প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৭শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৪

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যবদ্বীপের নৃত্য
শ্রীমুকুন্দদেব ঘোষ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪৪ | ১ম সংখ্যা

গীতিগুচ্ছ

বর্ষামঙ্গল ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে॥
সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে
তমাল কুঞ্জপথে সজল ছায়াতে
নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী।
বকুল মুকুল রেখেছে গাঁথিয়া
বাজিছে অঙ্গনে মিলন বাঁশরি।
আনো সাথে তোমার মন্দিরা
চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে,
বাজিবে কঙ্কণ বাজিবে কিঙ্কিণী
ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুনু রুনু॥

২

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি'
মম জল-ছলছল আঁখি মেঘে-মেঘে;
বিরহ দিগন্ত পারায়ে সারারাতি
অনিমেষে আছে জেগে।

যে গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
পূরব পবন বেগে ॥

শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল
বিদায় গোধূলিখনে,
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে,
কাঁপে নিশ্বাসে।
বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

৩

চিনিলে না, আমারে কি।
দীপহারা কোণে ছিনু অন্যমনে
ফিরে গেলে কারেও না দেখি'।
দ্বারে এসে, গেলে ভুলে
পরশনে দ্বার যেত খুলে,
মোর ভাগ্যতরী
এটুকু বাধায় গেল ঠেকি।
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গনি'
হায় শুনি নাই তব রথের ধ্বনি।
গুরু গুরু গরজনে কাঁপি
বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নি
অভিশাপ গেল লেখি ॥

৪

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে
সেদিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে
কী ভেবে ফিরালে মুখখানি
কী কথা ছিল যে মনে।

তুমি সে কি হেসে গেলে
আঁখি কোণে,
আমি বসে বসে ভাবি
নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি ;
তুমি আছ দূর ভুবনে ॥
আকাশে উড়িছে বকপাঁতি
বেদনা আমার তারি সাথী।
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই
বিদায় কালে কী বলো নাই
সে কি রয়ে গেল গো
সিক্ত যূথীর গন্ধ-বেদনে ॥

আজি গোধূলি লগনে এই বাদল গগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি,
সে আসিবে, আমার মন বলে সারাবেলা।
অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে ॥
অধীর পবনে তার উত্তরীয়
দূরের পরশন দিল কি ও,
রজনীগন্ধার পরিমলে
সে আসিবে আমার মন বলে ॥
উতলা হয়েছে মালতীর লতা
ফুরাল না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি এ কী কানাকানি,
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে ;
সে আসিবে আমার মন বলে ॥

থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষণ
ঝিল্লি ঝনক ঝননন
হে শ্রাবণ।

ঘুচাও স্বপ্নমোহ অবগুণ্ঠন।
এসো হে দুর্দ্দম বীর
ঝড়ের রাতে অগমপথে
জড়ের বাধা যত করো উন্মূলন।
জ্বালো জ্বালো বিদ্যুৎ-শিখা
দেখাও তিমিরভেদী দীপ্তি তোমার
দিগ্বিজয়ী তব বাণী দেহ আনি
গগনে গগনে সুপ্তিভেদী
তব গর্জ্জন জাগাও॥

বর্ষণ-মন্দ্রিত অন্ধকারে
এসেছি তোমারি দ্বারে
পথিকেরে লহ ডাকি
তব মন্দিরের এক ধারে।
বনপথ হতে সুন্দরী
এনেছি মল্লিকা মঞ্জরী,
তুমি লবে নিজ বেণীবন্ধে
মনে রেখেছি এ দুরাশারে॥
কোনো কথা নাহি ব'লে
ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে।
ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত নিশীথে
পথে যেতে বাঁশরিতে
শেষ গান পাঠাব তোমাপানে
শেষ উপহারে॥

আমি তখন ছিলেম মগন গহন
ঘুমের ঘোরে।
যখন বৃষ্টি নাম্‌ল তিমির নিবিড় রাতে

দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে,
প্লাবন ঢালা শ্রাবণ ধারাপাতে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে ॥
আমার স্বপ্ন স্বরূপ বাহির হয়ে এল,
সেথায় বুঝি সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্ন দোসর সাথে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে ॥
দেহের সীমা গেল পারায়ে
ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে
মত্ত হাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে ॥

ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ-পথে
কিসের আহ্বানে।
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে।
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।
দিনশেষে ফিরে এসে পাই নি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে,
বেলা গেল, হোলো না আর দেখা ॥

মেঘ ছায়ে সজল বায়ে মন আমার
উতলা করে সারাবেলা,
কার লুপ্ত হাসি সুপ্ত বেদনা হায় রে।

কোন বসন্তের নিশীথে
যে বকুল মালাখানি পরালে
তার দলগুলি গেছে ঝরে
শুধু গন্ধ ভাসে প্রাণে।
জানি ফিরিবে না আর ফিরিবে না
জানি পথ তব গেছে সুদূরে।
পারিলে না তবু পারিলে না
চির শূন্য করিতে ভুবন মম,
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি
দিয়ে গেছ তোমার গান ॥

১১

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা,
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা ॥
হয়তো সে তুমি শোনো নাই,
সহজে বিদায় দিলে তাই ;
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝর ঝর বারিধারা
চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি,
আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি।
আর কি কখনো কবে
এমন সন্ধ্যা হবে,
জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা ॥

মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধছায়া
নীপ কুঞ্জতলে
শ্যামকান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া
ফিরে বৃষ্টিজলে।
ফিরে রক্তঅলক্তকধৌত পায়ে
ধারাসিক্ত বায়ে
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা
সিঁথি প্রান্তে জ্বলে ॥

পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা।
উন্মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গ-দোলে,
কলমন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে
কার তরণী চলে॥

১৩

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
চাও কি,
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি,
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না।
প্রেমের বাদল নামল, তুমি
জানো না হায় তাও কি,
মেঘের ডাকে তোমার মনের
ময়ূরকে নাচাও কি॥
আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি
আমি সুরলোকের সুর সেধেছি
তারি তানে তানে মনে প্রাণে
মিলিয়ে গলা গাও কি,
হায় আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে
তুমি সাড়া দাও কি।
আজ ঝুলন দিনে দোলন লাগে
তোমার পরাণ হেলে না॥

১৪

আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো
বকুল ফুলের দুলে।
যেন মেঘ রাগিণী রচিত কী সুর
দুলাল কর্ণমূলে।
ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়া-বীথিকায়,
হাস্য কল্লোল উছল গীতিকায়,
বেণুমর্মর মুখর পবনে তরঙ্গ তুলে।

আজি নীপশাখায় শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,
আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।
মেঘপুঞ্জ গরজে গুরু গুরু,
বনের বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু,
স্বপ্নলোকে পথ হারানু
মনের ভুলে ॥

১৫

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সাথীহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্য ছায়াতলে।
কী জানি সেথা আছে কিনা আজো বিজনে
বিরহী হিয়া
নীপবন গন্ধ ঘন অন্ধকারে,
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায় ॥
হায় জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে
জানি সে নাই নাই।
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়,
ডাকে তবু হৃদয় মম মনে মনে
রিক্ত ভুবনে,
রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে ॥

১৬

আমার যে দিন ভেসে গেছে
চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগনতলে।
সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে
অতল বিরহে নেমে
আজি পূবের হাওয়ায় হাওয়ায়
হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে।
নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল
সেই দিন
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ।
তার ছিঁড়ে গেছে কবে
একদিন কোন হাহারবে—
সুর হারায়ে গেল পলে পলে ॥

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শান্তিনিকেতন

শ্রীমমতা দেবী, শান্তিনিকেতন

শ্রীনিবেদিতা দেবী, শান্তিনিকেতন

ফোকিন

নিজিনস্কি ও শ্রীমতী কারসাভিনা

শান্তিনিকেতনের নৃত্য

জাপানের নৃত্য

নৃত্যরস

শ্রীপ্রতিমা দেবী

বিশ্বজগতের মর্মে যে অনাদি চাঞ্চল্য, অস্তিত্বের যে অসীম আবেগ, তাই মিলল এসে পাখির দেহের ছন্দে, মিলল তার মনের চাঞ্চল্যে, মিলল তার প্রাণের আবেগে,—বন-রঙ্গভূমিতে তার থেকে দেখা দিল নাচ। আদিম কালে মানুষের অপরিণত মনের প্রকাশ-চেষ্টা ভাষার আঙ্গিক তখনো গড়ে তুলতে পারে নি, বিশ্বপ্রকৃতির থেকে আদিম চাঞ্চল্যের প্রেরণা পেয়েছে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। পাখির ভাষার সঙ্গে মিল ক'রে মানুষের এই প্রথম ভাষা। ছন্দের স্বাভাবিক আনন্দ মানুষ পেয়েছে বিশ্বজগতের দোলা খেয়ে, তার সঙ্গে মিশেছে সুখ দুঃখ বিরাগ অনুরাগে হৃদয়ের দোলা, এই আন্দোলনে সাহিত্যের পূর্বেই নৃত্য হয়ে উঠেছে তার ভাষার বাহন। এখনো আফ্রিকার বহু অসভ্য জাতির মধ্যে নৃত্যের উৎকর্ষ পরীক্ষা দ্বারা বিবাহের জন্য কন্যানির্বাচন-প্রথা বর্তমান আছে। এর থেকে বোঝা যায় মানবসমাজে আত্মপ্রকাশের গৌরব ছিল নৃত্যে। ক্রমে তার আঙ্গিক ও ব্যবহার বিচিত্র হয়ে উঠল। দেখা দিতে লাগল ধর্মানুষ্ঠানের নৃত্য, সম্মোহন-বিদ্যার নৃত্য, জন্মমৃত্যুবিবাহের ঘোষণা-সূচক নৃত্য, যুদ্ধ-অভিযানের নৃত্য। পর যুগে যেমন বাণীবদ্ধ মন্ত্রের নানা গূঢ় শক্তি কল্পনা করা হয়েছে, আদিম মানুষও ভয়ে ভক্তিতে আনন্দে সেই রকমই গূঢ় রহস্য কল্পনা করেছে বিবিধ নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে।

আর্ট মাত্রেই একটি গভীর রহস্যের আন্দোলন আছে। কেননা আমরা স্পষ্ট করে জানি নে সে কী বলছে।

যে ভাবার্থ ভাষার আনুষঙ্গিক, শিল্পে তার স্থান থাকার প্রয়োজন নেই। শিল্পের সার্থকতা অব্যবহিত ভাবে তার নিজের মধ্যেই। যার কল্পনার মধ্যে সে সাড়া পেল সেই জানলে তার মূল্য। যার কল্পনাকে সে স্পর্শ করল না, তার কাছে সে চিরকালই সংসারের অসঙ্গত পদার্থের মধ্যে নির্বাসিত। নৃত্যকলাতেও সেই রকম সব সময় তথ্যের বা যুক্তির মূল্য না থাকতেও পারে। অর্থাৎ তার সঙ্গে তথ্যের যোগ থাকলেও সেটা গৌণ। তার ভঙ্গী, একটি বিশ্বছন্দকে দেহের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত করে, যার অনির্বচনীয় বেদনা মানুষের মনকে চিরকাল নাড়া দিয়ে আসছে। যেমন ফুল ফোটা বা চারাগাছের পরিণতির মধ্যে প্রকৃতি তার নিজের নিগূঢ় গতিবেগের অনুসরণ করে, নৃত্যকলাও সেই রকম অপরিমেয় গতির ছন্দকে রূপ দিচ্ছে ইঙ্গিতমূলক মুদ্রাতে, তাই তার ভাষা সাহিত্য বা চিত্রের ভাষা নয়।

সমগ্র জগতের মধ্যে যে হিন্দোল রয়েছে দেহের মধ্যবর্তিতায় তারই বিচিত্র ভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে গাছের ডালে ফুলের পাপড়িতে পাতার সংস্থানে লিপিবদ্ধ করছে সেই নিরন্তর গতিছন্দকে। মানুষের কল্পনা সেই গতিশক্তিকেই অনুসরণ করে উদ্বেল প্রাণের বিচিত্র তরঙ্গলীলায়। সাহিত্য যেমন ভাষার যোগে আত্মপ্রকাশ করে, ছবি যেমন রং ও রেখার ভিতর নিজেকে ধরা দেয়, নৃত্যকলাও সেই রকম সুর ও তালের যোগে স্বরূপ নেয়। সুর পিছন থেকে জোগান দিতে থাকে শব্দজগতের রহস্যময় সেই বাণী যার মোহিনীশক্তি বিশ্বব্যাপী ভাষাতীত গভীর রসরহস্যকে ব্যক্ত করতে থাকে সাহানা, পূরবী, ভৈরবীর তানে; যার মধ্যে দিয়ে পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্নচ্ছায়া মানুষের মনে মায়া বিস্তার করে, ঝড়ের রাতের তাণ্ডব চিত্তকে আলোড়িত করে আর সূর্যাস্তের অবসন্ন নিবিড় আলোর অপূর্ব্ব আভাসে আমাদের মানসজগৎ রঙীন হয়ে ওঠে। নৃত্যও সেই রকম দেহের ভঙ্গীতে ছন্দোবদ্ধ করে পূরবীর বিদায় ব্যথা, সাহানার করুণ আনন্দ, আর ভৈরবীর অনির্দ্দিষ্ট সুদূরের আহ্বান। যে যত বড় রূপকার সে তত গভীর ভাবেই সেই অসীম ছন্দকে দেহের রেখায় [illegible] পারে। এ যেন নিঃশব্দ রেখার কবিতা, রেখাই তার ভাষা, দেহের একটুখানি মোচড় যে-মীড় লাগায় দর্শকের মনে, সেই মীড়ের মধ্যে নৃত্য-রসিকের সৌন্দর্যবোধ দানা

বেঁধে ওঠে, আন্দোলিত করে রসপিপাসুর চিত্তকে কখনো বিষাদে, কখনো বা আনন্দ-অনুরাগে।

মানুষের ভাষা যেমন প্রকৃতির ভাষাতীত কথা খুঁজে পেয়েছে সঙ্গীতের মধ্যে, মানুষের হৃদয়াবেগের গতি তেমনি বিচিত্র তালের ছন্দে আবিষ্কার করেছে জাগতিক গতির সহজ অলঙ্কারশাস্ত্রকে। পুরাকাল থেকেই দেবতা ও মানুষে মিলে অমর হবার কামনা করে আসছে। যে অমৃত লাভের ইচ্ছাতে দেবতারা সমুদ্র-মন্থন সুরু করল, মানুষের মধ্যেও সেই অভিলাষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কলাসৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল। তাই অমৃতবাহিনী উর্বশী ললিতকলার মধ্যে অমৃত সঞ্চার ক'রে মানবের অমরতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করলেন। রূপকার তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে চিরন্তন হয়ে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। কবি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ধন্য হয়ে রইলেন। অজন্টার গুহার দেওয়ালে, কনারকের ভগ্ন স্তূপে সেই দু-হাজার বৎসর আগেকার যে জীবনযাত্রার ইতিহাস চোখে পড়ে, তার মধ্যে শুধু কতকগুলি বর্ণসুষমার ব্যঞ্জনা দেখি তা নয়, যে-সব রূপকার তাঁদের মনের মাধুর্য দিয়ে এই বহুযুগ আগেকার জীবনযাত্রাকে পাথরের ফলকে দেয়ালের গায়ে এঁকে গেছেন, তাঁদের মন, তাঁদের দেখা, তাঁদের কথা আজকের দিনেও আমাদের কাছে কি প্রতিমুহূর্তে এই পাথরের ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে ওঠে না?

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই নিজেকে স্থায়ী করবার একান্ত ইচ্ছা মানুষের মনকে তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ ক'রে তুলেছিল, তাই চিত্তের মধ্যে নানা প্রকারের রস-উপভোগস্পৃহা বিচিত্র কলাসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আত্মপরিতৃপ্তির পথ খুঁজে বের করলে। এই চিত্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকলাও তার সহজ আদিমতাকে ছেড়ে ক্রমে মনের বিচিত্র গতিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের প্রাচীন নৃত্যকলাতে সঙ্গীত অভিনয় দুয়েরই যোগ আছে; তবে নৃত্যের অভিনয় ছন্দের ভঙ্গীতে প্রকাশিত হোত। সাধারণ ভঙ্গীকে ছন্দের মধ্যে অসাধারণ ক'রে তোলাই ছিল নৃত্যের অভিনয়। নৃত্যের মধ্যে খাঁটি নাট্যের মতো কথা না থাকার দরুন তাকে মুদ্রার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তা ছাড়া খাঁটি নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের আঙ্গিকের অনেক তফাৎ। নাটকীয় গুণগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় নাটক বাস্তবিক ঘটনার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। দুই বা ততোধিক পাত্রের চিত্তসংঘাত নিয়ে নাটকের বিষয়গুলি তৈরি হয়। তার মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য জাগিয়ে নাটকের রূপকারগণ অতি নিপুণ ভাবে বাস্তবকে মূর্তিমান করেন। কোথাও ঝাপসা বা অসঙ্গত বা কৃত্রিম কিছু থাকলে নাটক সেই পরিমাণে নাট্যরস-সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। খাঁটি নাটকে সংসারের রূপ প্রতিরূপ প্রতিফলিত হোতে থাকে, নৃত্যনাট্যে প্রকাশ পায় তার অন্তর-অন্তঃপুরবর্তী কল্পনা ও বেদনার সেই নিগূঢ় চাঞ্চল্য, যাকে অর্থবান কথায় ধরা যায় না, রূপবান চিত্রকলায় যা বাঁধা পড়ে না। সংসারে ঘটনা-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে বাস্তবের যে সুনির্দিষ্ট রূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে তাকে প্রকাশ করা নৃত্যের কাজ নয়, বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবকে উপলব্ধি করাই তার ধর্ম। নৃত্য ও সঙ্গীত অনির্দিষ্টকে নির্বিশেষ অর্থাৎ এবষ্ট্রাক্টকে ভাবের রাজ্যে রূপায়িত ক'রে তোলে, তাই অহৈতুক অনুভূতির পটভূমিকাতেই তার সৃষ্টি স্থিতি লয়।

কোনো সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান নর্তক তাঁর গোলাপ ফুলের স্বপ্নভঙ্গ নৃত্যের মধ্যে যে কলানৈপুণ্য ও অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন অনুভূতির প্রেরণা না থাকলে তাঁর সৃষ্টি অত শক্তিসম্পন্ন হোত না—সকালবেলার আলোতে ফুলের ফোটা, এ তো হোলো জগতের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু রূপকার সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন ফুলের প্রাণকে। তার ঝরে-পড়ার মধ্যে পরিপূর্ণ ফোটার যে সার্থকতা তাই হয়েছিল তাঁর বিষয়; সেই জন্যই তাঁর নৃত্য, নৃত্যের আঙ্গিককে ছাড়িয়ে অন্তরের করুণ আবেদনে ভরে উঠেছিল।

তাহোলে বোঝা যায় একটি বেদনাকে রূপ দান করাই নৃত্যের মূলে। যা দেহের অন্তরালে অদৃশ্য তাকে দেহে জাগিয়ে তোলা, অনুভবের মধ্যে যার অজ্ঞাতবাস তাকে অঙ্গভঙ্গীতে দোলায়িত ক'রে দেখানো, এই তো নৃত্য। ঘটনার বৈচিত্র্যকে নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, আঙ্গিক

জগতের স্বচ্ছ সরোবরে যে প্রতিবিম্বগুলি তরঙ্গিত হয় নৃত্যের সাঙ্গীতিক আবেগ তাকেই ছন্দে আবদ্ধ করে। তাই নৃত্যের মধ্যে নাটকীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার গাঁথনি অন্য প্রকার। প্রধান নর্তকই তার মুখ্য বাহন। আশেপাশের সমস্ত আয়োজন এই মধ্যবিন্দুকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। ফুল যেমন পাতার মধ্যে দিয়ে নিজের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, নর্তক তেমনি তার সমস্ত রঙ্গমঞ্চ ও সহচরদের নিজের গৌরবকে ফুটিয়ে তোলবার অনুবর্তী করে। নৃত্যের সমস্ত রস নির্ভর করে এক জনের উপর, যে সুদর্শনচক্রহাতে কলা-সৃষ্টিকে গড়ে তুলবে। এই প্রধান রূপকার যদি দুর্বল হয় তাহোলে সমগ্র জিনিষের রসভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে।

পুরাকালে নৃত্যবিদেরা নাচকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন; যেমন তাণ্ডব এবং লাস্য। নৃত্যকে তাঁরা কেবল বিলাসের উপকরণ মনে করেন নি। তাঁদের কাছে নৃত্য ছিল সাধনার প্রণালী, সেই রূপক কলার মধ্য দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক জগৎ মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। তাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পরিকল্পনা শিব ও উমার মূর্তির মধ্যে প্রথম তাঁরাই করেছিলেন। যে ললিতকলার ছন্দ প্রকাশ করে ছায়ালোকে জীবনমৃত্যুর রূপরূপান্তর, সেই শিল্পকলাই হোলো লাস্যরসের অধিকারিণী; সেই শিল্পকলাই জীবনের অফুরন্ত গতিচাঞ্চল্যকে চরণবিক্ষেপের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ক'রে কোন দুর্লভ আনন্দকে পাবার আশায় মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করে; সেই শিল্পকলাই প্রকৃতি-পুরুষের এই ইন্দ্রজাল-লীলার মধুর রসের প্ররোচনায় রঙীন করে তোলে পৃথিবীর স্বপ্নকে রাগ-অনুরাগের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায়। তার পরেই দেখা যায় শিবের তাণ্ডবের রূপক ছবি, যার মধ্য দিয়ে অনন্ত সৃষ্টিধারার শক্তিকে অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত করে তোলা হয়েছে।

জীবজগতের মধ্যে অহরহ যে নিগূঢ় দ্বন্দ্ব চলেছে অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে প্রাণীজগৎ পর্যন্ত, নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের চিত্ত সাধনা করছে সেই অসীম গতিশক্তিকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে। শিবের তাণ্ডব হোলো সেই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিশক্তির প্রত্যক্ষ রূপ। তার মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আবর্ত আমরা দেখি। তাণ্ডবের প্রতি-পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা যে কত গভীরভাবে এবষ্ট্রাক্টকে নিরুদ্দেশকে অনুভব করতে পারে শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভুত প্রকাশ। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গ-সীমানা অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

মানুষের চৈতন্য যখন বাইরের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কাছে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে নিজের সঙ্গে বিশ্বের ঐকান্তিক যোগকে আর্টিষ্টের মন অনুভব করে। তাই তার রচনার আনন্দ থেকে আবরণ যায় খুলে, উছলে ওঠে আদি প্রাণের উৎস। সমস্ত আর্টের গোপন কথাই এই হোলো,—নিজেকে ভুলে যাওয়া। এই আত্মবিস্মৃতি মানুষের মনকে সকল প্রকার সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের ও বিশ্বের মাঝে সেতু বাঁধে। নৃত্য ও সঙ্গীতকলাও সাময়িক ভাবে সেই যোগকে অনুভব করে কিন্তু তার প্রকাশের উপাদানের কোন ধ্রুবত্ব নেই ব'লে আপন সৃষ্টিকে সে স্থায়ী করতে পারে না। তাই পাওয়া এবং হারানোর অপরিসীম আনন্দ-বিষাদের অস্থায়ী মুহূর্তকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার সৃষ্টি। নর্তকের কাছে সেই সৃষ্ট মুহূর্ত্তগুলি চরম সত্য। তার পর নিবে যায় তার আলো কোন বিয়োগান্ত যবনিকার অন্তরালে, পিপীলিকার চরম অভিসারযাত্রা যেমন প্রাণের অবাধ উৎসবে মৃত্যুকে বরণ ক'রে ধন্য হয়, নর্তকের নৃত্য-মুহূর্ত্তগুলিও সেইরূপ অনুভূতির পরম প্রাপ্তির মধ্যে, ক্ষণিকের অন্তহীন আত্মবিস্মৃতির আনন্দে নিজেকে পরিসমাপ্ত করে! সঙ্গীত ও নৃত্যসাধকের চিত্ত ব্যর্থতার নির্মম সাধনায় তখন গেয়ে ওঠে—

দেবী. অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি—
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন খানি।

উপকথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা।

ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া খাটের উপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছি ও হাত-পাখা টানিয়া নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি এমন সময় পত্নী ঘরে ঢুকিয়া বিছানার পাশে বসিলেন ও হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমার মত অকর্ম্মা লোক ভূ-ভারতে যদি দুটি আছে!'

নিরুত্তরে সে-কথা স্বীকার করিলাম।

অতঃপর তাঁহার হাতের পাখার সঙ্গে মুখের ভাষারও গতি বৃদ্ধি হইল।

—ক হপ্তা থেকে বলছি—সাঁড়াশিটা সারিয়ে আন, তা আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু! মানি, কামার-বাড়ী অনেকটা দূর, তা বলে কেউ কি জিনিষ সারিয়ে আনছে না?

সবিনয়ে বলিলাম, 'এখানকার কামার-বাড়ীতে সারাতে যা দক্ষিণা নেবে, তার দামে কলকাতা থেকে একজোড়া ভাল সাঁড়াশি এনে দেব।'

—তাই দিয়ো। আর না দাও আসছে হপ্তা থেকে ডাল-তরকারি বন্ধ, শুধু ভাতে-ভাত খেয়ো।

সত্য কথা বলিতে কি এইরূপ ভীতি প্রদর্শনে বিশেষ চিন্তিত হইলাম না। যে স্বতঃস্বীকার্য্য কারণবশত বাঙালী হইলেই কেরানী হইতে হয়, এবং কেরানী হইলেই ডিস্‌পেপটিক হওয়া ললাট-লিপি, সেই ললাটের লেখনানুযায়ী তেল-ঘি-দেওয়া রান্নার উপর গত কয়েক মাস হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি; পটল ও কাঁচকলার উপর প্রীতি আসিয়াছে, ঘোল ও ডাবকে জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি এবং ভাতে-ভাত পাইলে তরকারির উপর প্রবল লোভকে দমন করিবার পন্থাও আবিষ্কার করিয়াছি। কিন্তু গৃহিণী শহর-বাসিনী নন। কাঠের জালে মাটির হাঁড়িতে ঢেঁকিছাটা মোটা চালের ভাতই সিদ্ধ করেন, তরকারিটা তেল-মশলা-সহযোগে বেশী পরিমাণেই রন্ধন করেন এবং বেলা একটায় প্রচুর পরিমাণে ব্যঞ্জনসহ বাটি-দুই ঘন ডাল খাইয়া রাত্রি নয়টায় ক্ষুধা অনুভব করিয়া থাকেন। সাঁড়াশিটা না সারাইয়া লইলে অসুবিধা বিস্তর। হায়! বাড়ীর দুয়ারে যদি কামার-বাড়ী থাকিত!

দক্ষিণ শিয়রে মাথা রাখিয়াছিলাম, উত্তর দিকের খোলা জানালায় দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক। এ-পাশে আমাদের নীচু প্রাচীর ও ও-পাশের পড়ো জমির ভাঙা প্রাচীরের মাঝখানে সরু এতটুকু গলি। গলিটা লম্বায় সত্তর-আশী হাতের বেশী হইবে না। তিন-চার ঘরের যাতায়াতের পথ। আমরা কিন্তু জন্মাবধি অন্য কোন বসতির চিহ্ন দেখি নাই। আমাদের বাড়ীটা বড়রাস্তা হইতে একটু দূরে এবং বনের মধ্যে বলিয়া কতবার আক্ষেপ করিয়াছি।

ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছি, সে-কালে ডাকাতের ভয় নাকি বেশী থাকায় বাড়ীটা আমাদের সদর রাস্তা হইতে একটু দূরেই ছিল এবং চারি দিকে ছিল লোকজনের বসতি। পিতামহদের কথঞ্চিৎ ধনাপবাদ ছিল।

আজ ইংরেজ-সুশাসনে চুরি-ডাকাতি কমিয়াছে, আমাদেরও ধনাপবাদ ঘুচিয়াছে। চারি পাশে যাহারা রক্ষী-স্বরূপ বাসা বাঁধিয়াছিল তাহাদের জনহীন ভগ্ন ভিটার পানে চাহিয়া চোখ যত না অশ্রুসজল হইয়া উঠুক, মনে ভয়ের পরিমাণটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওরা গেল কোথায়?

সামান্য একটা বেড়ির খিল পরাইবার জন্য আকাশ-পাতাল ভাবিয়া মরিতেছি ও অকেজো অপবাদ নির্ব্বিকার-চিত্তে মাথায় তুলিয়া লইতেছি, অথচ বাড়ীর দুয়ারেই ছিল কামার-বাড়ী। উত্তর-খোলা জানালা দিয়া যে পতিত জমিটুকু দেখা যায়, একটা বেলগাছ, একটা কাঁঠালগাছ, একটা জামরুল-গাছ ও গুটিকয়েক আমগাছ, উহাতেই বাসা বাঁধিয়া ছিল কামাররা। কামারদের ও-পাশের পড়ো জমিতে ছিল কুমোরদের বাসগৃহ। দুটি জমির মাঝে এখনও ইটের ক্রমক্ষয়িষ্ণু প্রাচীর বিদ্যমান। প্রাচীরের এ-পাশে একটি আমগাছের সঙ্গে ও-পাশে একটি ঝাঁকড়া জামরুল-গাছের মিতালি—আমরা জন্মাবধি লক্ষ্য করিতেছি। চৈত্র-সন্ধ্যায় বাতাস উঠিলে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। ছেলেবেলায় কল্পনা করিতাম পরস্পরে মল্লযুদ্ধ করে, এখন ভাবি ওরা অতীতের কথা ভাবিয়া হয়ত বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পরস্পরকে সান্ত্বনা দেয়!

ঠাকুরমার যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি নয় বৎসরের

বালিকা। শ্বশুরগৃহে আসিয়া একে ত বালিকা-বধূর মন টিকিত না, তার উপর ঘরের শিয়রে কামারশালা। দিনরাত হাপরে আগুন গন্‌গন্‌ করিতেছে, ভস্ত্রার ভস্‌ভসানি ও লোহা-পিটাইবার প্রচণ্ড শব্দে রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত বালিকার ঘুম আসিত না। কামারশালায় শুধু লোহা পিটানোই হইত না, নানা লোক রাত্রির কাজ সারিয়া গল্প করিতে আসিত এবং সেই সকল গল্প কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে না তুলিয়া উহারা জমাইতে জানিত না। ও-পাশে কুমোরদের 'পোয়াণ' হইতে এক-এক দিন এমন ধোঁয়া উঠিত যে আকাশের চেহারা বদলাইয়া যাইত। ঠাকুরমা প্রথম প্রথম বিরক্তি বোধ করিলেও পরে কামার-কুমোরদের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছিলেন। তখন ধোঁয়া ও শব্দের মধ্যে রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কামাররা ছিল পাঁচ ভাই—কালো এবং বলিষ্ঠ। লোহা পিটাইয়া পিটাইয়া দেহ উহাদের লোহার মত কঠিন হইয়াছিল, কেবল মনটায় সে-ছাপ পড়ে নাই। পাঁচ ভাইয়ের অবশ্য পাঁচটি বউ ছিল না, অর্থাৎ যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিন জনের মাত্র বিবাহ হইয়াছিল। বাকী দুই জন বালক, গ্রামের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল।

কামারের ছেলে বাল্যকাল হইতে লোহা পিটিয়া দেহকে কর্মঠ করিয়া তুলিবে, সে কি না গিয়া ঢুকিল বিদ্যালয়ে! পাড়ার হিতৈষীরা ও প্রাচীনরা জোর আপত্তিই তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ভাই রামকান্তের মতের দৃঢ়তায় সে আপত্তি টেকে নাই। অবশ্য পিছনে আমার প্রপিতামহ উৎসাহ না দিলে শেষ পর্য্যন্ত গোবিন্দ ও মুরারির পড়াশুনা কতদূর অগ্রসর হইত কে বলিতে পারে? প্রপিতামহ ছিলেন সেকালের ব্রাহ্মণ, গোঁড়া, অথচ বিদ্যোৎসাহী। জাতি-রক্ষার জন্য সব সময়ে তিনি ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিতেন কি না জানি না, কিন্তু মানুষের বিপদে কোন দিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই, শুনিতে পাই। মুখের কথায় তিনি টাকা ধার দিতেন, সুদ লইয়া কোন দিন কাহারও সঙ্গে বচসা করেন নাই এবং আদালত কোন্‌মুখো এ-খবরও নাকি তাঁহাকে লইতে হয় নাই। রামকান্তরা পাঁচ ভাই তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত; আত্মীয়ের মত ভালবাসিত।

হাপরে কাঠ-কয়লায় স্তিমিতপ্রায় আগুন যখন ভস্ত্রার পরিচালনায় শব্দমুখর ও আরক্ত হইয়া উঠিত, উত্তপ্ত লৌহের একাংশ সাঁড়াশি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া রামকান্ত যখন নেয়াইয়ের উপর সেই গলিতপ্রায় ধাতুপিণ্ড স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের পেশী ফুলাইয়া লৌহমুদ্গর দ্বারা ঠন্‌ঠন্‌ শব্দে আঘাত করিয়া চলিত, তখন পাশের তক্তপোষের উপর বসিয়া প্রপিতামহ পাড়ার অন্য পাঁচজনকে লইয়া তামাকু-সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য গল্প জমাইয়া তুলিতেন।

পাশের জলপূর্ণ নাদায় (মাটির গামলা) উত্তপ্ত লৌহ ডুবাইবার সঙ্গে ছ্যাঁক করিয়া যে-শব্দ হইত তাহার তালে তাল রাখিয়া রামকান্ত হয়ত বলিত, 'দা-ঠাকুর, এবার গোবিন্দ আর মুরারিরে লেখাপড়া শিখতে ইস্‌কুলে দেব। তা কাজটা কি ভাল হবে না, দেবতা?'

প্রপিতামহ হাসিয়া বলিতেন, 'ভাল বইকি।'

রামকান্ত বলিত, 'কিন্তু ওনারা যে বারণ করে, বলে, খিরিষ্টান হয়ে যাবে।'

—দূর! লেখাপড়া না শিখলে মানুষজন্মই বৃথা। আমার নাতিকে আমি স্কুলে দিই নি?

—তোমাদের কথা আলাদা, তোমরা হ'লে গিয়ে মোদের দেবতা।

—লেখাপড়া শেখা সকলেরই দরকার। তোরা তিন ভাই, রোজগার ত ভালই করিস। ওরা লেখাপড়া শিখে যদি ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে ত খড়ের ছাউনি ঘুচে পাকা কোঠাঘর হবে।

রামকান্ত একমুখ হাসিয়া বলিত, 'ছিচরণের ধুলো দাও দেবতা। ওরে গোবিন্দ, ওরে মুরারি, দা-ঠাকুরের পায়ের ধুলো নে।'

ছোট এতটুকু বাড়ী, পূব-দক্ষিণে কয়েকখানা খড়ের চালা, সামনে খানিকটা দাওয়া। পূব দিককার দাওয়ার শেষ কোণে রন্ধনের জায়গা, উঠানের এক কোণে গরুর গোয়াল। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা অধিকার করিয়া আছে কামারশালা। উঠানে যেটুকু জায়গা ছিল তাহাতে একটা কাঁঠাল-গাছ, একটা বেলগাছ ও কয়েকটা আমগাছ কর্ত্তারা পুঁতিয়াছিলেন। তখন পরিবার এত বাড়ে নাই, স্থানের

অকুলানও হয় নাই। বাসগৃহ ও বাগান দুয়ের সুখই তাঁহারা মিটাইয়া গিয়াছেন।

কালক্রমে সংসার বাড়িল, পরিবার-সংখ্যার অনুপাতে চালাও কয়েকখানা উঠিল, কেবল কর্ত্তাদের স্বহস্ত-রোপিত আম-কাঁঠালের গাছগুলি কাটা পড়িল না। কেন কাটা পড়ে নাই সে-কথা আজিকার দিনে বলিয়া বিশেষ লাভ আছে বলিয়া বোধ হয় না। জড়- এবং প্রাণী- জগতে যে-স্নেহ সেকালের মানুষগুলি বিতরণ করিতেন, সেই স্নেহকে তৌল করিবার বাটখারা আজিকার দিনে অমিল। এক-একটি শিশু-জন্মের সঙ্গে এক-একটি বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই ছেলের পরমায়ু ও গাছের পরমায়ু একই সুতার দুটি প্রান্তে বাঁধা থাকিত। রামকান্তরা জায়গার অভাব যথেষ্ট অনুভব করিয়াছে, কিন্তু অশ্রদ্ধাবশত পূর্ব্বপুরুষের দানকে নষ্ট করিবার দুঃসাহস তাহাদের হয় নাই।

যদি কেহ বলিত, 'গাছগুলো বড় বেড়ে উঠেছে। শীত-কালে উঠোনে এক ফোঁটা রোদ আসে না, দু-একটা কেটেই ফেল না।'

রামকান্ত হাসিয়া বলিত, 'শীত আর ক'টা দিন গো, কামারশালে ব'সে ও সুমুন্দিরে কি গেরাহ্যি করি, ভাই। কিন্তু গরমি কালে ওনারারই ত বেঁচিয়ে রাখেন। বাপ-পিতোমো কি মুখ্যু ছিলেন, ভাই? তেনারা দেবতা।'

বর্ষার জল লাগিয়া চালার কিছু ক্ষতি হইত এবং প্রত্যেকবারে চালায় 'খুঁচি' দিতে হইত। উপার্জ্জনক্ষম রামকান্তরা সে খরচটুকু গায়েই মাখিত না।

কামার-বাড়ীর তিন বউয়ে ভারি ভাব। তাহারা কাজ ভাগ করিয়া মনের সুখেই ঘরকন্না করে। বড়বউ দুই বেলা হাঁড়ি-হেঁসেল লইয়া থাকে, মেজ বাসন মাজা, কাপড় কাচা, উঠান ঝাঁট, ঘর নিকানো প্রভৃতি করে, সেজ পাতকুয়া হইতে জল তোলে আর গো-পরিচর্য্যা করে। ক্ষুদ্র সংসার এই কয়টি পরিপাটি হাতের সেবায় নূতন কেনা আয়নার মত ঝকঝক করিতে থাকে। ছেলেদের কোলাহল আছে, বউদের নালিশ নাই। কাহারও স্বামী উকিল, ব্যারিষ্টার বা আপিসের কেরানী নন, কাজেই অসৎ উপার্জ্জনের দোহাই দিয়া, না মনে, না বাহিরে, ময়লা কোথাও জমে না। দিনে রাতে সকলেই খায় এক তরকারি দিয়া ভাত, ছোট ছেলেরা পায় দুধ। মোটা চাল, শাক-পাতার তরকারি, মশলা কম, নুন বেশী, তেলের সম্পর্ক কিছু বা আছে,—ঘিয়ের গন্ধও নাই, অথচ শরীরের অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য ঐ সামান্য উপকরণেই অদ্ভুত ভাবে গড়িয়া উঠে।

ও-পাশে কুমোর-বাড়ীতে মাত্র তিনটি প্রাণী। আধ-বুড়া মা, বছর-ত্রিশের এক ছেলে ও ছেলের বউ। ছেলের নাম কৃষ্ণ; কামার-বাড়ীর সেজছেলের সঙ্গে নামের মিল থাকায় পরস্পরকে 'মিতে' বলিয়া ডাকে। ও-বাড়ীতে ঘর আছে দুখানি, জায়গা আছে প্রচুর। গাছের বালাই বিশেষ নাই, কেন-না, প্রকাণ্ড এক চালার মাঝে 'পোয়াণ' ঘর। উঠানের এক পাশে মাটির তাল আর এক পাশে অড়হর, নোনা আতা, আসশ্যাওড়া প্রভৃতির পালা স্তূপীকৃত ভাবে সাজানো রহিয়াছে। পালার পাশেই অসংখ্য হাঁড়ি, কলসী, সরা, জালা, নাদা, পাতকুয়ার পাট প্রভৃতি সাজানো। ঘরের সামনে যে মাটির দাওয়া তাহার এক ধারে প্রকাণ্ড এক গর্ত্তের মধ্যে চাক বসানো। দাওয়ার উপরেও মাটির তাল, ছোট-বড় কতকগুলি পুতুল ও সরা-ভাঁড় প্রভৃতি রহিয়াছে। কৃষ্ণ হাতের টিপে পুতুল তৈয়ারী করে, কৃষ্ণের মা একটা সরায় রং গুলিয়া তুলি লইয়া সেগুলির প্রসাধন করে। চন্দনযাত্রা, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, দোল, চড়ক প্রভৃতি ছোট-বড় বহু পর্ব্বদিনে বুড়ী সেগুলি ঝুড়িতে পুরিয়া মেলাক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং একখানা ছেঁড়া ফরসা কাপড় বিছাইয়া পুতুলগুলি তাহার উপর সাজাইয়া বেচিতে বসে। বেলাশেষে খালি ঝুড়ি হাতে ঝুলাইয়া আঁচলের ভারি খুঁটটা কোমরে গুঁজিয়া হাসিমুখে বুড়ী বাড়ী ফেরে।

কামারদের মত ইহাদের সংসারে যথেষ্ট সাচ্ছল্য। বুড়ীর স্বভাব ভাল, হাসিয়া ভিন্ন কথা বলে না এবং বউয়ের সঙ্গে অবনিবনাও বিশেষ হয় না।

এক দিন বুড়ীর বউ হরিমতী বলিল, 'মা, সইদের বাড়ী কত গাছ আছে, আমাদের উঠোনটা খালি-খালি দেখায়, একটা গাছ পোঁত না।'

বুড়ী দাওয়ায় পা ছড়াইয়া কড়াইয়ের ডাল ভাঙিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'গাছ দিবি ত জায়গা কই? হাঁড়ি-কুঁড়িতে যে উঠোন ভর্ত্তি!'

হরিমতী বলিল, 'কেন, পাঁচিল ঘেঁয়ে একটা গাছ পুঁতবো, জামরুল-গাছ।'

বুড়ী হাসিয়া বলিল, 'তাই পুঁতিস। আসছে রথের মেলায় গাছ কিনে আনবো। যদি খোকা হয়ত জামরুল-গাছ পুঁতবি, খুকী হ'লে আমগাছ।'

হরিমতী লজ্জায় মাথা নামাইয়া মৃদু হাসিল।

হরিমতীর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নাই। একটি ফুটফুটে সুন্দর খোকা তার কোলে আসিয়াছে এবং প্রাচীর ঘেঁষিয়া জামরুল-গাছও একটা পোঁতা হইয়াছে।

কিন্তু জামরুল-গাছটা বড় হইয়া একটুখানি অনর্থের সূত্রপাত করিল। গাছটা সেবাযত্ন পাইয়া দিন দিন সতেজ শাখা-প্রশাখা মেলিতে লাগিল এবং প্রাচীরের ও-পিঠে কামারদের গোশালার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কামারদের সেজবউ বড়বউকে বলিল, 'ও দিদি, ত্যাখ না, সইয়ের জামরুল-গাছ কেমন বেড়েছে। এবার আশ মিটিয়ে জামরুল খাব।'

কথাটা বড়বউ শুনিল, বড়কর্ত্তা রামকান্তও শুনিল। বড়বউ সেজবউয়ের আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, 'তাই খাস।'

রামকান্ত কিন্তু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'তাই ত, গাছটা বড্ডাই বেড়েছে। গোয়ালের ও-কম্মো না শেষ করে!'

বড়বউ হাসিয়া বলিল, 'তোমাদের এতগুলো গাছ যদি বাড়ীটা অক্ষে করে, ওই পুঁটকে গাছটা গোয়ালের করবে কি!'

রামকান্ত হাসিল, 'তা বটে! ও-বাড়ীর বউমা দিয়েছে বুঝি। তা যত্ন আছে গাছটার।'

গাছটায় গাঁটে গাঁটে যেমন ফল ধরিল, ছেলেদের উৎপাতও সেই দিন হইতে সুরু হইল। প্রাচীরের মাথা হইতে ইট খসিতে লাগিল, চালার খড় বিশৃঙ্খল হইয়া অনেকগুলি ফুটা দেখা দিল এবং ভাঙা জামরুল-ডালে ও আধ-খাওয়া ফলে উঠান জঞ্জালময় হইল।

এক দিন সেজবউ হরিমতীকে বলিল, 'সই, তোর গাছটা এবার কেটে ফ্যালা, না হ'লে মোদের পাঁচিল উঠোন, চালা কিছুই থাকবে না।'

হরিমতী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, 'ষাট! ষাট! আমার দাদুর বয়সী গাছ। ছেলের মা হয়ে কোন্ লজ্জায় তুই ও-কথা মুখে আনলি!'

সেজবউ একটু চড়া সুরে বলিল, 'না কাটলে মোর গতর যে যায়!'

হরিমতী বলিল, 'গতর খাটালে তবে না গতর ভাল থাকে।'

সেজবউ বলিল, 'তবে আমিও পাঁচিলের পাশে একটা আমগাছ পুঁতব, তোর গতর খাটাস।'

হরিমতী হাসিল, 'তুই যেমন সই, গাছের সঙ্গে পেতিয়ে দেব সই। তোর পেটে যে ছেলে অয়েছে ওর জন্মোদিনে পুঁতিস, ভাই।'

সেজবউ হাসিয়া বলিল, 'দিদিরে বলবো। একটু কাসুন্দি দিবি ভাই, ভাত খেতে গেলেই গা স্তাকার-স্তাকার করে।'

ছোট একটু কলাপাতায় করিয়া হরিমতী কাসুন্দি ও কুল-আচার আনিয়া সেজবউয়ের হাতে দিল।

সেজবউ গলা খাটো করিয়া কহিল, 'খবরদার, ওনাদের বলিস না, ভাই, কাল আবার জ্বরের মত হয়েলো কিনা।'

হরিমতী চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, 'অরে কাসুন্দি খাবি? না ভাই।'

সেজবউ মিনতি করিয়া বলিল, 'অরুচির মুখ, হেই ভাই, তোর দু-পায়ে পড়ি ওদের বলিস না।'

ও-ঘর হইতে হরিমতীর শাশুড়ীর গলা শোনা গেল, 'বউমা, এই নাউডগাগুলো বড়বউমাকে দ্যাও ত।'

খানিক বাদে বড়বউ এ-বাড়ীর মধ্যে একটা পিতলের ঘটি হাতে করিয়া উপস্থিত।

ঘটিটি দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'বুধির দুধ। রোজই মনে করি এক ফোঁটা দেব, তা পোড়া মনের দশা দেখ না।'

ঝুমোর-গিন্নি হাসিয়া বলিল, 'সে কি বড়বউমা, পরশু যে এক ছটাক (কাঁচি আধ সের) দুধ দিয়েলে গো।'

বড়বউ বলিল, 'সে অবির (রবি) দুধ।'

কুমোর-গিন্নি পুনরায় শুধাইল, 'তা কতখানি দুধ দিচ্ছে, বউমা!'

বড়বউ বলিল, 'গরুটো ধারে বাটে ভাল। দোউজি কি না (দুবার বাছুর হইয়াছে যাহার)। এবেলা ওবেলা পাঁচ সের দেয়। আমি কি ছাই টানতে পারি! মেজ যেদিন দোয় সেদিন ছ-সের পাওয়া যায়। এক ছটাক পিত্যহ ঠাকুরবাড়ী দেই, কচিকাচার ঘর কুলোয় না, মা। ওনারা ত পায়ই না।'

কুমোর-গিন্নি বলিল, 'এবার নই বাছুর হ'লে একটা দিস ত, পুষবো। বউমার ভারি সাদ।'

এদিকে রামকান্ত, শ্যামকান্ত আর কৃষ্ণকান্ত তিন ভাইয়ে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে। কেহ লোহা কাটে, কেহ পিটায়, কেহ বা ভস্ত্রা চালনা করিয়া আগুনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

একদিন কৃষ্ণকান্ত কহিল, 'শুনেছ দাদা, ও-পাড়ার চকোত্তিরা তিন ভায়ে ভেন্ন হ'ল।'

রামকান্ত বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করিয়া কহিল, 'বলিস কি কেষ্ট! ভেন্ন হ'ল? বেরাম্ভন দেবতা একটু নজ্জা করলেন না। কলিকাল!'

শ্যামকান্ত বলিল, 'ওনারা ত নতুন নয়। আর-বছর বোসেদের ছ-ভায়ে মাথা ফাটাফাটি মনে নেই?'

রামকান্ত চড়া গলায় বলিল, 'কাজটা কি ভাল? আমাদের জেতে হ'লে একঘরে করতো। ওনারা বেরাম্ভন কায়েত—নেখাপড়া জানা লোক, আলাদা কথা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিল, 'গোবিন্দটারে আর লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ নেই। কামারের ছেলে ফাল পিটুক।'

রামকান্ত হাসিয়া বলিল, 'না রে, দা-ঠাকুর বলে ছেলে ভাল, কাজ করলে উন্নতি করবে।'

শ্যামকান্ত বলিল, 'ছুত্তোরি উন্নতি! পাস দিয়ে করবে কি? আমাদের মত খাটতে পারবে? ইস্, যে তুল-তুলে শরীল!'

রামকান্ত বলিল, 'মোরা মুকখ্যু বলে ও-ছুটোরেও মুকখ্যু বানাবি! আজকাল পাঁচ দেশের সঙ্গে কুটুম্বিতে, মোদের দেশ ঘরে ত কন্তে মেলেন না, একটু লেখাপড়া শেখা ভাল। আমরা ত ভদ্দর নোকেদের বাপ বলতে শালা বলি।'

হা হা করিয়া হাসিয়া রামকান্ত ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিল, 'এবার পাস্ দিতে ট্যাকাও ত লাগবে এক কাঁড়ি, কোত্থেকে জোগাড় হবে, শুনি?'

'সে হবে।' বলিয়া রামকান্ত উত্তপ্ত লোহার হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

কৃষ্ণ জিদ ধরিয়া বলিল, 'না, বল তুমি। বউরো গয়না দেবেন, না কলসীতে লুকোনো আছে টাকা?'

রামকান্ত বলিল, 'বউদের গয়না ত ভারি! রুপোর খাড়ু, রুপোর পৈছে। নথ যা আছেন তার সোনা কতটুকু? কলসীতে যা লুকোনো ছিল তার দফাও ত শেষ। বই কেনা, মাইনে...' পরে মাথা নাড়িয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'আছে, আছে, টাকার ঠিক আছে।'

দুই ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে রামকান্ত চুপি চুপি বলিল, 'দা-ঠাকুর দেবে বলেছে। খবরদার, কাউকে বলিস নে যেন?'

—টাকা শুধবে কিসে?

এবার রামকান্ত রাগিয়া গেল, বলিল, 'তোর বিয়ের দেনা শুধলাম কিসে? গতরে। পাস ক'রে ওরাও ত গতর খাটাবে, দেনা শোধার ভাবনা? হ্যাঁ! নে, নে, ছুতোরদের আট জোড়া চাকার আজ 'উলু' পড়াতে হবে, চটপট হাত চালা।'

এন্ট্রান্স পরীক্ষার মোটা ফী জমা দিবার জন্য প্রপিতামহ কামারদের কিছু টাকা ধার দিলেন। মুখের কথায় ধার দেওয়া, মুখের কথাই লেখাপড়া। হ্যাণ্ডনোট, হাত-চিঠার চলন সে-কালে পাড়াগাঁয়ে ছিল না বলিলেই হয়। লিখিত জিনিষ আদালতের সাহায্যে আদায় করা আজকালকার দস্তুর হইয়াছে, সে-কালে সামান্য একটি সাক্ষী রাখিয়াও এ-কার্য্য হইত না। অশিক্ষিত মানুষ কিনা, বুদ্ধিবৃত্তিটা মোটাই ছিল।

টাকা ধার দিবার পক্ষ-খানেক মধ্যেই প্রপিতামহ

আরতি

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

দেহরক্ষা করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বাক্‌রোধ হওয়াতে টাকার অঙ্কটা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারিলেন না।

শ্রাদ্ধ-দিবসে বহু ভদ্রলোক চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। রামকান্ত চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার নীচেয় দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া মুণ্ডিত মস্তক পিতামহকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'একটা নিবেদন আছে দেবতা। আপনারাও অনুগ্রহ ক'রে কান দিন।'

পিতামহ বলিলেন, 'বোস না, রামকান্ত-দা।'

রামকান্ত তেমনই হাতজোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, 'বহুৎ কাজ, দেবতা, বসবার জো নেই। আপনারা হয়ত জান না, গোবিন্দ, মুরারির লেখাপড়া দা-ঠাকুর না থাকলে চুলোয় যেত। এবার কম ট্যাকাটা দিয়েছে বেরাস্তন! বউদের গায়ে গহনা নেই, মাটির নীচেয় যা পোঁতা ছিল তা বই কিনে, মাইনে দিয়ে কাবার। ওনারে বললাম, কি হবে, দেবতা? দেবতা হাসলে। বললে, ভয় কি আমকান্ত, ট্যাকা আমি দেব। একটা নয়, দশটা নয়, তিন কুড়ি ট্যাকা, শুনে রাখ দেবতারা, তিন কুড়ি ট্যাকা বেরাস্তনের কাছে ধারি। কথাটা শুনিয়ে আমার ধম্মে আমি খালাস।'

কথা শেষে দাওয়ার উপর মাথা ঠেকাইয়া সকলকে প্রণাম করিয়া রামকান্ত দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

•

বছর-খানেক বেশ ভাল ভাবেই কাটিল। গোবিন্দ ভালভাবে এন্‌ট্রান্স পাস করিয়াছে ও উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় যাইবে স্থির হইয়াছে। মুরারি হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া দাদাদের সঙ্গে কাজে লাগিয়াছে। গোবিন্দ ছেলে ভাল, পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগ। উচ্চশিক্ষার জন্য যে-দিন সে দেশ ছাড়ে সে-দিনটা নাকি পাড়ার সকলেরই বেশ মনে ছিল। কৃষ্ণ ও শ্যামকান্ত কিছুতেই অনুমতি দিবে না, রামকান্তও ভাইকে ছাড়িতে রাজী হয় নাই, কেবল আমার পিতামহের কথায় উহাদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ় বাঁধন শিথিল হইয়াছিল।

পিতামহ বলিলেন, 'জান ত রামকান্ত-দা, বাবা লেখা-পড়া শেখা কত পছন্দ করতেন? আমার ছেলেকেও আমি কলকাতায় পাঠাচ্ছি; এক নৌকোয় যাবে, একসঙ্গে থাকবে, ভাবনা কি?'

রামকান্ত চোখের জল মুছিতে মুছিতে শুধু প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'হ্যাগা ঠাকুর, লেখাপড়া শিখে ওটা করবে কি? দারোগা হবে?'

পিতামহ হাসিয়া বলিলেন, 'দারোগার ওপরও ত হ'তে পারে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট।'

রামকান্তরা তিন ভাই হাঁ করিয়া পিতামহের পানে চাহিয়া হয়ত বা তাঁর কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল এবং কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'সে কারে কয়?'

পিতামহ বুঝিলেন উহাদের সরল অন্তরে উচ্চপদের মর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া দেওয়া কতটা কঠিন! তাই তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ওই দারোগারই মতন।'

অমনি শ্যাম ও কৃষ্ণ সমস্বরে আপত্তি তুলিল, 'সে হবে না, ঠাকুর। গোবিন্দরে আমরা দারোগা হ'তে দেব না। তার চেয়ে লোহা-পেটাটা মন্দ কি?'

গোবিন্দ সকাতরে পিতামহের পানে চাহিয়া বলিল, 'আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন। লেখাপড়া না শিখলে জীবনই আমার বৃথা!'

রামকান্ত রুখিয়া উঠিল, 'জীবনই বেরথা! কেন রে গোবিন্দ, জীবন বেরথা কেন? আমরা তা হ'লে মুরুখ্যু মনিষ্যি—'

পিতামহ অতিকষ্টে ক্রুদ্ধ রামকান্তকে শান্ত করিয়া গোবিন্দর পড়ার অনুমতি আদায় করিলেন।

রামকান্ত কহিল, 'ট্যাকা? এই পড়নেই ট্যাকার ছেরাদ্ধ, আবার ট্যাকা—'

গোবিন্দ বলিল, 'মাস মাস আপনাদের কাছ থেকে কিছু নেব না, শুধু রাহা-খরচটা দিয়ে দিন।'

রামকান্ত রাগিয়া বলিল, 'ভারি আমার পুরুষের আগ্‌রে, কিছু চাই নে! এতদিন খেইয়ে পইরে বেঁচিয়ে রাখলে কে? নেকাপড়ার ছেরাদ্দ জোগালে কে? আমি, না তুই? বল নেমকহারাম, বল শুনি?'

গোবিন্দ নতমুখে বলিল, 'আপনাদের ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারব না।'

রামকান্ত চড়া গলায় বলিতে লাগিল, 'শোন, ঠাকুর, শোন। নেকাপড়া শিখে গাছ-গরুটা কি বলে শোন। ওরে নেমকহারাম,—ভায়ের কাছে আবার ঋণ কি রে? বড়ভাই পিতৃতুল্যি তা জানিস?'

গোবিন্দ অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, 'জানি। বাপের চেয়েও তাঁরা বড়।'

রামকান্ত চড়া গলাতেই বলিতে লাগিল, 'সখ হয়েছে, নেকাপড়া করবা, কর। মোদের গোঁ নয় নাই থাকলো! নিজে খেটে যে শরীল পাত করবা সে হবে না। মাস মাস ট্যাকা পাঠাবো, পড়বা, কিন্তু পাসটি দিয়েই দেশে আসতে হবে। এই কাল আর ওই হাতুড়ি, বুঝলে?'

বিদায়-দিনের মড়া-কান্নাটা বাদ দিলে এইটুকু বলা যায়, গঙ্গার ঘাটে সেদিন গ্রামের অর্দ্ধেক লোক জড় হইয়াছিল। দইয়ের ফোঁটা কপালে পরিয়া, ঠাকুরের প্রসাদী বিল্বপত্র আঘ্রাণ করিয়া ও স-পল্লব পূর্ণকুম্ভ সম্মুখে রাখিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া ইহারা নৌকায় উঠিল।

সে-দিন বহু সাধ্যসাধনায়ও কামার-বাড়ীতে উনান জ্বলে নাই।

আরও এক বছর বাদে গ্রামে হঠাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিল। জ্বর না বলিয়া মহামারী বলাই উচিত। এক দিন দুই দিনের জ্বরেই মানুষ মরিতে লাগিল, যেমন বৈশাখী ঝড়ে আলগা বৃন্ত হইতে রৌদ্র-জর্জ্জর আমগুলি টুপটাপ করিয়া খসিয়া পড়ে।

আমাদের গ্রাম হইতে দশ মাইল দূরে উলায় বহু বৎসর পূর্ব্বে এই মহামারী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। উলা তাহাতে শ্মশান হইয়া যায়। যাহা হউক, মারী-আক্রমণ সেরূপ তীব্র না হইলেও কিছু কিছু জনক্ষয় হইল। মহামারী রামকান্তের বাড়ীতে কয়েকটি শিশুকে গ্রাস করিয়া রামকান্ত ও কৃষ্ণকান্তকে আক্রমণ করিল। আবার পিতামহও সে আক্রমণ-বেগ রোধ করিতে পারিলেন না।

বন্ধুর সেবা করিতে আসিয়া কুমোর কৃষ্ণ বলিল, 'মিতে, আগে গেলে ত চলবে না। মোদের কথাটা কি হুঁস নেই?'

বাক্‌শক্তিহীন কৃষ্ণকান্ত বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরিয়া গোঙাইয়া গোঙাইয়া কি বলিল বোঝা গেল না। কুমোর কৃষ্ণ কয়েক বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া সে-কথার জবাব দিল। তার পর, সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই কুমোর কৃষ্ণ জ্বরে পড়িল এবং একটা-দুই আগুপিছু দুই বন্ধু অজানা জায়গায় গিয়া হয়ত বা নূতন করিয়া স্নেহভালবাসার আস্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মত মহামারীর একটা স্পর্শ গ্রামের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ঝড়-শেষে দেখা গেল, রামকান্ত ও মুরারি দুই ভাই মাত্র বাঁচিয়া আছে। বউয়েরা নাই, শিশুগেছীর কেহই নাই; দূর দেশে ছিল বলিয়া গোবিন্দ কেবল বাঁচিয়া গিয়াছে। কুমোর-বাড়ীর কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বউ আশ্চর্য্য মরণ মরিয়াছে। বুড়ী কেবল নাতিটিকে বুকে চাপিয়া সেই দুর্জ্জয় শেল সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বাড়ীতে পিতামহের দেহান্তর ঘটিয়াছে। মোট কথা, গ্রামের এক-চতুর্থাংশ লোক এই মহামারীর মুখে উড়িয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা শোকে, ভয়ে সান্ত্বনা দিবার কথাও যেন ভুলিয়াছে।

রোগের দুর্য্যোগ থামিতে-না-থামিতে ইউরোপে হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল এবং তাহার ফলে লোহার দর খুব চড়িয়া গেল। লোহার দর চড়িলেও ততটা ক্ষতি হইত না, দুর্ভিক্ষের ভয়াল ভ্রূকুটিতে মানুষ বড়টা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। জিনিষের চাহিদা থাকিলে মূল্যবৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু অনাবৃষ্টি হওয়ায় রাঢ়দেশে ফসল ভাল ফলিল না। ফসল না ফলিলে চাকার খরিদ্দার আসিবে কোথা হইতে? ছুতার কেনা কাঠের স্তূপ সম্মুখে সাজাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রামকান্তের মস্ত একটা লাভের অংশ চাকায় 'উলু' মারা একদম বন্ধ হইয়া গেল। টুক্‌টাক্‌ করিয়া কাজ যা করে তাহাতে সংসার কোন রকমে চলে। সংসার বৃহৎ নয় বলিয়াই রক্ষা। শোক ও অশ্রুর মধ্য দিয়া মহামারী রামকান্তকে সে-দিক দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছে।

পিতামহের মৃত্যুতে পিতাঠাকুর বাড়ী আসিলেন এবং সংসারে অভিভাবক কেহ না থাকায় দেশেই রহিয়া গেলেন। এত বড় দুঃসংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ কিন্তু বাড়ী আসিল না।

একদিন প্রাতঃকালে রামকান্ত পিতাঠাকুরের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হ্যাগা, বাবাঠাকুর, কি মহাপাতকী মুই, ঘর-সংসার কোথায় ভেসিয়ে নিয়ে গেল, তার ওপর লোহার বাজার আগুন। রাঢ়ে অজন্মা, মোদের পেট চলা কি ক'রে বল? হ্যাগা, গোবিন্দ একবার এল না? এই বিপদে একবার—'

পিতাঠাকুর বলিলেন, 'গোবিন্দ অনেক দিন হ'ল আলাদা বাসা করেছে। তার প্রতিজ্ঞা, লেখাপড়া ভাল ক'রে না শিখে দেশে পা দেবে না।'

রামকান্ত কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, 'হাত্তোরি নেখাপড়া! মানুষের চেয়ে নেখন হ'ল বড়? মানুষই যদি মরে ছেয়ের নেখাপড়ায় কি হবে?'

পিতাঠাকুর সান্ত্বনা দিতে গেলেন, রামকান্ত শুনিল না। কেবলই বলিতে লাগিল, 'নেখাপড়া শিখলে মনিষ্যির বস্তু থাকে না আজ বোঝলাম। শামা কেষ্ট বলত, বুঝি নি। ওরা জেতেই হয় আলাদা।'

পিতাঠাকুর একখানা চিঠি উহার হাতে দিতে গেলেন। রামকান্ত বলিল, 'তুমি পড় বাবাঠাকুর।'

পিতাঠাকুর চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝাইলেন তাহার অর্থ এই: গোবিন্দ ইচ্ছা করিয়াছে শিক্ষার আস্বাদ শেষ পর্য্যন্ত লইবে। দেশে তাহার দাদাদের যে-দুরবস্থা সে দেখিয়াছে তাহাতে মনে তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে। হীন ভাবে উদরান্নের সংস্থান তাহাকে দিয়া হইবে না। কলিকাতায় আসিয়া সে বুঝিয়াছে একই মানুষ অবস্থাভেদে পশু-জীবন যাপন করে। তাহার দাদার কাছে সে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছে। যদি সুদিন আসে দাদাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে, সে অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু জীবন থাকিতে কামারশালায় ঢুকিতে পারিবে না।

রামকান্ত চীৎকার করিয়া দাওয়ার নীচেয় বসিয়া পড়িল। পিতাঠাকুর তাহাকে ধরিতে গেলে সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'ঠিক, ঠিক, নেমকহারাম সে নয়। আমাদের জাতকে সে ঘেন্না করতে শিখেছে। বাবাঠাকুর, ও-দেশে কি ওলাউঠো ধরে না, এই এমনধারা জর এখানে যেমন হয়েলো? তুমি গোবিন্দর মরা খবর কেন নিয়ে এলে না? ওরে মুরারি, মুরারি রে, তোর দাদা গোবিন্দর মিত্যু হয়েছে রে—'

প্রচণ্ড শোকেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে, কোন কোন শোক সান্ত্বনারও অতীত। পিতাঠাকুর নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিলেন।

রামকান্তর কামারশালার হাপরে আগুন জলে, টুকটাক্ লোহা-পেটানোর শব্দও হয়, লোক আসিয়া বসে, গল্প করে। কিন্তু পূর্ব্বের মত সে শব্দ, সে কোলাহল আর শোনা যায় না।

কুমোর-বাড়ীর পোয়াণে বহুদিন আগুন পড়ে নাই; আকাশের চেহারা এখন ঘন নীল। অড়হর, আসশেওড়া প্রভৃতির পালায় উঠান ভর্ত্তি। হাঁড়ি সাজাইয়া পোয়াণ ভর্ত্তি করিবার লোক নাই, আগুনই বা ধরায় কে? এক শোকের প্রচণ্ড আগুনে কর্ম্মের আগুন কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের হাতের তৈয়ারী হাঁড়ি, কলসী, জ্বালাতে উঠান এখনও ভর্ত্তি, কিন্তু সেরূপ বিক্রয় হয় না। রাঢ়দেশের অজন্মার সঙ্গে নিত্যব্যবহার্য্য হাঁড়ি-কলসীর বিক্রয় কেন বন্ধ হইল?

কুমোর-বুড়ী আমাদের বাড়ী আসিয়া ঠাকুরমার কাছে প্রায়ই সে দুঃখের কাহিনী বলে আর কাঁদে।

—মা-ঠাকরোণ গো, পোড়া যমের জালায় এঁকে জলে মনু, তার ওপর পেটের জালা। এই গুঁড়োটা না থাকলে গঙ্গায় ডুবে মরতাম। একবার ভাবি এখানকার বাস উইটে বাঁগাচড়ায় বুনের বাড়ী যাই। আবার ভাবি সাতপুরুষের ভিটে, তবু সন্ধ্যের পিদিমটা ত দেখানো হয়। কি করি বল ত, মা!

ঠাকুরমা বলেন, 'তা কেষ্টর মা, হাঁড়ি তোমার যা আছে তাই বিক্রী হ'লেই ত বছর দুই চলে যায়।'

বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, 'কে নেবে মা-ঠাকরোণ। এই তোমাদের বাড়ীতেই দেখ না, কাঠের জাল উইটে কয়লার জালে আন্না কর। ঘর ঘর এই অবস্থা। বড়-নোকেরা সব পেতলের হাঁড়ি কিনেছে, বলে মাটির হাঁড়ি দু-দিনে ফেটে যায়। পাঁচ পয়সার জিনিষটে দু-পয়সায় বেচতে হয়। এতে খোকার দুধই বা আসে কোত্থেকে, মোর পোড়া পেটই বা চলে কি ক'রে? ভিটে বেচে বুনের বাড়ী যাই, কি বল?'

ঠাকুরমা বলেন, 'ভিটে বেচিস নে, কেষ্টর মা। বোনের বাড়ী গিয়ে দিনকতক দেখ। ছেলেটা যদি মানুষ হয় ভিটের দরকার আগে।'

—ঠিক বলেছ, মা। ভিটে থাকলে মাঝে মাঝে এসে তোমাদের ছিচরণ দর্শন ক'রে যাব।

ঠাকুরমা বলেন, 'তুমি ত পুতুল তৈরি করতে

পার, কেষ্টর মা। মেলায় বেচে তা থেকেও ত কিছু পেতে।'

কেষ্টর মা বলিল, 'আর নজরের যুত নেই, মা-ঠাকরোণ অং গুলতেও পারি নে। আমাদের মাটির পুতুলে তোমাদের খোকারা ভোলেন না, মা-ঠাকরোণ। বউরো বলেন, মাটির জিনিষ পড়লেই ভেঙে যায়। এখন ওই যে রবারের ভেঁপু হয়েছেন, কেমন কাঁচের পুতুল—ওনারাই ত আমাদের অন্ন মারলে। (তখনও জার্ম্মেনী বা জাপানের সুন্দর সুন্দর হরেক রকমের নয়নমুগ্ধকর খেলনা আমদানী হয় নাই।)'

তার পর আরও অনেকক্ষণ দুঃখ করিয়া নাতিটিকে কোলে চাপিয়া বুড়ী উঠিয়া গেল।

একদিন সকালে পরিচিত এক দোকানী আসিয়া কৃষ্ণের হাতের তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসী জলের দরে কিনিয়া লইল। জিনিষগুলি গাড়ী ভর্ত্তি হইবার সময় কৃষ্ণের মায়ের বুকফাটা কান্নায় পাড়ার লোক আসিয়া সে বাড়ীতে জড় হইল। কৃষ্ণ যেন আর একবার নূতন করিয়া মরিল!

বৈকালে মেটে ঘরের দুয়ারে তালা লাগাইয়া নাতি কোলে করিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বুড়ী ভিটা ছাড়িয়া বোনের বাড়ী চলিয়া গেল।

দিনকয়েক পরে রামকান্ত একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ডাকিল, 'বাবাঠাকুর?'

—কি রামকান্ত-দা?

—একটা লেখাপড়া করতে হবে যে, ভাই?

পিতাঠাকুর সবিস্ময়ে বলিলেন, 'কিসের লেখাপড়া?'

রামকান্ত বলিল, 'তোমার হয়ত মনে নেই, বাবাঠাকুর, তোমার ঠাকুরদার কাছে তিন কুড়ি টাকা ধারি। ভেবেলাম গতর দিয়ে শুধবো, তা এ জন্মে হ'ল না। এই ত শরীলের অবস্থা, কবে আছি, কবে নেই, বেরাহ্মনের ঋণ নিয়ে ত মরতে পারব না, যমদূতের বড্ডা ভয় করে। একটা লেখাপড়া কর।'

পিতাঠাকুর পুনরায় বলিলেন, 'কিসের লেখাপড়া?'

—আমাদের বাস্তুভিটে তোমার নামে লিখে নাওগ

—সে কি! তোমরা থাকবে কোথায়?

—যিনি ঘর বাঁধতে দিলেন না, তিনিই জানে—ওই বিদেতা পুরুষ।

পিতাঠাকুর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'তা ভেব না, রামকান্ত-দা, গোবিন্দ তোমার মানুষ হ'লে—'

রামকান্ত গোবিন্দর নামোচ্চারণে জলিয়া উঠিল। বলিল, 'আমি করেছি ট্যাকা ধার, আমি শুধবো। সে পারে ভিটে খালাস ক'রে নেয় যেন। তার কি তোয়াক্কা রাখি, বল?'

—সে ত তোমারই ভাই।

রামকান্ত হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'যমের জালা সয়—এ যাতনা সয় না, বাবাঠাকুর। ভাই আমার মুরারি আর ভাই কেউ নেই। মরেছে। কবে লেখাপড়া করবা বল?'

পিতাঠাকুর বলিলেন, 'তোমার ভিটে নিয়ে আমার মনে কি শান্তি আসবে, রামকান্ত-দা? তোমরা কামার, আমরা ব্রাহ্মণ এ-জ্ঞান বাবা বা ঠাকুরদাদা কখনও করেন নি। পর ভাবলে কি তিনি টাকা দিতেন? টাকা আমার চাই নে।'

রামকান্ত সজল চক্ষে বলিল, 'তা জানি দেবতা। তবু ঋণ পাপ, মহাপাপ। এই জন্মের ফলে একে ত এই অবস্থা, দোহাই বাবাঠাকুর, পরের জন্মে আর মোরে দগ্ধে মেরো না। তুমি যদি আমায় ঋণ থেকে না রেহাই দাও, এই দাওয়ার নীচেয় না খেয়ে শুকিয়ে মরবো।'

অনেক বুঝাইলেও অবুঝ রামকান্ত বুঝিল না। তার মুখে এক কথা, 'ঋণ পাপ, মহাপাপ। দোহাই বাবাঠাকুর, মোরে ডুবিয়ে মের না।'

পিতাঠাকুরের নামে সাত পুরুষের জন্মভিটা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া রামকান্ত ঋণমুক্ত হইল। ইহার পরও কিছুদিন সে এখানে ছিল। তার পর এক দিন বৈশাখের প্রথমে কামারশালা তুলিয়া দিয়া সামান্য যন্ত্রপাতি ও মুরারিকে সঙ্গে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

তার পর হইতে রামকান্তের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

যেদিন সকালে রামকান্ত গ্রাম ত্যাগ করে সেই দিন বৈকালেই কুমোর-বাড়ীতে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কান্নার শব্দ শুনিয়া সকলে কুমোর-বাড়ী আসিলেন। আসিয়া

দেখেন এক বর্ষীয়সী বিধবা কৃষ্ণের মায়ের নাম করিয়া ভাঙা দাওয়ায় বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে।

কান্না থামাইয়া বর্ষীয়সী যে-পরিচয় দিলেন তাহাতে বোঝা গেল, এত দিন পরে দুর্ভাগিনী কুমোর-বুড়ী ছেলের পাশে স্থান পাইয়া যমের যন্ত্রণা ভুলিয়াছে। নাতিটি এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বুড়ী তাহার বোনকে শেষ অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছে ছেলেটিকে যেন সে যত্ন করিয়া মানুষ করে এবং তার বাপ-পিতামহের ভিটায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বপুরুষের নামটি বজায় রাখে।

বর্ষীয়সী মহিলা কুমোর-বুড়ীর পিসতুতো বোন।

খানিক কাঁদিয়া পাড়াপড়শীর কাছে নিজ সংসারের দুরবস্থা বর্ণনা করিল এবং কান্না থামাইয়া ঘরের কুলুপ খুলিয়া ভাঙা তক্তপোষ, ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ও কাঠের সিন্দুক বাহির করিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিল এবং ছেলে মানুষ হইলে তাহাকে বাপ-পিতামহের ভিটা চিনাইয়া দিয়া আপন কর্ত্তব্য শেষ করিবে এই কথা সমবেত জনমণ্ডলীকে জানাইয়া শূন্য ঘরে পুনরায় কুলুপ ঝুলাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তার পর, কত বর্ষার জলধারা মাথায় করিয়া দুই বাড়ীর জীর্ণ খড় গলিয়া পড়িয়াছে, মাটির দেওয়াল কালের কঠিন করস্পর্শে ঢিবি হইয়া দুই বাড়ীর উঠানকে খানিকটা উঁচু করিয়া দিয়াছে, কামারশালার কাঠের দরজা উইয়ে খাইয়া মাটি করিয়াছে, গোয়াল-ঘরের চিহ্ন নাই। প্রাচীরের ইট খসিতেছে, এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নাই এবং কালের সহস্র নিপীড়ন সহিয়াও অক্ষত আছে ঐ গাছগুলি—ঐ বেল-গাছ, আমগাছ, জামরুল-গাছ। ফাল্গুনের দিনে নবপত্র-সমারোহে জামরুল- ও আম- গাছের যৌবন ফিরিয়া আসে। যৌবনবতী নারীর মত ফুল ও ফলভারে ডালগুলি উহাদের নুইয়া পড়ে, বাতাসে দুলিয়া মন্থরগামিনী নারীর মতই সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠে। উপরে ন্যাড়া বেলগাছটার তলায় ফল-মুকুল-পরিপূর্ণ এই গাছগুলি যেন সেকালের শাশুড়ীর স্নেহচ্ছায়ে বধূজীবনের পরমনির্ভর-ভরা দিনগুলি, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, কর্ত্তব্যে ও কৌতুকে কাটাইয়া দিতেছে। যে-সংসার ভাঙিয়া গিয়াছে তাহারই ধ্বংস-স্তূপে ইহাদের অতীত কাহিনীর রোমন্থন চলিতেছে। ফলবান আম- ও জামরুল- গাছ পরস্পরকে শাখাবাহুবন্ধনে বাঁধিয়া দূর অতীতের প্রতিষ্ঠাত্রী দুই অশিক্ষিতা গ্রাম্য-বধূর অন্তরের সম্পদকে মেলিয়া ধরিতেছে।

শোভনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অস্তরবি-কিরণে তব জীবন-শতদল
মুদিল তার আঁখি।
মরমে যাহা ব্যাপ্ত ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে নিল ঢাকি।

নিয়ে গেল সে বিদায়-কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী-সুধা সাথে।
নূতন লোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নব প্রাতে॥

[গত মাসে 'মহিলা-সংবাদ' বিভাগে শোভনা দেবীর জীবন-কথা দ্রষ্টব্য]

হিন্দুর মাতৃভূমি ও স্বদেশপ্রেম

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

হিন্দুর শাস্ত্রে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ, স্বদেশপ্রেমের আভাস পাওয়া যায় কি না;—না উহা স্বদেশী ভারতীয় ভাব নহে, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে প্রাপ্ত? দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধ জাতীয় জীবনের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। সেই অনুভূতি ও অনুরাগ যদি স্বভাব-জাত স্বদেশী না হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনও কৃত্রিম আকার ধারণ করিবে। উহা নিজের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি নহে; উহা হিন্দুর ভাবরাজ্যে কোথাও স্থান পায় নাই। এই প্রমাদের সম্যক্ প্রতিবিধানকল্পে অল্প কিছু বলিব।

আবহমান কাল হইতে হিন্দু এই সুবিশাল দেশকে নানা ভাবে গড়িয়া তুলিয়া আসিতেছে। সেই গঠন শুধু প্রাকৃতিক নহে। উহার অধিকাংশই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। হিন্দু দেশকে প্রাকৃতিক সীমায় পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে নাই। তাহার দেশ তাহার নিজস্ব সংস্কৃতিরই রূপ—অসীম অরূপের অভিব্যক্তি। যেখানে তাহার সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানই তাহার দেশ। দেশ তাহার কাছে জড় বা নির্জীব পদার্থ নহে। উহা তাহার জাতীয় আত্মার বাহ্য অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অশরীরী আত্মা বা মন ব্যক্তিগত শরীর অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষে হিন্দুর দেশ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তখন ভারতবর্ষের যতটুকু জানা ছিল তাহা ঋগ্‌বেদে "সপ্তসিন্ধবঃ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে-দেশ সপ্তনদীধারার দ্বারা বিমণ্ডিত ও বিধৌত। পঞ্জাবের পঞ্চনদ ও আরও দুইটি নদী লইয়া এই সাতটি নদী। শেষ দুইটি নদী অনেকের মতে গঙ্গা ও যমুনা কিংবা সরস্বতী। কিন্তু হিন্দুর জাতীয় হৃদয় এই সঙ্কীর্ণ দেশ লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের প্রসার সঙ্ঘটিত হইয়াছে। একথা এস্থানেও বলিয়া রাখা উচিত যে আদিম কালে বহির্জগৎ ভারতবর্ষকে ঋগ্‌বেদোক্ত সপ্তসিন্ধু নামেই অভিহিত করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের প্রত্যন্ত প্রতিবেশী ইরাণীগণ সপ্তসিন্ধু শব্দটিকে সঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিয়া 'হপ্তহেন্দু' বলিয়া উচ্চারণ করিতেন, এবং আরও পশ্চিমস্থিত তৎকালীন আইয়োনিয়ান গ্রীকগণ সিন্ধু হিন্দুকে 'ইন্দস' বলিয়া উচ্চারণ করিতেন। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের নাম 'ইণ্ডিয়া' বলিয়া বহির্জগতে গৃহীত ও প্রচারিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, হিন্দু শব্দটি আদৌ ধর্ম্মসূচক নহে। উহা একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রসূচক শব্দ। হিন্দুয়ানীতে (যাহাকে এখন আমরা Hinduism বলি) ধর্ম্মের কোন গন্ধই ছিল না, অথচ এই হিন্দু ও হিন্দুয়ানী লইয়াই বর্ত্তমানে এত সঙ্ঘর্ষ, বিরোধ ও মারামারি।

হিন্দুর দেশ হিন্দুর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুগে যুগে প্রসারিত হইয়া আসিতেছে। সেই প্রসারণের প্রত্যেক অবস্থারই প্রতীকস্বরূপ তাহার অনুরূপ স্বতন্ত্র নামকরণ সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর দেশ বর্দ্ধিত আকারে উহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ব্রহ্মর্ষি দেশ, তাহার পর মধ্যদেশ, তদনন্তর আর্য্যাবর্ত্ত এবং সর্ব্বশেষে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল অবস্থাতেই দেশ সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার রূপ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছিল। উক্ত নামধেয় দেশ-ভাগের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য বা ধর্ম্মের ক্ষেত্র তাহাই অগ্রে উল্লিখিত। সুমন্ত বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাবর্ত্তঃ পরোদেশ ঋষিদেশস্তদনন্তরঃ।
মধ্যদেশস্ততো ন্যূনঃ আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ।

—ব্রহ্মাবর্ত্তই প্রধান পুণ্যদেশ, তার পর ঋষিদেশ, তদপেক্ষা ন্যূন মধ্যদেশ ও সর্ব্বশেষে আর্য্যাবর্ত্ত।

সুতরাং প্রত্যেক প্রদেশই তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির

দ্বারা পরিচিত ও পূজিত হইত। হিন্দু শুধু মাটি জয় করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল না। মৃৎকে চিৎশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সংশোধিত করিয়া দেশমাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠিত করা তাহার জাতীয় আদর্শ। তাহার সনাতন জাতীয় আদর্শ জড়ে জীবনের আরোপ করা—পৌত্তলিক প্রতীকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করা।

ভারতবর্ষ যখন আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত হইয়াছিল, সে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছিল মাত্র হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত। তখন সমগ্র ভারতভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—আর্য্যাবর্ত্ত ও ম্লেচ্ছদেশ। স্মৃতি ও পুরাণে হিন্দুর দেশ আর্য্যাবর্ত্ত নামেই পরিচিত ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত নামেই বুঝা যায় যে দেশ শব্দটি ধর্ম্মবাচক,—প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক সীমাসূচক নহে। শাস্ত্রে আর্য্যাবর্ত্তের গুণগান নানা ভাবেই করা হইয়াছে। নিম্নে মাত্র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল :—

(১) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশঃ ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ [মনুস্মৃতি]

(২) চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ॥ [বিষ্ণুস্মৃতি]

(৩) কৃষ্ণসারৈর্বো দৈবতৈশ্চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমৈস্তথা।
সমৃদ্ধো ধর্ম্মদেশঃ স্যাদ্ যাদ্যা প্রয়েরপি পণ্ডিতঃ॥ [আদিপুরাণ]

(৪) স্বভাবাদ্‌যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদামৃগঃ।
ধর্ম্মদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্ম সাধনম্॥ [সম্বর্ত্ত পুরাণ]

এই কয়েকটি শ্লোকে আর্য্যাবর্ত্তের নানারূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তকে যথাক্রমে যজ্ঞীয় দেশ, ধর্ম্মদেশ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দেশ বলা হইয়াছে,—যে-দেশের পবিত্রতা কৃষ্ণসার মৃগ এবং উদ্ভিদ্ দুর্ব্বাদল ঘোষণা করে। এই আর্য্যাবর্ত্তের বহির্গত ভারতভূমিকে তখনকার সামাজিক অবস্থায় অধর্ম্মদেশ বলা হইয়াছে। আর্য্যের পক্ষে অধর্ম্ম-দেশে যাওয়া কিংবা কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ ছিল—'ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্ন গচ্ছেত্তং বিষয়ম্'।

আর্য্যধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অধর্ম্মদেশের বিস্তৃতি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে এই বিশেষ সত্যটির ভূয়িষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌধায়ন (যাঁহার কাল আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫০০) তাঁহার ধর্ম্মসূত্রে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিকে অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) আনর্ত্ত (গুজরাট ও কাথিয়াবাদ), (২) অঙ্গ, (৩) মগধ, (৪) সৌরাষ্ট্র, (৫) সিন্ধু-সৌবীর, (৬) দক্ষিণাপথ। ব্যাসের সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রদেশ পর্য্যন্ত অশুদ্ধ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আদিপুরাণে আরও অন্যান্য দেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, মগধ, চেদী, অবন্তী, কেরল, ইত্যাদি।

বাস্তবিক, দেশগুলির মধ্যে তারতম্য-বিচার ও শ্রেণী-বিভাগ প্রত্যেক দেশের আচার-ব্যবহারের উপর নির্ভর করিত; কেবলমাত্র ভৌগোলিক সংস্থিতির উপর উহা নির্ভর করিত না। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে যে শুধু বিন্ধ্যাগিরির ভৌগোলিক ব্যবধান বর্ত্তমান ছিল তাহা নহে। উহার উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল সামাজিক ব্যবধান যাহা পরস্পরের লঙ্ঘন করা অদ্যাবধি সুকঠিন। উত্তর-ভারতের দূষিত আচার-ব্যবহারের মধ্যে ধর্ম্মসূত্রকার বৌধায়ন এই কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) উর্ণাবিক্রয় [মেষপালন ও তজ্জাত পশম বিক্রয় যাহা দ্বিজোচিত কর্ম্ম নহে]

(২) সীধুপান [মদ্যপান]

(৩) উভয়তোর্দদ্ভির্ব্যবহার [দুইটি পংক্তি দন্তবিশিষ্ট প্রাণীর ব্যবসা করা]

(৪) আয়ুধীয়ক [অস্ত্র-ব্যবসায়]

(৫) সমুদ্রযানম্ [সমুদ্রযাত্রা]

পক্ষান্তরে দক্ষিণ-ভারতেরও নিম্নলিখিত আচার-ব্যবহার দূষিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে :—

(১) অনুপনীতের সহিত ভোজন (যথা সস্ত্রীক ভোজন)

(২) পর্য্যুষিত ভোজন (অর্থাৎ 'বাসি ভোজ')

(৩) মাতুল-কন্যা ও পিতৃস্বসৃকন্যার সহিত বিবাহ।

বৃহস্পতি, উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারত, মধ্যভারত এবং পূর্ব্বভারতকে তৎ তৎ প্রদেশীয় আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া ভাগ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণ মাতুল-সুতা বিবাহ করিতেন। মধ্যদেশের লোকেরা অধিকাংশই কারুজীবী এবং মাংসভোজী ছিলেন। পূর্ব্বভারতের লোকেরা মৎস্যভোজী এবং তথায় স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত

স্বৈরিণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরতম ভারতে স্ত্রীগণ মদ্যপায়ী ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠের বিধবা স্ত্রীকে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিতেন।

ঐতিহাসিক কিন্তু লক্ষ্য করিবেন যে বিভিন্ন দেশের এই ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার ও সামাজিক বিধানের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, এই বিভিন্নতাকে ভেদ করিয়া, তাহার মধ্য দিয়াই একটি বিশাল ভারত যুগে যুগে গড়িয়া উঠিতেছিল। হিন্দু চিরকালই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ভেদের ভিতর দিয়াই অভেদের অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। সেই মানসিক গতির বলে জাতীয় জীবনের উপাদান-স্বরূপ কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশটিকেই হিন্দু নিজস্ব দেশরূপে গঠন করিয়া লইতে পারিয়াছিল। পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তের সীমা অতিক্রম করিয়া আর্য্যসভ্যতা বিন্ধ্যগিরি লঙ্ঘন করিয়া অচিরে আসমুদ্র সমগ্র ভারতভূমিতে যখন প্রসারিত হইয়া পড়িল, সেই দিগ্বিজয়ের পরিচয় পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে নানাবিধ শ্লোকের দ্বারা হিন্দুমাত্রেরই অখণ্ড মাতৃভূমি দেশমাতৃকার বিরাট মূর্ত্তি-স্বরূপ পরিকল্পিত করা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি শ্লোক এখানে উল্লেখ করা হইল :—

(১) গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু।

(২) মহেন্দ্রো মলয়: সহ্য: শক্তিমান্ ঋক্ষ পর্ব্বত: ।
বিন্ধ্যশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতা: ।

(৩) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা: ।

এই সমস্ত শ্লোক ধার্ম্মিক হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন উপাসনার সময়ে আবৃত্তি করেন এবং এই আবৃত্তি-প্রণোদিত ধ্যানের দ্বারা তাঁহার মানস-ফলকে স্বদেশের রূপচ্ছবি সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়। দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করিবার এমন সহজ, সরল উপায় খুব কম ধর্ম্মে বা শাস্ত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম ধারণা দ্বারা উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু-নদ-তীরবাসী পাঞ্জাবী, মধ্যভারতে গঙ্গা-কালিন্দী-তটবাসী এবং সুদূর দক্ষিণে কাবেরী বা তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত মাদ্রাজী ভারতবাসী সকলেই একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া অখণ্ড, বিশাল ভারতের ঐক্যমন্ত্রে গ্রথিত হইয়া স্ব স্ব প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ব্যবধান অতিক্রম করিতে সমর্থ হন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী বা মাদ্রাজী জ্ঞান না করিয়া ভারতের সন্তান বলিয়া মনে করিতে পারেন। হিন্দুধর্ম্ম এই ভাবেই যুগে যুগে ভারতের জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ শুধু যে দেশমাতৃকার বিরাট দেহ নানা মন্ত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নহে। শুধু জননী জন্মভূমির ধ্যান কিংবা "বন্দেমাতরম্" গান করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং অঙ্গস্বরূপ তীর্থপর্য্যটন প্রবর্ত্তন করিয়া কি উত্তরে, কি দক্ষিণে, কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, প্রত্যেক ভারতবাসীকেই স্বকীয় মাতৃভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিবার অবসর ও সুযোগ দিয়াছেন। হিন্দুমাত্রেরই "চার ধাম করিয়া আসা" ধর্ম্মজীবনের একটি গৌরবের বিষয়। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার দার্শনিক বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই চার ধামেই তাঁহার ধর্ম্মমতের কেন্দ্রস্বরূপ চারিটি মঠ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অদ্যাবধি দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব্বে পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকার শারদা মঠ এবং উত্তরে বদরি-কেদারের নিকট জোশী মঠ ভারতবর্ষের নানা দিক হইতে তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেইরূপ দক্ষিণী হিন্দু যেরূপ বারাণসী, পুষ্কর, হরিদ্বার বা অমরনাথকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করেন, উত্তর-ভারতের হিন্দুও সুদূর রামেশ্বর বা কুমারিকা পর্য্যন্ত তীর্থ-পর্য্যটন করিবার জন্য সর্ব্বদা আকুল হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক তীর্থ-তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবের আপন আপন বিশেষ তীর্থক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। শৈবের কাশী-বিশ্বনাথের অনুরূপ বৈষ্ণবের মথুরা-বৃন্দাবন এবং শাক্তের খণ্ডিত-সতীদেহ-বিজড়িত ৫১ পীঠস্থান। বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ তীর্থ-তালিকা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে আমাদের জন্মভূমি ভারতভূমির প্রত্যেক অংশই একটি তীর্থস্থান, উহার প্রত্যেক নদনদী, গিরিকন্দর সবই পুণ্যভূমি। স্বদেশপ্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ এস্থলে একই ভাবে মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক রমণীয় স্থানকে পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছে। তাই আজ হিন্দুর চরম তীর্থস্থান তুষারহারধবল হিমালয়ের অগম্য চূড়া অথবা

গহন কাননের নিবিড় ছায়া—যেখানে প্রকৃতিদেবীর বিপুল সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে বিকশিত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। হিন্দুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রণালীও স্বতন্ত্র। হিন্দু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বহির্মুখী ভাবের উদ্দীপনা অনুসন্ধান করে না। তাই ত্রিবেণীসঙ্গমে, প্রয়াগে-পুষ্করে, হরিদ্বারে, জলবিধৌত বীচিমালা-বিক্ষুব্ধ জগন্নাথধামে প্রকৃতির লীলানিকেতনে আমরা দেখিতে পাই অগণিত মন্দির, সাধকদল, বৈরাগী-সন্ন্যাসী—নিবৃত্তিমার্গের অসংখ্য পথিক। সেখানে দুর্লভ দৃশ্য—সংসারের উন্মাদনা, প্রবৃত্তি-তাড়িত দৈহিক ভোগলিপ্সু প্রমোদ-বিহারের উৎসব। এখানে দেখা যায় হোটেলের বদলে পদে পদে দেবালয়, তপস্বীর কুটীর, সংযত-জীবন গৃহস্থের ধর্ম্মশালা। এখানে উপবাসের অবসর, ভোগবিলাসের উপকরণ নাই। সুতরাং দেশ-ভক্তির এই নূতন পন্থা হিন্দুর নিজস্ব। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ও বিপরীত। বিরাট্ মাতৃদেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, লোমকূপ, স্বদেশের ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র, স্বর্ণরেণুর ন্যায় আদরণীয়। ইহার ফলে সমগ্র মহাদেশটি একটি বিরাট তীর্থক্ষেত্র হইয়া হিন্দুর দেশাত্মবোধকে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মাটির দেশকে হিন্দু তাহার ধর্ম্মের দ্বারা, হৃদয়ের ভাবের দ্বারা জাতীয় জীবনদেবতারূপে পরিণত করিয়াছে। ইহাকেই বলে জড়ের উপর, বাস্তবের উপর আত্মার আধিপত্য, ভাবের উপর ভাবের অনুশাসন। স্বদেশপ্রেমের এইরূপ পূর্ণ প্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয় নাই। হিন্দুর স্বদেশপ্রেম সাময়িক ক্ষণিক উচ্ছ্বাস নহে, উহা তাহার সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। এই ভাবেরই চরম প্রকাশ নিম্নলিখিত চরণে পাওয়া যায় :—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

এই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই মনু নিজের দেশকে "দেবনির্ম্মিত স্থান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ভারতবর্ষকে দেবদুর্লভ পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য দেবতারাও লালায়িত। কারণ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে ধর্ম্মের অনুকূল আবেষ্টনের প্রভাবে বদ্ধজীব মানুষ অপরিসীম আত্মোন্নতি সম্পাদন করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়। সুতরাং হিন্দু অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহার জন্মভূমির বাহিরে কোন তীর্থস্থান স্থাপন বা স্বীকার করে নাই। হিন্দু তাহার রাজনীতিকেও ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত করিয়া আসিতেছে।

নব যুগে হিন্দু স্বদেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও মুক্তিসাধন-কল্পে অযথা বিজাতীয় পন্থা-প্রণালী অবলম্বন করিতে গিয়া স্বধর্ম্মদ্রোহী ও আত্মঘাতী না হইয়া পড়েন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

উপসংহারে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে হিন্দুর স্বদেশের বিস্তৃতি ও তাঁহার চিরপ্রসারণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে ধারণা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে তাহার মূলে একটি বিশেষ উদারতার বিধি বিদ্যমান ছিল। এই উদার নীতি অবলম্বন করিলে প্রাদেশিকতার ও জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা অপসারিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী ও মানবসমাজ ভেদবিহীন সমষ্টিতে পরিণত হইতে পারে—যে-আদর্শ লইয়া বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ্ (লীগ অব নেশন্স) তাহার সমবেত চেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োগ ও প্রচেষ্টা এত দিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে বেশী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত না করিয়া আমি মনুর একমাত্র বিধান উল্লেখ করিতেছি এবং সেই বচন অবলম্বন করিয়া হিন্দুর প্রসিদ্ধ আইন-গ্রন্থ স্মৃতি-চন্দ্রিকা যে ব্যাপক ব্যবহারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিলাম। এই বিধানগুলি হইতে প্রতীত হইবে যে হিন্দু বহু দেশকে এক অনুশাসনের অন্তর্গত করিয়া যে বিরাট ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া গঠন করিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ যে হিন্দু বিভিন্ন প্রদেশ ও জাতির নানাবিধ আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি যত দূর সম্ভব স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। এই স্বীকরণের সীমা ছিল যে এই সমস্ত দেশাচার ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হয়; এই মর্ম্মে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বুঝিতে হইবে :—

জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণী ধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥ [মনু]

যেষু দেশেষু যে দেবাঃ যেষু দেশেষু যে দ্বিজাঃ।
যেষু দেশেষু যত্তোয়ং যা চ যত্রৈব মৃত্তিকা।
যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তান্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥

যস্মিন্দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্য নগরেঽপি বা।
যো যত্র বিহিতোধর্মস্তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ। [স্মৃতি-চন্দ্রিকা]

এই সকল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রাজাকে প্রত্যেক কুল, জাতি, শ্রেণী (অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসায়-সঙ্ঘ), ও জনপদের নিজ নিজ ধর্ম্ম বা বিধান, সমগ্র রাষ্ট্রীয় বিধান সমর্থন করিতে হইবে। এই মর্ম্ম স্মৃতি-চন্দ্রিকা আরও বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন, যে দেশের যে দেবতা, যে দ্বি-জাতি, যা জল, যা মাটি, যে স্থানের যাহা শৌচ ও ধর্ম্মাচার, সেই সকল স্থানের তাহাই মান্য ও ধর্ম্ম্য। যে দেশে, যে নগরে, যে গ্রামে যাহা প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাই তৎ তৎ দেশের ধর্ম্ম। এই ঔদার্য্য নীতি, যাহা দ্বারা একটা বিরাট দেশ ও বিপুল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একমাত্র সীমা ছিল যে উহা ধর্ম্ম বা নীতিকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বেদ-বিরুদ্ধ দেশাচার অগ্রাহ্য এবং তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শাস্ত্রে এইগুলি উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) যমাতুলসুতোদ্বাহংমাতৃবন্ধুত্ব দূষিতঃ দাক্ষিণাত্যে।

—মাতুল-কন্যা বিবাহ মাতৃসম্বন্ধ-দূষিত ; সেই জন্য উহা পরিহার্য্য। এই প্রথা কিন্তু এখন পর্য্যন্তও দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত।

(২) অভর্ত্তৃক ভ্রাতৃভার্য্যা গ্রহণং চাতি দূষিতম্।

—ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা অতি দূষিত।

(৩) স্বকুলে কন্যা প্রদানং চ দেশেষস্মেষু দৃশ্যতে।

—স্ব-গোত্রে বিবাহ নিন্দনীয়।

(৪) তথা ভ্রাতৃ-বিবাহোঽপি পারসী কেষু দৃশ্যতে।

—পারস্য দেশে তৎকাল-প্রচলিত ভগিনীর ভ্রাতৃ-বিবাহ ভারতবর্ষে কখনও প্রচলিত হয় নাই।

ইহার পরে নিন্দনীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অর্থলিপ্সা-প্রণোদিত কয়েকটি প্রচলিত প্রথা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা :—

(১) দত্বা ধান্যং বসন্তেঽন্তে শরদি দ্বিগুণং পুনঃ।

—বসন্তে ধার দেওয়া ধান্য শরৎকালে দ্বিগুণ দাবী করা, অর্থাৎ শতকরা দুই শত টাকা সুদ লওয়া, আইন-অনুমোদিত নহে।

(২) গুপ্তদ্বি বন্ধুক্ষেত্রং চ প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে।
ভুজ্যতেঽন্যৈরপ্রবিষ্টে মূলে তচ্চ বিরুধ্যতে।

—গচ্ছিত জমির উপর ধার দেওয়া মূলধন সুদে আসলে দ্বিগুণ হইলে ধার শোধের জন্য গচ্ছিত জমি অপহরণ আইন-বিরুদ্ধ।

ভারতবর্ষের এই চিরন্তন উদারনীতি অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্য জগতে কতিপয় প্রবলপরাক্রান্ত জাতি স্বকীয় সংস্কৃতি সজোরে আসুরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর আরোপিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই দুর্নীতির তাড়নায় আজ বসুধা বিধ্বস্ত, সমগ্র মানবভূমি বিকম্পিত। এই সকল জাতির প্রত্যেকেই মনে করিতেছে যে তাহার নিজের সভ্যতা ও আদর্শ একমাত্র চরম সত্য ও সমগ্র মানব-সমাজের পরিণতির পরিচায়ক। অতএব সেই আদর্শ সমগ্র জগতে জোর করিয়া প্রচার করা তাহাদের ধর্ম্ম। এই প্রণালীতে সৃষ্টির স্থিতি নাই। সৃষ্টির প্রলয় হইবে। ইহা সভ্যতার নামে এক বিরাট অসত্যের টানে মানব-জাতির বহুদিনের সাধনালব্ধ সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আদর্শই মানবের একমাত্র আশা। সেই আশার একটি উদার বাণী দিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।

—বিশ্বজননী পার্ব্বতী গৌরী আমার মাতা, বিশ্বপিতা মহেশ্বর আমার পিতা, সকল মানব আমার ভ্রাতা, আর ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল) আমার স্বদেশ।

মৃত্যুভয়

শ্রীপরিমল গোস্বামী

জীবনটাকে অতি সহজ ভাবেই লইয়াছি। ক্ষুধা অনুভব করিলে প্রচুর আহার করি, হাসি পাইলে হাসি, কান্না অনিবার্য্য হইলে প্রাণ খুলিয়া কাঁদি। অবশ্য, ইহা ছাড়া আরও ঘটনা আছে।

কিন্তু অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গত পাঁচ বৎসরে আমার তিনটি স্ত্রী মারা গিয়াছে। মৃত্যু সর্ব্বদাই দুঃখের, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুখের বিষয় এই যে বিবাহগুলি একসঙ্গে করি নাই, পর পর করিয়াছি। তাহা ছাড়া আর একটি সান্ত্বনার কারণ ঘটিয়াছিল এই যে বহু-মৃত্যুজনিত দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্থবার বিবাহ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম।

এইখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি অবান্তর কথা বলিতে হইল। বুদ্ধদেব জরা, মৃত্যু প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় অভিসম্পাত যৌবন বয়সে হঠাৎ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত এই যে বুদ্ধদেব বহু পূর্ব্ব হইতেই এই সব দেখিয়াছেন, এবং মানুষ যে জরাগ্রস্ত হয় অথবা তাহার যে মৃত্যু হয় ইহা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। পণ্ডিতদের এই মতটি প্রতিবাদযোগ্য, কারণ বহুদিন ধরিয়া দেখা ও জানা সত্ত্বেও মানুষ সত্য করিয়া একদিনই মাত্র দেখিতে ও জানিতে পায়। সংসার ত্যাগ করিতে হইলে সেই দিনই করা উচিত।

নিজের গৃহে ধারাবাহিক মৃত্যু দর্শনের সমসাময়িক কালে আমি আমার বাড়ীর পাশে এমন অনেক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি যাহাতে আমার মনে বহু পূর্ব্বেই বৈরাগ্য উদয় হওয়া উচিত ছিল। এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে অকারণ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন, ইহা দেখিয়াছি; সেই স্ত্রী শেষে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি; সেই ভদ্রলোক পরে এক বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি; সর্ব্বশেষে দেখিয়াছি সেই বালিকাকে, সর্ব্ব-আভরণহীনা বিধবার বেশে। এই সব দেখিয়াও আমার মনে কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই, কারণ চোখের দেখার সঙ্গে সত্য উপলব্ধির সম্পর্ক সব সময়ে ঘনিষ্ঠ নহে।

শেষ পর্য্যন্ত সত্য আমার মনেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কাহারও মৃত্যুতে নহে, কাহারও নিষ্ঠুরতায় নহে, বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে। আমি চতুর্থবারের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম তাহার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল না। বিপক্ষের লোকেরা প্রচার করিল আমি স্ত্রীভুক্। বিপক্ষদলে হয়ত কোনও ভুক্তভোগীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। প্রমাণ হইল যাহার ভাগ্যে তিনটি স্ত্রী অস্থায়ী হইয়াছে, চতুর্থ স্ত্রীর স্থায়িত্ব তাহার ভাগ্যে কখনই লাভ হইতে পারে না।

হঠাৎ মৃত্যু আমার চোখে ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিল। তিনটি স্ত্রীর মৃত্যু একসঙ্গে বীজগণিতের ত্রিশক্তি-রীতিকেও অতিক্রম করিয়া প্রবল শক্তিতে আমার বুকে চাপিয়া বসিল। প্রথম স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সহিত কথা হইয়াছিল সে আমাকে চিরদিন ভালবাসিবে—আমি তাহাকে চিরদিন ভালবাসিব। দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও ঠিক ঐ কথাই হইয়াছিল। তৃতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও দেখি ঐ একই কথা হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয়টিকে যে আমি সত্যই অতি গভীর ভাবে ভালবাসিয়াছিলাম! উদ্বাহস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই কথাটা এতদিন ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই, আজ ডুবিবার মুখে অকস্মাৎ দেখি হৃদয় একেবারে শূন্য!

এখন রাত্রি বারটা। ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ।

মাঠের চারিদিকের আমবাগান চাঁদের আলোয় মহারহস্যপূর্ণ নিবিড় অরণ্যের মত দেখা হইতেছিল। তাহারই এক প্রান্তে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মানসিক এবং দৈহিক উত্তাপে মাঠের হাওয়া বড়ই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু মন হইতে দার্শনিক চিন্তাস্রোত রোধ করিতে পারিলাম না।

এইখানে বলা আবশ্যক যে আমি জীবনে কখনও থিয়েটার করি নাই। দেখিয়াছিও অত্যন্ত কম। কারণ থিয়েটার মাত্রেই কেহ-না-কেহ স্বগতোক্তি করে, এবং এই স্বগতোক্তি আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক বোধ হয়। কথাটা বলিতেছি এই জন্য যে সেদিন রাত্রি বারটায় চাঁদের আলোয় চিৎ হইয়া শুইয়া আমি স্বয়ং স্বগতোক্তি আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি স্বগতোক্তি আসলে স্বতোক্তি, রসনা হইতে স্বতই স্খলিত হইতে থাকে; নাট্যকার নিরপরাধ।

সেদিন অনিবার্য্যরূপে যাহা আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে লাগিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়—

মৃত্যু বিরাট, অনন্ত, ভয়ঙ্কর। দিন ও রাত্রির মত নিয়মিত ছন্দে জীবন ও মৃত্যুর গান সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। মৃত্যু পটভূমি, জীবন ছবি। ছবি ক্ষণকালের, মৃত্যু চিরন্তন। হে মহান্ মৃত্যু, হে সুন্দর, প্রশান্ত মৃত্যু, তুমি একদিন আমার জীবনের ছবিকেও তোমার পটভূমিতে মিলাইয়া দিবে, আমি আর তুমি এক হইয়া যাইব। আমার হাসি-অশ্রু, আমার ভয়-ভাবনা, আমার সংগ্রহের বোঝা তখন কোথায় থাকিবে?

মৃত্যু, তুমি যখন আমাকে আহ্বান করিবে তখন আমার চেতনা থাকিবে কোথায়? তখন কি বুঝিতে পারিব না আমার মৃত্যু হইয়াছে? এই ক্ষণকালের জীবন কি নিতান্তই ক্ষণকালের? এই ক্ষণ-দীপ্তির শেষে কি চির-অন্ধকার? এই স্বপ্নের পশ্চাতে কি কোন সত্য নাই, কিছু নাই? ..

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার কানের পাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "আছে আছে।"

ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখি আমার নিকট হইতে প্রায় সাত হাত দূরে আর একটি মানবসন্তান বসিয়া উক্ত কথাটি উচ্চারণ করিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনি?"

মানবসন্তান বলিল, "আমি অল্-ইণ্ডিয়া হোমরুল ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানীর এজেন্ট; আসুন, আপনার মৃত্যুভয় দূর ক'রে দিচ্ছি।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি মৃত্যুভয় দূর করবে!"

মানবসন্তান এক লাফে আমার কাছে আসিল এবং আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দশ রকম প্ল্যান আছে, যেটা আপনার পছন্দ।"

অগত্যা তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

সংস্কৃতসাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা*

শ্রীসত্যচরণ লাহা

অন্যপুট্—পরভৃৎ, কাক।

অন্যপুষ্ট—পরভৃত, কোকিল,—রাজনিঘণ্টুতে এই বিহঙ্গের সপ্তদশ সংজ্ঞার অন্যতম বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে।

অন্যপুষ্টা—স্ত্রী-কোকিল; রাজনিঘণ্টুপ্রদত্ত ষোড়শ নামের অন্যতম।

অন্যবর্দ্ধিত—অন্যপুষ্ট, কোকিল।

অন্যবাপ—কাক; বৈজয়ন্তীতে ইহার আরও চারিটি নামান্তর পাওয়া যায়।

কোকিলাখ্য পক্ষিবিশেষ (বাজসনেয়িসংহিতা, উবট ও মহীধরভাষ্য)। ম্যাকডোনেল্ এবং কীথ্ প্রণীত Vedic Index গ্রন্থে (এমন কি মনিয়র উইলিয়মসের অভিধানেও) ইহার কোকিল পরিচয়ে এরূপ লিখিত হইয়াছে—"('sowing for others').—The cuckoo is so called from its habit of depositing its eggs in the nests of other birds."

অন্যবিবর্দ্ধিত—কোকিল।

অন্যভৃৎ—কাক; হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে বায়সের চতুর্দ্দশ সংজ্ঞার অন্যতম বলিয়া ইহার নির্দ্দেশ আছে।

অন্যভৃত—কোকিল।

অপকৃষ্ট—কাক; ত্রিকাণ্ডশেষ কোষে এই বিহঙ্গের সপ্তদশ সংজ্ঞার অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অপদৃষ্ট—কাক (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

অপ্রকৃষ্ট—কাক (শব্দরত্নাবলী)।

অপ্রহৃষ্টক—বলিপুষ্ট, কাক; বৈজয়ন্তীতে যে চারিটি নামান্তর পাওয়া যায় তাহাদের অন্যতম।

অপ্রোট—ভারদ্বাজ পক্ষী (বৈদ্যকনিঘণ্টু)।

অবকর—বিষ্কির পাখীদের অন্যতম (চরক)।

অবচণ্ডা—শালিকা, শারিকা,—ত্রিকাণ্ডশেষ কোষে যে পাঁচটি নামান্তর প্রদত্ত আছে তাহাদের অন্যতম।

অবলোহ—প্রতুদ পাখীদের অন্যতম (চরক)।

অবট—পক্ষিপোত, পক্ষিশিশু (বৈজয়ন্তী)।

অবিন—পক্ষী (বৈজয়ন্তী)।

অজাদ—হংস (বৃহৎসংহিতা); অব্জ অর্থাৎ জলজ লতাপদ্ম ভক্ষণ করে তজ্জন্য এই নামের সার্থকতা।

অমতি—চাতক (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

অমলপত্রী—হংস।

অম্বুকুক্কুট—কয়েকটা বিশিষ্ট গণ অথবা জাতিভুক্ত বিহঙ্গ, পক্ষিবিজ্ঞানে যাহাদিগকে *Rallidae* বংশের পাখী বলা হয়। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমার "জলচারী" গ্রন্থ (৯-১১ পৃষ্ঠা) হইতে উদ্ধৃত হইল—

"যাদব এইরূপ পরিচয় দিতেছেন,—'অথ শকটাবিলে প্লবপরিপ্লবৌ অবর্ণনামধেয়ৌ দ্বৌ জালপাদাম্বুকুক্কুটৌ।' শকটাবিল অর্থে প্লব এবং পরিপ্লব বিহঙ্গগণকে বুঝায়, যাহারা যথাক্রমে বিশেষভাবে জালপাদ এবং অম্বুকুক্কুট নামে অভিহিত হয়। সুশ্রুতসংহিতায় প্লব পক্ষিগণের মধ্যে অম্বুকুক্কুটিকার নাম পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে সকল পাখীকে অম্বুকুক্কুট বলা হয় যাদবের বৈজয়ন্তীতে তাহাদিগকে পরিপ্লব সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়া প্লব হইতে পৃথক গণ্য করা হইয়াছে। বৈজয়ন্তী অনুসারে জালপাদ উক্ত প্লব বিহঙ্গদিগকে বুঝায়। নানার্থার্ণবসংক্ষেপ অভিধানে কিন্তু দেখা যায়—'জালপাদো দ্বয়োর্হংসে রাজহংসে তু দন্তকঃ। কুক্কুটে বৈজয়ন্ত্যাং তু তং পঠত্যম্বুকুক্কুটে। জালাকারস্তু পাদোঽস্তি যেষাং ত্রিষ্বেষু পক্ষিষু।' অর্থাৎ হংসের সঙ্গে অম্বুকুক্কুটও জালপাদ আখ্যা পাইয়া থাকে।

* ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের জন্য 'প্রবাসী (কার্ত্তিক, ১৩৪৩) ১৮-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জালপাদ শব্দটির অর্থ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় যে সাধারণতঃ ইহা বুঝায় এমন পাখী যাহার পা 'জালাকার'; ইংরাজ তাহাকে web-footed বলেন। পক্ষিতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যাইবে যে অম্বুকুক্কুট পাখীদের পা হাঁসের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে জালাকার নয় বটে, কিন্তু তাহাদের কাহারও কাহারও পদাঙ্গুলি আংশিকভাবে পর্দা বা জাল দ্বারা আবদ্ধ। অতএব অম্বুকুক্কুটের জালপাদ আখ্যা সম্পূর্ণ দোষের হয় না। জালপাদ প্লব বিহঙ্গেরা যেমন aquatic বা জলচর, পরিপ্লব অম্বুকুক্কুটও তদ্রূপ। প্লব পরিপ্লবের মধ্যে এত সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তারতম্য নির্দ্দেশ করা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না। তাই চরক ও সুশ্রুত অম্বুকুক্কুটিকাকে প্লব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যে যে পাখীকে এই প্লবের অন্তর্গত করা হইয়াছে পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে তাহারা বিভিন্ন বংশের বিহঙ্গ; তাহাদের একত্র সমন্বয়ের কারণ মনে হয় যে তাহাদের পরস্পরের কতকটা স্বভাবসাম্য। অম্বুকুক্কুট বিহঙ্গদিগকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কিন্তু অনায়াসে এক বৃহত্তর বংশ বলিয়া গণ্য করা চলে। তন্মধ্যে ডাহুক ও কোড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

অম্বুকুক্কুটিকা—অম্বুকুক্কুট দ্রষ্টব্য।

অম্বুকুক্কুটী—অম্বুকুক্কুটিকা।

অম্বুচর—জলচর বিহঙ্গ।

অম্বুচারী—হংসাদি জলচারী পাখী, ইহাদের সাধারণ ইংরাজি নাম wader।

অম্বুজ—চাতক।

অম্বুজন্মা—সারস (বাচস্পত্য অভিধান)।

অন্তঃপা—চাতক।

অম্ভোজ—সারস।

অম্ভোরুহ—সারস।

অরণ্যকাক—দাঁড়কাক; সাধারণ ইংরাজি নাম Jungle Crow; বৈজ্ঞানিক নাম *Corvus levaillanti* Less।

অরণ্যকুক্কুট—বনকুক্কুট, বনকুকড়ো। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বে 'বনকুক্কুট' প্রধানতঃ দুই জাতীয়; তন্মধ্যে *Gallus bankiva murghi* (Robinson and Kloss) প্রায় সমগ্র ভারতে পাওয়া যায়, অপর জাতিটা মাত্র দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয় এবং তাহার বর্ণের ধূসরতা হেতু সে Grey Jungle Fowl নামে অভিহিত।

অরণ্যচটক—বনচটক (বাচস্পত্য); মনিয়র উইলিয়মস্ ইহার অর্থে লিখিয়াছেন wood-sparrow। ইহার যে তিনটি নামান্তর ("ধূসর, কুজ, ভূমিশয়") রাজনিঘণ্টু গ্রন্থে প্রদত্ত আছে তাহাতে বোধ করি সাধারণ চটকের সঙ্গে ইহার প্রভেদ সূচিত হয়, যদিও 'ধূসর' সংজ্ঞা সেই গ্রন্থ অনুসারে 'চটক' এবং 'অরণ্যচটক' উভয়কেই বুঝায়। 'কুজ' ও 'ভূমিশয়' আখ্যা পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে sparrow অর্থাৎ 'চটক' বা তাহার কোন জাতি-বিশেষের উপর ঠিক প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ, কারণ ভূমিতে সর্ব্বদা শয়ন করা কিংবা ভূমি হইতে হঠাৎ উত্থিত হওয়ার অভ্যাস ইহাদের দেখা যায় না। এই আখ্যাদ্বয় কিন্তু স্বতঃই 'ধূলিচটা' পাখীকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহার সংস্কৃত সংজ্ঞা হিসাবে 'ধূলিচটক' (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'বাঙ্গালা শব্দকোষ') ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পাখী বিশিষ্ট Finch Lark নামে অভিহিত এবং ভারতবাসীর বিশেষ পরিচিত। পক্ষিবিজ্ঞান হিসাবে সে 'চটক' বা চটকের জাতিসম্পর্কীয় পাখী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদিও আকারে ও গঠনে চটকের সহিত তাহার কতকটা সাম্য অনুমান করা চলে। চটকের জাতি সম্পর্কীয়দের সাধারণ ইংরাজি অভিধা Jungle Sparrow, Tree Sparrow ইত্যাদির সঙ্গে 'অরণ্যচটক' নামের মিল দেখা যায়। ইহারা বাস্তবিক বৃক্ষলতা, বনজঙ্গল প্রিয়, House Sparrow বা গৃহচটকের ন্যায় গৃহবাসীর অঙ্গনে কচিৎ বিচরণ করে, ইহারা উত্তর-ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। ভারতের সমতল ভূমিতে ইহাদের যে একটি জাতি 'জঙ্গলি চড়া' বা 'জঙ্গলি চড়ি' নামে অভিহিত হয় Tree Sparrowর সঙ্গে তাহার স্বভাবের মিল আছে। তাহার বৈজ্ঞানিক নাম *Gymnoris xanthocollis* (Burt.)। জঙ্গলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া অরণ্যের চটক হিসাবে তাহাকে সাব্যস্ত করা সহজ বটে, কিন্তু রাজনিঘণ্টুর পরিচয়ে তাহাকে 'কুজ' ও 'ভূমিশয়' বলা কখনই চলে না, যদিও 'ধূসর' আখ্যা তাহার প্রতি অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়।

অরণ্যবায়—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক (বাচস্পত্য অভিধান); অরণ্যকাক।

অরণ্যবায়স—অরণ্যকাক। ইহার আরও সাতটি নামান্তর রাজনিঘণ্টু অভিধানে প্রদত্ত আছে, যথা—দ্রোণ, দ্রোণকাক, কাকোল, বনবাসী, মহাপ্রাণ, ক্রূরমাবী, ফলপ্রিয়।

অরলা—হংসী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অরবিন্দ—সারস (শব্দকল্পদ্রুম)।

অরিষ্ট—কাক। অমরকোষে ইহা কাকের দশ নামের অন্যতম বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু রাজনির্ঘণ্টু গ্রন্থে দেখা যায় ইহা উনবিংশ সংজ্ঞার অন্যতম।

কঙ্ক (মেদিনীকোষ); বকবিশেষ, কাঁক ; সাধারণ ইংরাজি নাম heron।

অরুণচূড়—তাম্রচূড় (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু), কুক্কুট। 'অগ্নিচূড়' দ্রষ্টব্য।

অরুণলোচন—পারাবত, এই সংজ্ঞার সহিত আরও দশটি পারাবতের নাম রাজনির্ঘণ্টুতে পাওয়া যায়।

অর্জ্জুন—ময়ূর।

অর্থ্য—দাত্যূহ, ডাহুক বা ডাকপাখী। বৈজয়ন্তী অভিধানে ইহার আরও চারিটি নামের উল্লেখ আছে—কুকর, কুরণ, দাত্যূহ, কালকণ্ঠক।

অর্দ্ধপারাবত—তিত্তিরি পক্ষী (মেদিনী), তিত্তির পাখী। ইহার পর্য্যায় হিসাবে পাওয়া যায় চিত্রকণ্ঠ (মেদিনী), চিত্রকণ্ঠক (বাচস্পত্য)। চিত্রকণ্ঠের পরিচয়ে কিন্তু শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"কপোতঃ। ইতি জটাধরঃ।" তাহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে 'অর্দ্ধপারাবত' কপোতকেও বুঝাইতে পারে কি না ? মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ তাঁহার অভিধানে এই অর্দ্ধপারাবতের পরিচয় দিয়াছেন—a kind of pigeon, যদিও সেই সঙ্গে partridge বা তিত্তিরেরও নাম করিয়াছেন। সাধারণতঃ 'পারাবত' 'কপোত' হইতে অভিন্ন, "পারাবতঃ কপোতঃ স্যাৎ" ; পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতেও উভয়ে একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব দেখা যায় 'অর্দ্ধপারাবত' তিত্তির এবং কপোত উভয়কেই বুঝায়।

রুশিয়া ও জার্ম্মানী

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে দিতে নূতন জগতের সম্মুখে পুরাতন ইউরোপে জার্ম্মানী ও রুশিয়া যে অভিনব সমাজগঠনপ্রণালী ও রাষ্ট্রিক আদর্শ লইয়া দ্বন্দ্ব আনিয়াছে তাহাই বার-বার চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে। পাশাপাশি প্রকাণ্ড দুই দেশ বিপরীত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা কত-না সন্দেহ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত করিতেছে।

আশ্চর্য্য, এই মহাযুদ্ধের মধ্যেই দুই দেশে প্রজাতন্ত্রের জয়ঘোষণা এই গঠনের সূত্রপাত করে, কিন্তু গঠনের রীতি-নীতি এখন একেবারে বিরুদ্ধ, অথচ সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষাও ব্যাকুলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ইতিহাস ইহার জন্য দায়ী। পাশ্চাত্য ইউরোপের অন্য দেশের মত জার্ম্মানীতেও ধর্ম্ম-সংস্কার ও শিল্পব্যবসায়ের যুগে একটা কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জাগে। কিন্তু জার্ম্মানীতে রাষ্ট্র পুরাতন ফিউডাল কাঠামরই ছিল। তাই রাষ্ট্র যে ঐক্যবিধানের দাবী রাখে তাহার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দাবি মিলাইতে হেগেল-প্রমুখ অনেক মনস্বীকে অনেক গোঁজামিল দিতে হইয়াছিল। রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তির দাবির সামঞ্জস্য বিধানের নূতন সুযোগ উপস্থিত হইলেও বিধ্বস্ত, বিকারগ্রস্ত জার্ম্মানী সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহা ইউরোপীয় সভ্যতার একটি বিষম শোচনীয় ঘটনা, এবং ইহার ফলে ঐ সভ্যতাকে যে বার-বার লাঞ্ছিত হইতে হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। যেখানে দেশ জীবন-মরণ লইয়া ব্যাপৃত, সেখানে রাষ্ট্র অতি সহজে নির্ব্বিবাদে সকল ধর্ম্ম ও নীতির

প্রতিভূ হইয়া ব্যক্তির আত্মসমর্পণ দাবি করে ও সেই আদায়ে স্ফীত হইয়া একটা অপ্রাকৃতিক মহিমা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। পাশ্চাত্ত্য ইউরোপের অন্য দেশের মত শিল্পবিপ্লব ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী জার্ম্মানীতে দলবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রিক শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে শ্রমিকের ব্যূহ যেমন রাষ্ট্রকে চোখ রাঙাইয়াছে তেমনই সমাজের নিম্নস্তরে একটা বিরাট রিপাবলিককে সদা জাগ্রত রাখিয়াছে। রাষ্ট্রকে শ্রমিক-ব্যূহের অধিকার মানিয়া চলিতে হয়, ব্যক্তির অলঙ্ঘ্য অধিকারের সঙ্গে দল রচনা করিবার অধিকার ও দলের অধিকার খাপ খাইয়া গিয়াছে। নূতন জার্ম্মানীতে এই সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ মিলে নাই বলিয়া রাষ্ট্র এখানে বিপরীত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যুগপরম্পরার্জ্জিত ইউরোপের ব্যক্তিস্ববাদকে এখন পরাস্ত, লাঞ্ছিত করিতেছে। শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিস্ববাদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও লুথারের দেশে এখন চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সাহিত্য ও আর্ট এখন রাষ্ট্রের বেগার বহিতেছে। জার্ম্মানীর এক জন সুপ্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ্‌, যাঁহার প্রতিভা পৃথিবীময় বিখ্যাত, তিনি নিভৃত আলাপে অতি দুঃখের সহিত বিলাপ করিলেন, হয়ত জার্ম্মান কুলটুর চির-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে। নানা সভ্যতা যুগে যুগে উন্মার্গগামী হইয়া পথ হারায়। ব্যক্তির জীবন ও চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া, নিষ্পেষিত করিয়া, জার্ম্মানী বর্ব্বরতাকে বরণ করিতেছে তিনি ইঙ্গিত করিলেন। রাষ্ট্রের উত্থানপতন সভ্যতার ধারাবাহিকতার তুলনায় ক্ষণকালের আলোড়ন—এই কথা তোলাতে, প্রবীণ অধ্যাপক ইতিহাস হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া আবার বিষাদে অভিভূত হইলেন। তর্ক সেখানে চলে না। জার্ম্মানীর নানা শহরের চিত্রশালায় গিয়া ভাস্কর্য্যের এক অপরূপ অভিব্যক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। মানুষের ও জন্তুর নগ্ন রূপে কি মনোময়তা ও অপার্থিবতা ফুটানোর চেষ্টা কোলবে ও বেগাসের ভাস্কর্য্যে। কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হইলাম এখন ভাস্কর্য্যের ঐ রীতিকে জার্ম্মানী প্রশ্রয় দিতেছে না, ইহা নাকি অত্যন্ত বিপ্লবপন্থী।

অথচ বিশ্বের সব দেশ অপেক্ষা জার্ম্মানী নিপুণতা ও মিতব্যয়িতার আদর্শকে এখন যে ভাবে জাতীয় জীবনের সব দিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ-সেবা, সব ক্ষেত্রেই একটা কার্য্যকরী প্ল্যান, কি উপায়ে দেশকে সব চেয়ে স্বাধীন, ক্ষমতাসম্পন্ন করিতে পারা যায় তাহার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, ও ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে নিয়োগ করিতেছে। প্রতি পদে বিদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া জাতীয়তার গর্ব্ব বৃদ্ধি ও পৃথিবীকে করতলগত করিবার একটা বিপুল অপ্রাকৃতিক আয়োজন! আর এই প্রতিষ্ঠা ও আয়োজনের গোড়ায়, মাঝখানে ও শেষে পার্টি ও ফুরার যিনি বিক্ষিপ্ত ও বিরোধী শক্তিকে এক কেন্দ্রে সমান উদ্দেশ্যে আনিতে পারিয়াছেন।

রুশিয়াকে এই কর্ম্মনিপুণতা অর্জ্জন করিতে এক যুগ লাগিবে। নূতন শিল্প রুশিয়া ত এই সেদিন প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তাহা আবার রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। তবুও যে ভাবে এখন সমগ্র সোভিয়েট সাম্রাজ্যে লোহা ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। এত শীঘ্র শতকরা ৮৩টি কৃষিক্ষেত্রকে যৌথভাবে আর্টলের অন্তর্ভূত করাও অসাধ্য সাধন।

রুশিয়াতে চাষের কাজকর্ম্ম এত সেকেলে ও অবৈজ্ঞানিক ছিল যে যৌথকৃষি নানা প্রকার কল ও ঘোড়া নিয়োগ করিবার একমাত্র উপায়। যে পরিমাণে যৌথ পদ্ধতিতে এখন কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, সেই পরিমাণে রুশিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। সামাজিক অপেক্ষা যান্ত্রিক বিপ্লবের দিক দিয়া যৌথকৃষিকে বিচার করা উচিত। তাহা ছাড়া রাষ্ট্র এখন কৃষির উদ্বৃত্ত সম্পদের খুব কম অংশই রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেছে। যৌথ কৃষিক্ষেত্রের ধন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপালিতের জন্যই ব্যয় হইতেছে। জমিদার ও প্রজা, মহাজন ও খাতক, চাষী ও কৃষাণ, এ সকল শ্রেণী-বিভাগের বালাই রুশিয়াতে নাই। অতি সুন্দর কার্য্যকরী ভাবে মজুরীর একটা মাপকাঠি নির্দ্ধারিত হয়, তাহাই হইল শ্রমিকের অবশ্যপ্রাপ্য, অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রমব্যবহারের দ্বারা। ইহার উপরে মজুরীর হার পরিশ্রমের উপর, শিল্পচাতুরীর উপর নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমের মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা রুশশাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছে শ্রমলব্ধ অবসরকে। শিক্ষা,

ব্যায়াম, আমোদ-প্রমোদ সবের ভার লইয়াছে রাষ্ট্র। চার দিনের খাটুনির পর শ্রমিকের এক দিন পুরা মজুরীতে অবসর লাভ। আর সেই অবসরের দিনকে বিচিত্র উপায়ে শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ করিবার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের কি বিপুল চেষ্টা, কি ব্যগ্র আয়োজন! জার্ম্মানীতে রাষ্ট্র নার্ডিক জাতির প্রতিভূ, রুশিয়াতে রাষ্ট্র মানবজাতির প্রতিভূ। রুশিয়ার কার্য্যকলাপে তাই এখন কোন ঈর্ষা, বিজিগীষা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আছে একটা ধৈর্য্য ও করুণা যাহা রুশ ইতিহাস বিশ্বমানবের জন্য যেন ক্রশের মত বহন করিয়াছে।

যুগে যুগে কত সভ্যতা, কত রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে কত না উজ্জ্বল লিপিতে তাহার বাণী লিখিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে বাণী মহামানবের ত হয়ই নাই, সমাজের বা জাতির বাণী না হইয়া সেই দেশের সেই যুগের কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর বাণী হইয়াছে। তাই সে বাণী অক্ষয়তা লাভ করিতে পারে নাই। রুশিয়ার বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজনে, তাহার বৃহৎ শিল্প ও বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠানে, তাহার আর্ট, সাহিত্য ও অবসর-বিনোদনে আমরা একটা বিরাট কৃষক-সমাজের অভিনব স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। আর কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় এখানে নাই, কৃষক ছাড়া। কৃষক প্রকৃতির সহিত মানুষের সংগ্রামের রূপক; এবং শিল্পী, ব্যবসায়ী, এন্‌জিনিয়ার, রাষ্ট্রিক, সকলেই তাহারই সেবায় রত, কৃষি-সমৃদ্ধির পরিপোষক। রুশ রাষ্ট্র কৃষকের মনোময় রূপটি অবলম্বন করিয়া আজ বিশ্বের বাণী বহন করিতেছে, তাহা শ্রমের বাণী, শ্রম অস্বীকার ও অপরের শ্রমলব্ধ ফলাদায়ের বাণী নহে, তাহা শান্তির বাণী, জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের বাণী নহে, তাহা বিজ্ঞানের বাণী, বসুন্ধরার লুক্কায়িত সম্পদ উদ্ধার করিয়া মানুষের কল্যাণনিয়োগের বাণী।

রুশিয়া ও জার্ম্মানীর রাষ্ট্র, বিপরীত তত্ত্ব ও আদর্শ অনুধাবন করিলেও তাহাদিগের মধ্যে একটা সমতা তবুও লক্ষিত হয়। এই সমতা এক দিকে যেমন দুই দেশের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত রাখিয়াছে, অপর দিকে বিশ্বের প্রগতিকেও ক্ষুণ্ণ করিতেছে। জার্ম্মান ও রুশ রাষ্ট্র, উভয়ই এখন দুই দেশে এক রাজনৈতিক দলের করায়ত্ত। প্রজাতন্ত্রের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা তখনই যখন দেশের রাষ্ট্রিক মত গড়িয়া উঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন মতের ঘাত-প্রতিঘাতে, তাহাদিগের সামঞ্জস্য বিধানে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইংলণ্ডই সত্য সত্যই সম্যক্‌ভাবে এই হিসাবে প্রজাতান্ত্রিক। যে রাষ্ট্রিক আবহাওয়ায় একের অধিক রাজনৈতিক দল পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, সে আবহাওয়া আপাত স্বাস্থ্যকর হইলেও অচিরেই যে ঘোর অনিষ্টকর ও অসহ্য হইতে পারে, ইহার খুবই সম্ভাবনা। তখন জার্ম্মানীর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের তৈয়ারী অতিদৃঢ় রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে, রুশিয়ার বলশেভিক দলের বিশ্বমানবিক আদর্শ অতি হেয় ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। এ ভয় যে অমূলক নহে তাহা জার্ম্মানী ও রুশিয়ার কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এ ব্যাধি জগতের যুগ-ব্যাধি। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে রাষ্ট্র ছিল বিজিগীষু, ভূমণ্ডলগ্রাসী; বিংশ শতাব্দীতে সেই বিজিগীষা জাগিয়া রহিয়াছে কোথাও নগ্ন মূর্ত্তিতে, কোথাও বা অর্থনৈতিক আধিপত্যের আবরণে; সব দেশে রাষ্ট্রের বিপুল ঐশ্বর্য্যে, তাহার অন্তর্জ্জাতিক দ্রোহিতায়। যত কাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত প্রবল থাকিবে তত কালই দেশে দেশে রাষ্ট্র জাতীয় শক্তির পূর্ণ আধার ও আশ্রয় হইয়া সমাজ ও সভ্যতা যে পরিমাণে অন্তর্জ্জাতিমুখী তাহার ব্যত্যয় ঘটাইবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের পরজাতিবিমুখ আচরণ, শিক্ষা ও দীক্ষা অন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষের কারণ। যতই এই সংঘর্ষ বাড়িতে থাকে ততই আবার রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি বাড়ে। সমস্ত বিশ্ব এখন এই কার্য্য-কারণের বিপাকে পড়িয়াছে, এবং ইহার ফলে আরও কত কাল যে দেশে দেশে রাষ্ট্রিক আদর্শের সঙ্গে বিশ্বমানবের আদর্শের বৈপরীত্য দেখা যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীতে যত কাল রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগ্রত থাকিবে তত কালই যে যে দেশ, যেমন ইংলণ্ড, জার্ম্মানী বা রুশিয়া, বিশ্বমানবের শিক্ষা ও আচরণের ভার এখন লইয়াছে, তাহারা উহাদিগের অন্তর্জ্জাতিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবে না, বিশ্বের প্রগতি ও নানা বাধার মধ্য দিয়া অসমতালে চলিতে থাকিবে।

নিউ-ইয়র্কের পথে

রাঁচি জেলার একটি উৎসব

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ইউরোপের কথা বলিতে পারি না, তবে ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুরের মত সুন্দর জায়গা যে কম আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশটি ছোট-বড় পাহাড় এবং উপত্যকায় ভরা, মাঝে মাঝে সুবর্ণরেখা, দামোদর, কোয়েল প্রভৃতি নদী বহিয়া গিয়াছে। সে-সকল নদীতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। বর্ষায় যখন নদীতে জল নামে তখন সারা ছোটনাগপুরে কতই যে বিচিত্র জলপ্রপাতের লীলা দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। হুডরুঘাগের নাম অনেকে শুনিয়াছেন কিন্তু তাহা ছাড়াও দাসোমঘাগ, পেরোঁয়াঘাগ প্রভৃতি আরও কতকগুলি অতি সুন্দর জলপ্রপাত আছে, তাহাদের শোভাও কোন অংশে কম নয়।

আজকাল রেল ও মোটর হওয়ায় রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থান সকলের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে বটে, কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে পৌঁছিতে হইলে মানুষে-টানা পুসপুস গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইত। বহুকাল ধরিয়া এই দেশে মুণ্ডা, উরাঁও, খাড়িয়া, বিরহড় প্রভৃতি জাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে। রাঁচি জেলা একটি মালভূমির উপরে অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বে সুবর্ণরেখার বিস্তীর্ণ উপত্যকা এবং মানভূম জেলার হিন্দুজাতির ঘন বসতি বর্ত্তমান। হিন্দু ও জৈনগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া মানভূমে বসবাস করিয়া আসিতেছে। জৈনদের তৈয়ারি মন্দির ও মূর্ত্তি মানভূমে অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু জৈনগণ এখন হিন্দুদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে, আচারে ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

বিগত শতাব্দী ব্যাপিয়া মানভূমের প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব দিক দিয়া এবং উত্তরে হাজারিবাগ, গয়া প্রভৃতি জেলা হইতে হিন্দু চাষী, জমিদার, ব্যবসায়িগণ ক্রমে ক্রমে রাঁচির

উরাঁও-বৃদ্ধা

উরাঁও যুবক

কান্ধাইয়া অনুষ্ঠান

উৎসবে সমবেত বালিকাবৃন্দ

মালভূমিতে প্রসার লাভ করিয়া আদিম উরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে দুইবার ছোটনাগপুরে বিদ্রোহ হয় এবং উভয় বিদ্রোহে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পরাজিত হইয়া মুণ্ডা জাতীয়েরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আজকাল হিন্দুদের সহিত শান্তভাবে একত্র বসবাস করিতেছে। তাহারা পূর্ব্বে যে-রীতিতে চাষ করিত তাহা পরিহার করিয়াছে। পূর্ব্বের সামাজিক প্রথা অনেকাংশে বর্জন করিয়াছে এবং সর্ব্ব বিষয়ে হিন্দুগণের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। দেশের মধ্যে হিন্দুই ধনী, তাহারা লেখাপড়া জানে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদেরই প্রতিপত্তি বেশী, সেই জন্ম মুণ্ডাদের পক্ষে হিন্দুগণের সংস্কৃতি অনুকরণ করার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বে হিন্দু চাষী এবং জমিদারের সহিত কলহ-বিবাদের সময়ে খ্রীষ্টিয়ান মিশনরীগণ উরাঁও-মুণ্ডাদের সাহায্য করিতেন, এখনও করেন। সেই কারণে আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যায়। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সারা ভারতে যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার প্রভাব ছোটনাগপুরের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ফলত ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হইবার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে হিন্দু হইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক আন্দোলন উরাঁও জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে।

হিন্দু জাতির সহিত একীভূত হইবার চেষ্টায় রাঁচির উরাঁও-মুণ্ডাগণের মধ্যে একটি বিশেষ উৎসব খুব প্রসারলাভ করিয়াছে। তাহারই কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাংলা দেশে চৈত্র মাসে যে গাজনের উৎসব হয়, রাঁচি জেলায় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন রাঁচি জেলার অধিবাসী বৈষ্ণবজাতীয় কয়েক ব্যক্তি ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তারিখের কোন বালাই নাই, পুরোহিতের অবসর বুঝিয়া গ্রামের পর গ্রামান্তরে মাণ্ডা-পরবের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মাণ্ডা-পরবে শুধু যে মুণ্ডা বা উরাঁওগণ যোগ দেয় তাহা নহে, গ্রামের অধিবাসী লোহার, আহির প্রভৃতি জাতিও একসঙ্গে একই ভাবে উৎসবটি পালন করিয়া থাকে। বিগত আষাঢ় মাসে রাঁচির নিকটে হাতমা গ্রামে আমরা মাণ্ডা-পরব দেখিতে গিয়াছিলাম। যে ভোক্তা অর্থাৎ গাজনের সন্ন্যাসিগণ তাহা পালন করিতেছিল তাহাদের সকলের নাম পাঠ করিলেই বুঝা

ফুলকুন্দনা অনুষ্ঠানে আগুনের উপর দিয়া হাঁটা

দিদির পিঠে ভাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে

যাইবে ইহা কিরূপ বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে :—হাথুয়া আহির, মহাদেও লোহার, বিরসা উরাঁও, জগন্নাথ মুণ্ডা, মাংরু লোহার, ঢুকরু উরাঁও, বুধনা মুণ্ডা, পুরন্দু মুণ্ডু, হিরুয়া লোহার, বোধা লোহার, পোঢ়ু মিরধার পুত্র (ডোম) ইত্যাদি। বৈষ্ণব পুরোহিত ইহাদের পৌরোহিত্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় মাণ্ডা-পরবে পুরোহিত বিনা-দ্বিধায় মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। মাণ্ডা-পরবে শিব এবং পার্ব্বতী উভয়ের পূজা হইয়া থাকে।

মাণ্ডা-পরবটি তিন দিন ধরিয়া হইয়া থাকে। পরবের পূর্ব্বে যাহারা ভোক্তা হইবে তাহাদের উপর দেবতার ভর হয় এবং সচরাচর এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইলে লোকে ভোক্তা হইয়া থাকে। উৎসবের প্রারম্ভে 'রামাইত' গোঁসাই ভোক্তাগণকে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দেয় এবং তাহার তিন দিন মাছ, মাংস, নুন, হলুদ, মশলা প্রভৃতি খাওয়া ত্যাগ করে; শুধু ভাত, ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন খাইয়া তাহারা কয়েক দিন কাটাইয়া দেয়। ভোক্তাগণ বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া গ্রামের প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যায় এবং পরে সেই পয়সা খরচ করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে গ্রামের মধ্যে মহাদেবের "আস্থানে" ইহারা সমবেত হইয়া অনেকগুলি অনুষ্ঠান করে। তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটির নাম "কান্ধাইয়া", অপরটির নাম "ফুলকুন্দনা"। কান্ধাইয়া অনুষ্ঠানে ভোক্তাগণ সারবন্দী হইয়া মাটিতে উপবেশন করে এবং পুরোহিত তাহাদের কাঁধের উপর পা দিয়া হাঁটিতে থাকে। যাহাদের কাঁধের উপর দিয়া হাঁটা হইয়া যায় তাহারা আবার ঘুরিয়া সামনে আসিয়া বসে। এই ভাবে পুরোহিত এক স্থান হইতে মহাদেবতলায় অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কাঁধে

রাঁচির একটি দৃশ্য

ভোক্তাগণের সজ্জা

আকাশ হইতে টিয়েনসিনের দৃশ্য

ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপর চংকিং বন্দর। ইহাও "সন্ধি-বন্দর", অর্থাৎ বিদেশীর দখলে।

মুণ্ডাদের অস্থি পুঁতিয়া উপরে খাড়া পাথর দাঁড় করান হয়

ভোক্তাগণ পর-পর সারি বাঁধিয়া যুক্তহস্তে খালি পায়ে আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। শুধু একবার হাঁটা নয়, বার-বার তিন বার তাহারা এইরূপ অগ্নিকে অতিক্রম করিয়া যায়। ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি প্রতি বারে প্রায় ২।৩ সেকেণ্ড তাহারা আগুনের উপর থাকে, তিন বারে মোট ৮ হইতে ১০ সেকেণ্ড নগ্ন অগ্নির উপরে তাহারা পদচারণ করে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে বালক, বৃদ্ধ কাহারও পায়ে কিছুই হয় না, এমন কি ফোস্কা পর্য্যন্ত পড়ে না। প্রতি ভোক্তার সেবা করিবার জন্ম তাহার সঙ্গে তাহার মাতা, ভগ্নী বা কেহ অপর থাকে। তাহাদিগকে সোকথাইন বলে। ভোক্তাগণের পিছনে সোকথাইনেরাও অগ্নিকে হাঁটিয়া গিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানটির দ্বারা পুরোহিতের নিকট ভোক্তাগণ বিশেষভাবে আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি রাত্রি প্রায় নয়টা, দশটা বা তাহার পরেও হইয়া থাকে। মহাদেওস্থানের নিকট প্রায় ১২।১৪ ফুট একটি খাল কাটা হয়। ইহা চওড়ায় প্রায় দুই ফুট এবং এক ফুট গভীর হইয়া থাকে। এই জায়গাটিকে ...পাকার কাঠকয়লায় ভরিয়া দেওয়া হয়। কুলার বাতাস দিয়া কাঠকয়লা-গুলিকে ভাল করিয়া ধরান হয়। আঁচ বেশ গন্‌গনে হইলে পুরোহিত আসিয়া অগ্নিকে পূজা করেন। তাহার উপর আশীর্ব্বাদী জল দু-চার ফোঁটা ছিটাইয়া দেন এবং তাহার পর

রাঁচি জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে বুঢ়াডির নিকট মন্দির

গ্রামে একটি সাধারণ দৃশ্য

পার্ব্বত্য নদীতে মাছধরা

অতিক্রম করিয়া থাকে। অথচ তখনও যে আগুনের দাহিকাশক্তি বর্ত্তমান থাকে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার জনৈক বন্ধু ভোক্তাগণের পরে অগ্নিতে পা দিয়া পা পুড়াইয়াছিলেন। অপর এক জন ভোক্তাদের সঙ্গে সারাদিন উপবাসাদি করিয়া ভোক্তা হইয়া সব নিয়ম পালন করিয়া অগ্নিতে পদচারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কিছু হয় নাই। কিন্তু তাঁহার ধারণা "ফুলকুদনা" অনুষ্ঠানের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্নান করিতে হয় বলিয়া ভিজা পায়ে মাটি লাগিয়া থাকে এবং সেই মাটিই অগ্নি হইতে চর্ম্মকে রক্ষা করে।

কথাটি হয়ত আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু আট দশ বছরের ছোট ছেলেকেও ফুলকুদনায় যোগ দিতে দেখিয়াছি, তাহাদের পা ছোট, চামড়াও নরম, অথচ কিছু হয় নাই। আবার রাঁচি হইতে দূরের গ্রামে শুনিয়াছি ফুলকুদনায় ভোক্তাগণ শুধু আগুনে হাঁটিয়া নিরস্ত হয় না, অনেকক্ষণ তাহার উপর নৃত্য করিয়া অবশেষে আগুনটিকে নিবাইয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও কিছুই অনিষ্ট হয় না। চোখের ধাঁধা ভাবিয়া ফটোগ্রাফ লইয়া দেখিয়াছি, ইহার মধ্যে কোনও জালজুয়াচুরি নাই।

যাহাই হউক, ফুলকুদনা উৎসবের পরে সারারাত ধরিয়া গ্রামে নৃত্যগীত হইতে থাকে। তাহাতে মুখোস পরিয়া রাম, রাবণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সাজিয়া লোকজন নৃত্য করে। পরদিবস বাংলা দেশের মত চড়কগাছে চড়া হয় এবং মেলা বসে। সেই মেলায় গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে মুণ্ডারা আসিয়া নাচগান করে এবং পরম উৎসবের মধ্যে মাণ্ডা-পরবের অবসান হইয়া থাকে।

ধানের ক্ষেত

রাজপুত্র

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই নরেনকে বাইসিক্ল চালনার মোটামুটি কৌশল এবং কসরৎ শিখাইয়া দিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এইবার নিজে রোজ অভ্যাস করবি। দু-তিন দিনেই রাস্তা দিয়ে চলতে পারবি।

নরেন বলিল—তুমি একবার সেই কসরৎগুলো দেখাও না বিশু-দা।

বিশ্বনাথের আপত্তি ছিল না, জীবনে তাহার এদিকে শ্রান্তিও নাই, সে আপনার পুরানো রং-চটা বাইসিক্লখানা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নরেন আপত্তি করিয়া বলিল—না, না, বিশুদা, আমার নতুনখানা নাও।

বিশু অভ্যাসমত রসিকতা করিয়া বলিল—অ্যাচ্ছ্যা!

কথাটা আসলে আচ্ছা। রসিকতা করিয়া বিশু বলে, অ্যাচ্ছ্যা। নরেনের নূতন চকচকে সাইকেলখানা একপাশে সযত্নে রক্ষিত ছিল, বিশু নিজের পুরানো জীর্ণখানাতেই নরেনকে চাপাইয়া তালিম দিতেছিল। বলিয়াছিল—না, নতুন গাড়ী এখন খারাপ হয়ে যাবে। আর জানিস—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। আর উপকারীও খুব, সহজে হজম হয়।

বিশ্বনাথের ঐ গাড়ীখানাতেই এ অঞ্চলের সাইকেল-আরোহীর অন্তত শতকরা ষাট জন আরোহণ-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে।

সে বলে—ইনি আমার মান্ধাতা—কীং মান্ধাতার ষাট হাজার বছর পরমায়ু। যাক্, বিশ্বনাথ নূতন গাড়ীখানা লইয়াই কসরৎ দেখাইতে আরম্ভ করিল। নানা ধরণের কসরৎ, গাড়ীখানা তাহার স্পর্শগুণে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ যে ভাবেই নিজেকে বিপন্ন করুক না কেন, লোহার গাড়ীখানা জীব এবং একান্ত বিশ্বস্ত বাহনের মত তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া কখনও তীরবেগে, কখনও বা ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

নরেন বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছিল। বিশ্বনাথ গাড়ীখানা থামাইয়া নামিয়া বলিল—নে। অনেক বেলা হ'ল, চল্ এইবার বাড়ী যাই।

কৃতজ্ঞচিত্তে নরেন বলিল—গাড়ীখানা আপনার কাছেই থাক না বিশু-দা, আপনি এখন চ'ড়ে ঠিক ক'রে দেবেন।

বিশু হাসিয়া বলিল—অ্যাচ্ছ্যা! তার পর বলিল—ওরে বাপরে! তা হ'লে মান্ধাতা বুড়ো আমার রাগ করবে—আর পিঠেই নেবে না। এতেই হয়ত রাগ ক'রে ব'সে আছে—তোর গাড়ীটাতে চেপে কসরৎ দেখিয়েছি—হয়ত রাগ ক'রে ব'সে আছে। দেখবি!—বলিয়া সে নিজেরখানাতে চড়িবার উপক্রম করিল। গাড়ীখানা সত্যই নড়ে না, বহুকষ্টে যদি নড়িল তবে বিশ্বনাথ চড়িয়া বসিবামাত্র সেটা উল্টাইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া গাড়ীখানাকে তুলিয়া পরম আদর আরম্ভ করিল, বুড্‌ঢা আমার, মান যাও বেটা, রাগ মৎ করো বেটা। এস্য কাম হাম আর নেহি করেঙ্গে। মান যাও, মান যাও।

গাড়ীটার হ্যাণ্ডেলের উপরে গোটাকয়েক চুম্বনও সে আঁকিয়া দিল। গ্রামের মধ্যে পৌঁছিয়া সে নরেনকে বলিল—ফি নিয়ে আসবি বিকেলবেলা।

নরেন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুই বাক্স কাঁচি সিগারেট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—আমি ভুলে গিয়ে ছিলাম বিশু-দা!

বিশু বলিল—অ্যাচ্ছা! ওঃ এ যে ডবল ফি রে! অ্যাচ্ছা, অ্যাচ্ছা! তা বেশ—দিচ্ছিস তুই।—বলিতে বলিতেই সে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিল। নরেনকে বিদায় করিয়া বিশ্বনাথ গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

—এই যে বাবু দাদা! ও বাবু দাদা!

—অ্যাচ্ছা! কে'রে আমার গরীব ভাই, পিছন থেকে টিক্‌টিকির মত টক্‌টক্ আরম্ভ করলে মাণিক!

গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্বনাথ দেখিল পঞ্চানন সাহা হন্তদন্ত হইয়া পিছনে আসিতেছে।

বিশ্বনাথ বলিল—সাহা মশায়ের কি খবর আবার?

পঞ্চানন নিকটে আসিয়া বলিল—আজ একবার সন্ধ্যে বেলাতে আসতে হবে দাদাবাবু। আমরা নতুন বই ধরেছি, একবার মোশানটোশানগুলা দেখিয়ে দেবেন।

পঞ্চানন সাহা অবস্থাপন্ন সাহা-বংশের ছেলে, মদের দোকান আছে, তাহার উপর আবার এক যাত্রার দল খুলিয়া বসিয়াছে। ঐ দলে মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথকে মোশান-মাষ্টারী করিতে হয়।

বিশ্বনাথ বলিল—আজ আর হয় না গরীব ভাই। আজ আবার আমাদের থিয়েটারের রিহারস্তাল আছে। অন্য দিন আসব বরং।

পঞ্চানন একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—আর একটা কথা বলছিলাম দাদাবাবু!

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—আচ্ছা! বলে ফেল!

—আমাদের একটা পার্ট যদি আপনি ক'রে দিতেন—।

—হুঁ! নাঃ, তা পারব না গরীব ভাই।

—আমরা মোটা পেনামী দিতাম! কথাটা পঞ্চানন একটু দ্বিধাভয়েই বলিল। বিশ্বনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল—জান পঞ্চানন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ একদিন রাজা ছিলেন!

পঞ্চানন সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল, সে মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বনাথও আর কোন কথা বলিল না, গাড়ীতে চড়িয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিছু দূর গিয়াই কিন্তু সে আবার ফিরিল, পঞ্চাননের কাছে আসিয়া বলিল—মোশানটোশান যা দেখিয়ে দেবার আমি দেব, কাল পরশু যেদিন হোক—আমাকে খবর দিও।

আবার সে গাড়ীটাকে ফিরাইয়া দ্রুততর বেগে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। পঞ্চানন মুখ ভেঙচাইয়া বলিল—রাজকোঙর আমার! 'ঘরে ভাত নাই ধরমের উপোস' সেই বিত্তান্ত! কোন্ কালে ঘি খেয়েছি হাত শুঁকে দেখ—ভাই! পাশেই রাস্তার ধারে আপন দোকানে হরিপদ দাঁড়াইয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল—কি হ'ল সাহা-দাদা? বংশখেঁটে কি বললেন?

পঞ্চানন কথাটা বলিবার জন্ত হরিপদর দোকানে গিয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ যখন বাড়ী ফিরিল তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

সমস্ত বাড়ীটা যেন থম্‌-থম্‌ করিতেছিল। মা দাওয়ার উপর একটা খুঁটির ধারে অত্যন্ত বিষণ্ণ ব্যথাতুর মুখে বসিয়া আছেন। তাহার স্ত্রী বোধ হয় ঘরের ভিতর, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। বিশ্বনাথের তিন বছরের মেয়ে বাণী বারান্দার এক প্রান্তে তাহার খেলাঘরে বসিয়া আছে। সেও কেমন যেন অত্যন্ত শান্ত, মুখে তাহার আবোল-তাবোল কথার লহরী নাই, হাত পা নাড়িয়া অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে সে তাহার গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত নয়, মোট কথা জীবনের উচ্ছ্বাস যেন অকস্মাৎ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

গাড়ীটা এক পাশে রাখিয়া দিয়া বিশ্বনাথ বাহু প্রসারিত করিয়া ডাকিল—বাণীমা, রাণীমা, মণিমা, ধনিমা, চাঁদিমা, রাঙিমা, লালিমা, নীলিমা, মহিমা, গরিমা, সুরমা, সুষমা, মাসীমা, পিসীমা এস মা, হাস মা!

বিশ্বনাথের এটুকু নিজের রচনা—মেয়েকে আদর করিয়া সে এমন অনেক ছড়া রচনা করে। বাণী খেলা ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর ছুটিয়া আসিয়া বাপের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল না। সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল—গয়লাকে তুমি মেরো বাবা!

বিশ্বনাথ বলিল—আচ্ছা! কিন্তু কেন বলত? সে কি তোমার শ্বশুর হ'তে চায় না কি?

মা এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—পায়ে তার জুতো ছিল না বাবা, তাই হাতেনাতে জুতো মারতে বাকী রেখে গেছে। নইলে মুখে—।

মা আর বলিতে পারিলেন না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে এতক্ষণে স্ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল,—তার আর দোষ কি বলুন, পাঁচ মাস সে ধারে দুধ দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—পাঁচ বছর ত হয় নি, কি বল মা! আমার যে প্রজাদের কাছে দশ বছর বিশ বছরের খাজনা পাওনা আছে!

মা বলিলেন—তোমার পাওনা আছে ব'লে সে ছাড়বে কেন বাবা!

বিশ্বনাথ কোন উত্তর দিল না, সে মেয়েকে নানা ভাবে হাসাইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের বোধ করি আর ধৈর্য্য থাকিল না, তিনি এবার বলিলেন—একটা টাকা—না—তাই বা কেন; দেশে কলকে-ফুলের বীজের ত এখনও অভাব হয় নি! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বনাথ মেয়েকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া আবার গাড়ীটা টানিয়া লইয়া বলিল—তোমাকে যেতে হবে না মা, আমিই নিয়ে আসছি কল্কেফুলের বীজ।

সে আবার বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া মা ঈষৎ উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন—এই দুপুরে না খেয়ে বিশু আবার গেল কোথায়? অ বিশু!

ঘরের ভিতর হইতে জবাব দিল বধূ,—কি ক'রে জানব বলুন, রাজবংশের মহাপুরুষদের ধারা-ধরণই আলাদা!

কথাটায় বিশ্বনাথের মায়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল—তাঁহার সমস্ত ক্রোধটা গিয়া পড়িল বধূর উপর। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কি বললে বৌমা? এত বড় আস্পর্দ্ধা! স্বামীর বংশ তুলে তুমি কথা কও?

বধূর শরীরটিও শীতল ছিল না, অন্তরের জ্বালায় সে-ও জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কেন তুলব না মা, ওই রাজবংশ দেখিয়েই ত আমার বাপের কাছ থেকে এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছিলেন!

বিশ্বনাথের মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চেঁচামেচির লজ্জাকে তিনি বড় ভয় করেন, তিনি নীরবে শুধু কাঁদিতে বসিলেন। নিস্তব্ধ বাড়ী—পুরাতন ভগ্নপ্রায় দ্বিতল বাড়ীখানার কোন ফাটলে বসিয়া কয়টা পারাবত শুধু দ্বিপ্রহরে বিশ্রামসুখে গুঞ্জন করিতেছিল।

* * *

রাজবংশ এই কথাটা আজ এ-বাড়ীতে খোঁটার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রাজবংশের ইতিহাস এ-অঞ্চলে আজ উপকথা এবং রাজবংশীয় বলিয়া গৌরব বোধ করাটা আজ অপবাদের মত ব্যঙ্গের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলেও এককালে সমস্তই সত্য ছিল। সত্য সত্যই বিশ্বনাথ রাজবংশের সন্তান। সে রাজবংশ কোম্পানী অথবা ইংরেজের আমলের খেতাবী রাজা নয়, মুসলমান-আমলে যেকালে জমিদার-তন্ত্রের উপর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আমলের রাজবংশ। মুরশিদ কুলি খাঁর রাজত্বের ইতিহাসের মধ্যে 'ঢেকার' 'রায় চৌধুরী'-বংশের ইতিহাস একটা অধ্যায়। রাজা রামজীবন রায় বহু কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইট-কাঠের বাড়ীগুলি আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নির্ম্মিত বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলি ভাঙিয়া নূতন ভক্তে নূতন মন্দির গড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এ-অঞ্চলের জলাশয়-গুলি আজও জলে টলমল করিতেছে। পশু-পক্ষী-মানুষ, এমন কি বহুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে শস্যসম্ভার পর্য্যন্ত এই জলে নিত্য-নিয়মিত পরিতৃপ্ত হয়। অবশ্য, সে জলাশয়গুলির মালিক এখন রায় চৌধুরী বংশাবলীর কেহ নয়—তবুও এ বংশের কীর্ত্তি সেগুলি এ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাক্, ওসব অতীত কথা, বর্ত্তমানে ওসব উপকথারই সামিল এবং ও লইয়া গৌরবও আজ অপবাদের মতই ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু। এই জন্যই বিশ্বনাথকে কেহ বলে 'রাজকোঙর', কেহ বলে 'বংশখেটে', তার স্ত্রী পর্য্যন্ত বলে রাজবংশের 'মহাপুরুষ'। আরও কত জনে কত বলে—সমস্ত সংগ্রহ করিলে বোধ হয় বিশ্বনাথেরও অষ্টোত্তর সহস্রনাম হইতে পারে। সাধারণকেও তাহার জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

বিশ্বনাথ পুনরায় বাড়ী ফিরিল বেলা তিনটার সময়। অভ্যস্ত হাসিমুখেই সে বলিল—গয়লার টাকাটা দিয়ে এলাম মা। আর এই চারটে টাকা রাখ। আবার দরকার হ'লে ব'লো।

বাণী যাহাকে বলে পাকা মেয়ে, সে তাড়াতাড়ি কোথা হইতে একটা পাখা লইয়া আসিয়া বাবাকে বাতাস করিতে বসিল। বিশ্বনাথ স্মিতমুখে বলিল, আচ্ছা!

বিশ্বনাথের মা বাণীর হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া

বলিল—তুমি বাবার কোলে ব'সো—আমি তোমাদের বাতাস করি।

বিশ্বনাথ একটু সুস্থ হইলে মা প্রশ্ন করিলেন—টাকাটা বুঝি প্রজাদের কাছে আদায় ক'রে নিয়ে এলি?... গেলেই, তাগাদা করলেই, আদায় হয় বাবা; আমি কত বার বলি তোমাকে, তা তুমি কানেই তোল না। ও টাকাটা আদায় হলেও ত মাসে দশ-বার টাকা আসে!

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—ম্যাড, ম্যাড, মাদার তুমি ম্যাড।

মা হাসিয়া বলিলেন—তোর কি হাসি-তামাশার সময়-অসময় নেই রে!

বিশ্বনাথ বলিল—পাগল, পাগল, তুমি পাগল তাই বলছি! লোকে কখনও পাওনা দেয়! বিশেষ খাজনা! ওই রামনগরের কাঠওয়ালাকে চারটে তালগাছ বেচে দিলাম—তিন টাকা ক'রে—বার টাকায়।

মায়ের মুখ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—বৌমা বিশুকে তেল দাও গো!

বাণী তখন আব্দার ধরিয়াছে—বাবা একটা গল্প বল। খুব ভাল গল্প!

—আচ্ছা!

—বল না—হ্যা!

—এই একদিন মা আমি গিয়েছিলাম নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে। শীতকাল, চাষারা সব সরষে বুনেছে, সরষের গাছ হয়েছে। হঠাৎ মা, কোথা থেকে একটা ইয়া বড় বাঘ চ'লে এল। হালুম ক'রে আমাকে ধরে আর কি!

বাণীর মুখ ভয়াতুর হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—কত বড় বাঘ বাবা?

—এই এত বড়! আমি আর কি করি, করলাম কি তাড়াতাড়ি একটা সরষে গাছে উঠে পড়লাম!

—আর বাঘটা?

—বাঘটা সেই গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে গর্জ্জাতে লাগল, লাফাতে লাগল। এমন সময় মা, আকাশের ওপর থেকে সোঁ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটা চড়ুই পাখী, ব্যাস বাঘটাকে ছোঁ দিয়ে নখে ক'রে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। আর আমি সেই চড়ুই পাখীটার পাখার বাতাসে ডাল ভেঙে ধপাস ক'রে মাটিতে—বুঝলে কিনা—। সঙ্গে সঙ্গেই সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে মাটির উপর ধপ করিয়া পড়িয়া চোখ বিস্ফারিত করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাণী সে ভঙ্গী দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার স্ত্রী আসিয়াছিল তেল দিতে এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই সে আসিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহার ঐ ভঙ্গী দেখিয়া না হাসিয়া পারিল না। বিশু আবার আরম্ভ করিল—বুঝলে মা, আমি প'ড়ে গিয়ে ভাবছি কি ক'রে উঠব। এমন সময় কোথা থেকে বেরিয়ে এল এক পরী; হাতে তার তেলের বাটী!

বাণী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—পরী!

—হ্যাঁ মা, পরী—এই চুল পড়েছে পা পর্য্যন্ত, এই সুন্দর নাক—এই পটল-চেরা চোখ, গোলাপফুলের মত রং—।

—পরী কি বললে বাবা?

—বললে?—আমাকে অমনি করে ব'সে থাকতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললে—মরণ আর কি!

মা আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—আর মেয়ে নিয়ে খেলা করতে হবে না বিশু, ওঠ—উঠে স্নান কর, ভাত খা!

বাণী বলিল—তার পর বাবা!

—তার পর এই ম্যা কুতু—কুতু—! কাতুকুতুর ভয়ে বাণী পলাইয়া গেল। বিশ্বনাথ তেল মাখিতে বসিল।

* * *

সন্ধ্যা হইতেই দিবানিদ্রা সারিয়া, বিশ্বনাথ উঠিয়া নিজেই চায়ের জল গরম করিতে বসিল।

চা খাইয়া আবার সে গাড়ীখানা বাহির করিয়া রওনা হইল থিয়েটার-ক্লাব অভিমুখে। ক্লাবে তখনও সকলে জমায়েৎ হয় নাই, সদ্যপ্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত কয়েকটি অল্প-বয়সী ছেলে হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলা লইয়া নিদারুণ অসঙ্গতির সহিত সঙ্গীতের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। বিশুদাদাকে দেখিয়া তাহারা উৎসাহে উৎকট ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিশ্বনাথ আকস্মিক কোন একটা যন্ত্রণায় কাতর হইয়া

বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

—কি হ'ল বিশুদা?

—বিশুদা—বিশুদা?

বিশু উত্তর দিল—বুকে বিঁধে গিয়েছে!

—কি? কই দেখি!

—ওঃ তোদের সঙ্গীতের সঙ্গীন। উঃ!

সকলে আবার কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুকে হাত বুলাইয়া বলিল—বাপ! এমনি ভাবে বেতালা চীৎকার করে। কানের ভিতর দিয়া মরমে একবারে ঘ্যাক ক'রে—উঃ!

এক জন বলিল—বিশুদা সেই মেমসাহেবের সেইটে একবার হোক।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

—দোহাই বিশুদা!

বিশুদার আপত্তি নাই, সে উঠিয়া বলিল—একটা বোর্ড চাই যে! আচ্ছা এই আলকাতরামাখা জানলাতেই হবে। কিন্তু খড়ি খানিকটে?

চট করিয়া এক জন সাজঘর হইতে এক টুকরা খড়ি আনিয়া বিশুদাদার হাতে জোগাইয়া দিল।

—বাবু!

ঠিক সেই সময়েই দরজার বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবু!

—কে? কাকে চাই? সমস্বরে কয় জন প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

—আজ্ঞে, আমাদের রায় বাবুকে!

—কে রে? আমাকে বলছিস? বিশ্বনাথ বাহির হইয়া আসিল। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল তাহারই লাগরাজের এক জন প্রজা রামদাস কৈবর্ত্ত। পাশের গ্রামেরই অধিবাসী রামদাস। রামদাস কাঁদিয়া বলিল—বাবুগো, আমাকে বাঁচান!

বিশ্বনাথ বলিল—বেঁচেই ত রয়েছিস বাবা, এর ওপরে আর কি বাঁচাব?

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া রামদাস বলিল—আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বুকে কাঠ চাপিয়ে দিয়েছে, বাবু গো!

বহু কষ্টে জানা গেল রামদাসের পিতা সম্প্রতি ঘোষ-বাবুদের এলাকার মধ্যে কয়েক বিঘা জমি খরিদ করিয়াছে। সেই সম্পত্তির খারিজ-ফি আদায়ের জন্য তাহাকে ঘোষ-বাবুদের কাছারিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং সে বর্ত্তমানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় টাকা আদায়ের জন্য তাহার হাতে পায়ে বাঁধিয়া বুকে কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা এ রাত্রে ত আর কিছু হয় না। কাল সকালে যা-হয় করব। আর এই চিঠিখানা আমার বাড়ীতে দিয়ে যাও, বুঝলে!

একটা কাগজে কি খানিকটা লিখিয়া সে রামদাসের হাতে দিল। তার পর সঙ্গীদের বলিল—আজ চললাম ভাই। কাজ আছে একটু!

বাইসিক্লখানা টানিয়া লইয়া সে পথ ধরিল জেলার সদর শহরের মুখে। সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চলিয়াছে।

* * *

পরদিনই বেলা বারটা নাগাদ ক্ষুদ্র গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিল। লোষ্ট্রপাতে চঞ্চল মধুচক্রের সহিত অবস্থাটার তুলনা করা চলে। একেবারে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া হাজির হইয়াছেন, সঙ্গে বিশ্বনাথ।

কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই ঘোষবাবু কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া বনজঙ্গলের আড়াল দিয়া পলাইয়া বাঁচিলেন, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা নিজের চোখেই সাহেব দেখিতে পাইলেন। লোকটার বুকের উপরে কাঠটা ছিল না, কিন্তু পাশেই পড়িয়া ছিল, হাতে পায়ে বাঁধনের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়াছিল।

সাহেব বাঙালী এবং তরুণ আই-সি-এস, তিনি সবই বুঝিলেন।

সাহেব প্রতিবারের জন্য স্থানীয় ডাক-বাংলোয় চাপিয়া বসিলেন। ভাঙা বাইসিক্লটা ঠেলিতে ঠেলিতে বিশ্বনাথ যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা একটা। মা বলিলেন—বাবা বিশু, কাজটা কি ভাল হ'ল?

—কেন মা? গরিবের ওপর এই অত্যাচার, [illegible]

ওপর রামদাস আমার প্রজা, আশ্রিতকে রক্ষা না করলে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে মা!

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রী বলিয়া উঠিল—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে, সে বৃত্তান্ত! এইবার নিজেকে কে রক্ষে ক'রে খুঁজে দেখ।

বিশ্বনাথ ডাকিল—বাণী মা, রাণী মা কই গো?

এবার কঠোরতর স্বরে ঘরের ভিতর হইতে মন্তব্য হইল—ঘোষ-বাবুদের কাছে যে নিজের এই এতগুলি দেনা আছে, সেগুলির জন্য হরিশ্চন্দ্রের মত স্ত্রী-পুত্র বেচতে হবে!

পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইয়া বিশ্বনাথ বলিল—এক কাপ চা ক'রে দিতে পার মা!

মা বলিলেন—বৌমা কথাটা মিথ্যে বলে নি, বাবা বিশু!

সম্মুখেই ভাঙা উঠানটার এক কোণে একটা বিড়াল বসিয়া বেশ আরামে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিল। সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বিশ্বনাথ এবার বিড়াল ডাকিতে আরম্ভ করিল—এ্যাঁ-ও—এ্যাঁ-ও—!

যেন কোন বিড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একেবারে নিখুঁত বিড়ালের ডাক! বিশ্রাম-রত বিড়ালটা চকিত হইয়া চারি পাশ দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গের লোম ফুলাইয়া ডাকিয়া উঠিল—এ্যাঁ-ও—!

মা আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। স্ত্রী আসিয়া তেলের বাটি নামাইয়া দিয়া বলিল—বেরাল ডাকলে ঘোষবাবুরা ভুলবে না!

বিশ্বনাথ উত্তর দিল—চায়ের জন্যে বললাম যে একটু!

কোন উত্তর না দিয়া স্ত্রী চলিয়া গেল, বিশ্বনাথ তেলের বাটিটা লইয়া বসিল।

—বাবা! এই যে বাবা! বলিয়া বাণী বহির্দ্বারে প্রবেশ করিয়াই ছুটিয়া আসিল।

—তোমার চিঠি আছে বাবা! মা ফেলে দিয়েছিল, আমি কুড়িয়ে রেখেছি!

—চিঠি? কই মা, আন ত দেখি!

বাণী একখানা ধূলি-মলিন পোষ্টকার্ড আনিয়া বিশ্বনাথের হাতে দিল, সত্যই চিঠিখানা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বড় সাহেব-কোম্পানীর নাম-ছাপান সাদা পোষ্টকার্ডের চিঠি, দুধের মত সাদা রঙের উপর ধুলার দাগ লাগিয়াছে। হাত দিয়া ঝাড়িতেই সদ্যলাগা ধুলা অনেক ঝরিয়া গেল।

বিশ্বনাথ দেখিল চিঠিখানা তাহার এক দূরসম্পর্কীয় ভগ্নীপতি অমূল্য লিখিয়াছে। অমূল্য এক বড় সাহেব-কোম্পানীর কয়লাকুঠীর হেড ক্লার্ক। কয়লাকুঠীতে থিয়েটার হইবে, তাই অমূল্য তাহাকে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। লিখিয়াছে—"আমাদের দল একেবারে নূতন, বহু কষ্টে এবার সাহেবের কাছে টাকা মঞ্জুর করাইয়াছি। প্লে ভাল না হইলে ভবিষ্যতে আর বোধ হয় টাকা পাওয়া যাইবে না। আপনার আসা চাই-ই, আমরা কেহ কিছুই জানি না, এ বিষয়ে কোন ওজর আপনার শুনিব না।"

চিঠিখানা মায়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বিশ্বনাথ বলিল—অমূল্য চিঠি দিয়েছে দেখেছ মা?

ম্লান হাসি হাসিয়া মা বলিলেন—দেখেছি।

—না গেলে অমূল্য রাগ করবে।

মা আবার একটু হাসিলেন। তার পর বলিলেন—বৌমা আসন্নপ্রসবা হয়ে রয়েছেন—এ সময় বাইরে গেলে আমি একা কি করব, বল?

অমূল্য শুধু পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কয়টি টাকাও সে পাঠাইয়াছিল। পরদিনই দশ টাকার একখানি মনি-অর্ডার আসিয়া হাজির হইল। কুপনে লেখা ছিল—আজই অথবা কালই আপনি রওনা হইবেন।

বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল ডাকবাংলোয় সাহেবের নিকট, রামদাসের বাপের বুকের কাঠ এখন তাহার মাথার উপর চাপিয়াছে। ভাগ্য তাহার ভালই বলিতে হইবে, সাহেব তাহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—এই যে, এইমাত্র আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।

বিশ্বনাথ নীরবেই সাহেবের বক্তব্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সাহেব বলিলেন—দেখুন, আজ আমার কাছে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদের ক'জন এসেছিলেন। তাঁদের অনুরোধ, যাতে ব্যাপারটা আপোষে মিটে যায়। আপনার মতের জন্ত আমি অপেক্ষা করছি। কি মত আপনার?

বিশ্বনাথ অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল, সে বলিল—সে খুব

সুখের কথা স্যার! তবে ভবিষ্যতে যাতে আর তার ওপর কোন অত্যাচার না হয়—।

সাহেব বলিলেন—সামান্য অত্যাচার যদি হয়, আপনি আমায় সংবাদ দেবেন, আমি তাকে হাতকড়া দিয়ে প্রকাশ্য ভাবে চালান দেব—আর সাজা যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। শুধু সে-লোকটা কেন—যে-কোন লোকের ওপর অত্যাচার হোক আপনি আমায় জানাবেন। এবারও ওকে ঘোষেরা খুশী করবে, খারিজ এমনি ক'রে দেবে, আর এবারকার খাজনা মাফ দেবে।

বিশ্বনাথ সানন্দে মত দিয়া বলিল—আমার কোন অমত নেই!

সাহেব বলিলেন—এ কথা আপনারই যোগ্য। আমি আপনার সম্বন্ধেও খবর নিয়েছি। আপনি খুব বড় বংশের ছেলে, কাজ এবং কথা দুইই আপনার বংশোচিত হয়েছে!

সেই দিনই ব্যাপারটার উপর যবনিকা পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ঘোষবাবুরা বিপন্ন হওয়াতে তাহার মনে একটা কাঁটা যেন বিঁধিয়াছিল, বার-বার মনে হইয়াছে এত দূর অগ্রসর না হইলেই ভাল হইত।

আর নিশ্চিন্ত হইয়া সে যাইতে পারিবে সেও একটা বড় আরামের কথা। পরদিনই সে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময় ছয়টি টাকা মায়ের হাতে দিয়া বলিল—সে-দিন চার টাকা দিয়েছি—আর এই ছ-টাকা। আমার তো দিন-পনরর বেশী হবে না। এতেই হবে, কেমন?

মা বলিলেন—যাচ্ছ বাবা, ওখানে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখো না! অমূল্যকে ব'লো!

বিশ্বনাথ বলিল—যে-সে কাজ করতে যে কেমন—। কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—রাজা-রাজড়ার বংশধরেরা শুনেছি এখন জুতো বেচে খায়! রাজবংশ ব'লে ত আর কেউ সিংহাসন গড়িয়ে দেবে না!

বিশ্বনাথ ডাকিল—বাণীমা, রাণীমা, মণিমা, ধনিমা, চাঁদিমা, রাঙিমা—মা গো একটি চুমু দাও।

বাণীমা চুমা দিয়া বলিল—কানে কানে একটা কথা বলি বাবা!

বিশ্বনাথ হেঁট হইয়া মেয়ের মুখের উপর কান পাতিয়া দিল, বাণী চুপি চুপি বলিল—আমার জন্যে এক শিশি আলতা আর সাবান, বেশ!

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—বেশ।

—আর একটি কথা বলি বাবা!

আবার বিশ্বনাথ কান পাতিয়া দিল, বাণী বলিল—আর পাউডার—আর স্কার (স্কার্ট) শাড়ী, বেশ।

বিশ্বনাথ বলিল—বেশ!

—এই কাগজে লিখে দিয়েছি বাবা! বিশ্বনাথ দেখিল, হিজিবিজি দাগটানা এক টুকরা কাগজ। সে সেটা পকেটে পুরিল।

* * *

কলিয়ারীর পয়সা, কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের নিকট হইতেই টাকায় এক পয়সা করিয়া আদায় হইয়া একটা তহবিলে জমা হয়, সে-জমার পরিমাণ যেমন মোটা, দাতার হাতও তেমনি দরাজ। সুতরাং টাকার অভাব ছিল না। বিশ্বনাথ মনোমত করিয়া ষ্টেজ গড়িয়া তুলিল এবং কলিকাতায় প্রথম শ্রেণীর পোষাকওয়ালার নিকট হইতে পোষাক ভাড়ার ব্যবস্থা করিল। নাচগানের জন্য একটা ছেলের দলও ভাড়া করা হইল।

অভিনয় মোটের উপর ভাল না হইলেও মন্দের পর্য্যায়ে পড়ে না। বিশ্বনাথের আর বিশ্রাম নাই—সে ইহার চুল ঠিক করিয়া দেয়, উহার পোষাকটা একটু শোধরাইয়া দেয়, কখনও দৃশ্যপটের দড়ি টানে, কখনও প্রম্‌ট করে, কখনও ঘণ্টা মারে, আবার সঙ্গে সঙ্গে দুই-একটা ছোট পাট করিয়া আসিতেছিল।

অমূল্য আসিয়া বলিল—দাদা, সাহেবরা বলছেন নাচগান কই? দু-একটা নাচগান ঢুকিয়ে দেন না।

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—মাদল আনিয়ে দিতে পার একটা?

কয়লাকুঠি সাঁওতালের রাজ্য—অমূল্য তৎক্ষণাৎ মাদল আনিবার ব্যবস্থা করিল। বিশ্বনাথ নাচের ছেলেদের পাণ্ডার কাছে গিয়া বলিল—সেই সাঁওতাল-নাচটা একবার দিতে হবে।

ছেলেদের নিখুঁত ভাবে সাঁওতাল রমণী সাজাইয়া দিয়া সে নিজে সাজিল সাঁওতাল। মাথায় চূড়াবাঁধা পরচুলায় পালক গুঁজিল—বুকে, গলায়, হাতে পরিল কড়ির গহনা, কপালে কালি দিয়া উল্কি আঁকিল, তার পর মাদলটা গলায় ঝুলাইয়া দলবলসমেত সে ষ্টেজের উপর বাহির হইয়া পড়িল।

সাহেব মেমের দল হাসিয়া সারা হইয়া গেল। মাদল বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বনাথের অঙ্গভঙ্গী, তাহার নৃত্য একেবারে নিখুঁত। মধ্যে মধ্যে তালের মাথায় সে—উর-র-র—একটা শব্দ করিয়া লাফ দিয়া উঠিতেছিল। গানও সে নিজেই গাহিতেছিল।

নাচগান শেষ করিয়া সে সাজঘরে পোষাক খুলিতেছিল, তাড়াতাড়ি এক জন ভক্ত শিষ্য তাহাকে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল, সত্যই সে ঘামিয়া যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। অমূল্য হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—এস! সাহেবরা ডাকছে তোমাকে!

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দাঁড়াও পোষাকটা খুলি।

—আরে ঐ পোষাকেই এস, খুব খুশী হবে। যাকে বলে একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড!

পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়াই বিশ্বনাথ দেখা করিতে গেল। মনে মনে স্থির করিল এই সুযোগে সাহেবকে একটা চাকরির কথা বলিবে। বাড়ীর অবস্থা সত্যই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে!

সাহেব খুশী হইয়া করমর্দ্দন করিয়া বলিল—ওয়াণ্ডারফুল মিঃ চৌধুরী!

বিশ্বনাথ ধন্যবাদ দিল, বলিল—আমার সৌভাগ্য আপনারা খুশী হয়েছেন!

মেমসাহেবের দল তখনও হাসিতেছিল।

সাহেব সিগারেটকেস খুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল—নাও!

বিশ্বনাথ ধন্যবাদ দিল।

সাহেব বলিল—আমি অমূল্যবাবুর কাছে সব শুনেছি মিষ্টার চৌধুরী! তোমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা ছিলেন!

মেমসাহেবের দল সবিস্ময়ে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল। এক জন বলিয়া উঠিল—সত্যি!

সাহেব আবার বলিল—আভিজাত্যের সঙ্গে কালচারের খুব নিকট-সম্বন্ধ! মিষ্টার চৌধুরী, তোমার রক্তের মধ্যে ললিতকলার কালচার রয়েছে!

বিশ্বনাথ তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সে কালচার লইয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল। চাকরির কথা তুলিতে ঘৃণা হইল।

* * *

পনর দিনের পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথ দুই মাস সেখানে থাকিয়া গেল। কোন রূপেই সে আসিতে পারিল না। আশেপাশে প্রায় কলিয়ারীতেই বাঙালী বাবুদের থিয়েটার-ক্লাব আছে, তাহারা আসিয়া তাহাকে ধরিল। আজ এ ক্লাব আসে—কাল আর এক দল, পরদিন আবার অন্য দল, এই দশ দিন পরে প্লে দাদা, এ দশ দিন আপনি যেতে পাবেন না।

সে এখানে সার্ব্বজনীন দাদা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আবার ধরে—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধের কথা বলুন।

ইতিমধ্যে দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তাহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। প্রসূতি ও নবকুমার ভালই আছে। পরিশেষে প্রত্যেক পত্রেই মা লেখেন—কাজের কি কিছু সুবিধা করিতে পারিলে?

পত্র যখন পায় তখন সে একবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হয়, কিন্তু বাহির হইয়া সে-সঙ্কল্প সে রাখিতে পারে না। বহুবার এমন হইয়াছে। শেষ পত্র আসিল, ছেলেটির খুব অসুখ—এবং ঘোষবাবুরা নাকি নালিশ করিয়াছেন। তুমি পত্র পাঠ আসিবে। তখন হাতে তাহার এক কপর্দ্দকও নাই। হাতে একটা আংটি ছিল সেটাকে পাঁচ টাকায় গোপনে বিক্রয় করিয়া সে ফিরিল। পথে সে কিনিল চার পয়সায় একখানি স্যাম্পেল সাবান ও একটি ছোট কৌটা সস্তা স্নো।

বাড়ীর দরজাতেই সে শুনিল—মৃদুস্বরে বাড়ীর মধ্যে কান্নার ধ্বনি উঠিতেছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রাণী! রাণীমা, রাণীমা বলিবার মত শক্তি তখন আর তাহার ছিল না। মা তাহাকে দেখিয়াই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এলে বাবা, আসতে পারলে! সোনার চাঁদ আমার বিনা-চিকিৎসায় মারা গেল বাবা! ছি-ছি-ছি! আমার কপালে ছি!

বলিতে বলিতেই তিনি নির্ম্মমভাবে আপনার কপালে

করাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাড়াতাড়ি বিশ্বনাথ তাঁহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন—না না! ছাড় বাবা, ছাড়! আমার মরণই মঙ্গল বাবা! বাবা—পথের ভিখেরী ক'রে ছাড়লে বাবা! সর্ব্বস্ব নিলেম হয়ে গেল বাবা, কচি ছেলে ওষুধ অভাবে চলে গেল! আর একটা আছে, ওটাও পড়েছে, ওটাও কি—। হাঁ হাঁ হাঁ, ধর, ধর, বাণীকে ধর!

—বাবা!

চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিল—অদূরে কঙ্কালসার বাণী দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে ডাকিতেছে—বাবা! সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

ঘরে ঢুকিতেই তাহার স্ত্রী পায়ে আছাড় খাইয়া বলিল—বিষ এনে দাও, আমাকে বিষ এনে দাও। নইলে ওই পা চাপিয়ে দাও আমার গলায়!

মা আসিয়া বধূকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। তার পর আরম্ভ করিলেন দুঃখের কাহিনী। বিশ্বনাথ নির্ব্বাক হইয়া মাতার শিয়রে বসিয়া সব শুনিয়া গেল।

* * *

সন্ধ্যাতেই সে আবার বাহির হইয়া গেল। গেল সে পঞ্চাননের কাছে। সে একবার চাকরি দিতে চাহিয়াছিল।

রাজবংশের মর্য্যাদা! বিশ্বনাথের ইচ্ছা হইল একবার পাগলের মত হাসে! রাজবংশ, রাজবংশ!

পঞ্চানন তাহাকে দেখিয়া মহা সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—এলেন কবে?

—এই আজই। তার পর দল কেমন চলছে বল?

পঞ্চানন অবাক হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—এখনও বাড়ী যান নি?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—সকালে এসেছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পঞ্চানন বলিল—ছেলেটি মারা গেল!

হাসিয়াই বিশ্বনাথ বলিল—কি করব বল—ও তো ভগবানের হাত!

—হ্যাঁ তা বটে! কিন্তু—। তার ওপর ঘোষবাবুদের কাণ্ড শুনেছেন ত? সেই রাগে, গোপনে নালিশ ক'রে, সমন-টমন সব গোপন ক'রে সমস্ত নিলেম ক'রে নিয়েছে আপনার!

এবারও হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—তাও শুনেছি।

—আপনি আপীল করুন। ও ঘুরে যাবে। —হ্যাঁ আর এক কাজ করুন দাদাবাবু, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গিয়ে ধরুন। বলুন সেই রাগে বাবেরা এই করেছে। আপনি এর বিহিত করুন।

ঘাড় নাড়িয়া বিশ্বনাথ বলিল—তাই কি হয় পঞ্চানন? টাকা পাবে তারা—আর নিজের স্বার্থের জন্যে—তাই কি হয়? পাগল তুমি!

পঞ্চানন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এখন দলের খবর কি বল?

পঞ্চানন বলিল—দলের খরচ দাদাবাবু রোজ বাড়ছে! ভাবছি লোক দু-চারটে কমিয়ে দোব। সেই যে পার্টের জন্যে আপনাকে বলেছিলাম—সে জন্যে একজন ভাল লোক এনেছি—মোটা মাইনে দিয়ে। তবে হ্যাঁ লোক খুব সরেস! লোকটা দলটাকে ভেঙে গড়ে তুললে দাদাবাবু। একদিন আসবেন রিহারস্যাল শুনবেন!

কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বিশ্বনাথ বলিল—তাই আসব, আচ্ছা উঠি আজ।

সে উঠিয়া ভাঙা গাড়ীটা অন্ধকার পথে চালাইয়া দিল। পথে সহসা তাহার মনে হইল—কল্কেফুলের বীজ ত অজস্র ধরিয়া আছে! পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিয়া দ্রুত সে সাইকেলটা চালাইয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি।

মা স্ত্রী আজ তাহাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছেন। একই ঘরে সকলে শুইয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে কম্পিত দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে সত্য, তবুও নিশ্চিন্ততার ছাপ তাহাদের ঘুমন্ত মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাণীও সুস্থ আছে। বিশ্বনাথ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছিল।

থিয়েটার—সিনেমা!

কিন্তু সে বহু দূরের কথা। কালই যে তাহার অর্থের প্রয়োজন! স্থির স্থাণুর মত সে বসিয়া ভাবিতেছিল। সহসা তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে আলো ও কাগজ-কলম লইয়া বসিল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মায়ের ঘুম

ভাঙিয়াছিল, তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কি লিখছিস ?

—ও কিছু না!

বলিয়া বিশ্বনাথ উঠিয়া পড়িল। পরদিন প্রাতঃকালেই উঠিয়া আবার সে বাহির হইল। নরেনের বাড়ী আসিয়া বলিল—তোদের সব ইস্কুলের পাণ্ডাদের ডাক!

ইস্কুলের ছেলেদের মহলে বিশ্বনাথের খুব খাতির, তাহারা 'বিশু-দা' বলিতে অজ্ঞান। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয় জন ছেলে আসিয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—বিশু-দা, ডাকছেন ?

—আঁচ্ছা! বিশু-দাকে মনে আছে ?

—হ্যাঁ আমরা ভুলেছি—না, আপনি ভুলেছেন ? ম্যাচের সময় রেফরীর অভাবে যে কষ্ট আমাদের! তিন-চার জন সাইকেল চাপা শিখবে, তারা হা-পিত্যেশ ক'রে আপনার পথ চেয়ে আছে!

—আঁচ্ছা! এখন শোন, আজ ইস্কুলে তোমাদের ক্যারিকেচার দেখাব—।

ছেলেরা কলরব করিয়া উঠিল—জয় বিশু-দার জয়!

—কিন্তু—!

—কিন্তু কি বিশু-দা ?

মাটির দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—চার পয়সা ক'রে টিকিট করতে হবে।

—সে খুব হবে বিশু-দা। দু-আনা ক'রে করুন না কেন!

—না, চার পয়সা ক'রেই করবি!

* * *

সন্ধ্যায় ইস্কুলের হলে ছেলেদের দল বিপুল উৎসাহে সমাগত হইয়াছে। ভদ্রলোক ও ইস্কুলের শিক্ষক কয়েক জন আছেন।

থিয়েটার হইতে কিছু সাজসরঞ্জাম লইয়া বিশ্বনাথ হাস্য-কৌতুক অভিনয় করিতেছিল।

হরবোলার অভিনয় হইল প্রথম, বিড়ালের ঝগড়া, মুরগীর ডাক, কুকুরের ডাক, ভোমরার ডাক দেখাইয়া আরম্ভ হইল ব্যঙ্গাভিনয়।

এখানকার এক পঙ্গু নাছোড়বন্দা ভিক্ষুকের অভিনয়—সেই মেমসাহেবের বাংলা গান শিক্ষা শেষ করিয়া সে আরম্ভ করিল—এক ভদ্রলোক জুতো কিনতে গেছেন। যাচ্ছেন আর সাইনবোর্ড দেখছেন—ভি-হুন্, ফিঙ হিঙ-লুঙ- চাঙ, মানে চীনেদের দোকান। চীনেরা ঠিক বুঝতে পেরেছে যে এ জুতো কিনবে। তারা ডাকছে—বাবু, বাবু! ভেলি গুড্‌ থু, আথুন, আথুন। বাবু, বাবু!

তার পরই হ'ল মডার্ণ শু ফ্যাক্টরী। বাঙাল মুসলমান ডাকছে—হ-কর্ত্তা, হ-কর্ত্তা, আয়েন, আয়েন, হ—।

এইবার একটা সাইনবোর্ড—কিংস সন্‌স শু ফ্যাক্টরী! রাজার ছেলের জুতোর দোকান।

—আসেন—আসেন—ও মশায় আসেন! ভাল জুতো পাবেন—সস্তা—রাজার ছেলের হাতের তৈরি।

ব্যাপারটা কি ? না—এঁর পূর্ব্বপুরুষ ছিল মহারাজ অজাতশত্রু। এঁরা তাঁরই বংশধর! ভদ্রলোক আর দ্বিধা করলেন না, ঢুকে পড়লেন।

জুতো তো বের হ'ল।

—এ কি জুতো মশায় ? না, এ পছন্দ হচ্ছে না। না এটাও না। না, না, ভাল বের করুন।

—দেখুন আমি রাজা অজাতশত্রুর বংশধর! রাজা অজাতশত্রু। হো-হো-হো-হো-হো-হো! দোকানদার হো-হো করিয়া কাঁদিতেছে। কান্নার বহর দেখিয়া ছেলে বুড়ার দল হাসিয়া আকুল হইল।

হো- হো- হো!

আচ্ছা আচ্ছা উঃ! কত দাম মশায় ? উঃ!

রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিশ্বনাথ আবার আরম্ভ করিল—চার চার চার টাকা। উঃ-উঃ-উঃ! বিশ্বনাথ হাঁপাইয়া উঠিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতেই বলিল—মানে, খদ্দেরকে সে আর কোন কথা বলতে দিতে চায় না আর কি! কিন্তু কণ্ঠস্বর যে তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সে বলিল—জল!

কিন্তু হাসির কলরবের মধ্যে সে-কথা কেহ শুনিতে পাইল না।

সে তাড়াতাড়ি কোনরূপে বলিল—এই নিন দাম! উঃ উঃ।

বলিয়া সে ছুটিয়া পাশের সাজঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সাজঘর হইতে নরেন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—জল—জল।

* * *

বিশ্বনাথ এখন ক্যারিকেচার করিয়াই বেড়ায়।

আঙ্কোর ভাট। পূর্ব্বদ্বারের পার্শ্বে নারীমূর্ত্তি

বান্তিএ শ্রী। মাঝের তিনটি মন্দির

বান্তিএ শ্রীর মন্দিরপুঞ্জ। উত্তর দিকের দৃশ্য
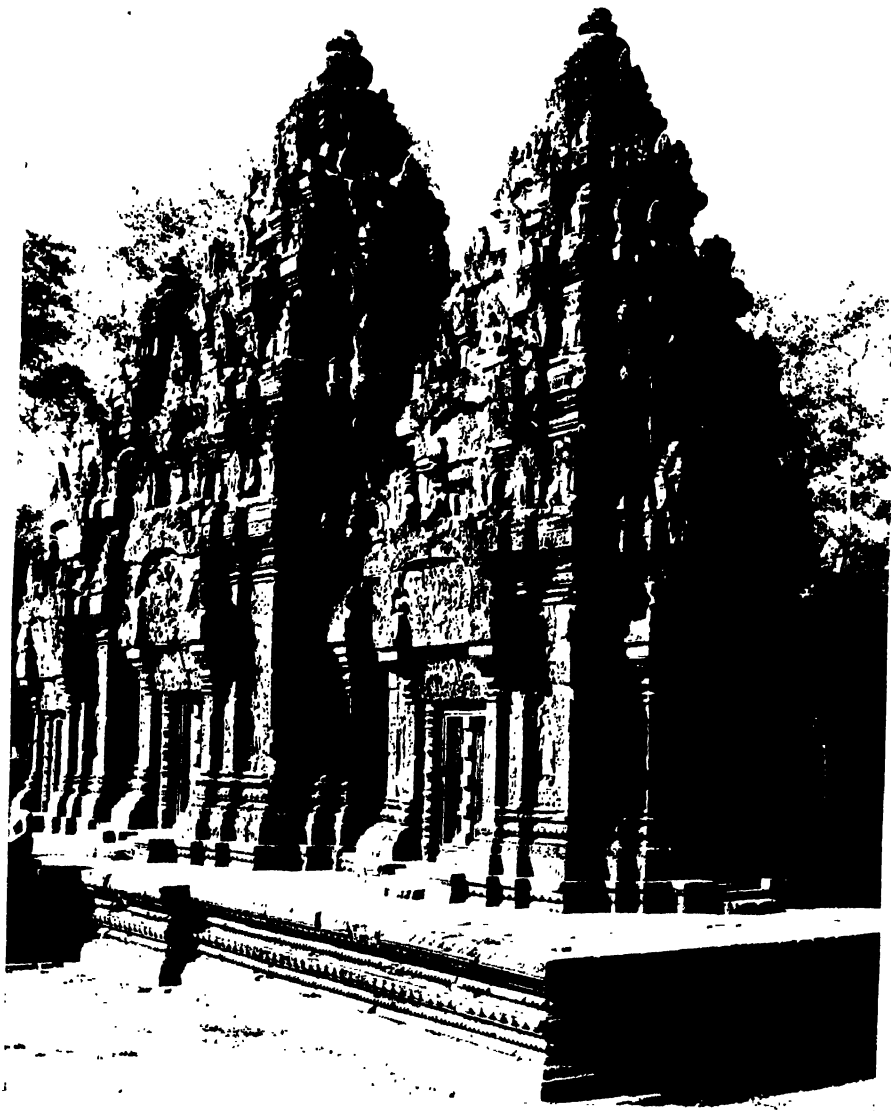
বান্তিএ স্রী। পশ্চিম দিকের গোপুরমের শীর্ষের অলঙ্কার

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(৫)

মৃগাঙ্কের সংসার এখন ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়বালার ছয়-সাতটি ছেলেমেয়ে হইয়াছে, সব কয়টিই প্রায় সমান ডানপিটে, ঘরের কাজকর্ম্ম সারিতে আর ছেলেমেয়ে সামলাইতে একলা মানুষ তাঁহার প্রাণান্ত হইয়া যায়। বড়মেয়ে সুবালার বয়স বছর দশ হইয়াছে, সেই যা একটু মানুষের মত। আর কোনও কাজে লাগুক বা নাই লাগুক, ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে সামলাইয়া মায়ের অনেকটা কাজের সাহায্য করে। বাকীগুলা এখনও বনের পশুর মতই আছে, মানুষের পদবীতে উন্নীত হয় নাই। ভালর মধ্যে এইটুকু যে অসুস্থ কেহ নয়, সব-ক'টারই মোটের উপর শরীর ভাল। তা না হইলে এই টানাটানির সংসারে আর তাহাদের বাঁচিতে হইত না। ঔষধ, পথ্য, ডাক্তারের ভিজিট এ-সব কোথা হইতে আসিত? মৃগাঙ্কের অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই, যেমন ছিল তাই আছে, কিন্তু মানুষ এখন এত বাড়িয়াছে যে এই অল্প আয়ে আর কুলায় না, মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটাইতেই জিব বাহির হইয়া পড়ে।

বড়মেয়ে সুবালা ওরফে বুলু, তাহার পর এক ছেলে গুলু, তাহার পর আবার দুই মেয়ে টেঁপি আর ক্ষেপী, তাহার পরে তিন ছেলে নিধু, বিধু, আর সিধু। সিধুর বয়স মাত্র কয় মাস, সবে হামা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামে ভাল স্কুল নাই, বিদ্যালয় বলিতে দুইটি পাঠশালা আছে, একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। মেয়েদের পড়াইবার কথা প্রিয়বালা স্বপ্নেও মনে স্থান দেন না। বুলি যদি হট্ হট্ করিয়া বিবি সাজিয়া রোজ দশ ঘণ্টা পাঠশালায় কাটাইয়া আসে তাহা হইলে একটা আট মাসের ও একটা দুই বছরের ছেলে ট্যাঁকে গুঁজিয়া তিনি এই রাবণের গোষ্ঠীর পিণ্ডি রাঁধিবেন কি প্রকারে? তিনি ত আর দশভুজা নন। ওসব মেমসাহেবীআনা মেমসাহেবের মেয়েদেরই পোষায়, পাড়াগাঁয়ে হিন্দুঘরে পোষাইবে না। টেঁপি আর ক্ষেপীরও পড়া আরম্ভ করিবার বয়স হইয়াছে, সেগুলি ঘর হইতে যতক্ষণই বাহিরে থাকুক তাহাতে প্রিয়বালার সম্মতি বই আপত্তি নাই, কিন্তু বড় বোনকে বাদ দিয়া তাহাদের পড়িতে পাঠাইলে বুলি আর মায়ের রক্ষা রাখিবে? এমনিতেই সতীন-ঝি শহরে গিয়া পরীক্ষায় পাস দিবার যোগাড় করিতেছে, আর বুলির এখনও অক্ষর-পরিচয়ের অধিক বিদ্যা অগ্রসর হইল না, ইহারই খোঁটা প্রিয়বালাকে কতবার খাইতে হয়। কিন্তু উপায় নাই। মৃতা সতীন এবং জীবিতা সতীন-কন্যাকে গাল পাড়িয়া যেটুকু গায়ের ঝাল মিটানো যায়, তাহার বেশী কিই বা প্রিয়বালা করিতে পারেন? তাও যদি সতীন-ঝিটা গালাগালিগুলি শুনিতে পাইত। স্বামী ত কানে তুলা গুঁজিয়া, পিঠে কুলা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, একেবারে কাঠের পুতুল।

ছেলে গুলু পাঠশালাতেই পড়ে, সে বেটাছেলে তাহাকে লেখাপড়া শিখিতেই হইবে। পাশের গ্রামে ভাল মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল আছে, সেখানে এ গ্রামের কয়েক জন ছেলে পড়িতেও যায়, কিন্তু প্রিয়বালার আদরের ছেলে অতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার আজ পর্য্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া হয় নাই। নিজে একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন বলিয়া পড়াশুনার প্রয়োজনটা যে কতখানি তাহা প্রিয়বালা ঠিক বুঝিতে পারেন না। টাকা আনিবার জন্য বিদ্যার প্রয়োজন বটে, কিন্তু গুলুর বয়স ত মাত্র আট বৎসর, এখনই কি আর সময় উত্তরাইয়া গিয়াছে?

মৃগাঙ্কমোহনের বয়স বেশী হয় নাই, কিন্তু ইহারই ভিতর তিনি অনেকখানি যেন বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। পাশের গ্রামের জমিদারী সেরেস্তায় তিনি কাজ করেন, ইহা তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসা, তাঁহার বাবাও এই কাজই করিতেন। কিন্তু ঐ যে যাইতে-আসিতে ক্রোশ দুই-আড়াই হাঁটিতে

আর কাশি সুরু হইতে-না-হইতে হাঁপানি। চিকিৎসা বিশেষ কিছু করানো হয় নাই, পাড়াগাঁয়ে তেমন ডাক্তারই বা কোথায়? আর ডাক্তারী চিকিৎসায় এ সনাতনরোগ সারিবে কেন? মৃগাঙ্কের দিদিমা কোনও এক মহাপুরুষের নিকট একটি মাদুলি পাইয়া জীবনের শেষ কয়েকটা বৎসর একটু স্বস্তিতে ছিলেন। মৃগাঙ্কেরও ইচ্ছা সেই মাদুলি একটি যোগাড় করা, কিন্তু সময়াভাবে এখনও তিনি গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন নাই। যাতায়াতের খরচ যোগাড় করাও কঠিন। তরিতরকারি, ধান, দুধ, কিছুই পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না বলিয়া, এখনও হাঁড়ি চড়ায় ব্যাঘাত হয় না, না হইলে ত মাসের সাতটা দিন যাইতে-না-যাইতেই নগদ পয়সা ঘরে একটিও থাকে না। যাহাই প্রয়োজন তাহা হয় ধান দিয়া কিনিতে হয়, নয় ধারে কিনিতে হয়। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা গ্রামের ভিতরেই চলে, গ্রামের বাহিরে চলে না। ধান কেহ লয় না, আর অচেনা মানুষকে ধারও কেহ দেয় না।

উঠানের এক কোণে দরমার বেড়া আর টিনের সাহায্যে ছোট একখানি স্নানের ঘর তৈয়ারি হইয়াছে। কর্ত্তা এখন এখানেই স্নান করেন। খুব গরমের দিনে, খটখটে রৌদ্র থাকিলে পুকুরে স্নান করিতে যান। আজন্ম যাহাদের পুকুরে স্নান অভ্যাস তাহাদের এই তোলা জলে স্নান করিয়া একেবারে আরাম হয় না। কিন্তু রোগের ভয়ে এখন মৃগাঙ্ককে এই ব্যাপারটি মানিয়া লইতে হইয়াছে।

ইহার পর খাইয়া কর্ম্মস্থানে যাওয়া। এতটা হাঁটিতেও এখন ভাল লাগে না। দু-একজন সাইকেলে যায়, কিন্তু বুড়াবয়সে ওসব অভ্যাস নূতন করিয়া অর্জ্জন করাও শক্ত। কাজেই একটু সকাল সকাল বাহির হইয়া, আস্তে আস্তে হাঁটিয়াই তাঁহাকে যাইতে হয়।

স্নান করিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে মৃগাঙ্ক রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ভাত দাও গো।"

প্রিয়বালা তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া ঠাঁই করিলেন, চুমকি ঘটিতে এক ঘটি জল গড়াইয়া রাখিলেন। তাহার পর মস্তবড় কানা-উঁচু কাঁসার থালে ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভাত, কড়াইয়ের ডাল, আলু বেগুন ভাতে, আর পোস্ত-চচ্চড়ি। মাছ সব দিন জুটে না, অন্ততঃ এত সকাল আসে না।

মৃগাঙ্ক খাইতে খাইতে বলিলেন, "বেশ শীত প'ড়ে গেল।"

প্রিয়বালা সিধুকে কোলে করিয়া সামনে আসিয়া বসিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী সুরু করিলেন। তাঁহার একখানা র‍্যাপার না হইলে চলে না, সকালে উঠিয়া শীতে যেন হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে চায়। ছেলেমেয়েগুলারও গরম জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এ বছর আর উহাতে চলিবে না।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "বুঝি ত সবই। কিন্তু পয়সা কোথা?"

প্রিয়বালা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "মাইনা পেলেই মুঠা ক'রে কলকাতায় চালান দিবে ত পয়সা থাকবে কি ক'রে?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন,"সেটা বানের জলে ভেসে ত আসে নি? সেও সন্তান। তাকে খরচ দিতে হবে না?"

প্রিয়বালার তরকারি পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই উত্তর না দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া উনানের কাছে চলিয়া গেলেন। বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। সন্তান কি সেই সতীনের বেটীই, আর প্রিয়বালার ছেলেমেয়েরাই কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? তবে এমন ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তিনি বিবির মত চেয়ারে বসিয়া পাসের পড়া পড়িবেন, জুতা মোজা পরিয়া খট্ খট্ করিয়া বেড়াইবেন, আর এগুলি দারুণ শীতের দিন বুকে হাঁটু দিয়া কাটাইবে? কেন শুনি? অবস্থা মত ব্যবস্থা করিলেই ত হয়। ধাড়ী মেয়ে, বিবাহ দিলে এত দিনে ছেলের মা হইত। তাহার অত পড়ার সখ কেন? সে কি খ্রীষ্টানের মেয়ে না ব্রাহ্মের মেয়ে? তাহার মা ক'টা পাস দিয়াছিল? যেমন অবস্থা তেমন দেখিয়া বিবাহ দিয়া দিলেই ত এ আপদ্ ঘাড় হইতে নামিয়া যায়? মায়ের গহনাগাঁটি আছে, মামার অবস্থা ভাল, সেও কিছু সাহায্য করে। তা প্রিয়বালা বলিবেন কাকে? ঘটে কি মানুষের বুদ্ধি কিছু আছে। মৃণালের কথা উঠিলে তাহার যেন দুই কান কালা হইয়া যায়, কোনও কথাই আর সে শুনিতে পায় না।

মৃগাঙ্কমোহনের কালা সাজা ছাড়া উপায় কি? এ-বিষয়ে প্রিয়বালার সহিত বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইলে একদিনে শেষ

হইবে না। মৃণালকে তিনি ক'টা টাকা দিয়াই পিতৃত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন, সেই ক'টাতে তাহার চলে কিনা সে খোঁজও তিনি করিতে যান না। বাদবাকী যা লাগে মৃণাল মামামামীর কাছেই চাহিয়া লয়। এটুকুও যদি না করেন, তাহা হইলে মৃগাঙ্কমোহন জনসমাজে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? প্রিয়বালারও সে হতভাগী সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের কোনও বালাই নাই, তিনি চীৎকার করিয়াই খালাস।

সুতরাং রান্নাঘরে বসিয়া প্রিয়বালার অমন চোখা-চোখা স্বগতোক্তি সব উপেক্ষা করিয়া তিনি ভাত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন। কাছারি যাইবার ফরসা জামা-কাপড় দড়ির আলনায় ঝুলানো থাকে, তাহা পাড়িয়া, বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পরিধান করিলেন, এবং জীর্ণ ছাতাটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ছোট ছেলেমেয়ে গোটা দুই-তিন, খানিক পথ তাঁহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চলিল, তাহার পর ফিরিয়া গেল।

প্রিয়বালা রান্না শেষ করিয়া টেঁপী, ক্ষেপীকে, আর ছোট ছেলে দুইটাকে লইয়া স্নান করিতে চলিলেন। এই ফাঁকে কাপড়চোপড়, কাঁথা, প্রভৃতি যাহা কাচিবার তাহা কাচিয়াও আনিবেন। সময় খানিকটা যাইবে। এতক্ষণ বাড়ী একলা ফেলিয়া যাওয়া যায় না, কাজেই বুলু বাড়ী আগলাইয়া রহিল। মা ফিরিলে পর সে যাইবে।

সকলের স্নান খাওয়া সারিতে সারিতে একটা-দেড়টা বাজিয়া যায়, তাহার পর দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া প্রিয়বালা একটু গড়াইয়া নেন। গড়াইতে গড়াইতে ঘুম আসিয়া যায়। রোদ দাওয়ার কোল হইতে নামিয়া গেলে একটু শীত-শীত করে, তাহাতেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। ছেলেটাকে কাঁথা চাপা দিয়া উঠিয়া পড়েন। আবার বিকালের পাট সারিতে হইবে ত?

বিকালে রান্না বড় বেশী করিতে হয় না। ওবেলার ডাল-তরকারি সবই থাকে, শুধু কোনওমতে এক হাঁড়ি ভাত নামাইয়া নেওয়া। নেহাৎ অবেলায় মাছ-টাছ আসিয়া পড়িলে অন্য কথা। তাহা না হইলে শীত গ্রীষ্ম বারো মাস এই নিয়মেই প্রিয়বালার সংসার চলে।

(৬)

আবার বৎসর ঘুরিয়া পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। আর তিন-চার দিন পরেই স্কুল বন্ধ হইবে। মৃণালের এবার পরীক্ষার বৎসর, ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই টেষ্ট্ দিতে হইবে। এবার ছুটিতে সে বাড়ী যাইবে কি না তাহা এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। পড়াশুনা অনেক বাকী, মামার বাড়ীতে ছেলেপিলের গোলমালে পড়িবার সুবিধা মোটেই হয় না। বাড়ীর ভিতর জায়গা এমন নাই যে নিরিবিলি বসিয়া সে পাঠচর্চ্চা করিবে। চিনি, টিনি আর কানু ত দিদি বাড়ী গেলে তাহার আঁচল ছাড়িয়া এক দণ্ড নড়িতে চায় না, তাহাদিগকে মৃণাল ঠেকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? বাড়ীর বাহিরে জায়গার অভাব নাই, কিন্তু পড়ায় মন বসে কই? পল্লীগ্রামের সুনীল উদার আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠ, ঘন নীল গাছের সারি মৃণালের মনকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, হাতের বই কখন্ হাত হইতে খসিয়া কোলে লুটাইয়া পড়ে তাহা সে জানিতেও পারে না। এমনভাবে পড়া করিলে টেষ্টে তাহার উত্তীর্ণ হওয়া শক্ত। বয়স্ তাহার এমনিই সতর বৎসর হইতে চলিল, এখনও যদি ম্যাটিক দিতে না পারে ত কবে পারিবে? আর বাবাই বা আর কতদিন তাহাকে খরচ দিবেন তাহাই বা কে বলিতে পারে। হাঁপানির অসুখ বাড়িয়া তিনি ত ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। জমিদারী-সেরেস্তার কাজটি যদি যায়, তাহা হইলে অতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া অর্দ্ধেক দিন তাঁহাকে না খাইয়াই কাটাইতে হইবে, তখন কি আর তিনি মৃণালকে পড়াইবার টাকা দিতে পারিবেন? মামাবাবুর অবস্থা পাড়াগাঁয়ের হিসাবে সচ্ছল হইলেও এতটা নগদ টাকা তাঁহার নাই যে মাসে মাসে অতগুলি টাকা মৃণালকে পাঠাইতে পারেন। আর কেনই বা পাঠাইবেন? মৃণালের স্কুলে পড়া তাঁহারা মোটে পছন্দই করেন না, মামীমার ত ইহাতে ঘোর আপত্তি। মৃণাল এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকায় পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে তাঁহাকে নানা রকম কথা শুনিতে হয়। এখন মধ্যে মধ্যে মৃগাঙ্কের কাছে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্য। মল্লিক-মহাশয় যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

মৃণালের মায়েরও গহনাগাঁটি কিছু কিছু আছে। বেশী উঁচু নজর না করিয়া, যেমন মানুষ তেমন জামাই দেখিয়া যদি দিতে রাজী থাকেন ত মৃণালের বিবাহ সহজেই হইয়া যায়। মেয়ে দেখিতে সুশ্রী, ঘরও ভাল। মৃগাঙ্ক হঁ-না কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলেন না। এই আজন্ম-পল্লীবাসী মানুষটির মনে মেয়েকে উচ্চশিক্ষিতা করিবার এমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার কেন যে আবির্ভাব ঘটিল তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। মোটের উপর বুঝা যায়, মৃণালের স্কুলের পড়াটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষাই করিবেন। মৃণাল ইহাতে খানিক আশ্বাস পায়, কিন্তু মামা-মামীর ভাব দেখিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভয় হয় যে পাছে তাঁহারা মৃণালের বাবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহার বিবাহ দিয়া দেন।

বোর্ডিঙের মেয়ে দুই-একটি ইহারই মধ্যে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুবিধামত সঙ্গী পাইলে দুই-চার দিন আগে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি সহজেই মিলে। মৃণালেরও এক দূরসম্পর্কের মেসোমশায় দুই দিন পরে তাহার মামার বাড়ীর গ্রামে যাইতেছেন। মৃণাল ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে। কিন্তু যাইবে কি? একটা মাস একেবারেই কি নষ্ট হইবে না? যাওয়া কি তাহার উচিত? কিন্তু না-যাইতে পারিলেও প্রাণ তাহার একেবারে অস্থির হইয়া উঠিবে। নির্জ্জন সঙ্গীহীন বোর্ডিঙে দিন তাহার কাটিবে কেমন করিয়া? তাহার ক্লাসের মেয়েরা প্রায় সকলেই চলিয়া যাইবে।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। আজ শনিবার, স্কুল মাত্র তিন ঘণ্টা হয়, অনেক আগেই ছুটি হইয়া গিয়াছে। চুল বাঁধিয়া, কাপড় বদলাইয়া, মৃণাল বোর্ডিঙের লনে বেড়াইতে চলিল, এমন সময় মাঝপথে দরোয়ান আসিয়া একখানা স্লেট তাহার চোখের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল। তাহার সেই মেসোমশায় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মৃণাল আবার ঘুরিয়া স্কুলবাড়ীর দিকে চলিল।

ছোট্ট একখানি ঘর, মাঝে একটা চৌকো টেবিল, তিন দিকে তিনখানা চেয়ার। ইহার বেশী আস্‌বাব এ-ঘরে ধরে না। মৃণাল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনার পরশু যাওয়াই ঠিক না-কি মেসোমশায়?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হ্যাঁ। তুমি যাবে নাকি তাই জানতে এলাম।"

মৃণাল আর কিছু না ভাবিয়া-চিন্তিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "হ্যাঁ, যাব।" বলিয়াই তাহার নিজেরই অবাক্ লাগিয়া গেল। এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত তাহার মন যাওয়া-না-যাওয়ার মধ্যে দোলা খাইতেছিল। যাক্, মুখ দিয়া কথাটা যখন বাহির হইয়াই গিয়াছে, তখন যাওয়াই ঠিক।

তাহার মেসোমশায় বলিলেন, "তাহলে সকাল সাড়ে-আটটার মধ্যে তৈরি থেকো, আমি একেবারে গাড়ী নিয়েই আসব। পার ত কিছু খেয়ে নিও, পৌঁছতে সেই ত বেলা গড়িয়ে যাবে।"

মৃণাল বলিল, "আচ্ছা, যদি পেতে পাই ত খেয়েই নেব, না-হলেও ভাবনা নেই, তিনটের সময় বাড়ী গিয়েই খাওয়া যাবে।"

তাহার মেসোমশায় চলিয়া গেলে মৃণাল আবার সঙ্গিনীদের মধ্যে গিয়া জুটিল। প্রমীলাকে বলিল, "বাড়ী যাওয়াই ঠিক ক'রে এলাম রে।"

প্রমীলা বলিল, "বেশ করেছিস্, এক মাস ধ'রে মামা-মামীর আদর হাঁ ক'রে গিলে, টেঁষ্টে গোল্লা পাস্ এখন।"

মৃণাল বলিল, "না, এবার পড়াশুনো একটু একটু করতে চেষ্টা করব।"

মাঝের দিন দুইটা কাটিতেই যেন চায় না। মৃণাল পারিলে ঘণ্টাগুলিকে ঠেলা মারিয়া পার করিয়া দেয়। সুখের ক্ষণগুলি যেন হাওয়ায় উড়িয়া চলে আর অন্য সময় তাহাদের গতি কি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়? ক্রমাগত ঘড়ি দেখিতে দেখিতে মৃণালের চোখ যেন টাটাইতে থাকে।

যাইবার আগের দিনটায় তবু জিনিষপত্র গুছাইবার কাজে সময়টা কিছু তাড়াতাড়ি কাটিল। রাত্রে বোর্ডিঙের মেট্রনের কাছে গিয়া মৃণাল বলিল, "মাসীমা, কাল সকালের ট্রেনে আমি যাচ্ছি, ভাত তখন হবে কি?"

মাসীমা বলিলেন, "আলুভাতে ভাত হবে আর কি? অত সকালে ত আর মাছ-মাংস হ'তে পারে না?"

আলুভাতে ভাত পাইলেই ঢের হয়। মাছ-মাংস

যে জুটিবে না, তাহা মৃণালের জানিতে বাকী নাই। ইহা ত আর তাহার মামার বাড়ী নয় যে যাত্রার আগে তাহাকে মাছ-ভাত খাওয়াইবার জন্য সকাল হইতে সকলে উঠিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকিবে?

বাক্সটা গুছাইয়া রাখিয়া সে শুইতে চলিয়া গেল। বিছানা সকালে উঠিয়া বাঁধিলেই চলিবে। আর ত বিশেষ কিছু তাহার গুছাইবার নাই?

সকালে উঠিয়া প্রথমেই সে স্নান করিয়া ফেলিল। তাহার পর বাকী জিনিষপত্র বিছানার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বিছানাটাও বাঁধিয়া ফেলিল। ভিজা চুল বাঁধিলে তাহার মাথা ধরে, তাই আজ মৃণাল চুল না ভিজাইয়াই স্নান করিয়াছে। সারা পথ ত এতখানি চুল ঝুলাইয়া যাওয়া যায় না? কাপড়চোপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়া সে খাইতে গেল।

মেট্রন বলিয়াছিলেন মৃণাল শুধু আলুভাতে ভাত খাইতে পাইবে, কিন্তু সে এক বাটি ডাল, এবং একটু দইও তাহার সঙ্গে পাইল। বোর্ডিঙের এই মাসীমাটি স্বভাবে অতিশয় রুক্ষ, কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি গুপ্ত স্নেহের স্রোত যে তাঁহার মধ্যেও প্রবাহিত, তাহার পরিচয় মেয়েরা যখন-তখন পাইয়া থাকে।

খাইয়া উঠিয়া বার দুই-চার ঘড়ি দেখিবার পরই মৃণালের মেসোমশায় গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ এবং সঙ্গিনীদের কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দরোয়ান তাহার বাক্স-বিছানা গাড়ীর উপর তুলিয়া দিল।

কলিকাতার রাস্তার দিকে তাকাইলে মন ভরিয়া উঠে না, কিন্তু না তাকাইয়াও মৃণাল থাকিতে পারে না। ইহার কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। এত বিচিত্র লোকের মেলা আর কোথাও দেখা যায় কি? ষ্টেশনেও দেখা যায় সেই ভিড়, সেই কোলাহল, সেই প্রচণ্ড ব্যস্ততা। পৃথিবীতে এত মানুষ যে আছে, কলিকাতায় আসিবার আগে মৃণালের তাহা ধারণাই ছিল না।

ষ্টেশনে সেদিন যেন মানুষের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কি তার তুমুল কলরব, কি তার আস্ফালন। মৃণালের ভয় করিতে লাগিল। এই ভীষণ ঘূর্ণির মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া যাইবে না ত?

মেসোমশায় মুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া বলিলেন, "সাবধানে আমার পিছন পিছন এস, যা ভয়ানক ভিড় হয়েছে, আজ গাড়ীতে জায়গা পেলে হয়। ভাগ্যে কাল টিকিটটা ক'রে রেখেছিলাম।"

মৃণাল অসংখ্য মানুষের গুঁতা খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেসোমশায়ের সঙ্গে চলে, মাঝে মাঝে পিছাইয়া পড়ে। তখন ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা গুরুগুর্ করিয়া উঠে। আর যদি উহাদের সঙ্গ ধরিতে না পারে? তখনই আবার দূরে জনসমুদ্রের মাথার উপর ভাসিয়া উঠে মুটের মাথায় তাহার নীল ডোরাকাটা ট্রাঙ্কের মূর্ত্তি, মেসোমশায়ের কাঁচা-পাকা মাথাটাও কাছাকাছিই দেখা যায়। খানিক নিজের চেষ্টায়, খানিক পিছনের লোকের ঠেলায় মৃণাল অগ্রসর হইয়া যায়। লোহার গেটটা পার হইয়া, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া তবে মৃণাল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এখানে এতটা মারামারি ঠেলাঠেলি নাই।

মেসোমশায় জিজ্ঞাসা করেন, "আমার সঙ্গেই উঠবে, না মেয়েদের গাড়ীতেই যাবে?"

মেয়েদের গাড়ীই ভাল। পুরুষ-যাত্রীদের সঙ্গে যাইতে হইলে মৃণালের অস্বস্তির সীমা থাকে না। একে ত এক পাল অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে অতক্ষণ বসিয়া থাকিতেই তাহার দেহমন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠে, তাহার উপর জলটুকু খাইতে সুদ্ধ তাহার সঙ্কোচ লাগে, একটু পা বদলাইয়া বসিতে পর্য্যন্ত লজ্জা করিতে থাকে। গাড়ীতে উৎপাতেরও অন্ত নাই, তামাক খাওয়া, সিগারেট খাওয়া লাগিয়াই থাকে, গন্ধে মৃণালের মাথা ধরিয়া উঠে। তাহার উপর ক্যান্‌ভাসারের উপদ্রব, ভিখারীর উৎপাত, ইহার হাত হইতেও নিষ্কৃতি নাই। ভিড়ও এই গাড়ী-গুলিতেই হয় বেশী। আজকাল কিসের ভয়ে জানি না, কোনও মেয়েই প্রায় মেয়ের গাড়ীতে উঠিতে চায় না, আণ্ডাবাচ্চা পোঁটলাপুঁটলি লইয়া সেই পুরুষদের গাড়ীতেই ভিড় করে, মেয়েদের গাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁকাই থাকিয়া যায়। কাজেই সেখানে যাওয়াই সুবিধা।

মেসোমশায় বলিলেন, "দেখ, ভয়টয় করবে না ত?"

মৃণাল বলিল, "দিনের বেলা আবার ভয় কিসের? আর সে গাড়ীতেও ত লোক থাকবে?"

মেসোমশায় তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। মেয়েদের গাড়ী একেবারে যে খালি তাহা নয়, তবে এখনও বোঝাই হইয়া উঠে নাই। জিনিষপত্র লইয়া মৃণাল তাহারই মধ্যে উঠিয়া পড়িল। একটি বেঞ্চ জুড়িয়া একটি ফিরিঙ্গী-ললনা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, অন্য যাত্রিণীদের দিকে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না, তাহা হইলে অসুবিধা ঘটিতে পারে। আর একটি বেঞ্চে দুইটি উৎকলবাসিনী বসিয়া কৌতূহলদৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছে। মৃণাল উঠিয়া মাঝের বেঞ্চটিতে গিয়া বসিয়া পড়িল, জিনিষ-গুলি বেঞ্চের তলায় ঢুকাইয়া রাখিল।

গাড়ী ছাড়িতে তখনও বেশ কিছু দেরি। বসিয়া বসিয়া জনস্রোত দেখা ভিন্ন কাজ নাই। বিরাট দানবাকৃতি ব্যাপার এই হাওড়া ষ্টেশনটা। লোকের যেন সমুদ্র, কত পথে তাহারা আসিতেছে, যাইতেছে, প্ল্যাটফর্ম্মেরও শেষ নাই, ট্রেনেরও শেষ নাই। আর এখানেই যেন একটা বাজার বসিয়া গিয়াছে; ইচ্ছা করিলে কি না এখানে পাওয়া যায়? খাইবার, পরিবার, পড়িবার, সাজিবার যাহা চাও তাহাই পাইবে, যদি পয়সা খরচ করিতে রাজী থাক। যাবতীয় রোগের ঔষধও এইখানে মেলে, যদি ক্যান্‌ভাসারগুলির কথা বিশ্বাস করিতে হয়।

যাক্, কোনওমতে আধটা ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এইবার ঘণ্টা পড়িল, ট্রেন ছাড়িবে। এখনও যাত্রীর ছুটাছুটি হুড়াহুড়ির বিরাম নাই, সৌভাগ্যক্রমে মৃণালদের গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না। কতবার সারি সারি মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে দেখা গেল, সঙ্গে আণ্ডাবাচ্চা, বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, কিন্তু ঢুকিবার বেলা তাহারা সেই পুরুষদের গাড়ীতেই ঢোকে, এদিকে আসে না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার বেঞ্চে সে একলা, সুতরাং জুতা খুলিয়া মৃণাল পা উঠাইয়া আরাম করিয়া বসিল। এখন একখানা মাসিকপত্র কি বাংলা উপন্যাস পাইলে সময়টা আরামেই কাটিত, কিন্তু মৃণাল পাঠ্য বই ছাড়া অপাঠ্য কিছুই সঙ্গে আনে নাই। সঙ্গিনী তিনটিও গল্প করিতে নিশ্চয়ই চাহিবে না। মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে মৃণালের কোনও উৎসাহ বোধ হইল না, আর উড়িষ্যাবাসিনীরা বাংলা হয়ত বুঝিতে পারিবে না। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে এবং পান-দোক্তা খাইতেই ব্যস্ত।

হাওড়া ছাড়াইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে সবুজ টোপা-পানায় ঢাকা পুকুর, বাঁশঝাড়, ভাঙাচোরা খড়ের ঘর। মাঝে মাঝে আবার শহরের জয়ধ্বজা তুলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিম্‌নি আকাশে মাথা উঁচাইয়া আছে, পাশে তাহার বড় বড় টিনের ছাউনি। শহর বা পল্লী, কোনটারই সৌন্দর্য্য এ জায়গাগুলির মধ্যে নাই। কেমন যেন নিরানন্দ, ম্লান, শ্রীহীন মূর্ত্তি, দেখিলেই মনের ভিতরটা মুষ্‌ড়াইয়া যায়। খানিক পরে পরে এক-একটা পানের বরজ চোখে পড়ে। ছোট ছোট ষ্টেশনগুলি, বেশ পুতুলখেলার ঘরের মত সুন্দর পরিপাটি, হাওড়ার আসুরিক আকৃতির পাশে বাস্তবিকই এগুলিকে খেলার ষ্টেশনই মনে হয়। বেশীর ভাগ জায়গায়ই ট্রেন দাঁড়ায় না, আবার এক-আধটায় দাঁড়ায়ও। যাত্রীরা সব চীৎকার করিয়া ডাবওয়ালাকে ডাকে, এ সব জায়গায় ডাব খুব সস্তা। মৃণালও দু-পয়সা দিয়া বড় একটা ডাব কিনিয়া খাইল।

গাড়ী আবার অগ্রসর হইয়া চলে। এইবার চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্রমেই মনোরম হইয়া আসিতেছে। আর বাঁশঝাড়, পানাপুকুর নাই, মাটির চেহারাও আর পঙ্কিল নয়। দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত, কাশবন, ছোটবড় নদী, তাহার জল স্বচ্ছ নির্ম্মল। মাঠে মাঠে গরু-মহিষ চরিতেছে, সঙ্গে রাখাল আছে-না-আছে চোখে পড়ে না।

শুধু শুধু বসিয়া বসিয়া মৃণালের চোখ ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। পা ছড়াইয়া সে বেঞ্চের উপরেই শুইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িল সে অবিলম্বেই, কিন্তু ঘুমটা তাহার খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। আর কিছুই নয়, গাড়ী রূপ-নারায়ণের ব্রিজ পার হইতেছে।

কোলাঘাটে ট্রেন পৌঁছিলেই মৃণালের মন খুশী হইয়া উঠে। সে যেন এইবার বাড়ীর গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এই স্থানটার উপর রাক্ষসী রাজধানীর যেন কোনও অধিকার নাই।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মেঘলক্ষ্মী
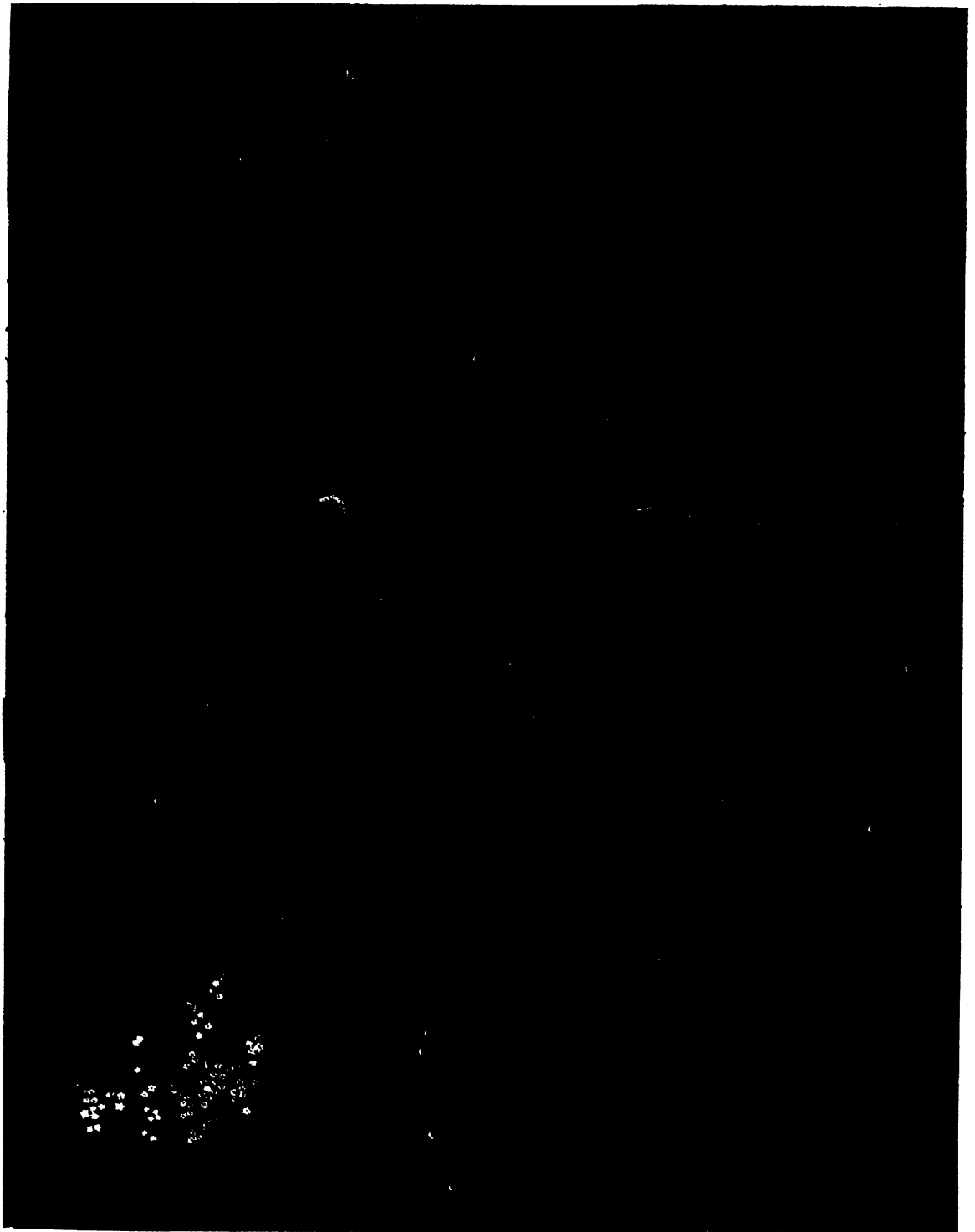
শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কয়েকটা জেলে ছুটাছুটি করিতেছে বড় বড় সদ্যধরা ইলিশ মাছ লইয়া। পাড়াগাঁয়ে সদাসর্ব্বদা এসব মাছ পাওয়া যায় না। মামীমা দেখিলে অত্যন্ত খুশী হইবেন, চিনি, টিনিও খুশী হইবে মনে করিয়া মৃণাল আট আনা পয়সা খরচ করিয়া একটা মাঝারি-গোছের মাছ কিনিয়া লইল। তাহার হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ থাকে না, না হইলে দুইটা লইতে পারিত।

আবার ট্রেন ছুটিয়া চলে। খানিক বাদে প্রকাণ্ড এক জংশন, এখানে গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। উৎকলবাসিনী দুটি এইখানে নামিয়া গেল, তাহাদের স্থানে আসিয়া বসিল একটি বাঙালী বধূ। সঙ্গে তাহার একটি শিশুকন্যা ও একটি ঝি। তরুণীটি কোনও কারণে অতিশয় চটিয়া আছে। সঙ্গের লোকদের এবং শিশুকন্যাকেও মাঝে মাঝে তাহার মেজাজের ঝাঁজ সহ্য করিতে হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মৃণাল আর তাহার সঙ্গে ভাব করিবার কোনও চেষ্টা করিল না।

গাড়ী ক্রমে মেদিনীপুর ছাড়াইয়া গেল। এইবার রাঢ়ের রাঙা মাটি আর রুক্ষ কঠিন পার্ব্বত্য শ্রী চোখে পড়িতে আরম্ভ করে। ঝোপঝাপ কমিয়া আসিতেছে, তাহার স্থান অধিকার করিতেছে শালবন। পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস দিগন্তের কোলে ফুটিয়া উঠিতেছে। মৃণালকে যেন উহা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, আগ বাড়াইয়া লইবার জন্য যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

এখান হইতে মৃণাল খালি মিনিট গুনিতে আরম্ভ করে। আর চার-পাঁচটা ষ্টেশন, তাহার পরেই মামার বাড়ীর গ্রাম। ঘর বলিতে আজ পর্য্যন্ত মৃণাল এই গ্রামটিকেই জানিয়াছে, বাপের বাড়ীর দেশের সঙ্গে তাহার মনের কোনও সম্পর্কই নাই, চোখেও সে উহা একবার মাত্র দেখিয়াছে।

সূর্য্য মাঝ আকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতেছে। খোলা জানালার পথে এক ঝলক রোদ আসিয়া মৃণালের মাথার উপর ছড়াইয়া পড়িল। সে একটু সরিয়া বসিল।

মাঝের ষ্টেশনগুলা একটা একটা করিয়া পার হইয়া গেল। ইহার পরেই তাহাকে নামিতে হইবে। সে চুল ঠিক করিয়া, পায়ে জুতা দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়া গেল। মামাবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছে।

ক্রমশঃ

বীরেশ্বর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন আমাদের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের দিন ছিল। আমরা তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। মৃত্যু যে গোপনে উৎসবের আলিঙ্গন থেকে উৎসবের কোলের একটি ছেলেকে কেড়ে নিতে এসেছিল সে সংবাদ আমার জানা ছিল না। আমাদের আশ্রম তারই অনুসরণে পাঠিয়ে দিলে আপন অনারব্ধ উৎসবকে তার জীবনান্তের শেষ ছায়ার মতো। সেদিন আমাদের বর্ষপঞ্জীর উৎসব-গণনায় একটি শূন্য চিহ্ন রয়ে গেল যেখানে ছিল বীরেশ্বরের আবাল্যকালের আসন। শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার মুখে কে একজন বললে গোঁসাইজির ঘরে দুশ্চিন্তাজনক রোগ দেখা দিয়েছে, ব্যস্ততার মুখে কথাটা ভালো ক'রে আমার কানে পৌঁছয় নি। আমি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবতে পারি নি যে বীরেশ্বরই তার লক্ষ্য।

সে ছিল মূর্তিমান প্রাণের প্রতীক, যৌবনের তেজে দীপ্ত। তাকে ভালোবেসেছে আশ্রমের সকলেই, সে ভালোবেসেছে আশ্রমকে। তার সত্তার মধ্যে এমন একটি উদ্যমের পূর্ণতা ছিল যে তাকে হারাবার কথা কল্পনাও করতে পারি নি।

অবশেষে দারুণ সংবাদ নিশ্চিত হয়ে কানে পৌঁছল— তার পর থেকে কত অর্ধরাত্রে ঘুমের ফাঁকে কত ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, কতবার দিনের বেলায় কাজের মাঝে মাঝে তার ছবি মনে অকস্মাৎ ছায়া ফেলে গেল।

সংসারে যাওয়া-আসার পথে, আলো-আঁধারের পর্যাবর্ত্তনে ভিড়ের সঙ্গে মিলে যখন মৃত্যু দেখা দেয় তখন তাকে অসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। বনে অজস্র ফুল ফোটে আর ঝরে, সেই ফোটা-ঝরার ছন্দ একসঙ্গে মেলানো। তেমনি বিরাট সংসারের মাঝখানে জীবনে মৃত্যুতে চিরদিন ধরেই তাল মিলিয়ে চলে। মৃত্যু সেখানে জীবনের ছবিতে দুঃখের দাগ কাটে, চিত্রপটকে ছিন্ন করে না। কিন্তু আশ্রমের মধ্যে সেই মৃত্যুকে আমরা তো অত সহজে মেনে নিতে পারি নে। যারা এখানে মিলেছে তারা মিলেছে পান্থশালায়, সামনে তাদের এগোবার পথ, সেই পথের পাথেয় সংগ্রহ করছে, এখানে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব নেই। এখানকার আশাপ্রত্যাশা প্রভাত-সূর্যের আলোকে দূরপ্রসারিত ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে মৃত্যু যখন আসে তখন অভাবনীয় একটা নিষ্ঠুর প্রতিবাদ নিয়ে আসে। অতি তীব্র বেদনায় অনুভব করি এখানে তার অনধিকার।

বীরেশ্বর আমাদের মধ্যে এসেছিল শিশু অবস্থায়। সমস্ত আশ্রমের সঙ্গে সে অখণ্ড হয়ে মিলেছিল, চল্‌ছিল এখানকার তরুলতা পশুপাখির অবারিত প্রাণযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিকাশের অভিমুখে; এখানকার বিচিত্র ঋতুপর্যায়ের রসধারায় তার অভিষেক হয়েছিল। কোনো দিকে সে দুর্বল ছিল না; না শরীরের দিকে, না মনের দিকে, না শ্রেয়োবুদ্ধির দিকে। নবোদিত অরুণরশ্মির মতো তার মধ্যে পুণ্যজ্যোতির আভাস দেখা দিয়েছিল, সে ছিল অকলঙ্ক।

যদি কেউ ত্যাগ বা সেবার দ্বারা জীবনের সত্য রূপ প্রকাশ করতে পারে, তবে তা আমাদের কেবল যে আনন্দ দেয় এমন নয় শক্তিও দেয়। স্বল্পকালীন জীবনমৃত্যুর পাত্রটিকে সে আপন সত্য দ্বারা পূর্ণ ক'রে গেছে। এই সত্যের সম্বন্ধের অবসান নেই। সত্য ভাবে যার কাছে সে আপনাকে নিবেদন করেছিল, বেঁচে থাকলে সেই আশ্রমের কাছে সে ফিরে আসতই।

এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী আসেন, যা লাভ করবার হয়তো তা সম্পূর্ণই লাভ করেন, এখানকার আনন্দ-উৎসবে আনন্দিত হন, কিন্তু এখানে তাঁদের আশ্রমবাস অবশেষে একদিন সমাপ্ত হয়। কিন্তু আমি অনুভব করেছি, বীরেশ্বর কেবল এখানকার দান গ্রহণ করতে আসে নি, তার মনের মধ্যে অর্ঘ্য সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, তার জীবনের নৈবেদ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এইখানকার বেদীমূলেই সমর্পিত হোত। মৃত্যুর থালায় সেই নৈবেদ্যই কি এখানে সে চিরদিনের মতো রেখে গেল।

অল্প কিছু দিনের জন্যে সংসারে আমরা আসি আর চলে যাই। বিশ্বব্যাপী মানবপ্রাণের যে জাল বোনা নিত্যই চলেছে তার মধ্যে ছোটবড় একটি ক'রে সূত্র আমরা জুড়ে দিই। তার মধ্যে অনেক আছে বর্ণ যার ম্লান, শক্তি যার দৃঢ় নয়। কিন্তু যে ভালো, যে ভালোবেসেছে, মানুষের ইতিহাসসৃষ্টির মধ্যে সে অলক্ষ্যেও সার্থক হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে এবং গেছে যাদের নাম জানি নে,মহাশিল্পীর শিল্পে চিরকালের জন্যে তারা কিছু রং লাগিয়ে গেছে। বীরেশ্বর তার সরলতা, তার নির্মলতা, তার সহৃদয়তায় আমাদের মনে যে প্রীতির উদ্রেক ক'রে গেছে তারই দ্বারা তার জীবনের শাশ্বতমূল্য আমরা মৃত্যু অতিক্রম করেও অনুভব করি।

জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে বিদ্রূপ করতে এসেছে মৃত্যু, এ কথা মনে নেয় না। বিশ্বের মধ্যে এত বড় নিরর্থকতার ব্যঙ্গ তো দেখতে পাই নে। জগৎকে তো দেখতে পাচ্ছি সে মহৎ সে সুন্দর। তার সেই মহত্ত্ব মৃত্যুকে পদে পদে মিথ্যা করে দিয়ে, অমঙ্গলকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিলীন করে দিয়ে বিরাজ করে, নইলে সে যে থাকতেই পারত না। এই জগৎ নিত্যই চলছে, কিন্তু আপনাকে তো হারাচ্ছে না। জগতের সেই স্থায়ী সত্যের দিকেই সে রয়ে গেছে, মহাকালের যাত্রাপথে ক্ষণকালের অতিথিরূপে এসে যে আমাদের স্নেহ আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছে। তাকে আমরা হারাই নি, তোমরা তার প্রিয়জন, আমরা তার গুরুজন—এই কথাই আজ অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করি।

[শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিপি। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামীর একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর শিশুকাল হইতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন ও সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনে আই. এ. পড়িতেছিলেন—সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল-উৎসবের আয়োজন বন্ধ হয়।]

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়াছিলাম।

নিকটেই একটা বাদাম-গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদাম-গাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ-খেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্ণের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা শহরের হৈচৈ কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে আরণ্যভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী শুব্ধ রাত্রি, ধূ ধূ বনঝাউ আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীলগাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন্ অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্য্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা...মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসারযাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়ত জ্যোৎস্না-ভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণের ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা...নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!...

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগণার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া-গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্যগ্রামগুলিতে...চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কি খুশীর হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরণের ভাবভঙ্গী, বছর তের-চোদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়...সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার...মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড় বড় সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট কুঁড়েঘরের ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপন মনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জী—

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্ব্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতি দরিদ্র বালকবালিকা, নরনারী, কত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বন্য শিকারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা-ঢাকা গর্ত্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

* * * *

কিন্তু আমার এ-স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা।

১

পনর-ষোল বছর আগেকার কথা। বি-এ পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরী মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেক দিন ধরিয়া আছি, তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় এক টুক্‌রা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকী, আমি যেন চাকরের হাতে অন্ততঃ দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোন জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম, পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড়রাস্তার ওপারে কলেজ হোষ্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোকে ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরীর খোঁজে হেন মার্চ্চেণ্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়লোকের বাড়ী নাই—যেখানে অন্ততঃ দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা, চাকুরী খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোষ্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্ত্তমানে সে আলিপুরের উকীল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসার-সমুদ্রে বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা ত দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যত দূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সে কথা আপাততঃ ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে কোথায় চলেছ সত্যচরণ। চল হিন্দু হোষ্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জলসা হবে—এস। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এষ্টেটের দু-একটা বাজকর্ম্ম মাঝে মাঝে করি কিনা? এস, তোমায় দেখলে সে খুশী হবে।

কলেজে পড়িবার সময় আজ পাঁচ-ছ বছর আগে আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোষ্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে। তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম—

বিকেলে জলসা হবে, তা এখন কি! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে-কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জল্‌সার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্ব্বের ছাত্রজীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে যে চাকুরী পাইলাম কি না-পাইলাম—মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্ত্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতেই বায়ুভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জল্‌সা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোষ্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, "স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত"। অবিনাশ প্রস্তাবকর্ত্তা, আমি প্রতিবাদী-পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষে তুমুল তর্কের পরে সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তাহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চল সতীশ, আমার গাড়ী রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাক?

মেসের দরজায় নামাইয়া দিয়া বলিল—শোন, পরশু হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে আমার বাড়ীতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখ ত নোট-বইয়ে?

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন ষ্ট্রীট বাহির করিলাম, সতীশের বাড়ীও বাহির করিলাম। বাড়ী খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইষ্টারিয়া লতা, নেপালী দরোয়ান ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকীর বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের লন্, অন্য ধারে বড় বড় মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ী। বড়লোকের বাড়ী নয় বলিয়া ভুল করিবার কোন দিক হইতে কোন উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথা-বার্ত্তায় আমরা দু-জনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের এক জন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কি করছ সতীশ?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাষ্টারী করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি এক রকম। ভাবছি, আর মাষ্টারী করব না। দেখছি অন্য কোন দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়-লোকের ছেলে, মস্তবড় এষ্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরীর উমেদারী করিতেছি এটা না-দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত এক জন উপযুক্ত লোকের চাকুরী পেতে দেরি হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে। তুমি ত আইনও পড়েছিলে—না?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস ক'রে অত জমির বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা এক জন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি? যে-চাকুরীর খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে আসিয়া সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরীর

প্রস্তাব আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ ত?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা এক জন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্ম্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নতুন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়। তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

২

কি করিয়া চাকুরী পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিষপত্র লইয়া বি. এন. ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট ষ্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জ্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জ্জন, যেমন নির্জ্জন এই উদাস প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনর-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলিকাতা হইতে আনীত কম্বল রাগ্ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে এত ভয়ানক শীত? সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি-লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোট বড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনর বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরি—ঘরে শুক্‌না ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন-তৈরি, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাট্‌কা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলকষ্ট নাই।

৩

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এ-সব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরীর কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জ্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্য্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না। নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি

বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্ব্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল, কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোপাল চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোপালবাবু এখানে আছেন অন্তত সতর-আঠার বছর। বর্দ্ধমান জেলায় বোনপাশ ষ্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম—বসুন, গোপাল বাবু—

গোপালবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোপাল বাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজার বাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হ'ত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে দেশে ত দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী তিন দিন থাকতে পারি নে।

গোপালবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্যে মন হাঁপায় নাকি?

গোপালবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজার বাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ু-উড়ু করছে। বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন—তার পর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশঃ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কোন্‌কালে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোপালবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা!

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশী না। এই বছর আট নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি ক'রে মেরে নিলে দেখছেই বা কে?

গোপালবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরী করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই। এ-সব বিপজ্জনক স্থান আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার ওপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্য্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্-মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার কোন্ জনহীন অরণ্যে প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরীর খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্য্যন্ত নাই। এদেশের এই সব নিতান্ত মূর্খ, বর্ব্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্য্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্ত-ব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন যেন ভয়ও হইল। তখনই সঙ্কল্প করিলাম, এ-মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তার পরে অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় সভ্য বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া বহু মানবের আনন্দ-উল্লাস-ভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্ব্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালবাসি! মানুষকে এত ভালবাসি! তাহাদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য হয়ত সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না—কিন্তু ভালবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে বই বিক্রী করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কত দিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইয়াছি—কেনা উচিত ছিল হয়ত কিন্তু কেনা হয় নাই—সেও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল—তাহাকে আজ কত দিন দেখি নাই!

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর মাহাতো আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বর মাহাতোর মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত স্বরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে-সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিষপত্র রাখা যায়, শুতে ক'রে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কত দিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরিব, একখানা কড়ার দাম ছ' আনা। অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন ক'রে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরণের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরিব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ' আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরিব। এত গরিব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই-করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর মাহাতো নওগচ্ছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেজেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা সে—কড়াইয়া হো গৈল—তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই এক মাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো। বড় কষ্ট ত এদের!

(ক্রমশঃ)

ইতালীয় বেশভূষা

আব্রুৎসি প্রদেশের পোষাক।

• মধ্য-ইতালীর পিস্তইয়ায় নৃত্যরত কৃষক-সম্প্রদায়।
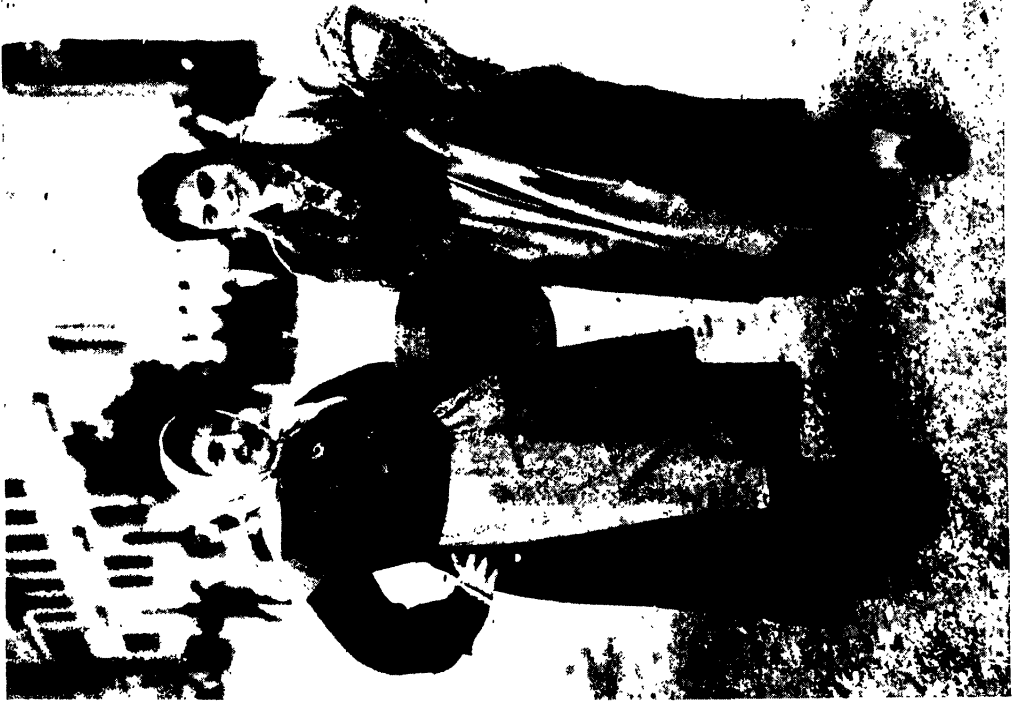
লাৎসিও প্রদেশের তিভলি অঞ্চলের পোষাক। খাঁটি লাটিন নমূনা

নেপ্‌ল্‌সের পোষাক। স্পেনীয় প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইবে।

জারাদ্বীপের পোষাক, ইস্‌লাম-সংস্কৃতির প্রভাবাপন্ন

সাভোনা অঞ্চলের পোষাকে কৃষাণ-যুবতী

উত্তর-ইতালী, স্পেৎসিয়ার কৃষাণ-যুবতীর পোষাক
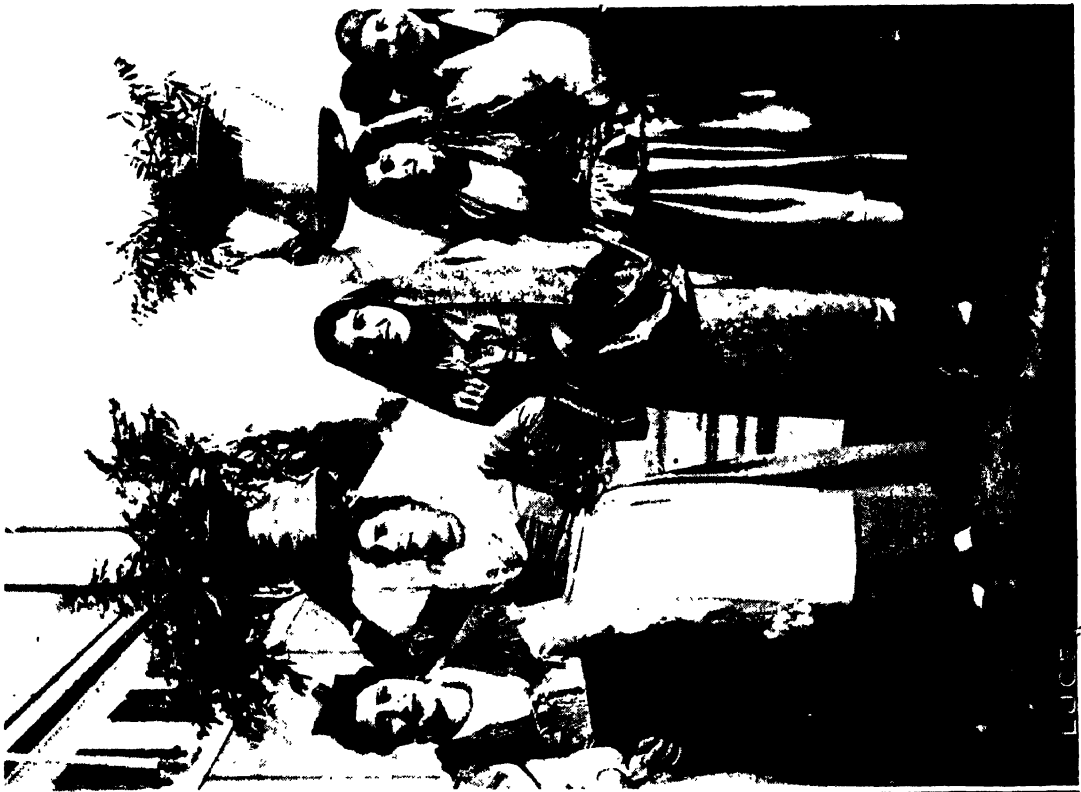
মের ফুলওয়ালীদের পোষাক

ইতালীর বেশভূষা

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি. এসসি.

ইউরোপের চর্চ্চা যেদিন থেকে আমাদের দেশে সুরু হয়েছে সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা এই মহাদেশটিকে একটা একক সত্তা হিসাবে দেখে এসেছি। ইতিহাস এবং ভূগোলের মধ্য দিয়ে, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং শিল্পের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের যে মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই তাতে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ ইউরোপের এই মূর্ত্তিটি হচ্ছে আসলে তার সভ্যতার মূর্ত্তি। এই ধারণার জোরে হিস্পান থেকে রাশিয়া পর্য্যন্ত আর গ্রীস থেকে নরওয়ে পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডকে একটি একক শিক্ষা, আচার, ধর্ম্ম এবং অনুভূতির অন্তর্গত ব'লে মনে ক'রে থাকি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই একত্ব ধোপে টেকে কি না তা নিয়ে মতদ্বৈধ হ'তে পারে, কিন্তু ইউরোপের বাইরের যা রূপ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার অন্তরের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে গোড়াতেই মনে হবে যে ইউরোপ ব'লে একক কোন একটি বস্তু নেই। ইউরোপে বৈষম্যের অন্ত নেই; প্রাকৃতিক দৃশ্যে, মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতিতে, আচারে ও ব্যবহারে, বেশে ও ভূষায়, সঙ্গীত ও শিল্পের অভিব্যক্তিতে, একটি দেশ থেকে আর একটি দেশে ত দূরের কথা, একটি জনপদ থেকে আর একটি জনপদে যা প্রভেদ দেখেছি তা আমাদের বৈষম্যময় ভারতবর্ষেও দেখতে পাই নি। প্রথমতঃ ইউরোপে কতকগুলো জাতিগত, ভাষাগত বৈষম্য আছে যা ইতিহাস-চর্চ্চার মধ্য দিয়ে ততটা ধরা পড়ে না যতটা পড়ে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে। এক জন ইতালীয়ান আর জার্ম্মানে যা বৈষম্য, এক জন ফরাসী আর ইংরেজে যা বৈষম্য, কিংবা এক জন ওলন্দাজ আর রাশিয়ানে যা বৈষম্য তা আমাদের মাদ্রাজী এবং পাঞ্জাবীর মধ্যে যে প্রভেদ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। ভাষার ব্যাপারেও এই বৈষম্য গভীর ভাবে বিদ্যমান। শুধু এক দেশ থেকে আর এক দেশে নয়, এক দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভাষা এবং উপভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দক্ষিণ-আল্‌প্‌সের টিরোলে একটি উপত্যকা থেকে আর একটি উপত্যকায় ভাষার বৈষম্য লক্ষ্য করেছি। ইতালীর দক্ষিণ ও উত্তর সীমান্তের মধ্যে ভাষার ততখানি বৈষম্য যতখানি আমাদের চট্টগ্রাম এবং বীরভূমের মধ্যে, অথচ ওটাও ইতালীয়ান আর এটাও বাংলা। জার্ম্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর সুইটজারল্যাণ্ডের ত কথাই নেই, এদের বিভিন্ন অঞ্চলেও ভাষার অথবা উপভাষার একই বৈষম্য দেখেছি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রাশিয়া-বিহীন ইউরোপ আয়তনে যদি ভারতবর্ষের সমান হয় তবে আমাদের জাতি-বৈষম্য কিংবা ভাষা-বৈষম্য ওদের অনুপাতে মোটেই বেশী নয়। কিন্তু সেজন্য একথা বলছি না যে, বৈষম্য থাকাটা উচিত নয়; বস্তুতঃ বৈষম্যটাই হচ্ছে আসল সমৃদ্ধি। ভেবে দেখুন, বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা না-থেকে যদি খালি একটি মাত্র সাধু ভাষার প্রচলন থাকত তাহলে বাংলা ভাষা আজ যা আছে, তার চেয়ে কম সমৃদ্ধিশালী হ'ত না-কি? এমনি ক'রে বৈষম্যের মধ্য দিয়েই দেশের একটি কেন্দ্রীয় সভ্যতা, ভাষা আরও পুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ভাষার ব্যাপারে, বেশভূষার ব্যাপারেও তাই। ইউরোপের প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা বেশভূষা আছে। প্রত্যেক দেশের মধ্যে আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বেশভূষার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। খালি পরার ঢঙে নয়, বর্ণসমন্বয়ের রুচিতেও কারও সঙ্গে কারুর মিল নেই। কিন্তু সেখানেই তার সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধি। আজ বাঙালী, মরাঠী, গুজরাটি এবং মাড়োয়ারীদের বেশভূষা যদি একই রকম হ'ত, তাহলে ভারতীয় বেশভূষায় অনেক সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি আমরা পেতাম না।

যন্ত্র-যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সাম্যবাদের

অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এ-সব সংস্কারগত বৈষম্যের একটি জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল। যে-দেশের অতীত আছে, ইতিহাস আছে, সংস্কার আছে তারই আছে লোক-সংস্কৃতিতে বৈষম্য-সম্পদ।

আমেরিকায় এজন্যে লোকের আচারগত বেশভূষাগত পার্থক্য খুব কম। আমেরিকার শুধু দীর্ঘ অতীত নেই ব'লে নয়, ও-দেশটায় গণতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আছে বলে। শৈশবের দোলনা থেকে মৃত্যুর শবাধার পর্য্যন্ত এক-ছাঁচে-ঢালা মানবজাতি যাতে তৈরি করা যায় এই আদর্শবাদেই চলেছিল আমেরিকার সভ্যতা, স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। ফলে হয়েছে এই যে ইউরোপে যেমন যন্ত্র-যুগ এবং সাম্যবাদের মধ্য দিয়েও সব জাতগুলো নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে আমেরিকা তা পারে নি। এজন্যে আমেরিকাতে না-আছে লোক-নৃত্য আর না-আছে লোক-সাহিত্য কিংবা লোক-ভূষণ; তাই যখন একটি রাশিয়ান্ ব্যালে কিংবা উদয়শঙ্কর গিয়ে উপস্থিত হয় নিউ ইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে, তখন একঘেয়েমি-লাঞ্ছিত ইয়াঙ্কি-প্রাণ ছুটি নিতে পাগল হয় বিদেশীর প্রাণস্পর্শে। আজকাল প্রতি বৎসর ইউরোপ থেকে যত আর্টিষ্ট যাচ্ছেন আমেরিকায় তাঁদের লোক-নৃত্য দেখাতে, এত আর কোন দেশে যাচ্ছে না কেউ। ইউরোপের প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে একটি সংস্কারবদ্ধ প্রাণ আছে তার আর একটি প্রমাণও এই যে সাম্যবাদী সকল প্রকার আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েও তাদের আপন আপন সভ্যতার আদর্শকে হারায় নি। বিশেষতঃ, গত মহাযুদ্ধের পর যে কয়টি নূতন জাতীয়তাবাদী মহাশক্তি ইউরোপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে তাদের প্রধান প্রেরণাই হচ্ছে নিজেদের সংস্কার এবং সভ্যতাকে সাম্যবাদের ধ্বংসমুখী প্লাবন থেকে রক্ষা করা। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ আমার আলোচ্য বিষয় নয়, তবুও কি ক'রে আধুনিক সময়ে ইউরোপে লোক-সাহিত্য, লোক-নৃত্য এবং লোক-ভূষণের উদ্ধার ও পরিপুষ্টি সাধন হচ্ছে তার একটা রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, এ জিনিষটা আরম্ভ হয়েছিল দু-একটি মাত্র দেশে, এখন সর্ব্বত্রই ছেয়ে গেছে। জার্ম্মানী, ইতালী, হাঙ্গেরী, সুইটজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড ইত্যাদি সর্ব্বত্রই লোক-সংস্কৃতির চর্চ্চা দেখে এসেছি। হাঙ্গেরীর এবং নরওয়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। হাঙ্গেরীতে অবশ্য লোক-সংস্কৃতির চর্চ্চার জন্য বিপুল আয়োজন দেখে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, এমন কি দেব্রেৎসেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক-সংস্কৃতির জন্য আলাদা একটি ফ্যাকাল্‌টির পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ওস্‌লোর লোক-সংস্কৃতির মিউজিয়মের মত দ্বিতীয় কোন অনুষ্ঠান, বিশেষজ্ঞতার দিক থেকেই হোক আর পরিপূর্ণতার দিক থেকেই হোক, ইউরোপের অন্য কোথাও দেখি নি।

ইতালীতেও লোক-নৃত্য, লোক-ভূষণ ইত্যাদি জিনিষগুলোকে আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিপুষ্ট করবার খুব চেষ্টা চলেছে। কয়েক বছর আগে ইতালীর বর্ত্তমান যুবরাজের যখন বিয়ে হয় তখন ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের বেশভূষার শোভাযাত্রা করবার জন্যে সেই সব অঞ্চল থেকে অনেক লোক রোমে আনা হয়েছিল। এ প্রবন্ধের সঙ্গে যে ছবি কয়টি ছাপা হ'ল সেগুলো সে-সময়েরই তোলা। দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলের পোষাক-পরিচ্ছদ অতীতের কোন এক সময়ে কতখানি পৃথক ছিল; অথচ প্রত্যেকটিরই একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই বেশ-ভূষাগুলোর বিশেষ কোন গম্ভীর ব্যাখ্যা দিতে চাই না; তবে এটুকু ব'লে রাখা ভাল যে ইতালীয়ান জাতটা খুব মিশ্রিত জাত। বিভিন্ন দেশের হাওয়া এবং আচার-ব্যবহার ইতালীর গায়ে এসে লেগেছে—যেমন এসে লেগেছে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম ক'রে, তেমন লেগেছে আল্‌প্‌সের তুষার-বন্ধন ভেদ করে। অন্য দিকে আবার তুর্কী, মুসলমান আর হাঙ্গেরিয়ান্ রীতিনীতিও কিছু কিছু মিশে গেছে ইতালীর বহিরঙ্গে। তার প্রমাণ বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাবে এই অল্প কয়েকটি বেশভূষার উদাহরণের মধ্যে।

কাব্যের মূলতত্ত্ব

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

টিফিন-পিরিয়ডের ঘণ্টাখানেক পরে বাংলার পণ্ডিত দেবকণ্ঠ বাবু অসুস্থ হইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

একেবারে অভাবনীয় সৌভাগ্য। সেকেণ্ড পণ্ডিতের কোষ্ঠীতে যে আবার অসুখে-পড়া লেখা আছে, যত দূর মনে পড়ে সাত-আট বৎসরের পাঠ্য-জীবনে এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। তাও এমন সুবিবেচনার সহিত অসুখে পড়া যে মনটা আপনি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া পড়ে। আজ সপ্তম ঘণ্টা অর্থাৎ শেষ ঘণ্টা ছুটি,—হেডপণ্ডিত মহাশয়ের অ্যাডিশন্যাল্ ক্লাস, তিনি বোসপাড়ায় শ্রাদ্ধ করাইতে গিয়াছেন। এখন দুইটি ঘণ্টা একসঙ্গে ছুটি পাওয়া যাইবে। সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের এই একটি দিনের সুবিবেচনার জন্য আমাদের বরাবরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল।

পঞ্চম ঘণ্টার পরে আমরা সব ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেরা মুখ যতদূর সম্ভব বিষণ্ণ করিয়া আপিস-ঘরে হেডমাষ্টারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুখপাত্র হিসাবে আমি মুখটা যতটা পারা গেল অন্ধকার করিয়া বলিলাম, "স্যার, সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাস...।"

"হ্যাঁ, ঠিক, মনেই ছিল না; কখনও তো পড়েন না ভদ্রলোক অসুখে কিনা...তাই তো। আবার হেডপণ্ডিত মহাশয়ও গরহাজির, তিনি থাকলেও বা তোমাদের বাংলাটা পড়িয়ে দিতে পারতেন।"

হেডমাষ্টার মহাশয়ের দুশ্চিন্তায় আমরা মুখটা আরও বিষণ্ণ করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার নিজের মুখের কথা বলিতে পারি না, তবে দেখিলাম এইরূপ অমানুষিক চেষ্টার ফলে, কৃত্রিম বিষণ্ণতার পাশে ভিতরের অকৃত্রিম পুলক ঠেলা মারিয়া আসিয়া, হরার মুখটা এমন বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে দেখিলে না-হাসিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়ে। বিলাস ত বাংলার শোকে ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসই ফেলিয়া বসিল। ওর নিয়ম, সকলে কি করে সেটা প্রথমে লক্ষ্য করিবে, তাহার পর সকলের উপর টেক্কা দিয়া একটা কিছু করিবে।

ঘরে বসিয়াছিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার, মৌলবী সাহেব আর কেরানী অটল বাবু। হেডমাষ্টার বলিলেন, "অটলবাবু, তা'হলে আপনিই না হয়...।"

"আমায়ই যেতে হবে?" বলিয়া দলটির পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাঁহার চোখ পড়িল হেডমাষ্টারের চেয়ারের পিছনে বলাইয়ের উপর; সে প্রবল মিনতির সঙ্কেতস্বরূপ কোলের কাছে হাত দুইটি একত্র করিয়া ঘষিতেছে।

অটলবাবু ঠোঁটে একটা হাসি চাপিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "যেতে আপত্তি নেই, তবে মাইনের বিলটা তা'হলে কাল তোয়ের হওয়া মুস্কিল বড্ড কাটাকাটি কিনা এ-মাসে..."

হেডমাষ্টার ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, তবে থাক, পরশু ইনস্‌পেক্‌টার আসবে, ঠিক সময় মাইনে পাই নি সব দেখলে আবার..."

অটলবাবু একবার বলাইয়ের দিকে চাহিলেন, সে সঙ্গোপনে অঞ্জলিবদ্ধ হাতটা তুলিয়া, আর ওদিকে মাথাটা একটু নামাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

হেডমাষ্টার বলিলেন, "তবে আর উপায় কি? তোমরা যাও। ছুটি তো খোঁজোই সব। একটু ক্ষতি হ'ল, তা যাক, বাংলা ত?"

অস্বাভাবিক বিষণ্ণতায় দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল যেন, ঠেলাঠেলি করিয়া দুয়ারের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছি এমন সময় বিলাস হতভাগা বাদ সাধিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধি ত হইয়াই গিয়াছে, ফাঁকতালে খানিকটা যশ অর্জ্জন করিয়া

লইবার জন্ম মুখটা আবার এক চোট বিপন্ন করিয়া লইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে বলিল, "নেহাৎ উপায় নেই তাই, নইলে বাংলা কি আর তাচ্ছিল্য করবার জো আছে স্যার? কি রকম ফেল করছে আজকাল বাংলাতে! বরং আজ হেডপণ্ডিত মশাই আসেন নি, যদি দুটো ঘণ্টাই বাংলা হ'ত···বাঙালীর ছেলে হয়ে ··"

কয়েক জন একসঙ্গে বিলাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানিলাম। সে থামিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। হেডমাষ্টার একটু চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর বলিলেন, "তা বলেছ ঠিক।·· তা'হলে?"

আমরা সবাই শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে হেডমাষ্টার হঠাৎ মাথা তুলিয়া সেকেণ্ড মাষ্টারের দিকে চাহিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ত কালীবাবু রয়েছেন। কি মশাই, আপনার মতে তো ম্যাথেমেটিক্স-জানা লোকের কিছু আটকাবার কথা নয়। দেখবেন নাকি একবার চেষ্টা ক'রে? আপনার এ-ঘণ্টা ত ফুরসৎও আছে।"

পিছনে বিলাসের চারি ধারে দাঁতে দাঁত ঘষার একটা উৎকট আওয়াজ হইল। হেডমাষ্টার মহাশয় ঘুরিয়া চাহিতেই হরা সঙ্গে সঙ্গে মুখটা প্রসন্ন করিয়া লইয়া বলিল, "তাহ'লে বেশ হয় স্যার।"

সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের চেহারাটা বেশ মনে আছে। মোটাসোটা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। দর্প, প্রসন্নতা এবং দাড়িতে ভরা মুখমণ্ডল: দেখিলে ভয়, শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া আসে। সর্ব্বদাই ভাল করিয়া কাচা এবং ইস্ত্রি-করা একটি কামিজ গায়ে। গলায় কোঁচান চাদর, দুই কাঁধের উপর দিয়া বুকের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বিশাল বক্ষটিকে আরও বিশাল বলিয়া বোধ হইত। মাষ্টার মহাশয়ের একটা অভ্যাস ছিল প্রায়ই চাদরের কোঁচান প্রান্ত দুইটি দুই হাতে মাঝামাঝি আনিয়া তাহাদের মুখ মিলাইয়া আবার ছাড়িয়া দিতেন। বোধ হয় কোন দিকে বেশী কোন দিকে কম ঝুলিয়া থাকা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। জিনিষটাকে আমরা মাষ্টার মহাশয়ের ম্যাথেমেটিক্যাল জিম্ন্যাসটিক্স্ বা অঙ্কের কসরৎ বলিতাম।

এই অঙ্কই ছিল তাঁহার দর্প।

দর্পের মূলে ছিল দুইটি কথা। এক, তাঁহার নিজের শক্তির উপর প্রবল আস্থা—অবশ্য শক্তিও ছিল অবিসংবাদিত; আর দ্বিতীয়, শাস্ত্রটার উপর তাঁহার অটুট নিষ্ঠা।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিতেন, সমস্ত সৃষ্টিটা বিধাতার কষা একটা অঙ্ক মাত্র। আমাদের ধর্ম্মে যে বলে এটা তাঁহার ধ্যানের পরিণাম একথাও যেমন ভুল, খ্রীষ্টান মতের খামখেয়ালী ইচ্ছার থিয়োরিটাও ঠিক তেমনি ভুল। তারা যে বলে—ভগবান বলিলেন জল হোক আর অমনি জল হইল, একথার কোন মানে হয় না। গণিতধর্ম্মী সৃষ্টির কোন গাণিতিক প্রয়োজনের জন্যই ভগবানকে জল সৃজন করিতে হইয়াছিল এবং তা করিতে হইয়াছিল নিখুঁৎ অঙ্কের হিসাবে যথাপরিমাণে অক্সিজেনের সহিত যথাপরিমাণ হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া। এতে যদি একটুও ভুল হইত ত ধ্যানই বল কিংবা খামখেয়ালী ইচ্ছাই বল—মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও জলের জন্ম হইত না।

সৃষ্টির মূলতত্ত্ব গণিত বলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের মতে এর সব রহস্যের কুলুপই এক গণিতের 'মাষ্টার-কী' বা রাম-চাবি দিয়া খোলা যায়। ধর্ম্ম—অঙ্ক, সঙ্গীত—অঙ্ক; ইতিহাস, দর্শন—অঙ্ক, ব্যাকরণ—অঙ্ক ··

আজ টিফিন-পিরিয়ডেই একচোট ঘোর তর্ক হইয়া গেল। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় বুকের উপর চাদরের দুই প্রান্ত মিলাইয়া ধরিয়া বলিতেছিলেন, "অঙ্কের ভিতর কি নেই মশাই? আর অঙ্কের বাইরে আছেই বা কি? নিউটন অঙ্কের একটি খুঁট ধ'রে টান দিলেন,—সামান্য একটি ফল-পড়া নিয়ে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির সারা রহস্য ফরফর ক'রে বেরিয়ে এল। আপনারা কালিদাস কালিদাস করেন, ভাবলাম একবার দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। সেদিন মেঘদূত পড়ছিলাম,—ভেবে সারা হচ্ছিলাম আপনারা ওতে ভাবে এলিয়ে পড়বার মত কি পান এত। ও ত একেবারে খাঁটি অঙ্কের হিসেব—কি রেটে গেলে, কোথায় থামলে কোন্ সময়ে কি ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে করতে যাবে তার নিক্তি দিয়ে ওজন করা হিসেব।

অ্যাল্‌জেব্রার গ্রাফের এমন সুন্দর উদাহরণ দেখাই যায় না। যক্ষরাজ যেন একটি সুন্দর টাইম-টেবিল ছকে দিয়েছে। বলুন ম্যাথেমেটিক্স নয়।···খোলের আওয়াজ একটু কানে গেলে ভাবের ঘোরে মূর্চ্ছা যান সব; বলুন ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্বটা কি? শ্রীকৃষ্ণ কড়ে আঙুল দিয়ে গোবর্দ্ধন পাহাড়টা তুলে ধরলেন,—পিওর ব্যালেন্সিং! ভার-সাম্য-তত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা। যদি রূপক হিসেবে ধরেন ত ঐ একই কথা—অর্থাৎ ম্যাথেমেটিক্স ছিল শ্রীকৃষ্ণের কড়ে আঙুলের ডগায়। আর একটু এগিয়ে যান—শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ব'লেই ধ'রে নিন,—মানেটা কি হ'ল?—এই নয় কি যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মূলশক্তি হচ্ছে ম্যাথেমেটিক্স? —সর্ব্বশক্তির গোড়ায় অঙ্ক?···সব চুপ ক'রে রইলেন যে?···

২

সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তাহ'লে সত্যিই আমায় যেতে হবে নাকি?···তবে তোমরা এগোও, আমি আসছি; হ্যাঁ, কম্পাস, চক্‌খড়ি আর আপিস থেকে গজের ফিতেটা নিয়ে যেও।"

আমরা যাইবার জন্য ঘুরিয়া আবার আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। অনাথ ভয়টা আর চাপিতে পারিল না, শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আবার অঙ্ক করাবেন নাকি স্যার?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "কেন, সাহিত্য কি অঙ্কের বাইরে?"

হতভাগা বিলাস। আমরা এদিকে দারুণ নিরাশায় মুষড়িয়া পড়িয়াছি, আর সে স্বচ্ছন্দে মুখে হাসি টানিয়া আনিতে পারিল। বলিল, "অঙ্ক আর পদ্য যে আলাদা জিনিষ আমি এই প্রথম শুনলুম স্যার। তা ছাড়া অঙ্ক আগে না পদ্য আগে?—পদ্য ত এই সেদিন বাল্মীকি এক দুই ক'রে অক্ষর গুনে গুনে রচনা করলেন।

জেঁপোমির গন্ধ ছিল বেশ একটু, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অঙ্কের পরিপোষক বলিয়া সেকেণ্ড মাষ্টার চটিলেন না; বরং হেডমাষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছন্দ যে অঙ্ক একথা ত বলেইছি আপনাকে কতবার। 'না' বলবার জো নেই।··· তোমরা চল।"

বারান্দা হইতেই একটু একটু করিয়া অসন্তোষের গুঞ্জন আরম্ভ হইল এবং সকলে ক্লাসে ঢুকিলে সেটা রীতিমত গোলমালে দাঁড়াইল। লক্ষ্য সবার একা বিলাস।— "ইডিয়ট, কে তোকে মুরুব্বিয়ানা করতে বলেছিল র‍্যা?··· ওঃ বাংলার জন্যে ওঁর প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠল!···শুভঙ্করী বাল্মীকির কত আগে র‍্যা বিলেস?···আজ ফুটবল খেলার সময় আমার সামনে একবার আসিস বিলে, সাহস থাকে ত; যেখানে শুভঙ্কর আছেন সেইখানে পাঠিয়ে দোব।··· ওর ত সময় থাকবে না, ও যে সেকেন মাষ্টারের সঙ্গে হুঁকো টানতে টানতে···"

বিলাস প্রথমটা অপরাধীর মত মুখ বুজিয়া রহিল, তাহার পর আঘাতে আঘাতে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়া উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় দুই হাতে চাদরের খুঁট মুঠো করিয়া ধরিয়া সেকেণ্ড মাষ্টার প্রবেশ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, কি আছে তোমাদের নিয়ে এস।"

বিলাস তৃতীয় বেঞ্চ হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "পদ্য, স্যার।"

হরা চাপা গলায় ব্যঙ্গকটু স্বরে বলিল, "বল্ পদ্যাঙ্ক।

বিলাস দুষ্টামি করিয়া তাহার দিকে মুখ ঘুরাইয়া উঁচু গলায় প্রশ্ন করিল, "কি বলতে বলছিস্?"

হরা ভয়ে প্রথমটা হকচকিয়া গেল, তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেকেণ্ড মাষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিল, "পদ্য আছে স্যার;—নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'।"

তাহার পর হাত দিয়া নিজের বইয়ের গোছাটা নীচে ঠেলিয়া ফেলিয়া কুড়াইবার অছিলায় ঝুঁকিয়া পড়িল এবং সেখান হইতে দুইটা হাত জোড় করিয়া বিলাসের দিকে চাহিয়া রহিল। বিলাস আস্তে আস্তে বলিল, "ওঠ্, আর কখনও করিস্ নি।"

সেকেণ্ড মাষ্টার প্রসন্নভাবে ক্লাসের চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ—ব্যাট্‌ল অব প্লাসী?—অনাথ, কোন্ সালে হয়েছিল বলতে পার?"

হরা আস্তে আস্তে বলিল, "এতেও অঙ্কের গন্ধ পেয়েছে!"

অনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "১৭৫৭, স্যার।"

"সেভেন্‌টীন ফিফ্‌টিসেভেন—বেশ; কোন সেন্‌চুরি হ'ল?"

অনাথ চুপ করিয়া রহিল। সেকেণ্ড মাষ্টার চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিছনের বেঞ্চে ভবেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি, কবি ?"

ভবেশ কবিতা লেখে বলিয়া একটু বিশেষ ভাবে সেকেণ্ড মাষ্টারের লক্ষ্যস্থল। বলিল, "আজ্ঞে, সপ্তদশ শতক !"

"তা ত হবেই ; ১৭৫৭ সতর শতাব্দী না হয়ে যায় কোথায় ?...আবার সপ্তদশ শতক !—ভাষার জলুশ দেখ না! তুমি যে এর মধ্যে 'শতদল' কি 'কিশলয়' এনে ফেল নি এই আমার বাবার ভাগ্যি ! · তুমি, শৈলেন ?"

বলিলাম, "অষ্টাদশ শতাব্দী স্যার।"

"কেন বলতে পার ?—এদিকে ত ১৭৫৭, অষ্টাদশ শতাব্দী হ'ল কি ক'রে ?"

রহস্যটা জানা ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম।

"তোমরা বাপু এসেছ মহাকাব্য পলাশীর যুদ্ধ পড়তে, অথচ এদিকে ১৭৫৭ কোন্ সেন্‌চুরি হ'ল জান না ; যদিই বা জান এক আধজন তো কি ক'রে হ'ল বলতে পার না। তোমরা কাব্যটার কি ছাই রসগ্রহণ করবে শুনি ?"

আমরা লজ্জায় সকলে অধোবদন হইয়া রহিলাম ; অনেকে লজ্জায়, অনেকে আবার পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিবার সুবিধার জন্য।

"হয়েছে, আর লজ্জা দেখাতে হবে না, লজ্জা পাবার কথা ত বেচারী নবীন সেনের, তোমাদের মত পাঠকের হাতে পড়ে যাঁর নাকালের অন্ত নেই...যীশুখ্রীষ্ট কত দিন পূর্ব্বে জন্মেছিলেন বলতে পারেন বলাইবাবু ?"

বলাই পাখার দড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

"তুমি, অনাথ ? ইংরেজী এটা কত সাল ?"

"উনিশ-শ বার স্যার।"

"তা হ'লে ?"

"উনিশ-শ বার বছর পূর্ব্বে জন্মেছিলেন স্যার।"

"অর্থাৎ—"

চকখড়িটা হাতে লুফিতে লুফিতে মাষ্টার মহাশয় উঠিলেন এবং বোর্ডে গিয়া পড়িয়া পড়িয়া লিখিলেন, "উনিশ-শ বার মাইনাস্ উনিশ-শ বার,—ইজ ইকওয়াল টু জিরো, অর্থাৎ ?..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার ক্লাসের দিকে চাহিলেন। সকলেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া বোর্ডের ১৯১২—১৯১২র বিয়োগ-ফল শূন্যটার পানে শূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়—বোধ হয় কাব্যটা অঙ্কের জটিলতা অবলম্বন করিতেছে দেখিয়া প্রসন্নভাবে স্মিতহাস্য করিলেন, তাহার পর শূন্যটার দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ এই জিরো হ'ল ষ্টার্টিং পয়েণ্ট—এইখান থেকে হিসাবের সুরু—অর্থাৎ—?"

আমরা ক্রমেই ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। যাহারা একটু আধটু বুঝিতেওছিলাম সাহস করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। মাষ্টার মহাশয় আরও প্রসন্নতার সহিত হাস্য করিলেন।

"অর্থাৎ এই শূন্য থেকে এক-শ বছর পর্য্যন্ত হ'ল প্রথম সেন্‌চুরি, এক-শ থেকে দু-শ বছর হ'ল..."

প্রায় সমস্ত ক্লাস হইতে মুক্তকণ্ঠের একটা আওয়াজ উঠিল, "দ্বিতীয় সেন্‌চুরি স্যার।"

"বুঝেছ ত ?"

বিলাস বলিল, "একেবারে জল হয়ে গেছে স্যার।"

"টুকে নাও।"

একথাটা মাষ্টার মহাশয়ের একটা মুদ্রাদোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—প্রতিদিন পাঁচ-ছয় পিরিয়ড করিয়া অঙ্ক কষাইতে কষাইতে। টুকিবার কিছু না থাকিলেও আমরা খাতার উপর একটু পেন্সিল চালাইয়া—, অতঃপর কি বলেন শুনিবার জন্য আবার মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিলাম।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধের কাহিনী পড়তে যাচ্ছ—কিন্তু জেনে রেখো কাব্য পড়া মাত্রই একটা যুদ্ধ করা, —শুধু কাব্য বলি কেন, যে-কোন জিনিষ পড়াই যুদ্ধ করা। কোন একটা জিনিষ বোঝা মানে সেই জিনিষটাকে আয়ত্ত করা অর্থাৎ জয় করা। তোমরা এক্ষেত্রে নবীন সেনের কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' আয়ত্ত করতে যাচ্ছ, তার রস উপলব্ধি করবে বলে, এই ত ? এই যে কাব্যের বিরুদ্ধে বিজয়-অভিযান এতে তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র থাকা চাই তো ? এখন, সে-অস্ত্র কি ? · তুমি ?...তুমি ?...ভবেশ ?"

ভবেশ ডেস্কে হাত দুইটার উপর ভর দিয়া সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল, "হৃদয়রূপী ..."

"ব'স বাপু, আমি জানি তুমি সোজা ব্যাপারটিকে জটিল না ক'রে ছাড়বে না। ..বিলাস ?"

"অঙ্ক, স্যার।"

"অঙ্ক, তবে শুধু অঙ্ক নয়,—ইতিহাস, ভূগোল সবই আছে —এই সমস্ত জিনিষের জ্ঞানই হ'ল তোমার অস্ত্র।"

বিলাস বলিল, "ইতিহাস, ভূগোলও ত অঙ্ক থেকে আলাদা নয় স্যার।"

"নয়ই ত; এইবার মনে হচ্ছে যেন তোমরা কতক কতক বুঝেছ। পড় দেখি পদ্যটা এইবার।"

৩

বিলাসেরই দিন আজ। 'আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন' বলিয়া অ্যাক্‌টিঙের ঢঙে আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, সেকেণ্ড মাষ্টার বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, কামান-গর্জ্জন থামাও একটু। বলি রণক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন একটা ধারণা ক'রে নিয়েছ আগে ?"

ক্লাসে একটা চাপা আক্রোশের হাসি উঠিল। বিলাস থামিয়া গিয়া অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "না স্যার।"

"তা করবে কেন ? তাতে যে অঙ্কের গন্ধ আছে একটু। অথচ যিনি লিখেছেন তাঁকে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রটি মগজের মধ্যে রেখে তবে এই যুদ্ধের ইতিহাসটি পদ্যে বর্ণনা করতে হয়েছে।"

সেকেণ্ড মাষ্টার উঠিয়া গিয়া বোর্ডের গায়ে, উঁচু দিকে ফলাটা নির্দ্দেশ করিয়া একটি তীর আঁকিলেন এবং ফলার মুখে একটি ইংরেজী 'N' অক্ষর বসাইয়া দিলেন। কে এক জন চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "ওটা আবার কেন ?"

হরা সেইরূপ স্বরে উত্তর করিল, "বাংলা-সাহিত্যের জন্যে শক্তিশেল।"

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, "এটা হ'ল উত্তর দিক।"

তীরের সমান্তরালে আর একটি দাঁড়ি টানিলেন; বলিলেন, 'ভাগীরথী', এবং দাঁড়িটির উভয় প্রান্তে, মাঝে একটু জায়গা ছাড়িয়া দুইটি চতুষ্কোণ ঘর আঁকিলেন, একটির মাঝখানে লিখিলেন—'ইং', অপরটির মাঝখানে 'ন', তাহার পর অনাথের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিছু বোধগম্য হচ্ছে অনাথবাবুর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, এদিকটা হ'ল নবাবের সৈন্য আর এদিকটা ইংরেজের।"

"কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব ?—তালগোল পাকিয়ে ?"

"আজ্ঞে না স্যার।"

"তবে ?"

অনাথ প্রশ্নটার অর্থ কি এবং কি ধরণের উত্তর চাহে তাহার কোনও হদিস না পাইয়া হতাশভাবে বোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

"খুব বুঝেছ সব।...তুমি ... তুমি ? ... ইউ ? ... তুমি শৈলেন ?"

আমি মুখটা ফ্যাকাশে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, আকুল ভাবে বোর্ডের সেনাবাহিনীর দুই কক্ষের দিকে চাহিলাম, তাহার পর তীরের ফলায় নজরটা আটকাইয়া গিয়া একটা বুদ্ধি আসিল; বলিলাম, "সঙীন উঁচু ক'রে স্যার।"

ভাল ছেলে বলিয়া আমার একটু নাম ছিল। মাষ্টার মহাশয় এমন গভীর ভাবে নিরাশ হইয়া গেলেন যে আমার উত্তরের উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। ভবেশকে বলিলেন, "যা, বোর্ডের কাছে যা, জিওমেট্রির ছয়ের প্রবলেমটা মুখস্থ আছে ?"

ভবেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ছাদের দিকে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল, মনে হইল যেন ছাদ ভেদ করিয়া আকাশে কোন নক্ষত্রলোকে ছয়ের প্রবলেমটার অনুসন্ধান করিতেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, "যা, ঐ এক কোণে ব'সে পদ্য লিখগে যা। বলাই ?"

ভবেশের অবস্থার সঙ্গে বলাইয়ের অবস্থার কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। সেকেণ্ড মাষ্টার তখন নিজে বোর্ডের কাছে গেলেন এবং সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক চতুষ্কোণ ঘরটিতে পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোটাকতক করিয়া সোজা লাইন টানিলেন। বলিলেন, "এই সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক লাইনটি পরস্পরের সমান্তরাল, কেন না, আমি প্রত্যেকটিকে প্রথম লাইনটির সঙ্গে প্যারালাল ক'রে টেনেছি।...কোন্ থিয়োরেম ?"

বিলাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "পনরর থিয়োরেম স্যার।"

অনাথ সামনের খাতার দিকে মুখটা নীচু করিয়া, আমার দিকে আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "অঙ্কের জের ধ'রে কোন্‌খানে চলে এলেন দেখ! কোথায় 'পলাশীর যুদ্ধ' আর কোথায় পনরর থিয়োরেম!"

সেকেণ্ড মাষ্টার সমান্তরাল লাইনগুলির উপর দিয়া তির্য্যক্‌ভাবে একটি সোজা লাইন টানিলেন, বলিলেন, "ঠিক, ব'স।...পনরর থিয়োরেম বলছে যদি দুই কিংবা ততোধিক লাইন অন্য একটি লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয় তো তারা পরস্পরের মধ্যেও সমান্তরাল হবে।"

অঙ্কের নেশা তখন পুরা মাত্রায় জমিয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় সমস্ত থিয়োরেমটি বিধি অনুসারে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাহ'লে সৈন্যেরা তালগোল পাকিয়ে (আমার দিকে শ্লেষ কটাক্ষ করিয়া), সঙ্গীন খাড়া ক'রে না থেকে প্যারালাল লাইনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...অর্জ্জুনের ব্যূহরচনার কথা শুনেছ তো?—পিওর ম্যাথেমেটিক্স, নিজের সৈন্যের সংখ্যা আর শক্তি বুঝে, তাকে বিভিন্ন সেক্‌শনে ভাগ ক'রে দাঁড় করান শুধু হায়ার ম্যাথেমেটিক্সের খেলা—জিয়োমেট্রি, এলজেব্রা, ট্রিগনোমেট্রি. কেমন—ভাল লাগছে, ইন্টারেসটিং বোধ হচ্ছে?"

ঢং ঢং করিয়া ষষ্ঠ ঘণ্টা শেষ হইল।

"নাও পদ্যটা পড় দিকিন এইবার।"

অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে বিলাস আর উঠিল না। বোধ হয় অঙ্কর হাত থেকে পরিত্রাণ পাইবার আশায় প্রত্যেক বেঞ্চে দু-এক জন করিয়া ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল—ভবেশ পর্য্যন্ত।

মাষ্টার মহাশয় অনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইউ।"

অনাথ পড়িল—

আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন,
উগরিল ধূমরাশি
আঁধারিল দশদিশি
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিশ বাজন।

মাষ্টার মহাশয় চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "যতটা সহজ ভাবছ ততটা নয়। জিনিষটাকে খুব ভাল ক'রে এনালাইজ ক'রে দেখতে হবে। লিখে ফেল বোর্ডে।"

অনাথ রণস্থলের নীচে পদ্যটা লিখিয়া ফেলিল। মাষ্টার মহাশয় একবার মনে মনে পড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'ধূমরাশি'র ওপর ১ লেখ, 'উগরিল'র উপর ২, 'দশে'র উপর ৩, 'দিশি'র ওপর ৪, 'আঁধারিল' ৫, 'সেই' ৬, 'সঙ্গে' ৭, 'ব্রিটিশ' ৮, 'গরজিল' ৯...যাও নিজের সীটে ব'স গিয়ে।...এটা কি হ'ল বলতে পার?"

সবাই বুঝিল কবিতাটির অন্বয় করা হইল, কিন্তু নিগূঢ় কোন অঙ্কের কারসাজি আশঙ্কা করিয়া কেহ আর উত্তর দিল না। "ইউ--ইউ"—করিতে করিতে মাষ্টার মহাশয়ের নজর হরার উপর পড়িল। সে বেঁটে হওয়ার সুবিধায় মাথা নীচু করিয়া ঢুলিতেছিল। মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন, "হরা?"

হরা হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"নিদ্রা দেওয়া হ'চ্ছে?...পদ্যর মাথায় ওই ফিগারগুলো কি হ'ল?"

তন্দ্রা হইতে একেবারে অঙ্কের মাঝখানে পড়িয়া হরার আর ভাবিয়া দেখিবার শক্তি রহিল না; বলিল, "একুশ অপন্..."

সেকেণ্ড মাষ্টার এক রকম ভেংচাইয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ, বলে যাও, একুশ অপন্ পাঁচ-শ চৌত্রিশ অপন্ ন-শ .."

ললিত ঠিক সামনেই প্রথম বেঞ্চে বসিয়াছিল। সেকেণ্ড মাষ্টারের রসিকতায় হাসিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যদি প্রশ্নাদি না করেন এই আশায় সবে হাসিতে সুরু করিয়াছে, সেকেণ্ড মাষ্টার আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি, ললিত?"

ললিতের মুখটা যেন ছাইয়ের মত হইয়া গেল। ও-বেচারার জায়গা প্রথম বেঞ্চে নয়, শেষ বেঞ্চে নিরুপদ্রবে বসিয়া সাতটি ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ী চলিয়া যায়; আজ গোলমালে কেমন অন্যমনস্ক ভাবে প্রথম বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়াছে। একে পড়াশুনার সঙ্গে কোন কালে কোন সম্বন্ধই নাই তাহাতে আবার অঙ্ক শেষ হইয়া পদ্য চলিতেছে, কি পদ্য শেষ হইয়া এই আসলে অঙ্ক আরম্ভ হইল সে-সম্বন্ধে

কোন ধারণাই পাকা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বোর্ডের পানে চাহিয়া পদ্যের উপর লেখা অঙ্কগুলা পড়িতে পড়িতে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "একুশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছ-শ আটাত্তর।"

চারি দিকে একটা চাপা হাসি উঠিল। সেকেণ্ড মাষ্টার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "চমৎকার! একুশ কোটি কি তা শুনি?"

ললিত আরও ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, "সৈন্ত, স্তার।"

"ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত?"

"তিরিশ কোটি, স্তার।"

"তা হ'লে প্রায় সবাই পলাশীর যুদ্ধে নেমে পড়েছিল বল?"

ললিত চুপ করিয়া রহিল। সেকেণ্ড মাষ্টার নিরাশ হইয়া বলিলেন, "ব'স।" আমারও যেমন দুর্ভোগ, তোমাদের মত গর্দ্দভদের ক্রিটিক্যালি পদ্য পড়াতে যাওয়া?...তুমি, শৈলেন?

আমি সংখ্যার নির্দ্দেশ-মত ভয়ে ভয়ে কথাগুলি পড়িয়া অন্বয়টা দাঁড় করাইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের রাগটা পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিলেন, "এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পদ্যের গোড়ার রহস্য হচ্ছে ম্যাথেমেটিক্স?"

কাহারও কাছে কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের সামনে গদ্য আর পদ্য দুই-ই একসঙ্গে রয়েছে; দুটোর মধ্যে মূলগত প্রভেদটা কি?"

আমি বলিলাম, "ছন্দ, স্তার।"

"ছন্দটা কি?"

চুপ করিয়া রহিলাম।

"তুমি, কবি?"

"শব্দের এমন সংযোজনা স্তার..."

"ব'সো বাপু, তুমি ত আরম্ভই করলে অনুপ্রাস দিয়ে।...ছন্দটা আর কিছু নয়, ম্যাথেমেটিক্স,—সময়ের অতি সূক্ষ্ম বিভাগ—কথাটা মনে রেখ,—বিভাগ—ডিভিশ্যন—মাইণ্ড ইউ।...পদ্য থেকে এই ম্যাথেমেটিক্স বের ক'রে নাও, যা অবশেষ থাকবে তা গদ্যেরও অধম। তা হ'লে দাঁড়াল—নবীন সেন বাইরেই নবীন সেন, তাঁর ভেতরে রয়েছে—ভেতরে রয়েছে..."

বিলাস বলিল, "যাদব চক্রবর্ত্তী, স্তার।"

মাষ্টার মহাশয় প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বুঝেছ তো?"

"একেবারে জল হয়ে গেছে স্তার।"

"সমস্ত ডায়াগ্রামটা এঁকে নাও।...এইবার মানেটা একবার প'ড়ে নাও দিকিন—অর্থাৎ কাব্যের ভাবের দিকটা আর কি। দেখবে তার মধ্যে ম্যাথেমেটিক্স আরও সূক্ষ্ম-ভাবে প্রবেশ করেছে।...কি বলছে?—

আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন
উগরিল ধূমরাশি
আঁধারিল দশদিশি...

"হিয়ার ইউ আর...দশদিশি...অনাথ!..."

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া শেষ ঘণ্টা পড়িল। মাষ্টার মহাশয় ক্লাসের চারি দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর একটু তাহ'লে পড়বে না কি সব?"

বিলাস গোড়ায় মজাইয়াছিল, শেষের দিকে কিন্তু সে-ই উদ্ধার করিল। আমরা শঙ্কিতভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছি, বিলাস বলিল, "আজ না-হয় আর থাক্ স্তার, জিনিষটাকে সত্যিই যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা নয়, অনেক ভাববার কথা আছে।"

মাষ্টার মহাশয় গভীর প্রীতির সহিত চাদরের প্রান্তভাগ দুই মুষ্টিতে একত্র করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

জাপান যাত্রা

শ্রীশান্তা দেবী

বাংলা দেশের শীতে যাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়, এমন মানুষ সচরাচর পৌষ মাসের শীতে জাপান যায় না। কিন্তু আমার ভাগ্যে এই সময়েই জাপান যাবার সুযোগ জুটল। আমি মনে মনে যথেষ্ট ভয় পেলেও যাবার সংকল্প ত্যাগ করলাম না। ডাক্তারেরা অনেকেই বললেন, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর এত ভাল হয়ে যাবে, যে, ঠাণ্ডা লাগবার আর কোনও ভয় থাকবে না।

জাপানে লেখিকা ও তাঁহার কন্যা

যাই হোক, সাবধানতার জন্য যথাসাধ্য গরম কাপড়-চোপড় যোগাড় করতে লাগলাম। আমাদের দেশে জাপানী জিনিষ খুব আমদানী হয়, কাজেই ব্যবসায়সূত্রে অনেককে জাপানে যেতে হয়। কাপড় কিনতে গিয়ে এই রকম একটি লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল্‌লে, "শীতকালে জাপান? সে যে ভয়ানক ব্যাপার!"

আমি বল্‌লাম, "শীতকালের দার্জ্জিলিঙের মত?"

সে বল্‌লে, "না, না, আরও অনেক বেশী।"

বুঝতে পারলাম না সেই অনেক বেশীটা কি রকম হতে পারে। যাই হোক, শীতেও সেখানে বাঙালী যখন ইতিপূর্ব্বে থেকেছে তখন বেশী ভয় না পেয়ে যাওয়াই ভাল।

৬ই জানুয়ারী রাত্রে ট্রেন ধরে ৮ই সকালে আমরা বোম্বাই পৌছলাম। ৭ই যখন ভোরে মির্জ্জাপুরে ট্রেন থাম্‌ল তখন সেখানে ওভারকোট প'রে নেমেও দাঁড়ানো যায় না, শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে পা কাঁপে। বেশী শীত আমাদের দেশেও অনেক জায়গায় আছে। ভাবলাম কিছু কিছু সহ্য ক'রে যাওয়া ভাল।

বোম্বাইএর কাছে শীত প্রায় নেই, ছোট ছোট ষ্টেশন থেকে সমুদ্রের টুক্‌রা বার-বার দেখা যায়। পূজার সময় দেখেছি এখানে যেমন সমুদ্র-শকুন (sea-gull) আর তেমনই রঙীন শাড়ী-পরা মারাঠি মেছুনীর ভিড়। এবার দুই জাতীয় ভিড়ই কম, বোধ হয় শীতের দিন ব'লে। ট্রেনে আমাদের গাড়ীতে এক ফিরিঙ্গি-দম্পতি উঠেছিল, আমার মেয়ে এত অল্পবয়সে জাপান যাচ্ছে শুনে মেমটি তার ভাগ্যের খুব প্রশংসা করল। "শি ইজ্ ভেরি লকি!"

বোম্বাইএ আমরা আতিথ্যপরায়ণ সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে উঠেছিলাম। তাঁরা তখন বাড়ীতে ছিলেন না, কিন্তু তার জন্য আতিথ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি। বালকেশ্বর রোডের উপর সমুদ্রের ধারেই তাঁদের চারতলার ফ্ল্যাট। সকালবেলা সমুদ্রের বুক থেকে সূর্য্য উঠে রোদে জল কাচের মত জ্বলে, সেদিকে চাওয়া যায় না। রোদটা একটু সরে গেলেই আমরা মা ও মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পরিবর্ত্তনশীল নানা রূপ দেখতাম। সারাদিনই ছোট বড় পালতোলা নৌকা চলেছে, জাল হাতে জেলেরা ভাঁটার সময় সমুদ্রের ভিতর নেমে যাচ্ছে, ডিঙি নৌকা

এদিক্ ওদিক্ ঘুরছে, সকালে কেউ বা জলে দাঁড়িয়ে সূর্য্য-স্তব করছে, কেউ বা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা কখনও উড়ে এসে ভিজে বালির উপর বসছে, কখনও বা ভাঁটার টানে বেরিয়ে-পড়া পাথর-গুলার মধ্যে একটা ঘোড়া এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের ধারের এই পথে সকালে ও বিকালে অসংখ্য মোটর বিহারী ও পথচারী দেখা যায়। কত জা'তের সব মানুষ! মেয়েদের পোষাক দেখলেই বোঝা যায় গুজরাটি না পার্শী না মারাঠি। পুরুষদের চেনা অত সহজ নয়। কয়েক বছর আগে ভদ্র মারাঠি মেয়েদের মধ্যে কাছা দিয়ে কাপড় পরার প্রথা যতটা ছিল এখন আর ততটা নেই। অনেকেই শুধু কোঁচা দিয়ে ঘুরিয়ে কাপড় পরেন। মেয়েদের অবশ্য এতেই বেশী ভাল দেখায়। আগে মারাঠি মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া বেশী দেখতাম না, এবার মনে হ'ল অনেকেরই মাথা ঢাকা। বাংলা দেশে মাথায় কাপড় দেওয়া ক্রমেই ক'মে যাচ্ছে ব'লে কি মহারাষ্ট্রে বাড়ছে? যে দেশে যেটা চলতি নেই, সেইটাই ফ্যাশন হয় সহজে।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির একটা নিয়ম দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার কাছাকাছি কোথাও ময়লা ফেলা টিন দেখলাম না। কিন্তু সকালবেলাই দেখি একটা মস্ত বন্ধ গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে সজোরে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাঁশীর সুরে প্রত্যেক বাড়ী থেকে ঝি-চাকরেরা ঝুড়ি বাল্‌তি ও টিন নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। সেগুলি আবর্জ্জনাতে ভর্ত্তি। মোটর গাড়ীটির গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে "আমাকে বোঝাই ক'রে দাও, কিন্তু রাস্তা নোংরা ক'রো না।" চাকর-বাকরেরা তাদের বাড়ীর আবর্জ্জনাগুলি গাড়ীর ভিতর ঢেলে দিতেই গাড়ীটা আর একটু এগিয়ে গিয়ে অন্য দরজায় বাঁশী বাজাতে সুরু করল। গাড়ীটার উপর ও চারপাশ বন্ধ, আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশনের গাড়ীর মত খোলা নয়। আবর্জ্জনা ফেলার এই রকম নিয়মে পথঘাট নোংরা হয় না, রোগ ছড়ায় না এবং মানুষের চোখ ও নাক অনেক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত থাকে। বোম্বাই শহরে সর্ব্বত্র এই রকম নিয়ম আছে কি না জানি না, কিন্তু যেটুকুতে আছে সেইটুকুই অন্যান্য স্থানের অনুকরণ করবার যোগ্য।

ছয় বৎসর আগে প্রথম যখন আমি বোম্বাই আসি, তখন শহরটিকে যত পরিষ্কার ও সুন্দর মনে করেছিলাম, এবার দেখলাম ঠিক তেমন নয়। অনেক জিনিষ তখন চোখে পড়েনি, এবার দেখতে পেলাম। এখানেও ফ্ল্যাটওয়ালা বাড়ীর সিঁড়ি থুতুতে ভর্ত্তি, রাস্তার উপর ময়লা কাপড় শুকানো ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা বাংলা দেশের মতই রয়েছে। অবশ্য বাংলার চেয়ে কতটা কম কি বেশী দু-চার দিনে তা বোঝা যায় না।

জাপানে শীতের প্রভাত

৯ই দুপুর বেলা দেড়টায় আমাদের জাহাজ 'আনিও মারু'র ছাড়বার কথা। সমুদ্রযাত্রা আজকাল বাংলা দেশে অনেকেই করছেন। মেয়েরাও বাদ যান না, সুতরাং বাঙালীর কাছে এটা আর আগের মত তাজ্জব ব্যাপার নেই। তবে আমি নিজে ইতিপূর্ব্বে জাহাজে কোথাও যাইনি ব'লে আমার কাছে অনেক জিনিষই নূতন লাগছিল।

আলেকজান্ড্রা ডকের গেটে আমাদের গাড়ীটা ঢুকতেই পুলিস আটকাল। তাদের এলাকায় ঢোকবামাত্র তাদের আইনকানুন মত চলতে হবে। অবশ্য পোর্ট চার্জ্জের টাকা

জাপানী কনের সাজ

বার করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ আমাকে করতে হয়নি, কাজেই নিয়মগুলো সব ঠিক বুঝতে পারলাম না। কুলিরা মহা কোলাহল করে হাতব্যাগ ছাতা টুপি যা পাচ্ছে তাই এক-একজন এক-একটা তুলে নিতে লাগল। তাহলে প্রত্যেকটার জন্য কিছু কিছু মজুরী আদায় করা যায়। তাদের হাত থেকে কোনওরকমে নিষ্কৃতি পেয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠা গেল। জিনিষপত্র যথাস্থানে রেখে ও কেবিনে তালাবন্ধ ক'রে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম জাহাজ-ঘাটের কাণ্ডকারখানা।

এক জাপানী ভদ্রলোক সস্ত্রীক দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁদের বিদায় দিতে ঘাটে মহা-ভিড় লেগে গিয়েছে। জাপানী পুরুষ ত একপাল, জাপানী মেয়েও পঁচিশ-ত্রিশজনের কম হবে না। তা ছাড়া পার্শি ও গুজরাটি পুরুষে ঘাটটা ভর্ত্তি। অন্য লোকের চলাচল করা শক্ত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গোটা দশ-বারো ক'রে ফুলের মালা পরেছেন, বন্ধুদের উপহার। মালায় যুঁই রজনীগন্ধা, গোলাপ, জরির ফিতা রিবন—কত কি গাঁথা। ছোট বড় ফুলের তোড়া ও ফুলের ডালিরও অভাব নেই। ফুলের গন্ধে মনে হচ্ছে জাহাজ-ঘাট থেকে অকস্মাৎ বুঝি নন্দন-কাননে এসে পড়েছি।

জাপানীরা হাঁটুতে হাত রেখে নমাজ পড়ার মত নীচু হয়ে হয়ে এক-একজন পাঁচ-সাতবার একজনকেই নমস্কার করছিল। তার সঙ্গে বিদায়বার্ত্তা ব'লেও যাচ্ছিল। আমাদের মত সংক্ষেপে একটা নমস্কার ক'রে ওদের কাজ সারা হয় না। ওরা সহিষ্ণু জাত নিশ্চয়, আমার ত দে'খেই মন ছটফট করছিল। বিশেষতঃ বেচারী স্বদেশগামী দম্পতির অবস্থা দে'খে ত কান্না পাচ্ছিল। ওই শ'দুই লোককে অতবার ক'রে প্রত্যভিবাদন ক'রে ওঁদের কেন যে ঘাড়ে পিঠে বাত ধ'রে যায়নি এই আশ্চর্য্য।

আর একটা জায়গাতেও মন্দ ভিড় হয়নি। সেটা একটা টিনের চালা। দুধারে ক্যানভাসের পরদার মধ্যে সেখানে একদল ভারতীয় স্ত্রীলোক মাটিতে সতরঞ্চি পেতে ব'সে আছে বোধ হয় তারা মুসলমান। তাদের সঙ্গে কুচো-কাচা ছেলে বুড়ো অনেক। এতগুলো লোক এই জাহাজে চ'ড়ে কোথায় যাবে ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছিলাম।

চারিধারের বিদায়-পর্ব্ব দেখছি, আমরা ত ওদেশের মানুষ নয়, আমাদের কেউ বিদায় দিতে বিশেষ আসেনি। একটিমাত্র ভদ্রলোক আমাদের তুলে দিতে এবং সকল কাজে সাহায্য করতে এসেছিলেন, তিনি মজুমদার মহাশয়ের সহকর্ম্মী। এমন সময় একজন বললে, "যাও, তোমাদের নীচে ডাকছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা (health examination) হবে। কাজেই আবার ডাঙ্গায় নেমে পড়তে হ'ল। টিনের ছাউনির তলায় দুটো পর্দ্দাঘেরা ভাগে দুই ডাক্তার, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। মহিলাটির চেহারা দে'খে মনে হ'ল মারাঠি। তাঁর কাছে নাড়ী টেপাতে গেলাম, একটা চাপরাশি বললে, "এখন নয়, আগে 'ক্রু'-দের।"

'ক্রু'-র দল এল সব হুড়মুড়িয়ে জাহাজ থেকে নেমে নোংরা কাপড় প'রেই। ডাক্তার তাদের লাইন ক'রে দাঁড় করিয়ে নাড়ী টিপে চোখ দে'খে, দুই একজনের গলাও দেখে এক একজন ক'রে ধাক্কা দিয়ে পার ক'রে দিলেন। তারপর আমরা আবার গেলাম, কিন্তু ফিরিয়ে দিল। এখন নাকি ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের পালা। শেষকালে হুকুম হ'ল—'এইবার ওদিকে মেয়েদের ঘরে যাও।'

মেয়েদের ঘরে গিয়ে দেখি একটা টেবিলে একগাদা পাসপোর্ট সামনে নিয়ে মেড়ি ডাক্তার ব'সে আছেন। দেশী

মহিলারা এক এক ক'রে নাড়ী টেপাচ্ছে, কিন্তু দুর্গতি হচ্ছে বাচ্চাগুলোর। তাদের পরীক্ষার আর অন্ত নেই। তাদের গলা, বুক, পিঠ, জ্বর, কত কি যে দেখছে তার ঠিক নেই। একটা পুঁটকে বাচ্চাকে বলা হচ্ছিল—জিভের তলায় থার্ম্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখ। সে ক্রমাগতই প্রাণপণে হাঁ করছে আর বড় ক'রে গলা দেখাচ্ছে। শেষে লালকুর্ত্তি-পরা এক চাপরাশি বাচ্চাটাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে জিভের নীচে তাপ নিল। অতঃপর এলেন মেমরা। আমরা উপর নীচ দুই দিক্ থেকেই কেন যে সবার পরে পড়লাম বোঝা গেল না। যদি আগে দেখালে মর্য্যাদা কম হয়, তাহলে কালা আদমিদের সঙ্গেই ত আমাদেরও নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মেমরাই গেল আগে। হতে পারে যে আমরা সব চেয়ে নিরাপদ্ লোক ব'লে আমাদের সকলের শেষে রাখা হয়েছিল। আমাদের জাহাজে চড়তে দিতে বোধ হয় ওদের আপত্তি ছিল না। মেমসাহেবদের বারেও ছোটদের উপর নজর বেশী পড়ল। মিস্ ক্যাডেট্ নাম্নী একটি এগার-বার বছরের মেয়েকে প্রায় 'কাণপকড়কে উঠো বৈঠোর মতন বারবার হাঁটু গাড়িয়ে গলা জ্বর পিঠ দে'খে অস্থির করে তুলল। তাতেও তার নিষ্কৃতি হ'ল না। অন্য মেমদের এবং আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে ধামাচাপা রইল কিছুক্ষণ। আমার নাড়ী দে'খে কোথা থেকে আস্‌ছি সেইটুকু মাত্র জিজ্ঞাসা করল। আমার মেয়ের কিন্তু গলা ও নাড়ী দে'খে আবার জামার বোতাম খুলে বুক পিঠ সব দেখাতে হ'ল। ডাক্তারের ছাপমারা ছাড়পত্র নিয়ে যখন আমরা জাহাজে কায়েমী হয়ে উঠলাম তখনও সেই ইউরোপীয় ছোট মেয়েটির হয়রানি চল্‌ছিল। লেডী ডাক্তার তাকে টেনে নিয়ে পুরুষ ডাক্তারদের কাছে গেলেন। তিন-চারজনে মিলে দেখে শুনে তার জ্বর হয়নি প্রমাণ পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তার মা'র ত মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

সকলে ক্রমে উঠে পড়ল। যাদের যাত্রী ও যাত্রিণী মনে করেছিলাম তাদের সকলেই প্রায় বন্ধুদের বিদায় দিতে এসেছে। একদল মুসলমান মেয়ে তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের জাহাজে তুলে দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। এরা বাংলা ইংরিজী হিন্দী কোনও ভাষাই ভাল

তীরের বন্ধুরা ফিতা দিয়া জাহাজ বাঁধিতেছেন

ক'রে বোঝে না। কি ভাষায় যে কথা বলে তাও ঠিক জানি না।

ডেকে বসবার কোন আসন তখনও দেয়নি। কিন্তু প্রথম সমুদ্রযাত্রার সময় কে আর কেবিনে ঢুকে ব'সে থাকতে চায়? জাহাজ ছাড়াটা ত দেখতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা প্রায় খসে যাবার যোগাড়। একটা বাজতেই জমির থেকে জাহাজের গায়ে আটকানো মইটা আস্তে আস্তে খুলে নিল। এইবার যাত্রারম্ভ। জাহাজের জাপানী দম্পতি ও তাদের বোম্বাই-প্রবাসী বন্ধুরা গজ ফিতের মতো ক'রে জড়ানো রাশি রাশি রঙীন ফিতে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। তীরের বাঁধন খুলে জাহাজ তেলকালি গোলা জলে ধীরে ধীরে অগ্রসর না হতে হতেই দুধারে সুরু হয়ে গেল, "যেতে নাহি দিব"র পালা। জাহাজের দম্পতি ডেকের রেলিঙের গায়ে ফিতাগুলির একটা দিক্ বেঁধে বাকি পাকানো ফিতা এক এক বন্ধুকে এক একটা ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। বন্ধুদের মধ্যে ফিতা ধরবার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। তীরের বন্ধুরাও লাল নীল হলদে নানা রঙের ফিতে ছুঁড়তে লাগলেন। দেখতে দেখতে জাহাজের কর্ম্মচারীরাও দলে ভিড়ে গেলেন। মাঝিমাল্লা যে পাচ্ছিল সেই একটা করে ফিতা ছুঁড়তে সুরু ক'রে দিল। ক্রমে দুই দিক্ থেকে পঞ্চাশ-ষাটটা ফিতা জলে স্থলে জালের বাঁধন বেঁধে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে অগ্রসর হতে লাগল। বন্ধুদের হাতে দু-দিকেই রুমাল, টুপি, ফুলের মালা

প্রাচীন "মারু" অর্থাৎ জমিদারদের সখের বজরা

দুলতে লাগল। জাহাজ ডাঙার থেকে স'রে যাচ্ছে, ফিতার বাঁধনে টান পড়ছে। তীরের বন্ধুরা যেন বিরাট জাহাজটাকে সমুদ্রে ঘুড়ির মত ওড়াচ্ছে, জাহাজ যতই দূরে স'রে যায় ততই তারা লাটাইয়ের সুতার মত ফিতার পাক খুলে খুলে দেয়। লাটাইয়ের সুতো দিয়ে আকাশের ঘুড়ি যেমন মাটির মানুষের সঙ্গে বাঁধা থাকে, তেমনই ফিতা যতক্ষণ আলগা দেওয়া চলল ততক্ষণ ডাঙার বন্ধুরা সমুদ্রযাত্রী বন্ধুদের বেঁধে ধ'রে রাখল। যে ফিতার দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে যায়, জাহাজের টানে পট ক'রে সেটা ছিঁড়ে যায়, সে বন্ধুর মায়ার বন্ধন কেটে গেল। কেউ বা বেশী উৎসাহ ক'রে একটা ফিতার মুখে আর একটা ফিতার শেষ বেঁধে তাকে দ্বিগুণ লম্বা ক'রে তুলছিল। কিন্তু এক এক ক'রে সব বন্ধনই টুটে গেল, জাহাজ তীরের মায়ামুক্ত হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিল, তাকে আর পিছু ডাকা গেল না। বন্ধুদের হস্তচ্যুত ফিতাগুলি জলে ভেসে ভেসে জাহাজের সঙ্গে চলল।

মনে করেছিলাম এইবার বুঝি সবাই ঘরে ঢুকবে। কিন্তু কারুর সে-রকম উৎসাহ দেখা গেল না। অর্দ্ধচন্দ্রের মত বোম্বাই শহর সমুদ্রকূল ঘিরে রয়েছে, তীর ঘেঁসে জাহাজ চলেছে, সবাই সেইদিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দেখি, গুটি পাঁচ-ছয় জাপানী মহিলা তিন-চারটি বাচ্চাকাচ্চা ও একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে মোটর গাড়ীতে এসে হাজির। এটাও ডকের মত দেখতে। এরা এক জায়গায় বিদায়-পর্ব্ব শেষ ক'রে আর এক জায়গায় বন্ধুদের আবার দেখতে এসেছে। এখানেও সেই ফিতা ছোঁড়া, ফিতার জাল বোনা। কচি কচি ছেলেরাও ঘুড়ির সুতার মত ক'রে ফিতা টানতে লাগল। সব ফিতার বাঁধন শেষ ক'রে জাহাজ একটা একটা ক'রে লক-গেট পার হয়ে চলল।

শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়াতে বোম্বাইএর শেষ দৃশ্য আর দেখা হ'ল না। কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম।

আমাদের কেবিনের নম্বর ২৭ ছিল। কিন্তু জাহাজের খোলে ঢুকেই চারটে দিক্ এমন একরকম লাগত যে প্রথম দিন কতবার যে আমি কেবিন ও পথ ভুল করেছি তার ঠিক নেই। রবিবাবুর প্রথম সমুদ্র-যাত্রার মত কাণ্ড অবশ্য করিনি, কিন্তু সেটা নেহাৎ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল ব'লে। প্রথম দিন চাবি দিয়ে পরের কেবিন খুলতে খুব চেষ্টা ক'রেও যে খুলতে পারি নি তার কারণ চাবিটা তাতে লাগল না। কেবিন-বয় আমার অবস্থা বুঝে ঠিক পথটা আমায় দেখিয়ে দিতে এল। তার কথাও ভাল ক'রে না বুঝে এক মনে চাবি ঘোরাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল—ওমা এ যে ২৪ নম্বর ঘর ছেলেমানুষরা বোধ হয় সব জিনিষ তাড়াতাড়ি চেনে। আমার মেয়ে এক মুহূর্ত্তেই জাহাজের পথঘাট অন্ধিসন্ধি সব চিনে ফেলল। কোন্ ঘরে কে কে থাকে সব তার মুখস্থ।

আমাদের সামনের কেবিনে দুটি আমেরিকান মহিলা ছিলেন। তাঁরা এই দেশেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন, ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছিলেন। একটি মহিলা এমন রোগা যে তাঁর এক পাটি দাঁত ছাড়া আর কিছু প্রায় চোখে পড়ে না। দেখলেই হাসতেন, কিন্তু কথা খুব কম বলতেন।

পাশের কেবিনে একটি সাহেব ছোকরা থাকত। সে যাচ্ছিল হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। বেচারীর অবস্থা বড় কাহিল। খাবার টেবিলে তার সঙ্গে বসতেন পাঁচটি

বৃদ্ধা এবং আধবৃদ্ধা মিশনারী মহিলা। তাঁদের সঙ্গে কি গল্প যে করবে বেচারী বোধ হয় ভেবে পেত না। নিতান্তই ছেলেমানুষ সে। অগত্যা সারাদিন গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগিয়ে এবং একলা ব্যাগাটেল খেলে সে দিন কাটাত। সেই ব্যাগাটেল বোর্ডটার আবার অর্দ্ধেক ঘুঁটি গিয়েছিল হারিয়ে। ছেলেটির অবস্থা অনেকটা আমারই মত। মনের মত সঙ্গী নেই এবং অ-মনের মতদের এড়িয়ে চলতে চায়। তাই ডেকের যেদিকে চেয়ার থাকে না এবং কেউ যায় না সেই দিকে গিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের নাচন দেখত। আমি অবশ্য অত দাঁড়িয়ে থাকতাম না, হাওয়া-পথের ঢিপিগুলোর উপর ব'সে কিছু লেখাপড়া করতাম।

আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী বোধ হয় সতর জন ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ ছাড়ছে কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভারতবাসী আমরা তিন জন ছাড়া কেউ ছিলেন না। সমুদ্রযাত্রায় উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের বোধ হয় বিশেষ উৎসাহ নেই। ইউরোপ হ'লে তবু একটু উৎসাহ দেখা যায়, চীন ও জাপান সম্বন্ধে লোকের অত গা নেই।

আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন আর ছ'জন। একটি ইউরোপীয় পরিবার স্বামী-স্ত্রী ও একটি মেয়ে বসতেন আমাদের মুখোমুখি। স্ত্রীটির বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে বোধ হয়। ভারী মিষ্টি হাসে, চোখ দুটো ঠিক হরিণের মত। মহিলাটি কথা বলেন খুব, খান তার চেয়ে অনেক বেশী এবং সাজপোষাক করেন অনেক রকম। নানা বিষয়েই মনে হয় সেকেলে মতাবলম্বী, সিগারেট খেতে কিম্বা মদ খেতে দেখিনি কোনও দিন, জল কফি আর চায়েই তৃষ্ণা নিবারণ করতে দেখতাম। তবে ইউরোপে আজকাল পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে যে আধুনিকতা চলেছে তার হাত থেকে ইনি মোটেই নিষ্কৃতি পাননি।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই আজকাল হাফপ্যান্ট এবং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কাপড়-চোপড়ে উৎসাহী। সকাল থেকে ডিনারের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাতের কাপড়, হাফপ্যান্ট গেঞ্জি সাঁতারের পোষাক যার যা খুশী নির্ব্বিবাদে প'রে বেড়ায়।

কুমারী ক্যাডেট

এরা যে সভ্য জাতের স্ত্রীলোক তা ডিনারের আগে বোঝা শক্ত। সেই সময় পা পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়া গাউন ও অন্যান্য নানা সাজপোষাকের ঘটা প'ড়ে যায়।

অবিবাহিত মহিলারা তবু দিনের বেলাও একটু সভ্য ভব্য থাকতে চেষ্টা করতেন। বিবাহিতাগুলি ছিলেন সংক্ষিপ্ত পোষাকে মারাত্মক উৎসাহী।

আমাদের সঙ্গে যে ছোট মেয়েটি খেতে বসত তার বয়স বোধ হয় দশ থেকে বারোর মধ্যে হবে। মুখখানা কচি কিন্তু দেখতে মস্ত লম্বা। সমস্ত দিন জাহাজের প্রত্যেক অলিগলিতে ছুটোপাটি ক'রে বেড়ানো ছিল তার কাজ। আমার মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে সুরু ক'রে এঞ্জিন-রুম পর্য্যন্ত সে ঘুরে বেড়াত। আমাদের দেশের মেয়েরা এই বয়সে এতখানি দুরন্তপনা করতে কোনদিন পারে না। ঠিক পাঁচ বছরের মেয়ের মত সময়ে-অসময়ে এসে আমাদের কেবিনে ঢুঁ মারা ছিল তার মস্ত একটা কাজ। ভোরবেলা আমরা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই সে এসে দরজায় ঠক্ ঠক্ করত। দুপুরে খাবার পরে কেবিনে ঢুকে দেখতাম, নিশ্চিন্তমনে আমার বিছানাটি দখল করে আমার

জাহাজের মেমরা শাড়ী পরেছেন

মেয়ের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে। জেগে থাকলে দুই বন্ধুতে স্কিপিং রোপ নিয়ে লাফিয়ে, গ্রামোফোন বাজিয়ে, ডেক-গল্‌ফ খেলে জাহাজ মাতিয়ে রাখত।

কেবিন থেকে জিনিষ বাইরে নিয়ে যাওয়া বারণ। কিন্তু এরা কেবিন থেকে কম্বল বার ক'রে নিয়ে উপর তলায় ডেকে চেয়ার জোড়া দিয়ে বিছানা পেতে ঘুম দিতে মহা আনন্দ পেত। ঢেউ বেশী আর হাওয়া জোরাল হ'লে ঢেউয়ের আছড়ানির চোটে জলের গুঁড়ো গুঁড়ো কণা উপরে এসে সকলের কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দিত। প্রায়ই দেখতাম এই দুই বন্ধুর কাপড়-চোপড় ও কম্বল সব ভিজে। তাই নিয়েই তারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চেয়ার সরিয়ে সরিয়ে বিছানা পেতে বারবার শুচ্ছে।

এক জন জাপানী ভদ্রলোকও আমাদের টেবিলে খেতে বসতেন। প্রথম দিন দেখলাম লোকটি খুব বীয়ার খেল। তার পর দিন-দুই খালি জল। আবার থেকে থেকে বীয়ার খেত। এ-ব্যক্তি ইউরোপীয় আদব-কায়দার বেশী ধার ধারে না। কখনও কিমোনো প'রে খেতে আসে, কখনও মাথায় ভিজে রুমাল বেঁধে আসে, কখনও বা চানের ঘরের ছোট তোয়ালে নিয়ে খাবার টেবিলেই নাক মোছে। একদিন তাই দে'খে কে হেসেছিল। জাপানীর কাছে বোধ হয় এটা বেয়াদবি। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড স্বদেশীয়ের অসভ্যতা দেখে মহা লজ্জিত হ'য়ে টেবিলের সকলের কাছে মাপ চাইল এবং ব'লে দিল, "জাপানে কেউ এ-রকম করে না।" আমি অবশ্য তাতে আপত্তি করবার কিছু কারণ দেখতাম না। সভ্যতা বিলাতী হলেও সভ্যতা। অসভ্যতা বিলাতী হলেও অসভ্যতাই। জাহাজে বিলাতী অসভ্যতা যখন বরদাস্ত করা চলে তখন অন্য দেশীয়ও নিশ্চয় চলবে। তাছাড়া মাথায় ভিজে তোয়ালে বাঁধার চেয়ে স্বল্পবাস হয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোটাই আমাদের চোখে বেশী অসভ্যতা ব'লে মনে হয়।

জাপানী ভদ্রলোকটি বাটি আর কাঠিতে খেতেই বেশী ভালবাসত; অবশ্য, বিলাতী খানাও প্রচুর খেত। আমাদের একদিন বাটি আর কাঠি নিয়ে খেতে শিখিয়ে দিল। খেতে খুব অসুবিধা হয় না। তবে ওরা যেমন বাটিটা মুখের কাছে ধ'রে অনেক সময় প্রায় মুখ দিয়েই খাবারটা টেনে নেয়, কাঠিটা কেবল গোঁজা দেয় মাত্র, আমাদের তেমন করতে লজ্জা করে। তাছাড়া জোড়া কাঠির মধ্যে উপর দিকের কাঠিটা নাড়বারও একটা ভঙ্গী আছে যাতে খাবারের দলাটা বেশ দুটো কাঠির উপরে উঠে আসে। এই ভঙ্গীটা খুব শীঘ্র আয়ত্ত করা যায় না।

আর একটি ইউরোপীয় মহিলা আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন, বোধ হয় বেশ বড়লোক। প্রত্যহ সন্ধ্যায় খুব দামী দামী পোষাক প'রে খেতে বসতেন, নানা দেশে ঘুরে বেড়ান এবং কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স ইত্যাদিও করেন। পোষাক-পরিচ্ছদে খুব শালীনতা দে'খে মনটা প্রসন্ন ছিল তাঁর প্রতি। একদিন ঝড়বৃষ্টির সময় দেখলাম তিনিও হাফপ্যাণ্ট প'রে ডেকে দৌড়চ্ছেন।

ক্যানেডিয়ান এক মহিলাও আমাদের সঙ্গে বসতেন। বাকি দলের ছিল আর একটা টেবিল। এই টেবিলে সবই প্রায় মিশনারী মেম। এক জন বৃদ্ধা ডেন মহিলা, প্রায় চলৎশক্তি রহিত। তিনি ভারতবর্ষে ৩৪ বৎসর আছেন বললেন, লক্ষ্ণৌয়ের দিকে তাঁদের কি আশ্রম আছে। ইনি বেশ তামিল বলতে পারেন। ইনি জাভায় যাচ্ছিলেন, "নারী ও বালিকা জোগানো" ব্যবসা (Traffic

in Women and Children) বিষয়ে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। মুখখানা প্রসন্ন ও সদয় কিন্তু পুরুষের মত ভাব। খুব উঁচু নাক, পাকা চুলে বিনুনি ক'রে খোঁপা বাঁধা, সাদাসিধে পোষাক, দেখে মনে করেছিলাম বোধ হয় স্যালভেশন আর্মীর লোক। নিজেই আমার সঙ্গে ভাব করলেন। তাঁর ভাইবোনদের গল্প ক'রে আমার আত্মীয়স্বজনদেরও খোঁজ নিলেন। বললেন, "আমরা ছিলাম সাত ভাইবোন, এখন কেবল আমরা দুই বোন বেঁচে আছি। আমার বোনের অনেক নাতিনাতনী আছে, কিন্তু আমি কখনও বিয়ে করিনি (I never married)।"

আমাদের বাঙালীর কানে কথাটা অদ্ভুত শোনায়। আমাদের দেশে বিবাহ একবার মানেই চিরকালের মত।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি হিন্দু ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হিন্দুই বটে।"

ইনি ভারতীয় মেয়েদের মত ফুল-তোলা শাল মুড়ি দিয়ে বেড়াতেন, সেটা তাঁকে একজন ভারতীয় মহিলাই উপহার দিয়েছিলেন।

আর একটি মিশনারী মহিলাও আমার সঙ্গে নিজে থেকে খুব ভাব করেছিলেন, তিনি রোজ দুবেলা আমাকে ধ'রে ডেকে প্রায় ঘোড়দৌড় করাতেন। এঁর বয়স বেশ হয়েছে, কিন্তু খুব দ্রুত পায়ে ছুটতে পারেন। আমরা সচরাচর অত জোরে কখনও হাঁটি না, তবে দুই-এক দিন অভ্যাস করলেই পারা যায়। এঁরা খুব জোরে হাঁটলেও বেশীক্ষণ পারেন না। একটু পরেই ডেক-চেয়ারে পিঠ দিয়ে বিশ্রাম চাই।

জাহাজে মেমসাহেবদের কার ক'টা শাড়ী আছে, কোনটার কি রং, কি পাড়, সব আমাকে ফর্দ্দ দিতেন। এঁদের যাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যায় ভারতবর্ষ কেমন লাগে, সবাই বলেন "Oh, I love India।" জানি না কত জনের কথা সত্য। পথে এঁরা আমাদের সঙ্গে খুব আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতেন। মিশনারী মেমরা কারুর একটু শরীর খারাপ হলেই ঔষধ পথ্য বালিশ জল নিয়ে সাহায্য করতে বারবার ছুটে আসতেন। আমরা এত তাড়াতাড়ি মানুষের অত কাছে আসতে সঙ্কোচ বোধ করি। এঁদের আত্মীয়তা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম যাই হোক, পথে প্রবাসে মানুষকে যথেষ্ট আনন্দ দেয় ও আরাম দেয়।

বাংলার পল্লী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত ড্রাইপয়েন্ট

বাউল—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত ড্রাইপয়েন্ট
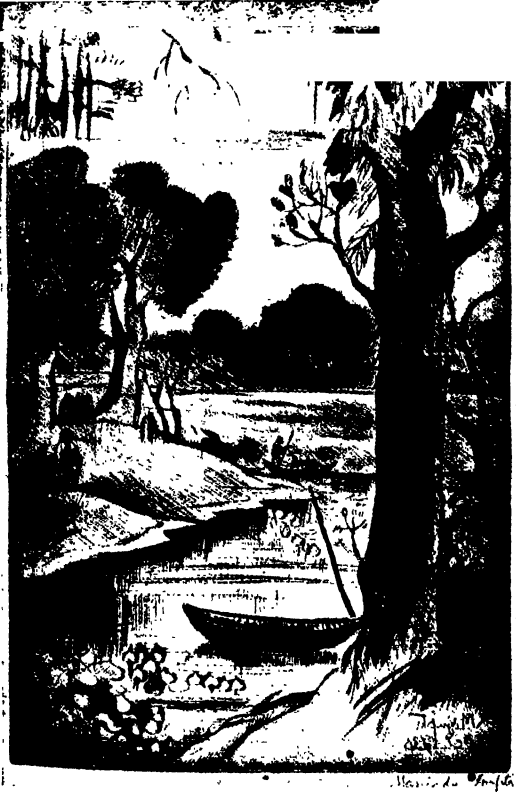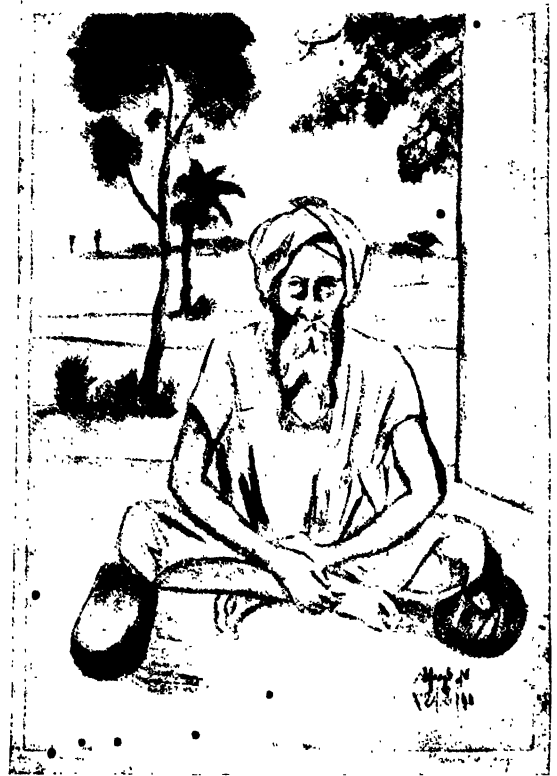
প্যালেষ্টাইনের মরু-মাঠে উপনিবেশ

প্যালেষ্টাইনের মরু-মাঠ

প্যালেষ্টাইন প্রাসঙ্গিক

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

অক্সফোর্ড, মে ১৯৩৭

কলেজের ছুটি। বেলিয়লে আমার ঘরে বসে আছি। বসন্তের রোদ্দুরে ফুল ধরেছে; ধূসর দেয়ালে কাঁপছে চিকণ আইভি-পাতার ছায়া। অক্সফোর্ডের অগণ্য চূড়া উঠেছে হাওয়ায়; খোলা দরজার সামনে ঘন ঘাসের সতরঞ্চি। ঐশ্বর্য্যের টুকরো কলেজের এই লন্-গুলি, বাহারে পাড় নেই, চোখ-ডোবানো সবুজের ধারে পুরনো দেয়ালের পাথর। ঘণ্টার মন্দ্র বেজে ওঠে গীর্জ্জের উঁচু থেকে; কাছে দূরে; য়ুরোপীয় মধ্যযুগের ধ্বনি। ঘরে কিছু নূতন কাব্য রেখেছি; দু-মিনিটের পথ বডলিয়ন গ্রন্থসমুদ্র। কাজ সেরে আমার দেশে ফেরবার সময় হ'ল। বিদেশী পথের শব্দের ফাটলে সানাইয়ের সুর কানে লাগে, ওপারটা যেন চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইংলণ্ড দেখা দেয় আবার দ্বীপ হয়ে, ছোট দ্বীপ, ঝাপসা তটে ঢেউ আছড়াচ্ছে। এখানেও ঘর বেঁধেছি; বন্ধুময় করুণা ঘিরল অক্সফোর্ডের আকাশে;—অনেক দিন কাটল।

ফেরবার পথে প্যালেষ্টাইন ঘুরে যাবার নিমন্ত্রণ। ঐ দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধি এসেছিলেন লণ্ডনে; জেরুজেলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বক্তৃতার ডাক পড়ল, নূতন সভ্যতার পত্তন হচ্ছে চোখে দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। বহু দিনের ইচ্ছা মিটবে মনে হ'ল। ওঁদের দু-জনকে আজ কলেজে মধ্যাহ্নভোজনে ডেকেছি, লণ্ডন থেকে দু-ঘণ্টার জন্যে আসছেন। অধ্যাপক লিপিয়ে বন্ধু কয়েক জনকে বলেছি যোগ দিতে। আমার ঘরের স্কাউট্ ভিয়েরি উৎসাহিত; হাল্কা সুন্দর লাঞ্চের ব্যবস্থায় তার দক্ষতা অসাধারণ। ব্যবহারের সৌজন্য পেয়েছি এর কাছে; বেলিয়ল-জীবনের সঙ্গে তা মিশে থাকবে।

*　　*　　*　　*

এক্সেন প্রোভাঁস, জুন ১৯৩৭

আশ্চর্য্য আবিষ্কারের বার্ত্তা গোপন করব না,—মার্সেইয়ে জাহাজ ধরবার যাত্রীর পক্ষে এমন জায়গা আর নেই। মোটরে এক ঘণ্টার কম পথ; প্রাচীন প্রোভাঁস-জীবন সঙ্গত হয়েছে আধুনিক পরিপাটি শহরের ছন্দে। কাফে-গুলির তুলনা নেই, সারি চলেছে গাছের ছায়ায় ঘেরা রাস্তার দু-ধারে। হঠাৎ চোখে পড়ে বহুকালের প্রকাণ্ড দরজা, পিতলের ড্রাগন্-মূর্ত্তি বসান; জালি-কাজকরা দেয়ালের টুকরো সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীত কালের, নূতন বাড়ীর কোণায় অপ্রাসঙ্গিক মাধুর্য্য। এখানকার ঝরণার আধারগুলি প্রসিদ্ধ; ঢালাই-করা বিচিত্র জানোয়ার জলের রূপ-খেলায় ব্যস্ত; জোরাল তাদের অঙ্গরেখা। সবুজ মরচে প'ড়ে মানানসই হয়েছে। পি. ই. এন. কংগ্রেস সেরে এখানে এলাম। এবারে ফ্রান্সের অনেকটা ভিতরে ঢোক্‌বার সুবিধে পেয়েছি। প্যারিসে সভাসমিতি আলোচনা সামাজিক সম্মেলন; প্রদর্শনীকে ঘিরে ফরাসী চিত্রের, স্থাপত্যশিল্পের বিরাট আয়োজন। লুভারে আলো দিয়েছে, পাথরের মূর্ত্তি রাত্রে খচিত হয়ে

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক পি. ই. এন. আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা

ওঠে; প্রাডোর শ্রেষ্ঠ ছবি ধারে এসেছে, অপরূপ দেখবার সুযোগ। কংগ্রেসের এক দল আমরা বেরিয়েছিলেম লোআর ভ্যালির শ্যাটোগুলি দেখতে—(এইখানে বলে রাখি শ্যাটো কঁদে-তে যাই নি; ডিউক অব উইণ্ডসরের মধু-চন্দ্রযাপনের স্মৃতিকণা কুড়োনোর ভার মুখ্যত মার্কিন টুরিষ্টের হাতে ন্যস্ত। ব্লোয়া, তুর, ম্যাঁৎন, ভিলানড্রি··· কত আর নাম করব। সুখের বিষয়, আশ্চর্য্য এই সৌধগুলি আজ মুাজিয়মে পরিণত; সৌখীন বাগান, সাজসজ্জার রাজকীয় বিলাস আঙুরক্ষেতের গরীব চাষীদের বুকে ব'সে নৃত্য করছে না। শ্যাটোগুলি সমস্ত দেশের সম্পত্তি; দু-চারটে যা বাকী আছে সম্প্রদানে দেরি হবে না। অতীতের সঙ্গে কলহ করব না; আজকের দিনে অন্য ব্যবস্থা সইত না। ভারতবর্ষের নকল নৃপতিগুলির ঐশ্বর্য্যপুরী যখন জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডারে পরিণত হবে একবার দেখে আসব। মধ্যে আনাতোল ফ্রাঁসের শেষ-বয়সের বাড়ী স্যাঁসের সুর্-লোআর (St. Cyr sur Loire)-এ তীর্থ করা গেল। সার্ৎর্ (Chartres)-এর ক্যাথিড্রালে মায়া ঘনিয়ে ধরে। য়ুরোপের বহুমানিত সম্পদ এটি, বিশুদ্ধ গথিক ছন্দের প্রার্থনা। পাথরে মূর্ত্তিতে কারুরেখায় খ্রীষ্টীয় সাধনার প্রসন্নতা পরিব্যাপ্ত। দীপ জ্বলছে, ধূপ জ্বলছে; মাটির গভীর নীচের প্রকোষ্ঠে ফ্রেস্কো এবং স্থাপত্যের ভাষা থেকে বোঝা যায় প্রথম ভিত্তি-রচনার কাল খ্রীষ্ট-যুগের বহু পূর্ব্বে। দুঃখের বিষয় পাহাড়তলী গ্রামটায় মিলিটারি এরোড্রোম হওয়ায় চারি দিকের আকাশ ভীমরুলের চাক হয়ে উঠেছে। রুয়াঁ-শহরে আমাদের পি. ই. এন.-এর দলকে স্পেশাল ট্রেনে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল; জ্যাঁন্দার্কের-এর কথা ফরাসী জাতি ভুলতে পারে নি। সেখান থেকে মোটরে গেলাম স্যাঁ, ভাঁদ্রীই (St. Wandrille)-এর বহু প্রাচীন মঠ দেখতে। দীর্ঘকাল একান্ত নিরালায় এইখানে সন্ন্যাসব্রতীদের কাছে জীবন কাটিয়েছিলেন মেটারলিঙ্ক। চারি দিকে ভগ্নস্তূপ, সাধনার একটি ঋজু সঙ্কীর্ণ ধারা তারই মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

ফ্রান্সের কথা এখন নয়; পি. ই. এন. কংগ্রেসের বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি। সব চেয়ে ভাল লাগল এবারকার সম্মেলনের জাগ্রত ভাব। পৃথিবী-জোড়া মরণ-বাঁচন কঠিন সমস্যার দিনে লিখিয়ে-আঁকিয়ের দল বলেন নি ত্রেতাযুগের স্বপ্নবিলাস করবেন। সৃষ্টিকর্ম্মীরূপেই তাঁরা বলেছেন স্বাধীনতার ধ্বজা আমাদের কলমে, তুলির ডগায়; যেখানে মানুষকে অস্বীকার করছে আধুনিক সভ্যতা—পলিটিক্স নয়, প্রাণের দিক থেকেই তাঁরা প্রতিবাদ করবেন। স্পেনের

শ্রেষ্ঠ কবি, লর্কা, অন্ধ ভ্রাতৃঘাতক ফ্রাঙ্কোর দল তাঁকে খুন করেছে। জার্ম্মানীতে ওসিয়েট্‌স্‌কি আজ নামে নেই কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, কিন্তু তাঁর নার্সিং হোমের চারি দিকে প্রহরী, নাৎসি রাজত্ব ছেড়ে যাওয়া বন্ধ। বিষাক্ত হাওয়ার মধ্যে থেকে একদিন মাথা তুলে ইনি কণ্ঠে এবং কলমে শান্তির কথা বলেছিলেন, জার্ম্মানীর গোপন যুদ্ধ-আয়োজনের বার্ত্তা গোপন রাখেন নি। বলেন নি জার্ম্মানীর গৌরবের পথ কামানের গোলার অনুবর্ত্তী। এর বাড়া পাপ কি হ'তে পারে? পি. ই. এন.-এর ইনি সভ্য, নোবেল প্রাইজ দ্বারা সম্মানিত—কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর এবং কবি লর্কার বিষয়ে যথাযোগ্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। পি. ই. এন.-এর আদর্শ রাষ্ট্রিক হিসাববুদ্ধি দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মুক্তি এবং মৈত্রীকে মানে, এই পুরনো কথা ঘোষণা করা হ'ল স্পষ্ট ক'রে—দরকার ছিল। মারিনেত্তি-জাতীয় ইটালীয় এবং অন্য দেশীয় দু-একটি লেখক গোলমালের সূত্রপাত করেছিলেন, সুবিধে হ'ল না। উক্ত ভদ্রলোক এক

হুলে হ্রদ। শ্যাওলা ও আগাছাগুল্মে আচ্ছন্ন এই হ্রদটিকে য়িহুদীরা স্বচ্ছ জলাশয় ও বাসযোগ্য উপনিবেশে পরিণত করায় নিযুক্ত।

সুপ্রভাতে অদর্শন হলেন আপন উষ্মা এবং রেলওয়ে টিকিট বহন ক'রে স্বদেশের পানে। পূর্ব্বে একদা বক্তৃতাঘরে বুকে মুষলাঘাত ক'রে জানিয়েছিলেন তিনি ফাসিষ্ট কবি, ধর্ম্মকাব্য রচনা করেছেন আবিসিনীয়ার রক্তপ্লাবন নিয়ে। ছন্দের ধমনীতে মেশিন-গান শোনা যায়। পড়ে স্বয়ং মহাপ্রভু মুগ্ধ। ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ফেরেরো বহুকাল ইটালী হ'তে নির্ব্বাসিত—তাঁর বক্তৃতা কংগ্রেসকে যেমন নাড়া দিয়েছিল এমন আর কারও নয়। বিদ্বেষ নেই ভাষায়, মনীষার দীপ্তি তাঁর শান্ত চোখে। জুল রোমাঁ্যা যোগ্য সভাপতি; আন্তর্জাতিক পি. ই. এন.-এর ইনি প্রেসিডেণ্ট। ফয়েক্‌ট্‌ওয়াঙ্গার এবং হাইনরিক মান্‌ চলেছেন স্পেনে। চাপেক্‌ যেমন লেখায় তেমনি কথায় ব্যবহারে হাস্যোজ্জ্বল; বলছিলেন প্রাগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা কখনও ভোলেন নি। জুলিয়া বাঁদা-র খরধার ফরাসী ভাষা যতটা না বুঝি, শুনেও সুখ পেতে হয়। আধুনিক ইন্‌টেলেকচ্যুয়ালদের যেমন ক'রে দায়িক করেছিলেন যুদ্ধের পরে,

য়িহুদী-উপনিবেশ নাহালাল। মরুভূমির মধ্যে জল রাখবার ব্যবস্থা।

প্রাচীন আরব শহর, এস্ সাণ্ট

হাইনা ও নাজারেথের মধ্যবর্ত্তী য়িহুদীদিগের নাহালাল উপনিবেশ

ট্রান্সজর্ডানিয়ার রাজধানী আমান। বামদিকে প্রাচীন রোমক আম্ফিথিয়েটার বা প্রেক্ষাগৃহের ধ্বংসাবশেষ
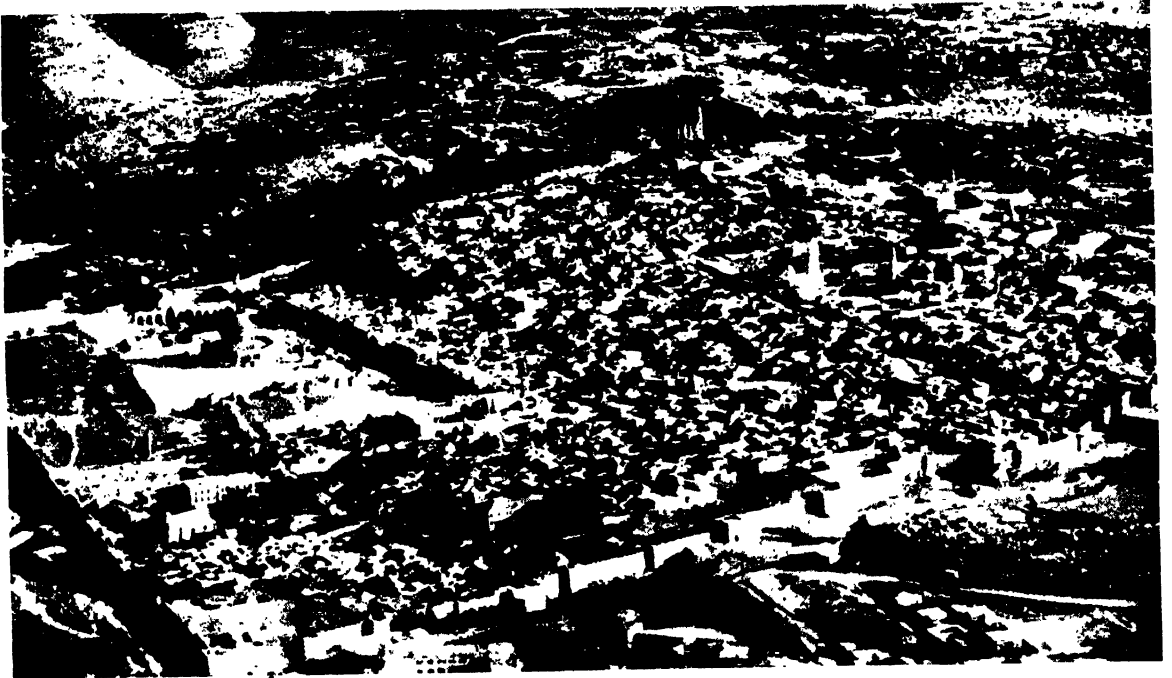
পশ্চিম জেরুসালেম। 'তিন ধর্মের তীর্থস্থান ও প্যালেষ্টাইনের রাজধানী

সবাই এঁকে শ্রদ্ধা করেছি। প্রীস্টলিকে ভাল লাগল; খাঁটি ইংরেজ, কোন আড়ম্বর নেই। সোশ্যালিজমে নেমেছেন দলের নামে নয়, অভিজ্ঞতার ফলে। লণ্ডন-কেন্দ্রের সেক্রেটরী সর্ব্বজনপ্রিয় হার্ম্মন্ উল্ড এসেছিলেন···নানা দেশীয় নৃসিংহ যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের নাম-মালা দেবার বাসনা নেই। ব'লে শেষ করি, ভারতবর্ষের লেখকদের কাছে সমস্ত কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিবাদন পাঠানো হ'ল—ইণ্ডিয়ান পি. ই. এন.-এর যোগে শ্রীমতী ওয়াদিয়া সবাইকে জানাবে।

মজার কথা—নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও জানাতে দোষ নেই। জেম্‌স্ জয়েসের সঙ্গে বেশ জমেছিল; তাঁর ফ্ল্যাটে ব'সে আছি, হঠাৎ বললেন তোমার নামের অর্থটা বুঝিয়ে বলো। খানিক বাদে গম্ভীর মুখে *Dubliners* বইয়ের এক কপি এনে আমাকে উপহার দিলেন—তাতে লিখেছেন, বইখানি দিচ্ছি Mr. Ambrose Wheelerকে।

টেল-আভিভ, ৮ই জুলাই

রাত্রের তারা জ্বলছে সুয়েজ ক্যানালের স্বচ্ছ জলে; দূর থেকে সার্চ্চ-লাইট ফেলে রাজহংসের মত ভেসে আসছে একটি বড় জাহাজ। আল ক্যান্টারায় ট্রেন থেকে নেমে ফেরি-যোগে ক্যানাল পার হলেম প্যালেষ্টাইনের গাড়ী ধরব ব'লে। মরুভূমি চিরে রাত্রের গাড়ী চলল; বিছানায় শুয়ে ভোরের আলোয়

জেরুজেলেমের কাছে আইন-কারেম নামে আরব গ্রাম

আইন-কায়েমের আরব-পল্লী

জেরুজেলেমের কাছে আরব গ্রাম—বীর-জেইটে আরব-পরিবার কর্ত্তৃক লেখককে আতিথ্যদান

চোখে পড়ল গাজা ষ্টেশন। খেজুরগাছ, উটের সারি, তরমুজের ঝাঁকা গুনে চলেছি, অগণ্য বালির দিগন্ত পেরিয়ে লীডায় এসে পৌঁছলেম। দেখি ডক্টর অলসভ্যাজার উপস্থিত; বললেন, এখান থেকে মোটরে গেলে অনেকটা সুবিধে। এক ঘণ্টার পথ টেল-আভিভ।

প্যালেষ্টাইন, 'ডেড সী'র তীরে

লৌহদানব মিশর এবং জুডিয়ার বালি ভেঙে এ পর্য্যন্ত এনেছে, দেখলাম দু-ভাগ হয়ে গড়িয়ে চলল জেরুজেলেম এবং হাইফা-র দিকে। এর পরে প্যালেষ্টাইন, সীরিয়া, লেবানন কোথাও ট্রেন ব্যবহার করতে হয় নি, মোটরের সুন্দর পথ সর্ব্বত্র; ফিরেছি মিশরের এরোপ্লেনে, পাইলট ইংরেজ। মনে রাখতে হবে পথ কেবল ইংরেজ-ফরাসীর বানানো নয়; তুরস্কের আমলে, প্যালেষ্টাইনের পথঘাটের দশার কথা না বলাই ভাল। যেখানেই য়িহুদী কর্ম্মীর দল এসেছে, পাহাড় কেটে বানিয়েছে চওড়া রাস্তা, দু-পাশে লাগিয়েছে গাছ। তারই ছায়া দিয়ে চলল আমাদের মোটর জাফা পেরিয়ে টেল-আভিভের দিকে।

পথের কথাটা ছোট নয়, দেশের সত্তাকে ঐক্য দেয় পথের বাঁধন, এক যুগ থেকে উদ্ধার করে অন্য যুগে। ভারতীয় পথ ছিল ঘোড়া গরুর গাড়ীর যুগে, বাঁধন ছিল ঢিলে, গতি মন্থর। ফিরবে না সে যুগ। ইংরেজ এনেছে রেলওয়ে, যথেষ্ট নয়; তা ছাড়া দেশের মর্ম্মে লোহার লাইন পৌঁছবে সাধ্য নেই। পথও গড়েছে, শহরে ঘাটে ব্যবসা চালাবার মত, শাসনবিধানের জন্যে যেটুকু দরকার। পথের দৌড় গ্রামে গ্রামে পঙ্ককুণ্ডে অবসান, ধুলোয় অবলুপ্ত। বোঝা যায় আস্ফালন সত্ত্বেও বিদেশী রাষ্ট্রের গ্রন্থি শিথিল। সমস্ত দেশকে অধিকার ক'রে নূতন সভ্যতার ধারা শিরা-উপশিরায় বইয়ে দেবার চৈতন্যশক্তি নেই রাষ্ট্রিক শাসনকেন্দ্রে। নবীন ভারতের পথ-বানিয়ের দল জাগবে দেশেরই সমাজ থেকে। পর-রাজ্যের পথ প্রাণের চলাচলের কাজে ঠিকমত লাগে না, বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রহরী বসিয়ে অন্যের মাটিতে তার রক্ষার আয়োজন। ইম্পীরিয়াল সভ্যতা স্থাপনের প্রণালী এই; পথ-নির্ম্মাতা চলে বন্দুক ব্যারাক্ সৈন্যবাহিনী সামনে পিছনে রেখে। আবিসিনিয়ায় যুগান্তরের পথ কাটছে ব'লে ফাসিষ্ট দস্যুদলের আস্ফালন; এই বিশিষ্ট সভ্যনীতি রাস্তার সিমেন্টের জন্যে চায় নরকঙ্কাল, এবং যারা পথে চলবে তাদেরই মারবার জন্যে বিষবাষ্প। জনকয়েক নব্য রোমান সাম্রাজ্যের দূত অত্যাশ্চর্য্য এই পথে ধুলো উড়িয়ে আনাগোনা করবেন লুঠের সন্ধানে। এ পথ টেকে না। আধুনিক কালের য়িহুদীরা প্যালেষ্টাইনে এসেছে বিনা অস্ত্রে, এনেছে হাত, দু-চারটে হাতিয়ার এবং গড়বার বুদ্ধি। য়ুরোপে সর্ব্বস্ব বিকিয়েও মানবত্বের আদর্শটুকু সঙ্গে রেখেছে; ধ্বংসের উন্মাদনা নেই ব'লে বীর্য্য দেখাতে পারল মরুভূমিতে ক্ষেত বানিয়ে, শহর তুলে; এর মধ্য দিয়ে যে-পথের পত্তন হচ্ছে মনে হয় তার সঙ্গে দেশের নাড়ীর যোগ আছে। আরব-পল্লীর প্রাণ যদি জাগিয়ে থাকে, য়িহুদী নয়, আরবী নয়, সাম্যধর্ম্মী নূতন প্যালেষ্টিনিয়ান সভ্যতা গড়বার কাজে দুই সম্প্রদায়কে মেলাতে চায়, তবেই জানব এরা মানুষের পথ বানাচ্ছে।

মনে হয় বার্লিনের প্রান্তে এসে পৌঁছচ্ছি—রাতারাতি উঠেছে টেল-আভিভের এই শহর মনসাগাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বালির রাজ্যে ঝকঝকে বাড়ীর সারি দেখা যায়।

শুঁয়োপোকার মৃত্যু-অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

লেমিংস্ নামক ইঁদুরের মত এক জাতীয় প্রাণী পাহাড়-পর্ব্বতের আশেপাশে দলবদ্ধভাবে বাস করিয়া থাকে। এত দ্রুতগতিতে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে যে কিছুদিনের মধ্যেই চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালীন প্রখর রৌদ্রের তাপে ঘাসপাতা শুকাইয়া গেলে তাহাদের মধ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন হঠাৎ একদিন দেখা যায় তাহারা যেন পরামর্শ করিয়াই—শীত নাই, রৌদ্র নাই, খাদ্যের অভাব নাই—এমন এক অজানা কল্পিত সুখের রাজ্যের অভিমুখে ছুটিতে থাকে। পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, শহর-বন্দর অতিক্রম করিয়া, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লেমিংস্ দলে দলে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। শত সহস্র বাধাবিঘ্ন, প্রাকৃতিক বিপ্লব, নানাবিধ শত্রুর আক্রমণ—কিছুই ইহাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জীবন থাকিতে এইরূপ অজানা কোন সুখের রাজ্যে পৌঁছিতে না পারিলেও, সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমুদ্রই হউক বা যাহাই হউক—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—অগ্রসর হইতেই হইবে। যত ক্ষণ সমুদ্রের ঢেউ তাহাদিগকে অতলে নিমজ্জিত না করে অথবা সামুদ্রিক হিংস্রপ্রাণীর কুক্ষিগত না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত সাঁতরাইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অদ্ভুত ইহাদের সংস্কার! এই সংস্কারের দ্বারাই হয়ত প্রকৃতি প্রাণীজগতের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে।

ক্যারিবু নামক এক জাতীয় হরিণের মধ্যেও এই ধরণের অদ্ভুত সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের চারণ-ভূমিতে কোন প্রাকৃতিক উৎপাত অথবা খাদ্যাভাবের আশঙ্কা দেখা দিলেই হাজার হাজার হরিণ দলবদ্ধ হইয়া কোনও এক কল্পিত নন্দনকাননে উপনীত হইবার জন্য নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত সকল রকম বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কবে যে ইহাদের যাত্রাপথ সমাপ্ত হইবে তাহা ইহারা জানে না—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অভিযান চলিতে থাকে—এমনই দৃঢ় একটা সংস্কার!

শ্রেষ্ঠতম প্রাণীদের মধ্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে যাযাবরবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও। কিন্তু কাল্পনিক সুখের আশায় (একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী ছাড়া) লেমিংস্-এর মত মহাযাত্রার এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় উন্নত অবনত সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই একান্ত বিরল। কিন্তু সম্প্রতি কীট-পতঙ্গশ্রেণীর এক-জাতীয় শুঁয়োপোকার লেমিংস্এর মত মৃত্যু-অভিযান প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমাদের দেশীয় জবা বা কাঁঠালীচাঁপা প্রভৃতি গাছের পাতার নিম্নভাগে ঈষৎ সবুজাভ সাদা রঙের এক জাতীয় শুঁয়োপোকা দেখিতে পাওয়া যায়।

হাজার হাজার 'ক্যারিবু' হরিণ কল্পিত নন্দন-কাননের পথে অগ্রসর হইতেছে।

লজ্জাবতী গাছের টবের কাণার উপর সাদা রঙের শুঁয়োপোকাগুলি চক্রাকারে ঘুরিতেছে।

লক্ষ লক্ষ লেমিংস্‌-এর মৃত্যু-অভিযান

ইহারা মথ-জাতীয় এক প্রকার কাল রঙের প্রজাপতির বাচ্চা। প্রজাপতি পাতার গায়ে একসঙ্গে ১০।১৫ হইতে ২০।২৫টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া রাখিয়া যায়। দশ-বার দিন পরে ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট শুঁয়োপোকা বাহির হইয়া একসঙ্গেই অবস্থান করে। এক-একটা গাছে এরূপ পাঁচ-সাতটা হইতে বিশটা পর্য্যন্ত বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ ভাবেই গাছের পাতা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়—কখনও দলছাড়া হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে না। খুব ছোট অবস্থায় যখন এক ডাল হইতে অন্য ডালে যাইবার প্রয়োজন হয় তখন মাকড়সার মত মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া অন্যত্র যায়—সকলেই একসঙ্গে সুতা ছাড়িয়া কতকটা জালের মত যাতায়াতের রাস্তা সৃষ্টি করে বলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে না। সহজেই অন্যত্র গিয়া একসঙ্গে জড় হইতে পারে।

গাছপালা-বিবর্জ্জিত একটা পাথরের বেদীর উপর কোন কারণে ছোট একটি গাছসহ টব রাখা হইয়াছিল। একদিন সকালবেলায় দেখা গেল—সেই সিমেন্টের মেঝের উপর দিয়া দূর হইতে প্রায় দশ-বারটা সাদা রঙের শুঁয়োপোকা পিঁপড়ের মত সার বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। আশেপাশে গাছপালা নাই—ইহারা কোথা হইতে আসিল? আর এদিকেই বা অগ্রসর হইতেছে কেন? ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ ভাবিতেছি, দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া টবটার পাশে উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইবার পর লাইনটা যেন কতকটা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল—কেহ কেহ এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়া, কেহ কেহ বা মাথা উঁচাইয়া কিছু যেন অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় উহারা টবের উপরের গাছটার গন্ধই পাইয়াছিল। কারণ খানিক বাদে দেখা গেল উহারা আবার পূর্ব্বের মত লাইন করিয়াই টবের গা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। টবের কানার প্রায় দেড় ইঞ্চি নীচে মাটির মধ্যে গাছটি জন্মিয়াছিল। শুঁয়োপোকাগুলি একে একে উপরে উঠিয়াই টবের গোলাকার কানার উপর দিয়া ঘুরিতে লাগিল। কারণ গোলাকার রাস্তার আর অন্ত পায় না। এদিকে পাতার গন্ধ পাইয়াও বুঝিতেছে খাদ্যবস্তু অতি নিকট; কারণ ইহারা গাছের পাতা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। এদিকে রাস্তাও ফুরায় না। গোলকধাঁধায় পড়িয়া একই রাস্তায় বার-বার ঘুরিয়া মরিতেছে—ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও ইহাদের নাই। প্রায় সমস্ত কানাটা জুড়িয়াই ইহারা চলিতেছিল। মাঝে একটু ফাঁকও নাই যাহাতে অগ্রগামী একটু এদিক-ওদিক মাথা ঘুরাইয়া অবস্থা তদারক করিতে পারে—কেবল একে অন্যকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—তাহাতে আবার অনাহার। একদিন একরাত্রি চলিয়া গেল—তখনও দেখি সেই অগ্রগতির বিরাম নাই। এরূপ অবস্থায় পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি অতীত হইল।

পঞ্চম দিন বেলাশেষে অনাহারে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে দলের একটি শুঁয়োপোকা যেন অসাড় ভাবেই লাইন হইতে নীচে পড়িয়া গেল—এবং কিছুক্ষণ বাদেই তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা গেল। ভাবিলাম, একটা পোকা মরিয়া যাওয়াতে ইহাদের লাইনের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা হইবে এবং অগ্রগামী পোকাটা একটু ফাঁকা দেখিয়া এদিক-ওদিক মাথা ফিরাইয়া টবের মাটি বাহিয়া গাছটার উপর উঠিতে পারিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটা শুঁয়োপোকা পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও লাইনের মধ্যে একটুও ফাঁক দেখিতে পাইলাম না—পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই একে অপরকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ব্যাপার আর কিছুই নহে, মৃত শুঁয়োপোকাটা যখন দলে ছিল তখন ঠিকমত ইহাদের স্থান সংকুলান হইতেছিল না—ইহারা নিজ নিজ শরীর কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া চলিতেছিল। ষষ্ঠ দিনে দেখা গেল আরও গোটাতিনেক শুঁয়োপোকা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—তবুও তাহাদের লাইনের মধ্যে বড়-একটা ফাঁক দেখিতে পাইলাম না—ইহারা শরীরটাকে অসম্ভব লম্বা করিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। মনে হইল যেন এক একটা শুঁয়োপোকা দৈর্ঘ্যে অন্তত দেড় গুণ লম্বা হইয়াছে. সপ্তম দিনে আরও কয়েকটা মারা গেল—এবার যেন ইহাদের গতিবেগ প্রায়শঃই মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই যেন জোর করিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রায় দেড় শত হাত দূরে একটা ছোট্ট চাঁপাগাছ হইতে শুষ্ক ঘাসপাতা, কাঁকর-পাথর অতিক্রম করিয়া কল্পিত সুখের আশায় বরাবর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ইহারা দৈবক্রমে এই টবের গাছটার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, চাঁপাগাছটার পাতা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং আশেপাশে তাহাদের খাইবার উপযুক্ত কোন গাছও ছিল না। কিন্তু আশেপাশে না চাহিয়া ইহাদের অগ্রগতির এই দৃঢ় সংস্কারই ইহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর এই শুঁয়োপোকা লইয়া পরীক্ষা সুরু করিলাম—এরূপ একটা ঘটনা কি দৈবাৎ ঘটিল, না ইহাদের স্বভাবই এইরূপ? টবের কানায় কানায় জল ভর্ত্তি করিয়া এই জাতীয় এক দল শুঁয়োপোকাসহ একটি জবাগাছ পুঁতিয়া দিলাম। পাতা খাইয়া নিঃশেস করিবার পর ইহারাও একদিন নূতন খাদ্যপূর্ণ স্থানের উদ্দেশে অভিযান সুরু করিল। গাছটার গা বাহিয়া নীচে নামিয়াই দেখে জল, কিন্তু তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই—একটা শুঁয়োপোকা জলের উপর নামিয়া শরীরটাকে নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটু অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পিছনেরটা জলে নামিয়া পড়িল; এইরূপে একটার পর একটা করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই জলে নামিয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া ভাসিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর পাড়ে উঠিয়া টবের কানার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঘুরিতে সুরু করিয়া দিল। যাবৎ মৃত্যু আসিয়া ইহাদিগকে না থামাইবে তাবৎ অহোরাত্র এই চক্রাকার পরিভ্রমণ চলিতেই থাকিবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা যখন এক ইঞ্চি হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় তখনই নূতন স্থানের সন্ধানে ইহাদের এইরূপ অভিযান করিতে দেখা যায়, পূর্ণ বয়সে ইহারা তিন ইঞ্চি সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা হয় এবং গায়ের রং কালো হইয়া যায়।

আউশ ধান

শ্রীমনোজ বসু

ধান গাছে কথা কয়, ধানবন ডেকে ডেকে রূপ দেখায়। শুনেছ কখনও? মেঘের মত কালো কচি কচি ধানের চারা—দেমাক তাদের গায়ে ধরে না। তুমি যদি আ'ল-পথে যাও কোন দিন, থমকে দাঁড়াতে হবে। সাধ্য কি—হাঁ ক'রে খানিক না-তাকিয়ে থেকে চলে যেতে পার!

আরও কত জনের কত জমি রয়েছে, জীবধরের ত মোটে বার বিঘে! কিন্তু তার মত কারও নয়। ক্ষেতে নামলে খাওয়া-নাওয়ার জ্ঞান থাকে না জীবধরের। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। মাঠ দিয়ে আগুনের হল্কা বয়ে চলেছে। জীবধর জন-আষ্টেক কৃষাণ নিয়ে আড়াই পহর অবধি ক্ষেতে নিড়ান দিয়েছে। তার পর বাড়ী এসে খেয়ে-দেয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে। ঘুম বেশ এঁটে এসেছে, এমন সময় শুনল, দুলি ডাকছে—ও বাবা, বাবা—আম কুড়োতে যাবে? বড়-হেলার তলায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম পড়েছে ঠিক।

জীবধর জবাব দিল—উঁহু, তুই যা। ঘুম পাতলা হয়ে এল। জীবধর শুনতে লাগল, খড়ের চালে জল পড়বার শব্দ,...বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া এসে বেড়ায় ধাক্কা দিচ্ছে। তার পর উঠে তামাক সাজতে বসল। দুলি এই জলের মধ্যে বেরিয়ে গেছে। ডাকাত মেয়ে!

হুঁকা টানতে টানতে জীবধরের বড় স্ফূর্ত্তি লাগল। এই

বৃষ্টিটায় ধানের চারা এক হাত বেড়ে উঠবে। তার পর মনে পড়ল, সরকারদের এঁদো পুকুরে খুব সম্ভব কইমাছ উঠতে লেগেছে; বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি—এ সময় মাছ ডাঙায় না উঠে যায় না। গামছা মাথায় সে চুপি চুপি বেরুল।

পুকুরের কোণে কাঁটা-ঝিটকের ঝোপ। জীবধর সেইখানটায় চুপ ক'রে ব'সে রইল। জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। মাছ খল্‌বল্‌ করছে, কিন্তু একটাও ডাঙায় ওঠে না।

—হ'ল কিছু?

ঘাড় তুলে দেখে কানাই গায়েন। হাতে তার একটা খালুই। সে-ও একই উদ্দেশে বেরিয়েছে। কানাই বলল—এখানে কিছু হবে না, বার জনে ঘাঁটা দিয়ে গেছে। তার পর ফিস-ফিস ক'রে বলতে লাগল—মাঠের দিকে যাই চল। নৈমদ্দি মোড়ল শোলা-বনে চারো পেতেছে। বিশ-ত্রিশখান পেতেছে। চারো কই-মাগুরে ভরে গেছে। সোলা-বনের মাগুর—জান ত?

কানাই দু-হাতে মাগুর মাছের যে আয়তন দেখাল, রুই-কাৎলাও অত বড় হয় না। পায়ের উপর দিয়ে স্রোত চলেছে, ছপছপ ক'রে দু-জনে মাঠের দিকে চলল। জীবধর বলল—নৈমদ্দি যদি ঘাপটি মেরে ব'সে থাকে কোথাও?

—বয়ে গেছে নৈমদ্দির। যাত্রার দল ক'রে বেড়ায়, এই বৃষ্টিতে বৈঠকঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে,—দেখগে যাও—

আ'লের উপর দিয়ে পথ। আ'লের কানায় কানায় জল। আর একটু এগুতে পায়ের পাতা ডুবে যেতে লাগল। জীবধর বলল—বাপ রে, জল জমেছে ত খুব—

কানাই বলল—তা বৃষ্টিটা কম হ'ল নাকি! মাঠে ঘাস-পাতা মিলছিল না। গরুগুলো শুকিয়ে মরছিল; এবার খেয়ে বাঁচবে—

—তোমার ত কেবল গরু আর গরু। ভুঁই-ক্ষেত ছেড়ে চাষার ছেলে গোয়ালা হ'লে হয় ঐ রকম।

কিন্তু হাসতে গিয়ে জীবধরের হাসি এল না। সে অবাক হয়ে গেছে। বলল—আরে, বিল যে জলে জলে নৈরেকার। দেলখোলায় জল উঠেছে—কাণ্ডটা কি!

কানাই বলল—দাঁড়িয়ে গেলে যে।

জীবধর বলল—তুমি এগুতে লাগ, কানাই। আমি মাঠের দিকটা ঘুরে অমনি যাচ্ছি। না-হয় দু-জনেই ঐ পথে ঘুরে যাই চল।

কিন্তু কানাইয়ের এক কাঠা জমি নেই, মাঠে ঘুরতে যাবে সে কি দেখতে? জীবধর একাই চলল।

দূর থেকে দেখা গেল, আ'লের উপর দুলি দাঁড়িয়ে। বাতাসে খোলা চুল উড়ছে, দিগন্ত-বিসারী সবুজ আউশ-ধানে তার কোমর অবধি ডুবে গেছে। দুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে—ওরে গয়লা, দেখেছি—দেখেছি—সব কীর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি গো—

অতএব কাছাকাছি কোথাও নন্দরামও আছে। নন্দরাম কানাইয়ের ছেলে। গোয়ালা বললে সে ক্ষেপে যায়, আর দুলিও তাকে ঐ ছাড়া ডাকবে না। বাপকে দেখে মেয়ের মূর্ত্তি রণরঙ্গিনী হয়ে উঠল। বলল—দেখ বাবা, দেখ—

অনেক দূরে ধানের চারা নড়ছে বটে; ধানবনের মধ্যে গরু! গরুর পিছনে নন্দরাম আছে। জীবধর বলল—তুই যে আম কুড়োতে গেলি—

দুলি বলল—গেলাম ত। তার পর দেখি, গয়লা গরু নিয়ে মাঠে আসছে। পিছন পিছন এলাম। জানি, ধান খাওয়াবে। ও কি কম শয়তান! খাওয়াচ্ছেও তাই—

নন্দরাম কাছে এসে পড়েছে, আলের উপর উঠে সে রুখে দাঁড়াল।

—খবরদার দুলি, মুখ সামলে কথা কস্‌। দুটো আগা কেটে খেয়েছে কি না-খেয়েছে—হয়েছে কি তাতে?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—হয়েছে কি! যাদের জমি চষতে হয় না, খালি গরু তাড়িয়ে বেড়ায়—তারা কি বুঝবে, আগা কেটে খেলে কি হয়—

জীবধরের কানে এসব যাচ্ছে না। সে দেখছে, হৈ-চৈ ক'রে গ্রামের দিক দিয়ে অনেক লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে চলেছে।

—কি? কি? ব্যাপার কি?

—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, সর্দ্দার। বাঁধ ভেঙেছে। খালের নোনাজল উঠছে। শীগগির চল।

জীবধর পাগল হয়ে ছুটল।

নন্দরাম দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল—দেমাক করতে নেই। আমাদের জমিজমা নেই—গরু তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু জমিজমার মজা দেখলি ত হাতে হাতে? দুটো আগা খেয়েছে ব'লে গালমন্দ করলি, এবার হবে কি? নোনা-লাগা ধান কেটে কেটে যে গরুকে খাওয়াতে হবে।

দুলি মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

গরুর দড়ি ধরে নন্দরাম এগিয়ে চলল।—চল রে, দুলি, তোদের বাড়ী থেকে একটা কোদাল দিবি আমায়।

দুলি তবু নড়ে না। নন্দরাম রীতিমত চটে উঠল।—কোদাল দিতে বললাম, তা রাজকন্তের কথা কানে যায় না বুঝি?

দুলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—বাঁধ বাঁধতে গিয়ে কাজ নেই কারও। খুব হয়েছে।...বাঁধ ভাঙে নি, শত্তুররা কেটে দিয়েছে। এখন ভালমানুষ সাজতে এসেছে।

সে কেঁদে ফেলল।

* * *

বাঁধ ভেঙেছে অনেকটা। জলের বেগ কিছুতে ঠেকান যায় না। বাঁশের খোঁটা পুঁতে ফাঁকের মধ্যে বোঝা বোঝা বিচালি দেওয়া হচ্ছে। তা-ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক কষ্টে অবশেষে খানিকটা আটকান গেল। তখন রাত হয়ে গেছে। নির্ম্মল আকাশ, ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। চরের মাটি কেটে জলে ঢালা হচ্ছে; ঝপাঝপ কোদাল পড়ছে।

শ্রান্ত জীবধর উপরে উঠে বাবলার গুঁড়ি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। খবর শুনে কানাইও কখন এসেছে। হঠাৎ নজর পড়ল, কোদালওয়ালাদের মধ্যে নন্দরাম।

—এই নন্দা, জল-কাদা মাখছিস—কাল তুই পাচন খেয়ে উঠেছিস না?

নন্দরামের জবাব সঙ্গে সঙ্গে।—গরু রাখতে বলেছিলে, তাতে জলকাদা লাগে না বুঝি?

কানাই এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। উঠানে ধানের একটা চিটে উঠবে না, তোর এত কোদাল পাড়বার দরকারটা কি বাপু! জীবধরকে বলল—সর্দ্দার ভাই, চাষবাসের এই ফ্যাসাদ। এত খাটলে,—সমস্ত মাটি। এর চেয়ে আমার দুধের ব্যবসা ভাল। জমি বেচে আমার মত গরু কেনো গে এবার।

জীবধর আশা ছাড়ে নি। বলল—নোনা জল কতটুকুই বা ঢুকেছে! এতে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না।

জল দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে শুকিয়ে এল। ধানের সবুজ পাতাও সঙ্গে সঙ্গে লাল। ক্ষেত থেকে ফেরবার পথে জীবধর যেন টলে পড়ে যায়। দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে সে ব'সে পড়ল—কি হবে!

দুলি দড়ি ধরে টানতে টানতে একটা গরু নিয়ে এল; নন্দরামদের রাঙী গরুটা। বলতে লাগল—বাবা, শয়তানিটা দেখ। তুমি বাড়ী আসতে আসতে অমনি গরু ছেড়ে দিয়েছে। আমিও তাকে-তাকে ছিলাম। গরু খোঁয়াড়ে দিতে হবে—ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেমন তেমনি—দণ্ড দিয়ে মরুক।

একটু পরেই নন্দরাম এল। সে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—ছেড়ে দিয়েছি, না আরও কিছু। দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল।

দুলি বলল—তাই বা যাবে কেন?

নন্দরাম মুখ বাঁকিয়ে বলল—ক্ষেত আগলে রেখে কি হবে শুনি। নোনা-লাগা ধান—দু-দিন বাদে শুকিয়ে ত খড় হয়ে যাবে। গরুতে খেলে যা হোক ভগবানের জীবের পেটে যাবে।

দুলি আগুন হয়ে উঠল।—তা বুঝি, বুঝি গো—পোড়া-মুখো ভগবানকে ডেকে ডেকে বার জনে ঘটিয়েছে এইটা। ধান শুকিয়ে খড় হয়ে যাক—আগুন জেলে পুড়িয়ে দেব। তবু যেন কারও গরু সেখানে না যায়—

—থাম না, দুলি। বাপের তাড়ায় দুলি চুপ হয়ে গেল। জীবধরের স্বর কাঁপছে; বলল—নন্দরাম, তোমার সমস্ত গরু ছেড়ে দাওগে আমার ক্ষেতে। খেয়ে সাফ ক'রে ফেলুক। আমার এত কষ্টের ফসল যে রোদপোড়া হয়ে শুকুবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না, বাবা—

তাড়াতাড়ি সে দু-ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেলল।

উঠানের আমড়া গাছে রাঙীকে বেঁধে নন্দরাম দাওয়ার উপর দিব্য পা ঝুলিয়ে বসেছে। কানাই হুঁকো শোলোক করছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। শেষে আর থাকতে পারল না, বলল—গরুর পেট চিটেপানা হয়ে রয়েছে...এরই মধ্যে ফিরে এলি—ওরে নন্দা?

নন্দ উদাসভাবে বলল—কোথায় কার জমিতে যাব, কে ফ্যাসাদ বাধাবে—

চক্ষু কপালে তুলে কানাই বলল—বলিস কি রে? তামাম মাঠে নোনা লেগেছে, এখন আবার গরুর ভাবনা? গতর নড়াতে চাস না, সেই কথাটা বল্।

—জান না ত মাঠের খবর। পরের জমিতে গরু নামাতে দেবে কেন? নন্দরাম অবাধে মিথ্যা ব'লে চলল—ঐ ত সর্দ্দার-খুড়োর ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিলাম। গরু ধরে তারা খোঁয়াড়ে দিতে যায়। অনেক বলে-কয়ে ছাড়িয়ে আনলাম। তার পর বলল—টাকাকড়ি দিয়ে একটা বিলিব্যবস্থা ক'রে নিলে হয় কিন্তু। নৌকোর ধান কেনার চেয়ে তাতে সস্তায় হবে।

কানাই বলল—টাকা চায় নাকি?

নন্দ বলল—তারা জন-কিষেণ দিয়ে চাষ করিয়েছে, খরচা হয়েছে—চাবে না কেন? টাকা-পঁচিশেক হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে নাও গে, বাবা। আমাদের বিশটা গরু এই মগুর্ম খেয়ে শেষ করতে পারবে না—

হুঁ—ব'লে কানাই গুম হয়ে খানিক ভাবতে লাগল। বলল—পঁচিশ টাকা না আরও কিছু! আচ্ছা দেখছি আমি।

সন্ধ্যার পর কানাই জীবধরকে নিয়ে নীলরতন চাটুজ্জের বৈঠকখানায় গেল। গ্রামের অনেকেই সেখানে; আড্ডা বসেছে। দশ টাকার একখানা নোট সে জীবধরের কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিল।

—না, না—সর্দ্দার-ভাই, সে কি হয়? গতরে খেটেছ, এত পয়সা খরচ করেছ, তোমার কত ক্ষতি হয়েছে। তবু যা হোক, বীজ-ধানের দামটা ত ঘরে উঠল। এই ক'টা মাস ক্ষেত আমার জিম্মায় থাকবে, গরুগুলো চ'রে খাবে—মাঘ-ফাল্গুনের মধ্যেই তোমার ক্ষেত তুমি ফিরে পাবে। চাটুজ্জে মশায়রা সব শুনে রাখলেন।

নন্দরামের বুকের ছাতি ফুলে গেছে। এখন দুলিদের বাড়ীর সামনে দিয়েই গরু তাড়িয়ে মাঠে যায়। দুলিকে দেখলেই শব্দ-সাড়া বেড়ে ওঠে। দুলি কিন্তু ভুলেও তাকায় না। দুপুরবেলা আবার যখন গরু ফিরিয়ে আনে, মেয়েটা ঐ সময় প্রায়ই ঘাটে ব'সে বাসন মাজে। একটা দিনও সে মুখ তোলে না। কুড়িটা গরু হৈ-হৈ শব্দে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া—তা কালা দুলির কানেই যায় না যেন!

আবার একদিন বড় মেঘ ক'রে এল। তার পর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি। বৃষ্টি—বৃষ্টি—রাত দুপুর অবধি একটানা বৃষ্টি চলল। শুকনো মাঠেঘাটে জলের তুফান বইতে লাগল। দু-এক দিনের মধ্যে দেখা গেল, লাল ধানবন আবার সবুজ হয়ে উঠেছে। জীবধর ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, মুখ হাসিতে ভরে গেল। সেখান থেকে সোজা গেল সে চাটুজ্জে-বাড়ী। বলল—চাটুজ্জে মশায়, কপাল ফিরেছে। ধানের চেহারা দেখবেন একবার গিয়ে। কানাইয়ের টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছি।

কানাই আকাশ থেকে পড়ল। বলে—বোশেখে এমন বর্ষা, দেখেছ কখন? তোমার কপালে নোনা লেগেছিল; আমার কপালে নোনা ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। আমি গোলা বাঁধছি। টাকা আমি ফেরত নেব না।

আবার সেই দিন দুলির সঙ্গে নন্দরামেরও ঝগড়া লাগল। নন্দরাম অতশত খবর রাখে না, গরু নিয়ে যেমন যায়, তেমনি যাচ্ছিল। দুলি তার সাড়া পেয়ে কাজকর্ম্ম ছেড়ে রাস্তার উপর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

—ও গয়লা, গরু নিয়ে যাচ্ছ যে বড়!

নন্দরাম অবাক হয়ে গেছে। বলল—আজকে নতুন যাচ্ছি নাকি?

দুলি হাসিতে যেন ফেটে পড়তে লাগল। বলল—ক্ষেতের নতুন রূপ খুলেছে, দেখ গে গিয়ে। দরদ হয় না? গরু দিয়ে খাওয়াতে সরম লাগে না? হ্যাঁ রে গয়লা?

নন্দর রাগ হয়ে গেল। বলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—। টাকা দিয়েছি—গরু দিয়ে খাওয়াই, যা করি—গাঁয়ের মানুষ কথা বলতে যাবে কেন? আর, যার তার কাছে কৈফিয়ৎই বা দিতে যাব কেন?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—সাধে কি গয়লা বলি? হ'তে চাষা, ধানের মর্ম্ম বুঝতে পারতে। চলদিকি কানাই-জেঠার কাছে, বিচারটা কি হয় দেখি—

দুলি কিছুতে ছাড়ল না। গরু রইল সেখানে, ঝগড়া করতে করতে দু-জনে চলল কানাইয়ের কাছে। নন্দ

বলে—দেখ বাবা, উৎপাতটা দেখ একবার। গরু মাঠে নিতে দেয় না। দাও দিকি এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে—ডাকাত মেয়ে জেল খেটে মরুক—

কানাই বলল—আচ্ছা হাবা ছেলে ত তুই। কড়কড়ে ধানবন—তার মধ্যে গরু নিয়ে যাস কোন্ আক্কেলে? সত্যি কথাই ত বলেছে ডুলি-মা। আমি বসে গোলা বাঁধতে বায়না দিয়ে এলাম, আর তুই গরু দিয়ে খাওয়াতে যাস্?

নন্দরাম আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—ধানগাছ গরু দিয়ে খাওয়াবার কথা,—ধান আমাদের গোলায় তুলতে দেবে কেন?

কানাই বলতে লাগল—না,—দেবে না। চাটুজ্জে-মশায়ের চেয়ে আইন ত কেউ বেশী জানে না—তিনি বললেন, আলবৎ দেবে। নন্দা, গরুগুলোকে রাত্রে জাবনা দিবি,—ধানবনে নিয়ে যাস না আর—

কানাই ঘরে গিয়ে উঠল। নন্দ ডুলির দিকে চেয়ে দেখল, মেয়েটার খুশীর অবধি নেই। আবার জিজ্ঞাসা করে—জিত হ'ল কার?

নন্দ বলে—কার শুনি?

—আমার, আমার। হাবা মেয়ে দম্ভে যেন ফেটে পড়ছে।—কেমন, ধান খাওয়াতে যেও এবার। চুপি চুপি আমি কানাই-জেঠাকে ব'লে দিয়ে যাব, তখন বুঝবে মজা—

নন্দর চোখে জল আসতে চায়। সামলে নিয়ে বলল—আচ্ছা ডুলি, এত কষ্ট করে চাষ করলি তোরা,—ফাঁকি দিয়ে আমরা সে-সব নিয়ে নিচ্ছি। তা কষ্ট হচ্ছে না তোর?

ডুলি বলল—আমার কষ্ট হয় লক্ষ্মীর অযত্ন দেখলে। গরু দিয়ে ধান খাওয়ালে আমার এক-একটা পাঁজরা খসে যায় যেন। এবার ত তা চলবে না।

হাসতে হাসতে বিজয়ীর মত ডুলি চলে গেল। নন্দ নিজের মনে বলতে লাগল—এই বুদ্ধি নিয়ে গয়লা গয়লা করিস আমায়। টের পাবি, যখন উপোস করে থাকতে হবে।

ক্ষেতে নামবার হুকুম নেই, আ'লের ঘাস কেটে এনে গরুকে খাওয়াতে হয়। একদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, নন্দ ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখল, শান্ত-ডোমের ভিটার ধারে তালগাছের গোড়ায় একটা লোক চুপচাপ ব'সে আছে।

—কে?

—আমি, বাবা। বুড়া জীবধর একলা ধানবনের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে। কৈফিয়তের ভাবে বলতে লাগল—কাজকর্ম্ম নেই, কি করি—বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম এদিক পানে—

বৃষ্টির জল পেয়ে নাটা ও কালকাসুন্দের ঝোপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ভাসা বাদার দু-দশটা জাত-কেউটেও যে আস্তানা না নিয়েছে, এমন নয়। এটা বেড়াবার জায়গাই বটে!

মাথার বোঝা মাটিতে ফেলে নন্দরাম তার উপর এক পা তুলে দাঁড়াল।

—ক্ষেতটা তা'হলে আমাদেরই সাব্যস্ত হ'ল?

জীবধর বলল—ক্ষেত ত নয়, ক্ষেতের ধান—

—কিন্তু ধানগাছ আমাদের,—ধানের চুক্তি ত কিছু ছিল না—

—গাছ হ'লে তার ফলও পাওয়া যায়, বাবা। চাটুজ্জে-মশায় ব'লে দিয়েছেন।

—তা বলে,—বাড়ীতে ভারে ভারে দই-ছানা বয়ে নিয়ে গেলে সবাই অমন ব'লে থাকে। নন্দরাম যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বলতে লাগল—চাটুজ্জে বললেই অমনি হবে নাকি? জমিদারের কাছারি নেই?

জীবধর বলল—হা রে কপাল! কানাইয়ের নামে বলতে আমি যাব জমিদারের কাছারি?

—তুমি না যাও, যাবার কত লোক রয়েছে, সর্দ্দার-খুড়ো! রাঙী দড়ি ছিঁড়ে দু-গোছ ধান খেল, ডুলি তাতে খোঁটা দিল—হেন-তেন কত কি গালমন্দ করল। কেন করল অমন? গোলমাল ত সেই থেকে। আমি কি করেছি? আমি টাকা আদায় ক'রে দিয়েছি—চুক্তির সময় ছিলাম আমি? যত গণ্ডগোলের গোড়াই ত ডুলি!

কথা আর সে বলতে পারল না। তাড়াতাড়ি বোঝাটা মাথায় তুলে হন হন ক'রে চলে গেল।

ক'দিন পরে নন্দ জীবধরের একেবারে সামনে পড়ে গেছে,

সরে পড়বার ফুরসৎ নেই। জীবধর বলতে লাগল—এ কি আরম্ভ করেছ, বাবা? এক মায়ের পেটে না জন্মেও কানাই আর আমি চিরকাল ভাই ভাই ছিলাম। ক'খুঁচি আউশ-ধান সব যে বরবাদ ক'রে দেয়—

নন্দ আকাশ থেকে পড়ল।—কি হয়েছে সর্দ্দার-খুড়ো?

জীবধর বলল—সে কি? তুমি জান না কিছু? কাছারি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। নায়েব বললেন—কে এসে নাকি নালিশ ক'রে গেছে। তুমি যে সেদিন কি সব ব'লে গেলে,—আমি ভাবলাম, তুমিই বুঝি খবর দিয়ে এসেছ!

নন্দরাম বলল—কি সর্ব্বনাশ, আমি খবর দিতে যাব! তাতে ক্ষতিটা আমার না আর কারও? অন্যায় ত হচ্ছেই, খবর দেবার লোকের অভাব কি! কে গিয়ে লাগিয়ে এসেছে। তার পর উৎসুক কণ্ঠে বলল—কিন্তু বিচারটা কি হ'ল, শুনি—

জীবধর চিন্তিতভাবে বলল—বিচার হয় নি এখনও। একটা কিছু হবেই ত, তাই আরও ভাবনা লেগেছে। আমি দেখছি, জেতার চেয়ে আমার হারই ভাল। একবার ইচ্ছে হ'ল, চেপে যাই। কিন্তু রাজ-কাছারিতে দাঁড়িয়ে সবটাই ব'লে আসতে হ'ল। কাল কানাইকে ডেকে পাঠাবে, শুনলাম।

পরদিন সত্যই কানাইয়ের ডাক হ'ল। ফিরে এল, খুব হাসি মুখ। নন্দ মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলল—খবর কি, বাবা? উতলা হয়ে আছি।

হি হি ক'রে হাসতে হাসতে কানাই বলল—হবে আবার কি, হবে ঘোড়ার ডিম। নায়েবের সঙ্গে রফা হয়ে গেল, নগদ আড়াই টাকা আর আড়াই সের মাখন। ব্যস!···জীবধরের আবার কারসাজিটা দেখ। খবর পেয়েছে, কাছারিতে ম্যানেজার এসেছে—তাড়াতাড়ি তার কাছে সাতখানা ক'রে লাগান হয়েছে। আরে বাপু, ম্যানেজার এর করবে কি? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে হয় কখনও? নায়েব তাই আরও রেগে গেছে।

শুষ্ক মুখে নন্দ বলল—হ'ল কি তাই বলো—

কানাই সগর্ব্বে বলতে লাগল—নতুন আবার হবে কি। আদেশ হ'য়ে গিয়েছে ধান আমার পাওনা।

কিন্তু নায়েব যা-ই বলুন এবং কানাইয়ের সঙ্গে তাঁর যে-প্রকার রফাই হোক, ম্যানেজার উপস্থিত থাকায় শেষ পর্য্যন্ত হুকুম সম্পূর্ণ উল্টা রকম হয়ে গেল। ধান পাবে জীবধর, এমন কি কানাইয়ের দশ টাকা ফেরতও দিতে হবে না, গরুকে এতদিন যা খাইয়েছে, তাতেই টাকার শোধ হয়ে গেছে। হুকুমটি এখনও জানাজানি হয় নি।

তেথরার গাঙে নৌকা-বাইচ ছিল। এই বাইচের বড় নামডাক, যে দল জেতে তাদের পিতলের ঘড়া বখশিশ দেওয়া হয়। জীবধর তুলিকে নিয়ে বাইচ দেখতে গিয়েছিল। কাছারির নকুল-বরকন্দাজও গিয়েছিল সেখানে; সেই চুপি চুপি জীবধরকে হুকুমের কথাটা বলল। তুলি আর বেশীক্ষণ থাকতে দিল না; কেবলই বলে—বাড়ী চল, বাড়ী চল—। বাড়ী এসে খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির ক'রে নন্দরামের সামনে দিয়ে জাঁক ক'রে বেড়িয়ে আসবে—এই তার মতলব।

বাপে মেয়েয় ফিরছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাড়ী যাচ্ছে, তা তুলি যেন নাচতে নাচতে চলেছে। দেহাতির চরের কাছাকাছি এসে বলল—চল না বাবা, ক্ষেতের দিক দিয়ে ঘুরে যাই একটু—

—উঁহু, রাত্তির বেলা··। জীবধর মাথা নাড়ল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কানাই যেদিন ধান পাওয়াবার চুক্তি ক'রে নিয়েছে, সেই দিন থেকে তুলি ক্ষেত-মুখো হয় নি। আজ সে কিছুতে শুনল না। জীবধরকে এক রকম জোর ক'রে নিয়ে চলল।

গেঁয়োবনের মধ্যে যেন কিসের আওয়াজ। তুলি হাঁক দেয় কে? কোন সাড়া নেই, চারিদিক চুপচাপ। তুলি বলে—বাবা, মানুষ আছে ওখানে—। জীবধর বলে—আছে, আছে। মাছ ধরছে কারা।···আরে আরে চললি ঐ জঙ্গলের মধ্যে ম্যাচ ম্যাচ ক'রে? এমন ডাকাত মেয়ে দেখি নি ত!

জঙ্গলের মধ্য থেকে তুলি চীৎকার আরম্ভ করেছে—বাবা দেখ—দেখসে. এসে গয়লার কাণ্ড। আমি তখনই জানি—

জীবধর গিয়ে দেখে, চোর বামালসুদ্ধ ধরা পড়েছে। হাতে কোদাল, কোদাল দিয়ে নন্দরাম বাঁধ কাটছিল। আর

খানিকটা কাটতে পারলেই খালের নোনা জল ধানবনে প'ড়ে সোনার ধান ডুবিয়ে দিত। সাংঘাতিক ছেলে!

ঢুলি কোমরে দু-হাত দিয়ে মল্লযোদ্ধার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। বলল—দেখ, শয়তানিটা দেখ একবার। নোনা লাগলে গরুকে ধান খাওয়াবার মজা হয়—না?

নন্দরাম কিন্তু একটুও অপ্রতিভ নয়। জবাব দিল—হয়ই ত। গরুকে আমি খাওয়াবই। তুই জিতে যাবি, তাই হ'তে দেব নাকি?

ঢুলি বলতে লাগল—দেখলে বাবা? কেমন হিংসুটে দেখ একবার। খবর পেয়েছে, ক্ষেতের ধান আমাদের পাওনা। বাঁধ কেটে অমনি সব ডুবিয়ে দেবার মতলব করেছে—

কোদাল ছুঁড়ে ফেলে নন্দরাম খাড়া হয়ে দাঁড়াল।—ক্ষেতের ধান তোমরা পাবে সর্দ্দার-খুড়ো? নায়েব তাই হুকুম দিয়েছে?

জীবধর নন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল—এ সব কার কীর্ত্তি, সে কি জানি নে, বাবা? নকুল-বরকন্দাজের কাছ থেকে সমস্ত শুনে এসেছি। নায়েবের কাছে হ'ল না দেখে তুমি নিজে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে সব ব'লে এসেছ। কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয় নি। বাপের নামে লাগিয়ে এলে, কানাই যখন শুনতে পাবে তার মনটা কি রকম হবে বল ত।

ঢুলির কালো চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠল।—গয়লা ব'লে এসেছে! ম্যানেজারের কাছে যেতে সাহস হ'ল ওর?

জীবধর বলল—ও ছাড়া আবার কে! আমি বরাবর সন্দেহ করেছিলাম, মিথ্যে ব'লে ও আমার কাছে লুকিয়ে এসেছে।

—তবেই দেখ কি রকম লোক। ঢুলির চোখে-মুখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলতে লাগল—চুরি ক'রে বাঁধ কাটে, আবার মিথ্যে কথা কয়। ওকে যে কি ক'রে তুমি ভাল বল—

তিন-চারটা লণ্ঠন আ'লপথে এসে বাঁধের উপর উঠল। কানাইয়ের গলা পাওয়া যাচ্ছে, ডাকছে—জীবধর, জীবধর!—

জীবধর সাড়া দিলে সকলে সেইখানটায় এসে দাঁড়াল। কানাই ক্রুদ্ধস্বরে বলল—কেষ্ট গিয়ে খবর দিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি নি—

সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তাদের মুখের দিকে এক নজর চেয়ে শুষ্কমুখে জীবধর বলল—কি বলেছে কেষ্ট?

জবাব দিল দক্ষিণপাড়ার মধু।—মাথামুণ্ডু কি আর বলবে! মাছ ধ'রে এই পথে ফিরছিল। গিয়ে খবর দিল, বাঁধের এই দিকটায় কোদাল পড়েছে। এক রশি আগের থেকে আমরা তোমার গলার আওয়াজ পেলাম, কোদালও ঐ পড়ে রয়েছে। ...তা দিনটা বেছেছ ভাল, সর্দ্দার—সবাই বাইচ দেখতে গেছে। আমরাই ক'জন সকাল-সকাল ফিরেছি।

ঢুলি জ্বলে উঠল।—বাঁধ কাটতে বাবার বয়ে গেছে। কাটছিল ঐ নন্দা—

—নন্দা কাটছিল বাঁধ?

কানাই বলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়ছ কেন মধু, তা হ'তে পারে। হারামজাদা হয়েছে কুলের মুষল। তার পর জীবধরের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—ওর কানে যে কি গুরুমন্তোর দিয়েছে সর্দ্দার-ভাই, রাত-দিন ও তোমাদের হয়ে ঝগড়া করে। ধানগুলো আমার গোলায় উঠলে ওর সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে কিনা, তাই ও বাঁধ কাটতে লেগেছে—

নন্দরাম বলল—তোমার গোলায় ধান উঠবে কি ক'রে, বাবা? ম্যানেজার হুকুম দিয়েছে, যাদের জমি তাদেরই ধান। আমি বাঁধ কাটি আর নোনা জলের তুফান বইয়ে দিই, তোমার তাতে কি যায় আসে?

—সত্যি নাকি? কানাই জীবধরের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

জীবধর বলল—ম্যানেজার বলেছে তাই বটে। কিন্তু ক'টা ধানের জন্য তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব বুঝি! ধান আমি নন্দকে দিয়ে দিলাম—ও তোমাদের। আমি আর ওদিকে ছায়া মাড়াতে যাচ্ছি না।

কিন্তু ঢুলির আপত্তি আছে। সে বলল—না, যাব না—এক-শ বার যাব। ধান দাও—দিয়ে দাও গে। কিন্তু ওকে বিশ্বাস নেই—গরু দিয়ে ধান না খাওয়ায় সেটা দেখতে হবে?

কানাই ব'লে উঠল—দেখতে হবে বইকি মা। হারামজাদার কাণ্ডজ্ঞান মোটে নেই, ওকে দেখবার জন্যই একজন পাহারাদার দরকার। সর্দ্দার-ভাই, ধান-টান থাক গে, তুমি এই দুলি-মাটি'কে দিয়ে দাও। ধান দিলে লাভ হবে না কিছু—হারামজাদ গরু দিয়ে খাইয়ে দেবে—

লণ্ঠন নিয়ে ওরা একটু এগিয়ে পড়েছে। দুলি আর নন্দ পিছিয়ে গেছে। অত ঝগড়া করবে, তা পা চলবে কখন? নন্দ সদম্ভে বলল—ওরে দুলি, গয়লা গয়লা করতিস যে বড়—এবার যদি তোকে কেউ ডাকে গয়লা-বউ?

দুলি মুখ ঘুরিয়ে বলল—গয়লার ব্যবসা রাখতে দেব বুঝি! রাঙীকে দিয়ে আসছে-বছর আউশের চাষ হবে।

ঘন কালো আউশধান। কোমর সমান উঁচু হয়েছে, রাতের বাতাসে দুলছে, ফিসফিস করছে। আ'লপথে চলেছে দুলি আর নন্দ। ধান তাদের গায়ের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

উৎসবান্তে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অধীর উৎসব-রাত্রি এল—গেল চলে';
প্রজ্জ্বলিত দীপালোক দণ্ড দুই জ্বলে'
লভিল নির্ব্বাণ তার; নক্ষত্র-আলোকে
ধরণীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ফিরে' এল চোখে।

স্তব্ধ গীত, বন্ধ বাদ্য; ক্লান্ত কর্ণপুটে
উত্তেজিত স্নায়ুজাল ধীরে ভরে' উঠে
মৌনতার মধুরসে; পুষ্পগন্ধাতুর
নাসায় পশিল আসি' প্রসন্ন মধুর
বিমুক্ত দক্ষিণ বায়ু বন্ধুর মতন,
লয়ে তার পরিচিত প্রিয় পরশন।

জুড়াল জ্বরের দাহ যেন সর্ব্বদেহে
প্রকৃতির মন্ত্র-পড়া স্নিগ্ধ অবলেহে।
ক্লান্ত মন যন্ত্রণায় শান্তি পেল ধীরে,
ঝঞ্ঝাহত পক্ষী যেন সান্ত্বনার নীড়ে।

প্রশান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম;—অশান্ত তুফান
স্নিগ্ধ সহজিয়া-মন্ত্রে যেন অবসান!
তৃপ্ত প্রাণ জেগে উঠে' যেন আশেপাশে
নেহারে আত্মীয়জনে সুস্থ নিজবাসে,—
শান্তিভরা দৃষ্টি যার—সুস্মিত আনন
প্রসন্ন কুশল-প্রশ্নে করে সম্ভাষণ।

সুস্বর যেমনই হোক্, নিঃস্বরের স্বর
শ্রবণের পাত্রে সে যে শাশ্বত মধুর
সঞ্জীবনী-রসধারা। কুসুমের বাস
যতই সুমিষ্ট হোক্, সহজ নিঃশ্বাস
রুদ্ধ করে দণ্ড দুয়ে। রুদ্র দীপালোক
বঞ্চিয়া সহজ দৃষ্টি অন্ধ করে চোখ।
চঞ্চল উৎসব-রাত্রি শুধু এই বলে'
যেমন সে এসেছিল, ফিরে' গেল চলে।

চীনের বৌদ্ধশিল্প

য়েন-চৌ, পথরক্ষী-মূর্ত্তি

লোহান-গুহা, বুদ্ধমূর্ত্তি

লুং-মেন, বুদ্ধমূর্তি

পিইপিং, সিংহ-মূর্তি

কলির মেয়ে

শ্রীসীতা দেবী

শশিনাথ বেয়ানের চিঠিখানা হাতে করিয়া ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ী ছোটই, সদর-অন্দরে খুব যে একটা তফাৎ আছে তাহা নয়, তবে গৃহিণী অতিশয় নাকি লজ্জাবতী এবং একেলে বেহায়াপনা দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, সুতরাং বারান্দার এক ধারে চটের একটা মোটা পর্দ্দা টাঙাইয়া অন্দর-মহলের আব্রু রক্ষা করিতে হইয়াছে। ছেলে হেমেন্দ্র জিনিষটাকে মারাত্মক অপছন্দ করে, কিন্তু মাকে ভয়ও সে করে মারাত্মক। সুতরাং তাহার স্ত্রী সুনয়নী ছাড়া এ অপছন্দের খবর কাহারও কানে পৌঁছায় নাই।

গৃহিণীকে চট্ করিয়া শশিনাথ দেখিতে পাইলেন না। শয়নকক্ষে তিনি নাই, ভাঁড়ার ঘরেও তিনি নাই। আর যে কোথায় থাকিতে পারেন তাহা কর্ত্তা ভাবিয়া পাইলেন না। মেয়ে পুঁটুরাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা মা পুঁটু, তোমার মা গেলেন কোথায় ?"

পুঁটুরাণী জানলার ধারে বসিয়া পুতুলের সেমিজ সেলাই করিতেছিল। বাপের ডাকে মুখ তুলিয়া বলিল, "কোথায় আর যাবেন ? কলঘরে কাপড় কাচতে গেছেন। এক ঘণ্টা হ'ল ঢুকেছেন, এইবার বেরবেন।"

শশিনাথ চিঠি হাতে করিয়া সেই ঘরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটু যেন অন্যমনস্ক।

গৃহিণী বাহির হইলেন, কলঘরের দরজা ক্যাঁচ করিয়া খুলিল আবার দড়াম্ করিয়া বন্ধ হইল। শশিনাথ বলিলেন, "একবার এদিকে শুনে যাও দেখি।"

গৃহিণী সুরবালা বলিলেন, "রোস, ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে আসি আগে।" পরনে তাঁহার একখানি স্বল্পপরিসর বাঁধিপোতার গামছা, এই বেশেই তিনি কাপড় মেলিয়া দিতে গজেন্দ্রগমনে ছাদে উঠিয়া গেলেন।

শশিনাথ এই ব্যাপারটি পছন্দ করেন না, কিন্তু পছন্দ না করিলেই বা কি ? গৃহিণীকে তাঁহার কোনও আচরণ লইয়া কোনও কথা বলা চলে না।

খানিক বাদে সুরবালা নামিয়া আসিলেন, ছাদে থাকিতে কোনও ব্যাপারে তাঁহার মেজাজ কিছু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে বোঝা গেল। "পোড়ারমুখো, ড্যাক্‌রা, চোখগুলো কুলকাঁটা দিয়ে গেলে দিতে হয়," বলিতে বলিতে তিনি নামিয়া আসিলেন।

শশিনাথ বুঝিলেন, প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেই এই-সকল সুমধুর সম্ভাষণ হইতেছে, বলিলেন, "তা চারিদিকে গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী, কাপড়চোপড় শুকোনোর কাজটা নীচে করলেই হয়।"

গৃহিণী ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "আহা মরি, কত বড় না দালান উঠোন বাড়ীর, তাই নীচে কাপড় শুকুব ! আমার ছাদে আমি যা-ই করি, ও ড্যাক্‌রাদের কি ?"

শশিনাথ আর আলোচনা না বাড়াইয়া বলিলেন, "এই চিঠি এসেছে বেয়ানের, দেখ।"

বাহিরের আকাশে মেঘের পুঞ্জ ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া আসন্ন ঝটিকার আভাস দিতেছে। গৃহিণী অতি হিসাবী, সাতটা বাজিবার আগে ঘরের আলো জ্বালিতে দেন না, তা মানুষ চোখে দেখুক বা না-ই দেখুক। নিজেরও চোখের দৃষ্টি সন্ধ্যার পর ঝাপসা ঠেকে, কিন্তু গৃহিণী তাহা স্বীকার করেন না, চশমা পরাতেও তাঁহার আপত্তি, নিজের বয়স চল্লিশের বেশী হইয়াছে তাহা জানাইতেও আপত্তি। বলিলেন, "কি লিখেছেন তাই বল না, আর এখন পড়তে পারি না।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বেয়াইয়ের বড় অসুখ, তাই বৌমাকে একবার নিয়ে যেতে চান।"

সুরবালার মুখ ভ্রুকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ওগো, ঘাস খাই না গো, চালের ভাতই খাই। সারাটা বছর ভাল রইলেন, আর ঠিক এই পুজোর দিন-কুড়ি আগেই

অসুখটা করল? তা বেশ, তাঁদেরও কথা থাক, আমারও কথা থাক। পূজোর তত্ত্বটি আগেভাগে ভাল ক'রে পাঠিয়ে দিন, দিয়ে মেয়ে নিয়ে গিয়ে যত খুশী সোহাগ করুন।"

পুঁটুরাণীর এ-সব ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি ভাল লাগে না, সে তাড়াতাড়ি নিজের সেলাই গুটাইয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শশিনাথ বলিলেন, "তবে তাই লিখে দিই?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল ক'রে গুছিয়ে লেখ। আমাদের কি কেউ ছেড়ে কথা কয় যে আমরা যাব লোককে দয়া করতে? এই পূর্ণিকে তত্ত্ব করতেই আমার একশ টাকা খ'সে যাবে। না হলে মেয়ের খোয়ারের একশেষ হবে। আমি পাচ্ছি কোথায়? আমরাও ত নবাব-বাদশা নই? মেয়ে গর্ভে ধরলে অত পয়সা বাঁচানো চলে না।"

কর্ত্তা চলিয়া গেলেন, যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম ফিরেছে নাকি? বড় বৃষ্টি আসছে।"

সুরবালা বলিলেন, "কে জানে, আমি ত আসতে দেখিনি। অ বৌমা!"

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে পাশের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম ফিরেছে?"

বধূ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে স্বামী আসেন নাই।

"তা আসবে কেন? তাহলে যে জলে ভিজে সর্দ্দিজ্বরটা হয় না?" বলিতে বলিতে সুরবালা ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর চেহারাখানি বেশ দশাসই, রংটা এককালে ফরশাই ছিল বোধ হয়, এখন তামাটে হইয়া গিয়াছে। চুল এখনও পিছনে নিতান্ত মন্দ নাই, তবে সামনের দিকে টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ চওড়া করিয়া সিঁদুর পরিয়া সে খুঁৎটুকু তিনি ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন। গলার আওয়াজটিও তাঁহার চেহারার সঙ্গে মানানসই। একবার মুখ খুলিলে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না যে সুরবালা কোন্ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

কাজেই বেহাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি সুনয়নীর কানে বেশ স্পষ্ট হইয়াই পৌঁছিল। তাহার বড় বড় চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল, অবাধ্য অধরও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। জানালার পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল অশ্রু সম্বরণ করিতে।

শ্বশুরবাড়ীতে তাহার কান্না দেখিবার জন্য বসিয়া আছে কে? সে ত এখানে রক্তমাংসের মানুষ বলিয়া গণ্য হয় না, সে কেবলমাত্র বধূ। তাহার প্রতিপদে ত্রুটি, তাহার ভালটুকুও ইহাদের চোখে মন্দ হইয়া দেখা দেয়। স্বামী মুখে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে বলিয়া ত বোধ হয় না? পরের একটা মেয়ে, তাহার পক্ষ লইয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনকে কথা বলা, এ তাঁহার চিন্তারও অতীত।

আজ রবিবার, খাইয়া-দাইয়া একটুখানি গড়াইয়া লইয়া, হেমেন্দ্র বন্ধু-বান্ধবের সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছে। আজ রাত্রের খাওয়াদাওয়া অনেক রাত করিয়াই হইবে, কাজেই সন্ধ্যাবেলা সুনয়নীর খানিকক্ষণের ছুটি মিলিয়াছে। সুরবালার সংসারের নিয়ম বিকালের রান্নাও সকালে সারিয়া রাখা, ঠিক সকালে না হোক অন্ততঃ দুপুরের মধ্যে ত বটেই। দুই বেলা সমানে কয়লা পোড়ানোর পক্ষপাতিনী তিনি নন। স্বামী কিছু হাজার টাকা রোজগার করেন না, বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইতে চলিল, দেড়শ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার মুরদ। আর কতকালই বা তিনি চাকরি করিতে পাইবেন? ইহারই মধ্যে দুপয়সা গুছাইয়া না রাখিলে মেয়ের বিবাহ হইত কেমন করিয়া? তবু ত ঋণ না করিয়া পারা গেল না। ছেলে ত যা রোজগার করেন, তা তাহার নিজের হাতখরচ করিতেই ফুরাইয়া যায়। নিজের ও স্ত্রীর কাপড়চোপড় ঔষধপথ্যের ভারও অবশ্য তাহার ঘাড়ে। বাড়ীতে সখ করিয়া ইলেকট্রিক বাতি সে-ই আনিয়াছে, খরচটাও সে-ই দেয়। ইহা ভিন্ন টানাটানি পড়িলে পাঁচ টাকা দশ টাকা যখন যাহা পারে তাহা দেয়। কিন্তু এগুলি গৃহিণী ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন না। এক মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আর-একটিও মায়ের কাঁধ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেটিকে বড় জোর আর দু-এক বছর রাখা যাইবে। ইহারই ভিতর বিবাহ দিবার টাকা আসিবে কোথা হইতে? যত ভাবেন ততই সুরবালার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, এবং পরের যে মেয়েটিকে তাহার বাপ-মায়ের দায়মুক্ত করিয়া তিনি নিজে ঘরে আনিয়া তুলিয়াছেন, তাহার উপর মনটা বিরূপ হইয়া

যায়। বড় মেয়ে পূর্ণিমার গত বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছে, এই প্রথম পূজার তত্ত্ব, ভাল করিয়া না করিতে পারিলে মান থাকিবে না। কিন্তু করেন কোথা হইতে? নিজের পুত্রবধূর বাপ-মায়ের ত চোখের চামড়া নাই, কানের পর্দ্দাও নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়। কথা শুনাইতে ত সুরবালা ত্রুটি করেন না। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতর মেয়ে আটক করিয়াও ত কিছু আদায় করিতে পারিলেন না? কোনও মতে মেয়েকে একখানা ডুরে শাড়ী এবং জামাইকে অতি সাধারণ ধুতি-চাদর পাঠাইয়া তাহারা কাজ সারিয়া দেয়। তিনিও তেমনি, যতদিন না হাড়-কিপ্পন মিন্‌সে ভাল করিয়া তত্ত্ব সাজাইয়া পাঠাইবে, ততদিন সুনয়নীকে বাপ-মায়ের ছায়াও তিনি মাড়াইতে দিবেন না।

আজ বেয়ানের চিঠির মর্ম্ম শুনিবামাত্র তাঁহার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করিতে লাগিল। তাঁহাকে উহারা এমনই বোকা পাইয়াছে বটে। অসুখ শুনিলেই তিনি অমনি মেয়ে পাঠাইয়া দিলেন আর কি? সুনয়নী যাহাতে ভাল করিয়া শুনিতে পায় এমনই জোর গলায় কতকগুলি বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। যদি উহারা ভাল করিয়া তত্ত্ব করে তাহা হইলে সেই-সব জিনিষপত্র লইয়া তাঁহার নিজের তত্ত্ব পাঠানোর দায়ও অনেকখানি উদ্ধার হইয়া যায়। না-হয় মিষ্টি দই প্রভৃতি কিছু কিনিয়া দিলেই হইবে। এ এমন কিছু নূতন ব্যাপার নয়, ছেলের বিয়ের পাওনা দিয়া মেয়ের বিয়ের কাজ উদ্ধার করা ত সনাতন পদ্ধতি?

সুনয়নী দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। শাশুড়ীকে সে ভাল রকমই চেনে, তাঁহার যে কথা সেই কাজ। এ বৎসরও তাহাকে ইঁহারা তাহা হইলে বাপের বাড়ী যাইতে দিবেন না। কতকাল সে বাপ-মা ভাই-বোন কাহারও মুখ দেখে নাই। এখানে ত সে জেলের কয়েদীর মত থাকে। তাহার হাঁটিবার চলিবার বা কথা বলিবার স্বাধীনতাটুকুও নাই। দু-বেলা দু-মুঠা খায় এবং সারাদিন খাটে।

আকাশের রং যেন কষ্টিপাথরের মত কালো হইয়া আসিতেছে, সুনয়নীর বুকের ভিতরটাও যেন এমনই অন্ধকার।

হঠাৎ সদর দরজায় ধাক্কা পড়িল, সুনয়নী বুঝিল হেমেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়াছে। তাড়াতাড়ি চোখমুখ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল, সহানুভূতি যেখানে কিছুই নাই বা মুখের কথায় শেষ সেখানে নিজের দুঃখ জানাইতেও লজ্জা হয়।

হেমেন্দ্র আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জুতাজোড়া খুলিতে খুলিতে বলিল, "বাবাঃ, খুব বেঁচে গেছি। আর দু-মিনিট হলেই ভিজে চুপচুপে হয়ে যেতে হত।"

সুনয়নী সে কথায় কোনও মন্তব্য না করিয়া বলিল, "চা আনব নাকি?"

স্ত্রীর গলাটা কেমন যেন ধরা-ধরা, চট্ করিয়া ঘরের আলোটা জ্বালিয়া দিয়া হেমেন্দ্র সুনয়নীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখেমুখে স্পষ্ট অশ্রুজলের চিহ্ন। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল আজ আবার?"

স্ত্রী বলিল, "কিছু হয়নি, আমি চা নিয়ে আসছি," বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। এ-বাড়ীতে সুরবালার অখণ্ড প্রতাপ, ইটালীতে মুসোলিনীরও ইহার চেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যে ফতোয়া জারি করেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ কেহ মনে মনে করিলেও তাহা রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়। পাঁচ বৎসর এ-বাড়ীতে বাস করিয়া সুনয়নী ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

চা আর জলখাবার গুছাইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল। উনানটা এখনও ভাল করিয়া ধরে নাই, তাড়াও কিছু নাই। কেহ আজ রাত দশটার আগে ভাত খাইবে না, কাজেই রাত আটটা-নয়টার আগে ভাত চড়াইবার প্রয়োজনই নাই।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কাপড়-চোপড় বদলাইয়া আরাম করিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। পাশের ছোট টিপয়টার উপর চা ও খাবার নামাইয়া রাখিয়া সুনয়নী বলিল, "এখনই আলো জাললে কেন? মা বকাবকি করবেন না?"

হেমেন্দ্র মোহনভোগের প্লেটটা তুলিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল, বলিল, "তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দাও না, মা অত বাইরের থেকে বুঝতে পারবেন না।" সুনয়নী দরজা ভেজাইয়া দিয়া চুপ করিয়া জানালার পাশে গিয়া বসিয়া রহিল।

হেমেন্দ্র ধীরেসুস্থে চা জলখাবার শেষ করিয়া প্লেট ও পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে ত মেঘ যথেষ্ট, আবার ঘরের ভিতরে কেন ?"

সুনয়নী বলিল, "তোমাদের কি, দিব্যি খাচ্ছদাচ্ছ, কবিত্ব করছ। আমরাও ত মানুষ, আমাদেরও ত সুখ-দুঃখ আছে, তা ত তোমাদের মনেই থাকে না।"

হেমেন্দ্র বলিল, "বাপ্, মনে আবার থাকে না! কার জন্যে এই দশটার থেকে ছ'টা অবধি নাকে দড়ি দিয়ে খাটি শুনি ?"

সুনয়নী বলিল, "তা জানি না।"

হেমেন্দ্র অতিশয় আহত মুখ করিয়া বলিল, "তা জানবে কেন ? তা হলে আর মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবে কেন ? তা না-হয় জানই না, কিন্তু ভোর সন্ধ্যেবেলা কেঁদে নাক-মুখ ফুলিয়ে ব'সে আছ কেন শুনি ?"

বলিয়া কোন লাভ নাই, কিন্তু কাহারও কাছে মনের দুঃখ না বলিয়া মানুষ কি বাঁচে ? সুনয়নী বলিয়াই ফেলিল, "বাবার বড় অসুখ, মা আমাকে নেবার জন্যে চিঠি লিখেছেন, তা এঁরা দেবেন না।" বলিতে বলিতে সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমেন্দ্র সিগারেট-কেস্ হইতে আর-একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া বলিল, "কেন পাঠাতে চান না ?"

সুনয়নীর কণ্ঠস্বরে এবার একটু ক্রোধের সুর ধরা গেল, সে বলিল, "সে কি তুমি আমার চেয়ে কম জান ? তোমার মা-বাবা, তোমারই ত বেশী জানবার কথা।"

স্ত্রীকে রাগিতে দেখিলেই হেমেন্দ্রের মেজাজ তৎক্ষণাৎ সপ্তমে চড়িয়া যাইত। স্ত্রীলোক আবার রাগিবে কি ? তাও শ্বশুরবাড়ীর কাহারও উপর। ইহা একেবারেই অনাচার, এবং স্বামীর প্রতি প্রীতির অভাব। বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁরা যে আমার মা-বাপ আর তোমার পরম শত্রু তা আমার জানা আছে, তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবু তাঁরা কি এমন বললেন, যাতে এমন মহাপ্রলয় ঘ'টে গেল, সেইটাই শুনি না ?"

সুনয়নী বলিল, "তোমার শুনতে চাওয়াই বা কেন, আর তা নিয়ে অত মেজাজ দেখানই বা কেন ? আমি ত তোমায় যেচে বলতে আসিনি ? আমার মনে কষ্ট হলে আমি কাঁদব না ? তোমরা না-হয় আমাকে কলের পুতুল ভাব, কিন্তু আসলে ত আমি রক্তমাংসের মানুষ ?"

হেমেন্দ্র বলিল, "এই নাও, কোথা থেকে কি কথা এনে ফেললে ? মানুষ তা কে অস্বীকার করছে ? কলের পুতুলই যদি হতে তাহলে তুমি কাঁদলেই বা আমার কি এসে যেত ! তোমরা মোটেই লজিক্যাল জাত নও।"

সুনয়নী বলিল, "তা লজিক-পড়া মেয়ে নিয়ে এলেই ত হত ? তারও ত আজকাল অভাব নেই ? তবে তাকে নিয়ে এমন কাণ্ডকারখানা চলত না।"

হেমেন্দ্রের পৌরুষে আঘাত লাগিল। সে বলিল, "তাই নাকি ? লজিক-পড়া মেয়েরা এসেই বুঝি শ্বশুর-শাশুড়ীকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেয় আর স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে থাকে ? তা হলে ত স্ত্রী-শিক্ষা অতি উত্তম জিনিষ বলতে হবে।"

সুনয়নীর এখন ঝগড়া করিবার ইচ্ছা ছিল না। সে পেয়ালা পীরিচ উঠাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এখনও রান্নার কাজ বাকি, বাড়ীসুদ্ধ সকলকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেও তাহাকেই হইবে। এমনই তাহার মন আজ অবসন্ন, স্বামীর সহিত আবার একপালা ঝগড়া হইলে সারারাত্রি তাহার শান্তি থাকিবে না। ভোরে উঠিয়াই তাহাকে রান্নাঘরের কাজে লাগিতে হয়, রাত্রিতে একটু না ঘুমাইলে সে বাঁচে না।

পেয়ালা-পীরিচ ধুইয়া তুলিয়া রাখিয়া সে ভাত চড়াইবার আয়োজন করিতে লাগিল। এ-বেলা রান্নাঘরে আর কাহারও সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। সকালে তাড়া থাকে, কাজেই সুরবালা বধূর কাজে সাহায্য করিতে আসেন। সাহায্যটা অবশ্য সমালোচনার রূপ ধরিয়াই বেশীর ভাগ প্রকাশ পায়। যাহা হউক, ঠিকা ঝি শীতলের মা অনেকটাই সাহায্য করে, পুঁটুরাণীর মর্জ্জি হইলে সেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তরকারিটা কুটিয়া দেয় বা মাছে নুন-হলুদ মাখাইয়া দেয়, কাজেই এক রকম করিয়া কাজ উদ্ধার হইয়া যায়। এ-বেলা সুনয়নী একলাই যাহা করিবার করে।

হেমেন্দ্রের কিন্তু মাঝপথে কথাটাকে চাপা দিবার ইচ্ছা ছিল না। স্ত্রীকে সোজাসুজি ডাকা যায় না, বাবা অথবা

মা শুনিয়া ফেলিতে পারেন। অতএব সে গলা ছাড়িয়া পুঁটুরাণীকে ডাকিতে লাগিল।

তাহার চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া পুঁটু খানিক পরে আসিয়া হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হয়েছে কি শুনি? এত চেঁচাচ্ছ কেন?"

হেমেন্দ্র বলিল, "তোর বৌদি কোথায় গেল? তাকে ডেকে দে।"

পুঁটু গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে স্নয়নী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আবার?"

হেমেন্দ্র বলিল, "একটা কথার মধ্যে হট্ ক'রে উঠে গেলে কেন?"

সুনয়নী বলিল, "তা আমার রান্নাঘরে কাজ প'ড়ে রয়েছে যেতে হবে না? আর তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে লাভই বা কি? পাঁচ বছর ত ঘর করছি, তর্কের ফল কি যে হবে তা আর আমার জানতে বাকি নেই।"

হেমেন্দ্র বলিল, "তা বেশ, আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমার চলে ত আমারই কি চলে না? বেশ তাসের আড্ডাটা বসেছিল পূর্ণর বাড়ীতে, বৃথাই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম।"

সুনয়নী একটু নরম হইয়া বলিল, "ভাতটা নামিয়ে আসি, নইলে বেশী গ'লে ঘ্যাট হয়ে যাবে।"

এ মানুষটাকে বাদ দিলে সুনয়নীর এখানকার জগতে বন্ধু আর কেহই থাকে না। এ অন্যায় করে, অত্যাচার করে, আবার মাঝে মাঝে মিষ্টি কথাও বলে, আদরও করে। ইহার বিরুদ্ধে সুনয়নীর মনে নালিশ ক্রমেই স্তূপাকার হইয়া জমিয়া উঠিতেছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সব ভুলিয়াও যায়, ইহারই সঙ্গে তাহার ইহজীবনের ভাগ্য একান্তভাবে জড়িত, এইটুকু মাত্র মনে রাখিয়া সে হেমেন্দ্রের সঙ্গে আপোষ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাঁচা ভিত্তির উপর গাঁথা সৌধ অল্পক্ষণ পরেই ধসিয়া যায়।

ভাত নামাইয়া, ফেন গালিয়া ফেলিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। হেমেন্দ্র সিগারেটটা মুখের কোণে ঠেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ হ'ল?"

সুনয়নী খাটের উপর বসিয়া বলিল, "হ'ল।"

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা তোমায় কিছু লেখেন নি?"

সুনয়নী সংক্ষেপে বলিল, "না।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "কি আর এমন চমৎকার খবর যে আলাদা আলাদা ক'রে লিখতে হবে? শাশুড়ীঠাকরুণকে লিখলে আমার ত আর জানতে বাকি থাকবে না?

হেমেন্দ্র বলিল, "বিশেষ কিছু নয় হয়ত, মেয়েমানুষের মন অল্পেই ব্যস্ত হয়।"

সুনয়নী বলিল, "সব মেয়েমানুষই একরকম হয় না। আমার মায়ের মন খুব শক্ত, অল্পে কাতর হবার লোক তিনি নন। বাবা ডায়েবেটিসের রুগী, তাঁর সব অসুখেই খুব ভয়ের কারণ থাকে। এখন নানা ওজর ধ'রে আমায় যদি তোমরা না পাঠাও, তাহলে এ জন্মে বোধ হয় বাবাকে আর আমি দেখতে পাব না।"

হেমেন্দ্র বলিল, "তুমি ত 'তোমরা' ব'লে বেশ নিশ্চিন্ত মনে আমার ঘাড়ে সব দোষের ভাগ তুলে দিলে, কিন্তু আমার দোষটা কি শুনি? আমি কি কিছু বলেছি?"

সুনয়নী বলিল, "বল না যে সেইটাই ত আমার দুঃখ। আমাকে বিয়ে ক'রে এনেছ তুমি, আমার ভালমন্দ কিছুতে তুমি কথা বলবে না এ কি রকম?"

হেমেন্দ্র বলিল, "সব বাঙালী-সংসারেই এই রকম। বাপ-মা থাকতে আমি তাঁদের কথার উপর কথা বলতে পারি না।"

সুনয়নী বলিল, "পার আবার না, নিজের দরকার হ'লে খুব পার। গত বছর বড়দিনের ছুটিতে যে দলবলের সঙ্গে ফুর্ত্তি করতে বেরলে, সে ত তাঁদের কথা ঠেলেই গেলে? বল যে স্ত্রীর হয়ে তাঁদের কথার উপর কথা বলতে পারি না।"

কথাটা এতই সত্য যে ইহার উত্তরে ভয়ানক রাগিয়া উঠা ছাড়া আর কিছু হেমেন্দ্রর করিবার ছিল না। সে বলিল, "বেশ তাই, আমি বলব না কিছু, তুমি যা খুশী কর।"

সুনয়নী বলিল, "ভাল, আমার যা খুশী তাই-ই করব। মনে রেখো তোমার মা-বাবা তোমার কাছে যতখানি, আমার মা-বাবাও আমার কাছে ততখানিই। মা-বাপের

খাতিরে যদি অন্যায় করলেও তোমার দোষ না হয়, ত আমারও হবে না।" বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হেমেন্দ্র খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল, "নাঃ, অতি বদ্‌মেজাজী, এমন হলে আর পাঁচজনের সংসারে চলে ?"

আকাশে তখন মেঘের রাশি ভীষণাকৃতি ধরিয়াছে, রাত্রিও অনেকখানি হইয়াছে, না হইলে হেমেন্দ্র আবার বন্ধু-বান্ধবের সন্ধানে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত। বাধ্য হইয়া তাহাকে একলা ঘরে বসিয়া থাকিতে হইল। সুনয়নী আর রাত এগারোটার আগে ঘরে আসিল না। আসিয়াই একটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, এবং ভোর হইতে-না-হইতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। হেমেন্দ্র বুঝিল, রাত্রির আগে আর স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়ার অবকাশ পাওয়া যাইবে না। অত তেজ দেখাইয়া যে গেল, সে নিশ্চয়ই মনে মনে কোনও ফন্দি আঁটিয়াছে। হেমেন্দ্রের মনটা অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কোনও উপায় নাই যেখানে সেখানে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি ?

আপিস হইতে সে একটু সকাল সকালই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যথানিয়মে সুনয়নী চা জলখাবার হাতে করিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি, অন্যায় করবার ব্যবস্থা কিছু পাকা হল ?"

সুনয়নী বলিল, "যথাকালে দেখতেই পাবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "এই-সব থিয়েটারি ঢং আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা কেলেঙ্কারি বাধিও না যেন, আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তা হলে ভাল হবে না। নিজে যে স্ত্রীলোক, এবং তাও হিন্দুঘরের পরাধীন স্ত্রীলোক, সেটা মনে রাখলে তোমার উপকার হবে।"

সুনয়নী বলিল, "মনেই রাখব।" তাহার পর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমেন্দ্র চা জলখাবার খাইয়া শেষ করিলে সে পীরিচ পেয়ালা তুলিয়া লইয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল। রাত্রে অনেক জেরা করিয়াও হেমেন্দ্র আর তাহার নিকট হইতে কোনও কথা আদায় করিতে পারিল না। মুস্কিল এই যে দিনের বেলা সুনয়নীর উপর চোখ রাখা তাহার সম্ভব নয়, সাড়ে নয়টা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরেই কাটাইতে হয়। মা ত সারাটা দিনের বেশীর ভাগ কলের ঘরে কাটান, বাকিটুকু ভাঁড়ার ঘরে, বৌ কি করে না করে বিশেষ দেখেন না। পুঁটুটা কাজের অযোগ্য, আছে খালি বই আর পুতুল লইয়া, সেও ত দুপুরে স্কুলে চলিয়া যায়। আশেপাশে সব গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী, সবাই বাঙালী। তাহাদের বাড়ীর বৌঝিরা পায়ে হাঁটিয়া সারাক্ষণই এ-বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। সুনয়নীর যদিও বেশী পাড়া বেড়ানোর হুকুম নাই, তাই বলিয়া একেবারে নিষেধও নাই। ইচ্ছা করিলে দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা বাহিরে গিয়া সে কাটাইয়া আসিতে পারে। কিছু অঘটন ঘটাইবার ঝোঁক চাপিলে তাহার পক্ষে সেটা কার্য্যে খাটাইয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। হেমেন্দ্র মনে মনে অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মাকেও কিছু বলিতে পারিল না বা স্ত্রীকে ঢিট্ করিবারও কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই হইয়া গেল।

দিন তিন-চার কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন সকালে বাড়ীর সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া সুনয়নীর বাপের বাড়ী হইতে পূজার তত্ত্ব আসিয়া হাজির হইল। সুরবালা ত একেবারে থ হইয়া গেলেন। এত রকমারি জিনিষ, এত ভাল কাপড়চোপড় তিনি আশাই করেন নাই। মেয়েকে যে জংলা ঢাকাই শাড়ীখানা পাঠাইয়াছে তাহার দাম কোন্ না পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হইবে ? জামাইকে যে ধুতি চাদর পাঞ্জাবী দিয়াছে, তাহাও বিশ টাকার কম নয়। বাবাঃ, আচ্ছা ঢ্যাঁটা মানুষ যা হোক। এতটা যাহারা দিতে পারে তাহারা কি বলিয়া এতদিন চুপ করিয়া ছিল ? মেয়ের প্রতি দরদ যে কত তাহা ত ব্যবহারে বুঝাই গেল। যাহা হউক তিনি এক কথার মানুষ, তত্ত্ব করিলে পাঠাইয়া দিবেন যখন বলিয়াছেন, তখন পাঠাইয়াই দিবেন। তাঁহার নিজের কাজ ইহাতেই উদ্ধার হইবে। খালি যা দই-মিষ্টির খরচ। কাপড়চোপড় সব সোজাসুজি তাঁহার বাক্সে বন্দী হইল, আর সব জিনিষও তিনি গুছাইয়া রাখিয়া দিলেন। দই মিষ্টি প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেকাজেই সেগুলি বাড়ীর লোকের ভোগের জন্য দান করিতে হইল।

সুনয়নী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বাপের বাড়ীর পাঠানো জিনিষপত্রের সদ্গতি দেখিতে লাগিল, কোনও মন্তব্য করিল না। পুরানো চাকর শ্যাম আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তা কহিয়া রান্নাঘরে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সুরবালা কুটুম-বাড়ীর লোককে নিয়মমত জলযোগ করাইয়া ও বকশিশ দিয়া বিদায় দিলেন, বলিয়া দিলেন, ভাল দিন দেখিয়া সুনয়নীকে তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন, বেয়ান যেন লোক পাঠান।

মায়ের ব্যবহারে হেমেন্দ্র একটু লজ্জা অনুভব করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, তাহা হইলে যে স্ত্রীর কাছে খাটো হইতে হয়। মনে মনে স্থির করিল, ঐ রকম ভাল শাড়ী একখানা সে কোনও মতে সুনয়নীকে কিনিয়া দিবে—আজ না পারুক দুদিন বাদে।

সুনয়নীর মা আর তিন-চার দিনের মধ্যেই মেয়েকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তত্ত্ব আসিবার পর হইতেই সুনয়নী জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে-দিন লোক আসিল সেই দিন বিকালের গাড়ীতেই তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার আগে স্বামীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আসি তবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "ভয়ানক ফুর্ত্তি হচ্ছে, না?"

সুনয়নী বলিল, "হবারই কথা, চিরকাল মা-বাপের কোলে ব'সে আছ, জান না ত বছরের পর বছর আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে থাকতে মানুষের মন কেমন করে!"

হেমেন্দ্র বলিল, "এখানকার মানুষগুলো তাহলে তোমার আত্মীয় বা স্বজন কিছুই নয়?"

সুনয়নী বলিল, "যাবার মুখে ঝগড়া ক'রে কি হবে? ও-সব মীমাংসার দিন ত প'ড়েই আছে? যাই, আবার ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে।" সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সুরবালা বলিয়া দিয়াছিলেন, বেয়ান মেয়েকে যেন পনর-কুড়ি দিনের বেশী না রাখেন। এ-ধারেও তিনি একলা মানুষ, তাঁহার কাজের অসুবিধা হয়। পূর্ণিমাও বাপের বাড়ী আসিয়াছে, কাজেই কাজও বাড়িয়াছে। অগত্যা সুরবালাকে একজন ঠিকা রাঁধুনীও রাখিতে হইয়াছে। মিছামিছি টাকা খরচ তাঁহার ভাল লাগে না, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই করিতে হইল।

সুনয়নী গিয়াই হেমেন্দ্রকে চিঠি লিখিয়াছিল, সে উত্তর দিয়াছে বটে, তবে অতি সংক্ষেপে এবং অনেক দেরি করিয়া। সুনয়নী অতঃপর আর স্বামীর কাছে চিঠি লেখে নাই, সুরবালাকে একখানা লিখিয়াছে ও পুঁটুরাণীকে একখানা। তাহাতে খবর দিয়াছে যে তাহার বাবা খানিকটা ভালই আছেন, আরও আট-দশ দিনে সম্পূর্ণ ভাল হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

সুরবালা পনর দিন যাইতে-না-যাইতেই বধূকে ফিরিবার জন্য তাড়া দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আজ দিন ভাল নয়, কাল সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না, ইত্যাদি নানা ওজরে সেই কুড়ি-একুশ দিনই হইয়া গেল। তাহার পর সুনয়নী ফিরিয়া আসিল।

হেমেন্দ্র বলিল, "রংটি ত গায়ের বেশ পাকা ক'রে এসেছ দেখি।"

সুনয়নী বলিল, "তা হোক, এখানকার নারকেল-ছোবড়ার ঘষড়ানিতে দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

হেমেন্দ্র বলিল, "ইস্, বাক্যবাগীশ একেবারে। ভাগ্যে বাপ মা তোমার নাম সুভাষিণী রাখেন নি।" যাহা হউক, অনেক দিন পরে আবার দেখা, ঝগড়াঝাঁটি, তর্কাতর্কি করিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কথাটা ঐখানেই থামিয়া গেল।

দিন দুই কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইতে আসিয়া সুনয়নী বলিল, "দেখ, তোমার কাছে আমার একটা কথা বলবার আছে। হাজার হোক তুমি স্বামী, তোমার কাছে লুকানো ঠিক নয়।"

উপক্রমণিকা শুনিয়াই হেমেন্দ্রের চোখ প্রায় কপালে উঠিবার জো হইল। বলিল, "কোথায় আবার কি কাণ্ড বাধিয়েছ, তোমার জ্বালায় ত আর পারি না।"

সুনয়নী বলিল, "মা যে তত্ত্ব করেছিলেন তার টাকা কিন্তু আমি দিয়েছিলাম।"

হেমেন্দ্র তড়াক্ করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিল। বলিল, "কোথায় পেলে তুমি টাকা?"

সুনয়নী বলিল, "আমার কড়িহারটা ত পরতাম না, সেইটা বেচে দিয়েছি।"

রাগে তখন হেমেন্দ্রের দম আটকাইয়া আসিতেছে।

সুনয়নীর হাত ধরিয়া এক ঝটকা দিয়া বলিল, "কি ক'রে বেচলে? আর ওসব বেচবার তোমার অধিকারই বা কি? ওসব ত আমাকে দান করা হয়েছে। সালঙ্কারা কন্যা যখন দেয়, তখন অলঙ্কারগুলোর উপরে আমারই অধিকার, তোমার নয়। তুমি চোর।"

সুনয়নী হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "তা বেশ, চোর ত আমায় জেলে দাও না? আমার বাপ-মায়ের দেওয়া জিনিষ, তাতেও আমার অধিকার নেই? এই নাকি আইন?"

আইনটা যে কি তাহা হেমেন্দ্রের ঠিক জানা ছিল না। সে কথাটা ঘুরাইয়া বলিল, "তোমার মা কি ব'লে এ টাকা নিলেন? তোমার আক্কেল নেই না হয়, তাঁর ত থাকা উচিত? যা একবার দান করেছেন, তা আবার নেওয়া যায়?"

সুনয়নী বলিল, "আমি কি আর তাঁকে বলেছি যে আমি গয়না বেচে টাকা দিয়েছি?"

হেমেন্দ্র বলিল, "তবে কি তুমি রোজগার ক'রে এনেছ তিনি ভেবেছেন?"

সুনয়নী বলিল, "না গো মশায়, আমি তোমার নাম ক'রে দিয়েছি। বলেছি শ্বশুর-শাশুড়ীর দুঃখ দে'খে টাকাটা তুমিই দিয়েছ গোপনে। বাবা-মা কত আশীর্ব্বাদ করলেন তোমায়, মা পাঁচজনকে ডেকে বললেন, 'আর যত দুঃখ ভগবান আমায় দিন, এখানে আমি রাজরাণীর চেয়ে সুখী, এমন জামাই দশ জন্ম তপস্যা করলে হয়। হীরার টুকরো ছেলে, আমার পেটের ছেলে হলেও এর বেশী করতে পারত না।' সবাই বললে 'ঠিকই ত, আজকালকার দিনে এমন দেখা যায় না'।"

হেমেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া খানিকক্ষণ সুনয়নীর দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কি সাংঘাতিক মেয়ে তুমি! এ যে দিনকে রাত করা? কলিকাল! নইলে নিজের স্ত্রী এমন হয়!"

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমারে চেয়েছি শুধু, পাই নাই কভু—
প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ পরিণাম
যে ভাবে ভাবুক মনে, আমি জানিলাম
যা চেয়েছি পেয়েছি তা। যে অতৃপ্তি তবু
জেগেছে নিয়ত প্রাণে তাহার নির্ব্বাণ
ধুলার ধরণীবাসী আছে কার হাতে!
পরম সরমে মোর জীবনের রাতে
তোমার বিদায় সে ত প্রেমের সম্মান।

চাওয়া-পাওয়া শোধবোধ হ'ল না যে তাই
আজিও চঞ্চলচিতে চারি ভিতে ফিরি,
তোমার অতীত সেই তুমিরে সদাই
নিজ হাতে রাখিতেছ অন্ধকারে ঘিরি।
যা চেয়েছি পেয়েছি তা, পাই নি যেটুক
নিয়ত অন্তরে যাচি, তারি তীব্র সুখ॥

চীন ও জাপান

উত্তর-চীনে জাপানের বর্ত্তমান 'সাম্রাজ্য-অন্বেষণ' অভিযানের গোড়ার কথা অনেক দিন আগেকার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে বিজয়ী জাপান ফর্‌মোজা দ্বীপ দখল করে। তখন জাপান প্রতীচ্যের খোলস ছাড়িয়া পাশ্চাত্যের নূতন সজ্জা ধরিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তার সাম্রাজ্য-পিপাসাও আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে ১৯০১ সালে বক্সার-যুদ্ধ মিটিবার পরে জাপান ইউরোপ ও আমেরিকার দস্যুদলের সঙ্গে (তাঁহাদের অনেকে এখন পরম সাধু সাজিয়াছেন) মিশিয়া চীনদেশে নানা প্রকার অধিকার পায়। সেই সব অধিকারের ভাগ লইয়াই ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ বাধে এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় জাপান কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার ইজারা পায়। ইজারার পথ সাম্রাজ্যের দিকে লইবার জন্য কোরিয়ায় প্রথম 'স্বাধীন রাজা' বসাইয়া, পরে ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যবাদ-দমনকারীদিগের সঙ্গে মিলিবার ফলে ১৯১৫ সালে শানটুঙ্গের এক বন্দর জাপানের হাতে আসে, কিন্তু ১৯২২ সালে অন্য শক্তিপুঞ্জের চীন-প্রেমের বন্যার ঢেউ বেশী হওয়ায় সেটা চীনকে ফেরত দিতে হয়। ১৯৩২ সালে মাঞ্চুরিয়ার ইজারাও ঐ ভাবে চীনকে ফেরত দেওয়ার আভাস-ইঙ্গিতে জাপান এবার রুদ্রমূর্ত্তি ধরে। পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ প্রথমে লম্ফঝম্প করিয়া পরে ধর্ম্মের গীত গাহিয়া 'দুত্তোর ছাই' বলিয়া সরিয়া পড়েন। ধর্ম্মগীতিগায়কদিগের মধ্যে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লাট লিটন সাহেবও ছিলেন। যাহা হউক, জাপান অত্যুচ্চ পাশ্চাত্য নীতি অনুসারে মাঞ্চুরিয়ায় "স্বাধীন রাজ্য" বসাইয়া ১৯৩২ সাল হইতে নিজের দখল মজবুত করিতে আরম্ভ করে। এই দখল নির্ব্বিবাদ করিবার জন্য জাপান ১৯৩৩ সালে মাঞ্চুরিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী জিহোল প্রদেশ অধিকার করে।

উত্তর-চীনে মাঞ্চুরিয়ার পরে চাহার হোপেহ্, সুইয়ান, শানসি ও শানটুঙ্গ এই পাঁচটি প্রদেশ আছে। একত্রে এই পাঁচটিকে আর একটি তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত

পিইপিং ষ্টেশনের সম্মুখভাগ

করিয়া মাঞ্চুরিয়া-রাজত্ব নিষ্কণ্টক করা ও সঙ্গে সঙ্গে চীনে সাম্রাজ্য স্থাপনের আর একটি ধাপ গাঁথিতে আরম্ভ করা —ইহাই এখন জাপানের চেষ্টা। তাহার পথরোধ করার কোন ওজর আপত্তি সে শুনিতে প্রস্তুত নয় এবং ইহাও সত্য যে জোর গলায় প্রতিবাদ করার মত সাহস কাহারও জোগাইতেছে না।

১৯৩২ সালের শেষে জেনিভায় লিটন-কমিটি মাঞ্চুরিয়া দখল সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিলে, জাতিসঙ্ঘে জাপানী প্রতিনিধিবর্গ প্রথমে দুই-এক মাস কূটতর্কে জয়লাভের চেষ্টা করে। যখন তাহারা দেখিল যে পাশ্চাত্যদল তাহাদের নিজস্ব পন্থায় অন্য দেশীয়দের অধিকার দিতে রাজী নয় অথচ জাপানের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভরসাও তাহাদের নাই তখন তাহারা তর্কযুক্তি ছাড়িয়া মাৎস্য ন্যায় অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ মনে করিল। ফলে ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী তাহারা শানহাইকোয়ান দখল করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী (জাতিসঙ্ঘের কমিটি যেদিন মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ বলেন সেই দিনই) পুনর্ব্বার জিহোল আক্রমণ আরম্ভ করে।

চীনদেশ এতদিন অন্তর্বিপ্লবে ব্যস্ত ছিল। তাহার প্রধান সৈন্যদল তখন স্বদেশীয় কম্যুনিষ্টদিগের দমনে ব্যস্ত ছিল। এদিকে অন্য শক্তিপুঞ্জেরও দূর হইতে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও সাহায্য করার উপায় ছিল না। সুতরাং মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি চীনা জাতীয় সঙ্ঘ মাঞ্চুরিয়া ও জিহোল ত্যাগ করিয়া সন্ধির চেষ্টা দেখিল। এইরূপে ৩১ মে টংকুতে যে সন্ধি হয় তাহাতে জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া ও জিহোলে অপ্রতিহত অধিকার পায়। সন্ধির সর্ত্তগুলি জাপান প্রতিদিনই অদলবদল করিয়া শেষে ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি, সর্ত্তগুলি নিজ ইচ্ছামত হওয়ায়, সন্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে রাজী হয়।

পিইপিঙের রাজপথ

জাপানের রাজ্যপিপাসা কিন্তু অতি প্রবলই রহিল। ১৯৩৫ সালের মে-মাসে কয়েকটি দস্যুদলের দমন উপলক্ষ্য করিয়া জাপানী সেনা আবার নূতন অঞ্চল আক্রমণ করে। এবারও চীন অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া শেষে হোপেহ্ ও চাহার এই দুই অঞ্চলই জাপানের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই সঙ্গেই মঙ্গোল-অঞ্চল অধিকারের সূত্রপাতও জাপানীরা করিয়া রাখে এবং 'সন্ধি' হইবার পরই সেই দিকে অভিযান আরম্ভ হয়।

এদিকে রুশ-সাম্রাজ্যের সীমান্তে প্রথমে উদ্বেগ পরে ভয়ের প্লাবন চলে। ফলে, জাপানের এই সাম্রাজ্য-স্থাপনের গতিরোধের চেষ্টায় মঙ্গোল-অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রুশীয়েরা সকল প্রকারে সাহায্য করিতে থাকে। মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিরিয়ার সীমান্ত অনেক দূর পর্য্যন্ত পাশাপাশি চলিয়াছে। সেখানে দুর্গমালা, এরোপ্লেনের বন্দর ও প্রচুর সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। জাপান দেখিল সেদিকে ভয়ের কারণ আছে, সুতরাং সাময়িক ভাবে চীন-জয় স্থগিত রাখিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপে জার্ম্মানী ও ইটালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি দাঁড়ায় স্পেনে আন্তর্জাতিক বিবাদের সৃষ্টিতে, যাহার ফলে এখন কোনও ইউরোপীয় শক্তির এখন ইউরোপের বাহিরে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। এই সঙ্গে জাপান ও জার্ম্মানীতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার ফলে জাপান আবার নির্ভয়ে চীন-জয়ের পথে চলিতে আরম্ভ করে। মধ্যে কিছুদিন চীন দেশ অবকাশ পাইয়াছিল, কেন-না, জাপানের সেনাপক্ষের কতকগুলি গোঁয়ার সেনানী একটি ছোটখাট বিপ্লবের সূচনা করায় সে-দেশে মহা অশান্তি ও অনিশ্চয়তার সূত্রপাত হয়। দুঃখের বিষয় এই সুযোগে চীনবাসিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, নানা প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদে সময় কাটায়, ফলে জাপান নিজের গৃহ-বিবাদ শান্ত করিয়া আবার দ্বিগুণ বিক্রমে বাহিরের অভিযানে মন দিতে সমর্থ হইয়াছে।
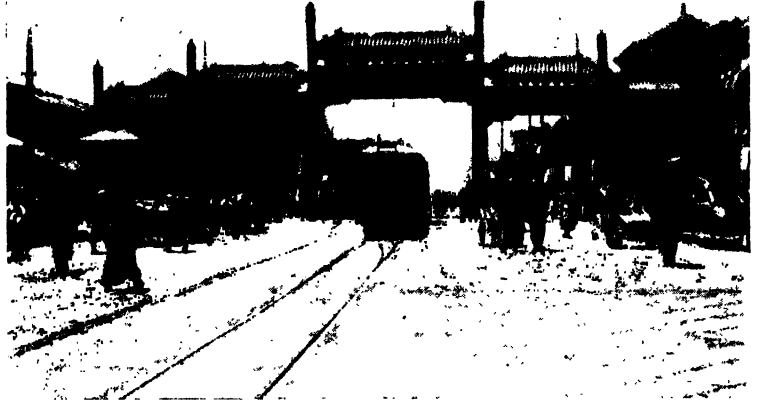
এদিকে রাশিয়ায় ট্রট্স্কিদলের উচ্ছেদ-চেষ্টায় গত দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় চার শত শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও বিশেষজ্ঞ লোকের প্রাণদণ্ড হওয়ায় সেখানে সকল ব্যাপার অনিয়মিত হইয়া পড়ে। সমগ্র রাষ্ট্রে সন্দেহ ও ভীতির ঢেউ চলায় রাশিয়ারও দৃঢ়ভাবে জাপানের সাম্রাজ্যবাদে বাধা দিবার শক্তি নাই। গত জুলাই মাসের গোড়ায়, যখন রাশিয়ার আট জন শ্রেষ্ঠ সেনানায়ককে—এমন কি প্রধান সেনাপতি টুখাচেভাস্কিকেও—প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তখন জাপান আমুর নদের সীমান্তে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। রুশদল প্রথমে যুদ্ধে

উদ্যত হইয়া হঠাৎ সরিয়া যাওয়ায় জাপান বুঝিতে পারে রুশদের মধ্যে লড়িবার উদ্যম বা প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং এই ঘটনার কয়েক দিন পরে পিইপিং (পুরনো পিকিং) শহরের মার্কো পোলো ব্রিজের নিকট কুচকাওয়াজে রত জাপানী সেনাদলের সঙ্গে ২৯-সংখ্যক চীনা সেনাবাহিনীর যখন সংঘর্ষ হয় তখন জাপান দাবী করিয়া বসে যে, চীনা সৈন্যদলকে সরাইয়া দেওয়া হউক এবং এই ব্যাপারের জন্য চীন-রাষ্ট্র জবাবদিহি করুক। বাকবিতণ্ডা ক্রমে বিরোধে পরিণত হইয়া এখন রীতিমত যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, জাতিসঙ্ঘ বা বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ বাক্যজাল বিস্তার ভিন্ন অন্য কোন প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ।

পিইপিঙে চীনা সৈন্য

চীন-রাষ্ট্রে সৈন্য আছে এবং বহুদিনের অপমানে ও অত্যাচারে পীড়িত চীনবাসীর যুদ্ধের উত্তেজনাও আছে, কিন্তু সেনানায়কদিগের মধ্যে একতা নাই, সৈন্যদের যথেষ্ট শিক্ষা বা যুদ্ধোপকরণ নাই, সুতরাং এই যুদ্ধের ফলাফল সুনিশ্চিত। বিজয়লক্ষ্মী চিরদিনই যেদিকে অস্ত্রসজ্জা অধিক সেইদিকেই প্রসন্ন মুখ দেখান, ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনও প্রশ্ন সেখানে নাই!

এখন চীনের উপায় কি? বহুদিন যাবৎ চীনের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এক কথায় বলিতেছেন যে চীনের এখন জীবন-মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা, সাম্রাজ্যবাদের পথে ক্ষণিক বাধা দেওয়ায় কোনই ফল হয় না। কিন্তু এরূপ যুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে দেশে গৃহবিবাদ শান্ত করা প্রয়োজন এবং দেশে ক্ষাত্রধর্ম্মের পুনরুত্থান হওয়া দরকার। চীন দেশে এখন বলশেভিক মত, রাষ্ট্রবাদ, মাৎস্যন্যায়ী সমরপতিদের শাসন এ-সব ত চলিয়াছেই। আবার কিছু দিন যাবৎ এক দল চীনা-সনাতনী "নূতন জীবন" নামে প্রাচীন কালের যত অন্ধ ধর্ম্মমত প্রচারে ব্যস্ত হইয়াছেন। মানুষ যখন যুদ্ধবিগ্রহে বা জীবন-সংগ্রামে ভয় পায়, তখন তাহার মন কাপুরুষের মত বলে "এ-সমস্যা পূরণ করা, এ-কার্য্য সমাধান করা, আমার ক্ষমতার অতীত", তখনই তাহার মনের মধ্যে দৈবশক্তির প্রতিও প্রাচীন কালের যত বুজরুকির প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। তখনই সে আপ্তবাক্য, পূজাপাঠ, তুকতাক ইত্যাদিতে মন দিয়া শত্রুপক্ষের জয়ের পথ পরিষ্কার করে। চীন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি প্রধান অংশের মধ্যে এখন এই নূতন জীবনের নামে কনফ্যুসিয়সের ও লাওৎসের বাণীর প্রচার চলিয়াছে। ইহা সব দিক দিয়াই ক্ষাত্রমত ও পৌরুষবাদের প্রতিকূল, সুতরাং ইহাতে যে দেশের সংগ্রাম-শক্তি ক্ষীণ হইয়া লোপ পাইবে ইহা নিশ্চয়।

শ্রীযুক্তা সুঙ্গ চিং লিং (সুন্ য়াট্‌সেন-পত্নী) একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে সম্প্রতি বলিয়াছেন চীন দেশের এখন সর্ব্বাপেক্ষা দারুণ সমস্যা এই সকল মতবাদের খণ্ডন, ও বলশেভিক ও রাষ্ট্রবাদের বিবাদভঞ্জন। প্রথমটি না হইলে চীনদেশবাসী ক্রমেই অদৃষ্টবাদী হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে এবং দ্বিতীয়টি না হইলে যাহা কিছু পৌরুষের ভাব দেশে আছে তাহার শক্তি অন্তর্বিপ্লবেই ক্ষয় হইয়া যাইবে। তবে জাপান জানে যে এই দুই সমস্যাই তাহার সহায়, সুতরাং ইহার সমাধান সে করিতে দিবে কি না সন্দেহ। চীনবাসীরা অনেক দেরিতে বুঝিয়াছে যে, যে-সকল প্রাচীন মতবাদ বা প্রাচীন ধর্ম্ম ও সামাজিক প্রথা বিদেশীয়েরা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে সে-সকলই বিদেশীয়দের অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক। এবং "সনাতন"-ধর্ম্মের নামে যাহারা দেশ ও সমাজকে শাসন করিতে চায় তাহারাই বিদেশী শত্রুর প্রধান বন্ধু। ক. চ.

প্রতীক্ষা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নব-জাগরণ আধেক চেতন, আধো-বা স্বপনময়,
মধুর-ভারতী প্রভাত-আরাত, প্রথম অরুণোদয়,
আরেক আশার অপর ভাষার অচেনা-চেনার গান,
অধীর মদির সে অথির সুরে থর থর করে প্রাণ।
শ্যামল নিলয়ে কাঁপে কিশলয় ; কুলায়ে-ঝাপট-হানা
ঘুম-ভাঙা পাখী তুলি রাঙা আঁখি প্রথম মেলিছে ডানা।
তরুবীথিকার অন্তরালে কি আনাগোনা শোনা যায় ?
মৃদুল কোমল ফুলের নিশাস বহি আনে বন-বায়।
এমন প্রভাতে বনের শোভাতে, সবুজ সভাতে হেন,
আসিবে আসিবে আসিবে করিয়া তুমি এলে না-কো কেন ?

উতল প্রহর, কালের লহর দুলিয়া দুলিয়া ওঠে,
ঝরে পলগুলি, ব্যথিত দিবার দিঠিতে বিরহ ফোটে।
পরাগ-বিলাসী—কনক-চাঁপার খোলা পাপড়ির কাছে
প্রজাপতিটির পাখায় মরণ-মূর্চ্ছা জড়িয়ে আছে।
বনস্পতির চূড়ায় এখনো রক্তবহ্নি জ্বলে ;
কে গেছে—রাখিয়া অলক্তকের রেখা কমলের দলে ?
বিহগ-কাকলী উঠিছে আকুলি, নীরবে ডাকিছে নীড়,
মিলালো আলোর সেতারের তারে ক্ষীণ টানটির মীড়।
শ্রান্ত যূথিকা যাব-যাব করে, বৃন্ত বলিছে থাকো,
এমন বিদায়-মিলন-লগ্নে কেন তুমি এলে না-কো ?

সুনীল ছবির উপরে রবির তুলির আগুন-টানে
কোন্ সমাহিত-মহিমা-মূর্ত্তি আকাশের পটে আনে ?
চলে কি চলে না ক্লান্ত তটিনী, নড়ে কি নড়ে না পাতা,
জগৎপ্রবাহ গতিহারা হ'ল, অগীত কালের গাথা।
কূজন ছাড়িয়া কপোত করুণ কপোতীর মুখে চায়,
মর্ম্মরহীন বনানী গুমরে নিদারুণ বেদনায় ;
ভরা-সরোবরে তার ছায়া পড়ে ; মরাল বাঁকায়ে গ্রীবা
খোঁজে মরালীর অলস নয়নে উষার অরুণ বিভা।
আসিতে আসিতে স্বপ্ন-আতুর তুমি কি থামিয়া গেলে ?
দীপ্ত দিবার তন্দ্রা-কুহকে কেন তুমি নাহি এলে ?

এ-পারের চখা, ও-পারের চখী ডাকাডাকি শুধু করে,
মাঝখানে নদী বহে নিরবধি গভীর করুণা-ভরে।
ঝিলের সীমায় সারস ঝিমায়, ঝিল্লী কাঁদিয়া চলে,
ডালে কেকাহীন ময়ূর একাকী নীলাম্বরের তলে।
মায়া-আলিপনা-লেখা রহে পড়ি জনহীন বন-বীথি ;
অনাদি কালের বেদনায় ঝরে চন্দ্রালোকের গীতি।
গোলাপের কম-কপোলে লেগেছে বিন্দু অশ্রু কার !
চাহে উন্মুখ ক্ষণগুলি ফিরি পশ্চাতে বার-বার।
ব্যথিত প্রহর,—রজত-রজনী জ্যোৎস্না-বিধুর যেন,
এখনো এলে না, এখনো এলে না, এখনো এলে না কেন ?

সুরের উৎস

শ্রীআশালতা সিংহ

পাত্রপাত্রী-পরিচয়

জ্ঞানদাবাবু	অধ্যাপক
মোহিনী	তাঁহার স্ত্রী
নির্ম্মল	তাঁহাদের প্রতিবেশী যুবক
ইন্দিরা	জ্ঞানদাবাবুর কন্যা
নরেন	জ্ঞানদাবাবুর পুত্র
মিঃ নন্দী	বিলাত-ফেরত তরুণ ব্যারিষ্টার
শান্তা	ইন্দিরার শিক্ষয়িত্রী
মনোজবাবু	ইন্দিরার মেসোমশায়
কুন্তল	তাঁহার কন্যা
মিঃ ভাদুড়ী	বিলেত-ফেরত বালিগঞ্জনিবাসী আধুনিক ভদ্রলোক,
রেবা	তাঁহার কন্যা
মিসেস ভাদুড়ী	

এই কয়েক জন প্রধান চরিত্র ছাড়াও ভৃত্য ব্রজ, টেনিসখেলার কোর্টে জ্ঞানদাবাবুর কয়েক জন বন্ধু, ইন্দিরার জন্মতিথি-উৎসবে তাহার কলেজের কয়েক জন বান্ধবী ইত্যাদি আরও কয়েকটি ছোটখাট চরিত্র আভাসে মাত্র দেখা যাইবে।

পরিচয়

অধ্যাপক জ্ঞানদাবাবু হাল আমলের উদারপন্থী শিক্ষিত ভদ্রলোক। বড়গোছের প্রফেসরি করেন; বিলাতী ডিগ্রী আছে। স্ত্রীশিক্ষা, পর্দা না-মানা, কো-এডুকেশন (সহশিক্ষা), বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের মন জানাজানি করিবার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি তিনি যে কেবলমাত্র মুখে মানেন তাহাই নয়, আপন পরিবারেও তাহা ঘটিতে দিতে উৎসুক। বয়স বছর পঞ্চান্ন। আঁটসাঁট গড়ন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা।

তাঁহার স্ত্রী মোহিনী দেবী তাঁহার চেয়ে বয়সে বছর-দশেকের ছোট? মনে প্রাণে সেকালের মেয়েদের মত স্বামীগতপ্রাণা। নিজের মতামতের কোন বালাই নাই। আধুনিকতার যেটুকু প্রলেপ লাগাইয়াছেন, কেবল স্বামীর জন্য। মুখভাবে একটি স্নিগ্ধ সহিষ্ণু মাতৃভাব আছে। তাঁহাদের দুই ছেলে। বড় ছেলে রমেন আজ বছর দুই-তিন হইল কেমব্রিজে পড়িতেছে। ছোট নরেন প্রেসিডেন্সীতে বি-এ পড়ে। সকলের চেয়ে ছোট মেয়ে ইন্দিরা, আঠারো বছরের, দেখিতে সুশ্রী, মায়ের মত। কিন্তু মায়ের মুখে যে স্নিগ্ধ ভাবটি আছে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার মুখশ্রীতে প্রকাশ পায় একটা বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য। সে বেথুন কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। তাহার বাবা সহশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বেথুনে ভর্ত্তি হইয়াছে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জ্ঞানদাবাবুর বাড়ীর বসিবার ঘর। আধুনিক কায়দায় সাজানো। সময়টা শীতের সন্ধ্যা। বিলাতী কায়দায় চুল্লীর নিকট একটা চেয়ারে বসিয়া জ্ঞানদাবাবু কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছেন। কিছু দূরে অপর একখানা চৌকিতে মোহিনী একটা সেলাই হাতে বসিয়া আছেন। একটা বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলিতেছেন। অবশ্য, সেলাইটা উপলক্ষ্য, স্বামীর কাছে বসিয়া গল্প করা এবং তাঁহার কিছু প্রয়োজন হইবে কিনা জানিয়া লওয়াই লক্ষ্য। কিছুকাল দুই জনে নিঃশব্দে কাজ করিবার পর,]

মোহিনী। [একটা হাই তুলিয়া] যাই, সাতটা বাজল, তোমার হর্লিক্সটা এবার নিয়ে আসি। এবারে ঐ কাগজ-পত্রগুলো রাখ না গো। এই তো সেদিন অতবড় অসুখ থেকে উঠলে।

জ্ঞানদা। সে ত প্রায় আজ এক মাস হ'তে চলল। কিন্তু ঝি রয়েছে চাকর রয়েছে বেয়ারা আছে, তাদেরই কাউকে ব'লে দাও না কেন হর্লিক্স ক'রে নিয়ে আসবে, তোমার তাড়াতাড়ি উঠবার দরবার কি? [এতক্ষণ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কথা বলিতেছিলেন, এখন মুখ তুলিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া] আচ্ছা, কাল যে তোমাকে খবরের কাগজে দাগ দিয়ে বললুম, ভাইসরয়ের স্পীচটা পড়ে রেখো, পড়েছিলে?...আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না যে...এই স্পীচটার মস্তবড় একটা সিগ্নিফিক্যান্স (গূঢ়ার্থদ্যোতনা) রয়েছে...

মোহিনী। ওটা এখনও আমার পড়া হয় নি। পড়ব ব'লে রেখেছিলুম, বেয়ারাটা বুঝতে না পেরে সেটা পুরনো খবরের কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে।

জ্ঞানদা। আশ্চর্য্য! আজ তিন দিন হ'ল দিলুম পড়তে, এখনও তোমার পড়া হয় নি?

মোহিনী। সময় কোথা যে পড়ব? যেই দুটি লাইন পড়েছি অমনই খোকা এসে বললে, তার জামাতে বোতাম নেই। কলেজ কি ক'রে যাবে তার ঠিক নেই, স্নান ক'রে এসে একটা ফরসা ধুতি খুঁজে পাচ্ছে না। বেয়ারাটা আমাকে না দেখিয়েই এক ক্ষেপে তার দশটা ধুতি ধুতে দিয়েছে। ইন্দু বললে, তার শাস্তাদি এক পেয়ালা চা চাইছেন।

জ্ঞানদা। আমার খুবই অবাক লাগে বাড়ীতে এতগুলো ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও তুমি একটা খবরের কাগজের প্রবন্ধ পড়তে সময় পাও না। কেন, বেয়ারাটা কি চা তৈরি করতে ভুলে গেছে, না এই এতবড় কলকাতা শহরে দরজী মেলে না যে তোমাকে রাত-দিন জামার বোতাম সেলাই করতে হবে, আর—

মোহিনী। [তাহার উত্তেজনায় বাধা দিয়া, বিস্মিত স্বরে] ওমা, তুমি যে অবাক করলে! জামার একটা বোতাম ছিঁড়লেই দরজীবাড়ী দৌড়তে হবে নাকি? আর বেয়ারা যে চা তৈরি করে, খোকা আর ইন্দু বলে অমন চা খাওয়ার চেয়ে চা না খেলেই হয়। তুমি কি মনে কর আমি যে কাজটি নিজে থেকে না দেখব, সেটি হবার জো আছে! কিন্তু আর না, যাই তোমার হর্লিক্সটা তৈরি করে নিয়ে আসি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান করিলেন]

[অন্য দিকের দরজা দিয়া ইন্দিরা ঘরে ঢুকিল]

জ্ঞানদা। তোমার পড়া হয়ে গেল মা?

ইন্দিরা। হাঁা, এইমাত্র আমাকে পড়ানো শেষ ক'রে শাস্তাদি চলে গেলেন। এ কি, তুমি এখনও খোলা জানালার সামনে ব'সে হিম লাগাচ্ছ বাবা? এই ত সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠলে। মা কোথা গেলেন?

জ্ঞানদা। তোমার মা এখানেই বসেছিলেন, এইমাত্র আমার রাত্রির খাবার আনতে গেলেন তৈরি ক'রে। তাঁর অত্যাচারের ত সীমা-পরিসীমা নেই। কবে অসুখ থেকে উঠেছি এখনও রোজ রাত্তিরে এক বাটি ক'রে হর্লিক্স খাওয়াই চাই। এদিকে দেখি তোমার মা দিনান্তে একটিবার খবরের কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে যাবারও অবসর পান না। সেদিন অত ক'রে বললুম লর্ড জেটল্যাণ্ড যে কথাগুলো বললেন একবার ভেবে দেখ দিকি..দেশের কতবড় একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত যাচ্ছে...কিন্তু তোমার মায়ের কাছে মশারির একটি পেরেক সোজা ক'রে টাঙানোও দেশের এতবড় ভাবনার চেয়ে মূল্যবান।

[ইন্দিরা তাহার মায়ের পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।]

জ্ঞানদা। [বিস্মিত হইয়া] তুমিও হাসছ ইন্দু? কেন আমি যে কথাগুলো বললুম তাতে কি হাসির উপাদান ছাড়া আর কিছু ভাববার বিষয় নেই? মেয়েরা কি চিরদিনই জামার বোতাম পরানো আর বালিশের ওয়াড়ে ফুল তোলা—এই সব নিয়ে থাকবে? বৃহত্তর জগতে তাদের কোন দায়িত্ব নেই?

ইন্দিরা। [দেয়ালে টাঙানো তাহার এস্রাজটা পাড়িয়া আনিয়া] তুমি সারাদিন এই সব পরীক্ষার কাগজ নিয়ে বড্ড খেটেছ বাবা, এখন আর বৃহত্তর জগতের সমস্যার সমাধান এর উপর সইবে না। তার চেয়ে আমি একটু এস্রাজ বাজাই তুমি শোন।

[এমন সময় ইন্দিরার মেসোমশায় এবং তাঁর কন্যা ফুল্লরা ঘরে ঢুকিলেন। ইন্দিরার মেসো মনোজবাবু, পসারওয়ালা এটর্ণি। বয়স জ্ঞানদাবাবুর চেয়ে কিছু কম। শুষ্ক চেহারা কাঠখোট্টাগোছের। জীবনে যেন সরসতা নাই। মেয়ে ফুল্লরা আধুনিক প্রগতিশীলা তরুণী। মাজাঘষা ফ্যাশনদুরস্ত বেশভূষা।]

জ্ঞানদা। আরে মনোজ যে! এস এস! এদিকে যে আর তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না।

মনোজ। সময় ক'রে উঠতে পারি নে ভাই। যা কাজের চাপ পড়েছে। সেই দুটি নাকে মুখে দিয়ে হাইকোর্ট দৌড়ই, ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

ফুল্লরা। [মিহি স্বরে] আমি এসেছি ইন্দুকে নিমন্ত্রণ করতে মেসোমশায়। কাল আমার জন্মদিন। তাকে যেতে হবে আর ঐখানেই থাকতে হবে কালকের দিনটা। আমাদের হোল-ডে প্রোগ্রাম রয়েছে। কাশীপুরে আমাদের বাগানবাড়ীতে চড়িভাতি করতে যাব, তার পর সবাই মিলে একসঙ্গে মেট্রো।

ইন্দু। ওরে বাবা, সে যে সারাদিনব্যাপী হৈ চৈ! আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।

ফুল্লরা। মা আবার কি বলবেন? তোর ইচ্ছে হয় যাবি, না, ইচ্ছে হয় যাবি নে। এ ত ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচির কথা।

ইন্দু। [হাসি চাপিয়া] তাই না কি? আচ্ছা মাসীমা এলেন না কেন ফুল্লরাদি?

ফুল্লরা। তিনি মীটিঙে গেছেন।

ইন্দু। কিসের মীটিং ভাই?

ফুল্লরা। ওমা, জানিস নে! পর্দাপ্রথার বিষময় ফল বোঝাবার জন্যে যে পার্কে মস্ত মীটিং হচ্ছে। মাকে ওরা সভানেত্রী করেছে। আমরাও সেখানে ছিলুম। মায়ের এখন দেরি আছে দেখে নিমন্ত্রণগুলো সেরে নিতে বেরিয়েছি। এই মীটিঙের কথা নিয়ে শহরময় হৈ চৈ, আর তুই কিছুই জানিস নে? তুই কেমন যেন একটু কুনো স্বভাবের ইন্দু। মেসোমশায়, আপনার এদিকে একটু লক্ষ্য করা উচিত। বাইরে যে একটা মস্ত জগৎ চলছে আমাদের সে-বিষয়ে দস্তুরমত খোঁজ রাখা উচিত।

জ্ঞানদা। [উৎসাহিত হইয়া] নিশ্চয়, এক-শ বার! আমিও একটুখানি আগে ঠিক সেই কথাই ইন্দুকে বলছিলুম মা। কিন্তু তোমার মাসীমা—

মোহিনী। [হর্লিক্সের পেয়ালা-হাতে প্রবেশ করিয়া] কিন্তু মাসীমা কি?—বল না সবটা, থামলে কেন?…ও মা এ যে রায়মশায়সুদ্ধ এসেছেন, কত ভাগ্যি! [জ্ঞানদার হাতে পেয়ালাটা দিয়া] একটু সবুর করতে হবে কিন্তু, অমনি ছাড়ছি নে…একটু মিষ্টিমুখ…

ফুল্লরা। [একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] না না মাসীমা, মাপ করতে হবে। এখনও আমাদের অনেক জায়গায় এন্‌গেজমেন্ট বাকী রয়েছে। [রিষ্টওয়াচের দিকে চাহিয়া] ঠিক সাতটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে মিসেস মণ্ডলের বাড়ী পৌছান চাই। তিনি আবার বেরিয়ে যাবেন। বরঞ্চ বাবা কিছুক্ষণ বসুন, আমি ফিরবার সময় ওঁকে তুলে নেব।

[হিলউঁচু জুতা খটখট করিয়া চলিয়া গেল]

জ্ঞানদা। [স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া] শুনলে ত রায়মশায়ের গৃহিণী একটা কত বড় সভার প্রেসিডেন্ট হয়ে মীটিঙে গেছেন। তাঁর কত বড় দায়িত্ব, দেশের দুঃখদুর্দ্দশা ঘোচাবার জন্যে নিজের অনেকখানি দিয়েছেন, আর তুমি?…

মোহিনী। [বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া]…আর আমি সম্প্রতি চললুম রায়মশায়ের জন্যে গোটাকতক গোকুল-পিঠে আনতে। ওবেলা তৈরি করেছি। আপনি এই পিঠে খুব ভালবাসেন, নয় রায়মশাই?

[প্রস্থান করিলেন]

মনোজ। [একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একবার সতৃষ্ণ নয়নে ঘরের চারি দিকে এবং একবার জ্ঞানদাবাবুর দিকে তাকাইয়া] কি যে ভালবাসি আর কি বাসি নে তা অনেক দিন হ'ল ভুলে গেছি দাদা। বামুনে কিংবা বাবুর্চ্চিতে যা তৈরি ক'রে এনে দেয় খাই। কোন বিকার নেই, ক্ষুন্নিবৃত্তি…হলেই হ'ল। কেবল অনেক রাত্রিতে কাজকর্ম্ম সেরে খেটেখুটে যখন বিছানায় এসে দেখি চাকর বেটা এমন ক'রে মশারি খাটিয়েছে যে সারারাত্রি মশার কামড় খাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন রীতিমত কষ্ট হয়। কিন্তু গৃহিণীকে একথা বলতে কেমন যেন লজ্জা ক'র। যিনি দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের ভার নিয়েছেন, তাঁকে কি ক'রে বলি আজ তরকারিতে নুন হয় নি কিংবা মশারিটা উটমুখো ক'রে টাঙান হয়েছে।

জ্ঞানদা। [উত্তরোত্তর মুগ্ধ হইয়া] দেখলি ইন্দু, দেখ! আর তোর মা? ‥তাঁর কাছে মশারির একটা কোণ সোজা ক'রে টাঙান দেশের সব বড় বড় সমস্যার চেয়ে মূল্যবান! এ যে ভগবানের দেওয়া এত বড় জীবনটার দস্তুর মত অপব্যয়!

ইন্দিরা [হাসিয়া] ও সব বড় বড় কথা ভাবতে গেলে এই দুর্ব্বল শরীরে তোমার আবার মাথা ঘুরবে বাবা। তার চেয়ে মা যতক্ষণ না খাবার আনছেন আমি একটু এস্রাজ বাজাই।

[ইন্দিরা এস্রাজ বাজাইতে লাগিল। ইমনকল্যাণের করুণ সুর শান্ত সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দিরার পড়িবার ঘর। এক কোণে একটি অর্গান। শেল্‌ফে কিছু বই সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিলে ফুলদানিতে ফুল।

চারি পাশে চারিখানা চেয়ার। ইন্দিরা অর্গানের নিকট বসিয়া অতুলপ্রসাদ সেনের বিখ্যাত গান 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে, তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ বাদল-রাতে' গানটি গাহিতেছিল। নির্ম্মল পাশের দরজা দিয়া ঢুকিয়া তাহার চেয়ারের হাতলে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরা। [গান থামাইয়া এই দিকে ফিরিয়া] ওমা, আপনি কখন এসেছেন? আমি কিছুই টের পাই নি!

নির্ম্মল। ভাগিস টের পাও নি, তাহলে হয়ত আরও আগেই গান বন্ধ করতে।

ইন্দিরা। [একটু সলজ্জভাবে] জানেনই ত যে আমি কারও সামনে গাইতে পারি নে। একা যখন থাকি তখন কখনও কখনও ইচ্ছে হ'লে···কিন্তু যাক গে ও কথা। হ্যাঁ, দেখুন দাদা যাওয়ার পর থেকে আমাদের টেনিস-কোর্টটা অমনি পড়ে রয়েছে। আজ মিঃ নন্দী প্রস্তাব করছিলেন, বিকেলে টেনিস খেলবার কথা। আপনি কি বলেন? অনেকেই যোগ দেবেন।

নির্ম্মল। আমি ত জানতুম, তুমি এসব গোলমাল ভালবাস না।

ইন্দিরা। তা সত্যি। কিন্তু বাবার শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। মনও তাঁর ভাল নেই। এক সময়ে তিনি টেনিস খেলতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যদি এই হিড়িকে তাঁর মনটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও প্রফুল্ল রাখা যায়।

নির্ম্মল। হ্যাঁ, আমিও লক্ষ্য করেছি তোমার বাবার শরীর যেন দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আচ্ছা, রমেন বিলেত থেকে ঠিক সময়ে চিঠিপত্র দেয় ত? কই এদিকে সে আর আমাকে চিঠিপত্র লেখে না। আমি অনেকগুলো চিঠি দিয়েছি তার একটারও জবাব পাই নি।

ইন্দিরা। আমাদেরও দেয় না। সম্প্রতি দাদার ব্যবহার কি রকম খাপছাড়া হয়ে গেছে। প্রত্যেক মেলে চিঠি আসা দূরে থাকুক, এই সেদিন তার খবর অনেক দিন পান নি ব'লে মা কান্নাকাটি করায়, 'তার' ক'রে খবর আনতে হ'ল।

নির্ম্মল। তাই ত! আচ্ছা ইন্দিরা, মিঃ নন্দীটি কে?

ইন্দিরা। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করেন, চমৎকার লোক। আমার মাসতুত-বোন ফুল্লরার জন্মদিনে তাদের বাড়ীতেই আলাপ হয়েছিল।

ইন্দিরার শিক্ষয়িত্রী শান্তা মিত্র প্রবেশ করিল। ইতিহাসে এম-এ. ফার্ষ্ট ক্লাস। চেহারা সুশ্রী, একটা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আছে। বছর-ত্রিশেক বয়স। রোগা ধরণের। মুখে অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক একটা রুক্ষ কোমল ভাব। নির্ম্মল যে এ বাড়ীর বহুদিনের পরিচিত এবং অদূর ভবিষ্যতে ইন্দিরার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি দাঁড়াইবে তাহা ভাল করিয়া জানে।

শান্তা। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] নির্ম্মলবাবু যে! কি ইন্দিরা আজ পড়বে নাকি?

ইন্দিরা। বাঃ একথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

নির্ম্মল। সব কথার মানে থাকে নাকি? তুমি যে দেখছি 'লজিক' পড়ে পড়ে দস্তুরমত লজিকাল্ হয়ে উঠছ। কি শান্তাদি, আপনার ছাত্রী আজকাল পড়াশোনা করছে কেমন? কই ইন্দিরা বানান কর দেখি বিষণ্ণ, যত্নবতী।

[ইন্দিরার ছোট দাদা নরেন দুয়ারের কাছে আসিয়া]

নরেন। বাঃ, মেয়েদের পড়া মানে কি চমৎকার আড্ডা দেওয়া!

ইন্দিরা। তোমার তাতে কি?

নরেন। আমার তাতে কিছুই নয় এবং সম্ভবতঃ তোমারও নয়। কারণ মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাক বা ব'সে থাক, হাসুক বা কাঁদুক, পড়া করুক কিংবা আড্ডা দিতে থাক্;—সব সময়েই তাদের বাহবা দেবার লোক জুটবে। আপনি কি বলেন নির্ম্মল-দা?

নির্ম্মল। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

নরেন। যাই আমার একটা কাজ আছে। এবং বড় দুঃখের বিষয় কাজ না করে গল্প করলে ইন্দিরার মত বাহবা পাব না।

[প্রস্থান করিল]

ইন্দিরা। [সকোপে, নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া] যান, আপনাদের সবেতেই তামাশা।

নির্ম্মল। যেতে ত হবেই। যখন শান্তাদি এসেছেন এবং তোমার পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে।

শান্তা। ঐ যাঃ, ইন্দু, গিবসনের বইখানা কাল আনতে

বলেছিলে, এনেছি। কিন্তু মোটর থেকে নামাতে মনে নেই। যাই নীচে একবার, দেখে নিয়ে আসি।

[শান্তা প্রস্থান করিল]

নির্ম্মল। ইন্দু!

ইন্দিরা। বলুন।

নির্ম্মল। যে-গানের সবটা শুনতে পেলুম না সমস্ত দিন রাত্রি তারই রেশ কানে বাজবে। 'তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে।'

ইন্দিরা। শীতের কনকনে সন্ধ্যে, আকাশে মেঘের লেশ নেই।

নির্ম্মল। কিন্তু মনে অনেক মেঘ জমে রয়েছে ইন্দু। যদি বলি সেখানে বাদল-রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি নে।

ইন্দিরা। মুখে মুখে কাব্য তৈরি করবেন না। কাল থেকে টেনিস খেলতে আসতে হবে।

[শান্তা একটা মোটা বই-হাতে ঘরে ঢুকিল]

শান্তা। নির্ম্মলবাবু, আমার উপর কৃতজ্ঞ থাকবেন কিন্তু।

ইন্দিরা। কেন?

শান্তা। ভাগ্যে বইখানা ফেলে এসেছিলুম।

ইন্দিরা। [সকোপে] শান্তাদি ভাল হচ্ছে না ব'লে দিচ্ছি।

তৃতীয় দৃশ্য

[জ্ঞানদাবাবুর বাড়ীতে টেনিস-কোর্ট। লনের উপর ইতস্তত বেতের চৌকি, ছোট টেবিল সাজান আছে। কয়েক জন বসিয়া আছেন। চার জন খেলিতেছেন। মিঃ নন্দী এ সেটে খেলেন নাই। ইন্দিরার সহিত খেলিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন। একটা ছোট টেবিলের চারি দিকে নন্দী ও আরও দুই-তিন জন বন্ধুবান্ধব, শান্তা প্রভৃতি বসিয়া আছে। ইন্দিরা তাহাদের চা ইত্যাদি পরিবেশন করিয়া যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হয় তাহাই করিতেছে। এমন সময় একটা টেনিস-র‍্যাকেট-হাতে নির্ম্মল ঢুকিল।]

ইন্দিরা। আপনি এত দেরি করলেন! আমি ভেবেছিলুম আজ বুঝি আর আসবেন না।

নির্ম্মল। [অপ্রসন্ন নয়নে একবার চারি দিকে চাহিয়া] আমি না এলেও যে কিছু ক্ষতি ছিল তা মনে হয় না।

ইন্দিরা। [একটা চেয়ার তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া] ক্ষতিটা কি কেবল বাইরে থেকেই দেখা যায় তাই মনে করেছেন? [এক পেয়ালা চা তাহার হাতে দিয়া] কিন্তু ভাবছি নিজের মনের মধ্যে একটু বিনয় রেখে কথা কইতে শিখবেন কবে?

নির্ম্মল। [অনুতপ্ত সুরে] সত্যি তোমার কাছে এখনও অনেক শিখবার রয়েছে ইন্দিরা।

ইন্দিরা। এবারে যে অতিবিনয় সুরু হ'ল। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটি যে এদিকে জুড়িয়ে জল হচ্ছে।

নন্দী। [হাতের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া] মিস্ গুপ্ত, কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের এই বাগানখানা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। চমৎকার বাগান! সমস্ত জিনিষটার মধ্যে ভারি সুন্দর একটা রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি যদি দয়া ক'রে পথ দেখান—

ইন্দিরা। বেশ ত আসুন না। এখনও ওঁদের এই সেটটা খেলা শেষ হ'তে দেরি আছে। ততক্ষণে আপনার বাগান দেখা হয়ে যাবে।

[ইন্দিরা ও নন্দী উঠিয়া দাঁড়াইল]

[নির্ম্মল চা খাইতে খাইতে একবার তাহাদের দুই জনের দিকে চাহিল]

ইন্দিরা। [চলিতে চলিতে] এই দেখুন এই চন্দ্রমল্লিকার টবগুলি আমি নিজের হাতে লাগিয়েছি। আর ঐ গোলাপের চারাগুলো বাবা পুঁতেছেন। এই যে দেখছেন বেগুনী রঙের চন্দ্রমল্লিকা, এগুলি এখনও বড় হয় নি, সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটতে সুরু হয়েছে। যখন সমস্তটা ফুটবে এক-একটি ফুল বড় থালার মত প্রকাণ্ড হবে।···আচ্ছা গোলাপের কোন্ রং আপনার পছন্দ? সাদা না মার্শাল নীল?

নন্দী। আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনার বাগানের একটি চন্দ্রমল্লিকা আমাকে দিন।

ইন্দিরা। বেশ ত, আমি মালীকে ব'লে দেব আপনি যখন যাবেন চন্দ্রমল্লিকার একটি তোড়া তৈরি ক'রে দেবে।

নন্দী। না না, আমার মালীরও প্রয়োজন নেই, তোড়ারও প্রয়োজন নেই। আপনি নিজের হাতে একটি ফুল দিলেই আমি খুশী হব।

ইন্দিরা। মাপ করবেন, আমি নিজের হাতে আজ অবধি এ বাগানের ফুল তুলি নি।

নন্দী। [উচ্ছ্বসিত স্বরে] এ কথাটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। আপনার হৃদয় ঐ ফুলগুলির মতই সুকুমার। আপনি কি পারেন নিজের হাতে ফুল ছিঁড়তে!

ইন্দিরা। [অল্প হাসিয়া] সম্ভবতঃ আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু ওঁদের খেলা দেখছি শেষ হয়েছে, চলুন যাওয়া যাক।

[বাগানের পথ ঘুরিয়া তাহারা খেলার জায়গায় আসিয়া পৌঁছিল।]

নির্ম্মল। একটা কথা শোন ইন্দিরা; আজ আমার শরীরটা কেমন যেন ভাল লাগছে না। তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমি বাড়ী যাই।

ইন্দিরা। [স্মিতমুখে] আমি কেবল এই কথাটি মনে করব যে, আপনারা মুখে যত লম্বা লম্বা কথা বলেন মনে সেটার যাচাই না ক'রেই বলেন।

নির্ম্মল। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] মাপ কর ইন্দিরা, সময়-বিশেষে বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার ধৈর্য্য মানুষের থাকে না। আজ আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। চললুম। তোমার বাবা যদি খোঁজ করেন ব'লে দিও।

ইন্দিরা। [ব্যাকুল স্বরে] যদি সত্যি মাথা ধরে থাকে তাহলে এখনই আবার গিয়ে সেই অন্ধকূপে বইয়ের গাদা নিয়ে বসবেন, তাতে কি ভাল ফল হবে? তার চেয়ে এইখানে খোলা হাওয়ায় একটু বসলে কি ক্ষতি হ'ত?

নির্ম্মল। [গম্ভীর মুখে] তুমি যখন বলছ; আর একটু বসি। হয়ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা ধরা সারতেও পারে।

ইন্দিরা। শুধু ঠাণ্ডা হাওয়াতে সারবে না। আরও কিছু চাই।

নির্ম্মল। তুমি তামাশা করছ।

ইন্দিরা। ওমা! তামাশা কিসের?

নন্দী। [ইহাদের নিকটস্থ হইয়া] আলো ক্রমেই কমে আসছে। মিস গুপ্ত খেলা সুরু করলে ভাল হয়। আপনার পার্টনার হওয়ার সৌভাগ্য···

ইন্দিরা। কিন্তু আমাকে যে অল্পক্ষণের জন্য ছুটি দিতে হবে মিঃ নন্দী। আমার একটা ভারি দরকারী কাজ বাকী রয়েছে, সেটুকু না সেরে আমি আসতে পারব না। আপনারা ততক্ষণ সুরু ক'রে দিন। শান্তাদি রয়েছেন, আর আপনার ঐ বন্ধু সতীশবাবু, চারুবাবু। এর মধ্যে হয়ত আমি এসে পড়তে পারি।

নন্দী। সে এমন কি দরকারী কাজ মিস্ গুপ্ত?

ইন্দিরা। আমার বাবা অসুখ থেকে উঠবার পর তাঁর রাত্রির খাবার আমি কিংবা আমার মা তৈরি ক'রে দিই। আজ মায়ের শরীর ভাল নেই। সাতটার সময় তিনি এক পেয়ালা হর্লিক্স খান। তার আর বড় দেরি নেই। আচ্ছা আপনারা ততক্ষণ খেলা আরম্ভ করুন।

[প্রস্থান করিল]

সতীশ। [নন্দীর বন্ধু] কি নন্দী, আজ আর খেলবে না নাকি?

নন্দী। [নিস্পৃহ স্বরে] তেমন ইচ্ছে করছে না। আজকের সন্ধ্যেটি বড় চমৎকার! খেলার চেয়ে চুপ ক'রে মেঘের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করছে।

[নির্ম্মল মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই একটু ইতস্তত করিয়া একটু এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

নন্দী। [বিদ্রূপের স্বরে] মাপ করবেন, নির্ম্মলবাবু আপনারও বুঝি অন্যত্র একটু বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে?

নির্ম্মল। [হঠাৎ তাহার এমন প্রশ্নে অপ্রতিভ হইয়া] হ্যাঁ,···না, ঠিক তেমন কিছু···এই আমার ছড়িটা কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না। বাড়ী ঢুকবার সময় বোধ হয় বাইরের ঘরে ফেলে এসেছি, একটু খোঁজ করা দরকার।

[চট করিয়া চলিয়া গেল।]

নন্দী। [শান্তাকে প্রশ্ন করিয়া] আশ্চর্য্য! এলেন টেনিসের র‍্যাকেট্ হাতে। ছড়ি কোন্ হাতে নিয়েছিলেন?

শান্তা। [হাসিয়া] এর চেয়ে জুৎসই একটা কিছু তাঁর ভেবে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি এমন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন যে চিন্তা ক'রে উত্তর দেবার সময় ছিল না। উনি নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

নন্দী। [নির্ম্মলের পরিত্যক্ত টেনিস-র‍্যাকেট্‌টার দিকে চাহিয়া] একটা সামান্য ছড়ি পাছে হারিয়ে যায় এই আশঙ্কায় নির্ম্মলবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন অথচ এই দামী

র‍্যাকেট্‌টা যে পড়ে রইল সে খেয়াল নেই। লাভ-ক্ষতির হিসেব দেখছি ওঁর অসামান্য।

শান্তা। মানুষের জীবনে একটা সময় আসে, যখন লাভ-ক্ষতির কথা খেয়াল থাকে না। সংসারের সাধারণ হিসেবের সঙ্গে তখন মিলবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

খোলা জানালার কাছে গরাদে মাথা রাখিয়া ইন্দিরা দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মল টেনিস-শু-পায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল।

নির্ম্মল। মাপ কর ইন্দু। হাজার বড় বড় কথা বলি, তোমার কথাই সত্যি। পুরুষমানুষ চিরদিনই বর্ব্বর।

ইন্দিরা। এমন কথা আমি কক্ষনো বলি নি। কিন্তু ঐ মিঃ নন্দী এবার আমাকে জ্বালাতে সুরু করবেন তা বেশ বুঝতে পারছি। ভদ্র এবং কালচার্ড সমাজের এই সুমিষ্ট বন্ধুত্বের জের অন্য সময় হ'লে হয়ত বা সহ্য করতে পারতুম কিন্তু এখন আমার মন এত খারাপ যে কিছুতেই সইবে না।

নির্ম্মল। আমি দেখছি তোমাদের পরিবারে কি যেন একটা অশান্তির ছায়া পড়েছে। তোমার বাবা হাসছেন, সবারই সঙ্গে গল্প করছেন, কিন্তু তাঁর মন যেন আর কোথাও। তোমাকেও তেমন ভাল দেখাচ্ছে না—কি হয়েছে আমাকে কি বলতে পার না?

ইন্দিরা। [জানালার উপর বসিয়া] আজ বাবার কাছে বিলেতী ডাকে একটা বেনামী চিঠি এসেছে তার অর্দ্ধেকও যদি সত্য হয়—আমি সেটা লুকিয়ে পড়েছি···।

নির্ম্মল। ওঃ এই! বেনামী চিঠিতে অমন কত কথাই থাকে। রমেনকে আমি ছোট থেকে জানি। আমি জানি সে এমন কোন কাজ করবে না যাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়।

ইন্দিরা [সাগ্রহে] সত্যি?

নির্ম্মল। সত্যি নয় ত কি, যার এমন বোন।

ইন্দিরা। আবার সুরু করলেন ঐ ড্রয়িংরুম-জাতীয় স্তুতিবাদ। জানেন বেশ যে এ আমি কিছুতেই সইতে পারি নে।

নির্ম্মল। [হতাশ হইয়া] আচ্ছা, আর বলব না। শুধু ভাবি যা মনে হয় তার অর্দ্ধেকও যদি বলতে পেতুম।

ইন্দিরা। [সরিয়া আসিয়া ষ্টোভ ধরাইবার উদ্যোগ করিয়া] সব বলতে নেই, হাতের পাঁচ রাখতে হয়। কিন্তু বাগানে বেড়াবার সময় মিঃ নন্দী একটা ফুল তুলে দিতে বলেছিলেন। ফুল তুলতে বড় কষ্ট হয়, দিতে বাধল। কি জানি শিষ্টাচার হ'ল কি না।

নির্ম্মল। [ইন্দিরার হাত হইতে স্পীরিটের বোতল কাড়িয়া লইয়া] আমি ষ্টোভ ধরাতে জানি। কিন্তু ইন্দিরা, তুমি আমাকে অনর্থক কেনই বা পরীক্ষা করছ? তুমি জান আমি কোনদিন তোমার কাছে কিছুই গোপন করি নি, আর আমার অজানাও তোমার কাছে কিছু নেই। মুখে যত বড় বড় কথাই বলি ভিতরে কত দৈন্য। নইলে ঐ লোকটার সঙ্গে একত্রে তোমাকে বেড়াতে দেখে এত কষ্ট হবে কেন?

ইন্দিরা। [ষ্টোভ ধরিয়া উঠিয়াছিল, কেট্‌লিতে জল চড়াইয়া] যত বড় বুদ্ধিমানই হোক, সব পুরুষই একটা দিকে যুক্তিহীন অবোধ শিশু। কিন্তু শুধু কি তোমার মনেই কষ্ট হয়?—সভ্য সমাজের এই সব বন্ধুত্বের দাবি মিটিয়ে চলতে আমার হয় না কষ্ট! [সহসা লজ্জিত হইয়া] এত উলটোপালটা বকেন আপনি, সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। এখনই ভুলে—

নির্ম্মল। এক জনকে তুমি ব'লে ফেলেছ। জানি, নিমেষেই ভুল শুধরে নিয়েছ আর হয়ত ভুলের জের টেনে চলবে না। কিন্তু তবু ত এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল করেছিলে, সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ইন্দিরা আর কতদিন আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবে? আজও কি তোমার দ্বিধা আছে?

ইন্দিরা। [ষ্টোভ নিবাইয়া দিয়া] বাস্‌ রে, এই সব নভেলী ছাঁদে যখন কথা বলেন তখন দস্তুরমত ভয় করে। [পেয়ালায় হর্লিক্স তৈয়ারী করিয়া] ব্রজ!

ব্রজ। [জ্ঞানদাবাবুর পুরনো চাকর ব্রজ ঘরে ঢুকিল] কি দিদিমণি?

ইন্দিরা। [পেয়ালাটা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া

দিয়া] বাবাকে খাইয়ে আয়। আর রাত হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে হিমে থাকতে বারণ ক'রে দে।

নির্ম্মল। আমি যে কথাটা বললুম তুমি কি তার উত্তর কোনদিনই দেবে না ইন্দিরা?

ইন্দিরা। উত্তর না দিলেও আপনি কি মনে মনে কোন উত্তর পান নি? কিন্তু দাদার জন্যে মা-বাবার মন এত বিচলিত রয়েছে যে আমি উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার সম্বন্ধে কোন ভাবনা তাঁদের ভাবতে দিতে চাই নে।

নির্ম্মল। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আজ তোমার সেই গানটা একবার ক'রো ইন্দিরা। যখনই কোন কারণে মন চঞ্চল হয়েছে তোমার কাছে শোনা গানের সুর মনে পড়েছে।

[পাশের ঘর হইতে মোহিনী ডাকিলেন, ইন্দু। ইন্দু।]

ইন্দিরা। মা কেন ডাকছেন শুনে আসি।

নির্ম্মল। চল, আমিও দেখে আসি মা কেমন আছেন।

[দু-জনে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল]

[পাশের ঘরে ছোট একটি খাটে মোহিনী শুইয়া আছেন।]

মোহিনী। ইন্দু, তোমার বাবাকে আর হিম লাগাতে বারণ ক'রে পাঠিয়েছ?

ইন্দিরা। হ্যাঁ, মা।

মোহিনী। আর তাঁর রাত্রির খাবার!

ইন্দিরা। তাও ব্রজ দিয়ে এসেছে।

মোহিনী। [নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া] বাঃ, তোমাকে এই কোর্ত্তাটায় বেশ মানিয়েছে দেখছি নির্ম্মল।

নির্ম্মল। [একটু লজ্জিত ভাবে] আজ টেনিস-সুট প'রে এলাম অথচ খেলাই হ'ল না। মা, আজ কেমন আছেন?

মোহিনী। ভালই আছি। কিন্তু ইন্দুর বাহাদুরি আছে স্বীকার করতে হবে, তোমার মত বইয়ের পোকা রিসার্চ্চ-স্কলারকেও ঘরের কোণ থেকে টেনে বার করেছে। বিকেলে খেল আর নাই খেল একটু ক'রে বেড়িও বাবা, নইলে শরীর থাকবে কেন?

ইন্দিরা [একটু ইতস্তত করিয়া] আচ্ছা মা, আমি যদি এখন একটা গান করি তোমার কষ্ট হবে না ত?

মোহিনী। [কৌতুকের সুরে] আমার ভালই লাগবে। কিন্তু নির্ম্মলের কষ্ট হবে না ত?

নির্ম্মল। [লজ্জা পাইয়া] কি যে বলেন!

[ইন্দিরা টেবিল-ল্যাম্পটায় একটা বই আড়াল করিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গানখানি গাহিল।]

"এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয় বাঁশী আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে।
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে বাঁশীতে তান দাও হে ভরে
যে তান দিয়ে অবাক ক'রো গ্রহশশীরে।
যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে এবার এ জীবনে,
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনব বাঁশী অকূল-তিমিরে।"

পঞ্চম দৃশ্য

[জ্ঞানদাবাবুর বাড়ীর চায়ের টেবিলে সকালবেলাকার চা খাওয়া চলিতেছে। বাইরের লোকদের মধ্যে শান্তা ও নির্ম্মল আছে। শান্তা আজ সকালেই পড়াইতে আসিয়াছে। আজ ইন্দিরার জন্মদিনের উৎসব বলিয়া সন্ধ্যাবেলায় সুবিধা হইবে না।]

ইন্দিরা। শান্তাদিকে আর একটু কেক দি?

শান্তা। না, না, সকালবেলায় এত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

ইন্দিরা। আপনাকে আর কিছু দেব? [নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া] কিছুই নেবেন না?

নরেন। আমাকে কিন্তু খাওয়ার জন্যে অতিরিক্ত সাধ্যসাধনা করবার দরকারই হয় না। আমাকে ঐ ডিমের প্লেটটা সরিয়ে দাও ইন্দু আর দুটো টোষ্ট্। অমনি আর এক পেয়ালা চাও দিতে পার এবং কেকের গোটাকতক টুকরো। [ছুরি দিয়া কেক কাটিতে কাটিতে] কিন্তু সবাই যদি আমার মত হ'ত, যদি পুরুষদের খাওয়াবার জন্যে অনুরোধের প্রয়োজন না হ'ত তাহলে মেয়েদের সময় কাটত কি ক'রে নির্ম্মল-দা?

নির্ম্মল। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার উচ্চ ধারণার প্রশংসা করতে পারি নে নরেন। কেন, খাওয়ান ছাড়া তাদের আর অন্য কাজ নেই নাকি?

নরেন। কি আর কাজ আছে শুনি? কেবল খাওয়ার কাছে পাখা-হাতে ব'সে এটা খাও, ওটা খাও নয়ত আমার মাথা খাও, এই করা ছাড়া।

নির্ম্মল। বাঃ, তাই কি? এই ত ইন্দু আর তার মত কত মেয়েই আজকাল কলেজে পড়ছে, ফার্ষ্ট হচ্ছে···

নরেন। হ'লেই বা কিন্তু সেও ত শেষ অবধি এটা খাও, ওটা খাও, ঐ মেঠাইটা ফেলে উঠ্‌লে আমার মাথা খাবে—এই মহলা দেবার জন্যেই।

ইন্দু। [সরোষে] মা দেখছ!

[বেয়ারা প্লেটে করিয়া ভিজিটিং কার্ড লইয়া ঘরে ঢুকিল]

বেয়ারা। এক জন দেখা করতে চান।

জ্ঞানদা। [কার্ড পড়িয়া] আরে এ যে আমাদের নন্দী। তাঁকে এইখানেই নিয়ে আয়।

[মিঃ নন্দী ঘরে ঢুকিলেন।]

জ্ঞানদা। আরে এস! কাল খুব চমৎকার বললে ত শুনলাম।

ইন্দিরা। কাল কি বলেছিলেন?

নন্দী। [সবিনয়ে] এমন কিছু নয়। কাল মেয়েদের শিক্ষা ও জাগরণ নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ডিবেটিঙের মত হয়েছিল। আমার মনের মত প্রসঙ্গ কি না। প্রাণ দিয়ে বলতে পেরেছিলুম।

জ্ঞানদা। ওঁকে চা দাও ইন্দু।

নন্দী। শুধু এক পেয়ালা চা দেবেন দয়া ক'রে। আর কিছু না। বাড়ী থেকে চা খেয়েই বেরিয়েছি।

শান্তা। তবে আর ওঁকে অনর্থক উপরোধ ক'রো না ইন্দু। মানুষের অপ্রবৃত্তির উপরে জোর করা অন্যায়। কি বলেন?

নন্দী। আপনি অবশ্য ঠিকই বলেছেন কিন্তু সময়-বিশেষে স্থল-বিশেষে অন্যায়ের উপরেও মানুষের তৃষ্ণা হয়। হয়ত যখন অন্যায়টাকেও ন্যায় ব'লে মনে হ'তে পারে।

নরেন। আমার বোধ হচ্ছে আজ যদি আপনাকে অন্যায় ভাবে জিদ করা হয় আপনি তাতে খুশীই হবেন।

নন্দী। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে সব সময় এটা হয় না, ইট্‌ ডিপেণ্ড্‌স···

[ইন্দিরা নিঃশব্দে চা কেক ইত্যাদি নন্দীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।]

জ্ঞানদা। আজ ইন্দুর জন্মতিথি, সন্ধ্যার দিকে দু-চার জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছি, তুমিও নিশ্চয় এস নন্দী।

নন্দী। নিশ্চয়! আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন, আমার ভাগ্য!

শান্তা। [উঠিয়া] আমরা তা'হলে যাই। ইন্দুকে পড়াতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

[শান্তা ও ইন্দিরা নমস্কার বিনিময়ের পর প্রস্থান করিল।]

[নির্ম্মল উঠিয়া পড়িল, নরেনও উঠিয়া পড়িল। এবং মিঃ নন্দীও কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া আড়ম্বরের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘরের ভিতর কেবল জ্ঞানদা বাবু ও তাঁহার স্ত্রী রহিলেন।]

জ্ঞানদা। [স্ত্রীর দিকে চাহিয়া] ইন্দুর জন্মদিনে এক-জোড়া ব্রেসলেট্ দেবে বলেছিলে, পছন্দ ক'রে নিয়ে এস। গাড়ীটা আনতে বলে দিই।

মোহিনী। না, এবারে থাক। বড় খরচ যাচ্ছে। রমেনকে এখনও এ মাসের টাকা পাঠানো হয় নি। মাইনে পেতে এখনও তোমার দেরি আছে।

জ্ঞানদা। রমেনকে আর আমি টাকা পাঠাব না। এখন যেরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে সে যে-কোন রকম ক'রে ফিরে আসুক, এ ছাড়া আর আমার কিছু চাইবার নেই।

মোহিনী। কেন কি হয়েছে? বেনামী চিঠিতে যা লেখে তার সব সত্য হয় না, হয়ত তার কোন শত্রু···

জ্ঞানদা। আর মনকে চোখ ঠেরে কোন রকমে চাপা দিয়ে রাখা চলে না মোহিনী। তোমাকে একটা খবর এখনও দিই নি। জানই ত কেবল মাত্র টাকার জন্য লেখা ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে আর তার চিঠিপত্রের সম্পর্ক নেই। দিন-কয়েক আগে একখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির, পীড়িত, হাসপাতালে আছি, নব্বই পাউণ্ড পাঠাও। একটু সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু এমন তার পেয়ে কোন্ বাপ টাকা না পাঠিয়ে থাকতে পারে? হাতে টাকা ছিল না, ধার ক'রে পাঠালুম। তার পরে আমাদের প্রফেসর নীরদবাবু—যিনি বিলেতে আছেন—তাঁর চিঠিতে জানলুম ব্যাপার তা নয়, অন্য কাণ্ড। সে সমস্ত কথা আমি তোমাকে বলতে পারব না। আমার হাতবাক্সে চিঠি আছে পরে দেখো। তাছাড়া রমেনের অসঙ্গত খেয়াল মেটাতে গিয়ে আমার যা সামান্য সঞ্চয় ছিল তাও গেছে, শুনলে অবাক হবে হাজার-দশেক টাকা দেনা

হয়ে গেছে। লাইফ ইনসিওরের পলিসি অবধি বাঁধা দিতে হয়েছে। আর আমাকে কি করতে বল ?

মোহিনী। [অধোমুখে] এ সব কথা তোমার আরও আগেই আমাকে জানান উচিত ছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ একা বিদেশে আছে, হঠাৎ টাকা বন্ধ করলে তার কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখ দিকি।

জ্ঞানদা। [হতাশভাবে] তা বুঝতে পারি, কিন্তু আমিই বা কি করব আর ভেবে উঠতে পারি নে। কতবার বুঝিয়ে চিঠি লিখেছি উত্তর অবধি দেয় না। তা ছাড়া আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, তাদের উপরেও একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। আজ যদি চোখ বুজি কাল তোমাদের হয়ত পথে দাঁড়াতে হবে। শুনতে ঐ সাড়ে আট-শ টাকা মাইনে কিন্তু ঠাট্ বজায় রাখতে কতখানি লাগে সেও ত তোমার অজানা নেই। রমেনের উপর অনেক আশা ছিল কিন্তু···এখন দেখছি তাকে বিলেতে না পাঠালেই ভাল হ'ত।

মোহিনী। সংসার করতে গেলেই অমন ধার-কর্জ্জ হয়, তাতে তুমি মুষড়ে পড়ছ কেন ? আমি এবারে সব জানতে পারলুম, এখন থেকে বাজে খরচ একেবারেই কমিয়ে দেব। এখন ইন্দিরার জন্মদিনে বেশী হৈচৈ কিংবা গয়না কেনা বন্ধ থাক।··

জ্ঞানদা। বন্ধ থাকবে কেন ? এই হয়ত আমাদের বাড়ীর শেষ উৎসব, কে জানে হয়ত আর কোনদিন ইন্দুকে কিছু কিনে দিতে পারব কি না। ওর জন্যে এক জোড়া ব্রেসলেট আমি নিজেই দেখে পছন্দ ক'রে কিনে আনব। আর একবার ধুমধাম হোক, আর একবার শেষ বারের মত সব আলোগুলো জ্বলে উঠুক। তার পরে সবসুদ্ধ যদি অন্ধকারে তলিয়ে যায়, যাক না, ক্ষতি কি ?

মোহিনী। কি যা-তা পাগলের মত বকছ ? ওসব অলক্ষণের কথা মুখে আনতে নেই। মানুষের দুঃসময় কি আসে না, কিন্তু অন্ধকার একদিন কেটে যায়ই।

জ্ঞানদা। এ অন্ধকার আর কাটবে না মোহিনী, কে যেন ভিতর থেকে এ কথা ব'লে দিচ্ছে। আমার ব্লড্-প্রেশারের উপসর্গটা এত বেড়ে গেছে, কাল কলেজে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ এত মাথা ঘুরে উঠল যে এক জন ছাত্রকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে বাড়ী চলে এলুম।

মোহিনী। ডাক্তার বাবুকে একবার ডেকে পাঠাব ? তুমি নিজেকে অত উতলা ক'রো না। মা মঙ্গলচণ্ডী নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। রমেনের সুমতিও তিনি দেবেন। সে কি আর সত্যি ওদেশের মেয়ে বিয়ে ক'রে মা বাপ ভাই বোন কর্ত্তব্য সব ভুলে ওখানেই বাস করতে পারবে।

জ্ঞানদা। [একটুখানি হাসিয়া] কিন্তু এক জন বিলেত-ফেরতের বাড়ীর খানা-টেবিলে ব'সে তুমি খামোকা মঙ্গলচণ্ডীকে টেনে আনলে কেন ? মেয়েদের পড়াশোনাই বল আর বিচার-বিতর্কই বল সবই মিছে।

মোহিনী। দেখ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা ক'রো না বলছি। আমিই না-হয় সেকেলে মেয়েমানুষ, কেবল পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হ'ল সাথে, কিন্তু ঐ যে তোমার সায়েন্স-পড়া আধুনিকা মেয়ে, তাঁকে যতই একালের শিক্ষায় দীক্ষিত কর, স্বামী-পুত্রের কোন বিপদের ছায়া দেখলে দেখবে তিনিও আগাগোড়া সব ভুলে গিয়ে ঠাকুর-দেবতার দোরে ধন্না দেবেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইন্দিরার জন্মতিথি-উপলক্ষে জ্ঞানদা বাবুর বাড়ীর প্রকাণ্ড হল উৎসবের বেশে সজ্জিত। নিমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে আসিয়া পৌছিতেছেন। ইন্দিরা দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছে। মিঃ নন্দী ঢুকিলেন. হাতে একটা মখমলের বাক্স এবং প্রকাণ্ড এক ফুলের তোড়া তাহাতে সাদা কাগজের স্লিপ লেখা।]

নন্দী। [বাক্সটা ইন্দিরার হাতে দিতে গিয়া] জানি এ আপনার যোগ্য নয় তবু···

ইন্দিরা। [পিছাইয়া আসিয়া] ঐ যে টেবিলের কাছে শান্তাদি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সকলেরই উপহার ঐখানে রাখা হচ্ছে।

নন্দী। একবার খুলে দেখলে পারতেন কি আছে।

ইন্দিরা। আমার সাহস হয় না, জানি নিশ্চয়ই ভয়ানক দামী একটা কিছু আছে।

[ইন্দিরার মাসতুত-বোন ফুল্লরা ও নির্ম্মল প্রায় একই সঙ্গে ঢুকিল।]

নির্ম্মল। একটা ছোট মখমলের কেস খুলতে খুব বেশী দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় না।

ফুল্লরা। দেখি দেখি মিঃ নন্দী, আপনি ওটা কি এনেছেন? [বাক্স খুলিতেই জড়োয়ার বহুমূল্য নেকলেস বিদ্যুতের আলোতে ঝকঝক করিয়া উঠিল।] বাঃ চমৎকার জিনিষ। আপনার টেষ্ট আছে মিঃ নন্দী।

ইন্দিরা। [নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া] আর আপনি আজ আমার জন্যে কিছু আনলেন না?

নির্ম্মল। আমি কি আনব কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না। তাই ত এত দেরি হয়ে গেল আসতে। শেষে শুধুহাতেই এসেছি।

ইন্দিরা। [তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল] বেশ করেছেন। আসুন ভিতরে। এস ফুল্লরাদি, মিঃ নন্দী আসুন, বসবেন আসুন।

[নির্ম্মল কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়া কোন এক সময় সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। ইন্দিরার কলেজের এক দল বান্ধবী আসিয়াছে, সে তাহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইল।]

মিঃ নন্দী। আচ্ছা ফুল্লরাদেবী, নির্ম্মল বাবু বুঝি আপনার মেসোমশায়ের বাড়ীতে বহুদিনের পরিচিত?

ফুল্লরা। হ্যাঁ, ওঁর মা নেই, মাসীমাকে মা বলেন। ছোটবেলা থেকেই মাসীমাদের প্রতিবেশী। তাছাড়া ওঁর গুণে সবাই ওঁর ভক্ত।

নন্দী। কিন্তু নির্ম্মলবাবু একটু কেমন যেন, যেন কাউকে দেখতেই পান না, যদি বা দেখেন লক্ষ্যই করেন না।

ফুল্লরা। না না, ঠিক তা নয়। তবে একটু কুনো-স্বভাবের। এম-এ পাস ক'রে এখন কি থীসিস লিখছেন, শুনছি ওঁর ডি-এসসি হওয়ার কথা আছে। পড়াশোনার উপর ঝোঁক বেশী। তেমন আলাপী ন'ন। দু-জনের বেশ মিলেছে ভাল কিন্তু। ইন্দুও যেমন…

নন্দী। মিস গুপ্তের সঙ্গে বুঝি ওঁর…

ফুল্লরা। কেন আপনি কি শোনেন নি ইন্দু এক রকম নির্ম্মল বাবুর সঙ্গে বাগদত্তা। বছর-পাঁচেক আগে যখন নির্ম্মল বাবুর মা মারা যান তখন মৃত্যুশয্যায় এই অনুরোধ করেছিলেন।

নন্দী। ওঃ, তাই নাকি! নির্ম্মল বাবুর চশমাজোড়া দেখলে মনে হয় যেন ওঁর দৃষ্টিশক্তি নেই-ই। প্রায় অন্ধের সমান। কি ক'রে যে টেনিস খেলেন বুঝতে পারি নে।

ফুল্লরা। বড়বেশী পড়াশোনা করেন তাই বোধ হয় দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। শুনেছি ইন্দুর কাছে ওঁর চশমার পাওয়ার ন'য়ের কাছাকাছি।

নন্দী। সর্ব্বনাশ! এমন চোখ খারাপ হ'লে সরকারী চাকরি পাওয়া মুস্কিল।

ফুল্লরা। চাকরি করবার ওঁর দরকারও নেই। বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যতই খরচ করুন একপুরুষে ফুরবে না। তা ছাড়া একমাত্র বই-কেনা ছাড়া আর কিছু বাজে খরচ কখনও করতেও দেখলুম না।

শান্তা। [ফুল্লরার নিকট আসিয়া] ফুলু, একটা গান-টান কর না। আমি একবার ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের দিকে যাই। শুনছি আজ ইন্দুর মায়ের শরীর ভাল নেই। তিনি ভাল ক'রে কোন ভার নিতে পারছেন না। আজ সবই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ততক্ষণ একটা গান কর তুমি, তবু সবারই ভাল লাগবে। কই ইন্দু কোথা গেল, তাকেও ত দেখছিনে!

[শান্তা ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল]

মিঃ নন্দী। আপনার মুখে সেই যে গজল শুনেছিলুম এখনও কানে লেগে রয়েছে।

ফুল্লরা। [বিনীত ভঙ্গীতে] এমন আর কি, আপনি বাড়িয়ে বলছেন। তবে আজ কেমন হবে বলতে পারছি নে, মানে ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একটু ধরে রয়েছে। [হাতের ব্যাগ খুলিয়া একটা পেপস্ বড়ি টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল]

নন্দী। যা হবে তাতেই আমরা মুগ্ধ হব। আপনার ভাঙা গলার গানই যথার্থ বুঝতে পারে এমন শ্রোতা এখানে ক'টা আছে বলতে পারেন?

ফুল্লরা। না না, কি যে বলেন আপনি। [অর্গ্যানের নিকট গিয়া ফুল্লরা একটা আধুনিকতম গজল সুরু করিল।]

নন্দী। ডিভাইন!

[ফুল্লরাকে ঘিরিয়া কয়েক জন সঙ্গীতরসপিপাসু আসিয়া জড় হইল এবং বোধ করি বা সঙ্গীতরস পান করিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাগানের ভিতর একটি বেঞ্চিতে নির্ম্মল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঈষৎ চন্দ্রালোকে স্থানটি উদ্ভাসিত। আলো এবং ছায়ায় জড়াজড়ি। ইন্দিরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইল।]

ইন্দিরা। বাঃ রে, একলাটি পালিয়ে এসে ব'সে আছেন! আমি কত খুঁজলুম। সামাজিক দায়িত্ব ব'লে একটা জিনিষ আছে সেটাকে ভাল লাগা বা না-লাগার খাতিরে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না এটা মানেন ত? হয়ত অনেকে আপনাকে খুঁজছে। না দেখতে পেলে আশ্চর্য্য হবে।

নির্ম্মল। আমাকে কেউ খুঁজবে না, নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তোমাকে যে অনেকে খুঁজছে এ-কথা হলফ ক'রে বলতে পারি। কিন্তু তুমি যে তোমার বিরাট সামাজিক দায়িত্ব ফেলে আমার খোঁজে আসবে তা আমি জানতুম না।

ইন্দিরা। সত্যি জানতেন না?

নির্ম্মল। সত্যিই জানতুম না ইন্দিরা। তোমার অনেক মান্য অতিথিকে ফেলে তুমি যে এখানে আসবে একথা কেমন ক'রে জানব বলো?

ইন্দিরা। আপনি আমাকে যতই বিঁধবার চেষ্টা করুন, পুরুষমানুষের বেশী ভাবপ্রবণ হওয়া যে একেবারেই ভাল নয় একথা আমি বলবো। এ যেন গ্রামোফোনের নাকী সুরে কাঁদা কীর্ত্তনের মত···।

নির্ম্মল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলুম না এ বিশেষণটির লক্ষ্য কে, আমি না নন্দী সাহেব?

ইন্দিরা। [মর্ম্মাহত সুরে] আপনি যে আজ যা মুখে আসছে তাই বলছেন···।

নির্ম্মল। থাক ওসব কথা ইন্দিরা, চল যাওয়া যাক। তোমার অনেক অতিথি দস্তুরমত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

ইন্দিরা। [বেঞ্চির উপর বসিয়া] আপনার মুখের ঐ ভাষা যতক্ষণ না বদলাচ্ছেন আমি কিছুতেই কোথাও যাচ্ছি নে। এই বসলুম।

নির্ম্মল। [হাসিয়া] কি ছেলেমানুষী করছ! চল চল।

[ব্রজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিল।]

ব্রজ। শীগগির আসুন দিদিমণি। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

ইন্দিরা। [ব্যাকুল ভাবে] কি হয়েছে?

ব্রজ। বাবু এই খানিক আগে প্রায় সন্ধ্যে ক'রে একটা গাড়ীতে কলেজ থেকে না কোথা থেকে এলেন। মা সরবতের গেলাস হাতে দিয়ে পাখা করছিলেন, হঠাৎ কি হ'ল উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। কি সর্ব্বনাশ কাণ্ড! কি হবে নির্ম্মল বাবু?

[ইন্দিরা ও নির্ম্মল দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। ব্রজ ভীত পদক্ষেপে তাহাদের পিছনে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[শয়নকক্ষে খাটের উপর জ্ঞানদাবাবু শুইয়া আছেন; মাথায় জলপটি দিয়া মোহিনী পাখা করিতেছেন। ইন্দিরা ও নির্ম্মল প্রবেশ করিল।]

ইন্দিরা। [অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে] মা মা, বাবার কি হয়েছে?

নির্ম্মল। চুপ কর। দেখছ না উনি ঘুমিয়েছেন। [নিম্নস্বরে] মা, একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দেব।

মোহিনী। এখন থাক। ওঁর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল, এখন সামলে উঠেছেন।

[টেবিলের উপর রক্ষিত একটা ভেলভেটের বাক্স লইয়া ইন্দিরার হাতে দিয়া]

এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার। কলেজের কাজ হয়ে গেলে ঐ পথেই কিনতে গেছলেন।

[ইন্দিরা বাক্সটা হাতে লইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।]

মোহিনী। কাঁদছ কেন ইন্দু, ওতে তোমার বাবার মনে কষ্ট হবে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উনি ছেলেমেয়েকে একান্ত সাবধানে আগলে আগলে যেন পাহাড়ের আড়ালে রেখেছেন। কখনও এতটুকু দুঃখ বা অভাবের আঁচ গায়ে লাগতে দেন নি। এত দুশ্চিন্তার মাঝেও তোমার জন্মদিনের উপহারের কথা ভোলেন নি। কিন্তু আর ত এমন ক'রে চলবে না। যাদের জন্য এমন সর্ব্বস্ব পণ করলেন সবচেয়ে বড় আঘাত কি এল তাদেরই কাছ থেকে! [একটা হলদে রঙের খাম অঞ্চলপ্রান্ত হইতে গিঁট খুলিয়া বাহির করিয়া নির্ম্মলের হাতে দিয়া] এইটে প'ড়ে দেখ, তাহলেই সব জানতে পারবে। কলেজের ঠিকানায় ওঁর কাছে আজ বেলা বারটার সময় এসেছিল। তখন

থেকে ওঁর কাছেই ছিল। পকেট থেকে বার ক'রে দেখলুম।

[নির্ম্মল আলোর নিকট গিয়া খামখানা খুলিয়া কাগজের টুকরাটুকু পাঠ করিল। তাহার পর আবার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল।]

ইন্দিরা। [ব্যাকুল স্বরে] কি ওটা ?

নির্ম্মল। পাশের ঘরে এস বলছি। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, এখানে আর একটা কথাও নয়। বিশ্রামের অবসর দাও ওঁকে।

[দু-জনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অন্য একটা ঘরে আসিল।]

ইন্দিরা। কি হয়েছে আমাকে বলুন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

নির্ম্মল। [একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া] ঐ হলদে খামখানা একখানা টেলিগ্রাম। তোমার দাদা বিলেত থেকে জানিয়েছেন যে তিনি আর মা-বাপের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না, কারণ অপেক্ষার সময় ছিল না। অপেক্ষা না করেই তিনি ডোরা স্মিথকে কাল বিবাহ করেছেন।

[ইন্দিরা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।]

নির্ম্মল। [ঈষৎ একটুখানি ব্যঙ্গের স্বরে] এতেই এত আঘাত পাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি নে। তোমরা প্রগতিবাদী ; আধুনিক সভ্যতার পূজারী। বিশ্বমানবতার দোহাই যখন কথায় কথায় দাও তখন এটা ধরে নিতে হবে যে বিশ্বমানবের বা বিশ্বমানবীর সঙ্গে প্রেম করাটাও নিশ্চয়ই দস্তুরমত এড্‌মায়ার কর।

ইন্দিরা। [ভগ্নকণ্ঠে] এ সময়ে যে আপনি ব্যঙ্গ ক'রে কথা কইবেন তা জানতুম না।

পাশের ঘর হইতে ফুল্লরার চাঁচ-ছোল সুমার্জিত কণ্ঠের গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল,

'মলয় আসিয়া কয়ে গেল কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে,
মোর মরম বাথা তুমি আসি সযতনে নাশিবে, এইবার তুমি আসিবে।...'

নির্ম্মল। ব্যঙ্গ নয় ইন্দিরা। এই খানিকক্ষণ আগে যখন একলা অন্ধকারে চুপ ক'রে বাগানের বেঞ্চির উপর বসেছিলুম তখন মনে হচ্ছিল মুখে আমরা কত বড় বড় বুলি আওড়াই কিন্তু আধুনিকতার সবচেয়ে নির্লজ্জ ন্যাকামি হচ্ছে এই প্রেম। প্রেম নিয়ে এত অসারতা, এত মিথ্যা, এত অসুন্দরতার সৃষ্টি আগে কখনও হয় নি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর এত বড় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে যে একে অসার ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। আজ রাত্রির ঘটনাগুলোই তুমি মনে মনে একবার স্মরণ ক'রে দেখ দিকি। অস্ফুট চাঁদের আলোয় আমি ঈর্ষাবশে পালিয়ে বাগানে বসেছিলুম এবং তুমি নানা সুতীক্ষ্ণ স্বরে সেই ঈর্ষা বিদ্ধ করতে গিয়েছিলে। এদিকে পৃথিবীর একটা করুণতম অন্যায় নিঃশব্দে ঘটে গেল। তোমার দাদা বিশ্বমানবতার দোহাই দিয়ে তোমার বাবার মত অমন লোককেও এত বড় আঘাত দিলেন। আর ঐ নন্দী সাহেব মিস্ ইন্দিরার মোহ কাটবামাত্রই আর এক তরুণীর কানে বচনবিন্যাস সুরু করলেন।

ইন্দিরা। অমন ক'রে বলবেন না। যা বলতে চাইছেন তা আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু এই বুঝাকে আমি ভয় করি। এতে জীবনের সব মাধুর্য্য সব মোহ যে শূন্য হয়ে উড়ে যায়। বাবার কাছে যাই। তার আগে একবার শান্তাদিকে ব'লে আসি যত শীগ্‌গির সম্ভব এই সব অতিথিদের বিদায়ের বন্দোবস্ত করুন।

নির্ম্মল। আমি একবার ডাক্তারের বাড়ী চললুম। তাঁর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। না হয় অসুস্থতার আসল কারণটা ডাক্তারের কাছে না ভাঙলেই চলবে।

[দু-জনের দুই দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জ্ঞানদাবাবুর শয়নকক্ষ। খাটে তিনি শুইয়া আছেন, মাথার কাছে ছোট টেবিলে মেজার-গ্লাস, ঔষধের গোটা দুই-তিন শিশি। একটা রেকাবিতে আধখানা ছাড়ানো বেদানা। পারিবারিক ডাক্তার ব্লড-প্রেশার নির্ণয় করিবার যন্ত্র লইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে। শিয়রের কাছে ইন্দিরা এবং তাঁহার ছোট ছেলে নরেন।

ডাক্তার। [পরীক্ষা শেষ করিয়া] কই একটু কাগজ দেখি প্রেসক্রিপশন লিখে দিই।

ইন্দিরা। [ফাউন্টেন পেন ও কাগজ আনিয়া দিল] ডাক্তারবাবু কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার। [কোন উত্তর না দিয়া প্রেসক্রিপশন লিখিতে লাগিলেন, লেখা শেষ হইলে নরেনের দিকে চাহিয়া] এইটে চার ঘণ্টা অন্তর চলবে। মাথায় বরফ দেবে, আর পথ্যের ব্যবস্থা যেমন চলছে তেমনই চলুক। এক জন কাউকে আমার সঙ্গে দাও, ওষুধ তৈরি করিয়ে এই মোটরেই পাঠিয়ে দিই।

নির্ম্মল। [ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়া নিঃশব্দে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।] চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

[নির্ম্মল ও ডাক্তার নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

নির্ম্মল। [নীচের গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া] আচ্ছা ডাক্তারবাবু, তেমন ভয়ের কিছু নেই ত ? আমার কিন্তু কেমন কেমন ঠেকছে, ওঁর জ্ঞান যেন স্বাভাবিক নেই। চোখের চাউনি কেমন ধূসো ঘোলাটে। তাছাড়া সর্ব্বদাই

ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্নের মত হয়ে রয়েছেন, জ্ঞান হচ্ছে না।

ডাক্তার [একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া] আচ্ছা, এঁর বড় ছেলে রমেনকে আসবার জন্যে একটা 'তার' ক'রে দিলে হয় না?

নির্ম্মল [চমকিয়া উঠিয়া] কেন বলুন দেখি, তবে কি...

ডাক্তার। দেখুন যতক্ষণ আশা থাকে ডাক্তারেরা বাড়িয়ে ভরসা দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি এঁদের অনেক দিনের পুরনো পারিবারিক ডাক্তার, জ্ঞানদাবাবুর স্বাস্থ্যের কথা বিলক্ষণ জানি। এঁর ব্লড্-প্রেশার বড্ড বেশী। সেদিন যে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন, সেদিনই ওঁর ব্লড্ ভেস্‌ল ছিঁড়ে গেছে। অনেক সময় ব্লড্ ভেস্‌ল ছিঁড়ে যাবার পরেও সাত দিন পর্য্যন্ত রোগীকে টিকে থাকতে দেখা গেছে... কিন্তু...

নির্ম্মল। আপনি কি বলছেন, তবে কি, না না ডাক্তারবাবু আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। এ কেমন ক'রে হবে, এ কি হ'তে পারে...

ডাক্তার। ভুল নিশ্চয়ই হ'তে পারে আর সেই জন্যই আমি ডাক্তার সরকারের কাছে যাবার পথে একবার নামব এবং তাঁকে কন্‌সাল্ট করবার জন্য ডেকে আসব। আমরা দু-জনে একসঙ্গে বেলা দশটা এগারটা আন্দাজ আবার আসব। আপনার কথা যেন বাস্তবিকই সত্য হয় নির্ম্মলবাবু, আমার যেন ভুলই হয়। কিন্তু আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে...

নির্ম্মল। [অভিভূতের মত] কিন্তু ওঁরা যে এখনও পরম নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, ওরা ত স্বপ্নেও ভাবতে পারছেন না যে মাথার উপর তাঁদের কি সর্ব্বনাশ উদ্যত হয়ে আছে।

ডাক্তার। জ্ঞানদাবাবুর স্ত্রীর কথা বলছেন? ওঁর মত সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীলা আমি খুব কমই দেখেছি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক, চলুন নির্ম্মলবাবু চট্ ক'রে ওষুধটা তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিই।

[অভিভূত নির্ম্মলকে একটা ঠেলা দিয়া ডাক্তার তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটরে উঠিলেন।]

পঞ্চম দৃশ্য

[ইন্দিরা মেঝেতে বসিয়া বেদানার রস প্রস্তুত করিতেছিল। নির্ম্মল একটা ঔষধের শিশি হাতে লইয়া ঢুকিল। তাহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, গতি শ্লথ।]

ইন্দিরা। [তাহার দিকে চাহিয়া] আপনার কি হয়েছে বলুন ত? মুখ চোখ এত শুক্‌নো!

নির্ম্মল। তোমার বাবা এখন কেমন ইন্দু?

ইন্দিরা। তিনি ত কেবলই ঘুমুচ্ছেন। আজ সকাল থেকে আর ওঠেন নি। অনেকক্ষণ কিছু খান নি, তাই বেদানার রস ক'রে রাখছি, যদি খেতে চান ঘুম ভেঙে উঠে।

নির্ম্মল। মা কোথা?

ইন্দিরা। তাঁর কথা আর জিজ্ঞেস করছেন কেন, দিন রাত্রি মাথায় বরফের টুপি ধরে বসেই আছেন। ডাক্তার আসাতে একবার পাশের ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন এখন আবার বাবার মাথার কাছে ব'সে আছেন। আজ আর স্নান-আহ্নিক করতে একবারও ওঠেন নি।

[হঠাৎ নন্দী সাহেব ও ফুল্লরা ঘরে ঢুকিল। ফুল্লরা রীতিমত সজ্জিত বেশে। নন্দীও সাহেবী পোষাকে।]

ফুল্লরা। ইন্দু, শুনলুম মেসোমশায়ের নাকি অসুখ হয়েছে? আমরা মার্কেটে যাচ্ছিলুম, গাড়ী দাঁড় করিয়ে একবার ভাবলুম খবর নিয়ে আসি। কবে থেকে হ'ল অসুখটা? কি অসুখ? দেখছে কে, আমাদের ডাক্তার মুখার্জ্জি ত। লোকটার ট্রীট্‌মেণ্ট্ বড় ওল্ড ফ্যাশনের। আমি বলি কি, তার চেয়ে কাপ্তেন চ্যাটার্জ্জিকে একবার এনে দেখা। সত্যিকার কোয়ালিফিকেশন্ আছে। নয় মিঃ নন্দী?

মিঃ নন্দী। নিশ্চয়! লণ্ডনের এফ-আর-সি-এস মুখের কথা নয়, পথে ঘাটে আর কিছু মেলে না! হাঁ, আমিও তাই বলি মিস্ গুপ্ত, আপনার দিদির কথামত তাঁকেই বরঞ্চ একবার আনিয়ে দেখান। কিন্তু কবে থেকে অসুখটা হয়েছে তাঁর?

ইন্দিরা। আমার জন্মদিন গেল, সেই শুক্রবার থেকেই তিনি অসুস্থ। আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল।

ফুল্লরা। ওহ্, আই অ্যাম্ সো সরি! কই কোথায় তিনি, চল দেখে আসি।

নির্ম্মল। [একটু কঠিন স্বরে] না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন সে-ঘরে গিয়ে গোলমাল করা সঙ্গত হবে না।

নন্দী। বেশ, তাই ভাল। মিস গুপ্ত আপনার বাবা উঠলে ব'লে দেবেন আমরা তাঁকে দেখতে এসেছিলুম। না-হয় একটা কার্ড রেখে যাই।

ইন্দিরা। কার্ড রেখে যাবার দরকার নেই মিঃ নন্দী, তিনি উঠুন, আমি তাঁকে বলব।

ফুল্লরা। তাই ব'লে দিও ইন্দু। কেন-না, আর ত আমাদের আসবার ফুরসৎ হবে না। কাল মা, আমি, আর নন্দী সাহেব যে বেড়াতে যাচ্ছি কাশ্মীরে। কাল ত সারারাত্রি উত্তেজনায় আমার ঘুম হয় নি। কাশ্মীরে যাব! সেই ডাল-হ্রদে নৌকো ক'রে বেড়াচ্ছি চাঁদের আলোয়, সেই

ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ী পথে উঠ্‌ছি, থ্রীল, অ্যাড্‌ভেঞ্চার! উঃ আপনার মাথা থেকে কি সব প্ল্যান বার হয় মিঃ নন্দী। আপনিই ত কাশ্মীর যাওয়ার কথা সজেষ্ট্‌ করলেন প্রথমে। আচ্ছা···গুড্‌মর্ণিং নির্ম্মল বাবু।···আসি ইন্দিরা। মেসোমশায় কেমন থাকেন খবর দিস। নমস্কার মিস গুপ্ত।

[নন্দী ও ফুল্লরা যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল তেমনিই আচম্বিতে বাহির হইয়া গেল।]

নির্ম্মল। আমি শুধু এক-এক সময় বড় ব্যথার সঙ্গে ভাবি, ইন্দু তুমি যদি তোমার ঐ ফুল্লরাদিদের মত হতে, হয়ত সংসারের কত দুঃখকষ্টের হাত থেকেই না তাহলে রেহাই পেতে। কিন্তু আমার ভাবনাও যে সেই জন্যেই। তুমি ত ওদের মত নও। আমি কি পারব তোমাকে সব আঘাতের হাত থেকে বাঁচাতে?

ইন্দিরা। তবেই ত দেখছি আপনার আমার উপর খুব শ্রদ্ধা! আমাকে সব আঘাত থেকে বাঁচনই কি আপনার একমাত্র কাজ? আঘাত যদি না পাই তবে মানুষ হয়েছি কেন? কিন্তু ফুল্লরাদিকেই বলুন আর যাকেই বলুন, আমার মাকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি মেয়েদের যথার্থ স্বাধীনতা কাকে বলে। আমার মা কখনও সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও করেন নি কিংবা কলেজেও পড়েন নি, কিন্তু জীবনের দায়িত্ব ষোল আনাই ঘাড় পেতে নিয়েছেন। আমি জানি যে-কোন আঘাতই আসুক তাঁকে দুর্ব্বল ব'লে টলাতে পারবে না।

কক্ষান্তর হইতে মোহিনী ডাকিলেন, ইন্দু, ইন্দু। নির্ম্মল। তাহার তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যেখানে জ্ঞানদাবাবু শুইয়া আছেন সেখানে গেল। মোহিনী স্থির নিষ্পলক নেত্রে স্বামীর প্রতি চাহিয়া আছেন।]

ইন্দু। মা বাবা কি উঠেছেন? বেদানার রস আনব?

মোহিনী। [ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে] বেদানার রস আনতে হবে না ইন্দু, তোমরা কাছে এসে ব'স। নরেনকেও ডাক। তোমার বাবার অবস্থা ভাল নয়।

ইন্দু। মা!

ক্রন্দনের বেগে তাহার সমস্ত শরীর দুলিয়া উঠিল।]

মোহিনী। ওঁর জ্ঞান নেই, আর জ্ঞান হবেও না। তোমাদের যে শেষ কথা কিছু ব'লে যাবেন সে অবসর হ'ল না। তোমরা মনে মনে প্রার্থনা কর তোমাদের ভালমন্দ সব ভাবনাই ফেলে রেখে যেন উনি শান্তিতে যেতে পারেন। এখন কেঁদ না ইন্দু।

[নরেন নিঃশব্দে পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে ডাক্তারের মোটর দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল।]

নির্ম্মল। [পাগলের মত] ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন, ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!

[দু-জন ডাক্তার ঘরে ঢুকিলেন। নিকটে গিয়া পরীক্ষান্তে]

ডাক্তার। আর কি দেখব নির্ম্মল বাবু!

[ইন্দিরা পিতার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। মোহিনী স্বামীর বক্ষের উপর একটা হাত রাখিয়া নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইন্দিরা ঘরে চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। ঘর সেই আগেকার, আসবাবপত্রও সেই, কিন্তু সমস্তই কেমন ছিন্নভিন্ন শ্রীহীন। সে নিজেও যেন শোকের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা।]

নির্ম্মল। [ঘরে ঢুকিয়া] ওবেলায় আসতে পারি নি, এত জোরে বৃষ্টি এল। মা কেমন আছেন?

ইন্দিরা। তাঁর অসীম ধৈর্য্য। এই ক'দিনে তাঁর ওপর দিয়ে যা বয়ে গেল তার তুলনা নেই, তবু আজ দেখছি বাবার বসবার ঘরের দেরাজ-বাক্স ঝেড়ে মুছে রাখছেন।

[নরেন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিল, তাহার হাতে একখানা কাগজ।]

নরেন। [উত্তেজিত স্বরে] জানেন নির্ম্মল-দা, আজ কি আবিষ্কার করলুম, আমরা পথের ভিখিরী, কিছু নেই আমাদের।

নির্ম্মল। আঃ কি বাজে বকছ নরেন, এই ত সবেমাত্র কলেজ থেকে ফিরলে। মুখে হাতে জল দিয়ে কিছু খাও গে।

নরেন। [উচ্চহাস্য করিয়া] ওসব বাবুগিরি আর চলবে না নির্ম্মল-দা, কলেজ যাবার জন্যেও আর তাড়াহুড়ো নেই। এই দেখুন এই নোটিসখানা। বাবা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, উপরন্তু দশ হাজার টাকা দেনা। এমন কি এই বাড়ীখানাও মর্টগেজ রয়েছে। যাদের কাছে আছে তারা বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে।

নির্ম্মল। [তাহার হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া তিরস্কারের সুরে] বেশ, এসব বিষয়ে যা স্থির করবার তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমরা ঠিক করব। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি? যাও, তুমি চা-টা খেয়ে একটু বেড়িয়ে এস। বিকেল-বেলায় ঘরে ব'সে থেকে কি করবে।

নরেন। নির্ম্মল-দা আপনি ভুল বুঝছেন, আর ছেলে-মানুষ ব'লে সরে দাঁড়ালে আমার চলবে না, এখন আমাকেই সংসারের ভার নিতে হবে। দাদার কাছ থেকে কাল চিঠি এসেছে, সে ওখানে চাকরি পেয়েছে। এখন দেশে ফিরবে না। মা তাকে বাবার মৃত্যুসংবাদ দিতে দেন নি। তিনি বলেন আর কোন চিঠিপত্রই তাকে লিখতে হবে না।

নির্ম্মল। [তাহার নিকটে আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া] ভাই নরেন, তোমার দাদা এখন দেশে নাইবা ফিরে এলেন, তোমার আর এক দাদা যে দেশেই আছেন এ কথাটা যেন তুমি ভুলো না। আর সেই জোরেই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি এসব ব্যাপার নিয়ে অনর্থক উদ্বিগ্ন হয়ো না। যাও, একটু বেড়িয়ে এস।

[নরেন চলিয়া গেল]

ইন্দিরা। [এতক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল] মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি, এখনই ঘুম ভেঙে গেলে দেখব সমস্তই দুঃস্বপ্ন, কিছুই সত্যি নয়।

নির্ম্মল। নিশ্চয়ই তাই দেখবে ইন্দু। মানুষের জীবনে দুঃসময় আসে, কিন্তু তা কেটে গেলে স্বপ্নের মতই মনে হয়। কোনদিন যে এমন সময় এসেছিল তা আর মনেও থাকে না।

[মোহিনী ঘরে ঢুকিলেন; তাঁহার পরনে বৈধব্যের বেশ। মুখে ঘনীভূত বৈরাগ্যের ছায়া।]

মোহিনী। বাবা নির্ম্মল, এখন আমাদের আত্মীয়বন্ধু বলতে আর ত বেশী কেউ নেই, তোমাকেই এর একটা বিলি-ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। [হাতের কতকগুলি কাগজপত্র নির্ম্মলকে প্রদান করিয়া] এই তাঁর ঋণের পরিমাণ ও সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র। এ বাড়ীখানাও বাঁধা আছে। আমি বলছি তুমি একটু চেষ্টাচরিত্র ক'রে বাড়ীটা বিক্রী করবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তার থেকেই ধারটা শোধ হয়ে যাক। আমরা ছোটখাট অল্প ভাড়ার একটা বাড়ীতে উঠে যাই।

নির্ম্মল। মা, আপনার এই মনের অবস্থায় যে এসব কথা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, এ আমি সইতে পারি নে। ওসব কাগজপত্র আমাকে দিন, আমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করব।

মোহিনী। মনের আবার কি অবস্থা বাবা, আমার যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর আমি বেশী দেরি করতে চাই নে। যত শীগ্‌গির পারা যায় বাড়ীটা বিক্রী ক'রে দাও। অনর্থক এমনি টাইলে আরও কিছুদিন থাকলে হয়ত শেষে ওঁকে ঋণমুক্ত করবার সুযোগটুকুও হারাব।

নির্ম্মল। আরও অন্য উপায় কিছু আছে কি না আমাকে ভাবতে সময় দিন।

মোহিনী। [ক্ষীণ হাসিয়া] সে ভাবনার ফল কি হবে তাও আমার অজানা নেই বাবা, কিন্তু তোমার কাছেও হাত পেতে আমি কিছু নিতে পারব না। একথা শুনে দুঃখ ক'রো না বাপ আমার, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি একমাত্র ঈশ্বরের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে ঋণী থাকব না।

নির্ম্মল। এ প্রতিজ্ঞা যদি ক'রে থাকেন তাহলে আমি বলব এ প্রতিজ্ঞায় আপনার দম্ভ রয়েছে মা। শুধু টাকার ঋণ ছাড়া আর কোন রকম ঋণ কি কখনও আপনার চোখে পড়ে নি?—যেখানে হৃদয়ের শ্রদ্ধায়, সেবার ব্যাকুলতায় এক জন আর এক জনকে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধছে?

মোহিনী। পড়েছে বইকি নির্ম্মল, আর সেই জোরেই ত তোমার উপর এত জোর। কিন্তু আমি তোমাকে মিনতি করছি তুমি এ বাড়ীটা বিক্রীর একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। এ বাড়ী তিনি নিজে উপার্জ্জনে করেছিলেন, এই দিয়েই তাঁর ঋণ শোধ হোক। আর অন্য কোন ব্যবস্থাতেই তিনি উপর থেকে তৃপ্তি পাবেন না এ আমি বেশ বুঝতে পারছি।

নির্ম্মল। বেশ তাই করব মা। কিন্তু নরেনের ব্যবস্থা কি করবেন?

মোহিনী। পড়া ছেড়ে দিয়ে সে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করুক। এখন থেকে তার উপরেই সব নির্ভর করবে।

নির্ম্মল। এ কথা কেমন ক'রে বলছেন বুঝতে পারছি নে।

মোহিনী। অনেক ভেবেই বলেছি নির্ম্মল। বেশী উচ্চাশা করবার ঝোঁক আর আমার নেই। রমেনকে ওঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিই বেশী আশা ক'রে ওদেশে পাঠিয়েছিলুম। তা ছাড়া আর একটা কথা কি জান বাবা, আমাদের চাল এত বেড়ে গেছে যে যতই উপার্জ্জন কর, শান্তি নেই। ওঁর কথা একবার ভেবে দেখ দিকি, অত টাকা মাইনে পেতেন অথচ···না না, আর আমার অতয় কাজ নেই, নরেন ছোটখাট যা চাকরি পাবে ষ্টাইল কমিয়ে দিয়ে তাতেই সংসার চালিয়ে নিতে হবে। আমি এখন যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল, সন্ধ্যে দেখাতে হবে। তুমি রাত্রিতে অন্ধকারে নীচে যেও না নির্ম্মল। চাকরকে বলবে সিঁড়িতে আলোটা দেখাবে। ওখানকার ইলেকট্রিক আলোটা খারাপ হয়ে গেছে।

[মোহিনী চলিয়া গেলেন]

নির্ম্মল। সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইন্দু। কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি নে। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি তোমাদের এই দুঃসময়ে আমি কোন কাজেই এলুম না। মা আজ স্পষ্টই এক রকম জানিয়ে গেলেন সে কথা।

ইন্দিরা। আপনি অত ভাবছেন কেন, ছোটদা আছে, আমি আছি, সংসার এক রকম ক'রে চলে যাবে।

নির্ম্মল। তুমি! তুমি কি করবে? তুমিও কি চাকরি করবে নাকি?

ইন্দিরা। প্রয়োজন হ'লে করতে হবে বইকি।

নির্ম্মল। অমন কথা ব'লো না ইন্দু। তোমাকে বাস্তব জগতের রূঢ় সংগ্রামের মধ্যে নেমে আসতে কেন দেব আমি? তোমাকে সকল কুশ্রীতা এবং সকল আঘাত থেকে রক্ষা করব বলেই ত আমি আছি।

ইন্দিরা। এই মনোভাব নিয়ে আপনি মেয়েদের স্বাধীনতার কথায় শতমুখ! জীবনের দায়িত্ব যদি না নিলুম তবে স্বাধীনতার মানে কি রইল?—আপনি আমাকে সকল আঘাত থেকে আড়াল করতে না চেয়ে আমাকে আঘাত সয়ে এবং দায়িত্ব নিয়ে যথার্থ মানুষ হবার স্বাধীনতা দিন।

নির্ম্মল। ওসব যুক্তিতর্কের কথা আমিও বুঝি ইন্দু। কিন্তু সমস্ত সভ্যতা প্রগতি এবং নারী-জাগরণ সত্ত্বেও আজও পুরুষের চিত্ত থেকে ঐ প্রার্থনাটি ধ্বনিত হচ্ছে। স্নেহাস্পদাকে বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও নগ্ন সত্যের হাত থেকে আড়ালে রাখবার কামনা আজও তার লেশমাত্র ম্লান হয় নি।

ইন্দিরা। [টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া] আপনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য পথ থেকে এমন ক'রে বিচলিত করবেন না।

নির্ম্মল। [তাহার মাথায় হাত রাখিয়া] ইন্দু!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বেলা আটটা। কলিকাতার রাজপথে কম্পানির বিজ্ঞাপন ল্যাম্প-পোষ্টে প্রাচীরের গাত্রে আঁটা আছে। নরেন পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া লইতেছে।]

নরেন। নম্বর সেভেণ্টিফাইভ বি রসারোড, প্রাইভেট সেক্রেটরী চাই। গ্র্যাজুয়েট হওয়া আবশ্যক, ইংরেজীতে ষ্ট্রং, টাইপরাইটিং জানা প্রয়োজন [টুকিয়া লইয়া] আচ্ছা আমি একটা দরখাস্ত লিখে ফেলি। [আপন মনে] না দরখাস্ত হাজার জায়গায় করেছি কোন ফল হয় নি। এখানে আমি নিজেই একবার গিয়ে দেখি।

[ফুটপাত হইতে নামিয়া পথ চলিতে লাগিল]

[— নম্বরের নির্দ্দেশমত প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। দুয়ারে দরোয়ান। নরেন গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।]

দরোয়ান। [ক্ষণেকের জন্য খইনি-ডলা বন্ধ করিয়া, মুখ তুলিয়া] এ বাবু কেয়া মাংতা?

নরেন। তোমাদের বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

দরোয়ান। বাবু আভী শোতা হায়।

নরেন। যখন ঘুম ভাঙবে তখন দেখা করব। যখন আমারই গরজ বেশী তখন অপেক্ষা করতে রাজী আছি।

[গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল]

[বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া নরেন আর একজন চাপরাশির হাতে পড়িল। সে অযথা বাক্যব্যয় না করিয়া বাঁদিকের ছোট পায়রা-খোপের মত একটি ঘর দেখাইয়া দিল। নরেন ঢুকিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। তথায় আরও জন দশ বারো প্রার্থী বসিয়া আছে। কেহ সিগারেট মুখে দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, কেহ একান্ত উত্তেজিত ভাবে বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার বিষয়ে তুমুল আলোচনা সুরু করিয়াছে। কেহ বা অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত শুধুমাত্র অপেক্ষা করিয়া আছে।]

১ম প্রার্থী। [বারান্দায় একটু মুখ বাড়াইয়া খানসামাকে লক্ষ্য করিয়া] বাবা, একটু মেহেরবাণী ক'রে দেখ বাবু উঠলেন কি না। আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও, আমি তোমাকে পান খেতে নগদ আট আনা দেব।

খানসামা। [গরম জল লইয়া দ্রুতপদে উপরে যাইতে যাইতে] সবুর করুন, বাবু এই উঠলেন। এখন গোসল করছেন।

২য় প্রার্থী। তার পরে?

খানসামা। তারপর চা খাবেন।

২য়। তার পরে?

খানসামা। দাড়ি কামাবেন। এই দেখুন না গরম জল নিয়ে যাচ্ছি।

৩য়। তার পরে?

খানসামা। তার পরে পোষাক পরবেন, টাই আঁটবেন।

৪র্থ। আচ্ছা তার পরে?—তার পরে সময় হবে ত?

খানসামা। তার পরে কাগজে একশ-আট বার দুর্গা-নাম লিখবেন।

নরেন। [হাসিয়া ফেলিয়া] বেশ মজা ত, এদিকে টাই আঁটবেন আবার দুর্গানামও লেখা চাই। ~~কিন্তু যে~~ রকম ফর্দ্দ পেলুম তাতে দেখছি বেলা এগারটার এদিকে তোমাদের বাবুর নীচে নামবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অতক্ষণ অপেক্ষা আমি করতে পারব না। তার চেয়ে চল তোমাদের বাবুর মুখ হাত ধুতে ধুতেই তাঁর সঙ্গে যে দু-চারটে কথা আছে সেরে আসি।

[ঘর হইতে বাহির হইয়া দোতালার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিল।]

খানসামা। কোথায় যাচ্ছেন বাবু?

চাপরাশি। উপর কাহে যাতে হেঁ বাবু! মৎ যাইয়ে।

নরেন। [উঠিতে উঠিতে] বাধ্য হয়েই যেতে হ'ল। তোমরা যা ফর্দ্দ দাখিল করলে সে অনুসারে উনি আজ সকালে আদৌ নামবেন কি না সন্দেহ, এবং আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করা চাই-ই।

১ম প্রার্থী। ছোকরা খুব স্পীরিটেড দেখছি! কিন্তু বৃথা যাওয়া। ঐ ত বয়েস, ম্যাট্রিক পাস করেছে বড়জোর··· শুধু দোতালায় উঠতে পারলেই কি চাকরি হয় মশাই!

২য় প্রার্থী [পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকটির সহিত গল্প করিতে লাগিলেন]...তার পর মশাই গিন্নী ত বাপের বাড়ী থেকে এসেই ফরমায়েস করলেন, তাঁর সেজবৌদির ভাজের সাধের নিমন্ত্রণ পেতে গিয়ে তাঁর বকুল-ফুলের মাসতুত-বোনকে ঠিক যেমন রঙের জর্জেট শাড়ীখানি পরতে দেখেছিলেন ঠিক তেমনই রঙের একখানি কাপড় চাই। কিন্তু মশাই বকুল-ফুলের মাসতুত-বোনের মত রং খুঁজে বার করতে বাজার চষে ফেললুম কিন্তু ঠিক তেমনিটি আর আনতে পারলুম না। গৃহিণীরও মনঃপূত হ'ল না।

১ম প্রার্থী। তার পরে মশায় ?

৩য় ঐ। তার পরে একদিন বকুল-ফুলের বোনকে সেই কাপড়খানি প'রে আসবার জন্যে অনুরোধ ক'রে গিন্নী নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেন। তিনি এলে পর আড়াল থেকে রং দেখলাম ঠিক চাঁদের আলো রঙের সঙ্গে টিয়াপাখীর রঙ আর ফিকে নীলরং এসে মিশলে যেমনধারা হয় তেমনই ধারা···

৪র্থ ঐ। আর বলেন কেন মশাই, মেয়েমানুষের কাপড় কেনা এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, যদি কথা তুললেনই তাহলে আমার একটা ব্যাপার বলি···

[তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, নরেন তাহার ছাতাটা লইতে সে ঘরে প্রবেশ করিল।]

অনেকে একত্রে। কি মশাই, কিছু সুবিধেটুবিধে করতে পারলেন না কি ?

১ম। আচ্ছা বাবুর মেজাজটা কেমন ধারা ?

২য়। আপনার সঙ্গে দেখা করলেন ত ? না দেখাই হ'ল না ?

৩য়। খুব মারমুখো মেজাজ নয়ত ? তাহ'লেই হয়েছে।

৪র্থ। বলি তাঁর টাইফাই পরা ওগুলো সব সাজ হয়েছে ত ?

৫ম। আপনাকে একটু আশাটাশা দিলেন নাকি ?

নরেন। [ছাতাটা হাতে লইয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে] মাইনে বেশী নয়। এখন মোটে পঁচাত্তর টাকা ক'রে পাব। পরে আরও কিছু বাড়তে পারে। কাল থেকেই জয়েন করতে হবে।

১ম। [চোখ কপালে তুলিয়া] অ্যাঁ, আপনি চাকরি পেলেন !

২য়। বলেন কি মশাই ! আমরা সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মত ব'সে রয়েছি।

[নরেন আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।]

১ম। ছেলেটা আচ্ছা তামাশা ক'রে গেল দেখছি।

২য়। [কাষ্ঠহাসি হাসিয়া] তামাশাই বটে ! কাগজ কলম নিয়ে এস আমি লিখে দিচ্ছি, সেরেফ কথাগুলো বানিয়ে ব'লে গেল। চাকরি অমনই হাতের মোয়া কি না ? আমাদের বোকা বানাবার জন্যে ঐ কথা ব'লে চলে গেল, যখন দেখলে আশাটাশা একেবারেই নেই।

বেহারা। [ঘরে ঢুকিয়া, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া] আজকের মত আপনারা যান। বাবু এখনই বাইরে যাবেন। বিশেষ জরুরি কাজ। বেলা বারোটার এদিকে ফিরবেন না।

১ম। আমরা না-হয় বেলা বারোটা অবধি বসব।

২য়। তাতে আমাদের কোন কষ্ট নেই, এই ত ন'টা বাজে, গল্পগাছা করতে করতে সময়টা কেটে যাবে'খন।

বেহারা। না না, তার পরে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে একটুখানি জিরিয়ে মিটিঙে যাবেন ছুটোর সময়। আপনারা কি তাহ'লে সারাদিনই বসবেন।

[হতাশ হইয়া একে একে সকলে উঠিয়া পড়িলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[কলিকাতার একটি সাধারণ একতালা ছোট বাড়ী। বাড়ীর মত গৃহসজ্জাগুলিও সাধারণ। কলতলায় ইন্দিরা কয়েকটি বাসন মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে। তাহার পরিধানে লালপাড় সাদাসিধা শাড়ী। চুলগুলি খোলা।]

নরেন। [বাহিরের বসিবার ঘর হইতে তথায় আসিয়া] তোমার সঙ্গে কে এক জন নন্দী দেখা করতে এসেছেন। একখানা কার্ড দিলেন, 'মিষ্টার ন্যাণ্ডি, বার-এট্-ল।' তা তাঁকে কি বলব ?···বাইরের ঘরে বসাব না কি ?

ইন্দিরা। [কাজ করিতে করিতে] আমার ত এখন সময় নেই, এই কাজগুলো যত শীগ্‌গির পারি ক'রে নিতে হবে। তা তাঁকে এখানেই না হয় নিয়ে এস। [একটু হাসিয়া] এখানে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়ালেই নন্দী সাহেবের সখ মিটে যাবে, কি বল ছোটদা ?

নরেন। কি জানি, সংসারে কোন্ কথাটাই বা আগে থেকে ব'লে দেওয়া যায়।

[নরেন প্রস্থান করিল এবং মিনিট-দুই পরে তাহার সহিত মিঃ নন্দী তথায় আসিলেন। নরেন ঘর হইতে একটা বেতের চেয়ার আনিয়া বারান্দায় রাখিয়া চলিয়া গেল।]

ইন্দিরা। নমস্কার মিঃ নন্দী। ভাল আছেন ত ? সেই যে কাশ্মীরে-বেড়াতে গিয়েছিলেন এই ফিরছেন বুঝি ?

নন্দী। [অভিভূতের মত তাকাইয়া ছিল] হ্যাঁ, মাত্র কাল ফিরেছি। কিন্তু···

ইন্দিরা। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে আজকাল অনেক দিন পরে প্রথম দেখায় মস্তবড় একটা 'কিন্তু' এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় বটে। সবাই ভাবে হঠাৎ এ কি? কিন্তু দুনিয়াতে কোন্ জিনিষটাই বা চিরস্থায়ী, বলুন। নির্ম্মলবাবুর কাছে সব শুনেছেন বোধ হয়।

নন্দী। [তখনও অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল। চকিত হইয়া] হ্যাঁ, শুনেছি। ওঁর সঙ্গেই যে এলুম। নইলে হয়ত আপনাদের এ বাড়ীর ঠিকানা পেতুম না।

ইন্দিরা। উনিও এসেছেন বুঝি?

নন্দী। হ্যাঁ, আপনার মায়ের কাছে কি দরকারী কথাবার্ত্তা বলছেন।

ইন্দিরা। [একটু হাসিয়া] এখন ত আর আমাদের বয় কিংবা খানসামা নেই, মিঃ নন্দী। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহ'লে হাতের এই কাজ কয়েকটা সেরে আপনাদের জন্যে একটু চা-টা তৈরি করি। ততক্ষণ বসবার ঐ ঘরটায় যদি একটু অপেক্ষা করেন।

নন্দী। [বিচলিত স্বরে] অপেক্ষা আপনি যতক্ষণ বলবেন করতে পারি। কিন্তু এই চায়ের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। জীবনে অনেক অনাবশ্যক এবং অযথা চা খেয়েছি ভদ্রতার খাতিরে, লৌকিকতার অজুহাতে। কিন্তু আজও সেই কারণে আপনাকে হাতের কাজ ফেলে চায়ের জন্যে বিন্দুমাত্র আয়োজন করতে হবে না। আমি কিন্তু এসেছিলুম আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে। আসছে সোমবারে ফুল্লরা দেবীর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে। এই নিন নিমন্ত্রণ-চিঠি।

ইন্দিরা। তাই নাকি? খুব চমৎকার খবর ত! কিন্তু আপনি আমার জন্মদিনে যেমন দামী উপহার দিয়েছিলেন আমি ত আপনার বিয়েতে তেমন কিছু দিতে পারব না।

নন্দী। উপহার আপনার যা খুশী দেবেন কিন্তু যত অল্পক্ষণের জন্যই হোক সে দিনটায় যাবেন একবার। দেখুন আজ অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার জীবনে খুব বড় একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সমস্তই যেন ওলটপালট হয়ে গেল, দেখছি সময়ের হিসাবটা কিছুই নয়, অনুভবের তীব্রতায় মানুষের একটা নিমেষও হয়ত তার জীবনের অনেকগুলো বছরকে ডিঙিয়ে যায়। কিন্তু যাক ওসব কথা···আচ্ছা আপনার দাদার বিলেতের ঠিকানাটা কি আমাকে বলতে পারেন?

ইন্দিরা। কেন?

নন্দী। সামনের আগষ্ট মাসে আমরা সস্ত্রীক বিলেত যাব, ভাবছি আপনার দাদার সঙ্গে দেখা ক'রে তখন তাঁকে একটি কথা বলব।

ইন্দিরা। [শুষ্কভাবে] নির্ম্মল বাবু ঠিকানা জানেন, প্রয়োজন হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু আর যাই কেন না সহ্য করি, অযাচিত করুণা আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে, মিঃ নন্দী।

নন্দী। আপনি একটু ভুল করছেন, সংসারে করুণার প্রয়োজন যে কার বেশী কেবল সেই কথাটি জানতে আপনার আজও বাকী রয়েছে। কিন্তু হয়ত আপনার কত সময়ই না নষ্ট করলুম, এখনও কত কাজই না আপনার বাকী। ·· আজকের মত আসি · নমস্কার।

চতুর্থ দৃশ্য

[রন্ধনগৃহের প্রাঙ্গণে ইন্দিরা তরকারি কুটিতেছিল। সামনে ছোট একটি তোলা উনুনে ভাত ফুটিতেছে। নিকটে জলচৌকির উপর মোহিনী বসিয়া আছেন।]

ইন্দিরা। মা, ছোটদা যে পঁচাত্তরটি টাকা মাইনে পায় তাতে কোন মাসেই তোমার পুরোপুরি সংসারখরচ চলে না। প্রত্যেক মাসে খাতা থেকে কিছু কিছু বার করতে হচ্ছে। সামান্য দু-তিন হাজার টাকা, এমন ভাবে চললে আর ক'দিন?

মোহিনী। [হাতা ডুবাইয়া ভাত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে] আর কি উপায় আছে তাও ত দেখতে পাচ্ছি নে। বাজে খরচ কিছুই করি নে, রাঁধুনি রাখি নি, একটা ঠিকে-ঝি ছিল তাও তুই ছাড়িয়ে দিয়েছিস। তবু বাসাভাড়া লাগে, ইলেকট্রিকের চার্জ্জ আছে। জামা-কাপড় ধোপা, গোয়ালা, সব নিয়ে একটা সংসারের খরচ অনেক।

ইন্দিরা। তাই ত বলছি ঝি-চাকর ছাড়িয়ে সামান্য খরচ কমিয়ে কিছুই হবে না। মা, তুমি যদি বল তাহলে আমিও চাকরি করি। ধর অনেক লোকের বাড়ীতে মেয়েদের কিছুক্ষণ গান-বাজনা সেলাই বা লেখাপড়া শিখিয়ে আমি অনায়াসে উপার্জ্জন করতে পারি। সেদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম মিঃ ভাদুড়ির বাড়ীতে তাঁর ছোট মেয়েকে কিছুক্ষণ ক'রে ইংরেজী পড়াতে আর এস্রাজ শেখাতে এক জন লোক খুঁজছেন। আমাদের সুধীরকে দিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছিলুম, তাঁরা এখনই রাজী। এখন তোমার মত নিয়ে কথা।

মোহিনী। এমন কথায় আমি কেমন ক'রে মত দিই বাছা। আর নির্ম্মলই বা কি মনে করবে? ..এখন তুমি তার অমতে কিছুই করতে পার না। তোমার বাবা মারা গেছেন, মহাগুরুনিপাতের বছর, এ বছর শুভ কাজ হ'তে পারে না বলেই হয় নি। নইলে তুমি ত জান তার মত

না নিয়ে কিছু হ'তে পারে না। এখন তোমাকে কোথায় সৎপাত্রের হাতে দেব, তুমি আপন সংসার বুঝেপড়ে নেবে, তা নয় এখন আমার সংসার চালাবার ভাবনায় তুমি চাকরি খুঁজতে লাগলে এমন অসঙ্গত কথায় কেউ মত দেবে না বাছা, তা ব'লে দিচ্ছি।

ইন্দিরা। [দৃপ্ত স্বরে এবং জেদের ভঙ্গীতে] কেন মা আজ তুমি এমন কথা বলছ বুঝতে পারছি নে। বাবা বরাবর ছেলেমেয়েকে সমান ভাবে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। জীবনে তাদের দায়িত্ব এবং তাদের স্বাধীনতা যে সমান এ-কথা বারংবার বুঝিয়েছেন। ছোটদা এই অল্প বয়সে সংসারের বোঝা স্বচ্ছন্দে বইতে পারল এবং এই ভার কেমন ক'রে বহন করবে সেই ভাবনায় বিয়ে করলে না, এই যদি হয় তবে আমিই বা কোন্ বিধানে বড়লোকের ঘরের বৌ হয়ে সব দায়িত্ব মুছে ফেলে চলে যাব ?

মোহিনী। তোমার বাবা কি শিখিয়েছিলেন, কি মতামত প্রচার করতেন তা হয়ত জানি নে কিন্তু এ আমি নিশ্চয় জানি, মুখে তিনি যাই বলুন মনে মনে আমার মতই তিনিও ব্যাকুল হয়ে চাইতেন তুমি যাকে ভালবাস সুখে দুঃখে তার ঘর ক'রে চরিতার্থ হও। তার বদলে চাকরি খোঁজ এ কখনই চাইতেন না।

নরেন। [ঢুকিয়া] মা, নির্ম্মলদা এসেছেন, আদা দিয়ে চা চাইলেন, ঠাণ্ডা লেগেছে। আর ইন্দু, তোমাকে একবার ডাকছেন, কি দরকার আছে।

ইন্দিরা। বলগে আমি চা তৈরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

[নরেন চলিয়া গেল।]

[বাহিরের ঘরে নরেন ও নির্ম্মল বসিয়াছিল, ইন্দিরা চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ঢুকিল।]

নির্ম্মল। [হাত বাড়াইয়া পেয়ালাটা লইয়া] মায়ের সঙ্গে এতক্ষণ কি নিয়ে বচসা হচ্ছিল ? তোমার প্রবল কণ্ঠস্বর যে মোড় থেকে শোনা যাচ্ছে, আমি আসতে আসতে শুনলুম। ব্যাপার কি ?

ইন্দিরা। [রাগত ভঙ্গীতে] কে বললে আপনাকে বচসা হচ্ছিল ?

নির্ম্মল। [সস্নেহ স্বরে] আচ্ছা এত অল্পেতেই এত চটে ওঠ কেন বল দেখি ?

নরেন। আমি জানি কি নিয়ে বচসা হচ্ছিল। ইন্দিরা বলছে, ছোটদা একা কেন চাকরি করবে, আমিও করব। আমার সঙ্গে ছোট থেকে ওর রেষারেষি চলছে, আজই বা তার অন্য রকম হবে কেন ? কিন্তু আজ যে কলেজে ভারি একটা সুখবর পড়লুম, তুমি নাকি ডি-এসসি হয়েছ। একদিন খাওয়াতে হবে নির্ম্মলদা, অমনি ছাড়ছি নে।

নির্ম্মল। [আড়চোখে ইন্দিরার প্রতি চাহিয়া] কিন্তু তারও চেয়ে একটা সুখবর আছে নরেন। আমি যে এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটিতে একটি বেশ ভাল রকম প্রফেসরী পেয়েছি। ভাবছি, এমন চাকরি ছাড়া উচিত নয়।

ইন্দিরা। [চমকিত হইয়া] সে কি আপনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন নাকি ?

নির্ম্মল। অগত্যা, তোমরা সবাই চাকরি করছ আর আমি ব'সে থাকব কেন ? এবং চাকরি যখন করবই তখন যে-দেশে ভাল পাব সে-দেশেই যাব।

ইন্দিরা। [একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে] আপনার অগাধ অর্থ। আপনার চাকরি সখের। আমাদের তা নয়।

নির্ম্মল। যাও ত ভাই নরেন, মায়ের কাছে আমার জন্যে দুটো পান চেয়ে আন গে।

[নরেন প্রস্থান করিল।]

নির্ম্মল। ইন্দু!

ইন্দিরা। বলুন।

নির্ম্মল। আমার যে টাকা আছে এ-কথাটা কি কখনও ভুলতে পারবে না ইন্দু ? কিন্তু তোমার যদি কোটি টাকাও থাকত আমার একবারও মনে পড়ত না আমার ইন্দিরার টাকা আছে। আমার টাকা আছে বা নেই এ-কথাটাই যে অবান্তর। এটা কেন তোমার যখন-তখন মনে পড়ে ? বুঝতে পারছ ?

ইন্দিরা। পারছি। আগে মনে পড়ত না। কিন্তু এখন পড়ে। যখন দেখি শোকাতুর জরাজীর্ণ দেহমন নিয়েও আমার মাকে সকালে উঠেই ভাতের হাঁড়ি চাপাতে হয়, যখন দেখি ছোটদা এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিয়েও পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় সারাদিন বাঁধা রয়েছে, তখন মনে পড়ে যায়। এবং আরও মনে পড়ে দু-দিন পরে আমি হয়ত ধনীর গৃহিণী হয়ে এই দরিদ্র সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেব। না না, তা আমি কিছুতেই পারব না।

[দু-জনেই কিছুক্ষণ নীরবে রহিল]

নির্ম্মল। [কিছুক্ষণ পর মুখ তুলিয়া] আচ্ছা ইন্দু, দৈবক্রমে আমার যে কতকগুলো টাকা রয়েছে, তা কি কোনদিনই কোন কাজে আসবে না ?

ইন্দিরা। সম্ভাবনা দেখি নে। মাকে আপনি জানেন, তিনি তাঁর স্বমত থেকে এক বিন্দু টলবেন না। কিন্তু সত্যিই আমি চাকরি করতে চাই। ছোটদার ঐ অল্প আয়ে ভাল ক'রে সংসার চলে না। এ-বিষয়ে আপনার মত কি ?

নির্ম্মল। [সাভিমানে] আমার মতে কি এসে যায় ? আমার মত নিয়ে ত আর কিছু তুমি সঙ্কল্প স্থির কর নি।

ইন্দিরা। তার কারণ আমি জানি ন্যায়সঙ্গত কাজে আপনি কখনও 'না' বলবেন না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমি যদি চাকরি করি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকবে ত?

নির্ম্মল। [আহত স্বরে] আমাকে ব্যথা দেওয়ারও কি একটা সীমা নেই ইন্দিরা? কিন্তু বিশ্বাসের কথা তুমি কেন তুলছ, এর একটি মাত্র উত্তর আমার মনে লেখা আছে, সে-কথা আজ বলতে পারব না। [উঠিয়া ঘরের মধ্যে বিচলিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।]···আচ্ছা আজ চললুম মাকে ব'লে দিও।

[নরেন পান লইয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর পানের রেকাবি রাখিয়া]

নরেন। একটু দেরি হয়ে গেল, তুমি কিছু মনে কর নি ত নির্ম্মল-দা? মা পান সাজতে এত দেরি ক'রে ফেললেন। তিনি বললেন, দেরি হলেও ক্ষতি নেই। তুমি না কি শাগ্‌গির প্রান পাবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হয়ে ওঠ নি। [মৃদু হাস্য] যদি বল তা'হলে আমি তোমার জন্যে এক বাক্স সিগারেট নিয়ে আসি।

[পুনরায় চলিয়া গেল]

নির্ম্মল। আজ ৬ই সেপ্টেম্বর হ'ল। আমি ১০ই এখান থেকে চলে যাব। কারণ ১২ই সে-কাজটায় জয়েন করবার শেষ দিন। যাবার আগে দেখা করব, অবশ্য, তুমি যদি বল। আজ চললুম।

ইন্দিরা। কি বকছেন আপনি? সত্যিই কি আপনি প্রফেসরী নিয়ে চলে যাবেন?

নির্ম্মল। নিশ্চয়। বিশেষ ক'রে তুমি যখন ঐ বিশ্বাসের কথা তুললে। তুমি হয়ত মনে করতে পার কাছে থেকে আমি তোমার উপরে পাহারা দিচ্ছি। আমাকে যাতে তুমি পাহারাওয়ালার চেয়ে আর একটু অধিক শ্রদ্ধা কর সে ভার আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু একটি কথা বলে যাই ইন্দু, কোন কারণে যদি কিছু প্রয়োজন হয় সঙ্কোচ ক'রো না। তুমি ত জান তোমার আমার মধ্যে কোন মিথ্যা সঙ্কোচ বা অযথা অভিমানের স্থান নেই। আর তোমার কথা এক রকম ক'রে আমি বুঝেছি। যদি কোন দিন তোমার দাদা ফিরে এসে তোমাদের সংসারের দায়িত্ব নেন, তখন কিন্তু আর আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখ না। অপেক্ষা করতে আমিও জানি, তবু এক-এক সময় সমস্ত মন কি রকম যে অধীর হয়ে ওঠে! ··আচ্ছা, কথায় কথায় রাত্রি বাড়ছে। যাই।

ইন্দিরা। যাই বলতে নেই, বলুন আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

[মিঃ ভাদুড়ির বালিগঞ্জের বাড়ীর ড্রইং-রুম। একটি সোফায় মিসেস ভাদুড়ী অর্দ্ধশায়িতা, আর একখানি চেয়ারে মিঃ ভাদুড়ি বসিয়া আছেন। ইন্দিরা ঘরে ঢুকিল। তাহার বেশবাস সাদাসিধা।]

ইন্দিরা। নমস্কার। আমাকে সাতটার সময় দেখা করতে বলেছিলেন। আপনাদের কথামত এসেছি।

মিসেস ভাদুড়ি। [বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া] আপনিই রেবাকে শিখাবেন বলেছিলেন?

ইন্দিরা। হ্যাঁ, যদি আমাকে রাখা আপনাদের মত হয়।

মিঃ ভাদুড়ি। মত! আশ্চর্য্য, আপনি আবার মতের কথা জিজ্ঞেস করছেন। না-চাইতে না-খুঁজতে আপনার মত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেল এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য মনে করেন। বয়···বয়!

[রীতিমত উর্দ্দিপরা বয় প্রবেশ করিল।]

মিঃ ভাদুড়ি। রেবা দিদিমণিকে ডেকে আন।

[ক্ষণকাল পরে রেবা ঘরে ঢুকিল। ধূসর-রঙের একখানি শাড়ী ফেরতা দিয়া হালফ্যাশানে পরা। মাথার দুই পাশে বেণী দুলিতেছে। পায়ে স্লিপার। বারো-তের বছর বয়স।]

রেবা। বাবা ডাকছিলে?

ভাদুড়ি। এই যে ইনি তোমার নতুন মিসট্রেস হবেন। কেমন লাগছে? খুব খুশী, নয়?

রেবা। নমস্কার···কি ব'লে আপনাকে ডাকব?

ইন্দিরা। আমার নাম ইন্দিরা গুপ্ত। তুমি আমাকে ইন্দুদি বলেই ডেক। [ভাদুড়ির দিকে চাহিয়া] আমি সন্ধ্যে সাতটার সময়েই রোজ আসব। গাড়ীর ব্যবস্থা কিন্তু আপনাদের করতে হবে।

ভাদুড়ি। নিশ্চয়। আমার দু-দুখানা গাড়ী ব'সে আছে। আপনার ঠিকানাটা একটু ব'লে দেন, আমি ড্রাইভারকে ব'লে দিই।

ইন্দিরা। আজ আর থাক। কাল থেকে পাঠাবেন। কাল থেকে নিয়মিত কাজ আরম্ভ করব।

ভাদুড়ি। [অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে] সে আপনার যখন খুশী কাজ আরম্ভ করবেন। একটা বাধ্যবাধকতার ভাব নাইবা রাখলেন মিস গুপ্ত? আপনার খেয়ালখুশীমত আসবেন। একটু-আধটু গান শেখাবেন। কখন একটু ইংরেজী পড়ালেন।

ইন্দিরা। সে কি কথা! আমি যখন আপনাদের কাছে টাকা নেব তখন নিয়মিত ভাবে পরিশ্রম করব বইকি। আচ্ছা আজ আমি আসি। কাল থেকে তৈরি থেক রেবা। ···ঠিক সাতটার সময়।

ভাদুড়ি। না না, অমনি চলে যাবেন না। আজ প্রথম দিনটায় গরিবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন একটু চা-টা না খেয়ে··· [মিসেস ভাদুড়ির প্রতি চাহিয়া] কি বল গো। উঠে অমনি বেহারাটাকে হুকুম ক'রে দাও একটা···

ইন্দিরা। ধন্যবাদ মিঃ ভাদুড়ি। কিন্তু ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। আমি ত আপনাদের নিমন্ত্রিত অতিথি নই। পয়সার জন্যে কাজ খুঁজতে এসেছি। আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করলেই সুখী হব। নমস্কার···আজ আসি তাহ'লে।

[কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া গেল।]

রেবা। [ঠোঁট উল্টাইয়া] বাবা ত একেবারে ফস্ করেই ওঁকে ঠিক ক'রে বসলে, কিন্তু উনি কি ডটিনীদির মত পিয়ানো বাজাতে পারেন? রমাদির মত কি ওঁর ইংলিশ উচ্চারণ করবার ভঙ্গী? ··এসব না জেনে নিয়েই···

ভাদুড়ি-জায়া। [অপ্রসন্ন স্বরে] তাছাড়া মেয়েটার বড় দেমাক। আর এত অল্প বয়স! এমন জানলে আমি ওকে দেখা করতে আসবার জন্যেই লিখতুম না। আর তুমি ত আগাগোড়া আমাকে একটা কথাও বলতে দিলে না, নিজের বুদ্ধিতে একেবারে কথা দিয়ে বসলে। এখন আর ভাবনা মিছে।

ভাদুড়ি। শোন কথা, এতে ভাবনার কি আছে? অল্প বয়স ত হয়েছে কি? এরাই ত যত্ন ক'রে পড়াবে। বেশী বয়সের ঝাণ্ড মেয়েগুলোর শুধু ব্যবসাদারী চাল!

ভাদুড়ি-জায়া। ব্যবসাদারী চালের জন্যে আমি ঠিক ভেবে-মরে যাচ্ছি নে। আমার ভাবনা অন্য কারণে। আর কেন যে ভাবনা সে-কথা তুমিও বিলক্ষণ জান। সেবারে সেই অসীমা ব'লে মেয়েটাকে নিয়ে ·

ভাদুড়ি। [ইংরেজীতে] দয়া ক'রে মুখ বন্ধ কর। এ ঘরে রেবার উপস্থিতি ভুলে যেও না।

ভাদুড়ি-জায়া। [মুখ হাঁড়ির মত করিয়া] না, ভুলে যাই নি। কিন্তু খুব অসহ্য হয় বলেই বলি। যাও রেবা, তোমার বামুনদিদির কাছে দুধ খেয়ে এস গে।

[রেবা চলিয়া গেল।]

ভাদুড়ি-জায়া। এই সব জালায় ইচ্ছে হয় যেদিকে দু'-চোখ যায় চলে যাই। তবু যাই নে, জানি যে এক দণ্ড গেলে সংসার চলবে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হাওড়ার রেল-ষ্টেশন। পশ্চিমগামী একখানা ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সুমুখে নির্ম্মল দাঁড়াইয়া। ইন্দিরা ও নরেন ষ্টেশন অবধি পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে।

নরেন। কই তুমি ত মাসিকপত্র বা বই একটাও সঙ্গে নাও নি নির্ম্মলদা? আচ্ছা দাঁড়াও, হুইলারের ষ্টল থেকে আমি একটা কিনে এনে দিই। কোন-না-কোন সময়ে তোমার দরকারে লাগবে। এতটা রাস্তা যাবে।

[চলিয়া গেল।]

নির্ম্মল। [রিষ্টওয়াচের দিকে চাহিয়া] আর মোটে পাঁচ মিনিট ট্রেন ছাড়তে।

ইন্দিরা। সত্যি তাহলে সেই সুদূর এলাহাবাদে চললেন চাকরি করতে! সেদিন যখন কথাটা বললেন আমি ভেবেছিলুম নিশ্চয় তামাশা করছেন। কিন্তু দেখছি কথাটা আপনার মনেই ছিল। আচ্ছা কেন বলুন দেখি আপনার এ খেয়াল?

নির্ম্মল। কারণ ত তোমাকে আগেই বলেছি।

ইন্দিরা। এই হ'ল যে আমাকে আরও সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে। দায়িত্বের অবধি রইল না।

নির্ম্মল। কেন?

ইন্দিরা। কেন আর কি, আপনি থাকবেন না কাছে, নিজেকেই হয়ত নিজে বিশ্বাস করতে পারব না।

নির্ম্মল। নিষ্ঠুর তুমি, তবু সেই নিষ্ঠুরতার জাল ছিন্ন ক'রে মাঝে মাঝে ধরা দাও। সেইটুকুই পাথেয়। এখনই যা বললে এইটুকু মনে রইল, কতবার মনে পড়বে।

[গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল।]

নির্ম্মল। [গাড়ীর দরজা খুলিয়া পা-দানিতে পা রাখিল] এইবারে উঠি।

ইন্দিরা। নাই বা গেলে অত দূরে। থাক তুমি, যেও না।

নির্ম্মল। [উদ্বেলিত কণ্ঠে] ইন্দু!

[গাড়ী ছাড়িয়া দিল]

নরেন। [হাতে একটা মাসিকপত্র, একটু দ্রুতপদে আসিয়া] ঐ যাঃ ট্রেন চলে গেল! ঠিক সময়ে আসতে পারলুম না। যাক কি আর করা যাবে। চল এবার ফেরা যাক্।

ইন্দিরা। [অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল] চল। কিন্তু ওয়েটিং-রুমে আমার শাল আর জুতোটা রেখে এসেছি।

[ওয়েটিং-রুমে শান্তা বসিয়া ছিল। ইন্দিরা ঘরে ঢুকিতে দেখা হইয়া গেল]

শান্তা। তুমি কোথা থেকে ইন্দু!

ইন্দিরা। নির্ম্মলবাবুকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম। কিন্তু আপনি কোথা চলেছেন শান্তা-দি?

শান্তা। আমার এক খুড়তুত-বোনের বিয়েতে মুঙ্গের যাচ্ছি, কিন্তু নির্ম্মলবাবু হঠাৎ গেলেন কোথা?

ইন্দিরা। হঠাৎ নয়। এলাহাবাদে এক প্রফেসরীর জন্যে আবেদন করেছিলেন, মঞ্জুর হয়েছে, তাই চাকরিতে যোগ দিতে গেলেন।

শান্তা। চাকরি! হঠাৎ নির্ম্মলবাবুর চাকরির খেয়ালই বা হ'ল কেন? আর যদি তাই করতেই হয় কলকাতা কি দোষ করলে? সমস্তই কেমনধারা হেঁয়ালির মত ঠেকছে। কি হয়েছে ইন্দু?

ইন্দিরা। কি ক'রে জানব বলুন। সবারই মনের কথা যে আমাকে জানতে হবে এমন কোন কথা আছে কি?

শান্তা। না তা অবশ্য নেই। তবে মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে ত ইন্দু, তুমি নির্ম্মলবাবুর ধৈর্য্যের পরীক্ষা এত করেছ যে, শেষকালে তিনি আর পারলেন না। বোধ করি বা আরও পরীক্ষা দেবার ভয়েই পালিয়ে গেলেন।

ইন্দিরা। [রুদ্ধস্বরে] আপনিও শেষে এই কথা বললেন শান্তা-দি! [একটা চেয়ারের উপর রক্ষিত শালটা তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুয়ারের দিকে পা বাড়াইল।]

শান্তা। [উঠিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া] একটু ব'সো না ইন্দু। এখনও আমার ট্রেনের দেরি আছে, ওয়েটিং-রুমেও আর দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। আচ্ছা কবে তোমাদের বিয়ে হবে ইন্দু? তোমার বাবার বাৎসরিক হয়ে গেলেই বুঝি?

ইন্দিরা। সে আমি ঠিক জানি নে শান্তাদি। এখন আমি ও ছোটদা দু-জনে উপার্জ্জন ক'রে সংসার চালাচ্ছি। একা তার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে কেমন ক'রে চলে যাব? মাকে কিছুদিন দেখতে হবে। বড়লোক জামাইয়ের কাছে হাত পেতে তিনি কিছুতেই কিছু নেবেন না, চিরকাল তাঁকে দেখে এলেন, একথাটা ত জানেন।

শান্তা। জানি বইকি ইন্দু। বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু মেয়েদের ঐ স্বাধীন জীবিকার পথে আমিও চিরকাল চলে এলুম। আমাদের দেশে ওপথে সম্মান নেই, মাধুর্য্য নেই। বড়ই রুক্ষ, নিরানন্দ। তোমার এমন জীবনটি ওতেই নষ্ট হবে মনে করলে কষ্ট হয়।

ইন্দিরা। কি করব শান্তাদি উপায় নেই।

শান্তা। আর একটা কথা মনে হয় ইন্দু, সমস্ত উপায়-নিরুপায়, সমস্ত কর্ত্তব্যের হিসাবনিকাশ অতিক্রম করেও যে ব্যথা সারা আকাশ ছেয়ে আছে তাকে 'না' ব'লে মুছে দেবে তুমি কেমন ক'রে? হয়ত তুমি একটা কর্ত্তব্যের বোঝাই জাহাজ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বল পাচ্ছ, কিন্তু আর একজন যে শূন্যমনে ততোধিক নিঃসঙ্গ প্রবাসে একাকী যাত্রা করেছে তার মনে এখন নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির সেই গানটার ধুয়ো বার-বার বেজে উঠছে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'।—সে শূন্যতার বোঝা বয়ে বেড়ান সোজা মনে কর?—ওগো অভিমানিনী, নিজের কথা বাদ দিয়ে সেটা একবার মনে মনে তলিয়ে বুঝেছ কি?

ইন্দিরা। আপনার দুটি পায়ে পড়ি শান্তাদি, আপনিও আমাকে অমন ক'রে বিচলিত করবেন না!

[ট্রেনের বাঁশী বাজিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভাদুড়ির বাড়ীর একখানি কক্ষে ইন্দিরা ভাদুড়ি-কন্যা রেবাকে ইংরেজী পড়াইতেছে।]

ইন্দিরা। [একখানা খাতা দেখিতে দেখিতে] রেবা, তুমি পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছ না। এই একটা পাতার মধ্যে তোমার কতগুলো ভুল বার হ'ল বল দেখি!

রেবা। ভারি ত, বানান ভুল হয়েছে ত হয়েছে কি?—আমাদের শান্তদি বলেন আর যাই হোক ইংরেজী উচ্চারণগুলো খাঁটি হওয়া চাই। যাই বলুন ইন্দিরাদি, আপনার উচ্চারণগুলো বড় কেমন যেন। আপনি বলেন, গার্ল, ওটা সেকেলে। এখনকার দিনে ওটা অচল। আমাদের শান্তদি বলেন, গোর্ল। উচ্চারণ-দুরস্ত না হ'লে সবারই কাছে বড়ই লজ্জা পেতে হয়।

ইন্দিরা। ওসব চিন্তা এখন রাখ দেখি। পড়ছ ত ভারি ফোর্থ ক্লাসে। এক পাতায় সাতটা বানান ভুল কর, এখন কোন্‌টা ফ্যাশন-দুরস্ত উচ্চারণ আর কোন্‌টা সেকেলে তা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

[ভাদুড়ি ঢুকিলেন। তাঁহার হ্যাট হইতে টাই অবধি সমস্ত নিখুঁৎ ভাবে পরিহিত। বেশবাসে প্রসাধনের আতিশয্য।]

ভাদুড়ি। গুড্‌ ইভ্‌নিং মিস গুপ্ত। রেবা পড়াশোনা করছে কেমন?

ইন্দিরা। মন্দ না।

ভাদুড়ি। [একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া] কাগজে পড়লেন ত সব। এবারে কাউন্সিলে জমিদারী-টমিদারী ওসব উঠে যাবার জন্যে আন্দোলন চলবে। আর বাস্তবিক উঠে যাওয়া উচিতও। রাশিয়ার মত ক্যাপিটালিজম্‌ যদি একদম উঠিয়ে দেওয়া হয় তবেই আমার মনে শান্তি আসে।

ইন্দিরা। [মৃদু হাসিয়া] হঠাৎ এমন কথাটা আপনার মনে হ'ল কেন?

ভাদুড়ি। [উদ্দীপ্ত হইয়া] কেন মনে হবে না।

ভাবুন দেখি একবার যে-সামাজিক বিধানে আমাদের মত অপদার্থগুলো টাকার আণ্ডিলের উপর পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আছে আর আপনার মত মেয়েকেও পয়সার জন্যে করতে হচ্ছে পরের অধীনে দাস্য,— সে সামাজিক ব্যবস্থায় কোন মঙ্গল আছে মনে করেন ?

ইন্দিরা। [পাংশুমুখে] থাক ওসব কথা মিঃ ভাদুড়ি। আমার চেয়ে আরও ঢের বড় সমস্যা আছে, কেবল আমাকেই অতবড় গৌরব দেবেন না। নাও রেবা, এই ট্রান্‌স্লেশন্‌গুলো চটপট মন দিয়ে ক'রে ফেল দেখি। [রেবা মিনিট-দুই পূর্ব্বে নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।] ওকি, রেবা চলে গেল নাকি ?

ভাদুড়ি। বোধ হয় কোন দরকারে গেছে। আসছে এখনই। ··· হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমার কথাটা অমন ক'রে উড়িয়ে দিলেন কেন মিস্ গুপ্ত ? ·· দেখুন সংসারে এত অসাম্য, এত অবিচার, তবু সওয়া যায়, যদি পাওয়া যায় একটু দরদ···একটু ব্যথাময় সহানুভূতি।

[ইন্দিরা আরক্ত মুখে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। কোন জবাব দিল না।]

ভাদুড়ি। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] আর শুধু টাকা থাকলেই জীবনটা সুখের হয় না মিস্ গুপ্ত। বাইরে থেকে লোকে মনে করে ঐ টাকাটাই বুঝি সব, না-জানি কত সুখেই এরা রয়েছে। তারা দেখে মস্ত বড় বাড়ী, মোটরকার, জাঁকজমক। কিন্তু এর তলায় তলিয়ে ত আর তারা দেখতে যায় না। দেখতে পায় না সেখানে কত দৈন্য কত রিক্ততা। আমার জীবনটাও একটা অশ্রুধারা করুণ ট্র্যাজেডি।

ইন্দিরা। [অস্ফুটকণ্ঠে] আমাকে এ-সব বলায় কি লাভ মিঃ ভাদুড়ি। আপনার বলেই বা কি লাভ আর আমার শুনেই কি লাভ ? জীবনের ট্র্যাজেডি একটু অন্তরালে রাখতে হয়। যার তার সামনে অমন ব'লে বেড়াতে নেই। কিন্তু রেবা আমাকে না ব'লে উঠে গেল কেন ? সে কি আজ আর পড়বে না।

[পরমুহূর্ত্তে রেবা ঘরে ঢুকিল।]

রেবা। [গম্ভীর মুখে।] বাবা মা তোমাকে ডাকছেন, শীগ্‌গির যাও।

[ভাদুড়ি আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। অপরাধীর মত।]

[মিনিট-পাঁচেক পরে পাশের ঘর হইতে ভাদুড়ি-জায়ার তর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল]

ভাদুড়ি-জায়া [পার্শ্বের কক্ষ হইতে] কোথায় গেছিলে ? সেই থেকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি! মিষ্টার দের, বাড়ী থেকে মোটর এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাপড় ছাড়তে যাই ব'লে সেজেগুজে ঐ মেয়েটার কাছে যেয়ে রস-কথা হচ্ছিল। দাঁড়াও আমি বার করছি তোমার রসতত্ত্ব !

[ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দিরাদের বাড়ীর সম্মুখে মোটর থামিল। সে নামিয়া নিঃশব্দে আপন ঘরে ঢুকিল। টেবিলের টানা-দেরাজ খুলিয়া নির্ম্মলের একটি ছোট ফটো বাহির করিল। তন্ময় হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া তাহার উপর মাথা রাখিল। ঘনকৃষ্ণ কেশভার ছড়াইয়া পড়িল।]

মোহিনী। [দরজা ঠেলিয়া] ইন্দু দোর খোল ! রাত হয়েছে খাবি নে ?

ইন্দিরা। [চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফটোখানা একখানা বইয়ের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল।] এই যে খুলি মা !

মোহিনী। কি ব্যাপার কি ? এসেই ঘরে দোর দিয়েছিস। এদিকে শান্তা তোর জন্যে সেই সন্ধ্যের আগে থেকে এসে ব'সে আছে।

[মোহিনীর পিছু পিছু শান্তা ঘরে ঢুকিল।]

শান্তা। মাসীমা আপনি যান। আমি এখনই ইন্দুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

মোহিনী। বেশী রাত ক'বো না বাছা। আমি ততক্ষণ খাবার সাজিয়ে ঠিক ক'রে রাখি। তোমরা দু-জনে একসঙ্গেই বসবে।

[প্রস্থান করিলেন]

শান্তা। [সহাস্যে] ফটোর উপর এত অনুরাগ কিন্তু আসল মানুষটিকে ত নাস্তানাবুদ করছ ইন্দু !

ইন্দিরা। তার মানে ?

শান্তা। [বইটা সরাইয়া ফেলিয়া ফটোখানা বাহির করিয়া] বলি এতক্ষণ দোর বন্ধ ক'রে করছিলে কি ? এখন ভালমানুষের মত মানে জিজ্ঞেস করছ ইন্দু ?

ইন্দিরা। আপনি কেমন ক'রে জানলেন শান্তাদি ?

শান্তা। আমি যে হাত গুণতে জানি ভাই। কিন্তু ভাবছি তোমাদের দু-জনের ধ্যানের পালা শেষ হবে কখন এবং কেমন ক'রে। আমি আজ এমন অসময়ে এসেছি কেন জান, আজই বিকেলের ডাকে নির্ম্মলবাবুর একখানা চিঠি পেলুম···

ইন্দিরা। [বিবর্ণ মুখে] তিনি ভাল আছেন ত ?

শান্তা। [হাসিয়া] ভাল আছেন ইন্দু। কিন্তু সে চিঠি ত আমাকে লেখা নয় ভাই, আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে তোমাকেই লেখা। আচ্ছা তোমাকে কি উনি চিঠি লেখেন, ইন্দু ?

ইন্দিরা। না। মাকে লেখেন, সর্ব্বদাই খবর নেন। আমাদের উপর ওঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে।

শান্তা। [হাসিয়া ফেলিয়া] তা আছে বইকি। কিন্তু কি বলছিলুম, সে চিঠির ছত্রে ছত্রে একই অনুরোধ, আমি যেন প্রায়ই তোমার কাছে আসি। তুমি বড় একা পড়েছ। তোমার দিকে যেন একটু লক্ষ্য রাখি। কারণ তুমি বড্ড চাপা স্বভাবের। নিজের কোন অভাব বা ক্লেশের কথা কখন মুখ ফুটে প্রকাশ করবে না। সমস্ত চিঠিখানাই আগাগোড়া ঐ কথায় ভর্ত্তি। সেই চিঠির করুণ মিনতিই আমাকে এই অসময়ে টান মেরে ঘর থেকে বার করলে। চিঠিটা নাও ইন্দু। কারণ সে ত তোমাকেই লেখা, আমি কেবল উপলক্ষ্য।

[একখানা খাম বাহির করিয়া ইন্দুর হাতে দিতে গেল।]

ইন্দু। [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে] না না, আমি পড়তে চাই নে শান্তাদি! আমি পড়ব না।

তৃতীয় দৃশ্য

[ইন্দিরা ভাদুড়ির বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নরেন চেয়ারে বসিয়া একটা বই পড়িতেছে।]

ইন্দিরা। ছোটদা!

নরেন। [মুখ তুলিয়া] কিরে?

ইন্দিরা। ফিরতে আমার আটটা বেজে যায়। অত রাত্রিতে আমি একা আসতে পারি নে। আজ থেকে ঠিক আটটার সময় তুমি আমাকে আনতে যাবে। দু-জনে একসঙ্গে আসব বুঝলে?

নরেন। যো হুকুম! কিন্তু আধুনিক মেয়েদের এত ভয় আবার কিসের? আটটা রাত্রি আবার রাত্রি না কি?

ইন্দিরা। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু ঠিক আটটার সময় যাবে। আমাকে যেন অনর্থক ব'সে থাকতে না হয়।

[ভাদুড়িদের বাড়ীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরা চলিয়া গেল।]

ইন্দিরা [রেবার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া] কি রেবা, কাল যে এস্রাজের গৎটা দিয়েছিলুম ভাল ক'রে অভ্যেস করেছ?

রেবা। কি জানি ইন্দুদি। কাল মোটে আমার সময় ছিল না। মিস্ দের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে যে পারফর্মেন্স ছিল তাতে আমার অনেক পার্ট ছিল। উঃ, কি ভিড় হয়েছিল যদি দেখতেন একবার! মিস্ দে বললেন, আমার পার্ট নাকি সিম্প্লি চার্মিং হয়েছিল। আপনি বুঝি কোথাও যান না ইন্দুদি? আপনাকেও ত আমি কার্ড দিয়েছিলুম।

ইন্দিরা। আমার সময় নেই রেবা। কিন্তু আর গল্প থাক, এবারে গৎটা একবার বাজাও শুনি। দেখি ভুল হয় কি না।

[রেবা এস্রাজ পাড়িয়া লইয়া বাজাইতে সুরু করিল।]

ইন্দিরা। [এস্রাজের পর্দ্দায় আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া] ঐখানটায় তোমার কেবলই ভুল হচ্ছে রেবা। আর একটু মন দাও।

রেবা। [আবদারের নাকি সুরে] আজ কিছুতেই আমার মন বসছে না ইন্দুদি। আজ আমি প্রপার মুডে নেই। আজ যে সাড়ে ছ'টার শো-তে আমাদের মেট্রো যাবার কথা। আমি, মিলি আর মিলির দাদা। কাল থেকে আমাদের এনগেজমেণ্ট হয়ে রয়েছে। ছটা বেজে পনর হয়ে গেছে।

ইন্দিরা [বিরক্তির সুরে] এ-কথাটা আগে বললেই পারতে। তাহলে আজ আমি আসতুম না। এদিকে ছোটদাকে আমি ঠিক আটটার সময় আসতে বলেছি আমাকে নিতে।

ভাদুড়ি। [ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সহাস্য মুখে প্রবেশ করিয়া] নমস্কার মিস্ গুপ্ত। রেবা কেমন শিখছে-টিকছে? আপনার হাতে যখন পড়েছে তখন ওর জন্যে আমি আর ভাবি নে। আজ কি চমৎকার সন্ধ্যেটি হয়েছে। চাঁদের আলোয় চারি দিক ভ'রে গেছে। আপনি যদি বাইরে বেরিয়ে দেখতেন, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

ইন্দিরা। সময় নেই আমাদের মিঃ ভাদুড়ি। কাজের রুটিন শেষ ক'রে তবে ত চাঁদের আলোর দিকে মন দেব। বরঞ্চ আপনি বেড়িয়ে আসুন। আপনাদের জীবনে অগাধ অবসর এবং ভাবনা-চিন্তারও বালাই নেই।

ভাদুড়ি। [করুণ সুরে] তবেই দেখুন যে-সমাজবিধির ফলে আপনার মত প্রতিভাময়ী নারীকেও জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত কাজের চাকার তলায় উৎসর্গ করতে

হচ্ছে, সে-বিধি কি নিষ্ঠুর! আমরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব!

ইন্দিরা। [সহাস্যে] বিদ্রোহ করলে কিন্তু আপনারই ক্ষতি মিঃ ভাদুড়ি। আপনার বালিগঞ্জের এই প্রাসাদতুল্য বাড়ীখানি এবং আপনার মিনার্ভা-কার খানাও তাহ'লে আর খুঁজে পাবেন না। সমাজবিধির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও দুটো বস্তুও অদৃশ্য হবে।

ভাদুড়ি। যায়ই যদি যাক না, ক্ষতি কি তাতে? হয়ত কষ্ট হবে কিন্তু আপনার সঙ্গে সে কষ্ট ভাগ ক'রে নিতে পাব, এ আনন্দ যে সকল কষ্টকেই ছাপিয়ে উঠবে।

রেবা। [আবদারের সুরে] বাবা, আজ তুমি ইন্দুদিকে পৌঁছে দিয়ে এস না। আমি এখনই মিলি আর তার দাদার সঙ্গে মেট্রো যাব। ইন্দুদি যে আবার ভয়ানক পর্দ্দানসীন, একা যান না বাড়ী, ওঁর ছোটদাকে আসতে বলেছেন, তাঁর আসতে এখন ঘণ্টা-দুয়েক দেরি।

ইন্দিরা। [ভর্ৎসনার সুরে] ওকি রেবা, একি তোমার অন্যায় আবদার! তোমার বাবার কত কাজ, ওঁকে কেন বিরক্ত করছ? তার চেয়ে তোমার মৌচাক,- শিশুসাথীগুলো আমাকে দিয়ে যাও, দিব্যি সময় কেটে যাবে।

ভাদুড়ি। [সাড়ম্বর বিনয়ে] বলেন কি মিস্ গুপ্ত, একদিন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব তাতেই হবে আমার কাজের ক্ষতি! এ ত আমার সৌভাগ্য। যাই গাড়ীখানা বার করতে বলি।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন]

ইন্দিরা। [স্বগত হইয়া] মহা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি।

চাপরাশি। [ঘরে ঢুকিয়া] আইয়ে মেম সাব্। গাড়ী তৈয়ার।

চতুর্থ দৃশ্য

[মোটরে মিঃ ভাদুড়ি ইন্দিরার পাশে বসিয়া আছেন। মোটর চলিতেছে চৌরঙ্গীর রাস্তা ধরিয়া।]

ইন্দিরা। কোন্ দিকে যাচ্ছেন, এ রাস্তায় ত আমার বাড়ী নয়।

ভাদুড়ি। আপনার বাড়ীতে ঠিকই পৌঁছবেন মিস্ গুপ্ত, তবে মিনিট পনর-কুড়ি দেরি হবে। চৌরঙ্গীতে আমার নিজের একটু কাজ আছে, এক মিনিট নামব। আঃ আজকের রাত্রিটি কি চমৎকার। যদি একটু বেড়ান তাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু আপনার গলা কি সুন্দর মিস্ গুপ্ত, সেদিন রেবাকে কি যেন একটা গান গেয়ে শেখাচ্ছিলেন আমি পাশের ঘর থেকে শুনে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেলুম!

[ইন্দিরা নিরুত্তর]

ভাদুড়ি। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] তাও বলি আপনার মত প্রতিভা এমন ক'রে নষ্ট হ'তে ভগবান কখনই দেবেন না। এ যে তাঁর সৃষ্টির অপমান! জন্মাতেন আপনি ইউরোপে, ওরা পূজো করত আপনার প্রতিভাকে, লুফে নিত। আমাদের এই পরাধীন দেশে জন্মেছেন বলেই না আপনাকে এত ষ্ট্রাগল করতে হচ্ছে।

[ইন্দিরা নিরুত্তর]

ভাদুড়ি। [একটুখানি দম লইয়া] কিন্তু একদিন-না-একদিন আপনি সুযোগ পাবেনই, এ আমি আজ আপনাকে নিশ্চয় ব'লে দিলুম। সেদিন মনে করবেন হ্যাঁ, আপনার এক জন পূজারী ভক্ত ঠিক বলেছিল বটে। মনে করবেন না আমি শুধুমাত্র আন্দাজে এ কথা বলছি। এক সময় আমার জ্যোতিষের উপর ভয়ানক ঝোঁক ছিল। ঐ জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে এমন বই নেই যা পড়ি নি। বিশেষ ক'রে পামিষ্ট্রি খুব ভাল ক'রেই জানি। আপনার কতকগুলো লক্ষণ দেখে আমার মনে হয়...কই দেখি আপনার হাতখানি একবার। হাতের রেখাগুলি ভাল ক'রে দেখলেই এ বিষয়ে আরও স্থিরনিশ্চয় হব। [ইন্দিরার একখানি হাত ধরিলেন] আঃ কি নরম হাত আপনার! হ্যাঁ, ঐ দেখুন ঠিকই ধরেছি, আপনার ভাগ্য-রেখা একেবারে সোজা উঠেছে, কোথাও ছেদ নেই।

ইন্দিরা। [ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া, একটু ঝুঁকিয়া হাতের কয়েকখানা বই ও খাতা রাস্তায় ফেলিয়া দিল।] ঐ যাঃ, ঝুঁকে দেখতে গিয়ে আমার বইগুলো হঠাৎ পড়ে গেল। মোটরটা শীগ্‌গির একবার থামাতে বলুন না মিঃ ভাদুড়ি।

মিঃ ভাদুড়ি। [ড্রাইভারের প্রতি] জলদি রোকো!

[গাড়ী সহসা থামিয়া গেল। ইন্দিরা নামিয়া সোজা সামনে যে বাসটা পাইল চড়িয়া বসিল। ভাদুড়ি বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।]

পঞ্চম দৃশ্য

[ইন্দিরার ঘরে মুক্ত বাতায়নপথে অজস্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। খোলা দরজা দিয়া সে ঢুকিল। উত্তেজনায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। চেয়ারে বসিয়া সে টেবিলের উপর মাথা রাখিল। নির্ম্মল ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে একটা হলদে খামে একখানা টেলিগ্রাম। ধীরে সে ইন্দিরার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিল।]

নির্ম্মল। ইন্দু!

ইন্দিরা। [চমকিয়া মুখ তুলিয়া] আপনি! কখন এসেছেন ?

নির্ম্মল। সাতটার ট্রেনে নেমেছি। এখনও বাড়ী যাই নি, ষ্টেশন থেকে সোজা এইখানে আসছি।

ইন্দিরা। [ক্ষীণ হাস্যে] চাকরির সখ মিটে গেল ?

নির্ম্মল। কোন্‌কালে মিটে গেছে, কিন্তু তোমার ?

ইন্দিরা। আমারও মিটব মিটব করছিল, একটু আগের একটা ব্যাপারে একেবারে মিটে গেছে।

নির্ম্মল। যাক বাঁচা গেল! কিন্তু তোমার দাদা যে আসছেন ইন্দু, এই দেখ টেলিগ্রাম। তোমার ফুল্লরাদি ও নন্দী সাহেব ফিরে আসছেন তাদেরই সঙ্গে। পনর তারিখে ওরা বম্বে পৌঁছবে। আর এই নাও তোমার দাদার চিঠি। এলাহাবাদে আমাকে লিখেছিল। এ চিঠি পড়লে তোমার মায়ের মন থেকে সব অভিমান মুছে যাবে। রমেন একেবারে চাকরিতে বাহাল হয়ে আসছে। ওখানে ওর রিসার্চের ভয়ানক সুখ্যাতি হয়েছে, এদেশে যে ওকে লুফে নেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ইন্দিরা। আপনি যা বলছেন, সত্যি ?

নির্ম্মল। সত্যি কি না তুমি নিজেই প'ড়ে দেখ।

[চিঠি ও টেলিগ্রাম তাহার হাতে তুলিয়া দিল]

ইন্দিরা। [হাতের মুঠায় তাহা ধরিয়া] আমি এখনই মনে মনে তোমাকে ডাকছিলুম। জীবনের সবচেয়ে অবসাদের মুহূর্ত্তে যে একসঙ্গে এত আনন্দের খবর আমার জন্য সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তা ভাবতেই পারি নি।

নির্ম্মল। [তাহার একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া] আর আমার জন্যে কি সঞ্চিত হয়ে আছে ইন্দু? এখনও কি তোমার সময় হয় নি ?

ইন্দিরা। তুমি এত উতলা হয়েছ, কিন্তু সত্যি কি আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে ? এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে জীবনের এত উলটোপালটা অবস্থা, এত অন্ধকার দিক দেখলুম। প্রথম-জীবনের সেই আদর্শবাদ সেই নির্ভর ও শ্রদ্ধার ভাব ক্রমেই যেন হারাতে বসেছি। সমস্ত জীবনকে তখন একটি অখণ্ড আরতির মত ক'রে জেনেছিলুম, এখন সেখানে দ্বিধা ও সংশয় দেখা দিচ্ছে। সব জিনিষকেই যেন অবিশ্বাসের চোখে দেখতে সুরু করেছি। তোমার সেই ইন্দিরাকে আর কি খুঁজে পাবে ?

নির্ম্মল। [তাহার হাতখানি তেমনই করিয়া ধরিয়া থাকিয়া] খুঁজে পাব ইন্দু, খুঁজে পাব। অন্ধের আদর্শবাদ এমন কিছু লোভের বস্তু নয়। তুমি দু-চোখ খুলে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ পৃথিবীর সমস্ত রূঢ় বাস্তব, নগ্ন সত্য। কিন্তু শুধু ঐখানেই থামলে চলবে না, আরও দূরপ্রসারী কর তোমার দৃষ্টি, দেখবে সকল আলজ্জ বাস্তবকে ছাপিয়েও একটি কথা বাকী আছে, সমস্ত নগ্ন সত্যকে আবৃত ক'রে একটি অখণ্ড সুর আছে। তুমি আমার যাত্রাপথে আলো জ্বেলে দাও, আমরা দু-জনে মিলে সেই সুরের উৎস আবিষ্কার ক'রে বার করব।

[চাঁদের আলো সেই নিঃশব্দ কক্ষে অজস্র ধারায় আসিয়া পড়িল। কোন এক প্রতিবেশী-গৃহের ছাদ হইতে কীর্ত্তনের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।..."

গানের সুরের সহিত ক্রমশঃ ইন্দিরার বিদ্রোহময় মুখে বিহ্বল মধুরতা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একান্ত ভাবে প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে আপনাকে সমর্পণ করিল।]

যবনিকা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূজার বাজারে কর্ত্তব্য

বাঙালী হিন্দু মাত্রেই এই সময় কাপড়, জামা, জুতা ও অন্য অনেক জিনিষ কিনিবেন। তাঁহারা বাঙালীর কারখানায় বা বাঙালীর গৃহে প্রস্তুত এই রকম প্রায় সব জিনিষই কম ও বেশী দামের পাইবেন। বাঙালীর মিলের কাপড়, বাঙালীর হাতের তাঁতের কাপড়, বাঙালীর বোনা খদ্দর পাইবেন। সাবান, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রসাধনের জিনিষও বাঙালীর তৈরি পাইবেন। বাঙালীর তৈরি যাহা না পাইবেন, তাহা অন্য প্রদেশীয়ের তৈরি কিনিবেন। কিন্তু বিদেশী কিছু কোনক্রমেই কেনা উচিত হইবে না।

—

জাপানী বর্ব্বরতা

জাপানীরা চীন দখল করিতে চেষ্টা করিতেছে। শুধু এই কারণেই আমাদের জাপানী জিনিষ ক্রয় হইতে বিরত থাকা উচিত। তাহার উপর জাপানীরা চীনের নানা শহরে, যাহারা যুদ্ধ করিতেছে না এরূপ পুরুষদের উপর, এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া হাজার হাজার মানুষের প্রাণবধ করিতেছে। মাছি মারিবার জন্য ব্যবহৃত বিষমাখান কাগজের উপর যেমন ঠাসাঠাসি পাশাপাশি মাছির ঝাঁক পড়িয়া মরিয়া থাকে, চীনের অনেক জায়গায় আবালবৃদ্ধবনিতা নিহত চৈনিকদের মৃতদেহ বা দেহাংশ সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে, কোথাও কোথাও বা শবস্তূপের মধ্য হইতে আহত অর্দ্ধমৃত কাহারও কাহারও ক্ষীণ কাতরধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং সাহায্য-ভিক্ষার জন্য উত্তোলিত হস্তের সঙ্কেত দৃষ্ট হইতেছে।

চীনের বিখ্যাত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান চীনের গৌরব নান্‌কাই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। জাপানীরা তাহা আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া চারি ঘণ্টায় ধ্বংস করিয়াছে। পাছে তাহাতেও কিছু অবিনষ্ট থাকে, এই জন্য বোমা ফেলার পরদিন প্রাতে জাপানীরা কেরোসিন্ তেলের টিন এবং মশাল ও বন্দুক লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ড ও কাগজের টুকরা ভস্মীভূত করে—সেখানে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও না-রাখা তাহাদের উদ্দেশ্য। এরূপ পৈশাচিক প্রলয়কাণ্ড করিবার কোনই সামরিক প্রয়োজন ছিল না।

সমুদ্রে কতকগুলি চীনা মৎস্যজীবীদের নৌকা মাছ ধরিতেছিল। একটা জাপানী সবমেরীন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া গোলা ছুঁড়িয়া শত শত শিশু যুবা বৃদ্ধ নরনারী সমেত সেগুলিকে নষ্ট করিয়াছে।

এই প্রকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা যাহারা করিতেছে, তাহাদের কোন প্রকার জিনিষ কেনা অনুচিত।

নানকাইয়ের একটি ছাত্র 'ভয়েস্ অব্ চায়না' পত্রিকায় নানকাই-ধ্বংসের মর্ম্মভেদী বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের শেষে লিখিয়াছেন—"নানকাই বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। কিন্তু এখন বিলাপের সময় নাই। আমাদের একটি কর্ত্তব্য আছে।" জাপানকে পরাস্ত করা সেই কর্ত্তব্য। জাপানী বর্ব্বরতায় স্বদেশপ্রেমিক চৈনিকেরা দমিয়া যান নাই। তাঁহারা অদম্য।

—

কালনেমির লঙ্কাভাগ

শক্তিশেলে সংজ্ঞাহীন লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য যখন হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন, তখন রাবণের মামা কালনেমি হনুমানকে বধ করিবার ভার পান। এই কাজটার পুরস্কার স্বরূপ কালনেমি লঙ্কারাজ্যের অর্দ্ধেক পাইবেন, রাবণ এইরূপ অঙ্গীকার করেন। কালনেমি হনুমানকে বধ করিতে যাইবার সময়ই লঙ্কার কোন্ আধখানা লইবেন স্থির করেন। কিন্তু হনুমান নিহত না হইয়া তিনি নিজেই নিহত হন। সুতরাং লঙ্কাভাগটা তাঁহার বাঞ্ছা ও কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়, বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সিমলায় মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার দলের লোকেরা তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার দেন, এবং তাহার উত্তরে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথা বলেন :

There could be no solution, if people continue to believe in the principle of 'acquisition first and distribution afterwards', or, in the latest dictum, 'possession first and partition afterwards'.

তাৎপর্য্য। [সাম্প্রদায়িক] সমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না যদি লোকেরা "আগে অর্জ্জন পরে বণ্টন" নীতিতে, অথবা আধুনিকতম বচন অনুসারে "আগে দখল পরে বাঁটোয়ারা" নীতিতে বিশ্বাস করিতে থাকে।

তাহা হইলে মিঃ জিন্নার মতে "আগে বাঁটোয়ারা পরে দখল" নীতিটাই বোধ হয় ঠিক এবং তাহার বিপরীত যে-নীতির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত।

কার্য্য সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বেই ফল আকাঙ্ক্ষা করা ও প্রাপ্তব্য ফলের কতটা ভাগ কে পাইবে তাহা স্থির করিয়া ফেলা বাংলা প্রবাদবাক্য অনুসারে 'কালনেমির লঙ্কা-ভাগ' নামে পরিচিত। তাই মিঃ জিন্নার উক্তিতে কালনেমির গল্পটা মনে পড়িয়া গেল। কারণ, তাঁহার উক্তির পশ্চাতে এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, যে, ভারতবর্ষ ও তৎসম্পর্কীয় সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুবিধা অধিকার ইংরেজদের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে আসিবার পূর্ব্বেই তৎসমুদয়ের কতটা অংশ কোন সম্প্রদায় পাইবে তাহার মীমাংসা হইয়া যাউক।

অবশ্য, ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের কেহই রাবণ কালনেমি বা হনুমান নহেন। কার্য্যনির্ব্বাহের পূর্ব্বেই পোষিত ও প্রকাশিত কালনেমির আকাঙ্ক্ষার সহিত আলোচ্য আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মোসলেম লীগের আদর্শ সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার মত

মিঃ জিন্না সিমলায় তাঁহার অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন, কংগ্রেসের অথবা দেশের অন্য কোন বহুজন-স্বীকৃত রাষ্ট্রনৈতিক সমিতির আদর্শের সহিত মোসলেম লীগের আদর্শের কোন প্রভেদ নাই, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এই আদর্শ।

ইহা সত্য হইলে সুখের বিষয়।

ইহা সত্য হইলে মোসলেম লীগ কংগ্রেসকে কোন সর্ত্তে বা চুক্তিতে আবদ্ধ না করিয়া, কেন স্বাধীনতালাভপ্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সহিত যোগ দেন নাই বা দিতেছেন না? যদি কংগ্রেসের সহিত যোগ দিবার পূর্ব্বে কোন একটা চুক্তি মোসলেম লীগ একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মোসলেম লীগ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি-অনুসারে নিজের পৃথক্ স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা কেন করেন নাই বা কেন করিতেছেন না? অন্য স্বাধীনতালাভপ্রয়াসীদের ভয়ভাবনাশূন্য ক্ষতিলাভগণনাশূন্য এবং বহুবিঘ্নসংকুল চেষ্টার ফলে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যে, যে-কেহ, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয় না-থাকায়, বলিতে পারে, "আমি দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।" কিন্তু যিনি এই কথা বলিবেন, তাঁহার স্বাধীনতাকামনা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? অন্যেরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ দ্বারা, কারাবরণ দ্বারা, অন্য বহু দুঃখ বরণ দ্বারা, মৃত্যুবরণ দ্বারা তাঁহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়াছেন। মোসলেম লীগ এইরূপ কি প্রমাণ দিয়াছেন?

মিঃ জিন্না যে দখলের আগে বাঁটোয়ারার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? অর্থের কতকটা এই:— এখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সম্পত্তি। ইহার সমুদয় চূড়ান্ত ও চরম ক্ষমতা সুযোগ সুবিধা অধিকার এখন ইংরেজদের। ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ স্থাপিত হইলে দেশটি ও তাহার সমুদয় চূড়ান্ত ও চরম ক্ষমতা সুযোগ সুবিধা অধিকার দেশের লোকদের হইবে। কংগ্রেস বলিয়াছেন, দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইলে ধর্ম্মজাতিবর্ণশ্রেণীবৃত্তিনির্বিশেষে নরনারী সকলে রাষ্ট্রের চক্ষে সমান বিবেচিত হইবে, কোন পুরুষ বা নারী কেবল তাহার ধর্ম্ম জাতি বর্ণ শ্রেণী বৃত্তি ইত্যাদির জন্য কোন সুযোগ সুবিধা অধিকার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

মিঃ জিন্নার কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি ও মোসলেম লীগ কংগ্রেসের এইরূপ প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা কি কংগ্রেসকে সন্দেহ করেন? কি সন্দেহ করেন? তাঁহাদের সন্দেহ কি এই, যে, স্বরাজ লব্ধ হইলে কংগ্রেস মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিবেন?

স্বরাজলাভের সম্ভাবনা দুই প্রকারে হইতে পারে। হইতে পারে, যে, কংগ্রেস বা কংগ্রেসী হিন্দুরা মোসলেম লীগের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বরাজ লাভ করিতে পারেন; কিংবা হইতে পারে, যে, কংগ্রেস বা কংগ্রেসী হিন্দুরা মোসলেম লীগের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইলে তবে স্বরাজলাভে সমর্থ হইবেন। যদি কংগ্রেস বা কংগ্রেস-হিন্দুরা মোসলেম লীগের সাহায্য না পাইয়া না লইয়াই স্বরাজ অর্জ্জন করেন,তাহা হইলেও কংগ্রেস বা কংগ্রেস-হিন্দুরা মোসলেম লীগের সভ্যদিগকে স্বরাজের আমলের সুযোগ অধিকার প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত না করিয়া অংশী করিবেন। কিন্তু মোসলেম লীগের তাহাতে কোন দাবী থাকিতে পারে না—না খাটিয়া মজুরীর দাবী করা বৈধ নহে। অতএব মোসলেম লীগ যদি দাবী করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কংগ্রেসের সহযোগিতা করিতে হইবে, স্বরাজলাভ-প্রচেষ্টার সমুদয় ক্ষতি দুঃখ দায়ঝুঁকির অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য, এ-কথার উত্তরে মিঃ জিন্না বলিতে পারেন, "কংগ্রেস যে আমাদিগকে ভাগ দিবেন, তাহার স্থিরতা কি, প্রমাণ কি? কংগ্রেস যদি স্বরাজ-সংগ্রামে আমাদিগকে সৈনিকরূপে খাটাইয়া পরে স্বরাজ লব্ধ হইলে আমাদিগকে কোন ভাগ বা ন্যায্য ভাগ না দেন? আমরা যাহাতে নিশ্চয় ভাগ পাই, সেই জন্য স্বরাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার আগেই ভাগ-বাঁটোয়ারা হওয়া আবশ্যক।"

ইহার উত্তরে বলি, "ভাগ-বাঁটোয়ারা আগে হইতে না

হইয়া গেলে যদি কংগ্রেস নীচাশয়তা ও ন্যায়বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মোসলেম লীগকে বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গেলেও ত ঐ নীচাশয়তা ও ন্যায়বুদ্ধিহীনতার প্রভাবে কংগ্রেস ভাগ-বাঁটোয়ারার সমর্থক নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া মোসলেম লীগকে বঞ্চিত করিতে পারেন? এরূপ প্রতারণা নিবারণের উপায় কি? কংগ্রেসের সততার উপর যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে কোন উপায় অবলম্বনের কথাই উঠে না। যদি কংগ্রেসের সততার উপর নির্ভর করা না-যায়, তাহা হইলে একমাত্র উপায় এই হইতে পারে, যে, মোসলেম লীগ কংগ্রেসের বা অন্য কাহারও সাহায্য না-লইয়া স্বয়ং নিজের পৌরুষে স্বরাজ অর্জ্জন করুন ও স্বয়ং স্বরাজ ভোগ করুন—কংগ্রেসের বা অন্য কাহারও তাহাতে ভাগ বসাইবার ন্যায্য দাবী থাকিবে না; মোসলেম লীগ তাহাদিগকে কিছু নাই দিলেন? তাহারা হাত পাতিবে না।"

—

সকলের, না সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বাধীনতা

মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, কোন দেশের স্বাধীনতার মানে তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের ('মেজরিটি'র) শাসন ও স্বাধীনতা নহে, তাহার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সকলেরই স্বাধীনতা। কোন দেশের স্বাধীনতার মানে নিশ্চয়ই তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠ সকলেরই স্বাধীনতা। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও শাসনপ্রণালী (যাহা মিঃ জিন্না এবং মোসলেম লীগও চান) অনুসারে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই শাসন প্রচলিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ কথাটির গণতান্ত্রিক অর্থ বুঝিলেই সংখ্যালঘু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা শ্রেণীর আশঙ্কা দূরীভূত হইতে বা খুব কমিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীতে এক-একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য বা জাতিগত বা বৃত্তি অনুযায়ী কোন সমষ্টির জন্য ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে না। তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু সদস্য এত, মুসলমান সদস্য এত, খ্রীষ্টীয় সদস্য এত, বৌদ্ধ সদস্য এত, এরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে না। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি মত অনুসারে কোন বার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের পর কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মত অবলম্বী সদস্য বেশী হয়, কোন বার বা কম হয়। এই জন্য যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় কোন বার সংখ্যালঘু তাহারা তাহার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে। এই জন্য ও এই প্রকারে, মিঃ জিন্না সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা যে অত্যাচারের সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন, তাহা নিবারিত হয়, এবং তাহা কখন ঘটিলেও স্থায়ী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদের বা আসনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইলে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অধিকতম সংখ্যক আসন পাইলে, তাহাদের দ্বারা অত্যাচার সম্ভবপর হয়। বঙ্গদেশের হিন্দুরা এবং বিবেচক নিরপেক্ষ মুসলমানেরা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিবারণের আর একটা উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা এবং সংখ্যালঘু কয়েকটি লোক-সমষ্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা। ভারতশাসন আইনে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য সকল জাতি (রেস্) ও সম্প্রদায়ের লোকদের মোট সংখ্যার চেয়ে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। তাহারা শতকরা ৭০ জনের উপর। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশী রাজ্যগুলির রাজাদের সমষ্টি, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের সমষ্টি, ও ভারতীয় মুসলমান প্রভৃতির সমষ্টিকে হিন্দুদের সমষ্টির চেয়ে অনেক বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে সংখ্যা-লঘুতে পরিণত করা হইয়াছে। হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচার হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যে তাহাদিগকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হইয়াছে তাহা নহে। প্রধানতঃ তাহারাই স্বাধীনতা চায় এবং স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্বপণ প্রাণপণ করে এই জন্য তাহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা কমাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদিগকে কম আসন দেওয়া হইয়াছে।

আর যদি সত্য সত্যই তাহাদের দ্বারা অত্যাচারের আশঙ্কা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য যাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কি অত্যাচার হইতে পারে না? হিন্দুরা অত্যাচারী হউক বা অত্যাচার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হউক, ইহা আমরা চাই না। কিন্তু তাহারা অত্যাচরিত হউক, বা তাহাদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা ঘটুক, ইহাই কি বাঞ্ছনীয়, না, এরূপ ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে?

—

অত্যাচার নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়

মিঃ জিন্না সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা অত্যাচার চান না, কংগ্রেসওয়ালারা চান না, আমরাও চাই না। কোনও অত্যাচারই একদিনের জন্যও কাহারও উপর যাহাতে না হইতে পারে, এমন কোন শাসনপ্রণালী এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অত্যাচার না-হওয়া শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করে অত্যাচার যাহাদের দ্বারা হইতে পারে তাহাদের ন্যায়বুদ্ধি, মানবিকতা ও মানব-ভ্রাতৃত্ববোধের উপর এবং যাহাদের উপর অত্যাচার হইতে পারে তাহাদের অত্যাচার-অসহিষ্ণু

অত্যাচার-প্রতিরোধক পৌরুষের উপর। কিন্তু যদি কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষহেতু অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে, তাহা গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী। এই প্রণালী অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমষ্টি পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের দেশের দৃষ্টান্ত লইলে বলিতে হয়, ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী ও প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনপ্রণালী গণতান্ত্রিক হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দলগুলি কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমান বা কেবল অন্য কোন সম্প্রদায়েরই লোক থাকিবে না, প্রত্যেক দলেই নানা সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোক থাকিবে—কখন বেশী, কখন কম। এবং যে-সদস্য যে-ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, তাঁহাকে নিজ ধর্ম্মাবলম্বী ভোটারদের মত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভোটারদের ভোটের উপরও নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনপ্রণালী অনুসারে নির্ব্বাচিত সদস্যেরা যেমন কেবল নিজ সম্প্রদায়ের ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়ায় বেপরোয়াভাবে অন্য সব সম্প্রদায়ের অভিযোগ দুঃখ স্বার্থ অবহেলা করিতে পারেন এবং নির্লজ্জভাবে নিজ সম্প্রদায়ের আব্দার ও অত্যাচার সমর্থন করিতে পারেন, গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনপ্রণালীতে নির্ব্বাচিত সদস্যেরা তাহা করিতে পারিবেন না।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা অত্যাচার নিবারণের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন ব্যতিরেকে, স্বরাজ-লাভের আগে বা পরে কংগ্রেসকে যে-কোন চুক্তিতেই আবদ্ধ করা যাক্ না, তাহার দ্বারা অত্যাচার নিবারিত হইবে না। যদি সংখ্যালঘুদিগকে ন্যায্য পাওনার চেয়ে বেশী সদস্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহারা হয় তাহাতেও সংখ্যালঘু থাকিবে, সুতরাং তাহাদের অত্যাচরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, নতুবা তাহাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া অত্যাচারী হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মত গণতন্ত্রবিরোধী (anti-democratic) ও স্বাজাতিকতাবিরোধী (anti-national) ব্যবস্থাও সহ্য করিয়া এবং অন্য অনেক রকমে বিস্তর হিন্দুকে অসন্তুষ্ট করিয়া, কংগ্রেস মুসলমানদের মন রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মন পাইতেছেন না।

—

অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যবস্থা

মিঃ জিন্না ইংলণ্ড, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের সংখ্যালঘু সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা করিবার উদ্দেশ্যটা তাঁহার কি ছিল জানি না। কি উপায়ে সেই সব দেশে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহা তিনি বলেন নাই। এই জন্যই কি বলেন নাই, যে, সেই সব দেশে সমস্যাটার সমাধানার্থ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার মত কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচন নাই, সাম্প্রদায়িক আসন-সংরক্ষণ নাই, সংখ্যালঘুদিগকে ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি দিয়া তাহাদের ওজন বাড়ান হয় নাই? তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্যান সংখ্যালঘুদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের জন্যও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মত কোন ব্যবস্থা নাই। তা ছাড়া, তাহারা রাষ্ট্রে জাতি হিসাবে এবং ভিন্ন-ভাষাভাষী বলিয়া সংখ্যালঘুসমষ্টি (racial and linguistic minority), ভারতবর্ষে মুসলমানেরা তাহা নহে। ভারতবর্ষীয় প্রায় আট কোটি মুসলমানের মধ্যে বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর অল্পসংখ্যক ও তাহাদের মধ্যেও ভারতীয় রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে, এবং যাহারা বা যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতীয় কোন-না-কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাই বেশী। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান যে-সব ভাষা মুসলমানেরা ব্যবহার করে, হিন্দুরাও তাহা করে—উর্দ্দুও কেবল মুসলমানদেরই ভাষা নহে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু উহা ব্যবহার করে। অতএব চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্ম্যানদের মত ভারতবর্ষে মুসলমানরা জাতিক (racial) ও ভাষিক (linguistic) সংখ্যালঘু সমষ্টি নহে।

মিঃ জিন্না সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক অধিকার রক্ষার কথা তুলিয়াছেন। ভাষার কথা আগেই বলিয়াছি। মুসলমানদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে, গবর্মেণ্ট, হিন্দুরা, কংগ্রেস—কেহই চায় নাই। সুতরাং এ-বিষয়ে তাহাদের আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। গোবধ করা যদি ইসলামের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হয় (ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে), তাহা হইলে ইহা যেমন সত্য, যে, কোথাও কোথাও হিন্দুরা ইহাতে বাধা দিয়াছে, তেমনি ইহাও সত্য যে মুসলমানেরা হিন্দুদের নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে তদপেক্ষা বেশী বাধা দিয়াছে ও ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। পরমতসহিষ্ণুতা ও ঔদার্য্য কাহার বেশী কাহার কম, সে বিষয়ে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই।

মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠেরা নিজেদের সংস্কৃতি ও আদর্শ সংখ্যালঘুদের উপর চাপাইয়া দিতে পারে। হিন্দুরা নিজেদের সংস্কৃতি ও আদর্শ কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে চায় না। যাহারা প্রচারশীল ধর্ম্মসমূহে (missionary religionsএ) বিশ্বাস করে, যেমন খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান, তাহারাই ইহা বেশী করে। হিন্দুরা কিছুদিন হইতে যে ইহা করিতেছে তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অন্যদের অনুকরণ। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদের পক্ষে যাহা আইনসঙ্গত, হিন্দুদের

পক্ষেও তাহা আইনসঙ্গত। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না-করিয়া বা না-করাইয়া যে সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, আইন দ্বারা বা চুক্তি ও বাঁটোয়ারা দ্বারা তাহা বন্ধ করা যায় না।

মিঃ জিন্না ও অন্য অনেক মুসলমান ও অনেক হিন্দু যে পরিচ্ছদে ও অন্য কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য 'কাল্‌চ্যার' ও "সভ্যতার" নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে স্থলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন সম্প্রদায় তাহাদের উপর তাহা চাপায় নাই।

মুসলমান শাসনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান কাল্‌চ্যারের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এখন আবার পাশ্চাত্য কাল্‌চ্যারের সহিত হিন্দু ও মুসলমান কাল্‌চ্যারের মিশ্রণ ঘটিতেছে। অবশ্য, ইহার একটা কারণ, এক সময়ে মুসলমানরা ভারতবর্ষের অনেক অংশে প্রভুত্ব করিত এবং এখন ইংরেজরা করে। কিন্তু পাশ্চাত্য নানা দেশে এখন যে ক্রমশঃ লোকদের উপর ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব বাড়িয়া চলিতেছে এবং আগে যে চীন কোরিয়া ও জাপানের উপর তাহা পড়িয়াছিল, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব তাহার কারণ নহে; কারণটি ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। হিন্দু রাজা না হইয়াও যদি অতীতে মুসলমানকে প্রভাবিত করিয়া থাকে, এখন যদি করিতেছে, বা ভবিষ্যতে করে, তাহা মিঃ জিন্নার বা মোসলেম লীগের ভাল না লাগিলে উপায় কি? কোন আইন, চুক্তি বা সর্ত্তের দ্বারা ইহা নিবারিত হইবে না।

—

মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিত্ব

মিঃ জিন্না ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের সমষ্টিগত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিত্ব চান। কিন্তু অন্য কোন দেশেই কোন সংখ্যালঘু জনসমষ্টিরই এরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, বা সেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সংখ্যালঘুদের ভাষিক, ধাম্মিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করাই লীগ অব নেশ্যন্সের প্রভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার্থ ব্যবস্থিত সন্ধিগুলির (Minority Guarantee Treaties-এর) উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞেরা ও লীগ অব নেশ্যন্স সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্র সৃষ্টির (creation of a State within a State-এর) বিরোধী। কিন্তু মিঃ জিন্না তাহাই চাহিতেছেন। একটি সম্প্রদায়ের আলাদা রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিত্ব স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা করিলে সেই সব সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা হইতে পারে না; তাহারা নিজেদের দলগত সাধারণ সাংসারিক সুবিধাই দেখিবে। ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষতিলাভগণনা লইয়া যাহারা ব্যস্ত, স্বদেশ উদ্ধার তাহাদের কর্ম্ম নয়, সাধ্যও নয়।

মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা যাহাতে আপনাদিগকে কেবল পৌরজন (citizen) মনে করিতে পারে, এইরূপ মনোভাব জন্মান আমাদের কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ইহাই যে আদর্শ তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আলাদা আলাদা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহা কিরূপে সম্ভব? তিনি আরও বলিয়াছেন, যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বলিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করা অপরাধ নয়, যদি তদ্দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভের ব্যাঘাত না-হয়, এবং অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি না-করা হয়। কিন্তু মোসলেম লীগের মত সাম্প্রদায়িক সমিতির দ্বারা স্বাধীনতা লাভের ব্যাঘাত হইয়াছে ও হইবে, এবং মুসলমানেরা সংখ্যা অনুসারে ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা বেশী যাহা পাইয়াছেন, হিন্দুদের ক্ষতি করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

—

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের পর্ব্ব উপলক্ষে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছুটি থাকে। সেই ছুটির সময় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন পাটনায় হইবে। সরকারী বিহার প্রদেশের মধ্যে বাংলাভাষাভাষী লোকদের বাসভূমি অনেক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ বিহার প্রদেশে বহু লক্ষ বাঙালীর বাস। ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভের আগে হইতেই বাংলার সহিত বিহারের শাসনসম্বন্ধীয় যোগ ছিল। ইংরেজশাসনকালে সেই যোগ ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকে। এই কারণে খাস বিহারে বিস্তর বাঙালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যাইতে থাকেন। তাঁহাদের অনেকে পুরুষানুক্রমে তথায় বাস করিতেছেন। নূতন করিয়া বিহারে বাঙালীর গমন ও তথায় বসবাসও এখনও চলিতেছে।

এই সকল কারণে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন অনেক বাঙালী সরকারী বিহার প্রদেশে বাস করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা, কর্ম্মদক্ষতা এবং আর্থিক সামর্থ্য—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, বিহারের বাঙালীদের তাহা আছে। সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতবিদ্য, কৃতী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া নিশ্চিত আশা করা যাইতে পারে। উপসমিতিগুলিও সুবিবেচনা পূর্ব্বক গঠিত হইয়াছে। মহিলা-বিভাগের গঠনও সুবিবেচিত হইয়াছে। ডক্টর প্রশান্তকুমার সেন মহাশয়ের পত্নী প্রভৃতি বহুমহিলা তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অধিবেশনের মূল সভাপতি, মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী, এবং সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসাদি বিভাগের সভাপতি-দিগের নির্ব্বাচন পরে হইবে।

নির্ব্বাচিত প্রবন্ধগুলি সমুদয় পঠিত হইবার ব্যবস্থা হইলে ভালই হয়। তাহা সম্ভবপর না-হইলে প্রত্যেকটির সারমর্ম্ম পঠিত হওয়া আবশ্যক। যে-সব প্রবন্ধের আলোচনা আবশ্যক, তাহার আলোচনার নিমিত্ত যথেষ্ট সময় দিতে পারিলে ভাল হয়।

—

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই একাধিক বার লিখিয়াছি। এ বিষয়ে কয়েক মাস পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিসভার অধিবেশনের সময় যখন উদ্যোক্তাদিগের সহিত আমাদের কথা হয়, তখনই তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে, অধিবেশন সম্ভবতঃ মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের আরম্ভে ইংরেজী ফেব্রুয়ারি মাসে হইবে। এখন শুনিতেছি, যে, অধিবেশনের জন্য ২৯শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি, এই দুটি দিন নির্দ্ধারিত হইবে। ইহা আগে হইতেই এক প্রকার স্থির ছিল। ১৫ই আশ্বিন অভ্যর্থনা-সমিতির যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে যথারীতি তারিখগুলি স্থির করা হইবে। আমরা আগেই লিখিয়াছি, কৃষ্ণনগরের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইবার আশা করা স্বাভাবিক।

—

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি কে হইবেন

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি কে হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা একাধিক বার বলিয়াছি। আমাদের মতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকেই সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত। কেন উচিত, সে বিষয়ে আমাদের যুক্তিও আমরা সর্ব্বসাধারণকে বাংলায় ও ইংরেজীতে জানাইয়াছি। তাহা কেহ খণ্ডন করেন নাই, করিবার চেষ্টাও করেন নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু উভয়েই এবং অন্য কোন কোন নেতাও সুভাষ বাবুকেই সভাপতি নির্ব্বাচন করার পক্ষে। এই সংবাদের কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

তাহার পর সম্প্রতি এই খবর বাহির হইয়াছে, যে, অনেক নেতা (তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীজী ও পণ্ডিতজী আছেন কি না প্রকাশিত হয় নাই) এবার সুভাষ বাবুকে সভাপতি না-করিয়া কোন মুসলমানকে করিতে চান। সুভাষ বাবুকে না-করার কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নাই, এবং কোন মুসলমানকে করার কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, অনেক বৎসর কোন মুসলমানকে সভাপতি করা হয় নাই, এবং মুসলমান জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার দ্বারা কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যের সংখ্যা বাড়ান আবশ্যক ও কোন মুসলমানকে সভাপতি করিলে এই বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িবে।

সুভাষ বাবুর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য কোন কুস্তিগীর পালোয়ানের মত নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান চিকিৎসক বলিয়াছেন, তিনি আগামী নবেম্বরের মাঝামাঝি নিরাময় হইবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে ফেব্রুয়ারিতে। সুতরাং তখন কংগ্রেসের সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সুভাষ বাবু সমর্থ হইবেন। সাধারণ ভাবে ইহাও বিবেচ্য, যে, কাহার স্বাস্থ্য কোন্ সময় কি রকম কাজের উপযোগী তাহা বিবেচনা করিবার ভার তাঁহার ও তাঁহার চিকিৎসকদের উপরই থাকা উচিত; অন্যদের সে বিষয়ে কিছু বলা অনধিকারচর্চ্চা ও 'আধিক্ষেতা'।

সুভাষ বাবুকে এবার কি কি কারণে সভাপতি করা উচিত, তাহা আগে আগে লিখিয়াছি। প্রধান দুটা কারণের উল্লেখ করিতেছি। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সভাপতি হইয়াছেন তাঁহাদের কাহারও সহিত সুভাষ বাবুর তুলনা করিতে চাই না। যাঁহারা একবার সভাপতি হইয়াছেন, অন্য যোগ্য লোক থাকিতে তাঁহাদের কাহাকেও সভাপতি করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। সকল যোগ্য লোকদের সেবাই যথাসম্ভব গ্রহণ করা দেশের কর্ত্তব্য; কেন-না, যোগ্যতম ব্যক্তির দ্বারাও সম্পূর্ণ সেবা ও সকল রকম সেবা হইতে পারে না। ইহা বিবেচনা করিয়া, যে-সকল নেতা এখনও সভাপতি হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে সুভাষবাবুর স্থান কোথায় তাহাই দেখা উচিত। আমাদের বিবেচনায় তিনি তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতম। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতায়, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সুবিবেচকতায় তাঁহার যোগ্যতা ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম নহে। দেশের জন্য তাঁহার স্বার্থত্যাগ, দুঃখবরণ ও নির্য্যাতনসহন ইঁহাদের মধ্যে অনতিক্রান্ত। আধুনিক সময়ে কোন দেশের—বিশেষতঃ কোন পরাধীন দেশের, কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা, রাষ্ট্রনীতির গতি, ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহের লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান কংগ্রেসনেতাদের কাহারও সুভাষবাবু অপেক্ষা অধিক নহে।

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী বার-বার বা ঘনঘন পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত জবাহরলাল যে-ভাবে কাজ চালাইতেছেন, সুভাষবাবুর রাষ্ট্রনৈতিক মত মোটের উপর

তাহার সমর্থক। তিনি এক দিকে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেসের সদস্যদের দ্বারা যে-যে কাজ হইতে পারে, তাহা হইতে স্বাধীনতা প্রচেষ্টার যে সুবিধা হইতে পারে এবং সাধারণ লোকদের অবস্থার যে উন্নতি হইতে পারে, তাহার সপক্ষে, অন্য দিকে তিনি জনগণকে—বিশেষতঃ কৃষক ও কারখানার শ্রমিকদিগকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতাপ্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে।

যে-উদ্দেশ্যে এক জন মুসলমানকে এবার সভাপতি করিবার কথা উঠিয়াছে, তাহার সহিত সুভাষবাবুর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি বুঝেন, মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দিলে কংগ্রেসের শক্তি ও ফললাভসামর্থ্য বাড়িবে। আমরাও ইহা বুঝি। মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মত। ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী এবং তাহারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং সুভাষবাবু, অন্য যে-কোন কংগ্রেসী বাঙালীর মত, মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের মধ্যে আনা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন না, বরং বিশেষ আগ্রহান্বিত। সুতরাং কোন মুসলমানকে সভাপতি করিলে মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে আনিবার চেষ্টা যেরূপ হইবে, সুভাষবাবুকে করিলে সেরূপ হইবে না, ইহা মনে করা ভুল। মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে আনিতে হইলে বহু মুসলমান কর্ম্মীর আবশ্যক, এক জন মুসলমানকে সভাপতি করিলেই কার্য্য উদ্ধার হইয়া যাইবে, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে আনা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত কংগ্রেসনেতা মাত্রেই মুসলমান কর্ম্মী সংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারিবেন—তাঁহার ধর্ম্মমত যাহাই হউক।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কংগ্রেসের বিশেষ কোন একটি কর্ত্তব্যের উপরই দৃষ্টি রাখিয়া সভাপতি নির্ব্বাচন করা সমীচীন নহে। কোন অধিবেশনে আলোচ্য বিবেচ্য ও নির্দ্ধারণীয় সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য সুভাষ বাবুকে সভাপতি নির্ব্বাচন করাই সমীচীন।

বলা হইয়াছে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমানকে সভাপতি করা হয় নাই। কিন্তু শুধু এরূপ কারণে কাহাকেও সভাপতি করা যাইতে পারে না। তাহা যদি করা হয়, তাহা হইলে ত বলা যাইতে পারে, কোন বাঙালীকে তাহা অপেক্ষাও অধিক বৎসর সভাপতি করা হয় নাই। এমন কোন কোন ভাষিক প্রদেশ আছে, যাহা হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরই কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। এক-একটি সম্প্রদায়ের দাবী যদি এইরূপে বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে শিখ ও ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কথা উঠে না কেন?

যাঁহারা এক জন মুসলমানকে এবার সভাপতি করিতে চান, তাঁহারা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নাম করিয়াছেন। মৌলানা সাহেবের যোগ্যতার এবং কংগ্রেসের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে তিনি ১৯২৩ সালে দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন, এবং ১৯৩০ সালে তিনি আবার কার্য্যকারী (Acting) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সুভাষ বাবুর মত যোগ্য লোককে একবারও নির্ব্বাচন করা হয় নাই।

—

পদ্ম ও 'শ্রী'

সরকারী লোকেরা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা কয়েক জনে মিলিয়া পদ্ম ও "শ্রী" সম্বন্ধে বিচার করিবেন। তর্কের জের মিটিতেছে না। পদ্ম যে আলঙ্কারিক ভাবে মসজিদগাত্রেও ব্যবহৃত হয়, তাহা মুসলমানেরাও জানেন। কোন মসজিদের কোন অংশের ছবি দিয়া তাহা বুঝান অনাবশ্যক। 'শ্রী' শব্দটি যে কোন কোন মুসলমান বাদশাহ নিজ নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন, তাহাও সুবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। তাঁহাদের মুদ্রাতে উহা দৃষ্ট হয়। পৌত্তলিকতা নাশ যাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন কোন কোন বাদশাহও ইহা করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) সম্বন্ধীয় বহিতে সেই সব মুদ্রার ছবি আছে। তাহা অবশ্য সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকদের নিকটও থাকে না, ভাল ভাল লাইব্রেরীতে আছে। এই প্রকারের কিছু ছবি ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংঘী মহাশয়ের প্রবন্ধটিতে দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুনর্মুদ্রণ অনাবশ্যক।

হিন্দুরা পদ্মফুলের পূজা করেন না, তাহার ছবিরও পূজা করেন না। "শ্রী" শব্দটিরও পূজা করেন না। পদ্মফুলের ছবি ও "শ্রী" শব্দটি একত্র করিয়াও উভয়ের পূজা করেন না। পদ্মফুল ও "শ্রী"র একত্র সমাবেশ কোন দেবতার পূজা বুঝাইবার জন্য করা হয় নাই। তাহা হইলে যে মুসলমান ভাইস্-চ্যান্সেলরের আমলে এই চিহ্নটি অনুমোদিত হয়, তিনি ইহাতে আপত্তি করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাহা উদ্দেশ্য, শুচিতা ও শ্রী লাভ, তাহাই পদ্মফুলের মধ্যে "শ্রী" চিহ্নের দ্যোতনা।

মুসলমানরা একেশ্বরবাদী, অতএব তাঁহারা পদ্ম ও "শ্রী" ব্যবহার করিলে পৌত্তলিক ভাবে করেন না, ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ভাবে

করেন না, হিন্দুরা তাহা করিলেই পৌত্তলিক ভাবে করেন, এরূপ মনে করা ধর্ম্মান্ধতা মাত্র। হিন্দু হইলেই সে পৌত্তলিক, ইহাও ভ্রম। মূর্ত্তিপূজক মাত্রেই পৌত্তলিক ও অধম, ইহা মনে করাও ভ্রম ও দাম্ভিকতা। রামপ্রসাদ ও তুকারাম কি ধার্ম্মিক ছিলেন না? পরমহংস রামকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ছিলেন না?

কোন শব্দের একটা অর্থ দেবতাবাচক হইলেই একেশ্বরবাদীরা তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না, এমন নয়। মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যবহৃত ঈশ্বরবাচক একটি শব্দ পূর্ব্বে মূর্ত্তিবিশেষবাচক ছিল, ইহা মৌলানা আক্রম খান্ সাহেবের একটি রচনায় আছে বলিয়া মৌলবী রেজাউল করীম সাহেব "দেশ" কাগজে লিখিয়াছেন। পদ্ম ও শ্রীর বিরোধী সব মুসলমানের তাঁহার প্রবন্ধটি পড় উচিত। "লক্ষ্মী" কথাটি দেবীবিশেষবাচক, কিন্তু বাংলায় সচরাচর "লক্ষ্মী ছেলে", "মেয়েটি বড় লক্ষ্মী", "লোকটি লক্ষ্মীমন্ত", বলা হয়। যাঁহারা লক্ষ্মীপূজা করেন না, তাঁহারাও এরূপ বলিয়া থাকেন। "শ্রীমন্ত", "শ্রীমান", শব্দগুলি তাঁহারাও ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথ যে নিজে নিজের নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করেন না, তাহার কারণ এ নয়, যে, "শ্রী" কোন দেবীর নাম; তাহার কারণ তিনি নিজে বলিতে চান না যে তিনি "শ্রী"মন্ত। বস্তুতঃ অন্য অনেকেও যে নিজের নামের আগে নিজেই শ্রী লেখেন, তাহাতে অহঙ্কার প্রকাশ হয় না এই জন্য, যে, তাঁহারা গতানুগতিক ভাবে ইহা লেখেন, "শ্রী" ব্যবহারের অর্থ কি তাহা ভাবিয়া লেখেন না।

মুসলমানদের মধ্যে যেমন আগে অনেকে নামের পূর্ব্বে "শ্রী" লিখিতেন, এখনও তেমনি অনেকে লেখেন। ইহার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক হইলেও অকস্মাৎ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আমাদের নিকট বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত যে চিঠিখানি আসে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি উহাতে লিখিয়াছেন, যে, প্রবাসীতে "শ্রী" ও "পদ্ম" সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের তাঁহাকে লেখা মূল বাংলা চিঠিখানি আমাকে পাঠাইতেছেন; তাহাতে তাঁহার নামের আগে "শ্রী" দিয়া তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন। মুসলমান ভদ্রলোকটির এই চিঠিটির তারিখ এই বৎসরেরই ৫ই সেপ্টেম্বর। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, বীরভূম অঞ্চলের পল্লীগ্রামের অনেক মুসলমান এখনও নামের পূর্ব্বে "শ্রী" ব্যবহার করেন। তিনি যাঁহার চিঠিখানি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে লোক্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর ছিলেন এবং এখনও একটি ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আছেন। তাঁহার চিঠিটির, প্রতিলিপি মুদ্রিত করায় তাঁহার আপত্তি হইবে কি না না-জানায়, প্রতিলিপি দিলাম না, তাঁহার নামেরও উল্লেখ করিলাম না।

মুসলমানদিগের ব্যবহৃত নক্ষত্রভূষিত অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নযুক্ত পতাকার ব্যবহারের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহা ইসলামিক যুগের আরম্ভকাল হইতে ব্যবহৃত হইত না। তাহা আগে একটি "পৌত্তলিক" প্রতীক ছিল। কিন্তু কন্সটাণ্টিনোপল জয়ের পর হইতে তাহা মুসলমান তুর্করা ব্যবহার করিতে থাকে। এখনও খিলাফৎ কনফারেন্সওয়ালা মুসলমানেরা তাহা ব্যবহার করেন এবং খিলাফৎ কনফারেন্সের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত যোগ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মগত যোগ নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নহে। ইহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং অজ্ঞেয়তাবাদী ও নাস্তিকদেরও বিদ্যা অর্জ্জনের প্রতিষ্ঠান। ইহাতে "পদ্ম" ও "শ্রী" ব্যবহারে আপত্তি হইতেছে, অথচ মুসলমান পতাকায়, খিলাফতীদের টুপিতে মূলতঃ পৌত্তলিক প্রতীক তারকাখচিত চন্দ্রকলা ব্যবহারে আপত্তি হইতেছে না!

হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিদ্বেষ জন্মাইবার এই সকল চেষ্টা শোচনীয়। নিজ নিজ পৌরুষে যাঁহারা দেশের রাজা হইয়াছিলেন সেই বাদশাহেরা যাহা ব্যবহার করিতেন, হিন্দুরা তাহা করায়, ইংরেজের অনুগ্রহলব্ধ ক্ষমতা পাইয়া কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোক সোরগোল জুড়িয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত বয়নাগার

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর বাণীভবন-প্রাঙ্গণে ভগিনী নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বয়নগৃহের দ্বারমোচনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই গৃহটি শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়া নিজব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং তাহাতে অনেকগুলি তাঁত বসাইয়াছেন। গৃহটির ভিতর ভগিনী নিবেদিতার একটি আলেখ্য স্থাপিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানের মন্ত্রপাঠাদি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় করেন। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার মহোদয়া ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন, এবং প্রবাসীর সম্পাদকও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলেন। বাণীভবনের প্রবেশদ্বারে এবং অনুষ্ঠানমণ্ডপে আলিপনা সুন্দর হইয়াছিল।

এই বয়নাগারটি ভগিনী নিবেদিতার ভারতভক্তির, ভারতীয় শিল্পানুরাগের, ও শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়ার তাঁহার সহিত সখ্যের নিদর্শন হইয়া থাকিবে, এবং বাণীভবনের বহু ছাত্রীর বয়নশিল্প শিক্ষার উপায়স্বরূপ হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

রাজশাহী কলেজের ব্যাপার

রাজশাহী কলেজের ব্যাপারটা আগাগোড়াই শোচনীয় ও লজ্জাকর।

ভারতবর্ষে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা একত্র জীবন-যাপন করুন, ইহা আমরা কাহারও চেয়ে কম চাই না। কিন্তু যত দিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকদের খাদ্যাখাদ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবাদের কারণ থাকিবে, তত দিন যাহা বাস্তব অবস্থা তাহা মানিয়া লইয়া তদনুরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা শান্তিরক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত ছাত্রাবাসে দুটি মুসলমান ছেলেকে না রাখিয়া সহজেই অন্যত্র রাখা যাইত। তাহাদিগকে হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত ছাত্রাবাসে রাখিবার জিদ না করিলে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিত না। খবরের কাগজে প্রকাশিত শিক্ষামন্ত্রীর টেলিগ্রাম দুটি হইতে দেখা যায়, যে, তিনি তাঁহার পদোচিত নিরপেক্ষতা ভুলিয়া গিয়া আগে হইতেই মুসলমান ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কলেজ বন্ধ করিবার হুকুম প্রকাশিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে কলেজ বন্ধ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশাহী গিয়া উভয় পক্ষের ও উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের কথা শুনিয়া যেরূপ মীমাংসা করিবেন, তদনুসারে কাজ হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যভাবে দিয়া পরে শিক্ষামন্ত্রী ডিগবাজী খাইয়া অন্যরূপ কথা বলায় শরৎবাবু ও প্রমথ বাবু রাজশাহী যান নাই, গবর্ন্মেণ্ট অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রী একটা খামখেয়ালী হুকুম দিয়াছেন। হিন্দু ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত ৫টা ব্লকের মধ্যে ১টা মুসলমানদের জন্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের যে ব্লক আগে হইতে ছিল, তাহাও তাহাদের রহিল। হুকুম হইয়াছে যে যে-সব ছাত্র হষ্টেলে থাকিবে তাহাদিগকে এই বন্দোবস্তে ও গবর্ন্মেণ্টের ভবিষ্যৎ যে-কোন বন্দোবস্তে স্বীকৃতি লিখিয়া দিতে হইবে। ফলে, যদিও কলেজ খোলা হইয়াছে, তথাপি একটিও হিন্দু ছাত্র হষ্টেলে যায় নাই। তাহারা যে পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃতিরূপ দাসখত লিখিয়া দেয় নাই, ভালই করিয়াছে। তাহারা শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান হষ্টেলগুলি গবর্ন্মেণ্টের টাকায় নির্ম্মিত হইয়া থাকিলেও উহাদের নাম সরকারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে হিন্দু ও মুসলমান ব্লক বলিয়াই উল্লিখিত আছে। গবর্ন্মেণ্ট টাকা দিয়াছেন বলিয়াই কি যা খুশী তাই করিতে পারেন? কলিকাতার ক্লোর হষ্টেলে হিন্দু ছাত্র এবং ইডেন হিন্দু হষ্টেলে মুসলমান ছাত্র রাখিতে পারেন? গবর্ন্মেণ্ট যে টাকা দিয়াছেন, তাহা বঙ্গের রাজস্ব হইতে, এবং বঙ্গের রাজস্বের টাকার বার আনা হিন্দুর দেওয়া। আজ না-হয় গবর্ন্মেণ্টের অনুগ্রহে শিক্ষামন্ত্রী দু-দিনের জন্য কিছু ক্ষমতা পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ লোকের মাথা খারাপ হওয়া উচিত হয় নাই।

হিন্দুরা টাকা দিয়াছিলেন বলিয়াই রাজশাহী কলেজ হইয়াছিল। কলেজ না-হইলে হষ্টেলের দরকার হইত না, হষ্টেলও হইত না। হিন্দুরা দেখিয়া শিখুন। তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে বলিতেছি না। তাঁহারা অর্থব্যয় করুন সকলের জন্য; কিন্তু অতঃপর ক্ষমতা যেন নিজের হাতে রাখেন। ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া, বাস্তবিক অনুগ্রহজীবী না হইয়াও, ভিখারীর লাঞ্ছনা কেন ভোগ করেন?

—

'আনন্দমঠ' দাহন

যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষপ্রণোদিত ব্যবহার তাঁহার অনুমোদিত হইবে না যদি তিনি বিবেচক ও প্রকৃত ধার্ম্মিক হন। 'আনন্দমঠ' যে পোড়ান হইয়াছে, মুসলমানই তাহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রতিবাদ করায় মুসলমানের মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। কোন উপন্যাসে বা নাটকে এক সম্প্রদায়ের কোন কল্পিত লোক অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ-সূচক কথা বলিলে, তাহার দ্বারা ঐ পুস্তক-বর্ণিত সময়ে সাম্প্রদায়িক পারস্পরিক মনোভাব সূচিত হয়। এরূপ মনোভাব নিন্দনীয়। কিন্তু যে পুস্তকে তাহা সূচিত হয়, সে জন্য তাহা পুড়াইয়া ফেলা অনুচিত। ইহুদীদের প্রতি কুবাক্য আছে বলিয়া শেক্সপিয়রের মার্চ্যাণ্ট অব্ ভীনিস দগ্ধ হয় নাই। বিস্তর ঐতিহাসিক বহিতে পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহম্মদের নিন্দা আছে। এই নিন্দার নিন্দা হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল পুস্তক দগ্ধ হয় নাই।

—

মন্দির কলুষিত, মূর্ত্তি ভগ্ন

হিন্দুদের মন্দির কলুষিত করিতেছে, দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিতেছে মুসলমাননামধারী গুণ্ডারা, "আনন্দমঠ" দাহনের প্রতিবাদকারী বিবেচক মুসলমানের মত কোন মুসলমান তাহা করেন নাই। গবর্ণর বা মুসলমান মন্ত্রীরা যে এরূপ গুণ্ডামির যথোচিত প্রতিকার করিতেছেন না, তাহা নিন্দনীয়।

—

সিঙ্গুরে প্রসূতিভবন

পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পত্নী

স্বর্ণপ্রভা মল্লিক মহোদয়া তাঁহাদের আদি নিবাস সিঙ্গুর গ্রামে একটি প্রসূতিভবন নির্ম্মাণের নিমিত্ত বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মল্লিক মহাশয় জীবিতকালে সিঙ্গুরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য আরও অধিক টাকা একাধিক বার দান করিয়াছিলেন। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের জন্য এইরূপ দান করিলে বঙ্গের পল্লীশ্রী আবার ফিরিয়া আসিতে পারে।

—

মহিলা মন্ত্রীর সুসঙ্কল্প

যুক্ত-প্রদেশের মহিলা মন্ত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বুন্দেলখণ্ডে যে সফর করিবেন, তাহা গরুর গাড়ীতে করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি চাষী ও মজুরদের খাদ্য খাইয়া ও তাহাদেরই গৃহে তাহাদেরই মত শয্যায় শুইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের সাধারণ লোকদের অবস্থার সহিত পরিচিত হইবেন। ইনি পিতা মোতীলাল নেহরু মহাশয়ের নাম উজ্জ্বল করিবেন। আমরা এলাহাবাদে শুনিয়াছিলাম, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর ভ্রাতা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এইরূপে কৃষকদের কুটীরে তাহাদের মোটা রুটি খাইয়া ও চাটাইয়ে রাত্রি যাপন করিয়া কিষাণদের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

—

প্রজাদের দরদী ?

নিখিল বঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতি দুটা দলে বিভক্ত হইয়াছে। যে-দলের নেতা ফজলল হক সাহেব, তাহাতে অনেক নবাব খান বাহাদুর অগ্রগরা আছেন। এই দলের এবং অন্য দলেরও সম্ভ্রান্ত লোকেরা কেহ চাষীদের মোটা ভাত ও নুন খাইয়া এবং তাহাদের পর্ণকুটীরে ঘুমাইয়া দরদ দেখাইবেন কি না, ভবিষ্যতে জানা যাইবে।

—

আণ্ডামানের বাঙালী বন্দী

আণ্ডামানের যে অল্পসংখ্যক বাঙালী বন্দীকে দেশে আনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়োপবেশকদিগের এক জনও নাই। প্রায়োপবেশকদিগকে আনা সম্বন্ধে ও তাহাদের অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি সদস্যের সহিত গবর্মেণ্টের যে আলোচনা হইবার কথা, তাহার ফল অচিরে জানা যাইবার সম্ভাবনা।

মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নে যে জানা গিয়াছে, যে, বন্দীদের মধ্যে যাহারা সন্ত্রাসনবাদী ছিল তাহাদের এখন সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই সংবাদ ও অবস্থার সুব্যবহার ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্রীদের করা উচিত ছিল।

—

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের বিবৃতি

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ এ পর্য্যন্ত ত্রিশটি বা ততোধিক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে পাঠকেরা "অন্তরীন" ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত অন্য রাজনৈতিক দুঃখীদের ও তাহাদের অনেকের অভিভাবকদের ঘোর দুর্দশার কথা অবগত হইতেছেন। কয়েক জন অন্তরীণের যে উন্মাদ রোগ হইয়াছে, তাহাও জানা গিয়াছে। প্রতিকার কখন হইবে?

—

বঙ্গের হাজার হাজার যুবকের স্বাধীনতা লোপ বা হ্রাস

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে, যে, চট্টগ্রাম জেলার সাড়ে একুশ হাজার যুবকের গতিবিধি এখনও লাল নীল সাদা টিকিটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহারা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের যুবক। আগে আরও কত জনের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইত কে জানে। মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলায় কত হাজার লোকের এরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানা যায় নাই। প্রায় পাঁচ হাজার লোক "অন্তরীণ" "নজরবন্দী" ইত্যাদি, তাহা আগে জানা গিয়াছিল।

ইহারা সকলেই বিভীষিকাপন্থী ছিল বা আছে, বিশ্বাস হয় না। সকলে বিভীষিকাপন্থী হইলে এপর্য্যন্ত রাজনৈতিক খুন ডাকাতি যত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইত। তবে ইহা হইতে পারে, যে, অনেকেই স্বাধীনতালিপ্সু ছিল।

বঙ্গীয় যুবজন নিষ্পেষিত হয় নাই, হইবে না।

—

জেলা হইতে বিতাড়ন

মানুষকে জেলে বন্দী করা ও "অন্তরীণ" করা অপেক্ষাও এক হিসাবে কঠোরতর অন্য প্রকার শাস্তি বঙ্গে অনেকের হইয়াছে। বিনা বিচারে যাহাদের নিজের নিজের ঘরবাড়ী গ্রাম জেলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ হইয়াছে, তাহাদের এইরূপ কঠোর শাস্তি হইয়াছে। জেলের কয়েদীরা খাইতে পরিতে পায়—তা যেমনই হউক, "অন্তরীণ"রা ভাতা পায়—তা যত কমই হউক। কিন্তু এই বহিষ্কৃত লোকদের রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যায়, অথচ গবর্মেণ্ট তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারবর্গের খাওয়া-পরার কোন ব্যবস্থাই করেন না।

—

সূর্য্যের তাপ ও বালির উত্তাপ

বাংলা দেশের নানা ঘটনা ও অবস্থা বার-বার মনে

পড়াইয়া দিতেছে, যে, সূর্য্যের তাপ যদি-বা সহ্য হয়, সূর্য্যের প্রসাদে প্রাপ্ত বালির তাপ বরদাস্ত করা কঠিন।

—

ক্ষেত্র, ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ক্ষমতা ; জমি ও জোর

গ্রীক পুরাণে ধরিত্রীর পুত্র আন্টিয়স্ নামক এক দানবের গল্প আছে। মহাবীর হারকিউলিস তাহাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না, কারণ যত বার তাহাকে আছাড় দিয়া মাটিতে ফেলিতেছিলেন তত বারই সে মাতা মৃত্তিকার স্পর্শে নূতন বললাভ করিতেছিল। শেষে হারকিউলিস তাহাকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিয়া মৃত্তিকার সহিত সংস্পর্শরহিত অবস্থায় তাহার প্রাণবধ করেন।

—

পঞ্জাবে ও বঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিষ

বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উভয় প্রদেশেরই প্রধান মন্ত্রী মুসলমান। পঞ্জাবে প্রবল সম্প্রদায় তিনটি—মুসলমান, হিন্দু, শিখ; বঙ্গে দুটি—মুসলমান ও হিন্দু। বঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা পঞ্জাবের চেয়ে কঠিন নহে—বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া বিবাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাহা করিতেছেন না। সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কোন কোন উক্তি ও কার্য্য হইতে উহা প্রশ্রয়, এমন কি উস্কানি, পাইতেছে, ইহা নিশ্চিত। অন্য মন্ত্রীরা তাঁহার সহিত একমত কি না জানি না। বিশেষ করিয়া হিন্দু মন্ত্রীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ও দৃঢ় মতের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পরানুগ্রহে ও ভিক্ষা হইতে লব্ধ ক্ষমতায় অনেকে আপাততঃ বলীয়ান হইলেও তাঁহাদেরও বুঝা উচিত, যে, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষ হ্রাসে তাঁহাদেরও কল্যাণ, বৃদ্ধিতে তাঁহাদেরও ক্ষতি।

—

বঙ্গে এবং অন্য কোথাও কোথাও পুলিস

আগে বঙ্গে বৎসরে একবার দু-বার গবর্ণর কর্ত্তৃক পুলিসের প্রশংসা ঘোষিত হইত। পুলিস বে-আইনী কাজ করিলেও হয় শাস্তি হইত না, নয় গোপনে বিভাগীয় তিরস্কার কিংবা প্রকাশ্যে সামান্য সাজা হইত। নূতন আইন অনুসারে বাংলায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পর গবর্ণর কর্ত্তৃক পুলিসের গুণগানের পালার এখনও সময় যায় নাই বোধ হয়। কিন্তু পুলিসের কুলোকেরা বিচারকের দ্বারা নিন্দিত হইলেও, বে-আইনী কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, আগে যেরূপ ব্যবহার গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে পাইত এখনও সেইরূপ পাইতেছে। যাহাদিগকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করিয়া অতিরিক্ত আরও কিছু শাস্তি দেওয়া উচিত, তাহারা দিব্য আরামে চাকরিতে বহাল আছে। সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের খাতিরে (in the public interest) এইরূপ করা হইতেছে! এই মিথ্যা কথাটার মহিমা অপার।

পুলিস না হইলে কোন দেশের শাসনকার্য্য চলে না জানি, পুলিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে সৎলোক আছেন তাহাও জানি। কিন্তু, যে-হেতু বেআইনী দুর্নীতি দমন পুলিসের কাজ, এই জন্য পুলিসের কোন লোক সেই রকম অপরাধে অপরাধী হইলে অন্য ঐরূপ অপরাধীর চেয়ে তাহার বেশী বই কম শাস্তি হওয়া উচিত নয়, রেহাই পাওয়া ত কোন মতেই উচিত নয়।

বঙ্গে পুলিসের সম্বন্ধে সরকারী সাবেক মনোভাব কায়েম আছে। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে পুলিসের কুলোকদের দ্বারা জুলুম অত্যাচার অভদ্রতা নিবারণের চেষ্টা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ন্যায্য ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা সংরক্ষণেরও চেষ্টা হইতেছে। অন্য অনেক বিষয়েও বাংলার চেয়ে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে দেশহিত সাধনে উদ্যোগিতা অধিক দেখা যাইতেছে।

—

চিনি উৎপাদন ও রপ্তানী-নিয়ন্ত্রণের চুক্তি

গত মে মাসে চিনি উৎপাদন ও তাহার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে একটি চুক্তি হয়। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত কোন প্রতিনিধি ছিল না, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মিঃ মীক নামধারী এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে ভারতপ্রতিনিধি সাজান হইয়াছিল। চুক্তির একটা কথা এই, যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও ভারতীয় চিনি রপ্তানী হইতে পারিবে না! এই চুক্তিটা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা অনুমোদন করাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইংরেজ সদস্যেরাও অনুমোদনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। এখন রাষ্ট্রপরিষদ্ যদি অনুমোদন করে, তাহা হইলেই ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মুখ রক্ষা হয়।

ভারতবর্ষে সবাই নিজেদের জিনিষ পাঠাইয়া ধনী হইতে পারিবে, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশে নিজের উদ্বৃত্ত সস্তা জিনিষ রপ্তানী করিতে পারিবে না, ইহা অতি চমৎকার চুক্তি!

—

মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা

সঞ্জীবনীতে দেখিলাম—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন, ফরিদপুর জেলার বিপ্লবদমন আইনানুসারে তিনটি অবিবাহিতা তরুণী, দুইটি বিবাহিতা তরুণী এবং একটি বিধবা মহিলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল। উহাদের নাম ধাম পিতার নাম ইত্যাদি গবর্ন্মেণ্ট প্রকাশ করিবেন না, আত্মীয়দের সমক্ষে দিনের বেলা পুলিস কর্ম্মচারীরা উহাদের চারি জনের জবানবন্দী লইয়াছিলেন। ২৭ বৎসর বয়স্কা একটি মহিলা ও ১৬ বৎসর বয়স্কা একটি তরুণী ময়মনসিংহে নিজ বাড়ীতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল এক জন ইনস্‌পেক্টরের নিকট এবং ১৯ বৎসর ও ১৭ বৎসর বয়স্কা দুইটি যুবতী বিলাসখানে নিজ বাড়ীতে, দেড় ঘণ্টা করিয়া এক জন দারোগার নিকট ছিলেন।

যে-দেশের গবর্ন্মেণ্টকে অন্তঃপুরিকাদের ও বালকদের ভয়ে ত্রস্ত থাকিতে হয়, সে-দেশের গবর্ন্মেণ্টের নিজের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারা উচিত।

—

রবীন্দ্রনাথের আরোগ্যলাভ

রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হওয়ায় বিদেশের, ভারতবর্ষের ও বঙ্গের অগণিত লোক উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ-মুক্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ দূর হইয়াছে।

আমরা তাঁহার পীড়ার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তাঁহার আরোগ্যলাভে আনন্দিত হইয়াছি।

সর্ নীলরতন সরকার প্রমুখ চিকিৎসক মহাশয়েরা কবির চিকিৎসা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—

কংগ্রেস ও হিন্দুসমাজ

ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে একমত ও একপ্রাণ করিয়া সকলকে দেশের স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই কার্য্য হইতে মুসলমানদিগকে নিবৃত্ত রাখিতে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট অনেক বৎসর হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ উৎপাদিত হইয়াছে। এই জন্য, সন্দেহ নিরসনার্থ, কংগ্রেসকে মুসলমানদের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও অনেক মুসলমান কংগ্রেসকে হিন্দু মহাসভারই মত একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ করে। কংগ্রেস মুসলমানদের মন রাখিবার বিশেষ চেষ্টা না-করিলে না-জানি উক্ত মুসলমানেরা আরও কি বলিত।

হিন্দুরা যত কংগ্রেস ত্যাগ করিবে, হিন্দুরা যত কংগ্রেসে যোগ দিতে নিবৃত্ত থাকিবে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাহারা ততই দুর্ব্বল হইবে। দেশ স্বাধীন না হইলে বড় বা ছোট কোন সম্প্রদায়ই যথেষ্ট উন্নতি ও শক্তি লাভ করিতে পারিবে না—ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের অনুগ্রহলাভ করিলেও পারিবে না। স্বাধীনতা চাই-ই চাই। কিন্তু কংগ্রেস ভিন্ন আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই সমিতি নাই যাহা দেশকে স্বাধীন করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ। অতএব কংগ্রেসের দোষ ত্রুটি যাহাই থাকুক, উহাতে যোগ দেওয়া, উহার সভ্য না-হইলেও অন্ততঃ উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হওয়া, সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া সদলবলে উহার দোষত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করাই সুপরামর্শ।

—

পটুয়াখালীতে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট

পটুয়াখালীতে নিরন্ন লোকদের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সেখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বা অন্নকষ্ট হইয়াছে, এই তর্কে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। গত দুই বৎসর এই মহকুমায় ভাল ফসল হয় নাই। এ বৎসর পোকার উপদ্রবে আউশ ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে। গো-মড়কও হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট যেরূপ সাহায্য করিতেছেন, তাহা ছাড়া সর্ব্বসাধারণের সাহায্যও আবশ্যক।

—

মৌলবী মুজিবর রহমানের আবেদন

মৌলবী মুজিবর রহমান স্বাজাতিক মুসলমানদের অন্যতম নেতা। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া একটি যুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আবেদন সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমুদয় স্বাজাতিক ভারতীয়ের সমর্থনযোগ্য।

—

সিমেণ্টের কারখানা

সিমেণ্টকে আগে বিলাতী মাটি বলা হইত। এখন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় সিমেণ্ট তৈরি হয়, এবং ঘরবাড়ী সাঁকো রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণে উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে যাঁহারা সিমেণ্ট প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী কম। কাপড়ের কল ও চিনির কলের মালিকদের মধ্যেও বাঙালী কম। অথচ এই সমস্ত জিনিষের কাটতি বঙ্গে খুব বেশী।

কল্যাণপুরে একটি সিমেণ্টের কারখানা খুলিবার জন্য এক জন বাঙালী এঞ্জিনিয়ারের চেষ্টায় একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত

খুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীহট্ট চূণের জন্য বিখ্যাত। সেখানে সিমেণ্টও বেশ হইতে পারে।

বঙ্গে টাকা নাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। আপেক্ষিক ভাবে বঙ্গে টাকা কম বটে ; কিন্তু সব বাঙালীই নিঃস্ব নহে। উদ্যোগিতা থাকিলে বাঙালীদের দ্বারা অনেক পণ্যদ্রব্যের কারখানা স্থাপিত ও লাভের সহিত পরিচালিত হইতে পারে।

—

ডাক্তারদের মধ্যে বেকারসমস্যা ও পল্লীস্বাস্থ্য

সব বাঙালীই জানেন, বঙ্গের পল্লীগ্রামগুলির স্বাস্থ্য খারাপ, অধিকাংশ পল্লীগ্রামে রোগ হইলে চিকিৎসা হয় না বলিলেই চলে। এক-একটি পল্লীকেন্দ্রে এক-এক জন শিক্ষিত ডাক্তারকে বসাইয়া ঔষধালয় খুলিলে অনেক উপকার হয়। ডাক্তারেরা সাধারণতঃ শহরে থাকেন। সেখানে অনেকেরই পসার হয় না। সেই জন্য কখন কখন প্রশ্ন উঠে, তাঁহারা পাড়াগাঁয়ে যান না কেন? সেখানে গেলে রোগীও জুটে এবং গ্রামগুলিরও উপকার হয়। কিন্তু শুধু রোগী জুটিলেই ত হইবে না। ডাক্তারদেরও ত অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকিবার মত আয় হওয়া চাই। সাধারণতঃ বিস্তর পল্লীগ্রামের লোকদের অবস্থা এরূপ যে তাহারা দর্শনী দিতে অসমর্থ। এই জন্য গবন্মেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড যদি এক-একটি পল্লীকেন্দ্রে ডাক্তার বসান এবং তাহাদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক ন্যূনতম একটি ভাতার ব্যবস্থা করেন; তাহা হইলে ডাক্তারদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হয় এবং পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগচিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়।

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন হইতে বীরভূম জেলার কতকগুলি গ্রামের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় তথাকার লোকদের উপকার হইতেছে।

—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বাংলা দেশে এখন যতগুলি মাসিকপত্র আছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি যে-সকল লেখকদের চেষ্টায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা এক সময়ে ইহাতে লিখিতেন। ইহার নূতন পর্য্যায় শীঘ্র আরম্ভ হইবে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের "যোগ" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইবে। পত্রিকাটি ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

—

এম্-এ পরীক্ষায় প্রথমস্থানীয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে কুমারী কমলা গুপ্ত এবং ইতিহাসে কুমারী কমলা রায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

—

চীন-বাসর

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে চীনের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ এবং জাপানের চীন আক্রমণ, চীনের স্বাধীনতা হরণ চেষ্টা ও যুদ্ধে বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে নির্দ্দিষ্ট চীন-বাসরে জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সকল সভায় ভারতবর্ষের লোকদের প্রতিনিধিদিগের পরামর্শ ও সম্মতি না লইয়া চীন দেশে ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণেরও প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

জাপানের কার্য্যে গভীর অসন্তোষ প্রকাশের একটি উপায়ের কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। জাপানী এমন কোন পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে আসে না ও নাই যাহা আমাদের না কিনিলে চলে না। জাপানী পণ্যদ্রব্য কাহারও কেনা উচিত নহে। যাঁহারা দেশী শিল্প ও বাণিজ্যের বাস্তবিক উন্নতি চান, চীন-জাপান যুদ্ধ না ঘটিলেও তাঁহারা জাপানী জিনিষ ক্রয় হইতে বিরত থাকিতেন।

জাপানের ভারতবর্ষ জয় করিবার ইচ্ছাও আছে। মিঃ টি এইচ্ বেন লীগ য্যাসেমব্লীতে চীন-জাপানের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার নিমিত্ত জেনিভা যাত্রাকালে বোম্বাইয়ে একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমরা যতটা বুঝি, জাপানের দক্ষিণাভিমুখ নীতির লক্ষ্য প্রথমে চীন দখল ও পরে ভারতবর্ষ জয়।" ভারতবর্ষের উপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি বহু বৎসর হইতেই আছে। ১৯২৭ সালে জেনার‍্যাল টানাকা জাপান-সম্রাটের নিকট একটি আবেদনে বলেন, "চীনের সমুদয় প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়া আমরা ভারতবর্ষ জয় করিতে অগ্রসর হইব।"

—

প্রবল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় সৈন্যদলের অসামর্থ্য

গত আগষ্ট মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সামরিক সেক্রেটরী কর্ণেল ওগিলবী বলেন, যে, বড় কোন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ভারতীয় সৈন্যদল বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সর্ ফিলিপ্ চেটওডও এইরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছিলেন। অথচ ভারতবর্ষকে নিজের শক্তি এ-প্রকারে বাড়াইতে দেওয়া হইতেছে না, যাহাতে আমরা অন্য কোন দেশের সাহায্যনিরপেক্ষ ভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারি।

—

নেশার জন্য সুরা উৎপাদন ও বিক্রয় নিষেধ

মান্দ্রাজের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্থির করিয়াছেন, যে, নেশার জন্য সুরা উৎপাদন বিক্রয় ও ব্যবহার তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ প্রদেশে বন্ধ করিবেন। তাঁহারা প্রথমে সালেম জেলায় এই চেষ্টা আরম্ভ করিবেন।

বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য যে কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী। তাহা সত্ত্বেও এখানে আবগারীর আয় বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি অপেক্ষা কম। অর্থাৎ কম লোকে মদ খায়। সুতরাং এখানে সুরাপান নিষেধ অপেক্ষাকৃত সহজ। এইরূপ কথা বঙ্গের রাজস্বমন্ত্রীও বলিয়াছেন।

মান্দ্রাজে যেমন সালেমে সুরাপান নিবারণ চেষ্টা আরব্ধ হইবে, বঙ্গে সেইরূপ হুগলী জেলায় ঐরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবার নিমিত্ত উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন।

—

প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী বিরোধ

প্যালেষ্টাইনে আবার আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিরোধ গুপ্তহত্যা প্রভৃতির আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উভয় পক্ষের বিরোধের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশজাতীয় লোকেরা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিবে। ব্রিটেনের নিযুক্ত কমিশন যে প্যালেষ্টাইনকে আরব, ইহুদী ও ব্রিটিশ তিন রাষ্ট্র ও এলাকায় বিভক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছিল, ব্রিটেন এখনও তদনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে আরব ও ইহুদী কোন পক্ষেরই স্বার্থ নাশ না করিয়া প্যালেষ্টাইনে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহা হয়ত অনেকেই বাৎলাইতে পারেন। কিন্তু সেই উপায় কার্য্যতঃ অবলম্বিত করিবার শক্তি কাহারও আছে কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। কাগজে আমরা আগে লিখিয়াছি, এখনও লিখিতেছি, যে, আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষ আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া লইতে পারিলে তাহাই সর্ব্বোত্তম মীমাংসা। কিন্তু এরূপ কিছু করা কি সম্ভবপর?

আরবদের পক্ষে কংগ্রেস ও মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আন্দোলন করিতেছেন।

কয়েক মাস আগে ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্যালেষ্টাইন দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার লেখা হইতে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ কিছু তথ্য পাওয়া যাইবে।

—

মুসোলিনি-হিটলার সাক্ষাৎকার

মুসোলিনি জার্মেনী গিয়াছিলেন। হিটলার মহা সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনার একটি অঙ্গ ছিল নূতন রকমের। মিউনিকের শান্তি-স্বর্গদূতের বৃহৎ স্তম্ভের পাদদেশে ("at the base of the big column of the Angel of Peace") সোনালী পরিচ্ছদ-পরিহিত পাঁচ শত বাভেরীয় সুন্দরী বালিকাকে মালার আকারে সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল।

ইটালী ও জার্মেনী উভয় দেশ ফাসিষ্ট এবং রাশিয়ার বিরোধী। ব্রিটেন দু-নৌকায় পা-দিয়া জয়কেতে মনোভাব লইয়া আছেন। মুসোলিনি ও হিটলারের কোলাকুলির রাষ্ট্রনৈতিক ফল কি হইতে পারে, সে বিষয়ে ব্রিটেনে জল্পনা চলিতেছে, অন্য দেশেও চলিতেছে। ফাসিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইতেছে, ইহা ত সহজেই বুঝা যায়।

—

স্পেনের যুদ্ধ

স্পেনের যুদ্ধ চলিতেছে। ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক বোধ হয় বুঝিয়াছে, যে, ন্যায় স্পেনের গবর্মেণ্টের পক্ষে, বিদ্রোহীদের পক্ষে নহে। তথাপি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্পেনের গবর্মেণ্টকে একটা কারণে সাহায্য করিতেছে না। স্পেনের গবর্মেণ্ট সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্ট। তাহার জিত হইলে তাহা স্পেনে যত বিদেশী মূলধন খাটিতেছে সব বাজেয়াপ্ত করিবে। স্পেনে প্রভূত ব্রিটিশ মূলধন খাটিতেছে। এই জন্য রক্ষণশীল ও ধনিক দল স্পেনের গবর্মেণ্টকে সাহায্য করার বিরুদ্ধে। অন্য দিকে বিদ্রোহী জেনার‍্যাল ফ্রাঙ্কোর জয়েও ব্রিটিশের বিপদ আছে। ফ্রাঙ্কো ফাসিষ্ট, ইটালীর স্বৈর নেতা মুসোলিনিও ফাসিষ্ট। ফাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর প্রভুত্ব স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হইলে জিব্রালটার ও ভূমধ্য সাগর দিয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের নানা অংশে যাইতে ব্রিটেন বাধা পাইতে পারে। তা ছাড়া, ফ্রাঙ্কোর জিত হইলে বিদেশী মূলধনের লাভ স্পেনের বাহিরে যাইতে না-দেওয়া হইতে পারে, যেমন জার্মেনী হইতে বিদেশী মূলধনের লাভ বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। তাহা হইলে ব্রিটিশ ধনীরাও স্পেনে খাটান অর্থের লাভ পাইবে না।

অতএব ব্রিটেনের উভয়সঙ্কট—শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি।

—

বিহারী ও বাঙালী ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার

মজঃফরপুরের ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ সরকারী কলেজ। উহার ছাত্রেরা কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। প্রথমে লাইব্রেরিয়ান পরে প্রিন্সিপ্যাল উহা সরাইয়া দেন। একটি ছাত্র উহা দখল করে। প্রিন্সিপ্যাল (ইনি ভারতীয় মনুষ্য) তাহা কাড়িয়া লন ও ছাত্রটিকে প্রহার করেন। ইহাতে খুব বিক্ষোভ হয়। অনেক ছাত্র প্রায়োপবেশন করে। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ অবিলম্বে মজঃফরপুর গিয়া ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিজেই অনুসন্ধান করিতে অঙ্গীকার করায় উপবাসী ছাত্ররা উপবাস ত্যাগ করে। প্রিন্সিপ্যাল কংগ্রেস-পতাকাটি ছাত্রদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

রাজশাহীর ব্যাপারটা অন্য রকমের। কিন্তু সেখানেও প্রিন্সিপ্যালের হুকুম লইয়া হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়।

বিহার ও বাংলা উভয় প্রদেশেই শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান।

—

রুসভেল্ট কর্ত্তৃক স্বৈর শাসকদের নিন্দা

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় একাধিপতিদের স্বৈর শাসনপ্রণালীর (dictatorshipএর) তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিয়াছেন, এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন।

আমেরিকায় শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক। ব্রিটেনেরও শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক। কিন্তু এই উভয় দেশ অন্যত্র গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদের চেষ্টায় বাধা দিতেছেন না, বা দিতে পারিতেছেন না। জাপান চীনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে। কেহ তাহাতে বাধা দিতেছে না, বা বাধা দিতে পারিতেছে না।

—

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দলিল

রামমোহন রায়ের জীবনচরিতসমূহে লিখিত আছে, যে, তাঁহাকে নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা কুৎসা প্রচার ত ছিলই, তাঁহার আত্মীয়েরা ও অন্যেরা তাঁহার ও তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদের নামে অনেক মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ ও সর্ব্বস্বান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কোন কোন প্রকার নির্যাতনে তাৎকালিক অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর যোগ ছিল। তখনকার মিলিটরী সেক্রেটরী কর্ণেল ইয়ং দার্শনিক জেরেমি বেন্থামকে লিখিয়াছিলেন, যে, এই কর্ম্মচারীরা রাজার প্রতি এই কারণে ঈর্ষ্যান্বিত ছিল, যে, তিনি কালা আদমী হইয়াও "মনের অভিযানে" ("in the march of mind") তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। কর্ণেল ইয়ং লিখিয়াছেন, এই সব মোকদ্দমায় রামমোহন জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশ্রম, উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল।

এই সকল মোকদ্দমার আবশ্যকমত দলিল এবং রামমোহনের বৈষয়িক জীবনসম্পর্কীয় কতকগুলি কাগজপত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আরও সন্ধান লওয়া হইতেছে। কাগজগুলি প্রধানতঃ ইংরেজী। কিছু বাংলাও আছে। তিনটা মোকদ্দমার পারসী রায়ও পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজী অনুবাদসহ সেগুলিও প্রকাশিত হইবে। যে বহিতে এই সকল কাগজ একত্র সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহার ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইহার একটি ভূমিকা লিখিবেন।

—

রামমোহন রায়ের গদ্য

সকল দেশেই গদ্য লিখিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ গদ্যে কথা বলিত। সুতরাং গদ্যের সৃষ্টি কোন্ দেশে কোন্ মানুষ করিয়াছে, এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। পুস্তক-রচনায় গদ্য ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ও আদালতের দলিলে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। প্রথম লিখিত বাংলা গদ্য গ্রন্থ কোনটি এবং তাহার রচয়িতা কে, জানা গেলেই বাংলা পুস্তক রচনাতে কে আগে গদ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, জানা যাইবে। রামমোহন রায়, বা অন্য কেহ, যে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম বাংলা গদ্য বহিও তিনি লেখেন নাই। তাহা হইলে গদ্যলেখক বলিয়া রামমোহন রায়ের প্রশংসা কি কারণে করা হয়? বিখ্যাত ইংরেজী লেখক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের এতদ্বিষয়ক মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ১৮৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির 'সমাচার দর্পণ' হইতে এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইতেছে।

"বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক। লিটিরেরি গেজেট নামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জ্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

"বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্য রচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত প্রকাশ হইতেছে।' কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের

মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামকগ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

"পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায় নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

"অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশ হওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন।"—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা।

অতএব রামমোহন রায়ের সমসাময়িক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতে "নিরাবিল বাঙ্গলা" গদ্য রামমোহন রায় প্রথমে লেখেন।

—

শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার্থ ইউরোপ যাত্রা

শান্তিনিকেতন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন ইংলণ্ডের ডার্টিংটন হল ট্রষ্ট ফণ্ড হইতে একটি গবেষণা ফেলোশিপ পাইয়া ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। বৃত্তিটি এক বৎসরের জন্য। তাঁহার গবেষণার বিষয় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিশিক্ষা ও শ্রমশিল্পশিক্ষার স্থান (Place of Vocational and Industrial Training in General Education)। তাঁহাকে সম্ভবতঃ কিছুদিন ডেন্মার্কে ও প্যালেষ্টাইনে থাকিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ গবেষণার প্রয়োজন আছে।

—

শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব

এ বৎসরও শান্তিনিকেতনে, নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল গ্রামের মাঠে, হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সাঁওতাল পুরুষ ও নারীরা ইহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছিল। সভ্যতার প্রায় আদিম স্তরের মানুষের সহিত সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উপনীত কবির মিলন জগতে অপূর্ব্ব।

—

গান্ধী জয়ন্তী

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধী যাহা করিয়াছেন, আর কাহারও কাজের সহিত তাহার তুলনা হয় না। সাহসের সহিত হিংসার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগ ইতিহাসপ্রথিত। অহিংস সাহস যে হইতে পারে এবং কিরূপ হইতে পারে, মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সময়ে তাহার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল। ভিক্ষা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া এবং স্বয়ং তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি পরাধীন ভারতীয় জাতির আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া দিয়াছেন। অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ যাহাদিগকে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের ধারণাও হীন, গান্ধীজী তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত মর্য্যাদা দিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও তিনি সত্য কথন ও সত্য আচরণের সমর্থন করিয়া এবং তদ্বিষয়ে স্বয়ং যথাসাধ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতবর্ষের ও জগতের হিত করিয়াছেন। তাঁহার 'জন্মদিন' আগতপ্রায়। এই সময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন এবং তাঁহার বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পাদন তাঁহার অনুরাগী সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

—

আণ্ডামান জেলে-বন্দীদের পুনরানয়নের কথা

আণ্ডামানে বঙ্গের যে-সব বন্দী তথাকার জেলে আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগকে দেশে আনিবার কথা গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ ব্যবস্থাপক সভার কয়েক জন সদস্যের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনা স্থির হইয়াছে। তাহারা জেলের নিয়ম-ভঙ্গাদি করিলে তাহাদিগকে নির্জ্জন কক্ষে একা রাখা আবশ্যক হইবে। যথেষ্টসংখ্যক নির্জ্জন কক্ষ এখন নাই, ৪।৫ মাসে তাহার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। তখন সকলকেই আনা চলিবে।

বন্দীদিগকে তাহা হইলে দেশে খুব সুখে রাখিবার প্রলোভন দেখান হইতেছে! যাহা হউক, নির্জ্জন কক্ষের বিভীষিকা সত্ত্বেও তাহাদের দেশে প্রত্যাগমন বাঞ্ছনীয়।

তাহারা দেশে ত ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের মুক্তির ও প্রায়োপবেশকদের অন্যান্য দাবীর কি হইল?

শরৎচন্দ্র বসু এই প্রতিশ্রুতি দেন, যে, স্বদেশে জেলে এই বন্দীরা যাহাতে এরূপ কিছু না করে যাহার জন্য তাহাদের শাস্তি হইতে পারে, তাহার চেষ্টা তিনি করিবেন। তজ্জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

—

আণ্ডামানে বন্দীদের ক্ষয়রোগ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারপক্ষ হইতে মিঃ থর্ণ বলিয়াছেন, গত তিন বৎসরে আণ্ডামান জেলে ২৬ জনের ক্ষয়রোগ হইয়াছে। আণ্ডামান দ্বীপ যে সরকারী ভূস্বর্গ ইহা তাহার অকাট্য প্রমাণ। ইহা সবাই জানে, যে, যাহারা সাহসসাপেক্ষ বৈপ্লবিক কাজ করে, বিশেষতঃ যাহারা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সেরূপ কাজ করে, তাহারা রোগাপট্‌কা নয়। সেই রকম লোক আণ্ডামানে গেলে যে এত রোগপ্রবণ হয়, তাহা ঐ দ্বীপের ভূস্বর্গত্বের প্রমাণ নিশ্চয়ই। অন্ততঃ ইহা ঠিক্, যে, আসল স্বর্গে যাইবার পথে আণ্ডামান প্রকৃষ্ট পান্থশালা।

অবশ্য, ইহাও অসম্ভব নহে, যে, বাংলা দেশের যত ক্ষয়রোগপ্রবণ ছোকরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বদনাম রটাইবার নিমিত্ত দল বাঁধিয়া বৈপ্লবিক কাজ করিয়াছে।

—

"অন্তরীণ"দের মধ্যে কঠিন পীড়া

'অন্তরীণ'দের মধ্যেও ক্ষয়রোগ এবং তাদৃশ অন্যান্য কঠিন পীড়ার প্রাদুর্ভাব কম নয়। অথচ ইহা জানা কথা, যে, অন্তরীণ হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে ব্যায়ামপটু বলিষ্ঠ যুবকদের সংখ্যা যত ছিল অন্য যুবকদের মধ্যে তত নয়।

'অন্তরীণ'দের মধ্যে আত্মহত্যার ও মস্তিষ্কবিকৃতির অনুপাতও দেশের সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে অপেক্ষা অধিক।

—

বঙ্গে বেআইনী প্রতিষ্ঠান

খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন সেদিন বঙ্গীয় এসেম্ব্লীতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন, যে, বঙ্গে এখনও ২১৮টি প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়া আছে। ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে সরকারী ঘোষণা হয়। এইগুলির মধ্যে ১০টি মেদিনীপুরের, ৩২টি কলিকাতার, ১৯টি ফরিদপুরের, ১৯টি ত্রিপুরার, ইত্যাদি। এগুলি সব সন্ত্রাসক প্রতিষ্ঠান নয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও নয়। অবশ্য, বেশীর ভাগ কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান। বাকী শ্রমিক, ছাত্র, যুবক প্রভৃতির সমিতি, ব্যায়াম-সমিতি, হিন্দু মুসলমানের মিলন-সমিতি, স্বদেশী শিল্প আশ্রম ইত্যাদি। সুতরাং বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকেই কাবু করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে। যাহাতে যে-কোন দিক দিয়া শক্তিমত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে, তাহা বে-আইনী, সরকারী মতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বোধ করি খুব বেশী ভুল হইবে না।

যাহা হউক, আশার কথা এই, যে, এখনও বঙ্গে দেহমনের তারুণ্য বাঁচিয়া আছে। বেঁচে থাক্ যৌবন! 'নওজোয়ানী জিন্দাবাদ'!

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মানুষ চুরি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের বদমায়েসদের দ্বারা আবার নারীহরণ হইয়াছে। আজকাল আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া শত শত হাজার হাজার মানুষ বধ সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়ায় ২।১ জনের প্রাণবধে আর বেদনাবোধ না হইবার কথা। তথাপি সীমান্তে দুটি অপহৃতা হিন্দু বালিকাকে যে অপহারকেরা পাথর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে প্রাণ ব্যথিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বিনা লাইসেন্সে বন্দুক রাখিতে ও ব্যবহার করিতে দেওয়া হউক। ভারত-গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন কিনা, দ্রষ্টব্য।

বাংলা দেশেও গ্রাম অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতি ও তদুপলক্ষ্যে খুন জখম এত হয়, যে, এখানেও বন্দুক ব্যবহার সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক।

—

বরিশাল ছাত্র কন্‌ফারেন্স নিষিদ্ধ

৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বরিশালে ছাত্রদের একটি কন্‌ফারেন্স করিবার উদ্যোগ হয়। তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজুহাত এই, যে, সর্ব্বসাধারণের একটি অংশ ইহার বিরোধী এবং কন্‌ফারেন্স হইলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। কোন্ অংশ? শান্তিভঙ্গ কে করিত? উদ্যোক্তারা না আপত্তিকারীরা? আপত্তিকারীদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাদিগকেই নিবৃত্ত ও মুচলেকাবদ্ধ করা উচিত ছিল, এবং কন্‌ফারেন্স নির্ব্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে হইতে দিবার জন্য যথেষ্ট পুলিস মোতায়েন করা উচিত ছিল।

কতকগুলি লোক আপত্তি করিলেই সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত সভাও বন্ধ করিবার রীতি নিন্দনীয়।

—

কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেমব্লী

কয়েকটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের মূল রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নকল্পে কন্‌সটিটিউয়েণ্ট এসেমব্লী আহ্বানের

অনুকূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ-বিষয়ে এক দফা তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এরূপ গণসভা শীঘ্র আহূত না-হইলেও বর্ত্তমান ভারতশাসন-আইন যে ভারতীয়দের মনঃপূত নয়, তাহা সকল রকমে জানান ভাল ও আবশ্যক।

—

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী

আগামী বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

—

নিখিলভারত শিক্ষা কনফারেন্স

আগামী ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় নিখিলভারত শিক্ষা কনফারেন্স হইবে। ইহার আপিস ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে অবস্থিত। সমুদয় কলেজ ও স্কুলের ইহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও আর্থিক সাহায্য দান কর্ত্তব্য।

—

চেকোস্লোভাকিয়ার দেশনায়ক মাসারিক

চেকোস্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব ও প্রথম রাষ্ট্রপতি মাসারিক ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের মুক্তিদাতা এবং কার্য্যতঃ চেকোস্লোভাক সাধারণ-তন্ত্রের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন এক জন গাড়োয়ান এবং এক কামারের কামারশালায় ছেলেকে শিক্ষানবীশ করিয়া দেন। পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমতঃ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে কবে গাড়োয়ানের ছেলেরাও রাষ্ট্রপতি হইতে পারিবে?

—

"অলখ-ঝোরা"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ দর্শনাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় "অলখ-ঝোরা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

মহিলা-লেখিকাদের মধ্যে শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। এই উপন্যাসখানি প্রবাসীতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল এবং গত সংখ্যার প্রবাসীতে শেষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিরন্তনী, জীবনদোলা, দুহিতা, স্মৃতির সৌরভ প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস ও উষসী, সিঁথির সিঁদুর, বধূবরণ প্রভৃতি গল্পের বহি ইনি লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাসখানি একটু অন্য ধরণের। পড়িলেই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র কথা মনে হয়। কিন্তু "অলখ ঝোরা" "পথের পাঁচালী"র অনুকরণ নহে। মূল গল্পাংশ গ্রন্থের একরূপ মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ হইয়াছে কয়েকটি স্কুলের মেয়ের পরস্পর সখীত্ব লইয়া। হৈমন্তী ও সুধা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসিত কিন্তু তপন নামক একটি ছেলেকে হঠাৎ ইহারা দুই জনেই ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। হৈমন্তীর প্রকৃতি একটু বেশী সপ্রতিভ, সে যে তপনকে ভালবাসে এই কথা সে একদিন গোপনে সুধাকে বলে এবং তাহার কিছুদিন পরে তাহার প্রেম নিবেদন করিয়া তপনকে একখানি পত্র লেখে। হৈমন্তী তপনকে ভালবাসে এই কথা শুনিয়া সুধা তাহার মনের ভালবাসাকে গোপনে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে এবং তাহাদের দেশ পল্লীগ্রামে চলিয়া যায়। এদিকে সকলের অগোচরে তপনের চিত্ত সুধার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; হঠাৎ হৈমন্তীর পত্র পাইয়া তাহাকে ব্যথিত করার ভয়ে সে তাহার পত্রের উত্তর না দিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অনেক দিন পরে সে তাহার প্রেম নিবেদন করিয়া সুধাকে পত্র লেখে। হৈমন্তীকে ব্যথিত করিয়া সুধা কেমন করিয়া তপনকে বিবাহ করিবে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সুধার চিত্ত বেদনাতুর হইয়া উঠে। এইখানেই গল্পের শেষ।

গল্পটির নায়ক-নায়িকা কাহারা তাহা বলা সহজ নহে। তবে সুধাকেই বোধ হয় নায়িকা বলিতে হয়। সুধাকে অবলম্বন করিয়া সুধার পিতামাতা, দাদামহাশয়, দিদিমা প্রভৃতিকে লইয়া লেখিকা একটি সুদীর্ঘ গ্রাম্যচিত্র দেখাইয়াছেন। সুদীর্ঘ হইলেও যাঁহারা নিরন্তর কলিকাতা শহরে থাকেন, তাঁহাদের নিকট এই গ্রাম্যচিত্রগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইবে। গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, তাহাদের দুঃখসুখের নানা তরঙ্গ, বহু পুত্রকন্যা লইয়া এক একটি পরিবারের অসচ্ছলতার মধ্যে শান্ত সরল ও উদ্বেগবিহীন জীবনের ছবির সহিত নাগরিক জীবনযাত্রার চিত্রের তুলনা করিলে আমাদের মন যেন স্বভাবতঃই গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শহরে থাকিয়া যাহাদের গ্রাম্য জীবনের সহিত যোগ আছে তাহাদের চিত্তে আপনাপন গ্রামের নানা সৌভাগ্যসম্ভারের কথা নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বইখানির এই অংশের আখ্যানভাগের সহিত শেষ দিকের আখ্যানভাগের বিশেষ যোগ না থাকিলেও গ্রাম্যচিত্র হিসাবে ইহা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া গল্পের নায়িকা সুধার চরিত্র ফুটাইবার পক্ষে ইহার একটি বিশেষ উপযোগিতাও আছে। সুধার বাল্যকাল গ্রামের জলবাতাসে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং গ্রামের হাওয়ার মধ্যে যেটুকু ভাল, যেটুকু পেলব, কোমল ও নিষ্পাপ, সেইটুকুই ছায়া সুধার জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কলিকাতার জীবনের শিক্ষা তাহা দূর করিয়া দিতে পারে নাই। এই জন্যই সুধা তাহার অন্য অন্য নাগরিক বন্ধুদের ন্যায় প্রগল্ভ হইতে পারে নাই কিন্তু তাহাদের ন্যায় কেবল নিজেকে লইয়া ব্যস্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। দুই-একটি তর্কবিতর্কের মধ্যেও দেখা গিয়াছে যে যাহাকে কেহ ভালবাসে তাহার জন্য বাবা মা ভাই সকলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাওয়া সঙ্গত কি না সে সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ ভাবে কোন মত সে পোষণ করিতে পারে নাই। অতিবড় বন্ধুত্বের খাতিরেও লুকাইয়া কোন কাজ করিতে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করিয়াছে। সে অস্বীকার করার মূলে নিজের উপর দোষ পড়িতে পারে এ ভয় তাহার ছিল না—যাহা সকলকে বলা যায় না তাহা করা উচিত নয় এই বিশ্বাস হইতেই সে তাহা করিয়াছিল। যাহা সকলকে বলা যায় না তাহা করা উচিত কি অনুচিত, সে তর্ক আমি এখানে তুলিব না। কিন্তু অতি সরল

শিশুর ন্যায় চিত্ত যার, তারই মনে এই কথা ওঠে এবং অন্যায় হইতে বিরত থাকিবার প্রবল শক্তিতে সে প্রলোভন কাটাইয়া উঠিতে পারে। অথচ তার বন্ধুদের বিম্নসঙ্কুল প্রেমের আর্ত্তিতে সে কম আর্ত্ত হইয়া উঠিত না। তাহাদের অতি গোপন কথাও সে অতি সঙ্গোপনে রাখিতে জানিত এবং অপরে বেদনা পাইবে বলিয়া নিজের প্রেমকে নিষ্পেষিত করিতে জানে। দুই জনে এক জনকে ভালবাসিলেও ঈর্ষাবহ্নিতে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠে নাই, দুঃখ সে অনেক পাইয়াছে কিন্তু দুঃখকে সংযমের সহিত আপনার চিত্তে ধারণ করিয়া দুঃখ ও প্রেমের মর্য্যাদা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অতি কোমল অতি স্নিগ্ধ অথচ আপন কর্ত্তব্যে দৃঢ় সে, এইখানেই সুধার চরিত্রের মহিমা। সে যে তপনকে ভালবাসিয়াছিল তাহারও প্রধান কারণ মনে হয় সরল গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য তপনের ঐকান্তিক চেষ্টা। তপনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে নিজেও স্কুল খুলিতে চেষ্টা করিল। এইখানেই "অলখ ঝোরা"র যথার্থ পরিচয়। যাহাকে লোকে ভালবাসে তাহাকে লোকে দেখিতে চায় তাহার কথা শুনিতে চায় তাহার স্পর্শ চায়। কিন্তু এই ভালবাসার আকর্ষণ কোথা হইতে আসে তাহার পরিচয়েই তাহার বিশুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে রূপের মোহে, সাধারণ সঙ্গের আকর্ষণে, যৌবনের বিলোভনে, কি সুখ ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের প্রলোভনে কি কেবলমাত্র তারুণ্য-ধর্ম্মপ্রযুক্ত ভালবাসা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাহ্যকারণসম্ভূত বলিয়া বিশুদ্ধ বলা যায় না। কিন্তু যেখানে জ্ঞানের বা চরিত্রের কোন আদর্শের মধ্যে কেহ তাহার নিজের বিশুদ্ধ চিত্তের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় কিংবা নিজের মধ্যে যাহাকে ক্ষীণভাবে পাইয়াছে অপরের মধ্যে তাহারই বৃহত্তর ও মহত্তর সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইখানেই সেই প্রেমকে বিশুদ্ধ বলিতে হয়। কাহাকেও কেহ ভালবাসে তাহাকে না পাইলেই চলিবে না এই জন্য অনেকে অন্নজল ত্যাগ করে বা আত্মহত্যা করে কিংবা বৈরাগিণী হয় কিন্তু ইহাকে প্রেমের সন্ন্যাস বলা যায় না। পার্ব্বতী শিবকে পান নাই বলিয়া তপস্যা করেন নাই, তিনি রূপের দ্বারা শিবকে বিলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিলেন যে মহাদেবের দেবত্ব রূপভোগের মধ্যে নহে তাহা তাঁহার তপস্বীস্বরূপের মধ্যে। রূপ ক্ষণভঙ্গুর, তাহার দ্বারা চিরন্তন তপস্বীস্বরূপকে বাঁধিতে পারা যায় না। সেই জন্য

"ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ
অবাপ্যতে বা কথমন্যথাদ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।"

"আত্মস্থ তপস্যা ও সমাধির দ্বারা পার্ব্বতী আপনি রূপকে সফল করিতে উদ্‌যুক্তা হইলেন। তাহা না হইলে কি অমন প্রেম এবং অমন পতি কেহ পাইতে পারে?"

সাধারণতঃ কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেমের যে-সমস্ত স্তুতি শোনা যায়, তাহা অনেক সময়েই বাচালতা বা প্রলাপমাত্র। মানুষের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ দিকের আকর্ষণে যেখানে দুইটি চিত্ত পরস্পর একত্র হইতে চায়, সুখদুঃখে যে প্রেমের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না, সেখানে রূপ বা বয়সের অপেক্ষা থাকে না। বিশিষ্ট মানুষের মধ্যেই সেই প্রেম ঘটিয়া থাকে এবং তাহা দুর্লভ। তাই ভবভূতি বলিয়াছেন যে "ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে" ("মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবল সম্ভব এমন পবিত্র প্রেম বড় সহজে ঘটে না")। মানুষের রক্তমাংসের প্রয়োজন এই অশরীরী আকর্ষণকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে কিন্তু তাহার পিছনে থাকে তাহার প্রাণস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ। অপরকে লাভ করিতে গিয়া মানুষ এই প্রেমের মধ্যে নিজেকেই পায়। সেই জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "ন বা অরে মৈত্রেয়ী পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ("হে মৈত্রেয়ি, পতির জন্য পতি প্রিয় নহেন; আত্মার জন্য পতি পত্নীর প্রিয়")। এই প্রেমের অভিব্যেচনের মধ্যে ঈর্ষা বা হিংসার কোনও স্থান নাই, আছে কেবল প্রিয়কে অবলম্বন করিয়া একটি নিরন্তর প্রিয়তার উপলব্ধি।

সুধার চরিত্রে আমরা এই প্রেমের কিছু ইঙ্গিত পাই। লেখিকার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল এবং নানা স্থানে ইনি নানা সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। সে সমস্ত আলোচনা করা এখন সম্ভব নয়। সমালোচনার দ্বারা কোনও সাহিত্যের ভিতরকার বস্তুটিকে প্রকাশ করা যায় না। সেই জন্য সুধী পাঠকবর্গের নিকট "অলখ-ঝোরা"র যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিবার ভার দিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। আশা করি তাঁহারা আনন্দিত হইবেন ও উপকৃত হইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

—

১২ই আশ্বিনের ঝড়বৃষ্টি

১২ই আশ্বিন এবং তাহার কিছু আগে ও পরে হুগলী ও হাবড়া জেলায় এবং ২৪-পরগণা ও কলিকাতায় ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অনেক গাছ পড়িয়া গিয়াছে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এক জন মানুষ মরিয়াছে, অনেক নৌকা ডুবিয়াছে, অনেক ঘর পড়িয়াছে, কোন কোন জায়গায় বিস্তর গোরু মারা পড়িয়াছে, এবং অনেক মানুষ ও পশু আহত হইয়াছে। ঈষ্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের গোরিয়া ষ্টেশনের নিকট একটি জলস্তম্ভ (water-spout) আবির্ভূত হইয়া ২৪-পরগণার বৈকুন্ঠতলা ইউনিয়নের উপর দিয়া যাওয়ায় গ্রাম লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। গ্রামবাসী অনেকে নিরাশ্রয় হইয়াছে।

—

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ২৫শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর হইতে ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

দেশ-বিদেশের কথা

চিত্র-পরিচয়

চীনের বৌদ্ধশিল্প

সম্প্রতি চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপনের নানা আয়োজন চলিতেছে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্মের যোগে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ শিল্পকলাও চীনদেশকে কিরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এই চিত্রগুলি তাহার নিদর্শন-স্বরূপ।

কাম্বোজ-চিত্রাবলী

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত কাম্বোজে ক্মের-রাজত্বে শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমগ্র দেশময় এই রাজগণ, অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন বহু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্মের শিল্পকলা এক সময় ভারত-শিল্প হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল; ক্রমশ ইহা একটি স্বকীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ক্রমশ ক্মের-রাজদের গরিমা ম্লান হয় তাঁহারা আঙ্কোর নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের নির্ম্মিত মন্দিররাজি পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমশ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই সকল মন্দিরের অপূর্ব্ব কলাকৌশল ও সৌন্দর্য্যের প্রতি শিল্পদক্ষদের দৃষ্টি পুনরায় আকৃষ্ট হয়।

শ্রীসুবিমল বসু

কচুরিপানা দ্বারা বাংলা দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা সুবিদিত। কিছুকাল যাবৎ শ্রীসুবিমল বসু কচুরিপানা সহজে বিনষ্ট করিবার জন্য একটি দ্রাবক প্রস্তুত করিয়াছেন ও নানা স্থানে তাহার সাহায্যে কচুরিপানা বিনাশ করিয়া হাতে-কলমে দেখাইয়াছেন। এই দ্রাবক ছড়াইয়া দিবার পর তিন দিনের মধ্যে কচুরিপানার সব পাতা মরিয়া গিয়াছে, ও কয়েকটি গাছের শিকড় লইয়া আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে সজীবতার কোন চিহ্ন নাই; সাউথ-সুবারবন মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিনাশায়োজন প্রদর্শনের পর ঐ মিউনিসিপালিটির ডাঃ এস, কে, চন্দ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজের বহু বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতিতেও তিনি সকলের সন্তোষকররূপে এই বিনাশ-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঢাকায় কৃষিবিভাগে অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপস্থিতিতেও তিনি এই পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। সম্প্রতি ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য-বাহাদুরের আনুকূল্যে তিনি আগরতলাতেও এই দ্রাবকের সাহায্যে কচুরিপানা ধ্বংস করেন আগরতলা কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন যে ঐ দ্রাবক ছড়াইবার এক সপ্তাহের মধ্যে কচুরিপানা নষ্ট হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে ঐ স্থানে উহা আর জন্মাইবে না বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসুবিমল বসু
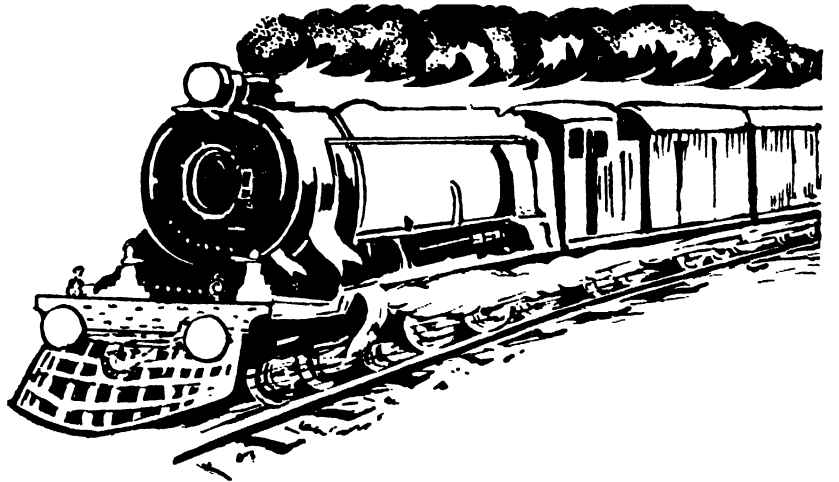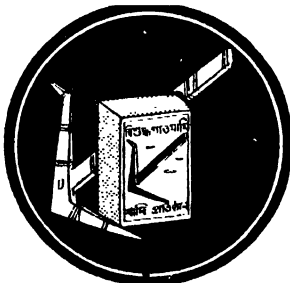
গয়ায় নিখিল-ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলন, ১৯৩৭

আগামী শারদীয় পূজার ছুটিতে গয়া নগরীতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশন সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। গয়া এক কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি কেন্দ্র ছিল। যাঁহারা এই মহাসম্মেলনে যোগ দিতে চাহেন, অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও সঙ্গীতরসজ্ঞদের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা সাদরে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাহেন তাঁহারা প্রতিযোগিতা-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার বিষয়— (১) ধ্রুপদ ও খেয়াল, (২) টপ্পা ও ঠুংরী, (৩) গজল, ৪) যন্ত্রসঙ্গীত, (৫) প্রাচ্য ও আধুনিক নৃত্য।

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, নিখিল-ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলন, গয়া, এই ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরিতব্য।

শ্রীমতী প্রীতি দেবী

অধ্যাপক ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রীতি দেবী এ-বৎসর যুক্তপ্রদেশের ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান ও ছাত্রছাত্রীসমূহের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছেন ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সঙ্গীতবিশারদ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ (সঙ্গীত-বিদ্যালয়) হইতে শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া 'সঙ্গীত-বিশারদ' উপাধি লাভ করেন। মরিস কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পারদর্শিতার নিদর্শন স্বরূপ ভাতখণ্ডে-পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার এবং সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি আহমেদাবাদে আম্বালাল সারাভাইয়ের বিদ্যালয়ে গীতশিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি বরোদায় ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁর নিকট ননীগোপালবাবুর গীত-দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষ্যে বরোদায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল।

উপবিষ্ট, বামে। শ্রীমতী জয়শ্রী রায়জা, সভানেত্রী, ভগিনী-সমাজ।
দণ্ডায়মান, দক্ষিণে। শিল্পী শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়,
তৎপার্শ্বে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী প্রীতি দেবী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কাশী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন

গত ২০শে ভাদ্র ১৩৪৪ বারাণসীস্থ কাশী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন তত্রস্থ বাঙালীটোলা স্কুলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, এবং শ্রীনির্ম্মলা সান্যাল বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন ও মণ্ডলের কতিপয় সদস্য সময়োচিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুইটি বালিকার কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য গীত এবং দেশীয় যন্ত্র বাদনের ব্যবস্থাও

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছিল। বিদায়কালে মহিলাগণকে সিন্দূর, পান ও মাল্য চন্দন দ্বারা ভূষিত করা হয়। অতঃপর শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী নৃত্য গীত ও কবিতা আবৃত্তির জন্য বালিকাগণকে পুরস্কার বিতরণ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, ও কাঠখোদাই, এচিং প্রভৃতি পদ্ধতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভই তাঁহার বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য। বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী ও এচিং, কাঠখোদাই, রঙীন কাঠখোদাই প্রভৃতির প্রদর্শনী হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের প্রদর্শনী শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ও বোম্বাই ভগিনী-সমাজের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল স্যর রিচার্ড টেম্পল প্রদর্শনীর উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এচিং, রঙীন কাঠখোদাই ইত্যাদি শিল্প-পদ্ধতি এই অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত না থাকায়, ঐ সকল ছবি আঁকিবার ও ছাপিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানিতে অনেক দর্শক আগ্রহ প্রকাশ করায়, রমেন্দ্রবাবু ঐ সকল বিষয়ে দর্শকদের সহিত আলোচনা করেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলো ও ছ

শ্রীখগেন্দ্র র

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
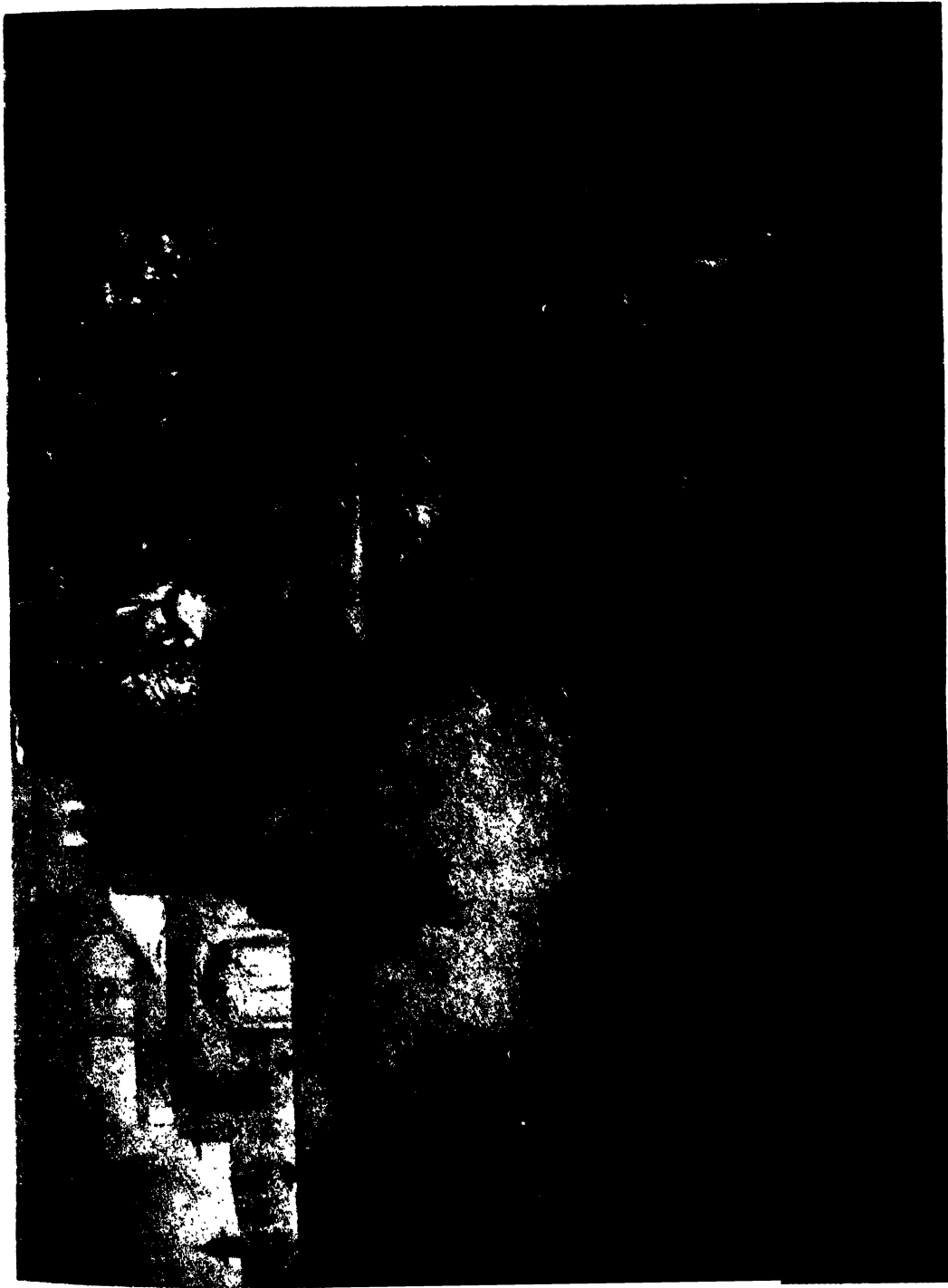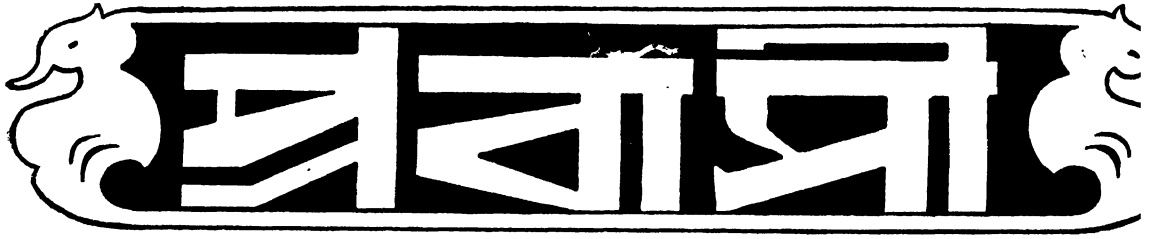
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

২য় সংখ্যা

তীর্থযাত্রিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে
শেষ আধক্রোশটুকু টেনে টেনে চলে কোনোমতে।
হাতে নাম-জপ ঝুলি,
পাশে তার রয়েছে পুঁটুলি।
ভোর হতে ধৈর্য ধরি' ব'াস' ইষ্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে,
আর কোনো ইষ্টেশনে আছে যেন আর কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্ঘ্যেরে ফিরে পায়,
যেথা গিয়ে ছায়া
কোনো এক রূপ ধরি পায় যেন কোনো এক কায়া।
বুকের ভিতরে ওর পিছু হতে দেয় দোল,
আশৈশব পরিচিত দূর সংসারের কলরোল।
প্রত্যাখ্যাত জীবনের প্রতিহত আশা
অজানার নিরুদ্দেশে প্রদোষে খুঁজিতে চলে বাসা

যে-পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন,
সেখানে নবীন
আলোকে আকাশ ওর মুখ চেয়ে উঠেছিল হেসে।

সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।
যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে সুখে মেশা,
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।
আজিকে চলেছে যারা খেলার সঙ্গীর আশে
ওরে ঠেলে যায় পথপাশে ;
যারা চায় দুর্গমের সাথী
পারে না তাদের পথে জ্বালাইতে বাতি
জীর্ণ কম্পমান হাতে
দুর্যোগের রাতে।
একদিন যারা সবে এ পথ নির্ম্মাণে
লেগেছিল আপনার জীবনের দানে,
ও ছিল তাদেরি মাঝে
নানা কাজে,
সে পথ উহার আজ নহে।
সেথা আজি কোন্ দূত কী বারতা বহে
কোন্ লক্ষ্য পানে
নাহি জানে।
পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্ম্মূল্য কিছুরে।
হায় সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

সংসারে মরীচিকারে বিশ্বাস করিয়াছিল ও যে
সংসার-বাহিরতীরে পুন ফিরে তারি ব্যর্থ খোঁজে॥

আলমোড়া
২২ মে ১৯৩৭

জাপ ও জপমালা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সাধকেরা সাধনার সহায়রূপে যে-সব পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তাহার মধ্যে "জপ" একটি প্রধান সহায়। তাই সাধকরা জপকে মহাপথ বলেন।

"ক্রিয়া" সকলের সাধ্য নহে, "ধ্যান" শক্তিমানেরই শক্য, কিন্তু "জপ" সকলের পক্ষেই সহজ পথ। ভগবানের কোনো একটি বিশেষ নাম, প্রণব বা মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বার বার তাহার আবৃত্তিই হইল "জপ" বা "জাপ"।

সাধনার প্রারম্ভে এই নামজপ এক এক সময় সাধকের বড়ই নীরস মনে হয়, অথচ ঠিক পথে চালিত হইলে এই নামজপ অমৃতরসে ভরিয়া উঠে। শক্তিহীন শক্তিমান উভয় প্রকারের সাধকই ইহাতে পরম সহায়তা পাইয়া থাকেন।

আমাদের দেশের এক জন বিশ্ববিশ্রুত মহাপ্রতিভাশালী সাধককে আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনার সাধনার পথের প্রধান আশ্রয় কি?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "জপ"। তিনি বলিয়াছিলেন, "পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের কোনো একটি স্বরূপনাম লইয়া আমি দিনের পর দিন নিরন্তর জপ করিয়া যাই। প্রথমে ইহাতে কোনো আলোক পাই না, যেন শুধু দৈহিক ব্যাপারের মত মনে হয়, কিন্তু তাহাতেও কখনও আমি হাল ছাড়ি না। পরিশেষে আমার সমস্ত অন্তর যখন জপে জপে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, তখন আমি মনে করি আমার জপ সার্থক হইয়াছে।"

পৃথিবীতে এখন যে কয়টি প্রধান ধর্ম্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই নামজপের প্রথা আছে। কিন্তু মনে হয় ইহার আদি এই ভারতেই। শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই মতই ভক্তিমূলক। এই উভয় মতের মধ্যেই ভগবানের নামের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়। কাজেই এই উভয় মতের মধ্যেই অতি পুরাতন কাল হইতে জপ প্রচলিত। ইহাঁদের আদিগুরুরাই জগতে প্রথম নামজপের পথ দেখান। জৈন ও বৌদ্ধরা পরে ইহাঁদের কাছেই নামজপ-প্রণালী গ্রহণ করেন।

প্রথমে সব দেশেই জপ অঙ্গুলীদ্বারাই গণিত হইত। অঙ্গুলির গণনাতে যাঁহারা সংখ্যা ঠিক রাখিতে না পারিতেন বা সংখ্যার দিকে বেশী মন দিতে হইত বলিয়া নামের উপর ধ্যানে কম্‌তি পড়িত, তাঁহারা পাথরের বা কাঠের গুটি ব্যবহার করিতেন। পাথর বা কাঁকরের গুটিকে calculus বলে। তাহাতেই সংখ্যার নাম হইল calculation বা গণনা। ইহুদীরা বহুদিন এই ভাবেই জপ করিয়াছেন। ভারতেই বোধ হয় প্রথম সূত্র দিয়া গুটিগুলি গাঁথিয়া জপমালা রচিত হইল। ভারতে এখন দেখা যায় যে শৈবদের জপমালা সাধারণতঃ রুদ্রাক্ষ দিয়া তৈরি। নেপালী বীজ ছাড়া দক্ষিণ-ভারত, মলয়, যবদ্বীপ ও ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ হইতে সাধারণতঃ রুদ্রাক্ষ আসে। শৈব জপমালা প্রায়ই বত্রিশ বা চৌষট্টি বা ছিয়ানব্বই গুটির। কখনও কখনও বৈষ্ণবদের মত ১০৮ গুটিরও হয়। কুলাচার, গুরুর উপদেশ প্রভৃতি কারণে মালাতে গুটির সংখ্যার কম্‌তি-বাড়তি হয়।

বৈষ্ণবদের জপমালা প্রায়ই ১০৮ গুটির। তুলসী বা চন্দন-কাষ্ঠ, গোপীমৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণে ইহাঁদের গুটি রচিত। গোপীমৃত্তিকার প্রধান স্থান হইল দ্বারকার নিকট গোপীতালাও নামক তীর্থ। কণ্ঠির জন্য বেলের মালাও ব্যবহৃত হয়।

তান্ত্রিকদের মহাশঙ্খমালার কথা অনেকেরই জানা আছে। স্ফটিকের, নানাবিধ মণি ও বহুমূল্য পাথরের, প্রবালের, শঙ্খের ও রুদ্রাক্ষের মালাও ইহাঁরা ব্যবহার করেন। ভদ্রাক্ষ-বীজ ও পদ্মবীজও ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো প্রকার ফুলের বীজেও মালা হয়। তাহার মূল্য সুলভ বলিয়া বাজারে খুব চলে।

মধ্যযুগের ধর্ম্মের মধ্যে শিখধর্ম্ম বিশেষ করিয়া জপ-পরায়ণ। শিখদের জপমালা হয় গ্রন্থিবদ্ধ সূত্রের অথবা লৌহগুটির। কবীর, দাদূ প্রভৃতি ভক্তদের বাণীর মধ্যে মালার সাহায্যে জপের নিন্দা থাকিলেও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে জপের বিলক্ষণ পসার আছে।

পৃথিবীতে যদি কোথাও জপের একান্ত প্রভাব থাকে তবে তাহা তিব্বতে। তাঁহাদের জপমালাতেও ১০৮ গুটি। তাঁহারা নিজেরা মালা জপ তো করেনই তাহা ছাড়া "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" মন্ত্র দিয়া যেসব জপ-চক্র রচিত, তাহা সাধকদের হাতে, নদীর বেগে, বায়ুর প্রবাহে নানা দিকে নানা ভাবে নিরন্তর ঘুরিতেছে। সে দেশে সন্ন্যাসী গৃহস্থ সবার হাতেই নিরন্তর চলিয়াছে জপমালা। ১০৮ সংখ্যাটি তাঁহাদের এত পবিত্র যে তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থেরও ১০৮ ভাগ। কোথাও কোথাও এই ১০৮ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র মেরুও তাঁহাদের থাকে।

চীন দেশে এক একজন সাধক গুহাতে আপনাকে ১৫।২০।৩০ বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া জপ-সাধনায় আপনাকে উৎসর্গ করেন। পাংগী লাহৌল প্রভৃতি প্রদেশে এইরূপ সাধকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে।

চীন দেশেও জপমালার গুটি ১০৮টি, তবে মালাটির তিন ভাগ। প্রতি ভাগেই ৩৬টি গুটি। ১৮ গুটির ছোট জপমালাও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। চীন দেশে কাইফেং নগরের একটি বৃদ্ধ সাধু স্নেহভরে তাঁহার জপমালা আমাকে দেন, তাহাতে ১৮টি গুটি। এই গুটিগুলি অষ্টাদশ অর্হতের প্রতীক। গুটিগুলি চন্দনকাঠের। ভারত হইতেই এক সময় চীনে গিয়াছিল। চীনে নানাবিধ মণিরত্ন ও বহুমূল্য পাথরের জপমালা প্রস্তুত হয়। জেড (Jade)-মণির মালাই অত্যন্ত সমাদৃত। ব্রহ্মদেশেও জেডের জপমালার প্রচলন আছে। এই জেড প্রস্তর অতিশয় ঠাণ্ডা। ইহার যে সব নকল ইউরোপ হইতে আসে তাহাতে এই অপূর্ব্ব শীতলতাগুণ নাই। চীনে লোয়াং প্রদেশে এমন সব জপপরায়ণ সাধক দেখিয়াছি যাহা না দেখিলে প্রত্যয় হয় না। যে কোনো দেশে তেমন জপযোগী দুর্লভ। নিরন্তর জপে তাঁহারা ভারতীয় সাধকদেরও হারাইয়াছেন।

কোরিয়াতেও জপমালার গুটি ১০৮টি কিন্তু তাঁহাদের দুইটি অতিরিক্ত মেরু থাকাতে সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০টি। তাঁহারা বলেন "আমাদের সংখ্যা হইল ১০৮, মেরু দুইটি সংখ্যায় ধরি না।"

জাপানেও জপমালার খুব পসার। তাঁহাদের জপমালায় ১১২টি গুটি। গুটিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগে ৫৬টি গুটি থাকে। জাপানে জপসাধনার খুব প্রচলন। কোবে-নগরের নিকট একটি পল্লীতে ফুজী-নো-সান নামে এক গৃহস্থ ভক্তকে রাত্রি ২টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত জপসাধন করিতে দেখিয়াছি। সে দেশের জপের মর্ম্ম তাঁহার কাছে অনেক শুনিয়াছি।

ব্রহ্মদেশের জপমালার গুটির সংখ্যা সাধারণতঃ ৭২টি; ১০৮ গুটির জপমালাও প্রচলিত। এই সব বৌদ্ধ দেশে ভারতীয় বোধিবৃক্ষের কাঠই গুটির প্রশস্ত উপকরণ। চন্দনকাঠও ব্যবহৃত হয়। স্ফটিক, শিলা, প্রবাল, পদ্মবীজ এবং শঙ্খেরও প্রচলন কোথাও কোথাও আছে।

ব্রহ্মদেশে যে বেতেরও জপমালা হয় তাহা জানিতাম না। সম্প্রতি দেখিলাম বেতের চমৎকার জপমালা হয়। তাহাতে লাল রং দেওয়ায় মনে হয় রক্ত-প্রবালের মালা।

সেমেটিক ধর্ম্মের তিনটি প্রধান শাখা—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান। তাহার মধ্যে প্রাচীনতম হইল ইহুদী ধর্ম্ম। ইহুদীদের মধ্যে জপমালার বেশী প্রচলন ছিল না। তবে পরে তাঁহারাও ইহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাঁদের জপ-গুটির সংখ্যা ৩২ বা ৯৯টি।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রথম দিকে জপমালার প্রচলন ছিল না। এমন কি কিছু বিরুদ্ধতাও ছিল। কেহ কেহ বলেন ক্রুসেডের সময় তাঁহারা মুসলমান সাধুদের কাছে জপমালার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্রুসেডের পূর্ব্বেও খ্রীষ্টীয় জগতে জপমালার প্রমাণ মেলে। খুব সম্ভব বৌদ্ধ ও ম্যানিকিয়ন-দের কাছে তাঁহারা এই বস্তুটি পান। চতুর্থ শতাব্দীতে মিশরদেশীয় ভক্ত পল দৈনিক ৩০০ বার প্রার্থনা-মন্ত্র জপ করিতেন। তিনি কাঁকরের সাহায্যে জপসংখ্যা ঠিক করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই যুগে কোথাও কোথাও কাঁকর দিয়া সব গণনাই চলিত।

মুসলমানদের মধ্যেও পূর্ব্বে জপমালা ছিল না, জপ যখন তাঁহাদের ধর্ম্মে প্রবেশ করিল তখন অঙ্গুলির দ্বারাই

সংখ্যা ঠিক রাখা হইত। তাঁহাদের মধ্যে সুফীরাই প্রথম জপমালা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদের মালাজপই নানা হাত ঘুরিয়া তাঁহাদের কাছে যায়। এখন মুসলমান সাধকদের মধ্যেও জপ-সাধনাটা এমন নিষ্ঠা ও ভক্তির দ্বারা পালিত হয় যে তাহা একেবারে অপরিহার্য্য। মিশরে তো উচ্চবংশীয় ও ধনীদের মধ্যে ভাল বেশভূষার মত জপমালাও একটা আভিজাত্যের চিহ্ন।

কোরাণে জপমালার কথা নাই। কোরাণের পরে যে-সব জিনিষ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়াছে তাহার নাম "বিদত" অর্থাৎ প্রাচীন বিধির "ব্যভিচার"। কিন্তু জপমালা "বিদত" হইলেও ক্রমে তাহা ভাল "বিদত" বলিয়া পরিগণিত হয়। এখনও শুদ্ধ কোরাণাশ্রয়ী ও ওয়াহাবীগণ জপমালাকে পৌত্তলিকতার পর্য্যায়েই ফেলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের মধ্যেও জপের প্রথা আসিয়া পড়িয়াছে। তবে আপত্তিকারীরা জপমালার বদলে অঙ্গুলির দ্বারাই জপ করেন।

মুসলমানদের জপমালার গুটির সংখ্যা সাধারণতঃ ৯৯টি, কারণ আল্লার ৯৯টি নাম। কেহ কেহ রসুলের ১০১টি নামের জন্য ১০১ গুটির মালাও ব্যবহার করেন।

মুসলমান সাধকরা জপমালাতে কাঠের গুটির ব্যবহার করেন। মক্কার মাটির গুটিও জপমালাতে প্রশস্ত। কারবালা হইল শিয়াদের পবিত্র তীর্থ, তাই শিয়াগণ কারবালার মাটির গুটির অত্যন্ত সমাদর করেন। এই গুটিগুলি নাকি হুসেনের "কতল" রাত্রে লাল বর্ণ হইয়া উঠে। প্রতি বৎসর মহরম মাসের নবম রাত্রিটি "কতল" রাত্রি। আরবদেশের খেজুরের বীজের মালাও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। খেজুর সেই দেশের প্রধান ফল। উটের হাড়, স্ফটিক, অম্বরমণি বা কেহেরবা ও নানাবিধ বীজেরও মালা ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিমে কাশী, বালিয়া প্রভৃতি জেলায় ভুট্টা বা মকাইর বীজেও মালা হয়। মকাইর সঙ্গে মক্কার নাম-সাদৃশ্য আছে বলিয়া কি তাহা আদৃত? মঙ্গোলিয়ায় মুসলমানদের পদ্মবীজ-মালা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। সেই দেশে বৌদ্ধদের জপমালাও পদ্মবীজের।

মিশর দেশে হাজার গুটির বিরাট এক রকম জপমালা আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে সমাধি দিবার দিন, রাত্রে জন-পঞ্চাশেক ফকীর মিলিয়া সেই বিরাট মালায় জপ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মুসলমান ধর্ম্মে কোরাণের মধ্যে জপমালার কথা নাই, জপমালা তাই "বিদত" অর্থাৎ অভিনব "আমদানী"। তবে এই আমদানীকে তাঁহারা "ভাল-আমদানী" অর্থাৎ "হসন্"-বিদত নাম দিয়াছেন। হউক অভিনব, আজ ওয়াহবী ছাড়া সকল মুসলমান সাধকের হাতেই জপমালা। ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বত্র আল্লা ও রসুলের নাম-জপ এই জপমালায় চলিয়াছে। কাজেই নিঃসঙ্কোচে এই কথা বলা যায় যে জগতে নূতন বা পুরাতন এমন কোনো ধর্ম্ম নাই যাহাতে নামজপ না আছে, এবং জপমালা যেখানে সাধনার সহায়ক রূপে ব্যবহৃত না হয়।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজের খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলা দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই আরণ্য-ভূমির নির্জ্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এক-একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যাই। কাছারির কাছে তবুও লোকজনের গলা শুনিতে পাওয়া যায়, রশি দুই-তিন গেলেই কাছারি-ঘরগুলা যেমন দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশ-জঙ্গলের আড়ালে পড়ে তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। তার পর যত দূর যাওয়া যায়, চওড়া মাঠের দু-ধারে ঘন বনের সারি বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, শুধু বন আর ঝোপ, গজারি গাছ, বাব্‌লা বন্য কাঁটা বাঁশ, বেত ঝোপ। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে—সন্ধ্যার বাতাসে বন্যপুষ্প ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, প্রতি ঝোপ পাখীর কাকলীতে মুখর, তার মধ্যে হিমালয়ের বনটিয়াও আছে। মুক্ত, দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির মেলা।

এই সময় সম্মুখের ও পশ্চাতের নির্জ্জনতার দিকে চাহিয়া যেমন মন হু হু করিত, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মাঝে মাঝে মনে হইত যে, এখানে প্রকৃতির যে-রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যত দূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ—মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্য্যন্ত মনকে ও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই।

কাছারি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা নাবাল জায়গা আছে, সেখানে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী ঝরণা ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার দু-পারে জলজ লিলির বন, কলিকাতার বাগানে যাহাকে বলে স্পাইডার-লিলি। বন্য স্পাইডার-লিলি কখনো দেখি নাই, জানিতামও না যে এমন নিভৃত ঝরণার উপল-বিছানো তীরে ফুটন্ত লিলি ফুলের এত শোভা হয় বা বাতাসে তাহারা এত মৃদু কোমল সুবাস বিস্তার করে। কত বার গিয়া এখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জ্জনতা উপভোগ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতেই পাই নাই। যে কখনো এমন নির্জ্জন আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বন-প্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না-বেড়াইয়াছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ! কাছারি হইতে দশ-পনের মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সার্ভে পার্টি কাজ করিতেছে, প্রায়ই আজকাল সকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ার পিঠে জিন কসিয়া সেই যে ঘোড়ায় উঠি, কোনো দিন ফিরি বৈকালে, কোনো দিন বা ফিরিবার পথে জঙ্গলের মাথার ওপর নক্ষত্র ওঠে, বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করে, জ্যোৎস্নারাতে বনপুষ্পের সুবাস জ্যোৎস্নার সহিত মেশে, শৃগালের রব প্রহর ঘোষণা করে, জঙ্গলে ঝিঁঝি-পোকা দল বাঁধিয়া ডাকিতে থাকে।

৫

যে কাজে এখানে আসা, তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য। আর একটা ব্যাপার এখানে আসিয়া জানিয়াছি, এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্ব্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায়

ভাঙিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই-সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছে না। মোটা সেলামী ও বর্দ্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চায়। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহারা বার বার অনুরোধ উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না।

আমার কাছেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম কোনো পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনতঃ দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে কেহ মজুরী করিয়া খায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায়— প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

এদিকে নূতন প্রজা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী জেলা হইতে লোক যাহারা আসে, দর শুনিয়া পিছাইয়া যায়। দু-পাঁচ জন কিছু কিছু লইতেছেও। এইরূপ মৃদু গতিতে অগ্রসর হইলে দশহাজার বিঘা জঙ্গলী জমি প্রজাবিলি হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর লাগিয়া যাইবে। অবিনাশ বিশেষ করিয়া পত্র লিখিয়াছে, জমি বন্দোবস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত আমায় এখানে থাকিতেই হইবে।

আমাদের এক ডিহি কাছারি আছে—সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল—এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লব্‌টুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল, সেখানেও তেমনি, কেবল সেখানে কাছারি রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়। এ বাদে সেখানে প্রায় দু-তিন শ' বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষাকীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুল-বন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনায় একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারি আছে।

কুল-বন ইজারা দেওয়ার সময় আসিতেছে, এক দিন ঘোড়া করিয়া লব্‌টুলিয়াতে রওনা হইলাম। আমার কাছারি ও লব্‌টুলিয়ার মাঝখানে একটা উঁচু রাঙামাটির ডাঙা প্রায় সাত-আট মাইল লম্বা, এর নাম 'ফুলকিয়া বইহার'— কত ধরণের গাছপালা ও ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় বন এত ঘন, যে ঘোড়ার গায়ে ডালপালা ঠেকে, ফুলকিয়া বইহার যেখানে নামিয়া গিয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিল, চানন্ বক্সিয়া একটি পাহাড়ী নদী সেখানে উপল-খণ্ডের উপর দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে, বর্ষাকালে সেখানে জল খুব গভীর—শীতকালে এখন তত জল নাই।

লব্‌টুলিয়ায় এই প্রথম আসিলাম, অতি ক্ষুদ্র এক খড়ের ঘর, তার মেজে জমির সঙ্গে সমতল, ঘরের বেড়া পর্য্যন্ত শুক্‌নো কাশের, বনঝাউয়ের ডালের পাতা দিয়া বাঁধা। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিলাম—এত শীত যেখানে থাকি সেখানে নাই, শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম বেলা না পড়িতেই।

সিপাহীরা বনের ডালপালা জ্বালাইয়া আগুন করিল, সেই আগুনের ধারে ক্যাম্প-চেয়ারে বসিলাম, অন্য সবাই গোল হইয়া আগুনের চারিধারে বসিল।

কোথা হইতে সের পাঁচেক একটা রুই মাছ পাটোয়ারী আনিয়াছিল, এখন কথা উঠিল, রান্না করিবে কে। আমি সঙ্গে পাচক আনি নাই। নিজেও রান্না করিতে জানি না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাত-আট জন লোক লব্‌টুলিয়াতে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে কণ্টু মিশ্র নামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে পাটোয়ারী রান্নার জন্য নিযুক্ত করিল।

পাটোয়ারীকে বলিলাম—এ-সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে?

পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দুদিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। বলিলাম—সে কি?

আমি ত নিমন্ত্রণ করি নি এদের, তবে এরা আসছে কেন?

—হুজুর, এরা বড় গরীব। ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে।

বাংলা দেশের লোকে বড় বেশী সভ্য হইয়া গিয়াছে ইহাদের তুলনায়, মনে হইল। কেন জানি না, এই অন্ন-ভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে রাত্রে এত ভাল লাগিল। আগুনের চারি ধারে বসিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে গল্প করিতেছিল, আমি শুনিতেছিলাম প্রথমে তাহারা আমার আগুনে বসিতে চাহে নাই আমার প্রতি সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য—আমিই তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। কণ্টু মিশ্র কাছে বসিয়াই আসান কাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া মাছ রাঁধিতেছে—ধূনা পুড়াইবার মত সুগন্ধ বাহির হইতেছে ধোঁয়া হইতে—আগুনের কুণ্ডের বাহিরে গেলে মনে হয় যেন আকাশ হইতে বরফ পড়িতেছে—এত শীত।

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত হইয়া গেল অনেক। কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশী, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশী দূর নয় বলিয়া?

আগুনের ধারে আমরা সাত-আট জন লোক, সামনে ছোট ছোট দু-খানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকী এতগুলি লোক। আমাদের চারি ধার ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাচার উপরে নক্ষত্র-ছাড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল এ রাত্রিটি, এবং এই সব মানুষের সঙ্গ। যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে অন্য এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।'

এক জন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের লোককে এ-দলের মধ্যে আমার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল। তা পর্য্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে আমি লক্ষ্য করিতে ছিলাম সে সকলের দিকে কেমন কুণ্ঠিত ভাবে চাহিতেছিল, কারও কথায় কোনো প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ কথা যে সে কম বলিতেছিল তা নয়।

আমার প্রতি কথার উত্তরে কেবল সে বলে—হুজুর।

এদেশের লোকে যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে অল্প ঝুঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে—হুজুর।

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি?

আমি যে তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব, এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল—ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তার পর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্ব্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জ্জন অরণ্যময় ফুলকিয়া বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া কখনও ঠাকুরপূজা করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতী করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরী নাই, পর্ব্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, ফুলকিয়া বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বস্তি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ

চরাইতে আনে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে বাথানে ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

আসিয়াছে কেন, সে কথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজী?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার বাবু এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোক কি খেতে পায় না?

—কোথায় পাবে হুজুর। নউগাছিয়ায় মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমতন্ন ছিল, সে বড়-লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছে, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ রাত্রে শীত যখন বেশী পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্য্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল, ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষ মানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্ব্বতা হইতে ন' মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি এই বয়সেও কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ গনোরী তেওয়ারীর বয়সই ত ছাপ্পান্নর বেশী।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল—শীতে মুখ বাহির করাও যেন কষ্টকর, এমন যে শীত এখানে তা না-জানার দরুণ উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোষক আনি নাই। কলিকাতায় যে-কম্বল গায়ে দিতাম, সেখানাই আনিয়াছিলাম—শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে-দিকটা তবুও থাকে এক রকম, অন্য কাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন্ করিতেছে সে-পাশে—মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম। পাশেই জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন সম্মিলিত পদশব্দ—কাহারা যেন দৌড়িতেছে—গাছপালা, শুকনো বন-ঝাউয়ের গাছ মট্ মট্ শব্দে ভাঙিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে।

কি ব্যাপারখানা! কিছু বুঝিতে না-পারিয়া সিপাহী বিষ্ণুরাম পাঁড়ে ও স্কুলমাষ্টার গনোরী তেওয়ারীকে ডাক দিলাম। তাহারা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া বসিল—কাছারির মেঝেতে যে-আগুন জ্বালা হইয়াছিল, তাহারই শেষ দীপ্তিটুকুতে ওদের মুখে আলস্য, সম্ভ্রম ও নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। গনোরী তেওয়ারী কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই বলিল—কিছু না হুজুর, নীল গাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে জঙ্গলে—

কথা শেষ করিয়াই সে নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলগাইয়ের দল' হঠাৎ এত রাত্রে অমন দৌড়বার কারণ কি?

বিষ্ণুরাম পাঁড়ে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—হয়তো কোনো জানোয়ারে তাড়া করে থাকবে হুজুর—এ ছাড়া আর কি?

—কি জানোয়ার?

—কি আর জানোয়ার হুজুর, জঙ্গলের জানোয়ার। শের হ'তে পারে—নয়তো ভালু—

যে-ঘরে শুইয়া আছি, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাশডাঁটায় বাঁধা আগড়ের দিকে নজর পড়িল। সে-আগড়ও এত হালকা যে বাহির হইতে একটি কুকুরে ঠেলা মারিলেও তাহা ঘরের মধ্যে উল্টাইয়া পড়ে—এমন অবস্থায় ঘরের সামনেই জঙ্গলে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে বাঘ বা ভালুকে বন্য নীলগাইয়ের দল তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ সংবাদটিতে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু পরেই ভোর হইয়া গেল।

দিন যত যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে

ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জ্জনতা ও অপরাহ্ণের সিঁদুর-ছড়ানো বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশঃ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বন-প্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, বনপুষ্পের সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।

এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যায় আসিল অপূর্ব্ব রক্ত-মেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্রে আসিল উন্মাদিনী ভৈরবী বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালী-মূর্ত্তিতে।

এক দিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে, সেদিন দোলপূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত হেড-আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়ত যত দিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনো বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ-প্রমোদের পরে ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ আরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথ রাত্রি। সে জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বন-ঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্দ্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দেখিলে মনে কেমন যেন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারি ধারে চাহিয়া দেখিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে হিমবর্ষী আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোনো নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণ-ভূমিতে পরিণত হয়, আমি এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়। তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কখনো ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্য্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যত দিন না-হয় তত দিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জ্জনতা, অমন দিকদিগন্ত-বিসর্পিত বনানী—যেখানে সেখানে সুলভ নয় তো? জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত, যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

একদিন ডিহি আজমাবাদের সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার মুখে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। বনের ভূমি সর্ব্বত্র সমতল নয়, কোথাও উঁচু জঙ্গলাবৃত বালিয়াড়ি টিলা, তার পরই দুই টিলার মধ্যবর্ত্তী

ছোটখাট উপত্যকা। জঙ্গলের কিন্তু কোথাও বিরাম নাই—টিলার মাথায় উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি কোনো দিকে কাছারির মহাবীরের ধ্বজার আলো দেখা যায়—কোনো দিকে আলোর চিহ্নও নাই—শুধু উঁচুনীচু টিলা ও ঝাউবন আর কাশবন—মাঝে মাঝে শাল ও আসান গাছের বনও আছে। দুই ঘণ্টা ঘুরিয়াও যখন জঙ্গলের কূলকিনারা পাইলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়িল নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করি না কেন। গ্রীষ্মকাল, কালপুরুষ দেখি প্রায় মাথার উপর রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না কোন্‌দিক হইতে আসিয়া কালপুরুষ মাথার উপর উঠিয়াছে—সপ্তর্ষিমণ্ডলও খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌নিরূপণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোড়াকে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিলাম। মাইল দুই গিয়া জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি বর্গহাত আন্দাজ পরিষ্কার স্থানে একটা খুব নীচু ঘাসের খুপরি। কুঁড়ের সামনে গ্রীষ্মের দিনেও আগুন জ্বালানো। আগুনের নিকট হইতে একটু দূরে একটা লোক বসিয়া কি করিতেছে।

আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে? তার পরেই আমায় চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিল ও আমাকে খুব খাতির করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল।

পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, প্রায় ছ'ঘণ্টা আছি ঘোড়ার উপর, কারণ সার্ভে-ক্যাম্পেও আমিনের পিছু পিছু ঘোড়ায় টো টো করিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়াছি। লোকটার প্রদত্ত একটা ঘাসের চেটাইয়ে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি? লোকটা বলিল—গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা। এ অঞ্চলে গাঙ্গোতা জাতির উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন, তাহা আমি এতদিনে জানিয়াছিলাম—কিন্তু এ লোকটা এই জনহীন গভীর বনের মধ্যে একা কি করে বুঝিতে পারিলাম না।

বলিলাম—তুমি এখানে কি কর? তোমার বাড়ী কোথায়?

—হুজুর, মহিষ চরাই। আমার ঘর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে ধরমপুর, লছমনিয়াটোলা।

—নিজের মহিষ? কতগুলো আছে?

লোকটা গর্ব্বের সুরে বলিল—পাঁচটা মহিষ আছে, হুজুর।

পাঁচটা মহিষ? দস্তুরমত অবাক হইলাম। দশ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে পাঁচটা মাত্র মহিষ সম্বল করিয়া লোকটি এই বিজন বনের মধ্যে মহিষচরির খাজনা দিয়া একা খুপরি বাঁধিয়া মহিষ চরায়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই ছোট্ট খুপরিটাতে কি করিয়া সময় কাটায়—কলিকাতা হইতে নূতন আসিয়াছি, শহরের থিয়েটার-বায়োস্কোপে লালিত যুবক আমি—বুঝিতেই পারিলাম না।

কিন্তু এদেশের অভিজ্ঞতা আরও বেশী হইলে বুঝিয়াছিলাম কেন গনু মাহাতো ওভাবে থাকে তাহার অন্য কোন কারণ নাই—ইহাছাড়া, যে গনু মাহাতোর জীবনের ধারণাই এইরূপ। যখন তাহার পাঁচটি মহিষ আছে, তখন তাহাদের চরাইতে হইবে, এবং যখন চরাইতে হইবে, তখন জঙ্গলে কুঁড়ে বাঁধিয়া একা থাকিতেই হইবে। এ অত্যন্ত সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কি

গনু কাঁচা শালপাতার একটি লম্বা পিকা বা চুরুট তৈরি করিয়া আমার হাতে সসম্ভ্রমে দিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। আগুনের আলোতে উহার মুখ দেখিলাম—বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো—মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে, মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুনিয়া লওয়া যায়।

গনু আগুনে আরও বেশী কাঠ ফেলিয়া দিয়া নিজেও একটি শালপাতার পিকা ধরাইল। আগুনের আভায় খুপরির মধ্যে এক-আধখানা পিতলের বাসন চক্‌ চক্‌ করিতেছে। আগুনের কুণ্ডের মণ্ডলীর বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার ও ঘন বন। বলিলাম—গনু, একা এখানে থাক, জন্তু-জানোয়ারের ভয় করে না? গনু বলিল—ভয়ডর করলে কি আমাদের চলে হুজুর? আমাদের যখন এই ব্যবসা। সেদিন তো রাত্রে আমার খুপরির পেছনে বাঘ এসেছিল। মহিষের দুটো বাচ্চা আছে, ওঁদের ওপর তাক্‌। শব্দ শুনে রাত্রে উঠে টিন বাজাই, মশাল জ্বালি, চীৎকার করি। রাত্রে আর ঘুম

হ'ল না হুজুর। শীতকালে তো সারারাত এই বনে ফেউ ডাকে।

—খাও কি এখানে? দোকান-টোকান তো নেই, জিনিসপত্র পাও কোথায়? চাল ডাল—

—হুজুর, দোকানে জিনিষ কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাই? এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ আর একটু নুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়। সে সময় এক মাস এ-অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। দলে দলে মেয়েছেলে আসবে জঙ্গলে গুড়মী তুলতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রোজ রোজ খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক ভাল লাগে?

—কি করব হুজুর। আমরা গরীব লোক। বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাব কোথায়? ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাড়ে খায় দুবেলা। সারা দিন মহিষের পেছনে ভূতের মতন খাটি হুজুর, সন্ধের সময় ফিরি যখন তখন এত খিদে পায় যে যা পাই খেতে, তাই ভাল লাগে।

গনুকে বলিলাম—কলকাতা শহর দেখেছ গনু?

—না হুজুর। কানে শুনেছি। ভাগলপুর শহর একবার গিয়েছি, বড় ভারী শহর। ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি, বড় তাজ্জব চিজ হুজুর। ঘোড়া নেই, কিছু নেই, আপনা-আপনি রাস্তা দিয়ে চলছে।

গনুকে আমার লাগিল মন্দ নয়। এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে, ইহা মনে মনে স্বীকার করিতেই হইল।

গনুর জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে ও দু-তিন মাসের ঘি একত্র জমাইয়া ন' মাইল দূরবর্ত্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামা-ঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরীব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য। গনু সে-রাত্রে আমাকে কাছারিতে পৌছাইয়া দিল, কিন্তু গনুকে আমার এত ভাল লাগিল যে কত বার শান্ত বৈকালে তাহার খুপরির সামনে আগুন পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিয়া কাটাইয়াছি। দেশের নানারূপ তথ্য গনুর কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অত কেউ দিতে পারে নাই।

গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম—উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে-ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা ইত্যাদি। ওই নির্জ্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর যে-সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত—আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে-সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য। যেখানে-সেখানে বসিয়া যে-কোন গল্প শোনা চলে না, গল্প শুনিবার পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহার মাধুর্য্য যে কতখানি নির্ভর করে, তাহা গল্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। গনুর সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল বন্য-মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।

কিন্তু যেহেতু এই গল্পের একটি অদ্ভুত উপসংহার আছে—সে-জন্য সে-কথা এখন না-বলিয়া যথাস্থানে বলিব। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে, তবে অন্য ভাবে। আরণ্য প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে আরণ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে এক জন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

শীত কাটিয়া কবে বসন্ত পড়িয়াছিল, এখানে তাহা বুঝি নাই, কারণ এখানে ফুল ফোটে না, পাখীও ডাকে না। গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিক হইতে এক দল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

এক দিন অর্দ্ধশুষ্ক কাশের বনের ধারে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া কাজ করিতেছি, মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, নন্দলাল ওঝা সোনাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু পরে প্রায় পঞ্চান্ন বছরের একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া সেলাম করিল ও আমার নির্দ্দেশমত একটা টুলের উপর বসিল। বসিয়াই সে একটি পশমের থলে বাহির করিল। তাহার পর থলেটির ভিতর হইতে খুব ছোট একখানি জাঁতি ও দুইটি সুপারি বাহির করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল। পরে কাটা সুপারি হাতে রাখিয়া দুই হাত একত্র করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—সুপারি লিজিয়ে হুজুর।

সুপারি ও-ভাবে খাওয়া অভ্যাস না-থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হইতে আসা হচ্ছে, কি কাজ?

তাহার উত্তরে লোকটি বলিল, তাহার নাম নন্দলাল ওঝা, মৈথিল ব্রাহ্মণ। জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে কাছারি হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে সুংঠিয়া দিয়ারাতে তার বাড়ী। বাড়ীতে চাষবাস আছে, কিছু সুদের কারবারও আছে—সে আসিয়াছে তার বাড়ীতে আগামী পূর্ণিমার দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে—আমি কি তাহার বাড়ীতে দয়া করিয়া পদধূলি দিতে রাজী আছি? এ সৌভাগ্য কি তাহার হইবে?

এগার মাইল দূরে এই গ্রীষ্মে রৌদ্রে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার লোভ আমার ছিল না—কিন্তু নন্দলাল ওঝা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে অগত্যা রাজী হইলাম—তা ছাড়া এদেশে গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ণিমার দিন দুপুরের পরে দীর্ঘ কাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া কাহাদের একটি হাতী আসিতেছে দেখা গেল। হাতী কাছারীতে আসিলে মাহুতের মুখে শুনিলাম হাতীটি নন্দলাল ওঝার নিজের—আমাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। হাতী পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না—কারণ আমার নিজের ঘোড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পৌঁছিতে পারিতাম।

যাহাই হউক, হাতীতে চড়িয়াই নন্দলালের বাড়ীতে রওনা হইলাম। সবুজ বনশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে—দূর, দূর দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিকে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে—আমি সে-মায়ালোকের অধিবাসী—বহু দূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন আমায় অদৃশ্য যাতায়াত।

পথে চাম্‌টার বিল পড়িল, শীতের শেষেও সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্ত্তি। আর একটু গরম পড়িলেই উড়িয়া পলাইবে। মাঝে মাঝে নিতান্ত দরিদ্র পল্লী। ফণীমনসা ঘেরা তামাকের ক্ষেত ও খোলায় ছাওয়া দীন কুটীর।

সুংঠিয়া গ্রামে হাতী ঢুকিলে দেখা গেল পথের দু-ধারে সারবন্দী লোক দাঁড়াইয়া আছে আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য। গ্রামে ঢুকিয়া অল্প দূর পরেই নন্দলালের বাড়ী।

খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর আট-দশ খানা—সবই পৃথক পৃথক প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো। আমি বাড়ীতে ঢুকিতেই দুই বার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। চমকাইয়া গিয়াছি—এমন সময়ে সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া একটা বড় ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। চেয়ারখানি এদেশের শিশুকাঠে তৈয়ারী এবং এদেশের গ্রাম্য মিস্ত্রীর হাতেই গড়া। তাহার পর দশ-এগারো বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মত ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর, ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই—আমি আনাড়ির মত হাসিলাম ও বাটি হইতে আঙুলের আগায় একটু আতর তুলিয়া লইলাম মাত্র। মেয়েটিকে দু-একটি ভদ্রতাসূচক মিষ্ট কথাও বলিলাম। মেয়েটি থালা আমার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তার পর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। নন্দলাল যে ঘটা করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল যাহাতে করিয়া

আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শসার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনো দেখি নাই। আহারের পর নন্দলাল আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিল। আমায় দেখিবার জন্য উঠানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ও আমার দিকে এমন ভাবে চাহিতেছে যে আমি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব। শুনিলাম, ইহারা সকলেই নন্দলালের প্রজা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়া বলিল—হুজুরের নজর। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। এত টাকা কেহ কাহাকেও নজর দেয় না, তাছাড়া নন্দলাল আমার প্রজাও নয়। নজর প্রত্যাখ্যান করাও গৃহস্থের পক্ষে নাকি অপমানজনক—সুতরাং আমি থলি খুলিয়া একটি টাকা লইয়া থলিটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার ছেলেপুলেদের পেঁড়া খাইতে দিও।

নন্দলাল কিছুতেই ছাড়িবে না—আমি সে-কথায় কান না-দিয়াই বাহিরে আসিয়া হাতীর পিঠে চড়িলাম।

পরদিনই নন্দলাল ওঝা আমার কাছারিতে গেল, সঙ্গে তাহার বড় ছেলে। আমি তাহাদিগকে সমাদর করিলাম—কিন্তু খাইবার প্রস্তাবে তাহারা রাজী হইল না। শুনিলাম মৈথিল ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তের প্রস্তুত কোনো খাবারই খাইবে না। অনেক বাজে কথার পরে নন্দলাল একান্তে আমার নিকট কথা পাড়িল, তাহার বড় ছেলে ফুলকিয়া বইহারের তহশিলদারীর জন্য উমেদার—তাহাকে আমায় বাহাল করিতে হইবে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কিন্তু ফুলকিয়ায় তহশীলদার তো আছে—সে পোষ্ট তো খালি নেই? তাহার উত্তরে নন্দলাল আমাকে চোখ ঠারিয়া ইসারা করিয়া বলিল—হুজুর, মালিক তো আপনি। আপনি মনে করলে কি না হয়?

আমি আরও অবাক হইয়া গেলাম। সে কি রকম কথা! ফুলকিয়ার তহশীলদার ভালই কাজ করিতেছে—তাহাকে ছাড়াইয়া দিব কোন্ অপরাধে?

নন্দলাল বলিল—কত রূপেয়া হুজুরকে পান খেতে দিতে হবে বলুন, আমি আজ সাঁজেই হুজুরকে পৌছে দেব। কিন্তু আমার ছেলেকে তহশিলদারী দিতে হবেই হুজুরের। বলুন কত, হুজুর। পাঁচ-শ?...এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, নন্দলাল যে আমাকে কাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এ-দেশের লোক যে এমন, তাহা জানিলে কখনো ওখানে যাই? আচ্ছা ধড়িবাজ লোক তো!

নন্দলালকে স্পষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিলাম। বুঝিলাম; নন্দলাল আশা ছাড়িল না।

আর এক দিন দেখি, ঘন বনের ধারে নন্দলাল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কি কুক্ষণেই উহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম—দু-খানা পুরী খাওয়াইয়া সে যে আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে—তাহা আগে জানিলে কি উহার ছায়া মাড়াই?

নন্দলাল আমাকে দেখিয়া মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল—নোমোস্কার, হুজুর।

—হুঁ। তার পর এখানে কি মনে করে?

—হুজুর সবই জানেন। আমি আপনাকে বারো শ টাকা নগদ দেব। আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন।

—তুমি পাগল নন্দলাল? আমি বাহাল করবার মালিক নয়। যাদের জমিদারী, তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পার। তাছাড়া, বর্ত্তমানে যে রয়েছে—তাকে ছাড়াব কোন্ অপরাধে?

বলিয়াই বেশী কথা না বাড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ক্রমে আমার কড়া ব্যবহারে নন্দলালকে আমি আমার ও ষ্টেটের মহাশত্রু করিয়া তুলিলাম। তখনও বুঝি নাই, নন্দলাল কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ। ইহার ফল আমাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

উনিশ মাইল দূরবর্ত্তী ডাকঘর হইতে ডাক আনা এখানকার এক অতি আবশ্যক ঘটনা। অত দূরে প্রতিদিন লোক পাঠানো চলে না বলিয়া সপ্তাহে দু-বার মাত্র ডাকঘরে লোক যাইত। মধ্য-এশিয়ার জনহীন, দুস্তর ও ভীষণ

টাকলা-মাকান মরুভূমির তাঁবুতে বসিয়া বিখ্যাত পর্য্যটক স্বেন হেডিনও বোধ হয় এমনি আগ্রহে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। আজ আট-নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বনপ্রান্তরে সূর্য্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখিতে দেখিতে যে-বহির্জ্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি—ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হইত।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জওয়াহিরলাল সিং ডাক আনিতে গিয়াছে। আজ দুপুরে সে আসিবে। আমি ও বাঙালী মুহুরী বাবুটি ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে চাহিতেছি। কাছারি হইতে মাইল দেড় দূরে একটা উঁচু টিবির উপর দিয়া পথ। ওখানে আসিলে জওয়াহিরলাল সিংকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলা দুপুর হইয়া গেল। জওয়াহিরলালের দেখা নাই। আমি ঘন ঘন ঘরবাহির করিতেছি। এখানে আপিসের কাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন আমিনের রিপোর্ট দেখা, দৈনিক ক্যাশবহি সই করা, সদরের চিঠিপত্রের উত্তর লেখা, পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের আদায়ের হিসাব-পরীক্ষা, নানাবিধ দরখাস্তের ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের নানা আদালতে নানাপ্রকার মামলা ঝুলিতেছে—ঐ সকল স্থানের উকীল ও মামলা-তদ্বিরকারকদের রিপোর্ট পাঠ ও তার উত্তর দেওয়া—আরও নানা প্রকার বড় ও খুচরা কাজ প্রতিদিন নিয়মমত না করিলে দু-তিনদিনে এত জমিয়া যায় যে তখন কাজ শেষ করিতে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এক রাশি কাজ আসিয়া পড়ে—শহরের নানা ধরণের চিঠি, নানা ধরণের আদেশ, অমুক জায়গায় যাও, অমুকের সঙ্গে অমুক মহালের বন্দোবস্ত কর ইত্যাদি।

বেলা তিনটার সময় জওয়াহিরলালের সাদা পাগড়ী রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে দেখা গেল। বাঙালী মুহুরী বাবু হাঁকিলেন—ম্যানেজার বাবু, আসুন ডাকপেয়াদা আসছে—ঐ যে—

আপিসের বাহিরে আসিলাম। ইতিমধ্যে জওয়াহিরলাল আবার টিবি হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমি অপেরা-গ্লাস আনাইয়া দেখিলাম, দূরে জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ও বনঝাউয়ের মধ্যে সে আসিতেছে বটে। আর আপিসের কাজে মন বসিল না। সে কি আকুল প্রতীক্ষা! যে-জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য মানুষের মনের কাছে, তাহার মূল্য তত বেশী। এ-কথা খুবই সত্য যে এই মূল্য মানুষের মন-গড়া একটি কৃত্রিম মূল্য, প্রার্থিত জিনিসের সত্যকার উৎকর্ষ বা আকর্ষণের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জগতের অধিকাংশ জিনিসের উপরই একটা কৃত্রিম মূল্য আরোপ করিয়াই ত আমরা তাকে বড় বা ছোট করি।

জওয়াহিরলালকে কাছারির সামনে একটা অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ও-পারে দেখা গেল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। মুহুরী বাবু আগাইয়া গেলেন। জওয়াহিরলাল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া মুহুরী বাবুর হাতে দিল।

আমারও খান-দুই পত্র আছে—অতিপরিচিত হাতের লেখা। চিঠি পড়িতে পড়িতে চারি পাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। কোথায় আছি, কখনও ভাবি নাই আমি এখানে কোনদিন থাকিব, কলিকাতার আড্ডা ছাড়িয়া এমন জায়গায় দিনের পর দিন কাটাইব। একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"। জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে—এই নির্জ্জন বন-প্রদেশে—সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক হইবার অবকাশ আছে—এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে-অনুভূতিও আনয়ন করে।

যদি সত্য কথা বলিতে হয়, আজকাল জীবনে ভাবিয়া দেখিবার শিক্ষা এইখানে আসিয়াই পাইয়াছি। কত কথা মনে জাগে, কত পুরনো কথা মনে হয়—নিজের মনকে এমন করিয়া কখনও উপভোগ করি নাই। এখানে সহস্র

প্রকার অসুবিধার মধ্যেও সেই আনন্দ আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিতেছে দিন দিন।

অথচ সত্যই আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে একা পরিত্যক্ত হই নাই। কাছেই বোধ হয় বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে রেল-ষ্টেশন। সেখানে চড়িয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণিয়া যাইতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যে মুঙ্গের যাইতে পারি। কিন্তু প্রথম তো রেল-ষ্টেশন যাইতেই বেজায় কষ্ট—সে-কষ্ট স্বীকার করিতে পারি, যদি পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের শহরে গিয়া কিছু লাভ থাকে। এমনি দেখিতেছি কোনও লাভই নাই, না-আমাকে সেখানে কেউ চেনে, না-আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া?

কলিকাতা হইতে আসিয়া বই আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প ও আলোচনার অভাব এত বেশী অনুভব করি যে কতবার ভাবিয়াছি এ-জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। কলিকাতাতেই আমার সব, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গেরে কে আছে যে সেখানে যাইব? কিন্তু সদর-আপিসের বিনা অনুমতিতে কলিকাতায় যাইতে পারি না—তাছাড়া অর্থব্যয়ও এত বেশী যে দু-পাঁচ দিনের জন্যে যাওয়া পোষায় না। কাজেই বাধ্য হইয়া জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জনবাস করিতেছি। [ক্রমশঃ]

তোমারি লাগিয়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমারি লাগিয়া ভালবাসি আমি নিশীথ অন্ধকার
অন্ধকারেই এসেছিলে তুমি অভিসারিকার বেশে
জানি না কখন ফিরিয়া গিয়েছ হেরিয়া বন্ধ দ্বার
পায়ে-চলা পথ হারাল কোথায় বিজন বনের শেষে।

এলোমেলো ঝড় ভাল লাগে মোর শাঙন মেঘের দূত
মেঘছায়াঘন এলায়িত কেশে নব তারকার আলো
মেঘ-ডম্বুরী শাড়ীর আড়ালে জ্বলে নেবে বিদ্যুৎ
বরষার ধারা জলতরঙ্গে সুরের আগুন জ্বালো।

তোমারি সে সুর নিশিদিনমান গুঞ্জন করি প্রিয়ে
তোমার পায়ের চিহ্ন যে-পথে সেই পথে তোমা খুঁজি,
গভীর রাত্রি গুমরিয়া মরে তোমারি বিরহ নিয়ে
শেষ প্রহরের শ্রান্তি ঝিমায় অবসাদে চোখ বুজি।

একদিন শুধু এসেছিলে তুমি জ্যোৎস্না'বিভল রাতে
ফাগুন রাতের মদির আবেশে হৃদয় হইল ভোর
জ্যোৎস্নার মায়া-মন্থিত সুধা দিলাম তোমার হাতে
সে-মায়ারে তুমি ভালবাস তাই ভাল লাগিয়াছে মোর।

তোমারি লাগিয়া ভালবাসি সখী তন্দ্রাবিহীন শশী
দূর গগনের ছায়াপথ রচে তোমারি মোহিনী মায়া
মায়ার পৃথিবী অঘোরে ঘুমায় আমি জেগে থাকি বসি
এমন রাত্রি সম্মুখে মোর তুমি ধরিবে না কায়া?

সে কি তবে মায়া? ভ্রম সে আমার? তুমি আসিবে না আর?
বরষা রজনী কাটিবে বৃথায়, ফাল্গুনী পূর্ণিমা
তোমার স্মৃতির জ্যোৎস্না-জোয়ারে করিবে না পারাপার
নিখিল ধরণী হারাবে তাহার অপূর্ব্ব মাধুরিমা।

গোড়পাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

অদ্বয় ও অজাতি

পূর্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে গ্রন্থকার বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া নিজের বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক তাঁহার বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য কী। আমরা ইহাতে দেখিতে পাইব যে, তিনি একটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমত সুস্পষ্টভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

আচার্যগণের দুইটি শ্রেণি আছে। এক শ্রেণি (সাঙ্খ্য-প্রভৃতি[১]) সৎকার্যবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য নিজ কারণে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে (কেননা কোন অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না)। অপর শ্রেণি (বৈশেষিক প্রভৃতি[২]) অসৎকার্যবাদী, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য থাকে না, তাহা অসৎ। গোড়পাদ পূর্বোক্ত দুইটি কারিকার পরে ইঁহাদিগকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"ভূতস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি।
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্‌।"[৩]

'কোন-কোন বাদীরাই বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, আর অপর পণ্ডিতগণ অবিদ্যমান বস্তুর (উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন)। তাঁহারা (এইরূপে) পরস্পর বিবাদ করেন।'[৩]

আচার্য পরবর্তী কারিকায় আর এক শ্রেণির বাদীদের কথা উল্লেখ করিতেছেন যাঁহারা অ জা তি বা দ ঘোষণা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা বলেন যে, কোন বস্তুর জাতি বা উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই। কারিকাটি এই—

"ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে।
বিবদন্তোঽদ্বয়া হ্যেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে।"[৪]

ইহার অনুবাদ দেওয়ার পূর্বে ইহার পাঠসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মা ণ্ডু ক্য কা রি কা র ও তাহার শাঙ্কর ভাষ্যের বহু পুঁথিতে ও বহু সংস্করণে দ্বিতীয় অর্ধের প্রথমে বি ব দ ন্তো দ্ব য়া এই পাঠ দেখা যায়, এবং শাঙ্কর ভাষ্যে 'দ্বয়াঃ' শব্দই ধরিয়া তাহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'দ্বৈতিনঃ'। 'দ্বৈতী' বলিতে দ্বৈতবাদী, এখানে ইহা দ্বারা পূর্ব কারিকায় উক্ত সাঙ্খ্য-বৈশেষিক প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখানে অনুধাবন করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব কারিকায় জাতিবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (কাহারও মতে এই জাতি ভূত বা বিদ্যমান বস্তুর, কাহারও বা মতে অভূত বা অবিদ্যমান বস্তুর)। কিন্তু এই কারিকায় তাহার একবারে বিপরীত অজাতিবাদের কথা বলা হইতেছে। এমন কতক বাদী আছেন যাঁহারা কাহারও জাতি বা উৎপত্তি মানেন না। অতএব ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব কারিকায় যে সকল বাদীর কথা বলা হইয়াছে, এই কারিকায় উল্লিখিত বাদীরা তাঁহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'দ্বয়' পদের দ্বারা যদি পূর্ব কারিকায় উক্ত বাদিগণকে (দ্বৈতিগণকে অর্থাৎ সাঙ্খ্যপ্রভৃতিকে) লক্ষ্য করা হয় তবে ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, তাঁহারা অজাতিবাদী, কেনন পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা জাতিবাদী।

১। দ্রষ্টব্য সা ঙ্খ্য কা রি কা ৯; শাঙ্করভাষ্য-সহিত বে দা ন্ত সূ ত্র, ২. ১. ১৪-১৮; বৃ হ দা র ণ্য ক উ প নি ষ ৎ, শাঙ্করভাষ্য, ১. ২. ২: "কার্যস্য হি সতো জায়মানস্য কারণে সত্ত্বোপপত্তিদর্শনাৎ।" বৌদ্ধদের মধ্যে বৈভাষিক সৎকার্যবাদী। চ তুঃ শ ত ক, ৯.১৫।

২। দ্রষ্টব্য ন্যা য় ক ন্দ লী, বিজয়নগর-সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী, ১৮৯৫, পৃ, ১৪৩ ইত্যাদি। বৌদ্ধদের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বিজ্ঞান-বাদী অসৎকার্যবাদী, চ তুঃ শ ত ক, ৯. ১৫।

৩। আলোচ্য শ্লোকে ভূ ত ও অ ভূ ত শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য যথাক্রমে 'বিদ্যমান' ও 'অবিদ্যমান' করিয়াছেন এবং ইহা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু পূর্বে (৩. ২৩) ঐ দুই শব্দের অর্থ তাঁহার মতে যথাক্রমে 'পরমার্থ' ও 'মায়া'। করিবার বিষয়

দ্বিতীয়ত, 'দ্বয়' বলিতে 'দ্বৈতী' অর্থ কিরূপে হইতে পারে ইহাও বিচার করিতে হয়।[৪]

এখানে বস্তুত ও যুক্তিসঙ্গত পাঠ হইতেছে বি ব দ স্তো- ঽ দ্ব য়া (ঃ), অর্থাৎ আলোচ্য শব্দটি এখানে অ দ্ব য়, দ্ব য় নহে। আমার সঙ্কলিত সংস্করণের জন্য পঠিত Me চিহ্নিত পুঁথিতে এই পাঠই আছে। শ্রীমহেশচন্দ্র পালের সংস্করণেও[৫] এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। এই সংস্করণের শাঙ্কর ভাষ্যও এই পাঠ সমর্থন করে, আনন্দাশ্রমের ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে গৃহীত ক-সংজ্ঞক পুঁথিতেও ইহা বুঝা যায়।[৬]

এইবার উদ্ধৃত কারিকাটির অনুবাদ দিতে পারি :—

'বিদ্যমান কিছু জাত হয় না, অবিদ্যমানও জাত হয় না, এইরূপ বিবাদ করিয়া সেই অদ্বয়গণ অজাতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

এখানে অ দ্ব য় গ ণ কাহারা স্থির করিতে হইবে। আলোচ্য স্থলে অ দ্ব য় আর অ দ্ব য় বা দী একই। আপাত-দৃষ্টিতে কেহ মনে করিতে পারেন অ দ্ব য় বা দী বলিতে অ দ্বৈ ত বা দী। অনেকে এইরূপ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। যাঁহারা সামান্য সংস্কৃত জানেন তাঁহারাও জানেন যে, অ দ্ব য় বা দী হইতেছে বুদ্ধের নাম।[৭] কিন্তু কেন বুদ্ধকে অ দ্ব য় বা দী বলা হয়?

অনেক স্থানে ইহার ভাল উত্তর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অ দ্ব য় বা দী র অ দ্ব য় শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অদ্বৈত'।[৮] কিন্তু অ দ্ব য় বা দী র অ দ্ব য় শব্দের আর অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থগত ভেদ অনেক। তাই অ দ্ব য় বা দ আর অ দ্বৈ ত বা দ কখনও এক নহে। শাঙ্কর বেদান্তের অ দ্বৈ ত শব্দের অর্থ হইতেছে 'অভেদ', অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ। যে বাদের বিষয় হইতেছে এই অ দ্বৈ ত বা অভেদ তাহাই হইল অ দ্বৈ ত বা দ। আর যে বাদের বিষয় দ্ব য় অর্থাৎ দ্বিবিধ নহে, তাহা অ দ্ব য় বা দ। যিনি দ্ব য় অর্থাৎ দ্বিবিধ অর্থাৎ দুই প্রকার বলেন না তিনি অ দ্ব য় বা দী।[৯] বুদ্ধ ঐরূপ বলিতেন না, তাই তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। বুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অনুগামী অর্থাৎ বৌদ্ধগণের দ্ব য় ছিল না বলিয়া তাঁহাদিগকেও বলা হইত অ দ্ব য়।

বুদ্ধ দ্বিবিধ কী বলিতেন না? দুই অন্তের অর্থাৎ কোটির কোনটিকেই তিনি বলিতেন না। 'আছে' ইহা একটি অন্ত, 'নাই' ইহা অপর অন্ত; 'নিত্য' ইহা একটি অন্ত, 'অনিত্য' ইহা অপর অন্ত; 'উৎপন্ন' ইহা এক অন্ত, 'অনুৎপন্ন' ইহা অপর অন্ত; 'আগত' ইহা এক অন্ত, 'অনাগত' ইহা অপর অন্ত; ইত্যাদি, ইত্যাদি। বুদ্ধদেব

৪। পা ণি নি, ৫. ২. ৪৩ ("।। দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্ বা ।।")। কা শি কা—"দ্বাবয়বাবস্য দ্বয়ম্" অর্থাৎ যাহার দুইটি অবয়ব তাহা দ্বয়। বৃ. উপনিষদে (১. ৩. ১) আছে "দ্বয়া প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।" শঙ্কর এখানে 'দ্বয়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'দ্বিপ্রকার' ("দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ")। ঋ গ্বে দে (১. ১৪৭. ৪) সা য় ণ ও উহার অর্থ দ্বিবিধ' লিখিয়াছেন। অতএব বাঙলায় আমরা উহার অর্থ 'দ্বিপ্রকার' বা 'দ্বিবিধ' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি। ইংরাজীনবিশেরা বলিবেন—'twofold', 'double' অথবা 'of two kinds'.

৫। কলিকাতা, শকাব্দা ১৮০৬, ভাদ্র, পৃ. ৯৬।

৬। মূলে মুদ্রিত হইয়াছে "বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তো দ্বয়া দ্বৈতিনঃ।" পাদটীকায় ক-সংজ্ঞক পুঁথির পাঠ দেওয়া হইয়াছে "দ্বা অদ্বৈ"। মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে এখানে আছে "ঽদ্বয়া অদ্বৈতিনঃ।"

৭। অ ম র কো শ. ১. ১. ১৩-১৪ ("সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ"); ম হা ব্যু ৎ প ত্তি, ২৩; দি ব্যা ব দা ন, Cowell and Neil পৃ, ৯৫ ("বুদ্ধানাং ভগবতাং মহা-কারুণিকানাম্ অদ্বয়বাদিনাম্।"

৮। পূর্বোল্লিখিত অ ম র কো শে র টীকায় ভানুজিদীক্ষিত বলিতেছেন "অদ্বয়মদ্বৈতং বদত্যবশ্যম্।" ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন "অদ্বয়ং বিজ্ঞানাদ্বৈতং বদত্যবশ্যম্।" রঘুনাথ চক্রবর্তী (ইনি বুদ্ধের পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে কতক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন) ঠিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ন দ্বয়মদ্বয়ং তদ্ বদিতুং শীলমস্য।" দি ব্যা ব দা নে র সম্পাদকযুগলও অদ্বয়কে অদ্বৈত বুঝিয়া শব্দসূচীতে অ দ্ব য় বা দী না লিখিয়া ভুলে অ দ্বৈ ত বা দী লিখিয়াছেন।

৯। ইহার তিব্বতী প্রতিশব্দ gñis-su-med-pa-gsuṅ ba, আর চীনা প্রতিশব্দ pu-êrh-yü; এই উভয়েরই আক্ষরিক অর্থ হইতেছে "যিনি দুই বলেন না।" *Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary* (Memoir, Asiatic Society of Bengal, p. 2) নামক পুস্তকে এই শব্দটির অর্থ ভুল বুঝা হইয়াছে, কারণ উহা কখনই "not doubtful in his command" এই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না।

বলিতেন না যে, ইহা আছে; তিনি ইহাও বলিতেন না যে, ইহা নাই। তিনি বলিতেন না যে, ইহা নিত্য; তিনি ইহাও বলিতেন না যে, ইহা অনিত্য; ইত্যাদি। তিনি এই উভয়ই অন্ত পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম পথ (ম ধ্য মা প্র তি প দ্, পালি ম জ্ঝি মা প টি প দা) অবলম্বন করিয়া চলিতেন। তাই তাঁহার মতে কিছু সৎও (বিদ্যমান) নহে, অথবা কিছু অসৎও নহে; কিছু উৎপন্নও হয় না, বিনষ্টও হয় না; কিছু নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে; কিছু একও নহে, অনেকও নহে; কিছু আসেও না, যায়ও না; ইত্যাদি।[১০] এই অদ্বয়বাদের কথা সংস্কৃত ও পালি উভয়ই বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রচুর রহিয়াছে।[১১]

১০। নাগার্জুন বলিয়াছেন—

অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতং
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমং।
যঃ প্রতীত্যসমু পাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবং
দেশয়ামাস সম্বুদ্ধস্তং বন্দে বদতাং বরং॥

—ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি, পৃ. ১১।

নাগার্জুন এই তত্ত্বটিকেই সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বুদ্ধদেবের স্তব করিতেছেন—

সুখদুঃখাত্মনৈরাত্ম্যনিত্যানিত্যাদিষু প্রভো।
ইতিনানাবিকল্পেষু বুদ্ধিস্তব ন সজ্জতে॥

—নৈ রা ত্ম্য স্তো ত্র, ১০।

১১। অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তো নাস্তীত্যয়ং দ্বিতীয়োঽন্তঃ। যদনয়োর্দ্বয়োরন্তয়োর্মধ্যমিয়মুচ্যতে কাশ্যপ মধ্যমা প্রতিপদ্ ধর্মাণাং ভূতপ্রত্যবেক্ষা।

—কা শ্য প প রি ব র্ত, § ৬০ (পৃ. ৯০);
দ্রষ্টব্য ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি, পৃ. ২৭০।

যদ্ ভূয়সা কাত্যায়নায়ং লোকোঽস্তিতাং বাভিনিবিষ্টো নাস্তিতাং চ তেন ন পরিমুচ্যতে।—(ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি তে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৯) কা ত্যা য় না ব বা দ।

স্বয়ং নাগার্জুনও লিখিয়াছেন—

কাত্যায়নাববাদে চাস্তী [তি] নাস্তীতি চোভয়ং।
প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবাভাববিভাবিনা॥

ম ধ্য ম ক কা রি কা, ১৫. ৭।

অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবং॥

ঐ. ৫. ৮।

সম্মাদিট্‌ঠি সম্মাদিট্‌ঠীতি ভন্তে বুচ্চতি কিত্তাবতা নু খো ভন্তে সম্মাদিট্‌ঠি হোতীতি। দ্বয়নিস্সিতো খ্বায়ং কচ্চায়ন লোকো যেভুয্যেন অত্থিতং চেব নত্থিতং চ। (ছায়া— সম্যগ্দৃষ্টিঃ সম্যগ্দৃষ্টিরিতি ভদন্ত উচ্যতে। কিয়তা নু খলু ভদন্ত সম্যগ্দৃষ্টির্ভবতীতি। দ্বয়নিশ্রিতঃ খল্বয়ং কাত্যায়ন লোকো বহুভূয়সা অস্তিতাং চৈব নাস্তিতাং চ। — সং যু ত্ত নি কা য়, ২. পৃ. ১৭ (= ১২. ১৫)।

লোকসমুদয়ং খো কচ্চায়ন যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতো যা লোকে নত্থিতা সা ন হোতি। লোকনিরোধং খো কচ্চায়ন যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতো যা লোকে অত্থিতা সা ন হোতি।° (ছায়া—লোকসমুদয়ং খলু কাত্যায়ন যথাভূতং সম্যক্প্রজ্ঞয়া পশ্যতো যা লোকে নাস্তিতা সা ন ভবতি। লোকনিরোধং খলু কাত্যায়ন যথাভূতং সম্যক্প্রজ্ঞায়া পশ্যতো যা লোকে অস্তিতা সা ন ভবতি।)

সব্বং অত্থীতি খো কচ্চায়ন অয়মেকো অন্তো সব্বং নত্থীতি খো অয়ং দুতিয়ো অন্তো। এতে তে কচ্চায়ন উভো অন্তে অনুপগম্ম মজ্ঝেন তথাগতো ধম্মং দেসেতি। (ছায়া—সর্বমস্তীতি খলু কাত্যায়ন অয়মেকোঽন্তঃ সর্বং নাস্তীতি খল্বয়ং দ্বিতীয়োঽন্তঃ। এতৌ তৌ কাত্যায়ন উভৌ অন্তাবনুপগম্য মধ্যেন তথাগতো ধর্মং দেশয়তি।)

—ঐ. ২. পৃ. ১৭ (= ১২. ১৫)।

নিত্যমিতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ, অনিত্যমিতি কাশ্যপ অয়ং দ্বিতীয়োঽন্তঃ। যদেতয়োর্দ্বয়োর্নিত্যানিত্যয়োর্মধ্যং তদরূপ্যমনিদর্শনং।° আত্মেতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ, নৈরাত্ম্যমিতি দ্বিতীয়োঽন্তঃ। যদাত্মনৈরাত্ম্যয়োর্মধ্যং তদ্।° সংক্লেশ ইতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ, ব্যবদানমিতি কাশ্যপ দ্বিতীয়োঽন্তঃ। যোঽস্যান্তদ্বয়স্যানুপগমো (মূলে 'অনুগমঃ', কিন্তু যুক্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে—khas-mi-len-cin—'অনুপগমঃ' হওয়া উচিত) ঽনুদাহারোঽপ্রব্যাহার ইয়মুচ্যতে কাশ্যপ মধ্যমা প্রতিপদ্ ধর্মাণাং ভূতপ্রত্যবেক্ষা।—কা শ্য প প রি ব র্ত, পৃপৃ. ৮৬-৮৮।

অস্তীতি নাস্তীতি উভেঽপি অন্তা
শুদ্ধী অশুদ্ধীতি ইমেঽপি অন্তা॥
তস্মাদুভে অন্ত বিবর্জয়িত্বা
মধ্যেঽপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ॥
অস্তীতি নাস্তীতি বিবাদ এষঃ
শুদ্ধী অশুদ্ধীতি অয়ং বিবাদঃ।
বিবাদপ্রাপ্ত্যা ন দুঃখং প্রশাম্যতে
ঽবিবাদপ্রাপ্ত্যা চ দুঃখং নিরুধ্যতে॥

—স মা ধি রা জ সূ ত্র, পৃ. ৩০ (ম ধ্য ম ক বৃ', পৃপৃ. ১৩৫, ২৭০)।

ভাবাভাবদর্শনদ্বয়প্রসক্তো যাবত্তাবৎ সংসার ইত্যবেত্য মুমুক্ষুভিরেতদ্দর্শনদ্বয়নিরাসেন সম্যঙ্মধ্যমা প্রতিপদ্ভাবনীয়া যথাবদিতি।
—ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি, পৃ. ২৭৬।

'নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই'১২ এই বলিয়াই নাগার্জুন স্বকীয় মধ্যমককারিকা আরম্ভ করিয়া বহু যুক্তি প্রদর্শনে অজাতিবাদ স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রকীর্তির বৃত্তির সহিত কেবল প্রথম কারিকাটির (১.১) অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'এখন উৎপত্তির নিষেধ করিলে তাহা দ্বারা নিরোধের নিষেধ করা সহজ হইবে মনে করিয়া আচার্য প্রথমেই উৎপত্তির নিষেধ আরম্ভ করিতেছেন। অন্যেরা উৎপত্তি কল্পনা করিলে তাঁহাদিগকে এই কল্পনা করিতে হইবে যে, হয় উহা নিজ হইতে, অথবা অন্য হইতে, অথবা উভয় হইতে, অথবা বিনা হেতুতেই হইয়া থাকে। কিন্তু সর্বপ্রকারেই ইহা উপপন্ন হয় না। এই নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন—

"কখন কোথাও কোন বস্তু নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না। অন্য হইতে হয় না, (নিজ ও অন্য এই) দুই হইতে হয় না, বিনা হেতুতেও হয় না।" '১৩

নাগার্জুন বারবার এমন কি একই কথায় এই অজাতি-বাদ এই গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন —

১২। দ্রষ্টব্য টীকা ১০। নিরোধ ও উৎপত্তি এইরূপ না বলিয়া উৎপত্তি ও নিরোধ এইরূপ বলা উচিত, কেননা কোন বস্তুর উৎপত্তি হইলে পরে উহার নিরোধ বা ধ্বংস হয়। অতএব নাগার্জুন এইরূপ না বলিয়া বিপরীতক্রমে উহা বলিলেন কেন, ইহা কেহ মনে করিতে পারেন। বৃত্তিতে চন্দ্রকীর্তি ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বে উৎপত্তি ও পরে নিরোধ বস্তুত এইরূপ কোন ক্রম নাই, ইহাই সূচনা করিবার জন্য গ্রন্থকার ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। "অত্র চ নিরোধস্য পূর্বং প্রতিষেধ উৎপাদপ্রতিষেধয়োঃ পৌর্বাপর্যাবস্থায়াঃ সিদ্ধ্যভাবং দ্যোতয়িতুম্। বক্ষ্যতি হি (মধ্যমকারিকা), ১১. ৩; 'বৃত্তি, পৃ. ২২১)—'পূর্বং জাতির্যদি ভবেজ্জরামরণমুত্তরম্।'" এখানে নাগার্জুন বলিয়াছেন অনিরোধ অনুৎপাদ, আর আমাদের আচার্য গৌড়পাদও অন্যত্র (২.৩২) বলিতেছেন নিরোধ নাই, উৎপত্তি (অর্থাৎ উৎপাদ) নাই ("ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ")। ঠিক একই কথা, একই ক্রম। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে। গৌড়পাদের এই কারিকাটি পরবর্তী বহু উপনিষদে ও বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩। "ইদানীম্ উৎপাদপ্রতিষেধেন নিরোধপ্রতিষেধসৌকর্যং মন্যমান আচার্যঃ প্রথমমেবোৎপাদপ্রতিষেধমারভতে উৎপাদো হি, পরৈঃ কল্প্যমানঃ স্বতো বা পরিকল্প্যেত পরত উভয়তোঽহেতুতো বা পরিকল্প্যেত। সর্বথা চ নোপপদ্যত ইতি নিশ্চিত্যাহ—

"ন স্বতো নাপি পরতো ন দ্বাভ্যাং নাপ্যহেতুতঃ।
উৎপন্না জাতু বিদ্যন্তে ভাবাঃ ক্বচন কেচন।।'"

—ম. কা. ১. ১ ; ম. বৃ, পৃ. ১২।

বুদ্ধপালিত লিখিয়াছেন (মধ্যমকবৃত্তি পৃ. ১৪):—"ন স্বত উৎপদ্যন্তে ভাবাঃ। তদুৎপাদবৈয়র্থ্যাদতিপ্রসঙ্গদোষাচ্চ। নহি স্বাত্মনা বিদ্যমানানাং পদার্থানাং পুনরুৎপাদে প্রয়োজনমস্তি। অথ সন্নপি জায়েত ন কদাচিন্ন জায়েত।"

"ন স্বতো জায়তে ভাবঃ পরতো নৈব জায়তে।
ন স্বতঃ পরতশ্চৈব জায়তে জায়তে কুতঃ।।"

—মধ্যমককারিকা, ২১. ১৩ ; দ্রষ্টব্য ২৩. ২০।

'বস্তু নিজ হইতে জাত হয় না, অন্য হইতে জাত হয় না, নিজ ও অন্য (এই দুই) হইতে জাত হয় না; কোথা হইতে জাত হয়?'

ইহার সহিত গৌড়পাদের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি (৪. ২২) তুলনীয়—

"স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্ বস্তু জায়তে।"
'নিজ হইতে বা অন্য হইতে কোন বস্তু জাত হয় না।'

বিশেষ বিবরণের জন্য পাঠকেরা অন্যান্য বহু গ্রন্থের মধ্যে চন্দ্রকীর্তির টীকাসহিত মধ্যমককারিকা (১ ও ২৩) ও চতুঃশতক (১৫) দেখিতে পারেন। বোধিচর্যাবতারে (৯. ১০৬) সিদ্ধান্ত দেখান হইয়াছে—

"এবং হি সর্বধর্মাণামুৎপত্তির্নাবসীয়তে।"
'এইরূপে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি জানা যায় না।'১৪

আমাদের আলোচ্য কারিকাটি (৪. ৪ : "ভূতং ন জায়তে") নাগার্জুনের নিম্নলিখিত কারিকাটির (ম. কা. ১.৬) সহিত তুলনীয় :—

'নৈবাসতঃ নৈব সতঃ প্রত্যয়োঽর্থস্য যুজ্যতে।
অসতঃ প্রত্যয়ঃ কস্য সতশ্চ প্রত্যয়েন কিম্।।"১৫

'অসৎ বস্তুর কারণ যুক্তিযুক্ত হয়ই না, সৎ বস্তুর কারণ যুক্তি-যুক্ত হয়ই না; কোন অসৎ বস্তুর কারণ হইবে? সৎ বস্তুর কারণের দ্বারা কী হইবে?'

আলোচ্য কারিকার (৪.৪খ) "অভূতং নৈব জায়তে" এই পাঠের সহিত তুলনীয়—চতুঃশতক (১৫. ২৩খ): "নাভূতো নাম জায়তে।" চন্দ্রকীর্তি চতুঃশতকের (১৫. ১৬) টীকায় লিখিয়াছেন—"অত্রাহ। জাতো ন জায়তে অজাতোঽপি ন জায়তে।"১৬ আমরা দেখিতে

১৪। এখানে বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকায় বলা হইয়াছে—"এবমেব যথোদিতন্যায়েন সর্বধর্মাণামুৎপত্তির্নাবসীয়তে ন প্রতীয়তে।" ইহাতে আরও বলা হইয়াছে (পৃ. ৩৫৫ ইত্যাদি)—"ন চ স্বপরোভয়হেতুনিরন্বয়মহেতুনিরন্বয়ং বা ভাবস্য জন্মাতিপেশল-মুপপদ্যতে।" ইহা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১৫। দ্রষ্টব্য মধ্যমকাবতার (তিব্বতী), ৬. ৫৮।

১৬। ইহা তিব্বতী হইতে পুনরুদ্ধৃত। মূল সংস্কৃত এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী পাঠটি এই—bdir. smras. pa। skyes. pa. mi. skye. la. mi. skyes. pa. yaṅ. mi. skye. ste।

পাইব আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও অজাতিবাদ বিশেষ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।[১৭]

গৌড়পাদ এই অজাতিবাদকেই পরবর্তী কারিকায় অনুমোদন করিতেছেন—

"খ্যাপ্যমানামজাতিং তৈরনুমোদামহে বয়ম্।
বিবদামো ন তৈঃ সার্ধমবিবাদং নিবোধত॥ ৫॥

'তাঁহারা যে অজাতি প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। বিবাদ যে নাই তাহা তোমরা বুঝ।'

এখানে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, গৌড়পাদ নিজে বৈদান্তিক হইলেও অদ্বয়, অর্থাৎ অদ্বয়বাদী, অর্থাৎ বৌদ্ধদের অজাতিবাদ অনুমোদন করিতেছেন। এ বিষয়ে ইঁহার তাঁহাদের সঙ্গে কোন বিবাদ নাই, তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা নাই। ইঁহার অনুগামিগণের (অর্থাৎ বৈদান্তিকদের) মধ্যে কাহারও কাহারও অথবা অনেকের ইহাতে বিবাদ বা আপত্তি ছিল, সেই জন্য ইনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন যে, এই মত গ্রহণ করিতে কোন বিবাদ বা আপত্তি নাই। তিনি বলিতেছেন 'তোমরা বুঝিয়া দেখ ("নিবোধত")।'

সাংখ্য, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতির ন্যায় বৈদান্তিকগণও বস্তুত জাতিবাদী। ইহা ব্রহ্মসূত্রের (১. ১. ২)

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

'যাহা হইতে ইহার (এই জগতের) জন্ম প্রভৃতি হইয়াছে।'

—এই সূত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সূত্রটির মূল হইতেছে নিম্নলিখিত (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩. ১. ১) শ্রুতির ন্যায় শ্রুতিসমূহ[১৭]—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি।"

'যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত হইয়াছে।'

পরবর্তী কালে শাঙ্কর বেদান্তে এই জাতিবাদকে অস্বীকার করা হইয়াছে। মনে হয় ইহার মূল হইতেছে গৌড়পাদের এই অজাতিবাদের অনুমোদন, যাহা তিনি নিজের অনুগামিগণকে বুঝাইবার জন্য এখানে প্রস্তাব করিয়াছেন। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বেদান্তে একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মা অজ—ইহার জাতি বা উৎপত্তি নাই, আর সকলেরই জাতি আছে। কিন্তু মাধ্যমিকমতে কাহারও জাতি নাই।

অজাতিবাদ লইয়া বৌদ্ধদের সঙ্গে গৌড়পাদের কেন বিবাদ নাই, এবং কিরূপে তিনি তাহা অনুমোদন করেন, ইহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব।

১৭। শঙ্কর এই আলোচ্য কারিকাটির প্রথম অর্দ্ধের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হয় না, কেননা ইহা বিদ্যমানই আছে।' সেইরূপ অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু অবিদ্যমান (অর্থাৎ অসৎ) বলিয়াই উৎপন্ন হয় না, যেমন খরগোশের শিং।' ("ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে বিদ্যমানত্বাদেব।' তথাভূতমবিদ্যমানমবিদ্যমানত্বান্নৈব জায়তে শশবিষাণবৎ॥")।

১৭। যথা, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃসম্ভূতঃ" (তৈ. উ. ২. ১. ১.); "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (মুণ্ডক, ২.১.৩) ইত্যাদি, ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতি অনেক।

অনুভূতি

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সুবিমল লণ্ডনের কৃষিশিল্প-পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পাইয়াছে। সরকারী আপিসে যে সে একটা বড় রকমের সুযোগ পাইবে এ বিষয় কাহারও দ্বিমত ছিল না। বন্ধুমহল একটা ভোজের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আলোচনা, এত জল্পনা-কল্পনা, মতভেদ দেখা দিল তাহারই তরফ হইতে। সুযোগ তাহার অতি সহজেই মিলিল কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করিবার অবসর সুবিমলের হইল না। তাহার মতে, যখন লাঙ্গল ধরিতে শিখিয়া আসিয়াছে তখন লাঙ্গলই সে ধরিবে। গ্রামে জমির তাহার অভাব নাই। তা ছাড়া বাপের আমলের জমার অঙ্কটাও তাহার নিতান্ত মন্দ নয়।

বন্ধুমহল মুখে বাহবা দিল, অন্তরালে কাটিল টিপ্পনী—'গেঁয়ো ভূত কত আর হবে।' শ্বশুরের সহিত ছোটখাট রকমের একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। 'এমন মোটা বুদ্ধি গেঁয়োর জানলে কে যেত মেয়ে বিয়ে দিতে'—শ্বশুরের এ কটূক্তি সুবিমল গায়ে মাখিল না, বরং শান্ত স্থির কণ্ঠে কহিল—আমি কালকেই আমার গ্রামের বাড়ীতে যেতে চাই; আমার ইচ্ছে তপতীও আমার সঙ্গে যায়।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়িল—তা যাবে বই কি···দয়া ক'রে শ্বশুরের মতামতটা না চাইলেও পারতে! এ-সব বুড়ো-হাবড়াদের মতামতের কোন মূল্য আছে নাকি তোমাদের কাছে!

সুবিমল ব্যাপারটা ইহার অধিক গড়াইতে দেয় নাই, কিন্তু পর দিনই স্ত্রী সহ সে দেশে যাত্রা করিল।

গ্রামখানি ছোটও নয় বড়ও নয়, কিন্তু খুব বর্দ্ধিষ্ণু। সে-গ্রামে সুবিমলদের অবস্থা ভালই। কাজেই শহরের মেয়ে তপতীকে বিশেষ কোন অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইল না। বরং সে যেন একটু অধিক মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের আমূল সংস্কার করিয়াছে, জুতা বাক্সবন্দী হইয়াছে, ঝকঝকে শাড়ীগুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সুবিমল মুগ্ধ চোখে চাহিয়া দেখে, সাধারণ কালপেড়ে শাড়ী পরা তপতীর গৃহিণী-রূপ, অলক্তরঞ্জিত তার দুখানি পায়ের চঞ্চল ওঠাপড়া। কেমন সহজে সে গ্রাম্য মেয়েদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, যেন জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তপতী ইহাদের সাহচর্য্য পাইয়া আসিতেছে।

বাড়ীর আশেপাশের বনবাটালির ঝাড়, বেতের ঝোপ এবং জংলা গাছগুলি পরিষ্কার করাইয়া দিনকয়েকের মধ্যেই সুবিমল স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিল। চমৎকার একটি কৃষিক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহার এক-এক অংশে এক-এক প্রকার চাষ সুরু হইল।

সুবিমল সামনে থাকিয়া মজুর খাটায়; নিজ হাতে কোদালি চালায়, বীজ বোনে। মজুরদের উপদেশ দেয়,—হাতে ধরিয়া নূতন প্রণালীতে কাজ শিক্ষা দেয়। বৈকালে ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিতেই তপতী পাখা হাতে ছুটিয়া আসে—বসিবার চেয়ার আগাইয়া দিয়া ক্ষিপ্র হাতে পাখা চালায়।

সুবিমল পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে,—ফ্যানের হাওয়ায় কি এত আনন্দ ছিল তপতী?

তপতী উচ্ছ্বসিত বেগে হাসিয়া উঠিল।

—এ হাসির কথা নয় তপতী, বিকেল বেলার এই বিশ্রামটুকু এই জন্যেই আমার কাছে এত লোভনীয়। কাজ আমার ধাপে ধাপে দ্রুত এগিয়ে চলে এই বিশ্রাম-মুহূর্তগুলির কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

মুহূর্তের জন্য থামিয়া সুবিমল পুনরায় কহিল,—ভাগ্যিস দশচক্রে ভূত ব'নে গেছি, নইলে তোমার একটা দিক হয়ত আজও আমার কাছে ঢাকা থাকত।

তপতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কহিল—এত দাম বাড়িয়ে দিও না। শেষ পর্য্যন্ত ভার বইতে পারব না।

উত্তরে সুবিমল কহিল—না চাইতে যা পেয়েছি তা যদি নতুন করে হারাতে হয় তাতে দুঃখ পেলেও তোমায় অনুযোগ করব না তপতী।

—হ্যাঁ! বুঝেছি মশায়, তপতী হাসিয়া কহিল, চাষাভুষো লোকের আবার অত কবিত্ব কেন! তপতী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই হাতের পাখাটা নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় কহিল,—হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি আসছি।

সুবিমল ইজি-চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল, উঠিবার নামগন্ধ নাই। এমনি অনেক ক্ষণ কাটিল। তপতী ফিরিয়া আসিয়াছে। সুবিমল তেমনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তাহার এ ছলনাটুকু বুঝিয়া লইতে তপতীর বিলম্ব হইল না, দুই হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মাথা নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এখন হ'ল ত, এবারে চোখ খোল। কিন্তু সুবিমল নীরব। তপতী নিঃশব্দে খানিক হাসিয়া তরল কণ্ঠে কহিল, এমন কাঙাল কেন তুমি!

এমনি অনাবিল নিঃসঙ্কোচ গতিতে তাহাদের দিনগুলি চলিতে থাকে। গ্রামের লোকের উহারা ঈর্ষার বিষয় কিন্তু তবুও তাহারা উহাদের ভালবাসে, উহাদের জীবন যাত্রাকে সঙ্গোপনে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সাধ্যমত আদর-আপ্যায়ন করে।

অল্পবয়সী বৌরা বলে, তুমি ভাই বেশ আছ দিদি, নিজের ইচ্ছেমত চলতে ফিরতে পার। আমরা হ'লে এত দিনে ছি-ছি রব উঠত। তা ছাড়া, পারিও নে ভাই তোমাদের মত চলতে ফিরতে।

তপতী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না উহারা কি বলিতে চায়। বুঝিয়া দেখিবার আগ্রহও তাহার নাই।

মাঝে মাঝে সে কোমরে কাপড় জড়াইয়া বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে স্বামীর সহিত মাটি কোপাইতে প্রবৃত্ত হয়, কখনও বা স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়ায়, কর্ম্মরত তাহার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। সুবিমল কাজের ফাঁকে ফাঁকে তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, মুহূর্ত্তের জন্ত দৃষ্টিবিনিময় হয়। তপতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে,—তোমার ফাইন হওয়া উচিত। জরিমানার একটা নকল সে মুখে বলিয়া যায়।

সুবিমল হাসিমুখে উত্তর দেয়—তথাস্তু।

বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, ফল ধরিয়াছে। সুবিমলের প্রত্যেকটি উদ্যম অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাঁদরের উপদ্রবে কিছু রাখিবার উপায় নাই, রাঁধা ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া গাছের ফুল-ফলটি পর্য্যন্ত। সুবিমলকে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামছাড়া না করিয়া ছাড়িবে না।

তপতী এত দিন নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু আজ আর কোনমতেই সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। চোখের সম্মুখে নিজের সৃষ্টির লাঞ্ছনা কোন মেয়েইবা সহ্য করিতে পারে! কবে গ্রাম্য মেয়েদের মত কলসী কাঁখে জল আনিতে গিয়া সে নাকাল হইয়াছে! কবে সখ করিয়া গামলা-ভরতি চাল পুকুর-ঘাটে ধুইতে গিয়া বানরের কিল-চড় খাইয়া আসিয়াছে। কি কুক্ষণেই সে আহার-রত বানরকে বাধা দিয়াছিল—চালগুলি নষ্ট ত হইলই, তাহার উপর বানরের হাতে .অপমান। তাহাও বরং সে নীরবে পরিপাক করিয়াছিল, কিন্তু আজ যখন তার স্ব-প্রতিষ্ঠিত বাগানের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিল, তখন সে মরীয়া হইয়া উঠিল, স্বামীর কাছে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তপতী কহিল, যে ক'রে হোক এর একটা বিহিত করা দরকার।

সুবিমল গম্ভীর ভাবে তপতীর অভিযোগগুলি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

তপতী বিরক্ত হইল, তিক্ত কণ্ঠে কহিল, ভারী খুশী হয়েছ, না? তাই এত হাসি?

—হাসছি না তপতী, কিন্তু, ভাবছি—হায়রে বাংলার নারী...কথাটা এমন ভঙ্গীতে সুবিমল বলিল যে, তপতীও না হাসিয়া পারিল না, কহিল, আজও তুমি একটু 'সিরিয়াস্' হ'তে শিখলে না।

সুবিমল এতক্ষণে সহজ কণ্ঠে কহিল, বাস্তবিক, এর একটা প্রতিবিধান করা দরকার। হতভাগাগুলোর উপদ্রব দেখছি দিন দিন মানুষকেও ছাপিয়ে উঠছে। তুমি মনে ক'রো না এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।

বাগানের এক প্রান্তে একটি বড় রকমের ফাঁদ নির্ম্মিত হইয়াছে। তার মধ্যে স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে বানরের প্রিয় খাদ্য। দলে দলে বানর আসে যায়—খাঁচার চতুর্দ্দিকে নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। কবাট ধরিয়া নাড়া দেয়—অনুসন্ধিৎসু ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখে। কাছেই কোথাও হয়ত একটা শুকনা পাতা পড়িয়াছে, অমনি চক্ষের পলকে সব অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু লোভ উহাদের দুঃসাহসী করিয়া তোলে—পুনরায় একে একে ফিরিয়া আসে কিন্তু ভরসা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে না।

তপতী উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বাঁদরের কীর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং একা-একাই হাসিতে থাকে আর মনে মনে ওদের বুদ্ধির তারিফ করে।

হঠাৎ খাঁচার দরজা সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। তপতী হাত তালি দিয়া উঠিল। এত ক্ষণে বানর ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু যে-আহার্য্য বানরটিকে মৃত্যুর গহ্বরে টানিয়া আনিয়াছে তাহা যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিল। বানরটি তাহা স্পর্শও করিল না, শুধু পাগলের মত খাঁচার লোহার গরাদগুলি ধরিয়া সাধ্যমত আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র শক্তি বারবারই পরাভূত হইল।

তপতী চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কেমন করিয়া বানরটি ব্যর্থ রোষে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজেই ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। কান পাতিয়া শোনে, অক্ষমের করুণ ব্যাকুলতা। ব্যথিত চিত্তে ভাবে, মানুষের মধ্যে যদি এমনি একতা থাকিত! বন্দীকে উদ্ধার করিবার জন্য বানর-দলের সমবেত চেষ্টা তপতীর চিন্তাধারাকে এই পথে চালিত করিল।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। মজুররা কিছুক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছে। সুবিমল গৃহে ফিরিয়া আসিতেই তপতী ডাকিল, বানরগুলির কাণ্ড দেখবে এস।

সুবিমল তপতীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া কহিল, এবারে যদি উপদ্রবটা কিছু কম হয়।

তপতী কহিল, চেয়ে দেখ কত বানর এসে জুটেছে। সঙ্গীকে উদ্ধার করবার কি প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, শত চেষ্টায় আজ আর কিছু হচ্ছে না।

সত্যই তাদের উদ্যম সব দিক দিয়া ব্যর্থ হইল। একে একে বানরগুলি চলিয়া গেল, কেবল একটি বানর খাঁচার আশেপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তপতী কহিল—ওটি বুঝি ওর সঙ্গী—দেখছ কেমন ক'রে কাঁদছে। তপতীর মনে হয়ত একটু অনুকম্পা দেখা দিল কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করিতে গিয়া তার এ-অনুকম্পা কোথায় তলাইয়া গেল। তপতী নিজের কাজে স্থানান্তরে গেল, কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে বানরের আর্ত্ত স্বর তাহাকে চকিত করিয়া তুলিতেছিল এবং নিজেদের জীবনযাত্রার সহিত বানর-যুগলের তুলনা করিতে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তপতী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া তপতী কহিল—ওটাকে ছেড়ে দিলে হয় না? কানের কাছে দিনরাত কান্না কি ভাল লাগবে!

সুবিমল হাসিয়া কহিল—তুমি কি মনে কর কালকেও ওর কান্না তোমায় শুনতে হবে? বনের পশু সাময়িক খেয়ালের বশে খানিক চীৎকার ক'রে আপনি সরে পড়বে।

তপতী সুবিমলের কথায় কান দেয় না—উদ্‌গ্রীব হইয়া উহাদের করুণ কণ্ঠস্বর শোনে। তারপর এক সময় নিজের কাজে প্রস্থান করে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সুবিমলের বৈকালিক আহার্য্য লইয়া উপস্থিত হয়—রোজকার মত হাত-পাখাটাও চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণের স্পর্শের কিছু অভাব—অন্ততঃ সুবিমলের ত তাহাই মনে হইল। ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিল, তোমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে যেন।

তপতী হাসিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইল।

বন্দী গরাদের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইতে অপর বানরটি ওর গায় হাত বুলাইয়া দেয়, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অবোধ্য ভাষায় কি বলে এবং পরমুহূর্ত্তেই উভয়ে তাহাদের মিলিত শক্তি দিয়া লোহার গরাদগুলি আকর্ষণ করিতে থাকে। বার-কয়েক রুদ্ধ কবাটের উপর সজোরে আঘাত করে। তার পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া অপর বানরটি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সুবিমলও ঐ দিকেই চাহিয়া ছিল এবং নীরবে উহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল; এতক্ষণে বলিল—আমার কথার প্রমাণ পেলে ত তপতী?

তপতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, হতভাগী যে মেয়ে-জাত, এত সহজেই কি ও সব ভুলতে পারবে! তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি!

স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে হাসিতে লাগিল।

পরদিন দেখা গেল বানরটি যায় নাই, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে কিছু আহার্য্য লইয়া। তপতী সুবিমলকে ডাকিয়া বলে, চেয়ে দেখ। মুক্ত বানরটি খাঁচার চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করুণ রবে ডাকিতে থাকে, কিন্তু বন্দী সাড়া দেয় না—মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া থাকে। বাহিরে সঙ্গীর ব্যথিত কণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিয়া ওঠে। বন্দী করুণ চোখে তাকায়, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া গরাদের ফাঁকে আহার্য্য গ্রহণ করে। বানরটি আরও কিছু সময় অপলক চোখে চাহিয়া থাকে, তার পরে কোথায় চলিয়া যায়।

তপতী চাহিয়া দেখে। এই একটি দিনের মধ্যেই বানর-দম্পতির জন্য তার মনে এক করুণ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। হয়ত নির্দ্দোষী সাজা পাইতেছে। কিন্তু মানুষের বিধানে যে সব সময় দোষীই সাজা পায় না একথা তপতী একবারও ভাবিল না। কিন্তু একটা বানরের হইয়া ওকালতী করিতে সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ ঠানদির কথাকয়টিও তাহাকে কম ভাবাইয়া তোলে নাই।

ইতিমধ্যে তপতী একবার খাঁচার নিকট হইতে ঘুরিয়া আসিল। যদি কোন সুযোগে স্বামীর অলক্ষ্যে বন্দীর মুক্তি ঘটাইতে পারে। দেখিল, খাঁচার দরজায় প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলিতেছে, বন্দী নীরবে বসিয়া আছে, কোনও চাঞ্চল্য নাই। তপতী আরও একটু অগ্রসর হইল। বন্দী কাতর চোখে চাহিল। তপতী আর দাঁড়াইল না—কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল।

ও-বাড়ীর ঠানদির কথাকয়টি ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল, কথাগুলি ভাবিতে গিয়াও তপতী লজ্জায় ও আনন্দে নুইয়া পড়ে। ঠানদি বলেন, এ-সময় কাউকে দুঃখ দিতে নেই। শাপমন্যি তোমরা শহরের মেয়েরা না মানতে পার কিন্তু গাঁয়ের ঝি-বৌরা তাদের দিদিমা-ঠাকুরমাদের কথা অগ্রাহ্যি করে না। বুড়োরা বলেন, বানর মারলে বংশ থাকে না। বিমলকে ব'লে কয়ে ওটাকে ছেড়ে দিও। কথাগুলি তপতী নীরবে শুনিয়াছে, কিন্তু সুবিমলকে কোন কথা বলিতে পারে নাই। কেমন একটা অনাবশ্যক লজ্জা ও কুণ্ঠা আসিয়া তার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরে। অথচ দুশ্চিন্তার তার অবধি নাই।

পেটে তার সন্তান। আর সামান্য কয়েকটা মাসের ব্যবধানে সম্ভাবনা সত্যরূপ ধরিয়া তার কোলে আসিবে। গোল গোল কচি দুখানি নরম হাতে তার চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিবে, বড় বড় ভাসা দুটি চোখ মেলিয়া তার মুখের দিকে চহিয়া হাসিয়া হাত-পা ছুড়িবে—অনুচ্চারিত ভাষায় কত কথা কহিবে··

ভাবিতে গিয়াও তপতীর বুকটা এক অনাস্বাদিত পুলকে দুর দুর করিয়া উঠিল, চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল।

দিন দিন তপতী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সদা প্রফুল্ল ভাব আর তার মধ্যে দেখা যায় না, সব সময় কি ভাবে। সুবিমলের দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না। জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার শরীর খারাপ যাচ্ছে না ত তপু?

তপতী সংক্ষেপে জানাইল, না।' পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা বানরটাকে এখন ছেড়ে দিলে হয় না?

সুবিমল হাসিয়া উঠিল—পাগল···

কথাটা যেন এমনি অবহেলার। তপতী বিরক্ত মুখে পা বাড়াইল।

সুবিমল ডাকিল—ব্যাপার কি বল ত?

তপতী দাঁড়াইল, কহিল—ব্যাপার কিছুই নয়। মোটের উপর বাঁদরটাকে তোমায় ছেড়ে দিতেই হবে।

সুবিমল হাসিয়া আবহাওয়াটাকে হাল্কা করিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কহিল—বুঝতে পেরেছি তোমার ব্যাধি কোথায়। কিন্তু একটা বাঁদর নিয়ে তুমি যে ভাবে মাতামাতি জুড়ে দিয়েছ তা সত্যই হাস্যকর। তাছাড়া তুমি নিজেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছ ঐ একটি মাত্র বাঁদরকে আটকে রেখে কত নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হচ্ছে।

তপতী যেন কোন যুক্তিই শুনিতে চাহে না এমনি ভাবে মুখ ঘুরাইল।

সুবিমল একটু বিমর্ষ কণ্ঠে কহিল—তা হ'লে কি আমায় এই কথাটাই বুঝতে হবে যে, তোমার ইচ্ছে নয় আমি

আমার আদর্শকে মেনে চলি ? তুমি কি বুঝতে পারছ না এখানে থাকতে গেলে এবং আমাদের পরিশ্রম সার্থক ক'রতে গেলে হয় বানরের উপদ্রব সহ্য ক'রতে হবে নইলে ওদের ওপর অত্যাচার করতে হবে।

তপতী আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের হাতে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের বাড়ীতে আসিয়া আজ এই নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তনে সুবিমল কম বিস্মিত হইল না। এবং ইহার সত্যকারে কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিল। সুবিমলের এই বিস্মিত ভাবটা তার ভৃত্যের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিতে পারিল না, চট করিয়া তার মুখে একটা কৈফিয়ৎ জোগাইয়া গেল,—দিনকয়েক ধরে বৌদি-মণির শরীরটে তেমন ভাল যাচ্ছে না।

সুবিমল ধমকাইয়া উঠিল—বেরিয়ে যা এখান থেকে—কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই বাহির হইয়া গেল। আহার্য্য স্পর্শও করিল না।

ভৃত্য তপতীকে সব কথা জানাইল, কিন্তু তাহার তরফ হইতে ভালমন্দ কোন প্রত্যুত্তর মিলিল না। সে নিঃশব্দে নিজের কাজ করিয়া চলিল।

অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া সুবিমল দেখিল, তপতী মেঝের উপর শুইয়া আছে। সুবিমল পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আলনার উপর জামাটা রাখিতে গিয়া হয়ত সামান্য একটু শব্দ হইয়া থাকিবে। তপতী উঠিয়া বসিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল—বিকেল বেলা ত রাগ ক'রে না-খেয়ে গেলে—আর ফিরলেও রাত বারটায়। এর ত কিছু দরকার ছিল না। বাঁদরটা ছেড়ে দিতে বললুম—তুমি শুনলে না, নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলে। এমনি ইচ্ছা-অনিচ্ছা ত প্রত্যেক মানুষের থাকতে পারে।

সুবিমল ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু বাঁদর সম্বন্ধে তোমার এত উদ্বেগের আমি ত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

তপতী কহিল—না খেয়ে খেয়ে বাঁদরটা মরেও যেতে পারে ত ?

সুবিমল শান্ত কণ্ঠে কহিল—চোখের সামনে অত খাবার মজুত থাকতে না খেয়ে কখনও ওটা মরবে না। আর যদি তোমার কথাই সত্য হয় তাতেই বা আমাদের কি এসে যায়।

তপতী কাতর কণ্ঠে কহিল—ঠানদি বলেন, বাঁদর মারলে বংশ থাকে না। তপতী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। নিরন্তর ঐ একই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া করিয়া তাহার বিচার-বুদ্ধিও জড় হইয়া পড়িয়াছে।

সুবিমল সহাস্যে কহিল—ও এইজন্যে তোমার শরীর খারাপ! ছিঃ তপতী, তোমার মত কলেজে-পড়া মেয়েরাও যদি এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে তা হ'লে সংসার দেখছি নিতান্তই মেছোহাটায় পরিণত হবে।

কিন্তু সুবিমল যত সহজে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল তপতী এতটা অল্প সময়ের মধ্যে তাহা ভুলিতে পারিল না। একটা বিভীষিকাময় দুশ্চিন্তা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তার চলায়, ফেরায়, কথা বলায় সব কিছুতেই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু একথা সে বলিবে কাহাকে? তপতীর সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মুক্ত বানরটির আর্ত্ত কান্না চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে—সময় নাই, অসময় নাই, যখন তখন গুমরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তপতী অন্যমনস্ক ভাবে শূন্যে চাহিয়া থাকে, ঠানদির কথাগুলি যেন জীবন্ত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। তপতী শিহরিয়া ওঠে।

তাহার অলস দিনগুলি দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে। দিনের আলো তাহার কাছে বিভীষিকা। রাত্রির অন্ধকার বরং কতকটা সহ্য হয়। অন্ততঃ একটা উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

দিনের বেলা তপতী জানালার পাশে বসিয়া থাকে; নীরব দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে স্বামীর নিষ্ঠুরতার মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য। বনের পশু, কিন্তু কি অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য, কি আবেগময় অকপট ভালবাসা। অথচ এই তপতীই একদিন বানরের উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া স্বামীকে প্রতিবিধানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছে। সে-কথা যে তপতী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা নয়। এবং বোধ করি বা সেই কারণেই স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাহার মধ্যে একটা সঙ্কোচ আসিয়া দেখা দেয়।

সুবিমলকেও দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু তপতী কোন কথাই ভাবিতে চাহে না। কবে বিরক্ত হইয়া কি একটা অনুরোধ সে করিয়াছে তাহাই হইবে সত্য, আর আজ যে সে সর্ব্বান্তঃকরণে বানরটির মুক্তি ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহার কোন মূল্যই নাই। কি কুক্ষণেই তার ঠানদির সহিত দেখা হইয়াছিল। তার সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা সব দিক দিয়া জটিল হইয়া উঠিয়াছে। নিজেকে সে বহুপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু লাভ তাহাতে কিছুই হয় নাই, বরং সন্দিগ্ধ মন আর অধিক পরিমাণে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। এ-চিন্তা এমনি মারাত্মক যে একটি মুহূর্ত্তও তাহাকে বিশ্রাম দেয় না। তপতী ভাবে, শুধুই ভাবে। এ-ভাবনার আদি আছে অন্ত নাই। জাগরণে বানর-দম্পতি তাহার চোখের সম্মুখে এক জীবন্ত আতঙ্ক, নিদ্রায় ঐ একই চিন্তা নিঃশব্দ সঞ্চারে তার চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

তপতী স্বপ্ন দেখে, তার ফুটফুটে ছেলেটি ওর একক নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রাকে ভরিয়া রাখিয়াছে। একক এইজন্য যে তপতী আজকাল আর সুবিমলকে সহ্য করিতে পারে না। ইহার অন্তরালে অশ্রদ্ধা বা অসম্প্রীতি না থাকিলেও সে যেন পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। তপতীর কানে যায় তার ভাবী ছেলের নিঃসঙ্কোচ সবল 'মা' ডাক। তার ঘুমন্ত চোখের পাতায় পাতায় সে নাচিয়া বেড়ায়। স্বপ্নের খোকা তার চেতনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এমনি করিয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে পারিলে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি। তপতী ঘুমের মধ্যে খুশী হইয়া ওঠে। তার স্বপ্ন সত্যরূপে বিরাজ করিতে থাকে। হয়ত অজ্ঞাতে এক-আধবার ডাকিয়া উঠে, খোকনমণি অত দুষ্টুমি করতে নেই···পরমুহূর্ত্তেই হয়ত হাসিয়া বলে, আঃ দুষ্টু ছেলে এমনি ক'রে চুল ধরে টানতে নেই...লাগে যে···তার স্বপ্নের খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। কি উচ্ছ্বসিত সে-হাসি! কি অনাবিল, স্নিগ্ধ ওর মুখের ভঙ্গিটি। তপতী মুগ্ধ পলকহীন চোখে চাহিয়া দেখে।

এক রত্তি ছেলে...এক তাল নরম মাটি—কিন্তু দুষ্টুমিতে পাকা। কিন্তু ও কি, তার ছেলে বাঁদরের খাঁচার পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন! অমন ফুটফুটে ছেলে দেখিতে দেখিতে অমন তামাটে হইয়া গেলই বা কিসের জন্য···আর মুখের চেহারা···ও কি···তপতী ঘুমের ঘোরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সুবিমল জোরে জোরে ধাক্কা দিয়া বলিতেছে। হ'ল কি তোমার··· ? ওঠ, ওঠ, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে আছ ?

স্বপ্নের ঘোর তখনও তপতীর চোখ হইতে যায় নাই। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া একবার নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া লইল, কহিল—একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—বাঁদর নিয়ে নিশ্চয়···সুবিমল হাসিয়া উঠিল। তপতী যেন একটু লজ্জিত হইল। সুবিমল পুনরায় কহিল—বাঁদরের কান্না তোমার আর শুনতে হবে না—দেখবে এস। সত্যিই দিন কয়েক ধরে বড্ড জ্বালাচ্ছিল।

তপতী চঞ্চল হইয়া উঠিল। খুশী হইয়া কহিল—ছেড়ে দিয়েছ ? আঃ তুমি আমায় বাঁচিয়েছ···যে ক'রে আমার দিন কাটছিল। তপতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুবিমল হঠাৎ কথা কহিতে পারিল না। প্রকৃত সত্যের যবনিকা তুলিয়া ধরিতে তার হাত উঠিতেছিল না।

তপতী পুনরায় কহিল—তুমি যদি আজ আমায় দু-সেট জড়োয়া গয়না দিতে, আমি এত খুশী হতুম না। আজ তোমায় আমি রান্না করে খাওয়াব—আজ একটি মুহূর্ত্তের জন্য তোমার ছুটি নেই। অনেক দিন তোমায় আমি কাছে পাই নি।

এক নিমেষে তপতী বদলাইয়া গেল। কহিল—ক'দিন ধরে তোমার সঙ্গে বড্ড খারাপ ব্যবহার করছি। তা ব'লে তুমিও নেহাৎ ভালমানুষটি নও। সেই ত আমার কথাই রইল···অথচ—সহসা সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া তপতী থামিয়া গেল।

সুবিমল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, এ-আলোচনা কোন রকম বন্ধ করিতে পারিলে সে বাঁচে।

ভৃত্য আসিয়া জানাইল—বাঁদরটাকে কি বাগানের বাইরে ফেলে দিয়ে আসব।

—হ্যাঁ···সুবিমল ব্যস্ত চরণে প্রস্থান করিল।

তপতীর মুখে কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। দ্রুতপদে সে গিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইল।

বন্দী খাঁচার মধ্যে পাগলের ন্যায় ছটফট করিতেছে আর তাহারই অদূরে মুক্ত বাঁদরটি একেবারে মুক্তি

পাইয়াছে, সুবিমলের নিক্ষিপ্ত গুলি উহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। আশেপাশের মাটি রক্তে রাঙা। তপতী আর্ত্তনাদ করিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। চোখে মুখে তাহার স্পষ্ট আতঙ্ক, থাকিয়া থাকিয়া সে শিহরিয়া উঠিতেছে।

আহারের সময় হইয়াছে। তপতী সেই যে গিয়া নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে আর তার সাড়া নাই। সুবিমল এক ফাঁকে আসিয়া না-খাওয়ার মত খানিক নাড়াচাড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর-চাকর বসিয়া আছে। তপতীর জন্য তাহারাও আহার করিতে পারিতেছে না। বার-কয়েক ঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধি করিয়া তাহারা সুবিমলকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া যে তপতী এতটা বাড়াবাড়ি করিবে ইহা সুবিমলের স্বপ্নাতীত। দুয়ারে আঘাত করিয়া সে কহিল, দোর খোল...

অল্প ক্ষণের মধ্যেই তপতী দরজা খুলিয়া সুবিমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই কয়েক ঘণ্টায় সে যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চুলগুলি এলোমেলো, চোখ-দুটি জবা ফুলের মত লাল।

সুবিমল খানিক বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চাকর-বাকর সব তোমার জন্যে না খেয়ে রয়েছে যে?

নির্লিপ্ত গলায় তপতী কহিল—তাদের খেতে বললেই চুকে যায়—

সুবিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত বেশী মাতামাতি করবে এ আমি মনে করি নি।

ম্লান কণ্ঠে তপতী কহিল—এবার থেকে আমি আর কোন কথাই কইব না। তপতী মাথা নত করিল।

সুবিমল কহিল—ভেবে দেখলাম এ সময় তোমার দিন কয়েক ঘুরে আসা দরকার।

তপতী কহিল—আমিও তোমায় সেই কথাই বলব ভেবেছিলাম। এ জায়গাটা আমার আর মোটেই ভাল লাগছে না।

সুবিমল ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিলেও সহজ কণ্ঠে কহিল, এ সময়টা তোমার মায়ের কাছে থাকাই উচিত।

তপতী বিমনা হইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছে...উঃ ..কত রক্ত...মাটির রং বদলাইয়া গিয়াছে...উষ্ণ আর লাল রক্তে...বাঁদরের রক্তে...তার তার স্বপ্নের খোকার রক্তে... তপতী উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকায়, সে-দৃষ্টির সম্মুখে সুবিমল এতটুকু হইয়া যায়।

সুবিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হয়ত কিছু বলিবার জন্যই মুখ তুলিয়াছিল। তপতী কহিল—কি দোষ তোমার কাছে বাঁদরটা করেছে শুনি যার জন্যে ওটাকে গুলি না ক'রে তোমার চলল না। ঠাট্টা করবে জানি—বলবে কুসংস্কার। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে আমি পারব না, ইচ্ছেও নেই, কারণ তুমি ত কোন দিনই আমাকে বুঝবার চেষ্টা কর নি।

তপতী স্তব্ধ হইয়া গেল।

বন্দী মুক্তি পাইয়াছে। সুবিমল নিজে হাতে খাঁচার দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, বানরটি এক পা নড়িল না। তাহার মুখের ভাষা সুবিমল পড়িতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখের জল সুবিমলের দৃষ্টি এড়াইল না। চাহিয়া চাহিয়া আজ সুবিমলের অকস্মাৎ মনে হইল, কাজটা সে ভাল করে নাই।

সুবিমল গৃহে ফিরিল, কহিল, বাঁদরটাকে ছেড়ে দিয়ে এলাম তপতী।

তপতী মুখ তুলিয়া সুবিমলের প্রতি চাহিল, কহিল, গুলি কি তোমার এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে? ওটাকেই বা বাকী রাখলে কেন?

তপতী আর দাঁড়াইল না।

সুবিমল ধীরে ধীরে আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইল। বন্দী বাহির হইয়া আসিয়াছে—কিছুপূর্ব্বে যে স্থানে মৃত বানরটি পড়িয়াছিল সেইখানে আসিয়া একবার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর এক সময় ধীরে ধীরে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুবিমল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিতেছিল। এত ক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তার ভারাক্রান্ত মনটা কতকটা

হাল্কা হইল। এত সহজে যে বানরটি রেহাই দিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

কিন্তু গভীর রাত্রে একটা অব্যক্ত চাপা কান্নায় তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এ-কণ্ঠস্বর তার পরিচিত। সুবিমল উঠিয়া বসিল। সর্ব্বপ্রথমে তার চোখে পড়িল তপতীকে, জানালার নিকট বসিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সে কি দেখিতেছে। সুবিমল উঠিয়া আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল।

সন্ধ্যাবেলা মুষল ধারে বৃষ্টি হইয়া গেলেও বাহিরে তখন অজস্র জ্যোৎস্না। সুবিমল স্পষ্ট দেখিল, বানরটি পাগলের মত খাঁচার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটির ঘ্রাণ লইতেছে এবং এক অদ্ভুত শব্দ করিয়া গোঙাইতেছে। তার সাজনীর শেষ স্মৃতি রক্তের দাগগুলিও আর অবশিষ্ট নাই। বানরটি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। চাহিয়া অকস্মাৎ সুবিমলের দুই চোখ ছাপিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

তপতী স্বামীর আগমন টের পাইয়াও এতক্ষণ নীরব ছিল, কিন্তু সহসা কয়েক ফোঁটা জল তাহার বাহুর উপর পড়িতেই সে স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। তার চোখও শুষ্ক ছিল না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণ কণ্ঠে তপতী কহিল, চল…

বানরটির অবিশ্রাম কান্না তখনও থাকিয়া থাকিয়া ভাষাহীন আবেগে গুমরাইয়া উঠিতেছিল।

ইহারই দিন-কয়েক পরে পাড়াপ্রতিবেশীকে সচকিত করিয়া সুবিমল স্ত্রীসহ কলিকাতা যাত্রা করিল। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ ভাঙিয়া পড়িল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিল। সুবিমল স্মিত হাস্যে জানাইল, আবার তাহারা আসিবে। ভগবানই জানেন তার এ উক্তি কতখানি সত্য।

শহরের বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু সে সত্য কথাই কহিল। তাহারা অবশ্য বিশ্বাস করিল না, চোখ টিপিয়া হাসিল। সামনা-সামনি কিছু না বলিলেও পরোক্ষে বলিয়া বেড়াইল, গোলামির প্রবৃত্তি যাদের রক্তের প্রতি বিন্দুতে, এ-সখের খেয়াল তাহাদের কতদিন ?

রাসের মেলা
শ্রীতারক বসু

প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি-এস্‌সি

সত্তর বছর আগে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারিসের বিখ্যাত ত্রোকাদেরো প্রাসাদে। শহরের উত্তর প্রান্তে স্যান্ নদী আর প্যারিসের প্রমোদ-উদ্যান বোয়া দ্য বোলোনের মাঝখানে অবস্থিত ছিল ত্রোকাদেরো। ১৮৬৭ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বিখ্যাত প্রাসাদে অনেকগুলি প্রদর্শনীই হয়ে গেছে। কিন্তু এ-বছরের আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য ত্রোকাদেরোকে সংস্কার করার পর ওর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ঈফেল টাওয়ার আর ত্রোকাদেরোর মধ্যে স্যান্-এর উপরে তৈরি হয়েছে এক নূতন পুল, আর তাকেই কেন্দ্র করে, নদীর দু-পার ধরে চলে গেছে প্রদর্শনীর বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন রঙের জাঁকাল বাড়ীগুলি।

১৮৬৭ থেকে ১৯৩৭ এই সত্তর বছরের মধ্যে ফ্রান্সের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে—সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক। তবুও ফরাসী ইতিহাসের ভিতর দিয়ে প্যারিসের যে চিরন্তন মূর্ত্তি উজ্জল হয়ে উঠেছে শতাব্দীর ব্যবধানেও তার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হ'ল না। প্যারিস সেদিন যে বিপ্লবী ছিল আজও তাই আছে; তার শিল্প-প্রতিভার দীপ্তি এক বিন্দুও আজ মলিন হয় নি; তার পথঘাটের অনাবশ্যক খামখেয়ালগুলি আজও বিদেশী পথিকের মন ভোলায়। ১৮৪৮ সনে লুই ফিলিপ্‌সের রাজত্ব, বার বছর আগে যেমন প্যারিসের একটা বিপ্লবী শোভাযাত্রার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল, তেমনি আর একটা শোভাযাত্রায় শেষ হয়ে গেল। লুই বোনাপার্ট প্রবাসের কৃচ্ছ্রের মধ্যেও একটা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল এবং তার Idees Napoleoniennes-এর মধ্য দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের প্রচার চালাচ্ছিল। কিন্তু সব চেয়ে প্রবল জনমত ছিল বিদ্রোহী সাম্যবাদের পক্ষপাতী। অন্য দিকে বিস্‌মার্কের জর্ম্মন ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের আঘাতে ভেষ্টফালিয়া-সন্ধির ভিত্তি উঠেছিল কেঁপে। ১৮৭১ সনে বিসমার্কের সাম্রাজ্য-পরিকল্পনার গোড়াপত্তন হল ভের্সাইয়ের সন্ধিতে। পঞ্চাশ বছর পরে ফরাসীর এই অপমানের এবং লাঞ্ছনার জবাব দিয়েছিল ১৯১৯ সনে, গত মহাযুদ্ধের অবসানে; ভের্সাইয়ের যে-ঘরে বসে জর্ম্মন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়েছিল সেই ঘরেই জার্ম্মেনীকে নিরস্ত্র করবার চুক্তিপত্র সই করিয়ে নিয়েছিল অভিমানী ফরাসী। যা হোক, ফ্রান্সে থার্ড রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হবার আগের কয়েকটা বছরের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা কল্পনা করা মোটেই শক্ত নয়। আজও কি ফ্রান্সে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা নেই? আজ বিসমার্ক নেই, কিন্তু আছেন তার চেয়েও দুঃসাহসী এক জর্ম্মন নেতা—হিট্‌লার। ভেষ্টফালিয়ার কথা অনেকেই ভুলে গেছে, কিন্তু ভের্সাইয়ের সন্ধির যে লাঞ্ছনা জার্ম্মেনী ভোগ করেছে তার পিছনে যে কত বড় একটা জিঘাংসার সঙ্কল্প আছে তার উপলব্ধিই বর্ত্তমান ফরাসী রাষ্ট্রীয় জীবনে এনেছে একটা উচ্ছৃঙ্খল নৈরাশ্যবাদ। শুধু তাই নয়, ফরাসী জনমত আজ শতধা বিভক্ত, জাতীয় নেতৃত্বে আজ তুমুল বিপ্লব। অন্য দিকে ফরাসী মজুর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে যে কম্যুনিষ্ট-প্রীতি দেখেছি তাতে মনে হয় যে ফ্রান্সে একটা ফোর্থ রিপাব্লিকের বিশেষ দেরি নেই।

প্যারিস-প্রদর্শনীর কথা লিখতে গিয়ে যে এই ঐতিহাসিক সূত্রের অবতারণা করলাম তা লঘু বিষয়ের পণ্ডিতী মুখপত্র হিসাবে নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল এই যে এবারকার প্রদর্শনীর অন্তরে জীবনের যে স্রোত চলেছে তাও যে চিরন্তন প্যারিসের একটি প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়—বিপ্লবী, বিদ্রোহী, আত্মাভিমানী, শিল্পী প্যারিসের। ফরাসী মেজাজে এমন একটা মজ্জাগত বিপ্লববাদ প্রচ্ছন্ন আছে যা ফ্রান্সের ইতিহাসকে দিয়েছে এক অদ্ভুত রূপ আর প্যারিসকে করেছে ঘরের এবং বাইরের সমস্ত বিপ্লবের কেন্দ্র। ঐতিহাসিকরা

বলেন যে ফ্রান্সের এই বিপ্লবী সামাজিক অভিজ্ঞতার জন্য দায়ী অতীতের ধর্ম্মযুদ্ধগুলি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফ্রান্সের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে হয়ে গেছে এই কাথলিক আর প্রোটেষ্টান্টের সংগ্রাম, যার ফলে রাজনীতি হয়েছিল কলুষিত, এমন কি দ্বিতীয়-হেনরীর স্ত্রী ফ্লোরেন্সের ক্যাথরিন দেই মেদিচি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসে সেণ্ট বার্থোলোমিউর হত্যাকাণ্ডের সহায়তা পর্য্যন্ত করেছিলেন। সমস্ত ফরাসী ইতিহাসে একটি মাত্র ব্যক্তি ফরাসী সমাজে এবং রাজনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন—তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইহুদী, প্রোটেষ্টাণ্ট, জ্যাকোব্যান, সাম্রাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী—এই সবগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একটি মাত্র জাতীয় স্বার্থের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু ১৮৪৮ সনের বিপ্লবের সামনে নেপোলিয়নের শৃঙ্খলা গেল ভেসে, আর তারপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এক নূতন প্রজাতন্ত্র যার নাম থার্ড রিপাব্লিক। বিপ্লববাদের তীর্থক্ষেত্র আর বিপ্লবীদের পীঠস্থান হ'ল এই প্যারিস। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে রাশিয়ার বিপ্লববাদ ত ফরাসী প্রতিভারই সন্তান। লেনিনের কর্ম্মকৌশল ত ফরাসী অভিজ্ঞতারই একটা অধ্যায়। বিদ্রোহী কর্ম্মকৌশলের মধ্যে রাশিয়ার প্রতিভা যেটুকু নিজস্ব সেটুকু ষড়যন্ত্র এবং নৃশংসতার দিক দিয়ে। ষড়যন্ত্রে রাশিয়ার প্রতিভা দিগ্বিজয়ী, আর নৃশংসতায় রুশ বিদ্রোহীদলের সমকক্ষ কেউ নেই। স্পেনের বর্ত্তমান অন্তর্বিপ্লবে নৃশংসতায় যাদের তাণ্ডব নৃত্য দেখতে পাওয়া গেছে তাদের প্রেরণা এবং সহায় মস্কো থেকে ধার করা। প্যারিসকে চিনতে হ'লে, জানতে হ'লে তাকে এই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিক থেকে দেখতে হবে। যাঁরা প্যারিসে গিয়ে মঁমার্ৎ এবং মঁপার্ণাশের নৈশজীবনের বিকৃত বিলাসের চিত্র দেখে মনে করেন যে প্যারিসকে চিনেছেন, তাঁরা, মিস মেয়ো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুলেরই পুনরনুষ্ঠান করেন মাত্র।

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি বিশেষ চঞ্চল এবং উচ্ছৃঙ্খল মুহূর্ত্তে আমার প্যারিসে থাকার সুযোগ হয়েছিল। ব্রাসেলস্ থেকে প্যারিস এক্সপ্রেসে ফরাসী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেছি। ব্রাসেলস্ ষ্টেসনে একখানি Paris Soir কাগজ কিনে তার পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়ল দুটি জরুরী খবর। ফ্রাঁর স্বর্ণবিনিময়-মূল্যের নিম্ন গতি আর প্যারিসের হোটেল ও কাফেতে চাকরদের ধর্ম্মঘট। প্যারিসে নেমে যে সব ছোট হোটেলের সঙ্গে পূর্ব্বপরিচয় ছিল তাতে যেতে আর ভরসা হ'ল না, কারণ হয়ত গিয়ে দেখতে হত যে তাদের দরজা বন্ধ। তাই সোজা গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে উঠলাম। খুব ভিড় ছিল; তবুও অতিকষ্টে একটা ঘর সংগ্রহ করা গেল। ভোরবেলা অপেরা স্কোয়ারের মধ্যে একটা হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম; দেখলাম একদল মজুর এবং কতকগুলি ভদ্রবেশী লোক "মার্সাইয়েজ" গাইতে গাইতে আর চীৎকার করতে করতে চলেছে। দুপুর হ'তে-না-হ'তে সমস্ত পাড়ায় চাঞ্চল্য সুরু হয়ে গেল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একদল ছেলে লরিতে বোঝাই হয়ে লাল কম্যুনিষ্ট নিশান উড়িয়ে হৈচৈ করতে করতে চলেছে। রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের আত্মিক পরিণয় এবং রাষ্ট্রিক স্বার্থের ঐক্যের এমন দীপ্তিময় চিত্র আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। সোভিয়েটের অর্থে সমগ্র ফ্রান্সে আজ বহু বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছে। মজুরের মুক্তির জন্য তাই আজ মধ্যবিত্ত বেকার ফরাসী উঠে-পড়ে লেগেছে।

প্যারিসে এ বছরের প্রধান আকর্ষণ অর্থাৎ প্রদর্শনীর কথা ভুলে যাই নি। কন্‌কর্ড থেকে ঈফেল টাওয়ার পর্য্যন্ত শ্যান্ নদীর দুধারে বসেছে এই মেলা, আর ঠিক নদীর উপর থেকেই উঠেছে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রচার-প্রাসাদগুলি। সবচেয়ে জাঁকাল হয়েছে রাশিয়া, জার্ম্মেনী এবং ইতালীর প্যাভিলিয়নগুলি। দেখে মনে পড়ল মসিয় লিও ব্লুমের কথা। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনি বলেছিলেন যে প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হবে ফ্যাসিজম্-এর উপরে পপুলার ফ্রণ্টের (ফরাসী সোশ্যালিষ্ট পার্টি) শ্রেয়ত্বের প্রতীক। এই কথার উত্তরে জর্ম্মন এবং ইতালীয়ান প্রেসে এমন প্রতিবাদ হয়েছিল যে ঐ দুইটি দেশের প্রদর্শনী ত্যাগ করবার মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মসিয় ব্লুমের গর্ব্ব সার্থক হয় নি। জার্ম্মেনী, রাশিয়া এবং ইতালীর সহযোগিতায় প্রদর্শনীর যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তাকে পপুলার

ক্রুস্ট্‌ রীতিমত ঈর্ষা করতে পারে, অথচ এই এলোমেলো অগোছাল প্রদর্শনীটির যা সত্যিকারের আকর্ষণ তা কতকগুলি বিদেশীর ভিড়ের মধ্যে নয়, তা আসলে চিরন্তনী সেই ফরাসী শিল্প-প্রতিভার আলোতে। ঐ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য ছিল, বিচিত্র আলোকমালার সমারোহের মধ্যে যে রঙের হোলিখেলা চল্‌ত, এবং একটি আন্তর্জাতিক কোলাহলের মধ্যে ফরাসী অনুকরণের সামগান শুন্‌তে পেতাম, তাতে মনে হ'ত যে এই প্রদর্শনীটাও আসলে প্যারিসের একটা প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই প্রদর্শনীই প্যারিসে না হয়ে যদি হ'ত লণ্ডনে কিংবা বার্লিনে, ভিয়েনায় কিংবা বুডাপেষ্টে, তবে এর আকৃতি এবং প্রাণ যে হ'ত কত বিভিন্ন তা বেশ কল্পনা করতে পারি। লণ্ডনে দর্শকের জনতার মধ্যে হাস্যরসের চেয়ে পানরসের চর্চাই হ'ত বেশী; বার্লিনে চেষ্টা করেও কেউ হারিয়ে যেতে পারত না পথ ভুল করে; ভিয়েনায় হয়ত দর্শকবৃন্দ মেলার জিনিষ না-দেখে নিজেদের মধ্যেই চাওয়াচাওয়ি করত বেশী; আর বুডাপেষ্টে তোকাইয়ের (হাঙ্গেরিয়ান সুরা) অমৃতাস্বাদন এবং জিপ্‌সী সঙ্গীতের প্রলোভন সত্ত্বেও কোন দর্শক প্রদর্শনীতে এক বারের বেশী দু-বার যেত কি না সন্দেহ। এইখানেই হচ্ছে প্যারিসের বিশেষত্ব। এই জন্যেই প্যারিস ইউরোপ অন্যান্য সব কয়টা রাজধানীর থেকে এত বিভিন্ন। প্যারিসের রাস্তায়, ঘাটে, পার্কে, প্রাসাদে যে একটা সামঞ্জস্যের বিকাশ, প্রকৃত ফরাসী শিল্প-প্রতিভার তাই মূলমন্ত্র। লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনষ্টারের সৌন্দর্য্য এবং দম্ভ উইলেসডেনের নোংরামি আর বিনয়কে তিরস্কার করে; কিন্তু প্যারিসের কোন একটা বিশিষ্ট পাড়া অন্য একটা পাড়াকে হিংসা করে না। প্যারিসের যে-কোন অঞ্চলে আপনাকে ফেলে দিলে তখনি বল্‌তে পারবেন যে এটা প্যারিস। আগাগোড়া সমস্ত শহরটার মধ্যে একটা শিল্পসামঞ্জস্যের বাঁধন রয়েছে যাতে ভুল করবার উপায় নেই। আর প্লাস্‌ দ্য লা কন্‌কর্ড-এর মত ওরকম উদার এবং মুক্তি-উদ্দীপক স্কোয়ার ইউরোপের আর কোথাও দেখি নি। শাঁজ্‌ এলিজে (Champs Elysées)র চেয়ে সুন্দর রাস্তা লণ্ডনে কিংবা বার্লিনে দেখি নি। ফরাসীরা গাড়ী চালায় হয়ত খুব অসতর্ক ভাবে কিন্তু দুর্ঘটনা ইংরেজদের চেয়ে করে কম। বার্লিন প্যারিসের চেয়ে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু উন্টার্‌ ডেন্‌ লিণ্ডেনে কোন লোক তার বন্ধুকে নমস্কার করে দাঁড়াবে না, কিংবা বাড়ীঘরের কুশল-প্রশ্ন করবে না, যেমন হয় প্যারিসের রাস্তায়। বার্লিনের ট্যাক্সিওয়ালা তার প্যারিসের সতীর্থের চাইতে অনেক চরিত্রবান এবং সাধু হতে পারে, কিন্তু প্যারিসে একজন বিদেশী পথেঘাটে যে সব ছোটখাট নির্দ্দোষিতার আত্ম-প্রতারণা দেখে মজা পায়, বার্লিনে তার কোন সম্ভাবনা নেই। আর সারা ইউরোপে এমন যদি কোন শহর থেকে থাকে যেখানে সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতা বর্ত্তমান, তবে সে প্যারিস। গত জানুয়ারির ধর্ম্মঘটের সময় প্যারিসের পথে ফরাসী উপনিবেশের আরব এবং কাফ্রি সৈন্যকে পুলিসের কাজ করতে দেখেছি; দরকার হ'লে মারধর পর্য্যন্ত করেছে। এ ব্যাপার লণ্ডনে কিংবা বার্লিনে কখনও সম্ভবপর হয় নি কিংবা হবে না, এরূপ জোর করে বলা যেতে পারে। প্যারিসের আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীর ভিতরেও চিরন্তন প্যারিসের সেই একই চিত্র দেখতে পাওয়া যেত। সমস্ত দুনিয়ার সাদা, কালো, হল্‌দে ও লাল এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে ফরাসী-বিপ্লবের মানব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের একটা পরিণতি তার মধ্যে দেখতে পেতাম।

প্রদর্শনীর জাতীয় প্রাসাদগুলির মধ্যে রাশিয়া, জার্ম্মেনী এবং ইতালির বাড়ী কয়টাই ছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, সেকথা বলেছি। কিন্তু রাশিয়ান ও জর্ম্মন প্যাভিলিয়নের অবস্থিতির মধ্যে একটু হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার ছিল। দুটি বাড়ীই মুখোমুখী এবং আশপাশের অন্যান্য বাড়ীগুলির চেয়ে বেশ উঁচু। মনে হয় যেন এই দুটো জাত পাল্লা দিয়েছিল কার জাতীয় গর্ব্বের স্তম্ভ আকাশে বেশী দূর তোলা যেতে পারে তাই নিয়ে। জার্ম্মেনী ঊর্দ্ধযাত্রায় ঠকিয়েছে রাশিয়াকে কিন্তু কাস্তে- ও হাতুড়ি- ধরা যুবকযুবতী-যুগলের মূর্ত্তি জর্ম্মন ঈগলের আস্ফালনকে তুচ্ছ করেছে, এবং সমস্ত প্রদর্শনীর উপরে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্য সব দেশের প্রাসাদগুলির মধ্যে কোন-কোনটা বেশ কারুকার্য্য-মণ্ডিত, যথা হাঙ্গেরী এবং মিশরের বাড়ী; তবে রাশিয়ার মূর্ত্তির সামনে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। প্রথম পরিচয়ে দর্শককে তারা তাক্‌ লাগাতে পারে না। স্থাপত্যশিল্পের

প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী
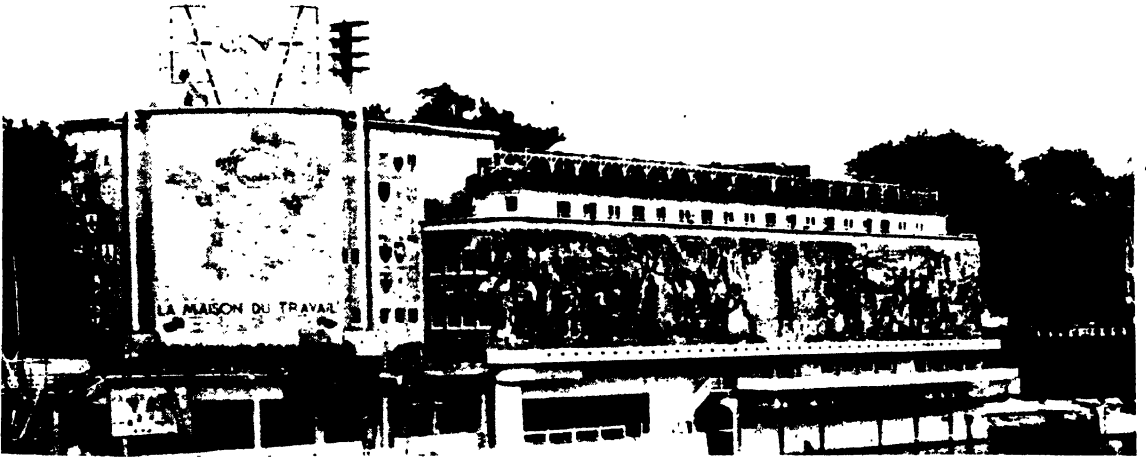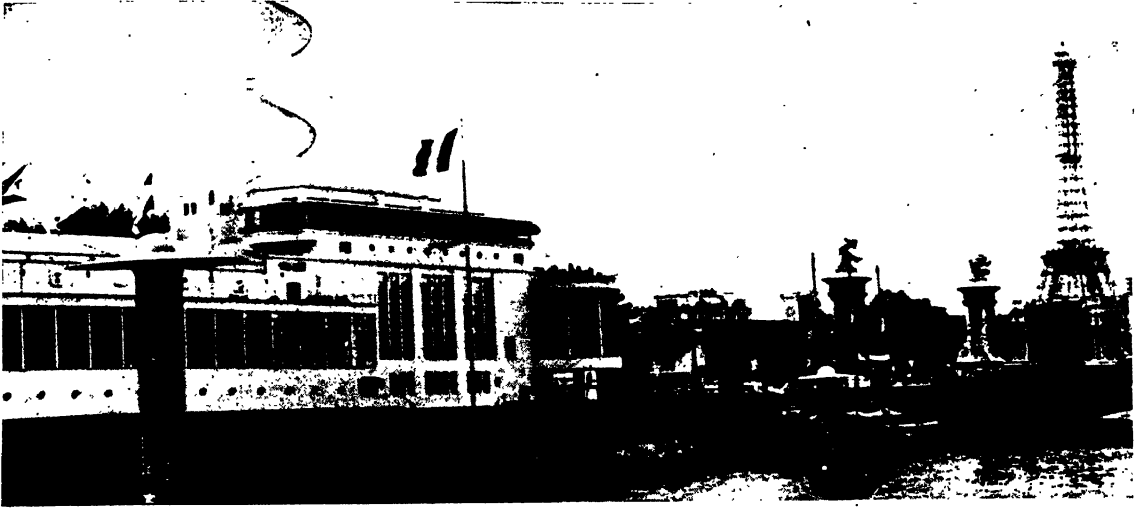
উপরে : নদী হইতে প্রদর্শনীর দৃশ্য ॥ মধ্যে : ফরাসী শ্রম-ভবন ॥ নিম্নে : প্যারিসের প্রদর্শনীতে রাশিয়া-ভবন ॥
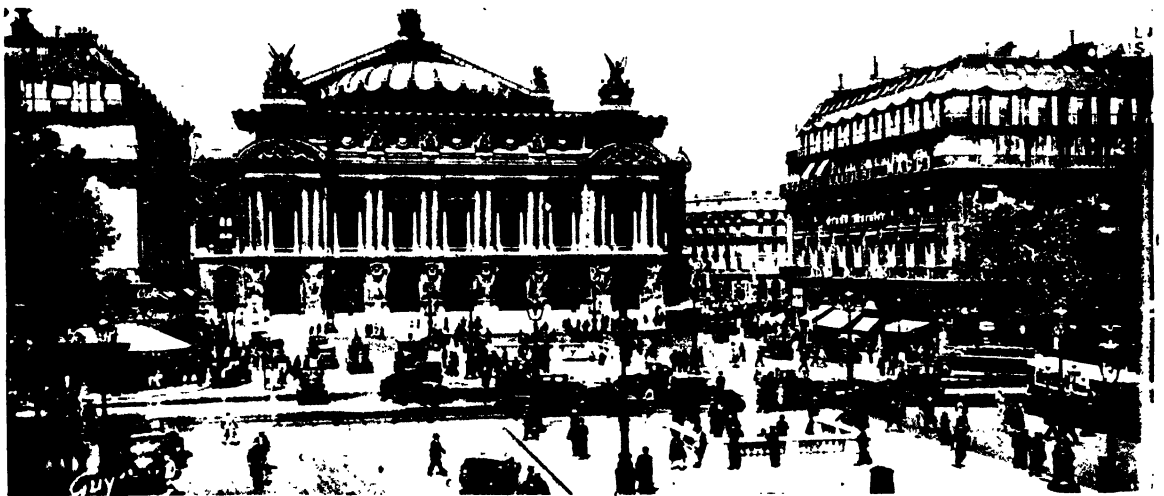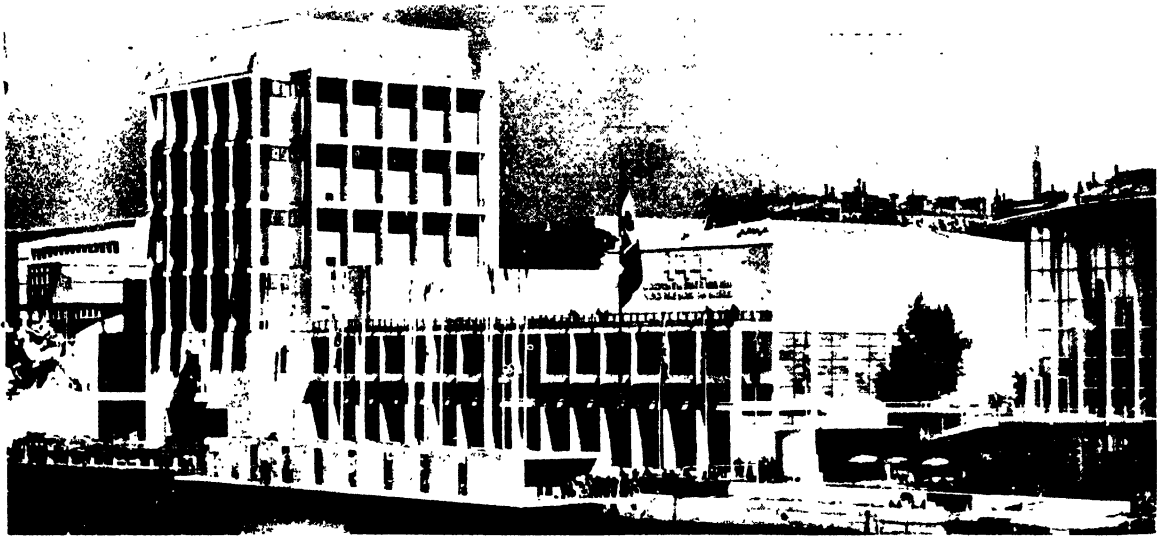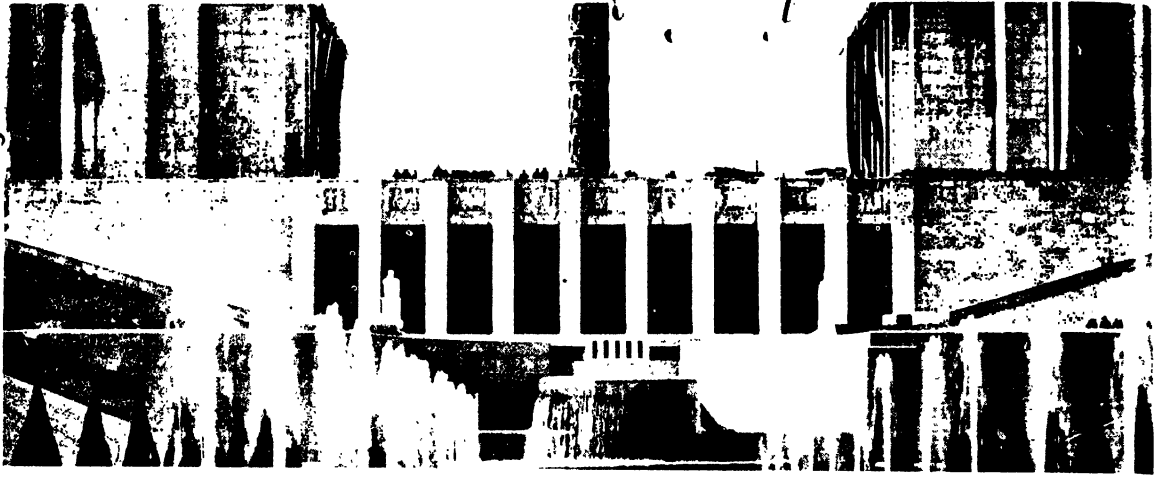
উপরে : ত্রোকাদেরোঁ ॥ মধ্যে : প্রদর্শনীর ইতালী-ভবন ॥ নিম্নে : অপেরা-গৃহ, অপেরা স্কোয়ার
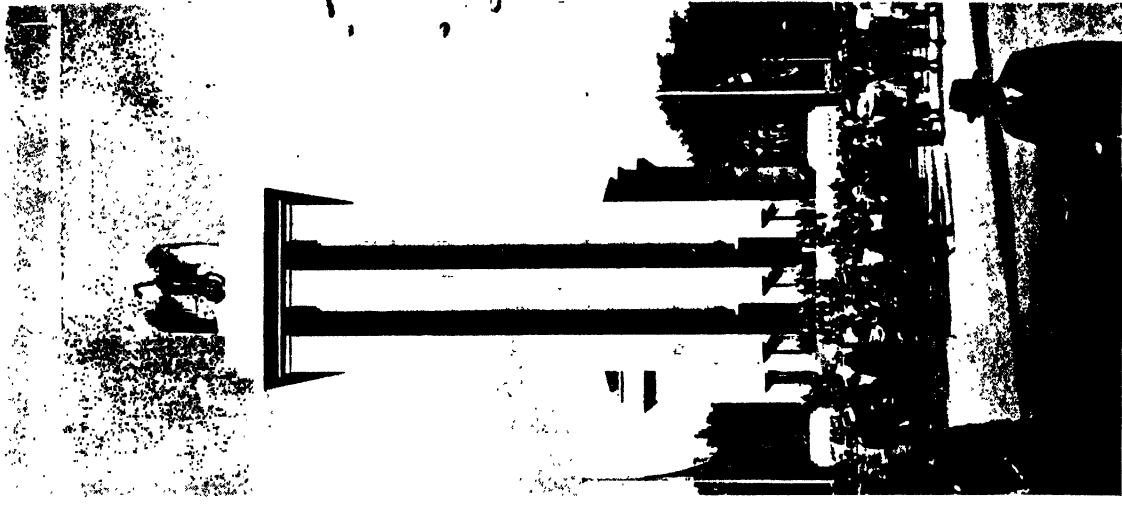
নরওয়ে-ভবন

শিয়া-ভবন

জর্মন-ভবন

প্যালেস্টাইন

['প্যালেষ্টাইনে হেরফের' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ঃ পৃ. ২২৩]

ওমর-মসজিদ, জেরুসালেম

লাজারাসের সমাধি, বেথানি

প্রাচীন জেরুসালেমের পথ

বিলাপ-প্রাচীর, জেরুসালেম

'দক থেকেও রাশিয়ান প্রাসাদটির মর্য্যাদা উঁচুদরের সন্দেহ নেই। জর্ম্মন স্তম্ভটির উচ্চতার সঙ্গে তার প্রদর্শনী-গৃহের কোন সামঞ্জস্যই নেই, কিন্তু রাশিয়ান প্রাসাদটি বেশ স্তরে স্তরে রেখার সারল্যে মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে। তবে প্রদর্শনী-গৃহের অভ্যন্তর হিসাবে জার্ম্মেনীর সমকক্ষ কেউ ছিল না বললেই চলে। রাশিয়ান গৃহের অভ্যন্তরে যদিও প্রচার-বিভাগের মালমসলা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু ছিল না, তবুও জনতার অভাব ছিল না ওখানে। জনতার স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে ওখানে ঢুকতে এবং বেরতে হত। ইতালীব প্রাসাদটির পরিকল্পনা করেছিলেন পিয়াচেন্তিনি, আধুনিক ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্পী; কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে তাকে এমন কিছুই জমকাল মনে হত না। তবুও ইতালীর রেস্তোরঁাটি ছিল গোটা প্রদর্শনীর মধ্যে সেরা, আর গৃহের অভ্যন্তরে ছিল একটি আধুনিক ধরণের ভাস্কর্য্যের নমুনা। মূর্ত্তিটি স্বাধীন ইতালীর— বিদেশীর আর্থিক দাসত্ব এবং রাষ্ট্রিক বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস মূর্ত্তিটির মধ্যে বেশ ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নটা দেখতে এত সাধারণ ছিল যে আমাদের চির-পরিচিত এবং সমাদৃত ব্রিটিশ শিল্প-প্রতিভার জ্যোতি দেখবার জন্যে তার ভিতরে ঢুকতে আর প্রবৃত্তি ছিল না। চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি সব দেশেরই ঘরগুলি দেখে বাসনা হ'ল ভারতবর্ষের ঘরটাকে খুঁজে বার করতে। অনেক খোঁজ করেও পেলাম না। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে এই নিয়ে দিল্লীর এসেম্ব্লিতে প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু এবারকার মত আর এর প্রতীকারের উপায় হবে ব'লে মনে হয় না।

স্বাধীন ইতালীর মূর্ত্তি

পথচলা

শ্রীসুশীলকুমার দে

এতদিনে বুঝি পথচলা মোর হ'ল শেষ
ফিরি' তব পথে, বিফল বিপথে ঘুরি';
ভাসে আশে-পাশে দূরের সুরের কলরেশ,
হারানো পুরানো সুখ আসে বুক জুড়ি।

পুরাতন পথে নূতন পথের অবসান,
প্রদোষের রাগে জাগিল প্রাতের প্রীতি;
পুরাতন গান হয়ে গেল যেন নব গান,
বিকশিত হ'ল স্মৃতিরসে বিস্মৃতি।

গানের সঙ্গে এনেছি প্রাণের প্রীতি-ভাষ,—
ফিরাক্ সকলে, তুমি ফিরায়ো না আঁখি;
আঁধারে মিলাক্ আঁধার-দিনের ইতিহাস,—
হয় নি ত শেষ, সকলি রয়েছে বাকি।

ঘরে ছিল যাহা, পথে খুঁজি তাহা সারাদিন,—
হারায় নি কিছু, সঞ্চিত ছিল সবি;
চোখের হাসিটি দেখি নি চোখের ধারালীন,
ছায়ার আড়ালে দেখি নি ছায়ার রবি।

তোমা' পানে আমি ছিনু দিনযামী উদাসীন,
আপনার ভুলে ভুলিয়া সকলহারা;
আপন মনের মোহের মাধুরী-সুধা-লীন,
ছিল না আগল, ছুটেছি পাগলপারা।

আপনার মাঝে রচি আপনার কারাগার
সাগর-স্বপ্ন বৃথা গোষ্পদে গড়ি';
জানি না আড়ালে দাঁড়ায়ে দুয়ারে পারাবার
পাষাণ-সোপানে খসিছে আছাড়ি' পড়ি!'

কণ্ঠে আমার ছিল অবনীর মণিহার,
হ'ল বুকে জ্বালা যৌবন-জয়মালা;
কাটে না ত দিন, শুধু দিন গণি' অনিবার
সকালে বিকালে সাজায়ে বরণডালা।

আজ বুঝি তাই ছুঁয়ে গেল তব পদতল
গহন-গমনে মগ্ন মনের বেদী;
দুখের অতলে উদিল সুখের শতদল
আলোকে অমল, আঁধারের বাধা ভেদি'!

বহুদিন পরে হেরিনু সে-রূপ বরাভয়—
শ্রান্তির শেষ ভ্রান্তির অভিশাপে;
নিজ আঁখিজলে মুছিলে নিজের পরাজয়
দহি মোর পাপ নিজের তপের তাপে।

হরের নয়ন মোহে কি স্মরের শরাসন?
সতী বুঝি আজ গৌরীর রূপে জাগে;
দিগম্বরের শ্মশানে ধেয়ানে ভরা মন,
বিষ-নীল আঁখি নিমীল নূতন রাগে!

ওগো বিমানিতা, পরাজয় মাঝে করি জয়,
দেহ-অন্তরে নূতন দেহটি ধরি,'
দিলে অভিনব এ কি আজ তব পরিচয়,—
জাগিল অতনু তনুর গরিমা ভরি'!

গরলের জ্বালা ধরিয়া, তবুও ধরি' প্রাণ
নিঃস্বের ক্ষুধা বিশ্বের সুধা মাগে;
আর্ত বুঝি তার নাহি পিপাসার পরিমাণ,—
তাপসী প্রিয়ার আঁখিটি আঁখিতে লাগে।

দীপ্তি ও দাহ দহিল, রহিল সাথে তার
ভস্মের ভারে আজো কি অগ্নিকণা?
জানি না,—কেবল তুলে দিনু সবি হাতে যার
আঁখি তার করে স্নেহভরে উন্মনা।

রৌদ্র-পীড়িত ধূলি-ধূসরিত হীনবেশ
ভ্রমণ-ভ্রান্ত ফিরেছি তোমার পথে;
দেরি নাই আর, হয়ে এল এবে দিনশেষ,—
লবে না কি মোরে বিজয়-গরবী রথে?

নয়নে নামিছে সন্ধ্যা-ধরার আঁধিয়ার,
দিনান্ত-রাগ দিগন্ত-পদে লুটে;
নিশীথের পথে কি দিয়ে তোমারে বাঁধি আর,—
নিঃশেষ মধু প্রাণের পদ্মপুটে!

পরিচয়মাঝে অপরিচয়ের ব্যবধান
কেটে যাবে কবে নব-প্রভাতের তীরে,—
ভেদিয়া অবোধ অন্ধকারের অবদান,
আকাশ আবার ধরারে ধরিবে ঘিরে!

আরতি
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফুলসাজ
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নব জার্মানী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখীর মত জার্মানী গত মহাসমরের চিতাভস্ম থেকে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

এ-কথা জার্মানীতে মাত্র এক দিনের জন্য এলেও না মনে হয়ে যাবে না। দিকে দিকে নানা ভাবে নব-জীবনের উৎসাহ ও উল্লাস। ঠিক গ্রীষ্মকালে উত্তর মেরুতে

ভাগ্যলক্ষ্মী
ফ্রাঙ্কফোর্ট

তুষার গলে সলিল-সমুদ্র সৃষ্টির মত। শীতের শুভ্র মৃত্যু বা নিরুপায় অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই। গত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ও লজ্জা জার্মানীর মুখ থেকে মুছে গেছে। জাতীয় জীবনে এসেছে অসীম যৌবন, অতুলনীয় বসন্ত। রাইনল্যাণ্ডে জার্মান সৈন্যের অভিযান, সারের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন, ভের্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি একে একে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার—এই সব আলোচনা প্রত্যেককেই উৎসাহিত ক'রে রাখে। মিউনিক মিউজিয়মে বিশ্রামমগ্ন গ্রীক-দেবতা স্যাটারের একটি মূর্ত্তি আছে। তার সঙ্গে তুলনা করে মিউনিকের অধিবাসীরা বলে, "আমাদের দেশ ঐ রকম করে ঘুমোচ্ছিল এতদিন; তা'বলে তার সুদৃঢ় মাংসপেশীবহুল দেহ দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল মনে ক'রো না।" সেই নিদ্রিত দেবতার জার্মানীতে জাগরণ হয়েছে।

ইউরোপে প্রাণ সর্ব্বদাই গতিশীল। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দূর ভবিষ্যতের দিকে, গৌরব থেকে নব গৌরবের অভিমুখে তার চিরযাত্রা। তবু বহু ইউরোপীয় দেশে অতীতের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ ও সলোভ দুর্ব্বলতার আভাস পাওয়া যায় এবং ভ্রমণকারীরাও সাধারণত জীবন্ত বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতের গৌরবই বেশী দেখে বেড়ায়। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকের দৃষ্টি পড়ে জার্মানীর পুরাতন ঐশ্বর্য্যের দিকে তত নয়, যতটা নবীন জার্মানীর অপরূপ মহাপ্লাবনের দিকে। বর্ত্তমান উন্নতি ও ভবিষ্যৎ গৌরবের স্বপ্নের দুঃসহ আনন্দে দেশ বিভোর।

কলোনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গীর্জ্জাটি জার্মানীর অন্যতম গৌরব। কিন্তু কলোনে এসে দেখলাম যে তার চেয়ে বড় গৌরবস্থল হয়েছে এখানকার ব্রাউন-শার্টের দল। সেদিন একজন নাৎসী নায়ক আসছেন বালক-বাহিনীর কুচকাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করতে। সেজন্য লোকের কি বিস্ময়কর চঞ্চলতা ও উত্তেজনা। পথের দুই পাশে গৃহে গৃহে জয়পতাকা, নাৎসী অভিবাদনের সমারোহ। অসংখ্য শিখরকণ্টকিত মন্দিরটিতে দেবোপাসনার সমারোহ নেই। এমন কি,

আকাশ হইতে বার্লিনের দৃশ্য

রাইনল্যাণ্ডে গোচারণভূমি

আকেনের সৌধচূড়া
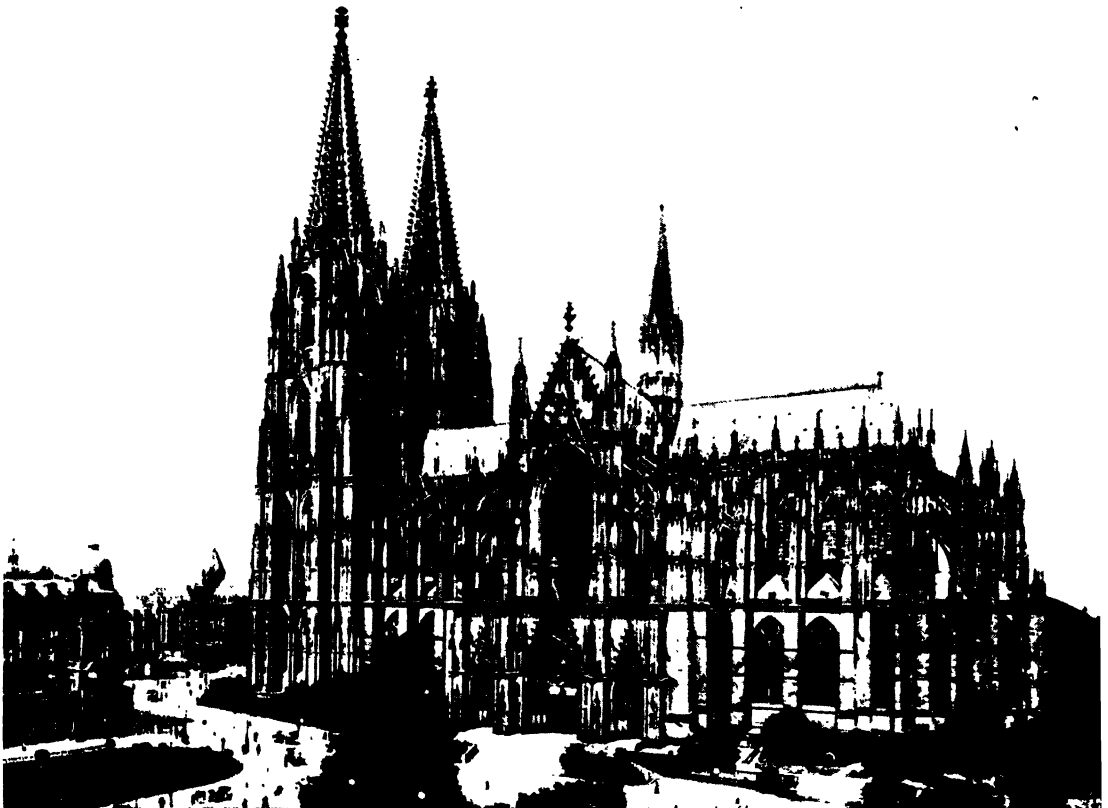
কলোন ক্যাথিড্রাল
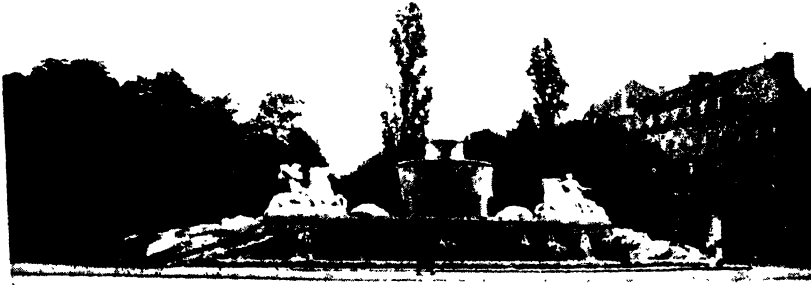
মিউনিকের একটি চৌরাস্তা

রথেনবুর্গ

রাজপথের একটি দৃশ্য

বিশ্রামমগ্ন স্যাটার, মিউনিক মিউজিয়াম

মোসেল নদীর তীরে দুর্গ
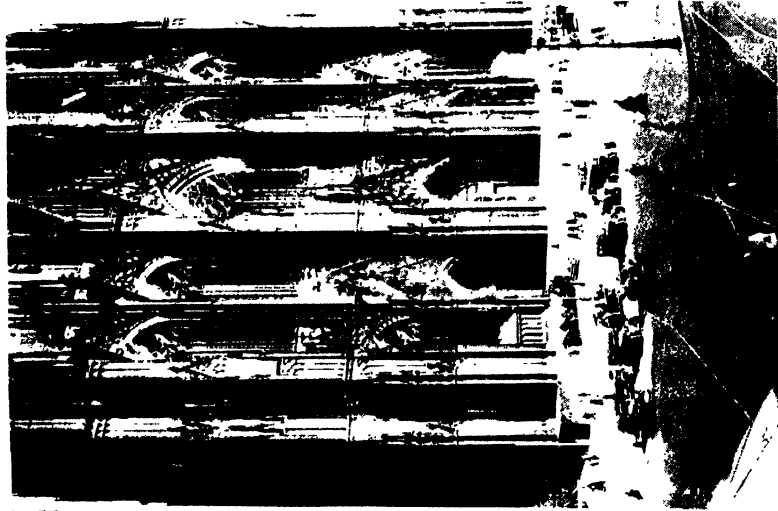
ক ক্যাথিড্রাল : পশ্চিম
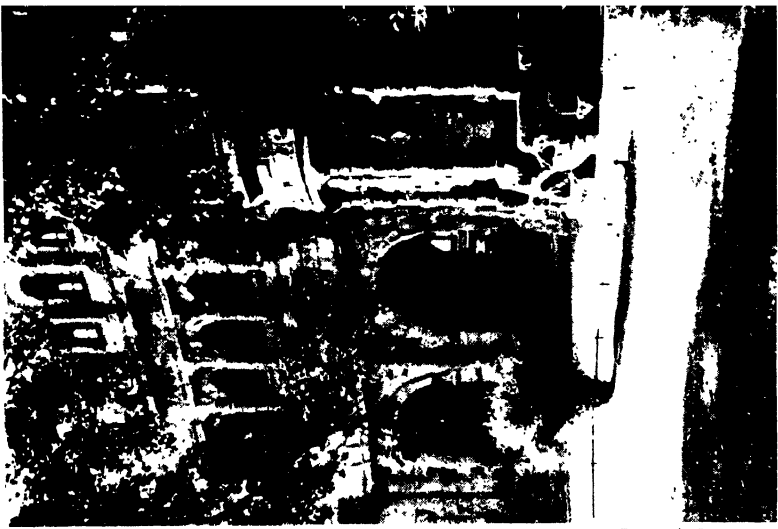
মোসেল নদীর তী। প্রাচীন নগরদ্বার

অভ্যন্তরের শান্তসমাহিত বিশালতার ছায়া বহিরঙ্গনের উদ্দামতার উত্তেজনাকে একটুও স্নিগ্ধ বা সংযত করতে পারছে না। ধর্মের স্থান অধিকার করেছে দেশপ্রেম। নবজাগরণের কোলাহলে মন্ত্রপাঠের গম্ভীর নির্ঘোষ ডুবে গেছে। ক্রুশ-চিহ্নের স্থান অধিকার করেছে স্বস্তিক-চিহ্ন।

জার্মানীর ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত ব্যক্তির ইতিহাস। যুগে যুগে দেশের অধঃপতন ও মোহনিদ্রা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ধার করবার জন্য, দেশকে জাগাবার জন্য কোন অতিমানব পাঞ্চজন্য বাজিয়েছেন; বিপ্লবের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে দেশের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। এই সব সময়ে এক-একটি আন্দোলন মূর্ত্তি লাভ করেছে। দেশের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন লুথার, ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক, হিটলার। এই রকম সম্পূর্ণ ভাবে আর কোন দেশে ব্যক্তি-বিশেষরা ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেন নি। জার্মান-প্রতিভা গণতন্ত্রের মধ্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, করে নেতার মধ্যে। ধর্মের আন্দোলন সৃষ্টি করলেন লুথার; সাম্রাজ্যের কল্পনাকে প্রথম প্রাণ দিলেন ফ্রেডেরিক; জার্মান সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন বিসমার্ক। আর তৃতীয় রাষ্ট্রের স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র হিটলার। জাতীয় জীবনের বিকাশ হয়েছে এ-দেশে ব্যষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে নয়।

জীবনগঙ্গার এই নব-ভগীরথকে বাদ দিয়ে বর্ত্তমান জার্মানী কল্পনা করাই অসম্ভব। ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও রক্তপাতের ভিতর দিয়ে তাঁর বিজয়-অভিযান হয়েছে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আসনে। কিন্তু এইটাই দেশের মুক্তি স্বরূপ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন, দলবিভক্ত, অপমানিত দেশের অন্য কোন উপায় ছিল না; অন্য কোন পথে তার হৃত সম্মানের এত শীঘ্র পুনরুদ্ধার হতে পারত না। সামান্য ভাবেই নাৎসী দলের প্রথম অভিযান হয়েছিল; মিউনিকে এক সময় তাদের চেষ্টা অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় যেখানে প্রথম নাৎসী নিহত হয় সেখানে অনির্ব্বাণ অগ্নি রক্ষা করা হয়। জার্মানীর এই একটি নূতন তীর্থ। প্রত্যেক পথচারীকে সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে হয় নাৎসী অভিবাদন ক'রে। ইহুদীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও বহিষ্কার; ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে দেওয়া, নাৎসীবাদের বিরোধীদের বন্দীশিবিরে অন্তরীণ করে রাখা, বারবার জগতের শান্তি-নাশের আশঙ্কা ঘটান—এই সব হচ্ছে জগৎকে নাৎসী জার্মানীর দান। তবু দেশকে তারা যা দিয়েছে তা স্মরণ ক'রে এই বীর আত্মাগুলির প্রতি সসম্মানে বাহু প্রসারিত হ'ল। জগতে কোন বিপ্লবের পথই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না;

অ্যাপলো
মিউনিক মিউজিয়ম

ফ্রান্স ও রাশিয়া তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ফরাসী-বিপ্লব দেড় শত বৎসরের ও রুশ-বিপ্লব মাত্র পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। সে-সব অত্যাচারের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহানুভূতির কথা বহু আলোচনা হয়েছে; কিন্তু আদিম মানবের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় নি।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জার্মানীর সুদৃঢ়। এই বিশ্বাসের বলেই সে তার প্রাপ্য স্থান ফিরে পাচ্ছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে যে রণহুঙ্কার ও বাগাড়ম্বর প্রকাশ পেয়েছে তা একটুও নিষ্ফল বা নিরর্থক নয়। ব্যায়ামচর্চ্চার রীতি

ব্রিটেনে শ্রেষ্ঠ না জার্ম্মানীতে, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে এবং যদিও কোন জাতিই নিজের পন্থাকে অপকৃষ্ট বলে স্বীকার করবে না, নিপুণতা ও শৃঙ্খলায় জার্মান-রীতি বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অলিম্পিক ক্রীড়াতে যেরূপে জার্মানী উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করছে তাতে ভবিষ্যতে কোন দেশই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। স্কুলে ব্যায়াম একটি প্রধান বিষয়; ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ শিক্ষার আগে শরীরচর্চ্চায় কুশলতা দাবী করা হয়। ব্যবসায়েও এর প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে।

দেশের প্রতি কোণটিকে এরা গভীর প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখেছে। দেশ বলতে কোন ভৌগোলিক মৃত্তিকাখণ্ড মনে করে নি, তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের প্রত্যেকটি অংশে, বনে উপবনে পর্ব্বতে বেড়িয়ে তার সঙ্গে নিবিড় চাক্ষুষ পরিচয় করছে। শ্রেষ্ঠ "গ্লোব ট্রটারে"র জাতি ভূ-পর্য্যটক থেকে স্বদেশ-পর্য্যটকে পরিণত হয়েছে। মোটর গাড়ীর প্রাচুর্য্যে, দেশব্যাপী রাজপথের প্রসিদ্ধিতে ও এরোপ্লেনের প্রসারে শ্রেষ্ঠ এই দেশের যুবকরা পায়ে হেঁটে দেশ দেখছে। "হ্বণ্ডারফগেল" আন্দোলন এদেশেই প্রথম সৃষ্টি হয়, পরে ইংলণ্ডে "ইয়ুথ হোষ্টেল মুভমেণ্ট নামে তার প্রচলন হয়। এই পায়ে-হেঁটে বেড়ানোতে যে নিবিড় আনন্দ পেয়েছি তার সঙ্গে তুলনা কোন মামুলি প্রথায় দেশ-ভ্রমণে পাই নি।

কিন্তু ইংলণ্ড ও জার্মানীর দেশ বেড়ানোতে প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডে নিছক মনের আনন্দে হাইল্যাণ্ডসের সাগরপ্রান্তে, হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জে, লেক-অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালাম। প্রকৃতির শ্যামস্পর্শ, তারকাখচিত নীলাকাশের অতন্দ্র নীরবতা, বিজন পর্ব্বতের মৌন মহিমা মনকে সংসার ও রাজনীতির চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। ডার্ব্বিশায়ারে প্রস্তর-শিখর-কণ্টকিত নির্জ্জনতায় চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে যে চির-রহস্যের সৃষ্টি করে, দূর-দূরান্তরে সন্ধ্যাতারা যে অপলক দৃষ্টিতে আহ্বান করে তা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্বের কথা মনে আসে না। কিন্তু জার্মানীতে "শুধু অকারণ পুলকে" আত্মহারা হবার উপায় নেই। নব-বিধান অনুসারে আল্‌প্‌সের শুধু কোন্‌ অঞ্চলে বেড়ান যাবে তা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। "হিটলার যুব-আন্দোলনে" যোগ দেবার সময় শপথ করতে হয়—অলসতা, স্বার্থপরতা, ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরাজয়-স্বীকারপ্রবণতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ করতে হবে। তার ফলে রাইন-বক্ষে বা প্রকৃতির যে-কোন নিভৃত অঞ্চলেই যাই না কেন—জার্মান যুবকের কানে বিজনতার বাণী নয়, এই শপথ বিবেকানন্দের অমর বাণীর মত ধ্বনিত হতে থাকে "হে জার্মান ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই দেশের কাছে বলি প্রদত্ত।" "আনন্দের মধ্য দিয়ে শক্তি-সাধনার" সংঘ সৃষ্টি হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ছুটি ও বিশ্রামের সময়টা আনন্দে—বলকারক আনন্দে—কাটানোর উপায়ের সন্ধান দেওয়া। শক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সব কর্ম্ম, চিন্তা, আনন্দ ও উপভোগেরই লক্ষ্য শক্তিসঞ্চয়। বিদেশীরা আতঙ্কে বলে, এই শক্তি-উপাসনা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নামান্তর। জার্মানরা বলে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ; আমরা শক্তির পথে মনীষার সাধনা করছি।

দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য বর্ত্তমান জার্মানী দার্শনিক চিন্তাশীলতাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পশ্চাৎপদ হয় নি। এদের মতে মনীষার আতিশয্যে দেশে অবসাদ এসেছিল; কাজেই মানসিকতার চর্চ্চার চেয়ে দেহচর্চ্চাই বেশী প্রয়োজন। থাকুক শুধু সেই বিদ্যাচর্চ্চা যার ব্যবহারিক উপকারিতা রাষ্ট্রকে বৈজ্ঞানিক সম্পদে বিভূষিত করবে; দূরে যাক্‌ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ইহুদী-সুলভ আন্তর্জাতিকতার ব্যাখ্যা। নারী ফিরে যাক তার নিভৃত নীড়ে; পুরুষের ভিড়ে তার প্রতিযোগিতায় অকল্যাণ হবে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও দেশকে সুস্থ সবল সন্তান দানই তার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। বহু বৎসরের কষ্টার্জ্জিত নারী-স্বাধীনতা জার্মানীতে নারী আবার হারাবে। সভ্যতার উন্নতির ঘড়ির কাঁটাটি জার্মানী পিছিয়ে দিতে চায়। বাইবেলের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে; নূতন সংস্করণ বাইবেলের দৈহিক শক্তির প্রশংসামূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিউনিকের ব্রাউন হাউসই জার্মানের বেথলিহেম; আর হিটলারের "আমার সংগ্রাম" বইখানিই নব-বাইবেল।

রাষ্ট্রপতির আদেশ শীতকালে বেকারদের সাহায্যের জন্য প্রতি রবিবারে মাত্র এক "কোর্সে"র খাদ্য খেয়ে বাকী অংশের দাম তুলে রাখতে হবে। সমস্ত জাতি অম্লানবদনে তা পালন করছে। এমনি একটি "হিটলার সন্‌টাগে"
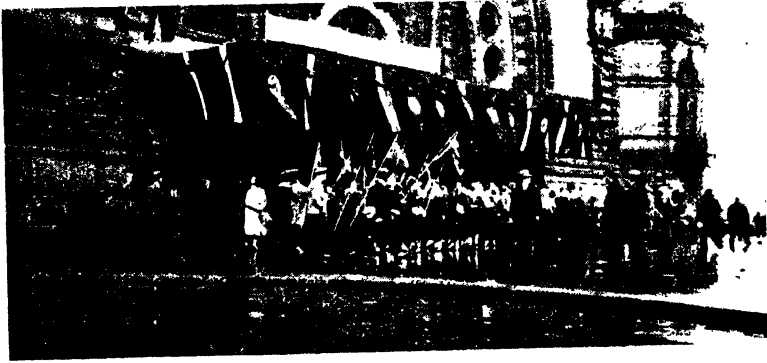
কলোনে শোভাযাত্রা

(সন্‌টাগ—রবিবার) অজ্ঞাতসারে লাঞ্চের প্রথম পর্ব্ব স্যুপ নিয়ে বসা গেল। তার পরই পুরা দামের এক 'বিল' এসে হাজির। তখন ব্যাপার বুঝে দাবী করলাম যে স্যুপের সঙ্গে রুটিও আমার প্রাপ্য। প্রকাণ্ড এক টুকরা রুটি দিয়ে একাধিক লোকের উপযুক্ত সমস্তটা স্যুপ খেয়ে হিটলারীয় নিয়ম রক্ষা ও সারাদিন অনাহারে রাইন-ভ্রমণের সম্ভাবনা-ক্লিষ্টের আত্মতৃপ্তি হ'ল। এই অতিভোজনও নিশ্চয়ই ব্রাউন-শার্টদের অননুমোদিত হবে।

কলোনের কোলাহলময় বাদামী বাহিনীর শোভা-যাত্রার শান্তি ভঙ্গ থেকে কি বিপুল বিরতি পেলাম কব্‌লেন্‌ৎসের ষ্টীমার-ভ্রমণে। একটি নব-বিবাহিত দম্পতি চলেছে মধুচন্দ্র যাপনে। ফরাসী স্ত্রী ও জার্ম্মান স্বামী দুই ভাষা মিলিয়ে কথা বলছে। কেউ অতুলনীয় জার্ম্মান কফি পান করছে। এক পাশে কয়েক জন লোক মৃদুস্বরে গান ধরেছে। জার্ম্মান ভাষা বড় অদ্ভুত। লেখার অক্ষরে বিকট ও ব্যঞ্জনবহুল দেখায়; পুরুষকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ শোনায়; কিন্তু নারীকণ্ঠে যেন সুধাবর্ষণ করে। দু-ধারে পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও শ্যামল, কোথাও প্রস্তর-বন্ধুর। অশান্ত পবন পর্ব্বতশিখরে খেলা করে; তার হাসির ঢেউ স্বচ্ছ জলরাশিকে চঞ্চল করে যায়। লঘু মেঘ দু-ধারের গিরিদুর্গগুলিকে নিয়ে খেলা করে; অক্টোবরের অনিবিড় কুহেলিকা, নদীর তীরে তীরে তরুশিরে অবগুণ্ঠন রচনা করে। মনে হয় সেই রাইন—অগণিত রূপকথা যার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত, প্রতি প্রস্তর ও গিরিদুর্গের সঙ্গে জড়িত সেই রাইন। 'লোরলেই'য়ের মায়া-সঙ্গীত শুনতে শুনতে যেখানে নাবিকরা হাসিমুখে প্রাণ দিত, যার মোহিনী মায়ায় রাজপুত্রেরও মন ভুলেছিল, সেখানে এসে মন মুখর ও বক্ষ স্পন্দিত হয়ে উঠল।

রথেনবুর্গের প্রাচীন প্রাচীরবেষ্টিত শহরেও মনে হ'ল বর্ত্তমান জার্ম্মানী থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। এদেশে এক শতাব্দী আগেও মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। প্রুশিয়ার রাজা ও অন্যান্য রাজারা প্রতিবেশীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তার রাজত্ব গ্রাস করতে চেষ্টা করতেন। এই শহরেও সেই রকম অত্যাচারের বহু চিহ্ন ছড়ান আছে। প্রস্তর-দুর্গ, পরিখা, অন্ধকার ভূগর্ভের কারাগার, বিপদ্-সঙ্কেতের ঘণ্টা, বীণাবাদিনী রাজকুমারীর বীণাটি—সব মিলিয়ে মধ্যযুগের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন দুর্গতলের উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়ছিল তখন কোন যুব-সমিতির কুচকাওয়াজের শব্দ এখানকার সান্ধ্য শান্তি ভঙ্গ করল না।

এমনি আর একটি শান্তির আশ্রয় পাওয়া গেল ফ্রাঙ্কফোর্টে গোটে-ভবনে। ছায়াময় স্নিগ্ধ একটি সঙ্কীর্ণ গলি। আশেপাশে জার্ম্মানীর বিখ্যাত সসেজের দোকান। পুরাতন আবহাওয়া সুন্দর ভাবে বজায় রয়েছে। মনে মনে বুঝলাম সাহিত্যগুরুর গৃহের নিকটে কোন নবীনতার ঔদ্ধত্য শোভা পাবে না।

ব্যাভেরিয়ার একটি পার্ব্বত্যগ্রামে একটি উৎসব-রজনী।

বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নরনারী এসেছে সেই উৎসবে যোগ দিতে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের বৈচিত্র্যময় পোষাকে সজ্জিতা হাস্যমুখী তরুণীরা পরিচিত ও অপরিচিত সকলেরই বিয়ারের গ্লাসের সঙ্গে নিজেদের গ্লাস স্পর্শ করিয়ে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করছে। সকলেরই পাত্রে সসেজ ও লাল বাঁধাকপির পাতা সিদ্ধ। এই সরল পার্ব্বত্য লোকদের মধ্যে আনন্দ খুব নিবিড় হয়ে উঠল। ব্যাণ্ড বাজছে, সকলে মিলে সমস্বরে 'কমিউনিটি' পল্লীসঙ্গীত করছে; মাঝে মাঝে উঠে হাত ধরাধরি করে নাচছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সকলেরই "পরাণ হল অরুণ-বরণী", এমন সময়ে সেই উৎসবের ইন্দ্রজাল ভঙ্গ করে মূর্ত্তিমান উপদ্রবের বেশে এক দল ব্রাউন-শার্ট যুবক প্রবেশ করল। তাদের দলের পোষাক এই উৎসবের মধ্যে নিয়ে আসতে একটুও দ্বিধাবোধ করল না। সামরিক 'টপবুটে'র রূঢ় শব্দে একটি মধুর স্বপ্ন যেন নিপীড়িত হয়ে মিলিয়ে গেল। তরুণীরা কিন্তু সাগ্রহে এদের আমন্ত্রণ করলেন। বুঝলাম যে বাদামী দলই এ-যুগের একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—বর্ণশ্রেষ্ঠ ও বরমাল্যপ্রাপ্ত বীর।

উজ্জ্বল তারায় ভরা নীল আকাশের তলায় গ্রাম্য পার্ব্বত্য পথে ফিরে আসতে আসতে মনে হ'ল—কোন্ জার্ম্মানী মানুষের মনে শাশ্বত আসন পাবে। সহস্র রাইন-উপকথার স্মৃতি-বিজড়িত, বিটোফেন-হ্বাগনারের সুরঝঙ্কৃত, গ্যেটে-শীলারের জার্ম্মানী, না ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক ও হিটলারের জার্ম্মানী?

জ্বলে বহ্নিশিখা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্বেল তরঙ্গমালা একদিন বহিত হিয়ায়
আজি তার শুষ্ক স্রোত, জাগি আছে দীর্ঘ বালুচর,
আনন্দ প্রবাহহীন আপনাতে আপনি লুকায়,
প্রচণ্ড অনলতাপে দগ্ধ তার বুকের পঞ্জর।

মেঘময়ী চন্দ্রলেখা আকাশের প্রান্তে পড়ে লুটি
বালুকার স্বপ্ন হ'তে জাগে বুঝি অসংখ্য কঙ্কাল,
তাহারা আসিতে চায়, তাহারা হাসিতে চায় উঠি
মরুভূ বহিতে চায় তরঙ্গিণী হইয়া উত্তাল।

কাহারে সে দোষ দিবে? এ যে তার অদৃষ্টলিখন,
কি যে চায়, জানে না সে, চোখে জাগে আশা-মরীচিকা,
হৃদয়-দিগন্তে তার উষা-সন্ধ্যা রাঙায় গগন,—
সুদূরের মেঘমায়া! বুকে তার জ্বলে বহ্নিশিখা।

দূরে কত হাসে ঢেউ, কত নদী মিশেছে সাগরে,
বাতাসের কলগানে জলস্রোত হয়েছে মুখর,
আশার শ্মশানে হেথা তৃষাদীর্ণ ধূসর প্রান্তরে
দহিছে অন্তরতল, শব্দহীন বাহির নিথর।

পাঁকের ফুল

শ্রীজীবনময় রায়

সেদিন চায়ের আসর তেমন করিয়া জমিতেছিল না। বৃষ্টির আর যেন বিরাম নাই। প্রধান আড্ডাধারী সমর-দা আড় হইয়া পড়িয়া একখানা দৈনিক খবরের কাগজ লইয়া বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলেন। হেবো না আসিলে তাঁহার খোঁয়াড়ী ভাঙ্গে না। পতিতপাবন একটার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া ঘরটাকে দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। বসাক বলিল, "বাবা, খাবে ত একেবারে গাঁজা খেলেই পার? তার তবু নিজস্ব একটা ক্যারেক্‌টার আছে।"

পতিতপাবন সিগারেট খায় না। বলিল, "দেশের দুটো গরীব লোক এর থেকে অন্নবস্ত্রের অভাব মোচন করে, তা বুঝি সহ্য হয় না? এই বিড়ির কল্যাণে কত চোর-ছ্যাচড়ের হাত থেকে আজ বেঁচেছ তার খেয়াল আছে? এরা যদি বিড়ি না পাকাত, ত, এরাই তোমার পকেট মারত অভাবে প'ড়ে। তখন বদমায়েস ব'লে তোমরাই আবার এদের জেলে পুরতে।" বলিয়া গরীবের কল্যাণার্থই বোধ করি ঘন ঘন বিড়িতে টান দিতে লাগিল।

বসাক ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল, "বিষ, বিষ, একেবারে সেঁকো। পকেট মারলে তবু দুটো পয়সার উপর দিয়ে গেল। এ একেবারে প্রাণে মারা। ফাঁসি দেওয়া উচিত সব বিড়িওয়ালাদের ধরে, আর তাদের সঙ্গে তোমাদেরও—যারা বিড়িখোর। অধঃপাতে দিলে জাতটাকে। স্বাস্থ্য-নাশ, অর্থনাশ,—প্রাণনাশ..."

"দাঁড়াও, উত্তেজিত হয়ো না। কাগজের ধোঁয়া থ্রোটের পক্ষে সর্ব্বনাশ। এত থাইসিস্ কেন বেড়ে গেছে জান? শুদ্ধ কাগজের ধোঁয়ায়—সিগারেট। সর্ব্বনাশ করলে এই সিগারেট, দেশের লোককে ডি-ন্যাশন্যালাইজড্ ক'রে তুললে। বিড়িতে স্বদেশীর অগ্নিদীক্ষা। বিড়িতে কমিউনিজম, বিড়িতে হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি। আবদুল্লার গান্ধীমার্কা বিড়ি দেখেছ?—জাতীয় কংগ্রেসের চেয়েও দেশকে তা একতা-সূত্রে বেঁধেছে। এক দিকে গান্ধীমার্কা ধোঁয়া মোছলমানে টানছে আবার আবদুল্লার ধোঁয়া হিন্দুতে টানছে। জাতীয় পতাকায় চরকার চেয়ে বিড়ির দাবী অনেক বেশী।"...

"থাক্ থাক্, বিড়ি খেতে দেখলেই মনে হয় লোকটা কুচক্রী, ধূর্ত্ত, বস্তির বাসিন্দা। স্লাম্-কোয়াটার্সের ছাপ্ মারা বিড়িখোরদের মুখে।..."

"সাবধান; তোমার বুর্জ্জোয়া নাকটা বাঁচিয়ে কথা বল। ঐ বস্তির পঙ্ক চিরে আজ লাল শালুকটি হয়ে ফুটেছ। এখনও ওসব চাল মারা ছাড়। নইলে, হেঁ হেঁ রবিঠাকুরের কবিতা পড়েছ?

> সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
> অপমানে হ'তে হবে পঙ্ক মাঝে সবার সমান।"

সমর-দা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমরা মারামারি ক'রে মরছ। কিন্তু সত্যি বল ত পতিত, ঐ এক নামটা ছাড়া তোমার ঐ বস্তির সঙ্গে কোন পরিচয় আছে কি না? ঘরে বসে ইংরেজী বইয়ের দু-ছত্র প'ড়ে তোমরা ওদের যেমন ক'রে কল্পনা কর তার সঙ্গে বস্তির বাস্তব জীবনের কিছুই মিল নেই জেনো। তোমাদের এথিকস্, ইকনমিক্স্, সোশ্যাল সায়ান্স, সিভিকস্-এর ওরা কিছুমাত্র ধার ধারে না। সম্পূর্ণ একটা আলাদা জগৎই ওদের। দুটো বিড়ি কিনে যাদের কৃতার্থ করছ, তারাও গরীব, কিন্তু এদের খুব কম লোকই বস্তির বাসিন্দা। ওদের অবস্থান, ওদের সমাজ, ওদের জীবন, সে একটা অভিনব জগৎ। এই ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মডার্ণ কমফর্টস্-এর প্রদর্শনী কলকাতার শহরের মনুষ্যলোক থেকে মানবদেহ ধারণ ক'রে ওরা একেবারে স্বতন্ত্র জীব। এক ড্রেনের ধেড়ে ইঁদুরদের জীবন-ব্যাপারের সঙ্গে মেলে ওদের কতকটা। তবু ইঁদুরেরাও বুঝি এত দুঃস্থ নয়। কারণ, উদ্বৃত্ত পর্য্যাপ্তের

পরিত্যক্তে তাদের অধিকার সাব্যস্ত। ওদের বস্তি দেখলেই আমার কি মনে হয় জান? মনে হয় একটা সুন্দর দেহে এরা সব গলিত কুষ্ঠের ক্ষত। বুর্জোয়াদের পাপেই এদের অস্তিত্ব, বুর্জোয়া-ধ্বংসেই এদের মুক্তি।

"একটা দুটো নয়, কলকাতায় এমন চার হাজার কুৎসিত ঘা দগদগ করছে, এক দিন এরোপ্লেনে উঠে নজর ক'রে দেখো। নিজেদের মৃত্যুবীজ নিজেদের দেহে কেমন নিশ্চিন্ত চিত্তে আমরা পালন করছি, দেখে আঁৎকে উঠবে। নজর যদি পড়ত তবে এই সব বস্তির জমিদারেরা খাজনা নিয়ে নিশ্চিন্তে এই নরক জিইয়ে রাখত না। কর্পোরেশনের হাত অতি সামান্যই এদের ভাগ্যের উপর। ভাবতেই পারি না, একটা সভ্যতম দেশের শাসনাধীনে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর সমৃদ্ধির বুকে এটা সম্ভবপর হয় কেমন ক'রে! সামান্য একটা ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এত ব্যবস্থা, আর এই সর্ব্বব্যাধি-পরিবেশনের নরক, নাগরিক কুষ্ঠের বিরুদ্ধে কোন অভিযানই হয় না!

"আইন ক'রে এদের প্রভুদের বাধ্য করা উচিত, সমস্ত বস্তির স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, মনুষ্যজনোচিত ব্যবস্থা বিধানে।"

বলিয়া সমর-দা যেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

লোকটা অনেক ঘাটের জল খাইয়া এখন বেশ ফলাও একটা ব্যবসাতে দুপয়সা করিয়া লইয়া জমিয়া বসিয়াছে।

লোকটার যেমন হাত খোলা মুখের বাঁধও তেমন আল্‌গা। পাসটাস কিছু নয় বটে, কিন্তু পড়াশুনা করিয়াছে বিস্তর আর অভিজ্ঞতাও আছে। তাই তাঁর সহিত তর্ক করিতে আমাদের ছোকরার দল বড় জুত পাইত না। এক হেবো সব তাতেই ফোড়ন দিয়া থাকে—সেও আজ অনুপস্থিত। চুপ করিয়াই রহিলাম।

বাহিরে বৃষ্টির অবিরাম ধারায় রাস্তায় ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাসের হুঙ্কার এবং বালকদের কোলাহলে পথে কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—রাস্তায় বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বেয়ারাটাকে ডাকিয়া আরও চা এবং আলুভাজার বন্দোবস্ত করিয়া আমরা একটু গুটিসুটি মারিয়া জুত করিয়া বসিলাম।

সমর-দা হঠাৎ ঝাঁকি দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়া হাঁকিলেন, 'তামাক'। এবং চিন্তাকুল মুখে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলাম, একটা কিছু গল্প আসিতেছে—দাদার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এক টুকরা।

একটু পরে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তাই ত, আজকেই হেবোটা এল না। শুনে কি বলত তা দেখ্‌তুম। ছোঁড়া আবার বস্তিসাহিত্য সৃষ্টি করছে! আরে তুই বস্তির জানিস্ কি? লেখা ত সাহিত্য-জগতের বস্তি বই আর কিছু নয়।"

আমি কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম, "কিন্তু দাদা, আধুনিক সাহিত্যগুরু কেদারেশ্বর..."

দাদা ধমকাইয়া উঠিলেন, "আরে থোও ফেলে তোমার সাহিত্যগুরু। বোতল পার করতে পারলে, আর সতীসাধ্বী 'নহ মাতা, নহ বধূ' রূপসীদের গুণগান করলেই এখন তোমাদের আধুনিক সাহিত্যের বাজার সরগরম হয়। বস্তি দেখেছে কেউ চোখে?"

ভাবিলাম, ভাল হইল না, গল্পটা বুঝি ভেস্তাইয়া গেল। নিঃসাড়ে চুপ মারিয়া গেলাম। তামাক আসিলে সমর-দা কিছুক্ষণ নীরবে ফরসির সহিত বাক্যালাপে তৃপ্ত হইয়াই বোধ করি আবার মুখ খুলিলেন। বলিলেন, "ভেবেছিলাম বলব না। তোমাদের মত অর্ব্বাচীনদের কাছে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু বর্ষাটা এমন যে, নিরন্তর বর্ষণে নিষ্কর্ম্মা লোকের স্নায়ুগুলোতে যেন ঝিঁঝি ধরিয়ে দেয়। মনের উপর ভব্যতার শাসন যেন এলিয়ে পড়ে। ভুলে-যাওয়া অতীত মেঘের আড়াল থেকে খঞ্জনী বাজিয়ে বিরহের গানে আকাশ ভরে তুলতে চায়!

ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

বলিয়া দাদা আবার খানিক ক্ষণ চুপ করিলেন। বেশ বুঝিলাম যে বলিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই, অথচ নিরন্তর অবসন্ন বারিপাতের মোহমন্ত্রে তাঁহার শিথিলগ্রন্থি মনের দুয়ার বাদল-বাতাসের ঝাপটে খুলিয়া গিয়াছে। দাদা এবার সুরু করিলেন। আমরা তাঁহার সেই দীর্ঘ কাহিনীর সারাংশ মাত্র দিব। তাহা ছাড়া তাঁহার সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁহার মত করিয়া ব্যক্ত করা আমার কর্ম্ম নয়। দাদা যাহা বলিলেন তাহার আখ্যানভাগ এই :—

বাবার সহিত ঝগড়া করিয়া তখন সেকেণ্ড ইয়ারেই মেডিকেল কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়াছি। টাকার টানে বই ক'খানা বেচিয়া কিছু নগদ টাকা হাতে পাইলাম কিন্তু সে-টাকায় বেশী দিন চলিল না। টাকা বাড়াইবার রাস্তা জানি না, অথচ টাকা উড়াইবার রাস্তা যখন অভ্যস্ত তখন টাকা যে বেশী দিন টিকিবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

মেসের ঘরটা ছাড়িয়া দিলাম। কোথায় মাথা গুঁজিব জানা নাই। দিনের বেলা তেলে-ভাজা বেগুনী খাইয়া পেট ভরিয়া জল খাইতাম। বাছিয়া বাছিয়া যে-দোকানে একেবারে আঠার মত আলকাতরার মত তেল সেখান হইতে বেগুনী কিনিতাম। সে-তেল হজম করিতে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। ক্রমে বেগুনী কিনিবার পয়সাও ফুরাইয়া আসিল। কাপড়-জামা বেচিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাহার আয়ও অক্ষয় নয়। শেষে একদিন না-খাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ময়দানে এক গাছতলায় বেঞ্চে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। উঠিয়া দেখি সন্ধ্যা হইয়াছে। চৌরঙ্গীর আলোগুলা জ্বলিতেছে যেন দৈত্যপুরীর মশালের মত। মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলা ব্যথায় ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। উঠিয়া বসিতেই গা পাক দিয়া এক ঝলক বমি হইয়া গেল। বমি হইতে কতকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

সার্কুলার রোডের কাছাকাছি ধর্ম্মতলার ফুটপাথে একটা বারান্দার তলায় ক'দিন রাত কাটাইয়াছি। জায়গাটা কয়েক দিনে দুর্দ্দিনের পরিচিত বন্ধুর মত একটা আশ্রয় হইয়াছিল। কোথায় দুগ্ধফেননিভ কোমল বিছানা আর কোথায় কলিকাতার ধূলি-মলিন ফুটপাথ। কিন্তু হইলে কি হয়, অসময়ে তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া পা ছুটাইলাম। কিন্তু পা আর চলিতে চায় না। তা ছাড়া পেটের যন্ত্রণাটাও পদে পদে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোনও রকমে ওয়েলিংটনের মোড়টা পার হইলাম; কিন্তু আর চলিল না। পেটে বেমওকা একটা মোচড় খাইয়া মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলাম। একবার ক্ষীণ একটা চেতনায় যেন মনে হইল পরণের কাপড়টা নোংরা হইয়া গেল। তার পর আর জ্ঞান নাই।

যখন জ্ঞান হইল তখন অবাক হইয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিলাম। কিছু যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিসের একটা তীব্র দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করিতেছিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি একটা স্যাঁৎসেতে খোলার ঘরের এক কোণে একটা ছেঁড়া মাদুরে পড়িয়া আছি। গন্ধটা এত তীব্র যে আমি হাত দিয়া নাক ঢাকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম। সাধ্য কি! সমস্ত শরীর যেন টুকরা টুকরা হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় ঘরের ভিতর একটি মেয়ে প্রবেশ করিল। পরণে তাহার মাত্র ছিন্ন একটি ঠেঁটি। তাহাতে লজ্জা নিবারণ হয় এই অর্থে যে লজ্জাকে লজ্জিত করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। লজ্জিত হইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইলাম। মেয়েটি কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিল না। বলিল, "এই যে গো, বাবু চোখ মেলেছ। কি বাঁচনটাই বেঁচেছ।"

তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিলাম। মেয়েটি অসঙ্কোচে ধরিয়া আমাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "উঠো না, উঠো না। আবার ভীর্ম্মি যাবে। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, নয়? আনছি গো একটু পালো গরম করে।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মেয়েটির বয়স বেশী নয়, ছাব্বিশ, সাতাশ হইবে। যৌবনের ভগ্নাবশেষ এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ—সাবলীল স্বচ্ছন্দ। ভাবিতে লাগিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? এ কোথায় আসিলাম? স্বপ্ন যে নয় তাহা ঐ দুর্গন্ধই জানাইয়া দিতেছে। পচা নর্দ্দমার ময়লা-পচা দুর্গন্ধ।

পিসীমার বাড়ী যাইতে একটা বস্তির ভিতর দিয়া শর্টকাট করিতে হইত—এ গন্ধ আমার একেবারে অপরিচিত ছিল না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম; হইতে পারে। ভাঙা খোলার ঘর, এক কোণে কাঁথা মাদুর জড়ানো আর একটা নোংরা বিছানা রহিয়াছে। বাহির হইতে কাংস্য-কণ্ঠে একটা কলহের কোলাহল আকাশ ফাড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। এখনি একটা খুন হইয়া যাইবে নিশ্চয়। ভারি অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া পলায়ন করি, তাহারও ক্ষমতা নাই। তাই নিরুপায় হইয়া কান পাতিয়া পড়িয়া রহিলাম।

হঠাৎ শুনিলাম, কে নারীকণ্ঠে ডাকিতেছে, "ও সদু, বলি, আছিস্ না?"

"কে, পরাণের মা? ই-দিকে আয় ভাই। একটু ব্যস্ত আছি।"

শুনিলাম পরাণের মা বলিতেছে, "নে বাপু, পাতি নেবুর কি সামান্তি দর? যেন নারাঙ্গী বিকুচ্ছেন। দু-পয়সায় তিনটের বেশী দিলে না। তা নেবু খুব সরেশ, রসে টুপ্‌টুপু। আর এই একটা কমলা নেবু। তোর ভাই যত অনাছিষ্টি। আবার কমলা নেবু কিনে খাওয়াতে সাধ গিয়েছে। কত রঙ্গই দেখালি ভবি, অম্বলে দিলি আদা।"

"তা একটা ভদ্দর নোকের ছেলে, আথান্তর হয়ে এসে পড়েছে, তা কি করব। তা তোর এত হিংসে হয় ত নিয়ে যা না।" বুঝিলাম এই হতভাগার কথাই হইতেছে। হা কপাল! কোথায় আসিয়া আমার এ-কদর বাড়িল যে আমাকে লইয়াই এই রস-বণ্টনের বচসা।

পরাণের মা বলিল, "আপনি শুতে ঠাঁই নেই, তার শঙ্করাকে ডাক। মিনসে চ্যালা কাঠ পেটা ক'রে আমায় মেরেই ফেলবে তা হ'লে। অমনিতেই রক্ষে নেই। হ্যাঁ রা, পঞ্চা কোথায় গেল?"

"গেছে কোথায় মরতে। কাল থেকে আর ত দেখা নেই। কাল ঐ বাবুকে নিয়ে না-হক যা-না তাই বলে মারতে এল। বলি, এক কড়ার মুরোদ নেই আবার আমার উপর হম্বিতম্বি। আমার ঘরবাড়ী আমি যা খুশী করব। তা তোর বাবার কি?"

"ভাল করিস নি সদু। সেই তোকে গাঁ থেকে নে এল। গয়না-টাকা কেড়ে নে সরে পড়তে পারত ত? এদ্দিনকার আচ্ছয়।"

"তা ভাই আমি কি তাকে তাড়িয়ে দিইছি? মিছি মিছি রাগ করলে আমি কি করব। যাবে কোথায়? পেট জ্বলবে না? তুই ভাই একটু উনুন কাঁদায় বসবি? আমি চট করে হালদার-বাড়ীর মোড়টা থেকে দু-ঘড়া জল নে আসি। নইলে আবার সেই বিকেলের আগে জল পাব না।"

ঘরে আসিয়া কোণ হইতে মাটির কলসীটা কাঁখে লইয়া বলিল, "জলটুকু এনেই পান্তো দোব। একটু কমলা নেবু খাবে?" বলিয়া কলসী নামাইয়া বাহিরে গিয়া একটা নেবু আনিয়া দিল।

সত্য কথা বলিব। এই দুর্গন্ধময় ঘরে এই কুৎসিত পরিবেষ্টনের মধ্যেও এই স্নেহটুকুতে আমার চক্ষে জল আসিল।

বৈকালের দিকে ঘুমাইয়া উঠিয়া শরীরটা অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলাম। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে দুর্গন্ধটাও নাকে আর তেমন তীব্র ঠেকিতেছে না। ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া যেন কতকটা সহিয়া গিয়াছে।

সদু ওরফে সৌদামিনী এক বাটি চিঁড়ার সরবৎ করিয়া আনিয়াছিল। এমন অমৃত জীবনে খাই নাই। খাইতে দিয়া সৌদামিনী মাটিতে বসিয়া গল্প সুরু করিল। বলিল, "বাবু, আপনার যুগ্যি যত্ন-আত্তি করতে পারছি না। কিছু অপরাধ নিও না।"

তাহারই মুখে কথায় কথায় ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম, আমাকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়া তাহার কেমন মায়া হইয়াছিল। একাকী কিছু না করিতে পারিয়া তাহার সঙ্গী বা স্বামী বা মানুষ পঞ্চাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আমাকে বাড়ী লইয়া আসে। পঞ্চা প্রথমটা ভাবিয়াছিল যে সদু বুঝি একটা দাঁও পাইয়াছে। কিন্তু পরে যখন জানিল যে আমার পকেটে কানা কড়িও নাই তখন সে রাগিয়া আগুন হইয়া গেল। এবং আমাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিবার জন্য জেদাজেদি করিতে লাগিল। সব চেয়ে গোলমাল হইল আমার হাতের আংটিটা লইয়া। এত অভাবের মধ্যেও মায়ের দেওয়া আংটিটা বেচি নাই। সেই আংটিটা ছিনাইয়া লইবার জন্য পঞ্চা ছোঁকছোঁক করিয়া বেড়াইতেছিল। এই লইয়াই সৌদামিনীর সহিত তাহার কলহ ও বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা এই। তাহারা সদ্গোপ। পিতার মৃত্যুর পর গাঁয়ে বিধবা সৌদামিনীর কোন রক্ষক ছিল না। যে-বাবুদের বাড়ী তার বাপ মান্দের খাটিত, তাহারই এক ভ্রাতার প্ররোচনায় পড়িয়া তার নিজস্ব টাকাকড়ি গহনাপত্র লইয়া সে ভাসিয়াছিল। সঙ্গে ছিল পঞ্চা, তাহাদেরই গাঁয়ের এক মুচির ছেলে। বাবুই তাহাকে এই কুটীরটি কিনিয়া দিয়া পঞ্চাকে পাহারায় রাখিয়াছিল।

বছর দু-এক বাবু রীতিমত যাতায়াত করিত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে উধাও হইল। শেষে ক্রমে ক্রমে অন্নের-

দায়ে তাহাকে ঝি-গিরিতে নামিতে হইয়াছে। প্রথম কয়েক মাস তাহার পঞ্চাকে লইয়া একটা সমস্যাই হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে পঞ্চাও তাহার সহিয়া গেল। দেখিলাম ঐ দুর্গন্ধটার মত আমাদের স্নায়ু সকল ব্যাপারকেই ক্রমে সহনযোগ্য করিয়া লয়। প্রভেদজিনিষটা আমাদের অভ্যাসের সৃষ্টি।

পঞ্চা অবশ্য কোন রোজগার করিত না। কিন্তু ঘর-দুয়ার সামলান, রান্না-বাড়া, বাজার-হাট করিত। জল তুলিত, চাকরের মত খাটিত। শুধু রাতের বেলায় বাবু হইয়া বসিত। এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহাদের কোন বিকার ছিল না। পঞ্চাও মানিয়া লইয়াছিল; সৌদামিনীও। এমন সময় আমাকে লইয়া এই কাণ্ড।

এতগুলি বীভৎস ব্যাপার শুনিতে আমার গা ঘিন ঘিন করিতেছিল। সৌদামিনীর কিন্তু বলিবার মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা গ্লানি কিছুই নাই। বলিল, "তা মিথ্যে বলব না বাবু। পঞ্চা বেইমানি করে নি কোন দিন। তা হ'লে কবে ঝ্যাটা মেরে বিদায় করে দিতুম।"

কয়েক দিন সৌদামিনীর বাড়ীতে বাস করিয়াছিলাম। তোমরা শুনিয়া মনে মনে আমার গায়ে থুথু দিবে নিশ্চয়, নরকবাসের গ্লানি আমার মনে হয় নাই। না না, ঠিক বলি নাই। কয়েক দিন থাকিয়া মনে হয় আমার নরকবাসের গ্লানি সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু বাহিরে সে কি নরক। মানুষের অধিকারে এমন সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া আর এক দল মানুষ কেমন করিয়া যে বিলাস সম্ভোগ করিতে পারে—চোখ চাহিয়া দেখি না তাই; নহিলে নিজেদের পাপে নিজেরা বিবর্ণ হইয়া যাইতাম।

যে দিন প্রথম পাইখানায় যাইতে হইল সেদিন কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। সমস্ত বস্তিটায় পাইখানা মাত্র দুটি। স্নানের জায়গাও তাই। তাহার কোন আব্রু নাই। নোংরামির নরক থৈ থৈ করিতেছে। মানুষ যে পশু অপেক্ষা কিছুমাত্র বিভিন্ন, ইহাদের মালিকদের বোধ হয় তাহার ধারণাই নাই, অথচ পশুদের নিকট হইতে কেহ খাজনা আদায় করে না। মরিয়া যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে তবে ইহারা অন্তত পশুও হইতে চাহিবে।

ঘরের বাহির হইলেই একটা কাটা খেজুর গাছের সাঁকো টলিতে টলিতে পার হইতে হয়। পা ফসকাইলেই একেবারে এক কোমর পাঁকে। গত বৎসর নাকি ইহারই মধ্যে দুইটি শিশু জড়াজড়ি করিয়া ডুবিয়া চিরদিনের পশুজীবন হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

জ্ঞান হইবার পর তৃতীয় দিন সৌদামিনী আমায় স্নান করিতে বলিল। বলিল, "দাঁড়াও বাবু, টাটকা জল এনে দি।"

জল আনিতে গিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরিল। বলিলাম, "এত দেরী যে? বাড়ীতে বুঝি কল নেই?"

বলিল, "আ কপাল! কল কি পাড়ায়ই আছে গা? ড্রেন নেই তার কল দেবে কেন! সেই বড় রাস্তায় কল। তা কি জল নিতে দেয় আবাগীর বিটিরা—সব গে মরেছে এই সময়ে একত্তরে।"

ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ! কলিকাতা শহরে বসিয়া কলের জলের এই দুর্ভিক্ষ! ভাবিতে ভাবিতে স্নান করিতে গেলাম। কোথা হইতে একটা দামী ব্যবহার-করা সাবান জুটাইয়া আনিয়াছিল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সাবান মাখ নাকি তোমরা?"

নিঃসঙ্কোচে বলিল, "না বাবু, ও-সাবান পাব কোথায়, বাবুদের চানের ঘর থেকে নিয়ে এলুম গে। ওদের কত আছে। তোমার দেহটা ক'দিনে পচে রয়েছে। তা বলি এটুকু নিয়ে যাই—একটুকু আরাম পাবে এখন।"

নীতির বক্তৃতা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। সেই সাবান দিয়াই গাত্র মার্জ্জনা করিলাম। আরাম অল্প লাগিল না।

এমন সময় দাদার গল্পের মাথায় বাজ পড়ার মত শুনিলাম "বল হরি হরি বোল" বলিয়া একপাল লোক বেয়াড়া গলায় হাঁক দিয়া উঠিল। গল্পস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। খানিক উন্মনা হইয়া দাদা চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর ফিরিয়া বলিলেন, "গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিল; আর একটা ঘটনা বলিলেই যবনিকা পড়ে।"

আমরা উদ্গ্রীব হইয়া বসিলাম। দাদা বলিতে লাগিলেন—প্রথম দিন ঘরের বাহির হইয়াই বুঝিলাম, ব্যাধি আমার একলার হয় নাই। পাড়ায় ও-ব্যাধি বিশেষ জোর করিয়াছে। দু-একটা জোর ভেদ ও বমি তারপর ঘেঁটি ভাঙিয়া পড়া। কিন্তু মৃত্যুর সহিত বুঝিয়া বোধ হয় ইহারা পাথর হইয়া গিয়া থাকিবে। ইহাদের মুখে দুঃখ বা ভীতির সেরূপ সকরুণ

ছাপ নাই। মৃতের কাপড়চোপড় লইয়া বড় রাস্তার কলে কাচিয়া আনিতেছে, গল্পও চলিতেছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় সৌদামিনী ফিরিয়া আসিল। বলিল, "গা কেমন করছে বাবু, সময় ভাল না ; তুমি বাড়ী যাও। আবার এস একদিন, যদি মনে পড়ে।" বলিয়া মাদুর পাতিয়া শুইল। আমার ঘরেই সে শুইত। ঐ এক বই দ্বিতীয় ঘর ছিল না। রাত্রের মধ্যেই বুঝিলাম, রোগ কঠিন। অনভ্যস্ত হাতে যথাসাধ্য সেবা করিতেছিলাম।

শেষরাত্রে আমায় বলিল, "গেলে না বাবু? আর জন্মে তুমি আমার বাপ ছিলে।

মনে হইল বলি, "তুমিই আমার মা ছিলে।" বলিতে মুখ ফুটিল না। ফুটিলেও ওর মত সহজ করিয়া বলিতে পারিতাম না নিশ্চয়।

একটু থামিয়া বলিল, "কোথায় গেল পোড়ারমুখোটা এই সময়। পরাণের মারে সকালে একটু ডেকে দিও দিনি বাবু।"

পরাণের মাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। কি কথা হইল জানি না।

মায়ের দেওয়া হাতের আংটিটা বেচিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইলাম। বুকের মধ্যে যেন একটু তৃপ্তির স্পর্শ পাইলাম। মনে হইল মায়ের দেওয়া আংটী সার্থক হইল। অনেক করিয়াও কিছু হইল না। সন্ধ্যাবেলায় শ্বাস উঠিল।

বাড়ীতেও পূর্ব্বে দু-একটা মৃত্যু দেখিয়াছি। বুকের মধ্যে এমন মোচড় কোন দিন খাই নাই। কি করিব দিশা না পাইয়া বসিয়া বসিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল মুখে দিতেছিলাম—অসহায়ের সান্ত্বনা। এমন সময় একটা লোক আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিছনে পরাণের মা। বুঝিলাম, এই পঞ্চা। নিতান্ত রোগা, নিরীহ, বালকের মত দেখিতে এবং প্রায় কুৎসিত বলা যায়। পরাণের মা কোথা হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। সে প্রায় উপুড় হইয়া সৌদামিনীর মুখের উপর পড়িল, "ওরে আমারে ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব কেমন করে? আমি মুরুখ্খু মানুষ; আমার অপরাধ নিও না, ও সদু দিদি।"

সৌদামিনী যেন মন্ত্রে চোখ খুলিল। পরম স্নেহে পঞ্চার মাথাটা টানিয়া নিয়া বলিল, "এমন করে যাবার সময় কাঁদিস নে পঞ্চা। তোরই ত রইল সব। আবার ঘর-সংসার করে মানুষ হ।"

পঞ্চা ডুকরিয়া উঠিল, "ওরে, না, না, না।" বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল।

আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। পরাণের মাকে ডাকিয়া লইয়া পকেট হইতে আংটির টাকাপয়সা যা বাকী ছিল দিয়া বলিলাম, "ওর কাজ যেন ভাল করে হয় পরাণের মা"। বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

দাদা চুপ করিলেন।

বৃষ্টি কখন থামিয়া রাস্তায় জল নামিয়া গিয়াছে। ট্রাম আবার চলিতে সুরু করিয়াছে। রাস্তার কোলাহল শ্রান্ত। ছপ ছপ খড় খড় করিতে করিতে ট্রাম-রাস্তার পাথরের উপর দিয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়ী চলিয়া গেল।

আমরা নিঃশব্দ হইয়া বসিয়া এতক্ষণ গল্পের স্বপ্নচিত্র-জগতে ডুবিয়া ছিলাম। এই স্নায়ুসংপীড়ক কঠিন শব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন জাগিয়া উঠিলাম।

পতিসরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

এবার কবির সঙ্গে তাঁর জমিদারী পতিসরে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের জমিদার-রূপ দেখবার ইচ্ছে অনেক দিন ধ'রেই প্রবল ছিল।

গত ২৬।৭।৩৭ তারিখে রাত্রি এগারটায় পার্শেল-ট্রেনে আমরা যাত্রা করেছিলাম। কবিপুত্রের মাতুল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় এবং আমি, উঠলাম একটি ইণ্টার ক্লাসে। গাড়ীতে ভিড় ছিল না মোটেই। যাঁরা ছিলেন, তন্মধ্যে একটি পরিবারের চার-পাঁচ জন ছিলেন। এঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ে জানা গেল, এঁদের পরিবারের দুজন ডেটিনু হয়ে বন্দীশালায় আছেন। বন্দী-দুজনের বিধবা জননী, একটি বন্দীর স্ত্রী, বন্দীর একটি ভাই এবং তাঁর কন্যাও ছিলেন। ব্যথাতুরা জননী সাশ্রুনয়নে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কাগজে দেখছি, বন্দীদের মুক্তি দেবে, এ-খবর সত্যি?" কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। তাঁর চোখেমুখে দারুণ বেদনা ফুটে উঠেছিল, সে-ব্যথা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করলে। তাঁর পাশে যে-মেয়েটি বসেছিল সে তার ঠাকুরমার কাছে আব্দার ক'রে কি-একটা উপহারের দাবী জানাতেই তার ঠাকুরমা (রাজবন্দীর জননী) নাতনীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "কত টাকা ব্যয় ক'রে তোমার জন্য একটা বর উপহারের জোগাড় করছি, তাতেও তোমার মন উঠছে না, এর চেয়ে বেশি আর কোন্ উপহার তোমায় দেব। নাতনী বললে, "সে দিচ্ছ তোমাদের গরজে, তাই বলে আমি যা চাচ্ছি সেটা ফাঁকি দিতে পারবে না।" এঁদের পরস্পরের বাক্যালাপের মধ্যে এমন একটি ঘরোয়া রকমের সারল্য ছিল যে আমাদের পক্ষেও তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া রকমে বাক্যালাপ করতে একটুও সঙ্কোচ হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা টের পেলেন আমাদের মধ্যে একজন রবীন্দ্র-নাথের সহচর, এবং আর একজন কবির শ্যালক। অমনি তাঁরা প্রস্তাব করলেন, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেন থামলেই, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কামরায় প্রবেশ ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রে আসবেন। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে ঐ পনর-ষোল বছরের মেয়েটি ব'লে উঠল, "আমি রবিবাবুর অনেক লেখা পড়েছি। সম্প্রতি তাঁর "জাপানে পারস্যে" পড়েছি। আমরা ধন্য, এমন লোককেও দেখতে পেয়েছি। আজ অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে।" পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাঁরা সকলেই কবির কামরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তাঁরা আবার ফিরে এলেন নিজেদের কামরায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, যে-ট্রেনে আমরা যাচ্ছিলাম, সেটা পার্শেল-ট্রেন। কাজেই তার গতি ছিল অন্য প্যাসেঞ্জার-ট্রেনের চেয়ে মন্থর। তার উপর প্রায় সব ষ্টেশনেই থামতে থামতে যায়। এর উপর আবার আর এক উপসর্গ জুটল। সংলগ্ন তৃতীয় শ্রেণীতে একদল হিন্দুস্থানী মুসাফির উঠলেন, সঙ্গে গ্রামোফোন। গাড়ীতে উঠেই তাঁরা ঐ যন্ত্রে রেকর্ড জুড়ে দিলেন, তার পর আর কি, গায়িকার কণ্ঠনিঃসৃত বেদম ঝঙ্কারপূর্ণ রেকর্ড-সঙ্গীত গাড়ীর সঙ্গে চলল পাল্লা দিয়ে। ফলে প্রত্যেক ষ্টেশনেই ঐ কামরার কাছে কিছু কিছু জন-সমাগম হ'তে লাগল। কাজেই কথা কয়ে আর জেগেই, রাত্রির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবশেষে এসে পৌছনো গেল প্রভাত-আলোর দেশে। আত্রাই ঘাটে আমাদের পৌছতে হবে। সেখানে পৌছতে বেলা প্রায় দশটা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের জন্য নদীতে ষ্টেশনের নীচেই বোট বাঁধা। কবি সেই বোটে গিয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে তীর হ'তে ধীরে চলল বোট এবং তৎসহ গোটাকয়েক পানসী নৌকো পতিসর অভিমুখে।

এবার এসে পৌছনো গেল একেবারে পাড়াগাঁয়ে নদীর দেশে, খাঁটি বাংলা-মুল্লুকের একেবারে অন্তরে। মাঝখানে চলেছে নদী, নদীর বুকে ভাসছে নৌকো আর অনেক

কচুরি পানা,—আর নদীর দুই ধারে পাটের ক্ষেত, বাঁশের জঙ্গল, আরো কত রকম গাছের বন, আর তারই মধ্যে গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে আলো-আঁধারের কোল জুড়ে পল্লীর খ'ড়ো কুটীর। দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। যারা কলসীকক্ষে নদীতে জল নিতে এসেছে, কিম্বা যারা ঘোমটা টেনে, ঘাটে ব'সে বাসন মাজছে কিম্বা কাপড় কাচছে—তাদের সকলের অঙ্গে বস্ত্রে দারিদ্র্য। নদীতীর-বাসীদের চেহারায় নেই আনন্দ, আছে কোন রকমে দিন কাটাবার ব্যথার একটা মলিন ছায়া। শহর থেকে দূরে গিয়ে একটু চোখ বদলাবার মত নূতনত্বের আস্বাদ অবশ্য পেয়েছিলাম।

নদীতীরের কুটীর থেকে গ্রামের পথ এঁকেবেঁকে বেরিয়ে চলেছে নদীর মতই, এর বাগানের পাশ দিয়ে ওর উঠোনের ভিতর দিয়ে, তার ক্ষেতের উপর দিয়ে, তার পর কোথাও সে-পথ গেছে চ'লে জনতার মধ্যে গঞ্জে-বাজারে, কোথাও সে-পথ নির্জ্জনতার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এসে নেমেছে সোপান বেয়ে নদীর জলে। এই পথে ধীরমন্থর গতিতে কলসীকাঁখে ঘর থেকে চলেছে বউ নদীর ঘাটে, সেখানে এটা-ওটা করবার ছলে, যত ক্ষণ পারে দেরি করে। তার পর চলে ফিরে বউ কলসী ভ'রে আবার নিজের কুটীরে। নদীর পাড়ে, গাছের উঁচু শিকড়ের উপর ব'সে, কোথাও হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় তুলে গ্রামের ছেলেবুড়ো ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে। কোথাও আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মাথায় ডালা বোঝাই তরি-তরকারি নিয়ে গঞ্জের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে চাষী। কোথাও নদীর জলে কূল ঘেঁসে, অশ্রান্ত ভাবে খালি গায়ে রোদে বর্ষায়, চাষী নতুন পাট ধুয়ে তুলছে ডাঙায়। এমনই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছনো গেল পতিসরের ঘাটে। তখন রাত্রি অনুমান ১১টা। মেঘলা রাত্রি। জমিদার কাছারিতে এলে দস্তুর আছে, বরকন্দাজেরা কয়েক দফা বন্দুকের আওয়াজ করে। এক্ষেত্রে সেরূপ কোন আওয়াজ বা অত্যধিক আড়ম্বর করা না হয়—সে-বিষয়ে পূর্ব্ব হতেই রবীন্দ্রনাথ ষ্টেটে নিষেধ-আজ্ঞা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রেনে নৌকায় এক রাত্রি এক দিন বন্দী থাকার পর যখন সুযোগ পেলাম আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রেই ডাঙায় উঠে পড়লাম।

তার পর দিন বুধবার। বুধবারে ঠাকুর-ষ্টেটের পুণ্যাহ। সেই জন্য কাছারিতে আজ বেশ ধুমধামের আয়োজন চলেছে। সকাল বেলায় আকাশও ঐ উৎসবে যোগ দিতে কৃপণতা করল না। সেদিনকার প্রভাত বেশ উজ্জ্বলই ছিল। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশে আবার মেঘ দেখা দিল। বেলা বারোটার পূর্ব্বেই কাছারিতে বিস্তর প্রজার ভিড়, শুধু পুণ্যাহের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যই বেশী। এই সময় এক দল প্রবীণ মুসলমান প্রজা এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালে যে তাঁকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও পুণ্যাহের সভায় উপস্থিত হ'তেই হবে। বিশেষ কায়িক অসুবিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রাজী হ'লেন। কিন্তু তখনি পুণ্যাহ-ক্ষেত্রে না-গিয়ে, স্থানীয় বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করবার পরে পুণ্যাহ-স্থলে যাবার প্রস্তাব হ'ল। রবীন্দ্রনাথের পাল্‌কী চলল গেঁয়ো পথের সরু লাইন ধ'রে, এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর আনাচ-কানাচ দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের দিকে, আর পাল্‌কীর সামনে পিছনে চলল লোকের ভিড়। পাল্‌কী এসে থামল "রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে"র উঠোনে। সেখানকার একটি সভামণ্ডপের নীচে একটি ইজি-চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসলেন। প্রধান-শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কবিকে দেওয়ার পর কবি সে-স্থান থেকে বিদায় নেবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই এক দল বালক-ছাত্র তাঁকে প্রণাম ক'রে, তাঁর আগমন উপলক্ষ্য ক'রে সাত দিনের ছুটি চাইলে। রবীন্দ্রনাথ ছুটি মঞ্জুর ক'রে দিলেন, এই মঞ্জুরীতে শিক্ষকদেরও বদনমণ্ডলে আনন্দ ফুটে উঠেছিল। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের মন্তব্য-বহিতে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :—

"রথীন্দ্রনাথের নামচিহ্নিত কালিগ্রামের এই বিদ্যালয়ের আমি উন্নতি কামনা করি। এখানে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধ যেন অকৃত্রিম স্নেহের এবং ধৈর্য্যের দ্বারা সত্য এবং মধুর হয় এই আমার উপদেশ। শিক্ষাদান উপলক্ষ্যে ছাত্রদিগকে শাসন এবং পীড়নে অপমানিত করা অক্ষম এবং কাপুরুষের কর্ম্ম, একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত;

এরূপ শিক্ষাদান-প্রণালী শিক্ষকদের পক্ষে আত্মসম্মানের হানিজনক। সাধারণত আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক বালকগণ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষকদের নির্মম শাসনের উপলক্ষ্য হয়ে থাকে, একথা আমার জানা আছে, সেই কারণেই সতর্ক করে দিলাম। ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৪।"

বিদ্যালয় হ'তে কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাহস্থলে বসেই বোটে ফিরে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন কয়েকজন বিশিষ্ট প্রধান মুসলমান প্রজা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা হতে যা বুঝলাম, সেটা এ-ক্ষেত্রে বিশেষ করে বলা কর্তব্য মনে করি।

সাম্প্রদায়িক এই দুর্দ্দিনে, পতিসরে মুসলমানবহুল প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যতটা বুঝবেন—চোখে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা খুবই শক্ত। নরজগতে হঠাৎ দেবতার আবির্ভাব হ'লে মানুষ যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং দেবতাকে কি দিয়ে খুশী করবে সেই কথাই ভাবে, প্রজারাও (শতকরা ৯৯ জনের চেয়েও বেশী মুসলমান) রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে সেই রকম খুশী হয়ে উঠল। তারা কবির কাছে কোন রকমের আর্থিক উপকারের প্রার্থী নয়। তারা কবিকে অনেক দিনের পরে নিজেদের মধ্যে পেয়ে পরমানন্দিত, এ যেন হারাধন ফিরে পাওয়া। এই শ্রেণীর প্রজাদের পক্ষ হ'তে মোঃ কাফিলউদ্দীন আকন্দ কবিকে মুদ্রিত যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন তার নকল এই—

"প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি
দেবরূপে এসে দিলে দেখা,
দেবতার দান অক্ষয় হউক
হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা।"

এঁদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে বার বার একটি প্রার্থনাই বেজে উঠছিল, সেটি তাঁদেরই ভাষায় বলি—

"আমরা ত হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে, আপনিও চলতি পথে, বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে-পিলেদের মতিগতি বদলে যাচ্ছে, তারা আমাদের সব নাদান মনে ক'রে—এমন জমিদারের জমিদারীতে বাস করবার সৌভাগ্য-বোধ তাদের বুঝি হবে না।" এঁদেরি মধ্যে একজন সাশ্রুনয়নে ব'লে উঠলেন, "হুজুর আমরা হিন্দুদের মত জন্মান্তরবাদ মানি না,—মানলে খোদার কাছে এই প্রার্থনাই জানাতাম, বার বার যেন হুজুরের রাজ্যেই প্রজা হয়ে জন্ম নিই।" এই সব প্রজাদের অবস্থা ভাল, এঁরা কেউ কবিকে এসব কথা খোসামোদ-ছলে বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তা থেকেও বুঝেছি যে, তিনিও তাদের কোন দিন অবজ্ঞা করেন নি,—তাদের নিজের অন্নদাতা হিসেবে মনে করেন। অতীর্তের পুরনো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে। এ-দৃশ্য দেখতে পাব, কোন দিন ভাবতেও পারি নি।

প্রজারা যে নিবেদনমিশ্রিত অভিনন্দন মোঃ আকবর আলী আকন্দের মারফতে কবিকে প্রদান করেছিল, তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

"তুমি যে মোদের দেবতা হৃদয়ের
নহ ত তুমি পাষাণে গড়া
জানি চিরকাল হে প্রভু দয়াল
হৃদয় যে তব মমতায় ভরা।"

এই সময়ে বগুড়া হ'তে একদল ছাত্র ও শিক্ষক এলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এবং তাঁর উপদেশ নিতে। এই দলের শিক্ষকদের লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মর্ম্ম এই—

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা ছাত্রদের সঙ্গে নিজেদের এক করতে না পারো ততক্ষণ তাদের ঠিক শিক্ষা দিতে পারবে না। তোমরা ছাত্রদের নিকট হ'তে মর্য্যাদা রক্ষার নামে, এবং শিক্ষাভিমানে যে-দূরত্ব রক্ষা কর, সেই দূরত্বরক্ষার নীতিই প্রকৃত শিক্ষাদানের পথে বিশেষ অন্তরায়।"

এই শিক্ষক ও ছাত্রদের দল চলে যাবার পর, কয়েক জন প্রধান প্রজা এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। তখন রাত্রি ৯ ঘটিকা। কবি অশ্রান্ত ভাবেই তাদের সঙ্গে অতীত দিনের সুখদুঃখের কথা আরম্ভ

করলেন। এঁরা রইলেন বোটে প্রায় চল্লিশ মিনিট। তার পর দিন সকালেও অনেক লোকসমাগম। এদিন অপরাহ্ণে রাতওয়াল এলাকার লাঠিখেলার দল এসে কবিকে তাদের লাঠিখেলা দেখিয়ে গেল। লাঠিয়ালদের লম্ফঝম্প এবং পাঁয়তাড়া দেখবার মত ব্যাপার ছিল। কি অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি, এদের ভিতরকার নির্ভয় আনন্দ এদের কসরতে ফুটে উঠেছিল।

তার পর দিন সকালেই কবির বোটে এল একটি ছেলে, তাঁর হাতে একটু শাদা কাগজ দিয়ে বললে, "কিছু লিখে দিন।" সে বালকটি চলে যাবার পর, কিছুক্ষণ পরে কবি সেই কাগজে লিখে দিলেন—

"সীমাশূন্যে মহাকাশে দৃপ্ত বেগে চন্দ্র সূর্য্য তারা
যে প্রদীপ্ত শক্তি নিয়ে যুগে যুগে চলে ক্লান্তিহারা,
মানবের ইতিবৃত্তে সেই দীপ্তি লয়ে, নরোত্তম,
তোমরা চলেছ নিত্য মৃত্যুরে করিয়া অতিক্রম।"

অপরাহ্ণে দলে দলে প্রজারা এল কবিকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। জনতার মধ্যে সভায় কবি বিদায় নিলেন প্রজাদের কাছে। সামনে যে-সব প্রজারা ছিল তাদের মধ্যে প্রবীণেরা অশ্রু সম্বরণ করতে পারে নি। সে এক অপূর্ব্ব বিদায় গ্রহণ আর বিদায় দেবার দৃশ্য। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে পতিসরের কূল ছেড়ে বোট চলল ফিরে আত্রাই ঘাটের দিকে। এসেছিলাম এই পথে দিনের আলোয় একটা আনন্দের ভাবে, যাচ্ছি ফিরে ভারাক্রান্ত চিত্তে। রাত্রির অন্ধকারকে দ্বিগুণতর অন্ধকার ক'রে দিলে, ঐসব প্রজাদের বিষাদ ছায়াবৃত মুখ, যারা পতিসরের নদীকূলে সমবেত হয়েছিল কবিকে বিদায় দিতে।

রাত্রির অবসান হ'ল; বোট আর কিছু দূরে এগিয়ে যাবার পর কানে এল নহবৎ আর শানাইয়ের বাদ্যধ্বনি। দূরে দেখা গেল নদীর তীরে ভিড়। পতিসর হ'তে আত্রাইয়ের পথে, পাঁচুপুর। এই পাঁচুপুরের জমিদার-বাড়ীতেই খুব ঘটা ক'রে বাজছে শানাই। পাঁচুপুরের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করলেন—এই অভ্যর্থনার জন্যই পাঁচুপুরের নদীতীরে লোকের ভিড়। রবীন্দ্রনাথ বোটেই রইলেন। জমিদার-পরিবার বোটে এসেই কবিকে তাঁদের শ্রদ্ধা-সম্মান যথারীতি নিবেদন করলেন। জমিদার-বাড়ীর গৃহিণীরা কবির জন্য যে সব আহার্য্য বোটে এনে উপস্থিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেদিন মধ্যাহ্নে তাই গ্রহণ করলেন।

জমিদারবাবুদের সেকেলে কেতায় তৈরি বিরাট অট্টালিকা। এক এক সরিকের এক একটি মহল। সব মহল যে বাইরে তা নয়—আমরা যে-মহলে গিয়ে ভোজন-সাধনায় মন এবং রসনাকে নিযুক্ত করেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই সাবেক যুগের একটি বিরাট পরিবারের অন্দরমহল।

এখানকার পালা শেষ ক'রে বেলা ১২টার সময় বোট চলল, পাঁচুপুর ছেড়ে আত্রাই অভিমুখে। নৌকা ছাড়বার সময় আবার বেজে উঠল শানাই, নদীর দুই তীরে কাতারে কাতারে জড় হ'ল নরনারী। এখান হ'তে যাত্রাপথে, বোটে কবির সঙ্গে ছিলাম আমরা তিন জন, নওগাঁর এস-ডি-ও, ঠাকুর-ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, এবং আমি। আত্রাই পৌঁছবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কবি গ্রাম সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার অনেক কথাই আমাদের বললেন। আত্রাই-ঘাটে বোট ভিড়বার কিছুক্ষণ পরেই এলেন রাজসাহীর বর্ত্তমান কালেক্টর শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই-সি-এস মহাশয়। ষ্টেশনে নেমেই এস-ডি-ও-র সঙ্গে অফিসিয়াল কাজের কথা সেরে নিয়ে তিনি এলেন বোটে কবির কাছে। সাহিত্য বিষয়ে আলাপ সুরু হ'ল। তার পর আলোচনা সুরু হ'ল গ্রামের সমস্যা নিয়ে।

গাড়ী আসবার সময় হ'য়ে এল। কবির পালকী কবিকে আত্রাই রেল প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেবার কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন এল। কবির সঙ্গেই শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় গাড়ীতে উঠলেন। নাটোর ষ্টেশনে তিনি নেমে গেলে, কবির কামরার বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমরাও নিজেদের কামরায় গিয়ে উঠলাম।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

৭

গরুর গাড়ী চড়িয়া ষ্টেশন হইতে বাড়ী পৌঁছিতে আধ ঘণ্টা পার হইয়া যায়। মৃণালকে হাঁটিয়া যাইতে দিলে সে পনর মিনিটে এ পথটুকু অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু হাঁটিয়া যাওয়া মামামামী পছন্দ করেন না। গ্রামের বাজারটা মাঝে পড়ে, সেখানে নানারকম লোক থাকে, তাহাদের চোখের উপর দিয়া অতবড় মেয়ে নাই বা হাঁটিয়া গেল? এমনিতেই কত কথা ওঠে।

বাজার পার হইয়া রাস্তাটা খানিক নামিয়া গিয়াছে, মাঝে একটি ছোট নদী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কল্যাণে তাহার উপর একটি সাঁকোও আছে। গরুর গাড়ী হড় হড় করিয়া নামিয়া গিয়া সেই সাঁকোর মুখে থামিল। গ্রামের এক দল মেয়ে জল ভরিতে আর কাপড় কাচিতে আসিয়াছে, তাহারা কৌতূহলবিস্ফারিত নেত্রে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। কে আছে ছইয়ের ভিতরে তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না, আবার না জানিলেও এই সব সরল গ্রাম্য ললনাদের খেদের সীমা থাকে না। কয়েকজন ত জল ছাড়িয়া উঠিয়াই আসিল, সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্ম। মৃণাল হাসিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, "আরে, আমি রে আমি।"

মেয়েদের ভিতর অগ্রবর্ত্তিনী হাসিয়া বলিল, "মল্লিক বাবুদের বিটী বটে গো।" তাহারা সব কয়জন আবার ঘাটে নামিয়া গিয়া মহোৎসাহে কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ, নদী, বন, সব যেন মৃণালকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিতেছে। নদীর কুল্ কুল্ শব্দটিও যেন আনন্দের রাগিণী। রাস্তার দুই ধারের বড় বড় শাদা পাথরের ঢিপিগুলি যেন উজ্জ্বল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ইহারা যে মৃণালের আজন্মকালের বন্ধু; ইহাদের ভুলিয়া কি সে কখনও কলিকাতার নির্ম্মম কারাগৃহে পড়িয়া থাকিতে পারে?

গরুর গাড়ী প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে দেখা যায় মামীমা বাহিরের দাওয়ার উপর ছোট খোকাটাকে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চিনি আর টিনি বাতাসে ঝাঁকড়া চুল উড়াইয়া, পায়ের মল বাজাইয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া আসিতেছে। গাড়ী থামিবার আগেই তাহারা ছোটখাট ঘূর্ণিবায়ুর মত আসিয়া গাড়ীর উপর আছড়াইয়া পড়িল। "আরে থাম্ থাম্, প'ড়ে যাবি গাড়ীর তলায়।" কে বা কাহার কথা শোনে?

মৃণাল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ান আর মামাবাবু জিনিষপত্রগুলির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মা, দিদি এসেছে গো।" মা যেন তাহা দেখিতে পান নাই, চিনির বলার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

চিনি ঢোক গিলিয়া বলিল, "মস্ত বড় মাছ এনেছে গো, এত্ত বড়।"

মামীমা বলিলেন, "মাছটা দে'খেই তুই বেশী খুসি হয়েছিস্, না?"

চিনি একথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। খাইতে পাইলে খুশী আবার জগতে কে না হয়? ইহা কি আবার একটা জিজ্ঞাসা করিবার কথা? চিনি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এবার বিলাতি মিঠাই আন নি?"

মৃণাল মামীমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এনেছি গো এনেছি, সব এনেছি। মামীমা, খোকাটা যে মস্ত হয়ে উঠল?"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "বড় হবার বয়স হ'লেই বড় হয়, বাছা। চল্ ঘরের ভিতর, হাত মুখ ধুবি, কাপড় ছাড়বি। কিছু খেয়ে এসেছিস, না সারা পথ শুকিয়ে এলি?"

মৃণাল বলিল, "সকালে দু-গ্রাস ভাত খেয়েছি বটে, কিন্তু আসতে আসতে আবার খিদে পেয়ে গেছে।"

মামীমা বলিলেন, "তা ত পাবেই, সেই সাত সকালে খাওয়া, তাতে কি আর সারা দিন যায়? আমি তোর জন্মে ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

মৃণাল বাক্স খুলিয়া প্রথম চিনি-টিনিদের ফরমাসী লজেন্স চকোলেট বাহির করিয়া দিল, তাহার পর হাত-মুখ ধুইয়া ট্রেনের কাপড় বদলাইয়া রান্নাঘরে খাইতে চলিল। মামীমা ক্ষুদকুঁড়ো যা খাইতে দেন, তাহাই মৃণালের মুখে অমৃতের মত লাগে। অথচ কলিকাতার বোর্ডিঙে কত রকম উপকরণ দিয়া তাহারা রোজ খায়, তাহাদের পেট ভরে ত মন ভরে না কেন?

মামীমা আজকের দিনটাই মাছ একেবারে পান নাই, শুধু পোস্তচচ্চড়ি, কুমড়োর ঝাল আর ডাল দিয়া ভাগ্নীকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "না খেয়ে এত পথ এসেছিস, এই খা, আর ত দেরি করা চলে না। না হলে দুখানা মাছ ভেজে দিতাম।"

মৃণাল বলিল, "রাত্রে সকলের সঙ্গে খাব এখন, অত তাড়া কিসের? এখন এইতে বেশ হবে।"

খাওয়া চুকিলে পর মৃণাল নিজের জিনিষপত্র শুইবার বড় ঘরের এক কোণে গুছাইয়া রাখিল। বিছানা খুলিয়া চিনি-টিনির খাটের উপর এক পাশে পাতিয়া রাখিল। এখানে আসিলে বরাবরই সে ইহাদের সঙ্গে শোয়। পড়ার বইগুলি কোথায় রাখিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। এই-সব ক্ষুদ্র দস্যুদের হাতে পড়িলে ত আর তাহাদের আয়ু বেশীক্ষণ থাকিবে না? ছবি দেখার ছুতায় তাহারা প্রত্যেকটি পাতা আলগা করিয়া রাখিবে।

মামীমা বলিলেন, "কি এত ভাবছিস বাক্স সামনে নিয়ে?"

মৃণাল বলিল, "এগুলি কোথায় রাখি বল ত মামীমা, সব আমার পড়বার বই।"

মামীমা বলিলেন, "ওঁর ঘরের তাকের একেবারে মাথায় তুলে রাখ্, না হ'লে এ দস্যিরা একেবারে সব শেষ ক'রে রাখবে।"

মৃণাল বই-খাতার রাশ তুলিয়া লইয়া মল্লিক-মহাশয়ের ঘরে চলিল। দেওয়ালের গায়ে বসানো তাক, তাহার সর্ব্বোচ্চ থাকটি এত উঁচু যে মৃণালও সহজে নাগাল পায় না। একটা টুল যোগাড় করিয়া আনিয়া, সে কোনও মতে জিনিষগুলি তুলিয়া রাখিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। আজকার দিনটা মৃণাল নিজেকে ছুটি দিবে স্থিরই করিয়া আসিয়াছিল। সে মামীমার হাত হইতে তাড়াতাড়ি লণ্ঠনগুলি কাড়িয়া লইয়া মুছিতে বসিয়া গেল। তাহার পর মাছ কুটিল, সরিষা বাঁটিয়া দিল, দুষ্ট খোকাকে অনেকক্ষণ সামলাইয়া রাখিল। কলিকাতায় শীতের লেশমাত্র নাই, এখানে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল। টিনি-চিনির তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা ডুরে শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়াইয়াই নিশ্চিন্ত। মৃণাল কিন্তু গায়ে একটা গরম জামা না দিয়া থাকিতে পারিল না। মামীমাও শীতকে গ্রাহ্য করেন না, জামা কোনও সময়েই গায়ে দেন না, দারুণ শীতেও একখানা মোটা কাঁথা মুড়ি দিলেই তাঁহার চলিয়া যায়।

রাত্রে খাইতে বসিয়া মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "মিনুর কল্যাণে আজ খাওয়াটা ভালই হ'ল।"

চিনি জিজ্ঞাসা করিল, "আর একটা মাছ আনলে না কেন? তা হ'লে কাল আমরা চচ্চড়ি ক'রে খেতাম, টক ক'রে খেতাম?"

তাহার মা বলিলেন, "হ্যাঁ, মাছ সব তোমার শ্বশুরের কিনা, তাই যত চাইবে তত বিনি পয়সায় দিয়ে দেবে।"

খাওয়া চুকিয়া গেলেই এখানে আর কোনও কাজ থাকে না। ছোটর দল হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া চটপট ঢুকিয়া পড়িল। মৃণাল খানিক ক্ষণ মামীমার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের কাজ সারিতে লাগিল, কিন্তু মামীমা খানিক পরেই জোর করিয়া তাহাকে শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

যতবারই ছুটিতে বাড়ী আসে, প্রথম রাতটা আনন্দেই বোধ হয় মৃণালের ঘুম হয় না। আবার ফিরিয়া কলিকাতায় যাইবার আগের রাতটাও না ঘুমাইয়া কাটে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আজও তাই ভাল করিয়া সে ঘুমাইতে পারিল না। চিনি আর টিনিও জাগিয়া থাকিতে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল, তাহাদের গুঁতাগুঁতি, মারামারি এবং অবিশ্রাম

নালিশ প্রায় রাত বারোটা অবধি চলিল, তাহার পর মায়ের হাতের গোটা-দুই চড় খাইয়া তবে ঠাণ্ডা হইল।

শীতের দিন, ভোরবেলাটা অন্ধকার হইয়া থাকে, কুয়াসা কাটে না অনেক বেলা পর্য্যন্ত। কিন্তু মৃণালের ঘুম ভাঙিয়া যায়, খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে উঠিয়া বসে। চিনি-টিনি এখন কুণ্ডলী পাকাইয়া পরস্পরের গায়ে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে। মুখ দুইটি দেখিলে মনে হয় একেবারে দেবশিশুর মুখ, কোনও রকম দুষ্টামির চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। অথচ চোখ চাহিবামাত্র কোথা হইতে যে দুষ্ট সরস্বতী ইহাদের স্কন্ধে আসিয়া ভর করেন, তাহা মৃণাল ভাবিয়াই পায় না।

মামীমা ভোর থাকিতেই উঠেন, না হইলে তাঁহার কাজকর্ম্মের সুবিধা হয় না। নামে মাত্র একটি ঝি আছে, সে কাজ যথাসম্ভব কমই করে, বেশীর ভাগ কাজ তাঁহাকে এক হাতেই সারিতে হয়। মৃণালও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল।

অন্যান্য বার সে বাড়ী আসিলে সারাক্ষণ মামীমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যথাসাধ্য তাঁহার কাজে সাহায্য করে। এবার কিন্তু ঠিক করিয়া আসিয়াছে, পড়াশুনায়ই সে বেশীর ভাগ সময় দিবে, ঘরের কাজের দিকে বেশী ভিড়িবে না। মামীমা জানেন, ইহা তাহার পরীক্ষার বৎসর। তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু মনে করিবেন না।

সে মুখ-হাত ধুইয়া মামাবাবুর ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এখন বাড়ী একেবারে নীরব, যেন নিশুতি রাত, হাট বসাইবার লোকগুলি এখনও জাগে নাই কিনা? ঘণ্টা-দুই মৃণাল এখন নিরুপদ্রবে পড়িতে পারিবে। উঠানের ওধার হইতে মাঝে মাঝে ঘটি-বাটির টুংটাং শব্দ আসিতেছে। রাধী বাসন গুছাইতেছে, এখনই পুকুরঘাটে লইয়া যাইবে। আর দূরে গোয়ালে গরুবাছুরের সাড়াও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মামীমা উনান ধরাইতেছেন, ধোঁয়ার ঝাঁজ ঘরে বসিয়াই অনুভব করা যাইতেছে।

মৃণাল জানালাটা খুলিয়া দিয়া তাহার সামনে পড়িতে বসিয়াছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় গোয়ালঘর, খিড়কি-পুকুরের ঘাট, তরিতরকারির বাগানের খানিক খানিক দেখা যায়, এখনও সব কিছু কুয়াসার ঘোমটায় মুখ অর্দ্ধেক ঢাকিয়া রাখিয়াছে। শির্ শির্ করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছে, মৃণাল গায়ের র‍্যাপারটা আরও ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতেছে। মন যত সে বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ করিতে চায় চোখ ততই তাহার বাহিরের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহাদের পোষা হাঁসগুলি গা ঝাড়া দিতে দিতে পুকুরের পাড়ে ইহারই মধ্যে প্রাতরাশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহাদের কলরব ঘরে বসিয়াই বেশ শোনা যায়। গোয়ালে মংলী গাইয়ের নূতন বাছুরটা গলা ছাড়িয়া ডাকিতেছে, তাহার বোধ হয় আর বন্দী হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। মৃণালের ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া সেটাকে একটু আদর করিয়া আসে। কি সুন্দর উহার চোখ দুটি! এমন নিষ্পাপ দৃষ্টি আর কোনও জীবের আছে কি? কবিরা হরিণশিশুর পিছনে ত কম সময় নষ্ট করেন না, কিন্তু ইহাদের প্রতি এত অবজ্ঞা কেন? মৃণাল কবিতা লিখিতে জানিলে এই বাছুরটার নামে গোটা দশ-বারো কবিতা লিখিয়া ফেলিত বোধ হয়।

কিন্তু এই রকম করিলেই তাহার পরীক্ষার পড়া হইয়াছে আর কি? মৃণাল তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া জোর করিয়া পড়ায় মন ডুবাইয়া দিল। ঘণ্টা দেড়েক সত্যই সে নির্ব্বিবাদে পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর শুইবার ঘর হইতে নানা রকম শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, বুঝা গেল ভোরের শান্তি টুটিবার উপক্রম হইয়াছে। টিনি, চিনি আর খোকা উঠিলেই নিশ্চিন্ত, আর কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না।

মামীমা ইহার মধ্যে অনেক কাজ সারিয়া ফেলিয়াছেন। দুধ দোয়ানো, জাল দেওয়া সবই হইয়া গিয়াছে, এইবারে সকলের খাইবার পালা। মৃণালও ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে রান্নাঘরেই খাইতে চলিয়া গেল।

এখানে চা নাই, ডিম ভাজা নাই, টোষ্ট-মাখনও নাই। কিন্তু বড় বড় কাঁসার বাটিতে খাঁটি দুধ আছে, তাহাতে ইচ্ছামত কেহ মুড়ি ভিজাইয়া খাইতেছে, কেহ খই, কেহ চিঁড়া। মৃণাল চিঁড়াটাই বেশী পছন্দ করে। তাহার পর ঘরে-তৈয়ারী নারকেল-নাড়ু আছে, মুড়কির মোওয়া আছে, চন্দ্রপুলি আছে। যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

কিনিয়া ত এ সব খাইতে হয় না, উপকরণও ঘরের, তৈয়ারীও হয় ঘরে।

জলখাবার খাওয়া শেষ হইতেই মামীমা বলিলেন, "তুই আর আমার পিছন পিছন এখন ঘুরিস্ নে। পরীক্ষার বছর, পড়্‌গে যা। আর চিনি, টিনি, যদি দিদিকে গিয়ে জ্বালাবি, ত একেবারে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

চিনি, টিনির তখনও হাঁসের বাচ্চা, বাছুর, বিড়ালছানা প্রভৃতি অনেক জীবের তদারক করা বাকি, কাজেই দিদিকে তখনকার মত রেহাই দিয়া তাহারা বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মৃণাল আবার গিয়া পড়িতে বসিল।

এবারে কিন্তু ঘণ্টা-খানিকের বেশী আর পড়া হইল না। একেবারে দিনরাত বইয়ের মধ্যে যদি ডুবিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ত তাহার এখানে আসাই বৃথা। সে বই তুলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরে মামীমার কাছে বসিয়া তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল। মামীমা বারণ করিলেও শুনিল না। জেলেনী চুবড়ি করিয়া কতকগুলি চুনা ও পুঁটি মাছ আনিয়া দিয়া গেল, তাহা বাছিতেও বড় কম সময় লাগিল না। পাড়াগাঁয়ে এই রকম মাছই বেশীর ভাগ দিন জোটে, বড় মাছ ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু এখানে ইহারই মূল্য অসাধারণ, এক থালা ভাত এই মাছ-চচ্চড়ির সাহায্যে উঠিয়া যায়।

মল্লিক-মহাশয় সকাল বেলাটা নিজের ক্ষেত-খামার তদারক করিয়াই কাটাইয়া দেন, না দেখিলে আয় কমিয়া যায়। গরু-বাছুরও অনেকগুলি আছে, তাহাদেরও রাখাল ছোঁড়াদের দয়ার উপর একেবারে ছাড়িয়া রাখা চলে না।

তাঁহার হাতে একখানি পোষ্টকার্ড দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি এল গো?" চিঠিপত্র বড় তাঁহাদের বাড়ী আসে না, তাই চিঠি দেখিলেই মনে কৌতূহল জাগে।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "মৃগাঙ্ক লিখেছে।"

মৃণাল তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি লিখেছেন মামাবাবু? আমার কথা কিছু লিখেছেন?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "পূজোর সময় একবার তোমাকে নিয়ে যেতে লিখেছে। তার শরীর মোটে ভাল যাচ্ছে না, হাঁপানির টানটা বড্ড বেড়েছে, কাজকর্ম্ম আর বেশী দিন করতে পারবে না ব'লে ভয় করছে।"

মৃণাল চিন্তিত ভাবে বলিল, "তবে ত বড় মুস্কিল। সংসারটি ত ছোট নয়। ওঁদের চলবে কি ক'রে?"

মামীমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আগে-ভাগে অত কু-ভাবনা ভাবতে হবে না। হাঁপানির অসুখ কতবার বাড়ে, আবার ক'মেও যায়। আর বাড়ীঘর জমিজমা সবই ত রয়েছে, নিজে দেখে না, বিলি ক'রে রেখেছে, তাই তত বেশী আদায় হয় না। নিজেরা হাতে ক'রে করলে, সামনে দাঁড়িয়ে লোক খাটালে ওরই থেকে দুগুণ পাওয়া যায়। তাতে কি আর চলে না? আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাকরি ক'রে টাকা আর ক'টা মানুষ আনে? ঘরের ধান-চাল তরিতরকারি, দুধ-ঘি, এইতেই সংসার চলে। তবে হ্যাঁ, বাবুগিরি করা চলে না।"

তাহার বাপের সংসারে বাবুগিরি যে বিশেষ হয়, এমন ধারণা মৃণালের ছিল না। বিমাতাটির যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাতে খুব ফ্যাশানদুরস্ত মানুষ বলিয়া তাঁহাকে মনে হয় নাই। আর ঐ অসংখ্য ছেলেমেয়ে, রুগ্ন স্বামী সাম্‌লাইয়া তিনি ফ্যাশান করিবেনই বা কখন?

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পূজোর আগেই কি যেতে বলেছেন?"

মামীমা বলিলেন, "থাক্, যা না সুখের বাপের ঘর, পূজোর আগে আর যেতে হবে না। বিজয়ার পরে যাস্ এখন। কখনও ত বাপ-মা একখানা মিলের কাপড় দিয়েও জিগ্‌গেস করে না। চোখের চামড়াও নেই।"

এই মা-মরা ভাগিনেয়ীর প্রতি তাহার পিতামাতার অবহেলা মল্লিক-গৃহিণী মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মৃগাঙ্কমোহনের কথা উঠিলেই তাঁহার মনের ঝাঁজ খানিকটা বাহির হইয়া পড়িত। মৃণালের এ-সব শোনা চিরকাল অভ্যাস, সে জিনিষটাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "গেলে ত বিজয়ার আগে যেতেই পারব না। কিন্তু যাতে একেবারেই না যেতে হয় তারই চেষ্টা দেখছি। মৃগাঙ্ককেই লিখলাম একবার

আসতে সে সময়। বহুকাল ত এ-মুখো হয় নি। মিনু যখন আমাদের কাছে রয়েছে তখন একেবারে সম্পর্ক তুলে দেওয়া ভাল দেখায় না।"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, তার গিন্নি আসতে দিলে আর কি? যা দজ্জাল!"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "লিখে ত দিলাম। তার পর না আসতে পারে, আমিই মিনুকে নিয়ে একদিনের জন্তে যাব।"

মৃণাল বলিল, "সেই ভাল, অনেক দিন বাবাকে দেখি নি।"

মামীমা আবার রান্নাঘরে গিয়া ঢোকাতে, সেও তাঁহার পিছন পিছন চলিল। রান্না শেখার সখ তাহার অসাধারণ, কিন্তু এই ছুটির দিন-কয়টি ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে শিখিবার সুবিধা নাই। সাদাসিধা রান্না প্রায় সবই সে শিখিয়াছে, তবে মামীমার রান্নার স্বাদ যেমন, তেমনটি তাহার হাতে কিছুতেই হয় না। ইহা লইয়া দুঃখ করিলে তিনি বলেন, "আমি দশ বছর বয়সে হাতা-বেড়ি ধরেছি রে, আর বুড়ী হ'তে চললাম, চুলে পাক ধ'রে গেল। আমার রান্না যেমন হবে, তোরও এই ক'দিন ক'রেই তেমন হবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?"

৮

মৃণালের মামার বাড়ীতে পূজা হয় না বটে, তাই বলিয়া পূজার আনন্দ তাহারা কিছু কম উপভোগ করে না। গ্রামের জমিদার গ্রামেই বাস করেন, তাঁহাদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়াই পূজা হয়। আর একটি বারোয়ারী পূজাও হয়। এক ঘর সাহা মহাজন আছে গ্রামে, তাহারাই এই দ্বিতীয় পূজাটির কর্ণধার হয়। গ্রামের অধিকাংশ লোকই ইহাতে সাধ্যমত চাঁদা দেয়।

জমিদার গ্রামে বাস করায়, এ গ্রামখানির বেশ শ্রী আছে। এখানে স্কুল আছে দুইটা, একটা ছেলেদের মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল, আর একটি পাঠশালা, ইহার আবার দুইটা বিভাগ। একটিতে বালিকারা পড়ে, আর-একটিতে বালকরা। ইহার জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহা জমিদার মহাশয়ই বহন করেন। এখানে ছোটখাট একটি বাজারও আছে, অবশ্য তরিতরকারি, মাছ-মাংসের জন্য সাপ্তাহিক হাটের উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে হয়। হাসপাতালও আছে একটি চলনসই গোছের। এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা মোটের উপর আশেপাশের গ্রামের চেয়ে ভাল। পুকুরগুলিও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার হয় এবং জমিদার-বাড়ীর সীমানার মধ্যে গোটা-দুই টিউব-ওয়েল থাকাতে মহামারীর প্রকোপ এখানে অনেকটা কম।

গ্রামে একটি কাপড়ের দোকান আছে। গ্রামেরই এক ভদ্রলোক ইহা খুলিয়াছেন, ইহার সাহায্যেই তাঁহার সংসার চলে। প্রায়ই কলিকাতায় যান বলিয়া নানারকম কাপড় তাঁহার কাছে সর্ব্বদাই মজুত থাকে, মণিহারী বিভাগও তাঁহার একটি আছে। তাহা ভিন্ন গ্রামের যে-কেহ যাহা কিছু ফরমাস করে তাহা তিনি কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনেন, রেলভাড়া হিসাবে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক লন। ইলিশ মাছ হইতে কবিতার বই পর্য্যন্ত নানারকম ফরমাশই তাঁহার কাছে আসিয়া জুটে। পূজার দিন-পনর আগে কলিকাতায় গিয়া সস্তা অথচ নয়নরঞ্জন অনেক রকম শাড়ী, জামা, ধুতি তিনি কিনিয়া আনেন। পূজার সময় তাঁহার বিক্রী বেশ ভালই হয়, জমিদার বাবুরা বাদে আর সকলেই প্রায় এই দোকানে কাপড় কিনিতে আসে। জমিদার-গৃহিণী কলিকাতার মেয়ে, তিনি স্বয়ং দিন-দুইয়ের জন্য কলিকাতায় গিয়া পূজার বাজার করিয়া আনেন। তবে ঝি-চাকরের জন্য অনেক সময় এই দোকান হইতেই কাপড় কেনেন।

মল্লিক-মহাশয় ধনী মানুষ নহেন, তবে অবস্থা তাঁহার কিছু অসচ্ছল নয়। তাঁহার গৃহিণীও হিসাবী মানুষ বলিয়া সংসারে কখনও অকুলান হয় না। মেয়েরা কেহ এখনও বিবাহযোগ্যা হয় নাই, কাজেই বাপমায়ের মেরুদণ্ড এখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই।

পূজার সময় সকলেই কাপড় পায়। ঝি, নাপতিনী, মেথরাণী, কেহই বঞ্চিত হয় না। এখানে বাড়ীর মেয়েদের দোকানে যাওয়ার প্রথা এখনও চলন হয় নাই, কাজেই মল্লিক-মহাশয়কেই প্রায় সমস্ত দোকানটাকে কাঁধে করিয়া ঘরে বহিয়া আনিতে হয়। গৃহিণী বলেন তাঁহার কর্ত্তার মোটে পছন্দ নাই, ছেলেমেয়েদেরও সেই মত। সুতরাং কর্ত্তা এক

বস্তা কাপড় দোকান হইতে উঠাইয়া আনেন, যে যাহার পছন্দ-মত কাপড় বাছিয়া লয়। পোষ্ট আপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে তাঁহার কিছু টাকা জমা আছে, তাহা হইতে এই সময় কিছু উঠাইতে হয়।

আজ বিকালের দিকে, খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিয়া মল্লিক-মহাশয় কাপড় আনিতে চলিয়াছেন। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, "সেবারকার মত সব যেন রঙীন কাপড় নিয়ে এস না গো। বাড়ীতে বুড়ী একটা আছে তাও মনে রেখো।"

ছেলেমেয়েরা সব গৃহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মৃণালও তাহাদের মধ্যে, কাজেই কর্ত্তা সদুত্তর কিছু দিতে পারিলেন না, হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মৃণাল বলিল, "মামীমা যেন কি! বয়স ত তোমার কতই। ঐ বয়সে দেখ ত কলকাতার মেয়েদের। তারা সব পরী সেজে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ী বললে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। ওখানে ত দেখি যত বয়স বাড়ে, তত সাজের বহর বাড়ে। খুব কম বয়স যাদের, তারাই যা একটু সাদাসিধে থাকে।"

মামীমা বলিলেন, "তোমার কলকাতার নিয়ম কলকাতা-তেই থাক বাছা। আমাদের ওসব করবার অবসর কোথায়? রাতদিন হাঁড়ি ঠেলব, না সেমিজ-সায়া প'রে, গালে রং মেখে বিবি সেজে ব'সে থাকব?"

মৃণাল বলিল, "আহা, গালে রং মাখতেই যেন আমি তোমাকে বলছি, তাই ব'লে একখানা রঙীন শাড়ী পরলে কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে না তোমার।"

মামীমা হাসিয়া ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। সমস্তটা দিন, এবং রাতেরও প্রথম কয়েকটা ঘণ্টা-তাঁহার এই ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরেই কাটিয়া যাইত। শুইবার ঘরে ঘণ্টা কয়েক ঘুমাইতেন, এই ছিল তাঁহার সে ঘরখানার সঙ্গে সম্পর্ক। অবশ্য, বার-দুই সেগুলিতে ঝাঁট দিতে, নিকাইতে তাঁহাকে যাইতে হইত।

টিনি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এবার কি শাড়ী নেবে? রাঙা?"

মৃণাল বলিল, "দূর, বারেবারেই কি রাঙা নেয় নাকি? আমি এবার নীলাম্বরী নেব। তুই বুঝি রাঙা নিবি?"

টিনি সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, বুলু চাই।"

মৃণাল বলিল, "যাঃ, তোর কেলে রঙে ব্লু মোটে মানাবে না।"

চিনি বলিল, "আমি চাই ডুরে, ওবাড়ীর শোভাদিদির মত।"

টিনিকে কালো বলায় সে চটিয়া গেল। "তুমি কেলে কুচকুচে!" বলিয়া মৃণালকে এক চড় মারিয়া সে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "শুনলে মামীমা, তোমার মেয়ের কথা?"

মামীমা বলিলেন, "যেমন তুই পাগল ক্ষেপাতে যাস ওটা কি আর মানুষ? মানুষের কোনো লক্ষণই ওর মধ্যে নেই।"

মল্লিক-মহাশয় কাপড়ের বস্তা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। এবার আবার দুইটি বস্তা, ছোটটি তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন, বড়টি দোকানের এক ছোকরা চাকর পৌঁচাইয়া দিয়া গেল।

বড় বারান্দাটার উপর দুইখানা মাদুর বিছাইয়া কাপড়গুলি তাহার উপর নামানো হইল। দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, কাজেই মৃণাল তাড়াতাড়ি একটা হারিকেন লণ্ঠনও জ্বালিয়া আনিল। ছেলেমেয়ে যে কোথায় ছিল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু সকলেরই যেন মাথার টনক নড়িয়া উঠিল। সবাই হুড়মুড় করিয়া উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া জুটিল কাপড় বাছিতে। মল্লিক-গৃহিণীও রান্নাঘর হইতে হাত ধুইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "নাও গো, কম হ'লেও বিশখানা সাদা শাড়ী নিয়ে এসেছি। বুড়ো মানুষের উপযুক্ত শাড়ী বেছে বার কর।"

মৃণালের মামীমা ছেলেমেয়ে, ভাগ্নী, প্রভৃতির সামনে যতই বৈরাগ্য দেখান না কেন, সখ তাঁহার কিছু কিছু ছিল। না থাকিলেই অন্যায় হইত, কারণ বয়স তাঁহার ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝির বেশী অগ্রসর হয় নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া মাদুরের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। মৃণাল তাঁহার দিকে একরাশ কাপড় ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও মামীমা, শান্তিপুরে তিন-চার খানা শাড়ী রয়েছে, চমৎকার। ওরই মধ্যে থেকে একখানা বাছ না?"

মামীমা শাড়ীগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া পরখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানি চওড়া লাল কস্তাপাড়ের শাড়ী তাঁহার

খুবই পছন্দ হইল, কিন্তু দাম সাড়ে পাঁচ টাকা। গৃহিণী হাত গুটাইয়া বলিলেন, "বড্ড যে দাম গো? অত টাকা খরচ করতে চাই না। তার চেয়ে ঐ বোম্বাইয়ের দিকের মিলের শাড়ী একখানা নিই। ওরও ত খোল বেশ পাতলা, পাড়ও নানারকম রয়েছে।"

মৃণাল বলিল, "না, ঐ শান্তিপুরেটাই তোমাকে নিতে হবে। ভারি ত বছরে একখানা কাপড় কিনবে, তাও আবার মিলের। এই শাড়ীটা রাখি মামীমার জন্যে, মামাবাবু?"

মামাবাবু বলিলেন, "তা রাখ না, রাখবার জন্যেই ত আনা? মিলের কাপড় নেওয়ার কি দরকার?"

মামীমা হাসিয়া শাড়ীখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেলেন। বলিলেন, "ভাতটা দে'খে আসি, না হলে ধ'রে উঠবে। তোরা ততক্ষণ কাপড় বাছ্।"

চিনি আর টিনির কিছুতেই কাপড় বাছা শেষ হয় না। তাহারা যেন বাঁশবনে ডোম কাণা। বস্তাসুদ্ধ রাখিয়া দিলে তবে তাহাদের মনের মত হয়। টিনি যদিও নীল শাড়ী লইবার সখ জানাইয়া ছিল, কার্য্যতঃ সে নিল একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী, পাড়টা তাহার জরির, এবং চিনিও ডুরে শাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া একখানি ছোট বুটিদার ঢাকাই শাড়ীর মায়ায় মজিয়া গেল। কিন্তু অন্য কাপড়গুলি হাত-ছাড়া করিতেও তাহাদের কোনও প্রকারেই আর মন উঠে না। অবশেষে তাহাদের মা আসিয়া দুইজনের পিঠে দুই চড় মারিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, না হইলে চটকাইয়া তাহারা শীঘ্রই ছোট শাড়ীগুলিকে আমসত্ত্বে পরিণত করিত। বুকের উপর নিজের নিজের শাড়ী চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহারা তখনকার মত রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গেল।

মামাবাবু বলিলেন, "নাও মিনু, এবার তোমার পালা, তাহলেই বস্তাটা আবার বেঁধে ফেলতে পারি।"

মৃণাল বলিল, "আমি এবার একটা সাদা শাড়ী নিই, মামাবাবু?"

মামাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তুমিও কি বুড়ী হয়ে গিয়েছ?"

মৃণাল বলিল, "বুড়ী নাই বা হলাম, তাঁই ব'লে কি এত খুকি যে রঙীন ছাড়া কিছুই পরতে পারব না? আমি এই মুগার ডুরে শাড়ীখানা নিই। বেশ সোনার ডোরার মত ঝক্ ঝক্ করছে।"

মামীমা কাছে আসিয়া বলিলেন, "একবার কাচতে দিলেই ত যাবে।"

মৃণাল বলিল, "না, আমাদের বোর্ডিঙে ঢাকাই ধোপা আছে, তাকে দিলে কিছু নষ্ট করবে না, ঠিক থাকবে।" সে সেই শাড়ীখানাই বাছিয়া আলাদা করিয়া রাখিল।

ছেলেদের কাপড় বাছার বিশেষ হাঙ্গাম নাই, একটু পাড়টা দেখিয়া রাখিয়া দিলেই হয়। সে কাজ শীঘ্রই চুকিয়া গেল, তাহার পর আবার ভাল করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া দোকানের চাকর কাপড় দোকানে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

শাড়ীখানি অতি যত্নে মৃণাল নিজের বাক্সে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিল। ভাল জিনিষ পায় সে অতি কম, কাজেই যাহা পায়, তাহা পাওয়ার রসটাকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপভোগ করে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কোনও ঘরে প্রদীপ কোনও ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। মৃদু আলোকপাতে আলোছায়ায় সারা বাড়ী চিত্রিত ছবির মত সুন্দর। এমন সময় পড়ায় মন বসে না, দাওয়ার এক কোণে পা ঝুলাইয়া বসিয়া মৃণাল একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মামীমা ডাকিয়া বলিলেন, "ও মিনু, সন্ধ্যেটা দিয়ে দে মা। আমার হাত জোড়া।"

মৃণাল তুলসীতলায় প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিল। শাঁখের শব্দ একবার প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল।

গোয়ালের গরু-বাছুরগুলি সদলে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের ডাক দূর হইতেই শুনা যায়। সন্ধ্যার ছায়া ধূসর অবগুণ্ঠনের মত নামিয়া আসিতেছে, পল্লীরাণীর মুখ আর স্পষ্ট দেখা যায় না, কেবল উজ্জ্বল তারাগুলি যেন শ্যামাঙ্গিনীর ললাটের চন্দনতিলকের মত ক্রমেই বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। শীতের হাওয়া শরীরে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে। মৃণালের চোখ সম্মুখের দৃশ্য হইতে ফিরিতে চায় না, সে গায়ের আঁচল গায়ে শক্ত করিয়া জড়াইয়া আরও খানিকক্ষণ সেইখানেই বসিয়া থাকে।

পাড়াগাঁয়ে খাওয়া-দাওয়া সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই সুরু

হইয়া যায়। বাতি জ্বালাইয়া কাজ করা পল্লীবাসীরা যেন পছন্দ করে না। দিনের কাজ দিন থাকিতে শেষ হইলেই ভাল, রাতে যখন ভগবান আলোক দেন নাই, তখন রাতে কাজ করা হয়ত তাঁহার বিধান নয়। রাত্রিটার সবটাই প্রায় ইহারা ঘুমাইবার জন্য রাখিয়া দেয়, তেমনি দিনের আলো ফুটিতে-না-ফুটিতে তাহারা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কাজে লাগিয়া যায়।

চিনি, টিনি, খোকা সকলে খাইতে বসিয়া গেল। মেয়ে দুটি খায় যা, ছড়ায় তাহার বেশী। তাহাদের মা আবার এসব নোংরামি মোটেই দেখিতে পারেন না, অথচ খোকাকে সামলাইয়া মেয়েদের খাওয়াইয়া দিতেও পারেন না। কাজেই খাইতে বসিয়া চিনি-টিনি ভাত-ডাল যত না খায়, মার খায় তার বেশী। এখন মৃণাল আসাতে কয়েকটা দিন তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে, সে-ই তাহাদের গুছাইয়া খাওয়াইয়া দেয়, মুখ-হাতও ধুইয়া দেয়।

তাহার পর মৃণাল, মল্লিক-মহাশয় এবং তাঁহার বড় ছেলে খাইতে বসিলেন। মামীমা সবাইকে দিয়া-থুইয়া তবে নিজে খাইতে বসেন, দুই বেলাই তাঁহার এই ব্যবস্থা। মৃণাল আগে আগে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে খাইত, এখন কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিতে হয় বলিয়া আগে খায়। কিন্তু হারিকেনের মৃদু আলোতে বেশীক্ষণ পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা করে না। চারিদিকের গভীর নীরবতারও যেন কেমন একটা সুর আছে। সেই সুর ঘুমপাড়ানি গানের মত কেবলই তাহার মনের ভিতর গুঞ্জন করিয়া ফিরে, দেখিতে দেখিতে ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসে। আলো কমাইয়া দিয়া, বই-খাতা গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া সে শুইতে চলিয়া যায়।

সকাল বেলা জলখাবার খাওয়া শেষ করিয়া মৃণাল আর-এক পালা পড়িতে বসিবে মনে করিতেছে, এমন সময় মামাবাবু বাহিরের কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আজও তাঁহার হাতে একখানি চিঠি। মৃণালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে মিনু, তোর বাবা যে আসছে।"

মৃণাল কিছু বলিবার আগেই মল্লিক-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে গো?"

মৃণাল চিঠি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "দাও না দেখি মামাবাবু, বাবা কি লিখেছেন।"

মল্লিক-মহাশয় চিঠিখানা মৃণালের হাতে দিয়া বলিলেন, "আসছে পরশু। পুজোর সময় আসতে পারবে না, বিজয়ার পরেও কি কাজ পড়েছে, তাই আগেই আসছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা যখন হয় এলেই হল। মিনুকে কত বছর যে দেখে নি তার ঠিকঠিকানা নেই। নিজে আবার যে-বছর বিয়ে করলে সেই বছর মিনুকে নিয়ে গিয়েছিল। তার বছর-দুই পরে একবার দেখতে এসেছিল। তার পর থেকে ত বাপে বেটীতে দেখাসাক্ষাৎ নেই। সেই সাত বছরের মেয়ে দে'খে গেছে আর এবার এসে সতেরো বছরের দেখবে। ধন্যি বাপ যা হোক। সাধে কি বলে, মা মরলে বাপ তালুই?"

মৃণাল অনেক কষ্টে তাহার বাবার লেখা পোষ্টকার্ডখানা পড়িতেছিল। মৃগাঙ্কের লেখা এমন অদ্ভুত রকম জড়ানো যে তাহার পাঠোদ্ধার করা এক অসম্ভব ব্যাপার। যাহা হউক, এইটুকু বুঝিতে পারিল যে তিনি পরশু দিন আসিতে-ছেন, তবে দিন দুইয়ের বেশী থাকিতে পারিবেন না।

চিঠিখানা মামীমার হাতে দিয়া সে গিয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু মন পড়ায় কিছুতেই বসিতে চায় না। কতদিন পরে বাবাকে সে দেখিবে। বাপের চেহারা এখন আর স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে না, আবছায়া মতন একটা মূর্ত্তি মনে ভাসিয়া উঠে। এখন তিনি কেমন হইয়া গেছেন কে জানে? এখানকার কাহারও সঙ্গেই এই দীর্ঘ দশ-এগারো বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেখা হয় নাই। বাপকে দেখিবার ইচ্ছা মনে মনে মৃণালের অনেকখানিই ছিল, কিন্তু তাহা সে বলিবে কাহার কাছে? মামাবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, তাঁহার সঙ্গে গল্প চলে না। মামীমা মৃগাঙ্কমোহনকে একেবারেই দেখিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার সামনেও মৃণাল এ-সকল কথা তোলে না। টিনি-চিনি এখন পর্য্যন্ত জগৎসংসারে দুইটি মাত্র রসের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা খাওয়ার এবং খেলার। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বুঝিতে তারা অক্ষম। কাজেই মৃণাল মনের ইচ্ছা মনেই রাখে। এতদিন পরে বাবাকে দেখিতে পাইবে শুনিয়া মনটা তাহার আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এ আনন্দের ভাগ লইবার লোক এ বাড়ীতে কেহ ছিল না।

সারাটা দিন এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল। নিজেকে ভাগ্যহীনা তাহার মনে হয় না, মামামামীর স্নেহের ছায়ায় সে যেমন বাড়িয়া উঠিতেছে, যত আরামে দিন কাটাইতেছে, অনেকে নিজের মা-বাপের ঘরেও ততটা আরাম পায় না। তবু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মৃণালকে দুর্ভাগিনীই বলিতে হয়। তাহার মা নাই, বাবা থাকিয়াও নাই, ভাই-বোন সহোদর কেহ নাই। সে কুমারী। এখন পর্য্যন্ত তাহার জীবন স্নেহপ্রেমের বন্ধনে অন্য কোনও জীবনের সহিত বাঁধা পড়ে নাই। জগতে সে বড় একাকিনী। কিন্তু এই একাকীত্ব সে তেমন অনুভব করে না ত? হৃদয়ের শূন্যতা কিসে তাহার পূর্ণ হইয়া আছে? [ক্রমশঃ]

কইমাছের বিচিত্র কাহিনী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কেবল রসনাতৃপ্তিকর বলিয়াই নহে, অদ্ভুত জীবনীশক্তি, অনাহারে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিবার ক্ষমতা, উভচর-বৃত্তি প্রভৃতি অন্য নানা কারণেও কইমাছ আমাদের দেশে সর্ব্বজনপরিচিত। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় কইমাছ তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়াও জীবন-রক্ষার জন্য যেরূপ আস্ফালন করিয়া থাকে, তাহাতে স্বতই মনে হয়, অতীতে ইহাদিগকে অতি কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইতে হইয়াছে। অতীতে ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বজাতীয়দিগকে হয়ত কেবল কর্দ্দমাক্ত ভূমির মধ্যেই অনাহারে বা স্বল্পাহারে বহু যুগ কাটাইতে হইয়াছে। এই অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধনের ফলেই বোধ হয় এখন ইহারা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অল্পায়াসে জীবনধারণ

কানকো প্রসারিত করায় কইমাছ জালে আটকাইয়াছে

করিতে পারে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি অদ্ভুত বৃত্তির অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু এই বৃত্তিগুলি আত্মরক্ষার পরিপোষক হইলেও সংস্কারমূলক বলিয়া প্রকারান্তরে বুদ্ধিজীবী শত্রুর হস্তে ইহাই তাহাদের লাঞ্ছিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

কইমাছ সাধারণতঃ ঘাসপাতাসমাচ্ছন্ন অন্ধকার অগভীর জলেই বাস করিয়া থাকে, মৃত মৎস্য বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীদের দেহাবশেষ বা কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করিয়াই ইহারা জীবনধারণ করে। দুই বৎসরের অধিক কাল পরীক্ষাগারের কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে সাত-আটটি কই-মাছকে অনাহারে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই দুই বৎসরের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ দিন সামান্য কিছু খাবার দিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল অনাহারে ইহাদের শরীরের চর্ব্বি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে কোনরূপ বৃদ্ধির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। শরীর ক্ষীণ হইবার ফলে মাথা অসম্ভব বড় দেখাইতেছিল চোখগুলি যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—কি রকম এক প্রকার শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত ও প্রায়ই এক স্থানে সকলে মিলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। সর্ব্বশেষে এমন অবস্থায় উপনীত হইল যে খাবার দিলেও আর যেন খাইবার প্রবৃত্তি ছিল না। একটি মাছ এক টুকরা রুটি চার-পাঁচ বার উদ্গীর্ণ করিয়া গিলিতে গিয়া দম আটকাইয়াই মারা গেল।

স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা এমন সুকৌশলী ও সন্তরণপটু যে সহজে ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না। ইহারা অতি সুদক্ষ

জলজ ঘাসের উপর পাতিয়া রাখা জালের উপরে শিকারের লোভে আসিয়া পড়িয়া কইমাছ আটকাইয়া গিয়াছে

শিকারী। শিকার ধরিবার সময় ইহারা বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সাধারণতঃ মৃত মৎস্য বা অন্য কোন প্রাণীর মৃতদেহ ভক্ষণের সময় ইহারা হায়েনা প্রভৃতি শিকারী জন্তুর মত দল বাঁধিয়া মৃতদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া খাইয়া থাকে। মৃত প্রাণী অবশ্য সর্ব্বদাই জোটে না, তখন প্রয়োজন-মত ইহারা মশা মাছি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ শিকারে মনোনিবেশ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘাসপাতা ও জঞ্জাল পরিপূর্ণ অগভীর জলেই বাস করিয়া থাকে।

কচুরিপানার শিকড়ে কানকো আটকাইয়া কইমাছ ঝুলিয়া আছে
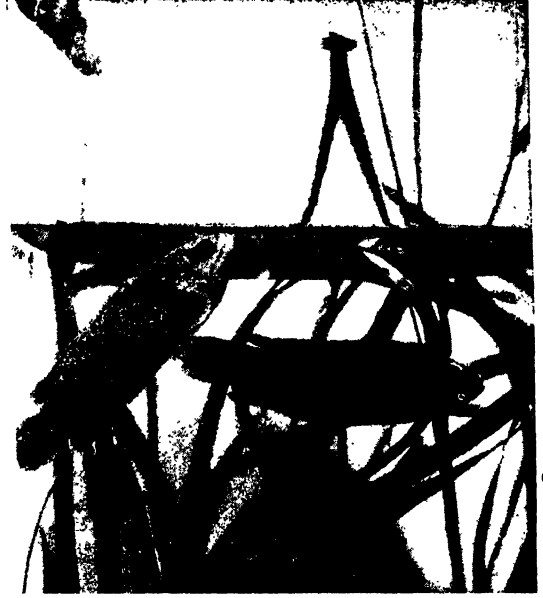
জলজ ঘাসের উপর মাছি বসিতে দেখিয়া কইমাছ জলের নীচে হইতে লক্ষ্য স্থির করিতেছে

এই সমস্ত ঘাসপাতা জলের উপরে বেশ উঁচু হইয়াই বাড়িয়া থাকে। এই জলজ উদ্ভিদগুলি নানা জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল। জল হইতে দেড় ফুট দুই ফুট, এমন কি সময় সময় আরও বেশী উঁচুতে এই সমস্ত ঘাসের শীর্ষের উপর পোকা-মাকড় আসিয়া বসিলে কইমাছ জলের নীচে হইতে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া কাছে আসে এবং তীরন্দাজ মাছের মত চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে, ঠিক কোন্ দিক হইতে আক্রমণের সুবিধা হইবে। মাছরাঙা পাখীরা যেমন জলের মধ্যে কোন শিকার দেখিতে পাইলেই খুব উঁচুতে উড়িয়া গিয়া এক স্থানে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে উড়িতে উড়িতে ঝুপ করিয়া হঠাৎ খাড়াভাবে শিকারের উপর পড়ে, কইমাছের শিকার-কৌশলও কতকটা সেইরূপ। লেজ ও পা-খানা অতি সুকৌশলে আস্তে আস্তে নাড়িয়া একই স্থানে স্থির ভাবে থাকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য স্থির করিতে থাকে এবং হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া শিকার আক্রমণ করে। শিকার ছোট হইলে জলে ডুবিয়া তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলে নচেৎ মুখে করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে ছুটিয়া পলায়, কারণ অন্যান্য স্বজাতীয়েরা দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কষ্টলব্ধ শিকার কাড়িয়া খাইবে। তীরন্দাজ মাছের মতই ইহাদের জলের উপর শিকার ধরিবার অব্যর্থ সন্ধান পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ ছোট বড় অনেক জাতের মাছই বঁড়শির আঘাতে একবার ঘায়েল হইয়া পলাইয়া গেলেও পরক্ষণেই আবার সেই বঁড়শি গিলিয়াই ধরা পড়ে, ইহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্রিম স্বচ্ছ জলাধারে বহুকাল কইমাছ প্রতিপালন করিয়া দেখিয়াছি কোন কারণে একবার ঘা খাইলে পুনরায় সহজে সেই কাজে অগ্রসর হয় না। ইহাদের স্মৃতিশক্তি অন্যান্য মাছ অপেক্ষা একটু প্রখর বলিয়াই মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহাদের স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি হইবে। কতকগুলি মাছকে অনেক দিন অনাহারে রাখিয়া একদিন একটি জীবন্ত বোলতা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। বোলতার ডানা ভিজিয়া যাওয়াতে সে উড়িয়া পলাইতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে চার-পাঁচটা কইমাছ শিকার ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। একটা মাছ বোলতাটাকে পিঠের দিকে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটিয়া পলাইল, আর সকলেই ইহাকে পিছু তাড়া করিতে লাগিল। বোলতাটা মাছের মুখে একই ভাবে থাকিয়া ছটফট করিতেছিল এবং হুল ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। অনেকক্ষণ ছুটাছুটির পর কইমাছটা এক নির্জ্জন কোণে গিয়া পোকাটাকে গিলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু একবারে গিলিতে না পারিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেই কোন এক অবস্থায় সুবিধা পাইয়া বোলতা তাহার মুখের মধ্যে হুল ফুটাইয়া দিল। তার কি যন্ত্রণা! পোকাটাকে ছাড়িয়া দিয়া মাছটা যেন বিদ্যুৎবেগে ছিটকাইয়া পিছু হটিয়া গেল। কতক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে জলের নীচে এক স্থানে চুপ করিয়া রহিল। এদিকে বোলতাটা ভাসিয়া উঠিতেই আর একটা মাছ ছুটিয়া আসিয়া সেটাকে মুখে করিয়া পলাইল, কিন্তু বোলতার হুলের ঘায়ে সেও তাহাকে

কইমাছ, স্বাভাবিক অবস্থায়

কইমাছ কানকো প্রসারিত করিয়া কাৎভাবে ডাঙায় হাঁটিতেছে
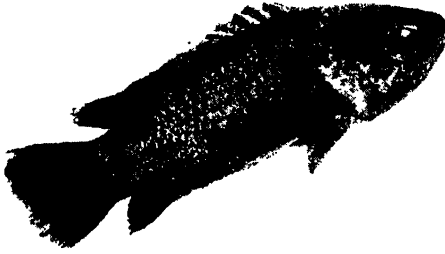
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এইরূপে পর পর কয়েকটা মাছই অল্পক্ষণের মধ্যে বোলতার হুলে ঘায়েল হইবার ফলে পুনরায় ইহাকে আক্রমণ করিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভাবিলাম, যন্ত্রণার উপশম হইলেই আবার আক্রমণ চলিবে। বলা বাহুল্য, জলের নীচে ডুবাইয়া রাখিলেও বোলতা সহজে মরিয়া যায় না—কাজেই বোলতাটা অনেকবার চুবুনি খাইয়াও তখন জল হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এতগুলি মাছের একটাও আর সারাদিনের মধ্যে তাহার কাছে ঘেঁসিল না। ইহাদের স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্যই এই ঘটনার পর ক্রমাগত কয়েক দিন জীবন্ত বোলতা জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিয়াছি—ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলেও কেহ আর বোলতার কাছে ঘেঁসে নাই। অথচ মশা-মাছি ফেলিয়া দিলেই টপাটপ গিলিয়া খাইয়াছে।

শিকার ধরিবার উল্লিখিত অদ্ভুত স্বভাবের জন্য কইমাছ সহজে মানুষের হাতে ধরা পড়িয়া থাকে। বিভিন্ন জাতের মাছ ধরিবার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের জাল ব্যবহৃত হয়। মাছ যাহাতে আটকাইয়া থাকিতে পারে এই জন্য জালের প্রান্তদেশ একটা থলির মত দুই ফেরৃতা করিয়া ভাঁজ করা থাকে। যাঁহারা ফেকা অথবা ঝাঁকি-জালে মাছ ধরা দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—রুই কাৎলা হইতে চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত সকল রকমের মাছই জাল চাপা পড়িবামাত্র উপর দিকে সাঁতরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করে কিন্তু জালে বাধা পাইয়া সামনের দিকে ছুটিতে থাকে। অবশেষে জালের প্রান্তদেশের থলির মধ্যে আসিয়া আটকা পড়িয়া যায়। কিন্তু কইমাছের স্বভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহারা জাল-চাপা পড়িলে উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া সোজা নীচের দিকে গিয়া কাদার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; কাজেই সহজে জালে কইমাছ ধরা পড়ে না। দৈবাৎ বেঘোরে পড়িয়া দুই-একটা জালের ফাঁকে বা থলিতে আটকা পড়িয়া যায়। এই জন্যই কইমাছ ধরিতে খুব সাধারণ এক প্রস্থ থলিশূন্য জাল ব্যবহৃত হয়। এই জালের ফাঁকগুলি হয় বেশ মোটা—একটা কইমাছ কোনক্রমে গলিয়া যাইতে পারে এই ভাবে নির্ম্মিত। কইমাছ ধরিবার জন্য এই জাল নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়। জলজ ঘাসপাতার উপর এই জাল আলগা ভাবে বিছাইয়া রাখা হয়। পোকামাকড় ঘাসপাতার উপর বসিবামাত্রই কইমাছেরা জালের নীচে হইতে শিকার লক্ষ্য করিয়া লাফাইয়া উঠিলেই জালের ফাঁকে আটকা পড়ে। ইহাদের আর একটি আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে কোন কিছুতে বাধা পাইলে অথবা আক্রান্ত হইলেই মাথার দুই দিকের কাঁটাওয়ালা কান্‌কো ও পিঠের কাঁটাগুলি ছড়াইয়া দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় না পড়িলে কিছুতেই কান্‌কো বন্ধ করে না। কাজেই লাফাইয়া উঠিবার সময় জালের ছিদ্র দিয়া সরু মুখ গলিয়া যাইবামাত্রই কানকো প্রসারিত করিয়া দেয় এবং আঁকশির মত জালে আটকাইয়া যায়।

সাধারণতঃ মাছ মাত্রেরই স্রোতের বিপরীত দিকে উজান বাহিয়া চলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। কইমাছের এই উজান বাহিয়া চলিবার প্রবৃত্তি যেন অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের স্রোতের উজান বাহিয়া চলিবার প্রবৃত্তি এরূপ অদ্ভুত যে বৃষ্টির সময় জল গড়াইয়া পুকুরে নামিলেই ইহারা সেই সামান্য জলস্রোতের উজান চলিতে চলিতে খাড়া পাড় বাহিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া আসে এবং কান্‌কোর সাহায্যে কাৎরাইতে কাৎরাইতে অনেক দূরে চলিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে ইহারা বড় বড় হেলান গাছের গুঁড়ি বাহিয়া অনেক উপরে উঠিয়া যায়—এরূপ ঘটনা নাকি অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জল ছাড়িয়া ইহারা অনেক সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কোন অসুবিধা বোধ করে বলিয়া মনে হয় না। তবে শুষ্ক ডাঙায় কিছু সময় চলাফেরা করিবার পর ক্রমশঃ শরীরের জল শুকাইতে থাকে তখন পিচ্ছিল এক রকম রস নির্গত হইয়া শরীরটাকে ভিজা রাখে। দেহনিঃসৃত এই পিচ্ছিল রসের জন্য ইহাদিগকে ধরিয়া তোলা দুষ্কর। কোন সুদূর অতীতে জলাভাব বশতঃই ইহারা এই উভচর-বৃত্তি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল—বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু সাময়িক ভাবে ডাঙায় চলাফেরা করিলেও ইহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে উভচর প্রাণী বলা যায় না। কারণ ডাঙায় উঠিয়া ইহারা কেবল ইতস্ততঃ চলাফেরা করা ব্যতীত কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর প্রাণীদের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট দিকে চলিতে পারে না। দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাঁকড়া যেমন জলের নীচে ও ডাঙায় তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ইহাদের সে ক্ষমতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা স্রোতের উজান বাহিয়া চলে এবং কোন কিছুতে বাধা পাইলেই কান্‌কো প্রসারিত করিয়া রাখে। এই

কচুরি-পানা টানিয়া কইমাছ ধরা

স্বভাবের জন্য দলে দলে ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়িয়া থাকে। দেড় হাত দু-হাত চওড়া সাধারণ এক প্রস্থ জাল অল্প স্রোতের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে পর্দ্দার মত করিয়া জলে পাতিয়া রাখা হয়। কইমাছ উজান চলিবার মুখে জালের ছিদ্র দিয়া মুখ গলাইয়া দেয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত চওড়া শরীর আটকাইয়া যাইবামাত্রই কান্‌কো প্রসারিত করিয়া দেয়—তখন না পারে ঢুকিতে, না পারে বাহিরে আসিতে। জাল তুলিলেই দেখা যায় জালের ছিদ্রে সারি সারি কইমাছ বন্দী হইয়া রহিয়াছে।

কচুরী-পানার আবির্ভাবের পর পাড়াগাঁয়ের লোকেরা জাল ব্যবহার না করিয়া অতি সহজ উপায়ে কইমাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পুকুর, খাল বিলে কচুরি-পানার লতাপাতার শিকড়ে পুরু আবর্জ্জনার মধ্যে কইমাছ পোকামাকড় প্রভৃতি শিকারের লোভে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কচুরির দল ধরিয়া টানিয়া উপরে তুলিলেই দেখা যায় অনেক কইমাছ কচুরির শিকড়ে কান্‌কো আটকাইয়া, কেহ বা শিকড় কামড়াইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ইহাদের আর একটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা পিঠ, কান্‌কো ও পেটের কাঁটা ফুটাইয়া তাহাকে ত ঘায়েল করেই অধিকন্তু সুবিধা পাইলেই দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরে। মুখের সম্মুখভাগে ইহাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম ধারালো দাঁত আছে। কাপড় অথবা চটের মধ্যে কইমাছ রাখিয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহারা কাপড়ের সুতা কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকে—কিছুতেই কামড় ছাড়ে না—টানিয়া খুলিতে হয়।

কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলেও ইহাদের একটা স্বভাব বড়ই হাস্যোদ্দীপক। মুখের কাছে হঠাৎ একটা আচম্‌কা আঘাত লাগিলেই ইহারা যেন একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। ইহাদের বুদ্ধিশক্তি এমন কি নড়াচড়া করিবার ক্ষমতাও যেন লোপ পায়। দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এই স্বভাবের সুযোগ লইয়া প্রচুর পরিমাণে কইমাছ শিকার করিয়া থাকে। খুব সরু পাতলা এক টুকরা বাঁশের চেঁচাড়ি ঘোড়ার ক্ষুরের মত বাঁকাইয়া ছোট ছোট কয়ার-ফড়িং বা অন্য কোন পোকার গায়ে দুই মুখ আল্‌গাভাবে গাঁথিয়া রাখা হয়। এই চেঁচাড়িটি ঠিক একটা স্প্রিঙের মত। ছাড়া পাইলেই সোজা হইয়া যায়। বাঁশের এই বাঁকানো ফালিকে "বড়া-বঁড়শি" বলে। জলের উপর দুই পাশে দুইটি খুঁটি পুঁতিয়া একটি লম্বা দড়ি উভয় খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেই লম্বা দড়ির সঙ্গে ছোট ছোট সুতায় "বড়া-বঁড়শি" বাঁধিয়া কয়ার-ফড়িঙের টোপ গাঁথিয়া জলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বঁড়শিগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ফড়িং শিকারের লোভে কইমাছ আসিয়া টোপ কামড়াইবামাত্রই বাঁশের ফালিটি খুলিয়া গিয়া স্প্রিঙের মত চাপে মাছের মুখটাকে হাঁ করাইয়া দেয়। আচম্‌কা এইরূপ অস্বাভাবিক ধাক্কা খাইয়া মুখ হাঁ হইয়া যাওয়ায় কইমাছ একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায় এবং পলাইবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অবস্থাটা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্যই যেন নিশ্চেষ্ট ভাবে সুতার সঙ্গে আট্‌কাইয়া ভাসিতে থাকে। পরে ছাঁক্‌নি-জালের সাহায্যে ইহাদিগকে তুলিয়া লওয়া হয়।

[এই প্রবন্ধের ছবিগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]
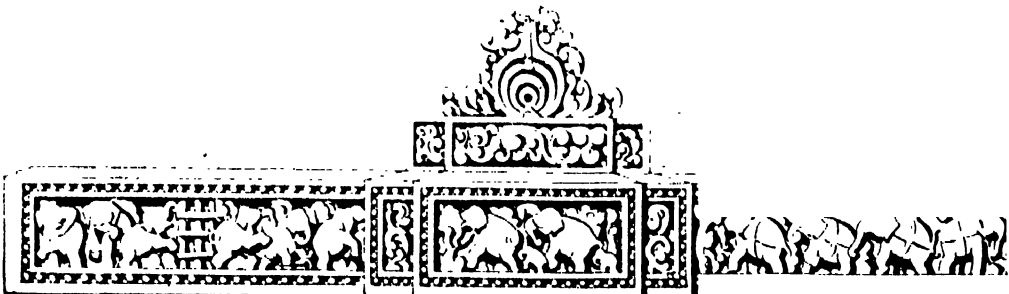
মাউন্ট কারমেল হইতে প্যালেষ্টাইনের সংঘাত-কেন্দ্র হাইফা

প্যালেষ্টাইনে হেরফের

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

টেল-আভিভ
৮ই জুলাই, ১৯৩৭

হোটেলের বাতায়ন থেকে দেখছি নীল ভূমধ্যসাগরের নৃত্য। প্রলয়-নাচের উঠোন বানিয়েছে বহু লুপ্ত সভ্যতার নিমগ্ন ইতিবৃত্ত। বালুতট, জল, আর জলন্ত আকাশ। নূতন প্যালেষ্টাইনের পালা সুরু হ'ল এই রঙ্গমঞ্চে। অনাদ্যন্ত কালের প্রান্তে কা'রা এসে তীরে রঙীন ছাতা খুলে টেবিল সাজিয়ে বসেছে, দলে দলে ঝাঁপ দিচ্ছে স্বচ্ছ ঢেউয়ে, বেলুন উড়িয়ে কলহাস্যে ছেলেমেয়েরা ছুটেছে, বালিতে খেলা জমিয়েছে। আইসক্রীম, খবরের কাগজ বিক্রি হচ্ছে। তটের ধারে ধারে নিতান্ত আধুনিক বাড়ীঘর, পরিচ্ছন্ন পথঘাট। মরুর তর্জ্জনী উপেক্ষা ক'রে ইহুদীরা নূতন ইতিহাসের ধারা বইয়েছে।

আরবদের দেশ এটা বহু শতাব্দীর অধিকারে। মরুভূমির সঙ্গে লড়াইয়ের বিদ্যে তারা খুঁজেছিল কঠিন দেহের চেষ্টায়, প্রকৃতির সঙ্গে রফা করেছে মরুচারী উগ্রতায়; উটে চড়ে, তাঁবু গেড়ে, কোথাও বা ওয়েসিসের বুকে গ্রাম ফেঁদে কখনো বা ছোট শহর বানিয়ে মস্‌জিদ গেঁথে মানবের রাজস্বত্ব ঘোষণা করেছে। প্যালেষ্টাইনে অধিবাসী আরব কোনো দিনই বেশী এগোয় নি: জনহীন মাটি ছিল প'ড়ে বাইবেলের সময় হ'তে; অদ্যাবধি তার প্রান্তে এরা আঁচড় কেটেছে মাত্র। তাদের হাতিয়ার পুরাতন, আধুনিক যুগেও মন মধ্যযুগের পাকে পাকে জড়ানো। নূতন জ্ঞানের চেষ্টা নেই। তাম্রবর্ণ পাহাড়গুলো মুষ্টি তুলে রয়েছে রুক্ষ আকাশে, বালিধুলোর মধ্যে জন্তুর কঙ্কাল মানুষের খুলি বিক্ষিপ্ত; বারে বারে হার মেনে মানুষ-দস্যু প্রকৃতি-দস্যুর কাছে অকালমৃত্যুর নৈবেদ্য দিয়েছে। লোকালয়ে মাইল জুড়ে অস্বাস্থ্য-আবর্জ্জনার তীব্র বিজ্ঞাপন, দান্তের নরকের যোগ্য বাজার। চক্ষুরোগে অন্ধপ্রায় ছেলেমেয়ের ভিড় সর্ব্বত্র,

ডেড সী

বেথানি

নাজারেথ, কুমারীর কূপ (The Virgin's Fountain)

বন্দীর অধম দশায় মেয়েদের রেখেছে অবজ্ঞায় অপমানে। এফেন্‌ডির দল গরিব চাষী ফেলাহিনকে নিষ্পেষণ ক'রে বিলাস করছে ; সাম্প্রদায়িকতা চড়েছে ধর্ম্মের ঘাড়ে। আরব-সভ্যতার বড় ঢেউ প্যালেষ্টাইনে পৌঁছয় নি, ভিতরের দু-চারটে শহরে ধর্ম্মের কেন্দ্র রচনা হয়েছিল প্রাচীন মসজিদকে আশ্রয় ক'রে—তার নীল গম্বুজ মিনারেট সুন্দর হয়ে জেগে আছে উর্দ্ধজয়ী চৈতন্যের পরিচয়ে। প্রকৃতিরই উদ্ধত মরুকেতন উড়ছে সর্ব্বত্র, মানুষের সমাজ পরিব্যাপ্ত নয়। বহু প্যালেষ্টাইনকে গ্রাস করতে পারে এমন ভূমি আরবদের হাতে, তা নিয়ে কিছু করতে পারে নি। ট্রান্স-জর্ডানিয়া থেকে য়েমেন পর্য্যন্ত আরব-সভ্যতার নূতন উদ্যমের অপেক্ষা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন প্যালেষ্টাইনের পরিত্যক্ত নিষ্প্রাণ মাটির খণ্ডে সোনা ফলিয়েছে ইহুদীরা কিসের জোরে ? এর পিছনে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বড় জিনিষ আছে। তাদের ধ্যানের জিয়নকে (Zionকে) তারা আপন করতে চায় মাটির প্রতি কণায় প্রাণ ঢেলে, বুদ্ধির কঠোরতম বীর্য্যে, অধ্যবসায়ে। মরু জয় করতে পারল, কেননা মরীয়া হয়ে এসেছিল নির্যাতিত বহু যুগের সঞ্চিত বেদনা নিয়ে, আধুনিক কালের নাৎসী অত্যাচার জ্বালিয়ে তুলল তাদের পূর্ণ মানুষকে। ইহুদী সভ্যতার আদিভূমিতে নূতন ক'রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারত না একাগ্র চৈতন্যের সঙ্গে, যদি না থাকৃত টেক্‌নীকের জোর। কথাটা ভেবে দেখবার। এরাই তো ছিল ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টের যুগে দেশের অধিপতি, দেশছাড়া হয়েছিল শুধু কি রাষ্ট্রিক চক্রান্তের ফলে ? এসেছিল তাদের সভ্যতার যুগসন্ধ্যা, প্রদীপ এল নিবে, হারাল আত্মিক ঐক্য, সমাজের ভেদ হ'ল শতধা, নিজের দেশেই এল পরবাসীর দশা ঘনিয়ে। চৈতন্যের এই হ্রাসের তত্ত্ব জানি নে, স্বীকার করব পর-জাতির আক্রমণ এবং প্রকৃতির অভিশাপ দুটোকেই মনে হয় নিমিত্ত কারণ, যে-পরাজয় আগেই ঘটেছে সে-ই আসে দুর্গতিকে বাহন ক'রে। বড় সভ্যতা যখন টেক্‌নীকের শক্তি হারায়, প্রাণের উৎসাহ পায় না তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখবে সাধ্য কার ? ইহুদীরা পারল না, যেমন পারে নি ধুলোয় হারিয়ে-যাওয়া আরও কত প্রাচীন সভ্যতা। অদ্ভুত ঘটনা এই যে ঘরছাড়া ইহুদীরা আবার দু-হাজার বছর পরে প্যালেষ্টাইনে ফিরছে, এমনতর প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী ইতিহাসে ঘটে নি। কিন্তু

প্রাচীন ইহুদী শহর সাফাদ ; মধ্যযুগে কাবালিষ্টরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

টিবে সর দৃশ্য

গলিলি

জরু মর দৃশ্য

ডামাস্কস-গেট, জরু লম

রথ

বেথলেহেম
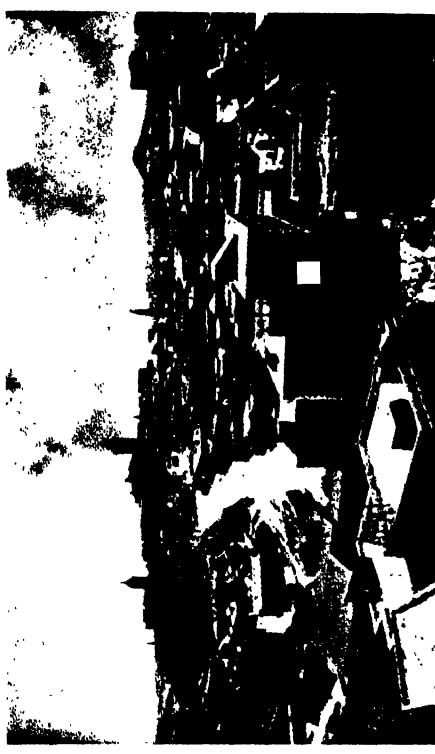
রিকে   প্রলোভন-পর্ব্বত (Mount   Temptation

ওলিভ-পর্ব্বত ও জেক   লেমের দৃশ্য

কোন্ ইহুদী এরা? এশিয়াটিক জাতি তারা ইতিমধ্যে শতাব্দী ধ'রে য়ুরোপীয় জ্ঞানের ধারাকে মজ্জায় মজ্জায় গ্রহণ করেছে। রাশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড আমেরিকায় শিল্প-বিজ্ঞানের চরমে পৌঁছেছে, আধুনিক সভ্যতার সব কল এদের আয়ত্তে। সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপের ধ্বংসমত্ত পায়োনিয়র এরা নয়, কলোনিয়ল সভ্যতা বিস্তারের জন্যে বোমাবারুদ-সংযোগে ধর্ম্মযুদ্ধে পরদেশ জয় করবার ব্রত ছিল না এদের অভিযানের মূলে। আপন সভ্যতার আদিক্ষেত্রে এরা স্থান ফিরে চায় এবং ফেরবার যোগ্য শক্তি রাখে। টেক্‌নীক্ এবং চৈতন্যশক্তির মিল ঘটেছে এদের ঐক্যবোধদৃপ্ত সমগ্র ইহুদী সত্তায়।

তবে কি বলতে চাই দেশ তারই, যার আছে টেক্‌নীকের জোর? আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, দু-হাজার বছর আগে কোন্ দেশ কার ছিল তাই নিয়ে আজকের দিনে কি ভাগ-বাঁটোয়ারা চলতে পারে? এই কি নীতি? দুয়ের কোনটাকেই খণ্ডভাবে মানছি নে। টেক্‌নীকের দোহাই দিয়ে ফাসিষ্ট্-দস্যুরা দেশ লুঠ করেছে; প্রলয় নামবে যদি প্রাচীন সভ্যতার লুপ্ত কবরের দাবী জানিয়ে টানাটানি চলে পৃথিবী জুড়ে। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীর দাবীর সঙ্গতি ঘটেছে কেননা মূলে আছে মানব-সত্যের প্রেরণা, শত বাধা হত্যা অপমান সত্ত্বেও বিশিষ্ট কোন সভ্যতার বিকাশ-চেষ্টা আত্মরক্ষার এই পরিচয়কে শ্রদ্ধা করতে হয়। যদি জানতাম ভারতবর্ষে দু-হাজার বছর আগে ইংরেজেরই সভ্যতার ছিল আদিস্থান, আসত যদি ইংরেজ দেশহারার দল কঠোর যন্ত্রণার শিক্ষা নিয়ে, ত্যাগ নিয়ে, এবং দাবী জানাত সনাতন ধর্ম্মের তীর্থমৃত্তিকার কোণে আপন জাতীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে তোলবার শেষ চেষ্টায়, তাহ'লে ভারতভূমিতে ইংরেজেরও যথার্থ অধিকার আছে মেনে নিতাম। প্রলুব্ধ রাষ্ট্রশক্তির রণতরী বায়ুযান অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত যখন অন্যের দেশকে গ্রাস করতে বসে তখন নীতির কোন দাবীই টেকে না। ভাগ্যক্রমে ইহুদীর সে-শক্তি নেই; অর্থশক্তিও ক্যাপিটালিষ্টের দানে নয়, বহু লক্ষ অসহায় নিপীড়িত জু-দের কানাকড়ি সংগ্রহ ক'রেই এরা জমি কেনবার, কল বানাবার পথ পেয়েছে। এখানেও ত্যাগের শক্তিই প্রধান, প্রবলের ক্ষুধা ছিল না ইহুদীর প্যালেষ্টাইনে ফেরবার ইচ্ছায়। সেই ক্ষুধা যদি জাগবার উপক্রম দেখি জানব তাদের মরণদশা এল ব'লে।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদীর ন্যায্য দাবী আছে। এই দাবীর সীমাও সুস্পষ্ট। দেশে আরবদের অধিকার কিছুমাত্র কম ব'লে মানব না। এই একটা দেশ যেখানে অনতিবিলম্বে সোশালিষ্ট-রাষ্ট্র না গড়লে দুঃখের অন্ত থাকবে না। নূতন সভ্যতা কেবলমাত্র ইহুদী বা আরবীয় হবার উপায় নেই, তাকে প্যালেষ্টিনীয় বিশেষ একটি সাম্যরূপ নিতেই হবে। যে-পক্ষ এদিক দিয়ে দেশকে সামনে টানবে তারই শ্রেয়োবুদ্ধিকে বাহিরের জগৎ স্বীকার করতে বাধ্য। এ-কথাও জানা দরকার প্যালেষ্টাইনের নানান্ কেন্দ্রে খৃষ্টীয় প্রতিনিধিদের সমান অধিকার, এমন কি জু-আরবদের চেয়ে বেশী। আরবদের কথা শুনলে মনে হয়, ওখানে আছে কেবল মসজিদ, পীর-স্থান; জায়নিষ্টদের (Zionist) ম্যাপেও খৃষ্টীয় তীর্থের প্রসঙ্গ পড়েছে চাপা। চিরন্তন মানবের সাধনা যে-সব পাহাড়ে, শহরে, হ্রদের ধারে স্মৃতিবাঁধা হয়ে আছে তাকে অন্য ধর্ম্মের অবজ্ঞা-আক্রমণ হ'তে বাঁচিয়ে রাখা উচিত এ-কথা মানবার জন্যে খৃষ্টান হওয়ার দরকার করে না। বিশুদ্ধ হিন্দুরই জানার কথা বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরাঙ্গনে পশুবলি দেওয়াটা কত বড় বর্ব্বর অধার্ম্মিক ব্যাপার। দিন-কাল মন্দ পড়েছে। আধুনিক অতিবুদ্ধির কাছে কিসের দোহাই দেব? ইহুদীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে বোঝানো চলে; খৃষ্টীয় এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের অধিকার তারা অমর্য্যাদা করবে না রক্ষা-নিষ্পত্তির কালে, কিন্তু তাদের হাতেও কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না। আরবদের মমতা কম, ইহুদীর বিলাপ-প্রাচীরে (Wailing Wall-এ) নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতেও ওদের বাধল না—দু-বছর আগেকার কথা। অতএব দেখা যাচ্ছে ত্রিধর্ম্মের উদ্ভবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই প্যালেষ্টাইনে আরব ইহুদী এবং খৃষ্টান য়ুরোপের সম্মিলিত চেষ্টায় কোন রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধি প্রচলিত হ'লে তবেই রক্ষা। যথার্থ লীগ-অব-নেশন্‌স্ যদি কোথাও থাকত তাহ'লে ইউরোপের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ইংরেজের আস্ফালন চলত না—সাম্যশাসনের ভিত্তি গড়াও সহজ হ'ত। এখন যা দেখছি তাতে ইহুদী-নেতাকেই যত দূর সম্ভব ঠিক পথে চলতে এবং চালাতে হবে।

প্যালেষ্টাইনের কর্ত্তৃপক্ষের মর্জ্জি অনুসারে তারা ইম্পীরিয়াল নীতির অনুসরণ করবে সে-ভয় নেই—ঠেকে শিখেছে তারা। য়ুরোপীয় বুদ্ধির মারপ্যাঁচে তারা অভ্যস্ত। তার পর হচ্ছে আরবের চেয়ে দেশে জ্যুদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রসঙ্গ। এ-কথা মনে রাখতে হবে, সমস্ত প্যালেষ্টাইন ট্রান্সজর্ডানিয়ার ভূখণ্ড করায়ত্ত হ'লেও ইহুদীর সমস্যা ঘুচত না—সমস্ত ইহুদী জাতিকে যদি ঘর বাঁধতে হয় তাহলে দেশ চাই অন্যত্র এবং অনেক বেশী। ট্রপিক্যাল প্যালেষ্টাইন বা মধ্য-এশিয়ায় বাস করাও অধিকাংশ ইহুদীর পক্ষেই অসাধ্য। আসবেও না তারা, যাই বলুক জায়োনিজম্। নাৎসী অত্যাচারের ফলে অনেকে ভেসে আসছে, তবু এরই মধ্যে ভাঙন ধরেছে, প্যালেষ্টাইন ছেড়ে গেছে এমন পরিবারের বার্ত্তা গোপন থাকে নি। ঐ দেশে চিরদিন থাকা বা জায়োনিজম গ্রহণ করা মোটেই সবার অভিপ্রেত নয়। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরাজ্য (Jewish State) স্থাপন করার অর্থ যাকে বলে "সিম্বলিক্ অকুপেশন্"—স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতীক হিসাবেই ওরা সলোমন-মোজেসের দেশে নূতন ক'রে আত্ম-পরিচয় দেবে। জাতীয় গৌরব প্রচার করতে চায় শুধু অভিমান আস্ফালন সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার ক'রে নয়, উজ্জ্বল মনের স্বতঃ-উৎসারিত সৃষ্টিকাজে। তাদের আঙুরের ক্ষেত চোখ জুড়োয় মরুর বুকে স্বপ্নের সবুজ ছুলিয়ে, ডোবা-জঙ্গলে সনাতন ভিটে ছিল মশামাছি-ম্যালেরিয়ার, কল্যাণের মন্দির জাগল শিক্ষায়তনে, মানুষের যোগ্য বিধিব্যবস্থায়। ইংরেজরা উচ্চ হ'তে অবজ্ঞাকৌতুকে চেয়ে দেখেছিল; আরবেরা ভেবেছিল য়ুরোপ থেকে এসেছে বাছাই-করা উন্মাদের দল, আগুনের দামে তারা কাফেরকে জিন্-সয়তানের জলাজমি মরুভূমি বেচে দিয়েছে। আলাদিনের কাণ্ড ঘটল; ভূষণ্ডীর মাঠে জাগল ইহলোকের সৌধ।...

দেখাদেখি সংস্কার-ভাঙা আরব-পল্লীতেও জাগুক কমলালেবুর বাগানে-ঘেরা আরোগ্যভবন, শিশুশিক্ষালয়, ছেলেমেয়ের একত্রশিক্ষা, আনন্দ-আয়োজনের বিচিত্র অনুষ্ঠান। টেল-আভিভের মেয়র রোকাক্ এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী নেমিভির সঙ্গে কথা হয়েছিল; শ্রমিকনেতা লকার দু-চার জনকে ডেকেছিলেন আলোচনার ঘরে—আরব জনসাধারণের মঙ্গল-চেষ্টায় এঁরা অনুপ্রাণিত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইহুদী-সভ্যতার আত্মরক্ষার জন্যেই প্যালেষ্টাইনে তাঁরা আরবের সাহচর্য্য পেতে উৎসুক হয়ে আছেন।

জেরুজালেম, ১৫ই জুলাই

মোটরে ঘুরছি। এখনও ইহুদী-আরব দাঙ্গাহাঙ্গামার জের মেটে নি, কিন্তু ভয় নেই ডাক্তার অল্‌সভাঙ্গারের মনে। যে-সব স্থানে ইহুদীর পক্ষে যাওয়া বিপদ্জনক আমার সঙ্গে চলেছেন পথ দেখিয়ে। দরাজ এঁর প্রাণ, সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র নেই। ভারতবর্ষের প্রতি এঁর গভীর শ্রদ্ধা। সম্প্রতি আমাদের দেশে ভ্রমণকালে কংগ্রেসের কাজ দেখে আগামী ভারতের সন্ধান পেয়েছেন; শ্রীনিকেতনে পল্লীসংস্কারের ব্যবস্থা তাঁর মনকে খুব নাড়া দিয়েছে; রামানন্দবাবুর সঙ্গে কলকাতায় তাঁর কথা হয়েছিল, কত ভাবে সাহায্য পেয়েছেন বারম্বার বলছিলেন। বাংলার এবং পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ওঁকে বিশেষ ভাবিয়েছে, প্যালেষ্টাইনে ব'সে এই নিয়ে আমাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নি। এখানেও অসাম্যের মূলে আছে অক্ষমের লোভ এবং ধর্ম্মের নামে অনৌদার্য্য। আছে রাষ্ট্রিক অভিসন্ধির গুপ্ত প্রবর্ত্তনা। যেদিন আমরা লীড্ডা, রাম্‌লে, বেন্-সেমেন, নাথানিয়া, তুল্‌কারম্, ত্রেনার উপনিবেশ ঘুরে দেখছি তার একদিন পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন-কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে, সমস্ত দেশ উত্তেজনায় টন্‌টনে হয়ে উঠেছে। মসজিদ-সীনাগগের অভ্যন্তরে ধর্ম্মের হাওয়া ভারাক্রান্ত, বাহিরের পথে ব্রিটিশ টমির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্যণীয়। চায়ের কাফে, মোটরের আড্ডায় ঝুলছে পার্টিশনের রক্তরেখাঙ্কিত ম্যাপ। নিরালা আরব-পল্লীতে গিয়ে দেখি, বাড়ীর চাতালে গাছের ছায়ায় আরব-নেতা বসেছেন স্থানীয় মণ্ডলীকে নিয়ে। বিদ্যালয়, কারখানা, শ্রমিক কেন্দ্রে কারও মুখ প্রসন্ন নয়।

ইহুদী-আরবের ভেদ কঠিনতর রূপ নিচ্ছে। নিতে বাধ্য। বিষয়বুদ্ধিকে জ্বালিয়ে তুলে স্থায়ী স্বার্থের বিচার আশা করা যায় না। ছুরির আঘাতে দেশ ভাগ ক'রে কমিশন কাকে খুশী করবে?—সম্পত্তির লোভ ষোল আনা বেড়ে উঠেছে উভয় পক্ষে। কর্ত্তৃপক্ষ ষ্ট্রাটীজিক্ (strategic) সুবিধার অঙ্ক কষছেন, তাঁদের ক্ষতি নেই। ইম্পীরিয়াল মন্ত্রণাকক্ষের

বাহিরে এসে তাঁরা নিষ্কাম তত্ত্বের প্রচার করছেন মুগ্ধ জনতার কাছে। সঙ্গে রেখেছেন বেয়নেট্-ধারী শান্তিমন্ত্রের সেনানী। স্বস্তির কথা এই যে, ইহুদী-সমাজের মধ্যে দূরদর্শী নেতার অভাব নেই, ভাগের অংশ বাড়ানোর চেয়ে Jewish Home-এর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-রচনার দিকে তাঁদের উৎসাহ। এ জন্যে দেশের জনসাধারণের দাক্ষিণ্য না হ'লে চলবে না। ইহুদী রিভিসনিষ্টদের আক্রোশ জায়োনিষ্ট দলেরই উপর কেন না জুডাইজম্‌কে এঁরা লড়াইয়ের লাঠি বানাতে রাজী নন। দুর্ভাগ্য আরবদের। উপযুক্ত নেতার অভাবে তারা দুর্ব্বলের হিংসাতন্ত্র গ্রহণ করেছে। উন্মত্ত ছোরার প্রধান লক্ষ্যস্থল জনবিরল ইহুদীপাড়া; সেখানে ছারখার ক'রে আসা সহজ, কারণ ইহুদীর প্রধান সম্বল তাদের ধৈর্য্যশক্তি। বহু পরিচর্য্যায় লালিত তাদের উপনিবেশের কোমল গাছগুলিকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে মরুপন্থীরা বীর্য্য দেখাচ্ছে। ওদিকে কভু ভয়, কভু অনুনয়দ্বারা তৃতীয় পক্ষের কৃপা বাঁধা পড়বে এমনতর দুরাশাও আছে মুফ্‌তির মনে। তৃতীয় পক্ষেরই সৃষ্টি এই প্রধান মুফ্‌তি, ছিলেন তাঁদেরই পোষ্য, আজ তাঁর অবস্থা সঙ্গীন। প্রবলের মন হারিয়েছেন। জ্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টামাত্র নেই—যদিচ তাদের সঙ্গে পঞ্চায়েতীর পথ রয়েছে খোলা। মারা পড়ছে গরিব আরব ফেলাহিন্; মোল্লা এফেন্‌ডির চাপে তারা দুর্দ্দশার প্রান্তে এসে ঠেকেছিল, এখন যে-মন্ত্রণা পাচ্ছে তাঁদের কাছ থেকে সে-ও যন্ত্রণার চরম অবসানের পথে। তৃতীয় পক্ষের এরোপ্লেন আকাশ থেকে যথারীতি এ-বিষয়ে সাহায্য করছে।

প্যালেষ্টাইন-কমিশনের রিপোর্টে কলাকৌশলের অভাব নেই কিন্তু তাদের একটা কথা ঠিক যে কমিশন আসার বহু পূর্ব্ব হতেই সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছিল। আজকের দিনে সমাধানের পথ দেখান সহজ নয়। ইংরেজের ম্যাণ্ডেট-রাজকে দোষ দিতে তাঁরা ত্রুটি করেন নি, কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতি এবং সমবায় অনুসারে সাম্যরাষ্ট্র-রচনার যে-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করলে যথার্থ সমাধানের পথ খোলে, সেটা তাঁদের মনস্তত্ত্বের অনুকূল নয়।

সাম্প্রদায়িক তাপবৃদ্ধির জন্যে ইংরেজের দায়িত্ব আছে; আধুনিক সভ্য-বুদ্ধির গর্ব্ব করেন যাঁরা দায়িত্ব তাঁদেরই বেশী। তৎসত্ত্বেও অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে তাঁরা যজ্ঞের আয়োজন ক'রে থাকেন। আজকের দিনে অন্য কথাটাও ভাববার দরকার আছে ঘৃত এবং বিদ্বেষের ইন্ধন জোগায় কোথা হ'তে? যে-মূঢ়ের দল ডালি সাজিয়ে পর-রাজের পায়ে এনে রাখে আহুতির উপকরণ, তাদের মুখে ধার্ম্মিক ইন্‌ডিগনেশনের বাক্য বক্র শোনায়। আরবদের শ্রদ্ধা করি ব'লেই ক্ষমা করতে চাই নে। কালের গহ্বর থেকে বার ক'রে অন্ধ সংস্কারগুলোকে নিয়ে আস্ফালন করবার এই কি সময়? এরই নাম জাতীয় পুনরুজ্জীবন?

স্বীকার করি, পৃথিবী জুড়ে আজ জাতিপূজার আয়োজন চলেছে—কেউ আমরা এই বিষ এড়াতে পারি নি। এর মূলতত্ত্বটা ভেবে দেখবার। ইংরেজকে দায়িক ক'রে বিশ্বের অন্যায়ের হেতু সন্ধান করাটা অবজ্ঞেয়। দেশে দেশে সচেতনতার হাওয়া উঠেছে। যে-সব এলোমেলো অর্দ্ধচেতন সম্মিশ্রক্রতার প্রবৃত্তিচালিত ওঠা-নামার পালা এতদিন ধরে চলেছিল, তাকে ভাল মন্দ আখ্যা দিতে চাই নে; কথাটা এই যে তার দিন গেছে। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক মিলন-বিরোধ, ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা-মৈত্রী যাই বল, সজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হচ্ছে। জ্ঞানের বিচারের মধ্য দিয়েই সমস্যার উত্তর চাই। প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত মেলামেশার একান্নবর্ত্তী সংসার আজ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী মনের যুগে টিক্‌ল না, উৎকর্ষের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে প্রত্যেক জাতি নূতন মানব-সন্ধির যুগে আত্মপরিচয় দিতে চায়। স্বচৈতন্যের উন্মেষকালে ভেদই উগ্র হয়ে দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক, ভয় করলে চলবে না। ইংরেজরা মানব-ইতিহাসে তাদের সর্ব্বগ্রাসী লোভের ফলে পৃথিবী জুড়ে চেতনার সংগ্রাম জাগিয়েছে। আধুনিক পর্ব্বে এই কি ছিল তাদের সার্থকতা? দুপুরে ডাকাতি ক'রে তারা বিদেশের ভদ্র-পরিবারে ঘুম ভাঙিয়েছে, সনাতন দিবানিদ্রা হ'তে জেগে মেজ ভাই সেজ ভাই ছুটেছেন পৈতৃক লাঠির সন্ধানে। গৃহবিবাদের পালাটা বড় আকারে দেখা দিয়েছে, ঘরের লোকে যদি বা, মিল্‌ল, পাড়াপ্রতিবেশী গ্রামের সম্মিলিত স্বার্থের কথা তুলে অভাব-অভিযোগের ফর্দ্দ বানিয়ে দল বাঁধছে। খাল কেটে কুমীর আন্‌বার কাহিনী ইতিহাসে

বারম্বার লেখা হ'ল। ডাকাতের সর্দ্দারকে না-ডেকে এবারে নিজেদের মধ্যেই আরব-ইহুদী মিলতে পারলে রক্ষা পাবে। সেমিটিক জাতির একই ছাঁচে গড়া জু-আরবদের ইতিহাস, কতকালের এই মাটিতে মিলেছে তাদের শিকড় সভ্যতার জটিল গ্রন্থিবাঁধা হয়ে। জেরুজালেমের আকাশরেখায় গির্জ্জে মসজিদ সীনাগগের চূড়া সারি বেঁধে ডাক দেয় দূরের অতিথিকে—অথচ লোকের মন কলহে শতছিন্ন হ'তে চলেছে। সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য অতিক্রম ক'রে স্বাতন্ত্র্য এবং সজ্ঞান মৈত্রীব্যবস্থা যদি খোঁজে ইহুদী-আরব, পরজাতির সাধ্য কি তাদের ভিন্ন করবে? আমাদের হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধেও এই কথাই বলতে হবে। কিন্তু শুভবুদ্ধি জাগাবে কে? প্যালেষ্টাইনে আরবেরা ঔদার্য্য দেখাতে পারত; কেননা তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, চতুর্দ্দিকে তাদেরই স্বধর্ম্মী রাজ্য, প্রতিবেশী সীরিয়াও স্বাধীন হ'তে চলেছে। ইহুদীরা বিরাট মুসলমান-সমাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র। অথচ নিরস্ত্র এবং সংখ্যায় অল্প হয়েও তারাই মৈত্রীর চেষ্টা দেখিয়েছে। তার প্রধান কারণ প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা বহুলভাবে কম্যুনিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আরব ঝুঁকেছে ফাসিষ্টতন্ত্রের দিকে, এক ডাকাতের জায়গায় অন্যকে ডেকে ভাবছে বিপ্লব হ'তে রক্ষা পাবে। মোল্লা-এফেন্‌ডির লক্ষ্য যেমন ক'রে হোক্ নিজের স্বার্থসম্পত্তি রক্ষা করা, জনসাধারণের কথাটা কিছু নয়। গোপনে চলছে পদসেবা ভূমধ্যসাগরে লম্বিত বুট-জুতোটাকে। শেষ পর্য্যন্ত পিঠে যা পাবে, তাতে আরবের মান বাড়বে ব'লে মনে হয় না। আজ নয় তো কাল। লীবিয়ার মুসলমান-প্রেমিকের উদ্যত মুষল যাদের মুক্তির প্রতীক, তাদের কে বাঁচাবে জানি না।

নাব্‌লুস্, জেনিন, রামাল্লা প্রভৃতি বিশিষ্ট আরব্য আখড়ায় গিয়েছিলাম, জেরুজালেম হাইফার আরব শিক্ষার্থী শিক্ষক সমাজনেতার সঙ্গে কথা চল্‌ছে। স্বীকার করতে হচ্ছে এঁদের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধির সূক্ষ্মতা এবং সাম্যবোধের অভাব যেমনটা দেখেছি, তা আমার অভিজ্ঞতায় বিরল। নেতাদের ধর্ম্মান্ধতাবশত বেদুয়িন ফেলাহিন সাম্প্রদায়িক বিষ মাখাচ্ছে রুটির সঙ্গে, খাদ্যের চেয়ে নেশার পরিমাণ অধিক হওয়াতে শত্রুমিত্রনির্ব্বিচারে হনোবৃত্তি চালাচ্ছে, অবশেষে পড়ছে গিয়ে মেশিন-গানের মুখে। আজকের দিনে আরব-আন্দোলনের মর্ম্মে রয়েছে অভাব-নির্য্যাতনের চূড়ান্ত প্রেরণা। অথচ চোরাবালিতে হারাচ্ছে তাদের শক্তি। হায় রে, বুদ্ধির সঙ্গে না মিললে হৃদয়াবেগের মত শত্রু আর নেই। ভারতীয় আমি, ভুক্তভোগী; যেখানে দুর্ব্বলতা—কারণ তার যাই হোক্ না—যেখানে দুঃখ, স্বভাবতই সেই দিকে দরদ জাগতে বাধ্য, কিন্তু স্বদেশের অভিজ্ঞতা হ'তেই জানি, বাস্তববোধকে ঢিমে ক'রে দিয়ে অভিমান-আস্ফালনের মূল্য নেই। ইম্পীরিয়ালিজমকে পরাস্ত করবার অস্ত্র নেই সাম্প্রদায়িক দলনেতার হাতে। দেশের প্রতি মমত্ববোধ অজেয় আত্মশক্তি জাগায়, যখন মাটির টান মেলে গিয়ে সাম্যিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুশীলনে; মাঠের চাষী, শহরের কর্ম্মী জানে তারা জাতিধর্ম্মের ছাপ-মারা মজুর নয়, নূতন সমাজ গড়বার কর্তৃত্বে তাদের আহ্বান এসেছে। আরব শ্রমিক-নেতা দু-এক জনের চোখ খুলছে কিন্তু মুফ্‌তি-এফেন্‌ডির প্রিয়পাত্র তাঁরা নন।

ইহুদীরা আরব শ্রমিকদের সংঘরচনায় সাহায্য করছে, হাইফায় সম্প্রতি ধর্ম্মঘটের সময়ে ইহুদী-আরব কর্ম্মী এক-জোট হয়েছিল। এই দিক থেকেই মুক্তি আসবে। ইতিমধ্যে দেশীবিদেশী উপরওয়ালার কত মার তাদের কপালে আছে কে বলবে? ইহুদীর সাম্যচেতনার কথা বলছিলাম। মনে রাখতে হবে জায়োনিজম্ মাটির কাছে ফিরে নূতন সভ্যতা গড়বার আদর্শ পেয়েছিল রাশিয়ায় টলষ্টয়-ফার্ম্মের কাছ থেকে, তার পরে সোভিয়েটের আমলে শুধু আদর্শ নয়, কর্ম্ম-প্রণালীর অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু রাশিয়ান শিক্ষক কৃষিকর্ম্মী এসেছেন প্যালেষ্টাইনে। বেশীর ভাগ ইহুদী-উপনিবেশ দেখলাম তাঁদের হাতে। আইন হারদ্, ভাগানিয়া প্রভৃতি (১) কম্যুনাল্ সেট্‌লমেণ্টের ভিতরের ব্যবস্থায় সোভিয়েট কলেকটিভ্ ফার্ম্মের সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ নেই; (২) (২) কো-অপারেটিভ এবং (৩) ইণ্ডিভিডুয়াল্ ফার্ম্মিং-এর কেন্দ্রগুলিতেও সাম্যতন্ত্রের ব্যত্যয় ঘটে নি। এই তিন রকমের উপনিবেশের কোথাও জাতিধর্ম্ম সামাজিক স্তরের ভেদ নেই; বিদ্যালয়ে হাসপাতালে আরব প্রতিবেশীকে সমান ভাবে সেবা করবার চেষ্টাও সর্ব্বত্র। রাশিয়ায় আজ জায়োনিজ্‌ম্‌কে বলছে "কাউণ্টার-রিভলিউশনরি"—সেখানে তারা তাদের

মাইনরিটিকে স্বাধীন ক'রে দিয়ে মেলাবার বিরাট রাষ্ট্রব্যবস্থা ফেঁদেছে, আপন উৎকর্ষের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য ইহুদীর আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। ভাগ্যের ফেরে হিংসানীতিবর্জ্জিত হয়ে কম্যুনিজম এসে পৌঁছেছে প্যালেষ্টাইনের মাটিতে, সেখানে সাম্যনীতির পত্তন চল্ছে শত বাধা সত্ত্বেও। মনে হ'তে পারে, ধনিক ইহুদী যেকালে জায়োনিজমের পৃষ্ঠপোষক, কঠিন বাধা আস্‌বে তাদেরই দিক থেকে। যত দূর দেখ্‌ছি, ইহুদী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাদের। উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত; কেরেন্ হায়েসদ্—জ্যুইশ ন্যাশনাল ফাণ্ড—মূল কেন্দ্র তার জেরুজালেমে, সেখানেও কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে সমগ্র ইহুদী-সম্প্রদায়ের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির উপরে। এঁদের মধ্যে রাষ্ট্রবিভাগের নেতা চেরটক্-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাঁর কাছে তথ্য সংগ্রহ করবার সুবিধে। শ্রীনিকেতন হ'তে কালীমোহন বাবু এখানে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ভারতীয় পঞ্চায়েৎ-পদ্ধতির আলোচনা ক'রে এঁরা পল্লী-গণতন্ত্রের উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন শুনে আনন্দ হ'ল। ইহুদী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বিখ্যাত লেখক সমাজসংস্কারকের প্রাধান্য। তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়ীর দল পারবে কেন? যদি কোন দিন ইহুদী-উপনিবেশে ঠগীর ধর্ম্ম ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ ছড়িয়ে পড়ে, লোভের মত্ততা দেখা দেয়, তবে জানব নেতাদের সৃষ্টিকাজের সমূহ বিনাশের উপরেই তার কালো পতাকা উড়েছে। জার্ম্মেনীর কৃপায় ধনিক ইহুদীও আজ নাৎসি-ফাসিষ্ট-বৃত্তির পূজারী হবেন এমন সম্ভাবনা কম, শ্রমিক জনসেবকদলের কথা বলাই বাহুল্য।...

জেরুজালেম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে তামাটে পাহাড়ের ঢেউ চলেছে জেরিকো পর্য্যন্ত, পাক দিয়ে গেছে পথ, প্রান্তে ডেড্ সীর ইস্পাত-নীল জলরেখা। মাউণ্ট অলিভে গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে; প্রাঙ্গণ হ'তে আশ্চর্য্য এই দৃশ্য চোখে পড়ল। দূরে জর্ডান্ নদীর শীর্ণ ধারা, তটের কোলে সবুজের আভা, চৌকো মাটির বাড়ী দেখা যায়। ধরণীর রুক্ষ-সুন্দর রূপ আঁকা পড়ল তরুলতাবেষ্টিত শিক্ষায়তনের ধারে ধারে। মনে হ'ল, প্রকৃতির বাধা মানুষের ইচ্ছাকেই ডাক দিয়েছে, সৃষ্টিকাজে তার ছন্দ এসে মিলবে। অলঙ্ঘনীয় বাধা কি আসবে রাষ্ট্রশক্তির দ্বন্দ্ব হ'তে, হিংসার সংঘর্ষে? আবিসীনিয়ায় অস্থি-চর্ব্বণের পালা শেষ না হ'তেই নখীদন্তীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে স্পেনে, ভূমধ্য-সাগরের তটদেশে। সিংহরাজ সহসা প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবে শঙ্কিত হয়ে মাল্টা হ'তে সাইপ্রাস্, আকাবা হ'তে এডেন কয়োমাণ্ডাল পর্য্যন্ত যুদ্ধজাহাজ বায়ুযানের ঘাঁটি বাঁধছেন। প্যালেষ্টাইন পড়েছে মল্লদের চলাচলের পথে, এই তার দুর্ভাগ্য। অনেক কীর্ত্তি দেখেছে জেরুজালেম, আবার দেখবে। মনে হচ্ছে খণ্ডপ্রলয়ের অন্তে থেকে যাবে সেই সৃষ্টি যা আজকে স্থানে স্থানে মিলিয়েছে আরব-ইহুদীকে আঙুর-বাগানে, কমলা লেবুর চাষে, টিউব-ওয়েলের ধারে।

প্যালেষ্টাইনে ভ্রমণ সেরে গ্যালিলি হ্রদের ধার দিয়ে পৌঁছব লেবাননের পাহাড়ে, তার পরে ডামাস্কস্।

স্রোতের ফুল

শ্রীঅলোক রায়

শনিবার। আপিস হইতে একটু শীঘ্রই ফিরিয়াছি। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, তখনও শৈলজার স্নানাহার হয় নাই। কোলের উপর পঞ্জিকা খোলা। ডান হাতের একটা আঙুল অধরে চাপিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া তন্ময় হইয়া সে কি ভাবিতেছে। আমার ভারী জুতার শব্দও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই

প্রশ্ন করিলাম, "মহা ভাবনায় পড়েছ দেখছি। ছেলের বিয়ের দিন বুঝি আর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না?"

আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই চকিতে পঞ্জিকা বন্ধ করিয়া শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কহিলাম, "ছেলের বিয়ের ভাবনাটা কিছুক্ষণের জন্য বাক্সবন্দী ক'রে স্নান-খাওয়াটা সেরে নিলেই ত ভাল হ'ত।"

আমার রসিকতার উত্তরে একটা কথাও না কহিয়া ক্ষুদ্র একটি 'আসছি' বলিয়া বই-হাতে শৈলজা দ্রুতপদে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

খাটে বসিয়া আপিসের ধড়াচূড়া ত্যাগ করিতেছি, শৈলজা আসিয়া উপস্থিত। সম্মুখের আলনা হইতে কোঁচান ধুতিটা আনিয়া খাটের উপর রাখিতে রাখিতে শৈলজা কহিল, "আজ যে শনিবার, একদম ভুলে গেছি তা।"

কহিলাম, "হুঁ! যে রকম ভোলা মন হচ্ছে তোমার, কোন দিন হয়ত আমাকেই ভুলে যাবে, বাড়ীতে এলে ঢুকতে দেবার বদলে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।"

শৈলজা কিন্তু এবারেও হাসিল না। এইবার ভাল করিয়া তাহার পানে চাহিয়া বুঝিলাম;—বাহিরের আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র না থাকিলেও, গৃহিণীর অন্তরাকাশ মেঘশূন্য নহে।

প্রশ্ন করিলাম, "কোথা থেকে চিঠি এল আজ? খবর সব ভাল ত? একটু যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে তোমাকে?"

কথাটা ভাল করিয়া শেষ করিতে না দিয়াই শৈলজা কহিল, "না, না, চিন্তা আবার কি? চিন্তা আবার আমি কোথায় করতে গেলাম! তোমার যেমন কথা।"

কহিলাম, "সুসংবাদ! চিন্তা না করলেই মঙ্গল। তবে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, কারণ চিন্তা করবার ইচ্ছে থাকলে ত আর তোমার বিষয় খুঁজতে দেরি হয় না।"

নিঃশব্দে শৈলজা কাজ করিয়া চলিল। আমার পরিত্যক্ত পোষাক পুনরায় ভাঁজ করিয়া আলনায় উঠাইয়া রাখিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া বসিল।

কহিলাম, "বসলে যে! যাও, স্নান ক'রে নাও তাড়াতাড়ি।" শৈলজার কিন্তু স্নান করিতে যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং বেশ ভাল করিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা—পাজি দেখা, হাত দেখা, কোষ্ঠী দেখা কিছু বিশ্বেস কর না তুমি, না?"

প্রশ্নটা নূতন নহে। পূর্ব্বেও বহুবার এ-প্রশ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর লইয়া মতভেদও হইয়াছে প্রচুর।

আমার সহিত শৈলজার বিবাহ-ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল একটু আশ্চর্য্যরূপে। শৈলজার দুই বড় বোনের তখনও বিবাহ হয় নাই। পিতার অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নহে, কিন্তু কন্যার সংখ্যা পিতার আয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব শৈলজার বিবাহের কোন চেষ্টাই হয় নাই। এমন সময় তাহাদের এক প্রতিবেশীর কন্যাকে আমার ভাবী বধূরূপে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া আমার পিতৃদেব পথিমধ্যে ক্রীড়ারতা শৈলজাকে দেখিয়া, তাহাকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন। ফলে কয়েক দিনের মধ্যে অভাবনীয় রূপে আমার জীবন-নাট্যে প্রধান নায়িকার বেশে শৈলজার প্রবেশ। এই বিবাহ-আখ্যায়িকার, শৈলজার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক এবং আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটিয়াছিল বিবাহের ঠিক পূর্ব্বদিন। সেই দিন সহসা কোথা হইতে এক গণৎকার আসিয়া নাকি শৈলজার

হাত দেখিয়া বলিয়া গেল—অতি অল্প দিনের ভিতর তাহার বিবাহ অনিবার্য্য। কথাটা তখন সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও ভাগ্যচক্রে ভবিষ্যতে সেইটাই আমার বিপক্ষে শৈলজার প্রধান যুক্তি হইয়া দাঁড়াইল।

অতএব বিবাহের পর হইতেই আমার গৃহে গণৎকার মাত্রেরই সাদর অভ্যর্থনা সুরু হইয়াছে। একবার পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রা-বিনিময়ে এক আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞাত বৃক্ষমূল মাদুলীরূপে শৈলজার কণ্ঠভূষণ হইয়াছে; আর এক বার দশটি রৌপ্যমুদ্রা-বিনিময়ে একটি নীল কাচখণ্ড, মন্ত্রপূত নীলারূপে গৃহিণীর অঙ্গুলির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। নীলা-সংক্রান্ত ব্যাপারটি হইয়াছে কিছুদিন পূর্ব্বে। অঙ্গুরীটি যে সত্যই একটি কাচখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছু নহে—ইহা স্থানিদ্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হইবার পর হইতে শৈলজা স্বীকার করিয়াছে যে গণক-সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার আর আস্থা নাই। সুতরাং অনর্থক অর্থব্যয় হওয়াতে আমার অদৃষ্টের দুষ্টগ্রহগণ শান্ত হইয়াছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হইলেও, গৃহিণী শান্ত হইয়াছেন এই ভাবিয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম।

কিন্তু এক্ষণে সেই পুরাতন প্রশ্নের পুনরভ্যুত্থান হওয়াতে মনে মনে চমকিত হইলাম। বিছানাটায় বেশ আরাম করিয়া শুইয়া অবজ্ঞার স্বরে কহিলাম, "না"।

"কিন্তু অনেক সময় ত ঠিক হয়ে যায়, হাত দেখে ঠিক কথা ব'লে দিতে পারে, পাঁজিতে লেখা—" বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই সহসা সে কহিল, "হ্যাঁ গা, যোগেনবাবুকে দেখতে গিয়েছিলে নাকি তুমি?"

আগের দিন সাইকেল হইতে পড়িয়া যোগেনবাবু শয্যাশায়ী হইয়াছেন। যোগেনবাবু লোকটি অত্যন্ত ভীতু। সামান্য জ্বরকে টাইফয়েড, এবং সর্দ্দিজ্বরকে নিউমোনিয়াতে রূপান্তরিত করিতে তাঁহার বিশেষ বিলম্ব হয় না। এইবারও আঘাত বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু সে-কথা কে শোনে, নিজের অভিজ্ঞতায় যতগুলি রোগের নাম জানা আছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহারই কোন একটার আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া গৃহস্থ সকল লোককে তিনি অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন।

কহিলাম, "তুমি গিয়েছিলে নাকি?"

মুখখানাকে যথাসম্ভব করুণ করিয়া শৈলজা কহিল, "হ্যাঁ, দেখেও এলুম! আহা! কি কষ্টই না পাচ্ছেন ভদ্রলোক, রোগা বউটি ত কেঁদে কেঁদে অস্থির। পাশের বাড়ীর মুখুজ্যে-গিন্নী এসে বললেন, 'তোমরা সব আজকালকার মেয়ে, পুজো-আর্চ্চায় ত আর বিশ্বেস নেই। কেন, পাঁজিতেই ত লেখা রয়েছে, কুম্ভরাশির পতন-ভয়।' বউটি কেঁদে কেঁদে বললে, 'আহা কেন আমি আগে একটু সাবধান হলুম না, কেন আমি—'"

বাধা দিয়া কহিলাম, "সাবধান কি ক'রে হতেন শুনি? কর্ত্তাটিকে আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শৈলজা কহিল, "তোমার ঐরকম বাঁকা বাঁকা কথা। আঁচল-চাপা দিতে যাবেন কেন শুনি? ঐ যে মুখুজ্যে-গিন্নী বললেন পুজো-আর্চ্চা, শত হ'লেও বামুনের কথা ত…"

আমি সত্যই অবাক হইলাম, রাগও করিলাম। কহিলাম, "হ্যাঁ তা ঠিক! বামুনকে কয়েকটা টাকা ঘুষ দিলে পতনেও কিছু ব্রহ্মতেজ প্রকাশ পেত। সাইকেল থেকে না পড়ে অনায়াসে তাল কিংবা সুপুরিগাছ থেকে পড়তে পারতেন। একবার অর্থ-বিনিময়ে তুমি আমার ভিতরে কিছু ব্রহ্মতেজের সঞ্চার করেছিলে কিনা, তাই বলছি।"

শৈলজার মুখখানা এইবার ম্লান হইল। গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় এক গণৎকার আসিয়া শৈলজার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—আমার খুবই ভাল সময়, রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অটুট স্বাস্থ্য, তবে বর্ষার সময় সামান্য উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় ভুগিবার সম্ভাবনা। তবে এক বাটি ঘৃত, একটি নূতন কাপড় এবং কিছু প্রণামী কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী স্বস্ত্যয়ন করিলে ফললাভ অনিবার্য্য। সুতরাং একদিন শুভক্ষণে আমার সর্ব্বরোগকে চিরকালের ন্যায় অগ্নিতে আহুতি দিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণটি একটি বৃহৎ পুঁটুলি স্কন্ধে প্রস্থান করিলেন।

পরের সপ্তাহে আমার হইল টাইফয়েড।

অতএব সেই ব্রহ্মতেজের উক্তিতে শৈলজার মুখ ম্লান হইল, এবং অচিরে কথাবার্ত্তা সাঙ্গ করিয়া সে স্নানকক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পরের দিন রবিবার। আহারান্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছি। কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান না ভানিয়া পারে না। আমি আপিসের বাবু, সারা সপ্তাহ আপিসে কাটাইয়াও আপিসের মোহ ত্যাগ করিতে পারি না। অতএব আজ ছুটি পাইয়াও চোখ বুজিয়া পুনরায় সেই পুরাতন পথ ধরিয়া প্রায় আপিসের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছাইয়াছি, এমন সময় বাহিরের গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

গোলমালটা আগেই হইয়াছে, ঘুম ভাঙিল পরে। শুনিলাম, পাশের কক্ষ হইতে শৈলজা ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন "কতদিন তোমায় বারণ করেছি, বাবু ঘুমোলে চেঁচাবে না, একটু আস্তে ক'রেও কি কথা কইতে পার না তুমি? এক দিন মোটে ঘুমোতে পান তাও···"

ভৃত্য এইবার সত্যই মৃদুস্বরে কথা কহিল, অসংলগ্ন দুই-একটা কথা কেবল কানে গেল—"হামি ত বলছে,...উ না যাবে,···হামি কি ক'রবে···"

গৃহিণীর সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আর কিছু শুনিবার পূর্ব্বেই চোখ বুজিয়া পুনরায় সেই পরিত্যক্ত আপিসের পথে পা বাড়াইলাম।

মাঘ মাস শেষ হইয়া ফাল্গুন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিন হইতে যেন পুনরায় নূতন করিয়া শীতকাল আরম্ভ হইল, এমনি শীত পড়িয়াছে। দৈনিক পত্রিকার খেলার সংবাদগুলি পাঠ সাঙ্গ করিয়া মহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছি। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। কলির ভীম ব্র্যাডম্যান। সে-যুগের গদার পরিবর্ত্তে হস্তে তুলিয়াছেন এ-যুগের ক্রিকেটের ব্যাট। তাহাকে পরাজিত করা কি একটা মুখের কথা! কত হাজার মাইল দূরে সেই অষ্ট্রেলিয়ার খেলা চলিতেছে, কিন্তু সংবাদপত্রের এমনি মহিমা যে আসামের এক নগণ্য শহরে বাস করিয়াও আমি সেই অষ্ট্রেলিয়ার সহস্র দর্শকমণ্ডলীর ভিতর অনায়াসে নিজের স্থান করিয়া লইলাম।

অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে প্রথমে বিজয়ীদিগের এবং পরে সংবাদপত্রের মহিমার কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নানকক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি,—দৃষ্টি পড়িল আমার ভৃত্যটির প্রতি। রৌদ্রে বসিয়া শৈলজা বঁটি লইয়া তরকারি কুটিতেছে এবং নূতন ভৃত্যটি এতদিন পরে তাহার অভ্যস্ত উচ্চকণ্ঠে কথা না কহিয়া যথাসম্ভব ক্ষীণকণ্ঠে ভদ্রভাবে কি একটা সংবাদ দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি এত দূর হইতে কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তবে হাত এবং মুখের বিচিত্র ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, সে কাহারও আগমন-সংবাদ জানাইতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট বুঝা গেল আগমন যাহারই হউক সে-সংবাদ আমার অজ্ঞাত থাকাই যে কর্ত্রীর অভিপ্রায়, ভৃত্যটি তাহাও উপলব্ধি করিয়াছে।

ভৃত্যের কথার উত্তরে কি-একটা কথা কহিতে গিয়া শৈলজার দৃষ্টি আমার প্রতি পড়িল, এবং চকিতে তাহার মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন এই লুকাচুরির লজ্জাটাকে একটা সহজ সরল আবরণ দিয়া ঢাকিবার অভিপ্রায়ে একটু অনাবশ্যক তেজের সহিত কহিল, "এসেছে ত এসেছে, তাতে কি হ'ল। অমন ফিসফিস ক'রে বলবার কি আছে? ব'লে দাও এখন দেখাটেখা হবে না।"

আশ্বস্ত হইয়া ভৃত্য জোরে কথা কহিয়া বাঁচিল। কহিল, "হামি ত বললে, ঠাকুর বোলে আপেন কহিয়াছিলেন আসতে, পূজা উজা হোবে।"

এইবার শৈলজা অপরাধীর ভাবটা আর কিছুতেই নিজের মুখ হইতে মুছিয়া লইতে পারিল না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে আমার নিকট অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। শৈলজার নিকটে গিয়া একবার দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলাম, "শৈল! কি দিয়ে ভগবান তোমায় তৈরি করেছিলেন তাই ভাবছি। এই সেদিন এত ক'রে বারণ করলুম এই সব যার-তার কথায় বিশ্বাস ক'রে মনে অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি ক'রো না। কিছুতেই কি শুনবে না তুমি আমার কথা? এই সব বাজে লোকই তোমার আপন হ'ল আমার চাইতে।"

ভৃত্য চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ঠাকুর-বোললে এক টাকা হোলেই সোব করিয়া দিবে।"

কর্ম্মরত:

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কহিলাম, "যাও, এক টাকা দিয়ে আবার কিছু নতুন রোগ চাপাও আমার ঘাড়ে।"

শিহরিয়া শৈলজা চোখ বুজিল। তার পর দুই হাত একত্র করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া মনে মনে কি কহিল তা সে-ই জানে। ভৃত্যকে ডাকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "ব'লে দাও, মরে গেলেও আর যাব না আমি ঠাকুরের কাছে। ব'লে দাও, কিছু বিশ্বেস করি না আমি, কিছু না।"

পরের দিন। ঘরে বসিয়া আপিসের কাজ করিতে করিতে শৈলজাকে ডাকিয়া কহিলাম, "একবার পঞ্জিকাটা দাও ত।"

কক্ষান্তর হইতে শৈলজা কহিল, "পাঁজি আবার তোমার কি কাজে লাগবে গো? ওসব আবার বিশ্বেস কর নাকি তুমি?"

কহিলাম, "বিশ্বাস না করলেও কাজে লাগে অনেক সময়। চৈত্রের প্রথমে আমার সেই রেঙ্গুনের বন্ধুর আসবার কথা, সে ত ভাল দিন না-দেখে আসবে না।"

কিছুক্ষণ পরে শৈলজা আসিয়া কহিল, "পাঁজি ত পেলুম না। সেদিন পাশের বাড়ীতে নিয়েছিল, বোধ হয় আর ফিরিয়ে দেয় নি।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এমন সময় ভৃত্যের প্রবেশ। আমার স্নানের জল দিবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া, মনে করিয়া পাশের বাড়ী হইতে পঞ্জিকাটা আনিয়া রাখিতে বলিলাম। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ভৃত্য পঞ্জিকা-হস্তে উপস্থিত। কহিলাম, "এখনই দৌড়োদৌড়ি ক'রে কে আনতে বলেছিল তোকে, যেমন বুদ্ধি তোর।"

অতি বিনয়ের সহিত ভৃত্য জানাইল, এইমাত্র মাইজী তাঁহার বাক্সের আবরণের নীচে পাঁজি রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সে দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

কথাটা মনে লাগিল। নিজে রাখিয়া অস্বীকার করিল শৈলজা? কিন্তু কেন? পঞ্জিকা খুলিবামাত্র সমস্যার সমাধান হইল। খুলিতেই চোখে পড়িল, বিভিন্ন রাশির বিভিন্ন মাসের ফলাফল নির্ণয়ের পৃষ্ঠার এক স্থানে কালো কালি দিয়া মোটা করিয়া দাগ দেওয়া রহিয়াছে। আমার রাশির ভাগ্যে ফাল্গুন মাসে রহিয়াছে—"মৃত্যুভয়"। কেন সেইদিন মধ্যাহ্নে ভৃত্য পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছিল, এবং আজই বা কেন শৈলজা আমার সহিত এই মিথ্যা আচরণ করিল, চোখের সম্মুখে এই সমস্ত প্রশ্নের সহজতম উত্তরটা ভাসিয়া উঠিল।

বুঝিলাম, জন্ম হইতে যে-সংস্কারের ভিতর শৈলজা এই দীর্ঘ দিন কাটাইয়াছে, সে-সংস্কার শৈলজার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল কয়েক দিনের অনুরোধ কিংবা ভীতিপ্রদর্শন সাময়িক ফল দিতে পারে বটে, কিন্তু সেই সংস্কারের আমূল উৎপাটন অসম্ভব। মনে মনে কামনা করিলাম, এইখানেই যেন ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে, আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারে।

এ-বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, শুনিয়াছি তিনি বিশেষ রসিক পুরুষ। পরিহাস করিয়া তিনি চাঁদের মুখে কলঙ্ক আঁকিয়াছেন এবং গোলাপ-বৃন্তে কণ্টক রাখিয়াছেন। অতএব বসন্ত-ঋতুর সৌন্দর্য্যসম্ভারের সহিত বসন্ত-রোগের সংযোগ সাধন করিয়াও হয়ত তিনি আর একবার পরিহাস করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানুষ আমরা সে-রহস্য না বুঝিয়া হাসিবার পরিবর্ত্তে কাঁদিয়া মরি। দুই দিন পূর্ব্বে কয়লাওয়ালার ছেলেটার বসন্ত-রোগে মৃত্যু হইয়াছে। ছেলেটার মা আসিয়া শৈলজার পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল।

সুযোগ বুঝিয়া সর্ব্বাঙ্গে সিন্দূর লেপিয়া ভক্তবৃন্দের হাতে হাতে মা-শীতলা দ্বারে দ্বারে পয়সার বিনিময়ে সিন্দূর দান করিতেছেন। সেদিনও রবিবার; মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া সবে একটা ইংরেজী নভেলের পাতা উল্টাইয়াছি, এমন সময় দেখিলাম ভিখারীর আহ্বানে শৈলজা ভিক্ষা লইয়া আঙিনা পার হইয়া বাহির হইতে ভিতরে যাইবার দ্বারের দিকে চলিয়া গেল। মিনিট সাত-আট পরে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে শৈলজা আসিয়া উপস্থিত। দুই চোখে অপরিসীম ভয় এবং উদ্বেগ যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। অধীর কণ্ঠে ব্যগ্রভাবে সে আমাকে প্রশ্ন করিল, ভৃত্য কোথায় গিয়াছে আমি জানি কি না।

ঠিক এই সময়ে ভৃত্যের দর্শনলাভ ঘটিল। আমারই একটা কাজে সে একটু বাহিরে গিয়াছিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল।

গল্পটায় বিশেষ মন বসিয়াছিল। তাই আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। সেই দিন রাত্রে শুইতে আসিতে শৈলজার অনেক বিলম্ব হইল। আমিও অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলাম বলিয়া সহজে ঘুম আসিতেছিল না। শৈলজা শুইতে আসিলে কহিলাম, "বড় দেরি হ'ল না তোমার শুতে ?"

"হ্যাঁ কাজ ছিল" বলিয়া শৈলজা পাশ ফিরিয়া শুইল। সে ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া আমিও ঘুমের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় সহসা সে উঠিয়া বসিল। তাহার পর উত্তেজিত স্বরে আমার পানে ঝুঁকিয়া সে কহিল, "নাস্তিক হ'লেই কি আর শান্তি মেলে ? আমার মা-ঠাকুরমা যে এই সব বিশ্বেস করতেন, অশান্তি এনেছিলেন নাকি তাঁরা ? সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে দেখি দিব্যি হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে গেলেন। কই, আগের মত শান্তি দেখাও ত কোন্ পরিবারে আছে,—হ্যাঁ, দেখাও ত ?"

বিস্মিত হইলাম, কহিলাম, "দেখ, ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে রাত্রে যত গল্প শুনেছি, তার প্রথম ছিল এক রাজার দুই রাণী সুয়ো আর দুয়ো—আর শেষ ছিল রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। এই দুটো কথা না যোগ করলে আমি গল্প বুঝতে পারতুম না। সেই থেকে কেমন একটা বদ-অভ্যেস হয়ে গেছে শৈল; প্রথম আর শেষ না ব'লে দিলে কোন গল্পই আর বুঝতে পারি নে। কাজেই তুমি যদি রাজার দুই রাণী থেকে আরম্ভ করতে, তাহ'লে বুঝে উত্তর দিতে আর দেরি হ'ত না আমার।

শৈলজা কহিল, "ঐ তোমার কথা সুরু হ'ল। তোমার মত অমন ক'রে কথা বলতে পারি নে ব'লে তুমি সব সময় আমায় চুপ করিয়ে দাও। কিন্তু আজ আর আমি কোন কথা শুনছি নে। শুধু তুমি বল, আমি সত্যি বললুম না মিথ্যে বললুম।"

কহিলাম, "সেইটে বললে এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পার, তাই।"

অধীর কণ্ঠে শৈলজা কহিল, "না গো না। আমি যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না, তাও কি বোঝ না তুমি ?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইলাম। গভীর কণ্ঠে কহিলাম, "তুমিই ত কিছু বলতে চাও না আমায় শৈল। আমি ত জানি স্বামী-স্ত্রীর ভিতর কোন অন্তরাল থাকতে নেই। জগতে আমার চেয়ে আপন তোমার আর কে আছে বল ? সেই আমার কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে তুমি যদি নিজের মনে অশান্তির সৃষ্টি কর, তবে কি করতে পারি আমি, বল ?"

বুঝিলাম, অশ্রুতে শৈলজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, "তুমি যা বললে, তাই ঠিক। আমার মনে অনেক ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে, কিছুতেই তা থেকে মুক্ত হ'তে পাচ্ছি নে। তুমি পাঁজি বিশ্বেস কর না, কোষ্ঠী বিশ্বেস কর না, কিন্তু আমি না-ক'রে পারি নে। পাঁজিতে আর কোষ্ঠীতে তোমার কথা ভাল লেখে নি এবার। তা ছাড়া সেদিন ভিক্ষে নিয়ে যখন গেলুম, শীতলা-ঠাকুরকে হাতে নিয়ে ভিখারী বললে, 'মা, তোমার অমন সুন্দর কপালে সিঁদুর নেই কেন ?' কোন দিন স্নান ক'রে সিঁদুর পরতে ভুল হয় না আমার; কিন্তু সেদিন কপালে হাত দিয়ে দেখি, সত্যি সিঁদুর নেই। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলুম, কখন ভিক্ষে নিয়ে, সিঁদুর না দিয়েই ভিখারী চলে গেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। তার পর ছুটে গিয়ে চাকরটাকে পাঠিয়ে ব'লে দিলুম, যেমন ক'রেই হোক ভিখারীকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, ব'লে আয় আমি শীতলাঠাকুরের পুজো দেব।" বলিয়া শৈলজা চুপ করিল।

যে-বৃক্ষের মূলে শক্তি নাই, বাছিয়া বাছিয়া কাঠুরিয়া তাহারই উপর কুঠারাঘাত করে।

কহিলাম, "কিন্তু তোমার মা-ঠাকুমার কথা কি বলছিলে যেন।"

শৈলজা কহিল, "হ্যাঁ, সেই কথাই বলি। আমার ঠাকুমা স্বপ্নে পেয়েছিলেন চোতপূর্ণিমার ব্রতের আদেশ। এ-ব্রত যে করবে তার কামনা পূর্ণ হবে, তার বৈধব্য কখনও ঘটবে না। সারা জীবন ঠাকুমা এই ব্রত করেছিলেন, ফলও পেয়েছিলেন।"

পরে মিনতিপূর্ণ স্বরে শৈলজা কহিল, "আমায়ও তুমি সেই ব্রত করবার আদেশ দাও। তোমার কথা শুনে, তুমি যাতে বিরক্ত না হও, এই মনে ক'রে সব জিনিষই ত

ছেড়েছি আমি, কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে এই ব্রত করবার ভিক্ষে চাচ্ছি।"

কহিলাম, "ভিক্ষে চাইবার ত কোন প্রয়োজন নেই শৈল। তোমার শরীর কোন দিনই বিশেষ ভাল নয়, আমি দেখেছি এই সব উপোস অনিয়ম তোমার সহ্য হয় না, তাই ত বারণ করি।"

শৈলজা কহিল, "এ খুব সোজা ব্রত। চার দিন এক বেলা উপোস। সে আমি খুব সহ্য করতে পারব।"

তাহার চিন্তাক্লিষ্ট ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল—সে যেন একটি স্রোতের ফুল। বিভিন্ন স্রোতধারার সম্মুখে পড়িয়া কোন্ দিকে যাইবে ভাবিয়া পাইতেছে না। মনে মনে কহিলাম, তাহার সকল চিন্তা-ভাবনা, সকল সুখ-দুঃখ এবং সকল দুর্ব্বলতা লইয়া, সকল স্রোতধারাকে উপেক্ষা করিয়া, একবার পূর্ণবিশ্বাসে সে কি আমার পানে ছুটিয়া আসিতে পারে না।

মুখে কিছু কহিলাম না, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইলাম আমার আর কোন আপত্তি নাই।

জগতে জন্ম যেমন স্বাভাবিক, মৃত্যুও তেমনই নিশ্চিত। নশ্বর জীব মানুষের পক্ষে মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত বস্তু পৃথিবীতে আর কি থাকিতে পারে। কিন্তু এ-তত্ত্ব শৈলজাকে বুঝাইয়া লাভ নাই। মনে হয় যেন চোখের সম্মুখে মৃত্যুকে দেখিয়াও সে চোখ বুজিয়া অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। সেই যে বেহুলা লখীন্দরের প্রাণ কাড়িয়া আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীর সত্যবান বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইটাই তাহার কাছে বড় কথা। কিন্তু তাহার পর কত লখীন্দর বাসরশয্যায় চিরনিদ্রা গিয়াছে, কত সত্যবানকে বুকে করিয়া সাবিত্রী চোখের জলে ভাসিয়াছে, সে-কথা খুব ভাল করিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না শৈলজা।

ভোর হইতে সারাদিন অল্প অল্প বৃষ্টি চলিতেছে। সহসা যেন বসন্তে বর্ষার আবির্ভাব। বিষণ্ণ বাদল-সন্ধ্যা। মেঘের অন্তরালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কি যায় নাই, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। পাশের ঝোপটা হইতে ঝিঁঝিঁপোকার একঘেয়ে শব্দ, বারিপতনের শব্দের সহিত মিশিয়া একটা অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি করিয়াছে। মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের পানে চাহিয়া সহসা মনে হইল, এ যেন সেই ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিবার সন্ধ্যা, সেই অবাস্তবকে বাস্তব বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবার সন্ধ্যা। কবে কোন্ বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বৃক্ষশাখায় বসিয়া রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কহিয়াছিল, কোন্ পাতালপুরী হইতে রাজকন্যা গভীর রজনীতে সরোবরে স্নান করিতে উঠিয়াছিলেন, কোন্ ঘুমন্ত রাজপুরীর অন্তঃপুরিকার ঘুম ভাঙাইবার জন্য সোনার কাঠি রূপার কাঠির প্রয়োজন হইয়াছিল,—মনে হইল বোধ হয় এমনই সন্ধ্যায় সেই রহস্যময় রূপকথাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল।

তিন দিন হইতে শৈলজার উপবাস চলিতেছে। অনভ্যাসে কষ্ট যে তাহার খুবই হইতেছে, মুখ দেখিয়া তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভৃত্যকে কি-একটা আদেশ দিয়া সে আমার কক্ষে ঢুকিল।

কহিলাম, "কাজ শেষ হ'ল?"

"হ্যাঁ", বলিয়া শৈলজা নিকটে বসিল। একবার মনে মনে গুছাইয়া লইয়া কহিলাম, "একটা গল্প শুনবে?"

"বল"—বলিয়া শৈলজা তাহার শাড়ীর অঞ্চলটা বেশ করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া আঁটসাঁট হইয়া বসিল।

কহিলাম, "আমার সুন্দর-ঠাকুরদাকে তোমার মনে পড়ে?"

শৈলজা কহিল, "সম্পর্কে তিনি আমার শ্বশুর ছিলেন। মাথায় কাপড় ছাড়া কোন দিন ত যাই নি তাঁর কাছে। তবে ঠাকুমাকে মনে আছে বইকি। তাঁরই ত ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল! মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা—এদিকে সুস্থ সবল ঠাকুমার সেই যে ফিট হ'ল আর ভাঙল না। দু-দিন পরে ঠাকুরদার মৃত্যু হ'ল।"

কহিলাম, "তুমি জান দেখছি তাঁদের অনেক কথা। ঠাকুরদার চেহারাটা এখনও আমার চোখে ভাসে। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। কপালের রঙের সঙ্গে মাথার সাদা চুলের রং একেবারে মিশে গেছে এক হয়ে। দীর্ঘ দুই চোখে অনাবিল শান্তি। সমস্ত মুখে স্নেহস্নিগ্ধ হাসির রেখা। কি সাহস ছিল তাঁর। ভয় কাকে বলে জানতেন না। আর ঠাকুমা ছিলেন যেমন দুর্ব্বল, তেমনই ভীতু। কারও কোন

আঘাত পাওয়ার কথা শুনলে ভয়ে কাঠ হয়ে যেতেন, কোন মৃত্যুসংবাদ শুনলে জ্ঞান হারাতেন।

"একবার সেই ঠাকুরদার হ'ল কঠিন অসুখ। মস্ত জ্ঞানী এক জ্যোতিষীকে আনা হ'ল। ঘরে ঢুকে রুগ্ন ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এ ত দেবকুমার বাবু নয়, এ যে তার মৃতদেহ।' কোষ্ঠী দেখান হ'ল—খুব খারাপ সময়। ঠাকুমা গিয়েছিলেন মেয়ের বাড়ী। খবর দিয়ে আনান হ'ল। লালপাড় শাড়ী প'রে, কপালে একটা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ দিয়ে তিনি এলেন। সবাই বললে, 'ওরে অভাগী, জন্মের মত স্বামীর পানে চেয়ে নে।' ঠাকুমা কিন্তু এতটুকু ভয় পেলেন না। বললেন, 'ওঁর ত মৃত্যু হ'তে পারে না। উনি যে কথা দিয়েছিলেন—আমায় বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। জীবনে কখনও কোন মিথ্যে আচরণ যিনি করেন নি, তাঁর কথা কি মিথ্যে হ'তে পারে?' সত্যি ঠাকুরদা সেরে উঠলেন। সবাই বললে, 'ধন্যি সুন্দর-বউয়ের মনের বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের জোরেই ওর স্বামীকে ও যমের ঘর থেকে ফিরিয়ে এনেছে।' তার পর শোনা গেল, একবার ঠাকুরদা আর ঠাকুমা যখন হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, তখন এক দিন সেই হরিদ্বারে গঙ্গার জলের দিকে চেয়ে ঠাকুরদা বলেছিলেন—'এই যে গঙ্গার জল দেখছ সুন্দর-বউ, এরই মত পুণ্য স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা। সেই ভালবাসাকে স্পর্শ ক'রে আমি বললাম, তোমাকে আমি বৈধব্যযন্ত্রণা দেব না। তোমার মরণের সময় আমি নিজের হাতে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেব।' সেই কথা মনে গেঁথে রাখলেন ঠাকুমা চিরদিন। একদিনের জন্যেও এতটুকু সন্দেহ মনে ঢুকতে দিতেন না। বলতেন, তিনি সত্যি করেছেন, এ কি কখনও মিথ্যে হ'তে পারে? ভগবান আছেন না স্বর্গে?"

গল্প যখন শেষ হইল, বাহিরের বৃষ্টিপাত তখনও সমান ভাবে চলিয়াছে। সূর্য্য এইবার অস্ত গিয়াছে। বাহিরে বেশী দূর আর দৃষ্টি যায় না। আকাশের একটা দিক একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই তখনও, শৈলজার ডাকে চাহিয়া দেখি এই ভোরে সে স্নান করিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিছনে ছড়াইয়া, কপালে একটা সিঁদুরের টিপ আঁকিয়া আসিয়া সে আমার ঘুম ভাঙাইতেছে। বাহির পানে চাহিয়া দেখি, বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। পূবের আকাশে কালো মেঘের চূড়ায় একটুখানি রাঙা আলো। ধীরস্বরে শৈলজা কহিল, "একটু উঠে এস গো। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।"

নিদ্রার ঘোর কাটিয়া যাইতেই বুঝিলাম, কেন এ আহ্বান। তাহার সহিত ঠাকুরঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। চন্দন ধূপ এবং পুষ্পের স্নিগ্ধ গন্ধে কক্ষ সুগন্ধ। এক দিকে দেয়ালের গায়ে আলোছায়ার রহস্য সৃষ্টি করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলো প্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির কালো দুটি পায়ের উপর পড়িয়া মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া শৈলজা কহিল, "কাল সারারাত আমি সুন্দর-ঠাকুমাকে স্বপ্নে দেখেছি। এই ঠাকুরের কাছে তুমি আমায় ছুঁয়ে বল, আমায় যেন বৈধব্য সইতে না হয়।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সেই স্বল্প আলো এবং অন্ধকারে বসিয়া শৈলজাকে স্পর্শ করিয়া ঈষৎ জোরে তাহার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিলাম। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখিলাম তাহার দু-চোখ হইতে জল পড়িতেছে,—বুঝিলাম এ দুঃখের নয়, আনন্দের। মুখে যে-কথা কহিলাম সে-কথা শুনিল শৈলজা, কিন্তু মনে মনে কহিলাম "হে দেবতা! আমার এ মিথ্যা আচরণ তুমি ক্ষমা করিও। পঙ্কজের জন্মের জন্য পঙ্কের প্রয়োজন, শৈলজার জীবনে একটা অতিবড় সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমার এ মিথ্যার অবতারণা। তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রভু!"

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বার পর জাহাজ বোধ হয় সর্ব্বদাই ভারতবর্ষের গা ঘেঁসে ঘেঁসে চলে। কেবিনে এই পৌষ মাসেও বৈশাখ মাসের মত গরম বলে আমরা প্রায় বেশীর ভাগ সময়ই ডেকের খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলে বাঁচবার চেষ্টা করতাম। এক দিকে খোলা সমুদ্র দিক্‌চক্র-রেখায় গিয়ে মিশেছে, আর এক দিকে বরাবরই জমির রেখা আর নীচু নীচু পাহাড়ের সারি। জমির দিকে প্রায় সারাদিনই পাল-তোলা ছোট ছোট জাহাজ ও ছোট বড় নৌকা ভেসে চলেছে। ঘন সবুজ জলের বুকে আর আকাশের নীচে এই সাদা পাল-তোলা নৌকাগুলি ভারি সুন্দর দেখায়, যেন তারা জলেরই জীব আনন্দে জলে খেলে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড় বড় জাহাজ যখন এদের পাশ দিয়ে চলে যেত তখন মনে হত এই আকাশ ও জলের মেশামিশির মাঝখানে এমন কদাকার জিনিষগুলোর সৃষ্টি মানুষ না করলেই ছিল ভাল। কিন্তু ভেবে দেখলাম এই কদর্য্যতা চোখকে যতই পীড়া দিক পৃথিবীকে চেনবার সুযোগ এর কাছেই পাওয়া।

সমুদ্রের রং এক এক সময় এক এক রকম হয় কি এক এক দেশে এক এক রকম হয় তা ঠিক জানি না। তবে নামের সঙ্গে মিলিয়ে দুবার কালাপানি ও পীত সমুদ্র (yellow sea) দেখে মনে হল স্থান-মাহাত্ম্যের সঙ্গে রঙের কিছু যোগ আছে। তবু আমার এটাও মনে হত যে সকাল বিকাল ও দুপুরের আলোয় সমুদ্রের জলের রং বারে বারে বদলে যেত। সকাল সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের কাছে সমুদ্র মনে হত কালচে নীল, তুলে নিয়ে কলম ডোবালেই হয়ত লেখা বেরোবে, কিন্তু বেলা হলে এই জলই লাগত পান্নার মত সবুজ।

আমাদের দেশ মাছের দেশ, তাই বোধ হয় এদিককার সমুদ্রেই কেবল মাছ দেখেছি! একদিন সকালে উঠে দেখি বড় বড় এক ঝাঁক মাছ আকাশের রেখার কাছ থেকে মস্ত মস্ত লাফ দিতে দিতে জাহাজের দিকে আসছে। এক-একটার ওজন পঁচিশ-ত্রিশ সের কি এক মণও হতে পারে। অতবড় সমুদ্রেও তাদের মোটেই সামান্য জীব মনে হচ্ছিল না। জাপানী চিত্রকরের ছবিতে ঢেউয়ের চূড়ার মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রের মত বাঁকা প্রকাণ্ড মাছ অনেকবার দেখেছি; তখন মনে হত সে-ছবি অনেকটাই বুঝি কাল্পনিক, এখন দেখলাম বাস্তবের ছবির চেয়ে কাগজের ছবি কত ছোট। জাহাজের ক'টি অধিবাসী ছাড়া এই অগাধ জলে জীব নামধারী কিছু দেখা যেত না, তাই মাছের নাচ দেখে মনটা ভারি খুশী হল।

রাত্রে ডিনারের পর ডেকে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ একজন মহিলা এসে একদিন আমাকে রেলিঙের ধারে টেনে নিয়ে গেলেন। জাহাজের ধাক্কায় জল যেখানে সাদা মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠছে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "লুক্ এট্ দোজ ষ্টার্স্।" আমি মনে করলাম সত্যিই বুঝি তারার ছায়া। তারপর মনে হল এতখানি সাদা ফেনার মধ্যে ছায়া কি করে পড়বে? সাদা মেঘের মধ্যে তারার মালার মত ঝিকমিক করছে ওগুলি ফস্‌ফোরেসেন্‌স্। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাঁক বেঁধে ছুটে চলেছে।

১২ই জানুয়ারী আমাদের জাহাজ কুমারিকা অন্তরীপ ঘুরে কলম্বোমুখী হবে। সকাল থেকেই সবাই বলছে কোচিনের পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। দুপুরে জাহাজের এঞ্জিনীয়র মিঃ নোনোমুরা এসে বললেন, এইবার কেপ কমোরিনের নাক দেখা যাচ্ছে। চিরকাল মানচিত্রেই যাকে দেখা অভ্যাস তাকে দেখবার জন্য সবাই বাইরে ছুটলাম। অনেকেই দূরবীণ নিয়ে পাহাড় দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বৃদ্ধা মিশনারী মহিলা তাঁর যন্ত্রটা

দিলেন, সবাই কাড়াকাড়ি করে দেখতে লাগল। এত বয়সেও যা আমাদের কাছে মানচিত্রের ছবিমাত্র ছিল সমুদ্রের কোলে সেই কুমারিকার বিরাট বাঁক আর তীরে অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা দেখে মনে পড়ল বাড়ী ছেড়ে কতদূর চলে এসেছি। ভারত-মাতার পায়ের তলা দিয়ে আজ ঘুরে যাব, দু'মাস আগে কোন দিন ভাবি নি।

তিন-চার দিন সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, এইবার তার দুরন্তপনা একটু একটু সুরু হল। জলের নাচ বেড়েছে, জাহাজের গায়ের আর ঢেউয়ের মাথার ফেনা জলের ধাক্কায় অনেক দূর পর্য্যন্ত দৌড়ে চলে যাচ্ছে। ঢেউয়ের চূড়া ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রামধনুর মত একটা রং ছড়িয়ে পড়ছে, জলকণা সারাদিন ছিট্‌কে ছিট্‌কে এসে মুখে লাগছে। অনেক লালচে চাবড়া চাবড়া এবং কিছু কিছু সবুজ সামুদ্রিক শেওলা জলে ভেসে আসছে। সেই জলের কত রকম যে রং তার ঠিক নেই, কখনও নীলকান্তমণির মত নীল, কখনও মরকতের মত সবুজ, কখনও নীলাম্বরীর মত কালো। যখন যেমনই রং হোক সর্ব্বদাই মণির মত জল্‌ জল্‌ করছে। সবচেয়ে সুন্দর দেখায় যখন গলিত নীলার মত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনাগুলি হীরার টুকরার মত রোদে ঝল্‌মল্‌ করে ভেসে উঠছে। দূরে মাটির রং লাল মনে হয়।

বোম্বাই আলেকজান্দ্রা ডকে যে ভারতীয় স্ত্রীলোকের ভিড় দেখেছিলাম, তারা সবাই ওড়না ঘাঘরা পরে দল বেঁধে জাহাজে উঠল, কিন্তু শেষকালে দেখা গেল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পাঁচটি মেয়ে মাত্র জাহাজে রইল আর বাকি সব নেমে দৌড়। মুসলমান মেয়ে হলে কি হয়? জাহাজে উঠে আত্মীয়-বন্ধুকে বিদায় দিতে বেশ সপ্রতিভ ভাবে এসেছে। এদের বিশেষ পর্দ্দাও নেই।

প্রথম দিন জাহাজে ওঠবার পর এই যাত্রিণীদের দিন-দুই আর কোন চিহ্নই দেখতে পাই নি, কোথায় যেন সব তলিয়ে গেল। এক দিন ডেকে মিশনারী মহিলাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে দেখলাম পাঁচটি মেয়ে একটি পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ দেখতে বেরিয়েছে। ভদ্রমহিলা বললেন, "ওদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলুন, দে উইল বি ভেরি হ্যাপি।" তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে গেলাম, তারা বললে হিন্দী জানে না। পরে দেখা গেল দুটো চারটে হিন্দী কথা জানে। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" তারা বললে, "আফ্রিকা।" আমি বললাম, "এই জাহাজে চড়ে আফ্রিকা কি করে যাবে?" তখন একজন বলল, "ম্যাডাগাস্কার যাব।" সঙ্গের পুরুষটি দুই-একটা ইংরিজী কথা বলতে পারত। তার সাহায্যে সব চেয়ে সপ্রতিভ মেয়েটি বললে যে তারা কলম্বোতে নেমে অন্য জাহাজ ধরবে। তাদের মধ্যে একজন ছিল ভেঙে নুয়ে-পড়া থুখ্‌ড়ে বুড়ী। সে নাকি কুড়ি বৎসর আফ্রিকায় থেকেছে, কিন্তু নিজের ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝে না। কি করে যে তারা বিদেশে কাটায় বোঝা শক্ত। এরা সব নিজেদের আলু পেঁয়াজ বোঝাই করে এনেছে, জাহাজে লোহার উনুন পেতে রোজ "তিন দফে পাকাতা।" আমাকে একজন বললে, "আও না, জাহাজ দেখো।" আমি জাহাজের অনেকটাই ইতিপূর্ব্বে দেখেছিলাম, ওরা সেইগুলোই দেখছিল, কাজেই আমি সঙ্গে গেলাম না। দুপুরে খাবার পরে তারা তাদের দিকের ডেকে বসে বিশ্রাম করছিল, একজন মেমসাহেব বললেন, "চল ওরা কোথায় ঘুমোয় দেখে আসি।" তারা "চল দেখাচ্ছি" বলে আমাদের নীচে নিয়ে গেল। এটা হ'ল থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের ঘর। ছোট ছোট আলাদা কেবিন নেই, মস্ত একটা ঘরেই উপরে নীচে বার্থ। আমাদের বার্থের চেয়ে অনেক চওড়া, পাশাপাশি দুজন শোবার মত। ঘরের ভিতর অনেকগুলি পুরুষমানুষ বসে আছে। বোধ হ'ল স্ত্রী-পুরুষ সবই এক ঘরে শোয়। যদিও আলাদা কেবিন নেই, তবু একটুখানি আব্রুর উপায় আছে। প্রত্যেকটা বিছানাই পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা। যে ছেলেমেয়েগুলো খুব ছোট ছোট তারা মা-বাবাদের সঙ্গে এই ঘরেই শোয়। পাশে আর একটা ঘর দেখলাম। সেখানে নাকি ওদের দশ-বার-তের বছরের বড় বড় ছেলেমেয়েরা শোয়। স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে ভালই, তাতে আয়না-টায়নাও দেওয়া। মাঝখানে একটা মস্ত ঘর মাল বোঝাই করে রাখবার জন্য। তাতে ওদের এত বেশী মাল যে ব্যবসায়সংক্রান্ত বলেই মনে হয়।

এরা সবাই কলম্বোতে নেমে গেল। কলম্বোতে জাহাজ ঘাটে লাগে নি, ষ্টীম লঞ্চে ক'রে সবাই ডাঙায় গেল।

মেয়েরা দুই-একজন বোরকা পরল বটে, কিন্তু মুখগুলো খুলেই রাখল।

থার্ড ক্লাসেরও নীচে যারা তারাই হ'ল ডেক-প্যাসেঞ্জার। তারা ডেকে পাল খাটিয়ে তারই তলায় বিছানা পেতে শুয়ে বসে আসে। কারুর কারুর সঙ্গে খাটিয়া কি ক্যাম্প খাটও দেখা যায়। বোম্বাই থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত ছিল শুধু পুরুষ ডেকযাত্রী। কলম্বোতে আবার ছেলেপিলে নিয়ে কতকগুলি মেয়েও উঠেছে। এদের গায়ে গা-ভর্ত্তি সোনার গহনা, কিন্তু খোলা ডেকে এক পাল অচেনা পুরুষের সঙ্গে চলেছে। একটি তামিল মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম; কিন্তু সে তামিল ভাষা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। "সিঙ্গাপুর" "কলম্বো" ও "তামিল" এই ক'টা কথায় কেবল সে একটু হেসে মাথা নাড়ল। বাকি বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী কোন কথাই তার বোধগম্য হল না। আমাদের সহযাত্রিণী ডেন-মহিলা তার সঙ্গে তামিল ভাষায় কথা বলতে স্বরু করায় সে খুব খুশী হয়ে গেল। আমার সব কথাও তিনি তাকে মুখে মুখে অনুবাদ করে দিলেন। তার ছোট্ট একটি পাঁচ বছরের মেয়ে বড় বড় কালো চোখ তুলে সবাইকে অবাক হয়ে দেখছিল। আমার মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে অনেক ডাকাতেও খুকীটি এল না। ডেন-মহিলা বললেন, "বা, বা," অর্থাৎ "এস, এস।" শুনে সে খুব হাসতে লাগল।

১৩ই জানুয়ারী ভোর পাঁচটায় জাহাজ কলম্বোতে পৌঁছল। তখনও আলো হয় নি। পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে। সেদিন ভোরে আরাম করে পাখার তলায় শুয়ে থাকা আর হ'ল না। তাড়াহুড়ো করে মুখটুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিতে হবে, কারণ সাড়ে ছয়টায় আমাদের চা-রুটি খাইয়ে সাতটায় ষ্টিম লঞ্চে করে ডাঙায় পৌঁছে দেবে বলেছে। জাহাজের চাকর-বাকররা খুব ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মে চলে, খাবার দিতে এক সেকেণ্ডও এদিকওদিক হয় না। চা খাবার পর উপরে উঠে দেখলাম মস্ত একটা সিঁড়ি জাহাজের গা থেকে জল পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। এতদিন যে-সব চাকরেরা জাহাজের জমাদারের কাজ করত তারা ফিটফাট ইউনিফর্ম পরে "watch steward" লেখা লাল ব্যাজ্ পরে মহা গম্ভীর হয়ে ডেকে পাইচারি করছে। মাঝি-মাল্লা চাকর-বাকর অফিসার সবাই নিজের নিজের মার্কামারা টুপি পরে তৈরী। সিঁড়ির নীচে ষ্টিম লঞ্চ দাঁড়িয়ে। নামতে গিয়ে দেখি আমার কন্তা আমাদের আগেই তার বন্ধুর সঙ্গে নেমে সেখানে গিয়ে বসে আছে। এদিকে আমাদের পাসপোর্টে ছাপ দেওয়া হয় নি, তার জন্তে ক্রমাগতই দেরী হচ্ছে। আমাদের জন্তে আর অপেক্ষা না করে নৌকার দড়ি দিল খুলে। আমি জাহাজের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমার কন্তা রীতিমত কান্না জুড়ে দিলেন। মহা মুস্কিল। এমন সময় শেষ মুহূর্ত্তে পারের কড়ি মিলল। আমরা কোন রকমে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লঞ্চে নেমে পড়লাম।

কলম্বোর ঘাটে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বৌদ্ধবন্ধু শিরিবর্দ্ধন মহাশয় আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে বেড়াতে চললেন। জাহাজে কলম্বোর আরও কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা ঘাট থেকে হেঁটেই টমাস কুকের আপিসে গেলাম, কারণ সেটা ঘাটের খুব কাছে। পাশেই হোয়াইট-ওয়ের দোকান, দেখলেই মনে হয় আবার বুঝি কলকাতায় ফিরে এলাম। অবশ্য, দেখতে সেগুলো যে কলকাতার বাড়ীর মত নয় তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া পথেঘাটে মানুষ সবই অন্ত রকম। যে এক দল পুরুষ এইখানে ঘোরাফেরা করছিল তারা কি অদ্ভুত লম্বা! গলিভারের গল্পের ব্রবডিংনাগের কাছাকাছি। একজন বললেন, "লম্বা মানুষগুলি তামিল আর বেঁটেগুলি আদত সিংহলী।" ঠিক এই রকম লম্বা একটি তামিল আমাদের জাহাজে কলম্বো থেকেই উঠল। সে যখন হাঁটে তার মাথার চুল ডেকের ছাদে প্রায় ছুঁয়ে যায়। কিন্তু যারা নিজেরা তামিল এমন মেয়েদের কাছে শুনেছি তাদের জাতের লোকেরা নাকি বিশেষ কিছু লম্বা নয়।

আজকাল ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সব মেয়েদের পোষাকই অনেকটা এক রকম হয়ে এসেছে। তবু বাঙালী মেয়েকে সিংহলে বিদেশী বলে চেনা খুবই সহজ। তামিল বলে ভুল করা যে একেবারে যায় না তা নয়, তবে যারা

খুঁটিনাটি ভাল করে দেখে তারা ভুল করে না। আমরা ঘাটের দিক থেকে আসছি এবং আমার সাজপোষাক একেবারে বাঙালীর মত দেখে পথের লোকেরা অর্থাৎ গাড়ীর দালাল প্রভৃতি তখনই বুঝে নিল যে আমরা জাহাজ থেকে এইমাত্র নামলাম। টমাস কুকের দরজার কাছে অতি দীর্ঘাকৃতি এই রকম দু-চারজন যে ঘোরাফেরা করছিল তাদেরই একজন বোধ হয় কিছু পাবার আশায় ডাকাডাকি করে আপিসের দরজা খোলাল। আর একটি দীর্ঘায়ত মূর্ত্তি ভিতর থেকে উঁকি দিল, বললে, "আপিস খুলতে দেরী আছে।"

কি আর করা যায়! তার হাতে চিঠি লিখে দিয়ে আসা হল যে আমাদের সব চিঠিপত্র যেন সাড়ে নয়টার আগে 'আনিও মারু' জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হয়। চিঠি নিয়েই ভিতরের দীর্ঘমূর্ত্তি দরজা বন্ধ করে দিলেন। পথের লম্বা মানুষটি বললে, "তোমরা বেড়াতে যাবে? গাড়ী চাই?" আমরা "চাই" বলবামাত্র সে ছুটে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোথা থেকে একটা ট্যাক্সি এনে হাজির করল।

বড় রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটল। বাড়ীর আড়াল, গাছের ফাঁক দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের জল ঝলমল করে উঠছে, পথটা সমুদ্রের ধার দিয়েই প্রায়। বড় রাস্তা থেকে সমকোণ ভাবে অনেকগুলি গলি বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে নেমে গিয়েছে। এদের নাম সব 12th lane, 13th lane এই রকম। আমাদের দেশের মত মহাপুরুষদের নামে পথের কিম্বা পথের নামে মহাপুরুষের খ্যাতি বৃদ্ধি করবার প্রথা বোধ হয় এখানে নেই।

এই রাস্তার ধারের বাড়ীগুলি প্রায় সবই একতলা বাংলোর মত, খোলা দিয়ে ঢাকা চাল। প্রত্যেক বাড়ীতেই অনেকখানি জমি, সবুজ সুন্দর বাগান। আধুনিক কলিকাতায় জমির এক-তৃতীয়াংশ ফেলে রেখে তবে বাড়ী করবার অনুমতি পাওয়া যায়, এখানে বোধ হয় দুই-তৃতীয়াংশ কি তার চেয়েও বেশী ফেলে রাখার নিয়ম। বোম্বাই প্রভৃতি অনেক সুদৃশ্য শহরের ভাল পাড়ায় বাড়ীর বাহারই বেশী, এখানে বাড়ীর বাহার কম বাগানের বাহার বেশী। অনেক বাড়ীর পথের ধারের নীচে, পাঁচিলের গায়েই সপ্তপর্ণীর মত বড় বড় পাতাওয়ালা এক রকম গাছ পথের শোভা বর্দ্ধন করছে। আর এক রকম গাছের পাতা খুব ফিকে সবুজ। বেঁটে বেঁটে এক রকম গাছ কেয়ারি করে মস্ত বড় এক একটা কদম ফুলের মত কিংবা জাপানী মেয়ের খোঁপারই মত ফাঁপিয়ে বাড়ীর সামনে সাজিয়ে রেখেছে। শুধু সবুজেরই যে কত বিভিন্ন রূপ বলা যায় না। চোখ-জুড়ানো কথাটা ব্যবহার করলে তাকে শুধু ভাষার অলঙ্কার বলে এখানে হাল্কা করে নেওয়া চলে না। মাথার উপর নীল আকাশ, পায়ের তলায় নীল সমুদ্র আর তারই কোলে ঘনশ্যাম, স্নিগ্ধশ্যাম, শ্যামাভ ও পীতাভ এই গাছের মাথাগুলি বাস্তবিকই মানুষের চোখ জুড়িয়ে দেয়।

ঘণ্টা দুই পথে পথে ঘুরে মানুষ যা দেখলাম তাতে স্ত্রীলোক খুবই কম। এটা ত পর্দ্দার দেশ নয় তাই একটু বিস্মিত হলাম। বোধ হয় এত সকালে ঘরের কাজ ফেলে মেয়েদের বাইরে বেরোবার সময় হয় না।

পথের লোক দেখে মানুষের যেটুকু ধারণা হয় তাতেই বোধ হল এখানে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অর্থাৎ সাহেবীয়ানার প্রভাব খুব বেশী। ফলওয়ালা, গাড়ীর দালাল, মুদি, দারোয়ান সবাই লুঙ্গির উপর মোটা মোটা ওপ্‌ন্ ব্রেষ্ট কোট পরে বসে আছে। এই ত গরম দেশ, পৌষ মাসের শেষেও এক ফোঁটা শীত নেই; বাংলা দেশ হলে কারুর গায়ে জামাই দেখা যেত না। দরিদ্র খ্রীষ্টধর্ম্মীরাও বাংলা দেশে এত কোট পরে না। অল্প দু-চারজন মেয়েও যা দেখলাম, তারাও প্রায় সবাই বুক পর্য্যন্ত জড়ানো লুঙ্গির উপর খুব আঁট জ্যাকেট এঁটে বেড়াচ্ছে। জামার হাতগুলো বহু পুরাকালের বেলুন-আস্তিন। আজকাল অবশ্য বেলুন-আস্তিন আবার ফ্যাশানের কোঠায় নূতন করে উঠেছে, কিন্তু তাতে একটু-খানি আধুনিকতার চিহ্ন লেগে আছে, দেখলেই বোঝা যায়। এদের ফ্যাশানটা আধুনিক নয় নিশ্চয়। দেখে মনে হয় যে-সময় এরা ধর্ম্মলাভ করেছিল সেই সময় পোষাকটাও উপরি পেয়েছিল। বংশানুক্রমে আজও সেই প্রাচীন পোষাক চলে আসছে।

কলম্বোর যে পথ দিয়ে আমরা গেলাম সেখানে ইউরোপীয়ানদের ভিড় খুব বেশী। এই পথটা মাউণ্ট লাভানিয়া বলে একটা ছোট ষ্টেশনে গিয়ে পড়েছে। ট্রেনে ও বাসেও সেখানে যাওয়া যায়। আমরা ন'টার সময়

ফেরবার পথে দেখলাম অসংখ্য গাড়ীতে সাহেব-মেমেরা সেই দিকে চলেছে। বোধ হয় তারা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে ইউরোপীয় পোষাক-পরা মেয়ের পাল যাচ্ছিল স্কুলে। পথের ধারে দুই-একটা স্কুল দেখতেও পেলাম। পোষাক সাহেবী হলেও মেয়েদের মধ্যে কালা আদমি অনেক ছিল!

সকাল বেলা ৯৷৷৹টাতেই জাহাজ ছেড়ে দেবে, কাজেই ডাঙার মেয়াদ আমাদের অল্পক্ষণ। গাড়ী থেকে নেমে বেড়ানো চলে না, তবু মাউণ্ট লাভানিয়াতে একবার নামলাম। একবারে সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের মত কালো পাথর পড়ে রয়েছে, উঁচু উঁচু গোল ধরণের পাথরগুলি বেশ ছবির মত দেখতে। দুই-একটা ডোঙার মত নৌকাও বালির উপর পড়ে আছে। কালো পাথরের উপর সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করে আছড়ে পড়ে সাদা ফেনার ফুল ফুটিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারই কাছ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলে যেতে হয় অনেক উঁচুতে মস্ত বড় একটা হোটেলের চূড়ায়। সমুদ্রের বুকে কত দিন ভেসেছি, কিন্তু মাটির পায়ে যেখানে মহাসিন্ধু এসে মাথা খুঁড়ছে তার মত সুন্দর মাঝ সমুদ্রকে কোনদিন মনে হয় নি।

সমুদ্রের ধারেই ছোট একটা বাড়ীতে য়্যাকোয়েরিয়াম্ (aquarium)। তাতে সামুদ্রিক মৎস্যদের অনেক নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। আমার মেয়েটির রংবেরঙের মাছ দেখে ফুর্ত্তি হবে মনে করেই বোধ হয় শিরিবর্দ্ধন মহাশয় টিকিট কেটে আমাদের সেখানে ঢোকালেন। মাছগুলির গায়ে ময়ূর ও প্রজাপতির মত কত বিচিত্র রং! নামও তেমনি, Butterfly fish, Surgeon-Major, Emperor, আরও গাল ভারি ভারি অনেক নাম। তাদের চিত্রবিচিত্র রং, নানা গড়নের চেহারা এবং নামের রকমারি দেখে আমার কন্যা ত মহাখুশী। কিন্তু আমাদের জাহাজে ফেরা চাই ঠিক সময়ে, কাজেই মৎস্যকন্যা ও মৎস্যরাজদের রূপ দেখে বেশীক্ষণ কাটাতে পারলাম না।

ফিরবার পথে মিউজিয়ম দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখনও দরজা খোলবার সময় হয় নি বলে রুদ্ধ কবাট দেখেই ফিরতে হল। দূর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী দেখে পোষ্ট আপিসে চিঠিপত্র দিয়ে আমরা ফিরলাম। দেখলাম ঘাটে সুন্দর সুন্দর পোষাক ও গহনা পরে কয়েকটি সিংহলবাসিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পোষাকের মত তাদের হাসি আর চোখের চাউনিও খুব উজ্জ্বল। কাকে যেন ঘাটে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। তিনটি মেয়ের পরনে শাড়ী। গাছের গায়ে লতা যেমন জড়িয়ে জড়িয়ে উপরে ওঠে, শাড়ীও তেমনি পাকে পাকে উপরে উঠেছে, আঁচলের দোলন কোথাও নেই। সিংহল মণি-মাণিক্যের দেশ, তাই এদের গায়ের গহনায় নীলকান্ত মণির খুব ছড়াছড়ি।

জাহাজ থেকে নেমে সহযাত্রীরা নানাদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। ষ্টীম লঞ্চে আবার সকলের সঙ্গে দেখা হল। এক মায়ের ছেলেমেয়ের মত সব এক তরণীর আশ্রয়ে চলেছে। নৌকা যখন ছাড়ে ছাড়ে, দড়ি খুলে দিয়েছে, তখনও দেখি বৃদ্ধা ডেন-মহিলা এসে পড়েন নি। তাঁর জন্যে সকলেই উদ্বিগ্ন। আমাদের সহৃদয় বন্ধুটি অজানা মানুষের জন্যেও ছুটাছুটি করে অনেক কষ্টে তাঁকে খুঁজে পেতে আনলেন। কিন্তু বুড়ো মানুষ ভারী শরীর আর দুর্ব্বল পা নিয়ে কিছুতেই খোলা নৌকায় উঠতে পারেন না। শেষে নৌকা আবার বেঁধে পিছন থেকে ঠেলে আর সামনে থেকে টেনে তাঁকে তুলে নেওয়া হল। মনে হল মস্ত একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। পাঁচ দিনের মাত্র পরিচয়, ডাঙায় পরিচয় হলে পাশের বাড়ীর লোকের এই জাতীয় বিপদে আমরা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই না, কিন্তু জলে মনে হয় এ আমাদেরই একজন। আমাদের পৃথিবী তখন ঐ জাহাজটুকু।

জাহাজে ফিরে দেখি ব্যাপারীরা ডিঙি নৌকা বোঝাই করে করে নানা জিনিষ বেচতে এসেছে। লুঙ্গির উপর মাথায় হ্যাট চাপা দিয়ে মসীনিন্দিতবর্ণ ব্যাপারীরা নৌকা বেয়ে বেয়ে এসে জাহাজ ঘিরে ফেলেছে। মাদুর চাপা দেওয়া অনেক খেলনা তাদের নৌকায়। বেশীর ভাগ কালো কাঠের হাতী, কিছু সাদাটে কাঠের হাতী, কিছু সজারুর কাঁটার ও কাঠের বাক্স, কৌটা, কিছু খেলনার নৌকা ইত্যাদিও আছে। ডেকের রেলিং ধরে যাত্রীরা সব ঝুঁকে পড়েছে আর নীচ থেকে বিক্রেতারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, "এই, এই, lady, lady, how much? Rs. 20 pair, Rs. 10 pair, take, take."

একজনও এক মুহূর্ত্তও চীৎকার থামাচ্ছে না। সবাই সবাইকার গলার স্বর ডুবিয়ে দিতে ব্যস্ত।

আমাদের সহযাত্রী জাপানী ভদ্রলোক একটা আধমণী হাতী কিনে ফেল্‌ল। ব্যাপারীদের ত জাহাজের উপর আস্‌তে দেয় না, তাই ওরা একটা থলিতে লম্বা দড়ি বেঁধে দড়িটা উপরে ছুঁড়ে দেয়। কুয়ার জল তোলার মত টেনে থলিটা তুল্‌লে জিনিষ পাওয়া যায়। তার পর টাকাও সেই থলিতে দিতে হয়।

কলম্বোতে থার্ড ক্লাসে এক পাল সিংহলবাসী, সেকেণ্ড ক্লাসে একটি ঘনকৃষ্ণকান্তি তামিল এবং ফার্ষ্ট ক্লাসে এক জোড়া সাহেবমেম দুটি ছোট ছেলে নিয়ে উঠ্‌ল। ম্যাডাগাস্কারের দল এইখানে নেমে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর তামিলটিকে দেখে আমাদের সহযাত্রীরা সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "এ কোন্ nationalityর লোক?" ভারতবাসীরা যে অনেকেই খুব কালো হয় তা ত তারা জানেই, তবুও কেন তারা এ প্রশ্ন করছিল ঠিক বোঝা গেল না। আমাদের ঠাট্টা করেও হতে পারে, আমাদের দর একটু বাড়িয়েও হতে পারে। যাই হোক, আমরা বললাম, "ইনি আমাদের দেশেরই লোক।"

প্রথম শ্রেণীতে যে সাহেবমেমরা উঠেছিল তাদের আভিজাত্য বড়ই বেশী। তাদের সঙ্গী বলতে সেখানে জাপানীরা ছাড়া আর কেউ ছিল না, তবু তারা প্রাণ গেলেও আমাদের ডেকে আস্‌ত না, পাছে আমাদের হাওয়া লেগে তাদের জাত যায়। ভারতবর্ষের নুন বেশী দিন পেয়ে তাদের জাতিভেদে বিশ্বাস ও ছুঁৎমার্গে নিষ্ঠা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর ডেক ছিল আমাদের মাথার উপর। সেখানে লোক অত্যন্ত কম থাকাতে এবং কেউ আপত্তি না করাতে এতদিন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সেখানে বেড়াতে ও ডেক-গল্‌ফ খেলতে রোজই যেত। কিন্তু নতুন মেমসাহেব এসেই ষ্টুয়ার্ডদের দিয়ে কড়া হুকুম জারি করে দিলেন, "আমাদের ডেকে তোমরা কেউ আস্‌বে না।" মেমসাহেব ঠোঁটে রক্তের মত রাঙা করে রং লাগিয়ে ছেলেদের নিয়ে সেখানে নিজেদের ঘাঁটি আগলে বসে থাকতেন। ছেলে দুটো অতি শিশু, বোধ হয় একটার দুই এবং একটার চার বছর বয়স হবে। সারা সকাল উপরের ডেকে শুধু গায়ে জামা দিয়া পরে খেলার মোটর নিয়ে খেলা ছিল তাদের কাজ। যখন কেবিনে আসত তখন পোর্টহোল দিয়ে গলা বাড়িয়ে তৃষিত নেত্রে চেয়ে থাকত সেকেণ্ড ক্লাসের দুটি ক্রীড়ামত্ত মেয়ের দিকে। কিন্তু বাইরে এসে খেলা তাদের বারণ ছিল জাত যাবার ভয়ে। ঘরে নানারকম খেলনা ছড়াছড়ি যেত, কিন্তু ডেকে দুটি মেয়ের লাফালাফি নাচানাচি দেখে তাদের চোখ খেলনার দিকে কিছুতেই যেত না। পোর্টহোল দিয়ে মুখ বার করে তারা চেয়ে থাকত আর মাঝে মাঝে মিচকে মিচকে হাসত।

সিংহলের কাছ থেকেই সমুদ্রের মাতামাতি সুরু। ১৩ই সকালে আমরা কলম্বো পৌছবার আগেই দেখেছিলাম সমুদ্রের উন্মত্ত নৃত্যের সূচনা। জাহাজের ধাক্কায় ঢেউ ভেঙে নীল জলের উপর সাদা ফেনাগুলো অনেক দূর পর্য্যন্ত রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়ছে যেন ঢাকাই নীলাম্বরী জংলা শাড়ী। বড় জিনিষের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় নীল হিমাচলের মাথা বেয়ে সাদা বরফের নদী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তার ভিতরে ভিতরে আবার কত রঙের খেলা। ঢেউগুলো যখন ফুলে উঠছে তখন যেন সমুদ্রের তলায় হঠাৎ কে বাতি জেলে দিচ্ছে, চূড়াটা বাতির আলোর আভায় যেন হাল্কা নীলার মত জলছে, তারপর আসমানী হয়ে শেষে সাদা ফেনার স্তূপ ফেটে ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

১৩ই রাত থেকেই জাহাজ দোলার মত দুলতে লাগল। সকালে উঠে দেখি দোলানির চোটে আর হাঁটা যায় না। আমার মেয়েটিকে বিছানা থেকে তুলতেই পারলাম না, বললে, "আমার মাথা ঘুরছে, গা বমি-বমি করছে।" রেলিং ধরে উপরে গিয়ে শুনলাম ফরাসী বালিকাটিরও সেই দশা। বড়দের মধ্যেও অনেকে কেবিনে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন, কেউবা ডেকে চেয়ার পেতে প্রাণপণে চোখ বুজে পড়ে আছেন। খাওয়া-দাওয়া অর্দ্ধেক লোকের বন্ধ।

কেবিনে থাকলে গরমে শরীর আরও খারাপ হবে বলে দুটি ছোট মেয়েকেই টেনেটুনে ডেকে এনে ফেলা হল। ঢেউগুলো তখন লাফিয়ে লাফিয়ে ডেকের উপর এসে পড়ছে, সমুদ্রের তলায় যেন সুরাসুরের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে, তারা পাহাড় পর্ব্বত তুলে ছুঁড়ছে। একসঙ্গে শত শত পর্ব্বতের

চূড়া সমুদ্র ফুঁড়ে যেন বরফ মাথায় করে উঠছে, আবার ভেঙে পড়ছে।

ডেকে এসেই মেয়ের বমি সুরু হয়ে গেল। জাহাজের চাকর-বাকররা এসব সময়ে খুব চটপট কাজ করে। একজন বাল্‌তি নিয়ে এল, একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটল। ডাক্তার থার্মোমিটার নিয়ে ছুটে এসে হাজির। দুটি মেয়েরই জ্বর এসেছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা হল "এরা খাবে কি?" ডাক্তার ডাক্তারী জানেন বটে, কিন্তু ইংরেজী জানেন না। হাত মুখ নেড়ে কথা চলে। এ সেই,

"সীতা নাড়ে হাতটি বানর নাড়ে মাথা,
বুঝিতে নারিনু নর-বানরের কথা।"

জবাব দিতে না পেরে ডাক্তার পলায়ন করলেন এবং ওষুধের গায়ে নাম লিখে ষ্টুয়ার্ডের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। ছোট ডাক্তার যাবার পর বড় ডাক্তার এলেন। তিনি অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিলেন, "মেয়েরা যা খেতে চাইবে তাই দিও।" শুনে ফরাসী বালিকা মহা খুশী! কিন্তু খাবার সামনে ধরে দেখা গেল কোনটাই তাদের পছন্দ নয়, সবেই অরুচি।

ক্রমে আকাশে মেঘ করে এল, জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও টলতে লাগল, মন্দ লাগছিল না। কিন্তু মেয়েটি কেঁদে ভয় পেয়ে আর বমি করে এমন অস্থির করে তুলল যে জিনিষটা কিছুমাত্র উপভোগ করা গেল না। বসে বসে দেখতে লাগলাম থার্ড ক্লাসের মা'রাও সমুদ্র-পীড়াগ্রস্ত ছেলেদের পিছনে জল নিয়ে ছোটাছুটি করছে।

মেমসাহেবদের মধ্যে যাঁরা একটু ভাল আছেন তাঁরা সারাক্ষণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন, "not feeling well?" আমাকেও কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি 'বেশ ভালই আছি' বলাতে সবাই বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "এই না তোমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা?" আমি বললাম, "হাঁ, তা বটে কিন্তু আমার শরীর খারাপ লাগছে না, ভালই লাগছে।" তখন প্রথম সমুদ্রযাত্রায় যে কে কয় সপ্তাহ বিছানা আঁকড়ে পড়েছিলেন তার গল্প সুরু হয়ে গেল। একজন বললেন, "আমেরিকা থেকে প্রথম ভারতবর্ষ যাবার সময় আমি ছয় সপ্তাহই শুয়ে ছিলাম।"

তার পর বৃষ্টি সুরু হল। জলের উপর বৃষ্টির ফোঁটা, যেন কোন দক্ষ শিল্পী এক মুহূর্তে কালো কাপড়ে শত শত কালো বুটি ফুটিয়ে তুল্‌ল। জলের রং ব্লু-ব্ল্যাক কালির মত। জাহাজটা নাগরদোলার মত দু-দিন ধরে দুলতে লাগ্‌ল। একবার এই কোণটা আকাশের মাথায় গিয়ে ঠেকে আর একবার ও-কোণটা আকাশের মাথায় ঠেকে। দ্রুত ট্রেন ছুটলে যেমন মনে হয় ডাঙার গাছপালা ল্যাম্পপোষ্ট সব দৌড়াচ্ছে, এতেও তেমনি মনে হয় সমুদ্র যেন কেবলি লাফিয়ে লাফিয়ে দিক্‌চক্ররেখা ছাড়িয়ে আকাশের মাঝখানে গিয়ে ঠেকছে। জলের মধ্যে আশেপাশে স্থির আর কিছু দেখা যায় না বলে এ ভ্রান্তিটা কাটতে সময় লাগে।

দুদিনই এই বৃষ্টি আর দোলানি। কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেছে, জাহাজ ভয়ে ক্রমাগত কুয়াশার বাঁশি (fog horn) ভোঁ ভোঁ করে বাজাচ্ছে। যাত্রীরা কেউ বর্ষাতি পরে বেড়াচ্ছে, কেউ বসবার ঘরে বই কাগজ নিয়ে বসে আছে। পীড়িতা বালিকা দুটি হাওয়া পাবার আশায় চলাচলের পথে লম্বা ডেক-চেয়ার পেতে শুয়ে আছে। বেচারী ডেকযাত্রীদের বড় দুর্গতি। একটি তামিল মেয়ে অনেকগুলি কুচোকাচা নিয়ে তেরপলের পর্দার তলায় ভিজছে। এক বছর দু-বছরের সব বাচ্চা!
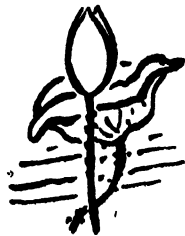
মহাত্মা গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। এক সময় দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, তা সংগ্রহ ক'রে, এক ক'রে দেখবার চেষ্টা মহাভারতে খুব সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। এ'কে সম্পূর্ণভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীনকালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে ক'রে, মানচিত্র এঁকে ভূগোল বিবরণ গ্রথিত ক'রে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীনকালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালই ছিল। সহজভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীরভাবে মুদ্রিত হয় না। সেই জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হোত, তা সুগভীর এবং মন থেকে সহজে দূর হোত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়-তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই যে খানিকটা দার্শনিকভাবে আলোচনা এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে, এমনও বলা যেতে পারে যে মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারত-পাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। এ হোলো পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম ক'রে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে, সেটা নঞর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীর পুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নত শির, তাঁদেরও দোষ-ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরো কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তব

খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ ক'রে শত্রুর আগমন হোলো। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশশুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়, তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউবা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খলভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলা দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হোলো না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হোলো এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়মুড় করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে, এল পর্তুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এই রকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে পরমার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে, যেখানে যথার্থ দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ ক'রে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীন-মণ্ডলীর, এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এই রকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, "গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন?" আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন, বললেন, "কী! যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়? আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব?" এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগেস করতে ইচ্ছে হয় যে তাঁদের তৈলচিক্কণ নধরকান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে? যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় ব'লে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধ'রে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা এই সংসারের উপযোগী হোতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালী এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্কৃত জীবন যাপন করেছিল, তার পরে ইতালীর ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর— ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডী বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে

মুক্তিদান ক'রে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ কত চেষ্টা কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে যে অপমান করা হয় সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ওদেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানব-গৌরবের অধিকারী, কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ওদেশের আইনের কাছে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি ব'লে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়ে ছিলুম তখন রাণাডে সুরেন্দ্রনাথ গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুতবেগে আশ্চর্য্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি—তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ইনিই কি প্রথম এলেন? তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরো অনেকে কাজ করেন নি? কাজ করেছেন সত্য কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই, সে কত ম্লান তাঁদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন আবেদন নিবেদনের ডালা, কখনো বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনো তীক্ষ্ণ কখনো সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনী গ্যারিবল্ডীর সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হোলো এই স্বার্থান্বেষণ। হোক না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা, তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান ব'লে একটা জাত আছে তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজস্র মিথ্যা বলতে পারে, তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে দেখি এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম ক'রে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয় আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজম বলছে সেই পেট্রিয়টিজমই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না—ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন ক'রে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে, দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক, তাঁরা মনে করেন যে কার্য উদ্ধার করতে হ'লে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের, এসব চতুর বিষয়ীদের আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে—যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি

সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক, তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না ক'রে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই যে তাদের গৌরব—এ গর্ব টিকবে না তো! আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসা প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব—এ কথা আমরা মানি কি? মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কিনা এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব, তবু মারব না এবং এই করেই জয়ী হব, এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা, ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে, হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খ্রীষ্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে, ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন, এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র, তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন, তাকে অন্ন দিতে হবে, এ-কথা খ্রীষ্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজী এমন একজন খ্রীষ্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলষ্টয়-এর কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খ্রীষ্টান ধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থভাবে লাভ করেছিলেন। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের, যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্র-নীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারী অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খ্রীষ্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা দেওয়া নয়, তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথু রাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম, ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খ্রীষ্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে যারা নম্র তারা জয়ী হয়, আর খ্রীষ্টানজাতি বলে নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস্রনীতি গ্রহণ করেছেন আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৩

[মহাত্মাজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন মন্দিরে অভিভাষণ। শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীপ্রভাত গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত।]

কেতকী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

একটি কেতকী
কেন ওরে চায় মন, রহস্য এত কি
ওর মাঝে! এত কি ঐশ্বর্য্য সংগোপন?
রূপ রস কি এমন? অঙ্গ-আভরণ
ঐ তো বিষাক্ত শত সুতীব্র কণ্টক,
স্পর্শমাত্র যন্ত্রণাতে মর্ম্মবিদারক।
তীব্র মদগন্ধমোহে মুগ্ধ আশীবিষ
ওরি ঝোপমূল বেড়ি থাকে অহনিশ
পড়ে! পরিবেশ ওর জীবন-সংশয়,—
তবু কেন উহারেই না পাইলে নয়?
এত শান্ত, এত স্নিগ্ধ, এত সুকোমল
এত যে স্বতন্ত্র! থাকে ফুটিয়া কেবল
বৃক্ষের সমুচ্চ শিরে পত্র-আচ্ছাদনে
যেন সে দিবে না ধরা স্বল্প আয়োজনে,—
তবু তার কি নিগূঢ় মিলন-আকুতি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হয়ে সারা অনুভূতি
প্রচণ্ড দুর্ব্বার টানে টেনে লয় কাছে;
ভাবিতে ভুলায় ওতে কি আছে না-আছে।
রেণুটুকু পাপড়িটি,—কিছু না-ও রয়
একটু সুবাসরেশ, তাই কি বিস্ময়
জাগায় কি ব্যাকুলতা একান্তে বিপুল!
শ্লথপ্রাণে শক্তি দিয়া অতি দৃঢ় স্থূল
সংসারের বিধিবদ্ধ অন্ধ-কারা হতে
মুহূর্ত্তেকে নিয়ে চলে কল্পনার রথে
দুরাশা উল্লাসে দোলা কোন্ অলকার
কুহক সঞ্চারি বক্ষে। প্রত্যক্ষের ভার
সাধ্য কি রুধিয়া রাখে স্বপ্নের দুয়ার!
সুনিশ্চিত বাস্তবের রীতি-ব্যতিক্রমী
অদৃশ্য গন্ধের গতি কি বা সে দুর্দ্দমই!
—এই যে সকলছাড়া সকলের বাড়া
বসে আছে অভিমানে রচি' নিজ কারা,—
মুক্তি দিয়া জড় বিশ্বে দুলর্ভের ধ্যানে
মিল আছে স্বভাবের এই অভিজ্ঞানে
আরেক মানিনী সাথে।

সে এক মানবী,
বাহিরেতে সেও এক সাদাসিধে ছবি।
এরি মত সুকুমার সরস কৈশোর,
অধরে প্রস্ফুট হাসি নয়নেতে-ঘোর,
লাজদীপ্ত তনু ঘেরি বসন-বিন্যাস,
সঘন কুটিল কৃষ্ণ চিকুরের রাশ
স্তরে স্তরে পৃষ্ঠ বাহি পড়েছে ছড়ায়ে,
মেঘ নামিয়াছে যেন দিগন্তের গায়ে।
বর্ণের প্লাবনে ছেয়ে গেছে ঘাটপাট,
এই যেন সুরু হবে বাদলের নাট,
—সেজেগুজে আছে ধরা তারি প্রতীক্ষাতে
তৃণপুঞ্জ রোমাঞ্চিত পূর্ব্ব-শীতবাতে।
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় বিদ্যুৎ-মাধুরী
নদীনদে খেলে ছটা, কূপেতে দাদুরী
তোলে ধ্বনি। কৃষকেরা ধরে সারি-গান।
মাঠে-বাঁধা গাভীগুলি তুলিয়া নয়ান
ডাকে হাম্বারবে, বক ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
সফরী উচ্ছলি ওঠে স্বল্পজল বাঁকে।
গামোছাটি কাঁধে লয়ে, কক্ষে লয়ে ঘড়া
আসন্ন বর্ষার চিত্রে উৎফুল্ল-অন্তরা
বধূরা চলেছে স্নানে পল্লীবালা সাথে;
সংহত জলদম্লান শ্রাবণের প্রাতে।—
—এমনি সমগ্র এক পটভূমি 'পরে
একটি নিটোল রূপ টলমল করে।
স্বভাবে এত সে চাপা, শ্রাবণেরই মেঘ,
যা আছে মনেই, কিন্তু রুদ্ধ অন্তর্বেগ
এখনি ঝরিবে যেন, শুধু অনুকূল
ঈষৎ ভাবের-বায়ু-প্রতীক্ষা-আকুল।
মানেতে জর্জ্জর তারো পীন বক্ষোভূমি
মুখখানি তারি মাঝে উঠিছে কুসুমি';
দেখিতে আদর আসে কেতকীরই প্রায়;—
সাধে কেউ বাসে ভাল!—ভাল যে বাসায়!

লোংচাঙ্ গ্রামের নাগা যুবতী

লোংচাঙ্ গ্রামের নাগা পুরুষ

স্বগৃহে স্বচ্ছল অবস্থার নাগা দম্পতি

বীরবেশে সুসজ্জিত নাগা

চীনা-তুর্কিস্তানের একটি ছোট শহরে ফলওয়ালী
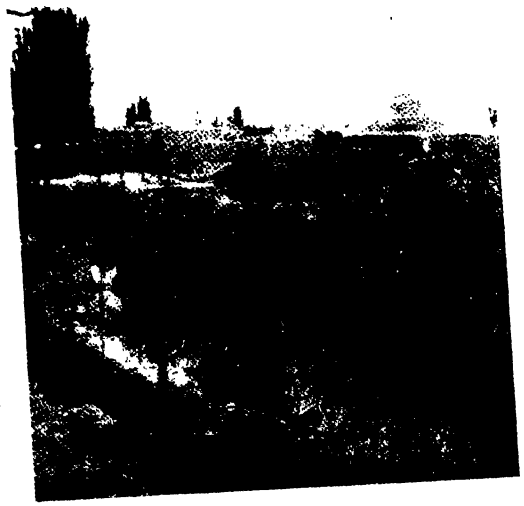
চীনা-তুর্কিস্তানের মারালবাসি নগর

ডিওফু হইতে কৈলাসের দৃশ্য

আলোচনা

"শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক"

গত ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—লিখিত "শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক" শীর্ষক প্রবন্ধের আমি যে সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলাম, আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে আপনি উহার অনেক প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া ছাপাইয়াছেন। অধিকন্তু, আমার শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অজিতবাবু যে দীর্ঘ 'উত্তর' দিয়াছেন, সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা না করিয়াই আপনি প্রকারান্তরে উহা সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে আমার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। [স্থানের অল্পতাবশতঃ আমাকে কখন কখন পত্রাদি সংক্ষিপ্ত করিতে হয়। দীনেশবাবুর পত্র সংক্ষিপ্ত করার তাঁহার যে ধারণা হইয়াছে, তাহার জন্ত আমি দুঃখিত। তাহা আমার অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়]

রামলালবাবুর বাড়ী গাজনা—পার্শ্ববর্তী অপর একটি গ্রামসহ পোষ্ট আফিসের নাম ব্যাসদি-গাজনা। আমার বাড়ী (কৃষ্ণনগর গ্রাম) এবং রামলালবাবুর বাড়ীর মধ্যে আড়াই মাইলের ব্যবধান। কর্ম্মজীবনের অবসানে তিনি যখন গাজনায় বাস করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিত্য সহচর ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবন্ধলেখক অজিতবাবুর বাড়ী (নলিয়া গ্রাম) গাজনা হইতে মাইল দুই দূরবর্ত্তী। আমাদের অঞ্চলে প্রায় সকল ভদ্রলোকের গৃহেই রামলালবাবুর 'আমার জীবনের লক্ষ্য' (উপন্যাস) রহিয়াছে। নলিয়া গ্রামের অনেক বাড়ীতে যে ঐ গ্রন্থ আছে তাহা বলা বাহুল্য। অজিতবাবু যে রামলালবাবুর প্রতিবেশী তাহার উল্লেখ না করিয়া মান্দালয় হইতে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

রামলালবাবুর নাম 'কুড়ন' ছিল না। তাঁহারা বহু পুরুষাবধি সরকার; সুতরাং 'কুড়ন চক্রবর্ত্তী' বলিলে কেহ রামলাল সরকারকে চিনিবে, ইহা আপনি কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহার শৈশবের নাম 'তুষ্টু'; আজিও তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহাকে 'তুষ্টু ডাক্তার' বলিয়া স্মরণ করে।

রামলালবাবুর প্রধান পরিচয় এই যে, তিনি ডাক্তার। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সরকারী কাষ্টমস্-বিভাগে (ব্রহ্ম ও চীনদেশে) ডাক্তারী করিয়া কাটিয়াছিল। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক কাল্পনিক কুড়ন চক্রবর্ত্তীকে তিনি ডাক্তাররূপে আঁকেন নাই। তিনি 'ব্রহ্মপ্রবাসের বিবরণ' নামক একখানা ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছিলেন; উহা এখনও ছাপা হয় নাই। উহার সহিত 'আমার জীবনের লক্ষ্য' উপন্যাসের কাহিনীর কিছুমাত্র মিল নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস একবার 'প্রবাসী'তেই "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" হিসাবে রামলালবাবুর জীবনের ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, রামলালবাবু উক্ত উপন্যাসের নায়ক ত হইতেই পারেন না, এমন কি শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজের বিপক্ষে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

'নব্য বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য' নামক অপর একখানি প্রকাশিত গ্রন্থে রামলালবাবু আমাদের অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের বিবরণ সংকলন করিয়াছেন। উহাতে গাজনার হাট লইয়া ব্যাসদির মুসলমানগণের সহিত দাঙ্গাতে তিনি কিরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, একবার বর্ষাকালে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে নৌকা ডুবিয়া গেলে কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদের উভয়ের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাঁহার চেষ্টায় কিরূপে গাজনায় মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল এবং কিছুদিনের জন্ত তিনি হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন, ইত্যাদি, তাঁহার প্রথম যৌবনের অনেক প্রকৃত ঘটনার বিবরণ আছে। বলা বাহুল্য, ইহার কোন কথাই 'আমার জীবনের লক্ষ্য' উপন্যাসে নাই। 'নব্য বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যে'র রামলাল সরকার এবং উক্ত উপন্যাসের নায়ক কুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভিন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। উপন্যাসের নায়ক কুড়ন চক্রবর্ত্তীকে উপন্যাসকার রামলাল সরকারের সহিত অভিন্ন করিতে যাওয়া 'রজনী'র প্রথমাংশ পড়িয়া বঙ্কিমবাবুকে কানা ফুলওয়ালী ঠাওরাইবার মতই হাস্যকর।

শেষ ব্রহ্মযুদ্ধ হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ডাক্তার রামলাল সরকার কাষ্টমস্-বিভাগে চাকুরী লইয়া ব্রহ্মদেশে যান ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের পর। সুতরাং রামলালবাবু কিছুতেই শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীরত্বপ্রদর্শনকারী কাল্পনিক কুড়ন চক্রবর্ত্তীর সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। রামলালবাবুর রচিত 'নব্য বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য' (১৩১৩ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "১৮৮৯ খ্রীঃ, যে বৎসর বর্ষায় আসি, ভাদ্র মাসে পূর্ণ বর্ষায় দেশ প্লাবিত। শ্বশুরালয়ের কোন বিবাহ উপলক্ষে সস্ত্রীক একখানি ডিঙ্গি নৌকাযোগে তথায় রওয়ানা হইলাম," ইত্যাদি। তিনি যে ইহার পূর্ব্বে কখনও ব্রহ্মদেশে যান নাই তাহারও প্রমাণ ঐ বহিতে আছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

২

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকারের সমালোচনার উত্তর-স্বরূপ আশ্বিন ১৩৪৪ সালের 'প্রবাসী'র ৮৯০ ও ৮৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন—'আমাকে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়-দ্বয়ও বলিয়াছেন যে তাঁহারা যখন উত্তর-ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন তখন ডাঃ সরকারের সম্বন্ধে ঐরূপ শুনিতে পান, এবং বিশেষ ভাবে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় উহার সন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'

আমার সম্বন্ধে অজিতবাবুর এই উক্তিতে আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তিনি ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াই লিখিয়াছেন। উত্তর-ব্রহ্মে আমি মাত্র তিনটি স্থানে গিয়াছিলাম—মিন্‌মানা, পাগান্‌ ও মাণ্ডালে। ঐ তিন স্থানে কোথাও আমি ৺ডাক্তার রামলাল সরকার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনি নাই—শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে তাঁহার অংশ গ্রহণ সম্বন্ধেও কেহ আমায় কোনও কথা বলে নাই। রেঙ্গুনেও ডাক্তার রামলাল সরকার সম্বন্ধে কোনও বিবরণ বা আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর বা কর্ণ-গোচর হয় নাই। আমি বহু পূর্ব্বে ডাক্তার রামলাল সরকারের "চীনদেশে সন্তান চুরি" নামক চীনা সামাজিক আখ্যানটি পড়িয়াছিলাম,—লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ নানা তথ্যের ও ঘটনার সমাবেশে বইখানি আমার কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন আমার মনে হয়, তাঁহার ভ্রমণের কথা-সংবলিত দুই-একটি প্রবন্ধও আমি কোথায় পাঠ করিয়াছিলাম। রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙালীগণের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করি, তাহাতে আমি ডাক্তার সরকার ও তাঁহার "চীনদেশে সন্তান চুরি" গল্পের কথা উল্লেখ করি, কারণ ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। সুতরাং অজিতবাবু যে লিখিয়াছেন, যে আমি উত্তর-ব্রহ্ম দেশে ডাক্তার সরকার এবং শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে তাঁহার অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে 'ঐরূপ' সংবাদ শুনিতে পাই, তাহা কোনও ভ্রান্তধারণা বশেই লিখিয়াছেন—আমি অজিত বাবুকে এরূপ কোনও কথা বলি নাই। 'প্রবাসী'তে "শেষ ব্রহ্ম যুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক" লেখাটি পড়িয়া আমার ভাল লাগে। তখন আমি 'কুড়নচন্দ্র চক্রবর্তী'রই আত্মচরিত আবিষ্কৃত হইয়াছে এই বিশ্বাসে অজিত বাবুকে বলি যে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্‌ ঐতিহাসিক আত্মকথা বলিয়া মনে হয়, এবং অবিলম্বে উহা পুরাপুরি প্রকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। অজিত বাবু আমায় বলেন যে ব্রহ্মদেশ হইতে তিনি সম্পূর্ণ হস্ত-লিখিত পুস্তকখানি আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। এখন শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর প্রতিবাদ পাঠে দেখিতেছি যে বইখানি পূর্ব্ব-প্রকাশিত, এবং আত্মচরিত বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, উপন্যাস। এই ছাপা বইয়ের হাতের লেখা প্রতি, যাহা হইতে অজিতবাবু কিছু কিছু অংশ নকল করিয়া লইয়া আসেন ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত করেন, সেটি বইখানির মূল পাণ্ডুলিপি, না মুদ্রিত হইবার পরে মুদ্রিত গ্রন্থের নকল? ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছাপা উপন্যাসও নকল করিয়া খাতায় লিখিয়া লইতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর মন্তব্য পাঠে বইখানি যে উপন্যাস, সত্যঘটনামূলক আত্মচরিত নহে, আশা করি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩

গত আশ্বিন-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন: "আমাকে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়-দ্বয়ও বলিয়াছেন যে তাঁহারা যখন উত্তর-ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করেন তখন ডাঃ সরকারের সম্বন্ধে ঐরূপ শুনিতে পান এবং বিশেষভাবে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় উঁহার সন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন" (বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ. ৮৯১)।

সুনীতি বাবু কি শুনিয়াছিলেন বা অজিতবাবুকে বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। আমি আমার নিজের কথাই বলি, কারণ আমার মনে হইতেছে, অজিতবাবুর উক্তিতে একটু ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইতে পারে। আমার একাধিকবার উত্তর-ব্রহ্ম ভ্রমণের সুযোগ হইয়াছিল; দ্বিতীয় বার যখন আমি মান্দালয়ে ছিলাম তখন প্রথম আমি দু-চার জনের মুখে রামলাল সরকার মহাশয়ের কথা শুনি, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মুখেই রামলালবাবুর শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানের কথা শুনি নাই। রামলালবাবুর কথা পূর্ব্বেও আমি 'প্রবাসী'তে পড়িয়াছিলাম; সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার আগ্রহ স্বভাবতই আমার হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে মান্দালয়ে ও মিন্‌জানে আমার পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকদের নিকট এ-বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধানও করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা কেহই বিশেষ কিছু সংবাদ দিতে পারেন নাই। তবে একথা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে উত্তর-ব্রহ্মে সর্ব্বত্রই বাঙালীরা শ্রদ্ধা-সহকারে রামলালবাবুর নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

অজিতবাবুর প্রবন্ধ বাহির হইবার পর এই কথাই আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, এর বেশী কিছু বলি নাই। তবে অজিতবাবু রামলালবাবুর সমস্ত কাহিনীটুকুই কেন উদ্ধৃত করেন নাই, এ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছিলাম বটে। এখন দীনেশবাবুর প্রতিবাদ পড়িয়া এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, গোড়াতেই কিছু গলদ রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

—

"পদ্ম ও শ্রী"

বাংলা অভিধানে অন্যান্য অর্থের সহিত "শ্রী" শব্দের অর্থ—"আলোক", "ঔজ্জ্বল্য", ও "দীপ্তি" পাওয়া যায়। আর 'মনুষ্য-হৃদয়'কে "পদ্ম" বা "কমলে"র সহিত উপমা করা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে—"হৃৎ-কমল", "হৃৎ-কোরক", "হৃদয়-পদ্ম"—এই প্রকার সমাসবদ্ধ পদ সর্ব্বসাধারণে অহরহ পড়িয়া থাকেন। সুতরাং "পদ্ম"র বুকে "শ্রী" প্রতীকের সোজাসুজি অর্থ ইহা ধরিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে "শ্রী" অর্থাৎ আলোক (জ্ঞানালোক) সম্পাতে "পদ্ম" (হৃদয়-পদ্ম) বিকশিত হইতেছে, যেমন সূর্য্যের কিরণে কমল বিকশিত হয়। জ্ঞানালোক-দানে অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশের সহায়তা করাই বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অসাম্প্রদায়িক অথচ কবিত্বপূর্ণ পরিকল্পনা অপর কি হওয়া সম্ভব? ইহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইলে, এক

তদকুন কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হইলে দেশের কবি ও শিল্পীদের সং-ফৌ:-আইন মতে নির্ব্বাসন না করা পর্য্যন্ত তাহা রোধ করিবার আর উপায় নাই।

শ্রীপবিত্রকুমার গুপ্ত

—

"গণতন্ত্রের স্বরূপ"

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় 'গণতন্ত্রের স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্র সমর্থন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এরূপ গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই ইউরোপকে সভ্যতার এক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে" এবং কাজে-কাজেই তাহাই কাম্য। পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল ক্যাপিটালিজমের এক বিশেষ অবস্থার প্রয়োজনের খোরাক জোগাইতে। কাজেই ইহা সমাজের কোন এক বিশেষ অবস্থার উন্নতির প্রতিবিম্ব মাত্র। সমাজশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই লোপ পাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যেরূপ এক দার্শনিক ভিত্তি আছে···প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।" পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল যে-দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহা এখন অচল। কম্যুনিষ্ট শাসনতন্ত্র দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের (Dialectical Materialism) উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের দ্বারাই জীব-ও জড়-জগতের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও এই দর্শনবাদ সমর্থন করিয়াছে। যথা :— (১) কোষের আবিষ্কার (Discovery of the cell), (২) শক্তির রূপান্তরের নিয়মের আবিষ্কার (The discovery of the law of transformation of energy), (৩) ডারউইনের প্রাণীজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম (Darwin's law of organic evolution)। তাহা ছাড়া উত্তরকালের পাশ্চাত্য দর্শনের বড় বড় মনীষীদের নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ফ্রেডারিক এ্যাঙ্গল্‌স্ তাঁহার The Development of Scientific Socialism নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'We German Socialists are proud to trace our origin not only to St. Simon, Fourier and Owen, but also to Kant, Fichte and Hegel. কাজেই দেখা যায়, ফরাসী, ইংরেজ ও জার্ম্মাণ দার্শনিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সামঞ্জস্যেই কম্যুনিষ্ট দর্শনের উৎপত্তি। তাহার পর শেলিং (Schelling), ফয়ারবাক (Feuerbach), ও লেনিনের নিকট হইতেও কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া রাশিয়ার মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা প্লেখানভ (G. V. Plekhanov) বলিয়াছেন,"the materialism of Marx and Engles is a kind of Spinozism." কাজেই উত্তরকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্পিনোজার নিকট হইতেও দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, তিনি বলিয়াছেন, 'কম্যুনিষ্ট দর্শন ঘোর জড়বাদমূলক'। ইহা কম্যুনিষ্ট দর্শন সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ (Dialectics) ও ফরাসী জড়বাদীদের জড়বাদ এই দুয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদই কম্যুনিষ্টগণের দর্শনবাদ। প্রত্যেক কম্যুনিষ্ট লেখকের লেখা হইতেই ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, কম্যুনিষ্টগণের অন্য কোন দেশের অধঃপতিতদের উদ্ধার সাধনের অক্ষমতার আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বরাজনীতি লইয়া আলোচনা করিতে হয়। তাহার স্থান এখানে নহে। তবে তাঁহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক যে কম্যুনিষ্টদের সংগ্রামমূলক কর্ম্মতালিকা ইহার মূলে।

ফ্যাসিজমের উৎপত্তি হইয়াছে কম্যুনিষ্টগণকে দমন করিবার জন্যই। "Fascism is the dictatorship of the Capitalists and the last resort of Capitalism to save itself from Communism." কাজেই ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য্য। ইহার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।

পঞ্চমতঃ কম্যুনিষ্টগণ যে উচ্চ বা মধ্যবিত্তদের ধ্বংস চাহেন তাহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, উচ্চ বা মধ্যবিত্তগণ অনেকটা বিনা পরিশ্রমে কেবল শ্রমিকদের শোষণ করিয়াই বিলাসপ্রিয় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

ষষ্ঠতঃ, ব্রিটেনে যে কম্যুনিজম বা ফ্যাসিজম কোন মতেরই প্রাবল্য দেখা যায় না, তাহার কারণ, ব্রিটেনের পৃথিবীবিস্তৃত সাম্রাজ্য। ইহা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রমাণ নহে। ফ্যাসিষ্টতন্ত্র বা কম্যুনিষ্টতন্ত্র নয় বলিয়াই যে ব্রিটিশ গণতন্ত্র অনুকরণীয় এই যুক্তি হাস্যাস্পদ।

সপ্তমতঃ, কম্যুনিষ্টগণ ডিক্টেটরত্ব বাহাল করিতে চান, তাঁহার এই উক্তি একেবারেই সত্য নহে। ডিক্টেটরশিপ্ অব দি প্রলেটারিয়েট একটি ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। "The Soviet form of Government (meaning thereby the dictatorship of the Proletariat) was introduced by Lenin because it seemed to him, under given concrete conditions, to be the best possible for the transitional period from Capitalism to Communism." দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরত্ব অর্থে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নহে।

লেনিন বলেন, "Our masses do not feel and are not conscious of dictatorship since they are the dictators * * * * step by step the functions of government are socialised and government dies its natural death." অন্য কোন শাসনতন্ত্র অনুরূপ অবস্থা আনয়ন করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। শুধু ফ্যাসিষ্টতন্ত্র বা কম্যুনিষ্টতন্ত্রেই নয়, পরন্তু পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্রেও দেশের শুধু শ্রেণীবিশেষই সন্তুষ্ট।

অষ্টমতঃ, রাশিয়ায় অত্যাচার-অনাচার যাহা ঘটিতেছে, তাহা যে-সব ক্যাপিটালিষ্ট কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাহাদেরই বিরুদ্ধে। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী

[সম্পাদকীয় মন্তব্য। লেখক মহাশয় এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা প্রমাণসাপেক্ষ, সুতরাং বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া যায় না।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

"তুই তুমি আপনি সে তিনি"

ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গে "তুই তুমি আপনি সে তিনি" প্রসঙ্গ দেখিলাম। গুজরাটী ভাষায় 'আপনি' নাই। গুজরাটীর বাংলা অনুবাদ করিতে আন্দাজী কোথাও তুমি, কোথাও আপনি, ব্যবহার করিতে হইয়াছে এবং প্রতিবারই ভাবিয়াছি বাংলা হইতে 'আপনি'কে বিদায় করিয়া দিলে বেশ হইত। গুজরাটীরা এক 'তুমি' দিয়াই সব কাজ সারে—শুনিতেও কিছু খারাপ লাগে না। উহাদের মধ্যে 'তুই' ব্যবহার আছে। আদর করিয়া বা তুচ্ছ করিয়া আমাদের মতই 'তুই' ব্যবহার করা হয়। বাংলায় কেবল 'তুমি' ও 'তুই' রাখিলে ভাল হইত।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

বিদায়

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

রোজা, পিনিন ও কর্ডেরা—এদের তিন জনকে সব সময়েই একসঙ্গে দেখা যেত।

পাহাড়ের নীচে শ্যামল তৃণে ঢাকা সবুজ গালচের মত নরম ও উজ্জ্বল তিনকোণা এক টুকরো জমি। তার একটা কোণ একেবারে রেল-লাইনের প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে আর সেই কোণে নিশান টাঙানোর ডাণ্ডার মত একটা টেলিগ্রাফ-পোষ্ট। রোজা ও পিনিনের কাছে এই টেলিগ্রাফ-পোষ্টটা ছিল বহির্জগতের প্রতীক—এক অজানা রহস্যময় জগৎ—যা মনে ভীতির সঞ্চার করে, অথচ যাকে স্বচ্ছন্দেই উপেক্ষা ক'রে যাওয়া চলে।

শান্ত ও নির্ব্বিরোধী টেলিগ্রাফ-পোষ্টটিকে বহুদিন ধরে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে পিনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ওটা প্রাণপণে একটা শুষ্ক বৃক্ষে পরিণত হবার চেষ্টা করছে মাত্র—ও দেখাতে চাচ্ছে যেন ওর মাথার উপরকার কাচের বাটিগুলি নূতন ধরণের ফলবিশেষ। এই ভেবে সে একদিন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পোষ্টটা বেয়ে উঠে পড়েছিল—তারগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে কিন্তু কাচের বাটিগুলি দেখে তার হঠাৎ গির্জ্জার পবিত্র পাত্রের কথা মনে পড়ে গেল, ভয় পেয়ে সে তখনই দ্রুতগতিতে নেমে পড়ল। মাটিতে নেমে, সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে তবে তার সে ভয় গেল।

রোজার অত সাহস ছিল না বটে, কিন্তু অজানা বস্তু সম্বন্ধে তারই কৌতূহল ছিল অনেক বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পোষ্টের তলায় ব'সে থাকত। তারের ভিতর দিয়ে এক অদ্ভুত অপার্থিব শব্দ ক'রে বাতাস প্রবাহিত হ'ত আর তার সঙ্গে পাইন্-বন থেকে ভেসে-আসা মর্ম্মভেদী হাহাকারের মত বায়ুনিঃস্বন মিশে এক অপূর্ব্ব স্বরলহরীর সৃষ্টি করত—রোজা নিবিষ্ট চিত্তে তাই শুনত। সময়ে সময়ে বাতাসের এই আলোড়ন ঠিক গানের মত বোধ হ'ত—রোজার তখন মনে হ'ত যে এক অজানা জগতের মৃদুগুঞ্জন তারের ভিতর দিয়ে আর এক অজানা জগতে ভেসে চলেছে। বহির্জগতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা যে পরস্পরের মধ্যে কি বাক্যবিনিময় করছে তা জানবার জন্য তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না; সে শুধু চুপ ক'রে বসে আবিষ্টের মত এই রহস্যময় স্বরলহরীর মাধুর্য্য উপভোগ করত।

কর্ডেরার বয়স হয়েছিল, কাজেই সঙ্গীদের চেয়ে তার সাংসারিক বুদ্ধিও ছিল অনেক বেশী। সে বহির্জগতের

সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে বিচ্ছিন্নভাবে দূরে সরে থাকত। তার ধারণা ছিল টেলিগ্রাফ-পোষ্টটা গাত্রঘর্ষণ করবার একটা নির্জ্জীব বস্তুবিশেষ—তাছাড়া ওর যে আর কোন উপযোগিতা থাকতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারত না।

কর্ডেরা হচ্ছে একটি গাভী—সে সংসারের অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। সময় সময় সে আহারের পরিবর্ত্তে বহুক্ষণ ধরে সেই তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রান্তরে ব'সে চিন্তা করত। শান্ত, পরিপূর্ণ জীবন, ধূসর আকাশ ও শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে প্রাণভরে উপভোগ করতে করতে সে মনকে উন্নততর করবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকত।

রোজা আর পিনিনের সব খেলাধুলায় সে যোগ দিত। তাদের উপরে ভার ছিল তার রক্ষণাবেক্ষণের। কর্ডেরার যদি হাসবার ক্ষমতা থাকত তাহলে সে প্রাণ ভরে হাসত; তার—কর্ডেরার—ভার কি না দেওয়া হয়েছে রোজা ও পিনিনের উপর, যাতে সে চারণভূমি ছেড়ে অন্যত্র না চলে যায় বা বেড়া ডিঙিয়ে রেল-লাইনের উপর দিয়ে না ঘুরে বেড়ায়;—যেন সে তাই করতে যাচ্ছে আর কি—তার কি দায় পড়েছে রেল-লাইনে অনধিকারপ্রবেশ করবার জন্য? এ রকম অনাবশ্যক কৌতূহল তার এক বিন্দুও ছিল না। ঘাড় নীচু ক'রে সযত্নে বেছে-নেওয়া কোমল সতেজ তৃণগুচ্ছ নিবিষ্ট চিত্তে চর্ব্বণ করাতেই তার সুখ। তার পরে বাকী সময়টা হয় সে নিশ্চিন্তচিত্তে ব'সে চিন্তা করত নয়ত সুস্থ শরীরে, শারীরিক কোন প্রকার কষ্ট ভোগ না করার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকত। কেবলমাত্র বেঁচে থাকা—নিছক প্রাণধারণ করা—এই ছিল তার একমাত্র কাম্য। সে জানত যে বাকী আর সব কিছুই বিপদসঙ্কুল।

প্রথম যখন এখানে রেল-লাইনের পত্তন হ'ল সেই সময় মাত্র তার একবার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটেছিল; প্রথম দিন ট্রেন চলতে দেখে সে ভয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। ভয়ের চোটে সে অন্য গাভীদের দলে মেশবার জন্য দেওয়াল টপ্‌কে পাশের জমিতে চলে গিয়েছিল। তার এই ভয় কয়েক দিন ধরে সমানভাবেই বর্ত্তমান ছিল। যখনই দূরে এঞ্জিনটা দেখা যেত তখনই অল্পবিস্তর প্রবলতার সঙ্গে তার ভীতি ফিরে আসত।

ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পারল যে ট্রেনটা কোন অনিষ্ট-কারী বস্তু নয়—ও এমন একটা বিপদ যা সব সময়েই দূরে সরে যায়—যা ভয় দেখায় কিন্তু কখনও আঘাত করে না। তখন থেকে সে আর সতর্কতা অবলম্বন করবার বা মাথা নীচু ক'রে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না। তার পর থেকে সে না উঠে, ব'সে ব'সেই ট্রেনটার দিকে চেয়ে থাকত—তার পরে ট্রেনের প্রতি তার সন্দেহ ও অবিশ্বাস একেবারেই দূর হয়ে গেল—আর সে ওটার দিকে তাকাতও না।

রোজা ও পিনিনের মনে কিন্তু রেলপথ সুন্দরতর অনুভূতির সঞ্চার করেছিল। সর্ব্বপ্রথমে একটা ভীতিমিশ্রিত উত্তেজনায় ওদের মন ভরে উঠেছিল—ওরা তখন পরম আনন্দে পাগলের মত নাচত ও নানা রকম অদ্ভুত শব্দ ক'রে চীৎকার করত। তার পর তারা ওটাকে একটা খেলা পেয়ে গেল। সেই বিশাল লৌহময় পদার্থটা যখন সরীসৃপ-গতিতে বহু অপরিচিত লোক বহন ক'রে দ্রুতবেগে চলে যেত তখন তাদের খুব আমোদ হ'ত।

কিন্তু রেলই হোক আর টেলিগ্রাফের পোষ্টই হোক—তারা আর কতক্ষণের জন্য মনকে আকৃষ্ট করে? একটু পরেই আবার বিরাট নির্জ্জনতা এসে তাদের ঘিরে ফেলত। তখন আর কোন জীবিত পদার্থের দর্শন মিলত না, বহির্জ্জগতের কোন সাড়াশব্দও পাওয়া যেত না।

দিনের পর দিন প্রথম সূর্য্যকিরণসমাচ্ছন্ন প্রান্তরে কীট-পতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি শুনতে শুনতে শিশুদুটি ও গাভীটি বাড়ী ফিরে যাবার জন্য দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষা করত, ফিরে এসে আবার স্নান, দীর্ঘ সায়াহ্ন ধরে রাত্রির অপেক্ষায় থাকত।

ক্রমে ক্রমে ছায়াগুলি দীর্ঘাকার ধারণ করত, পাখীর কূজন থেমে যেত, অন্ধকার আকাশে দু-একটি তারা ফুটে উঠত। প্রকৃতির ধীরগম্ভীর মূর্ত্তি শিশুদের মনে শান্ত পবিত্র ভাব জাগিয়ে তুলত, কর্ডেরার পাশে তারা স্থির হয়ে ব'সে থাকত। মাঝে মাঝে কর্ডেরার গলার ঘণ্টার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছু সেই আবেশভরা স্বপ্নময় নীরবতার শান্তি ভেদ করত না।

কাঁচা ফলের দুটি বিভিন্ন অংশের মত অখণ্ডনীয় স্নেহে শিশু দুটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে যে কি পার্থক্য আছে আর কেনই বা যে তারা পৃথক দুটি সত্তা,

এ-সম্বন্ধে তাদের অতি সামান্ত জ্ঞানই ছিল। তাদের এই স্নেহ মাতৃপ্রতিমা গাভীটির প্রতিও বিস্তারলাভ করেছিল। কর্ডেরাও তার শিশু-পালকদের এই স্নেহ—অন্তর ক্ষমতায় যত দূর সম্ভব ফিরিয়ে দিত। তাদের কল্পনাপ্রসূত নানা রকম উদ্ভট খেলার সময় তারা যখন ওর প্রতি বিবিধ অত্যাচার করত তখন ও অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিত। তা ছাড়া ওর ব্যবহারে সব সময়েই একটা সুচিন্তিত বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যেত।

অল্পদিন হ'ল রোজা ও পিনিনের পিতা য়্যাণ্টন এই চারণভূমিটির অধিকার লাভ করেছে, কর্ডেরাও সরস সতেজ তৃণগুচ্ছ ভোজনের সুখলাভ করছে। কিন্তু এর আগে তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পথের পাশের সামান্ত ঘাস-পাতা খেয়েই জীবনধারণ করতে হ'ত।

সেই অভাবের দিনে রোজা ও পিনিন তার জন্তে ভাল ভাল জায়গা খুঁজে বার করত—আর খাদ্যের অন্বেষণে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে যে দুঃখ ও অপমান অনিবার্য্য তার হাত থেকে কর্ডেরাকে বাঁচানোর জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করত।

তার পরে শীতকালে যখন গোয়ালে খড়ের অত্যন্ত অভাব হ'ত, গাজরও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠত তখন রোজা ও পিনিনের আদর-যত্নেই সে কোন রকমে বেঁচে থাকত। তা ছাড়া প্রত্যেক বার বাছুর হবার পর যখন এই প্রশ্ন উঠত যে কতটা দুধ গৃহস্থ পাবে আর কতটাই বা বাছুরের জন্ত থাকবে—রোজা ও পিনিন সব সময়েই কর্ডেরার পক্ষ গ্রহণ করত। সুযোগ পেলেই তারা বাছুর ছেড়ে দিত; সেও আনন্দে লাফাতে লাফাতে আশ্রয় ও আহারের সন্ধানে মায়ের বিশাল শরীরের তলায় লুকতো। তার মা তখন ঘাড় ফিরিয়ে সস্নেহ ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে উপকারী শিশু দুটির দিকে চেয়ে থাকত।

এ-বন্ধন কখনও ছিন্ন হবার নয়, এ-স্মৃতিও মুছে যাবার নয়।

য়্যাণ্টন অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে তার ভাগ্যই খারাপ—আরও অনেক গরু কিনে গোয়াল ভরিয়ে তোলার আশা তার আকাশকুসুম হয়েই রইল। নানা কষ্ট সহ্য ক'রে কোন রকমে এই একটি গরু কেনার পর আর গরু কেনা ত হ'লই না—উল্টে আরও এখন দেখা যাচ্ছে যে তার খাজনা বাকী পড়ে গেছে। এখন কর্ডেরাই তার একমাত্র সম্বল। যদিও কর্ডেরা পরিবারভুক্ত এক জন লোকের মত হয়ে গেছে এবং যদিও তার স্ত্রী শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কর্ডেরাকেই তাদের ভবিষ্যতের প্রধান অবলম্বন ব'লে নির্দ্দেশ করে গিয়েছিল—তবুও ওকে বিক্রি করতেই হবে; তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।

গোয়াল থেকে মাত্র বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়ে আড়াল-করা শোবার ঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মাতা ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দুটি কর্ডেরার দিকে ফিরিয়ে যেন নীরবে তাকে তাঁর শিশুদের মায়ের স্থান অধিকার করতে—যে-স্নেহ পিতার বোঝবার ক্ষমতা নেই সেই স্নেহ দিয়ে তাদের ঘিরে রাখতে—কাতর অনুনয় জানাচ্ছিলেন।

য়্যাণ্টনও বুঝত জিনিষটা—সেই জন্ত সে কর্ডেরাকে বিক্রি করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন কথা ছেলেমেয়েদের বলে নি।

এক শনিবারের খুব ভোরে রোজা ও পিনিন যখন ঘুমিয়ে ছিল, সেই সুযোগে সে কর্ডেরাকে নিয়ে বিষণ্ণচিত্তে হাটের দিকে রওনা হ'ল।

ছেলেমেয়েরা জেগে উঠে তার এ রকম অপ্রত্যাশিত গমনে বিস্মিত হয়ে গেল। তবে তারা বুঝল যে, কর্ডেরা নিশ্চয় অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নেহাৎ বাধ্য হয়েই য়্যাণ্টনের সঙ্গে গেছে। তার পর যখন সন্ধ্যায় ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত দেহে গরুটাকে নিয়ে ফিরে এসেও য়্যাণ্টন তার অনুপস্থিতির কোন কারণ বলল না, তখন রোজা ও পিনিন ভয় পেয়ে গেল।

গরুটা বিক্রি হয় নি। অপরিসীম মমতাবশতঃ য়্যাণ্টন এত বেশী দাম হেঁকেছিল যে কেউ তা দিতে রাজী হয় নি। সে তখন মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিল যে সে ত বিক্রি করতেই চেয়েছিল, কাজেই তার আর কোন দোষ নেই। লোকে যদি এখন কর্ডেরার উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী না হয়, ত সে কি করতে পারে?

রোজা ও পিনিন যেদিন থেকে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়েছে সেদিন থেকে আর তাদের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। যেদিন জমিদারের লোক এসে বাড়ী বেদখল হয়ে যাবে বলে ভয় দেখিয়ে গেল, সেদিন তাদের আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হ'ল।

কর্ডেরাকে শেষ পর্য্যন্ত বিক্রি করতেই হবে—হয়ত অতি সামান্য মূল্যেই বিক্রি করতে হবে।

পরের শনিবারে পিনিন বাবার সঙ্গে হাটে গিয়ে সশস্ত্র কসাইদের দিকে ভীতদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তাদেরই এক জনের কাছে গরুটা বিক্রি হয়ে গেল। কর্ডেরার গায়ে চিহ্ন দিয়ে দেওয়ার পর সেদিনকার মত তাকে আবার গোয়ালে ফিরিয়ে আনা হ'ল। তার গলার ঘণ্টাটা সারা রাস্তা বিষণ্ণভাবে মৃদু টিং টিং শব্দ করতে করতে চলল। য়্যান্টন নিঃশব্দে ক্লান্ত পদক্ষেপে পথ অতিক্রম করতে লাগল। কেঁদে কেঁদে পিনিনের চোখ ফুলে লাল হয়ে উঠল। রোজা যখন শুনল যে কর্ডেরা বিক্রি হয়ে গেছে সে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পরের কয়টা দিন গভীর দুঃখের ভিতর দিয়ে কাটল। কর্ডেরা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। অতএব সে আগের মতই নিশ্চিন্তচিত্তে বিচরণ করত। কসাইয়ের নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে এমনিই নিশ্চিন্ত থাকবে। কিন্তু পিনিন ও রোজা প্রতীকারহীন দুঃখে, বিমর্ষ চিত্তে, নীরবে ঘাসের উপর শুয়ে থাকত। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজে পেত না।

বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তারা টেলিগ্রাফের তার এবং ট্রেনের দিকে চেয়ে থাকত—ওরা সেই বহির্জ্জগতেরই অংশ, যে-বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নেই কিন্তু যা তাদের একমাত্র বন্ধুর সঙ্গ থেকে তাদের চিরতরে বঞ্চিত করছে।

কয়েক দিন বাদে বিদায় নেবার পালা এল। কসাই নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। য়্যান্টন তাকে বসিয়ে জোর ক'রে কর্ডেরার নানা রকম গুণ ব্যাখ্যান করতে লাগল। সে ভাবতে চাইছিল, কর্ডেরা বুঝি অন্য এক জন গৃহস্থ প্রভুর কাছে যাচ্ছে—যে তাকে আদরযত্ন করবে। কর্ডেরা কত দুধ দেয়, কেমন শান্ত, কেমন লাঙল টানতে পারে ইত্যাদি নানা কথা সে ব'লে চলল। কসাই কিন্তু আসলে কর্ডেরার কপালে কি আছে ভেবে মনে মনে হাসতে লাগল।

পিনিন ও রোজা পরস্পরের হাত ধরে একটু দূর থেকে এই শত্রুর দিকে চেয়েছিল। তাদের মনে পড়ছিল কর্ডেরার সঙ্গে অতীতে সুখের দিনগুলি কাটানোর কথা। যখন কসাই কর্ডেরাকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল, তখন তারা তার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

কিছু দূর অবধি তারা গাভীটির অনুসরণ করল। নির্ব্বিকার কসাই, অনিচ্ছুক গাভী ও শোককাতর দুটি শিশু—সবসুদ্ধ মিলে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সমাবেশ হয়েছিল। গলির মোড় অবধি পৌঁছে রোজা ও পিনিন আর এগলো না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দূরে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে কর্ডেরা অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তাদের পালয়িত্রী মা, তাদের ধাত্রীমাকে তারা চির-দিনের মত হারাল।

"বিদায়, কর্ডেরা, বিদায়"—ব'লে রোজা কেঁদে ফেলল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পিনিনও বলল, "বিদায়, কর্ডেরা।"

বহু দূর থেকে ভেসে-আসা কর্ডেরার গলার ঘণ্টাধ্বনিও যেন বলল—"বিদায়।"

পরদিন প্রত্যুষে রোজা ও পিনিন সেই মাঠে গেল। জায়গাটাকে এর আগে কখনও এমন ভয়াবহ নির্জ্জন—এমন মরুভূমির মত শ্রীহীন বোধ হয় নি।

সহসা দূরে কালো ধোঁয়া দেখা গেল—তার পর ট্রেন এসে পড়ল। ছোট ছোট জানালাওয়ালা প্রকাণ্ড বাক্সর মত একটা কামরায় অনেক পশু দেখা গেল। বহির্জ্জগতের অত্যাচার ও পীড়ন সম্বন্ধে এইবার সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হয়ে রোজা ও পিনিন ট্রেনের দিকে চেয়ে তাদের ছোট ছোট হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দেখাতে লাগল।

"ওরা তাকে কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছে।"

"বিদায়, কর্ডেরা।"

"বিদায়, কর্ডেরা।"

বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে রোজা ও পিনিন তাকিয়ে রইল নিষ্ঠুর জগতের প্রতীক রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের দিকে। মাত্র লোভাতুর রসনার পরিতৃপ্তির জন্য যে-জগৎ তাদের এত কালের সঙ্গীকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেই অকরুণ জগতের প্রতি ঘৃণায়, ক্ষোভে, রোষে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আবার তারা একসঙ্গে বলল—

"বিদায়, কর্ডেরা।"

"বিদায়, কর্ডেরা।"*

---

*Leopoldo Alas লিখিত "Adios, Cordera" নামক গল্পের অনুসরণে।

বিশ্বপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য কবি এই বহিখানি লিখিয়াছেন। তাহারা ইহা আনন্দের সহিত পড়িবে ও পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিবে। অধিকবয়স্কেরাও ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবে। ইহাতে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর জগৎ, গ্রহলোক, ও পৃথিবী—এই পাঁচটি অধ্যায় আছে; তদ্ভিন্ন উপসংহার আছে। আণ্ড্রমেডা নীহারিকা, ১৯১০ সালে হেলীর ধূমকেতু, এবং শনিগ্রহ ও পৃথিবী—এই তিনটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি আছে। ছবিগুলি বেশ ভাল। ছবি আরও বেশী দিলে ভাল হইত।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পত্রের আকারে লিখিত ভূমিকায় কবি বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইবার ইতিহাস অল্প দিয়াছেন। তাঁহাদের গৃহশিক্ষক পরলোকগত সীতানাথ দত্ত তাঁহাদিগকে কি শিখাইতেন তাহার আভাস দিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কি প্রকারে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বাল্যকালের পর কবি বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। "বিশ্বপরিচয়" লিখিবার পূর্বে ও লিখিবার সময়েও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পুস্তক পড়িয়াছিলেন। স্বীয় আবাল্যসঞ্চিত বহুজ্ঞানের কিয়দংশমাত্র এই পুস্তকে তিনি সরস ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই, যে, ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাহাদের সমক্ষে শুধু খুব সোজা জিনিষই উপস্থিত করা উচিত নহে, কিছু শক্ত জিনিষও দেওয়া আবশ্যক এবং উচিত। এই ধারণা খুব ঠিক। কঠিন যাহা তাহার সহিত না-লড়িলে শক্তির বিকাশ হয় না। পুস্তকখানির রচনায় তিনি তাঁহার উক্ত ধারণার অনুসরণ করিয়াছেন।

ছড়ার ছবি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীনন্দলাল বসুর দ্বারা চিত্রাঙ্কিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ ও দুই টাকা। ইহার মলাট ও ছাপা সুন্দর।

কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।" আমরা বুড়োরাও অর্থলোভী হইব না বা থাকিব না যদি ধ্বনির মত ধ্বনি পাই, যেমন পাইয়াছি এই বহিখানিতে। আমরা কোন কোন ছড়ায় এমন ট্র্যাজিডি পাইয়াছি, যাহা মর্ম্মকে শুধু স্পর্শ করে না, মন্থন করে। যেমন, "পিস্‌নি"। তার ছবিখানিও কি চমৎকার! ছেলেমেয়েরাও এইরূপ ছড়ার মজ্জাগত বেদনা অনুভব করিবে, যদিও বর্ণনা করিতে পারিবে না। তাহারা এই প্রকারে নিজেদের অজ্ঞাতসারে দুঃখী জনের সহিত সমবেদনায় অনুপ্রাণিত হইয়া সকল মানুষের সহিত একাত্মতার দিকে অগ্রসর হইবে। এই মনোজ্ঞ ছড়াগুলি পড়িয়া ও তাহার উৎকৃষ্ট ছবিগুলি দেখিয়া ছেলেবুড়ো সকলেই আনন্দিত হইবে।

(১) সব-হারাদের গান, (২) মরু-জয়ের সেনা, (৩) বঙ্কিমের স্বপ্ন; (৪) অভিশাপনা আশীর্ব্বাদ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, এবং ৪ নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা, নবজীবন সংঘ হইতে শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে আট আনা, আট আনা, দুই আনা, ও দুই আনা।

এই চারিখানি বহির মধ্যে প্রথমটি কবিতার পুস্তক, অন্য তিনটি গদ্যে লিখিত। সকলগুলিতেই লেখকের স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আশাশীলতা, তারুণ্য, এবং মানবের কল্যাণার্থ শক্তির জাগরণ-প্রতীক্ষা লক্ষিত হয়। কি পদ্যে কি গদ্যে তাঁহার ভাষা তেজস্বিনী। তাঁহার উদ্দীপনা ও উন্মাদনা পাঠকদিগকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে লেখকের সমভাবাপন্ন করে। তাঁহার লিখনভঙ্গী বাগ্মীদের ভাষণভঙ্গীর মত বেগবান্ ও শক্তিসঞ্চারক।

"সব-হারাদের গান" বহিটিতে 'সব-হারাদের গান,' 'রক্ত-জবা,' 'রক্ত-উষার যাত্রীদল,' 'মুক্তি-অভিযান,' 'আপনার পানে ফিরে তাকাও,' 'বিজিতের গান,' 'কবির প্রতি,' 'পার্থ,' 'স্বাধীনতা,' ও 'প্রভাতে,' এই দশটি কবিতা আছে। যে কবিতাটির মর্ম্মগত ভাব যেরূপ, তাহার ছন্দ ও ভাষা তাহার অনুরূপ। প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র পরিচয় দিবার স্থান নাই। প্রথম কবিতাটিতে কবি সব-হারাদিগকে বলিতেছেন,

"সাম্যের যুগ এল ধরণীতে, এই যুগে নরনারী
রহিবে না কেহ উপবাসী ঘরে, প্রাসাদ-তোরণে দ্বারী
দিবে না তাড়ায়ে কাঙালের দলে, মূর্খ রবে না কেহ,
নর বেচিবে না বাহুর শকতি, নারী বেচিবে না দেহ,
সব-হারা যারা দুনিয়ায় তারা সবের মালিক হবে—
যুগের শঙ্খে এই মহাগান বাজে ভৈরব রবে।
সময় নিকট হয়েছে বন্ধু, দুঃখ বেদনা ভোল;
ভগবান আসে আকাশে আকাশে আনন্দ-গান তোল।
ব্যথার সাগরে নিশার আঁধারে রক্তিম শতদল
করিছে রচনা তাঁহারই আসন,—মোছ মোছ আঁখিজল।"

'কবির প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি লেখক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন, মনে করি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। অনেক স্বাধীন দেশের বিদেশী ও বিদেশিনী ভারতীয় আত্মার ও সংস্কৃতির উচ্চস্তরে বিবেকানন্দের ও গান্ধীর সহিত মিলিত হইয়াছেন ব মিলনের প্রয়াসী। এই উচ্চস্তরে স্বাধীন দেশের বহু বিদেশী ও বিদেশিনী কি রবীন্দ্রনাথের সহিতও মিলিত হইতে পারেন না? কোন জাতির রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও আর্থিক দুর্দ্দশা ঘটিলে তাহার কি কোন সম্পদ, মানুষকে দেখাইবার ও দিবার কোন কিছুই থাকিতে পারে না? রবীন্দ্রনাথের "ভৈরব সুর," "ভীষণ-মধুর" বীণা কি এখনও শোনা যায় না?

"মরু-জয়ের সেনা" পুস্তকে লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী, ট্রটস্কি, রমাঁ রোলাঁ, ওয়াল্ট হুইটম্যান, গান্ধীজী, পণ্ডিত জবাহরলাল, এবং বিবেকানন্দের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব বা বাণীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ঠিক বলিয়াছেন যে ইঁহাদের মত মানুষদের "জীবন ও বাণীকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলে বর্ত্তমান জগতের সাধনার ধারাকে জানার পথ প্রশস্ত হবে।"—

তিনি ষ্টালিন ও ট্রট্স্কি উভয়কেই বুঝিবার ও বুঝাইবার ঠিক্ পথ ধরিয়াছেন। লেখক তাঁহার এই পুস্তকে ও অন্যত্রও, অমুক অমুকের প্রতিধ্বনি, এই রকম কথা দু-এক জায়গায় বলিয়াছেন। কে কাহার প্রতিধ্বনি, কে কাহার নহেন, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কেবল এইটুকু বলিতে চাই, যে, জওহরলালজীই যে ক্যাপিট্যালিজমের বিরোধী তাহা নহে, গান্ধীজীও বিরোধী। জবাহরলাল হয়ত ক্যাপিট্যালিষ্ট মানুষগুলার অন্তর্ধান চান, গান্ধী চান তাহাদের ধনিক প্রাণটার অন্তর্ধান। তাহারা জনসেবার জন্য ট্রাষ্টী রূপে ধনের অধিকারী, এই ভাব দ্বারা তাহাদের অনুপ্রাণিত হওয়া গান্ধী চান। লেখক বলেন, "জওহরলাল আর গান্ধীজীর কথা বিবেকানন্দের বাণীরই অনেকটা প্রতিধ্বনি। স্বরাজ হবে দরিদ্রের স্বরাজ—এই যে আশার বাণী উৎসারিত হ'চ্ছে গান্ধীজীর আর জওহরলালের কণ্ঠ থেকে এই বাণীর পিছনে রয়েছে স্বামীজীর স্বপ্ন।...বিবেকানন্দের এই স্বপ্নই তো রূপ নিলো স্বদেশী আন্দোলন আর গান্ধী আন্দোলনের মধ্যে।...আমরা জানি বর্ত্তমান ভারতের তিনিই [অর্থাৎ বিবেকানন্দই] স্রষ্টা।" এই সমুদয় কথার যাথার্থ্যের প্রমাণস্বরূপ লেখক যদি মহাত্মা গান্ধীর ও পণ্ডিত জবাহরলালের এইরূপ কথা ভবিষ্যতে উদ্ধৃত করেন, যে, তাঁহারা বিবেকানন্দ স্বামীর বাণীর দ্বারা দরিদ্রের স্বরাজ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে, তিনটি বিষয়ে তিনি রামমোহন রায়ের পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন—"his acceptance of the Vedanta" (তৎকর্ত্তৃক বেদান্ত গ্রহণ)" "his preaching of patriotism" ("তৎকর্ত্তৃক স্বদেশভক্তি ও স্বদেশহিতৈষণার প্রচার)" এবং 'that love which embraced the Hindu and the Musalman equally" ("সেই প্রেম যাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে সমভাবে আলিঙ্গন করে)।" স্বামীজী নিজে এই কথা বলিয়া থাকিলেও ইহা আমরা বলি না ও ইহা সত্য নহে, যে, স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহন রায় বা অন্য কাহারও প্রতিধ্বনি। ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বহু মনস্বী ব্যক্তি রামমোহনকে আধুনিক ভারতের জনক ("The Father of Modern India") বলিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও আমরা ইহা সত্য মনে করি না ও বলি না, যে, রামমোহনের পরবর্ত্তী নেতারা সকলেই তাঁহার প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দেরও মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও নেতাকে তাঁহার অধমর্ণ বা প্রতিধ্বনি মনে করিবার ও বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

"বঙ্কিমের স্বপ্ন" নামক বহিটিতে ঐ নামের প্রবন্ধটি ছাড়া আরও তিনটি প্রবন্ধ আছে। 'বঙ্কিমের স্বপ্ন' প্রবন্ধটির লেখা খুব ভাল। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে, যে, তিনি "আনন্দমঠ" লিখিবার আগে বিখ্যাত ও অবিখ্যাত দেশভক্তদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণে "পরাধীনতার কোন বেদনা ছিল না।" তাহা যে ছিল, তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়।—'লজিক বা ম্যাজিক' প্রবন্ধে বরিশাল কনফারেন্সে বিপিনচন্দ্র পালের অভিভাষণের কোন কোন উক্তির সমালোচনা আছে, তাঁহার আশ্চর্য্য বাগ্মিতা ও স্বরাজ-ব্যাখ্যার প্রশংসাও আছে। বিপিনচন্দ্রের জীবনের শেষ দিকে যে তাঁহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা মনে আছে; কিন্তু তাঁহার বরিশালের বক্তৃতাটির সব কথা—প্রধান কথাটিও—এখন মনে না থাকায়, প্রবন্ধটির আলোচনা করিব না।

"অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ" বহিটিতে ঐ নামের প্রবন্ধটি ছাড়া 'মুক্তির ডাকে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধও আছে। 'অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ' প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের একটি প্রবন্ধের আলোচনা। উহা পড়ি নাই, সুতরাং আলোচনাটির আলোচনা করিতে পারিব না। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, যে, মানব-সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানবাত্মার বিকাশের জন্য এমন বহু বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যক, যাহা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়বিধ দেশেই আবশ্যক। এরূপ কোন বিষয়ের অনুশীলনের উপযোগী প্রতিভা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা পরাধীন দেশেও তাহা করিলে তাঁহাদের শক্তির অপপ্রয়োগ হয় না। 'মুক্তির ডাকে' প্রবন্ধে লেখক স্বাধীনতা-অর্জ্জনের অভিযানে যৌবনকে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। যৌবন কোন কোন মানুষের বয়স-নিরপেক্ষ। যেমন গান্ধীজী।

র. চ.

পর্ণজা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটি গদ্য-কবিতার সমষ্টি। "কি গদ্যে কি পদ্যে যে সকল কথা সমান অচল অপাঙ্‌ক্তেয়" সাহিত্যে তাহাদের স্থান দেবার জন্য এবং 'যে সব তুচ্ছ ঘটনা বা বিষয় ছন্দের প্রসাধনে হয় হাস্যকর বা বেখাপ্পা' তাদেরও সাহিত্যের মর্য্যাদা দেবার জন্য লেখক এই গদ্য-কবিতাগুলি রচনা করেছেন। ইংরাজী লিপিত ভাষায় অনেক কথাকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয় সত্য, কিন্তু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলা গদ্য ভাষাকে এমন একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন যার ফলে আজকাল বাংলা গদ্যে কোন বাংলা কি অবাংলা শব্দ কি রচনাপদ্ধতিকেই আর অচল কি অপাঙ্‌ক্তেয় বলা যায় না। তুচ্ছ এবং হাস্যকর ঘটনা ও 'ক্ষণিকা' ও 'কথিকা' যুগের পর থেকে সাহিত্যে আসর পাবার সাহস সঞ্চয় করেছে। সুতরাং এই গদ্য-কবিতাগুলি গদ্য ও কবিতা দুই অংশে বেশ ভাগ হয়ে যেতে পারত। তাতে কাব্যাংশের স্থায়িত্ব বাড়ত।

বইখানি পড়তে আমাদের ভাল লেগেছে। আগাগোড়া একটানা কৌতূহলের সঙ্গে পড়ে যাওয়া যায়, কারণ রচনাগুলিতে বৈচিত্র্য আছে। এতে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে লেখক অপাঙ্‌ক্তেয় বল্লেও আমরা একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দ বিশেষ খুঁজে পেলাম না। অনেকগুলিই বেশ বিশিষ্ট ভাষায় রচিত। ভাষার মার্জ্জিত শ্রী রক্ষা করা বিষয়ে মৈত্র মহাশয় যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই বইখানিতেও 'অসমাপিকা', 'প্রেমোন্মুক্ত', 'ভূমি', প্রভৃতি কবিতায় পাই। অন্যত্র সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি বেশ সহজেই স্থান পেয়েছে তাঁর লেখনীর গুণে।

ব্রাহ্মণী, সমস্তা, প্রত্যাগতা, প্রতিভূ, বিনিময়, যাত্রিণী, পুরুৎঠাকুর, ঘটকালি, গল্প, প্রভৃতি কবিতাগুলির বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব উপভোগ্য।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য। বাহিরের মূর্ত্তি ও ভিতরের গতি দুই বেশ হাল্কা ঝরঝরে।

শ.

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রাপ্তিস্থান: কমলা বুক ডিপো ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১০৮, মূল্য দশ আনা।

পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বালক-বালিকাদের মনে যে-সকল প্রশ্ন ও কৌতূহল স্বভাবতই জাগরিত হয়, এবং অন্যান্য যে-সকল তথ্য সম্বন্ধে লোকের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহা মিটাইবার মত বই বাংলায় বেশী নাই। এই বইটি সেই প্রয়োজন অনেকখানি পূর্ণ করিবে। 'কি ও কেন' প্রশ্ন ও তাহার উত্তরগুলি বিষয়ানুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা, শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতিষ, এবং কতকগুলি বিখ্যাত আবিষ্কারের নাম, সাল, আবিষ্কর্ত্তা ইত্যাদির তালিকা।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ৮২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪৪।

এই পুস্তক ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়; চারি বৎসরের মধ্যে নাটক, নভেল, সিনেমা ও চুটকি গল্পে পরিপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশে এই শ্রেণীর পুস্তকের প্রথম সংস্করণের নিঃশেষ ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ অভাবনীয় হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করিতেছে। কেবল সুধীসমাজ, ইতিহাস-লেখক বা আলোচনাকারী নহে, সাধারণ পাঠকও যে ইহার সমাদর করিয়াছেন তাহা আনন্দের বিষয়। নাটক নভেল না হইলেও, শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী জীবনের প্রামাণিক চিত্র হিসাবে গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহলোদ্দীপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণটিও পূর্ব্বের মত সমাদর লাভ করিবে।

'প্রবাসী'তে প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় এই গ্রন্থের মূল্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়; কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণে যে-সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের আকার এবং ইহার সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল যে নূতন তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা নহে, প্রায় শত পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় পরিশিষ্টে সে-যুগের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় সমসাময়িক গ্রন্থ ও পত্রিকাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রজেন্দ্রবাবুর স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম ও ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। ইহার পর, অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের যে বিস্তৃত সূচী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তৎকালীন ভাষার পরিচয় ও আলোচনার যথেষ্ট সাহায্য করিবে। বিষয়-সূচীও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিতাকার ও পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতা ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা, এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জীবনের সকল দিক্ সম্বন্ধেই সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবনচরিত সঙ্কলিত করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অপরিহার্য্য। সেকালের একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্র হইতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় এইরূপ সমুদয় তথ্য সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।" এই সংবাদপত্র হইতেছে সেকালের বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ'। শ্রীরামপুরের মিশনরীগণের দ্বারা পরিচালিত হইলেও পত্রিকা-সম্পাদনের ভার দেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল; সেই জন্য ইহা ঠিক মিশনরী পত্রিকা ছিল না এবং ইহাতে ধর্ম্ম-আলোচনা কোনও স্থান পায় নাই বলিলেও চলে। দেশী ও বিলাতী সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের সার-সঙ্কলন, সমাজ শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য তৎকালীন আচার-ব্যবহারের বর্ণন প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পত্রিকাখানি পূর্ণ থাকিত; এবং সম্পাদন গৌরবে ও স্থায়িত্ব হিসাবে (১৮১৮ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) 'সমাচার দর্পণ' সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে-সকল সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের পুরাতন ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে সমাচার দর্পণের প্রায় অধিকাংশ ফাইল পাওয়া গিয়াছে; এবং অন্য সংবাদপত্রের মধ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কলনে যে-সকল তথ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই সমাচার দর্পণ হইতে গৃহীত; তবে পরিশিষ্টে অন্যান্য পত্রিকা হইতেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশের পাঠ মূলের সহিত সযত্নে মিলাইয়া যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ভূমিকায় নূতন করিয়া সমাচার দর্পণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজিত করা হইয়াছে, এবং শত বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি চিত্র, তৎকালীন বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার পরিচয় হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটি সঙ্কলন মাত্র নহে। নিছক সঙ্কলন হিসাবে ঐতিহাসিক ও গবেষণাকারীর পক্ষে ইহা মূল্যবান প্রমাণ পঞ্জী হইলেও, ইহাতে গত যুগের সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও আচারের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ পাঠকেরও চিত্তাকর্ষক। উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী সমাজের একটি স্মরণীয় যুগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় ও জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই। এই যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্বে, বাঙ্গালী-জীবনের প্রায় সকল দিক্ সম্বন্ধে সংবাদ ও তথ্য, সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু ইহার ধারাবাহিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেন নাই, কিন্তু এই ইতিহাস লিখিবার নির্ভরযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই উপকরণ বর্ত্তমান খণ্ডে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ, এই চারি ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা বিস্তার, এবং হিন্দু কলেজ, স্কুলবুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে ও চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, সাহিত্য, ভাষা ও মুদ্রণ পুস্তক পত্রিকা সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এ-সকল তথ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান্। তৃতীয় ভাগে, সামাজিক আচার-ব্যবহার, নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন, স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে। চতুর্থ বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়, যেমন পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, মেলা, তীর্থস্থান ইত্যাদি। 'বিবিধ' শীর্ষক পঞ্চম ভাগে কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সঙ্কলন করা হইয়াছে।

ইহা সুখের বিষয় যে, প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় এই গ্রন্থের মূল্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা বাংলা-দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে এই পুস্তক, ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থের পূর্ব্বগৌরব শুধু রক্ষিত হয় নাই, নূতন তথ্যের সমাবেশে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

রুচিরা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। কবিতার বই।

কতকগুলি কবিতা দুর্লভ মাধুর্য্যরসে টলমল। যেমন 'আগমনী', 'শরৎরাণী', 'কাঁচা', 'দোলা'। অধিকাংশ কবিতাই ছন্দ, ভাষা ও ভাবে গুরুগম্ভীর। অথচ কোথাও বাজে কথার বাগাড়ম্বর নাই।

ইহার মধ্যে 'আঁধার পারে', 'প্রতিধ্বনি', 'ছন্দ', 'স্বাধীন প্রাণ', 'চিত্রমন্ত্র', 'চৈত্রযাত্রা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ছাপাইয়া বা তাহাদের সাহায্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির সহজ আনন্দ, প্রেম ও সেবার ফিলজফি। এই সিনিসিজম্ ও পেসিমিজমের দিনে এই কবিতাগুলিতে সত্যই মুখশুদ্ধি হয়।

বই পড়িতে-পড়িতে প্রথমেই চোখে পড়ে কবির অক্ষুণ্ণ যৌবন। 'যায়' কবিতা পড়িতে-পড়িতে একবার মনে হইয়াছিল, বুঝি বুড়ার সুর মিলিতেছে: "বুকজুড়ানো, সেই হারানো, সেই পুরানো আস্‌বে না" ইত্যাদি। কিন্তু পরেই দেখি—

"পাহাড়-ঘেরা বনের বেড়ায় শীতের হাওয়ার ক্রন্দনে,
বাধার কথা রচার মত নূতন গাথার ছন্দ নে।—"

এটি ত ঠিক বুড়ার কথা নয়।

"তৃপ্তি যেন এ বেদনা হরে না-রে, হরে না।"
"হে আদিত্য ভ্রান্তচিত্তে মোক্ষ চিন্তা দাও পোড়াইয়া।
বিষসহ অদৃষ্টকে বুকে-বুকে দাও জড়াইয়া।"
"মৃত অতীতের কঙ্কালে গড় পাহাড়ে দেবতা নাই।"
(গঙ্গার উক্তি) "বিজন বনের ঊর্দ্ধপথে শুদ্ধি নাহি চাই।
ধরায় যারা তাপে জ্বলে গলায় গলায় আমার জলে
দাঁড়াক তারা, পাপের ধারায় মলিন হয়ে যাই।"
"জাগে উহার পারে জাগে নিঝুম রাতের বেলা।
আছে বেলা, থাকবে বেলা, খেলা-রে তুই খেলা।"
"নাশি ধীরতার শান্তি, গুরু ক্লান্তি এস ঝঞ্ঝা।"
"সখ্যে বাঁধি বক্ষে বক্ষ, ভুলিব না লক্ষ্য-খোঁজা মোহে।"
"অল্পে নাই সুখ, সে ত মিথ্যা ভ্রান্তবাদ;
ক্ষুদ্রে মিলাইয়া ক্ষুদ্র, বাঁধিছ অপার পারে বাঁধ।"

সরস সবল ভাষায় এই সব বলিবার মত প্রচণ্ড যৌবন এ-বয়সে বজায় রাখা শক্ত। নিজের জীবনে জরার স্পর্শ অনুভব করিয়া কবির অবিকৃতিতে আরও বিস্মিত হইতেছি।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

জলসাঘর—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বারোটি ছোট গল্পের সমষ্টি এই বইখানি পাইয়া অন্য দশখানা বাংলা গল্পের বই যেমন তাচ্ছিল্য করিয়া পড়ি তেমনি করিয়াই পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সমস্ত মন আমার সজাগ হইয়া উঠিল। এমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্য এবং গল্প বলিবার সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীতে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দেখিলাম, তারাশঙ্করের লেখাই শুধু পাকা ওস্তাদি হাতের নয়, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে পরিপূর্ণ রসানুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইবার ধ্যানযোগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। প্রচ্ছদপটের পুস্তকপরিচয়ে বলা হইয়াছে, "জলসাঘরের চরিত্রগুলি কল্পনার ঊর্দ্ধলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসে নাই—মাটির পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমশ কল্পনার ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে।" পড়িতে পড়িতে দেখিলাম যে ঊর্দ্ধলোকে উঠিবার আবশ্যক তাহাদের হয় নাই। এই মাটির পৃথিবীতেই তাহারা রসের স্বর্গ রচনা করিয়া চলিয়াছে। শোকদুঃখ সুখসম্পদ জন্মমৃত্যু পাপপুণ্য তুচ্ছমহানের অজস্র দ্বন্দ্বের সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত রসের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই রসের স্বর্গের সন্ধান লেখক লাভ করিয়াছেন, স্বর্গের দেবতাদিগকেও এই অমৃতের স্বর্গে লোভাতুর করিয়া মাটির পৃথিবীতে টানিয়া নামাইয়া আনিবে।

প্রথম গল্প 'জলসাঘর' দুই ভাগে বিভক্ত; রায়বাড়ি ও জলসাঘর। একটি প্রতাপশালী জমিদার-গৃহের মধ্যাহ্নসূর্য্যের খরদীপ্ত মহৎ প্রচণ্ডতার ভাস্বর ও অপরাহ্ণে তাহার অস্তমান সন্ধ্যারাগের গাম্ভীর্য্য ও কারুণ্যে বেদনা-মন্থর। গল্প দুইটির বিশেষত্ব এই যে আখ্যানবস্তু বর্ণনা করিবার প্রয়াসে এই গল্পের সৃষ্টি হয় নাই, একটি জমিদার-বাড়ী ও তাহার পারিপার্শ্বিকের চিত্র আঁকিতে আঁকিতে গল্পটি কখন তাহারই মধ্যে হইতে আপনি জন্মলাভ করিয়াছে। এই নিতান্ত দৈনন্দিন ও সাধারণ পারিপার্শ্বিক, যাহার মধ্যে আমরা নিত্য বিচরণ করিয়া ফিরিতেছি অথচ অজস্র চিত্র স্রোতের মত যাহা আমাদের চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে মাত্র—মনকে স্পর্শও করিতেছে না, তাহারই উপর অপূর্ব্ব আলোকপাতে লেখক যেন আপনারও অজ্ঞাতে, এক-একটি চিত্রনাট্য মানসপটে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। নিজের গল্প হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত করিয়া রাখিবার এই সুকঠিন নির্ব্বিকল্পতাই লেখকের সব গল্পগুলির মধ্যেই অল্পবিস্তর ফুটিয়াছে এবং অন্যান্য সাধারণ গল্পলেখক হইতে তাহাকে একটি মনোহর বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

গল্পগুলি পাঠ করিবার পর সাহিত্যরসিক বন্ধুদের মধ্যে যাহাকেই পাইয়াছি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "ওহে, পড়েছ? জলসাঘর?" দেখিলাম, প্রায় কাহারও বাকী নাই। বাহির হইয়াই ইহা সকল সাহিত্যিকের মন সহজেই হরণ করিয়া লইয়াছে। বাংলা গল্পের দুর্ভিক্ষের দেশে এ যেন অমৃতবৃষ্টি। গল্পগুলি পল্লীর নরনারী, এবং গ্রাম্য প্রকৃতি ও বিষয়ব্যাপারের অতিসূক্ষ্ম ঘনিষ্ঠ সহজপরিচয়ের সম্পদে প্রাণবান্। লেখক অত্যন্ত অনায়াসে নিতান্ত ঘরোয়া মানুষ হইয়া পল্লীর এই উপেক্ষিত জনসাধারণের মর্ম্মস্থলে প্রবেশলাভ করিয়াছেন এবং অনন্যসুলভ অপূর্ব্ব দক্ষতায় তাহাদের রসের ভাণ্ডার আমাদের বুভুক্ষু নয়নের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ নাই যে প্রত্যেকটি গল্পই অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি—আবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লইয়া রুচি ও মতভেদও হইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রায় কোনো-না-কোনো গল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। আমার কাছেও মনে হইয়াছে "টারা" গল্পের বুঝি তুলনা হয় না। "টহলদার," "ডাক-হরকরা," "তারিণী মাঝি" ছোটগল্প-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে; এবং বাদ্যের সঙ্গতির মধ্যে মৃদঙ্গধ্বনি যেমন শ্রোতার অজ্ঞাতসারেও তাহার সমস্ত সত্তাকে পূর্ণ করিয়া রাখে "জলসাঘর" ও "রায়বাড়ি"ও তেমনি করিয়া মনকে তাহাদের শ্রদ্ধাভয়মিশ্রিত মহনীয়তায় অভিভূত করিয়া দেয়। এমন গল্প যে বাংলা ভাষায় লেখা সম্ভব তাহা ভাবিয়া অবাক হইয়াছি। ইউরোপ হইলে এমন গল্পের বই ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ বিক্রয় হইয়া যাইত।

শ্রীজীবনময় রায়

বিবাহ-রহস্য—শ্রীরাধানাথ দত্ত চৌধুরী কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৮।১, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

গ্রন্থকার মহাভারতকে মূল ভিত্তি করিয়া হিন্দুর বিবাহিত জীবনে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একত্র করিয়া এই সঙ্কলন পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় মতামত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সঙ্কলনকার্য্যে গ্রন্থকার বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে তথ্যগুলি বহু স্থানে যথাযোগ্য সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ভাষাও বিশেষ প্রাঞ্জল নয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

মানুষের মন—উপন্যাস। শ্রীজীবনময় রায়। প্রকাশক ভারতী ভবন, ২১০ বি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী ৪০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা, কাপড়ের সুন্দর বাঁধাই। মূল্য তিন টাকা।

একটা জিনিষ যা ভাল লাগল না, গোড়াতেই তার উল্লেখ করি—যদিও তা উপন্যাসটির অংশ নয়। বইটির মলাটের উপর যে প্রচ্ছদপট, তার একটি ভাঁজে বইটির ললাটিকা হিসাবে কয়েকটি কথা জেগে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই ললাটিকার কেবল যে কোনও প্রয়োজন ছিল না তা নয়, কেউ যদি কথাগুলিকে বিশেষ ভাবে মনে রেখে বইটি পড়তে প্রবৃত্ত হন ত তাতে রসগ্রহণ ব্যাহত হ'তে পারে। বইটির সঙ্গে সম্পর্ক-বিচারে এই ললাটিকার প্রায় প্রত্যেকটি কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বাহুল্যভয়ে সে তর্ক এখানে করব না।

ছোট ছোট কতকগুলি পরিচ্ছেদের মোজেইক (mosaic) প্রত্যেকটি টুকরা পাথর জলজলে রঙদার, তাই দিয়ে পাশাপাশি লতানো দু-তিনটি ছবির কারুকার্য্য। সবটাকে ছাপিয়ে বা সবটার সমন্বয়ে কোনও বিশেষ একটি রঙের ছোপ নেই, কিন্তু মোজেইকের কাজে কেউ সেটা আশা করে না।

একই বিন্দু থেকে উদ্ভূত দুইটি লতা—দুইটিই এক হিসাবে বিবাহিত জীবনের সঙ্গে তার বন্ধন-বহির্ভূত প্রেমের বিরোধের কাহিনী—পাশাপাশি উঠে দুদিকে ছড়িয়ে গিয়ে আবার এক জায়গায় এসে পরস্পরকে জড়িয়েছে, তার মধ্যে খানিকটা যে ফাঁক জায়গা সেইখানটা ভরিয়ে একটি অগ্নিবর্ণ সরল রেখা—মোটামুটি এই হচ্ছে বইটির এই কারুকার্য্যের পরিকল্পনা (scheme)।

এই ট্র্যাজিডি; কিন্তু হাপুস নয়নে কেউ কাঁদতে পারবেন, এমন সুযোগের সৃষ্টি গ্রন্থকার কোথাও করেন নি। হাস্যরস করুণ রস এবং আরও নানা প্রকারের রসের স্রোত কলকল করে বয়ে গিয়েছে বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু সে রস-পরিবেশনে কোথাও কোনও অতিশয়তার বেহিসাব নেই। ফলে পড়তে বসে বইটির কোথাও থামতে হয় না, বই বন্ধ করে ভাবতে বসতে হয় না। এটি যদি দোষ হয় ত দোষ, যদি গুণ হয় ত গুণ। অথচ ভাববার কথা বইটিতে কিছু কম নেই। ভাববার চেষ্টাও যে একেবারে নেই তা বলতে পারব না। কিন্তু সে চেষ্টাতে গ্রন্থকার তেমন কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। তাঁর মনে গল্প বলবার যে ঝোঁক, গুছিয়ে গল্প বলতে পারবার তাঁর যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তারই টানে সে চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণগুচ্ছের মত ভেসে চলে গিয়েছে বার বার। ফলে বইটি নিছক গল্প বা গল্পের সমষ্টি-হিসাবে বেশ একটি সংহত রূপ পেয়ে চমৎকার উৎরেছে। বইটির কোথাও থামতে হয় না বলেছি; তার চেয়েও বড় কথা, থামতে পারা যায়ও না।

এই বইটিতে কোথাও কোনও সাহিত্যিক সৌখীনতা' বা dilettantism-এর পরিচয় নেই। বইটি পড়ে গেলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, গল্পের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে গিয়ে লেখক গল্প বলছেন, আবার যাদের নিয়ে গল্প তাদের তুচ্ছতম সুখদুঃখ, তাদের মুখের সামান্যতম কথাটিকেও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে সুনির্বাচিত শব্দ-বিন্যাসে, নির্দ্দোষ এবং সুশ্রী ভাষার বাঁধুনীতে সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করছেন। লেখকের এই অন্তর্দৃষ্টি স্থানে স্থানে এমন অমোঘ, যে, চমকে উঠতে হয়। প্রকাশ-ভঙ্গীতেও কোনও অতিশয্যতা নেই, যতটুকু বলা দরকার তার চেয়ে বেশীও বলছেন না, কমও নয়, এবং যা বলতে চাইছেন তা সোজাসুজি বলছেন গল্প শুনিয়ে লোককে আনন্দ দেবার সব-চেয়ে ভাল এবং চিরাগত রীতিও এই। একে কেউ ষ্টাইলের অভাব মনে করলে তাতে এসে যায় না কিছু।

গল্পস্রোতে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে, বা ঘটনাসংস্থানে সর্ব্বত্র বৃহত্তর একটি পটভূমিকার অপরিহার্য্যতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁরা এই বইটিতে নিন্দা করবার মত বিশেষ কিছু খুঁজে পাবেন না। ছোট দোষ ত্রুটি যেগুলি চোখে পড়ল সেগুলির কথা বলতে হ'লে তেমনি ছোট ছোট প্রশংসার যোগ্য আরও যেসব গুণ আছে বইটিতে, সেগুলোর কথাও বলতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে তার স্থানাভাব।

চরিত্রগুলির মধ্যে এই একটা জিনিষ বেশী ক'রে চোখে পড়ল, এরা কেউই ভূত-বাঁদর নয়। নিজেদের পরমতম সুখকেও এরা থেকে থেকে তৃণের মত জ্ঞান করে, হেলায় তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে তাদের বাধে না। যারা মরণ নিয়ে খেলছে, তারা ত বটেই; যারা জীবনকে যে-কোনও মূল্যে উপভোগ করতেই ব্যাকুল, তারাও। পৃথিবীকে জীবনময় যে দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, এইটিই তার বিশেষত্ব। সে যাই হোক, চরিত্রগুলির মধ্যে যে ধাঁচের মানুষগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে সেগুলি ভালই উৎরেছে বলতে পারি, যে ধরণের লোকদের সম্বন্ধে কিছু জানি না, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া উচিত হবে না। আমাদের বিবেচনায় বইটির মধ্যে শচীন্দ্র কমলা এবং পার্ব্বতীর কাহিনী সবচেয়ে বেশী দরদ দিয়ে লেখা এবং এই তিনটি চরিত্র-চিত্রণেই লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দু-এক জায়গায় একটু খটকা লাগলেও মালতীও বেশ মনোজ্ঞ সৃষ্টি। সমাজের নানা স্তরের, নানা স্বভাবের স্ত্রীপুরুষের নানা ধাঁচের কথায়, ভাষায় লেখকের দখল চরিত্রগুলিকে জীবন্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে কম নয়।

মোট কথা বইটি ভাল হয়েছে। ডিটেক্টিভ নভেলের মত suspense-এর পর suspense সৃষ্টি ক'রে ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে পাঠকের উচ্চকিত মনকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ছোটবড় প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তরের অন্তস্তল অবধি উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়ে দেখিয়ে যাওয়া, এমনই কেরামতির কাজ যে তারিফ না ক'রে থাকা যায় না। বইটির যিনি লেখক, তিনি বিশেষ শক্তিমান্‌, এ-বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। আশা করি, ভবিষ্যৎ আমাদের হয়েই সাক্ষ্য দেবে।

স. চ.

অর্কেষ্ট্রা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী-ভবন, দাম ১৷০।

ছেলেবেলা দেখেছি বাড়ীতে প্রতিমা গড়া হ'ত। নিপুণ কারিগরের নির্ম্মাণকৌশলে তাল তাল এঁটেল মাটি খড় ও বাঁশের কাঠামোয় অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তিতে রূপায়িত হ'ত। ষষ্ঠীর দিন পর্য্যন্ত সেই প্রাণহীন মূর্ত্তির সৌষ্ঠব তারিফ করতে করতে ভাবতুম—উঁহু, কি যেন নেই, কিসের যেন অভাব। প্রাণসঞ্চারের পরমুহূর্ত্তে সে কথা আর মনে হ'ত না। প্রতিমা তখন জীবনময়ী।

সুধীন্দ্র দত্তের কবিতা পড়তে গিয়ে ঐ স্মৃতি মনে পড়ল। কারু সুধীন্দ্রনাথ ও প্রাণসঞ্চারক কবি সুধীন্দ্রনাথ যেন দুটি বিভিন্ন সত্তা। যেখানে দুয়ের সমন্বয় হয়েছে, সেইখানেই অনবদ্য সুষমা সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে তিনি কবি, এইটেই তাঁর বিষয়ে প্রধান কথা। কেবল পেশাদারী আভিধানিক পদ্যকার কিংবা 'পরিচয়ে'র বিদগ্ধ গোষ্ঠীপাল মাত্র তিনি নন। নিখুঁত ছন্দে ও অপরূপ প্রকাশভঙ্গীতে তাঁর অবিসম্বাদিত অধিকার। যথাযথ শব্দপ্রয়োগ তাঁর রচনার বিশিষ্ট সম্পদ, তবে শব্দের উৎকট্যে সময় সময় তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে। আমার কেমন মনে হয়, এ বিপদ স্বেচ্ছাকৃত—এই মস্তিষ্কপ্রসূত দুর্ব্বোধ্যতার মূলে তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ্য। এই কারণেই স্থানে স্থানে কবি সুধীন্দ্রনাথ কারিগর সুধীন্দ্রনাথের বৈকল্যকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি।

অর্কেষ্ট্রার প্রধান সম্পদ প্রেমের কবিতা। সুধীনবাবু প্রেমের কবিতায় ভাবালুতা ও অস্পষ্ট আবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগের সৃষ্টি,

প্রকাশে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের উপযুক্ত। আদি-রসের আধিক্য সত্ত্বেও একটা বিমনা শীতলতার ভাব চোখে পড়ে। প্যাসন-এ কম্পমান অবস্থাতেও তার পারে যাবার আকুতি,

"তাই মোর প্রজ্বলিত যৌবনের যজ্ঞাগ্নি মহান
রিক্তাকাশে
প্রসারে কম্পিত বাহু অনামিক দেবতার আশে।" (কয়ে দেবার)

এই দেবতাই তিনি,

"প্রমোদের বিহ্বল নিশীথে
যাহার আহ্বানলিপি প্রতিভাসি বাসর-প্রাকার
এনেছে আশ্লেষ মোর দুজ্ঞের্য় ব্যবধি।" (মূর্ত্তিপূজা)

এ যেন একটা অতীন্দ্রিয় আসঙ্গলিপ্সা—দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতের জন্য বুভুক্ষা।

কবি সুধীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাব্যের অন্তরালে যে চিরন্তন রসফল্গু প্রবহমান, তার উৎস ভোগবিলাসীর অগভীর চপলতা নয়। তাহলে সে কবির কণ্ঠে এ উক্তি সম্ভব হ'ত না,

"শুধু যবে অন্তিম নিশীথে
চারিভিতে
করিবে বীভৎস নৃত্য আজন্মের নিষ্ফলতা যত,
দুয়ার বাহিরে
ঝঞ্ঝার গর্জ্জনমত্ত অখণ্ড তিমিরে
বৈতরণী পুনর্ব্বার আমারে ডাকিবে অবিরত,
সেদিন তোমার নাম নিঃশব্দে উচ্চারি
লবো কাড়ি
মৃত্যুর বিজয় হ'তে উল্লসিত আত্মপরসাদ।
সীমাহীন শূন্যতার মাঝে
সেদিন শুনিবো পুন ক্ষীণ সুরে বাজে
আজিকার মূল্যহীন কয়টি কথার অনুবাদ।" (পুনর্জ্জন্ম)

আর একটি দিকও আছে। শরীরিণী ও অশরীরিণী প্রিয়ার দ্বন্দ্বে প্রথমার মধ্যে দ্বিতীয়াকে পাচ্ছেন না ব'লে একটা ক্ষোভের ভাব, এটা একটু টং (pose)এর মত ঠেকে। এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্যময় শূন্যতা ও কাঙাল ভাব, অন্য দিকে তেমনি প্রচণ্ড আত্মাভিমান,

"আমার উদ্ধত অর্ঘ্য, প্রেয়সী তোমার লাগি নয়"

এই কৃত্রিমতা পীড়াদায়ক। কিন্তু এ আত্মবঞ্চনা কেন? কোথায় সে নিবিড়, অন্তরঙ্গ, অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ, যা ধ্বনিত হয়েছে,

"পূর্ণিমার অতন্দ্র নিশীথে
চেয়েছিলে নগ্নতনু উপহার দিতে"

কবিতায়? এই শেষোক্ত কবিতা অবশ্য অর্কেষ্ট্রার অন্তর্ভুক্ত নয়, 'পূর্ব্বাশা' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

নাম-কবিতাটিকে অভিনব প্রচেষ্টা ব'লে গ্রহণ করাই ভাল। হয়ত কবির 'ঐকতানে' অনেক উচ্চাশা ছিল হার্ম্মনির একান্ত অভাবে সে আশা পূর্ণ হয় নি। তবে কয়েকটি লিরিক অনবদ্য, যথা "খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম," "বনবীথি ছায়া ঢাকা" ইত্যাদি। বিভিন্ন ছন্দের উপর সাবলীল অধিকার শক্তির পরিচায়ক। বৈচিত্র্য সম্ভারে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ, তবে কবির মন এই বৈচিত্র্যিক বায়ুপরিবর্ত্তনেও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ফিরে আসে নি। শেষ সুর, "অন্তরের দীর্ণ ক্ষুব্ধ হাহাকার"।

কিন্তু মূলকথা, বাণীর আসরে কবি সুধীন্দ্রনাথ ওস্তাদ বীণকার। সংযত সনাতন রসধারার সঙ্গে আধুনিক মননশীলতার অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর কলাকুশল আঙুলের ছোঁয়াচে যে সঙ্গীত রূপ গ্রহণ করেছে, আহত-অনাহত ধ্বনির সমন্বয়ে তা যুগপৎ বিস্ময়কর ও প্রাণগ্রাহী। তবে উচ্চস্তরের সঙ্গীতের মতই তার আবেদন অধিকারী-অনধিকারী-ভেদে রসগ্রাহ্য।

শ্রীঅজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীমণীশ ঘটক

ক্রন্দসী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতী-ভবন, দাম ১৸০।

ক্রন্দসীতে অন্য সুর বেজেছে। বেহাগের অতীন্দ্রিয় আত্মলুপ্তির পর ভূপালীর গম্ভীর আত্মবিচারে ফিরে আসার মত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ বইয়ের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র।

এ বইয়ের দু-একটি কবিতায় কাব্যরসের অনাবিল গতি জায়গায় জায়গায় ব্যাহত হয়েছে। যে 'শব্দ-অপ্সরী'কে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন,

"তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্ব্বচনীয়" (বাক্য)

সেই অপ্সরী যখন কবিকে দিয়ে বলিয়েছেন,

"কেবল আদিম জাড়া প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে
সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে" (পরাবর্ত্ত)

তখন বাক্য-তাড়িতা অসহায় কাব্যলক্ষ্মীর দুরবস্থা অনুমেয়। কিন্তু আপাত-অসম দৈবী ক্রিয়ারক্লিষ্ট দুর্গত মানবচিত্তের আকুতি যখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"হায় ক্ষেমঙ্কর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে?
আজিকে আর্ত্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নাম মাত্র,
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান?" (প্রশ্ন)

তখনই আমরা কবি সুধীন্দ্রনাথকে স্বাধিকারে ফিরে পেলাম। 'পতঙ্গের সাম্যবাদ, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দন' তাঁর দুঃসহ লেগেছে, তিনি হিংস্র ভগবানকে আহ্বান করেছেন, মৃত্যু কামনা ক'রে নয়, কারণ মৃত্যু,

"—স্বপ্নগর্ভ সেও নিত্রাসম
সখার সংস্পর্শে দুঃস্থ, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল।" (প্রত্যাখ্যান)

তাঁর আর্ত্ত প্রশ্ন,—"হেথা যারা পরাজিত, বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয়?" তাঁর প্রার্থনা,

"নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজ পরাজিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণ শোনে মৃত্যু বিপ্রলব্ধ নচিকেতা,
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্ত বংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান।" (প্রার্থনা)

বাঞ্জনার দৃঢ় পৌরুষে, সত্যদৃষ্টির অকুণ্ঠ আলোকে, আধুনিক মননশীলতার নির্ভীক জিজ্ঞাসায়, ক্রন্দসীতে যে অকৃত্রিম কাব্যসৃষ্টি হয়েছে, পরিণতমানস কাব্যরসিকের রসগ্রাহী চিত্তে তার আসন শাশ্বত। দুর্ব্বোধ্য ভাষা কিংবা দুরূহ ভঙ্গিমার হুমকীতেও সে আসন টলবে না।

শ্রীমণীশ ঘটক

অভিজ্ঞতার মূল্য—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য ১৲।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বেহারে "পর্দ্দা-সরাও" আন্দোলনের একটা হাওয়া ওঠে এবং সেই উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় মহিলা দেশসেবা-কার্য্যে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসেন। এক দিকে হঠাৎ মুক্তির মোহ, অপর দিকে অভিজ্ঞতার অভাব—এই দুইয়ে মিলিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে যে একটা সঙ্কটের সম্ভাবনা থাকে, সেটিকে কেন্দ্র করিয়া এই ছোট উপন্যাসখানি লেখা হইয়াছে।

এক ডাক্তার লাহিড়ী ছাড়া সমস্ত চরিত্রগুলিই বেহারী, আর সমস্ত আখ্যানটির পটভূমিকা নিজ বেহারে, সুতরাং খাঁটি আধুনিক বেহার-জীবনের অনেকটা ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে

লেখা বেশ আড়ম্বরহীন এবং কথোপকথনে সজীবতার পরিচয় আছে। আখ্যানভাগটিও মোটের উপর বেশ একটা ঔৎসুক্য জাগাইয়া রাখে।

দুইটি বিষয়ে লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি বইয়ের মধ্যে দাদা মহাশয়ের সঙ্গে নাতি নাতনীর (অবশ্য কৃত্রিম সম্পর্কের) ঠাট্টা চালাইয়া গিয়াছেন। বেহারী সমাজে ওটা অচল। দ্বিতীয়তঃ, কয়েক জায়গায় বিশেষ করিয়া চাকর 'ফাগুনী'র কথাবার্ত্তায়—অযথা বেশী রকম হিন্দীর ছুট্ আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সেতার দীপিকা—৺ভগবানচন্দ্র দাস সেতারী প্রণীত। আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ১৷৵০।

ঢাকার প্রসিদ্ধ সেতারবাদক ৺ভগবান সেতারীর নাম বাংলার সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার সময়ে বাংলায় তাঁহার সমকক্ষ সেতারবাদক কেহ ছিল না। বর্ত্তমানেও সম্ভবতঃ তাঁহার স্থান অপূর্ণই রহিয়াছে। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যাও অল্প নহে। তাঁহার সংগৃহীত ও রচিত সেতারের গৎগুলি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে প্রকাশিত না হওয়া দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক মহাশয় ৺সেতারী মহাশয়ের নির্ব্বাচিত ৫০টি সহজ ও সরল গৎ প্রথম-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশ করিয়া সঙ্গীতানুরাগিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গৎগুলির স্বরলিপি অতি সহজবোধ্য ভাবে লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই স্বরলিপি দৃষ্টে প্রথম-শিক্ষার্থিগণ গৎগুলির মোটামুটি চেহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার আশা করি।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

উপনয়ন—স্ত্রীলোকের একটি লুপ্তপ্রায় অধিকার

শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম-এ

বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে উপনয়ন-প্রথা দৃষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু আজিও ভারতবর্ষে উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমি অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কোন শহরে একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠে উপবীত দেখিয়াছি এবং প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে, সে যথারীতি গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিয়া থাকে।

উপনয়ন হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংস্কার মাত্র ও দ্বিজত্বপ্রাপ্তির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লোকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতে পারে—কিন্তু তখন তাহার দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি হয় না।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।"—অত্রিসংহিতা:

দ্বিজত্বপ্রাপ্তি অর্থে বৈদিক-ধর্ম্মে অধিকার অর্থাৎ বেদপঠন, যাগযজ্ঞাদিকরণ ও সাবিত্রীমন্ত্র জপনাধিকার ইত্যাদি।

পুরাকালে যদিও বর্ত্তমানের ন্যায় কঠিন নিগড়াবদ্ধ জাতিভেদপ্রথা ছিল না—তথাপি যজুর্ব্বেদাদিতে ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাজকে গুণ ও কর্ম্মবিভিন্নতা অনুসারে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল। পারত্রিক মোক্ষলাভই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই হিসাবে "মহান্ সহস্রশীর্ষাঃ সহস্রাক্ষঃ" পুরুষের মুখস্বরূপ হইলেন ব্রাহ্মণগণ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"
—ঋক্‌বেদ ১০, ৯০

এই ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য বর্ণাদি হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন।

দ্বিজগণের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল—বেদপঠন, সাবিত্রীমন্ত্র

জপকরণ ও নিত্য যাগযজ্ঞক্রিয়াদি সমাপন ও প্রাতে উঠিয়াই গার্হপত্য অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা এবং দিনে তিন বার সেই অগ্নিতে হবিঃ প্রদান ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের জীবনের চরম লক্ষ্য হইল আধ্যাত্মিক এবং সেই ক্ষেত্রে অপরাপর শ্রেণীর জীবনের লক্ষ্য হইল জাগতিক।

এই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মবিভিন্নতা সদাসর্ব্বদা মনে ও সমাজে জাগরূক রাখিবার নিমিত্তই উপনয়ন-সংস্কারের প্রবর্ত্তন হয়।

তখনকার সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম-অধিকার প্রতিক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। ঋক্‌বেদপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে পুরাকালে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, যাগযজ্ঞে, মন্ত্রদর্শনে, রচনায়—সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের স্থান পুরুষের সমকক্ষ ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাদের সম-অধিকার শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃতও হইত।

যে সকল স্ত্রীলোক আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক উন্নতির পরিকল্পনায় জীবনযাত্রা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহারাও পুরুষের ন্যায় ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন ও যথারীতি উপবীত ধারণ করিয়া বৈদিক কর্ম্মে অধিকার লাভ করিতেন। মাধবাচার্য্যের "শ্যামলবিস্তারে" দেখা যায় যে দ্বিজাতির কন্যাগণের পুত্রসন্তানের ন্যায় অষ্টম বর্ষেই উপবীত হইবার অধিকার আছে।

"অস্তৈবাধিকরণস্যানুসারেণ অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনীয়ত
তমধ্যাপয়ীত ইত্যত্রাপি স্ত্রিয়াঽপ্যধিকারঃ।"

—শ্যামলবিস্তার

নিম্নোল্লিখিত শ্লোকে স্ত্রীলোকগণ যে "মৌঞ্জিবন্ধন" করিতেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

"পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জিবন্ধনমিষ্যতে
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা। —যম

সুতরাং শ্রুতিতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন পুরুষের ন্যায় স্বীকৃত হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন হেতু স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে ক্রমে ক্রমে স্ত্রীসমাজে সামাজিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। মনুসংহিতাতে দেখা যায় যে, উপনয়ন বা মৌঞ্জিবন্ধন-সংস্কার যদিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই তথাপি পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতও হয় নাই। মনু বলেন, "বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামে "বৈদিক সংস্কার" এবং স্বামীসেবাই "গুরুকুলে বাস" স্বরূপ ও গৃহকর্ম্মই প্রাতঃসন্ধ্যাদি হোমরূপী "অগ্নিসেবা"—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং
সংস্কারো বৈদিক স্মৃতঃ
পতিসেবা গুরৌ বাসো
গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়াঃ।

—মনু, ২।৬৭-৬৮

মনুর সময় স্ত্রীলোকের স্থান দ্রুততরভাবে নিম্নগামী হয়। এমন কি তিনি এক স্থানে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন যে, যে-যজ্ঞে স্ত্রীলোক হোতা প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখনও তথায় ভোজন করিবেন না। শকযবনপারদাদিদ্বারা দেশ ম্লেচ্ছাধিকৃত হওয়াতেই বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষরূপে রক্ষার নিমিত্ত অবরোধপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় ও দেশে পূর্ব্বোন্নত অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থার সংস্পর্শে আসিয়া সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলেই সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। মানুষের মনে বেশী মাত্রায় সংকীর্ণতা প্রবেশ করে এবং সমাজ-রক্ষণার্থে এক প্রকার নব শ্রেণীর শাস্ত্রকারও দেশে উদ্ভূত হন, যাঁহারা তদনুযায়ী শাস্ত্রাদি রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে স্ত্রী ও শূদ্রের বেদ-শ্রবণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

সুতরাং যে সংস্কারের বৈশিষ্ট্য ছিল—বেদপঠন, বৈদিক যাগযজ্ঞকরণ, সাবিত্রী-মন্ত্রোচ্চারণ, অগ্নি-রক্ষণ—সেই উপনয়ন প্রথাও ক্রমে ক্রমে স্ত্রীজাতির নিকট লুপ্ত হইতে লাগিল, এবং বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের উপবীত-ধারণ একটা অত্যাশ্চর্য্য বিধিরূপে জ্ঞাত হয়। কালের ধর্ম্ম এমনিই চমৎকার।

বর্ত্তমানে নারীজাতি আপনাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় দাবিগুলি অধিকার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের ভালরূপে জানা উচিত যে, কি কি অধিকার পূর্ব্বে তাঁহাদের ছিল যাহা আজ তাঁহারা হারাইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকিলে তাঁহাদের পূর্ব্বের সহিত ভালরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং এই জাগরণ ভারতের বিশিষ্টতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে, সন্দেহ নাই।

রূপ-দর্পণ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও!
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব? এ মনোমুকুরতলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি' ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে, তুমি নারী—নশ্বর-কায়া,
—দর্পণ ফেলে দাও!

তোমার পিঠের কালো কেশপাশ তুলিয়া গ্রীবার 'পরে
বেঁধেছ কবরীখানি,
চোখের কিনারে কাজল দিয়েছ টানি';
তার চেয়ে কালো অসীম-রাত্রির তিমিরের পটে আঁকা
ও বিধু-বদনে আমারি মনের কলঙ্ক-কালি-মাখা
নীল আঁখিদুটি মুনিদেরও মন হরে—
মুরছিবে তুমি নিজ কটাক্ষ-শরে!
—দর্পণ ফেলে দাও!

কেতকী-পরাগে পাণ্ডুর করি' ললাটের হেম-ভাতি—
অঙ্কিত-কুঙ্কুম,
অধরে ভরেছ মদিরা-সুরভি চুম্;
হেথা হের তব সীমন্ত-তলে উষায়-ধূসর নিশা—
একটি সে তারা, বুকে জ্বলে তার উদয়-আলোর তৃষা!
মোর স্বপনের পোহাইছে শেষ-রাতি—
তা' লাগি' তোমার অধরে হাস্য-ভাতি!
—দর্পণ ফেলে দাও!

আমার নয়ন-রশ্মির রসে পরায়েছি যেই টীকা
তব ভালে, সুন্দরি!
শশীতারাময় নিশাকাশ সম্বরি'—
তাহারি কুহকে মানস-সায়রে উছলে বারিধি-নীর,
জলতলে ছায়া—কনক-কান্তি কোন্ সে পদ্মিনীর!
তোমারই সে-রূপ—চিনিবে কি, মালবিকা?
মোর আঁখি দিয়ে আপনার পানে চাও,
—দর্পণ ফেলে দাও!

আমার ন[illegible]তলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব? এ মনোমুকুরতলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি' ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে, তুমি নারী—নশ্বর-কায়া!
—দর্পণ ফেলে দাও!

তরাইয়ের তরুণী

[শ্রীযুক্তা ডক্টর সেলমা লাগেরলভের মূল সুইডিশ উপন্যাস হইতে তাঁহার অনুমতি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত]

শ্রীসেলমা লাগেরলভ ও শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

১

গ্রাম্য আদালত। ঘরের এক কোণে টেবিলের এক পাশে প্রৌঢ় বলিষ্ঠ-আকৃতি গ্রাম্য বিচারক চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখমণ্ডল বৃহৎ ও শুষ্ক। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আদালতের কাজ চলিতেছে। জনাকীর্ণ এজলাসে এক একটি করিয়া কয়েকটি মামলার বিচার ও শুনানী হইয়া গিয়াছে। অবশেষে বিচারকের মুখখানা বিরক্তি ও বিষাদের ছায়ায় ম্লান হইয়া উঠিল। ইহার কারণ কি জন-বহুল আদালত-কক্ষের উষ্ণ বায়ু, না সত্যাসত্যজ্ঞানহীন মামলাবাজদের শুধু ব্যক্তিগত লাভের আশায় পরস্পরের প্রতি নির্ম্মমতা,—তাহা ঠিক বুঝা কঠিন।

সেই দিনের তালিকায় যে-সকল মোকদ্দমার তারিখ পড়িয়াছিল, তাহার শেষের কোন একটার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মামলাটির বিষয়, একটি শিশুর শিক্ষার ও ভরণপোষণের ব্যয় পাইবার জন্য আবেদন। ইহার বিচার পূর্ব্বেও কয়েকবার হইয়াছে, কিন্তু নিষ্পত্তি হয় নাই। আজ আবার পূর্ব্বদিনের বিচারের নথীপত্রগুলি আদালতে পড়া হইতেছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে, শিশুর মা বাদিনী—গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, এবং প্রতিবাদী একজন বিবাহিত পুরুষ।

নথীপত্র হইতে আরও জানা যায় যে, প্রতিবাদী বাদিনীর অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, শুধু লাভের আশায় বাদিনী তাহার নামে অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। প্রতিবাদী কিন্তু স্বীকার করিয়াছে যে, বাদিনী তাহার বাড়ীতে কাজ করিত, তবে উভয়ের মধ্যে কোন দিনই ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল না; সে জন্য মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া প্রতিবাদীর নিকট হইতে অর্থ আদায়ের অধিকার বাদিনীর নাই। বাদিনী কিন্তু অভিযোগ প্রত্যাহার করিল না। সুতরাং কয়েক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য হওয়ার পর বাদিনীর অভিযোগ ও শিশুর শিক্ষার ব্যয় বহন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য শপথ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা ভিন্ন প্রতিবাদীর অন্য কোন উপায় রহিল না।

আদালতে উভয় পক্ষই বর্ত্তমান এবং বিচারকের টেবিলের দুই দিকে উভয় পক্ষের লোকজনই দণ্ডায়মান। বাদিনীর বয়স অল্প এবং মনে হয় যেন সে ভয়ে একেবারে জড়সড়। তাহার চোখে অবিরল জলের ধারা এবং অতি কষ্টে সে অশ্রুসিক্ত চোখ রুমালের দ্বারা মুছিতেছে;—এমন কি সে যেন রুমাল ঝাড়িয়া লইতেও সাহস পায় না। তাহার পরনের পোষাক নূতন। ইহার রং কালো। ইহা এত বেমানান যেন আদালতে হাজির হইবার জন্য ধার করিয়া আনিয়া পরা হইয়াছে। প্রতিবাদীর সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, পুরুষটি সঙ্গতিপন্ন। তাহার বয়স চল্লিশ; দেখিতে বেশ সবল ও সাহসী। আদালতে বিচারকের সম্মুখে তাহার ভাব বেশ সহজ। তাহার মুখ দেখিলে কিন্তু বুঝা যায় যে, আদালতে দাঁড়াইতে তাহার ভাল লাগিতেছে না;—তাহা হইলেও সে মোটেই ক্লান্ত নহে।

নথীপত্র পড়া শেষ হইলে পর বিচারক প্রতিবাদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে এখনও বাদিনীর অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে কিনা এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শপথ করিয়া অভিযোগ অস্বীকার করিতে প্রস্তুত কি না।

প্রতিবাদী দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিল—'হাঁ, অবশ্যই।'

এই বলিয়া সে তখনই নিজের কোটের পকেটে হাত দিল এবং আপন বিবাহের পুরোহিতের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র বাহির করিয়া আদালতের সম্মুখে হাজির করিল। তাহার উদ্দেশ্য বিচারককে ইহাই বুঝান যে, সজ্ঞানে শপথ করার গুরুত্ব যে কত, সে তাহা বুঝে এবং সেই জন্য শপথ করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে।

অন্য দিকে বাদিনীর অবিরল চোখের জলের ধারা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, মনে হয় তাহার ভয়াকুলতা যেন কখনও ভাঙিবার নহে। তাহার দৃষ্টি মাটির দিকে এত নত যে, প্রতিবাদীর মুখ পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়িতেছে না।

প্রতিবাদীর 'হাঁ' শুনিয়াই বাদিনীর শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে টেবিলের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইল,—যেন প্রতিবাদীর 'হাঁ'-র বিরুদ্ধে তাহার কিছু বলিবার আছে; কিন্তু তবুও সে বলিতে পারে না। সে নিজের মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চায় যে, "ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না,—হয়ত বা সে 'হাঁ' বলে নাই,—না, নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনিয়াছি।"

এ দিকে বিচারক প্রতিবাদীর বিবাহ-সম্পর্কিত কাগজপত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরমুহূর্ত্তেই কেরানীকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আরদালী প্রতিবাদীর সম্মুখে টেবিলের উপর বাইবেল রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

কেহ যেন টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ শব্দ বাদিনীর কানে পৌঁছিয়াছে এবং ইহা তাহাকে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। টেবিলের উপর কি রাখা হইতেছে দেখিবার জন্য সে অতি কষ্টে জোর করিয়া চোখ তুলিল। তার পর সে দেখিল যে, আরদালী টেবিলের উপর বাইবেল রাখিতেছে।

মনে হইল যেন অভিযোগকারিণী ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায়। কিন্তু বলিতে গিয়া সে আবার থামিয়া গেল। প্রতিবাদী তবে শপথ করিবে, এ কি কখনও সম্ভব! না, এ যে অসম্ভব! শপথ করিবার অধিকার যে তাহার নাই! বিচারকের অন্তত উচিত তাহাকে নিরস্ত করা!

বিচারক বিজ্ঞ লোক। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট। সাধারণ লোকেরা আপনাপন বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে কোন বিষয়ে সাধারণত কি চিন্তা করিয়া থাকে, সে-সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট ধারণা আছে। দাম্পত্য কলহ কত দূর গড়াইতে পারে এবং ইহার ফলে মানুষ কতটুকু অমানুষ হয়, তাহা তিনি ভালই জানেন। বাদিনীর অভিযোগ মিথ্যা হইলে ইহা অপেক্ষা বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা সত্য না হইলে নিজের কলঙ্ক নিজে স্বীকার করা কি সম্ভব? বিচারককে বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান অভিযোগ আনিয়া বাদিনী আপনার উপর কত বড় গ্লানি ও কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। শুধু কলঙ্ক নয়—সেই সঙ্গে দারুণ দৈন্যও। এ সংসারে কেহই তাহাকে চাকরানীর বা অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করিতে চায় না! নিজের বাবা মা পর্য্যন্ত মেয়ের কলঙ্ক সহ্য করিতে রাজী নন এবং তাঁহারা তাহাকে আপন মা'র স্থান দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। এ অবস্থায় তাহার ঠাঁই কোথায়! না, বিচারককে বুঝিতে হইবে যে, অসহায়া বাদিনীর বর্ত্তমান অভিযোগ আনিবার অধিকার না থাকিলে, সে বিবাহিত পুরুষের নিকট নিজের শিশুর জন্য কোন সাহায্যভিক্ষা করিত না।

বিচারকের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, তরুণী মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিবাহিত পুরুষের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনিয়া সে যে নিজের কলঙ্কই ঘোষণা করিতেছে এবং যদি তাই হয়, তবে বিবাদীকে শপথ করা হইতে নিবৃত্ত করা কি বিচারকের কর্ত্তব্য নয়?

বাদিনী দেখে—বিচারক বিবাদীর বিবাহ সম্বন্ধীয় পত্রখানা বারবার পড়িতেছেন। তাঁহার হাবভাবে মনে হয় তিনি হয়ত বাদিনীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আবার ইহাও সত্য যে, বিচারককে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাইতেছে। তিনি বারবার বাদিনীর দিকে তাকাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মুখে গ্লানির ও ঘৃণার ভাব যেন বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; মনে হয় যেন তিনি বাদিনীর উপর ক্রুদ্ধ। —অভিযোগকারিণীর অভিযোগ সত্য হইলেও যে তাহাকে চরিত্রহীনা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাকে অনুকম্পা দেখানো কি বিচারকের পক্ষে সম্ভব!

বিচারক সাধারণত বিজ্ঞ বন্ধুর মত বাদী প্রতিবাদী দুই পক্ষকেই এরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, তাহারা যেন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া নিজেদের কোন অনিষ্ট না

ঘটায়। কিন্তু আজ তিনি বড়ই ক্লান্ত। সময় সময় তিনি শুধু আইনের ধারার অনুসরণ বজায় রাখিবার জন্য কিছু বলেন,—নতুবা যেন অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন না।

বিচারক টেবিলের উপর কাগজ-পত্র রাখিয়া সংক্ষেপে প্রতিবাদীকে বলিলেন যে, মিথ্যা শপথ করার গুরুত্ব কত তাহা সে নিশ্চয়ই বুঝে বলিয়া তিনি আশা করেন। প্রতিবাদী ঠিক পূর্ব্বের মত শান্তভাবে শুনিয়া গেল এবং পূর্ব্ববৎ সসম্মানে উত্তর দিল—'হাঁ'।

বাদিনী সভয়ে ইহা শুনিয়া, সামনের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইল; অনবরত হাত দুটি কচলাইতে লাগিল। এখন সে যেন বিচারককে কিছু বলিতে চায়। সে দৃঢ়ভাবে নিজের ভয়াকুলতা ও ক্রন্দন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নতুবা কথা বলিতে সে কেবলই বাধা পায়। ফলে সে যা বলে, তা নিতান্তই অস্পষ্ট।

প্রতিবাদী এখন শপথ করিবে। শপথ করার অধিকার তাহার আছে; সেজন্য কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

এখনও পর্য্যন্ত বাদিনী বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, শপথ করিবার অধিকার প্রতিবাদীকে দেওয়া হইবে; কিন্তু এখন সে দেখিতেছে যে প্রতিবাদী শপথ করিবেই। শুধু তাহাই নহে,—পরমুহূর্ত্তেই যে শপথ করা হইবে। শঙ্কায় তাহার শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম, সে প্রায় পাথর হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখে এখন আর বিন্দুমাত্র জল নাই; চোখের পুত্তলিগুলি যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

প্রতিবাদী কি তবে চিরকালের মত নিজের হাতে নিজের জন্য নরকের দ্বার খুলিয়া দিবে?

বাদিনী ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে যে, প্রতিবাদী নিজের বিবাহকে একমাত্র কারণ দর্শাইয়া শপথ করিয়া অভিযোগ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চায়। বাদিনী যদিই বা রাগ করিয়া থাকে, তবুও কি প্রতিবাদীর পক্ষে মিথ্যা শপথ করা উচিত?

মিথ্যা শপথ করার চেয়ে গুরুতর অধর্ম্মই বা কি? ইহার জন্য যে কোন ক্ষমাই নাই! মিথ্যা শপথকারীর নামেই যে নরকের দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া যায়।

বাদিনী প্রতিবাদীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিতেছে না—পাছে বিধাতার অভিশাপে তাহার মুখের বিকৃতি দেখিয়া তাহার ভয় হয়।

বাদিনীর শঙ্কা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অন্যদিকে বিচারক, কি ভাবে বাইবেল হাতে রাখিয়া শপথ করিতে হয়, তাহা প্রতিবাদীকে বলিয়া দিতেছেন। তা ছাড়া তিনি শপথ করাইবার আইনের ধারাও খুঁজিতেছেন।

বাদিনী প্রতিবাদীকে বাইবেল হাতে লইতে দেখিয়াই দ্রুতপদে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল; মনে হইল, সে যেন বাইবেল হইতে প্রতিবাদীর হাত সরাইয়া দিতে চায়।

তখনও তাহার মনে আশার ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। তাহার বিশ্বাস যে, অন্তত শেষ মুহূর্ত্তেও প্রতিবাদী মিথ্যা শপথ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

বিচারক ইতিমধ্যে শপথ করাইবার নিয়মাবলী আইনের বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং নিজে স্পষ্ট করিয়া কিন্তু থামিয়া থামিয়া শপথ পড়িতেছেন। মধ্যে মধ্যে থামিবার উদ্দেশ্য, যাহাতে প্রতিবাদী তাঁহার কথার পুনরুক্তি করার পূর্ণ সুযোগ পায়। প্রতিবাদী সত্য সত্যই শপথ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে ভুল করিতেছে। সেজন্য বিচারক আবার গোড়া হইতে বলাইতে আরম্ভ করিতেছেন।

এখন বাদিনীর শেষ আশাটুকুও বিলুপ্ত হইল। সে এখন বুঝিল যে, প্রতিবাদী মিথ্যা শপথ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই পাপকার্য্যের দ্বারা সে ইহকাল ও পরকালের জন্য ভগবানের অভিশাপ নিজের উপর ডাকিয়া আনিবেই।

বাদিনী সজোরে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইল। এ সমস্তই যে তাহার অভিযোগের ফল!

কিন্তু তাহার বাঁচিবার যে আর কোন পথ নাই! সে নিজে ক্ষুধায় কাতর ও শীতের জ্বালায় অস্থির! শিশুটিও মরণের মুখে! আর কাহার নিকট এখন সে সাহায্যভিক্ষা করিবে!

তাহার পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা বরাবর কঠিন ছিল যে, প্রতিবাদী ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মিথ্যা শপথ করিতে পারে।

এখন আবার বিচারক উচ্চকণ্ঠে শপথ করাইতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই বিচার শেষ হইয়া যাইবে। এরূপ মামলার

সুনিষ্পত্তি দুঃসাধ্য, অথচ নিষ্পত্তি করিতে নিবৃত্ত থাকাও যায় না।

প্রতিবাদী শপথ শেষ করিবে, এমন সময় বাদিনী এক লাফে তাহার নিকট গিয়া বাইবেল টানিয়া ধরিল।

বিলুপ্ত আশা অবশেষে সমূলে তাহার ভয় ভাঙিয়া দিয়াছে। ধর্ম্মের নামে মিথ্যা শপথ করা প্রতিবাদীর উচিত নয়; তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতেই হইবে।

কেরানী তৎক্ষণাৎ বাদিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া বাইবেল হইতে বাদিনীর হাত সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। আদালতের সব ব্যাপারই বাদিনীর নিকট একটা বিভীষিকা। তাহার নিশ্চিত মনে হইয়াছে যে, তাহার এই কার্য্যের দরুন তাহাকে কারাবাস করিতে হইবে; কিন্তু তবুও সে বাইবেল ছাড়িবে না। নিজে যত খুশী শাস্তি সহিতে সে রাজী, কিন্তু প্রতিবাদীকে শপথ করিতে দেওয়া হইবে না। এদিকে প্রতিবাদীও বাদিনীর হাত হইতে বাইবেল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাদিনী তাহা ছাড়িয়া দিতে মোটেই রাজী নয়।

"—শপথ করার অধিকার তোমার নাই। তোমার পক্ষে তাহা উচিত নয়।"—এই বলিয়া সে চীৎকার সুরু করিল।

এই ঘটনায় সমস্ত আদালতে একটা মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলেই ব্যাপারখানা কি দেখিবার জন্য টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জুররেরা শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। পাছে দোয়াতের কালি পড়িয়া যায়, সেজন্য দোয়াত হাতে করিয়া বিচারকের সেক্রেটারী সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিচারক তীব্র ভর্ৎসনার সুরে আদেশ করিলেন,—"থামো।"—সকলেই এক মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল।

—"তোমার হইয়াছে কি? বাইবেলে তোমার কি প্রয়োজন?"—তীব্রস্বরে বিচারক বাদিনীকে প্রশ্ন করিলেন। বাদিনী এবার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে; সে স্পষ্ট গলায় দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল,—"ধর্ম্মের নামে মিথ্যা শপথ করা যে তার পক্ষে উচিত নয়।"

বিচারক কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন, "চুপ্ কর, বাইবেল রাখ।"

বাদিনী কিছুতেই বিচারকের আদেশ শুনিবে না, বরং দুই হাতে আরও জোরে বাইবেল চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তাহার যে শপথ করা উচিত নয়।"

বিচারক তখন আবার গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"তা' হলে বুঝি তুমি মামলায় জয়ী হইতে চাও।"

বাদিনী তেমনি গলা করিয়া উত্তর দিল, "আমি অভিযোগ তুলিয়া লইতে চাই। আমি তাহাকে শপথ করিতে বাধ্য করিতে চাই না।"

বিচারক প্রশ্ন করিলেন—"এত চীৎকার কর কেন? তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি!"

বাদিনী অতিকষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া আপনাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। স্থির হইয়া নিজেই নিজের চীৎকারের ভীষণতা বুঝিতে পারিল। বিচারক নিশ্চয়ই মনে করিয়া থাকিবেন যে, সে পাগল হইয়াছে। সে নিজের গলার স্বরকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল এবং কৃতকার্য্য হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিচারকের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে অথচ স্পষ্ট গলায় বিচারকের উদ্দেশে বলিল, "আমি অভিযোগ তুলিয়া লইতে চাই। প্রতিবাদী আমার শিশুর পিতা। আমি এখনও তাহাকে ভালবাসি। সে মিথ্যা শপথ করে, আমি চাই না।"

বাদিনী বিচারকের টেবিলের অপর পার্শ্বে মাঝামাঝি জায়গায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বিচারকের রুক্ষ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। বিচারকও টেবিলের উপর দুই হাতে ভর করিয়া বাদিনীকে দেখিতেছেন। আদালতে গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বিচারকের মুখের ভাব যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। তাঁহার ক্লান্ত ক্লিষ্ট কঠিন ভাব কোথায় যেন উড়িয়া গেল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার শুষ্ক ম্লান মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিচারক ভাবিলেন—"তাই ত, আমার দেশের মানুষ! এদের উপর আমার অশ্রদ্ধার কী কারণ আছে? সমাজের তথাকথিত নিম্ন স্তরের লোকদের মধ্যে যাহারা অতি নীচ, তাদেরও একজনের প্রাণে এত গভীর প্রেম, এত ভালবাসা,—এত সততা!"

বিচারক বেশ কিছুক্ষণ নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি টের পাইলেন যে, তাঁর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জায় তাঁর মুখখানা আরক্তিম

হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি চারি দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সেক্রেটারী ও জুররগণ সকলেই,—বাইবেল হাতে টেবিলের পাশে দণ্ডায়মানা তরুণীকে দেখিবার জন্ম ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, সকলের মুখই আনন্দে উজ্জ্বল,—যেন সকলেই পরম আনন্দদায়ক অভূতপূর্ব্ব কিছু দেখিতেছে।

বিচারক এইবার আদালতে উপস্থিত সকলের দিকেই চাহিলেন। সকলেই নিজ নিজ আসনে নিঃশব্দে উপবেশন করিল। সর্ব্বশেষে বিচারক প্রতিবাদীর দিকে চাহিলেন। প্রতিবাদী মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টি নিজের পায়ের উপর আনত।

বিচারক তখন তরুণীর দিকে পাশ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাকে আমি সম্মান করি, এবং তাহাই পূর্ণ হোক।" এই বলিয়া তিনি কেরানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হোক।"

প্রতিবাদী এইবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যেন তার কিছু বলিবার আছে। বিচারক ইহা লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন তবে তুমি কি চাও? মামলা নাকচ হইতে দিতেও কি তুমি নারাজ?"—লজ্জায় তাহার মাথা আরও নত হইয়া গেল। অস্ফুট স্বরে সে উত্তর দিল, "আচ্ছা, তবে তাই হোক; তাই ভাল।"

বিচারক আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর তিনি ভারী চেয়ারটাকে পিছনের দিকে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তকাল থামিয়া পরে টেবিলের পাশ ঘেঁসিয়া তরুণীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি ডান হাত তরুণীর দিকে করমর্দ্দনের জন্ম বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমাকে বহু ধন্যবাদ।"

এদিকে তরুণী সবেমাত্র টেবিলের উপর বাইবেলখানা রাখিয়া আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে ও রুমাল দিয়া চোখের জল ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

—"তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ"—এই বলিয়া বিচারক বিশেষ হৃদ্যতার সহিত তরুণীর করমর্দ্দন করিলেন—মনে হইল, তিনি করমর্দ্দন করিয়া যেন কোন বীরকে সম্মান দেখাইতেছেন।

২

যে তরুণী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আদালতে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিদারুণ বেদনার সঙ্গে নিজের চরম কলঙ্ক জানাইয়াছে, সে যে আবার প্রশংসার যোগ্য কিছু করিয়াছে, এরূপ অনুভূতি তাহার আছে মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং তাহার মনে হইয়াছে যে, উপস্থিত সকলের নিকট নিজের কলঙ্ক ও অপমান আরও অধিক হইয়াছে। তাহার ব্যবহারে যে মহৎ ও সম্মানযোগ্য কিছু ছিল,—যে জন্ম বিচারক পর্য্যন্ত তাহার নিকট নিজে আসিয়া করমর্দ্দন করিয়াছেন, সে তাহা মোটেই বুঝিতে পারে নাই। তরুণী শুধু মনে করিয়াছে যে, ইহার অর্থ মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে এবং এখন তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই তাহাকে যে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে এবং অনেকে যে তাহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে ইচ্ছুক,—ইহাও সে বুঝে নাই। সে জনতা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শীঘ্র বাহির হইয়া যাইবার পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু আদালত-কক্ষের দরজায় সকলেই ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে, সকলেরই চেষ্টা—যত তাড়াতাড়ি বাহির হওয়া যায়। তরুণী দরজা হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনের ভাব যেন এই, যে, অন্য সকলে আগে চলিয়া গেলেই ভাল।

সকলের শেষে সে যখন বাহির হইল, তখন সে দেখিল যে গুডমুণ্ড এরল্যণ্ডসনের ঘোড়ার গাড়ী রাস্তার উপর, এবং গুডমুণ্ড নিজে ঘোড়ার লাগাম হাতে করিয়া যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। জনতার শেষে তরুণীকে বাহির হইতে দেখিয়াই গুডমুণ্ড বলিল,—"হেলগা, এখানে এস, আমার গাড়ীতে এস। আমাদের দু'জনেরই ত এক রাস্তা।"

কিন্তু কেহ তাহার নাম করিয়া ডাকিতেছে শুনিয়াও তরুণী নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। গুডমুণ্ড তাহাকে নিজের গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতে চায়, তাহাও কি কখনও সম্ভব? এই পরগণায় সে সর্ব্বাপেক্ষা সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত। শুধু তাই নয়,—বড় পরিবারে তার জন্ম এবং ছোট বড় সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখে। তরুণী

মোটেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, গুডমুণ্ড তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়।

তরুণীর মাথা রুমালে আবৃত—কপালের দিকে তাহা ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। সে কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া গুডমুণ্ডের পাশ কাটিয়া বরাবর সোজা চলিয়াছে। গুডমুণ্ড তখন আবার ডাক দিল—"ও হেল্‌গা, তুমি কি কানে কম শোন? তুমি যে আমার গাড়ীতে যাইতে পার।" গুডমুণ্ডের গলার স্বর সত্যই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু সে যে তাহার প্রতি সদ্ভাবাপন্ন হইতে পারে, সে কথা তাহার মাথায় কোন মতেই স্থান পায় নাই। তাহার বরং বিশ্বাস হইয়াছে যে, গুডমুণ্ড কোন-না-কোন প্রকারে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে চায়। পাশের লোকেরা—কেহ গলা চাপিয়া, কেহ বা অট্টহাসি হাসিয়া, তাহাকে বিদ্রূপ করিবে, শুধু এইরূপ ধারণাই তাহার মনে ছিল। নিতান্ত সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে শুধু নিজের পথের দিকে চায় এবং আদালত হইতে বাহির হওয়ার পর সে এখন প্রায় দৌড়াইয়া চলিয়াছে—কি জানি পাছে লোকজনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাহার কানে পৌঁছায়।

গুডমুণ্ড অবিবাহিত যুবক এবং পিতৃগৃহেই সে বাস করে। তাহার বাবার বেশ জমিজমা আছে। তাহাদের খামার খুব বড় নয় এবং তাহারা ধনীও নহে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে বসবাস করিবার মত সম্পত্তি তাহাদের আছে। শ্রীমান্ গুডমুণ্ড আইনসম্পর্কীয় কোন জরুরী কাগজ আদালতে তাহার বাবার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সকাল বেলা নিজের গাড়ী করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। তাহার মনে অন্য মতলবও ছিল এবং সে জন্য সে অতি যত্ন করিয়া ঘোড়া ও গাড়ীকে সাজাইয়া বাহির হইয়াছিল। গাড়ীটা ছিল নূতন এবং ঘোড়াগুলিকে এমন ভাবে বুরুশ করা হইয়াছিল যে, তাহাদের গায়ের চিক্কণ লোম উজ্জ্বল রেশমের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। ঘোড়ার মুখে নূতন লাগাম লাগানো ছিল এবং গাড়ীর গদির উপর লাল রঙের সুন্দর একখানা চাদর বিছানো ছিল। তাহার পরনে ছিল শিকারের পোষাক, গায়ে অপেক্ষাকৃত ছোট কোট, মাথার উপর ক্যাপ এবং পায়ে বুট জুতা, ও তাহার মধ্যে প্যাণ্টালুনের শেষ দিকটা ঢুকান। ইহা উৎসবের পোষাক ছিল না, কিন্তু সে ভাল করিয়াই জানিত যে, এই পোষাকে তাহাকে বীর পুরুষের মত দেখায়।

সকাল বেলা গাড়ীতে করিয়া সে বাহির হইয়াছিল একাই, কিন্তু মনে তাহার অনেক রঙীন কল্পনা খেলিতেছিল বলিয়া পথ চলার সময়টা একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধেক পথ চলার পর তাহার চোখে পড়িল এক তরুণী—একই পথ ধরিয়া অতি-ধীরে হাঁটিয়া চলিয়াছে। এত ক্লান্ত যে, মনে হইতেছিল তাহার হাঁটিয়া যাইবার শক্তি নাই। তখন বর্ষাকাল। বৃষ্টির জলে পথের ধুলা কাদায় পরিণত হইয়াছে। প্রতি পদবিক্ষেপে তরুণীর জুতা যে কাদায় ভারী হইয়া উঠিতেছে, ইহাও গুডমুণ্ড লক্ষ্য করিয়াছে। সে গাড়ী থামাইয়া তরুণীকে তাহার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে যখন জানিল যে, সেও আদালতে যাইবে, তখন গুডমুণ্ড তাহাকে গাড়ীতে উঠিয়া যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। তরুণী ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া গদির বিপরীত পার্শ্বের কাঠের বেঞ্চের উপর বসিল—যেন গুডমুণ্ডের পাশে লাল চাদরে ঢাকা গদির উপর বসিতে তাহার সাহস হয় না। গুডমুণ্ড তরুণীকে নিজের পাশে বসাইবার কথা মোটেই ভাবে নাই। এই তরুণীর সঙ্গে পূর্ব্বে কোন পরিচয় ছিল না, কিন্তু অনুমানে মনে হয় যে সে কোন গ্রাম্য গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। গুডমুণ্ড মনে ভাবিল যে গাড়ীর উল্টা দিকের কাঠের বেঞ্চে বসিয়া যাইতে তরুণীর হয়ত ভালই লাগিতেছে।

গাড়ী উঁচু ঢালু রাস্তায় পড়ার পর ঘোড়ার বেগ কমিয়া আসিল। গুডমুণ্ড তখন তরুণীর নাম ধাম জানিবার ইচ্ছায় কথা বলিতে সুরু করিল। তাহার নাম হেল্‌গা, সে চোরা-বালি পাহাড়ের উপর গৃহস্থ-ঘরে থাকে; কথাটা শুনিয়াই গুডমুণ্ড অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি সেখানে বাবা মা'র কাছে থাক, না, অন্য কোথাও চাকরানীর কাজ কর?"—উত্তরে তরুণী জানাইল যে, সে গেল বৎসর হইতে বাড়ীতেই আছে, পূর্ব্বে কাজ করিত। গুডমুণ্ড আবার অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বাড়ীতে কাজ করিতে?" তাহার মনে হইল যে,

তরুণী উত্তর দিতে দেরি করিতেছে। অবশেষে উত্তর আসিল, "প্যের-মোরটেনসনের বাড়ীতে।"—কথাটা বলিতে তাহার স্বর এত নামিয়া গিয়াছে—যেন সে ইচ্ছা করে গুডমুণ্ড তাহার উত্তর শুনিতে না পায়। কিন্তু গুডমুণ্ড উত্তরটা স্পষ্টই শুনিতে পাইয়াছে।—"য়্যা, তাহলে তুমি সেই—" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। সে পূর্ব্বের ন্যায় পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া বসিল এবং আর কোন প্রশ্ন করিল না।

গুডমুণ্ড ঘোড়ার পিঠে চাবুকের পর চাবুক মারে ও কর্দ্দমাক্ত রাস্তার জন্য বারবার গলা উঁচু করিয়া অভিশাপ দেয়। তাহাকে আর শান্ত দেখাইতেছিল না। তরুণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর গুডমুণ্ড টের পাইল যে তরুণী তাহার বাহুর উপর হাত দিয়াছে। সে পাশ না ফিরিয়াই প্রশ্ন করিল, "তোমার কি চাই?" উত্তরে সে জানিল যে, তরুণী নামিয়া যাইতে চায় এবং সেজন্য তাহাকে গাড়ী থামাইতে হইবে। সে খানিকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, "ঘ়্যা, কেন?—গাড়ীতে করিয়া যাইতে কি তোমার ভাল লাগিতেছে না?"

—"হ্যা, ধন্যবাদ, আমি কিন্তু হাঁটিয়া যাইতে চাই।" গুডমুণ্ডের মাথায় তোলপাড়। দুঃখের বিষয়, ঠিক আজ এই দিনে সে হেল্‌গার মত মেয়েকে নিজের গাড়ীতে ডাকিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আবার এই কথাও তাহার মনে হইল যে, একবার ডাকিয়া আনিয়া গাড়ীতে বসাইয়া পরে নামাইয়া দেওয়াটা ভাল দেখায় না। তরুণী আবার "থামুন, অনুগ্রহ করিয়া থামুন" বলিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে গুডমুণ্ডও লাগাম টানিয়া ধরিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'তার মত মেয়ে নামিয়া যাইতে চায়—যাক্, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন?"—গাড়ী সম্পূর্ণ থামিবার পূর্ব্বেই তরুণী নামিয়া গিয়াছে। তার পর সে বলিল—"আপনি যখন আমাকে আপনার গাড়ীতে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন আমার ধারণা ছিল যে, আপনি আমাকে চেনেন; তা না হইলে আমি কখনও আপনার গাড়ীতে চড়িতাম না।"

গুডমুণ্ড সংক্ষেপে "নমস্কার" বলিয়া আবার গাড়ী হাঁকাইল। গুডমুণ্ড যে এই তরুণীকে চেনে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্যাবস্থায় অনেকবারই গুডমুণ্ড তাহাকে চোরা-বালির কাছে খেলা করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সে বড় হইয়াছে, এখন সে তরুণী। সঙ্গিনীকে নামাইয়া দিয়া প্রথমটায় গুডমুণ্ড খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে সে নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিল। তরুণীর প্রতি অন্য প্রকার ব্যবহার করিবার কোন পথ যে তাহার জানা ছিল না! কাহারও প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা গুডমুণ্ডের স্বভাবে ছিল না।

হেল্‌গাকে নামাইয়া দেওয়ার কিছুক্ষণ পর গুডমুণ্ড বড় রাস্তা ছাড়িয়া এক ছোট পথে নামিয়া চলিয়াছে এবং অতি শীঘ্রই সে অতি বৃহৎ এক কৃষিক্ষেত্রের মাঝ দিয়া গিয়া একটি বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে সদর দরজার কাছে গাড়ী থামাইবামাত্র ভিতর হইতে কে একজন দরজা খুলিয়া দিল এবং পরক্ষণেই গৃহকর্ত্তার মেয়ে তাহার গাড়ীর কাছে আসিয়া হাজির হইল। গুডমুণ্ড মাথার টুপি খুলিল নমস্কার জানাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাহার মুখখানাও আরক্তিম হইয়া উঠিল। —"গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে আছেন কি না জানিতে আসিয়াছিলাম," বলিয়া সে কথা আরম্ভ করিল। মেয়ে উত্তর দিল, "না, বাবা বেশ খানিকক্ষণ হইল আদালতে গিয়াছেন।" গুডমুণ্ড আবার বলিল, "সত্যি! তিনি তাহা হইলে চলিয়া গিয়াছেন? আমি জানিতে আসিয়াছিলাম, মহাশয় আমার গাড়ীতে করিয়া যাইতে রাজী আছেন কি না।" —অভিযোগের স্বরে মেয়ে বলিল, "বাবার সব কাজেই কেবল তাড়াহুড়া।" তার উত্তরে গুডমুণ্ড কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, "তাহাতে কিছু আসে যায় না।" —মেয়েটি মৃদুহাস্যে নূতন কথা পাড়িল—"তোমার গাড়ীর মত এমন চমৎকার গাড়ী করিয়া যাইতে বাবা নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করিতেন।" নিজের গাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া গুডমুণ্ডের মুখখানা বেশ উজ্জল হইয়া উঠিল। সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিল, "এখন তবে আসি, এখন আমাকে যাইতে হইবে।" —আবার উত্তর আসিল, "গুডমুণ্ড, ঘরে একটু বসিয়া যাও না।"—"ধন্যবাদ হিলডুর! কিন্তু আমাকে আদালতে যাইতে হইবে। দেরি করাটা ভাল দেখায় না।"

[ক্রমশঃ]

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতসচিবের "মায়া, এবং রজ্জু ও সর্প"

৪ঠা নবেম্বর লণ্ডনে বঙ্গের নূতন গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ ও তাঁহার পত্নীকে একটি মধ্যাহ্ন ভোজ দেওয়া হয়। ভোজে সভাপতি ছিলেন ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,

ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর স্থাপিত শাসনপদ্ধতি দিবার চেষ্টার মূলে ছিল ভারতীয়দের স্বাভাবিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার একাগ্র ইচ্ছা এবং ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্বন্ধ অধিক হইতে অধিকতর হৃদ্যতাপূর্ণ করিবার একান্ত ইচ্ছা।

যে-রকম ইচ্ছা ছিল বলিয়া ভারতসচিব বলিয়াছেন, কেমন করিয়া বলিব তাহা ছিল না? আমরা ত ব্রিটিশ জাতির হৃদয়বিহারী অন্তরজ্ঞাতা নহি। পরচিত্ত অন্ধকার। আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি, যে, ভারতবর্ষকে যে শাসনপদ্ধতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা-সম্মত নহে, তাহাকে গণতান্ত্রিকতার ছদ্মবেশ পরান হইয়াছে মাত্র। ইহাও বলা আবশ্যক, যে, তাহার দ্বারা ভারতীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই। ১৯৩৫ সালের ভারত-গবর্মেণ্ট আইন প্রণীত হয় জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটির রিপোর্ট অনুসারে। সেই রিপোর্টে কমীটি বলিয়াছেন, ভারতীয় (তথাকথিত) প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁহারা মডারেট ("নরমপন্থী") তাঁহাদের অনুরোধ, প্রস্তাব বা সুপারিশগুলিও কমীটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। লর্ড জেটল্যাণ্ড এই কমীটির সভ্য ছিলেন; অথচ তিনি বলিতেছেন, ভারতীয়দের স্বাভাবিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্যই আইনটা প্রণীত হইয়াছিল! তাহা হইলে, ভারতসচিবের কথাগুলি হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, যে, ভারতীয়দের মধ্যে খুব অল্পে সন্তুষ্ট হইত যাহারা, তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষাতে কর্ণপাত না-করাই ভারতীয়দের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার ব্রিটিশ রীতি? কংগ্রেস, ভারতীয় উদারনৈতিক সংঘ, হিন্দু মহাসভা, মস্লেম লীগ—কেহই ভারতশাসন-আইনের উপর সন্তুষ্ট নহে।

ইহার দ্বারা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সদ্ভাব ও হৃদ্যতা বাড়ে নাই। ইংরেজ যাহা করিয়াছে, করে ও করিবে, ভারতীয়েরা তাহা বিধাতারই দান বলিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিলে হৃদ্যতার ছদ্মবেশধারী একটা জিনিষ বাড়িতে পারিত বটে। ভারতীয়দের এই প্রকার মনোভাব ও তদনুযায়ী বাহ্য আচরণই কি ইংরেজ জাতি আশা করিয়াছিল?

লর্ড জেটল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন, যত রকম শাসনপ্রণালী এ পর্য্যন্ত বিবর্ত্তিত ("evolved") হইয়াছে, ব্রিটিশপ্রণালী তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বুঝা যায়, এই প্রণালীটা সোজা নয়; এই জন্য ইহা যে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলে তাহা হইতে সরিয়া গিয়া কোন কোন শাসনপ্রণালী এক দিকে চরমে গিয়াছে (যেমন রুশিয়ায়), কোন কোনটা বা অন্য দিকে চরমে গিয়াছে (যেমন ইটালী ও জার্ম্মেনীতে)।

ব্রিটিশ জাতি ব্রিটেনের জন্য যে শাসনপ্রণালী গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে ভারতসচিবের এই দাবীর সমর্থন বা খণ্ডন আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা তাঁহার দাবী মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভারতবর্ষকে কি ব্রিটেনে প্রচলিত ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী দেওয়া হইয়াছে? ভারতবর্ষ ব্রিটেন নহে, উভয় দেশের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে। সুতরাং ব্রিটেনে প্রচলিত শাসনপ্রণালী ও ভারতে প্রচলিত শাসনপ্রণালী হুবহু এক হইতে পারে না। কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয়ের ঐক্য থাকিতে পারে ও থাকা চাই। এক—ব্রিটেনে যেমন ব্রিটিশ জাতি প্রভু, ভারতবর্ষে তেমনি ভারতীয়েরা হইবে প্রভু। দুই—ব্রিটেনের সমুদয় রাষ্ট্রীয় বিধি ও কার্য্যের উদ্দেশ্য যেমন ব্রিটিশ জাতির কল্যাণ, তৎসমুদয় যেমন ব্রিটিশ কল্যাণের অবিরোধী, তেমনি ভারতবর্ষেরও সমুদয় রাষ্ট্রীয় বিধি ও কার্য্যের উদ্দেশ্য হওয়া

চাই ভারতীয় জাতির কল্যাণ, তৎসমুদয় ভারতবর্ষের মঙ্গলের অবিরোধী হওয়া চাই। কিন্তু ভারতবর্ষে যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার দ্বারা এই দেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে ও হইবে, ব্রিটিশ প্রভুত্বের ও স্বার্থের প্রতিকূল কিছু ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন ও ভারতীয় প্রভুত্ব স্থাপন ইহার মূল লক্ষ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িয়া গেল, যে, দাদাভাই নওরোজী তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন, "দারিদ্র্য ও ভারতবর্ষে অ-ব্রিটিশ শাসন" ("Poverty and un-British Rule in India")। এই "অ-ব্রিটিশ" শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে এখনও চলিতেছে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী যদি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহাতে আমাদের কি লাভ? "বেল পাকলে কাকের কী?" ব্রিটনে তাহার শাসনপ্রণালী যে ভাল, তাহার দ্বারা ভারতের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না।

অতঃপর লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন,

ভারতবর্ষের মূল রাষ্ট্রবিধির (কন্সটিটিউশ্যনের) উচ্ছেদসাধন এখনও কংগ্রেসের করণীয়-তালিকার অন্তর্গত, এবং এই অদ্ভুত ধারণা এখনও বিদ্যমান যে, ঐ কন্সটিটিউশ্যনটি আমরা গড়িয়াছি একটা চরম কু-অভিপ্রায়ে। এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আবার বলিতে হইতেছে, পরচিত্ত অন্ধকার বলিয়া, ব্রিটিশ জাতি কি অভিপ্রায়ে ভারতশাসন আইন গড়িয়াছে, আমরা এখানে তাহা নির্দ্দেশ করিতে বিরত থাকিব। কিন্তু ইহাও বলিতে হইতেছে, যে, যদি তাহারা কোন কু-অভিপ্রায়ে তাহাদের অধীন কোন দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে, তাহা হইলে সেটা অনেকটা ভারতশাসন-আইনের মত হইবার সম্ভাবনা আছে।

অভিপ্রায়টা কু কি সু, সে বিষয়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মতের অনৈক্য স্বাভাবিক। ব্রিটিশ জাতির স্বদেশে এবং তাহাদের অধীন বিদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও স্বার্থ রক্ষা ব্রিটিশ জাতির মতে পরম সু-অভিপ্রায় বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের এই অভিপ্রায় যদি আমরা সু-অভিপ্রায় মনে না-করি, তাহা হইলে এই মতভেদ কি অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত?

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের "মায়া" সম্বন্ধীয় ধারণাটি লর্ড জেটল্যাণ্ড স্মরণ করেন, যাহার প্রভাবে মানুষ যে জিনিষটি যাহা নয় তাহাকে তাহাই মনে করে। যেমন মায়ার বশে মানুষ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের সম্বন্ধ বিষয়ে সদভিপ্রায়কে দুরভিসন্ধি বলিয়া ভ্রম করা হইতেছে। যেমন ভারতীয় দর্শনাধ্যায়ীরা মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া বস্তুসকলের প্রকৃত রূপ দর্শন করে, তদ্রূপ, ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতিদের মধ্যে সম্পর্ককে যে মেঘ আচ্ছন্ন করিয়াছে, সদ্ভাবপূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা তাহা অপসারণের একান্ত আবশ্যকতা যাঁহারা অনুভব করেন, তাঁহাদের পরম চেষ্টাও ঐ দর্শনাধ্যায়ীদের মত হওয়া উচিত।

ভারতসচিব চান, যে, ভারতশাসন-আইন ব্রিটিশ জাতির সদভিপ্রায়প্রসূত, ভারতীয়েরা এইরূপ বিশ্বাস করে। তিনি চান, আমরা যেন "মায়া"র প্রভাব অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হই। আমরাও ভারতসচিবের পথের পথিক হইয়া চাই, যে, তিনি ও তাঁহার সমবিশ্বাসী ইংরেজরা যেন "মায়া"র প্রভাব কাটাইয়া ভারতীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হয়েন।

হিন্দুরা ব্রিটিশ ভারতে শতকরা ৭০ জনের উপর। অথচ তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কেবল শতকরা ৪২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হইয়াছে। অন্য দিকে, ইংরেজরা, দেশী রাজ্য সকলের নৃপতিরা, ও মুসলমানরা মোট অধিবাসী-সংখ্যার শতকরা যত জন, মোট প্রতিনিধিসংখ্যার তদপেক্ষা অধিক অংশ নির্ব্বাচন করিবার অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ একচোখো ব্যবস্থার মধ্যে সদভিপ্রায়টা যে কি, তাহা ভারতসচিব এপর্য্যন্ত কখনও বলেন নাই।

তাঁহার মতে আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে। এক অর্থে ইহা সত্য হইতে পারে। রজ্জু মানুষের হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে। সাপের কামড়ে মানুষের প্রাণ যাইতে পারে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, যে, ভারতশাসন-আইন রজ্জুর মত; ইহা আমাদের হাত পা বাঁধিয়া আমাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চায়। এবং ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে, যে, ইহা বিষধর সাপের মত নহে; ইহা ভারতীয় জাতির বিনাশসাধন করিতে চায় না। বস্তুতঃ, ভারতীয় জাতি মরিলে কাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সে, কাহাদের মানসিক

ও দৈহিক শ্রমের সাহায্যে ব্রিটিশ জাতি ধনশালী ও শক্তি-শালী থাকিবে? ভারতীয় জাতি মরিলে আর কোন্ জাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত এত সৈন্য, এত রসদ, এত অস্ত্রশস্ত্র, এত অর্থ জোগাইতে পারিবে? অতএব আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি, যে, ভারতীয় জাতির বিনাশসাধন ভারতশাসন-আইনের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা তাহা মনে করে, তাহাদের নিশ্চয়ই রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, তাহারা বন্ধন-রজ্জুকে প্রাণান্তক সাপ মনে করিয়াছে।

—

বঙ্গে সরকারী চাকরী ভাগ

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল স্থির করিয়াছেন, বিচার-বিভাগের সমস্ত চাকরীর শতকরা ৪৫টি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে, এবং অন্যান্য বিভাগের চাকরীরও এইরূপ বাঁটোয়ারা হইবে। জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যোগ্যতমকে চাকরী দেওয়ার আমরা পক্ষপাতী। অতএব, এরূপ বাঁটোয়ারার সমর্থন আমরা করি না। যাহারা হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাধায়, সরকারী চাকরীতে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বেশী থাকায় তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার কাজের সুবিধা হয়। এইরূপ বাঁটোয়ারায় যদি ঝগড়া কমে, তাহা হইলে তাহা এই কুব্যবস্থার একটা সুফল হইবে। কিন্তু সেরূপ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা কম। বঙ্গে শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরী সব বিভাগে মুসলমানদের হস্তগত না-হওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইতে যত সময় লাগিবে তাহার মধ্যে যদি মুসলমানেরা আরও বাড়িয়া বঙ্গের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসী হয়, তাহা হইলে তখন বলা হইবে, শতকরা ৫৬টি চাকরী তাহাদের জন্য চাই। সুতরাং এপথে ঝগড়ার বিরাম নাই। ঝগড়ার বিরাম হইতে পারে যোগ্যতমের নিয়োগকে সকল সম্প্রদায়ের লোক ন্যায্য বলিয়া বুঝিলে ও স্বীকার করিলে।

সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে এই রকম বাঁটোয়ারা ইংরেজ গবন্মেণ্টের ব্যবস্থার সুযোগে ঘটিতে পারে। কিন্তু সরকারী চাকরী রোজগারের একটা মাত্র পথ। চাষ ব্যবসা বাণিজ্য কারিগরী প্রভৃতি উপার্জ্জনের পথ নানা রকমের আছে। তাহার কোন কোনটিতে মুসলমানদের একচেটিয়া দখল বা প্রাধান্য আছে। যদি আইন বা সরকারী অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা গবন্মেণ্ট সেগুলির শতকরা ৪৪ অংশ হিন্দুদিগকে দিতে চায়, তাহা হইলে মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হইবেন কি? তাহা হইবেন না। তখন তাঁহারা বলিবেন, অধিকতর দক্ষতা ও যোগ্যতার দ্বারা মুসলমানেরা এগুলিতে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে কেন তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে চাও?

হিন্দুরাও কি সেইরূপ বলিতে পারে না, যে, শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর বলিয়া যোগ্যতার বলে হিন্দুরা নানা চাকরীর ক্ষেত্রে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে; কৃত্রিম উপায়ে কেন তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে চাও?

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত লোকেরা এবং সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক গবন্মেণ্ট ন্যায্য যুক্তিতর্ককে আমল দিবে না। এত কাল হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে যে সব শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ চাকরীর জন্য প্রস্তুত হইতেন ও তাহারই উমেদারীতে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে এখন ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গে তাঁহাদের উপার্জ্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়াছে এবং আরও সংকীর্ণ ভবিষ্যতে হইবে; বঙ্গের বাহিরে ত হিন্দু বাঙালীর চাকরী পাওয়া আগে হইতেই দুর্ঘট হইয়াছে। সেই জন্য বাঙালী যুবকেরা উপার্জ্জনের যে সব "বে-সরকারী" উপায় আছে, তাহার দিকে স্বভাবতই আগেকার চেয়ে ঝুঁকিয়াছেন। আরও বেশী করিয়া ঝুঁকিতে হইবে। এবং শুধু ঝুঁকিলেই চলিবে না, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই সব উপায় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত ও সমর্থ হইতে হইবে।

—

জলযান-চালন বিদ্যা

কটক হইতে প্রেরিত ২০শে অক্টোবরের য়ুনাইটেড প্রেসের একটি টেলিগ্রামে দেখিতেছি, যে, উড়িষ্যা গবন্মেণ্ট জলযান-চালন বিদ্যা শিখাইবার বিদ্যালয় স্থাপন বিবেচনা করিতেছেন। ইহা চাঁদবালী বন্দরে স্থাপিত হইবার কথা। চিল্কা হ্রদের মুখ খুলিয়া দিয়া তাহাকে একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করিয়া তুলিবার প্রস্তাবও হইয়াছে।

আশা করি, উড়িষ্যা গবন্মেণ্ট এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক

ষ্টীমার-চালন বিদ্যা শিখিতে পারে এবং ষ্টীমারের নিম্নতম হইতে উচ্চতম কাজে যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত হইতে পারে। বাংলা দেশে, আইনে কি আছে জানি না, একমাত্র মুসলমানেরাই সারেং প্রভৃতির কাজ করিতে পায় ও পারে। মুসলমান ধর্মের জন্মেরও পূর্ব্বে যেদেশের লোকেরা জাহাজ চালাইয়া জাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপান যাইত, তাহারা এখন বঙ্গের নদীগুলাতেও ষ্টীমার চালাইবার সুযোগ পায় না।

মুসলমানেরা উপার্জ্জনের যে-সকল ক্ষেত্রে আগে কম সংখ্যায় নিযুক্ত বা ব্যাপৃত ছিল এবং এখনও আছে, তাহাতে অধিকতর সংখ্যায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। ইহা জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। হিন্দুদের মধ্যে যে এরূপ চেষ্টা একেবারে নাই, তাহা নহে। কিন্তু চেষ্টা আরও বেশী হওয়া উচিত।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"য় (১০ই আশ্বিনের কলিকাতা সংস্করণে ও ১২ই আশ্বিন মফঃসল সংস্করণে) জাহাজের কাজে হিন্দুর প্রবেশে বাধা সম্বন্ধে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাহা সর্ব্বসাধারণের যেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। তাহা আমরা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

মহাশয়—ষ্টীমার কোম্পানীগুলির অধীনে শিক্ষানবীশ হইয়া সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিবার জন্ম বহুদিন যাবৎ আমি চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। ভারতের আভ্যন্তরীণ নদীসমূহের মেরিন সার্ভিসের আইন অনুযায়ী ষ্টীমারের সারেঙ্গএর অধীনে সুখানি হইয়া কাজ শিক্ষা করিতে হয়। যদি সারেঙ্গ এই শিক্ষার্থীকে সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত মনে করিয়া সার্টিফিকেট দেন, তাহা হইলে শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়। কাজেই আমি ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোম্পানী ও রিভার্স ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বহু সারেঙ্গএর নিকট আমাকে সুখানি করিয়া লইবার জন্ম অনুরোধ করায় তাঁহারা বলিলেন, কোম্পানীর আইন অনুযায়ী হিন্দুদের শিক্ষার্থী হিসাবে নিযুক্ত করা নিষেধ। সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারিয়া আমি কীলবর্ণ কোম্পানীর মেরিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে কেহ সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিতে পারে। কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী সারেঙ্গই ষ্টীমারের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সুতরাং খালাসী এবং সুখানি সারেঙ্গ নিযুক্ত করিবে। কোম্পানীর প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই।"

বঙ্গীয় ষ্টীমারগুলি (মেরিন ডিপার্টমেণ্ট ও পূর্ত্ত-বিভাগ) মুসলমানদের দ্বারাই পরিচালিত; সুতরাং আমি হিন্দু বলিয়া কোন সারেঙ্গই আমাকে সুখানি করিয়া লইতে স্বীকৃত না হওয়ায় আমি ঈষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম কোম্পানীর অফিসে গিয়া আমাকে সুখানি পদে নিযুক্ত করার জন্ম অনুরোধ করাতে তাঁহারাও আমাকে উল্লিখিতরূপ জবাব দিলেন।

ঈষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টীম কোম্পানী দেশীয় মূলধনে পরিচালিত। কাজেই আমার বিবেচনায় উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের কয়েকটি হিন্দু যুবককে শিক্ষার্থী হিসাবে তাঁহাদের ষ্টীমারে নিযুক্ত করা উচিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাকে কোন ষ্টীমারে শিক্ষার্থী হিসাবে দিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু এবং মুসলমানগণ ভ্রাতৃভাবে বাস করিতেছে এবং সমস্ত বিভাগেই (মেরিন বিভাগ ব্যতীত) সমভাবে উভয় সম্প্রদায়ের লোক মেলামেশা করিয়া চাকুরী করা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ দাবী করিয়া দিন দিনই তাহাদের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বঙ্গীয় মেরিন সার্ভিস ও ষ্টীমারের পূর্ত্ত-বিভাগে মুসলমানদেরই একচেটিয়া দখল। ঐ বিভাগ দুইটিতে হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নাই।

আমি বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের হিন্দু এবং মুসলমান সদস্যদের নিকট অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন ন্যায় বিচার করিয়া বঙ্গীয় মেরিন সার্ভিসে ও ষ্টীমারের পূর্ত্ত-বিভাগে হিন্দুদের জন্ম কতকগুলি চাকুরী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিবার সুযোগ দিয়া হিন্দু যুবকদের কিঞ্চিৎ বেকার সমস্যার সমাধান করেন।

যদি কোন সহৃদয় ভদ্রলোক শিক্ষার্থী হইয়া সারেঙ্গশিপ পরীক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন।

(স্বাঃ) শ্রীনলিনীরঞ্জন কর
দেওয়ানজী বাড়ী, পোঃ গঙ্গাবিয়া;
জিলা ত্রিপুরা।

আমরা এরূপ কোন অসঙ্গত অনুরোধ করি না—তদ্রূপ কোন আশাও পোষণ করি না, যে, বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল নিয়ম করিয়া দিবেন, যে, জাহাজের শতকরা ৪৪।৪৫টি কাজ হিন্দুরা পাইবে। কিন্তু হিন্দুদের ও অন্য অমুসলমানদের এই সকল কাজে প্রবেশের আইনগত কোন বাধা থাকিলে তাহা দূর করা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদের, মন্ত্রিমণ্ডলের এবং গবর্ন্মেণ্টের নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য।

পদ্মা ও অন্যান্য বৃহৎ নদীতে অনেক কাজ শুধু যে হিন্দু বাঙালীর হাতছাড়া হইয়াছে তাহা নহে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙালী মাত্রেরই হাতছাড়া হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়টির আলোচনা করিলে ভাল হয়। সর্ব্বসাধারণে প্রকৃত অবস্থা জানিতে না পারিলে প্রতিকার-চিন্তা ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বন সম্ভবপর নহে।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাটনা শহরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। অভ্যর্থনা-সমিতির প্রচার-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনের বিভিন্ন শাখার নিম্নলিখিত কয়েক জন সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন :

বৃহত্তর বঙ্গ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ; মহিলা শাখা—মহারাণী সুচারু দেবী ; সঙ্গীত—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী ; কলা—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ; সাহিত্য—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ; বিজ্ঞান—ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ; অর্থনীতি—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনের মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সম্মেলনের স্থায়ী পরিচালক সমিতির সভাপতি বৃহত্তর বাঙালী-সমাজের নেতা ডাক্তার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। পাটনা অধিবেশনের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইবে। বিভিন্ন শাখার অধিবেশন ব্যতীত বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা সভা (Symposium) বসিবে। এই আলোচনায় বিহারী সাহিত্যিক-দিগকেও আহ্বান করা হইবে। প্রবন্ধাদি ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়া পৌছিলে সেগুলির সারমর্ম্ম সংকলন করিয়া মুদ্রিত করা হইবে। স্থানীয় প্রভাতী সংঘ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের বিহারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংঘের সভ্যদের রচনা সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ উপহার দিবেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সময়োচিত চারু ও কারু কলার এবং ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হইবে। প্রদর্শনীতে পদকের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যান্য আমোদপ্রমোদ ব্যতীত যাত্রা, কবিগান, তরজা, কীর্ত্তন, ঝুমুর, পাঁচালি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। সম্মেলন সংক্রান্ত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পাদক, প্রচার-বিভাগ, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন, বাঁকীপুর, পাটনা হইতে প্রাপ্তব্য।

—

"নিখিল-ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন"

"নিখিল-ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বরের শেষ দিকে রেঙ্গুনে হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। "প্রবাসী"র সম্পাদককে এই অধিবেশনের সভাপতির কাজ করিতে বলা হইয়াছে। অধিবেশন ২৪শে হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সভাপতি ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

—

"প্রবাসী-সম্মেলনী"

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র "প্রবাসী-সম্মেলনী" যাহাতে যথাসময়ে ও ঠিক্ মাসে মাসে প্রকাশিত হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। ইহার আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখা হইয়াছে : -

দিল্লী অধিবেশনে স্থির হয় যে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের' প্রচারকার্য্যের জন্য একটি সাংবাদিক মাসিক পত্রিকা আবশ্যক। এই পত্রিকা যে কেবলমাত্র প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবে, তাহা নহে, ইহার আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে। যথা—

১। ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা ও পাত্র-পাত্রী-সংবাদ প্রকাশ করা।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ও তাহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করা।

৩। প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যসমূহের অনুবাদ প্রকাশ করা ও তাহার আলোচনা।

৪। প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তিকলাপ, জীবন-কথা পারিবারিক ইতিহাস প্রভৃতি প্রকা করা।

৫। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জীবন-সমস্যার নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করা।

৬। প্রবাসের প্রতিষ্ঠানগুলির এবং কর্ম্মিসংঘের তালিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও প্রবাসী বাঙ্গালীকে সংঘবদ্ধ করা।

এই সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে মনোযোগী থাকা আবশ্যক। সেগুলির কেবল নির্দ্দেশ যথেষ্ট নহে।

—

প্রবাসী বাঙালীর জীবন-কথা

অনেক প্রবাসী বাঙালীর জীবন-কথা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস "প্রবাসী" কাগজে বাহির করিয়াছিলেন। সেই সকল ও অন্য বহু জীবনী তাঁহার "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক বৃহৎ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আরও কেহ কেহ কোন কোন প্রবাসী বাঙালীর জীবনী "প্রবাসী"তে ও অন্য কোন কোন কাগজে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বঙ্গের বাহিরে এলাহাবাদের "প্রবাসী-সম্মেলনী"তে ও

মধ্যপ্রদেশের "মধ্যভারতী"তে এইরূপ জীবনী বাহির হইয়া থাকে।

কলিকাতা যদিও এখন আর ভারতবর্ষের রাজধানী নাই, তথাপি ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানা পরিচালন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের যত লোক কলিকাতায় থাকিয়া উপার্জ্জন করে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তত করে না। অ-বাঙালীরা বঙ্গে—বিশেষতঃ কলিকাতায়—যত উপার্জ্জন করে, বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে কোথাও তত উপার্জ্জন করে না। উপার্জ্জক হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু উপার্জ্জন বিখ্যাত বাঙালীরাও বঙ্গের বাহিরে খুব বেশী করিতে না পারিলেও, তাঁহাদের অনেকের অন্য প্রকার এরূপ কৃতিত্ব আছে, যাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও স্মরণীয়। বঙ্গের বাহিরের কাগজগুলি বিখ্যাত ও অবিখ্যাত এইরূপ অনেকের জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়া বাঙালী সমাজের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন। "প্রবাসী-সম্মেলনী" নাগপুরের বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত।

—

দিল্লীতে বাঙালী

দিল্লী ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী হইবার আগে হইতেই অনেক বাঙালী সেখানে থাকিতেন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছিলেন; এবং প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও অনেকে নানা দিকে কৃতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও জীবন-কথা কোন-না-কোন কাগজে প্রকাশিতও হইয়াছে।

দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় নয়া দিল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে, পুরাতন দিল্লীও বিদ্যমান আছে। রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় এখানে নানা প্রদেশের লোকের সমাগম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফেডারেশনের পরিকল্পনা যখন কার্য্যে পরিণত হইবে, তখন নয়া দিল্লীর গুরুত্ব আরও বাড়িবে। কারণ, তখন ফেডারাল ব্যবস্থাপক সভা ও ফেডারাল ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন এখানে হইবে, বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যবস্থাপকের সমাগম এখানে হইবে, দেশীয় নৃপতি ও তাঁহাদের কর্ম্মচারী প্রভৃতি "নরেন্দ্র-মণ্ডল" স্থাপিত হইবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত যত আসিতেছেন তাহা অপেক্ষাও বেশী আসিবেন, এবং ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হেতু অন্যবিধ লোকেরও সমাগম বাড়িবে। ফেডারেশনের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ফেডারাল আদালত স্থাপিত হওয়ায় তদুপলক্ষ্যেও নানা প্রদেশের কতকগুলি লোক কোন-না-কোন কারণে ও উপলক্ষ্যে এখানে আসিবেন।

রাজধানীর বেসরকারী ও সরকারী নানা কাজে যত লোক ব্যাপৃত আছেন ও পরে থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের লোক যেমন আছেন ও থাকিবেন, বাঙালীরও সেইরূপ থাকা আবশ্যক, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

আমাদের দেশের গবর্ন্মেণ্ট বিদেশী বলিয়া সরকারী কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে-নেতৃস্থানীয় লোকদের ও তাঁহাদের সহকর্ম্মী ও অনুকর্ম্মীদের যে মনের ভাব ছিল ও এখনও আছে, গবর্ন্মেণ্ট যতই দেশী হইতে থাকিবে, ততই সেই ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তিত হউক বা না হউক, কোনও সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকিয়া কোন বাঙালী যদি প্রশংসনীয় যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হওয়া অবশ্যই আবশ্যক। তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত তদুপলক্ষ্যে আলোচ্য নহে।

আমরা এখন প্রবাসী বাঙালীদেরই কথা বলিতেছি, বিশেষ করিয়া দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীদের কথা হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থায়ী ভাবে দিল্লীর বাসিন্দা, কেহ কেহ বা অস্থায়ী ভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য তথায় বাস করেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে যে-সকল বাঙালী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তাঁহার যোগ্যতা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। তিনি শেষ যে আইনটির প্রণয়নে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বীমা-সম্পর্কীয় আইন। এই আইনের পাণ্ডুলিপি রচনায় এবং ব্যবস্থাপক সভায় ইহার আলোচনার সময় তর্কবিতর্কে শ্রীযুক্ত সুশীল সেনের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। সরকার মহাশয় ইতিপূর্ব্বে কোম্পানী আইন

সম্পর্কেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। হিন্দুনারীদের দায়াধিকার সম্বন্ধে ডাঃ দেশমুখের উদ্যোগে যে আইন প্রণীত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন সরকার মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তা ভিন্ন তাহা হইতে পারিত না। আইন-সম্পর্কিত বিষয়েই যে তাঁহার বিচক্ষণতা আছে, তাহা নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি সিমলায় "কর্ম্মবাদ" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় এ বিষয়ে এত পড়াশুনা ও চিন্তা করিবার সময় তিনি কখন পাইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লেখা আমাদের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং বহু সার্ব্বজনিক বেসরকারী কাজের সহিত তাঁহার যোগের উল্লেখ করিব না।

—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়

দিল্লী-প্রবাসী বাঙালীদের কথার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্প্রতি ভারত-গবর্ন্মেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ কম্যুনিকেশ্যন্স বিভাগের সেক্রেটরীর পদে উন্নীত হইয়াছেন। এই রকম কাজে অধিকাংশ স্থলে ভারতীয়েরা নিযুক্ত হন না, বাঙালীদিগকে পছন্দ না-করিবার কারণ ত সহজেই অনুমেয়। এইরূপ কাজে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় এক জন মাত্র বাঙালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রায় মহাশয় পরলোকগত জেলা ও সেশুন জজ কেদারনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র। তাঁহার বয়স এখনও ৫০ হয় নাই। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ও কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট্স্ কলেজের কৃতী প্রাক্তন ছাত্র। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সিবিল সার্বিসের চাকরীতে নিযুক্ত হন, এবং এপর্য্যন্ত নানা রকম সরকারী কাজ বিশেষ যোগ্যতার সহিত করিয়াছেন। তিনি যে-সব কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে:—১৯১৭ সালে ইজলিংটন কমিশনের প্রস্তাব-সমূহ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত প্রাদেশিক কমীটির সেক্রেটরী, ১৯১৮ সালে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের অধীনে ফিন্যান্স-ডিপার্টমেণ্টের ও ডিফেন্স ফোর্স উপবিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটরী, ১৯১৮-১৯ সালে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের সাধারণ বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটরী, ১৯১৯-২০ সালে হাবড়া মিউনিসিপালিটীর ডেপুটী চেয়ারম্যান্, ১৯২৫-২৭ সালে ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর ও বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের ডেপুটী পোলিটিক্যাল সেক্রেটরী, ১৯২৮-২৯ সালে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লীর মেম্বর ও ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটির ডেপুটী সেক্রেটরী, ১৯৩৬ সালে জেনিভার ইণ্টারন্যাশ্যন্যাল লেবার কনফারেন্সে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধি। তিনি নিজে জেলার কাজই বেশী পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁহাকে বেশীর ভাগ সেক্রেটারিয়েটের কাজই করিতে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার আত্মগোপনের স্বভাব, সৌজন্য, সততা, এবং সদয় ও নম্র ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, যে, আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে আমরাও প্রশংসা করিতাম। তিনি গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ; অন্য প্রমাণ অনাবশ্যক।

—

দিল্লীতে বাঙালীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহা হইয়াছিল তথাকার বাঙালী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে, এবং মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের বাসস্থানও সেইখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের অট্টালিকাটি বেশ উঁচু ও স্বাস্থ্যকর স্থানে গবর্ন্মেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীভাষী ছাত্রদের জন্য এবং মান্দ্রাজী ছাত্রদের জন্য সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত এইরূপ দুটি বিদ্যালয় আছে।

আমরা আগেই বলিয়াছি, দিল্লীতে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মত বাঙালীর সংখ্যাও ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে—অন্ততঃ বাড়া যে উচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তখন বাঙালী ছেলেদের ইস্কুলটির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আরও বেশী করিয়া উপলব্ধ হইবে। মাতৃভাষার ও তাহার সাহিত্যের চর্চ্চা বাল্যকাল হইতেই সকলের করা উচিত। এই প্রকার বিদ্যালয় ভিন্ন বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ছেলেদের তাহা হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের লোকদের যেমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক প্রদেশের সংস্কৃতিরও

বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য প্রদেশের লোকদের যেমন তাহাদের বৈশিষ্ট্যের সহিত যোগ রাখা উচিত, বাঙালীদেরও সেইরূপ রাখা উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের তাহা রাখিতে হইলে যেমন বিদ্যালয় আবশ্যক, তেমনি কলেজও আবশ্যক। অবশ্য যত জায়গায় প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন, সর্ব্বত্র তাঁহাদের বিদ্যালয় ও কলেজ থাকা বা শুধু বিদ্যালয় থাকাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু দিল্লীতে যেমন বিদ্যালয় আছে, সেইরূপ বাঙালীদের কলেজও স্থাপিত করা অসম্ভব নহে। দিল্লীতে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সরকারী মহলে প্রভাবশালী বাঙালী আছেন। অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের মত যোগ্য ব্যক্তি স্বয়ং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। দিল্লীতে বাঙালীরা একটি কলেজ করিতে পারেন কিনা, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য, এরূপ কলেজে অ-বাঙালী ছাত্রেরাও শিক্ষা লাভ করিতে অধিকারী হইবে।

বঙ্গের বাহিরে যেখানে যেখানে সম্ভবপর, সেখানে বাঙালীদের বিদ্যালয় ও কলেজ থাকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ইহা নহে, যে, বাঙালীরা কাহারও সঙ্গে মিশিবে না বা বঙ্গের বাহিরের কোন প্রাদেশিক ভাষা শিখিবে না। তাহা অবশ্যই শিখিবে। কিন্তু তাহাদিগকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির সহিত বিশেষ করিয়া যোগ রাখিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে ও যৌবনে যাহাতে এই যোগ রক্ষিত হয়, তাহার জন্যই স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন। আশা করি পুরাতন দিল্লী ও নয়া দিল্লীর বাঙালীরা আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য মনে করিবেন।

—

বাঙালীর "ভাবপ্রবণতা"র একটি ভাল দিক্

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় আগ্রার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি "প্রবাসী সম্মেলনী"তে নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের যত দোষই থাকুক না কেন, আমরা একটা এমন গুণের অধিকারী—যার বিষয়ে আমরা অনেক কথা জেনেও জানি না। সে গুণটি ভাবপ্রবণতা। অবস্থা অনুসারে এই গুণটি আমাদের হুজুগে বানায়, আবার অন্য দিকে আমাদের "আপনা-ভোলা, পাগলপারা" করে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দেখাবার অবসর বা সুযোগ দেয়। এই দুই অবস্থার মাঝখানের যতগুলি স্তর কল্পনা করা যায়, সে সবগুলিই আমাদের মধ্যে আছে বলেই আমরা অনেক জায়গায় দেবতা বলে মান্য পেয়েছি; আবার অবস্থা-বিশেষে অতি সাধারণ লোকেরও ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েছি।...

["ভাবপ্রবণতা" থাকায় আমরা অনেকে বঙ্গের বাহিরে] স্থানীয় জীবনের উপর একটা বিশিষ্ট রূপের ছাপ রেখে যেতে পেরেছি। আর এ কাজ শুধু কমিসেরিয়েটের বাবুরাই নন, কি শিক্ষক, কি উকীল, কি ডাক্তার, এমন কি সাধারণ চাকুরে পর্য্যন্ত সকল স্তরের প্রবাসী বাঙ্গালীরাই কোথাও না কোথাও এরূপ করতে সমর্থ হয়েছেন। কল্পনা বা আবেগের স্রোতে ভেসে যেতে ও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সময়বিশেষে আমরা যেমন বা যতখানি পারি, ভারতের অন্য কোন জাতি বোধ হয় তেমন বা ততখানি পারে না।

"ভাবপ্রবণতা"র মন্দ দিক্‌টা সুবিদিত।

—

প্যালেস্টাইন ও আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা

ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে লিখিয়াছেন:—

"ভারতবর্ষে ইংরেজ আসিয়া 'শ্বেত মানুষের বোঝা' স্কন্ধে লইয়াছেন এবং নিয়ত চরম স্বার্থত্যাগের দ্বারা সভ্যতার প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সরকারের কৃপাবর্ষণ সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা এবং মানুষের বাসযোগ্য ব্যবস্থার অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে এবং মারী ম্যালেরিয়ায় দলে দলে মরিতে ছাড়ে না।

"প্যালেষ্টাইনে ম্যাণ্ডেট-রাজ চলিয়াছে, সেখানেও আরব গ্রামের অবস্থা শোচনীয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। অথচ প্যালেষ্টাইন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে তাহা ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা এ কথা বলিতেছেন তাঁহারা বিকারগ্রস্ত সোস্তালিষ্ট ইংরেজ নন, প্রবীণ রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ প্রতিনিধি। অতএব দেখা যাইতেছে, ইংরেজই প্যালেষ্টাইনে গিয়া মনের ভুলে ভারতের দুরবস্থার কথা স্বীকার করিয়া ফেলেন—বোধ করি আরব-সম্প্রদায়কে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করাটা একান্ত লক্ষ্যের বিষয়

হওয়ায় এমনতর মনের ভুল ঘটিয়াছে। রিপোর্টের ১২৪ পৃষ্ঠায় আছে—

"...it may be said that, though much more could have been done if more money had been available, the equipment of Palestine with social services is more advanced than that of any of its neighbours, and far more advanced than that of an Indian province or an African colony."

অর্থাৎ—"যদিও একথা বলা চলে যে অধিক অর্থ হাতে পাইলে আরও অনেক উন্নতি করা যাইত, তৎসত্ত্বেও প্যালেষ্টাইনে জনহিতকর বিধিব্যবস্থা প্রতিবেশী অন্য দেশের চেয়ে অগ্রসর এবং ভারতবর্ষের প্রদেশ বা আফ্রিকার কলোনীর চেয়ে বহু গুণে অগ্রসর।"

"ইহাদের মত এই যে ইরাক, তুরস্ক, সীরিয়া, ইজিপ্ট, প্রভৃতি দেশের চেয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা খারাপ। য়ুরোপীয় ইম্পিরিয়ালিজম্-এর লুঠের দেশ আফ্রিকা সহসা ভারতবর্ষের সঙ্গে এক কোঠায় স্থান পাইয়া সম্মানিত হইল। দেখা যাইতেছে, এদেশে এবং ইংলণ্ডে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য তাহার সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। এই স্বীকারোক্তি হয়ত বা অনেকের চোখে না পড়িয়া থাকিবে মনে করিয়া এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র"

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ শহুরে সৌখীন কবি, বাংলা দেশের গ্রাম্য অঞ্চলসমূহের কোন বাস্তব জ্ঞান তাঁহার নাই, তিনি পল্লীগ্রামের ঘটনা অবলম্বন করিয়া গল্প উপন্যাস কবিতা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা নিছক কল্পনার সৃষ্টি। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা যাহাদের আছে, তাহাদের সংখ্যা কম হইলেই সন্তোষের বিষয়। তাহাদের সংখ্যা কম বা বেশী যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র" পড়িলে তাহাদের ওরূপ ধারণা দূর হওয়া উচিত। বিজয়বাবু "রবিবাসর" সমিতির একটি অধিবেশনে "রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্র" বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। খবরের কাগজে দেখিলাম, তিনি ঐ বিষয়ে একটি বহি লিখিবেন। তাহা উপাদেয় হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পদ্য ও গদ্য কাব্যসমূহ পড়িয়াছেন, তাহার সাহায্যে তাঁহাদের সেইগুলি সম্বন্ধে বহু পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে।

—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র পুনরাবির্ভাবে প্রীত হইলাম। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন ১৮৫৯ শকাব্দ চলিতেছে। বঙ্গে এত পুরাতন মাসিক-পত্র এখন আর একখানিও নাই। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ, এম্-এ, বি-এল, মহাশয়ের ঐকান্তিক অনুরাগ ও চেষ্টায় কাগজখানি নবজীবন লাভ করিয়াছে। ইহার নবপ্রকাশিত সংখ্যায় "যোগ" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ আছে। জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ অন্য কয়েকটি লেখাও আছে।

—

"বঙ্গীয় মহাকোষ"

বাংলা এই মহাকোষখানি পূর্ব্ববৎ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ইহার সপ্তদশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বশেষ যে প্রবন্ধটি আছে তাহার নাম "অচ্যুতরায়"। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই মহাকোষের প্রধান সম্পাদক এবং বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সহকারী সম্পাদক। তদ্ভিন্ন বিভাগীয় সংঘসমূহের আরও অধিকসংখ্যক সম্পাদক আছেন।

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একা যে অপূর্ব্ব বঙ্গীয় শব্দকোষ সংকলন করিতেছেন, তাহার ৪৬শ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে। যতগুলি সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই বৃহৎ অভিধানখানি ১৪৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। শেষ শব্দ 'তেঁলানা' বা 'তেলেনা'।

ইহার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া তৃতীয় ভাগ চলিতেছে। অভিধানখানির প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ ও ডাকমাশুল /০

আনা। যে ৪৬ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূল্য ২৩৲ টাকা। হাতে লইলে ডাকমাশুল লাগে না।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার লিখিয়াছি, যে, বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গতিপন্ন প্রত্যেক বাঙালীর এই অভিধানখানি নিজ নিজ গৃহে রাখা উচিত। তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয় সকলের লাইব্রেরিতে এবং সাধারণ পুস্তকাগারসমূহে ইহা রক্ষণীয়। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ইহার গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা কিস্তিবন্দী করিয়া ইহার মূল্য দিতেছেন। যাঁহারা এখন নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারাও এক এক বারে যে কয়টি সংখ্যা কিনিতে সমর্থ, তাহা কিনিতে পারেন।

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত

ইংরেজীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং দেশে ও বিদেশে তাহার প্রশংসা হইয়াছে। এক্ষণে তাহা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজী-না-জানা বাঙালীদেরও পাঠের সুবিধা হইল।

৫৫৭ পৃষ্ঠায় এই বহিখানি সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার এক-একটি পৃষ্ঠা প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা এক ইঞ্চি কম লম্বা ও ২ ইঞ্চি কম চৌড়া। সুতরাং পৃষ্ঠাগুলি বেশ বড়। বহিখানির বাঁধাইও বেশ মজবুত। কাগজ ও ছাপা ভাল। এরূপ একখানি বহির দাম গ্রন্থকার মহাশয় ও প্রকাশকেরা যে আড়াই টাকা মাত্র রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পাইতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৭৭এ চলিতেছে। এখনও তিনি কাজ করিয়া চলিতেছেন। এবং সেই কাজ নিজে ধনী ও সুখী হইবার নিমিত্ত নহে, দেশের লোকদের মঙ্গলের জন্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে, নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের ক্ষেত্রে, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকহিতসাধনের জন্য তিনি কি প্রকারে আপনাকে বাল্যকাল হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং দেশে ও স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষা সমাপনের পর কি প্রকারে এত কাজ করিতে পারিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। অলস তিনি কোন কালে ছিলেন না, বিলাসী কোন কালে ছিলেন না। পুস্তকখানিতে তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনের যে দুটি ছবি আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি সঙ্গতিপন্ন ও বনিয়াদী ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বংশের অহঙ্কার তাঁহাকে বিলাসী করে নাই।

এই বহিখানির বিস্তৃততর আলোচনা করিবার ও পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। এখন বালক-বালিকা ও অধিকবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদিগকে এবং তাহাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদিগকে ইহা পড়িবার অনুরোধ জানাইয়া এবারকার মত বক্তব্য শেষ করি।

—

দেওয়ালিতে আতশবাজি

দেওয়ালিতে যেমন বাসগৃহ ও দোকানপাট-আদি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়, তদ্রূপ নানা প্রকারের বাজি পোড়ানও হইয়া থাকে। বাজি পোড়ানতে কখন কখন দুর্ঘটনা ঘটে। যথেষ্ট সাবধান হইলে তাহা না ঘটিতে পারে।

আলোকমালার সজ্জা ও আতশবাজি নিন্দনীয় নহে। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী তুবড়ি হাওয়াই পটকা প্রভৃতি বাজি কেনা নিন্দনীয়। তাহাতে দেশের বহুলক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। কেবল দেশী বাজিই কেনা উচিত। দেশে যাহা প্রস্তুত হয় না, তাহা কেনা উচিত নয়। বিদেশী বাজি না-কিনিলে না-পোড়াইলে, দৈহিক বল, মানসিক বল, আয়ু, আনন্দ, কিছুই কমে না।

—

প্রবাসী বাঙালীদের একটি কৃত্য

বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে যেখানে বাস করেন, তথাকার সাহিত্য হইতে ভাল বহি অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে তাঁহারা সমৃদ্ধ করিতে পারেন ইহা অনেকবার বলা হইয়াছে। বাংলা ভাল বহি তথাকার ভাষায় অনুবাদ করা তাঁহাদের আর একটি কৃত্য। বাংলা অনেক বহি হিন্দী, গুজরাটী, তেলুগু, কন্নাড, তামিল, মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হয়। কিন্তু অনুবাদ করেন সেই সেই ভাষাভাষী লোকেরা। প্রবাসী বাঙালীদের ইহা করা উচিত। তাহাতে কিছু অর্থ উপার্জ্জনও হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে, যে, অন্য ভাষায় বাঙালীর কৃত অনুবাদ ভাল হইবে না। কিন্তু বাঙালীর লেখা সব ইংরেজী বহি ত মন্দ নহে। বাংলা

বহির গুজরাটী অনুবাদ কোন গুজরাটী করিলে তাহার ভাষা মন্দ হইবে না, ইহা যেমন সাধারণতঃ অনুমান করা যায়, তদ্রূপ ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, যে, বাংলা বহির গুজরাটীতে অনুবাদক বাঙালী বাংলা বহিটি যত ভাল করিয়া বুঝিয়া অনুবাদ করিবেন, গুজরাটী লেখকেরা তত ভাল করিয়া বুঝিয়া অনুবাদ করিতে পারিবেন না। আমাদের মনে হয়, যে-সকল বাঙালী বঙ্গের বাহিরের যে-যে ভাষা ভাল জানেন, তাহাতে বাংলা বহি অনুবাদ করিয়া সেই সেই ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা এরূপ কোন কোন যোগ্য লোককে দেখাইয়া লইলে ফল ভাল হইবে।

—

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনকাল হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দীর্ঘকাল এই সমাজের সম্পাদক ও আচার্য্যের কাজ তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি "অভিব্যক্তিবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। নূতন গবেষণার ফলে অভিব্যক্তিবাদ এখন যে-আকার ধারণ করিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার ঐ বহিটি সংশোধন করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিলে বঙ্গীয় পাঠকসমাজের উপকার হইবে। আমরা যত দূর জানি, বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ে ঐরূপ বহি আর নাই।

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ক্ষিতীন্দ্রবাবু যখন হাবড়া মিউনিসিপালিটির সম্পাদক ছিলেন তখন ঐ পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

—

অধ্যাপক প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজ এবং তথাকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। "বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকায় দেখিলাম তিনি ওয়েসলিয়ান কলেজের ল্যাবরেটরীতে কয়েকটি গবেষণা করিয়া ইংলণ্ডীয় এফ্‌ সি এস্‌ উপাধি পান। এই কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকতার জন্য তাঁহাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। তদ্ভিন্ন তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুলটির অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক রূপেও বিশেষ পরিশ্রম করিতেন।

—

জেম্‌স্ র‍্যামজি ম্যাকডোন্যাল্ড

ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেমস্ র‍্যামজি ম্যাক-ডোন্যাল্ড স্বাস্থ্যলাভার্থ দক্ষিণ-আমেরিকা যাইতেছিলেন। সমুদ্রপথে জাহাজে ৭১ বৎসর বয়সে হৃৎপীড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সামান্য মাত্র শিক্ষা পাইয়া নিজের বুদ্ধি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা এবং ব্রিটেনের প্রথম শ্রমিক গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরে তিনি তথাকথিত ন্যাশন্যাল গবর্মেণ্টেরও প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য শ্রমিক দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে যে-সকল মত পোষণ ও প্রচার করিয়া তিনি বিখ্যাত হন এবং শ্রমিক দলের নেতা মনোনীত হন, তাঁহার শেষ প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় সেই সমুদয় মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার অপযশ হয়।

তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রথম অংশে তিনি ভারতীয়দিগের ন্যায্য উচ্চাভিলাষের সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া স্পষ্টভাবে তাহার সমর্থন করেন। তাঁহার "The Awakening of India" ("ভারতবর্ষের জাগরণ") এবং "The Government of India" ("ভারত-গবর্মেণ্ট") এই সময়ের লেখা। প্রথম বহিটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। এই রকম লেখা পড়িয়া এবং তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা পড়িয়া ভারতীয় অনেকেই তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার হইবে আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপকারের পরিবর্ত্তে তাঁহারই হাত হইতে কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত বাহির হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে বা পরে কখনও হয় নাই। মানুষের মৃত্যুর পরেই নিন্দাব্যঞ্জক এইরূপ কথা আমরা লিখি না। কিন্তু মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড সম্বন্ধে ভারতীয় কাহাকেও কিছু লিখিতে হইলে তাঁহার অপকীর্ত্তি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাদ দেওয়া যায় না। এই জন্য দুঃখের সহিত তাহার উল্লেখ করিতে হইল। তাহার সঙ্গে ইহাও কৃতজ্ঞচিত্তে

স্বীকার করিতেছি, যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক দুইখানিতে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায্য দাবীর সমর্থন করায় ভারতীয়েরা উৎসাহিত হইয়াছিল।

তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী (যিনি তাঁহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন) আমাদের ইংরেজী মডার্ণ রিভিয়ু মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের "ভারতবর্ষের জাগরণ" পুস্তকে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে বঙ্গের কি দশা হইবে বঙ্গের অপমানকর তদ্বিষয়ক একটা অলীক কুৎসিত গল্পের পুনরাবৃত্তি থাকায় আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে তাহার সমালোচনা করি। ভগিনী নিবেদিতা এই সমালোচনায় অসন্তোষ বা মতানৈক্য প্রকাশ করেন, কিন্তু আমাদের মত অপরিবর্ত্তিত থাকে।

পরে, মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হয়। আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিখি। আমাদের মত এই ছিল, ও আছে, যে, ভারতবর্ষের স্বাজাতিকতার রূপ বর্ণন ও তদনুযায়ী দাবী ঘোষণা ভারতীয়দেরই করা উচিত, তাহারা তাহা করিতে সমর্থ, এবং অন্যের উপর তাহার ভার দিলে ভারতবর্ষীয় জাতির আত্মসম্মান-হানি হয়। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের ঐরূপ লেখা পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করেন এবং আমরা তাহার উত্তর দি।

ইহার পর বৌবাজারে ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞানসভা-গৃহের কাছাকাছি একটি জায়গায় একটি স্বদেশী মেলা হয়। বিলাত হইতে তখন প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই মেলার দ্বারমোচন করেন। এই উপলক্ষে ভূপেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে বলেন, "রামানন্দ বাবু, আপনি মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের সম্বন্ধে কি সব লিখেছেন; তাতে তিনি বড় দুঃখিত হয়েছেন।" মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড চিঠিও লিখিয়াছিলেন, যে, অন্ততঃ বন্ধুত্বের খাতিরে আমি যদি ও-রকম কিছু না লিখিতাম তাহা হইলে ভাল হইত। যে-কারণেই হউক, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন নাই। তাঁহার সহিত ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বলেন, "You are a man of war, I am a man of peace," "আপনি যুদ্ধ ভালবাসেন, আমি শান্তিপ্রিয়।" ভেতো বাঙালী ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া ছিল—হয় ত সকৌতুক বিস্ময় অনুভব করিয়াছিল।

মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের রাষ্ট্রনৈতিক মতের শেষ অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আমরা তাঁহাকে সভাপতি করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া মন্দ কিছু করি নাই।

—

সন্ত্রাসনবাদ, এবং "অন্তরীন" ও রাজনৈতিক বন্দিগণ

খবরের কাগজে দেখিলাম, কয়েক জন প্রাক্তন প্রধান "অন্তরীন" ও রাজনৈতিক বন্দী একটি জ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার শেষের দিকে আছে :—

> "To conclude, we take upon ourselves the entire responsibility to declare solemnly that detenus and political prisoners as a class no longer place their faith in terrorism as a useful method, and they are, on the contrary, opposed to it now."

ইহারা নিজেদের বক্তব্য ইংরেজীতে না বাংলায় লিখিয়াছিলেন জানি না—বোধ হয় ইংরেজীতে। সেই জন্য বাংলায় যাহা বাহির হইয়াছে তাহাও নীচে দিলাম।

> "উপসংহারে আমরা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে সমর্থ যে, আটক বন্দী এবং রাজনৈতিক বন্দীরা আর সন্ত্রাসবাদকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কার্য্যকরী পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করে না; পক্ষান্তরে তাহারা উহার বিরোধীই।"

"অন্তরীন" ও রাজনৈতিক বন্দীরা সকলেই আগে সন্ত্রাসনবাদে বিশ্বাস করিত—ইহা বলা লেখকদিগের অভিপ্রেত কি না ঠিক্ বলিতে পারি না। যদি তাহাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, আমরা এরূপ ব্যাপক উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করিতে না পারিলেও, এরূপ উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারি। কারণ, "অন্তরীন" ও রাজবন্দীদের সংখ্যা কয়েক হাজার। তাহারা সকলেই সন্ত্রাসনবাদে বিশ্বাস করিত, কেমন করিয়া জানা গেল? "অন্তরীন" ও রাজনৈতিক বন্দীরা সকলেই সন্ত্রাসনবাদে বিশ্বাস করিত, ইহা লেখকদের উক্তিতে উহ্য রহিয়াছে। "অন্তরীন"দের কখনও বিচার হয় নাই। তাহাদের কোন বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। রাজনৈতিক বন্দীদের বিচার-

হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই যে সন্ত্রাসনবাদী ছিল, তাহার কি প্রমাণ আছে? লেখকেরা এরূপ উক্তি দ্বারা পরোক্ষভাবে গবর্মেণ্টের নীতির ও উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

যাহারা আগে সন্ত্রাসনবাদে বিশ্বাস করিত, তাহারা এখন তাহাতে বিশ্বাস করে না, এরূপ সংবাদ অবশ্যই সুসংবাদ।

—

সন্ত্রাসনবাদের উৎপত্তির কারণ

পূর্ব্বোল্লিখিত লেখকগণ সন্ত্রাসনবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, খবরের কাগজে বাংলায় তাহা এইরূপ বাহির হইয়াছে:—

"বিশ্বস্তসূত্রে হইতে আমরা যত দূর তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে, বিশেষ মুদ্রাযন্ত্র আইনবলে ও অন্যান্য দমন আইনের সাহায্যে জনসাধারণকে যে সব অনাচারের বিষয় অবগত হইতে দেওয়া হয় নাই তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই গত ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যুবকগণ সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করিয়াছিল। আমাদের নিকট যে সব উপাদান আছে তাহা হইতে ইহা একরূপ সঠিক ভাবেই প্রতীয়মান হইবে যে ঐ সময়ে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসবাদ চালাইবার ঐ যে উদ্যম তাহা মূলতঃ সাময়িক ব্যাপার মাত্র। নির্দ্দয় ভাবে সরকারী সন্ত্রাসবাদ চালাইবার ইহা প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

"সে আতঙ্ককর অধ্যায়ের অবসান হইয়াছে।"

১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত সন্ত্রাসক কার্য্য-সকলের কারণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা অন্ততঃ আংশিক ভাবে সত্য হইতে পারে, আমাদের ধারণা এইরূপ।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিকল্পে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা

শারীরিক অসুস্থতা ও কর্ম্মবাহুল্য সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহার প্রশংসা করিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রশংসা যথেষ্ট করা যায় না।

তিনি এই উদ্দেশ্যে বঙ্গের অনেক মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্গের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, প্রেসিডেন্সি ও হাবড়া জেলে কতকগুলি বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের সহিত প্রয়োজনীয় আলোচনা করিয়াছেন। ওয়ার্ধা যাইবার পথে খড়্গপুরে থামিয়া তিনি হিজলীতে আবদ্ধ রাজবন্দীদের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন।

গবর্ণরের সহিত ও বন্দীদের সহিত কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যও প্রকাশিত হয় নাই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার অনুকূলে যাহা বলা আবশ্যক তাহা তিনি তাঁহার সাধ্যমত বঙ্গের গবর্ণরকে বলিয়াছেন।

—

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসিত প্রদেশসমূহে ও বঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যা

যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি বিষয়ে তাহাদের সহিত বঙ্গের প্রভেদ আছে। বঙ্গে এরূপ বন্দীদের সংখ্যা খুব বেশী, ইহাই একমাত্র প্রভেদ নহে। বাংলা দেশের অবস্থা অনেক বৎসর হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহা অন্য প্রদেশগুলি হইতে পৃথক। ইহাও একটি প্রধান প্রভেদ। এই প্রভেদের জন্য, প্রভেদ যত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই দীর্ঘকালের গবর্মেণ্টের দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বের পরিমাণ কত অধিক, তাহা সহজে বলা যায় না। কিন্তু দায়িত্ব যে ছিল এবং এখনও অন্ততঃ কিছু আছে, তাহা নিশ্চিত; এবং প্রভেদটাও যে ছিল ও আছে, তাহাও নিশ্চিত।

এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার সমস্যা বঙ্গে ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রদেশগুলিতে এক নহে। ইহাও আমরা জানি, কংগ্রেসী প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

এই সব কথা মনে রাখিয়াও আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে, অন্য প্রদেশগুলিতে সমস্যাটি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিবার তাহা মন্ত্রীরাই করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা মহাত্মাজীর প্রভাবের প্রত্যক্ষ সাহায্য চান নাই, চাহিতেছেন না; নিজের নিজের প্রদেশের গবর্ণরের সম্মতির অপেক্ষাও তাঁহারা করেন নাই। তাহাতে বুঝা যায়, যে, বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার ক্ষমতা আইন অনুসারে তাঁহাদের আছে। এ বিষয়ে আইন প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম নয়। ঐ সব প্রদেশের মন্ত্রীদের যে ক্ষমতা আছে, বঙ্গের মন্ত্রীদেরও তাহা আছে।

প্রভেদ এই, যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নিজ নিজ কাজের ফলাফলের দায়িত্ব লইবার সাহস আছে, পুলিসের উপর প্রভুত্ব করিবার সাহস এবং শক্তি-সামর্থ্যও তাঁহাদের আছে; বঙ্গের মন্ত্রীদের হয়ত তাহা নাই। এই প্রভেদের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আপনাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধি ও বিশ্বাসভাজন বলিয়া জানেন; এবং তাঁহারা নিজের সামর্থ্যবলে মন্ত্রী। বঙ্গের মন্ত্রীদের অবস্থা অন্য রূপ। তবে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ও অন্য কোন কোন মন্ত্রীর বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

—

প্রাদেশিক প্রভেদ সম্বন্ধে লর্ড ব্র্যাবোর্ণ

লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ণকে তাঁহাদের ভারতযাত্রার পূর্ব্বে যে ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে

তিনি কংগ্রেস নেতাদিগকে এই অনুরোধ করেন, যে, তাঁহারা সমস্ত ভারতবর্ষকে একটা প্রদেশ মনে করিয়া শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া যেন কাজটাকে কঠিনতর করিয়া না তুলেন। প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ সমস্যা আছে। সব প্রদেশকে একই রকমে শাসনের চেষ্টা করিলে কাজটা যত কঠিন তাহা অপেক্ষা কঠিনতর করাই হইবে। তিনি মাদকদ্রব্য ব্যবহার-নিষেধ ও শ্রমিকসমস্যাঘটিত আইন প্রণয়ন, এই দুইটি দৃষ্টান্ত লইয়া বলেন, যে, এগুলি যদি ভারতবর্ষকে একই প্রদেশ মনে করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সম্মুখে বড় বিপদ ও বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যে একটা দেশ নয়, তাহা দেখাইবার জন্য ইংরেজদের এমন একটা ঝোঁক আছে, যে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়ে। "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" ("Provincial autonomy") নামক বস্তুটি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যোপাসকদের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহা আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে দেখাইয়াছি। প্রত্যেকটি প্রদেশকে আলাদা আলাদা দেশের মত করিয়া শাসন করিতে হইবে, এই উপদেশ আমাদের মন্তব্যের একটা প্রমাণ। পার্থক্য প্রদেশে প্রদেশে অবশ্যই আছে, কিন্তু সাদৃশ্যও ত আছে। লর্ড ব্র্যাবোর্ণ পার্থক্যটার উপরেই কেন এত জোর দিলেন? পার্থক্যগুলা না ভুলিয়া আমরা চাই সাদৃশ্যগুলার উপর জোর দিতে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যথাসম্ভব একই নীতিতে একই ভাবে শাসিত হইতে দেখিতে। তাহা হইলে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে, প্রদেশগুলিকে আলাদা আলাদা দেশ মনে করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে শাসন করিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য কমিবে। তাহা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যোপাসকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক।

মাদক ব্যবহার নিবারণ ও শ্রমিক সমস্যাসমূহের সমাধান ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে একই নীতি অনুসারে কিন্তু প্রয়োজন মত কিছু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কেন যে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, বুঝিতে পারিলাম না।

—

হিন্দুদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কেন উচিত

বর্ত্তমান নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে খবরের কাগজে একটি সংবাদ পড়ি, যে, ডাক্তার মুঞ্জে ভাই পরমানন্দ প্রমুখ কতিপয় হিন্দু নেতাকে ও প্রবাসীর সম্পাদককে চিঠি লিখিয়াছেন, যে, বিজনোরে কংগ্রেসপক্ষের মুসলমানপ্রার্থী যদি নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে হিন্দুসভার লোকদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত হইবে। এই রূপ পরামর্শ দিবার কারণও ডাঃ মুঞ্জে যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা ঐ টেলিগ্রামে লিখিত ছিল।

আমরা ডাঃ মুঞ্জের ঐরূপ কোন পত্র পাই নাই। পাইবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। হিন্দুমহাসভার সহিত সম্বন্ধ আমাদের অনেক বৎসর নাই। তাহার বিরোধীও আমরা নহি। আমরা দীর্ঘকাল কংগ্রেসের বাহিরে আছি বটে, কিন্তু আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারী নহি। হিন্দুদের যে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত, তাহা আমরা আগে আগেও বলিয়া থাকিব, গত ১লা অক্টোবর প্রকাশিত কার্ত্তিক সংখ্যাতেও তাহা লিখিয়াছি। যথা:—

"হিন্দুরা যত কংগ্রেস ত্যাগ করিবে, হিন্দুরা যত কংগ্রেসে যোগ দিতে নিবৃত্ত থাকিবে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাহারা ততই দুর্ব্বল হইবে। দেশ স্বাধীন না হইলে বড় বা ছোট কোন সম্প্রদায়ই যথেষ্ট উন্নতি ও শক্তিলাভ করিতে পারিবে না—ইংরেজ গবর্মেণ্টের অনুগ্রহ লাভ করিলেও পারিবে না। স্বাধীনতা চাই-ই চাই। কিন্তু কংগ্রেস ভিন্ন আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই, সমিতি নাই, যাহা দেশকে স্বাধীন করিতে সচেষ্ট ও সমর্থ। অতএব, কংগ্রেসের দোষত্রুটি যাহাই থাকুক, উহাতে যোগ দেওয়া, উহার সভ্য না-হইলেও অন্ততঃ উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হওয়া, সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া সদলবলে উহার দোষত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করাই সুপরামর্শ।" (১৪৭ পৃষ্ঠা।)

—

গৌহাটী দর্শন

গত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে কয়েক দিনের জন্য গৌহাটী গিয়াছিলাম। তথাকার প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে যাইতে হইয়াছিল। আমার যে গৌহাটী দেখা হইল, তাহার জন্য তাঁহারাই ধন্যবাদার্হ। ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও আয়োজনে ঘটনাটি একটি উৎসবের আকার ধারণ করিয়াছিল। মাসিকপত্রে বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিবার স্থান নাই। তাহা হইলেও অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত

অন্ততঃ একটি প্রস্তাবের উল্লেখ আবশ্যক। তাহা এই, যে, অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্য এবং আসামের নিজস্ব সংস্কৃতির অনুশীলন করা বাঙালী ছাত্রদের কর্ত্তব্য। বালিকাদের গান—তন্মধ্যে একটি মুসলমান কিশোরীর গান—বেশ ভাল হইয়াছিল।

গৌহাটীতে দুটি কলেজ আছে। কটন কলেজে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, আর্ল কলেজে আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। আইন কলেজটি দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কটন কলেজ সুপরিচালিত। ইহার অধিকাংশ ছাত্র—অর্দ্ধেকেরও উপর—কলেজসংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলিতে থাকে। এই বৎসর এই কলেজের একটি প্রাক্তন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ছাত্রটি কামাখ্যা তীর্থের একটি পাণ্ডা-পরিবারের ছেলে। কলেজের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা দিয়াছিলাম, একটি প্রশ্নোত্তর সভায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।

গৌহাটীর চারি দিকের দৃশ্য মনোরম। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের একটি দ্বীপে উমানন্দ তীর্থ। গৌহাটী হইতে হাঁটিয়া বা কোন যানে বা রেলে নিকটবর্ত্তী কামাখ্যা তীর্থে যাওয়া যায়। তীর্থটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বৃদ্ধদের পক্ষে পর্ব্বত আরোহণ কষ্টকর। তথাপি দেখিতে গিয়াছিলাম। উপরে মন্দিরাদি আছে। তদ্ভিন্ন কামাখ্যা গ্রামটির জন্য একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। একটি ছোট পুস্তকাগারও আছে।

গৌহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে। তাহার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল।

বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাহিরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যে সকল শাখা আছে, গৌহাটী শাখা বয়ঃক্রম হিসাবে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহার বয়স ২৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

২৮ বৎসরে ২২০টি অধিবেশনে মোট ৯২ জন লেখকলেখিকার রচনা পঠিত হইয়াছিল :—৩৬৮টি প্রবন্ধ, ৩৭টি কবিতা, ৯টি ছোট গল্প ও ৩টি একাঙ্ক নাটিকা।

পরিষদের অধিবেশনসমূহে পঠিত কতকগুলি প্রবন্ধ হইতে পরে পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, যথা—(১) মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "কামরূপ শাসনাবলী", (২) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহের "তর্কবিজ্ঞান", (৩) শ্রীঅভয়কুমার গুহের "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব", (৪) ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "নাগা জাতি", (৫) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "শ্রীমন্ত" ও "রস কদম্ব"।

প্রবন্ধাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থের "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস", "দান তত্ত্ব" (প্রবাসীতে প্রকাশিত),

(২) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের "সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি"।

(৩) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী", "তরুণীরমণের পদাবলী", "সার্ব্বভৌম পর্য্যবেক্ষণ-যন্ত্র"।

(৪) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ" (প্রকৃতি এবং মানসী ও মর্ম্মবাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।)

(৫) শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনের—পরিষদে পঠিত ৪৭টি রচনার মধ্যে অন্ততঃ ২০টি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—

(১) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণ,

(২) নরওয়ের পুরাণ,

(৩) নরওয়ের পুরাণে বলভারের কাহিনী,

(৪) (৫) তিব্বতে মৃতের সংকার—২টি প্রবন্ধ,

(৬) (৭) এভারেষ্ট গৌরীশঙ্কর—২টি প্রবন্ধ,

(৮) গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের হস্তিতত্ত্ব

(৯) বাংলা সাহিত্যের দৈন্য, প্রভৃতি।

পরিষদের ২৮ বৎসরে মোট ব্যয় ৪২০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের উদ্যোগে বাঙালী ছেলেদের জন্য যে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার জন্য স্থানীয় বাঙালী সমাজ হইতে কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। সদাশয় কীন্ সাহেব গবর্ণর থাকিবার সময় তিনি বিদ্যালয়টিকে বিস্তৃত এক খণ্ড সরকারী জমী দান করেন, সরকারী তহবিলে টাকা থাকিলে টাকাও কিছু দিতেন। বিদ্যালয়টির এখনও অনেক অভাব আছে। গৌহাটীর বাহিরের আসামের এবং বঙ্গের বাঙালীরা সাহায্য করিলে তাহা ক্রমশ পূর্ণ হইতে পারে। তেজপুরেও বাঙালী ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় তথাকার বাঙালীরা স্থাপন করিয়াছেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান আবশ্যক বলিয়া এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইয়াছে।

গৌহাটীর সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যত্র আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে, পাটনার পর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন যেন আসামের কোথাও করা হয়। প্রস্তাবটি উৎসাহের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

গৌহাটীতে বালিকাদের জন্য যে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়টি আছে, তাহাতে আসামীয় ও বাঙালী ছাত্রীরা পড়ে। ইহার লেডী প্রিন্সিপ্যাল ও তত্ত্বাবধায়িকা ডাঃ জ্যোতিশ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের পত্নী। তিনি বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা। ডাঃ দাস বলিলেন, তিনি শ্রীমান্ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ী।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী শাখায় প্রবাসী-সম্পাদক

গৌহাটী প্রবাসী বাঙালী ছাত্রসম্মিলনীতে সভাপতি প্রবাসী-সম্পাদক

ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আসামীয়। কটন কলেজের ছাত্রীদের জন্য সরকারী ছাত্রীনিবাস নাই। একটি ছাত্রীনিবাস খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত, অন্যটি ডাক্তার দাসের সহধর্ম্মিণী চালান। একদিন ইঁহার ছাত্রীনিবাস ও আর একদিন ইঁহার বালিকা-বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বালিকা-বিদ্যালয়টিতে ছাত্রী অনেক পড়ে। শিক্ষা দেন ১৬ জন। তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় ১ জন ছাড়া আর সকলেই শিক্ষয়িত্রী।

এক দিন গৌহাটীর শ্রীহট্টসম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব দেখিলাম। গীতবাদ্যনৃত্য বক্তৃতা জলযোগ প্রভৃতির সুব্যবস্থা ছিল। কটন কলেজের সুপণ্ডিত প্রিন্সিপ্যাল সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহাতে নেতৃত্ব করেন।

গৌহাটীর জলের কল ব্রহ্মপুত্রের তীরে উচ্চ ও সুরম্য একটি স্থানে স্থিত। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার মোটর পাঠাইয়া আমার উহা দেখিবার সুবিধা করিয়া দেন। ভাইস্‌-চেয়ারম্যান মৌলবী ওয়াজেদ আলী মহাশয় আগে হইতেই জলের কলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি বাঙালীদের সভাসমিতি উৎসবাদিতে হৃদ্যতার সহিত যোগ দেন। অন্য শিক্ষিত আসামীয় ভদ্রলোকদের মত ইনি বাংলা বুঝেন ও বলেন। বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন হইলে আসামীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন।

গৌহাটীর ব্রহ্মমন্দিরে এক দিন সন্ধ্যায় আমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় কতকগুলি আসামীয় বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হয়। তিনি আমাকে এক দিন সৌজন্য সহকারে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়াম দেখান। ইহা বড় না হইলেও ইহাতে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গবেষকদের পক্ষে আবশ্যক অনেক জিনিষ আছে। অন্য সকল দ্রষ্টব্য স্থান ও প্রতিষ্ঠানও সতীশ বাবুর সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। অন্য যাঁহারা মোটর দিয়া বা অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

—

শ্রীহট্ট দর্শন

গৌহাটী যাইবার পূর্ব্বে শ্রীহট্টে একটু কাজ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা আমার দ্বিতীয় বার শ্রীহট্ট দর্শন। এবার সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে গিয়াছিলাম। তাহার বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। আসামের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও সাহায্যে এবং তাঁহার বাড়ীর মহিলাদের আতিথ্যে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কাজ করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে আসামের বাঙালীদের অনেক অসুবিধার বিষয় অবগত হইয়াছি। শ্রীহট্ট মহিলা-সংঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া বেশ কাজ করিতেছেন। এখানকার বিপিনচন্দ্র পাঠাগার একটি নূতন প্রতিষ্ঠান। শ্রীহট্টের ব্রহ্মমন্দিরে আমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল।

—

ঢাকা পুনর্দর্শন

ঢাকায় পূর্ব্ব-বাংলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন ১২ই হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত হয়। তদুপলক্ষ্যে উহার সভাপতিরূপে আমাকে ঢাকা যাইতে হইয়াছিল। এই অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অনেকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

—

বেজগাঁ দর্শন

ঢাকা হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে আমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজগাঁ নামক গ্রামটি দর্শন করি। তারপাশা ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে নৌকাযোগে বেজগাঁ যাইতে হয়। তারপাশা পৌঁছিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার হইতে তেলীরবাগ নামক পদ্মাতীরস্থ গ্রামে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভবনের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ঠিক নদীর তীরে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত শ্বেত স্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর আর সব অংশ নদী ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে। থামগুলির পশ্চাতে বৃহৎ একটি করগেটেড টিনে ছাওয়া ঘর দেখা যায়। আগামী বর্ষায় সম্ভবতঃ এ সকলের কোন চিহ্নই থাকিবে না।

বিক্রমপুরের কোন গ্রাম ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে ইহা নূতন অভিজ্ঞতা। ইটালীর ভেনিস শহরে যাতায়াত জলপথে করিতে হয়। এই গ্রামটিতেও তেমনই এ-বাড়ী ও-বাড়ী এ-পাড়া ও-পাড়া যাতায়াত করিতে হইলে নৌকার সাহায্য লইতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব স্বর্গত দেওয়ান প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর ও পুত্রদিগের অতিথি ছিলাম। তাঁহার পুত্রেরা নৌকাযোগে গ্রাম দেখাইলেন, নৌকা যোগে গ্রামের বাজার দেখাইলেন। প্রায় সমস্ত বাড়ীই করগেটেড টিনে ছাওয়া। ইঁহাদের বাড়ীটি পাকা। তাহার বিশেষত্ব এই, যে, ইহাতে বৈদ্যুতিক আলোক, বৈদ্যুতিক পাখা, নলকূপ, পাম্প, কলিকাতার মত জলের কলযুক্ত স্নানাগার ও শৌচাগার আছে। যে ডাইনামো যন্ত্রটির

সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া এই সমস্ত সুবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান করুণাকুমার গ্লাসগোর ম্যাক্‌ফার্লেন এঞ্জিনীয়্যারিং কোম্পানীর কারখানায় স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্যয়ের যেরূপ অনুমান তিনি দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বঙ্গের বহু গ্রামের লোক একজোট হইয়া চেষ্টা করিলে তাহাতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা হইতে পারে। বেজগাঁয়ে বালকদের জন্য একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় এবং বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উভয়ই প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের কীর্ত্তি। তারপাশায় ষ্টীমার ধরিবার নিমিত্ত যে নৌকায় আমরা বেজগাঁ হইতে আসিলাম, তাহা কতকটা পথ ধানের ক্ষেতের গভীর জলের উপর দিয়া আসিল।

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা চৌধুরী

শ্রীযুক্তা স্নেহলতা চৌধুরী

গত ৫ই অক্টোবর বেনারস ষ্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন শরৎকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা চৌধুরীর পরলোকগমনে কাশী বাঙালী সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজী, হিন্দী, ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত কাব্যও তাঁহার কিছু কিছু পড়া ছিল। তিনি নিজেই কেবল সুশিক্ষিতা ছিলেন না, অনাথা বিধবাদিগকে লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখাইয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। তাহা ছাড়া বাড়ীতে বসিয়া মেয়েদের সেলাই, বোনা, তাঁত ফিতা ও নেওয়ার বোনা এবং ছবি আঁকা শিক্ষা দান বরাবর সাধ্যানুযায়ী করিতেন। মহিলা-আশ্রম, অনাথাশ্রম, নারীশিক্ষামন্দির, মাতৃমঠ ইত্যাদি কাশীর প্রত্যেক মহিলা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ভদ্রঘরের অনেক মেয়ে নার্স হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরাও তাঁহার কাছে নানা ভাবে উপকৃত। প্রকাশ্য ভাবে বাড়ীতে প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিতে তাঁহারা লজ্জিতা হইতেন বলিয়া তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া বিক্রয়ে সাহায্য করিতেন। বিক্রয় না হইলে অধিকাংশ তিনি নিজেই কিনিয়া লইতেন। তাঁহার গৃহে ভৃত্যেরাও লিখনপঠনক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ ডিগ্রী তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয় তাঁহাকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের (ডোমেষ্টিক সায়েন্সের) প্র্যাকটিক্যাল অংশের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। গত সাত-আট বৎসর হইতে তিনি পরীক্ষকের কার্য্য প্রশংসার সহিত করিতেছিলেন। আচার, মোরব্বা, সিরাপ ও ভিনিগার ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ফল-সংরক্ষণের কার্য্যের জন্য তিনি একাধিক বার যুক্তপ্রদেশের ফলোৎপাদক সমিতির (U. P. Fruit Growers' Associationএর) দ্বারা পুরস্কৃত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আচার মোরব্বা প্রস্তুত করা ও উল বোনা সম্বন্ধে দুটি বহি লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। তাঁহার আরও অনেক বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল।

—

সমগ্রভারতীয় সরকারী চাকরীর পরীক্ষায় বাঙালী

বিলাতে ও ভারতবর্ষে সমগ্রভারতীয় যে-সব চাকরীর জন্য পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা হয়, কয়েক বৎসর হইতে বাঙালী যুবকদের নাম তাহাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় কম দেখা যায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া ইহার কারণ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। কারণ অনেক থাকিতে পারে। তাহার আলোচনা আগে আগে করিয়াছি। আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে, বাঙালী যুবকদের বুদ্ধি কমিয়া যায় নাই; তবে ইহা সম্ভবতঃ সত্য, যে, রাষ্ট্রনীতি তাঁহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছে, চিত্ত-বিক্ষেপের অন্য নানা কারণ ঘটিয়াছে, এবং অনেকে পরিশ্রমে অভ্যস্ত নহেন।

আমরা আগে আগে দেখাইয়াছি, যাঁহারা যোগ্যতার বলে জার্ম্মেনীর কতকগুলি বৃত্তি পান ও সেখানে শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতী হন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম নহে, বরং বেশী। বিলাতে ভারতবর্ষের যে-সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষার জন্য

যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সরকারী রিপোর্ট প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশিত রিপোর্টের ২৫ পৃষ্ঠায়, যে-সকল ভারতীয় ছাত্র ডক্টর (D. Sc., M. D. বা Ph. D.) উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহাদের একটি তালিকা আছে। মোট ৪৩ জন এরূপ উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ১২ জন বাঙালী। ৩৫ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে বাঙালী ৫ কোটি অর্থাৎ এক-সপ্তমাংশ। সে অনুপাতে বাঙালী ডক্টর উপাধি কম জন পান নাই, বেশী জনেই পাইয়াছেন। উক্ত ১২ জনের মধ্যে ২ জন মুসলমান, ১০ জন হিন্দু। ৩৫ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে বাঙালী হিন্দু ২ কোটি। এই সংখ্যা দুটিও বিবেচনা করিলে হিন্দু বাঙালী যুবকদের কৃতিত্ব নিন্দনীয় নহে। ইহা হইতে মনে হয়, বাঙালী যুবকদের বুদ্ধির হ্রাস হয় নাই।

আমরা বরাবরই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় বাঙালী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পরীক্ষকদের কাহারও কাহারও প্রতিকূল মনোভাবের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া আসিতেছি। কখন কখন তাহা লিখিয়াও থাকিব। বাঙালীর প্রতি বিরূপতা বাচনিক (viva voce) পরীক্ষাতে বাঙালীদের পক্ষে বেশী অনিষ্টকর হইতে পারে। বাঙালী কোন পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্রের লিখিত উত্তর দিয়া সন্তোষজনক নম্বর (mark) পাইয়াও বাচনিক পরীক্ষায় পরীক্ষকের বিরূপতায় বিফলমনোরথ হইতে পারে। আবার অন্য কোন পরীক্ষার্থী কোন কোন বিষয়ে লিখিত উত্তরের জন্য কম নম্বর পাইয়া থাকিলেও বাচনিক পরীক্ষকের সদয় পক্ষপাতিত্বে বাচনিক পরীক্ষায় খুব বেশী নম্বর পাইতে পারে। গত ৫ই অক্টোবর সিমলায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় এইরূপ একটি ঘটনা প্রকাশ পায়। এলাহাবাদের লীডার কাগজের ৮ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত তাহার সিমলার সংবাদদাতার চিঠি হইতে তাহা জানা যায়। চিঠিতে আছে, যে, একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, যে, এক জন নির্ব্বাচিত ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী প্রবন্ধরচনায় পূর্ণ নম্বর দেড় শতের মধ্যে কেবল দশ পান, কিন্তু বাচনিক পরীক্ষায় তিনি পূর্ণ নম্বর তিন শতের মধ্যে ২৮০ পান! এই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিটি কে তাহা জানা যায় নাই। অন্য রকমও কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঘটে। অর্থাৎ হয়ত কোন (বাঙালী) পরীক্ষার্থী প্রবন্ধরচনায় দেড় শতের মধ্যে এক শত চল্লিশ বা ত্রিশ পাইয়াছেন, কিন্তু বাচনিক পরীক্ষায় তাঁহাকে দেওয়া হইল তিন শতের মধ্যে কুড়ি বা দশ! বাচনিক পরীক্ষায় কে কি উত্তর দিল তাহা ত লেখা থাকে না, সুতরাং নম্বর ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না সে-সম্বন্ধে কোন তদন্ত হইতে পারে না।

লীডারে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা নীচে ঠিক উদ্ধৃত হইল।

The question hour revealed that a selected I. C. S. candidate who secured only 10 out of 150 marks in essay, got 280 out of 300 marks in the *viva voce*, thus strengthening the non-official suspicion that these tests were not fair to those who sat for them, and that the *viva voce* was becoming a source of danger to the competitors' rights.

—

"আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ"

বঙ্গের বাঙালীরা কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ" পড়িয়া ঐ দুটি বহি মুসলমানবিদ্বেষপূর্ণ এই ওজুহাতে ঐ দুটি সরকারী নিষিদ্ধপুস্তক-তালিকার অন্তর্ভূত করিবার প্রস্তাব করেন। পরে অন্য অনেক বাঙালী মুসলমান, যাঁহারা উহা পড়েন নাই, তাঁহাদেরও দাবী ঐরূপ হইয়াছে এবং অবাঙালী যে-সব মুসলমান বাংলা জানেন না তাঁহাদের অনেকে উহাতে সায় দিয়াছেন।

অতীত কালে খ্রীষ্টিয়ানরা সমালোচনা-অসহিষ্ণু ও কুৎসা-অসহিষ্ণু ছিলেন কি না তাহা এখন আলোচ্য নহে; কিন্তু আধুনিক সময়ে দেখিতে পাই, তাঁহারা বাইবেলের সমালোচনা ও নিন্দা, খ্রীষ্টের সমালোচনা ও নিন্দা—এমন কি গালাগালিও—বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহারা উত্তর দেন। এইরূপ আচরণের ফলে বাইবেলের ও খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অ-খ্রীষ্টিয়ানদেরও ধারণা মন্দের দিকে না-গিয়া ভালর দিকেই গিয়াছে। মুসলমান-সম্প্রদায় এরূপ সমালোচনা-সহিষ্ণু নহেন।

তাঁহাদের মনের ভাব বিবেচনা করিয়া এরূপ আশা করা যায় না, যে, কোন পুস্তকে কোরানের, মোহম্মদের এবং সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান-সম্প্রদায়ের সমালোচনা বা নিন্দা তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন। এরূপ আশাশীলতা লইয়া আমরা "আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ" সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, "আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ" উপন্যাস দুটিতে কোরানের কোন নিন্দা বা সমালোচনা নাই, মোহম্মদের কোন নিন্দা বা সমালোচনা নাই, সম্প্রদায় হিসাবে সার্ব্বকালিক মুসলমান-সম্প্রদায়ের নিন্দা বা সমালোচনা নাই। সুতরাং এই দুটি বহির উপর তাঁহাদের খড়্গহস্ত হওয়া উচিত নহে। নিজ সম্প্রদায়ের ভালমন্দ কোন মানুষেরই সমালোচনা সেই সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে প্রীতিকর নহে। কিন্তু সেই রকম জিনিষ থাকিলেই, কোন কাব্যে উল্লিখিত কোন চরিত্র কোন সম্প্রদায়ের লোকদের বা কোন লোকের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই, সেই কাব্য পুড়াইয়া দিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মুসলমানদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর কোন কোন জিনিষ এই দুটি পুস্তকে আছে, জানি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ধারণা এই যে, বহি দুখানি মুসলমান বিদ্বেষ-প্রসূত নহে।

"আনন্দমঠে" পরোক্ষভাবে মুসলমানের প্রশংসা আছে। যেমন প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের নিম্নলিখিত বাক্যের 'অপূর্ব্ব' কথাটিতে :—

"সেই সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে মুসলমান-সম্রাট-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত।"

সার্ব্বকালিক মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন ব্যাপক মন্তব্য বা উক্তি—বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি—"আনন্দমঠে" নাই, "রাজসিংহে" তাহা আছে। এই উপন্যাসের উপসংহারে "গ্রন্থকারের নিবেদন" নাম দিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।"

যে গ্রন্থকার এইরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে ধর্ম্মান্ধ, মুসলমানবিদ্বেষী মনে করা অযৌক্তিক।

এই দুই উপন্যাসে মীরজাফর, মহম্মদ রেজা খাঁ, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক মানুষদের উল্লেখ ও কথা আছে। এবং "আনন্দমঠে" ও "রাজসিংহে" বর্ণিত সময়ের মুসলমানদের কথা ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য কোথাও কোথাও আছে। যাহা আছে, তাহা ন্যায্য কিনা, ঐতিহাসিকের বিচার্য্য। রাগারাগি বৃথা। গ্রন্থ দুইখানির মুসলমান বিচারকদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, ঐ দুইখানিতে যে-সকল ঐতিহাসিক বা কল্পিত মুসলমানের বা তাৎকালিক মুসলমান সমাজের উল্লেখ ও কথা বা তৎসম্বন্ধে মন্তব্য আছে, তাঁহারা পয়গম্বর ত নহেনই, তাঁহার প্রতিনিধিও নহেন, কোরান নহেন, কোরানের কোন প্রতীক বলিয়াও উল্লিখিত বা কল্পিত হন নাই, এবং সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালিক মুসলমান সমাজ নহেন।

তাঁহাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ইহুদীরা শেক্সপীয়ারের মার্চেণ্ট অব ভেনিস পোড়ায় নাই বা তাহার প্রচার নিষেধ করিতে বলে নাই, তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুখানি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মত প্রকাশ করিলাম, সেইরূপ মত পোষণের সমুদয় কারণ যথেষ্ট সময় ও স্থানের অভাবে এখানে বলা হইল না।

—

"বন্দেমাতরম্" গান সম্বন্ধে আন্দোলন

"বন্দেমাতরম্" গানটির বিরুদ্ধে অভিযান হওয়ায় এবং কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমীটি ঐ গানটি সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা দেশে প্রতিক্রিয়াজনিত যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন দেখা যাইতেছে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের সহিত এই আন্দোলনের একটি অবাঞ্ছনীয় বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে হইতেছে। কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইলে তাহার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত, ব্যক্তিগত আক্রমণ অনুচিত। হীন অভিসন্ধি আরোপ যদি অগত্যা করিতেই হয়, তাহা হইলে সেরূপ অভিসন্ধি আরোপের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য সত্যের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। যেরূপ আক্রমণ ও অভিসন্ধি আরোপের কথা বলিতেছি, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সর্ব্বাংশে একমত নহি, কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ কর্ত্তব্যবোধে এইরূপ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ স্থলবিশেষে তর্কবিতর্কের রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ আক্রমণে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।

—

রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা

"বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধীয় আন্দোলন সম্পর্কে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলির বিরুদ্ধে এই মর্ম্মের কথাও বলিয়াছেন, যে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার জন্য মানুষ সেগুলি হইতে কোন প্রেরণা পায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা চান না, কোন সমালোচক যে একথা বলেন নাই, ইহাও সমালোচকদের দয়া বলিতে হইবে। উত্তেজনার সময় মানুষের মনের সত্যানুভূতির শক্তি হ্রাস পায়।

রবীন্দ্রনাথের তিন খণ্ড "গীতবিতান" গ্রন্থের শেষ খণ্ড ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই তিন খণ্ডে মোটামুটি ১৬০০ গান আছে। ১৩৩৯ সালের পরও এ পর্য্যন্ত তিনি বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন। সবগুলি হইতে জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাছিয়া লইয়া সেগুলির সম্বন্ধে সরাসরি রায় দেওয়ার কাজে আমরা প্রবৃত্ত হইব না।

—

"বন্দেমাতরম্"

"বন্দেমাতরম্" গানটি আদ্যোপান্ত বঙ্গে ও বাঙালীদের নিকট যেরূপ পরিচিত, বঙ্গের বাহিরে ও অবাঙালীদের মধ্যে তদ্রূপ নহে। "আনন্দমঠ" এবং "রাজসিংহ"ও অবাঙালীদের পরিচিত নহে। এই জন্য আমরা গানটি ও এই দুখানি বহি সম্বন্ধে আমাদের মত কিঞ্চিৎ যুক্তিসহ ইংরেজী মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। বাঙালীদের জন্য প্রবাসীতে তত কথা লেখা অনাবশ্যক। তথাপি কিছু লিখিতেছি।

আমাদের মত এই, যে, "বন্দেমাতরম্" গানটি পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতাপ্রণোদক নহে—যদিও শুনিবামাত্র বা ভাসা ভাসা ভাবে পড়িবামাত্র ইহা পৌত্তলিক গান মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আমরা কেন ইহাকে অপৌত্তলিক গান মনে করি তাহা পরে বলিতেছি।

গানটি যে মুসলমানবিদ্বেষপ্রসূত বা মুসলমানবিদ্বেষজনক নহে, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মুসলমানদের কোন নিন্দা ইহাতে থাকা দূরে থাক, ইহার কোথাও মুসলমানদের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। বরং ইহাতে মুসলমানদিগকেও মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া ধরিয়া জন্মভূমি যে সংঘশক্তিতে বলীয়সী তাহাই বলা হইয়াছে। গানটি রচনার সময় বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার সহিত যুক্ত ছিল এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা তখন সাত কোটি ছিল। এই জন্য গানটিতে সপ্তকোটি কণ্ঠ ও দ্বিসপ্তকোটি ভুজের উল্লেখ। পরে যখন গানটিকে সমগ্রভারতের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সপ্তকে ত্রিংশ করা হয়, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি। সপ্ত কোটি ও ত্রিংশ কোটি উভয়ের মধ্যেই মুসলমান আছেন। জাতি যে মুসলমানদেরও বলে বলীয়ান্, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং গানটি মুসলমানবিরোধী নহে।

ইহা "আনন্দমঠ" রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে রচিত হয়। সুতরাং "আনন্দমঠে" যদি মুসলমানবিরোধিতা থাকে, যাহা নাই আমরা বলিয়াছি, তাহা "বন্দেমাতরম্" গানে আরোপিত হওয়া উচিত নয়। "রিপুদলবারিণীম্" শব্দের "রিপুদল" দ্বারা মুসলমান বুঝাইতে পারে না, কারণ সপ্ত কোটি বা ত্রিংশ কোটি জাতীয় দলের মধ্যে মুসলমানদিগকে ধরা হইয়াছে। যদি গানটিকে "আনন্দমঠে"র অংশ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও, যেহেতু ঐ পুস্তকে বর্ণিত যুদ্ধগুলি ইংরেজ কোম্পানীর ইংরেজ সেনাপতিদের দ্বারা চালিত সৈনিকদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল, সেই জন্য যদি তাৎকালিক কোন দলকে লক্ষ্য করিয়া "রিপুদল" প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহারা ঐ ইংরেজ সেনাপতিগণ ও তাহাদের সৈনিকগণ।

গানটি বাঙালী হিন্দুর রচিত। এই জন্য ইহাতে পৌরাণিক কোন কোন দেবতার নাম ও স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কবি নিজের ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে গানটি পৌত্তলিক গান হইয়া যায় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি। মাতৃভূমিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ, চেতনা আরোপ, অহিন্দু অভারতীয় সভ্য জাতিরাও করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিয়াছে ও করে। ইহা পৌত্তলিকতা নহে। মাতৃভূমিকে নমস্কার করাও পৌত্তলিকতা নহে। কোন কোন মুসলমান বলিয়াছেন, আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও কাছে নতি জানাই না ইহা কি সত্য? তাঁহারা কি কোন গুরুজনকে নতি জানান না, কোন প্রভুকে ঝুঁকিয়া সেলাম করেন না? মাতৃভূমি অবশ্য বৈজ্ঞানিকের ভাষায় জড় পদার্থ। কিন্তু জাতীয় পতাকা কি তাহা অপেক্ষাও অধিক জড় পদার্থ নহে? কোটি কোটি সচেতন মানুষ এবং অগণিত অন্য প্রাণবান্ জীব ও উদ্ভিদ মাতৃভূমিতে বাস করে এবং আমরা মাতৃভূমি হইতে আমাদের প্রাণরক্ষার সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করি, আত্মার পুষ্টিও কম পাই না। কিন্তু পতাকা জিনিষটি হইতে ত তাহাও করি না। তথাপি কংগ্রেস পতাকাকে সেলাম করার বৈদেশিক রীতি চালাইয়াছেন, এবং তাহাতে কংগ্রেসী কোন মুসলমান আপত্তি করেন নাই। অধিকন্তু অ-কংগ্রেসী—কংগ্রেসবিরোধী—মোস্লেম লীগ তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তাহা হইলে, "তোমাকে বন্দনা করি," মাতৃভূমিকে বলাতেই কি যত দোষ?

"বন্দেমাতরম্" গানটিতে আছে, "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা কমলদলবিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী।" ইহার অর্থ অনেকে এই রূপ বুঝেন— আমিও তাই বুঝি, "তুমিই দুর্গা, তুমিই কমলা, তুমিই বাণী," অন্য কোন দুর্গা, কমলা, বাণী নাই। এই রূপ ব্যাখ্যার সমর্থন "আনন্দমঠ" হইতেই পাওয়া যায়। ইহার শেষ অধ্যায়ে আছে:—

"মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, একথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা

সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে।"

ইহাতে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পৌত্তলিক ছিলেন না, সুতরাং "বন্দেমাতরম্" রচনা করিয়া তিনি পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যায় না।

গানটিতে আছে বটে, "তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"। ইহাতে ইহা বুঝায়, যে, যেমন "তুমিই দুর্গা, কমলা, বাণী," অন্য কোন দুর্গা, কমলা, বাণী নাই, তদ্রূপ, মন্দিরে অন্য যে-সব দেবতার কল্পিত মূর্ত্তি গড়া হয়, তুমিই সেই সব, অন্য সেই সব দেবতা নাই। তদ্ভিন্ন, আমরা অনেক বিখ্যাত মানুষের সম্বন্ধেও ত বলিয়া থাকি, তাঁহাদের মূর্ত্তি দেশের লোকদের বা জগদ্বাসীর হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে চিরকাল বিরাজ করিবে। তাহাতে পৌত্তলিকতা হয় না।

"আনন্দমঠে" "হরে মুরারে মধুকৈটভারে! গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!" ইত্যাদি গানটি আছে বটে। কিন্তু তাহাতে বহিখানি পৌত্তলিকতাদুষ্ট মনে করা উচিত নহে, যেমন রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" পুস্তকে কালী-বিষয়ক কয়েকটি গান আছে বলিয়া কেহ তাহাকে পৌত্তলিক পুস্তক বলে না।

বহুদেববাদ হইতে উদ্ভূত শব্দ ব্যবহার মাত্রই পৌত্তলিকতা নহে। সঙ্গীতের ইংরেজী প্রতিশব্দ music গ্রীক বহুদেববাদজাত। তদ্রূপ ইংরেজী jovial, saturnine, martial, son of Mars, Mammonite, votary of the Muses, Cupid's arrows (বাংলা 'পুষ্পবাণ') ইত্যাদিও বহুদেববাদপ্রসূত। তাহা হইলেও এইগুলির ব্যবহারহেতু ইংরেজদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। শয়তানে ও বহু ফেরেস্তায় বিশ্বাসও এক প্রকার বহুদেববাদ। কিন্তু সেরূপ বিশ্বাসহেতু, কিংবা মুসলমানী কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাহাকে "কৌস্তভমণি" বলায়, কিংবা মুসলমান অনেক কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা রচনা করায়, কিংবা আধুনিক কোন কোন মুসলমান কবি 'প্রেমবৃন্দাবন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায় কেহ মুসলমানদিগকে পৌত্তলিক বলিলে ঠিক বলা হইবে না।" "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থে ও "ব্রহ্মসঙ্গীতে" শিব, শঙ্কর, শঙ্করী, শম্ভু, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগকে কেহ পৌত্তলিক বলে না। কতকগুলি কবিতা পড়িয়া "শ্বেতভুজা ভারতীকে" রবীন্দ্রনাথের মনে পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি পৌত্তলিক হইয়া যান নাই।

গানটিতে মাতৃভূমির শক্তিব্যঞ্জক অনেক কথা আছে। কিন্তু শক্তি থাকিলেই তাহার হিংস্র ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী নহে। দুষ্টের দমন ও অমঙ্গল বিনাশের জন্য শক্তি আবশ্যক।

অধিক লিখিবার স্থান নাই, সময় নাই, ইচ্ছাও নাই। কেবল উপসংহারে দু-একটা কথা বলি।

কংগ্রেস "বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি সিদ্ধান্ত করিবেন জানি না। সকল পক্ষের সব কথা শুনিয়া বিচার করিলে কাজটি সুবিবেচিত হইবে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত যাহাই করুন, বন্দেমাতরমের স্থান জাতীয় জীবনে থাকিবে।

আপাততঃ কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমীটি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলি। তাঁহারা যে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে বন্দেমাতরমের প্রধান স্থান স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তেরা প্রীত।

কোন কবিতা ও গানের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার মর্ম্মগত ভাবটির দিকেই, তাহার প্রাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কমীটি তাহা করেন নাই। তাঁহারা ইহার আক্ষরিক ও শাব্দিক অর্থের প্রতিই বেশী দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাহা ঠিক হয় নাই। স্বদেশভক্তি এই গানটির প্রাণ, এই তত্ত্বের উপর সমুচিত ও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ এক-একটি গান ও কবিতা—অন্ততঃ এই গানটি—একটি অখণ্ড সমগ্র বস্তু। দুই দাবীদারের মধ্যে একটি শিশুকে কাটিয়া ভাগ করিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণ যায়, অনেক কবিতা ও গানের দ্বিখণ্ডীকরণেও সেইরূপ তাহার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রে হয়ত বন্দেমাতরমের অশত্রু কেহ কেহ "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতির অনুসরণ করিয়া গানটির অধিকাংশ বর্জ্জনে সায় দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ গিয়াছে। যে-দুটি অংশ রাখা হইয়াছে, "সুখদাং বরদাং" ছাড়া তাহার সমস্তটি মাতৃভূমির বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক। গানটির পরবর্ত্তী অংশে জন্মভূমি হইতে জনগণ যে ঐক্য শক্তি সাহস জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যা প্রভৃতির অনুপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়, তাহাই লিখিত হইয়াছে। বাহ্য রূপ অপেক্ষা এই প্রাণময়ী মনোময়ী আত্মিক মূর্ত্তির মূল্য অধিক। তাহা বাদ পড়িয়াছে।

যাহাতে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, দুর্নীতি, কুরুচি প্রশ্রয় পায়, যাহাতে ধর্ম্মান্ধতা, বিবাদপরায়ণতা, হিংস্রতা বাড়ে, আমরা তাহার বিরোধী। লেখকদের যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় ঐরূপ কুফল ফলিতে পারে, আমরা তাহার বিরোধী। কিন্তু আমরা চিন্তায়, কথায়, লেখায় মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ অতি মূল্যবান অধিকার মনে করি। ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃত আইন দ্বারা তাঁহারা এই ক্ষমতা লইয়াছেন। কংগ্রেসও কি অনভিপ্রেত রূপে পরোক্ষ ভাবে মানুষের এই অধিকারে হাত দিতে চান? ভারতীয় কবি কী রূপক, কী পৌরাণিক

উপমার প্রয়োগে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহা কি তাঁহারা বাঁধিয়া দিতে চান ? কোন প্রকৃত কবি এ-বাঁধন মানিবেন না। ফল এই হইবে যে, প্রকৃত কবিদের সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটিবে, বরাত দিয়া ফরমাশ করিয়া অনুপ্রেরণাপূর্ণ জাতীয় সংগীত কংগ্রেস পাইবেন না। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ", কংগ্রেস যেন ইহা না ভুলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধারায়, বিবর্ত্তনে, বিকাশে, কংগ্রেসের পরোক্ষ হস্তক্ষেপও অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকর।

—

কংগ্রেসের ফেডারেশ্যন-বিরোধিতা

কংগ্রেস ফেডারেশ্যন চান, কিন্তু ভারতশাসন-আইনে ব্যবস্থিত ফেডারেশ্যন চান না। আমরাও চাই না। তাহার কারণ অনেক বার বলিয়াছি। কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সরকারী ব্যবস্থার ফেডারেশ্যনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস সরকারী "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বে"রও বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শেষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী ফেডারেশ্যনও শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন কিনা, বলা যায় না। যা হউক, আমাদের একটা আশঙ্কার কথা বলি।

মোস্লেম লীগও সরকারী ফেডারেশ্যনটার বিরোধী। কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, মোস্লেম লীগের বিরোধিতার কারণ, ব্রিটিশ ভারতের জন্য যেমন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আছে, দেশী রাজ্যগুলির জন্য সেরূপ বাঁটোয়ারা নাই। অধিকাংশ দেশী রাজ্যের নৃপতি (এবং প্রজাও) হিন্দু। এই জন্য মোস্লেম লীগ মনে করেন, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যেমন মুসলমানদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া ব্রিটিশ ভারতে তাঁহাদিগকে ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত অধিকার দিয়াছেন, "দেশী" ভারতে তাঁহারা তাহা পাইবেন না। ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুদের প্রতি যে গুরুতর অবিচার হইয়াছে, "দেশী" ভারতের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ন্যায়ানুগত হইলে হিন্দুদের প্রতি এই অবিচারের অতি সামান্য একটু প্রতিকার হইতেও পারে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের ও মোস্লেম লীগের সম্মিলিত ফেডারেশ্যন-বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন উপায়ে "দেশী" ভারতেও কার্য্যতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা জারি করিয়া মোস্লেম লীগকে হাত করিতে পারেন (কারণ তাঁহারা ফেডারেশ্যন চালাইতে দৃঢ়সংকল্প)। হিন্দুদের প্রতি গুরুতর অবিচার ত এক দফা হইয়াই গিয়াছে। মোস্লেম লীগকে গবর্ন্মেণ্ট এই রূপে সন্তুষ্ট করিলে হিন্দুদের প্রতি আর এক দফা অবিচার হইবে এবং হিন্দু "দেশী" রাজাদের প্রতি জবরদস্তী হইবে।

সব দিক্ বুঝিয়া, সকল কংগ্রেস-নেতার গুপ্ত প্রবৃত্তি বুঝিয়া, আপনাদের সকলের ওজন বুঝিয়া, দৃঢ়তা বুঝিয়া, কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা ও কাজ করা উচিত।

—

সকল বঙ্গভাষী অঞ্চলের একীকরণ

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটির গত অধিবেশনে একটি আলাদা অন্ধ্রপ্রদেশ ও একটি আলাদা কর্ণাটক প্রদেশ গড়িবার অনুকূল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই সুযোগে সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা বিহারের অন্তর্ভূত বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে বঙ্গের সহিত জুড়িয়া দিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। আপাততঃ আসামভুক্ত ঐরূপ অঞ্চলের কথা কংগ্রেসের কোন কমীটিতে উঠে নাই। কিন্তু বিহারভুক্ত ঐ অঞ্চলগুলি বঙ্গভুক্ত হইলেও কতকটা ন্যায়বিচার হইবে। বিহারের কাগজগুলি কিন্তু এ-বিষয়ে নির্ব্বাক্!

—

মেদিনীপুরের দুঃখদুর্দ্দশা

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমীটিতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মেদিনীপুরের দুঃখদুর্দ্দশা সংযত গম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। অবাঙালীরা তাহা শুনিয়া এবং, আশা করি, বুঝিয়া গিয়াছেন। তবে, কোন ফলের প্রত্যাশা না করাই ভাল।

—

"ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিমিটেড"

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের উদ্যোগে ভারত জুট মিলস স্থাপিত হওয়ায় চারি হাজার বাঙালীর অন্নসংস্থান হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগিতায় "ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী" স্থাপিত হইতে যাইতেছে। ইহাতেও কয়েক হাজার বাঙালীর কাজ জুটিবে। আলামোহন বাবুর প্রতিষ্ঠিত দুটি কারখানায় আগে হইতেই রেলগাড়ীর ওজনের কল, ছাপাখানার কল, জুট মিলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ঐ দুটি কারখানা নূতন কোম্পানীর পরিচালনাধীন হইবে এবং ক্রমশঃ আরও নানা রকমের কল নির্ম্মিত হইবে। এই কোম্পানীর সাফল্য প্রার্থনীয়।

অনন্তের আহ্বান

পুরীর সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য

শ্রীখগেন্দ্র রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
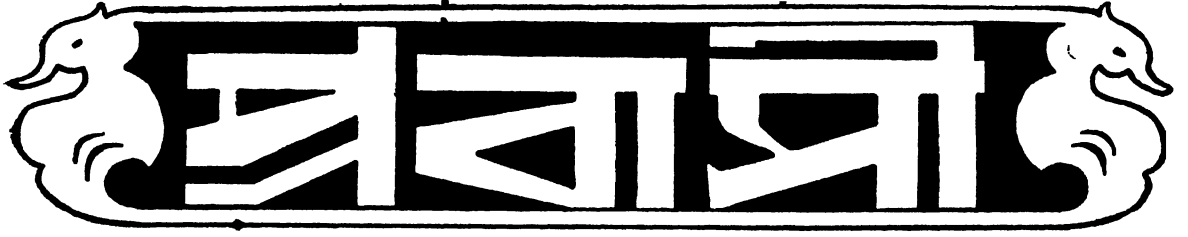
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪৪

৩য় সংখ্যা

হিন্দুস্থান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিম দিগন্ত পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
অন্তরের তালে তালে,
দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীর ঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি সাথে;
কালের মন্থনদণ্ডঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
বিধাতার অট্টহাস্য অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে।
লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা
জটিল রেখার জালে শুভ অশুভের আল্পনা।

নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি' আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।
প্রাঙ্গণ প্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
অনাহূত দস্যুদল,
অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল,
করেছে আসন কাড়াকাড়ি,
ক্ষুধিতের অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি'।
রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল আলোয়,
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি, সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর
প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত;
সেথা জয়ী আর পরাজিত
একত্রে করেছে অবসান
বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান।
নতজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি' চলে যায়,
ব'লে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের॥

১৯।৩।৩৭
শান্তিনিকেতন

স্বায়ত্তশাসনের সন্ধ্যা

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বায়ত্ত-শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ জাগিয়াছে। জার্ম্মানী, ইতালী ও রুশিয়ায় রাষ্ট্র একটা বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে; যাহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ডিক্টেটরশিপ বা স্বৈরশাসন, কোন বিশিষ্ট নায়ক বা দলের শাসন। স্বায়ত্ত-শাসনের দেশেও ডিক্টেটর-প্রীতির অভাব নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যখনই সমাজ ও রাষ্ট্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধী ভাব, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হয় তখনই এক দল লোক অনির্দ্দিষ্ট ডিক্টেটরকে আহ্বান করে। স্বায়ত্তশাসন এ যুগে জাতির কর্ম্মকুশলতার দাবী সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এদিকে আমেরিকার জননায়ক রুজভেল্ট জানান্ দিয়াছেন, আটলান্টিকের ওপার হইতে, সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ এক-জোট হইয়া নায়ক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা না করিলে সভ্যতার বিপর্য্যয় ঘটিবে। অথচ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে কয়েক দল লোক রুজভেল্টকে ডিক্টেটর আখ্যা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, এবং যে-ইংলণ্ড হইতে গণতন্ত্রের নূতন বাণী ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসার সঙ্গে জগতে প্রচারিত হইয়াছে সেখানেও নায়ক-তন্ত্রকে অনুমোদন করিবার লোক একেবারে বিরল নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন মিল ব্যাপকভাবে স্বায়ত্তশাসনের মূল ভাব ও আদর্শের ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যুক্তি ও নির্ভাবনাকে কেহই সন্দেহের চক্ষে দেখে নাই। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমাজের নিয়মানুবর্ত্তিতার চক্রে বিশ্বমানবের যে প্রগতি তিনি আঁকিয়াছিলেন তাহা এক জন পড়ো পণ্ডিতের আশায় অতিরঞ্জিত হইয়াছিল। পুস্তকালয়ের বাহিরে ইংরেজ শ্রমিকের অবস্থা ও বাস্তব জীবন তাঁহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতিহাস যে ধনী ও শ্রমিকের সংঘর্ষ তাহার চিত্রপটে অনুরাগ ও রক্তপাতের লালিমায় অঙ্কিত করিয়াছে তাহা তাঁহার কল্পনার আয়ত্তে ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আপন স্বার্থসাধনের শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা, রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতারক্ষার এই অতি সরল বাণী ইংলণ্ডের পার্লামেন্টও শুনে নাই। বাস্তবিক রাষ্ট্র নানাবিধ আর্থিক ও সামাজিক আইন-কানুনের দ্বারা অনেক দিক হইতে নির্ধন ও দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে, মিলের মতানুযায়ী শুধু শান্তিরক্ষাকে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করে নাই।

এটা ঠিক, মিলের সমসাময়িক কার্ল মার্ক্স যে-অর্থনৈতিক সংঘর্ষের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রেরণা এবং উহাই সামাজিক ধারা ও সমাজ-শাসন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মিল অপেক্ষা মার্ক্সেরই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও মার্ক্সের দেশে প্রথম ব্যাপকভাবে আর্থিক ও সামাজিক আইন-কানুন ও সেবানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে সব দেশেই রাষ্ট্র 'প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি' পিতৃধর্ম্মপালনে ব্রতী হইয়াছে।

তবুও ইংলণ্ডের ব্যক্তিস্বাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের যে নীতি ও কর্ত্তব্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিল তাহা এখনও পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রিক আদর্শ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এদিকে অর্থনৈতিক ভদ্রলোক স্বাধীন ও কর্ম্মকুশল আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বত্ব লইয়া ব্যগ্র। সকল ভদ্রলোকের স্বার্থের যোগফলে যে সমগ্র সমাজের সুখসম্পদ, রাষ্ট্রনীতির এ-বিশ্বাস অচিরেই ধূলায় ধূসরিত হইল। আর্থিক প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তির কল্যাণ ও প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সমাজের সাধারণ স্বার্থ বজায় রহিল না; বরং আর্থিক শোষণের উপায় ও অনুষ্ঠান ক্রমশঃ বিচিত্র হইয়া দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির দীনতা ও অক্ষমতা নিদারুণ ভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িল; দল ও

সমিতি ব্যক্তির স্বত্বের মত সমূহ স্বত্বের দাবী করিল; উদার সামাজিক নীতি ব্যক্তিগত স্বার্থের যোগসাধনে যে সাধারণের কল্যাণ ও অনিবার্য্য প্রগতির ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিল সমাজের ভীষণ অসাম্য, সাধারণের হীনতা ও ক্লেশ।

যেমন যেমন সামাজিক অশান্তি বা বিপদ ঘটিয়াছিল, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বত্ব ও স্বাধীনতার দাবীর উপর হস্তক্ষেপ করিয়াই রাষ্ট্র সমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্ত্তব্যপালনের জোরে নূতন মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। তবুও পূর্ব্বেকার ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব যুগের মতই ব্যক্তি রাষ্ট্রের জীবন হইতে কোন অধ্যাত্ম প্রেরণা পায় না। রাষ্ট্রের কোন মরণ-বাঁচন বিপদের সময় ছাড়া তাহার যেন অন্য সময় কোনই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাবী নাই। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেন তাহার লক্ষ্য ও আদর্শের পরিচয় পায় রাষ্ট্রের বাহিরে আপনার অন্তর হইতে। আর যখন রাষ্ট্রেরই অধ্যাত্মবোধ নাই, ব্যক্তি ও দলও অধ্যাত্মবোধহীন হইয়া পড়িতেছে। স্বায়ত্তশাসনের দেশে রাষ্ট্রের অগৌরবই হইতেছে গোড়ার গলদ।

ইউরোপের যে-সব দেশে এখন স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষত্ব এই যে রাষ্ট্রের এখানে একটা অধ্যাত্মবোধ আছে, জাতির আশা ও আদর্শের প্রতিভূ হইয়া রাষ্ট্র এখানে ব্যক্তিকে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছে। স্বৈরশাসন শুধু যে পুরাতন ইতিহাস-বিশ্রুত রীতি অনুসারে রাজকীয় শক্তির কেন্দ্রীকরণে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা নহে; ইহার মূলে রহিয়াছে,—দলপতি হইয়াছেন জননায়ক, যিনি রাষ্ট্রিক হিসাবে বেদনাময়, ক্ষুব্ধ অথবা নূতন জাতির মনোময় রূপ। আপন আপন দেশে নায়ক নূতন করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যান করিয়াছেন, এবং ঐ কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তি বা দলের অধ্যাত্মযোগ তাঁহারা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দিক হইতে ব্যাখ্যান ও জ্ঞাপনের (প্রপাগাণ্ডার) দ্বারা জাতীয় কৃষ্টি ও জাতীয় কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যেমন সমষ্টিকে নূতন প্রাণ দিয়াছেন, তেমনি ব্যক্তিকেও নূতন অধ্যাত্ম-জাগরণে ডাক দিয়াছেন।

কাল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ পক্ষান্তরে দলবিশেষের স্বার্থ ও মনোবৃত্তির দিক হইতে রাষ্ট্রকে বিচার করিয়াছে। উহা রাষ্ট্রকে নূতন অনুরাগে উদ্দীপ্ত, নূতন তেজে বলীয়ান করিয়াছে সত্য, কারণ রাষ্ট্র এখানে নিঃস্ব ও নিরাশ জনসাধারণকে ধন ও শক্তি দিয়াছে এবং তাহার বিনিময়ে অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও প্রেরণা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু কোন দলবিশেষ ব্যাপকতর জনসাধারণের দল হইলেও সমষ্টিকে পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না। ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে দলের সংকীর্ণ স্বার্থ নির্লজ্জ ভাবে ধরা পড়ে। তখন যে গণতন্ত্র দলের প্রতিনিধি হয় তাহাতে কিছুতেই জাতির আত্মবোধের অধ্যাস আসে না। দল বা সম্প্রদায়ের মতই রাষ্ট্রও হীন, সংকীর্ণ, বৈষয়িক ভাবে দেখা দেয়। তাহাতে অধ্যাত্ম-প্রেরণা জাগে না, অহরহ জাগে হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিশোধ-স্পৃহা।

স্বৈরশাসন ইউরোপীয় সভ্যতার এই বাত্যায় হইতে বিভিন্ন দেশকে রক্ষা করিয়াছে। যেমন মুসোলিনী লোভী স্বার্থান্ধ শ্রমজীবী দলের অশাসন হইতে ইতালীকে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনই হিটলার রক্ষা করিয়াছেন হতাশ জার্ম্মান জাতিকে নূতন সাহস ও আশায় সঞ্জীবিত করিয়া, কমিউনিষ্টদিগের বিনাশনীতির পরিবর্ত্তে নূতন সৃজননীতির আশ্রয়ে বিপর্য্যস্ত জার্ম্মানীর নূতন সম্পদ ও কর্ম্মকুশলতা অর্জ্জন করিয়া।

বলা বাহুল্য, রুশিয়া, জার্ম্মানী ও ইতালীতে রাষ্ট্রের ব্যাপারে যে ঐক্যসাধন দেখা গিয়াছে, তাহাতে ঐক্য আছে, সাধন নাই। এক জন অতিমানুষ উচ্চ নিনাদে জনগণের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করিল—রাষ্ট্রের সাধন ইহাতে হয় না। প্রত্যেকের জীবনে, প্রত্যেকের চিন্তা ও কর্ম্মে, প্রত্যেকের আত্মনিয়োগে, আত্মদানে ও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের জন্ম। এই হিসাবে ইতালী ও জার্ম্মানীতে একজন রাষ্ট্রিক পৌরমানুষ (সিটিজেন); বাকী সব লোকেরই কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। রুশিয়া, ইতালী ও জার্ম্মানীর সংস্কৃত সমাজ-বিন্যাসে যে নূতন কর্ম্মকুশলতা ও সংঘবোধ জাগিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। রুশিয়াতে জনসাধারণ হইতে নূতন প্রতিভার উন্মেষ দেখা গিয়াছে, কিন্তু কত যে প্রতিভার বিনাশ সাধন হইয়াছে, তাহার খোঁজ কে রাখে? ইতালী ও জার্ম্মানীতে একীকরণের অজুহাতে স্বাধীন লোকমতের নিগ্রহ যে কত

দিকে মানুষের সৃজনশক্তিকে বাধা দিয়া সমাজের উন্নতির সংপ্রধারা মূল প্রস্রবণকে রোধ করিতেছে, তাহারই বা হিসাব কোন নাট্ট্জী বা ফ্যাসিষ্ট রাখেন ?

আসল কথা এই, ব্যক্তির অন্তর্জীবনকে পিটিয়া, ঘষিয়া, মাজিয়া এক কাঠামতে গড়া যায় না। তাহা করিতে গেলেই মানুষ না-গড়িয়া রাষ্ট্র বানর গড়িয়া বসে। মানুষের অন্তর্জীবন চিরকালই রাষ্ট্রকে চোখ রাঙাইয়া বলিয়াছে, "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। সে চায় বৈচিত্র্য, স্বাধীন গতি, সাবলীল, এমন কি বক্র গতি, তাহাকে রাষ্ট্রের সোজা ইস্পাতের পথে জোর করিয়া চালানো অসম্ভব। বাষ্পীয় শকট গাধা-গাড়ীকেই টানিয়া লইয়া যায়। এক বাষ্পীয় শকট অন্য সচল বাষ্পীয় শকটকে হঠাইতে গেলে ঠোকাঠুকি লাগে।

এইখানেই ইংরেজ-ফরাসী-আমেরিকানের পুরাতন ব্যক্তি-স্বাধিকারলাভের আসল নৈতিক সার্থকতা। মানুষের অন্তর্জীবন ও স্বাধীনতা বিকারহীন, অবিনাশী। পুরাতন ফরাসী ও ইংরেজ তত্ত্বের দোষ হইয়াছিল এই যে, ব্যক্তি ও তাহার রাষ্ট্রিক অধিকার নিতান্ত ফিকে, সাধারণ ও অবাস্তব ভাবে কল্পিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রিক ছাড়া ব্যক্তির আর্থিক ও ব্যবহারিক ন্যায্য দাবী আছে। অবস্থাবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ঘটনা-পরম্পরার ভিতর মানুষের দাবী বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে। তাহা ছাড়া ব্যক্তির স্বাধিকারের সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্যের ভারও নিবিড় ভাবে জড়িত; বিচিত্র অবস্থায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবিপর্যায়ে সমাজের সঙ্গে আবেষ্টনের শক্তির বিনিময়ে ব্যক্তির অধিকার ও কর্ত্তব্যের একই সঙ্গে উন্মেষ। পুরাতন অনড়, অপরিণামী ও সাধারণ অধিকারের পরিবর্ত্তে ব্যক্তির সদা-পরিবর্ত্তনশীল ও বস্তুতান্ত্রিক স্বাধিকারের কথা নূতন ব্যবহার-দর্শন প্রচার করিতেছে। অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই বস্তুতান্ত্রিক অধিকারত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে উহাদিগের সঙ্গে যে-নীতিশাস্ত্রের এখন বিচ্ছেদ রহিয়াছে তাহা দূর হইতে পারে। ব্যক্তির স্বাস্থ্যের দাবী; তাহার ধর্ম্ম, চিন্তা ও মতের স্বাধীনতার দাবী; তাহার কর্ম্মনিয়োগ ও যথাযথ পারিশ্রমিকের দাবী; তাহার শিক্ষা, বিশ্রাম ও আমোদ উপভোগের দাবী; এবং তাহার ন্যায্য বসবাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী অনেক দেশে স্বীকৃত হইয়াছে। স্থানকালপাত্র হিসাবে ব্যক্তির এই সকল অধিকার যেমন সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছে, অপর দিকে ব্যক্তির জীবনও পরিপূর্ণ ও সার্থক করিতেছে।

পুরাতন লিবার্যালিজমের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে খুঁজিতে গেলে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—যদিও উপায় ও কার্য্যপ্রণালী সংঘ ও সমষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। এই ধারণা রুশিয়া, জার্ম্মানী, ইতালী প্রভৃতি নায়ক-তান্ত্রিক দেশে না আসিলে রাষ্ট্রের অনধিকার ও অত্যাচার হইতে রক্ষা নাই।

রাষ্ট্র ও সমাজের ক্রমবিকাশে ব্যক্তির স্বাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, গোষ্ঠী, শ্রেণী ও সমূহের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমূহের অধিকারের উৎস মানুষের সামাজিক জীবন ও সহজ লৌকিক ব্যবহার হইতে। ব্যক্তির স্বাধিকারের মত সমূহের স্বাধিকার রাষ্ট্রের অনধিকার হইতে মানুষের অন্তর্জীবনকে রক্ষা করে। শুধু তাহা নহে, সমূহের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির স্বাধিকার-লাভের প্রধান সহায় ও আশ্রয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ তাহার নানাবিধ গোষ্ঠী, শ্রেণী, পল্লীসমাজ ও সমূহের বিনাশসাধন করিয়া ব্যক্তিকে স্ফীতকায় রাষ্ট্রের সঙ্গে একা যুঝিতে আহ্বান করিয়াছিল। ইহার ফলেই ব্যক্তির রাষ্ট্রিক স্বাধিকারজ্ঞাপন। প্রাচ্য জগতে সমূহ-শক্তি ক্ষুণ্ণ হইলেও এখনও বিনষ্ট হয় নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবার গোষ্ঠী, জাতি, শ্রেণী, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি নানা দিক হইতে যুগপরম্পরা ধরিয়া ব্যক্তির সাধারণ জীবনযাত্রার সহায় ও নিয়ন্তা হইয়াছে। বিভিন্ন সমূহের সহজ শাসন ও সমবায় সমাজের বন্ধনী হইয়া চীন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, ইতিহাসের শত বাধা ও পরাধীনতার সহস্র বিঘ্ন সত্ত্বেও। এশিয়ার পল্লীসমাজের নীরব স্বায়ত্তশাসন তাহার প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মগ্রন্থি।

ইউরোপে আজ নায়ক-তন্ত্র নিতান্ত স্পর্দ্ধার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান প্রজার স্বায়ত্তশাসনকে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা করিতেছে। চীনের সহস্র বৎসরের পল্লীসভ্যতা জাপানী বোমা-কামানের আঘাতে আজ ছিন্নভিন্ন। ভারতে

ইংরেজ-শাসন ব্যক্তির স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সহায় হয় নাই। নূতন শাসনতন্ত্রের সঙ্গেও জনসমাজের আভ্যন্তরীণ শাসন-শক্তির যোগ স্থাপিত হয় নাই। শাসনতন্ত্র পল্লীসমাজ হইতে গড়িয়া উঠে নাই। তাহা বাহির ও উপর হইতে স্থাপিত হইয়াছে। ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহা অচিরেই আপনার স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করিবে। প্রাচীন সমূহতন্ত্রী কৃষিপ্রধান দেশের বিপুল জনসাধারণ নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের উপাদান খুঁজিয়া না পাইয়া আরও হতাশ ও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকিবে।

কি ইউরোপ, কি চীন ও ভারত, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য জগৎ, সব দেশের এখন নিতান্ত প্রয়োজন ভৌগোলিক শক্তি ও সামাজিক ইতিহাসের আশ্রয়ে নানা প্রকার প্রাদেশিক বা লৌকিক, স্থানীয় বা জাতিগত দল, শ্রেণী ও সমূহের দ্বারা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ-শক্তি হইতে আত্মরক্ষা। জগতের ইতিহাসে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহশীল বলিয়া অক্ষয় অকীর্ত্তি লাভ করিবে। জাতি-বৈরই আধুনিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ-শক্তির মূলে। এই কেন্দ্রীকরণ আজ দিকে দিকে মানুষের অন্তর্জ্জীবনকে খর্ব্ব ও পঙ্গু করিতেছে, যেখান হইতে রাষ্ট্রের জন্ম, স্থিতি ও শেষ বিচার তাহাকে আজ অবমাননা করিতেছে। ব্যক্তি ও সমাজকে অনধিকারী, অতিসাহসিক সবজান্তা স্ফীতকায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ হইতে রক্ষা পাইতে গেলে শ্রেণী, দল ও সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সমূহের ন্যায্য অধিকার ব্যক্তির স্বাধিকারের সঙ্গে দাবী করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মাটিতে আজ পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক চাষের ক্ষেতে গ্রামের ভিটায় কৃষির কল্যাণের উপর নির্ভরশীল। তাই ভারতবর্ষে সমূহতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শুধু যে এক অতি প্রাচীন পল্লীসভ্যতার আত্মরক্ষা ও বিকাশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত তাহা নহে, ইহাতে বিশ্বজগতের একটি অতি কঠিন সাধারণ সমস্যারও সমাধান হইবে। ভারতবর্ষের গ্রামসভায়, জাতি-মণ্ডপে লৌকিক জীবনযাত্রার আলোচনায় প্রাচীন বট-গাছের তলায় পঞ্চায়তের অধিবেশনে, প্রাদেশিক শিল্পী ও বণিকগণের সমবায় প্রতিষ্ঠায়, কে জানে হয়ত বিশ্বজগতের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালীর একটা অতি সুন্দর রীতি অনাদৃত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

রোম,
সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

আর্দ্রা

শ্রীমণীশ ঘটক

আজ মনে পড়ে না'ক, তোমারে চাহিয়া
উন্মুখ কামনা-ক্লিষ্ট কম্পমান হিয়া
মূর্চ্ছি পড়েছিল করে চরণে তোমার
মদির মাধবীরাতে ; তীব্র হাহাকার
একদা ধ্বনিয়াছিল ঝঞ্ঝার বিলাপে ;
সহসা লুকায়েছিল কার অভিশাপে
যাযাবর মেঘ-বুকে স্তম্ভিত চন্দ্রমা ;
হৃৎস্পন্দ থামিয়াছিল, হে মোর পরমা,
দুটি বক্ষে এক সাথে পরুষ পীড়নে।

সে স্মৃতি মুছিয়া গেছে। আমার জীবনে
আজিকার তুমি নাহি ছিলে কোনো দিন,-
তবু যবে অর্দ্ধরাত্রে, তন্দ্রাবিমলিন
ক্রন্দসী আর্দ্রার পানে চমকিয়া চাহি,
হেরি সেথা দৃষ্টি তব, শুধু তুমি নাহি॥

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

১

আজই মৃগাঙ্কমোহনের আসিবার দিন। বেলা নয়টা-দশটার সময় তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন। সকালে উঠিয়াই মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "কার্ত্তিক জেলেটাকে একবার ডাকি, কি বল গো? একবার পুকুরে জাল ফেলে দেখুক বড় মাছ একটা পায় নাকি? হাজার হোক এ-বাড়ীর জামাই ত বটে?"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "তা ডাক; জামাই ত শ্বশুরবাড়ীর মান কত রেখেছেন। এ বছর যা বৃষ্টি গেল পুকুর এখনও জলে থৈ থৈ করছে, মাছ উঠবে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "উঠতেও পারে এক-আধটা, দেখুক একবার জাল ফেলে। আর দেখ, মিষ্টি আনব নাকি দোকান থেকে?"

গৃহিণী চটিয়া বলিলেন, "অত্ত আর কাজ নেই। ঠাকুরঝি বেঁচে থাকত, কি মেয়েটাকে ওরা একটু ডেকে জিগ্যেস করত, তাহলেও না-হয় কথা ছিল। ঐ মাছ ধরালেই ঢের হবে। মিষ্টি দরকার হয়ত আমি ঘরেই ক'রে দেব। দুধেরও অভাব নেই, গুড়েরও অভাব নেই।"

কর্ত্তা অগত্যা প্রস্থান করিলেন। মৃগাঙ্ক বহু বৎসর পরে এ বাড়ীতে আসিতেছেন, একটু যত্ন-আদর বেশী করিয়া করিবারই মল্লিক-মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল। তিনি জামাই ত বটে এ-বাড়ীর, ব্যবহারটা না-হয় জামাইয়ের মত বহুকাল করেন নাই। কিন্তু গৃহিণী মৃগাঙ্কের নামে একেবারে খড়্গহস্ত, কিছু করিবার নামেই "আদিখ্যেতা" বলিয়া মুখ ঝামটা দিয়া উঠিবেন, কাজেই কর্ত্তা আর বেশী বাড়াইতে ভরসা করিলেন না। কার্ত্তিক জেলেকে ডাকিয়া পুকুরে জাল ফেলিবার আদেশ দিয়া ধীর পদে ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। মৃগাঙ্ককে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম অন্ততঃ কাহারও ত সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত?

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ট্রেন আসিতে তখনও মিনিট-পাঁচ দেরি আছে। প্ল্যাটফর্ম্মের উপরই পায়চারি করিয়া সময়টা কাটাইয়া দিবেন স্থির করিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কে আসছে মল্লিক-মশায়? ভাগ্নীটি ত সেদিন এসে গেল?"

মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ আসছে ভাগ্নীর বাপ।"

ষ্টেশনমাষ্টার দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? হঠাৎ এত দয়া যে? বারো বছর বোধ হয় এমুখো হন নি? মেয়ের বিয়ের-টিয়ের জোগাড় হচ্ছে নাকি?"

পল্লীগ্রামের লোক, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে, ইহাতে কেহ কিছু মনে করে না।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "না, মেয়ের বিয়ের কথা এখনও কিছু ওঠে নি। এমনি মেয়েকে দেখতেই আসছে আর কি? বহুকাল দেখে নি কিনা!"

ট্রেন আসিবার সিগ্ন্যাল্ পড়িয়া গেল, কাজেই ষ্টেশন-মাষ্টারকে গল্পের মায়া ত্যাগ করিয়া কাজে ছুটিতে হইল।

ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের ষ্টেশন, ট্রেন থামে মাত্র এক মিনিট। মানুষ উঠিবার নামিবার সময় পায় না। সঙ্গে একটার বেশী দুইটা পোট্‌লা থাকিলে যাত্রীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে যে নামাইবে কি করিয়া। প্ল্যাটফর্ম্মও গাড়ীর সিঁড়ি হইতে প্রায় এক-মানুষ নীচে। নামা-ওঠা করা এক রীতিমত কস্‌রতের ব্যাপার।

গাড়ী থামিবার আগেই মল্লিক-মহাশয় দেখিতে পাইলেন, মৃগাঙ্কমোহন জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছেন। পাশের একটি কুলী-ছোক্‌রাকে

ডাকিয়া লইয়া মল্লিক মহাশয় সেই গাড়ীখানার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

গাড়ী থামিবামাত্র মৃগাঙ্ক মস্ত একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া গাড়ীর দরজার হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। মল্লিক-মহাশয় ব্যাগটা তাঁহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া কুলীটার হাতে দিয়া বলিলেন, "আর আছে নাকি কিছু?"

মৃগাঙ্ক নামিয়া পড়িয়াই কাশিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোনও মতে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "একটা হাঁড়ি।"

গাড়ীর ভিতরের আর এক জন যাত্রী হাঁড়িটা অগ্রসর করিয়া দিল, কুলী-ছোকরা সেটা টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। ট্রেনও তখনই আবার ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাশি থামিলে পর মৃগাঙ্কমোহন মল্লিক-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "আমরা ত সব ভালই, কিন্তু তোমাকে ত একেবারেই ভাল দেখছি না। এমন চেহারা হয়ে গেল কি ক'রে?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আর কি ক'রে? যা রোগে ধরেছে, একেবারে শেষ না ক'রে ছাড়বে না। বারো মাস ত্রিশ দিন এই এক হাঁপানির টান, যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন খেতেও পারি না, শুতেও পারি না। জীবন্তে যমযন্ত্রণা ভোগ, মানুষের শরীরে আর কতই সয়?"

মল্লিক-মহাশয় দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "তাই ত, স্বাস্থ্যটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি। তুমি আমার চেয়ে কত ছোট, অথচ দেখাচ্ছে যেন তোমারই বয়স দশ বছর বেশী। চল এগনো যাক্। গাড়ী করি একখানা, তোমার আবার হাঁটতে কষ্ট হবে?"

মৃগাঙ্ক গরুর গাড়ীগুলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "নাঃ, আস্তে আস্তে হেঁটেই যাই চলুন। ও ঝাঁকড়ানি আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে পায়ে হাঁটাই ভাল।"

দুই জনে জনবিরল পল্লীপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। লাল মাটির পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া কত গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে কে জানে? কোথাও তাহার দুই ধারে খোলা মাঠ, কোথাও শ্যামল ধানের ক্ষেত, মধ্যে মধ্যে পুকুর, এবার বর্ষার প্রাচুর্য্যে কানায় কানায় ভরিয়া আছে। দূরে নির্ম্মলসলিলা ছোট একটি নদীর স্রোত রজতহারের মত শ্যামা ধরিত্রীর বুকে দুলিতেছে।

চলিতে চলিতে মৃগাঙ্ক বলিলেন, "দোকানপাট অনেকগুলো হয়ে গেছে দেখছি, প্রায় ছোটখাট শহর। আগে ত এর অর্দ্ধেকও দেখি নি?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, ক্রমেই গাঁয়ে লোকও বাড়ছে, দোকানপাটও বাড়ছে। ইংরেজী স্কুল হয়েছে একটা। জমিদার বাবু গাঁয়ে থাকাতেই নানা রকম সুবিধে হচ্ছে আর কি?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আর আমাদের গাঁ, যাকে বলে পাড়াগাঁ। দিনদুপুরে মানুষকে সাপে খাচ্ছে, বাড়ীর আনাচে-কানাচে শেয়াল ডেকে বেড়াচ্ছে। গেল বছর শীতকালে ত একটা বাঘই ঢুকে পড়ল গাঁয়ে। নেহাৎ পৈত্রিক ভিটা, যাবার ঠাঁইও নেই আর কোথাও, তাই ওখানে থাকা, নইলে মানুষের বাসের আর যোগ্য নেই।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "স্বাস্থ্যটা কেমন? ছেলেপিলে বেশী ভোগে না ত?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "ভোগে আবার না? এটার জ্বর, ওটার সর্দ্দি, সেটার আমাশা, এ ত লেগেই আছে। তবে ঘরের দুধটা ফলটা পায় এখনও তাই টিকে আছে কোনও মতে। ম্যালেরিয়া তত বেশী নেই, তাই ব'লে একেবারে যে নেই তা নয়।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "আমরা ওদিক দিয়ে ভাল আছি। কর্ত্তার এসব দিকে দৃষ্টি খুব, নিজে বারো মাস থাকেন কি না? পচা পুকুর, কি ডোবা একটিও নেই গ্রামে। টিউবওয়েলের জল পেয়ে অবধি কলেরাও বড়-একটা হয় নি, তবে সর্দ্দিজ্বর কি আর না হচ্ছে? তা হবে বইকি?"

কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের বারান্দাটি ভরিয়া বাড়ীর সব কর্ম্মী মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, মল্লিক-গৃহিণী বাদে। তাঁহার রান্নাঘরের কাজে ফাঁক পড়িবার জো নাই, তাহা ছাড়া মৃগাঙ্কে দেখিতে বা অভ্যর্থনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নহেন।

মৃগাঙ্ক দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই মৃণাল নামিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃগাঙ্ক অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "এই যে মিনু, চিনতে পারছ না নাকি?"

মৃগাঙ্ক শেষ দেখিয়াছিলেন কন্যাকে সাত বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা। শ্যামবর্ণ রং ছিল তখন বলিয়া মনে হয়, শরীরও যেন কৃশ ছিল। আর এ যেন পল্লাবনী লতার মত মনোহর, প্রথম যৌবনের শোভায় সৌন্দর্য্যে ইহার সুকুমার দেহখানি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "কত কাল আগে দেখেছি, তখন ছোটটি ছিল। বেশ ডাগর হয়েছে, শৈলজারই চেহারা পেয়েছে।"

মৃণালের পর চিনি, টিনি, তাহাদের দাদা, একে একে সকলেই মৃগাঙ্ককে প্রণাম করিতে লাগিল। মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "রোস্ রোস্, মানুষটাকে ঘরে ঢুকে বসতে দে। এতটা পথ হেঁটে এল।" তিনি সঙ্গে করিয়া অতিথিকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। কুলী-ছোক্‌রাকে বলিলেন, "হাঁড়ি আর ব্যাগ এখানে রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়া। পয়সা দিচ্ছি।" তাহার পর রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "কই গো?"

মল্লিক-গৃহিণী হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "এই চাল ক'টা হাঁড়িতে দিয়ে এলাম আর কি।" মৃগাঙ্ক প্রণাম করিতেই বলিলেন, "এস ভাই এস, এত দিনে তবু মনে পড়ল। ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে? এ যে চিনবার জো নেই।"

মৃগাঙ্ক হতাশভাবে বলিলেন, "আর চেহারা! বেঁচে যে আছি সেই ঢের। তা আপনারা সব ভাল আছেন ত?"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "এই যেমন রেখেছ! তা জুতো খুলে হাত-মুখ ধোও। চা-টা খাওয়া অভ্যেস আছে না কি?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "না বউঠাকরুণ, ওসব অভ্যেস করবার মত পয়সা কই? সকালে একটু গুড় হোক্ কি দুটো মুড়ি হোক্, এই মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খাই এই পর্য্যন্ত!"

চিনি আর টিনি পিসেমশায়ের আনীত হাঁড়িটাকে গভীর মনোযোগ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, মৃগাঙ্ক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এক হাঁড়ি টানা লাড্ডু আনলাম, ছেলেমেয়েদের জন্যে। যেমন মানুষ তেমন জিনিষ। ওরা কত ভাল ভাল মিষ্টি খায়। আমাদের যা দেশ, যেন ভূতের বাথান, সেখানে পাওয়াও যায় না কিছু।"

মল্লিক-গৃহিণী ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, "ঐ বেশ এনেছ। ওরাই কি আর সোনারূপো খায় নাকি? এখানে মিষ্টি কিনছেই বা কে, আর বেচছেই বা কে। আমি মাঝে মাঝে ঘরে দু-একটা কিছু ক'রে দিই যদি তবেই।" মনে মনে বলিলেন, "তোমার হিংসুটি গিন্নি আবার ভাল মিষ্টি আনতে দেবে!"

হাঁড়িটা খুলিয়া ছেলেমেয়েদের হাতে একটা একটা মিঠাই গুঁজিয়া দিয়া, তখনকার মত উহা তিনি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। এখন ঐ বাজে মিঠাই খাইয়া পেট বোঝাই করিলে ভাত তাহারা আর এক গ্রাসও খাইবে না। ভালমন্দ দু-একটা আজ রান্নাও করিতে হইবে, তাহার জন্যও পেটে জায়গা রাখা চাই।

মৃণাল বাপের পা ধুইবার জন্য জল আর গামছা আনিয়া ভিতরের বারান্দায় রাখিল। জুতা-মোজা ছাড়িয়া, হাত-পা ধুইয়া তিনি আবার মল্লিক-মহাশয়ের খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মিনু আয় ত আমার সঙ্গে। একটু জলখাবার গুছিয়ে দিই গিয়ে।" মৃণাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। মামীমা এক বাটি দুধ আর একটি কাঁসার রেকাবিতে খান-চার চন্দ্রপুলি আর দুইটা মুগের লাড্ডু সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই খেতে দে এখন, যা চেহারা করেছে, আর বেশী খেতে পারবে না। আর রান্নাও ত হয়ে এল ব'লে, মাছটা এলেই হয়।"

মৃণাল জলখাবার লইয়া মামাবাবুর ঘরে ফিরিয়া গেল। একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া জায়গা করিয়া দিল, এক গেলাস জল গড়াইয়া রাখিল। মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "নাও হে, একটু জল খাও।"

মৃগাঙ্ক নামিয়া আসনে বসিলেন, রেকাবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খাবার?" কিন্তু দেখিতে দেখিতে রেকাবিটা খালি হইয়া গেল, বাটির তলায় দুধ এক ফোঁটাও পড়িয়া রহিল না। পল্লীগ্রামের মানুষ, দেখিতে যতই রোগজীর্ণ হউক, খাইবার ক্ষমতা সর্ব্বদাই রাখে। মৃণাল

বাসন উঠাইয়া লইয়া গেল। এমন সময় কার্ত্তিক জেলে খিড়কীর দরজা দিয়া উঠানের ভিতর প্রবেশ করিল। রান্না-ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিল, "এই নাও মা-ঠাকৃরুণ, মা দুগ্‌গার কৃপায় বড় মাছটাই পাওয়া গেছে", সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করিয়া একটা চার সের ওজনের কাতলা মাছ সিঁড়ির উপরে ফেলিয়া দিল।

ছেলেবুড়া সকলেই দৌড়াইয়া আসিল মাছ দেখিতে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, খাইতে সকলেই ভালবাসে, ভাল সুখাদ্যের সন্ধান পাইলে তাই সকলেই উৎসুক হইয়া বাহির হইয়া আসে। এমন কি মৃগাঙ্কও বাহির হইয়া আসিলেন। মাছের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিব্যি মাছটি ত দাদা! চার-পাঁচ সের ওজন হবে, কি বল?"

মল্লিক-মহাশয়ও মাছ দেখিয়া বেশ খুশী হইয়াছিলেন। মৃগাঙ্ক প্রায় এগার বৎসর পরে এ বাড়ীতে পা দিলেন, তাঁহাকে আজ নিরামিষ খাইতে দিতে হইলে মল্লিক-মহাশয়ের আর খেদের সীমা থাকিত না। বলিলেন, "হ্যাঁ তা হবে বইকি? পাঁচ সের না হোক, চার সের ত হবেই।"

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, "আর একটু ছোট হ'লেও দুঃখ ছিল না। এত মাছ এক দিনে খাবে কে?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এক দিনে না হোক দু-দিনে খাবে। শীত পড়ে গেছে, নষ্ট হবে না। তুমি কিছু কালকের জন্যে তুলে রেখে দিও। টক দিয়ে দিব্যি হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ত ব'লে খালাস, তার পর একরাশ ক'রে টক মাছ খেয়ে ছেলেমেয়েরা যখন পেট ছাড়বে, তখন ত আর তুমি সামলাতে আসবে না? গতবার যা ভুগলাম এই নিয়ে।"

মৃগাঙ্কমোহন বলিলেন, "অবাক করলেন আপনি বউ-ঠাকৃরুণ, মাছ আবার এক দিনে বাসি হয় নাকি? পাড়া-গাঁয়ের মানুষ, বাসি খেতে ভয় করে এও কখনও দেখি নি। আমরা ত এমন মাছ পেলে চার দিন ধরে খাই। অসুখ হয়ত এক-আধটার করে, তা কে মানছে অত? খাবার জিনিষ ভাল পাওয়া যায় কালেভদ্রে, তাও যদি ভয়ে না খায়, তাহলেই হয়েছে আর কি?"

মল্লিক-গৃহিণী মনে মনে বলিলেন, "নোলা দেখ বুড়ো মিন্সের!" মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বাহিরে বলিলেন, "তা মাছ রেখে দেব ভাই যত পার কাল টক খেয়ো তোমরা। কুচোকাচা-গুলোকে আর দেব না। ও মিনু, মাছটা কুটবি আয় মা, এক হাতে ত পেরে উঠব না।"

মৃণাল মামীমাকে সাহায্য করিতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। পিতার আগমনের খাতিরে সে আজ নিজেকে নিজে ছুটি দিয়া রাখিয়াছিল।

রান্না হইতে একটু বেলাই হইয়া গেল। মাছের মুড়া দিয়া ডাল রান্না হইল, একটা ঝোলও হইল, খানকতক বড় বড় মাছ কালকার জন্য তুলিয়াও রাখা হইল। রাত্রির আহারের জন্যও সেরখানেক মাছ গৃহিণী রাখিয়া দিলেন।

ছেলেমেয়ে ছোটর দলের সঙ্গেই বড়রাও বসিয়া গেলেন। মৃণাল আর তাহার মামীমা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

মৃগাঙ্ক দুই চার গ্রাস খাইয়াই বলিলেন, "বউঠাকরুণের রান্নার হাত আরও খুলেছে দেখছি। এমন রান্না বহুকাল খাই নি।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু অম্লমধুর হাসিয়া বলিলেন, "কেন, বউ ভাল রাঁধে না?"

মৃগাঙ্ক একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "ওসব জায়গায় অত নানা রকম রান্নার চলন নেই, জানেও না বিশেষ কেউ, কোন মতে সেদ্ধ ক'রে নামায় আর কি? আর ছেলেমেয়ে নিয়ে তারও মরবার সময় নেই, রাঁধবে কি পাঁচ রকম! লোকজন রাখবার ত ক্ষমতা নেই?"

মল্লিক-মহাশয় কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "ছেলেমেয়ে ক'টি হ'ল?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা অনেকগুলি হয়েছে, ছেলে চারটি, মেয়ে তিনটি। বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে, এই ত শরীর, কাজকর্ম্মই যে কতদিন করতে পারব তার ঠিকানা নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "খাবার সময়ে আর দুঃখকষ্টের কথা তুলে কাজ নেই, ওসব আর কার সংসারে নেই বল? মাছ আর একখানা দিই?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা দিন। বেশী খেলে আবার সব সময় সয় না, এই যা ভয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "অত ভয় করে না। এই না তুমিই

বললে পাড়াগেঁয়ে মানুষের ভয় করলে চলে না। টাট্কা পুকুরের মাছ, খেয়ে নাও, কিছু হবে না আমি বলছি।"

মৃগাঙ্কমোহনকে বেশী বলিবার প্রয়োজন হইল না, তিনি আবার খাইয়া চলিলেন।

১০

বিকালবেলা ভগিনীপতিকে সঙ্গে করিয়া মল্লিক-মহাশয় সারা গ্রামখানি ঘুরাইয়া আনিলেন। নিজের জন্মভূমিটি সম্বন্ধে ভদ্রলোকের গর্ব্বের সীমা ছিল না। এ গ্রামখানা যে আশেপাশের আর পাঁচখানা গ্রামের মত অস্বাস্থ্য, মূর্খতা আর দারিদ্র্যের আড়ত নয় তাহা তিনি কাহাকেও বলিতে ছাড়িতেন না। সুবিধা পাইলে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াও দিতেন।

মৃগাঙ্ক ছেলেদের পাঠশালা, মেয়েদের পাঠশালা, মিড্‌ল-ইংলিশ স্কুল, হাসপাতাল সবই দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনারা রাম-রাজত্বে আছেন দাদা। আর আমাদের জমিদার বেটা, ছোঃ! ঠিক যেন কসাই। সাতজন্মে গ্রাম মাড়ায় না। কলকাতায় বসে বদমাইসি ক'রে পয়সা ওড়াচ্ছে বারোটা মাস, আর যত শকুনি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে, কি ক'রে গরীবের গলায় পা দিয়ে আরও দুটো পয়সা বেশী আদায় করবে।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "দেশের বেশীর ভাগ জমিদারই ঐ রকম ভায়া, আমরা কপালগুণে সদাশয় প্রভু পেয়ে গিয়েছি। আমাদের মা-ঠাকুরুণটিও চমৎকার মেয়ে, তাঁর সুপরামর্শেই এতটা উন্নতি হয়েছে। তা চল, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তোমার আবার ঠাণ্ডাটাণ্ডা লেগে যাবে।" দুই জনে ফিরিয়া চলিলেন।

রান্না হইতে তখনও দেরি ছিল, সবে দু-একটা প্রদীপ জ্বালা হইতেছে। মল্লিক-মহাশয় হাত-পা ধুইয়া ঘরে ঢুকিলেন, মৃগাঙ্ককে বলিলেন, "তুমি এমনি জুতো ছেড়ে খাটে উঠে বস, বারে বারে ঠাণ্ডা জলে পা ভিজিয়ে আর কাজ নেই।"

মৃগাঙ্ক তাহাই করিলেন।

মৃণাল আসিয়া ঘরে একটি হারিকেন লণ্ঠন রাখিয়া গেল। মল্লিক-মহাশয়ও বলিলেন, "আজ আর তোমার পড়া হবে না মিনু, জায়গার অভাব।"

মৃণাল সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নাইবা হ'ল? একদিন না পড়লে কিছু এসে যাবে না।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। পড়ার জায়গাও নাই, রান্নাঘরেও মামীমার সাহায্যের প্রয়োজন, বেশী আয়োজন করিতে হইলেই তিনি আর এক হাতে পারিয়া উঠেন না।

সে বাহির হইয়া যাইতেই মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু পড়াশুনায় কেমন?"

তাহার মামা বলিলেন, "পড়ায় ত বেশ ভালই, প্রতিবারেই প্রথম কি দ্বিতীয় হয়। তবে অনেক বয়সে পড়া আরম্ভ করেছে, কাজেই বয়সের আন্দাজে একটু পিছিয়ে আছে। এইবার ত ম্যাট্রিক দেবে।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আর কতদিন পড়াতে পারব তা ত জানি না। কলেজে পড়ানোর খরচ ত অনেক। এই যা দিচ্ছি তাই দিতেই কত হাঙ্গাম যে হয় তা কি বলব? জানেন ত মেয়েমানুষের স্বভাব, অতি স্বার্থপর জাত। ওরও যে কিছু দাবী আছে তা যেন মানতেই চায় না। একেবারে অশিক্ষিতা কি না? কিছু বললেই এক উত্তর— 'বিয়ে দিয়ে দাও না কেন? হিন্দু গেরস্ত ঘরে অত বিবিয়ানার কি দরকার?'"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ভাল বিয়ে যদি দেওয়া যায়, তা আমি ত ভালই বলি। বয়স ত ঢের হ'ল, গিন্নীর সঙ্গে আমারও মাঝে মাঝে এই নিয়ে তর্ক লাগে। উনি আবার বেশী একটু পুরাতনপন্থী কি না? পড়াশুনার প্রয়োজনটাও খুব বেশী যে বোঝেন তা নয়।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ কিছু হাতে আছে নাকি? ক'দিন যে আর বাঁচব, তার ঠিক নেই। আর বাঁচলেও কাজ যে আর অনেক দিন করতে পারব না, তা এক রকম ঠিকই। একটারও অন্ততঃ ভাল ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলে মনে অনেকটা শান্তি পাই।"

মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ের সম্বন্ধ কি আর সেধে আসে ভায়া, অনেক চেষ্টাচরিত্তির ক'রে তবে একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়। রাজারাজড়ার মেয়ে হ'লেও না-হয় কথা ছিল, টাকার লোভে বেটারা ছুটে আসত। আমরা ত টাকাকড়িও কিছু দিতে পারব না। তোমার ত এই অবস্থা। আর আমিও ছা-পোষা মানুষ, দিন-আনি

দিন-খাই, কিছু হাজার-বারো-শ বার ক'রে দিতে পারব না। সম্বলের মধ্যে ত ওর মায়ের ক'খানা গহনা, তাতে আর খুব ভাল বিয়ে কি ক'রে হবে?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "সেটা কি আর না বুঝি দাদা, সেই জন্যেই ত বিয়ের কথা তুলি না। ছোটবেলায় মা গেল, বাপও ওর নামে মাত্র আছে। নেহাৎ তোমাদের স্নেহে যত্নে ও এত বড়টি হয়েছে, না হ'লে অদৃষ্টে ওর অনেক দুঃখ ছিল। তাই ভাবি, পড়ছে পড়ুক, জোর ক'রে যার-তার হাতে দিয়ে দেব না, চিরটাকাল জ্বলে-পুড়ে মরবে। কলকাতায় অনেক মেয়ের ত লেখাপড়ার গুণে ভাল বিয়েও হয়ে যায়, ওরও যদি তেমনই হয় ত ভালই। না হলেও নিজে ক'রে খেতে পারবে ত? দুমুঠো ভাত আর দুখানা কাপড়ের জন্যে ঝাঁটা-লাথি খেয়ে মরতে হবে না।"

কথাগুলা মল্লিক-মহাশয়ের বিশেষ পছন্দ হইল না। গৃহিণীর মত উগ্র সনাতনপন্থী না হইলেও তিনি প্রাচীন প্রথাগুলি মানিয়া চলাই পছন্দ করিতেন। মৃণালের লেখাপড়া শিখিয়া খাটিয়া খাওয়ার চিত্রটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। নিজে স্বয়ম্বরা হইয়া ভাল বিবাহ করার সম্ভাবনাতেও তিনি যে খুব পুলকিত হইলেন তাহা নহে। বলিলেন, "ওসব যাদের সাজে তাদের সাজে ভায়া, ওসব আমাদের ঘরে কেন? আমি বলি কি ম্যাট্রিকটা দিয়ে নিক, তার পর তুমিও যা পার বার কর, আমিও যা পারি বার করি, ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলা যাক্। গিরিজার কাছে চাইলে সেও খুশী হয়েই সাহায্য করবে, মা-মরা বোনঝিটিকে সেও খুবই ভালবাসে। খুব একেবারে রাজাবাদশার ঘরে দিতে পারব না তা জানি, সেরকম দুরাশা রাখিও না। তবে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দুঃখ হবে না এমন ঘর দেখে দেব, ছেলেও যাতে পাজি কি মূর্খ না হয় তাও দেখব। এর বেশী আর গেরস্ত মানুষে কি আশা করতে পারে বল?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "দেখা যাক, এখনও ত মাস-ছয় সময় আছে। তোমাকে গোপনে বলি দাদা, কিছু টাকা আমি ওর বিয়ের জন্যে রেখেছি। অতি সামান্যই যদিও। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের সামর্থ্যই বা কত? কিছু কয়লার খনির শেয়ার ছিল, বাপের আমলের, সেগুলি বেচে শ-চার-পাঁচ টাকা পেয়েছি। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা আছে। গিন্নি লেখাপড়া জানেন না, কাজেই এর খোঁজ আর পান নি। মনে করেছি এ টাকাটা মিনুর জন্যেই দেব, তা তার বিয়েতেই হোক কি কলেজে পড়ানোর জন্যেই হোক। যা পাঁচ জন পরামর্শ ক'রে ভাল বোধ কর।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ঐ বিয়ের পরামর্শই ভাল হে। একটি ভদ্র গেরস্ত-ঘরের ছেলে দেখ তুমি, আমিও দেখি, তার পর ওর পরীক্ষার পর বৈশাখ মাসে শুভকর্ম্মটা হয়ে যাক। এতেই ভাল হবে। একটি ছেলে আমার আঁচে আছে, তুমি দিন-দুই থাক ত দেখাতেও পারি।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আমাকে ত কাল দুপুরের গাড়ীতেই যেতে হবে দাদা, ছেলেমেয়ে নিয়ে একলা রয়েছে কিনা? কেন, সে ছেলেকে কাল সকালে দেখা যায় না?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ছেলেটি মামার বাড়ী গেছে কিনা, ফিরতে দিন-দুই দেরি হবে। ঘর ভাল, আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছে এ বছর। জমিজমা, ঘরদোর আছে।"

এমন সময় টিনি, চিনি একসঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া ওঠায় মল্লিক-মহাশয় ও মৃগাঙ্ক দুই জনেই চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মৃণালও লণ্ঠন-হাতে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক কিছুই নয়, একটা মস্ত বড় তেঁতুলে-বিছা দেয়াল বাহিয়া উঠিতেছে। সেটাকে ঝাঁটা দিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিতেই, আবার পাড়া জুড়াইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রান্নাও হইয়া গেল। মৃণাল রান্নাঘরের ভিতর একটা দিক ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া বড় বড় পিঁড়া পাতিয়া জায়গা করিতে লাগিল। টিনি খাইবার নামেই বিছার ভয় ভুলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, দিদিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, জল গড়িয়ে দেব?"

দিদি কিছু বলিবার আগেই তাহার মা তাড়া দিয়া উঠিলেন, "থাক্, তোমার আর জলের কলসী ছুঁতে হবে না। যা পরিষ্কার কাপড়চোপড়, তেমনি পরিষ্কার হাত-পা। আঁস্তাকুড়ে ত দশবার পা দিয়ে এসেছিস।" টিনি মুখ গোঁজ করিয়া দরজার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

এবেলাও বড় ছোট সকলেই প্রায় একসঙ্গে খাইতে বসিয়া গেল। ছোটরা বিশেষ কিছু খাইতে পারিল না,

দুপুরে বেশী বেলায় গোগ্রাসে গিলিয়া পেট ভার হইয়া ছিল। বড়দের আহার সমান উৎসাহেই চলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "কাল সকালে টক রাঁধবার মাছ রেখে দিলাম ভাই, ভাল ক'রে খেয়ে যেতে হবে।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা খাব বইকি? ট্রেন ত সেই বেলা দেড়টায়, না খেয়ে কি আর যাব?"

গৃহিণী বলিলেন, "এলে ত বারো বছর পরে, তা এক দিনের বেশী দু-দিন থাকতে পার না? ঘরের মানুষটির গুণ আছে বলতে হবে।"

মৃণালের সামনে এহেন রসিকতায় একটু লজ্জিত হইয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "না না, গুণটুনের জন্তে কি আর? অজ পাড়াগাঁ কি না, বিপদআপদ সহজেই হ'তে পারে, তাই একলা ছেলেপিলেসুদ্ধ ফেলে রাখতে বেশী দিন ভরসা হয় না। এই ত সেদিন আমাদেরই বাগানে একটা রাখাল-ছোঁড়াকে কেউটে সাপে কামড়ে দিল। বল্ছি কি, একেবারে ঘোরতর পাড়াগাঁ।"

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐদিকে ভাল আছি ভাই, সাপখোপের উৎপাত এখানে তেমন কিছু নেই। বর্ষাকালে দু-চারটে ঢোঁড়া হেলে যে না বেরোয় তা না, তবে তার বেশী না। জঙ্গলটঙ্গল সব পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই এসব আপদ আর নেই।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "ওদিকে কেন, সকল দিকেই আপনারা ভাল আছেন বউঠাকরুণ। আমাদের গাঁয়ে মানুষ যে বেঁচে থাকে সেই আশ্চর্য্য। অসুখ যত রকম আছে তা ত বারো মাস ঘরের দোরে বাঁধা, আর সাপখোপ, বাঘ, শূয়োর কিছুর অভাব নেই।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "নিজেরা পাঁচ জন ভদ্রলোক মিলেও ত গাঁটাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পার? নিজেদেরও ত তাতে লাভ আছে, শুধু জমিদারের লাভ নয়।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "হঁঃ, তাহলে আর বাঙালী হয়ে জন্মেছে কেন? নিজের উপকার করতে গিয়ে যদি সেই সঙ্গে পাড়া-পড়শীরও উপকার হয়ে যায়, তাহলে সে দুঃখ ত আর রাখবার জায়গা থাকবে না।"

খাওয়া চুকিয়া গেল। মৃণাল চিনি, টিনি, খোকা সকলের হাত মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় বদলাইয়া একেবারে বিছানায় তুলিয়া দিয়া আসিল। মামীমা দুই জনের ভাত বাড়িতে বাড়িতে বলিলেন, "দেখ, আমি বলেছিলাম না? এক কাঁড়ি মাছ নষ্ট হ'ল কি না?"

মৃণাল বলিল, "সত্যি, চিনি-টিনির হাঁকাই আছে খুব, খেতে পারুক আর নাই পারুক। এমনি রেখে দিলে রাধীকে দেওয়া যেত।"

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি করিয়া খাইয়া মৃগাঙ্ক সকাল সকাল বিদায় হইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। ট্রেন পাছে ফেল্ হইয়া যায়, এই ভয়টা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মল্লিক-মহাশয়ও চলিলেন তাঁহাকে তুলিয়া দিতে। ছোক্রা-কুলী এবারেও ব্যাগ এবং হাঁড়ি বহন করিয়া লইয়া চলিল। হাঁড়িতে মল্লিক-গৃহিণী ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীর তৈরি মিঠাই দিয়া দিয়াছেন। প্রিয়বালার সন্তানদের মিষ্টিমুখ করাইবার কোনও রকম ইচ্ছাই তাঁহার নাই, তবু সামাজিক রীতি যাহা তাহা করিতেই হইবে। কোনও রক্তের সম্পর্ক না-থাকিলেও তাহারা নামে ভাগ্নে-ভাগ্নী ত?

যাইতে যাইতে মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা হ'লে ঐ কথা রইল দাদা। গিয়েই আমি টাকাটা তুলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। এখানকার পোষ্ট আপিসে মিনুর নামে রেখে দেবেন। ছেলে আপনিও দেখুন, আমিও দেখি। আমাদের কাছারিতে একটি ছেলে কাজ করে, বেশ বংশ ভাল, কুলীন, তবে লেখাপড়া তেমন জানে না, এই যা খুঁৎ। মেয়ের সঙ্গে সাজন্ত হবে না।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "সব রকমই দেখা যাক্, তার পর যেখানে সুবিধা হয়।"

ষ্টেশনে তাঁহাদের অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল, কারণ মৃগাঙ্কের শত আগ্রহেও ট্রেনখানা এক মিনিটও আগে আসিল না। তাঁহাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া তবে মল্লিক-মহাশয় গৃহে ফিরিলেন। সেদিন দুপুরের খাওয়া সারিতে সকলেরই অনেক বেলা হইয়া গেল। ছোট ছেলেমেয়েরা অবশ্য ঠিক সময়েই খাইতে বসিয়াছিল। তবে টকের মাছ না পাওয়ার দুঃখে তাহাদেরও খাওয়াটা ভাল করিয়া জমিল না। কর্ত্তা খান নাই বলিয়া গৃহিণী না-খাইয়া বসিয়া

রহিলেন এবং মৃণালও কোনও মতেই মামামামীর আগে খাইতে রাজী হইল না।

এক দিনের জন্য দেখা দিয়া গিয়া মৃগাঙ্ক মৃণালের মনটাকে অনেকখানি উতলা করিয়া দিয়া গেলেন। দুই-তিন দিন সে কেমন যেন বিমনা হইয়া রহিল। তাহার কাজে মন বসে না, পড়ায় মন বসে না। মামীমা পাছে তাহার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারেন, এই ভয়ে সে সশঙ্কিত থাকে। যে-বাপ তাহার প্রায় কোন ধারই ধারে না, তাহার জন্য মন খারাপ করিলে মামীমার আইনে দণ্ডনীয় হইবার কথা। এই মানুষটি অতিশয় ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। যাহারা তোমাকে ভালবাসে তাহার জন্য নিজের জীবনপাত করিতে দেখিলেও তিনি কিছু বলিবেন না, কিন্তু যেখানে পাওনা কিছু নাই, সেখানে দেওয়ার নামেই তিনি জ্বলিয়া ওঠেন।

কিন্তু এ ভাবটাও দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী তাহার মনের উপর যে মায়াজাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আবার ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পূজাও আসিয়া পড়িল। বাড়ীতে পূজা না থাকিলেও, আমোদ-আহ্লাদ কিছুরই তাহাদের অভাব হইত না। জমিদার-বাড়ীর পূজা, যাত্রা, কীর্ত্তন সবই যাহাতে গ্রামের ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীই প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারে, সদাশয় জমিদারবাবু সেই ব্যবস্থাই করিতেন। মল্লিক-মহাশয় আবার এ-সব ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী, কাজেই জমিদার-বাড়ীর পূজা এ-বাড়ীর লোকের নিজের ব্যাপারের মতই ছিল। চারি-পাঁচ দিন ত বাড়ীতে রান্নাও চড়িত না, কাহারও দু-দণ্ডের বেশী ঘরে দাঁড়াইবারও অবসর হইত না।

বিজয়ার পর কয়টা দিন আবার একটু অবসাদের মধ্যে কাটে, কিন্তু মৃণাল এবার একেবারে নিজের পড়ার মধ্যে ডুবিয়া গেল। আর অবহেলা করিলে চলে না। বাবার আসা, পূজার আনন্দ প্রভৃতির ছুতায় অনেক দিন ফাঁকি দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

মামীমা তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নে, নে, শেষ পড়া পড়ে নে। পরের বছর এমন সময় আর পড়তে হবে না।"

মৃণালের বুকের ভিতর যেন ঝাঁৎ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মামীমা? শেষ পড়া হ'তে যাবে কেন?"

মামীমা বলিলেন, "এবার যে তোমার বাপে আর মামাতে একজোট হয়েছেন। আমার কথা এতদিন ঠেলে দিত, এবার মৃগাঙ্কের চোখ ফুটেছে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে কি না? মনে করেছিল বোধ হয় যে তুই সেই সাত বছরেরই আছিস।"

মৃণাল বলিল, "হ্যাঁ, তাই নাকি আবার কেউ মনে করে?"

মামীমা বলিলেন, "যাই হোক, ডাগরটি হয়েছিস দেখে তোর বাবার এবার বিয়ে দেবার মত হয়েছে। পরীক্ষার পরই এবার তার জোগাড় করতে হবে। আমি একলা হাতে পেরে উঠলে হয় এখন" বলিয়া তিনি আবার নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

মৃণাল যেন একেবারে বিশবাঁও জলের তলায় চলিয়া গেল। পড়ার দিক হইতে মনটা একেবারে ঘুরিয়া গেল। কেন তাহার উপর এ উৎপাত? বিবাহ কোনদিনও করিবে না এমন কোন সংকল্প তাহার ছিল না, কিন্তু পড়াশুনা ভাল করিয়া করিবার, মানুষ হইবার সংকল্পটা বরাবরই ছিল। এমন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল ছবিখানির উপর কালি মাখাইয়া দিবার বাবার কিইবা দরকার ছিল? বিবাহই যে তাঁহারা কাহার সঙ্গে দিয়া বসিবেন তাই বা কে জানে? মামার উপরই পাত্র-নির্ব্বাচনের ভার পড়িবে নিশ্চয়। তিনি কিছু শহরে ছেলে খুঁজিতে যাইবেন না। এই গ্রামেরই কোন একটা ছেলেকে তাঁহার পছন্দ হইবে। ইহাদের সকলকেই শিশুকাল হইতে মৃণাল দেখিতেছে, কাহাকেও ভাবী পতিরূপে বরণ করিবার সম্ভাবনায় তাহার মনে পুলকের বন্যা বহিয়া গেল না। সকালের পড়াটা সম্পূর্ণ সেদিন মাটিই হইল।

মামীমার ডাকে যখন খাইতে গেল তখনও তাহার মুখ অন্ধকার। মামীমা বলিলেন, "বাবা, এখনও সেই কথাই ভাবছিস না কি রে? মেয়ে বড় ক'রে রাখলেই এই সব বিপদ। আমাদের দশ বছরে ধ'রে বিয়ে দিয়েছে, অত ভাবনাচিন্তা করতে হয় নি। তা এমন কি মন্দ আছি? চিরজন্ম আইবুড়ো থেকে মাষ্টারণীগিরি করতে হ'লেই কি খুব সুখে থাকবি?"

মৃণালের যে জবাবে কিছু বলিবার ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া মামীমার সঙ্গে তর্ক করিতে লজ্জাও করে, আর সব কথা তাঁহাকে বোঝানও যায় না। তাঁহার মত একেবারে কাটাছাঁটা, কিছুতেই তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার, এম্‌-এস্‌সি, এম্‌-এ

অতিদূর অতীতে লক্ষ যুগযুগান্তর পারে, সময়ের দূরত্বের যে কুজ্ঝটিকা ভেদ করিতে আমাদের মানস-নয়নের দৃষ্টিও শক্তিহীন হইয়া পড়ে, যাহার বিশালতায় চিন্তা স্তম্ভিত হয়, কল্পনা ভীত হয়—সেই সুদূর অতীতে এই বিশাল বিশ্বের রূপ কেমন ছিল? পৃথিবী নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, গ্রহ নাই, তারা নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু এখন কল্পনাও করিতে পারি তাহা নাই। শুধু আকাশ আর আকাশ। আর সেই মহাশূন্য ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ পরমাণু-কণা—যে পরমাণুপুঞ্জ হইতে ইহার লক্ষ যুগ পরে জগৎ-চরাচরের সৃষ্টি। আর ভবিষ্যৎ ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপাদান মহাকাশব্যাপী সেই প্রাথমিক পরমাণুপুঞ্জকে আবৃত করিয়া কল্পনাতীত নিবিড় অন্ধকার। কারণ-সলিলসমুদ্র ব্যাপিয়া ব্রহ্মার রাত্রি।
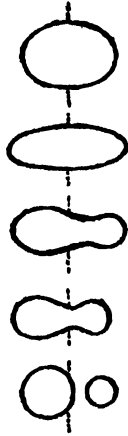
আবর্ত্তনফলে যুগ্মতারার জন্ম

এই পরমাণুগুলি এত দূরে দূরে যে কেহ কাহাকেও আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে না। একের অবস্থা অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সুতরাং সৃষ্টি-প্রভাতের পূর্ব্বে এই ব্রহ্মার রাত্রি কত যুগ ধরিয়া চলিয়াছিল তাহা কে বলিবে? এই সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তীর্ণ পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে সামান্য চঞ্চলতাই—এই কারণ-সমুদ্রে প্রথম বীচিবিক্ষেপই—সৃষ্টি-প্রভাতের প্রথম সূচনা। পরমাণুপুঞ্জের এক অংশের এই চঞ্চলতা হেতু পরমাণুগুলি কোথাও ঈষৎ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়, আবার এই ঘনসন্নিবেশের ফলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপর পরমাণুগুলিকে আকর্ষণ করিয়া আপনাদের দলপুষ্টি করে। ভিন্ন ভিন্ন অংশে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুদল মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। কত যুগ ধরিয়া কত জয়পরাজয়ের ফলে প্রাথমিক পরমাণুপুঞ্জ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পরস্পর হইতে বহু দূরে মহাকাশের বিভিন্ন অংশে বিশাল জড়সমষ্টির উদ্ভব। এইরূপ এক-একটি বিশাল জড়সমষ্টি হইতেই এক-একটি পৃথক জগতের সৃষ্টি। এইরূপ এক-একটি জড়সমষ্টি হইতেই কত শত কোটি সূর্য্যের জন্ম।
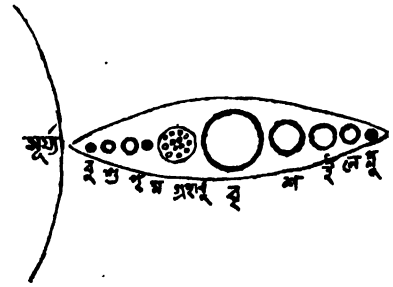
সূর্য্য হইতে গ্রহগণের জন্ম

যেমন অন্ধকার রাত্রিতে প্রান্তরমধ্যে পরস্পর হইতে বহু দূরে দূরে অবস্থিত বৃক্ষসকল খদ্যোতপুঞ্জের আলোয় আলোকিত দেখা যায়, সেইরূপ মহান্ধকার মহাশূন্যের বিভিন্ন অংশে পরস্পর হইতে লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে শত কোটি সূর্য্যসমন্বিত পৃথক পৃথক জগৎ দূরবীক্ষণযোগে শ্বেত মেঘখণ্ডের মত দেখা যায়—যেন অসীম আকাশসমুদ্রে ভাসমান এক-একটি দ্বীপ। ইহাদেরই নাম নীহারিকা।

প্রাথমিক পরমাণুপুঞ্জ হইতে উদ্ভূত পূর্ব্বোক্ত এক-একটি বিশাল জড়সমষ্টি হইতেই এক-একটি নীহারিকার জন্ম।

গণিতশাস্ত্রে জানা যায় যে সমভাবে বিন্যস্ত পরমাণুপুঞ্জ যদি অপর কাহারও দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া আপনি ক্রমশঃ ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে থাকে, তবে তাহার আকার হয় গোলকের মত এবং বরাবর সেইরূপই থাকে। কিন্তু সম্ভবতঃ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত এক-একটি জড়সমষ্টির মধ্যে আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। ঐ জড়সমষ্টি মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ আকারে যত ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে, গণিতশাস্ত্রানুসারে আবর্ত্তনের বেগও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর এই আবর্ত্তনের বেগবৃদ্ধির ফলে ঐ জড়সমষ্টি ততই মেরুপ্রদেশে চাপা ও নিরক্ষপ্রদেশে স্ফীত হইতে থাকে। অবশেষে উহা উভয় দিকে একটি কুব্জপৃষ্ঠ লেন্সের আকার

তারার ক্রমবিকাশ
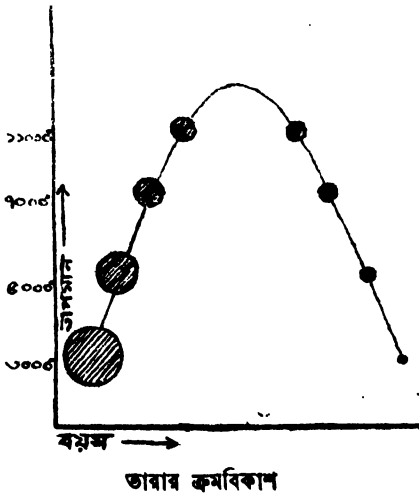
ধারণ করে। আবর্ত্তনের বেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ লেন্সের পরিধিস্থ পরমাণুগুলিকে আর মাধ্যাকর্ষণের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাহারা পরিধি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ও ঐ আবর্ত্তনশীল জড়সমষ্টির চারি দিকে ঘুরিতে থাকে এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে উজ্জ্বল নীহারিকাকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ কটিবন্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অধুনাবিষ্কৃত বিংশ লক্ষ নীহারিকার মধ্যে গোলকাকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব পর্য্যায়ের নীহারিকারই বহুল দৃষ্টান্ত লক্ষ্যগোচর হয়। এই আবর্ত্তনের বেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লেন্সের পরিধির বিপরীত অংশ হইতে দুইটি শাখা নির্গত হইয়া উভয়েই বামাবর্ত্তে বা উভয়েই দক্ষিণাবর্ত্তে মূল নীহারিকাকে কিছুদূর বেড়িয়া থাকে। ইহাদের নাম কুণ্ডলিত নীহারিকা (spiral nebula)।

ঐ কুণ্ডলিত শাখার অন্তর্গত জড়সমষ্টিও মাধ্যাকর্ষণের জন্য ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতে থাকে ও স্থানে স্থানে অধিক ঘনীভূত হয়। ঐ কচিচ্ছিন্ন কচিদ্‌ভিন্ন শাখার অংশগুলিতেও মূল নীহারিকার আবর্ত্তন সংক্রমিত হয়। এক-একটি বিশাল অংশ হয়ত মূল নীহারিকার ন্যায়ই শাখা বিস্তার করিয়া মাধ্যাকর্ষণ ও আবর্ত্তনের ফলে সহস্র ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ড উৎপাদন করে। এই সকল ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ডই এক-একটি নবজাত সূর্য্য বা তারা। আকাশের স্থানে স্থানে এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট তারকার গোলাকার পুঞ্জ (globular clusters) দূরবীক্ষণযোগে দেখা যায়। নীহারিকাশাখার কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্রতর অংশ জমাট বাঁধিয়া পৃথক পৃথক তারকারও সৃষ্টি করিতে পারে। নীহারিকাসকলের মধ্যে ক্রমবিকাশের

আমাদের নক্ষত্রজগৎ—মধ্যচ্ছেদ

সকল অবস্থাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কোনটিতে তারাগুলি এখনও জমাট বাঁধে নাই, কোথাও বা ঈষৎ জমাট বাঁধিয়াছে, কোথাও বা তারকাসৃষ্টির কার্য্য একবারে শেষ হইয়াছে।

এক-একটি নীহারিকা এক-একটি বৃহৎ তারকা-পরিবার বা এক-একটি জগৎ (island universe)। এক এক পরিবারের জনসংখ্যা ন্যূনাধিক শতকোটি তারকা। এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বিংশ লক্ষ পরিবারের একটির বাসস্থান হইতে তাহার প্রতিবেশীর বাসস্থানের দূরত্ব (এক জগৎ হইতে অপর জগতের দূরত্ব) গড়ে বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ, অর্থাৎ আলোকরশ্মি প্রতি-সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছেয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে লইবে বিশ লক্ষ বৎসর। এক কথায় এই পথ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দীর্ঘ। আমরা যেমন আমাদের বাসস্থান আমাদের

এই নাক্ষত্র-জগৎ হইতে অপরগুলিকে নীহারিকারূপে দেখি, ঐ সুদূর নীহারিকার কোন তারকার চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ কোন গ্রহের কোন জ্যোতির্ব্বিদও দূরবীক্ষণযোগে আমাদের জগৎকেও একটি নীহারিকারূপেই দেখিবে। যে তারকা-পরিবার আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী তাহার দূরত্ব সাড়ে আট লক্ষ আলোকবর্ষ। আর একটি নিকট প্রতিবেশীর নাম এন্‌ড্রোমেডা নীহারিকা। তাহার ভার তিন শত পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের সমান ও এখান হইতে দূরত্ব নয় লক্ষ আলোকবর্ষ অর্থাৎ প্রায় বাহান্ন হাজার কোটি কোটি মাইল। ইহা এক কোটি নব্বই লক্ষ বৎসরে একবার আবর্ত্তিত হইতেছে।

এখন আমাদের নিজেদের জগৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য, রাত্রিতে আমরা যে তারাগুলি দেখি তাহার প্রত্যেকটিই এক-একটি সূর্য্য, আর যদি আমরা আমাদের সূর্য্য হইতে যথেষ্ট দূরে যাইতে পারিতাম সেখান হইতে আমাদের সূর্য্যকেও একটি তারার মতই দেখিতাম। সমস্ত আকাশে শুধু চোখে ছয় হাজারের বেশী তারা দেখা না গেলেও, দূরবীক্ষণ-সাহায্যে আমাদের জগতের তারকা-সংখ্যা অনেক সহস্র কোটি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের নিকটতম তারকা প্রক্সিমা সেণ্টরির দূরত্ব প্রায় সওয়া চার আলোকবর্ষ অর্থাৎ পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। ইহা হইতেই কতক বুঝিতে পারা যায় এক তারকা হইতে অপর তারকার দূরত্ব কি বিশাল। এইরূপ দূরে দূরে সন্নিবিষ্ট কত সহস্র কোটি তারকাসমন্বিত আমাদের জগতের আকার একটি লেন্সের মত। লেন্সের পরিধি বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রধান তারকাপুঞ্জ হইতে কিছু দূরে অগণ্য তারকারাজি বলয়াকারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগকেই আমরা ছায়াপথ আকারে দেখিতে পাই। ইহার ব্যাসের বিস্তার আড়াই লক্ষ আলোকবর্ষ। আমাদের সূর্য্যের স্থান ঠিক ইহার কেন্দ্রে নহে, তথা হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এই লেন্সকে মাঝামাঝি কাটিয়া দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার খণ্ড করিলে তারকা-সন্নিবেশ যেরূপ দেখায় তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল। ছায়াপথ বোধ হয় কুণ্ডলিত নীহারিকার শাখার মতই মধ্যবর্ত্তী তারকাপুঞ্জকে বেড়িয়া আছে। পর্য্যবেক্ষণ
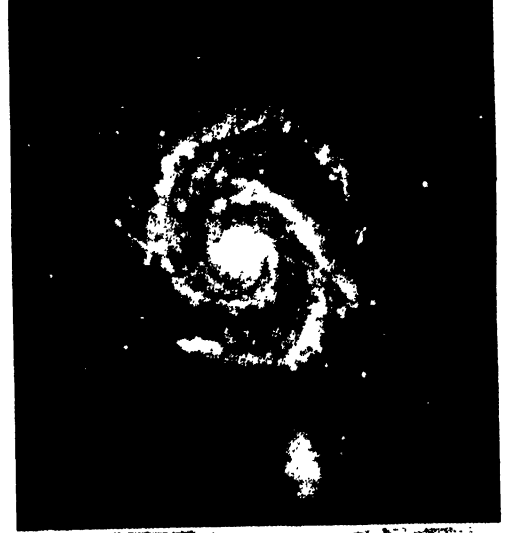
উপরে: কুণ্ডলিত নীহারিকা—"আবর্ত্ত নীহারিকা"।
নীচে: তারকার গোলাকার পুঞ্জ—"ওমেগা সেণ্টরি"।

ও গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অপরাপর নীহারিকার মত আমাদের নাক্ষত্র-জগৎও স্বীয় অক্ষের চারি দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। এই আবর্ত্তন একবার সম্পূর্ণ হইতে লাগে ত্রিশ কোটি বৎসর।

তারকাগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত, স্বীয় আবর্ত্তনের বেগে দ্বিধাবিভক্ত যুগ্মতারা। দ্বিতীয়ত, আমাদের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহবেষ্টিত তারকা। তৃতীয়ত, নিঃসঙ্গ তারকা।

এনড্রোমেডা নীহারিকা

প্রথম শ্রেণীর তারকার মধ্যদেশ আবর্ত্তনের বেগে ঈষৎ অবনমিত হয় এবং ঐ বেগ আরও বর্দ্ধিত হইলে মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থানটি সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকে। অবশেষে সে-বন্ধনও ছিন্ন হইয়া যায় এবং ঐ দুই অংশ পৃথক তারকারূপে সম্মিলিত ভারকেন্দ্রের চারি দিকে আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতে থাকে। আকাশে এরূপ যুগ্মতারার সংখ্যা খুব কম নহে। আবার এক পরিবারভুক্ত তিন বা চারিটি তারাও দেখা যায়। যুগ্মতারার এক-একটি ভাঙিয়া আবার যুগ্মতারার উদ্ভব হইতেই যে তাহাদের জন্ম এরূপ অনুমান করা যায়।

যুগ্মতারার বা এক পরিবারভুক্ত তিন-চারিটি তারার মধ্যে গুরুত্বের অধিক তারতম্য দেখা যায় না। সূর্য্যের তুলনায় গ্রহগুলি স্বল্পভার। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সূর্য্য হইতে সৌরপরিবারের উদ্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর তারকা বা আমাদের সূর্য্য হইতে বুধাদি গ্রহের জন্ম কেমন করিয়া হইল এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন, "যে উপায়ে নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তারকার জন্ম, সেই উপায়েই তারকার আবর্ত্তনে গ্রহের সৃষ্টি হইবে না কেন?" প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত ফরাসী গণিতবৎ লাপ্লাসের নীহারিকাবাদে গ্রহসৃষ্টির এই যুক্তিই দেখান হইয়াছে। সর্ জেমস্ জীনস্ গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, লাপ্লাসের গণিত সম্পূর্ণ নির্ভুল হইলেও সূর্য্যের মত এরূপ স্বল্পভার জড়ের সম্বন্ধে তাহা খাটে না; সেই গণিত প্রয়োগ করিবার জন্য আবশ্যক শত কোটি সূর্য্যের ভারযুক্ত নীহারিকা।

সূর্য্যের ব্যাস প্রায় নয় লক্ষ মাইল। আর যদিও এক-একটি তারকা এক-একটি সূর্য্য এবং আকারে ন্যূনাধিক সূর্য্যের মতই, তথাপি তারা সকল পরস্পর হইতে এত দূরে অবস্থিত যে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া বহু সহস্র কোটি তারা, যাহার যেদিকে ইচ্ছা ছুটিতে থাকিলেও তাহাদের সংঘর্ষের এমন কি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যদি ত্রিশটি ক্রিকেট-বল ইতস্ততবিক্ষিপ্ত থাকে তাহা হইলে তাহারা আকারে ও দূরত্বে তারকাগণেরই অনুরূপ। এইরূপ ক্রিকেটবলের মধ্যে দুইটির সংঘর্ষের সম্ভাবনা কত দূর? যদিও আমাদের নক্ষত্র-জগতের আকাশপথের পথিকসংখ্যা কত সহস্রকোটি, তথাপি ভিড় এত কম যে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেই হয়। অবশ্য একবারে যে সম্ভাবনা নাই তাহা নহে। হয়ত কোটির মধ্যে একের কপালে ইহা ঘটে। প্রায় দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সূর্য্যের ভাগ্যে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সূর্য্যের পক্ষে দুর্ঘটনা বটে, কিন্তু সুদূর অতীতের এই দুর্ঘটনার ফলেই আজ আমরা এই বিজ্ঞানালোচনায় যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছি। যাহা হউক, অতীতে এক বিশাল সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের যথেষ্ট নিকট-বর্ত্তী হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে এবং সেই স্ফীতি যেমন সমুদ্রবক্ষে সঞ্চরমান হয়, এই দুই সূর্য্যের পরস্পর আকর্ষণে সেইরূপ সূর্য্যপৃষ্ঠে বিশাল সঞ্চরমান পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। উভয় সূর্য্য আরও নিকটবর্ত্তী হইলে, আকর্ষণ আরও প্রবল হইলে, ঐ পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ড সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইল ও সূর্য্যের চারি দিকে আবর্ত্তন করিতে লাগিল। এই স্থূলমধ্য সূক্ষ্মাগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড আবার সেই মাধ্যাকর্ষণের ফলে সঙ্কুচিত হইয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সূর্য্যকে একই দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই আবর্ত্তন জন্য নিজ নিজ অক্ষের চারি দিকে এক অভিমুখেই আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

এই এক-এক অংশই এক-একটি গ্রহ। গ্রহগণ যথাক্রমে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids), বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্লুটো।

এখন যেমন এক সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহগণ সুনিয়ন্ত্রিত পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, যখন দুই সূর্য্য নিকটবর্ত্তী ছিল, নবজাত গ্রহগণ সেরূপ করিত না। কোন গ্রহ হয়ত কখন সূর্য্যের অতি নিকটে গিয়া পড়িয়াছিল। আর দূরাকাশ হইতে আগত সূর্য্যের আকর্ষণে আমাদের সূর্য্য হইতে যেমন করিয়া গ্রহের জন্ম হইয়াছিল, আমাদের সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহ হইতে সেইরূপে উপগ্রহের বা চন্দ্রের সৃষ্টি হইল। উপগ্রহগণ নিজ অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে আপন আপন গ্রহের চতুর্দ্দিকে একই অভিমুখে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। বুধ ও শুক্রের চন্দ্র নাই, পৃথিবীর এক চন্দ্র, মঙ্গলের দুই, বৃহস্পতির নয়, শনির নয়, ইউরেনাসের চার, এবং নেপচুনের একটি চন্দ্র। প্লুটোর চন্দ্র আছে কি না জানা যায় নাই। আকাশ-পথে ভ্রাম্যমাণ দুই সূর্য্যের পরস্পর-সাক্ষাতের সম্ভাবনা খুবই অল্প, সুতরাং গ্রহ-উপগ্রহ-বেষ্টিত তারকার সংখ্যা খুব বেশী নহে।

যে-সকল তারকা স্বীয় ঘূর্ণনবেগে দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হয় নাই বা যাহা হইতে দূরাগত তারকার প্রভাবে গ্রহের উৎপত্তি হয় নাই তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নিঃসঙ্গ তারকা।

সাধারণতঃ তারা সকল এত দূরে যে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অল্পই, তবে তাহারাও যে সূর্য্যের মত তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশির ভিতর দিয়া আমরা যেমন কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, সূর্য্যের ভিতরও তেমনই কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকি। একবারে বাহিরের আবরণ সৌর কিরীটমণ্ডল (corona) সর্ব্বগ্রাস গ্রহণের সময় আলোকচ্ছটারূপে দেখা যায়। ইহা যারপরনাই লঘু। ইহাতে আমাদের দৃষ্টি আদৌ বাধা পায় না। তাহার নিম্নস্থ আবরণের নাম বর্ণমণ্ডল (chromosphere)। ইহাও লঘু মেঘরাশির মতই সূর্য্যকে ঘিরিয়া আছে। পৃথিবী বেষ্টন করিয়া যে বায়ুসমুদ্র রহিয়াছে তাহা যেমন প্রবল ঝটিকার আলোড়নে আলোড়িত হইতে দেখি, সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলেও সেইরূপ প্রবল ঝটিকার আলোড়ন, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে বর্ণমণ্ডল হইতে সৌর মেঘরাশি প্রবল অগ্নিশিখারূপে সূর্য্যপৃষ্ঠ ছাড়িয়াও লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত উঠিতে ও অগ্নিশিখার মতই ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বর্ণমণ্ডলের নীচেই সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ। ইহার নাম আলোকমণ্ডল (photosphere)।

নীহারিকার ক্রমবিকাশ [মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির]
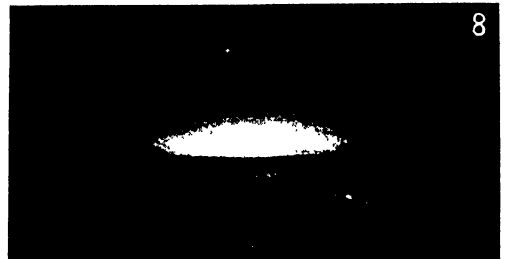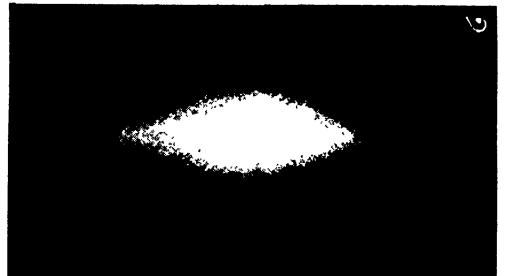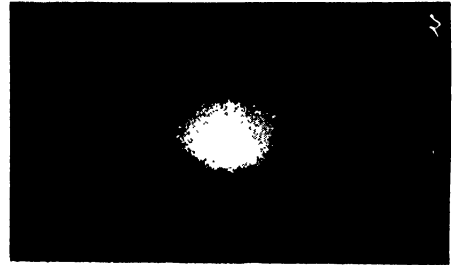
ইহা হইতেই সূর্য্যকিরণরাশি বিকীর্ণ হইয়া বর্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সূর্য্য ও তারকাগণ কত যুগযুগান্তর ধরিয়া যে অজস্র কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে তাহার উৎস কোথায়? সূর্য্য-কিরণেরও ওজন আছে। প্রতি দিনে কিরণ দানের জন্য সূর্য্যের ওজন ছত্রিশ হাজার কোটি টন করিয়া হ্রাস পাইতেছে।
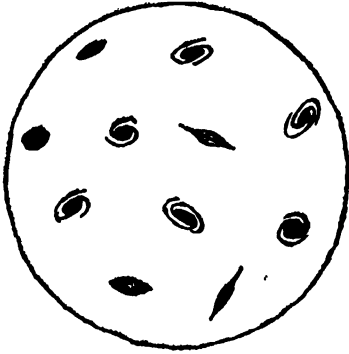
পৃথক পৃথক নক্ষত্রজগৎ

[Island universes]

সূর্য্যের অভ্যন্তরভাগে প্রতি দিনে ঐ পরিমাণ জড়-পরমাণু ধ্বংস হওয়ায় পরমাণুমধ্যস্থ শক্তিই তাপ ও আলোক-রূপে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। লৌহখণ্ড যেমন ক্রমশঃ অধিক উত্তপ্ত হইতে থাকিলে যথাক্রমে রক্তবর্ণ, জরদ, হরিদ্রাভ ও শেষে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, তারকাগণের বর্ণও তেমনই তাহাদের বাহিরের তাপমানের উপর নির্ভর করে। নবজাত তারকা বিশালকায়, প্রভূত ভারসম্পন্ন, লঘু উপাদানে গঠিত ও রক্তবর্ণ। উহার বহিরাবরণের তাপ তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্। ইহাদের আকার কি বিশাল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদি সূর্য্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বৃশ্চিক রাশিস্থ জ্যেষ্ঠা (antares) তারকার আকার ধারণ করিত, তবে উহা মঙ্গলগ্রহের কক্ষও ছাড়াইয়া যাইত অর্থাৎ বুধ শুক্র পৃথিবী ও মঙ্গল ইহার অভ্যন্তরভাগে স্থান লাভ করিত। জ্যেষ্ঠার ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল।

শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সারা জীবন ধরিয়া তারকা-গণের আকার ভার ও স্বকীয় উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং উপাদানের ঘনত্ব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবনের প্রথমাংশে তারাসকলের বাহিরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ইহা যৎপরোনাস্তি অমিতব্যয়িতার সহিত আলোক ও তাপ বিতরণ করিতে থাকে বটে, কিন্তু জীবনের অপরাহ্ণে তারকার বাহিরের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ইহারা আলোক ও উত্তাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মিতব্যয়ী হইয়া উঠে। বাহিরের তাপ অনুযায়ী বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হয়।

অবস্থা	বর্ণ	বাহিরের তাপ (ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড)	উদাহরণ
শৈশব	লোহিত	৩০০০	আর্দ্রা (Betelgeux)
			জ্যেষ্ঠা (Antares)
বাল্য	জরদ	৫	ব্রহ্মহৃদয় (Capolla)
কৈশোর	হরিদ্রাভ	৭০	প্রভাস (Procyon)
যৌবনারম্ভ	শ্বেত	১১০	লুব্ধক (Sirius)
পূর্ণযৌবন	নীলাভশ্বেত	২৩০	(এমন কি ২৮০০০ পর্য্যন্ত)
প্রৌঢ়ত্ব	হরিদ্রাভ	৭০০	
বার্দ্ধক্যারম্ভ	জরদ	৫০০	
বার্দ্ধক্য	লোহিত		

এখন তিনটি তারকার কথা বিবেচনা করা যাউক।

শ্বেতবর্ণ তরুণ আলগোল, বাহিরের তাপ বার হাজার ডিগ্রি।

হরিদ্রাভ প্রৌঢ় সূর্য্য, বাহিরের তাপ ছয় হাজার ডিগ্রি।

লোহিতবর্ণ বৃদ্ধ Kruger 60, বাহিরের তাপ তিন হাজার ডিগ্রি।

আলগোল তারকার ভার সূর্য্যের ভারের চারি গুণেরও অধিক, এবং Kruger 60 তারকার ভার সূর্য্যের ভারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তারকার ক্রমবিকাশের অর্থ এই যে উপরিউক্ত তারকাগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট তারকার বিভিন্ন বয়সের প্রতিরূপ। নতুবা মানবের পক্ষে তারার ক্রমবিকাশ দেখিবার চেষ্টা কয়েক মুহূর্ত্ত পরমায়ুশালী কোনও বুদ্ধিমান জীবাণুর পক্ষে মানবজীবনের ক্রমবিকাশ দেখিবার প্রয়াসের মতই হাস্যকর। সূর্য্য পাঁচ লক্ষ কোটি বৎসর পূর্ব্বে আল-গোলের মতই ভারসম্পন্ন ছিল। আলগোল অপেক্ষা বৃহত্তর তারকা এরূপ দ্রুত শরীর ক্ষয় করিতে থাকে যে সূর্য্যকে আলগোল তারকা অপেক্ষা যত অধিক ভারসম্পন্ন অবস্থা হইতেই জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে ধরা যাউক না কেন,

সূর্য্যের বয়স পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার কোটি বৎসর অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না।

আমাদের সমস্ত নাক্ষত্র-জগতের বয়সের হিসাবও জ্যোতির্ব্বিদগণ সম্পূর্ণ অন্য উপায়ে নির্ণয় করিয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ অণুসকল যেমন ঘাত-প্রতিঘাতে শক্তি আদান-প্রদান করিতে করিতে ক্রমশঃ একই রূপ শক্তিবিশিষ্ট হইবার চেষ্টা করে তারাসকলও সেইরূপ করিতেছে। এই উপায়ে নির্ণীত তারাসকলের বয়স পাঁচ লক্ষ কোটি হইতে দশ লক্ষ কোটি বৎসরের মধ্যে। ইহা সূর্য্যের পূর্ব্বনির্ণীত বয়সেরই সমর্থন করে। সুতরাং পাঁচ হইতে দশ লক্ষ কোটি বৎসর পূর্ব্বে আবর্ত্তনশীল নীহারিকা হইতে আমাদের জগতের তারাসকল সৃষ্ট হয়। আমাদের জগতের জড়রাশি ইহার পূর্ব্বে নীহারিকা অবস্থায় কত দিন ছিল তাহারও অত্যন্ত স্থূল হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। এন্‌ড্রোমেডা নীহারিকার উজ্জ্বলতা ও ভার হইতে গণনা করা যায় যে প্রায় আশী লক্ষ কোটি বৎসর ইহা তেজ বিকীর্ণ করিতে করিতে নিঃশেষ হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমাদের জগতের নীহারিকা অবস্থার বয়স তারকাসমূহের বয়স অপেক্ষা বেশী হইলেও উহার সহিত তুলনীয়।

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের এক শত ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীক্ষণযোগে যে বিশ লক্ষ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে দূরতম নীহারিকা মিথুন রাশিতে অবস্থিত ও ইহার দূরত্ব পনর কোটি আলোকবর্ষ। সুতরাং যে-আলোকে আমরা তাহাকে দেখি তাহা পনর কোটি বৎসর পূর্ব্বে সাতাশি লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূর হইতে যাত্রা করিয়াছিল। বর্ণবিশ্লেষণ-যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও গণনার সাহায্যে আবিষ্কৃত এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ঐ অতিদূরস্থ নীহারিকা বা নাক্ষত্র-জগৎ মহাশূন্যের মধ্য দিয়া সেকেণ্ডে পনর হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া পলাইতেছে! যে নীহারিকার দূরত্ব যত বেশী তাহার বেগও তত অধিক। নিকটবর্ত্তী নীহারিকাদের বেগ সেকেণ্ডে কয়েক শত মাইল। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে নীহারিকাসকল আমাদের নিকট হইতে যত দূরে যাইতেছে ততই প্রবৃদ্ধবেগ হইতেছে। তৃণখণ্ডের গতি দেখিয়া যেমন আমরা জলের প্রবাহ উপলব্ধি করি, সেইরূপ নীহারিকাসকলের গতি দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবর্দ্ধনশীলতা উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর যেরূপ কোনও সীমা না থাকিলেও পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমিত, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সীমাহীন হইলেও তাহা যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার ঘনফল পরিমিত, অসীম নহে। নীহারিকা-গণের গতি হইতে নির্ণীত হইয়াছে যে এক শত চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ বর্ত্তমান পরিমাণের অর্দ্ধেক ছিল। দুই শত আশী কোটি বৎসর পূর্ব্বে এক-চতুর্থাংশ ছিল। এইরূপে কিন্তু বরাবর হিসাব চলে না। গণিতানুসারে দশ হাজার কোটি বৎসর অপেক্ষা বেশী সময় ধরিয়া ব্রহ্মাণ্ড বাড়িতেছে না। Lemaitre-এর মতে আদিতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জড়পদার্থ একত্র জমাট বাঁধিয়া ডিম্বাকারে ছিল। আপেক্ষিকতাবাদিগণ বলেন, ব্রহ্মাণ্ড বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বহু যুগ ধরিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। আর ইহাই যদি মানিয়া লওয়া যায় তবে পূর্ব্বে কতবার ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইয়াছে তাহাই বা কে বলিবে?

যদি অতীতের মধ্য দিয়া আরও পিছাইয়া যাই ক্রমে সৃষ্টির আদিতে পৌঁছাইব কি? যদি জড় অনাদি না-হয় তবে কত কাল পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল? একটা অস্পষ্ট উত্তর নিম্নলিখিত উপায়ে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের যে-অংশ আমরা জানি (অর্থাৎ চারি দিকে পনর কোটি আলোকবর্ষ পর্য্যন্ত স্থান) তাহার প্রতি ঘনইঞ্চিতে গড়ে কত পরিমাণ জড় আছে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। যদি ধরা যায়, ব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্ট অংশেও গড়ে জড়রাশি ঐ ভাবে ছড়াইয়া আছে তবে ব্রহ্মাণ্ডের জড়-পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। যদি এই সমস্ত জড়জগৎ ধ্বংস হইয়া তেজে রূপান্তরিত হয় তবে তাহার ফলে আকাশে যে-পরিমাণ তাপাধিক্য হয় তাহাতে পৃথিবীপৃষ্ঠের উত্তাপ এক ডিগ্রির ছয় হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত তাপ বিকীর্ণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের জড়রাশি ক্ষয় পাইতেছে। অর্থাৎ যত অতীতে যাওয়া যায় ব্রহ্মাণ্ডের জড়পিণ্ড-পরিমাণ ততই অধিক দেখি। ইহার কি কোনও শেষ নাই? মনে করা যাউক্, এক সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের জড়পিণ্ড বর্ত্তমানের তুলনায় দশ লক্ষ গুণ বেশী ছিল। ইহার ধ্বংস হইতে যে উত্তাপ জন্মে তাহাতে

পৃথিবীর তাপ এক শত ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ বাড়িত অর্থাৎ সেই উত্তাপে সমুদ্র হ্রদ নদী প্রভৃতি বাষ্পে পরিণত হইত। সুতরাং কোন কালেই ব্রহ্মাণ্ডের জড়পিণ্ড দশ লক্ষ গুণ ছিল না। জড়-পরিমাণের একটা উর্দ্ধ সীমা এইরূপে নির্ণয় করা যায়। তাহা হইতে জানা যায় স্থূলতঃ দুই কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে জড়ের প্রথম আবির্ভাব।

এখন আবার আমাদের পৃথিবীতে আসা যাউক্। দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে বাষ্পময় সূর্য্য হইতে বাষ্পময় পৃথিবীর জন্ম। পরে তরল পৃথিবী ক্রমশঃ জমাট বাঁধিল। পৃথিবীপৃষ্ঠের সে প্রাচীনতম প্রস্তরের বয়স এক শত বিশ কোটি বৎসর। ক্রমে ক্রমে নানা যুগে নানা জীবের বিকাশ হইল। প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে জীবের প্রথম আবির্ভাব। শেষে আসিল মানুষ মাত্র তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। পৃথিবীতে প্রথম জীবের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল তাহা মহাসমস্যা, কিন্তু এ প্রবন্ধের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই। কিন্তু জগৎসৃষ্টি-কথায় আর একটি কথা আসিয়া পড়ে তাহা এই—ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও অংশে কি জীবের বাস আছে? সম্ভাবনা খুবই কম। নীহারিকায় নাই, তারকায় নাই। কেবল তারকা-প্রদক্ষিণকারী গ্রহই জীববাসের উপযোগী। কিন্তু এমন কি লক্ষ কোটি বৎসর জীবন যাপন করার পরও তারকার গ্রহবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা লক্ষের মধ্যে এক। আবার সব গ্রহই জীববাসের উপযোগী নয়। জল বুধে বাষ্পাকার, নেপচুনে কঠিন তুষার। আবার কোথাও কোন গ্রহ এমন তেজোবিকীরণক্ষম পদার্থে নির্ম্মিত হইতে পারে যাহাতে জীবের বাস সম্ভব নয়। জীববাসের জন্য চাই—পৃথিবীর মত গ্রহ, যাহা বিশ্বের দগ্ধাবশেষ তাপহীন ভস্মরাশি মাত্র। এতগুলি সম্ভাবনার একত্র সমাবেশ প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। আর ইহাদের সমাবেশ হইলেই কি জীব দেখা দিবে? জড় হইতে চেতনের উদ্ভব কি অনুকূল পারিপার্শ্বিকের ফলে স্বতঃই হইয়াছে অথবা আবার কতকগুলি ব্যাপারের হঠাৎ সমাবেশে জীবের উৎপত্তি? জীববিদ্যাবিৎ এ-বিষয়ে নিরুত্তর।

ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রত্ব কল্পনা করা দুঃসাধ্য। প্রায় ছয় শত কোটি মাইল পরিধিবিশিষ্ট পৃথিবীকক্ষকে যদি একটি সরিষার কণার পরিধিরূপে কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সূর্য্য হইবে এক অতি-সূক্ষ্ম ধূলিকণা, আর পৃথিবীর আকার এমন ক্ষুদ্র হইবে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যেও ইহা দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই অনুপাতে ছায়াপথের আকার একটা মহাদেশের মত। আর বিংশ লক্ষ নীহারিকাসমন্বিত আমাদের পরিচিত জগতের বিস্তার চল্লিশ লক্ষ মাইল। বলা বাহুল্য, ইহা ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অপর পক্ষে পৃথিবী সূক্ষ্ম ধূলিকণারও তের লক্ষ ভাগের এক ভাগ!

এখন শেষ প্রশ্ন এই—জীবের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ কি? কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া জীবলেশশূন্য কত কোটি নীহারিকা কত কোটি কোটি তারকা আপন আপন জড় শরীরকে ধ্বংস করিয়া মহাশূন্যে আলো ও উত্তাপ দিয়াছে। সে কি শুধু বিশ্বের কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নিভৃত কোণে বিশ্বের এই চরম পরিণতি জীবের সৃষ্টির জন্য? অথবা প্রকৃতির অপর কোনও মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে জীবসৃষ্টি নিতান্তই একটা আকস্মিক ও তুচ্ছ ঘটনা? কিংবা

> অতঃ মনঃ কল্পিত এব পুংসঃ
> সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি।

– এ সকলই পুরুষের মনঃকল্পিত, বস্তুতঃ ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই।

> সর্ব্বমেতৎ মনসঃ বিজৃম্ভনং

– এ সকলই বিমনের চিন্তা মাত্র?
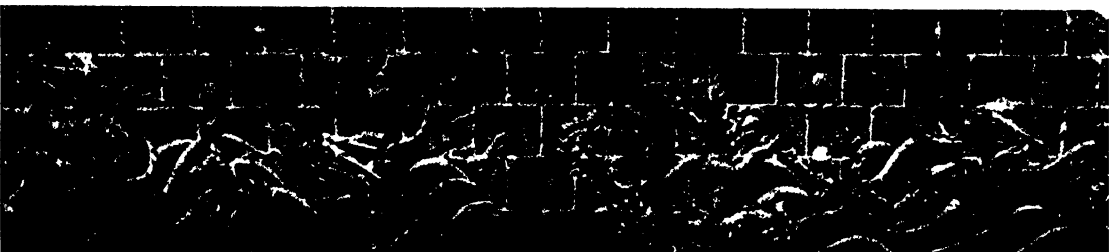
মা-মিয়া-সোয়ে

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

মা-মিয়া-সোয়ে প্রতি সপ্তাহের শেষে প্রায় আধ মাইল পথ হাটিয়া নদীতীরে জাহাজঘাটে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া দাঁড়ায়। জাহাজের বাঁশীর জলদ-গম্ভীর নিনাদ তাহার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া কি যে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া যায়, সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না। বি. আই. এস. এন্ কোম্পানীর সমুদ্রগামী তিন-চার তলা ভাসমান বিরাট্ অট্টালিকাগুলি কত দেশ-বিদেশ হইতে কত রকম-বেরকমের পোষাক-পরা, কত বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষগুলিকে বহন করিয়া আনে! তাহাদের অবোধ্য, অস্পষ্ট কলরব তাহার কানে এবং প্রাণে আনন্দের হিল্লোল তোলে। সেই মানুষগুলি যখন ছুটাছুটি করিয়া তাহাদের মালপত্র টানাটানি করিয়া নামাইয়া ট্যাক্সি, বাস্, গাড়ী, লাঞ্চা (রিক্শ) প্রভৃতি বিভিন্ন যানে চড়িয়া যে যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, তখন মা-মিয়া-সোয়ের অপলক দৃষ্টি একবার জাহাজখানির দিকে ফেরে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে বলে, "এত লোকের স্থান হয় তোমার মধ্যে, আর আমার মত ক্ষুদ্র জীবটিকে তুমি একটিবারও তোমার কোলে জায়গা দিতে পার না?"

মা-মিয়া-সোয়ে ক্যাণ্ডোয়ে দ্বীপের অধিবাসিনী। তাহার পূর্ব্বপুরুষের আদি জন্মস্থান বোধ হয় এই দ্বীপেই ছিল। মা-মিয়া-সোয়ে জানে, তাহার মাতামহ আজীবন ধানের চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছেন। আজও তাহার মা তিন-চার শত বিঘা জমির উত্তরাধিকারিণী, অধিকন্তু তামাকের চাষ-আবাদ করিয়া তাহার মা ড-খিন্-মিন্ যথেষ্ট আয়বৃদ্ধিও করিয়াছেন। অর্থের অনটন ছিল না তাহাদের, কারণ নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করে নাই তাহারা।

প্রকাণ্ড খোলা মাঠের মাঝখানে ধানি-পাতার ছাউনি-দেওয়া বাঁশ ও কাঠের তৈরি ঘরখানি। জমি হইতে কয়েক ফুট উঁচু, মাচাঙের মত ঘর। মেঝেটি পরিষ্কার পালিশ-করা তক্তা দিয়া তৈয়ারী, রং-করা বাঁশের চাটাইয়ের দেওয়ালগুলিতে হাতে-আঁকা কয়েকখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য কাচের ফ্রেমে ঝোলানো আছে। ঘরের এক কোণে উঁচু একটি প্রশস্ত তাকে সোনালী রঙের বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে তাজা সুগন্ধি ফুলের আধার, সরু সরু মোমবাতির সারি জ্বালান রহিয়াছে। ঘরখানিতে আসবাবের বাহুল্য নাই। দুই-চারিটি মোড়া ও জলচৌকি বারাণ্ডায় সাজান আছে। বৃহৎ ঘরখানির মাঝখানে মোটা বেতের তৈয়ারী একখানি পাটি বিছানো, একটি পানের বাটা ও একটি পিক্‌দানি পাটির মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে।

ড-খিন্-মিন্ বাপমায়ের আদুরে মেয়ে ছিলেন। বর্মী প্রথানুযায়ী বিবাহের পরেও পিতার ঘরেই বাস করিতেছেন। স্বামী মঙ্-লা-মঙ্ স্থানীয় সরকারী স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া দুই বৎসর রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটী-কলেজে পড়িয়াছিলেন। দুই বৎসর বাপের অজস্র টাকা উড়াইয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া কৃষক-পিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর বিরাগভাজন হইয়া পুত্রকে কলেজ ছাড়াইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। প্রতিবেশী বন্ধু-কন্যা ড-খিন-মিনের সহিত বিবাহ দিয়া আশা করিয়াছিলেন স্ত্রীধনের রক্ষক ও অভিভাবক রূপে তাহার দিন ভালই কাটিবে। কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপকারিতা তাহার জীবনে কোন সুফল প্রসব করিবার অবসর পাইল না বরং অল্প-শিক্ষার সঙ্গে ভোগ-লোলুপ বিলাসিতা মিশিয়া তাহার জীবনের যথেষ্ট অধোগতি হইল। রেঙ্গুন শহরের চাকচিক্যময় আমোদবহুল জীবনের আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে, তাহাকে নির্জ্জন, লোকবিরল বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য-জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট রাখা কি আর সম্ভব হয়? বিবাহের অল্পদিন পরেই ড-খিন্-মিনের

দাম্পত্য-জীবনের অবসান হইল। মঙ্-লা-মঙ্ রেঙ্গুন শহরের কোন আপিসের সামান্য মাহিনার কেরানীর কাজ লইয়া সেখানেই থাকিয়া গেল। অর্থের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আসিয়া স্ত্রীর উপর অধিকারের দাবী করিত মাত্র। ড-খিন্-মিন্ অল্পবয়সে কিছুদিন স্বামীর সকল অত্যাচার সহিয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হইয়া পড়িলেন এবং আইনের সাহায্যে দুরাচার স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ড-খিন্-মিন্ বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সন্তান, নয়নের মণি ছিলেন। পিতার নিকট চাষবাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিয়াছিলেন, তাই পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন হইলেও নিরাশ্রয় হন নাই। দুইটি নাবালক কন্যা লইয়া স্বাধীন ভাবে নির্ভয়ে বাস করিতেন। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই ড-খিন্-মিনকে সম্ভ্রম করিয়া চলিত, তাহার ব্যবহার ও চালচলনের মধ্যে একটি সুসংযত ভাব ফুটিয়া উঠিত, যাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত।

ড-খিন্-মিন্ স্বাস্থ্যবতী ও রূপসী রমণী ছিলেন, তাই কন্যা দুইটিও মায়ের রূপগুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। বড় মেয়েটি স্থানীয় মিশন স্কুলে পড়িত। মিশনরী মেমেদের আওতায় থাকায় শিক্ষাদীক্ষা কতকটা বিদেশী ফ্যাশানেরই হইয়াছিল। মেয়ের মায়ের তাহা পছন্দ হইত না, কিন্তু মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেও চাহিতেন না। মেমেদের প্রভাবে বড়মেয়ে মা-তিন্ ওরফে মিস্ মেবেল্ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটি কেরিন্ খ্রীষ্টান যুবককে বিবাহ করিল। যুবকটি স্থানীয় মিউকের* পদ লাভ করিয়া ঐ স্থানেই বসতি করিল দেখিয়া ড-খিন্-মিন্ তীব্র মনঃকষ্টের মধ্যেও কতকটা আরাম পাইলেন। ছোট মেয়ে মা-মিয়া-সোয়ে মায়ের হাতে পুরা বর্ম্মিণীর মতই গড়িয়া উঠিল। বড় বোন যখন লুঙ্গীর সঙ্গে হাই-হিলের মেমেলি-ফ্যাশানের জুতা পরিয়া খট্ খট্ শব্দ করিয়া হাঁটিত, তখন ছোট বোনটি তানাখা-লেপা পা দুখানিতে সোনার মল পরিয়া বর্ম্মা-ফানা-পায়ে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে চলিতে বলিত, "ঘোড়ার ক্ষুরের মতন শব্দ করিস্ কেন? মেয়েমানুষের হাঁটুনি বুঝি ঐ রকম ভাল? ওসব জুতো ফ্রকের সঙ্গেই মানায় ভাল। অত যদি মেম সাজবার সখ থাকে ত লুঙ্গী-এঙ্গিটাও ত্যাগ কর্ দেশী নামটার সঙ্গে সঙ্গে।" মেবেল্ চটিয়া জবাব দিত, "তোর মতন দুই আঙুলে ফানা আটকে চল্‌তে গেলে আর দুনিয়ার কাজ চল্‌ত না—ওসব স্লিপার বেডরুমেই চলে, তাড়াতাড়ি চলার কাজ কি ওতে হয়?" মা-মিয়া-সোয়ে হাসিয়া বলিত, "আহা! যত কাজের লোক তোমরাই বুঝি? মা যে ঐ ফানা প'রেই সারা জীবন ঘরে-বাইরের সব কাজই চালাচ্ছেন। আমাদের ঘরে ঘরে চিরজন্মই ত ঐ ফ্যাশানে কাজ চলল। দু-দিন মেমগুলোর সঙ্গে মিশে তোমার হালচালই বদ্‌লে গেল।" মা-মিয়া-সোয়ে চিরজন্ম-আচরিত দেশী প্রথা মানিয়া চলিতেই ভালবাসিত, তাই গ্রামে বিদেশী পাউডার, পমেটম, রুজ, লিপ্‌ষ্টিকের যথেষ্ট আমদানী সত্ত্বেও প্রতিদিন সদ্য-ঘষা তানাখা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, মাথার তালুর উপর সমস্ত চুলগুলি টানিয়া তুলিয়া একটি গ্রন্থি বাঁধিত, গ্রন্থির চারি দিক বেড়িয়া একটি গোল সিঁথি কাটিয়া, সম্মুখের ছোট ছোট করিয়া কাটা চুলগুলি মসৃণভাবে আঁচড়াইয়া একগুচ্ছ ফুল কান ঘেঁষিয়া গ্রন্থির নীচে দিয়া ঝুলাইয়া দিয়া প্রসাধন সম্পূর্ণ করিত। শহরে মেয়েরা যেমন লুঙ্গীর রঙের সঙ্গে রং মিলাইয়া কাপড়ের তৈয়ারী কৃত্রিম ফুল দিয়া সাজে, মেবেলও তাহা শিখিয়াছে; মা-মিয়া-সোয়ে তাহা দেখিয়াও নিত্য নূতন তাজা বনফুল সংগ্রহ করিয়া, কখনও ফুলের অভাবে পাহাড়ের গায়ের ফার্ণের ঝোপ হইতে কচি কচি কাঁচা সবুজ ফার্ণ তুলিয়াও চুলে পরিত, তবু কৃত্রিম ফুলে সাজিতে তাহার মন চাহিত না।

মেমেদের স্কুলে দিয়া বড় মেয়েটি বিধর্ম্মী হইয়া গেল দেখিয়া ড-খিন্-মিন্ ছোট মেয়েটিকে স্থানীয় ফুঙ্গী-চঙের বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করাইয়াই নিজের ব্যবসার কাজে লাগাইয়া দিলেন। ধান মাপিয়া গোলায় তোলা, কৃষকের সহিত হিসাব মিলানো, তামাকের পাতা গুঁড়াইয়া চুরুট তৈয়ারী, বাগানের ফুল, ক্ষেতের শাক-সব্‌জী তোলাইয়া প্রতিদিন ভোরে বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠানো প্রভৃতি গৃহস্থালীর প্রায় সকল কর্ম্মে মেয়েকে শিক্ষিত করিয়া লওয়াতে তাঁহার নিজের যথেষ্ট সাহায্যও হইত; পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার অনুপস্থিতিতে ছোট মেয়ের উপরে নিশ্চিন্ত মনে ফেলিয়া

* ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের ন্যায় সরকারী উচ্চপদ।

যাইতে পারিবেন, এই আশা ও আনন্দে পতিপরিত্যক্তা রমণীর প্রাণ ভরিয়া থাকিত।

সারাদিন মায়ের সঙ্গে কাজকর্ম করিয়া মা-মিয়া-সোয়ের কোন ক্লান্তিবোধ হইত না। দিনান্তে সাজগোজ করিয়া বোনের বাড়ী অথবা নদীতীরে বেড়ানো ছাড়া আর কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ঐ ছোট শহরটিতে ছিল না। সপ্তাহান্তে একটিবারই কেবল নিদ্রিত শহরটিতে সাড়া পড়িয়া যাইত, সেদিন সকলেই ছুটিত জাহাজঘাটের দিকে। সভ্যজগতের অবশ্যপ্রয়োজনীয় একটি জিনিষ যে সংবাদপত্র, তাহাও সাত দিনের পর এই লোকালয়ে পৌছিত। সেই জন্য জাহাজ পৌছিবার দিন সকাল হইতেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাঙালীর মত বুভুক্ষু মানুষের দল একটু নূতন কিছু খবরের আশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

মা-মিয়া সোয়ে সারা সপ্তাহ মনের খোরাকের কোন অভাব বোধই করিত না কিন্তু ঐ জাহাজখানি এতবার দেখিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না; মাকে বলিত, একটিবার শুধু ঐ বিরাট গৃহখানির একটি কুঠুরিতে বসিয়া সেও পাড়ি দিবে অথই জলের বুকের উপর দিয়া, একবার শুধু দেখিয়া আসিবে, কোন্ সুদূর ঘাটে গিয়া ভিড়ে এতগুলি যাত্রী লইয়া।

মা বলিতেন, "এ কি পাগলামি তোর! ও জাহাজ কালাপানি পার হ'য়ে এসেছে 'কালা'দেরই নিয়ে। আমরা দেশ ছেড়ে কোথায় যাব? 'কালা'রা নিজের দেশে খেতে পায় না, তাই আসে আমাদের দেশ লুটতে। আমাদের কি অন্নের অভাব! বেঁচে থাক্ আমাদের লাঙ্গল আর গরু, অক্ষয় হোক্ আমাদের দুই হাতের শক্তি। সোনার মাটিতে সোনা ফল্‌বে, ঘরে বসেই বাকী জীবন পেট ভরবে। ওসব দিকে ফিরেও চাস্ নে, তোর বাপের যেমন দশা হ'ল, ঘর ছেড়ে গিয়ে। দু-পাতা ইংরিজি পড়ে, ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি তার জীবনের সম্বল হ'ল! কত দুঃখ পাচ্ছে, মনে করলে এখনও চোখে জল আসে! এখানে থাকলে সারা জীবন রাজার হালে থাকতে পারত। কাচের জৌলুষে চোখে ধাঁধা লেগে গেল, মাটির নীচের সোনা সে দেখতে পেলে না।

২

সেদিন শরতের সন্ধ্যা। মেঘমুক্ত নীলাকাশের কোলে নবমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। অস্তমুখী লাল সূর্য্যের শেষ রেখাগুলি পশ্চিম আকাশ রাঙাইয়ে সোনালী-রূপালীর খেলায় আকাশ-বাতাসকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

নদীর দুই পারে কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে ফুরফুরে হাওয়া দোলা দিয়াছে। মা-মিয়া-সোয়ের অন্তর আজ কেবলই গাহিয়া উঠিতেছে, "যাব না, যাব না, যাব না ঘরে।" জাহাজ আসিয়া যাত্রী নামাইয়া দিয়া মাঝনদীতে সরিয়া গিয়াছে। দুই-চারিটি খালাসী কেবল উপরের ডেকে কাজকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে। জাহাজের কাপ্তেন, এঞ্জিনীয়ার, অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও জলযাত্রায় ক্লান্ত হইয়া ডাঙায় নামিয়া গিয়াছে। সব কোলাহল স্তব্ধ, তবু মা-মিয়া-সোয়ে আজ ঘরে ফেরে নাই। কেন জানি আজ তার প্রাণ বড় একাকী বোধ করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সে অভ্যস্ত, এমন আলো-আঁধারের খেলা সে আরও কতদিন একাই বসিয়া দেখিয়াছে, কোনও অভাব সে অনুভব করে নাই। কিন্তু আজ তাহার মনটা যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। পশ্চিমাকাশের রক্ত-আভা ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল, চাঁদের শুভ্র আলো চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, উদাস নির্নিমেষ-দৃষ্টি তরুণী একটি কালো পাথরের উপর বসিয়া আনমনে দূরের পানে চাহিয়া আছে।

"হ্যালো, মিসি! এমন নির্জ্জন স্থানে একা ব'সে কোন্ ভাগ্যবানের ধ্যান করছ, জান্‌তে পারি কি?" ইংরেজী ও বর্ম্মী ভাষা মিলাইয়া কে যেন এই কথাগুলি বলিয়া উঠিল। মা-মিয়া-সোয়ে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার ভগ্নীপতি মিঃ সান্-পো-লিন এবং এক জন ইংরেজ যুবক।

মা-মিয়া-সোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয়কে অভিবাদন করিয়া বলিল, "এই যে, আমি এখনই বাড়ী ফিরব ভাবছিলাম। চাঁদের আলোয় বুঝতে পারি নি এত বেশী দেরি হ'য়ে গেছে। মা হয়ত কত ভাবছেন!" ইংরেজ যুবকটি পরিষ্কার বর্ম্মী ভাষায় বলিল, "ভাগ্যিস্ চাঁদ উঠেছিল, নতুবা আপনাকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য ত আমার হ'ত না।"

মা-মিয়া-সোয়ে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতেই মিঃ সান্-পো-লিন বলিলেন, "ওহো ভুল হয়েছে। ইনি

আমার এক বন্ধু মিঃ অ্যাডামসন্, এখানকার ডি. সি. হ'য়ে এসেছেন। আগে আকিয়াবে ছিলেন, সেখানকার কমিশনার-সাহেবের ছেলে। বাল্যকাল বর্ম্মা দেশেই কেটেছে, কাজেই তোমার মাতৃভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ, আর ইনি আমার 'সিষ্টার্-ইন্-ল,' মিস্…"

মা-মিয়া-সোয়ে বাধা দিয়া বলিল, "মিস্ নয়, মা-মিয়া-সোয়ে।"

মিঃ সান্-পো-লিন্ হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর ভাই, তোমার ঐ লম্বাচওড়া নামটি আমি মনে রাখতে পারি না। তোমার দিদির মতন তুমিও একটা ছোটখাট নাম,—যেমন 'ডেইজি' বা 'ফ্লোরা'-গোছের একটা কিছু বেছে নাও না। আমার বন্ধু মিঃ অ্যাডামসনও নিশ্চয় তা হ'লে খুশী হবেন।"

মিঃ অ্যাডামসন্ বলিলেন, "না, না, ওসব নাম বড় কমন্ হয়ে গেছে। আপনার নামের মাঝখানটা বাদ দিয়ে শুধু 'মা-সোয়ে' বললে কেমন হয় ?"

মা-মিয়া-সোয়ে বলিল, "আপনাদের কারও নামটাই ত বড় ছোট দেখ্‌ছি না, আমি-বেচারীর নাম নিয়ে এত কাটাকাটি কেন," বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

যুবক দুইটি বলিল, "আমরা সঙ্গে গেলে বোধ হয় আপত্তি নেই আপনার ?"

মা-মিয়া-সোয়ে বলিল, "ধন্যবাদ, আমি এ পথে প্রতিদিনই চলি, একা যেতে ভয় করি না, আপনারা কেন কষ্ট করবেন ?"

তাহার মনে মনে ভয় হইল, একে ত রাত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর গ্রামের পথে দুইটি যুবকের সহিত চলাতে নানা কথার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার মা হয়ত এই সাহেবটিকে দেখিয়া চটিয়াই যাইবেন।

যুবক দুইটিও তাহার সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে পারিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। দুই-চার পা গিয়া সাহেবটি ফিরিয়া বলিল, "মা-সোয়ে, আশা করি কাল আবার নদীর ধারে দেখা হবে।"

মিঃ অ্যাডামসন্ শিশুকালে পিতামাতার সহিত বর্ম্মা দেশে আসেন। আকিয়াবে দুই-তিন বৎসর মাত্র স্থানীয় ইউরোপীয়ান্ স্কুলে লেখাপড়া করেন। হাই স্কুলে পাস করিবার অনেক আগেই স্বদেশে প্রেরিত হন। অবশিষ্ট শিক্ষা বিলাতেই হয়। অল্পবয়সে পিতার সহিত বর্ম্মা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই জন্য বর্ম্মা দেশের প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। পিতাও দীর্ঘকাল এদেশে চাকরি করিয়া অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পুত্রকে আপন পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মিঃ অ্যাডামসন্ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ডেপুটি কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। বিভাগীয় কমিশনার অবসর গ্রহণ করিলেই সেই পদে উন্নীত হইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। অনেক বৎসর পরে পুনরায় পূর্ব্বপরিচিত স্থানে ফিরিয়া মিঃ অ্যাডামসনের মন খুশীই হইয়াছিল, কিন্তু এ হেন বৈচিত্র্যহীন নির্জ্জন স্থানে অকস্মাৎ নিজেকে বড়ই একাকী বোধ হইতে লাগিল। স্থানীয় ক্লাব-হাউসে মিঃ সান্-পো-লিনের সঙ্গ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। গল্ফ খেলিবার মাঠে, বিলিয়ার্ড টেবিলে, টেনিস্-লনে, সর্ব্বত্রই এই কেরিন যুবকটি তাঁহার নিত্য সঙ্গী হইয়া পড়িল। সান্-পো-লিন্ জাতেই কেরিন্ ছিলেন, আচরণে, পোষাকে, কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে, আহারে-বিহারে সাহেবীর ত্রুটি কোথাও ছিল না। মঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখখানার গড়নই শুধু তাঁহার সাহেব হওয়ার বিরোধী ছিল, তাই পিতৃমাতৃদত্ত নামটাও আর পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতি হয় নাই। আমেরিকান্ মিশনরী সাহেবদের প্রশংসাপত্রের জোরে সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদ লাভের এবং ইউরোপীয়ান্ ক্লাবের সভ্য হইবার সুযোগ হারান নাই।

অ্যাডামসন্ সাহেব সান্-পো-লিন্‌কে খুব পছন্দ করিতেন। ছেলেটির সরল, অমায়িক, আমোদপ্রিয় স্বভাব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিশেষভাবে মিসেস্ সান-পো-লিনের সুমিষ্ট আতিথ্যে অল্পকালের মধ্যেই এই পরিবারটিকে তাঁহার আপন গৃহের সমতুল্য করিয়াছিল। মিসেস্ সান্-পো-লিন্ তাঁহাকে ভ্রাতৃজ্ঞানে 'রবার্ট' বলিয়া ডাকিতেন, অ্যাডামসন্‌ও 'মেবেল' বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

মেবেলের মনে মনে একটি সুদূর আশা মাঝে মাঝে

উঁকি মারিত, যদি এই ছেলেটির সহিত ছোট বোনটির বিবাহ হইত! কিন্তু আবার মনকে তিরস্কার করিত এই বলিয়া—আমি আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, স্বজাতি ত্যাগ করেছি, আমার দুঃখিনী মায়ের মনে কত আঘাতই দিয়েছি। আবার ছোট বোনটিকেও মায়ের বুক থেকে কেড়ে আন্‌ব? মা কত সাবধানে, কত ক্লেশে ছোট মেয়েটিকে আগ্‌লে রয়েছেন। না, না, আমি মায়ের এত যত্ন কখনও ব্যর্থ হ'তে দেব না। কিন্তু কই মা ত ওর বিয়ের জন্য কোনও চেষ্টাও করছেন না। আজকালকার দিনের বর্ম্মী যুবকরা কি গ্রাম্য মেয়ে পছন্দ করবে? কলেজে-পড়া ছেলেরা চাইবে কলেজে-পড়া মেয়ে। মা চাইবেন এমন ছেলে যে মায়ের ভিটে পাহারা দেবে, ধান-জমি দেখবে, ব্যবসা চালাবে। সে কি সহজে মিল্‌বে? মিললেও ঐ চাষা ছেলেই পাবেন, যাকে আমাদের ভগ্নীপতি ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জাই করবে। এক অক্ষর ইংরেজী জানবে না, লম্বা চুলে একপেশে খোঁপা বেঁধে গাউঙ বাউঙ (বর্ম্মা-ফ্যাশানের পাগড়ী) প'রে, ফ্যানা পরে পান চিবোতে চিবোতে কথা বলবে। মা গো কি বিশ্রী! ভাবলেও ঘেন্না করে। কিন্তু কি করি, মাকে দুঃখ দিতেও যে ইচ্ছা হয় না।

এমনি কত চিন্তা মেবেলের মনের উপর দিয়ে যায়-আসে। এক দিন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়া দেখিল, তাহার স্বামী অনেক আগে হইতেই এ-বিষয়ে ভাবিয়াছে এবং শ্যালিকার সহিত ইংরেজ যুবকটির পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেছে। সে শুনিয়াছিল মা-মিয়া-সোয়ে প্রতি সপ্তাহে জাহাজ আসিবার দিন নদীর ধারে আসে, তাই বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যায়। অ্যাডামসন সাহেব বর্ম্মিণীদের সহিত আলাপ করিতে খুব আগ্রহান্বিত বুঝিয়া দুই-একটি বর্ম্মী পরিবারে তাহাকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু খাঁটি বর্ম্মী পরিবারের রীতি ত তাহার স্ত্রী জানে! বাড়ীর কর্ত্তা, গৃহিণী অতিথির প্রতি সমাদরের কোন ত্রুটি করে না কিন্তু আধুনিক চালের অনুকরণে বয়স্থা কন্যাদের কখনও অপরিচিত আগন্তুকের সহিত আলাপ করায় না। তাহাদের কেরিন-পরিবার ত সে রকম নয়! বিশেষতঃ যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা একেবারে পাশ্চাত্য ধরণের। এই ত সেদিন বুড়ো পাদ্রী স-পো-চিনের বাড়ীর লনে একটা টেনিস্‌ টুর্ণামেণ্ট হইয়া গেল. স-পো চিনের মেয়ে মিস্‌ উইনি-পো অ্যাডামসন্‌ সাহেবের প্রতিযোগী হইয়া খেলিয়া তাহাকে হারাইয়া দিল। সাহেব ত অবাক! এইরূপ মেয়েদের পাল্লায় একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই, মা-মিয়া-সোয়ের মত ভীরু বর্ম্মী মেয়ের কি আর আশা আছে?

মেবেল হঠাৎ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রেখে দাও তোমাদের কেরিন মেয়েদের চাল! ওদের কি আর জাতীয়তাবোধ একটুকুও আছে? কেবল সাহেবীয়ানার অন্ধ অনুকরণ! আমরা, বর্ম্মিণীরা খ্রীষ্টান হই আর যাই হই নিজের জাতির বৈশিষ্ট্যটুকু সহজে ভুলি না। সাহেবেরা সাহেবীতে ভুলবে বুঝি? নূতনত্বেই মানুষের মন আকর্ষণ করে বেশী। ছেলেটি এখনও বিয়ে করে নি, বিদেশে একেবারে একা পড়েছে। ওদের জাতের লোকও এখানে এত কম যে মিশবার লোক পায় না, তাই এখন তোমাদের এত আদর। ক্লাবের বুড়ো সাহেবমেমগুলোই ওকে শিখিয়ে নেবে কয়দিন পরে, তখন আর তোমাদের ঐ মিস্‌ পোকেও পুছবে না।

এই সব আলোচনার কিছুদিন পরেই নদীতীরে মা-মিয়া-সোয়ের সহিত অ্যাডাম্‌সনের দেখা।

মা-মিয়া-সোয়ে বাড়ী গিয়া মায়ের কাছে এই সাহেবের গল্প করিল। সাহেবটির প্রকৃতি বড় নম্র এবং বর্ম্মী ভাষায় কথা বলিতে পারে, এইটাই তাহার নিকট বিশেষ ভাল লাগিয়াছে, তাহাও বলিল।

ড-খিন-মিন্‌ গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন, এ বিষয়ে যেন তাঁহার বিশেষ কৌতূহল নাই এমন ভাব প্রকাশ করিলেন। রাত্রে মেয়েটি যখন মায়ের গলা জড়াইয়া আদর করিয়া বলিল, "মা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?" তখন মা আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "না, মা, রাগ কেন করব? তবে বড় ভাবনা হয় তোমার জন্যে; তুমি এখন বড় হয়েছে, একা একা নদীর ধারে আর যেয়ো না। মাইলখানেক পথ যেতে হয়, সন্ধ্যার পর কত বিপদ হ'তে পারে। আর বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হওয়াই ভাল। ওরা দু-দিনের জন্যে

ভাব করবে, কাজ ফুরিয়ে গেলে নিজের দেশে চলে যাবে, তোমাদের মনেও রাখবে না। আর একটা কথা—পাশের গাঁয়ের লুজীর (মোড়ল) ছেলে তোমায় বিয়ে করতে চাইছে। সে বেশ ভাল ছেলে, বাপের চালের কল আছে একটা, তার কাজকর্ম্ম দেখে। ওদের পয়সা আছে ঢের, জমিজমাও অনেক। ছেলেটি কাল আসবে আমাদের বাড়ী। বিয়ের পর আমাদের বাড়ীই থাকবে, আমিও বাঁচি, আর এই বয়সে ঘোরাঘুরি করতে পারি না।"

মা-মিয়া-সোয়ে কিছু উত্তর দিল না। খানিক পরে বলিল, "মা, জাহাজ আসবার দিন আমি শুধু একটিবার যাব, সন্ধ্যার আগেই ফিরব, বরং পাশের বাড়ীর ম-চো-কে নিয়ে যাব সঙ্গে, কি বল?"

মা বুঝিলেন মেয়েটা সারাদিন একা একা থাকে, গ্রামের ভিতরে ওর প্রতিবেশীও নেই কাছাকাছি, একটু ছেড়ে না দিলেই বা বাঁচে কি ক'রে? বলিলেন, "আচ্ছা যেয়ো, কিন্তু সন্ধ্যা ক'রো না, দিনের আলো থাকতে চলে এসো। জাহাজ ত দুপুরেই আসে প্রায়।"

প্রতি সপ্তাহেই অ্যাডামসন্ সাহেব নিজের ডাকের চিঠিপত্র লইতে মোটর চালাইয়া নদীর পারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসেন।

মা-মিয়া-সোয়ে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বড় একটি পাথরের উপর বসিয়া যাত্রীদের নামা-ওঠা দেখে। কৃষ্ণচূড়া গাছটি লালে লাল হইয়া রহিয়াছে। মা-মিয়া-সোয়ে একটি ডাল ভাঙিয়া ছোট একটি স্তবক মাথায় গুঁজিয়া দিল। লাল লুঙ্গীর সহিত ফুলের রংটি ভারি সুন্দর মানাইয়া গিয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপে গৌরবর্ণ মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

জাহাজ আজ শীঘ্র আসিয়াছে, কাজেই রোদ পড়িবার আগেই যাত্রীদের কোলাহল থামিয়া গেল। সে ভাবিতেছে, এত শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া কি হইবে? গাছের স্নিগ্ধ ছায়া ছাড়িয়া তপ্ত বালুকাময় পথে পা বাড়াইতে কাহার ইচ্ছা হয়? সে আনমনে বসিয়া ভাবিতেছে—মঙ-লিন তাহার স্বামী হইবে? সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই একই রকম, একঘেয়ে জীবনযাত্রা? তবে আর তার কি ভাল হইবে? মা যে কি বলেন! তাঁর নাকি পৈতৃক ভিটার এমন মায়া যে কেউ লাখ টাকার সম্পত্তি দিলেও তাহা ছাড়িয়া যাইতে চান না। তাহার কিন্তু ঐখানেই থাকিতে হইবে চিরদিন, এ কথা ভাবিতেও ইচ্ছা হয় না। রঙীন লেসের পর্দ্দায় ঢাকা পাহাড়ের উপরের সুন্দর দোতলা পাকা বাড়ীটায় মেবেল থাকে। নিজের পছন্দমত নিত্য নূতন ফ্যাশানে বাড়ী সাজাইতেছে, কত লোকজন আনাগোনা, কত টি-পার্টি, ডিনার-পার্টি, নাচগান! কত বৈচিত্র্যময় ওর জীবন! ওর সবগুলিই তাহার ভাল লাগে না বটে, কিন্তু সে চায় তার একটি নিজস্ব সংসার। সে রাজ্যের একমাত্র রাণী হইবে সে। সে নিজে সৃষ্টি করিবে সে-সংসারের সব-কিছু। আরও ভাল লাগে তার, যে তাহাকে বিবাহ করিবে, সে যদি বিবাহের পরই তাহাকে লইয়া যায় ঐ বড় জাহাজটায় করিয়া অনেক—অনেক দূরের দেশে। জাহাজটা চলিতে থাকিবে এই পুরনো দ্বীপটিকে পিছনে ফেলিয়া। জাহাজের খোলা ডেকটায় দাঁড়াইয়া সে চোখের জল ফেলিবে, আর মা ঐ জেটিতে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিবেন। ক্রমশঃ আর পার দেখা যাইবে না, কেবল কালো জল, আর জল! তখন তাহার বুক ফাটিয়া কান্না উঠিবে, আর তাহার স্বামী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, "এই দেখ, আমি আছি তোমার সঙ্গে, ভয় কি? প্রাণভরা ভালবাসা দিয়ে তোমার সব অভাব পুরিয়ে দেব!" এই সব ছবি কল্পনা করিতে করিতে কি এক পুলক-শিহরণে তাহার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাস্তবময় সংসারের পরিচিত চিত্রগুলি চোখের সম্মুখে এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া তাহার কল্পনার জগৎকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিল যে তাহার দুই চোখে অশ্রু-ধারা বহিয়া গেল।

"মা-সোয়ে, তোমার এত দুঃখ কিসের? তোমার চোখে জল কেন, বলবে আমায়?" কে যেন তাহার অতি-নিকটে আসিয়া সমবেদনার সুরে কথা বলিতেছে শুনিয়া মা-মিয়া-সোয়ে চমকিয়া চাহিয়া দেখে, সেই ইংরেজ যুবকটি দাঁড়াইয়া; সে একটু ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "না, নদীর জলে রোদ প'ড়ে ঝিক্ ঝিক্ করছে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় চোখে জল এসেছে। আমি বাড়ী যাব এখনই, বড় রোদ, তাই অপেক্ষা করছিলাম।"

সাহেব বলিলেন, "আমার গাড়ীতে এস, যেখানে বলবে, আমি তোমায় সেখানে পৌছে দেব।"

মা-মিয়া-সোয়ে বলিল, "না, ধন্যবাদ আপনাকে, আমার বাড়ী গ্রামের পথে, সেদিকে মোটর চালানো বড় কষ্টকর।"

সাহেব বলিলেন, "তুমি মেবেলের বোন্, তুমি বোধ হয় জান না মেবেল আমার নিজের বোনের মত। আমি তোমাকে এই রোদে হেঁটে যেতে দিয়েছি জানলে সে আমার ক্ষমা করবে না। তুমি বোনের বাড়ী যাবে?"

মা-মিয়া-সোয়ে সেদিন একেবারে অন্য মানুষ। মায়ের নিষেধ, সামাজিক, রীতিনীতি সবই ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এমন স্নেহশীল, দরদী বন্ধু বুঝি আর জগতে কেহ নাই। দুই-এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি আমাকে দিদির বাড়ী পৌছে দিন" এবং সাহেব দরজা খুলিতেই সে ভিতরে গিয়া সাহেবের পাশে বসিল।

৩

গ্রামে-সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ড-খিন্-মিন্ কি ভাগ্যবতী! এমন জামাই কয় জনের ভাগ্যে হয়? শহরের সদরওয়ালা সাহেব, একেবারে আসল লালমুখো সাহেব, সে কিনা ড-খিন্-মিনের ছোট মেয়েটাকে বিবাহ করিল! বড় মেয়েটারও অদৃষ্টের জোর কম কয়, সেও ছোট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিবাহ করিয়া সাহেবদের মতন বাংলো-বাড়ীতে থাকে, সাহেবদের ক্লাবে যায়। কিন্তু যার সৌভাগ্যে এত লোক ঈর্ষান্বিত, সে কেন সুখী হইল না? ছোট মেয়েটি যেদিন স্ব-ইচ্ছায় মায়ের অনুমতি লইয়া সাহেবের বাংলোয় চলিয়া গেল, সে দিন হইতে ড-খিন-মিন্ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। সে শেষ দিন পর্য্যন্ত কন্যাকে কত করিয়া বুঝাইয়াছে, 'বো'কে (সাহেব) বিশ্বাস করিও না, সে বিদেশী মানুষ, নূতনত্বের মোহে পড়িয়া আজ তোমাকে বিবির আসনে বসাইতেছে, কাল কোথায় চলিয়া যাইবে, তোমার কথা মনেও পড়িবে না। তার চেয়ে মং-লিন্‌কে বিবাহ কর, সে স্বজাতি, সমধর্ম্মী, আবার ধনীর ছেলে, জীবনে কখনও অভাবে কষ্ট পাইবে না। তাহার নিজের সম্পত্তিও রক্ষা করিতে পারিলে আজীবন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে, স্বামীর অর্থের উপরও নির্ভর করিতে হইবে না, কি দুঃখে বিদেশীর অনুগ্রহপ্রার্থী হইবে?

কিন্তু কন্যা এত সুপরামর্শ কানেও তুলিল না, কেবলই মাকে বোঝায়, 'বো'য়া কালা'র মত নয়। তাহারা যাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকে দেবীর আসনে বসায়, কখনও অসম্মান করে না। তা ছাড়া এই সাহেবটি তাকে যে রকম ভালবাসে, এমন করিয়া কোন বর্ম্মী তার স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারে না।

ইহার পর শুধু চোখের জলকে সম্বল করা ছাড়া অভাগিনীর আর কি উপায় আছে? তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ইহা পিতৃ-স্বভাব, উত্তরাধিকারসূত্রে কন্যারা পাইয়াছে, তাহার সকল যত্ন, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ড-খিন্-মিনের শরীর মন ভাঙিয়া পড়িল, ফায়ার আশীর্ব্বাদে আর বেশী দিন ইহলোকের দুঃখ-বেদনা সহিতে হইল না, ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মহানির্ব্বাণের রাজ্যে তাঁহাকে স্থান দিলেন। মা-মিয়া-সোয়ে স্বামীর অপরিসীম প্রেমে ডুবিয়া মায়ের মৃত্যুশোক সহজেই ভুলিতে পারিয়াছিল। তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া মোটর-বোটে জলপথে কত সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। সরকারী লঞ্চে রাজকীয় চালে বিভাগীয় পরিদর্শন-কার্য্যে যখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া সাহেব ভ্রমণ করিতেন, তখন স্বামীর সম্মানের বহর দেখিয়া মা-মিয়া-সোয়ে কত গর্ব্ব বোধ করিত। মেবেল ছোট বোনটিকে সাহেব-বন্ধুর সহিত বিবাহ দিতে পারিয়া খুবই সুখী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার তুলনায় নিজেকে সর্ব্বদাই ছোট মনে হইত, তাই স্বামীকে মাঝে মাঝে বলিত, "তুমি কেন একবার বিলেত ঘুরে এলে না? যদি আই-সি-এস্ হ'তে, তবে আমার সম্মানটা আরও কত বাড়ত বল ত?"

এক দিন ক্লাবের পর রাত্রে বাড়ী ফিরবার পথে অ্যাডামসন্ সাহেব সান্-পো-লিন্‌কে বলিল, "ভাই, একটা বড় দুঃসংবাদ! আমাদের দেশে যুদ্ধ লেগেছে, জান ত? আমার একটা মিলিটারী ডিগ্রী আছে, কাজেই ডাক পড়েছে যুদ্ধের স্থানে। আমাকে খুব শীঘ্রই রওনা হ'তে হবে, বাঁচি যদি তবেই ফিরব, নতুবা কি হবে জানি না। এই খবর মা-সোয়েকে কি ভাবে যে দেব, তাই ক'দিন ধরে

ভাবছি। এত অল্প দিনের ভিতরেই ওকে ছাড়তে হবে আগে যদি একটুও জানতাম, তবে কখনও বিয়ে করতাম না। আমি ভেবেছি ওকে বলব, আমাকে বিশেষ দরকারে কয়েক মাসের জন্য দেশে যেতে হবে, সে কয় মাস তাকে বোনের বাড়ী রেখে যাব। আমি চাই না যে, মেবেলও এ-কথা জানে। কি লাভ হবে বল মেয়েদের কোমল প্রাণে আঘাত দিয়ে? আমি চিঠিপত্র লিখব, আমার স্ত্রীর জন্য মাসোহারা টাকাও পাঠাব, তোমার বোধ হয় তাকে রাখতে কোন আপত্তি হবে না?"

সান্‌-পো-লিন কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। সে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে সাহেবটি আর কোনদিন সুযোগ পাইলেও ফিরিবে। কিন্তু তাহার মনের এ সন্দেহ স্ত্রীকে বা শালীকে না জানান সম্বন্ধে সাহেবের সহিত একমত হইল। যে দুঃখ অনিবার্য্যরূপেই আসিবে, তাহা অকস্মাৎই আসুক, তিলে তিলে মরণের চেয়ে বজ্রপাতে মৃত্যুই অধিক বাঞ্ছনীয় বোধ হয়।

অ্যাডামসন্‌ সাহেব দীর্ঘ ছুটি লইয়া চলিয়া গেলেন। মা-সোয়ের সম্বল রহিল বিবাহিত জীবনের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, দুই-চারিটি মধুর সুখ-স্মৃতি, আর বিদেশী বঁধুর দুই-চার লাইন বিদেশী ভাষায় লিখিত অবোধ্য চিঠি!

প্রতি সপ্তাহের শেষে সে তাহার চিরপরিচিত জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিত তাহার স্বামীর চিঠির আশায়। কখনও একখানি পিকচার-কার্ডের নীচে স্বামীর হস্তাক্ষর পাইয়া আনন্দে ছবিখানি বুকে চাপিয়া ঘরে ফিরিত, কখনও খালি হাতে জাহাজখানির দিকে চাহিতে চাহিতে চোখের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিত।

৪

কালের আবহমান স্রোতের মুখে পৃথিবীর গণনা কোথায় ভাসিয়া যায়। একটির পর একটি বৎসর করিয়া দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে। মা-সোয়ের জীবন অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এত দিনে একটু স্থিতিলাভ করিয়াছে। বিদেশী স্বামীকে হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের নব-উদ্বেলিত প্রেমোচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ে নাই। স্বামীর আদরে, সোহাগে তাহার জীবন, যৌবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, নিত্য নূতন বেশ ধারণ করিয়া তাহার জীবন-নাট্যমঞ্চে দেখা দিত, কিন্তু হায়, জীবন-দেবতার আসন যেখানে শূন্য, সেখানে সব আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া যায়। মা-সোয়ের সকল ব্যথার ব্যথী ছিল তাহার দিদি মেবেল। সে কেবলই তাহার স্বামীকে বলিত, "ওগো, এমনই ক'রে কি আমার এমন বোনটির জীবনটা ব্যর্থতায় ডুবে যাবে? ওর এতখানি বুকভরা প্রেম, অনাদরে হেলায় শুকিয়ে যাবে? কেউ আর ওর সারা-জীবনের সাজানো অর্ঘ্যডালা গ্রহণ করবে না?" সদা-প্রফুল্ল স্বামী কৌতুক-হাসি হাসিয়া স্ত্রীকে জবাব দিত, "কি করি ভেকেন্সি নেই যে এখন। তুমি অনুমতি দিলে আমি এখনই গ্রহণ করতে রাজী।" মেবেল কপট রাগে উত্তর করিত, "ছেড়ে দিতে পারি না বুঝি? আমি সকল দুঃখ সইতে পারতাম যদি আমার প্রাণের বোনটির মুখে হাসি ফুটত।"

মেবেলের মুখের কথাই সত্য হইল। একটি মরা-শিশুর জন্ম দিয়া হাসপাতালেই দেহ রাখিয়া সে মায়ের সহিত অনন্তলোকে মিলিত হইল। সান-পো-লিনের শূন্য ঘরে মা-সোয়ের স্বামী আসন মিলিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শোক ভুলিবার জন্য সান্‌-পো-লিন্‌ মদ ধরিল। মা-সোয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বশে রাখিতে পারিল না। ধন-সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পদ-মর্য্যাদা একে একে সব হারাইয়া নিঃসম্বল হইল। যখন-তখন মা-সোয়েকে প্রহার করিত, মা-সোয়েই তাহার অধোগতির কারণ এই কথাই তাহাকে বার বার শুনাইত। মা-সোয়ে তাহার অত্যাচার সহিতে না পারিয়া এক এক দিন বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া নদীর ধারে সেই পুরনো গাছটির ছায়ায় গিয়া বসিত, যেখানে সে তাহার স্বামীর প্রথম দর্শন পায়। প্রতি সপ্তাহে এখনও বিরাট জলযানখানি আসে-যায়, কিন্তু কই সে ত আর আসিল না! তবে কি সত্যই সে তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া গেল? সে ত শুনিয়াছিল ইংরেজ জাতি এমন বিশ্বাসঘাতক হয় না, সে কত লোকের কাছে গল্প শুনিয়াছে, সাহেবরা কখনও না বলিয়া ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে না। কত বড় বড় জাহাজের কাপ্তেনরা, তাহাদের বর্ম্মী স্ত্রীকে বাড়ীঘর করিয়া দিয়া, আজীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে,

বর্ম্মিণীরাই নিজের দেশ ছাড়িয়া সঙ্গে যাইতে চায় না। কিন্তু মা-সোয়ের যে বড় সাধ ছিল সাহেবের সহিত ঐ বড় জাহাজে চড়িয়া তাহাদের দেশে যাইবে। কতবার সেকথা স্বামীকে বলিয়াছিল, স্বামীও আশা দিয়াছিলেন, যখন দীর্ঘ অবকাশে স্বদেশে যাইবেন, তাঁহার আদরের মা-সোয়েকেও লইয়া যাইবেন। তবে কেন সে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া গেল? আজ কয় বৎসর হইতে আর চিঠিপত্র, টাকা কিছুই আসে না। মা-সোয়ে কত ঠিকানায়, কত চিঠি পাঠাইয়াছে, কোন জবাবই আসে নাই। মায়ের মৃত্যুর পর তাহাদের বাড়ীঘর জমিজমা সব ফায়ার সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। জীবিতকালে দুই মেয়েকে মা কিছু দান করিয়া যাইতে পারিতেন, উইল করিবার ত নিয়মই নাই, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে মা এমনই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে তাহাদের ভবিষ্যতের চিন্তা আর করিবার ইচ্ছা হয় নাই। কে জানিত এত শীঘ্রই সে এমন ভাবে নিরাশ্রয় হইবে! এমনই দুঃখে, চোখের জলে মা-সোয়ের দিন কাটে। দিনান্তে গ্রামের ফায়ার মন্দিরে সে ভগবান বুদ্ধের চরণপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা করে। তরুণ ফুঙ্গীরা আড়চোখে সুন্দরীর চোখের জলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, আভাসে ইঙ্গিতে প্রলুব্ধ করিতে চায়। মা-সোয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়, ভাবে যুবতী সুন্দরীর বিপদ সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে, কোথায় সে নিরাপদ আশ্রয় পাইবে?

৫

ছোট্ট একখানি গ্রাম। পথের দুই পার্শ্বে বাঁশের এক-চালা ঘরে ছোট ছোট দুই-একটি দোকান। দোকান-ওয়ালারা সপরিবারে ঐ ঘরেরই পশ্চাতে মেটে উঠানের পারে বাঁশের মাচাঙের কুঁড়েতেই বাস করে। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সবাই দোকানের সওদা বিক্রয় করে। চাল, ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া খুচরা মণিহারী দ্রব্য, চুরুট, লজেন্স, চকোলেট, রঙীন ছিটের লুঙ্গী, পুঁথি, মুক্তার গহনা, চিনাবাদামের মিঠাই, বাঁশের কঞ্চিতে সাজানো কাটা আখের টুকরা, পোড়া রাঙা আলু, লঙ্কার গুঁড়ো ও লবণ-মাখানো সিদ্ধ শিমের বীচি, আলু ও ডিম প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনীয় এবং লোভনীয় জিনিষে সাজানো দোকানগুলি। ক্রেতার অভাব নাই, এসব জিনিষের চাহিদাও কম নয়। এইরূপ একখানা একচালার নীচে পুরনো মরিচা-ধরা একটি সেলাইয়ের কল সম্মুখে রাখিয়া টুলের উপর পা তুলিয়া, দুই হাঁটু একত্র করিয়া চিন্তিত মুখে বসিয়া আছে এক জন প্রবীণ আধবয়সী বর্ম্মী। লম্বা চুলগুলি মাথার বাঁ-পাশ ঘেঁষিয়া ঝুঁটি করিয়া একটি খোঁপায় বাঁধা। জীর্ণ, ময়লা এঞ্জি গায়ে, লাল চেক-কাটা ছিটের লুঙ্গী পরা। পাশে একখানা ভাঙা বেতের মোড়ায় বসিয়া মা-সোয়ে এখন 'ড-মিয়া-সোয়ে' নামে পরিচিত।

পুরুষমানুষটি বলিতেছে, "আমি ত চিরকেলে গরীব মানুষ, গ্রামের দর্জ্জিগিরি করে দু-চার আনা যা পাই, কায়ক্লেশে একলার পেট ভরত, তুমি যে কি দুঃখে আমার ঘরে এলে, আমি তাই ভেবে অবাক হই। ছিলে কমিশনার সাহেবের স্ত্রী, আমার মত কত গণ্ডা চাকর পুষেছ, আর আজ কিনা ভিখিরীর ঘরের ভিখারিণী, একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!"

ড-মিয়া-সোয়ে রাগের ভান করিয়া বলিল, "দেখ, বার বার ঐ পুরনো কথা তুলে কেন আমায় জ্বালাও? আমি ত তোমার ধন-দৌলৎ দেখে আসি নি? সংসারের ঐশ্বর্য্য ভোগ যথেষ্ট করেছি, স্বামী সুখশান্তি পাই নি তাতে, তাই বুড়ো বয়সে একটু খাঁটি ভালবাসার আশায় তোমার ঘরে এসেছি। বর্ম্মী মেয়েদের এই গুণটুকু ভগবান্ দিয়েছেন, তারা সকল অবস্থাকেই সহজে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। আজ যে রাজরাণী, হীরের গহনায় আপাদমস্তক সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাল যদি অবস্থার ফেরে সে পথের ভিখারিণী হয়, তখন সে মাছের চুবড়ি মাথায় নিয়ে বাজারে বিক্রয় করতে যেতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করবে না। বর্ম্মিণী কখনও, টাকায়ই তার সম্মান, শুধু মনে করে না। মনুষ্যত্বেই তার সম্মান, স্বাবলম্বনই তার অঙ্গের ভূষণ। সত্যই, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও আমি আজ রাজরাণীর চেয়ে কম সুখী মনে করছি না নিজেকে। ফায়ার আশীর্ব্বাদে বাকী জীবন যেন আমরা এমনই সুখেই কাটিয়ে দিতে পারি, আর কিছু আমার প্রার্থনীয় নেই।"

এমন সময় নিতান্ত বেরসিকের মত একটা পাগড়ি-আঁটা, চাপকানের উপর তকমা-পরা পাকানো গুম্ফধারী এক

ব্যক্তি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ড-মিয়া-সোয়ে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, এখানে কি চাও?"

লোকটি পাঞ্জাবী শিখ, হিন্দীতে বলিল যে আম্মা যদি একবার বাহিরে আসেন, তাহা হইলে সে আপন বক্তব্য বলিতে পারে।

বর্ম্মী দর্জ্জি ভীষণ রাগিয়া বলিল, "কালা, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার স্ত্রীকে ঘরের বাইরে নিয়ে আমার আড়ালে কথা বলতে চাও? কি বলবার আছে, এখানে বলবে ত বল, নইলে এই দা'য়ের মুখে তোমার গর্দ্দান যাবে" বলিয়া বেড়ার গায়ে গোঁজা একটি ধারালো দা'য়ে হাত দিল। ড-মিয়া-সোয়ে দাখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এত রাগ করছ কেন, লোকটা নিশ্চয় বিশেষ জরুরি কোন কাজে এসেছে, শুনতে দোষ কি?"

বর্ম্মী দরজী উত্তর করিল, "গরীব বর্ম্মীর ঘরে বড় আদমীর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? তুমি কি ভাবছ, তোমার কমিশনার সাহেব তোমায় তলব করেছে আবার?"

ড-মিয়া-সোয়ের লজ্জায়, সঙ্কোচে মুখ লাল হইয়া উঠিল, লোকটা নিশ্চয়ই বর্ম্মী ভাষা জানে, সে কি মনে করিল? সে ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তখন শিখ চাপরাশী একটি কার্ড দর্জ্জির হাতে দিয়া বলিল, "তোমার আওরতের হাতে দাও। ডাকবাংলোয় এক সাহেব এসেছেন, তোমার স্ত্রীকে তলব করেছেন, এবার বুঝি তোমার কপাল ফিরল!"

ড-মিয়া-সোয়ে ভিতর হইতে সব শুনিয়া বলিল, "তোমার সাহেব যেই হোন্, আমাকে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, খবরদার, তুমি আর এ পথে এস না, তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে জেনো।" শিখ তৎক্ষণাৎ কার্ডটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

বর্ম্মী দর্জ্জি কার্ডখানা আনিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, "ইংরেজী নাম লেখা, তুমি ত পড়তে পার, দেখ ত কে? বড় বড় সাহেবরা আপিসের কাজে শহরের প্রান্তে ডাক-বাংলায় এসে থাকে মাঝে মাঝে, সেই সময় এই সব চাপরাশী দিয়ে গ্রামে গ্রামে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করায় শুনেছি। অভাবে পড়ে অনেক মা-বাপ মেয়েদের পাঠিয়ে টাকা রোজগার করে। সুন্দরী ব'লে এক সময় তোমারও ত খুব খ্যাতি ছিল, নিশ্চয়ই সেই খবর পেয়ে চাপরাশীটা এসেছিল। চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই, কি জানি তোমায় যদি জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায়!"

ড-মিয়া-সোয়ে ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "কি কাপুরুষ তুমি! নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার সাহস নেই তোমার, পালাতে চাইছ! যত আস্ফালন বুঝি ঘরে স্ত্রীর সামনে?"

দর্জ্জি কার্ডখানা স্ত্রীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

ড-মিয়া-সোয়ে কার্ডখানার নামটি পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার অস্ফুট চীৎকারে পাশের দোকানের লোক ছুটিয়া আসিল। জ্ঞান হইবার পর সে কাহাকেও কিছু বলিল না। প্রতিবেশীরা ঠিক করিল, স্বামীর দুর্ব্যবহারেই মনঃকষ্টে নিশ্চয় এরূপ হইয়াছিল।

কার্ডখানি তাহার পূর্ব্ব স্বামী মিঃ অ্যাডামসন্ সাহেবের, নীচে আকিয়াবের ঠিকানা রহিয়াছে। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, তাহার সে স্বামীর কোন সন্ধানই সে পায় নাই। ভগ্নীপতি সান্-পো-লিনের গৃহিণীরূপে পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া যায়। সান্-পো-লিনের মৃত্যুর পর বহুকাল সে চুরুটের ব্যবসা করিয়া অনেক কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছে। সঙ্গী এবং রক্ষকের অভাবে অনেক লাঞ্ছনা ও বিপদ ভোগের পর এই প্রবীণবয়স্ক দর্জ্জিটির আশ্রয় লইয়াছিল এবং দশ-বার বৎসর ধরিয়া ইহার সহিত মনের শান্তিতে বাস করিতেছিল। এত কাল পরে এ আবার কি বিপদ! এখানে এই নির্জ্জন গ্রামের প্রান্তে কেমন করিয়া তিনি সন্ধান পাইলেন তাহার! এত দিন পরে কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহার কাছে? ড-মিয়া-সোয়ে ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইয়া গেল। নিরক্ষর গ্রাম্য-প্রকৃতি তাহার বর্ত্তমান স্বামী জানিতে পারিলে হয়ত সাহেবকে অথবা তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে। সে অনেক চিন্তার পর গ্রামের লুজীর স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সব বলিল এবং লুজীকে অনুরোধ করিতে বলিল, সে যেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বিশেষ করিয়া বারণ করে যাহাতে সাহেব আর কখনও তাহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা না করেন। কিন্তু মন যে বাধ মানে না, অতীতের শত মধুর স্মৃতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাহার অন্তরে অন্তরে দহন করিতে লাগিল। প্রাণ যেন

তাহার ছুটিয়া গিয়া স্বামীর বুকে আছড়াইয়া পড়িতে চাহিল। আবার বর্ত্তমান স্বামীর সরল অনাবিল প্রেমের শতসহস্র পরিচয় তাহার বর্ত্তমান জীবনের পাতায় পাতায় উজ্জল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাহাও যে মুছিবার নয়! আজ যদি সাহেব-স্বামী আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে কি সে ক্ষমা করিতে পারিবে? না, না, এত অবিচার, এত নির্ম্মমতা, এত অবহেলা সে ক্ষমা করিতে পারে না। নির্দ্দোষী বালিকার প্রতি কত বড় অপরাধ তাহার হইয়াছে, কি জন্ত সে ক্ষমা করিবে? যে অত্যাচরিতা, লাঞ্ছিতা, নিরাশ্রয়াকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছে, সে-ই প্রকৃত স্বামী নয় কি? না না, যত প্রলোভনই হউক তাহার, সে সংবরণ করিবে, দুর্ব্বলতাকে জয় করিবে, ন্যায়ের আসনই অবিচলিত থাকিবে, এই তাহার শেষ মীমাংসা। মন যেন অভিভূত না হয়!

অ্যাডামসন্ সাহেব চাপরাশীর নিকট সব শুনিয়া গ্রামের লুজীর নিকট আসিলেন। লুজী ইংরেজীনবিশ অর্দ্ধশিক্ষিত বর্ম্মী। সাহেবকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। সাহেব লুজীকে বলিলেন যে ড-মিয়া-সোয়ে তাহার স্ত্রী ছিলেন, বর্ম্মীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। এখন বিশেষ প্রয়োজনে তাহার সহিত একবার শুধু দেখা করিতে চান, লুজীর বাড়ীতেই তাহাকে আসিতে বলা হউক, সেই স্থানেই কথাবার্ত্তা হইতে পারিবে।

লুজী তাহার স্ত্রীর নিকট পূর্ব্বেই সব শুনিয়াছিল, ড-মিয়া-সোয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল। ড-মিয়া-সোয়ে উত্তর দিল, "আমি এক জন বর্ম্মীর বিবাহিতা স্ত্রী এখন, অপর কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই না। সাহেবের সহিত তাহার সম্পর্ক দীর্ঘকাল চুকিয়া গিয়াছে, সাহেব যেন তাহার দাম্পত্য জীবনের শান্তি-ভঙ্গ না করেন।"

সাহেব তবু নাছোড়বান্দা, বর্ম্মী ভাষায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত একবার সাক্ষাতের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। লিখিয়াছেন যে, অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে অপরাধ এবং অবিচার করিয়াছেন, তাহার জন্ত তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাহার দাম্পত্য-জীবনের শান্তিভঙ্গ করিবার অভিসন্ধি থাকা দূরে থাকুক বরং তাহাদের মিলিত জীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই আসিয়াছেন। তাঁহার মা-সোয়ে কি একটিবার মুহূর্ত্তের জন্তও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সম্মুখে আসিতে পারিবে না? পাঁচ মিনিটের জন্ত একবার সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়া তাঁহার জীবন কৃতার্থ করুক, তিনি এ জন্মের মত বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যদি মা-সোয়ে সম্পূর্ণ একাকী দেখা করিতে সাহস না পায়, তবে যেন তাহার বর্ত্তমান স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের বাংলোর বাগানের ফটকের কাছে একবার আসে, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লুজী ও তাহার স্ত্রীর পরামর্শে ড-মিয়া-সোয়ে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে রাজী হইল।

কানে কানে এ কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। দরজী মঙ্-পে তাহার বন্ধুবান্ধবসহ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের বাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সাহেব খবর পাইয়া বাগানের দরজায় আসিলেন। ড-মিয়া-সোয়ে ও তাহার স্বামীর সহিত সসম্ভ্রমে করমর্দ্দন করিলেন। ড-মিয়া-সোয়ের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, শত চেষ্টাতেও অবাধ্য অশ্রুধারা বাধ মানিল না, বক্ষ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। পরস্পরে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সাহেব রুমালে চক্ষু মুছিয়া যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি যুদ্ধশেষে তিন বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া মা-বাপের অনুরোধে বিবাহ করি। যুদ্ধের সময় তোমাকে খুব মনে পড়িত কিন্তু চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার নানা অসুবিধা হইত। তার পর দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিবার পরই বর্ম্মার কাজে ফিরি এবং নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়িয়াছে, কিন্তু নিজের মনকে চাপা দিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহার যখন বার বৎসর বয়স, তখন আমার স্ত্রী তাহার শিক্ষার জন্ত তাহাকে লইয়া দেশে চলিয়া যান। আমি দুই-তিন বৎসর পরে পরে দেশে যাই। এখন আমি পেন্সান লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে একবার স্যাণ্ডোয়ে দ্বীপে যাই, সেখানকার আব-হাওয়া আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তোলে। আমি

অনুভব করিতে থাকি যে আমি কি অবিচার করিয়াছি একটি নিরপরাধা রমণীর প্রতি। তখন হইতে তোমার অনুসন্ধানে কত স্থান ঘুরিয়াছি, কেহ তোমার সন্ধান দিতে পারে নাই। এই গ্রামের এক চৌকিদারের নিকট গ্রামের লোকের খবর লইতে গিয়া শুনি, এক জন দর্জ্জির ঘরে এক রূপসী রমণী আছে, যার স্বামী ছিল এক জন কমিশনার সাহেব। আজ আমার সন্ধানের শেষ হইয়াছে, আমি তোমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আমার একটি অনুরোধ তোমায় রাখিতে হইবে। আমি এই পাঁচ হাজার টাকার চেক্ তোমার নামে লিখিয়া আনিয়াছি, ইহা তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে, এবং আরও পাঁচ হাজার টাকার চেক্ আমি দেশে পৌঁছিয়াই পাঠাইব, তাহাও গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দাও। স্যাণ্ডোয়ে দ্বীপে আমি তোমার মায়ের একখণ্ড জমি কিনিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, এই টাকায় তুমি সেই জমির উপর একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে থাকিবে। বাকী পাঁচ হাজার টাকা হইতে কিছু ধান-জমি কিনিয়া চাষ-আবাদ করাইবে, তাহার দ্বারা তোমাদের জীবিকা সচ্ছল ভাবে চলিয়া যাইবে। আমার সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এইটুকু করিয়া যাইবার অধিকার যদি তুমি আমাকে দাও তবে আমি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে মরিতে পারিব।"

সকল কথাবার্ত্তা বর্ম্মী ভাষায় হওয়াতে মঙ্-পে অত্যন্ত খুশী হইল। তাড়াতাড়ি মা-সোয়ের হাত হইতে চেকখানি ধরিয়া দেখিয়া বলিল, "চল, চল, এবার কথা শেষ হয়েছে ত?"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "মঙ্-পে, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, স্ত্রীকে বিশ্বাস ক'রো, কখনও অসম্মান ক'রো না।"

মা-সোয়ে আর একবার সাহেবের হাতখানি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া চোখের জলে দৃষ্টি বিনিময় করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সাহেব গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দেখা গেল, অপলক-দৃষ্টিতে দূরের পানে চাহিয়া রহিলেন। আশেপাশের লোকেরা এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

৬

মাস-ছয়েক পরে স্যাণ্ডোয়ে দ্বীপের জাহাজ-ঘাটে লোকের ভিড়, অস্ফুট গোলমালে শোনা গেল ড-মিয়া-সোয়ের নামে বিলাত হইতে এক প্রকাণ্ড খামে করিয়া শিল-মোহর অঙ্কিত কি একটা কাগজ আসিয়াছে, সেটা লইয়া ড-মিয়া-সোয়ে রেঙ্গুন যাইতেছে। কোন্ ব্যাঙ্কে গেলে নাকি ঐ কাগজের বদলে তাহারা ড-মিয়া-সোয়েকে অনেক হাজার টাকা দিবে। "কি কপাল নিয়েই মেয়েটা জন্মেছিল! সাহেবকে এম্নি বশই করেছিল যে পালিয়েও ফাঁকি দিতে পারল না।"

জাহাজটি ধীরে ধীরে জেটী হইতে সরিয়া সুদূর নীল জলের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। তীরে মঙ্-পে রেশমের লুঙ্গীর উপর ব্লেজার কোট পরিয়া গোলাপী রেশমের গাউঙ্-বাউঙ্ বাঁধিয়া রেশমের রুমাল উড়াইয়া স্ত্রীকে ইসারা করিয়া বলিল, "শীঘ্র ফিরে এস কিন্তু।"

ড-মিয়া-সোয়ে জাহাজের প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত ডেকে রেলিঙে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া সজল নেত্রে আপন জন্মস্থান নিরালা দ্বীপটির সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে করিতে চির-আকাঙ্ক্ষিত সমুদ্র-যাত্রায় পাড়ি দিল। কিন্তু আজ সে একা—বড়ই একা! তাহার জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গীর প্রেম-বাহু যে আজ আর তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অভয়বাণী শোনাইল না!

জগদীশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছি—তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল—কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ, প্রাণ এজতি নিঃসৃতং," "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের

হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্তেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হোতে লাগল, একথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোক-বিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্ব-ভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত। এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয় বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

দুই দিক

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

সালজাক নদীটির দৃশ্য বিশেষ মনোরম নয়। এর পূর্ব্বতীরে শ্রীহীন, ম্লান, নিস্তব্ধ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম।

ভাড়া দেবার পয়সা না থাকায় খেয়া পার হ'তে অসমর্থ ক্ষীণকায়, শীর্ণ একদল ভিক্ষুকের মত জরাজীর্ণ বাড়ীগুলি নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে উঠেছে। তাদের ভাঙা দেওয়ালগুলি পরস্পরের উপর ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুণ-ধরা খুঁটিগুলো অনেক কষ্টে কোন রকমে গৃহের ভার বহন করছে। এদের কুদর্শন জানলাগুলি যেন বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ওপারের সুন্দর বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করছে। ওপারের বাড়ীগুলি খানিকটা দূরে দূরে অবস্থিত; মাঝে মাঝে আবার দুটো বাড়ী একসঙ্গে নির্ম্মিত হয়েছে। যত দূর দৃষ্টি চলে—কুহেলিকাচ্ছন্ন স্বর্ণাভ সুদূর অবধি নদীতীরস্থ শ্যামল সমতলভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুশ্রী সুরম্য অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যায়। এপারে কিন্তু আলোর চিহ্নমাত্রও নেই—আছে শুধু গভীর অন্ধকার বিরাট নিস্তব্ধতা আর তার সঙ্গে জীবনভারক্লান্ত উদাসীন নদীর মৃদু অবিরাম কলধ্বনি। সূর্য্য অস্তোন্মুখ, পতঙ্গদলের গুঞ্জনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে উঠেছে—নদীকূলের শরবনের ভিতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

একটু দূরে একটি নৌকা আসতে দেখা গেল।

নদীতীরস্থ একটি বাড়ীর বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে রুগ্না, শীর্ণা একটি স্ত্রীলোক নৌকার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রৌদ্রের তেজ নিবারণ করবার জন্য সে অতি ক্ষীণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। দূরে যেখানটি দিয়ে নৌকা আসছে সেখানে সূর্য্যের আলো পড়ে নদীর জল সোনার মত চকচক্ করছে—মনে হচ্ছে যেন নৌকাটি স্বর্ণনির্ম্মিত দর্পণের উপর দিয়ে ভেসে আসছে।

উজ্জ্বল গোধূলি-আলোয় স্ত্রীলোকটির পাণ্ডুর মুখমণ্ডল স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মুখেই যেন আলো রয়েছে। অমাবস্যার রাত্রেও যেমন সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গশিরে শুভ্র ফেনপুঞ্জ দেখা যায়, তার মুখও যেন সেই রকম আপন শুভ্রতায় জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। তার ভীতিপূর্ণ হতাশ চোখদুটি যেন কিসের অন্বেষণে ব্যস্ত; তার ক্লান্ত মুখে দুর্ব্বল ক্ষীণ একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু উন্নত ললাটের ঋজু রেখাগুলি সমস্ত মুখমণ্ডলে গভীর নিরাশার ছাপ এঁকে দিয়েছে।

গ্রাম্য গীর্জ্জায় সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বেজে উঠল।

অস্তগামী সূর্য্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে ইতস্ততঃ এমন ভাবে মাথা নাড়তে লাগল, দেখে মনে হয় যেন ঘণ্টাধ্বনি যাতে তার কানে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্যই সে এই রকম করছে। যেন ঐ অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির উত্তরেই সে অস্ফুটস্বরে বলল, "আর আমি পারি নে, আর আমি অপেক্ষা করতে পারি নে।"

কিন্তু ঘণ্টা বাজতেই লাগল।

যেন গভীর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে আরম্ভ করল। তার বিষণ্ণ মুখমণ্ডলে নিরাশার ছায়া এবার আরও গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। কান্নায় সমস্ত শরীর ভেঙে পড়তে চাইলেও যখন কিছুতেই কান্না আসতে চায় না সেই সময়কার মত মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস তার বক্ষপঞ্জর ভেদ ক'রে উত্থিত হ'তে লাগল।

বহু বর্ষ ধরে সে এক যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগছে—রোগের জ্বালায় সে এক মুহূর্ত্তও সুস্থিরভাবে থাকতে পারে না। না পারে বসতে, না পারে দাঁড়াতে, না পারে শুতে। অনেক বিজ্ঞ, প্রবীণা স্ত্রীলোকের কাছে সে পরামর্শ নিয়েছে, অনেক তীর্থের জলে সে স্নান করেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। অবশেষে সে গত সেপ্টেম্বর মাসে সেন্ট বার্থলোমীর তীর্থে গিয়েছিল—সেখানে এক জন একচক্ষু

বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে একটা ঔষধ ব'লে দিলেন। তিনি বলেছিলেন, একটা এডলউইসের তোড়া, এক টুকরো কাচ, খানিকটা তুষ, কবরের উপরকার কয়েকটা পাতা, তার নিজের মাথার একগোছা চুল, আর শবাধারের এক টুকরো কাঠ—এই সব একসঙ্গে বেঁধে একটা তোড়া ক'রে সেটা যদি সুস্থ সবল কোন মেয়ে—যে নৌকা চড়ে উজান বেয়ে তার দিকে আসবে—তার গায়ে ছুঁড়ে দিতে পারে তাহলে তার রোগটা সেই মেয়েটির শরীরে চলে যাবে—সে নিজে সুস্থ হয়ে উঠবে।

যাদুকরের কাছ থেকে পাওয়া ঔষধটি সংগ্রহ করবার পর এই প্রথম একটা নৌকাকে উজান বেয়ে তার দিকে আসতে দেখে সে সেটা শালের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আবার সে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। নৌকাটা এবার খুব কাছে এসে পড়েছে। নৌকায় ছয় জন আরোহী—তাদের কাউকেই পরিচিত ব'লে বোধ হ'ল না। নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে এক জন নৌকা ঠেলে নিয়ে চলেছে আর হাল ধরে ব'সে আছে একটি মেয়ে, সামনের লোকটির নির্দ্দেশ-মত সে নৌকা চালনা করছে, মেয়েটির পাশে ব'সে একটি যুবক; বাকী সকলে বসেছে নৌকার মাঝখানে।

রুগ্ন স্ত্রীলোকটি রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ল—তার মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল, উত্তেজনায় তার ললাটের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল, নাসিকা স্ফীত ও গণ্ড আরক্ত হয়ে উঠল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে সে নৌকার আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কখনও জোরে, কখনও আস্তে নৌকার আরোহীদের কথাবার্ত্তার শব্দ এবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

এক জন বললে, "সুখের ধারণাটা নেহাৎই পৌত্তলিক—সমস্ত নিউ টেষ্টামেণ্টের কোন জায়গাতেই ও-কথাটার একবারও উল্লেখ নেই।"

আর এক জন বললে, "আর মুক্তি?"

অপর এক জন বললে, "শোন, শোন—সত্য বটে যে প্রথমে যা নিয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা হয় তাকে ছাড়িয়ে যত বেশী দূরে যাওয়া যায় সেটা ততই বেশী আদর্শ কথোপকথন আখ্যা লাভ করে, কিন্তু আমার মনে হয় যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা যদি আবার সেই আদি বিষয়ে ফিরে যাই, তাহলেই সে উদ্দেশ্যটা সব চেয়ে ভাল ক'রে সিদ্ধ হবে।"

"আচ্ছা তবে তাই হোক। গ্রীকেরা—"

"না, প্রথমে ফিনীসীয়দের কথা—"

"তুমি ফিনীসীয়দের বিষয়ে কি জান বল ত?"

"কিছুই না—কিন্তু তাদের সব সময়েই বাদ দিয়ে যাওয়া হবে কেন?"

নৌকাটা এবারে বাড়ীর ঠিক সামনে এসে পড়ল, এই সময়ে এক জন আরোহী দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল আর আলোটা ঠিক মেয়েটির মুখের উপর পড়ল। আগুনের রক্তাভ আলোয় দেখা গেল স্বাস্থ্যবতী প্রফুল্লমুখী একটি মেয়ে, তার ঠোঁটের কোণে সুখের হাসি, ঊর্দ্ধ-গগনে নিবদ্ধ তার উজ্জ্বল চোখ দুটিতে স্বপ্নভরা মধুর আবেশের আমেজ। আগুনটা নিবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ঝপ ক'রে কোন জিনিষ পড়বার মত একটা শব্দ হ'ল—নৌকাটা দূরে সরে গেল।

এক বছর পরে। নানাবর্ণরঞ্জিত উজ্জ্বল মেঘের মাঝখানে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, নদীর কালো জলে রক্তের মত লাল আভার ছায়া পড়েছে। নদীতীরে শরবনে মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। আজ আর পতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে না—আশেপাশে কোথাও তাদের চিহ্নমাত্রও নেই। কানে আসছে খালি নদীর মৃদু কলধ্বনি আর শরবনে বাতাসের শন্‌ শন্‌ শব্দ। দূরে নদীর বুকে একখানি নৌকা ভেসে আসতে দেখা গেল।

পূর্ব্বদৃষ্টা সেই স্ত্রীলোকটি নদীর ধারে নেমে এসে দাঁড়াল। ঐন্দ্রজালিক ঔষধটা মেয়েটির প্রতি ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরই সে অজ্ঞান হয়ে যায়; গভীর উত্তেজনা অথবা নবাগত ডাক্তারের চিকিৎসা—যাই হোক্‌, তার রোগে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন নিয়ে এল। ধীরে ধীরে সে আরোগ্যের পথে চলল—অবশেষে একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠল। প্রথমটা সে এই নূতন-ক'রে-পাওয়া সুস্থতার আস্বাদ লাভ ক'রে উল্লসিত উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এ-ভাব তার বেশী দিন থাকল না। ক্রমে ক্রমে সে অত্যন্ত নিরানন্দ ও বিষণ্ণ হয়ে

উঠল, গভীর হতাশা তাকে অস্থির ক'রে তুললে। কারণ তার চোখের সাম্‌নে সব সময়ই ভাসত নৌকার সেই মেয়েটির মুখ, মনে হ'ত মেয়েটি যেন তার সামনে এসে নতজানু হয়ে অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে সে ছবি অদৃশ্য হয়ে যেত। মেয়েটির অবিরাম কাতরোক্তি সে সব সময়ই শুনতে পেত। যদিও বা এই কাতরধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হ'ত তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে তার করুণ মূর্ত্তি দেখা যেত। শেষে এমন হ'ল যে তার চোখের সাম্‌নে সব সময়ই ভাসত বিবর্ণ, শীর্ণ মেয়েটির ম্লান মুখচ্ছবি। বিশাল সবিস্ময় দুই চোখের দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকত।

আজ সন্ধ্যায় সে নদীর ধারে বেড়াতে এসেছে। তার হাতে একটি ছড়ি, সেই ছড়িটা দিয়ে সে নদীতীরের নরম মাটির উপর একটির পর একটি ক্রুশ এঁকে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে কি যেন শোনবার চেষ্টা করছে, তার পর আবার নত হয়ে ক্রুশ আঁকছে।

একটু বাদেই গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল।

পরম সতর্কতার সঙ্গে সে শেষ ক্রুশটি আঁকল, ছড়িটা দূরে ফেলে দিল, তার পর নতজানু হয়ে ব'সে প্রার্থনা করতে লাগল। প্রার্থনা হয়ে গেলে সে ধীরে ধীরে নদীতে নেমে গেল। যখন বুক অবধি জল পৌঁছল তখন সে যুক্তকরে প্রণাম ক'রে সেই গভীর কালো জলের তলায় তলিয়ে গেল; জলরাশি তাকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল, তার পর আবার আগেকার মতই নিরানন্দ বিষণ্ণভাবে গ্রামের পাশ দিয়ে, মাঠের ধার দিয়ে কুলকুল করে প্রবাহিত হ'তে লাগল।

নৌকাটা এবারে খুব কাছে এসে পড়েছে, আগের বছর যারা নৌকায় ছিল এবারেও তারাই রয়েছে। আজকে তারা বিবাহোৎসব উপলক্ষ্যে এই নৌকাবিহারে বেরিয়েছে। বর বসেছে হাল ধ'রে আর বধূ দাঁড়িয়ে আছে নৌকার মাঝখানে—তার মাথায় একটি লাল ওড়না আর গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল। পালহীন মাস্তুলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে মৃদুস্বরে গান করছে। একবার সে সহাস্যে কর্ণধারের দিকে তাকাল, তার পর আকাশের দিকে চেয়ে আবার গান করতে লাগল।

মাস্তুলের গায়ে ভর দিয়ে ভাসমান মেঘগুলির প্রতি তাকিয়ে মৃদুস্বরে সে গান করছে—আনন্দ-উদ্বেল, উল্লাসভরা সুখের গান।*

* Jeus Peter Jacobson লিখিত "Two Worlds" নামক গল্পের অনুসরণে।

আপাত-দৃষ্টি

[ব্রাউনিঙের Appearances অনুসরণে]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সে ঘর হয় নি তব মনের মতন?
নিরানন্দ অন্ধকার রিক্ত অশোভন
মনে হয়েছিল বুঝি ভিতরে তাহার?
আমি শুধু এই জানি, হৃদয়-দুয়ার
খুলেছিলে সেই ঘরে; শপথ করিয়া
সেই গৃহকোণে মোরে লইলে বরিয়া।
বারেক জিজ্ঞাসা করি' দেখিও সে ঘরে,
শুনিল সে বাণী তব কি পুলক ভরে!

এই সুসজ্জিত কক্ষ এত মনোহর?
হর্ষোজ্জ্বল যেন সর্ব্ব সুখের আকর!
মুখে তব প্রশংসা যে নাহি আর ধরে!
তবু মনে রেখো তুমি, মোরে এই ঘরে
শুনালে তোমার সেই নিদারুণ বাণী,
এ প্রকোষ্ঠ জানে তাহা, আর আমি জানি।
শুধালে, সুরম্য কক্ষ বলিবে তোমায়
মুখোশ খসালে তুমি কেমনে হেথায়!

ব্রহ্মের কেরিণ জাতি

শ্রীসুষমা বিদ

ব্রহ্মপ্রবাসকালে আমরা সেখানকার বনে-জঙ্গলে ও পার্ব্বত্য ভূমিতে অনেক দিন কাটিয়েছিলাম, আর সেই সূত্রে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সংশ্রবে আসি। যুগের পর যুগ, লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস ক'রে এই সব জাতির মধ্যে যে রীতিনীতি এবং জীবনধারার পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে তা জানবার জন্যে স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়েছিল। তাদের ভাষা হয়ত সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের ব্যবহার সবাইকে প্রীত করে।

ব্রহ্মের আদিম অধিবাসী তেলেঙদের গৌরবময় দিনের অবসান হয়েছে। একদিন যাদের সভ্যতাধারায় ব্রহ্মের চতুর্দ্দিক প্লাবিত হয়েছিল, তারা আজ বিগত-কীর্ত্তি হয়ে কি ক'রে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে তা ইতিহাসের কথা। মৌলমিন, পেগু প্রভৃতি স্থানে তারা সংখ্যায় এখনও গরিষ্ঠ হ'লেও সভ্যতার গর্ব্ব আর তাদের নেই। এমন কি, ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাতে বসেছে।

দক্ষিণ-ব্রহ্মে ভ্রমণের সময় আমরা কেরিণদের বিশেষ সংস্পর্শে এসেছিলাম। এরাও প্রাচীন ব্রহ্মের আদিম অধিবাসীদের অন্যতম। 'কেরিণ' শব্দটি চৈনিক 'কিয়াং' শব্দ থেকে উদ্ভূত। ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, পেগু এবং টেনাসেরিমেই অধিকাংশ কেরিণের বাস। তা ছাড়া শ্যামদেশেও প্রচুর সংখ্যায় ওদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে শাণ-রাজ্যে এবং দক্ষিণে ট্যাভয় ও মারগুইয়ের গিরিপ্রদেশেও কেরিণরা বাস করে।

অধিকাংশ জাতির মত এরাও মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণে আসতে আরম্ভ করে এবং কেরিণনি ও তার চারিপাশের ভূমিতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করে। এদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এরা অন্যান্য ভ্রমণশীল জাতির সঙ্গে কখনও কোন সংঘর্ষে অথবা সংস্পর্শে না এসে, নিজেদের বাসের উপযোগী স্থান ও চাষের উপযোগী জমি গ'ড়ে তুলতে পেরেছিল।

কেরিণ জাতি সংখ্যায় প্রায় ১১০২০০০ হবে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে এদের 'তাই-চৈনিক' পর্য্যায়ভুক্ত (Tai-Chinese group) করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞরা আজকাল এদের মূলতঃ চৈনিক ব'লেই স্বীকার ক'রে নেন। শাণ এবং চৈনিকদের সঙ্গে কেরিণদের ভাষাগত সম্পর্ক আছে ব'লে আমাদের মনে হয়। অনেকে বলেন, শাণদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে এরা চীন থেকে পালিয়ে আসে। চীনের সঙ্গে এই সম্বন্ধ কেরিণরা বেশ প্রসন্নমনে মেনে নেয়। ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে ওদের তেমন মিল হয় না। তিব্বত-বর্ম্মী (Tibeto-Burman) ব'লে পরিচয় দিতে তাই ওদের ঘোরতর আপত্তি। টংথু এবং লাহু নামে আরও যে দুটি আদিম সম্প্রদায় আছে, তাদের ওরা আত্মীয় ব'লে গ্রহণ করে।

কেরিণ জাতির মধ্যে দুটি বড় বিভাগ আছে, পো-কেরিণ এবং স্গাও-কেরিণ। পো-কেরিণদের কখনও কখনও তেলেঙ-কেরিণ বলা হয়, কারণ ক্রমশঃ এরা আরও দক্ষিণে এগিয়ে যায় এবং সেখানে বসবাস আরম্ভ করে। দক্ষিণে থাকার সময়ে এরা বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে তেলেঙ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে যেতে আরম্ভ করে। কিংবদন্তী যে, এরা তেলেঙদের কাছ থেকেই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ইউরোপীয় পাদরীদের প্রভাবে এরা আজকাল অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ছে। এক জন বৈদেশিক লেখক ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, পো-কেরিণদের দুটি প্রধান দুর্ব্বলতা হচ্ছে—অত্যধিক মাত্রায় খ্রীষ্টান হবার ঝোঁক, আর জীবনে হাস্যরসের অভাব।

স্গাও-কেরিণরাও এই সব পাদরীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তাঁরাও দলে দলে আজকাল খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত

উপরে : প্যাগোডার একটি প্রবেশ-দ্বার—চৈনিক গেট
নীচে : জুবিলী-হলে বর্ম্মী মহিলাদের সমাবেশ

উপরে: জঙ্গল হইতে কাঠ ভাসাইয়া আনা হইতেছে

নীচে: মহিলারা প্যাগোডার প্রাঙ্গণ ধৌত করিতেছেন

হচ্ছে। স্গাও-কেরিণরা ব্রহ্মবাসীদের মত চতুর এবং বুদ্ধিমান না হলেও অনেক ক্ষেত্রে ওদের চেয়ে শিক্ষিত। ব্রহ্মবাসীদের থেকে এদের জাতিগত পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্তে অনেকে এদের অযাচিত উপদেশ এবং পরামর্শ দেয়। কিন্তু এদের মধ্যে বাস ক'রে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে এরা যদি এই সব ভুল উপদেশ না শুনে ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়, তাতে এদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অন্যান্য অনেক বিষয়ে এরা প্রচুর লাভবান্ হবে। বনে বনে, অর্দ্ধসভ্য জাতির মত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেয়ে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ব্রহ্মজাতির সঙ্গে মধ্যে অনেকে চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন।

কেরিণদের মধ্যে যারা বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্ব্বতে বাস করে তারা কোন অচেনা লোক অথবা বিদেশীকে দেখলে বন্য পশুর মত, সন্ত্রস্ত ভাবে পালিয়ে যায়। বিশেষ ক'রে ব্রহ্মবাসীদের সম্বন্ধে এদের একটা বদ্ধমূল ভয় আছে এবং সেটা পুরুষপরম্পরায় চলে আসছে। এরা লোকালয় থেকে শত যোজন দূরে, গভীর অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটীর বেঁধে বাস করে। যেখানে রাজপথ আছে অথবা নদীর পথে আগন্তুকের আস্যর সম্ভাবনা আছে, সে-স্থান ওরা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। তাই সকল পন্থার অতীতে, নদনদীর

সোয়েড্যাগন প্যাগোডার একটি অংশ

প্যাগোডার অভ্যন্তর

মিশে যাওয়া হয়ত জাতির পক্ষে বিশেষ উপকারজনক হ'ত। ভারতবর্ষে সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। শক, হূণ, দ্রাবিড় প্রভৃতি কত উপজাতিই ত আর্য্যজাতির বিপুল সভ্যতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। আজ তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্র জাতি হিসাবে আমরা যে তাতে লাভবানই হয়েছি, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সেই হিসাবে, ব্রহ্মেও যদি মিলনের বন্যা আসে, তাতে কোন ক্ষতি নেই আর তৃতীয় পক্ষের তাতে হস্তক্ষেপ করাও সমীচীন নয়।

কেরিণদের মধ্যে আবার অধিকাংশই গিরিপর্ব্বতে বাস করে। সমতলভূমিতেও কেউ কেউ থাকে। সমতল-বাসীরা বেশ সভ্য হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখা যায়। আজকাল এদের

শেষে, ব্রহ্মের যে জনবিরল অরণ্যানী আছে তারই নিবিড়তম অন্তরে এই পাহাড়ী কেরিণদের বাস। যদি ওরা দৈবাৎ শুনতে পায় যে ওদের বাসস্থানের কাছে কোন রাস্তা তৈরি হবার সম্ভাবনা আছে, তবে ওরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তখনই বাসা গুটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। বাইরের লোকের উপর তাদের অগাধ বিতৃষ্ণা। এই রকম অবস্থা এবং আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে এরা ক্রমশঃ ভীরু এবং সন্দিহান হয়ে উঠেছে। পরস্পরের মধ্যে তেমন বিশ্বাস নেই এবং মন খুলে কেউ কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারে না। এরা যদিও শিকারে খুব তৎপর, তবু যোদ্ধা হিসাবে কোন দিন এদের খ্যাতি নেই। লোকালয়-ভীতিই বোধ হয় তার প্রধান কারণ। তা ছাড়া এদের মধ্যে এমন কোন বুদ্ধিমান নেতা কখনও জন্মগ্রহণ

করেন নি যিনি নিজের প্রভাব বিস্তার ক'রে শত খণ্ডে বিভক্ত কেরিণদের একটা সমগ্র জাতিতে পরিণত করতে পারেন। যথোচিত নৈপুণ্য এবং নেতৃত্বের অভাবে এরা শক্তিমান হয়েও ভীরু ও হীনবীর্য্য। এদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের দিকে তাকালে মনে হয় না—বল এদের কিছু কম আছে।

যে-সমস্ত পার্ব্বত্য কেরিণ দাওনা পাহাড় অথবা শ্যাম-সীমান্তে বাস করে তারা আবার বিশেষ ক'রেই সকলের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। লোকালয় থেকে বহুদূরে থাকার দরুন বহির্জগতের কোন সংবাদ তাদের কানে পৌঁছায় না। আপনাদের সুবিধা-অসুবিধা অনুসারে তারা কতকগুলি নিয়মকানুনের সৃষ্টি করেছে। তারই সাহায্যে

প্যাগোডার অভ্যন্তর

তারা নিজেদের পারিবারিক এবং বৈষয়িক দ্বন্দ্ব আপোষে নিষ্পত্তি করে। এরা 'নাথ' পূজার ভক্ত। এমন কি, যখন আগন্তুকের আসার সম্ভাবনায় ঘর ছেড়ে এরা পালিয়ে যায়, তখনও প্রথমে মুরগীর হাড় দিয়ে 'নাথ'-দেবতার পূজা করে। তাঁর সন্তুষ্টি সাধনের পর, তাঁরই পরামর্শ মত অন্যত্র বাসস্থান খুঁজতে যায়। এরা যদিও অধিকাংশই নাথের পূজা করে, তথাপি এদের মধ্যে অনেকে একই সঙ্গে নাথ এবং বুদ্ধের উপাসক।

কুসংস্কার, লোকালয়-ভীরুতা প্রভৃতি বহুবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও এদের কয়েকটি গুণ আছে। এরা অতিথিবৎসল জাতি। এদের অনেক গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করেছি যে, এরা মুরগী এবং বরাহমাংস এনে আমাদের অভ্যর্থনা করেছে। তাছাড়া এদের বিবাহাদি ব্যাপারে এরা গ্রামের সকল লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে পানাহারে সাধ্যানুযায়ী তুষ্ট করে। আগন্তুকেরা এদের কোন অনুমতি গ্রহণ না ক'রেও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য নিয়ে নিজেকে পরিতুষ্ট করতে পারে। এরা তাতে কোন বাধা দেয় না বরং আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করে। এরা খুব ন্যায়পরায়ণ, কখনও এদের মধ্যে চুরি

জলখেলার জন্ম স্নানের টুল

হয় না। মাঠে ফসল কাটার পর, যদি দৈবাৎ তা সময়মত ঘরে নিয়ে আসতে না পারে, তাহলে এরা দুঃখিত হয় না, কারণ তা অপহৃত হবার সম্ভাবনা নেই।

এরা পুরনো লোহা এবং ইস্পাত দিয়ে বেশ সুন্দর এবং মজবুত বন্দুক প্রস্তুত করে এবং তা বিদেশী বন্দুকের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। সেই সব বন্দুক হাতে ক'রে এরা যথেচ্ছ বন্যপশু শিকার ক'রে বেড়ায়। এদের শিকারে পারদর্শিতার খ্যাতি আছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে গান গাইতে এরা খুব ভালবাসে। অনেকে বলেন, এরা সব সময়েই বিষণ্ন হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের তা কখনও মনে হয় নি। এদের

কেরিণদের গ্রাম

গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে। আজ এরা সংখ্যায় মাত্র ৪৬ হাজারে পরিণত হয়েছে। সালেনের ধারে পাওয়েতে এরা এখনও সংখ্যায় গরিষ্ঠ। সেখানে বাইশ-তেইশটি গ্রামে টংথুদের বসতি আছে। এরা প্রায়ই এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠে যেতে ভালবাসে। আমাদের দেশের বেদেদের মতই এরাও চিরকাল এক জায়গায় বসবাস করতে ভালবাসে না। টংথুরা 'লুবিয়ো গজ' অর্থাৎ তরুণদের সর্দ্দার নির্ব্বাচন করে এবং তার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়। এরা বৌদ্ধ, কিন্তু নাথ-পূজাও করে।

মেয়েরা নানাবিধ ধাতুর গহনা এবং রং-করা লুঙ্গি পরতে ভালবাসে। কেউ কেউ গলায় ধাতু-নির্ম্মিত হাঁসুলি পরে এবং তার ফলে গলা জিরাফের মত লম্বা এবং শক্ত হয়ে যায়।

যজ্ঞ ও মানসিক্ প্রভৃতি বাড়ীর সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মে কেরিণরা নাথ-পূজাই ক'রে থাকে, কিন্তু বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৃহৎ সামাজিক ব্যাপারে বুদ্ধের পূজা ও উপাসনা করা হয়। এদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। অধিকাংশ কেরিণ স্গাও ভাষাতেই বাক্যালাপ করে।

টংথু ভাষার সঙ্গে পো-ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যদিও কেরিণদের সঙ্গে টংথুদের এখন অনেক রকম পার্থক্য দেখা যায়, তবু মনে হয় টংথুরা কেরিণদেরই বংশধর। টংথু নামের অর্থ, দক্ষিণ-বাসী। থাটন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে বাস করার দরুনই ওরা এই নাম পেয়েছে। টংথুরা নিজেদের পাও বলে, ওটা পো-এরই অপভ্রংশ। নিজেদের আদিমবাস 'সাটুং' বলে,—আর সাটুংকে থাটুনের বিকৃত রূপ ব'লে গণ্য করা হয়।

থাটুনে এক সময়ে টংথুদের রাজত্ব ছিল। এদের বিভিন্ন রাজার মধ্যে আজও 'থিট টবং মিঙ্গির' নাম লোকমুখে শোনা যায়। কিন্তু কালক্রমে এদের রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে

শাণ-রাজ্যে যে-সমস্ত টংথু বাস করে তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। তারা শাণদের মত পোষাক পরে, তাদের ভাষায় কথা বলে এবং শাণ-টংথু ব'লে নিজেদের পরিচয় পর্য্যন্ত দেয়।

কেরিণ-ছেলেমেয়েদের দেখতে খুব সুন্দর। বেশভূষা এবং প্রসাধনে তাদের বড় চমৎকার মানায়। যদিও পাহাড়ী

কেরিণরা জঙ্গল হইতে পাতা সংগ্রহ করিতেছে

কেরিণ গ্রামবাসী

কেরিণরা বিদেশীদের, বিশেষতঃ ব্রহ্মবাসীদের, দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, তবুও যদি তাদের সঙ্গে সরল ভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তারা আগন্তুকদের সঙ্গে এমন অমায়িক এবং ভদ্রভাবে মেশে, যে, বাস্তবিক আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। আমাদের যান্ত্রিক-সভ্যতাকে ওরা ভয় করে, তাই লোকালয়ের ধারে ওরা বাস করতে চায় না। আমরা সরলতার প্রমাণ দিয়ে ওদের আশঙ্কা দূর ক'রে দিলে ওদের বহির্জ্জগৎ-ভীতি দূর হয়ে ওরা পরমোপকারী সুহৃদে পরিণত হ'তে পারে।

কেরিণরা গীতবাদ্যের খুব ভক্ত। সর্ব্বত্র বালকবালিকা, তরুণ এবং বৃদ্ধ, মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। এদের মিষ্ট কণ্ঠের গ্রাম্য-গীতি এই নির্জ্জন দেশে আমরা বড় উপভোগ করেছিলাম।

এরা বিবাহ প্রভৃতি দুই-একটি উৎসব ভিন্ন মদ্যপান করে না এবং অহিফেন-সেবনেও আসক্ত নয়। তবে এরা পাইপের খুব অনুরক্ত। লম্বা লম্বা দেশীয় পাইপে ব্রহ্মদেশের তামাক ভর্ত্তি ক'রে এরা মনের আনন্দে ধূমপান করে। মাঝে মাঝে গ্রামের যে আসর বসে, সেখানে পরচর্চ্চা, পরনিন্দা চলে না, পরশ্রীকাতরতায় কেউ উল্লসিত হয়ে ওঠে না। সেখানে আলোচনা হয় বিবাহের ভোজের অথবা নাথ-দেবতার পূজার। কখনও বা কেরিণ-বালিকাদের গীত এবং নৃত্যে সে সভা মুখরিত হয়ে ওঠে।

সুখে দুঃখে আপনার মনে বাস করলেও, জাতিহিসাবে কেরিণরা ধ্বংসের পথে চলেছে। সংখ্যায় তাদের বৃদ্ধি নেই এবং সভ্য জগতে তারা আপনার বুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ পায় না। এদের উদ্ধারের জন্য মিশনরীরা মাঝে মাঝে সামান্য কিছু চেষ্টা ক'রে থাকেন কিন্তু তার ফল নিশ্চিত নয়। আশা করা যায়, প্রগতিশীল ব্রহ্মবাসীরা তাঁদের দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের লুপ্তির পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যত্নবান হবেন।

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

১৬ই আকাশ একেবারে পরিষ্কার। শরৎকালের মত নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ছাড়া আর কোনও মেঘ নেই। সমুদ্র ঘন নীল, উজ্জ্বল নীলার মত, কিন্তু এমন সুন্দর দিনেও তেমনই তাণ্ডব নৃত্যে রত। আগে মনে হ'ত পাহাড়ের মত ঢেউ কথাটা একটা কবিত্বের কথা, এখন দেখছি কবিত্বের এক কণা ভেজালও এতে নেই। অনবরত সমুদ্র মন্থন চলেছে আর ঢেউএর মাথায় মাথায় মণি জ্বলে উঠছে। এটা বঙ্গোপসাগর ব'লে এর এত দস্যিপনা। অন্য সমুদ্রের তুলনায় এর দুর্দ্দান্তপনা চিরকালই বেশী।

মানুষের পেটের ভিতরও মন্থন চলেছে বলে মেম-সাহেবরা দুই-তিন জন আজও কেবিনে কাতরভাবে পড়ে আছেন। আমার মেয়েটি একবার ছুটোছুটি করতে চেষ্টা করছে আবার কান্নাকাটি করছে। কেউ সারাদিনে একবার টেবিলে খেতে আসে কেউ তাও আসে না। চাকরেরা অল্প-স্বল্প খাবার ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, তাও খানিক পরে ট্রে-সুদ্ধই ফিরে আসে।

আমাদের জাহাজটা ছোট ব'লে এতে খেলাধুলোর আয়োজন খুব বেশী নেই। গ্রামোফোন, পিয়ানো ইত্যাদি ছাড়া ডেক্-গল্‌ফ প্রভৃতি কয়েকটা খেলার ব্যবস্থা ও জিনিষ আছে। সেদিন উপরের ডেকে ডেক্-গল্‌ফ খেলা হচ্ছিল। আমাদের জাপানী সহযাত্রী বললেন, "ডেক্-গল্‌ফ সাঁতারের পোষাক প'রে খেলতে হয়।" শুনেই ফরাসী বালিকাটি তার সাঁতারের পোষাকটা নিয়ে এসে হাজির করল। জাপানীকে বললে, "আমি পরছি, তোমাকেও কিন্তু

রিক্‌শ কুলিদের আড্ডা
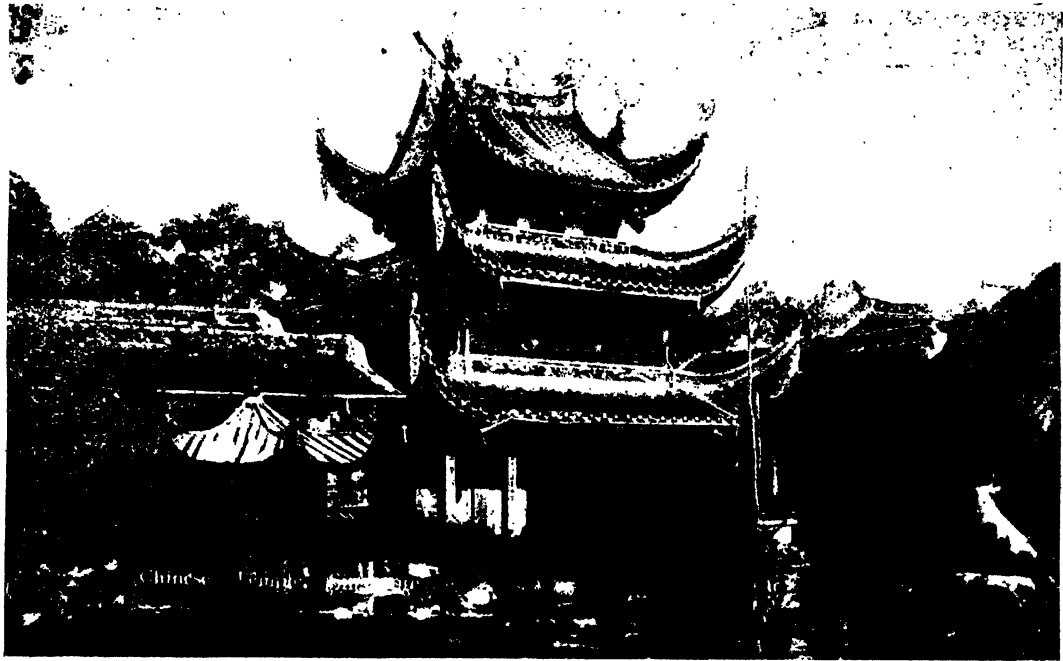
চীনা মন্দির

পরতে হবে।" জাপানী বললেন, "জোক্ অর নো জোক্ (Joke or no Joke)? সকলে যদি পরে ত আমিও পরব।" আমি মনে করলাম ঠাট্টা-তামাসাতেই বুঝি ব্যাপারটা শেষ হবে। অকস্মাৎ দেখলাম এক জন বয়স্কা মেমসাহেব হৃষ্টপুষ্ট চেহারায় সাঁতারের পোষাক প'রে খেলার জায়গায় এসে হাজির। সেই নামমাত্র পোষাকেই তিনি খেলা সুরু করলেন। যে সব যাত্রীদের এই রকম পোষাক দেখা অভ্যাস নেই তারা ভিড় করে কেউ দেখতে এবং কেউ খেলায় যোগ দিতে সোৎসাহে এসে দাঁড়াল। ইউরোপীয়দের এসব অষ্টপ্রহর দেখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, তারা খেলার জায়গা ছেড়ে হাওয়াই বাজনা বাজাতে ও শুনতে অন্য দিকে চলে গেল।

জাহাজের বালিকা যাত্রী দুটি ক'দিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করছিল যে একদিন জাহাজে 'শাড়ী পার্টি' করতে হবে। আজ তাদের সেই পার্টির দিন। চা খাবার পর বিকাল বেলা মেয়েরা এল আমার কাছে শাড়ী ধার করতে। সব মেমসাহেবের ত শাড়ী নেই। শাড়ী জামা অনেকগুলো দিতে হ'ল। মিশনরী মেমরা এদেশে বহুকাল থেকেছেন। তাঁদের সকলেরই নিজস্ব শাড়ী আছে। সে শাড়ীগুলো কিন্তু অত্যন্ত সস্তার কাপড়। ইউরোপ আমেরিকায় নিয়ে গেলে আমাদের দেশের শিল্পের প্রতি ন্যায় বিচার করা হয় না। তবু সেইগুলোই দেখছি তাঁরা কিনেছেন। এক জন একখানা পার্শি দামী কাপড় কিনেছেন। কিন্তু সেখানাও আধুনিক ধরণে সেলাই ক'রে পাড় বসানো। তাকে ভারতীয় শিল্পের নমুনা হিসাবে উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। মেমসাহেবরা সাজগোজ ক'রে উপরে চলে গেলেন। আমি যখন উপরে গেলাম তখন তাঁদের 'শাড়ী পার্টি'র ফটো তোলা হয়ে গিয়েছে। সবাই ভারতীয়া সেজেছেন, কিন্তু সত্যি ভারতীয়াই বাদ পড়ে গেলেন। আমার মেয়েটি অবশ্য বাদ পড়ে নি।

১৭ই সমুদ্র অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে। ঢেউয়ের বহর আর তেমন নেই। ছোট ছোট ঢেউগুলি ছেলেমানুষের খেলার মত যেন ঘুরে ঘুরে নাচছে।

১৭ই রবিবার, মিশনরী মেমরা দুঃখ করছিলেন জাহাজে উপাসনা হয় না ব'লে। জাপানীদের জাহাজ, তারা কিছুই গা করল না। মেমসাহেবরা বললেন, "অন্য জাহাজে

মালয়বাসীদের গানবাজনা

(অর্থাৎ ক্রীশ্চান জাহাজে) উপাসনা সাধারণের জন্য হয়, অনেক জায়গায় কাপ্তেনরাই বাইবেল পড়ার ভার নেন।” শুনেছি কোথাও কোথাও প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক দুই রকম যাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা হয়। যার যেমন খুশী সে তেমন ভাবে যোগ দেয়, কেউ কেউ যায়ও না। আমাদের সহযাত্রিণী মিশনরী মেমরা নিজেরাই বসে বসে বাইবেল নিয়ে পড়লেন। যারা ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারে না তারা রবিবার ব'লে প্রাণপণে সাজল। বড় বড় বেলুন হাতা ও লুটিয়ে-পড়া লম্বা গাউনের কি ঘটা! কে বলবে এঁরাই দিনে দুপুরে হাফপ্যাণ্ট ও সাঁতারের জাঙ্গিয়া পরে সর্ব্বসাধারণের সামনে ঘুরে বেড়ান?

আজ দুপুরে জমির দিকে পাহাড়গুলি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন মাঝসমুদ্রে ভাসছিলাম, আজ আবার জমি দেখা দিল। এখানে জল ঘন সবুজ, কিন্তু এই ক'দিনের মত স্বচ্ছতা আর ঔজ্জ্বল্য নেই, শেওলার মত ম্যাড়মেড়ে। যাত্রীরা বলছেন কাছের পাহাড়গুলি নাকি নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। যত বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসতে লাগল ততই পাহাড় গাছপালা খুব স্পষ্ট হয়ে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। এত কাছে যে মনে হয় জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে চলে যাওয়া যায়। পাহাড়গুলির উপরে নীচে বাড়ী, ঘন নারিকেল কুঞ্জ, সবুজ শস্যক্ষেত্র, জোড়া বাংলো সব পরিষ্কার দেখা যায়। একটা উঁচু টাওয়ার বোধ হয় বেতার ষ্টেশনের হবে।

১৮ই সকালে উঠে দেখি সমুদ্রকে আর সমুদ্র ব'লে চেনা যায় না। জল হ্রদের মত স্থির, নদীর জলও এমন স্থির হয় না। কথায় যে বলে তেলের মত জল এ যেন ঠিক তাই। ঘন তেলের সমুদ্র হাওয়ায় দোলে না পর্য্যন্ত। এটা বোধ হয় মলাক্কা প্রণালী। স্থির জলে মাঝে মাঝে মাছ লাফাচ্ছিল, ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছও ছিল। বঙ্গোপসাগরে উড়ুক্কু মাছরা যেমন ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় আবার জলে ডুব দেয় এখানে তত নেই। সমুদ্রের মাছ হওয়ার পক্ষে এদের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ছোট ছোট পার্শে মাছের মত দূর থেকে মনে হয়।

১৯শেও জল নদীর মত ঠাণ্ডা, রং ফিকে সবুজ। দুপুরে

নৌকার ঘাট

আমরা কলম্বো থেকে ১৩৯৯ মাইল চলে এসেছি। সিঙ্গাপুর আর ১৭০ মাইল দূরে। খুব মেঘ করেছে। সিঙ্গাপুর বৃষ্টির দেশ কিনা, কাছে আসতেই মেঘ। কাল ভোরেই সেখানে পৌছবে।

বেলা ১১টার সময় এন্‌-ওয়াই-কে লাইনের আর একটা জাহাজ আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাদের যাত্রীরা সব ডেকে বেরিয়ে এসে খুব রুমাল ওড়াচ্ছে। আমরাও ওড়ালাম। যখনই কোনও জাহাজ—বিশেষ করে এন্‌-ওয়াই-কেএর জাহাজ কাছ দিয়ে যায় তখনই দুই জাহাজের যাত্রীরা পরস্পরকে অভিবাদন করতে খুব ব্যগ্রতা দেখায়। মাঝসমুদ্রে মানুষের সঙ্গে এই ক্ষণিকের দেখাতেই কত আনন্দ। তারা মানুষ, আমরাও মানুষ এইটুকুই আনন্দের কারণ। আবার এই মানুষে মানুষেই পৃথিবীতে কি নিদারুণ শত্রুতা! পরস্পরকে ধ্বংস করায় কি পৈশাচিক আনন্দ!

পথের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে সিঙ্গাপুরে নেমে যাবেন। ডেন মহিলা নেমে যাবেন ব'লে সহযাত্রীদের নাম ঠিকানা সব লিখে নিচ্ছেন। তামিল ভদ্রলোকও সকলের অটোগ্রাফ নিচ্ছেন। কাপ্তেন সকলকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলাতে এসেছেন। যার যার ক্যামেরা আছে সবাই ছবি তুলে নিচ্ছে। বালিকাযাত্রী দুটির গলায় লাইফ-বেল্ট পরিয়ে সামনে বসানো হ'ল।

২০শে ভোরবেলাই ঘুম ভেঙে গেল, জাহাজ তখনও থামে নি। জাহাজটি বিশেষ জোরে যায় না, প্রায় মরাল-গামিনী। ঘণ্টায় মাত্র দশ মাইল এর গতি। খুব দিন ভাল থাকলে আর একটু বেশী যায়, ১১ কি বড়জোর ১২ মাইল। রাজহাঁসেরা এর চেয়ে আস্তে চলে কিনা জানি না। কাল দুপুরে ১৭০ মাইল বাকী ছিল ব'লে আন্দাজ করে-ছিলাম ভোর পাঁচটায় নিশ্চয় ডাঙায় ভিড়ব এসে। ভোরে কেবিন থেকে আকাশে সাউদার্ণ-ক্রস নক্ষত্রমালা দেখলাম। আমাদের দেশ থেকে একে দেখা যায় না। তখনও জাহাজ থামে নি।

জাহাজ বন্দরে পৌছল সাড়ে ছটায়। বন্দরের কাছে এসে সব জাহাজই এত আস্তে চলে যে যা আশা করা যায়

শ্রীকৃষ্ণ

ছায়ানাচের একটি মূর্ত্তি
"Nalagarang"
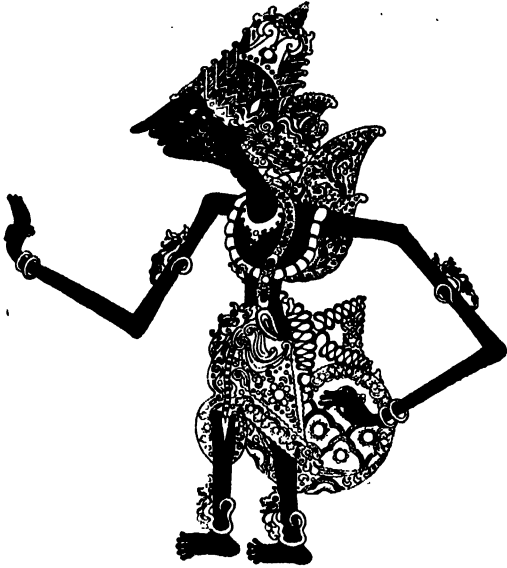
যথাস্থানে পৌঁছতে সর্ব্বদাই তার চেয়ে দেরি হয়ে যায়। আমরা জাহাজ থামবার আগেই কেবিন ছেড়ে হুড়োহুড়ি ক'রে ডেকে এসে হাজির হলাম। জাহাজ বন্দরের ভিতর ঢুকছে, আজ প্রথম বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সমুদ্রের জলের বেশ ফিকে কচি কলাপাতার মত রং, দূরে ঘাসের মত সবুজ। ডকে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, সাতটা আটটা হবে। ছোট ছোট সবুজ পাহাড়ের উপর সিঙ্গাপুরের সীমানা সুরু। বোম্বাই কিম্বা কলম্বোতে পাহাড় যেমন জল থেকে একটু দূরে এখানে তা নয়। একেবারে জল থেকে ছোট ছোট পাহাড়গুলি মাথা তুলেছে, আর জলের ধার থেকেই ঘন পাতাওয়ালা বড় বড় গাছ, বালিটালির চিহ্ন নেই, কালো পাথর পড়ে নেই, বেলাভূমির বালাই নেই। অবশ্য, কোন বন্দরেই বেলাভূমি থাকে না, কিন্তু এত গাছ-পালাও থাকে না; তাছাড়া এটা বন্দরের আগের কথা। পাহাড়গুলি খুব সামান্যই উঁচু। তাদের উপর থেকে ঢালু রাস্তা ও সিঁড়ি জলের ধারে নেমে এসেছে, পাহাড়ের মাথায় মাথায় রাঙা খোলা-ছাওয়া ছবির মত ছোট ছোট বাড়ী, মাঝে মাঝে কংক্রিটের বড় বড় ব্যারাকের মত সাদা সাদা বাড়ী। পুকুরের জলে যেমন কলমী শাক লাগিয়ে অনেকে বাঁশের বেড়া দিয়ে জলের ভিতর ঘিরে দেয়, এখানেও জলের ভিতর তেমনি ঘেরা অনেকগুলি রয়েছে। কলমী শাক অবশ্য নেই, কিন্তু কেন যে ঘেরা আমি বুঝতে পারলাম না।

প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ল, কাজেই তাড়াতাড়ি খেতে ছুটতে হ'ল। সাতটার মধ্যেই খাইয়ে দিল। আজ ডাঙায় নামতে হবে বলে সহযাত্রিণীরা সব মহিলাজনোচিত বেশভূষা করেই খেতে এসেছেন, অন্য দিনের মত হাতকাটা বেনিয়ান, হাফপ্যাণ্ট, রাত-পাজামা, কি পুরা পাতলুনের ঘটা আজ নেই। অন্য দিন যাঁরা খালি পায়ে ঘাসের চটি টানতে টানতে ঘোরেন আজ তাঁরা সবাই ফ্যাশনেবল জুতামোজা পরেছেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উপরে এসে দেখি ডেক-যাত্রীদের কাঠগড়া খুলে নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর করা হয়েছে। সব ডেক-যাত্রীরা তাদের বাক্স-পেঁটরা বেঁধে ভাল ভাল কাপড়চোপড় প'রে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকে উবু হয়ে এসে বসেছে। নীচে লঞ্চ এসে দাঁড়িয়েছে, জাহাজ ডাঙায় ঠেকাবে না, জল পর্য্যন্ত সিঁড়ি নামানো হয়েছে। ছাড়া পেলেই যাত্রীরা হুড়মুড় ক'রে সবাই নেমে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকের উপবাসক্লিষ্ট চেহারা দেখে কষ্ট হচ্ছিল। এই সব জাহাজ সচরাচর কলম্বো থেকে পাঁচ দিনে সিঙ্গাপুরে

পৌঁছায়। অশিক্ষিত যাত্রীরা বেশী হিসাব ক'রে ঠিক পাঁচ দিনের মত চাল ডাল সঙ্গে এনেছিল। দেখা গেল জাহাজে থাকতে হবে সাত দিন। রোজকার হিসাব মত চাল ডাল খেয়ে নিয়ে পুঁটুলি যখন শূন্য, তখন তারা ঠিক করল বাকী দু-দিন অনাহারে থাকবে। বৃদ্ধা জেন-মহিলা তামিল জানেন ব'লে এদের খোঁজখবর নিতেন। তিনি এদের উপবাসের সঙ্কল্প আবিষ্কার ক'রে জাহাজের ভাণ্ডারীর কাছ থেকে চাল কিছু জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা শুকিয়ে মরে গেলেও পাউরুটি ছোঁয় না। অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধেও এদের মারাত্মক সন্দেহ। ব্রাহ্মণীটির ত যা চেহারা দেখলাম তাতে সাত দিনই সে খায় নি মনে হয়।

সেই তামিল খুকীটি মাথায় সাদা রেশমের ফিতা বেঁধে গলায় সোনার হার প'রে বাবার কাছে যাবার জন্যে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল। দু-বৎসর তারা তার বাবাকে দেখে নি। তাকে ইসারাতে বললাম, "আমাদের কেবিনে থাক, নাই বা গেলে সিঙ্গাপুরে।" সে কালো চোখ দুটি ঘুরিয়ে সজোরে ঘাড় নেড়ে মহা আপত্তি করল।

ষ্টুয়ার্ড এসে খবর দিল ৭॥টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত সবাইকে ডাঙায় থাকতে দেওয়া হবে। তার পর ঠিক সময়ে সবাইকার খানার টেবিলে হাজিরা দেওয়া চাই। আমরা মনে করেছিলাম সারাদিন মাটির উপর ঘুরতে পাব, কিন্তু কর্ত্তারা রাজি না হ'লে উপায় নেই।

এদিকে ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা প্রায় খসে যাবার জোগাড়, তবু ডকের ছাড়-দেনেওয়ালা মহাপ্রভুরা আসেন না। তাঁরা এসে নামতে না অনুমতি দিলে কারুর নামবার জো নেই। সহযাত্রিণীরা বললেন, "নিশ্চয় সে ব্যক্তি এখনও ঘুমোচ্ছে।" একটা ক'রে ডিঙি-নৌকা জাহাজের কাছে আসে আর সবাই বলে, "ঐ আসে, ঐ আসে, ঐ ঐ ঐ রে।" হঠাৎ এক জন খুব ভারিক্কি লোক কাগজপত্র নিয়ে তড়াক ক'রে একটা লঞ্চ থেকে লাফ মেরে গট্ গট্ ক'রে উপরে উঠে এল। তাকে মহা সমারোহ ক'রে জাহাজের কর্ম্মচারীরা অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে চলল, আমাদের প্রাণেও আশা জাগল। ও মা, তার পর দেখি সে জাহাজের চিঠিপত্র এনেছে, ডাকহরকরা মাত্র।

শেষে সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন কেবিনে নেমে ঘুমোবার ব্যবস্থা করছি, তখন শুনলাম সাড়ে আটটার পর জল-পুলিস মহোদয় এসে দেখা দিয়েছেন। যারা আজ জাহাজ ছেড়ে একেবারে চলে যাবে তাদের পালা আগে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দু-জন চলে যাবেন, তাঁরা বন্ধুর মত সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নেমে পড়লেন। তার পর লঞ্চ পেয়েই আমরা নেমে পড়লাম। লঞ্চের লোকদের জিজ্ঞেস করা হ'ল, "ডাঙায় পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?" তারা বললে, "ওয়ান্ আওয়ার।" শুনে ত সকলের চক্ষুস্থির! এক ঘণ্টা! যেতে আসতে যদি দু-ঘণ্টা যায় তা হ'লে বেড়ান কি হবে?" ষ্টুয়ার্ড লঞ্চে নেমে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু ক'রে হাঁকতে লাগল, "১২টার সময় সবাইকে ফিরে আসতে হবে মনে রেখো। জার্ডিন ষ্টেপ্‌সে, জার্ডিন ষ্টেপ্‌সে।" মনে মনে নাম মুখস্থ করতে করতে নৌকায় বসে চললাম। মেমসাহেবেরা টুপির কোণ, নাকের পাউডার ভাল ক'রে দেখে নিলেন। এক জনের মুখে কলমের এক ফোঁটা কালি লেগে গিয়েছিল সেটা একটি সাহেব রুমালে ক'রে মুছে দিলেন। ভাল ক'রে ওঠে না দেখে মেমসাহেব রুমালটাকে থুথু দিয়ে একটু ভিজিয়ে দিলেন। এরাই ভারতবাসীদের নোংরামি বিষয়ে হয়ত বই লিখবে।

সবুজ তোড়ার মত পাহাড়গুলি চোখের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, নৌকার জলে সকলের কাপড়চোপড় ভিজে যেতে লাগল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কলম্বোর মত অত সবুজ নয় কিন্তু সব জড়িয়ে বন্দরটি আরও ঢের বেশী সুন্দর। সিঙ্গাপুর প্রাচ্য দেশে বোধ হয় সবচেয়ে বড় বন্দর, কত রকমের ছোটবড় ঘাট, পাহাড়-কাটা রাস্তা, সবুজ পাহাড়ের উপর বাঁকা বাঁকা রাস্তার মাথায় উঁচু নীচু বাড়ী। একটা প্রকাণ্ড পাথুরে পাহাড়ের মাথার উপর বেতারের থাম খাড়া দাঁড়িয়ে সমুদ্র পাহারা দিচ্ছে। দুই দিকের পাহাড়ের গাছ জলে এত ঝুঁকে পড়েছে এবং এমন সুন্দর সাজিয়ে বসান যে মনে হয় এইখানে খানিকটা পাহাড় কেটে উড়িয়ে এই ঘাটটি করা হয়েছে। মালয়বাসীরা নানা রকম চিত্রিত ডিঙি-নৌকা নিয়ে দে দোল্ দোল্ ক'রে জলে দাঁড় টেনে দুলতে দুলতে চলেছে। এই নৌকাগুলির নাম শাম্পান।

আমরা ঘাটে নামতেই গাড়ীর দালাল এসে হাজির, শহর দেখাবে, গাড়ী ঠিক ক'রে দেবে। একটা ট্যাক্সিকে দর-কসাকসি ক'রে নেওয়া গেল, সওয়া নয়টা থেকে পৌনে বারটা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টা আমাদের ঘোরাবে, ৫ ডলার নেবে। জানি না সত্যি ভাড়া এখানে কত। আমাদের সহযাত্রী হংকঙের ছাত্র সাহেবটি এবং কানেডিয়ান মহিলাটিও আমাদের দলে এলেন। অন্যদের গাড়ীতে আর তাঁদের স্থান হ'ল না ভালই হ'ল, আমাদের কিছু পয়সা বাঁচবে। বিনা পয়সায় পৃথিবীতে কোথাও চলা যায় না, কাজেই সর্ব্বত্রই সবার আগে পয়সা-কড়ির সন্ধানে ছুটতে হয় টমাস কুকের আপিসে। চিঠিপত্রও সেখানে কিছু পাবার আশা থাকে। সিঙ্গাপুরে তিন পাউণ্ডের চেক ভাঙিয়ে ২৫ ডলার ৪৭ সেণ্ট পাওয়া গেল। সিঙ্গাপুরী ডলার আমেরিকান ডলারের মত অত মূল্যবান নয়, তবে টাকার চেয়ে দামী, ১।৶ আনায় এক ডলার ধরা যেতে পারে যদি ৩ পাউণ্ডে ৩৯৲ টাকা হয়।

আমাদের জাহাজের ফরাসী বালিকাটি রেশমী ফিতার ভয়ানক ভক্ত। আমার মেয়ের চেয়ে তার ফিতার সংখ্যা কিছু কম থাকাতে সে দুঃখিতও ছিল। কথা ছিল, এই কারণে তাকে কিছু ভাল রিবন উপহার দিতে হবে। অকস্মাৎ একটা উপরি কারণও জুটে গেল। সিঙ্গাপুরে নামবার দিন দুই আগে অকস্মাৎ আমার একটা দামী সোনার ব্রোচ হারিয়ে গেল। প্রথমে আমাদের কেবিন-বয়কে বললাম। সে ঘর তোলপাড় ক'রে খুঁজতে লাগল, পেল না। জাহাজের চাকরবাকররা চুরি করে কিনা জানি না, আমাদের মনে সন্দেহ আসে, কিন্তু বলতে ভরসা হয় না। যাই হোক, জিনিষটা যে হারিয়েছে, তা ষ্টুয়ার্ডকে বললাম। সে যেন কিছুই হয় নি এমন মুখ ক'রে বললে, "আচ্ছা আমি একটা নোটিস টাঙিয়ে দিচ্ছি।" সহযাত্রী জাপানী ভদ্রলোক বললেন, "আপনার কোনই ভয় নেই, জাপানীরা অত্যন্ত 'অনেষ্ট', যে পাবে সেই আপনাকে দিয়ে যাবে।" তাঁর কন্যা এবং আমার কন্যা একটা হুজুগ পেলে বেঁচে যায়। দু-জনে দুটো টর্চ্চ ষ্টুয়ার্ডের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ইঁদুরের মত সারা জাহাজে ঘুর্ ঘুর্ লাগিয়ে দিল। ফরাসী-বালিকা অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে উঠল, "তোমাদের আর খুঁজতে হবে না, আমি খুঁজে পেয়েছি।" আমার কন্যা বললেন, "সিঙ্গাপুরে নেমেই তোমাকে পুরস্কার-স্বরূপ একটা জিনিষ কিনে দেওয়া হবে।"

কাজেই আমরা দোকানে জিনিষ কিনতে ছুটলাম। এখানে দোকানেরও অভাব নেই, জিনিষেরও কম্‌তি নেই, কিন্তু মনে করেছিলাম আমাদের ভারতীয় কিছু জিনিষ কিনব, সেইটারই দেখলাম একান্ত অভাব। অনেক পার্শী, গুজরাটী, সিন্ধি, কচ্ছী সব মস্ত মস্ত দোকান সাজিয়েছে, রেশমে পশমে কাচে পাথরে ঝল্ মল্ করছে, অধিবাসীও ৫১,০০০ ভারতীয়, কিন্তু সমস্ত জিনিষই জাপানী কিংবা বিলাতী ও ফরাসী, অভাবপক্ষে চীনা। একটা দোকানে শাড়ী-পরা মনুষ্যাকৃতি পুতুল দাঁড়িয়ে দেখে মনে করলাম নিশ্চয় এখানে ভারতীয় শাড়ী আছে। ও হরি, সব জর্জ্জেটের উপর ফরাসী পাড়-বসানো কাপড়। তখন ফুটপাথ ধরে চললাম, দেখি কোথাও কিছু পাওয়া যায়। ফুটপাথগুলির মাথার উপর আগাগোড়া ঢাকা। এক জায়গায় 'নগিন দাস' নামক এক ব্যক্তির দোকানে দিশী সুতার ১২ হাত সাদা মিলের শাড়ী খানকয়েক পাওয়া গেল। তিন খানা শাড়ীর দাম ৭ ডলার অর্থাৎ ১১৲ টাকা আন্দাজ।

এই দোকানের পাড়ায় পা দিয়েই সর্ব্বপ্রথম মনে হয় আমরা বুঝি চীনদেশে এসেছি। প্রায় সব দোকানের সাইন-বোর্ডই লম্বাভাবে ঝোলানো এবং চীনা অক্ষরে লেখা, আমাদের দেশের মত ইংরেজীতে লিখে আড়াআড়ি ভাবে টাঙানো নয়, অথচ দেশটা ইংরেজদের রাজ্য। মানুষ ত চার ধারে প্রায় সবই চীনদেশীয়। এত চীনা দেখে দুঃখ হয় বটে, তবে একটু ভালও লাগে। পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে খুব বেশী বেড়াই নি ব'লে প্রথম বার লম্বা পাড়ি দেবার সময় ইচ্ছা করে, নানা জায়গায় নানা নূতন জিনিষ দেখে চোখে একটু চমক লাগুক। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তা হয় নি বললেই চলে। বাস্তবিক আধুনিক যানবাহন ও শিক্ষার চোটে সমস্ত পৃথিবী এত এক রকম হয়ে গিয়েছে, যে খুব নূতন দেখবার আশা কোথাও থাকে না যদি না সভ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে ভিতর দিকে ঢুঁ মারা যায়। সভ্য পৃথিবী এবং তার অন্তরালের পৃথিবীতে যা নূতন আছে, তাও ছবির বই আর সিনেমার চোটে মানুষ অর্দ্ধেকের বেশী দেখে নিয়েছে।

কাপড়ের দোকানেও দেখলাম চীনা মহিলারা ভিড় ক'রে জিনিষ কিনছে, জাপানী মেয়েও দু-চার জন আছে। বড় ঘরের চীনা মেয়েদের পোষাক একটু রংচঙে এবং বড় বড় খোঁপায় লাটিমের মত বড় বড় সোনার ফুল গোঁজা। ফুলগুলি এত বড় যে সোনার জল করা বলেও সন্দেহ হয়, তবে সত্য কি তা আমি জানি না। সাধারণ পথচারিণী চীনা মেয়েদের সব নির্ব্বিচারে এক পোষাক—ঠ্যাংঠেঙে কালো পাজামা, নীল কোট আর বিনা সিঁথিতে কপাল বার ক'রে টেনে পিছনে চুল বাঁধা, কারুর গোড়ালি কি হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা বিনুনি ঝুলছে, কারুর শক্ত টিপি খোঁপা। দুই-চার জনের আগাগোড়া সব পোষাকই কালো। রাস্তার ধারে একটা বাগানওয়ালা পাঠশালায় দেখলাম পুরা কালো পোষাক প'রে চীনা শিক্ষয়িত্রী একপাল নানা দেশের ছেলে মেয়েকে খোলা হাওয়ায় কিছু নাচ ড্রিল কিংবা খেলা শেখাচ্ছেন।

এত চীনার ভিড় এবং চীনা সাইন-বোর্ড দেখে যা মনে হয়, মাস বুকের বই খুলে দেখছি তা প্রায় সত্য। সিঙ্গাপুরের ৫৬৭,৪৫৩ অধিবাসীর মধ্যে ৪২১,৮২১ জন হচ্ছে চীনদেশীয়। এটা যাদের দেশ সেই মালয়বাসীরা মাত্র ৭১,১৭৭ জন।

সিঙ্গাপুরে এসেছি ভরা শীতে মাঘ মাসের ৭ তারিখে, অথচ শীতের নামমাত্র নেই। প্রাচীনেরা যে মালয় উপদ্বীপকে চিরবসন্তের দেশ বলেছিলেন তা মিথ্যা নয়। এই শীতে গাছের পাতা, মাঠঘাট সবুজে সবুজ, আর মলয় পবন হুহু ক'রে বইছে। সারা বছরে এখানে শীত-গ্রীষ্মের বিশেষ প্রভেদ হয় না, থার্ম্মোমিটারে তাপ থাকে গড়পড়তায় ৮৬ ডিগ্রি। দেশটা এত যখন সবুজ, বৃষ্টি নিশ্চয়ই যথেষ্ট হয়। মালয় উপদ্বীপের গভীর অরণ্য পৃথিবীতে সুবিখ্যাত। এখানকার পথঘাটও আশ্চর্য্য সুন্দর। পৃথিবীতে এত ভাল পথ নাকি কোথাও নাই। এই সুন্দর পথে গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে বেড়ানো ভ্রমণকারীদের একটা মহা আনন্দের জিনিষ। আমাদের ভাগ্যে সেটা হয় নি।

পথের ধারে ঘরবাড়ীর বেশীর ভাগই আধুনিক ধরণের, মাঝে মাঝে দুই-একটা বাড়ীর খোলার ছাদ মালয়-ধরণে দু-ধারে শুঁড় তুলে আছে। শহর ছাড়িয়ে গেলে জংলা জায়গায় মালয়-ধরণে চারিটা খুঁটির উপর শূন্যে দাঁড়-করানো পাতার কি কঞ্চির ঘর দুই-চারটা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের থাকবার অনেক ভাল বাড়ী পাকা হ'লেও এই রকম চার ধারে চারটা ছোট থামের উপর দাঁড়-করানো, মেঝেটার সঙ্গে মাটির ছোঁওয়া লাগে না, মেঝের তলা দিয়ে মানুষ হামা দিয়ে চলে যেতে পারে। এতে ঘর ড্যাম্প হয় না এই একটা মস্ত সুবিধা।

হাইকোর্টের বাড়ীর সামনে লাটবেলাটের মূর্ত্তির মত উঁচু থামের উপর দাঁড়িয়ে কালো একটি নাদুসনুদুস পাথরের হাতী। সিনেমা হাউস, টাউন হল প্রভৃতি আমাদের দেশের মত। সাধারণ বাড়ী অধিকাংশ লাল টালি-ছাওয়া বাংলো।

পোষ্ট অফিস আর বাজার সেরে আসবার সময় পথে খুব কলার দোকান দেখলাম। আমাদের সহযাত্রিণী কিছু কলা কিনে সবাইকে খাওয়ালেন। কলার চেয়ে এখানে ম্যাঙ্গোষ্টিন ও আনারসই প্রসিদ্ধ। অনেকে ঝুড়ি ক'রে ক'রে কিনছে দেখা গেল। এখানকার আনারস টিনে বন্ধ ক'রে সারা পৃথিবীতে চালান দেওয়া হয়। দোকানে নানা রকম অর্কিড ফুলেরও খুব ঘটা। জাহাজ যেদিন যেদিন দাঁড়ায় সেদিন ডাঙা থেকে সেই দেশের ফুল ও ফল কিছু সংগ্রহ করে। আজ ফিরে দেখা গেল খাবার টেবিলে অর্কিড ফুল ও ম্যাঙ্গোষ্টিন ফল খুব সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রেখেছে।

এখানকার যাদুঘর র‍্যাফেল্‌স্ মিউজিয়ম বড় একটা দেখবার জিনিষ। আমাদের হাতে সময় খুবই কম, তবু একবার সেখানে ঘুরে আসবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। শোনা যায়, যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা না গিয়েও যদি সেখানকার শিল্পকলা ও জীবনযাত্রার নমুনা দেখতে হয় তবে এই মিউজিয়মে তা অনেকটা দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এখানে মালয় উপদ্বীপ ও এই সব দ্বীপের বহু মূল্যবান সংগ্রহ আছে। ভারতবাসীরা পুরাকালে এই সব দেশে যে সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করতেন তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ এখানে সংগ্রহ করা রয়েছে। আমি ঐতিহাসিক নই, এ সব নিয়ে কোনও মত প্রকাশ করতে যাওয়ার ভরসা আমার নেই, কিন্তু ভারতবর্ষের ছোটবড় কত জিনিষের সঙ্গে এখানকার জিনিষের সাদৃশ্য দেখে এবং কত প্রাচীন ভারতীয় জিনিষ এখানে এতকাল রয়েছে দেখে আনন্দ হয়।

মিউজিয়মের ঘরে ঢুকেই দেখা গেল বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের মন্ত্র লেখা ও দেবমূর্ত্তি আঁকা ছোটবড় অনেক মাটির চাকৃতি। মন্দিরে পূজা দেবার সময় ভক্তরা এগুলি হাতে ক'রে এনে মন্দিরে উৎসর্গ ক'রে যেতেন। সেই সব মন্দির ও স্তূপ থেকে তা কিছু কিছু উদ্ধার পেয়ে এখানে সংগৃহীত হয়েছে। এর অক্ষর সব দেবনাগরীর মত, বোধ হয় অষ্টম থেকে ১১শ শতাব্দীর লেখা।

সিঙ্গাপুরে বাস্তবে যে সব বাড়ীর ছাঁচ আমরা প্রায় দেখতে পাই নি, মালয়বাসী ও বলিদ্বীপবাসীদের সেই সব বাড়ীর নানা রকম ছাঁচ মিউজিয়মে দেখলাম। বাঁশের বেড়ায় গড়া ও পাতায় ছাওয়া বাড়ীগুলি চারি দিকে চারিটি বাঁশের খুঁটির উপর বসানো, শূন্যে যেন টাঙানো রয়েছে। বেড়াতে গালা ও রং দিয়ে নানা রকম ছবি আঁকা। বাড়ীতে ঢোকবার জন্যে একটি ক'রে মইয়ের মত সিঁড়ি। ছাদের ছাউনি উপরে দুই পাশে তৃতীয়ার চাঁদের দুটি শিঙের মত অথবা হাতীর উৎক্ষিপ্ত শুঁড়ের মত বেঁকে আছে। ঘরের ভিতর মালয়দেশীয় আসবাবপত্র সাজানো।

দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ও অন্যান্য দেশের যে মাটির বাসন হাঁড়ি কুঁজা ইত্যাদি রয়েছে তাতে দু-রকম ধরণ খুব চোখে পড়ে। এক পারস্য দেশীয় সরু লম্বা গলা আতরদানের মত পাত্র আর এক মোটা বেঁটে বড় গলা ভারতীয় মাটির হাঁড়ির ধরণ। ভারতীয় ধরণের গুলি ঠিক আমাদের বাংলার হাঁড়ির মত নয়, তার চেয়ে বেশী বেঁটে কিন্তু সুদৃশ্য। মাটির বাসনগুলির উপর সুন্দর নক্সাকাটা। সমুদ্রের ধারে এই সব মানুষের বসতি ব'লে অনেক মাটির বাসন, কাঁসা-পিতলের বাসন, এমন কি বাজনার পর্য্যন্ত নৌকার মত গড়ন। একটি তামার বাসন ঠিক ময়ূরপঙ্খী নৌকার মত। কাঁসা পিতল ও তামার অনেক বাসন আমাদের দক্ষিণ-ভারতের পূজার বাসনের মত। কতকগুলি দীপবৃক্ষ দক্ষিণ-ভারতের দীপবৃক্ষ বলেই মনে হয়। এগুলি সবই হয়ত ভারতীয়দের আনা। তাড়াতাড়িতে এদের তলার লিখনগুলি মনে রাখতে পারি নি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ও ভাল লাগল একটি বড় জলের ঘড়া দেখে। আমরা বাংলা দেশের গ্রামে যে ঢালাই ঘড়াতে মেয়েদের সর্ব্বদা নদী ও পুকুর থেকে জল নিয়ে যেতে দেখি, ভারতবর্ষের আর কোথাও তা আমার চোখে পড়ে নি। এইখানে দেখলাম বাঙালী মেয়েদের সেই ঘড়া কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে।

জাভার পুতুলের ঘরটি দেখলে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, সহজে সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করে না। এই জাতীয় পুতুলের দুই একটি নমুনা শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে আছে। এখানে দেখলাম অভিমন্যু, সুভদ্রা, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, ঘটোৎকচ, ভীম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন সব সারি সারি সাজসজ্জা করে দাঁড়িয়ে। আকৃতি-প্রকৃতি দেখে মনে হয় ঘটোৎকচ, ভীম ও দুর্য্যোধন এদের কাছে খুব নামজাদা। তাদের চেহারা সবচেয়ে বড় আর ভয়ঙ্কর। ভীম নখ দিয়ে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলেন ব'লে তাঁর দুই হাতে রক্ত-রঞ্জিত বড় বড় লাল নখ। এঁদের ছাড়া শিখণ্ডী, সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি আর দুই চার জনের মূর্ত্তি আছে। জাভার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেক বীর এবং তাঁদের অনুগত ভৃত্যদের কাল্পনিক মূর্ত্তিও অনেকটা অর্জ্জুন প্রভৃতির মত ক'রে গড়া আছে। তবে তাঁরা যে মহাভারতের চরিত্র নন তা দুই জাতীয় পুতুলের খানিকটা বিভিন্ন রকম গড়ন ও পোষাক মুকুট ইত্যাদি দেখে বেশ বোঝা যায়।

এই পুতুলগুলির দুটি বিভাগ আছে। এক সত্যকার কাঠ, গালা ও রংচং দিয়ে গড়া মূর্ত্তি কাপড়চোপড় পরিয়ে সাজানো, আর এক ছায়ানৃত্যের জন্য ছাঁচের উপর চামড়া ফেলে চ্যাপ্টা ক'রে কাটা মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুতুল-গুলির শরীরের বেড় পুতুলের মত মোটা নয়, পেষ্ট বোর্ডে এঁকে কেটে নেওয়া ছবির মত এরা চ্যাপ্টা। চামড়াতে কাটবার পর তার গায়ে গহনা কাপড় অস্ত্রশস্ত্র মুকুটের রং অনুযায়ী রং দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়। এগুলির কারুকার্য্য সূক্ষ্ম ও সুন্দর! ছায়ানাচওয়ালারা এগুলিকে কাঠিতে আটকিয়ে নাচের জায়গায় একটা বড় কলাগাছের কাণ্ডে বিঁধিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। তার পর যার যখন নাচের পালা আসে, তাকে তখন হাতে ক'রে তুলে নিয়ে ঘোরায়! ছায়াগুলি অবশ্য পুতুলের চেয়ে অনেক বড় হয়ে পড়ে।

মিউজিয়মে চামড়ার চ্যাপ্টা পুতুল, পুতুল কাটবার ছাঁচ, নকল কলাগাছে-গুঁজে-রাখা ইত্যাদি সবই দেখা যায়।

নাচওয়ালাদের পুতুল ঘোরানো ও ছায়া খেলার ছবিও রয়েছে। পুতুলের সঙ্গে সঙ্গে মালয় দেশের নানা রকম বাজনা ও বাজনদারদের মূর্ত্তি এবং সভাও দেখবার জিনিষ। বাজনাগুলির বহু বিচিত্র রকম গড়ন। এই সব বাজনার অল্পস্বল্প নমুনা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এবং উদয়শঙ্করের নাচের মজলিসে দেখা যায়। তবে এত রকম দেশে বসে দেখা সম্ভব নয়।

হিন্দুদেবদেবীদের অনেক মূর্ত্তিও এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহ অবতার বোধ হয় এদের বেশী মনোহরণ করেছিলেন, কারণ তাঁদেরই মূর্ত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জলের ধারে থাকলে মৎস্য ও কূর্ম্মের পূজা করা স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌তে পারে।

যাদুঘরে ও শহরে আরও অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষ চোখে পড়েছিল, সব একসঙ্গে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অনেক জিনিষ দেখে আসার পর স্মৃতির কোঠার তলায় চাপা পড়ে যায়। যাই হোক বারান্তরে আর কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

প্রেতসেনা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

সপ্তম সাগর পারে,
লঙ্কার তটের ধারে
কঙ্কাল পাইক আসে রাত্রি অন্ধকারে।
চোখের কোটর জ্বলে,
শঙ্খমালা দোলে গলে,
কোমরে দামামা বাঁধা সোনার শিকলে।
এদিক ওদিক হাঁটি
দামামায় দেয় কাটি,
গুড়ু গুড়ু বাজে ঢাক কেঁপে ওঠে মাটি।
বহু যুগ আগে গত
পুরান সৈনিক যত
শবদেহে জেগে ওঠে শত শত শত।
উত্তর গিরির শিরে,
দক্ষিণ সাগর তীরে,
পূরবে, পশ্চিমে, দূর মরুদেশ ঘিরে
সমরে পড়িয়া যারা
কালস্রোতে হ'ল হারা,
সারি সারি সারি আসি সমবেত তারা।
আসিল আকাশপথে
সাদা ঘোড়া জোড়া রথে
বর্ম্মধারী মহারথী স্বর্ণটোপ্ মাথে।

সমুদ্র হইতে উঠি
রণগজ এল ছুটি,
লাল রক্ত ঝরে গায় চোখেতে ভ্রূকুটি।
গজবাজী সারে সার,
বিচিত্র আয়ুধ ভার,
ঘণ্টা শঙ্খ ভেরি রোল কার্ম্মুকটঙ্কার।
গতে রাত্রি দ্বিপ্রহর
আসে রাজা রথপর,
গরজিয়া ওঠে সেনা 'হো হো লঙ্কেশ্বর'।
রাজরথ চারি পাশে
সেনাপতিগণ আসে,
সমর আদেশ রাজা কহে ধীর ভাবে,
'অরাম বা অরাবণ
হবে আজি এ ভুবন,
মনেতে জানিয়া সবে কর প্রাণপণ।'
বাদ্যভাণ্ড কোলাহলে
যায় অক্ষৌহিণী চলে,
নিস্তব্ধ প্রান্তর পড়ি রহে শূন্যতলে।
প্রতি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
জনহীন ক্ষেত্রপরে
রক্ষরাজ প্রেতসেনা সমাবেশ করে।

পূজায় শ্রেষ্ঠ উপহার—'বাটা'র জুতা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পূজার মাসাবধি আগে হইতেই উপরিলিখিত বিজ্ঞাপন পথে-ঘাটে অনেকেরই দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। বিজ্ঞাপনটি ইউরোপীয় বাটা কোম্পানীর প্রস্তুত জুতার। বিজ্ঞাপনটি জুতা বিক্রয়ার্থ হইলেও খুব অর্থপূর্ণ ; কারণ পরাধীন জাতির জন্য, বিশেষ করিয়া বিলাসী, নিশ্চেষ্ট, চিন্তাহীন ও শিথিল-দেশপ্রেম-বিশিষ্ট জাতির জন্য, পূজার সময় বিদেশীয় জুতার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ উপহার কি হইতে পারে ? এই জুতার উপহার বাস্তবিক পক্ষে পায়ে পরিবার নহে, ইহা পিঠে দিবার ও পিঠ পাতিয়া লইবার। আর পিঠ পাতিয়াই আমরা ইহা গ্রহণ করিয়াছি এবং সহাস্য বদনে ও সানন্দ চিত্তে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের, আত্মীয়-স্বজনদের উহা দিয়া পূজার উপহার দিবার তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

বাঙালী আমরা, আমরা অনেক সময়েই নিজেদের শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত ও কাল্‌চার্ড্‌ বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া একবারও ত আমাদের মনে হয় না যে সুদূর ইউরোপীয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য (চেকোস্লোভাকিয়া) যাহার স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিগত যুদ্ধের পর হইতে মাত্র কয়েক বৎসর হইয়াছে, আমাদের এই বিশাল দেশকে পূজার সময় জুতার উপহার দিয়া ও সেই উপহার আমরা কিরূপ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি তাহা দেখিয়া কতই না হাসিতেছে। সত্য, যদি আমরা একেবারে লজ্জাশূন্য না হইয়া পড়িতাম, ত বিজ্ঞাপন পড়িয়া ঐ কথা আমাদের মনে উঠিত এবং অন্ততঃ পূজার সময়টা পয়সা দিয়া, দোকানে দোকানে ভিড় করিয়া এই শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার ক্রয় করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করিতাম।

কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতা ও আধুনিক শিক্ষা আমাদের অন্যরূপ লজ্জা শিখাইয়াছে। দেশীয় অ-সুন্দর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে লজ্জা, বিদেশীয় ফ্যাশানযুক্ত দ্রব্যাদি পরিধানে সম্মান—ইহাই কি শিক্ষিত নর-নারীর বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় না? বৎসর দেড়েক আগে বিখ্যাত জাপানী টেনিস-খেলোয়াড় সাটো ও তাহার সঙ্গী খেলোয়াড়েরা যখন জাপান হইতে ইউরোপে ডেভিস-কাপ প্রতিযোগিতায় খেলিতে যাইতেছিল, তখন তাহারা সগর্ব্বে বলিয়াছিল যে তাহারা সকলেই স্বদেশী অর্থাৎ জাপানে প্রস্তুত টেনিস র‍্যাকেট লইয়া খেলে ও প্রতিযোগিতায়ও খেলিবে। অথচ জাপানী র‍্যাকেট এখনও ইউরোপে ও আমেরিকায় নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ র‍্যাকেটের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট এবং মূল্যেও সেইরূপ কম। সাটোদের সহিত যে র‍্যাকেট ছিল, তাহার দাম মাত্র ছয় টাকা, আর ইউরোপীয় ভাল র‍্যাকেটের মূল্য পঞ্চাশ টাকার উপরে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমী এই জাপানী খেলোয়াড়রা এই সামান্য ছয় টাকা মূল্যের নিকৃষ্ট স্বদেশী র‍্যাকেট লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান প্রতিযোগিতায় খেলিবে বলিয়া গর্ব্বিত, আর আমাদের দেশের খেলোয়াড়রাও যদি ঐসব জাপানী খেলোয়াড়দের নিকট দাঁড়াইতেও পারেন না, তথাপি বিলাতী র‍্যাকেট না হইলে তাঁহারা খেলিতে পারেন না। আজকাল সিয়ালকোটে উবেরয় (Uberoi) কোম্পানী বেশ ভাল র‍্যাকেট (জাপানী র‍্যাকেটের চেয়ে অনেক ভাল এবং বিলাতী শ্রেষ্ঠ র‍্যাকেটের সমতুল্য) প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যাহারা যৎসামান্য খেলাও শিখিয়াছে বিদেশী র‍্যাকেট হাতে না হইলে তাহাদের আর মানমর্য্যাদা থাকে না। তবে আর আশ্চর্য্য কি যে

> "চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান
> তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান."

আর আমরা ?—

আজকাল অনেকে দেশী কাপড় পরেন বটে, এবং খদ্দরও অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কতকটা নব্য ফ্যাশান, কংগ্রেসী ফ্যাশান বলিয়াই খদ্দর ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারকারীর মন স্বদেশী নহে, পুরা মাত্রায় বিদেশীই আছে। কারণ একদিকে খদ্দর পরিধান,

কিন্তু ওদিকে আবার হয়ত পায়ে বিদেশী জুতা, গায়ে বিলাতী কাপড়ের জামা। যদি গায়েও খদ্দরের পাঞ্জাবী ওঠে ত পাঞ্জাবীর বোতাম বিলাতী সোনার। অন্ততঃ মুখে ত বিলাতী সিগারেট আছেই। কেবল ফ্যাশান বলিয়া এবং কংগ্রেস-দলভুক্ত ও কংগ্রেস কর্ম্মী ও নেতা হইবার জন্য খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে, এইরূপ মনে করিলে খাঁটি ও সত্যভাবে স্বদেশী হওয়া যায় না। বিদেশী কোন জিনিষই ব্যবহার করিব না, তা তাহাতে যতই না অসুবিধা ও অ-ফ্যাশান হউক না কেন—এই ভাব যত দিন না অলঙ্ঘনীয় ব্রতস্বরূপ দেশবাসী গ্রহণ করিবে, তত দিন স্বদেশী ভাব প্রচারের অভিনয়ই চলিবে—প্রকৃত কাজ হইবে না, এবং দেশ ও জাতি নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নামিয়া চলিবে!

কেহ কেহ কেন, অনেকেই বলেন, যে, অনেক সময় পয়সার অভাবে দেশী জিনিষের পরিবর্ত্তে বিদেশী জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু একথা ঠিক নহে, কারণ স্বদেশী ভাব মনে যথার্থ জাগ্রত হইলে পয়সার অভাবে জিনিষের অভাবও লোকে সহ্য করিবে, কিন্তু সস্তায় বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই অভাব দূর করিবে না, এবং এই ভাবে অভাব সহ্য করায় আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্ব অনুভব করিবে। যেমন, জুতা ছিঁড়িয়া গেলে দেশী নূতন জুতা ক্রয় করিবার অর্থাভাবে ছেঁড়া জুতা পরিয়া চালানও সম্মানকর এবং সৎশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক, সস্তায় বিদেশী জুতা ক্রয় করিয়া সজ্জিত হইয়া বাহির হওয়া অপেক্ষা। যদি স্বাধীন ও মহাপরাক্রমশালী জাপান-দেশবাসী নিজেদের দেশে প্রস্তুত নিকৃষ্ট ছয় টাকা মূল্যের টেনিস র‍্যাকেট লইয়া যাহারা অনেক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান র‍্যাকেট লইয়া খেলে তাহাদের সহিত খেলিতে অগৌরবের পরিবর্ত্তে গৌরব অনুভব করে, ত আমাদের বিদেশী জুতার পরিবর্ত্তে ছেঁড়া জুতা পরায় লজ্জা না সম্মান অনুভব করা উচিত?

স্বদেশী যুগে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল ও জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহা যদি স্থায়ী হইত, ত আজ কেবল বাংলার ইতিহাস নহে সমগ্র ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ হইত। কিন্তু বিলাসী বাঙালী ও অস্থিরমতি ভোগপ্রিয় বাঙালী নেতা তাহা রাখিতে পারিল না। সেই জন্য অনেক শিল্প—যাহা তখন আরম্ভ হইয়াছিল, নষ্ট হইয়া গেল এবং বাঙালীর আজ এই ভীষণ বেকার-সমস্যা ও অন্নকষ্ট উপস্থিত। এই ত্রিশ বৎসর ঐ স্বদেশীব্রত পালন করিয়া আসিলে আমরা আজ সমৃদ্ধিশালী, সর্ব্বঅভাবমুক্ত, দেহে ও মনে সবল ও উৎসাহপূর্ণ, সর্ব্বকার্য্যে তৎপর ও সমর্থ, আত্মবিশ্বাসপূর্ণ, দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া দেশের কল্যাণসাধনে ও দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইতাম,—তৎপরিবর্ত্তে আজ আমরা দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, আত্মবিশ্বাসহীন, দ্বারে দ্বারে ক্ষুদ্র চাকরি ভিক্ষায় রত, জগতের সম্মুখে কেরাণীবাবু বলিয়া পরিচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-লব্ধ শিক্ষা অন্যের নিকট এবং আমাদের নিজেদের নিকটও ধিক্কারের বস্তু হইয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা স্বাবলম্বন-বৃত্তি জাগে না; ইহার দ্বারা কার্য্যের প্রেরণা আসে না; চিন্তাশীলতা সৃজিত ও বর্দ্ধিত হয় না; উচ্চ আদর্শ ধরিয়া জীবন যাপন করিবার দৃঢ়তা আসে না। কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট। তাহা হইলেই আমরা গৃহে ফিরিয়া তাস-খেলা, রহস্যালাপ, রাসলীলা-কীর্ত্তন, বিলাতী সিগারেট সেবন, মাথায় টেরির বাহার ও পয়সা জুটিলেই সিনেমাতে গিয়া বাইজী ও বাইজীদের নায়কদের নৃত্যকলাপ দেখা—ইত্যাদি করিয়া জীবন ধন্য মনে করি। আমরা সত্যই এরূপ কড়াপড়া হইয়া গিয়াছি এবং আমাদের বিবেকও এরূপ নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে যে যখন বিলাতী সিগারেটের ধূম নাক-মুখ দিয়া নির্গত করি বা বিলাতী বায়স্কোপ দেখিবার জন্য এই নির্ধন দেশের অর্থ বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিই, তখন আমাদের উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও আমাদের বিবেক একবারও জাগিয়া উঠে না, আমাদের দেশের কথা, আমাদের ম্রিয়মাণ ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীর কথা আমাদের মনে করাইয়া দেয় না। মহাত্মা গান্ধী বা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্ব স্বীকার করা এক কথা—তা না করিলে যে দেশের লোক মানিবে না—আর তাঁহাদের আদর্শ ধরিয়া জীবন নির্ব্বাহ করা আর এক কথা।

দেশের শিক্ষিতদের, ইস্কুল কলেজের শিক্ষকদের, ছাত্রদের ও দেশনেতাদের এইরূপ অবস্থা হইলে যদি বিদেশী এক ছোট কিন্তু উদ্যমশীল জাতি আমাদের পৃষ্ঠে শারদীয় পূজা উপলক্ষ্যে নূতন জুতার উপহার দেয়, ত আশ্চর্য্যই বা কি, আর আমাদের তাহাতে লজ্জিত হইবারই বা কি আছে?

সাঁওতাল-নৃত্য

শ্রীমতী রাণী চন্দ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
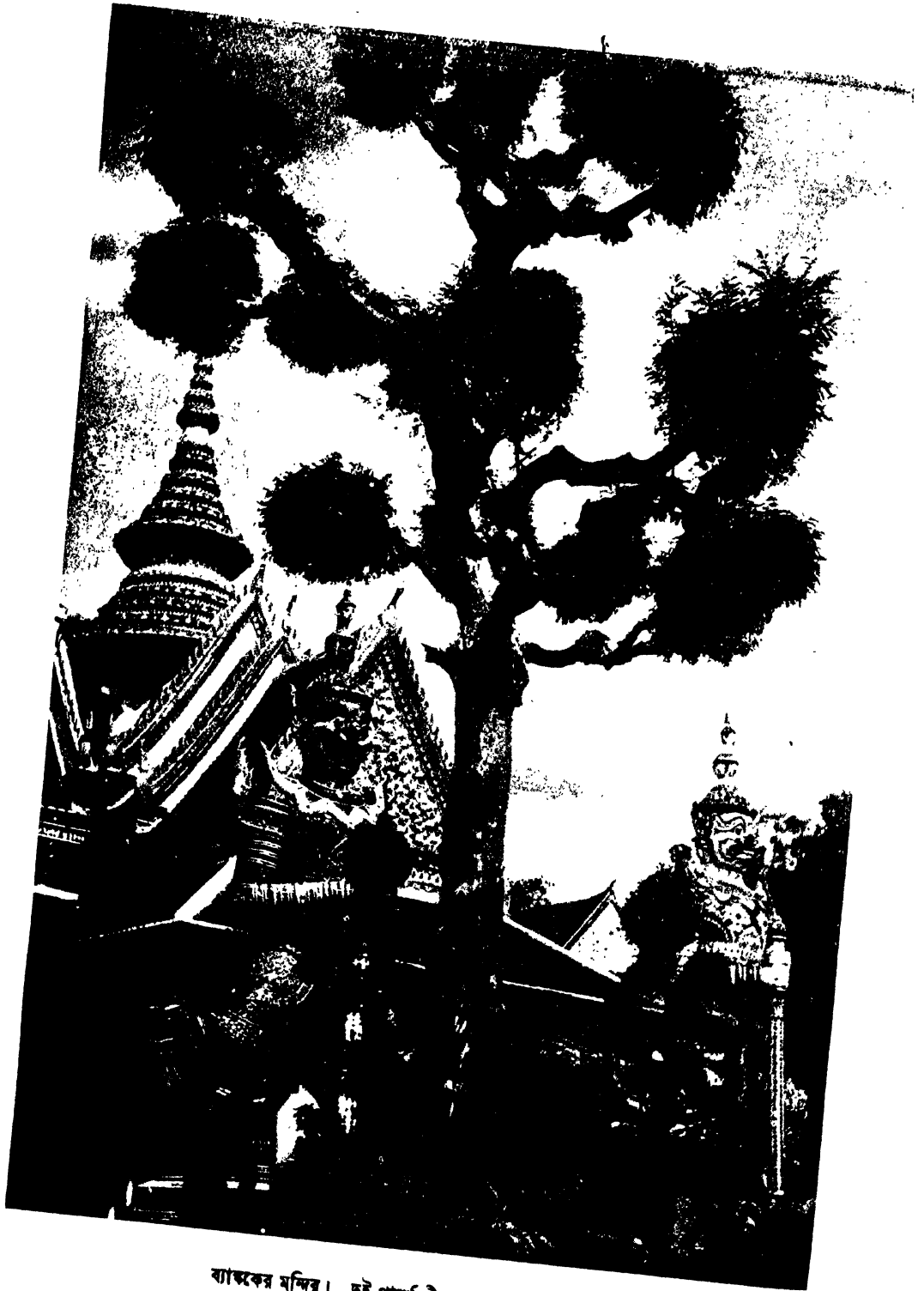
ব্যাঙ্ককের মন্দির। দুই পার্শ্বে ভীষণাকৃতি মন্দিররক্ষী।

শ্রীগুরুনানকজন্মোৎসব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গুরু নানকের জন্মোৎসব হইয়া গেল। কিন্তু সত্যই কি তাঁহার জন্ম সেই তিথিতে? মহাপুরুষদের জন্ম বা তিরোধান তিথি অনেক সময় ভক্তগণের সুযোগ অনুসারে পালিত হইয়া থাকে। তাই দেখা যায় প্রায়ই তাঁহাদের জন্ম ও তিরোধান তিথি পূর্ণিমা। পূর্ণিমা তখনকার দিনে প্রায় সকলেরই উৎসব-তিথি ছিল বলিয়া সর্ব্বত্রই কোনো-না-কোনো পূর্ণিমাকে আশ্রয় করিয়া জন্মতিথি বা তিরোধান-তিথির উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভাই মণি সিংহ প্রভৃতি পুরাতন সব ইতিবৃত্ত-রচয়িতাদের মতে গুরু নানকের জন্ম বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া বা শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে। এই পুণ্য দিনটিও এই ভাবেই ভক্তরা নির্ণয় করিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে পুরাতন জন্মসাখীগুলিতে এই দিনটিই পাই। ভক্তদের লিখিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায় ১৮১৫ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দেও গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানাতে বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়াতেই শ্রীগুরুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

প্রচলিত শিখধর্ম্মে সকলে কার্ত্তিক-পূর্ণিমাই মানেন। তাঁহারা ভাই সন্তোষ সিংহ ধৃত, গুরু নানকের কুলপুরোহিত হরদয়াল কৃত, কোষ্ঠিকে প্রমাণ মনে করেন। এই কোষ্ঠি নাকি গুরু অঙ্গদ পাইয়াছিলেন। তবে সকলে এই প্রমাণ স্বীকার করেন না। শ্রী পৈরা মোখার জন্মসাখী নাকি শ্রী বালা কথিত। তাহার উপর সকলের প্রত্যয় নাই। কার্ত্তিক-পূর্ণিমার পক্ষে শ্রীযুত খজান সিংহ অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শিখধর্ম্মের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কার্ত্তিক মাসে জন্মতিথির কথাটি পাওয়া যায় পরবর্ত্তী সব জন্মসাখীতে। নানা কারণে জন্মতিথিটা বদলাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া এইরূপ হয়।

শিখদের যেমন মহাতীর্থ নানকানা সাহেব ও অমৃতসর, তেমনি পরবর্ত্তী সম্প্রদায় নিরঞ্জনী বা হণ্ডালীদের তীর্থস্থান হইল জান্দিয়ালাতে। জান্দিয়ালা অমৃতসর হইতে মাত্র পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে। ভক্ত হণ্ডাল হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম। অথচ তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। হণ্ডাল ছিলেন গুরু অমরদাসের ভক্ত শিষ্য। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি ছিলেন মাঞ্ঝা জাঠ। হণ্ডাল অতিশয় কৃচ্ছ্রচারী সাধক ছিলেন। শিশুর মত সরল ছিল তাঁহার চিত্তটি। চুপচাপ তিনি হয় নিরন্তর জপ করিতেন, নয় নিঃশব্দে সকলের সেবা করিতেন। কাহারও প্রতি তাঁহার দ্বেষবুদ্ধি ছিল না। অনাড়ম্বর সহজ সেবাই ছিল তাঁহার সাধনা। ইঁহারই বংশে বিধিচাঁদের জন্ম। বিধিচাঁদই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হণ্ডালের নামে হণ্ডালী নামে নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন।

বিধিচাঁদ নাকি পূর্ব্বে দস্যু ছিলেন। পরে বন্ধু অদলীর কথায় তিনি পঞ্চম গুরু শ্রীঅর্জুনের (জন্ম ১৫৬৩) কাছে যান ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মতভেদ হওয়ায় তিনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ ভক্ত হণ্ডালের নামে নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। তাহাতে তিনি নিজ ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিখ-সম্প্রদায়কে অনেক স্থলে নিন্দা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শিখরাও বিধিচাঁদকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিধিচাঁদ পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন মুসলমানবংশীয়া। শিখরা বলেন, তিনি বিধিচাঁদের পরিণীতা পত্নী ছিলেন না। সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার পুত্র দেবীদাসের জন্ম।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিধিচাঁদের প্ররোচনায় যে নূতন "জন্মসাখী" হইল, শিখরা বলেন তাহাতে নানা মিছা কথা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। হণ্ডালীরা নাকি যথাসাধ্য পুরাতন সব জন্মসাখী নষ্ট করিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের নূতন জন্মসাখী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তাঁহারাই জানাইলেন গুরু নানকের জন্ম কার্ত্তিক মাসে।

এখন প্রশ্ন এই, যে, সাধারণ শিখরা এই নূতন ব্যবস্থাকে

স্বীকার করিয়া লইলেন কেন? আসলে অনেক দিন ধরিয়া দেখা যাইতেছিল যে বৈশাখে বৈশাখী মেলা, অক্ষয়তৃতীয়ার মেলা, প্রভৃতি অনেক পুরাতন মেলা থাকায় গুরু নানকের জন্মোৎসবের মেলাটার তেমন সুবিধা হইতেছিল না। তাই তাঁরা কেহ কেহ ভাবিতে লাগিলেন, "কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালীর পরে উৎসবটা করিলে কেমন হয়?" পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮১৫।১৬ পর্য্যন্তও নানকানা সাহেবে জন্মোৎসব বৈশাখেই অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাই সন্তোষ সিংহের জন্মসাখী লিখিত হইল তাহাতে দেখা গেল গুরু নানকের জন্ম কার্ত্তিকে। কিন্তু তিনি নানকের জন্মমৃত্যুর যে সন ও তারিখ দিলেন তাহাতে তাঁহার লিখিত আয়ুর বৎসর মাস দিনের মিল রক্ষা হয় না।

যখন বৈশাখ ও কার্ত্তিকের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তখন লাহোরের সহীদগঞ্জবাসী বিখ্যাত শিখ ভাই হরিভক্ত সিংহের মত চাওয়া হইল। তিনি একটি কাগজে "বৈশাখ" আর একটি কাগজে "কার্ত্তিক" লিখিয়া গ্রন্থসাহেবের কাছে রাখিলেন। একটি নিরক্ষর শিশুকে বলা হইল তাহার মধ্যে একটি কাগজ উঠাইতে। "কার্ত্তিক" লেখা কাগজটিই নাকি উঠিল।

মোট কথা নানা সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজনের তাগিদে বৈশাখ মাস ছাড়িয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতেই শ্রীগুরু নানকের জন্মতিথি এখন হয় অনুষ্ঠিত।

গুরু নানক যখন এই জগৎ হইতে বিদায় লইবেন বুঝা গেল তখন সবাই শোকে মগ্ন। তিনি আশ্বাস দিলেন, "হে ভাইগণ, প্রভুর নাম স্মরণ কর, সবাইকেই তো প্রয়াণ করিতে হইবে…যে কেহ এখানে আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই তো হইবে যাইতে, বৃথা কর সবাই অহঙ্কার। নানক বলেন, 'বাবা, তাহার বিলাপই সত্য যে কাঁদিতেছে প্রেমের জন্য।'

…সাহিবু সিমরহু মেরে ভাঈ হো
সভনা এহ পইআনা।…
এথৈ আইআ সভু কো জাসী
কূড়ী করহু অহংকারো।
নানক রুণা বাবা জাণীঐ
জে রোবৈ লাই পিআরো।
(রাগ বড়হংস, অলাহণীয়া।)

যাইবার পূর্ব্বে গুরু নানক তাঁহার ভক্ত শিষ্য অকিঞ্চন শ্রীঅঙ্গদকেই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। তাঁহার মাথায় রাজছত্র দিয়া গুরু নানক তাঁহাকে আপন সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ উপেক্ষিত হইয়া বড় দুঃখে কহিলেন, "আমাদের গতি কি হইবে?" গুরু বলিলেন, "ভগবানের উপর নির্ভর কর, তিনিই অভাব পূর্ণ করিয়া দিবেন।" ১৫৯৫ সংবৎ আশ্বিন শুক্লাদশমীতে আদিগুরু ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলেন (১৫৩৮ খ্রীঃ)।

ভক্ত লহণ গুরু অঙ্গদ নামে আপন পদে বিনীত ভাবে সমাসীন হইলেন। লহণাকে গুরু নানক অঙ্গদ নাম দিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গদের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। অঙ্গদের অঙ্গেই গুরুর আত্মা জীবন্ত রহিল। কাজেই অঙ্গদ প্রভৃতি পরবর্ত্তী সকল গুরুই নিজেদের বাণীতে "নানক" নামেই ভণিতা দিয়াছেন। গুরু নানক তো জন্ম-মরণের অতীত। তিনি পরবর্ত্তী গুরুদের মধ্যে জীবন্ত। তাই তাঁহারা গুরু হইবার সময় নিজ পূর্ব্ব সত্তা লোপ করিয়া 'নানক' হইয়া যান। তাই তাঁহাদের দায়িত্বের আর অন্ত নাই। গুরু নানককে তাঁহাদের সকল সাধনাতে জীবন্ত রাখিতে হইবে। কোথাও যদি তাঁহাদের চ্যুতি ঘটে তাহাতে আদিগুরুর বিড়ম্বনা।

দশ জন গুরু এই ভাবে সাধনা করিয়া গেলেন। কিন্তু নানা কারণে ক্রমে এই ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি দেখা দিল। গুরুর নিয়োজিত লোকেরা আপন আপন স্বার্থ ও নীচ কামনাকেই প্রধান করিয়া তুলিলেন। ক্রমে যখন ব্যাপার অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন দশম গুরু গোবিন্দ অনেক ধ্যানধারণার পর স্থির করিলেন যে এই ভাবে আর চলে না। পরিশেষে ১৭৫৬ সংবতের (১৬৯৯ খ্রীঃ) ১লা বৈশাখ তারিখে তিনি একেবারে নূতন ব্যবস্থা করিলেন। তিনি গুরুর পদ উঠাইয়া দিয়া "খালসা"কেই গুরু করিলেন। খালসা অর্থ হইল পবিত্র মণ্ডলী। সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই এই খালসার অংশ। সবাইকে লইয়াই খালসা। সকলে বিশুদ্ধ হইলেই গুরু হয়। গণ-নেতৃত্বের অপূর্ব্ব এই দৃষ্টান্ত।

কি ভাবে গুরু গোবিন্দ তাহা প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহাও চমৎকার। বৈশাখ মাসের নববর্ষের উৎসব উপস্থিত। গুরু সকলকে উৎসবে ডাকাইলেন। বর্ষশেষ রাত্রে তিনি

একটি বিশ্বস্ত শিখকে বলিলেন, "একটি উচ্চ স্থানে আমার আসন কর। নিকটে একটি তাম্বুতে পাঁচটি ছাগ বাঁধিয়া রাখ। কাহাকেও একথা বলিও না।" পরদিন নববর্ষের দিনে তিনি সকলকে লইয়া উৎসব জমাইয়া বসিলেন। তার পর ঘোষণা করিলেন, "আমার জন্য তোমাদের মধ্যে কেহ কি মাথা দিতে পার?" চারি দিকে মহা হৈচৈ পড়িল। কেহই উত্তর দেয় না। গুরু দ্বিতীয় বার ঐ কথাই বলিলেন। কেহই অগ্রসর হয় না। তৃতীয় বার গুরু যখন ঐ কথা বলিলেন, তখন লাহোরবাসী দয়ারাম অগ্রসর হইলেন। গুরু তাহাকে লইয়া তাম্বুর মধ্যে বসাইয়া, একটি ছাগকে বলি দিয়া, রক্ত-ঝরা খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন। সকলে ভাবিল, দয়ারামের মুণ্ডচ্ছেদ হইয়া গেল। সকলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তবু গুরু বলিলেন, "আর কে আছ?" তার পর দিল্লীর ভক্ত ধরমদাস অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকেও ঐ ভাবে তাম্বুর মধ্যে বসাইয়া, গুরু ছাগ ছেদন করিয়া রক্তঝরা খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন। সকলে ভাবিল গুরুর হইল কি! তবু গুরু ডাক দিলেন, "আর কে আছ, কে আমার জন্য শির দিতে পার?" ক্রমে দ্বারকার মুহকমচাঁদ, বিদরের সাহিবচাঁদ, জগন্নাথধামের ভক্ত হিম্মত একে একে গুরুর কাছে গেলেন ও গুরু ঠিক সেই প্রকার করিলেন। বাহিরের লোক ভাবিল পাঁচ জন নিহত হইলেন।

গুরু তখন এই পাঁচ জনকে উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া বাহিরে আনিয়া নিজ আসনে বসাইলেন। বলিলেন, "তোমরা যখন আমার, আমিও তখন তোমাদের। আমরা এখন অভেদ মূর্ত্তি। গুরু নানকের সময় গুরু অঙ্গদ একা একজন মাত্র সাচ্চা বীর শিখ ছিলেন। এখন আমি তো পাঁচ জনকে পাইলাম। আর চিন্তা কি? এখন আর ভয় নাই। এই ধর্ম্ম এখন জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।" সকলে তখন বলিল, "জয় জয় ভাই পঞ্চবীরের, জয় জয় শিখধর্ম্মের। আমরা যদি আত্মোৎসর্গ করিতাম তবে আমরাও ধন্য হইতাম।"

গুরু বলিলেন, "এত দিন গুরুর চরণোদকই ছিল দীক্ষার সেব্য। এখন হইতে খালসাই গুরু। তাই এখন আর গুরুর পাদপ্রক্ষালনে চরণপাহুল হইবে না। খালসার পবিত্র জলই হইবে দীক্ষা-বারি।" তিনি লৌহ পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে শর্করা মিশাইলেন। এই পঞ্চ বীর পঞ্চ কৃপাণ দিয়া তাহা নাড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরু নানকের "জপজী" গুরু অমরদাসের "আনন্দ" ও গুরু গোবিন্দের "সবৈয়া" কয়েকটি উচ্চারণ করা হইল। এই রসের নাম হইল অমৃত। ইহাই হইল নব পাহুল। মাধুর্য্যরসের সঙ্গে বীর-রস যুক্ত হইল। গুরু বলিলেন, "এই পাহুলে যাহাদের দীক্ষা তাহারা প্রত্যেকে হইবে সিংহ।"

দিল্লীতে বাদশার কাছে সংবাদদাতারা খবর দিলেন, "গুরু আজ বলিলেন, এই নববর্ষের দিন হইতে শিখধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম ও জাতির কাছে তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। সকল জাতি এক হইয়া গেল, উচ্চ নীচ ভেদ আর রহিল না। তীর্থ শাস্ত্র দেবতা সব ছাড়িয়া দিয়া এই ধর্ম্মকে দৃঢ় ভাবে আশ্রয় কর। চতুর্ব্বর্ণ সমানভাবে এই দীক্ষা লও। আহারে বিহারে কেহ কাহাকেও আর ঘৃণা করিও না।"

তিনি তখন এই অমৃতে পঞ্চশিষ্যের দীক্ষা দিলেন। তাহাদিগকে বীরের ও সাধকের নব নীতির উপদেশ দিলেন।

তার পর গুরু গোবিন্দ বলিলেন, "এইবার তোমরা পাঁচ জন আমাকে এই দীক্ষা দাও, আমারও তো এই দীক্ষা পাওয়া প্রয়োজন।"

শিষ্যরা বলিলেন, "এ কি কথা গুরু? আপনি কেন আমাদের কাছে দীক্ষার জন্য বিনত হইতে যাইবেন?"

গুরু গোবিন্দ বলিলেন, "আমি বিধাতার সন্তান, তাঁর ইচ্ছাতেই এই দীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। যে কেহ এই দীক্ষায় দীক্ষিত সে-ই খালসা। এখন হইতে খালসাই গুরু, গুরুই খালসা। কাজেই আমাতে ও তোমাতে কোন প্রভেদ তো নাই। আমি তোমাদিগকে গুরুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।"

অগত্যা তাঁহারা গুরুকে দীক্ষা দিলেন। তাঁহার নাম হইল গোবিন্দ সিংহ। আরও বহু লোক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সকল মণ্ডলীই গুরু হইল।

জগতে এই দীক্ষা একেবারে অভিনব ব্যাপার। সমস্ত শিখদের মধ্যে ইহাতে নূতন দায়িত্ব অর্পিত হইল। আগে

শুধু গুরুদের মধ্যেই গুরু নানক ছিলেন বিরাজিত। এখন প্রত্যেক শিখের মধ্যে আদি গুরু বিরাজমান। কাজেই তাঁহাদের ভালমন্দ সব কৃত্য গুরুর সঙ্গে যুক্ত।

শিখগণ কি সব সময় তাঁহাদের কৃত্যদ্বারা গুরুর সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? যে কৃপাণ তাঁহারা বীর দীক্ষায় গ্রহণ করিয়াছেন, পরে তাহার কি বহু স্থানে অপপ্রয়োগ ঘটে নাই? বড় ভীষণ দায়িত্ব যে গুরু গোবিন্দ তাঁহাদের সকলকে দিয়া গে'লেন। সকল শিখের মনে এই ভাবনা জাগ্রত না থাকিলেও এক এক জন শিখ সাধক এই দায়িত্বের কথা মনে করিয়া আজও কম্পিত হইয়া উঠেন।

১৯০৭ সালে পঞ্জাব গুরদাসপুরে এক শিখ সাধুকে দেখিয়াছিলাম। এই দায়িত্বের কথায় তিনি বলিলেন, "বলিব কি, বাবা, যখন দেখি শিখরা শুধু পেটের জন্য তাহাদের আদর্শ ভাসাইয়া অস্ত্র ধারণ করে, পয়সার জন্য তাহাদের বীরধর্ম্মকে দাস্যে পরিণত করে, নিঃসহায় দুর্ব্বলকে পীড়ন করে, অত্যাচার করে ও অত্যাচারীর দাসত্ব করে, তখন আমার কম্পিত অন্তরাত্মা কাতরে বলে, 'হে গুরু, এই জন্যই কি এত বিশ্বাস করিয়া এই গুরুভার, এই মহাব্রত, আমাদের দিয়া গিয়াছ? এই কি তোমার এত আশার ধন খালসার পরিণাম'?"

আফ্রিকা

শ্রীকালিদাস নাগ

মহাত্মা গান্ধী
ভক্তিভাজনেষু

দেখ্‌ছি বিরাট কালো মহাদেশ
দেখ্‌ছি তা'র অগণ্য কালো মানুষ
পুরুষ নারী ঘাড় হেঁট্ ক'রে চলেছে
যুগ হতে যুগান্তরে।
কোন্ সুদূর অতীতে এই কালো মানুষ হাঁটতে সুরু করেছে
কালের গজ-কাঠিতে যেন মাপাই যায় না।
হয়ত মানব-জাতের মুখ্য কুলীন
হয়ত স্রষ্টার খামখেয়ালে তা'র চেপ্‌টা নাক
কালো রঙ্, কদর্য্য ঠোঁট
আরো কত বিসদৃশ বীভৎস জিনিষ
যেন পুঞ্জীভূত হয়েছে তা'র শরীরে!
পরের যুগে শাদা-মানুষ এসে বলেছে
তা'কে দেখে ভয় করে, ঘৃণা হয়।

তাই কালোর উপরে শাদা করেছে কল্পনাতীত অত্যাচার
অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা।
কালো মহাদেশের সর্ব্বত্র আজ
শাদা জাতের গর্ব্বোন্মত্ত জয়ধ্বজা;
কালো মানুষ ক্রীতদাস
কালো নারী ভোগের দাসী হতেই যেন
জন্মেছে।
শাদা-কালোর কামজ সংমিশ্রণ
গড়ে তুলছে নতুন জাত, বর্ণসঙ্কর সমস্যা—
ভীষণ ক'রে তুলেছে মানুষের ইতিহাস।
অথচ এই ইতিহাসের গোড়ার অধ্যায়গুলো
কালো ঐতিহাসিকের লেখা;
কলম দিয়ে লেখা হয় নি তখনো সুরু—
নানা প্রহরণ দিয়ে, হাতিয়ার দিয়ে,
কালো মানুষ লিখে গেছে, মানব-পুরাণ।

কিম্পুরুষ যেন বামনাবতার হয়ে ছেয়েছে দেশ মহাদেশ :
কারো খাদ্য কন্দমূল কারো বা মাছমাংস
কেউ অহিংসাধর্ম্মী, কেউ হিংসাব্রতী
কেউ গড়েছে কৃষিবিজ্ঞান কেউ শিকার-সন্ধান,
কেউ স্থল-পথে কেউ জল-পথে গেছে ধেয়ে
সব মানুষের আগে,
সব জাতির অগ্রদূত,
এই কালো মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে
অতলান্তিক, ভূমধ্য-সাগর বেয়ে পাশ্চাত্য মণ্ডলে
ভারত-সমুদ্র বেয়ে সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে।

মানবজাতির প্রণম্য পথিকৃৎ!
প্রণাম করি তোমায়।
মানুষের শতাব্দী-সঞ্চিত ঘৃণা অত্যাচার ও দাসত্বের ভারে
তোমার ঘাড় গিয়েছে নুয়ে, পা গিয়েছে বেঁকে ;
প্রাণ দিয়ে খেটেও মেলে নি তোমার সুখশান্তি
স্থায়ী আবাস
নামও নেই যেন তোমার
শুধু ঘৃণ্য পরিচয়—তুমি ক্রীতদাস!
অপরিসীম স্পর্দ্ধা মানুষের,
যারা এসেছে সবার পরে, করেছে সব লুট্,
তারাই কিনেছে তোমার ভিটে-মাটি, তোমার সব,
তোমার প্রাণ!
কী দাম দিয়ে? কে ছিল সাক্ষী?
কে করেছে যাচাই?
এত অবিচার এত প্রতারণা
সহ্য করবে মানবের ইতিহাস, নীতি, ধর্ম্ম?
ন্যায়ের ক্ষেত্রেও কি আছে জাতিভেদ?
কার গড়া এই নব্য ন্যায়? কত দিন তার স্থিতি?

চিত্রশালা ভরে রয়েছে তোমার বিচিত্র সৃষ্টি—
মানবত্বে দাবীর পাকা দলিল :
অসীম সাহসে দুর্ভেদ্য জঙ্গল করেছ ভেদ
চিনেছ লতাপাতা কাঠপাথর,
রচেছ প্রথম গৃহস্থসূত্র—পর্ণকুটীর,
গেঁথেছ প্রথম মালা গৃহলক্ষ্মীর গলায়
দিয়েছ সোনার গয়না, কাঠের কণ্ঠী, ঝিনুকের কঙ্কণ বলয়,
কাচমণির হার, গজদন্তের অলঙ্কার

পাথর ঘষে উদ্ভিদরসে রসিয়ে
এঁকেছ ছবি, পুরাণ পৃথিবীটা ব্যেপে,
হিস্পানী গুহা থেকে ভারত-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত
সাজিয়ে তুলেছ তুমি তোমার রেখায় রঙে।
আদি শিল্পী তুমি, চিত্রী তুমি,
আদি নট তুমি!
ভাষায় নাটক লেখ নি
পায়ের ছন্দে অদ্ভুত নৃত্যতাণ্ডবে মাতিয়ে তুলেছ
সবাইকে
নাচিয়ে তুলেছ তোমার শাদা প্রভুদের ;
তা'রা প্রথম হেসেছিল বোধ হয় ঘৃণার হাসি
যখন তোমার ভাষাতীত বেদনা
মূর্ত্তি ধরে ফুটেছিল তোমার নাচে।
প্রথম দাস-জাহাজের বুকে,
সমুদ্রের তাণ্ডবে মনে পড়েছিল বোধ হয়—
একদিন তুমিই গড়েছিলে প্রথম কাঠের কাটামারান্,
লঙ্ঘন করেছিলে অসীম সাগর।
আজ তোমারই পায়ে বেড়ি, হাতে শিকল,
তবু তার মধ্যেই জাগ্‌ছে যেন জন্মান্তরের স্মৃতি।
নেচে উঠেছ তুমি
নাচিয়ে তুলেছ তুমি, ভাঙ্গো নৃত্যে,
শাদা-কালোর ভেদ ঘুচিয়ে ;
জাগ্‌ছে ঘৃণ-প্রীতির যুগ্ম-নৃত্য!
অর্কেষ্ট্রায় এনেছ নতুন তাল, নতুন প্রাণ,
গানে দিয়েছ নতুন প্রেরণা
শেক্স্‌পীয়রের রচেছ নতুন টীকা,
ক্রীতদাসের ভাষ্যে ধন্য হয়েছে
শ্বেত কবি-গুরুর রচনা,—
তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছে

লক্ষ লক্ষ মুগ্ধ শ্বেত নরনারী,
অবাক হয়ে দেখেছি।

ভেবেছি তোমার ভবিষ্যৎ, কালো ভাইবোন!
শিল্পীর সম্বর্দ্ধনা তুমি সহজেই লুটে নিয়েছ
কবে পাবে ন্যায়ের অধিকার
শাদা মানুষের হাত থেকে?
প্রাচীন মিশরকে জুগিয়েছ সভ্যতার উপাদান
ফিনীসিয়া, সীরিয়া, বাবিলনে পশেছে তোমার
কারুকাজ,
মধ্য যুগে আরব তাতার দিয়েছে হানা,
লুটেছে তোমার দেশ ঘর ধনদৌলত,
তোমার গজদন্ত, হীরক স্বর্ণ হয়েছে তোমার কাল।
আধুনিকেরা এসেছে তোমার খোঁজে,
ফলন্ত করতে হবে তাদের নতুন সাম্রাজ্য, নতুন জমি;
হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্রতর রোগের সঙ্গে যুঝে,
কালো ক্রীতদাস!
তুমিই গড়ে তুলেছ বিরাট শ্বেত সভ্যতা সুখ সমৃদ্ধির আবাদ
নামে ঘুচেছে তোমার ক্রীতদাস নাম
কাজে মেলে নি আজও মানুষের অধিকার
শাদা মনিবের হাত থেকে।

মানুষের অধিকার?
অনেক আগে উচিত ছিল তোমার পাওয়া।
মানব-সভ্যতার মূল উপাদান জুগিয়ে এসেছ তুমি,
কে অস্বীকার করবে তোমার দাবী?
কিন্তু ক'রে আসছে উপেক্ষা, যুগে যুগে দেখছি,
আধুনিক ইতিহাসও বাদ যায় নি
তাই আজ কালোর দেশে শ্বেত-সভ্যতার বর্ব্বরতা।
তবু মনে হয়, আছে ন্যায় কোনও খানে
অলক্ষিতে অতর্কিতে নাম্‌বে একদিন
উদ্যত বজ্রের মত
ভেঙে পড়বে অধর্ম্মের সাম্রাজ্য
ছিন্ন হবে দীর্ণ হবে অন্যায়-বৃত্রের উদ্ধত বুক
যেমন দেখি সব জাতির প্রাচীন পুরাণে
তেমনি হবে এ যুগের জীবন্ত ইতিহাসে।
জয়ী হবে মানুষের দাবী; চিরন্তন ন্যায়
বিধৃত করছে চিরদিন মহামানবের লীলা
নাই সেখানে কোনও ভেদ শাদায় কালোয়,
কোন পক্ষপাত জাতিতে জাতিতে—
এ বিশ্বাস
এই প্রতীক্ষা
ব্যথিয়ে তুলছে আমাদের এই যুগান্তরের সীমা॥

দার্ব্বান, দক্ষিণ আফ্রিকা
১৯৩৬।
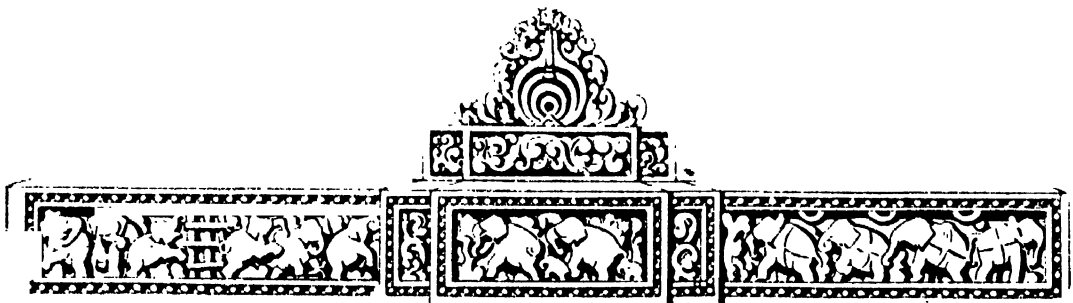
দামোদর ক্যান্যাল

শ্রীমেঘনাদ সাহা, এফ. আর. এস,

বর্দ্ধমান হইতে আবুল মনসুর নামক এক জন মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে দামোদর ক্যানাল সম্বন্ধে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। আমি মাঝে মাঝে বাংলার নদীনালা সম্বন্ধে লিখিয়া থাকি, বোধ হয় ভদ্রলোক সেই জন্য মনে করিয়াছেন যে আমি ইচ্ছা করিলে এই সম্বন্ধে কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে পারি। ভদ্রলোক স্থানীয় অবস্থা সম্যক্ অবগত আছেন এবং কৃষকদের অভাব-অভিযোগ বিষয়ে অনেক খবর দিয়াছেন। তাঁহার চিঠিখানি প্রাণস্পর্শী এবং সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য।

বাংলার নদীনালা সম্বন্ধে আমি ১৯৩২ সন হইতে আন্দোলন আরম্ভ করি। তার পরে 'সায়ান্স এণ্ড কালচার' পত্রিকায় ডাঃ নলিনীকান্ত বসু (পঞ্জাবের সেচ-বিভাগের রিসার্চ অফিসার), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গীয় সেচ-সমিতির সদস্য) প্রভৃতি অনেকেই বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের মূল বক্তব্য ছিল যে বাংলার নদীনালা দিয়া বৎসরে কত জলস্রোত প্রবাহিত হয়, দেশের উচ্চাবচতা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগের কর্ম্মচারীদের কোন ধারণা বা জ্ঞান নাই। কিরূপভাবে বর্ত্তমানে খাল ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাটা হয়, তৎসম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং বহুব্যয়সাপেক্ষ কোন খাল ইত্যাদি খননের পূর্ব্বে নদীবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, এবং নদীধৌত প্রদেশের জরীপ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে যে-সমস্ত খাল খনন হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ প্রণালী অবলম্বিত না হওয়াতে বহু কোটী টাকার অপব্যয় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের নদীবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। বাংলা দেশের নদী-নিয়ন্ত্রণ ও খাল-খননের জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ পঞ্জাব হইতে বিলাতী ও পঞ্জাবী এঞ্জিনিয়ার আমদানী করেন। ইহারা পঞ্জাবের ব্যাপার জানেন। কিন্তু বাংলার নদীনালার সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক। পঞ্জাবের এঞ্জিনিয়াররা তাহা না বুঝিয়াই কাজ আরম্ভ করেন এবং সরকারের বহু টাকা লোকসান করেন। আমি এরূপ দু-এক জন এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনারা নদীনালার গতিবিধি, জলপ্রবাহের দিক ও পরিমাণ এবং দেশের উচ্চাবচতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত না হইয়া কাজ আরম্ভ করেন কেন? তাঁহারা বলেন—আমরা কি করিব, মহাশয়। উপরওয়ালারা তাগিদ লাগান যে কাজ দেখাইতে হইবে। সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ কাজ করিতে হয়।

আমরা সকলেই ইতিহাসে পড়িয়াছি যে মোহম্মদ তোগলক নামে এক পাগলা বাদশাহ ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নোট চালান, রাজধানী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অপসারণ ইত্যাদি অনেক কাজ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি খুব বিদ্বান ও উচ্চমনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু কোন মতলব মাথায় আসিলে, সাধারণের উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে, অথবা বাস্তবিক তাহাকে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইবে, তৎসম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না। গবর্ণমেণ্টের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমার মনে হয় যে মোহম্মদ তোগলকের ভূত সকল সরকারী কর্ম্মচারীর মাথায়ই আশ্রয় করিয়া আছে। সেই ভূতে এখনও রোনাল্ডশে ড্রেজার, বর্দ্ধমান ড্রেজার, এণ্ডার্সন ক্যানাল, বিজয় কাট্ ইত্যাদি অপরূপ সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী করিতেছে। সমস্ত রাজকর্ম্মচারীই মনে করেন যে পাঁচ বৎসরে তিনি তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যাইবেন। সুতরাং বাংলা দেশের দুর্দ্দশা ঘোচে না। কয়েক বৎসর ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করার কাহারও ধৈর্য্য নাই। যদি ব্যবস্থাপক-সভায় কেহ প্রস্তাব আনেন

যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর নাম কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁহার জীবদ্দশায় যুক্ত হইতে পারিবে না, তাহা হইলে দেশ বহু অপব্যয়ের হাত হইতে মুক্ত হয়।

আমার প্রস্তাবিত নদীবিজ্ঞান-পরিষদে প্রথম খরচ হইত এককালীন ১০ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা। এক জন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী আমাকে ১৯৩৫ সনে বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যদিও আমার প্রস্তাবে সহানুভূতিসম্পন্ন, তথাপি তাঁহারা অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তখন উক্ত অর্থ খরচ করিতে রাজী নন। তার পর এক কোটী টাকায় এণ্ডার্সন খাল খনিত হইল। আমার মনে হয় সমস্ত টাকাটাই বর্দ্ধমান ও রোনাল্ডশে ড্রেজার খননের ন্যায় অপব্যয়।

গবর্ণমেণ্ট যদি নদীবিজ্ঞান-পরিষদ করিয়া পূর্ণভাবে গবেষণা করিতেন তাহা হইলে এত টাকার অপব্যয় হইত না। আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার—বাংলার নদীনালার সমস্যা কখনও ইংরেজ বা পঞ্জাবী এঞ্জিনিয়ার দিয়া সমাধান হইতে পারে না, কারণ আরাম-কেদারা ছাড়িয়া দেশে গিয়া জরীপ করা, বা তথ্য সংগ্রহ করার মত ধৈর্য্য বা অবসর তাঁহাদের নাই। এই কাজের জন্য যে এঞ্জিনিয়ার দরকার তাহা বাংলা দেশেই সৃষ্টি করিতে হইবে।

১৯২৭ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় কংগ্রেসের তরফ হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল স্কীমের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টাতেই ঐ স্কীম বন্ধ হয়। ইহাতে দেশের বহু অর্থ অপব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। সরকার-মহাশয় এখন মন্ত্রীমণ্ডলে আছেন এবং শোনা যায় তিনিই মন্ত্রী-মণ্ডলের অর্থ ও বুদ্ধি জোগাইয়া থাকেন। তিনি নদী-বিজ্ঞান-পরিষদ ও দেশের কন্টুর ও হাইড্রলিক সার্ভের উপকারিতা সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি চুপ করিয়া আছেন কেন?

এ-বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ লিখিতে পারিলাম না। আশা করি মৌলবী আবুল মনসুরের চিঠিখানা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

৭ নবেম্বর, ১৯৩৭, এলাহাবাদ।

[শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহাকে লিখিত মৌলবী আবুল মনসুরের পত্র]

কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতায় কোন বৈজ্ঞানিক-সম্মেলনে আপনার অভিভাষণ সংবাদপত্রে পড়ে আমার আপনার নিকট পত্র লিখবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু আপনার কর্ম্মবহুল জীবনযাত্রার মধ্যে এই পত্রের কোন মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে পারে কি না তৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। এখন প্রয়োজন মনে ক'রে লিখছি, যদি সম্ভব হয় অনুগ্রহ ক'রে এই পত্রের প্রতি একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন ব'লে আশা করি।

উক্ত অভিভাষণে আপনি দেশের সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আমার এই পত্রও ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারের নয়; আজ-বর্দ্ধমান জেলার সাত শত গ্রামের কৃষক-জনসাধারণের জমিজমার সেচ-ব্যবস্থা সম্পর্কে। আপনি সম্ভবত জানেন যে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে টাকা নিয়ে প্রায় এক কোটী টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে বর্দ্ধমান জেলায় একটি ক্যানাল খনন করেছেন। উক্ত ক্যানাল দামোদর ক্যানাল নামে অভিহিত। উক্ত ক্যানালের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উচ্চ হারে কর ধার্য্য করেন এবং তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ ক্যানাল-অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলন "ক্যানাল-আন্দোলন" নামে পরিচিত। কয়েক দিন পূর্ব্বে নিখিল-ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবে "ক্যানাল-আন্দোলন"কে সমর্থন করা হয়েছে। আপনি সম্ভবতঃ কাগজে দেখে থাকবেন। আপনার কাছে আমার পত্র দেবার উদ্দেশ্য, আমাদের জেলার এই সেচ-ব্যবস্থা ও তার জন্য চাষীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আপনার ও আপনার সাহায্যে ভারতের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সেই জন্যে এই ক্যানাল ও ক্যানাল আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলা দরকার। নিম্নে যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি সেই কথা বলব।

সমগ্র বাংলা দেশে বর্দ্ধমান জেলার মত সেচ-ব্যবস্থার অভাব খুব কম জেলাই অনুভব করে। তাই গত ৫০।৬০ বৎসরের আবেদন-নিবেদনের ফলে গবর্ণমেণ্ট একটি ক্যানাল এই জেলার জন্য ক'রে দিতে প্রস্তুত হন, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই ক্যানাল খনন করা হয়। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে—এমন কি কোম্পানীর আমলেও আমাদের জেলায় অসংখ্য ছোট ছোট খাল ও নদী, যথা—কাণা, খুসি, বাঁকা, ভৈরব ইত্যাদির দ্বারা আমাদের জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাকেই সর উইলিয়ম উইলকক্স তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ১৯৩০ সনে "Overflow irrigation system" বলে অভিহিত করেন। তাহার পরে তাঁহার মতে Zamindari bank irrigationএর ব্যবস্থা ছিল। সর উইলিয়ম উইলকক্সের বক্তৃতা যাহা পুস্তকাকারে আছে আমি তা পড়ে দেখেছি। তিনি আমাদের দেশের সেচ-ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ বলেন, সরকারের অবহেলা ও রেল-লাইন, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও দামোদরের বাঁধ ইত্যাদি "five Satanic chains"। এই শয়তানী শৃঙ্খল তাঁরই দেওয়া নাম।

এই দামোদর-ক্যানাল স্কীমকে "unjustifiable on any

ground" স্বাস্থ্যরক্ষা বা জলসেচ কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নয় এ কথা তিনিই ব'লে গিয়েছেন।

যাই হোক, গবর্ণমেণ্ট সে-সব কথায় কর্ণপাত না করে এক কোটী টাকা খরচ করে এই ক্যানাল করেন। কেন যে এই স্কীমের উপর সরকারী এঞ্জিনিয়ারগণ বেশী জোর দেন তা বিশেষ বোঝা যায় না। ক্যানাল যেখান থেকে কাটা হয়েছে মেন লাইনের পানাগড় ষ্টেশনের কিছুদূর রণডিহায় গেলে। সেখানে তিনটি ড্রেজার দামোদরের বুকে পড়ে আছে, কোন কাজে লাগান সম্ভব হয় নি। দামোদরের নদীগর্ভ অগভীর, সেখানে ড্রেজার চালান সম্ভব নয়, তথাপি কেন এখানে ড্রেজার আনান হ'ল? যাহা হউক, ক্যানাল খনন করা হয় এবং এখনও হচ্ছে কিন্তু কোন রিজারভয়ের বা ক্যাচমেণ্ট করা হয় নাই। দামোদর একটি পার্ব্বত্য নদী; তার উপর নদীগর্ভ পূর্ব্বাপেক্ষা উঁচু হয়েছে, বর্ষায় যে জল আসে কোনও রিজার্ভয়ের না-থাকায় তাহা ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না এবং অন্য দিকে বর্দ্ধমান শহর প্লাবিত হয়ে যায়। আমাদের দেশে 'অক্টোবর ওয়াটার'এর প্রয়োজন বেশী হয়, কারণ কার্ত্তিকের বর্ষার অভাবেই আমাদের দেশে "শুকা" (scarcity) হয়। কিন্তু ক্যানাল সেই সময় প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে পারে না, কারণ মূল দামোদরেই তখন প্রায় জল থাকে না। তার পর সরকার বলেন যে দামোদরের জল পলিমাটি আনে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পলির পরিবর্ত্তে জমিতে বালিই আসছে বেশী। ম্যালেরিয়া জ্বর ক্যানাল অঞ্চলে ভীষণ ভাবে চলছে, এ-বিষয়ে কয়েক দিন পূর্ব্বে "আনন্দবাজারে" জেলা-বোর্ডের ডিসপেন্সারীগুলিতে কিরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছে তার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আমি ক্যানালের এক মাইলের মধ্যে বাস করছি, আমার বাড়ীতেই উপস্থিত তিন জন ম্যালেরিয়া-রোগী বর্ত্তমান। তার পর ক্যানালের নিকটবর্ত্তী জমিতে জল জমে জমি হেজে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গত ২৪শে অক্টোবরের "আনন্দবাজারে" গলসী থানার (যে থানা থেকে ক্যানাল আরম্ভ হয়েছে) কয়েক জন চাষীর পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এইরূপ ব্যাপার দৈনন্দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। "আনন্দবাজার" ও অন্যান্য বাংলা দৈনিকে প্রায়ই এ-বিষয়ে কিছু-না-কিছু থাকেই। এই ত গেল ক্যানালের উপকারিতার কথা। এর মধ্যে কোন কিছুই বাড়িয়ে বলি নি। এই ক্যানাল ১৯৩৪।৩৫ সাল থেকে কার্য্যকরী হয়েছে। পূর্ব্বে ক্যানালের জল সাময়িক চুক্তিতে দেওয়া হ'ত। যে-গ্রামের শতকরা ৭৫ জন ৩।০ টাকা একর-প্রতি দিয়ে জল নিতে সম্মত হ'ত তারাই জল পেত। কিন্তু এতে গবর্ণমেণ্টের অর্থসমাগম না হওয়ায় ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন একজিকিউটিভ কাউন্সিলর "বেঙ্গল ডেভেলপ্‌মেণ্ট অ্যাক্ট" নামে এক আইন পাস করান। ঐ আইনের বিধান মতে উন্নত জমির বর্দ্ধিত আয়ের অর্দ্ধেক সরকার নিতে পারতেন। আইনটি দামোদর ক্যানেল হওয়ার অনেক পরে হয়েছে কিন্তু তবুও আইনটি দামোদর ক্যানালের উপর প্রয়োগ করা হয়, এবং একর-প্রতি ৫।০ টাকা কর ধার্য্য করা হয়। আইন কৌন্সিলে থাকাকালীন উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হ'তে থাকে। কিন্তু কোন ফল হয় নি, গত বৎসর এই সময় অর্থাৎ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাস থেকে আইন প্রয়োগ ক'রে সার্টিফিকেট দেওয়া হ'তে থাকে। তার পর আসে অ্যাসামব্লির সাধারণ নির্ব্বাচন এবং নির্ব্বাচনের পরেই জেলার কর্ম্মীদের এ-বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। কৃষকেরা এসে জেলা কংগ্রেস আপিস ও কৃষক-সমিতির আপিসে আবেদন করতে থাকে। সেই সময় বর্দ্ধমান জেলা কৃষক-সমিতির সম্পাদক ক্যানাল অঞ্চল ঘুরিয়া এক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, এবং কৃষক-সমিতি সমস্ত ব্যাপারটা হাতে নেন এবং ক্যানাল অঞ্চলে সভা-সমিতি ইত্যাদি করতে থাকেন এবং আন্দোলন চালাতে থাকেন। জেলা কংগ্রেস কমিটিও এ-বিষয়ে অগ্রসর হন। এই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যানাল অঞ্চলে ইস্তাহার দিতে থাকেন যে যারা আন্দোলন করছে তাহারা অসৎ প্রকৃতির লোক। এর পরই রুর্‍যাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিশনার মিঃ টাউনেণ্ড ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক ইস্তাহার গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে আসল তথ্য অপেক্ষা কৃষক-সমিতি ও তার কর্ম্মীদের গালাগালি বেশী ছিল। অবশ্য তাহা সরাসরি ভাবে নহে, পরোক্ষভাবে। এদিকে ক্যানাল অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ক্যানাল-সম্মেলন হয়। তথায় জেলা কৃষক-সমিতির কর্ম্মীদের কৃষকেরা কর বন্ধ করার প্রস্তাব আনতে বলে কিন্তু কর্ম্মীরা তাতে আপত্তি করেন; তাঁরা বলেন সিকি দিতে এবং বাকী প্রতিবাদ হিসাবে না দিতে; তাঁহাদের দাবী হয় যে, সমান-সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী সদস্য-সংবলিত একটি তদন্ত-সমিতি গঠন করা হোক। চাষীদের সত্যিকার কোন উপকার হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কতদূর ট্যাক্স ধার্য্য করা যেতে পারে, ইত্যাদি বিষয় তদন্ত-সমিতিকে অনুসন্ধান ক'রে দেখতে বলা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই সময় বর্দ্ধমানের কয়েক জন স্থানীয় লোককে ডেপুটেশন হিসাবে পূর্ত্ত-বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন, এবং সত্যিকার কৃষকদের পক্ষে বলবেন এমন সমস্ত লোককে সেই

ডেপুটেশনে বাদ দেওয়া হয়। যাহোক, সেই ডেপুটেশনও স্বীকার করেন নি যে এই দামোদর ক্যানাল চাষীদের কোন উপকার করেছে। এদিকে কৃষক-সমিতি ও কংগ্রেস আন্দোলন চালাতে থাকেন। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে নেতা করে জেলা কংগ্রেস একটি বেসরকারী তদন্ত-কমিটি গঠন করান। সেই তদন্ত-কমিটি কিছু দিন কাজ করেন এবং বর্ষার সময় তার কাজ স্বভাবতই বন্ধ হয়ে যায়। এই তদন্ত-কমিটির কাজ ছিল ফসলের হার, পরিবার-প্রতি আয়ব্যয় ইত্যাদি সংগ্রহ করা। বৈজ্ঞানিক কোন তথ্যসন্ধান এর দ্বারা সম্ভব হয় নি বা হবেও না. কারণ জলসেচ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ কমিটিতে নাই। ইতিমধ্যে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন এবং গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে সরকারী তদন্ত করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এই প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয়। বর্ত্তমানে সেই তদন্ত চলবে বলে শোনা যাচ্ছে। যে-সব লোক এই কমিটিতে থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে—যথা মৌলভী ফজলুল হক, সর্ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ইত্যাদি—তাঁরা যে কেমন ভাবে কি পদ্ধতিতে তদন্ত করবেন তা জানা যায় নি। এবং এদিকে জনসাধারণের মধ্যেও এই চিন্তা, উপস্থিত হয়েছে যে তদন্তকারীরা তাড়াতাড়ি দু-এক জায়গায় তদন্ত করে ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, জমিদার, মহাজন, রায়সাহেব-খেতাবধারী ইত্যাদির কাছে তদন্ত করে চলে যাবেন এবং তার ফল যে কি হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। এদিকে গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে কিন্তু কর-আদায়ের চেষ্টা বেশ চলেছে। গবর্ণমেণ্ট টাকায় চার আনা মকুব করেও গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে কর নিয়েছেন এবং বর্ত্তমানে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ তারিখ এগিয়ে দিয়েছেন। এতে নেহাৎ যাঁরা সরকারের দারোগা, সার্কেল অফিসারের প্রিয়পাত্র হ'তে চান তাঁদের মধ্যে দু-এক জন কর দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ কৃষক জনসাধারণ কর দেয় নি এবং তারা কৃষক-সমিতি ও জেলা-কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগ করে চলছে। জেলার কর্ম্মীরা জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করতে এবং তদন্ত-কমিটির সামনে তাঁদের ন্যায্য দাবী পেশ করবার জন্য অনুরোধ করছেন। আমার এই চিঠি লেখার কারণ হচ্ছে যে এই ক্যানাল-আন্দোলনের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের যথেষ্ট শুভেচ্ছা থাকলেও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমাদের কর্ম্মীদের আন্দোলন করবার শক্তি থাকতে পারে এবং তা আছে বলেই আজ ক্যানাল অঞ্চলে অস্থাবর ক্রোক করে সাতটি গরু মাত্র চার আনা মূল্যে খদ্দের হয় না, যখন ক্যানাল-কর্ম্মচারীরা গরু নিলাম করতে যায়। কিন্তু কর্ম্মীদের কোন বিজ্ঞানসম্মত তদন্ত করবার মত ক্ষমতা নেই। তার জন্য জলসেচ-বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। আপনার অভিভাষণ পাঠ ক'রে আমার ধারণা হয়েছিল আপনি দেশের সেচ-ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। দেশের অবস্থা দেখে এবং সর্ উইলিয়ম উইলকক্সের বক্তৃতা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে এই দামোদর ক্যানাল সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে কোন একটা ভীষণ গলদ আছে। কিন্তু আমাদের সাধারণ কর্ম্মীদের পক্ষে সেই সব গলদ ধরা সম্ভব নয়। একটা সামান্য জিনিষ দেখলেই বোঝা যায়—ক্যানাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে বই কমে নি। তাছাড়া গবর্ণমেণ্ট সব সময়েই কর্ম্মীদের কথায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখতে পান, কাজেই তাঁরা সত্য বললেও গবর্ণমেণ্ট শুনতে প্রস্তুত নন। কর ধার্য্য করা যে নিতান্ত অন্যায় হয়েছে তা তাঁরা নিজেরাই বুঝেছেন,তা নইলে সিকি মকুবের বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত না। বাংলার উন্নতির পক্ষে এই দামোদর ক্যানাল বিষয়টি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা আপনি বুঝতে পারেন। বাংলায় ইতিপূর্ব্বে সেচের ব্যবস্থার জন্য এত বড় একটা স্কীম গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নি। এই দামোদরের উপর বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার জনসাধারণের জীবন-মরণ নির্ভর করে। ইহার গুরুত্ব যে কতদূর তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার অনুরোধ যে আপনি আপনার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের এই বিষয়ে সচেতন ক'রে এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করুন। বর্দ্ধমানের কৃষকগণ তাদের একতার ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের গুণে জাতীয় মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা বেসরকারী ব্যাপারে খুব কমই হ'য়ে থাকে। ভারতের নানান প্রদেশের সেচের ব্যবস্থা একরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই দামোদর ও তার ক্যানাল যে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে একটা বিশেষ গবেষণার বিষয় হ'তে পারে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন, এবং সেই গবেষণার দ্বারা যদি দরিদ্র কৃষকগণ কিছু উপকার পায় তার জন্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে বর্দ্ধমান জেলার এই নিরন্ন চাষীরা চিরদিন ঋণী হ'য়ে থাকবে। আপনি হয়ত বলতে পারেন যে ঐ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা লিপ্ত হ'তে পারে না। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে দেশের ও দশের জন্য যারা কিছু ক'রে থাকে অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্ম্মীরা, তারা আর যত অন্যায়ই করুক না কেন মিথ্যা আচরণ কখন করে না। তারা যদি সত্য বুঝতে পারে যে

দামোদর ক্যানাল জনগণের উপকার করেছে ও কর ধার্য্য করা অন্যায় হয় নি, তাহ'লে তারা আন্দোলন করবে না। যাহোক, আপনাকে বিস্তৃত ভাবে জানালাম, আপনার যদি এ-বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে তাহলে দরিদ্র নিরন্ন কৃষকদের কিছু উপকার হ'তে পারে এই আশায়। এলাহাবাদে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আপিসে এ বিষয়ে একটি বিবরণী বর্দ্ধমান জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি দিয়েছেন। আপনি সেখান থেকে জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত জহরলালও এ-বিষয়ে অবগত আছেন। গত কল্যের সংবাদপত্রে দেখলাম বঙ্গীয় সেচ-বিভাগের চীফ এঞ্জিনিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সেচ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এই সংবাদ দেখেই আপনাকে পত্র লিখবার ইচ্ছা হ'ল, কারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বাংলার এঞ্জিনিয়ার কি প্রস্তাব দিয়েছেন তা জানার ইচ্ছা থাকলেও আমাদের ইচ্ছা যে কত দূর সীমাবদ্ধ তা উপলব্ধি করতে পারলাম। আমার মনে হয়, বাংলার এঞ্জিনিয়ারের প্রস্তাবটি হ'তে আমাদের দামোদর ক্যানালের সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানতে পারতাম। আমাদের এই অক্ষমতা উপলব্ধি ক'রে আমার মনে হ'ল, আপনাদের মত কোন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তাই এই পত্র লিখলাম। আশা করি আপনার বহুমূল্য সময় এই ভাবে নষ্ট করার জন্ম আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি বা জেলা-কংগ্রেসের সভাপতির দ্বারাই এই চিঠি লেখাতাম, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেই জন্ম আমি নিজেই লিখলাম। আপনার নিকট হইতে কোনরূপ আশাব্যঞ্জক পত্র পাওয়া মাত্র আমি তাঁদের জানাব। ইতিমধ্যে আপনি যদি কোন তথ্য তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চান তাঁদের কাছে লিখলেই তাঁরা পাঠাবেন। তাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে—আপনি তাঁদের কাছে লিখলেই তাঁরা সংবাদ পাঠাতে অবহেলা করবেন না। বর্দ্ধমান জেলা কৃষক-সমিতি বা জেলা কংগ্রেস-কমিটির আপিস, বর্দ্ধমান, এই ঠিকানাতেই তাঁদের নিকট চিঠি যাবে। আপনাদের মত ব্যক্তিদের কাছে দেশ অনেক কিছুই আশা করে বলেই আমিও আশা ক'রে আপনাকে পত্র লিখিলাম।

নবাবনগর, পোঃ সাহেবগঞ্জ, জেলা বর্দ্ধমান। ৩।১১।৩৭

অব্যক্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

একটি কথা কইব কানাকানি,
দেখো, যেন হয় না জানাজানি,
সে কথা কয় তারা রাতের বুকে,
যখন সবে ঘুমায় গভীর সুখে।

সে ব্যথাতে বোঁটার বাঁধন খুলে,
ঝরে' পড়ে শিউলি তরুর মূলে,
সেই ব্যথাতে বাতাস কেঁদে ধায়,
ফুলের 'পরে শিশির রেখে যায়।

পাহাড়ঘেরা কাননভূমি হোতে,
ঝরণা যখন নেমে আসে স্রোতে,
ছুটে চলে বেঁকে নদীর পানে,
ছলছলিয়ে সে ব্যথা গায় গানে।—

স্পষ্ট করে কইব ভাবি যারে,
এক নিমেষে হারিয়ে ফেলি তারে,
আঁধার যেমন পাথর হয়ে রয়,
তবু একটু পরশ নাহি সয়।

ফুলবাগানে পদ্মবনের মাঝে,
এই কথারি নূপুরখানি বাজে,
ব্যথায় ভরা ছায়ার অনুভবে
ভুবন চলে মহা মহোৎসবে।

পিঁপড়ের লড়াই

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েদের জীবনকাহিনী বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। ইহারা সামাজিক প্রাণী এবং সর্ব্বদাই দলবদ্ধভাবে বাস করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ-পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পিপীলিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ দলেই সাধারণতঃ স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী—এই তিন শ্রেণীর পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতের কর্ম্মীদের মধ্যে আবার ছোট কর্ম্মী, বড় কর্ম্মী ও যোদ্ধা—এই তিন রকমের বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বাসগৃহনির্ম্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যই ক্রীতদাসের ন্যায় এই কর্ম্মীদের করিতে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকার একমাত্র কাজ বসিয়া বসিয়া খাওয়া আর বংশবৃদ্ধি করা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জাতীয় বহুবিধ পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতের পিপীলিকার দলে হাজার হাজার কর্ম্মী থাকে; আবার কোন কোন জাতের দলে কর্ম্মীর সংখ্যা মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটি। অধিকাংশ পিপীলিকাই গর্ত্তের মধ্যে অথবা বৃক্ষ-কোটরে বাস করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বড় বড় গাছের উপরে সবুজ পত্র-পল্লবের সাহায্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিয়া থাকে। উগ্রপ্রকৃতি ও বিষাক্ত দংশনের জন্য 'নালসো' নামে এক জাতীয় লাল বর্ণের পিপীলিকা আমাদের দেশে সর্ব্বজন-পরিচিত। বাসস্থাননির্ম্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহা কতকটা সংস্কারমূলক হইলেও উহাতে সহজেই তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নালসো পিঁপড়েরা গাছের উঁচু ডালে অনেকগুলি সবুজ পত্র একসঙ্গে জুড়িয়া বড় বড় গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহার মধ্যে শত শত পিপীলিকা একসঙ্গে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের বাসস্থান-নির্ম্মাণপ্রণালী অতি অদ্ভুত। কতকগুলি নালসো কর্ম্মী একসঙ্গে পাশাপাশি ভাবে সার বাঁধিয়া পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি পাতাকে একত্র করিয়া টানিয়া ধরিয়া রাখে। তখন অপর কর্ম্মীরা তাহাদের কীড়া মুখে করিয়া উপস্থিত হয়। শুঁড়ের সাহায্যে এই কীড়াগুলির মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই তাহারা এক প্রকার আঠালো সুতা বাহির করিতে থাকে। কাপড় বুনিবার সময় তাঁতিরা যেমন একবার এদিক আর একবার ওদিক মাকু চালায়, কতকটা সেইরূপে কর্ম্মীরা কীড়াগুলির মুখ একবার এ-পাতায় আর একবার ও-পাতায় ঠেকাইয়া সূক্ষ্ম সুতার সাহায্যে পাতার ধারগুলি জুড়িয়া দেয়। এইরূপে বুনন শেষ হইলে বড় বড় ফাঁক-গুলিকে বার-বার সুতা বুনিয়া সাদা কাগজের মত পাতলা পর্দায় ঢাকিয়া দেয়। বাহির হইবার জন্য একটি কি দুইটি মাত্র পথ রাখে। পাতার পর পাতা জুড়িয়া ক্রমশঃ বাসা বড় করিয়া তোলে। বাসা বড় করিবার জন্য যদি কোন সময়ে একটু দূরবর্ত্তী নীচের ডাল হইতে পাতা লইবার প্রয়োজন হয়, তখন ইহারা দলে দলে বাসার নীচের দিকে জড়ো হইতে হইতে পরস্পর একে অন্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শিকলের মত ঝুলিয়া পড়ে। ক্রমে-ক্রমে অপরাপর কর্ম্মীরা আসিয়া সেই শিকল বাড়াইতে বাড়াইতে

নালসো পিঁপড়ে শিকল গাঁথিয়া বাসা তৈরি করিবার জন্য নীচের পাতা কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

পালিতা-মাদারের খুঁটির গায়ে বাখারির সঙ্গে ঝুলানো বাসাটি দেখা যাইতেছে

সর্ব্বশেষে পাতার নাগাল পাইলে কয়েক জন তাহা কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে। অপর কর্ম্মীরা তাহাদের পা কামড়াইয়া ধরে। তখন উপর দিক হইতে শিকল ক্রমশঃ খাটো করিতে করিতে নীচের পাতাকে টানিয়া কাছে আনিয়া, কীড়ার সাহায্যে মূল বাসার সহিত অত্যন্ত শক্ত করিয়া গাঁথিয়া দেয়।

ইহারা মাংসাশী প্রাণী। মৃত কীটপতঙ্গ, মাছের কাঁটা, পাখীর পালক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া যায় এবং অবসর-মত সকলে মিলিয়া তাহা চাটিতে থাকে। অন্যান্য পিঁপড়ের ডিম ও উই ইহাদের উপাদেয় খাদ্য, নাল্‌সোরা সুকৌশলে উই ধরিয়া থাকে। উইয়েরা কখনও অনাবৃত স্থানে যাতায়াত করে না, সর্ব্বদাই অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। এই জন্যই মাটির সুড়ঙ্গ গাঁথিতে গাঁথিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে নাল্‌সোদের উই-শিকার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির চতুর্দ্দিক বেড়িয়া অসংখ্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া উই ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ওই সব গাছে নাল্‌সো পিঁপড়ের অভাব নাই। তাহারা খাদ্যসংগ্রহের আশায় দল বাঁধিয়া উপরে নীচে উঠানামা করিতেছিল। নীচে আসিয়া অনেকে দল ছাড়িয়া বেশী দূরে না গেলেও আশেপাশে ইতস্তত খাদ্য-অন্বেষণে ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়ায়। উইয়ের সন্ধান পাইয়া ইহাদের গোটাদুই পিঁপড়ে মাটির সুড়ঙ্গের ধারে আসিয়া ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খানিকটা অংশ ভাঙিয়া দিল, এবং এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। উইয়েরা তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্ন স্থান মেরামত করিতে আসিবা মাত্রই একটা নাল্‌সো তাহার ধারালো চোয়ালের সাহায্যে একটাকে কামড়াইয়া ধরিয়া একেবারে শূন্যে তুলিয়া বাসার দিকে লইয়া পলায়ন করিল। অপর নাল্‌সোটা তখন আবার শিকারের আশায় সেই ভগ্নস্থানে আসিয়া ওৎ পাতিয়া রহিল।

জীবন্ত ফড়িং বা ঐ জাতীয় কোন কীটপতঙ্গকে একবার ধরিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। একটা পিঁপড়ে কোন রকমে একবার শিকার কামড়াইয়া ধরিলেই হইল; দেখিতে দেখিতে দলের অন্যান্য পিঁপড়েরা আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে থাকে। দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শিকার উড়িয়া পলাইবার জন্য প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করে; কিন্তু পিঁপড়েরাও তাহাকে কাবু করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বলপ্রয়োগ করিতে থাকে। ডানা চাপিয়া ধরিতে না পারিলে শিকার সহজেই উড়িয়া যাইতে সমর্থ হয়; সে অবস্থায়ও কিন্তু পিঁপড়েরা কামড় ছাড়ে না। অন্যান্য পিঁপড়েরা আসিয়া তখন সে পিঁপড়েটার পা অথবা কোমর কামড়াইয়া টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এ অবস্থায় ক্রমশঃ একটা পিঁপড়ের শিকল গাঁথিয়া তোলে। অনেক সময় দেখা যায় ফড়িং উড়িয়া যাইতেছে আর তাহার লেজ অথবা পা কামড়াইয়া ধরিয়া দুই-তিনটা নাল্‌সো শিকলের মত ঝুলিতেছে।

নাল্‌সো পিঁপড়েদের প্রকৃতি এতই উগ্র যে, শত্রুই হউক, মিত্রই হউক বাসার কাছে আসিলে কাহারও নিস্তার নাই; প্রবল দুর্ব্বল নির্ব্বিশেষে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে। প্রাণের ভয় যেন ইহাদের মোটেই নাই। একবার আক্রমণ করিলে কিছুতেই পিছু হটিবে না। শত্রুর আক্রমণে সঙ্গীরা দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে দেখিয়াও ইহারা যেন মোটেই বিচলিত হয় না, বরং চতুর্গুণ উত্তেজনার সহিত মরণ পণ করিয়া লড়াই সুরু করিয়া দেয়। একবার শত্রুকে কামড়াইয়া ধরিতে পারিলেই হয়—কিছুতেই আর কামড় ছাড়িবে না। মস্তক হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, মস্তকটি সেই একই ভাবে মরণ-কামড় দিয়া শত্রুর দেহসংলগ্ন হইয়া থাকে। শত্রুর আগমনের আশঙ্কা হইলেই দেহের প্রান্তদেশ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস পিচ্‌কিরির মত ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। এই রসের বিষাক্ত উগ্র গন্ধে অনেকে দূর হইতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। লড়াই সুরু হইবার মুখে ইহারা শরীরের পশ্চাদ্দেশ ঊর্দ্ধে তুলিয়া, সম্মুখের পা উঁচু করিয়া এমন উত্তেজিত অবস্থায় মুখ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দলে দলে বাসার উপর সার বাঁধিয়া দাঁড়ায় যে অতি বড় শত্রুও অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতে বাধ্য হয়। উত্তেজিত জনতা যেমন জিগির দিয়া সকলের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করে, প্রবল উত্তেজনার সময় ইহারাও তেমনি শরীরের পশ্চাদ্দেশ পাতার উপর ঠুকিয়া এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ উৎপাদন করে। বাসার সম্মুখে কান পাতিয়া রাখিলে তখন এক প্রকার অস্ফুট খস্ খস্ আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের দুর্দ্ধর্ষ কোপন স্বভাবের ফলে অন্যান্য পিপীলিকাদের সহিত হামেশাই ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়া থাকে, এমন কি বিভিন্ন দলের স্বজাতীয়দের মধ্যে সময় সময় ভীষণ লড়াই বাধিয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় অন্যান্য পিপীলিকা ইহাদের নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে দূরেই অবস্থান করে। তবে দলে ভারি বলিয়াই হউক বা অত্যুগ্র বিষের ভয়েই হউক ক্ষুদে পিঁপড়েদের সঙ্গে কিন্তু ইহারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষুদেরা কোন রকমে সন্ধান পাইলে নাল্‌সোদের সমূলে বিনাশ না করিয়া ছাড়ে না। এই জন্যই যে-সকল স্থানে ক্ষুদে পিঁপড়ের আস্তানা আছে, সেখানে কখনও নাল্‌সো পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদে ডেঁয়ো ও ছোট ছোট কালো বিষ-পিঁপড়ের সঙ্গে ইহাদের লড়াই আমি অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু ইহাদের স্বজাতীয়ের সঙ্গে যে ভীষণ লড়াই একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা সত্যই ভয়াবহ। এস্থলে সেই লড়াইয়ের বিবরণ প্রদান করিতেছি।

কিছুদিন আগের কথা। বিকালের দিকে এক দিন কলিকাতার সন্নিহিত সোনারপুর অঞ্চলের একটা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছি। বাগানটার চার দিকে পালিতা-মাদারের মোটা মোটা ডাল পুঁতিয়া তাহার গায়ে খুব ফাঁক ফাঁক করিয়া বাঁশের বাখারি আঁটিয়া এমনভাবে বেড়া দিয়া রাখিয়াছে যেন গরুবাছুর ভিতরে ঢুকিতে না পারে। বাগানের গাছপালার অবস্থা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল যে পূর্ব্বের দিন সেখানে বেশ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর একটু অগ্রসর হইতেই নজরে পড়িল—খুব বড় একটা লাল-পিঁপড়ের বাসা সমেত ছোট একটা আমের ডাল একটা খুঁটির খুব কাছেই বাখারির সঙ্গে ঝুলিতেছে। বোধ হয় ঝড়ের বেগে ডালটা ভাঙিয়া বেড়ার গায়ে আটকাইয়া গিয়াছিল। খুব নিকটে গিয়া দেখিলাম—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাসাটার ভিতরে সহস্র সহস্র পিপীলিকা অবস্থান করিতেছে। কতকগুলি পিপীলিকা বাসার উপরে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করিতেছে আর কতকগুলি একবার ডালটার গা বাহিয়া উপরের দিকে যাইতেছে আবার নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের গতিবিধি দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা গেল যে, তাহারা ঐ ঝুলানো ভাঙা বাসা হইতে বাহির হইয়া অন্য কোথাও যাইবার রাস্তা খুঁজিতেছে. কিন্তু একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারিলাম, তাহাদের বাহিরে যাইবার রাস্তা বন্ধ। কারণ যে-বাখারিটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলিতেছিল, সেই বাখারিটার উপর দিয়া বরাবর এক সার লাল-পিঁপড়ে যাতায়াত করিতেছে। বাগানের এক কোণে একটা ঝোপের ভিতর পূর্ব্ব হইতেই আর এক দল লাল-পিঁপড়ে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিল। তাহারাই বাখারির উপর দিয়া প্রায় ৩০।৩৫ ফুট লম্বা লাইন করিয়া একটা সদ্যকর্ত্তিত কচ্ছপের খোলা হইতে মাংস-কণিকা সংগ্রহ করিয়া বাসায় তুলিতেছিল। ঝুলানো বাসার পিঁপড়েরা ডাল বাহিয়া বাখারির কাছে আসিয়া উক্ত পিপীলিকার দল দেখিয়াই আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। অথচ বাখারির উপরের পিঁপড়েদের অতিক্রম না করিয়া তাহাদের অন্যত্র যাইবার কোনই উপায় নাই। ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভগ্ন বাসাতেও বেশী দিন বাস করা অসম্ভব। একে ত শত্রু নিকটে, তার উপর পাতা শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসা কুঁচকাইয়া যাইবে, নয়ত শুষ্ক পত্র কুঞ্চিত হইয়া জোড়া মুখ খুলিয়া স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দিবে। কাজেই এই বাসা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নূতন আশ্রয়ের সন্ধান করিতেই হইবে। বিশেষতঃ বাসার ভিতরে অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রহিয়াছে, তাহাদিগকে নিরাপদ
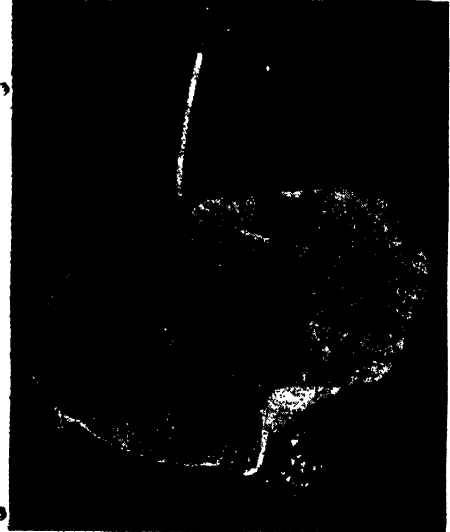
উপরে: বাসার নীচের দিকে কর্ম্মীরা ডিম ও বাচ্চা মুখে করিয়া ঝুলিতেছে।

নীচে: পালিতা-মাদারের ডগা মুড়িয়া নালসোরা বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

স্থানে রক্ষা করা দরকার। এই সব নানা ব্যাপারে বিব্রত হইয়াই ঝুলানো বাসার অধিবাসীরা বিষম উত্তেজিত ভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিল। বাখারির উপরে যাহারা যাতায়াত করিতেছিল তাহারাও এই আগন্তুক দলের সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, কারণ তাহাদের ভিতরও উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হইতেছিল। তাহারাও ক্রমে ক্রমে ঝুলানো ডালটার কাছাকাছি আসিয়া ভিড় জমাইতেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়াইয়া উভয় দলের এই তোড়জোড় লক্ষ্য করিতেছিলাম। একমাত্র উত্তেজিত ভাব বা এক স্থানে দলে দলে জমায়েৎ হওয়া ব্যতিরেকে লড়াইয়ের আর কোন লক্ষণই দেখিতে পাই নাই। ঝুলানো বাসার পিঁপড়েরা কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া বাখারির উপরের পিঁপড়েদের লাইন অতিক্রম করিয়া যায়—কেবল ইহাই দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আরও দশ-পনর মিনিট এই ভাবেই কাটিল।

অবশেষে দেখিলাম, ঝুলানো বাসার প্রায় পাঁচ-সাতটা পিঁপড়ে ডাল বাহিয়া বাখারিটার কাছে আসিয়াই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সেই দলের গোটাতিনেক বাসায় ফিরিয়া গেল। বাকী যাহারা রহিল তাহারা শুঁড় উঁচু করিয়া যেন বাখারির উপরের দলটাকে মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী পিঁপড়েটা অসীম সাহসে ভর করিয়াই অকস্মাৎ অতিবেগে বাখারির পিঁপড়েদের লাইনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া পার হইতে গিয়াই তুমুল কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। বাখারির দলও যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ দশ-বারোটা পিঁপড়ে মিলিয়া একযোগে তাহাকে কামড়াইয়া ধরিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। বন্ধন করিবার কায়দাও অদ্ভুত। ছয় জনে ছয়টা ঠ্যাঙ কামড়াইয়া ধরিয়া যথাসম্ভব টানিয়া ফাঁক করিয়া রাখিল। তখন আর দুই জনে দুইটা শুঁড় টানিয়া ধরিয়া পিঁপড়েটাকে এমন অবস্থায় রাখিল যে বেচারার আর নড়নচড়নের সাধ্য ছিল না। এইবার দুই দলে সত্যিকারের লড়াই সুরু হইয়া গেল। উভয় দলের সৈন্যসামন্তেরাই শুঁড় উঁচাইয়া পুচ্ছদেশ শূন্যে তুলিয়া প্রবল উত্তেজনায় যেন তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়া দিল। মাঝে মাঝে এক-একটা পিঁপড়ে অন্য একটার শুঁড়ে শুঁড় ঠেকাইয়া কি যেন বলিয়া দেয়, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাসার ভিতরে চলিয়া যায় আর পরক্ষণেই কতকগুলি নূতন সৈন্য দল বাঁধিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। এইরূপে ঘটনাস্থলে উভয় পক্ষেই ভিড় জমিয়া গেল। ইতিমধ্যে বাখারির উপরের দল শত্রুপক্ষের একটাকে বন্দী করিয়া উৎসাহের আতিশয্যেই বোধ হয় আস্ফালন করিতে করিতে ভাঙা ডালটার খুব নিকটে আগাইয়া গেল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন উহারা বাসাটাকেই দখল করিতে যাইতেছে; কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। মুহূর্ত্তের মধ্যেই ছিন্ন বাসার পিঁপড়েরা শত্রুপক্ষের পাঁচ-সাতটি অগ্রবর্ত্তী সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া একেবারে তাহাদের দলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েকটার দেহ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল আর বাকী কয়টাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকলে মিলিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে টানা দিয়া রাখিল। এই সব ঘটনা ঘটিতে দুই-তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই। এদিকে বাখারি ও ঝুলানো ডালের সংযোগ-

খুঁটির ডালের উপর পাতা মুড়িয়া নালসো পিঁপড়ে সাময়িক বাসা তৈরি করিয়াছে।

স্থলে দ্বৈরথ যুদ্ধ সুরু হইয়া গিয়াছে। দুই দলের দুই দুই জন করিয়া টানাটানি কামড়াকামড়ি চলিতেছে। দেখিলাম বেড়ার দলের কয়েকটি সৈন্য ঝুলানো বাসার কয়েকটি সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আবার ঝুলানো বাসার সৈন্যেরাও এক এক জনে এক একটি করিয়া শত্রুসৈন্যকে শুঁড় কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের দিকে টানিতেছে। যাহাকে টানিতেছে সে প্রাণপণে পিছু হটিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার কেহ কেহ ছয়টি পা দিয়া অবলম্বন-স্থান আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেহ কেহ শুঁড়ের অর্দ্ধাংশ শত্রুর মুখে রাখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। ক্রমশঃ লড়াই এমন ভীষণাকার ধারণ করিল যে দুই-তিন হাত প্রশস্ত স্থানের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ টানাটানি কামড়াকামড়ি চলিতে লাগিল। এখন শুধু টানাটানি নয়, কামড়াকামড়িই যেন বেশী দেখা যাইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষ-বাষ্পের অবাধ প্রয়োগ। এতগুলি পিপীলিকার দেহনিঃসৃত বিষাক্ত রসের উগ্র গন্ধে যেন আমার নাক জ্বলিয়া যাইতেছিল। কামড়াকামড়ি করিতে করিতে জড়াজড়ি করিয়া শত শত পিপীলিকা ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচে পড়িতেছিল। নীচে মাটির উপর চাহিয়া দেখিলাম প্রায় পনর-বিশ মিনিটের মধ্যে উভয় পক্ষের এত পিঁপড়ে মারা গিয়াছে যে ঘাসপাতাগুলি তাহাদের মৃতদেহের নীচে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মনে হইল উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যাহারা তখনও ছুটাছুটি করিতেছিল তাহাদের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—প্রায় প্রত্যেকেরই শুঁড়ের অথবা পায়ের সঙ্গে মরণ-কামড় দিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, শত্রুদের ছিন্ন মস্তক অথবা দেহের সম্মুখাংশ। বেড়ার উপরের পিঁপড়েরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছিল, যাহাতে

পালিতা-মাদারের দুইটি পাতা একসঙ্গে জুড়িয়া নালসো পিঁপড়ে সাময়িক বাসা তৈরি করিতেছে।

বাসাটিকে গিয়া দখল করিতে পারে। এত লড়াইয়ের পরেও দেখিলাম তাহাদের উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই। তাহাদের বাসা হইতে নূতন নূতন সৈন্য আসিয়া আবার পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ সুরু করিল। এবার যেন তাহারাই জয়ী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ঝুলানো বাসার সৈন্যদের সংখ্যা আর বেশী দেখা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ উভয় পক্ষের সৈন্যদের আকৃতি একই প্রকার বলিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না যে, কে শত্রু কে মিত্র। কিন্তু উহারা পরস্পর শুঁড়ে শুঁড় ঠেকাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে শত্রু-মিত্র চিনিয়া লইতেছিল। এদিকে বাখারির উপরের দল দুই চারিটি করিয়া ক্রমে ক্রমে বাসার উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু তাহারাও যে বেশ একটু ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ করিয়া আসিতেছিল তাহাও বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ। বাসার সৈন্যসামন্ত যেন ক্রমশঃ বিরল হইতে লাগিল। ঝুলানো বাসার পিঁপড়েরা যে যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে এ-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু বাসাটার খুব কাছে গিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম—ভিতরে যেন অজস্র পিঁপড়ের একটা খস্ খস্ আওয়াজ উত্থিত হইতেছে।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট এই ভাবে কাটিয়া গেল, তার পরেই দেখি গুটিকয়েক পিপীলিকা বাসার ভিতর হইতে অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখে লইয়া বাহির হইল। পিছনে তাহাদের এক দল সৈন্য। যেন পাহারা দিতে দিতে চলিয়াছে। বাচ্চাবহনকারীরা কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডাল বাহিয়া, বাখারির উপর দিয়া অতি দ্রুতগতিতে পালিতা-মাদারের খুঁটিটার উপর আরোহণ করিল। সৈন্যরাও পিছু পিছু তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে শত্রুরা বিশেষ কিছু বাধা দিবার চেষ্টা করিল না; কেবল দুই একটা সৈন্যকে ধরিয়া টানা দিয়া রাখিল মাত্র। বিশেষতঃ তখন সেস্থানে শত্রুসংখ্যাও খুব কমই ছিল। যাহারা ছিল তাহাদের অধিকাংশই যেন মারামারি করা অপেক্ষা বাসাটাকে লুটিয়া লইবার উৎসাহে সেই দিকেই ছুটিতেছিল। খানিক পরে দেখি আরও অনেকে ডিম ও বাচ্চাদিগকে মুখে লইয়া দলে দলে বাসা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সেই গাছটার দিকে প্রাণপণে ছুটিতেছে। তন্মুহূর্ত্তেই আবার ভীষণ লড়াই সুরু হইয়া গেল। বাসার ভিতরে এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্য যেন দম লইবার জন্য চুপ করিয়া ছিল—এবার তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া শত্রুদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। এদিকে ফাঁকে ফাঁকে তাহারা বাসার ডিম ও বাচ্চাদিগকে সেই গাছটার উপর সরাইতেছিল। শত্রুরা এবার সত্যসত্যই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। খুঁটিটার মাথার উপর কতকগুলি নূতন ডাল গজাইয়াছিল। সেই ডালের পাতা মুড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্ম্মী পিপীলিকা নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়া গেল। এইরূপে একটা ডালের মধ্যেই তিন-চারটা ছোট ছোট বাসা তৈরি হইয়া গেল। বাসানির্ম্মাণ শেষ হইতে-না-হইতেই তাহারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে তাহার মধ্যে স্তূপাকার করিয়া রাখিতে লাগিল। এদিকে ঝুলানো বাসাটার নীচের দিকে নজর পড়িতেই দেখি—এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন শত্রুসৈন্যেরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল সেই সময়ে ভয় পাইয়া কতকগুলি কর্ম্মী পিপীলিকা অসংখ্য বাচ্চা মুখে করিয়া বাসাটার নীচের দিকে জড়ো হইয়াছে। ক্রমশঃ স্থানাভাব হওয়াতে কর্ম্মীরা বাচ্চা মুখে করিয়া স্তূপাকারে নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, এদিকে শত্রুপক্ষ পরাভূত হওয়াতে তাহাদের রাস্তা খোলসা হইয়া গিয়াছিল। এখন বাখারি ও গাছটার দুই ধারে ইতস্ততঃ অনেক সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করিয়া তাহারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে দ্রুতগতিতে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইয়া যাইতেছিল। ডিম ও বাচ্চাগুলিকে সরাইবার পর তাহারা পুরুষ পিঁপড়েদিগকে ঠিক নিশান বহন করিবার মত উঁচু করিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। পুরুষের সংখ্যাও কম নহে—দেড় শত কি দুই শতের উপর হইবে। তার পর দেখিলাম রাণীদের পালা। রাণীরা আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। তাহাদিগকে বহন করিয়া আনা অসুবিধা। রাখালরা যেমন গরুর পাল তাড়াইয়া লইয়া যায়, কর্ম্মীরাও সেইরূপ রাণীদিগকে পিছনে পিছনে তাড়াইয়া আনিতেছিল। শত্রুপক্ষের লাইন তখন ভাঙিয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র দুই-চারিটি কর্ম্মী বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। এ পর্য্যন্ত দেখিয়াই সেদিন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তার পরদিন সকালে গিয়া দেখি—বাসাটি শূন্য অবস্থায় ঝুলিতেছে, বাসিন্দাদের কতকগুলি অবশ্য তখনও সেখানে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করিতেছিল। পালিতা-মাদারের খুঁটির গা বাহিয়া বাখারির উপর দিয়া তাহারা পরিষ্কার রাস্তা করিয়া লইয়া দলে দলে উপরে নীচে আনাগোনা করিতেছে। আর শত্রুপক্ষ বাখারির বিপরীত পার্শ্ব ধরিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লাইন করিয়া চলিয়াছে। এখন আর শত্রুতার ভাব দেখিতে পাইলাম না।

[প্রবন্ধের চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

কয়েক মাস সুখেদুঃখে কাটিবার পরে চৈত্র মাসের শেষ হইতে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইল যাহা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনও ছিল না। পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার পর হইতেই ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝান যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্ব্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্য্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে আর জল পাওয়া যায় না—যদি বা পাওয়া যায়, বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে চারি ধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ব্বে এক মাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্ব্বতম প্রান্ত হইতে সাত-আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায় তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফেরে।

কিন্তু এই পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বালতি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্দ্ধ শুষ্ক বন-ঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন, দেখিতে ভয় করে—চারি ধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হলকার মত তপ্ত বাতাস সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া দিয়া বহিতেছে—সূর্য্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক-এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস. পশ্চিম বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ গজ দূরের জিনিষ ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

অর্দ্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুয়ামে পানি নেই হে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বালতি তরল কর্দ্দম স্নানের জন্ম আমার সাম্‌নে আনিয়া ধরে। সেই ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

এক দিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলার স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারি ধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি ত নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশে দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ-রুদ্রমূর্ত্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটা বিরাট

অগ্নিকুণ্ড—ক্যালসিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা-অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু এক কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে এক সঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে ও বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া প্রতি তৃণপত্রের শিরা-উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগদিগন্ত ঝলসাইয়া পুড়াইয়া সুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডবলীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্ব্বত্র কম্পমান তাপতরঙ্গ ও তাহার ওপারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখীর দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের। খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকী তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ—সাহারা দেখি নাই, স্বেন্ হেডিনের বিখ্যাত তাক্‌লা-মাকান্ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল। কুণ্ডীটাতে গত বর্ষায় জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোনো কাজ হয় না—প্রথমতঃ, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোনো মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়তঃ, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে কোমর পর্য্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে জলটা খুব ভাল নয়—স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিষ মিশানো আছে জানি না—কিন্তু কেমন একটি অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

এক দিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বনঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যান্ট সাহেবের সেই বড় বট গাছটার আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যতই কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারি ধারে কাদার ওপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটি প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণতঃ দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল এ ধরণের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছে ত কোনো লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশে কেহ লুকাইয়া হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি মুনেশ্বর সিং চাকলাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্ব্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভৈঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন্, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই ত? জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনি রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিল—উঃ হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা ওই নির্জ্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না, হুজুর।

তার পর হইতে জঙ্গলে-ঘেরা ওই ছোট কুণ্ডীটা বন্য জানোয়ারের জল পানের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। অনাবৃষ্টি যত হইতে লাগিল, রৌদ্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রখরতায় দিকদিগন্তে দাবদাহ যত প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল—প্রতিদিন খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীলগাই ও বুনো শূয়োর ত আছেই—কারণ

শেষের দুই প্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চার জন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে—জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় ছবি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। উষ্ণ বাতাস অৰ্দ্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, লোকালয় হইতে বহু দূরে আসিয়াছি, দিকবিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে এক দিকে দুটি নীলগাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীলগাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীলগাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের একটি ছোট নীলগাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও এক ফোঁটা জল নাই— আরও এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক-দিশা হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছ পর্য্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও এক বিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। এক দিনের ঘটনা বলি।

সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙার ওপরে একজন কে অদ্ভুত ধরণের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যিই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া—মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দু-জন সিপাহী পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল দেখিলাম তাহার গায়ে কোনো জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাকলাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের এক পাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্ব্বে। তার পর কাল দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এরকম একঘেয়ে একই ধরণের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষতঃ বিদেশী লোকের পক্ষে। কালকার ভীষণ উত্তাপে ও গরম পশ্চিমে বাতাসের দমকার মধ্যে সারা দুপুর, সারা বৈকাল ঘুরিয়াছে—কোথাও এক ফোঁটা জল পায় নাই, একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় নাই—রাত্রে অবসন্ন অবস্থায় এক গাছের তলায় শুইয়া ছিল—আজ সকাল হইতে আবার ঘোরা সুরু করিয়াছে—মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে সূর্য্য দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করা হয়তো তার পক্ষে খুব কঠিন হইত না—অন্ততঃ পূর্ণিয়াও ফিরিয়া যাইতে পারিত—কিন্তু ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর,

তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের ফুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্য্যন্ত দশ-বারো বর্গ মাইল ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিন-পরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি সুরু হইয়াছিল যে, জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

এক দিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম নৈঋত কোণে মাইল খানেক দূরে জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে, সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমা বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বনঝাউয়ের জঙ্গল সূর্য্যতাপে অর্দ্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবা মাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটপট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাততঃ ত বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল ত আসিয়া পড়িল।

ভাবিবার সময় নাই। কাছারীর দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল-ম্যাপ, সর্ব্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার ত আছেই। এসব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর। বলিলাম—সব জিনিষ বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জন কতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যের বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিম বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাজিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, এক দল বন্যশূকর তো ছানা-পোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিকবিদিক্‌জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও-অঞ্চলের বাগান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, এক ঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটা কতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক্ হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে—আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্। এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনর জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এই মাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিষপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিষ যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে? মুহুরী বাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন। আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ ধার বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্ব্বমুখে

ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এ-যাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহু দূরে পূর্ব্বাকাশ লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারা রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্ত্তী কর্দ্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটা নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন মাইল দূরে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া আষাঢ় পড়িল। আষাঢ় মাসে প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এ জায়গায় মানুষের মুখ বড় একটা দেখিতে পাই না বলিয়া আমার একটা সখ ছিল কাছারির পুণ্যাহের দিনে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। নিকটে কোনো গ্রাম না থাকায় আমরা গণোরী তেওয়ারীকে পাঠাইয়া দূরে দূরের বস্তির লোকদের নিমন্ত্রণ করিলাম। পুণ্যাহের পূর্ব্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুস্কিল যে তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল।

এ-দেশের খাওয়ানোর কোনো হাঙ্গামা নাই, এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলা দেশ যতই গরীব হোক্, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরীব লোকেও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।

দশ-বার বছরের একটি অচেনা ছোকরা সকাল হইতেই খুব খাটিতেছিল, গরীব লোকের ছেলে, নাম বিশুয়া, দূরের কোন বস্তি হইতে আসিয়া থাকিবে। বেলা দশটার সময় সে কিছু জলখাবার চাহিল। ভাঁড়ারের ভার ছিল লব্‌টুলিয়ার পাটোয়ারীর উপর, সে এক খুঁচি চীনার দানা ও একটু নুন তাহাকে আনিয়া দিল।

আমি পাশেই দাঁড়াইয়াছিলাম। ছেলেটি কালো কুচ্‌কুচে, সুশ্রী মুখটা, যেন পাথরের কৃষ্ণঠাকুর। সে যখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলিন মোটা মার্কিনী আট-হাতি থান কাপড়ের খুঁট পাতিয়া সেই অতি তুচ্ছ জলখাবার লইল, তখন তাহার মুখের সে কি খুশীর হাসি! আমি বলিতে পারি অতি-গরীব অবস্থারও কোনও বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবেই না, খুশী হওয়া ত দূরের কথা। কারণ এক বার সখ করিয়া চীনার দানা খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি তাহাতে মুখরোচক সুখাদ্যের হিসাবে তাহাকে উল্লেখ কখনই করিতে পারিব না।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে ত ব্রাহ্মণভোজন এক রকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠানে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারি-ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা ব'সে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে?

পাটোয়ারী বলিল—হুজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ ছত্রি কি গাঙ্গোতা সে জিনিষ খাবে না। আর জায়গাই বা কোথা আছে বলুন?

ওই গরীব দোষাদের মেয়ে কয়টির সামনে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা, গুড় ও জলো টক দই এক এক জন যে পরিমাণে

খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্ত এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম, দোষাদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া এক দিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সত্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহখানেক পরেই পাটোয়ারীকে দিয়া দোষাদপাড়ার মেয়ে কয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল—লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাটনি—জীবনে কোনও দিন সে রকম ভোজ খাওয়ার কল্পনাও করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখমুখের সে হাসি কত দিন আমার মনে ছিল। সেই ভবঘুরে গাঙ্গোতা ছোকরা বিশুয়াও সে দলে ছিল।

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কলাইয়ের ছাতু খাইতে বসিয়াছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তে ছাতুটা মাখিয়াছে—এত বড় একটা তাল, যে এক জন লোকে—হইলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ ত বটে—কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর। আমায় দেখিয়া লোকটা সসম্ভ্রমে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—ম্যানেজার সাহেব! থোড়া জলখাই করতে হেঁ, হুজুর মাফ্ কি জিয়ে।

এক জন ব্যক্তি নির্জ্জনে বসিয়া, শান্ত ভাবে জলখাবার খাইতেছে, ইহার মধ্যে মাপ করিবার ব্যাপার কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—খাও, খাও, তোমায় উঠতে হবে না। নাম কি তোমার? লোকটা এখনও বসে নাই, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বলিল—গরীব কা নাম ধাওতাল সাহু, হুজুর।

চাহিয়া দেখিয়া মনে হইল লোকটার বয়স ষাটের ওপর হইবে। রোগা লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি।

ধাওতাল সাহুর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

কাছারিতে আসিয়া রামজোত পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধাওতাল সাহুকে চেন?

রামজোত বলিল—জী হুজুর। ধাওতাল সাহুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? সে মস্ত বড় মহাজন, লক্ষপতি লোক, এদিকে সবাই তার খাতক। নওগছিয়ায় তার ঘর। পাটোয়ারীর কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। লক্ষপতি লোক ময়লা উড়ানির প্রান্তে বনের মধ্যে বসিয়া এক তাল নিকৃষ্টতর কলাইয়ের ছাতু খাইতেছে—এ দৃশ্য কোনো বাঙালী লক্ষপতির সম্বন্ধে অন্ততঃ কল্পনা করা অতীব কঠিন। ভাবিলাম পাটোয়ারী বাড়াইয়া বলিতেছে, কিন্তু কাছারিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই ঐ কথা বলে, ধাওতাল সাহু? তার টাকার লেখাজোখা নেই।

ইহার পরে নিজের কাজে ধাওতাল সাহু অনেকবার কাছারিতে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, প্রতিবার একটু একটু করিয়া তাহার সহিত আলাপ জমিয়া উঠিলে বুঝিলাম একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে' পরিচয় ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের লোক যে আছে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

ধাওতালের বয়স যাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম, প্রায় তেষট্টি-চৌষট্টি। কাছারির পূব-দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের প্রান্ত হইতে বারো-তেরো মাইল দূরে নওগছিয়া নামে গ্রামে তার বাড়ী। এ অঞ্চলের প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। কিন্তু তাহার মজা এই যে, টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনও তাগাদা করিতে পারে না। কত লোকে যে কতটাকা তাহার ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মত নিরীহ, ভালমানুষ লোকের মহাজন হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু লোকের উপরোধ সে এড়াইতে পারে না। বিশেষতঃ সে বলে, যখন সকলেই মোটা সুদ লিখিয়া দিয়াছে, তখন ব্যবসা হিসাবেও ত টাকা দেওয়া উচিত। এক দিন ধাওতাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরানো দলিলপত্র। বলিল—হুজুর মেহেরবানী ক'রে একটু দেখবেন দলিলগুলো?

পরীক্ষা করিয়া দেখি প্রায় আট-দশ হাজার টাকার দলিল ঠিক সময়ে নালিশ না-করার দরুন তামাদি হইয়া গিয়াছে।

উড়ানির আর এক মুড়ো খুলিয়া সে আরও কতকগুলি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এগুলো দেখুন দেখি হুজুর। ভাবি একবার জেলায় গিয়ে উকীলদের দেখাই, তা মামলা কখনো করি নি, করা পোষায় না। তাগাদা করি, দিচ্ছি দেব ক'রে টাকা দেয় না অনেকে।

দেখিলাম, সবগুলিই তামাদি দলিল। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সেও চার-পাঁচ হাজার টাকা। ভালমানুষকে সবাই ঠকায়। বলিলাম—সাহুজী, মহাজনী করা তোমার কাজ নয়। এ-অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং রাজপুতের মত দুঁদে লোকেরা, যাদের সাত-আটটা লাঠিয়াল আছে, খাতকের ক্ষেতে নিজে ঘোড়া ক'রে গিয়ে লাঠিয়াল মোতায়েন ক'রে আসে, ফসল ক্রোক ক'রে টাকা আর সুদ আদায় করে। তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। দিও না কাউকে আর।

ধাওতালকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বলিল—সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে টাকা না বাড়ালে আমাদের চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা।

তাহার এ-যুক্তি আমি বুঝিতে পারিলাম না, সুদের লোভে আসল টাকা নষ্ট হইতে দেওয়া কেমনতর ব্যবসা জানি না। ধাওতাল সাহু আমার সামনেই অম্লান বদনে পনর-ষোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—এমন ভাবে ছিঁড়িল যেন সেগুলো বাজে কাগজ—অবশ্য, বাজে কাগজের পর্য্যায়েই তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে। তাহার হাত কাঁপিল না, গলার সুর কাঁপিল না।

বলিল—রাঁইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রি ক'রে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়ত আমার পৈতৃক আমলের একটা ঘসা পয়সাও ছিল না। আমিই করেছি, আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান আছেই হুজুর।

তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কয় জন লোক এত বড় ক্ষতি এমন শান্তমুখে উদাসীন ভাবে সহ্য করিতে পারে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার বড়মানুষী গর্ব্ব দেখিলাম মাত্র একটা ব্যাপারে। একটা লাল কাপড়ের বাটুয়া হইতে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট একখানা জাঁতি ও সুপারি বাহির করিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে একবার বলিয়াছিল—রোজ এক কনোয়া ক'রে সুপুরি খাই বাবুজী। সুপুরির বড় খরচ আমার। বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্ততঃ দেখি নাই।

ফুলকিয়ার ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি প্রতি বারই জয়পাল কুমারের মকাইয়ের পাতা-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার সামনে দিয়া যাইতাম।

খুব বড় একটা প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচেই জয়পালের ঘর। সংসারে সে সম্পূর্ণ একা, বয়সেও প্রাচীন, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা সাদা চুল। যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম ঝুঁড়েঘরের দোরের গোড়ায় সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জয়পাল তামাক খাইত না, কখনো তাকে কোনো কাজ করিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, গান গাহিতেও শুনি নাই—সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্য অবস্থায় মানুষ কি ভাবে যে এমন ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে! জানি না। জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতূহল বোধ করিতাম। প্রতিবারই উহার ঘরের সামনে ঘোড়া থামাইয়া উহার সহিত দুটা কথা না বলিয়া যাইতে পারিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জয়পাল, কি কর ব'সে?

—এই, ব'সে আছি হুজুর।

—বয়েস কত হ'ল?

—তা হিসেব রাখি নি, তবে যেবার কুশীনদীর পুল হয় তখন আমি মহিষ চরাতে পারি।

—বিয়ে করেছিলে? ছেলেপুলে ছিল?

—পরিবার মরে গিয়েছে আজ বিশ-পঁচিশ বছর, দুটো মেয়ে ছিল তারাও মারা গেল। সেও তের-চোদ্দ বছর আগে। এখন একাই আছি।

—আচ্ছা, এই যে একা এখানে থাক, কারো সঙ্গে কথা বলো না, কোথাও যাও না, কিছু করও না—এ ভাল লাগে? একঘেয়ে লাগে না?

জয়পাল অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিত—কেন খারাপ লাগবে হুজুর? বেশ থাকি। কিছু খারাপ লাগে না।

জয়পালের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। আমি কলিকাতার কলেজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ নয়ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, নয় বই,

নয় সিনেমা, নয় বেড়ান—এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না। ভাবিয়া দেখিতাম, দুনিয়ায় কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, গত বিশ বৎসর জয়পাল কুমার ওর ঘরের দোরটাতে ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তার কতটুকু খবর রাখে? আমি যখন ছেলেবেলায় স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখনও জয়পাল এমনি বসিয়া থাকিত, বি-এ যখন পাস করিলাম তখনও জয়পাল এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আমার জীবনেরই নানা ছোট-বড় ঘটনা যা আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু তারই সঙ্গে মিলাইয়া জয়পালের এই বৈচিত্র্যহীন নির্জ্জন জীবনের অতীত দিনগুলির কথা ভাবিতাম।

জয়পালের ঘরখানা গ্রামের একেবারে মাঝখানে হইলেও কাছে অনেকটা পতিত জমি ও মকাই-ক্ষেত, কাজেই আশেপাশে কোন বসতি নাই। ফুলকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম, দশ-পনর ঘর লোকের বাস, সকলেই চতুর্দ্দিকব্যাপী জঙ্গলমহলে মহিষ চরাইয়া দিন গুজরান করে। সারাদিন ভূতের মত খাটে আর সন্ধ্যার সময় কলাইয়ের ভুষির আগুন জ্বালাইয়া তার চারিপাশে পাড়াসুদ্ধ বসিয়া গল্পগুজব করে, খৈনি খায় কিংবা শালপাতার পিকার ধূমপান করে। হুঁকায় তামাক খাওয়ার চলন এদেশে খুবই কম। কিন্তু কখনও কোন লোককে জয়পালের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখি নাই।

প্রাচীন পাকুড় গাছটার মগডালে দিনরাত বকেরা দল বাঁধিয়া বাস করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় গাছের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটা ঘন ছায়াভরা, নির্জ্জন, আর সেখানটাতে দাঁড়াইয়া যে দিকেই চোখ পড়ে, সে দিকেই নীল নীল পাহাড় দূরদিগন্তে হাত ধরাধরি করিয়া ছোট ছেলেমেয়ের মত মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া। আমি পাকুড় গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া যখন জয়পালের সঙ্গে কথা বলিতাম তখন আমার মনে এই সুবৃহৎ বৃক্ষতলের নিবিড় শান্তি ও গৃহস্বামীর অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কেমন একটা প্রভাব বিস্তার করিত। ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী-বটের, কেমন মন্থর যমুনা জল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।

কিছু জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধাবন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্ব্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই, যে-সব কথা কখনও ভাবি নাই, তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যামা অরণ্য প্রভৃতিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে এক দিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য্য উপলক্ষ্যে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। কতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণ আবার সেই ঘন নির্জ্জনতার মধ্যে, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে, সূর্য্যাস্তের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে, তারাভরা নিদাঘ-নিশীথের মধ্যে ডুব দিব!

ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া মুকুন্দি চাকলাদারের হাতের বাবলাকাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমানায় ঢুকি, তখন সুদূর-বিসর্পী নিবিড়শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীলগাইয়ের জেরা, সূর্য্যালোক ধরণীর মুক্ত প্রসার আমায় একেবারে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত করিয়া দেয়।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণলীলা

শ্রী অমূল্যগোপাল সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জাপানের পূজারিণী

ন্দিরদ্বারে বলিদ্বীপের শিশু
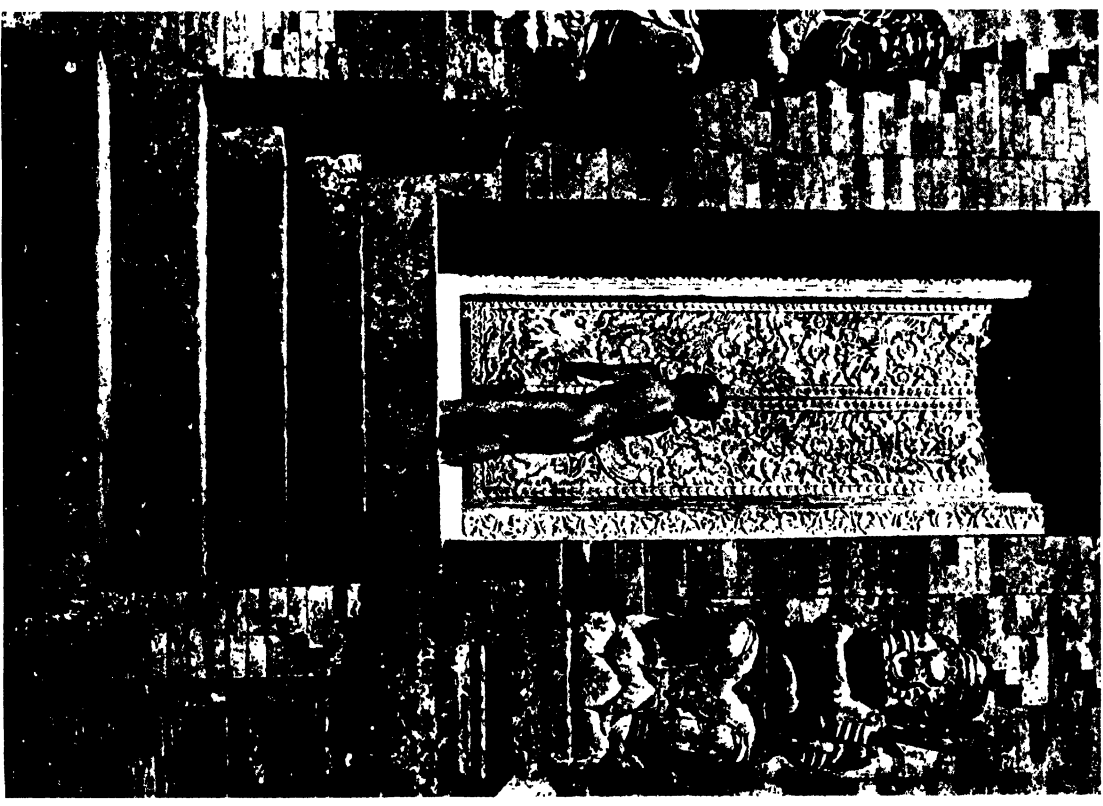
বৈবাহিক বৈচিত্র্য

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বাগবাজারের কোন এক রাস্তার এক বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া ১৩৪৩ সালের ১লা চৈত্র বেলা দশটার সময় শশধর চক্রবর্ত্তী সিউড়ি হইতে আগত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন।

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনার পুত্র শ্রীমান্ জলধর আমার কন্যার মাতুলের সহযোগিতায় কলিকাতাতেই আমার কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর নাই। পত্রযোগে আপনাদের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি। আপনাদের ব্যবসায়ের কথা এবং ব্যবসারে সততার কথা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের এই মফঃস্বল শহরেও আপনাদের খ্যাতির সংবাদ পৌছিয়াছে। সুতরাং আপনারা যে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহাতে আমি আপনাদের প্রতি যে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ হইয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম। শ্রীমান্ জলধর এম-এ পাস করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে ইহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান। সুখের বিষয় সেদিক দিয়াও আমি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছি। সুতরাং এইক্ষণে আমার কর্ত্তব্য, মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। আমি স্থির করিয়াছি আগামী ৫ই চৈত্র রবিবার সকালে কলিকাতা পৌছিব এবং সোজা গিয়া আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়।

শশধর চক্রবর্ত্তী পত্রখানা দুই বার পাঠ করিলেন এবং অন্তত চারি বার গোঁফে তা দিলেন। তার পর আর একবার চিঠিখানি সম্মুখে ধরিয়া, যেখানে লেখা ছিল "কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান"— সেই স্থানটির উপর কিছুকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ফাইলজাত করিলেন।

৫ই চৈত্র বেলা অনুমান দশটার সময় সিউড়ি হইতে কলিকাতা পৌছিয়া সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নির্দ্দিষ্ট গলিতে কোচম্যানের সাহায্যে বাড়ীর নম্বর মিলাইতে মিলাইতে চক্রবর্ত্তী-গৃহে আসিয়া পৌছিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় প্রাচীন ডাক্তার। কিন্তু সকলের কাছে তিনি কামানের গোলা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহা তাঁহার কেশবিরল গোলকাকৃতি মস্তকের জন্যই নহে। শহর হইতে একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের মত উঁচু জায়গায় তাঁহার বাড়ী। তাহারই এক দিকে একটি গাছ জন্মাবধি ভূমির সমান্তরাল ভাবে হেলিয়া গিয়া সেই ভাবেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল, শাখাপ্রশাখা অবশ্য আকাশমুখী ছিল। কিন্তু অনেক দিন হইল গাছটির উপরার্দ্ধ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এখন শুধু কাণ্ডটি কামানের মত তাঁহার বাড়ীর এক পাশ হইতে শহরের দিকে মুখ বাড়াইয়া আছে। এই কারণে তাঁহার বাড়ীর নাম হইয়াছে কামানওয়ালা বাড়ী এবং তাঁহার নাম হইয়াছে কামানের গোলা। তাঁহার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কামানের আওয়াজের কিছু সাদৃশ্য আছে। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাঝে মাঝে এমন অতর্কিতে গর্জ্জন করিয়া ওঠেন যাহাতে সাধারণ শ্রোতার সর্ব্বাঙ্গ এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্তের প্লীহা চমকিত হয়।

বহু আশায় বুক বাঁধিয়া এই কামানের গোলা সেদিন চক্রবর্ত্তী-গৃহে আসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। এরূপ চঞ্চল প্রকৃতি অল্পবয়স হইলে মানাইত, কিন্তু মুখুজ্জে-মহাশয় আটচল্লিশ বৎসর বয়সেও যেন শিশুটিই রহিয়া গিয়াছেন। এই শিশুর সারল্য হাত পায়ের চাঞ্চল্যে নয়, খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও তিনি শিশুর মতই লোভী। কিন্তু বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে শিশুও যেমন সংসারবিষয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞ হইয়া ওঠে, তেমনি এই প্রৌঢ় শিশুটি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহে এমন সব বিষয়ীজনোচিত ব্যবহার করিলেন যাহা তাঁহার পক্ষে সহজও নহে স্বাভাবিকও নহে, কারণ তাহা প্রায় পরিপক্ব লোকের ব্যবহার।

চক্রবর্ত্তী-গৃহে পৌঁছিয়া তাঁহার প্রথমে জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মুখুজ্জে-মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জলধর মুখুজ্জে-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া নিজের পরিচয় দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় তাহার সৌম্য আকৃতি এবং সপ্রতিভ ব্যবহারে আনন্দে গদগদ হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অন্ত কোন আলাপ না করিয়াই বৈঠকখানা-ঘরের চারি দিক ঘুরিয়া, ভিতরের দিকের দরজায় উঁকি মারিয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চমৎকার বাড়ী ত!"

সে গর্জ্জনে জলধরের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে এজন্ত প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া স্মিতহাস্তে বলিল, "আলো-হাওয়াটা একটু পাওয়া যায়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "একটু কেমন? বলি, হোয়াট ডু ইউ মীন্?—এ যে একেবারে ঝড়ের মত হাওয়া!"

একটু আবেগেই মুখুজ্জে-মহাশয়ের ভাষা ইংরেজী-মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আর এ না হ'লে কি আমাদের মনে ধরে?—আমরা খোলা জায়গায় থাকি—ফর নাথিং খানিকটা আলো আর হাওয়া আমাদের চাইই, তবে আলোটা শীতকালে এবং হাওয়াটা গ্রীষ্মকালে।" বলিয়া তিনি এইবার গা হইতে চাদর এবং পাঞ্জাবী খুলিয়া ফেলিলেন। তার পর বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার কথা ত এতক্ষণ জিজ্ঞাসাই করি নি, তিনি বাড়ীতে আছেন ত?"

ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে চাদর ও পাঞ্জাবী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, "বাবু পূজো করছেন, পূজো শেষ হ'লেই চলে আসবেন, তিনি সব শুনেছেন।"

জলধর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "যা তাড়াতাড়ি চায়ের কথা ব'লে আয়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় পূজার কথা শুনিয়া কিছু ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং কপালের উপর তিনটি ভাঁজের উপরে আরও চারিটি দেখা দিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মচেতন হইয়া বলিলেন, "তা ত চলবে না—স্নানের আগে ত কিছু খাওয়া চলবে না!" বলিতে বলিতে অস্থির ভাবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অবস্থিত বইয়ের আলমারির কাছে গিয়া একে একে বই টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

জলধর সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "তা হ'লে ততক্ষণ স্নানের বন্দোবস্ত—।" কিন্তু সে কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল না। তিনি বই দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আনন্দে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্রেভো! এ যে দেখছি আমারই সব খোরাক!—যায় বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত!" তার পর হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই একমাত্র খাদ্য যা স্নানের আগে খাওয়া চলে" বলিয়া এক খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র হাতে লইয়া আসনে আসিয়া বসিলেন।

জলধর পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল "তা হ'লে স্নানটাই সেরে নিলে হ'ত—চা পর্য্যন্ত খেলেন না!"

মুখুজ্জে-মহাশয় এলোমেলো ভাবে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কিসের? চা অবশ্য খাওয়া দরকার—কিন্তু কি জান বাবা, সংস্কারটা ত আর ছাড়া যায় না...কিন্তু ভিতরের তাগিদও কম নয়!—আচ্ছা বরঞ্চ স্নানের আগে এক গ্লাস জল—শাদা জল আমাকে দাও, হাত মুখ ট্রেনেই ধুয়েছি, আহ্নিকটাও বর্দ্ধমান ষ্টেশনে সেরে নিয়েছি।" কথাগুলি যে একটু অসংবদ্ধ হইল তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন।

জলধর বলিল, "শুধু জল খাবেন?"

মুখুজ্জে-মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "গলাটা শুকিয়ে গেছে ব'লেই জল খাচ্ছি, নইলে ওটাও ত ঠিক চলে না; খাওয়া ত বটে!" এইবারের কথাটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ভৃত্য জল আনিয়া দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় জল লইতে গিয়া হঠাৎ হাত গুটাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সাংঘাতিক ভুল হয়ে গিয়েছিল—জুতো পায়েই গেলাস ধরতে গিয়েছিলাম!" বলিয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া এক গ্লাস জল উদরস্থ করিলেন। তার পর বই ছাড়িয়া দেয়ালে-টাঙানো ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানা রাজারাণীর ছবি, একখানা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক ইংরেজ বন্ধুর ছবি, আর সব বিলাতী নিসর্গ দৃশ্য। ছবিগুলি খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "চমৎকার সব ছবি, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও বাবা, একখানা দেবদেবীর ছবি ঝুলিয়ে দাও না!—মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জাগবে।"

জলধর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই মুখুজ্জে-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না না না, ওটা আমারই ভুল—বৈঠকখানা-ঘরে দেব-দেবতার ছবি রাখা ঠিক নয়, এখানে ঐ সব ছবিই ভাল।" বলিয়াই ইলেকট্রিক ল্যাম্পের বিচিত্র শেডের দিকে চাহিয়া তাহার রূপ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। জলধর কোনমতেই কোন দিক দিয়া মুখুজ্জে-মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

পারিবারিক আবহাওয়ার পরিচয় লইতে আসিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় প্রথমেই চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ে নিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন। সুতরাং তিনি নিজেকে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের আদর্শের উপযুক্ত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ও মুখুজ্জে-মহাশয়ের পত্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি পারিবারিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় লইতেই আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের পিতা হইয়া কন্যার পিতার চোখে কোনক্রমেই যাহাতে ছোট না হন এই চিন্তা অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন; কাজেই কোথাও কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে সেদিকে তিনিও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং চক্রবর্ত্তী এবং মুখুজ্জে মহাশয়ের মিলনে চক্রবর্ত্তী-গৃহে যেন একটা নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইল।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম এবং পরনে গরদ। প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষ হইতেই আনন্দের যে উচ্ছ্বাস বহিল তাহার অর্থ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার শব্দ বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা চারি ধারের জানালায় উঁকি মারিয়া একটা বিশেষ রকম নূতনত্বের স্বাদ গ্রহণ করিতে নিযুক্ত হইল।

ট্রেন-ভ্রমণের কথা দিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ট্রেন-প্রসঙ্গের পরিণতি-স্বরূপ খাদ্যের অনাচার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল এবং অতি দ্রুতগতিতে আলোচনা প্রাচীন ভারতে গিয়া পৌঁছিল। ঐ সঙ্গে চক্রবর্ত্তী-মহাশয় গড়গড়া এবং মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুট টানিতে লাগিলেন, এবং উভয়ের শাস্ত্রালাপে এবং তামাকের ধোঁয়ায় চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের বৈঠকখানা-গৃহে একটা অভিনব কল্প-জগৎ রচিত হইল।

মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, "ধরুন, চ্যবন মুনি যে—" বলিয়া পুনরায় চুরুটে মুখ গুঁজিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "জাতিভেদের কথা বলছেন ত?"

মুখুজ্জে-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হ্যা, জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার অর্থ একালের লোকে ভুলেছে বলেই না—!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় আনন্দে প্রায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন, "ধরুন না কেন, শঙ্করাচার্য্য যে—" বলিয়া ঘন ঘন গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আপনি বোধ হয় স্বপাক আহারের কথা বলছেন?"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যা, সেই কথাই ত বলছি। শঙ্করাচার্য্য স্বপাক আহারকেই প্রশস্ত ব'লে গেছেন, কিন্তু দেখুন ত আমরা তা ক'জন মানি? আমরা যা করছি এটা কি স্বেচ্ছাচার নয়?"

মুখুজ্জে-মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রাইট ইউ আর—স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছু নয়।"

জলধর আর পারিল না, সে বাহিরে গিয়া কিছু হাসিয়া মনটাকে সহজ করিয়া লইল।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের মতবাদ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধ্বনিতে ঘর কাঁপাইতে লাগিল। জলধর পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, স্নানের সময় হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। "কি আশ্চর্য্য! অতিথির স্নানাহার ভুলে শুধু কথা বলে যাচ্ছি। ছি ছি ছি—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—আর নয়, আর নয় এবারে উঠুন" বলিয়া নিজে উঠিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উঠিবার কোন্ লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি বলিলেন, "নট অ্যাট অল্—কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "অপরাধ নেবেন না, কিন্তু এসব বিষয়েরই দোষ—আরম্ভ করলে পুরনো কথা সব মনে পড়ে—" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

মুখুজ্জে-মহাশয় তাহা দেখিয়া অস্থিরভাবে বলিলেন, "না না, স্নানাহার বরঞ্চ এখন থাক, কিন্তু এসব কথা বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন; আরম্ভ করা গেছে, শেষ করতেই হবে।"

কিন্তু শেষ করিবার পূর্ব্বেই একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় যখন বলিতেছিলেন, "আলোচনা শেষ করতেই হবে" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কানের পাশে এক ঝাঁক মুরগী সমস্বরে কোঁ কোঁ করিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় এক লাফে উঠিয়া পড়িলেন। দেখা গেল একটা লোক বাঁকে করিয়া দুই খাঁচা মুরগী আনিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছে। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় উন্মাদপ্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মুরগী! মুরগী আনতে কে বলেছে। আরে হাঁস—হাঁস—হাঁসের স্যুপ খেতে বলেছে ডাক্তার, বেটা মুরগী এনে হাজির—যেন আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে এসেছে! পালা, পালা, এখুনি পালা—ছি ছি ছি—।"

মুরগীওয়ালা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চক্রবর্ত্তী-মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া সোজা তাহাকে রাস্তা পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গেলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় এই সব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের আচরণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া তিনিও চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকটার ত স্পর্দ্ধা কম নয়! বাড়ীর উপর মুরগী নিয়ে আসে!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় মহা বিরক্তির সুরে বলিলেন, "দেখুন ত কাণ্ড! আরে যে-বাড়ীর কর্ত্তা মাছ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না, সেই বাড়ীতে মুরগী!— ছি ছি ছি—।"

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উৎসাহ এইবার অসীমা পার হইয়া গেল। তিনি চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে আনন্দে প্রায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আমার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছেন—আমিও নিরামিষ, আপনিও! ষ্ট্রেঞ্জ কয়েন-সিডেন্স!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আশ্চর্য্য ত!—আরে হতেই হবে, হতেই হবে। নিরামিষ না হ'লে সম্ভ্রম রাখাই দায়। যেখানেই যান, নিরামিষকে লোকে এখনও একটু মানে। মাছ খেলেন কি তার সঙ্গে পেঁয়াজ খেতে হবে, এবং মাংসের সঙ্গে রসুন।"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "অত্যন্ত সত্য কথা। নিরামিষ একেবারে নিরাপদ, যেখানেই যান সম্মান রাখবার পক্ষে এ একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তবে অনেকে আবার নিরামিষ ব'লে একেবারে বিধবার খাদ্য দিয়ে বসে!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়—তবে এ-বাড়ীতে সে ভয় নেই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় এ-কথায় গর্জ্জন করিয়া হাসিলেন।

এই সময় জলধর আসিয়া স্নানের জন্য জোর তাগিদ দেওয়ায় আলোচনা ঐখানেই থামিয়া গেল। তখন তেল মাখিতে মাখিতে মুখুজ্জে-মহাশয় আলোচনাটা রাষ্ট্র-বিষয়ের দিকে টানিয়া আনিলেন এবং স্বরাজ সম্বন্ধে তিন-চারি মিনিট ঘোর আলোচনা চলিল। তাহা ছাড়া আহারের সময় আর যে যে প্রসঙ্গ বাকী ছিল সে সমস্তই উত্থাপিত হইল এবং ঠিক হইল রাত্রিকালে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

ফলত উভয়েই উভয়ের প্রতি মতের গভীর ঐক্যহেতু এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে দুই জনের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাস্যপরিহাস আরম্ভ হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "বুঝলেন মুখুজ্জে-মশাই, আমার ধারণা ছিল মেয়ের বাপ সাধারণত ঘুঘু-চরিত্রের হয়, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে।"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আর ছেলের বাপ যে কসাই হয় সেই ধারণা ছিল আমার, কিন্তু ব্যতিক্রম ত চোখের সামনেই দেখছি।"

শেষ পর্য্যন্ত, মুখুজ্জে-মহাশয়ের কন্যা চক্রবর্ত্তী-গৃহে আসিলে যে পরম সুখের হইবে এবং চক্রবর্ত্তী-গৃহে মুখুজ্জে মহাশয়ের কন্যাকে পাঠাইয়া যে মুখুজ্জে-মহাশয় নিশ্চিন্ত হইবেন উভয়েই একথা স্বীকার করিলেন।

আহারান্তে-নিদ্রার পর বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ পাকা হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা। মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী-মশাই, আমি একটু বেরুতে চাই—বহুকাল পরে কলকাতা এসেছি, দু-এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যা, হ্যা, স্বচ্ছন্দে—আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা ক'রে আসুন। আর দেখুন, ঐ সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি না? চলুন আমাদের গাড়ীতে একসঙ্গেই বেরুন যাক্, চৌরঙ্গীতে আমার একটু কাজ আছে।"

"না না, তা হ'লে আর একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আপনার অসুবিধা হবে, আমি বরঞ্চ ট্রামেই যাচ্ছি।"—মুখুজ্জে-মহাশয় ব্যস্তভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু চক্রবর্ত্তী-মহাশয় ছাড়িলেন না, উভয়ে একসঙ্গেই বাহির হইলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের নির্দ্দেশে গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে চলিল। ভবানীপুরের একটা রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামাইতে বলিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় সেখানে নামিলেন এবং বলিলেন, "আমি ঘণ্টা দুই পরেই ফিরছি।"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "দেখবেন, দেরি করবেন না যেন, আমাদের আলোচনা ঢের বাকী আছে।"

গাড়ী চলিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় ছুটন্ত গাড়ীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, এবং গাড়ী অদৃশ্য হইবামাত্র দ্রুত পদচালনা করিয়া রসা রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে-বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিয়াছিল সে-বাড়ীর সঙ্গে তাঁহার যে কোনও সম্পর্ক ছিল সেরূপ বোধ হইল না।

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় চৌরঙ্গীর একটা রেষ্টুর‍্যাণ্টে পাশাপাশি দুইটি পর্দ্দা-ঢাকা কুঠরিতে বসিয়া দুই জন ভদ্রলোক মনের আনন্দে রোষ্ট-চিকেন এবং অন্যান্য নানারূপ মাংসের রান্না উপভোগ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে 'বয়' 'বয়' বলিয়া হাঁকিতেছিলেন। কুঠরি দুইটির একটির নম্বর তিন, অপরটির চার। মাঝখানে মানুষ-সমান উঁচু পার্টিশন।

এই দুই ভদ্রলোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়, এবং গৃহে প্রায় প্রত্যহ মাংস খাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, পথেঘাটে যখন যেখানে সুযোগ পান সেইখানেই লোভে পড়িয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। গৃহের রান্নার একঘেয়ে স্বাদ হইতে দূরে থাকিয়া মাঝে মাঝে ইঁহারা এই ভাবে রসনাকে তৃপ্ত করেন।

তিন নম্বর প্রথম উৎসাহে যতটা পারেন দ্রুত উদরস্থ করিয়া ধীরে ধীরে এক খণ্ড অস্থি চর্ব্বণ করিতেছিলেন, এমন সময় চার নম্বরের কণ্ঠস্বরে তাঁহার মন সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল এ কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, কিন্তু কোথায়, কবে শুনিয়াছেন তাহা মনে পড়িল না। তিনি কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিলেন ভদ্রলোককে একবার দেখা প্রয়োজন। তিনি হঠাৎ ঐখানেই আহার সমাপ্ত করিয়া 'বিল' দিবার জন্য বয়কে ডাকিলেন।

এই কণ্ঠস্বর এইবার চার নম্বরের ভদ্রলোকের কানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিল। তিনি সহসা আহার বন্ধ করিলেন। কার কণ্ঠস্বর? অতিপরিচিত অথচ কিছুতেই মনে পড়ে না!

যুগল ভদ্রলোকের যুগপৎ কৌতূহল, অথচ কৌতূহল মিটাইবার উপায় মাত্র একটি। পার্টিশনের উপর দিয়া লুকাইয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। দরজা দিয়া ঢোকা অসঙ্গত, অনুমান যদি ভুল হয়! সুতরাং চেয়ারে দাঁড়াইয়া একটু দেখিয়া লইলেই সন্দেহের অবসান ঘটিবে।

তিন নম্বর চেয়ারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পার্টিশনের উপর মাথা বাহির করিলেন। ঠিক সেই সময়ে চার নম্বরও চেয়ারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পার্টিশনের উপর মাথা বাহির করিলেন। দুই মাথা নাকে নাকে ঠেকিয়া গেল। চার নম্বর ভীতিজনক শব্দ করিয়া চেয়ার উল্টাইয়া পড়িলেন। তিন নম্বর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

ম্যানেজার অকারণ ভয় পাইয়া উভয় ঘরেই তাড়াতাড়ি বিল পাঠাইয়া দিলেন। বিলের পাওনা মিটাইয়া মুখুজ্জে-মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী-মহাশয় দুই কুঠরি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরবে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের গাড়ী একটু দূরে ছিল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মুখুজ্জে-মহাশয় মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং গাড়ীর ভিতরে নীরবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন। উভয়েরই হাতে এবং মুখে তখনও মাংসের ঝোল লাগিয়া রহিয়াছে।

গাড়ী চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রায় তিন মিনিট নির্ব্বাকভাবে চলিবার পর মুখুজ্জে-মহাশয় শুনিতে পাইলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন মনেই খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার মন হইতে একটা গুরু ভার নামিয়া গেল, তিনিও খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুখুজ্জে-মহাশয়ের মনে পুনরায় আশঙ্কা জাগিল। তিনিও গম্ভীর হইয়া গেলেন। প্রায় দুই মিনিট নীরবে চলিবার পর চক্রবর্ত্তী-মহাশয় চাদরে মুখ ঢাকিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ও হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুই জনের মিলিত হাসিতে ড্রাইভার চঞ্চল হইয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিল এবং পথে নামিয়া হাসিতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় হাসিতে হাসিতে মুখুজ্জে-মহাশয়ের ভুঁড়ি চাপড়াইতে লাগিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয় হাসিতে হাসিতে চক্রবর্ত্তী-মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।

মিনিট দুই এই ভাবে কাটিবার পর চক্রবর্ত্তী-মহাশয় গাড়ী ঘুরাইয়া গঙ্গার ধারে যাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী প্রায় গ্রে ষ্ট্রীটের কাছে আসিয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় চৌরঙ্গীর দিকে আসিতে লাগিল।

গাড়ী একেবারে কোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌছিল। গঙ্গার ধারে বসিয়া উভয়ে উভয়ের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে মুরগীওয়ালার ব্যাপারটাও—"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন "সব ফাঁকি; ঐ লোকটাই প্রতিদিন আমাকে মুরগী সাপ্লাই করে। —আর আপনার স্নান না ক'রে খাওয়া ?"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আপনার পুজো করার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, পাছে কোনও অপরাধ নেন। খাওয়া ত বর্দ্ধমানেই সেরে নিয়েছিলাম !"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "পুজো-ফুজো সব মিথ্যা,—তবে ঝোঁকের মাথায় নিরামিষ খাই বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি ভবানীপুর থেকে রেষ্টুর‍্যাণ্টে এলেন কি ক'রে ?"

মুখুজ্জে-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ভবানীপুরের ব্যাপারটাই একটা ব্লাফ—স্রেফ ফাঁকি। নিরামিষ খাওয়া মোটে সহ্য হয় না, তাই আপনার হাত থেকে ছাড়া পাবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল !"

দুই জনের প্রাণখোলা আলাপে এবং হাস্যে গঙ্গার ঘাট আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কত কথাই হইল। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা হইল; আধুনিক সমাজের কথা, আধুনিক সভ্যতার কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বিস্তারিত আলোচিত হইল এবং অবশেষে আধুনিক যাবতীয় কিছুর নিন্দা করিতে করিতে উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন; বলা বাহুল্য, আহারের অনাচার সম্বন্ধে ইঁহাদের পূর্ব্বে যে মত জানা গিয়াছিল এক ঘণ্টা আলাপের পর দুই জনে তাহাতে আরও দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেন।

বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে দুই জনে নিরামিষই খাইলেন। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের পরামর্শ-মত এ যাত্রার অভিনয়টা অভিনয়ই রহিয়া গেল।

পরদিন বিদায়গ্রহণ। সকালেই ফিরিবার ট্রেন। যাইবার সময় চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "উভয় পরিবারের চালচলনে যখন এতখানি মিল, তখন এ বিয়ে যে ভগবানের অভিপ্রেত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় কামানের গোলার মতই বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার শেষ কথাটি উচ্চারণ করিলেন, "কোন সন্দেহ নেই—নট্ দি লীষ্ট্।"

দূর দেখা

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি-এস্‌সি

এবারের গ্রীষ্মের ছুটির কথা কখনও ভুলতে পারব না। যুদ্ধাতঙ্কপীড়িত ইউরোপের জীবনযাত্রার মধ্যে ছুটির স্থান ক্রমশই অপরিসর হয়ে আস্‌ছে। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রের নীতিপ্রচার, অন্য দিকে নির্মম জাতীয়তাবাদের দুর্জ্জয় আস্ফালন, এই দুই একত্র হয়ে যে তাণ্ডবের আয়োজন কর্‌ছে তাতে কারও অবসর-বিনোদনের সুযোগ রাখে নি। কামান-বন্দুক আর গোলা-বারুদের কারখানাগুলি খাট্‌ছে দিনরাত; কামাই নেই কারও। আর তাদের খোরাক জোগাতে খাট্‌তে হচ্ছে সমস্ত দেশের নরনারীকে। অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের বুকে যে-আগুন জ্বলবে তার ধ্বংসের চিত্র কল্পনা ক'রে কয়েকটি ছোট ছোট দেশের প্রাণে মহা আতঙ্ক জেগেছে; তাদের গীর্জ্জার সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে অস্ফুট ধ্বনিত হচ্ছে আত্মরক্ষার প্রার্থনা। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইতালী, অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া, সর্ব্বত্রই ছদ্মবেশী আস্ফালনের নীচে ছেয়ে গেছে ব্যাপক আতঙ্কবাদ। সর্ব্বত্রই শুন্‌তে পাই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি মমতা; সকলেই চাইছে ইউরোপের সভ্যতাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে; অথচ কেউ এই সভ্যতাকে আপন আপন জাতীয় স্বার্থ থেকে আলাদা করে দেখতে পারছে না। আত্মপ্রবঞ্চনার নির্লজ্জ অভিনয় চলেছে সমস্ত ইউরোপের রাজনীতিতে।

এই অশান্তিবিধ্বস্ত মহাদেশেও যে নরওয়ে-সুইডেনের মত কোলাহলহীন জনপদ থাক্‌তে পারে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা চলে না—প্রকৃতি যেখানে ধ্যানে নিমগ্ন, যে-জাতির যুদ্ধলিপ্সা ইতিহাসের স্মৃতিতে মাত্র পর্য্যবসিত, এবার সেখানকার সমাজে সাদা-কালোর কিংবা হলদে-লালের অভ্যর্থনার কোন তারতম্য নেই। আজ এক-শ বছরেরও বেশী হয়ে গেছে নরওয়ে-সুইডেন কোনও যুদ্ধ করে নি। এই অবসরে তারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্য সংস্কৃতি সব কিছুরই এত উন্নতি সাধন করেছে যে যুদ্ধনিপীড়িত তাদের কোন প্রতিবেশীই তা করতে পারে নি। তাই আজ নরওয়ে সুইডেনের কোন সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু গৃহে আছে শান্তি, নেই ধনিক-শ্রমিকের অন্তর্বিপ্লব, কিন্তু আছে সামাজিক সাম্য ও সুস্থ শিল্পসাধনা।

মাসাধিক কাল জার্ম্মানীতে পর্য্যটন ক'রে আমার কল্পনা-বিলাসী অন্তর একঘেয়ে দাম্ভিক বীরত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাই যখন হাম্‌বুর্গ থেকে ছোট একখানি নরওয়েজিয়ান জাহাজে ওস্‌লো অভিমুখে রওনা হলাম, মনটা খুশীতে ভরে উঠল, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উদার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার আশায়। নরওয়ে-সুইডেন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কল্পনা অতিরঞ্জন ক'রে থাকে। শৈশবকাল থেকে অরোরা বোরিয়ালিস্‌, মধ্যরাত্রির সূর্য্য, উত্তর-মেরুর অসাধারণ বৈচিত্র্য, খানিকটা ভূগোল আর খানিকটা সিনেমার সাহায্যে আমাদের অন্তরলোকে এক বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি ক'রে রাখে। তার পর যাদের বিয়র্ণসন্‌, ইব্‌সেন, রোয়ার ও হাম্‌স্যুনের সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়েছে, এই দুটি দেশের প্রতি তাদের আকর্ষণ ক্রমশ মোহে পরিণত হয়। আমার অন্তত তাই হয়েছিল। যেদিন থেকে দূরের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছি সেদিন থেকেই নরওয়ে-সুইডেনের মোহে আমাকে পেয়ে বসেছিল। কয়েক বছর ইউরোপে কাটাবার পরেও যখন ফিয়র্ডের শোভা দেখবার অবসর হ'ল না, তখন ভেবেছিলাম একটি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রেখেই দেশে ফিরতে হবে। তাই জার্ম্মানীর বৃহত্তম বন্দর এবং দ্বিতীয় নগরী হাম্‌বুর্গ থেকে আমাদের ছোট জাহাজখানি যখন সাগর অভিমুখে রওনা হ'ল তখন সত্যিই মনটা উঠেছিল আনন্দে নৃত্য করে।

হাম্বুর্গ থেকে কীইলের পথ আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের নদী-বহুল শস্যশ্যামল সমতলভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়।

এখানে রাইন্ নদী খুব চওড়া, আর উভয় তীরে দিগন্ত পর্য্যন্ত চলে গেছে স্নিগ্ধ সবুজ শস্যক্ষেত্রগুলি। দূর দিগন্তের কোলে হাল্কা মেঘখণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে আমাদের বাল্যের সহচরী কীর্ত্তিনাশার কথা মনে পড়ল। গ্রীষ্মের কত অলস মধ্যাহ্নে আমাদের বাড়ীর দুর্গামণ্ডপের পিছনে তালগাছটির ছায়ায় বসে নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ-গামী ষ্টীমারগুলির ধূমরচিত মেঘরাশির দিকে তাকাতে তাকাতে দূর দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত। এত অল্প বয়সেই পদ্মার স্রোতের মধ্যে যে গতির আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম তাকে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে পেতে গিয়ে অনেক বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পর্য্যন্ত দাঁড়াতে হয়েছিল। ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে দুই-তিন বন্ধুতে মিলে পদ্মার সেই উন্মত্ত স্রোতের মধ্যে দূর দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। অকস্মাৎ কখনও কখনও ঝড় উঠত। কয়েক বার সাঁতার কেটে তীরে এসে পৌঁছেছি, আবার কখনও দৈবক্রমে জেলে, নৌকোর সাহায্যে উদ্ধার পেয়েছি। পদ্মার সেই স্রোতের কথা স্মরণ ক'রে রাইন্‌কেও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ-কর মনে হ'ল।

ডিনারের পর যখন ডেকে এসে বসলাম তখন জাহাজ সাগরে এসে পড়েছে, আর এক দিকে ডেনমার্কের তীর দেখা যাচ্ছে। একখানা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এক জন সহযাত্রিণীর সঙ্গীতচর্চ্চায় মনটা একটু উদাসী হয়ে উঠল। উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে, অশান্ত সাগরের বিরামহীন জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে পিয়ানোর মৃদু সঙ্গীত সেদিন এক অদ্ভুত মোহময় আবেষ্টনের সৃষ্টি করেছিল। মনে পড়ল আউট্রাম্ ঘাটের এক শীতের সন্ধ্যার কথা। পরীক্ষার পড়ার চাপে কিছু দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে পড়তে হ'ত। স্কটিশ চার্চ্চের এক হোষ্টেলে যে-পাড়ায় আমরা থাকতাম সেখানকার কোলাহল শেষ হ'তে রাত একটা দুটো বাজত। তখন সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে গঙ্গাবক্ষ থেকে ভেসে আসত সমুদ্রগামী জাহাজগুলির গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান। পরীক্ষাগ্রস্ত বন্দী মন বিদ্রোহ করে উঠত একটা অদৃশ্য অনিশ্চিত দূরের আহ্বানে। তাই হঠাৎ এক দিন খেয়াল হ'ল জাহাজগুলি দেখে আসবার। এক বন্ধুকে নিয়ে গেলাম আউট্রাম্ ঘাটে; গঙ্গাবক্ষে সেই অসংখ্য আলোকমণ্ডিত ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জীবনের যে চাঞ্চল্য চলছিল জলের ধারে ব'সে অনেক রাত পর্য্যন্ত একান্ত মনে তাই লক্ষ্য করছিলাম।

সেদিন জাহাজের পিয়ানোর সুরের মধ্যে যে মাদকতা এবং প্রেরণার আস্বাদ পেয়েছিলাম, উত্তর-মেরুর সান্নিধ্যে এসেও আজকার মোহময় সঙ্গীতে পেলাম সেই একই অতৃপ্তির স্পর্শ। দুই অসীমের সঙ্গমস্থলে কাগজের নৌকোর মত আমাদের জাহাজখানি জল কেটে চলল তীব্র গতিতে, ক্রমশ উত্তর হ'তে আরও উত্তরে।

ওস্‌লো দেখে প্রথমটাতে হতাশ হয়েছিলাম। নরওয়ে সম্বন্ধে আমার সমস্ত কল্পনা ধাক্কা খেয়েছিল এই সাদাসিধে ছোটখাট চাঞ্চল্যহীন রাজধানীটিকে দেখে। এত বড় একটা ভাইকিং-সভ্যতার কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না এখানে। ইতিহাসে পড়েছিলাম এই ভাইকিংদের কীর্ত্তির কথা। প্রায় তিন-শ বছর ধ'রে সমস্ত উত্তর-ইউরোপটাকে সন্ত্রস্ত ক'রে রেখেছিল এই পেগান সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয় অভিযান। খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর পরেও নরওয়ে আর সুইডেনে পূজা হ'ত পেগান দেবদেবীর—ওঁডিন্, টর্ ও ফ্রাইয়ের। নির্ম্মম প্রকৃতির শাসনের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়তির অবশ্যম্ভাবিত্বকেও মেনে নিত। আয়র্ল্যাণ্ড থেকে বস্‌ফরাস্ পর্য্যন্ত এমন কোন জনপদ নেই যেখানে ভাইকিং-উপনিবেশ গড়ে ওঠে নি। দীর্ঘ শীতের রাত্রির পরে যখন বসন্তের প্রথম আলো দেখা দিত, তাকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে সপ্তডিঙা মধুকর সাজিয়ে পুঞ্জীভূত উল্লাসের সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ত দুর্জ্জয় অভিযানে। তারা খালি লুটতরাজই করে নি, বিভিন্ন দেশে স্থাপন করেছে সমৃদ্ধিশালী বন্দর। হাম্‌বুর্গ, ল্যুবেক-এর হান্‌সা লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ভাইকিংরাই। রাশিয়াকে তার সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল এরাই। ইংলণ্ডের প্রথম রাষ্ট্রীয় নেতা এবং সংস্কারক রাজা ক্যানিউটও ছিলেন এক জন ভাইকিং-বংশধর, অথচ ওস্‌লোতে এসে এই লুপ্ত সভ্যতার তখন কোন উজ্জ্বল চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। এক-মাত্র লোকতত্ত্বের মিউজিয়মে (Folk Museum) দেখতে পেলাম ভাইকিংরা যে-জাহাজ নিয়ে সাগর পাড়ি দিত তার তিনখানার ভগ্নাবশেষ; সম্প্রতি নরওয়ের উত্তর-পশ্চিম

নরওয়ে-সুইডেনের দৃশ্যাবলী

ডালাকালিয়ায় শীতঋতু

নরহাইমসুণ্ডের নৃত্যোৎসব। নরওয়ে
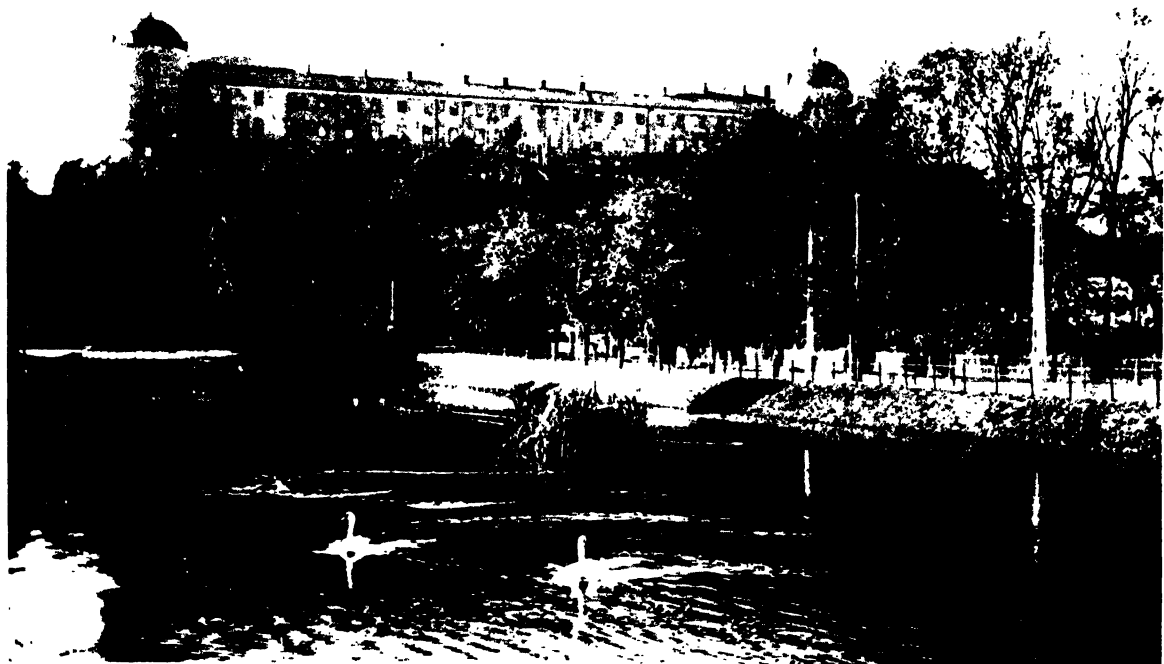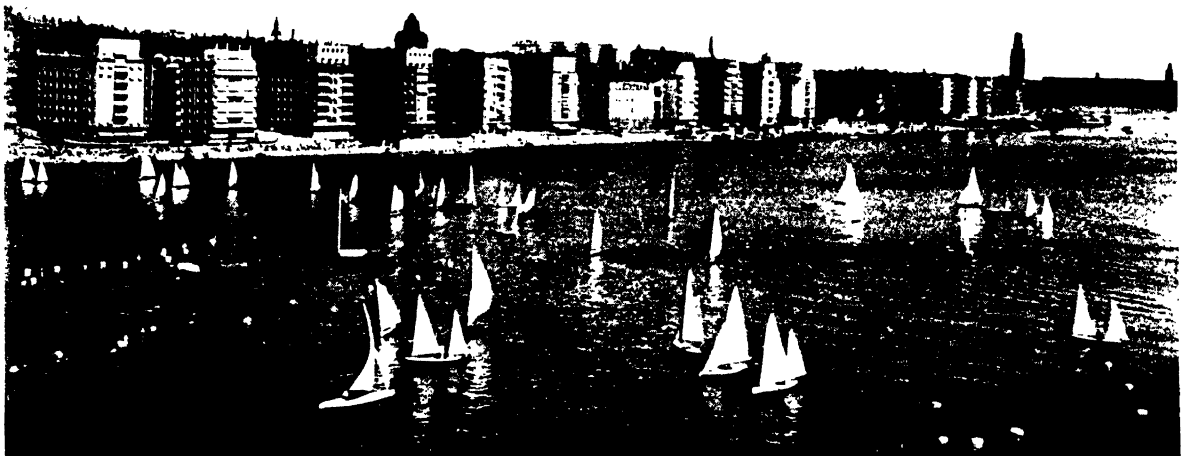
উপরে : ট্রোল-ল্যুঙবি প্রাসাদ, সুইডেন। নীচে : উপ্‌সালা প্রাসাদ, সুইডেন

উপর হইতে : নর্থকেপে সূর্য্যাস্ত, নরওয়ে ॥ উলভিকের পার্ব্বত্য দৃশ্য ॥ ষ্টকহল্‌মে বাচখেলা ॥
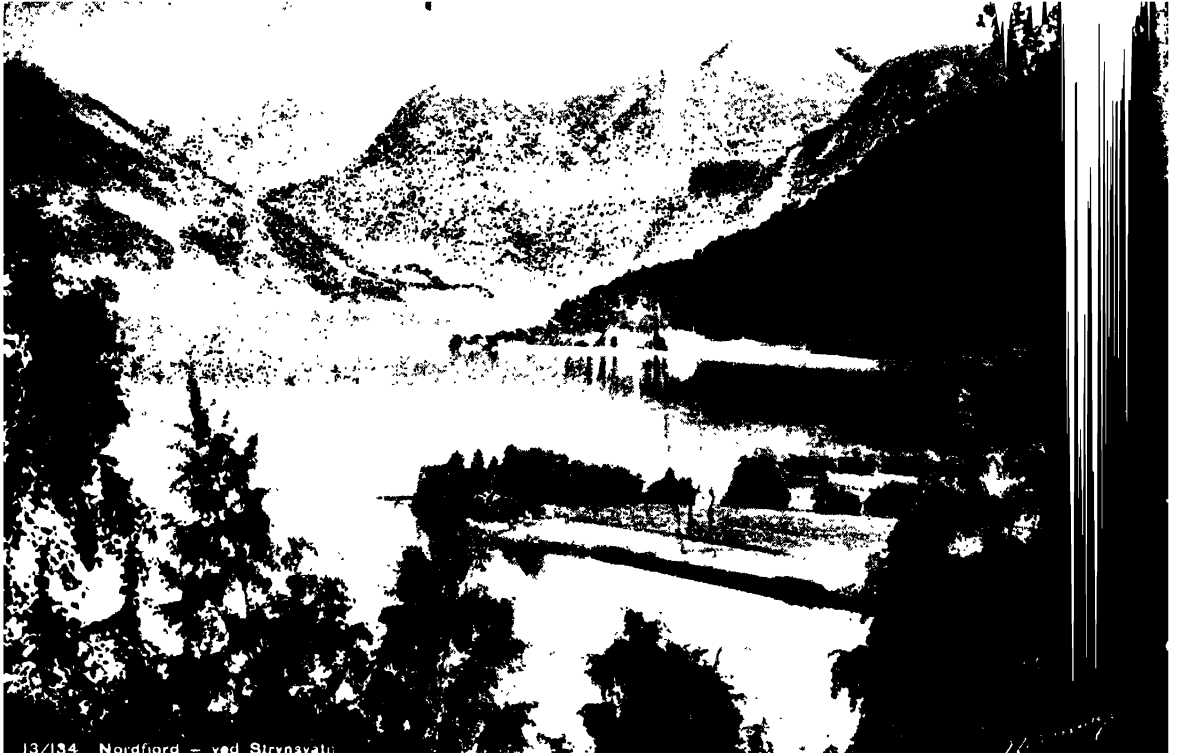
উপর হইতে : নর্ড ফিয়র্ড, নরওয়ে ॥ উলভিক, নরওয়ে

ষ্টকহল্‌ম

সুইডেনের স্বাধীনতা-স্তম্ভ—এঙ্গেলবের্টের মূর্ত্তি। ষ্টকহল্‌ম।
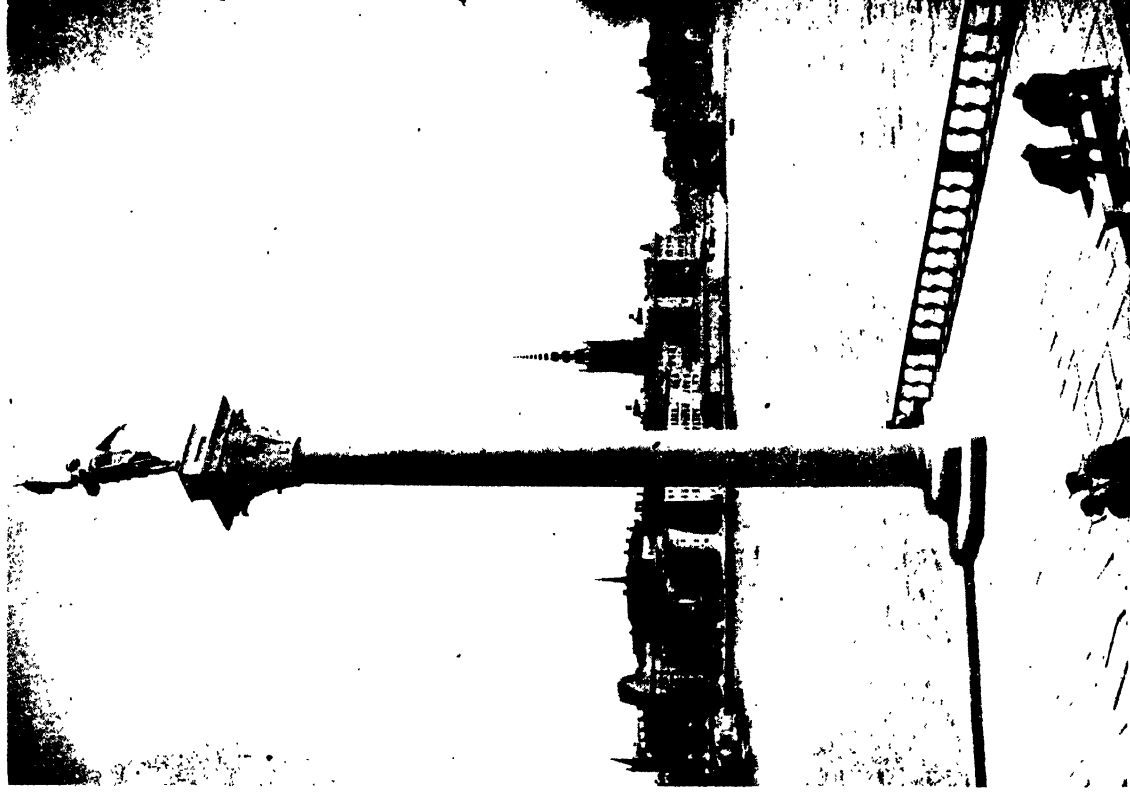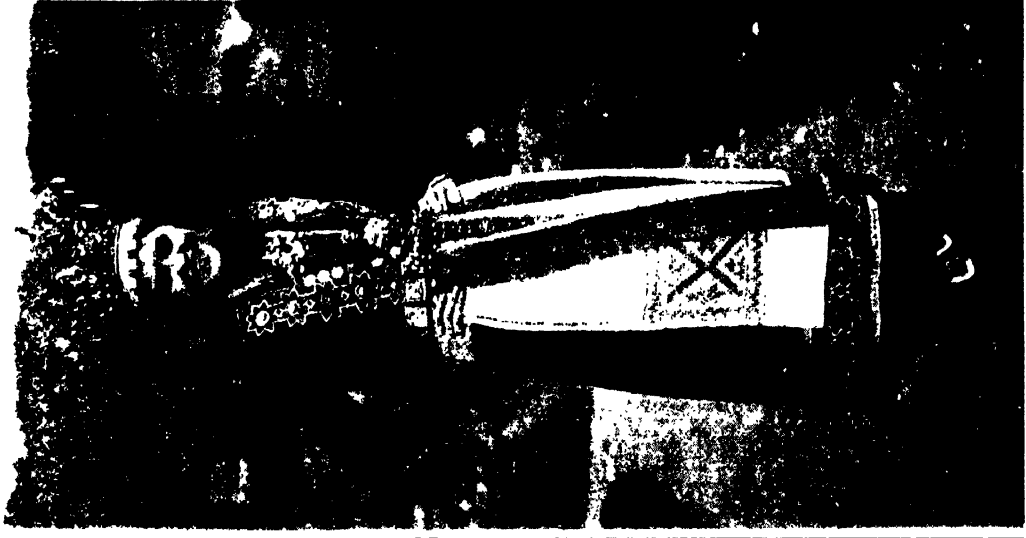
লার্নার শিশু একে অন্যের সাজ দেখিয়া মুগ্ধ

হার্ডাঙ্গারের বিশিষ্ট পরিচ্ছদে নরওয়ের তরুণী

হার্ডাঙ্গারের বিশিষ্ট পোষাকে নরহাইমসুণ্ডের তরুণী
[লেখককর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]

ওস্‌লো তার পুরনো নাম ফিরে পেয়েছে। ওস্‌লোতে অপ্রত্যাশিত ভাবে কয়েক জন ভারতবন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ওখানে প্রাচ্য সভ্যতার অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য একটি পরিষদ আছে। এই পরিষদের সভাপতি মাদাম ডিবোয়াড্ ও নরওয়ের সুফী-নেতা মিঃ জন্ এগেবের্গ, এঁরা উভয়েই ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট। ওস্‌লোতে আমার সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল তা এঁদের আতিথ্য এবং জন্মভূমি সম্বন্ধে কয়েকটি মিষ্টি কথা।

ওস্‌লোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর ভাইকিং সভ্যতার প্রাণের মধ্যে যে অনৈক্য দেখে প্রথমটা একটু নিরাশ হয়েছিলাম, তার দ্বিগুণ উৎসাহিত হলাম ফিয়র্ডের অঞ্চলে এসে। ওস্‌লো থেকে বের্গেনের রেলওয়ের পথটা অপূর্ব্ব সুন্দর—এই সৌন্দর্য্যই নরওয়েকে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে প্রকৃতি-পূজার বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র করেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কখনও কখনও পাহাড়ের মর্ম্ম

ডালার্নার তরুণী

উপকূল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। জাহাজ-নির্ম্মাণ যাদের ব্যবসা কিংবা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তি তারা এই নৌকোগুলো নিয়ে খুব গবেষণা চালাচ্ছে। ভাইকিংদের জাহাজ-নির্ম্মাণ-কৌশল যে অতি উঁচুদরের ছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, কারণ কিছুদিন আগে এক জন নরওয়েজিয়ান ভাইকিংদের রীতিতে তৈরি একখানি জাহাজ তৈরি ক'রে আটলাণ্টিক্ পাড়ি দিয়ে এসেছে।

ওস্‌লোর কোন নরওয়েজিয়ান বৈশিষ্ট্য নেই। ওখানে ইংরেজ আর আমেরিকান্ টুরিষ্টদের ভিড় দেখলে মনে হবে ইউরোপের যে-কোন আর একটা শহরের মত। তাছাড়া ওস্‌লোর বর্ত্তমান শহরটি খ্রীষ্টীয় রাজত্বের আমলে প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরওয়ের এক রাজা তাঁর নিজের নামকে অমরত্বের স্পর্শ দেবার জন্যে এই শহরের নাম বদলে রেখেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানিয়া। এই রাজার অসংখ্য অপকীর্ত্তির মধ্যে এটা ছিল একটি মাত্র। ১৯২৪ সনে

ষ্টকহল্মের টাউনহল
[লেখককর্তৃক গৃহীত চিত্র]

ভেদ ক'রে রেলের লাইন চ'লে গেছে; দুই দিকে সিল্ভার বার্চ, আর পাইন, ফারের ঘন সবুজ বন; লোকালয়হীন, পশুপক্ষীবিরল উপত্যকায় বসুন্ধরার বিপুল বৈরাগ্য। যেখানেই নজরে পড়েছে একটা হ্রদ কিংবা ঝরণা, সেখানেই দেখতে পেয়েছি দু-চার জন মানুষের অস্তিত্ব; কেউ হ্রদের তীরে বাসা বেঁধেছে, চাষের ব্যবস্থা করছে, আর কেউ ঝরণার স্রোত থেকে বিদ্যুৎকে বেঁধে তাকে কাগজের কিংবা অন্য কোন কারখানার কাজে লাগাচ্ছে। এমন লোক-বিরল দেশ আর কখনও দেখি নি। নরওয়ে আর সুইডেনের একত্রে যে লোকসংখ্যা তা একমাত্র লণ্ডনেই প্রায় সমস্ত ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ফিয়র্ড ছিল আমার কাছে একটা স্বপ্নের মত। বোয়্যরের লেখা প'ড়ে ফিয়র্ডের যে-চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল, বাস্তবে তার সত্যিকার রূপ কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু মজা এই, যে, যে-কয়টা দেশ কিংবা স্থান সম্বন্ধে স্বপ্ন রচনা করেছিলাম শুধু ফিয়র্ডে এসেই তার কোন লাঞ্ছনা হয় নি। প্রথম দৃষ্টিতে অনেক স্থানেই অতৃপ্তি বোধ করেছি—রোম, এথেন্স, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন, কোনটাই বাদ যায় নি, যদিও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা বোধ করেছি। কিন্তু একমাত্র ফিয়র্ডের সঙ্গেই প্রথম শুভদৃষ্টিতে বহু দিনের পরিচিত এক জন স্বপ্ন-সঙ্গিনীর মূর্ত্তি দেখতে পেলাম। দু-দিকে অভ্রভেদী নগ্ন পর্ব্বতমালা, গ্রীষ্মের উত্তাপেও যার শিখর-দেশের শুভ্র তুষার-ভূষণ স্খলিত হয় নি; আর নীচে উত্তর-সাগরের নীল জল পর্ব্বতমালার ব্যবধান খুঁজে খুঁজে প্রবেশ করেছে তার স্থির, শান্ত দর্পণ নিয়ে। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম ক'রে গিয়েছি, কিন্তু কোথাও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পাই নি; সমস্ত নীরব, নিশ্চল। ফিয়র্ডের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আছে যে গাম্ভীর্য্য আর উন্মুক্ত উদারতা, তাতে মনে হয় যে প্রকৃতি ধ্যানে বসে আছেন, তুলির রঙে বা কবিতার ছন্দে ধরা দিতে নারাজ। ইউরোপের চিত্রকর ফিয়র্ডের প্রকৃতি-দেবীর সৌন্দর্য্যের গুণ্ঠন মোচন করতে পারে নি; ও কাজ একমাত্র ভারতীয় কিংবা চীনা শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব, প্রকৃতির ধ্যানী মূর্ত্তিকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন রেখার সারল্যে। ফিয়র্ডের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভাইকিংরা কেন পেগ্যান্ অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজক ছিল, কেন তারা বিশ্বাস করত নিয়তিতে, কেন তাদের বিজয়-অভিযানে কেঁপে উঠেছিল ইউরোপের মাটি।

নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের সবগুলো ফিয়র্ডের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে হার্ডাঙ্গার ফিয়র্ড। এখানে উলভিক্ ও নর্হাইম্সুণ্ড এই দুটি পল্লীতে প্রায় এক সপ্তাহ ছিলাম। জুন মাসের শেষ; শীত তখন তত নেই, ওভারকোট ছাড়াই চলাফেরা করা যেত। ঐ সময়ে নরওয়েতে রাত্রি হয় না, হয় শুধু সন্ধ্যা, আর পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে একটি অদ্ভুত গোধূলি-আলোক। সেই গোধূলির মাদক-স্পর্শের এমন একটি মোহ আছে যাতে যে-কোন বিদেশীরই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। সেই প্রদোষের আলো-অন্ধকারে এমন একটি ঔদাসীন্যের স্পর্শ আছে যাতে কল্পনা-বিলাসী অন্তরে প্রার্থনার প্রেরণা জাগায়।

কাল্‌মার প্রাসাদ, সুইডেন
[লেখককর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]

নরহাইমসুণ্ড
[লেখককর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]
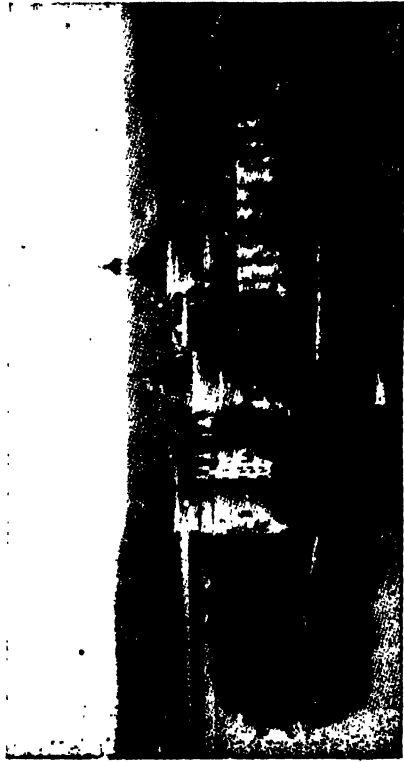
গ্রিপস্‌হল্‌ম প্রাসাদ, সুইডেন
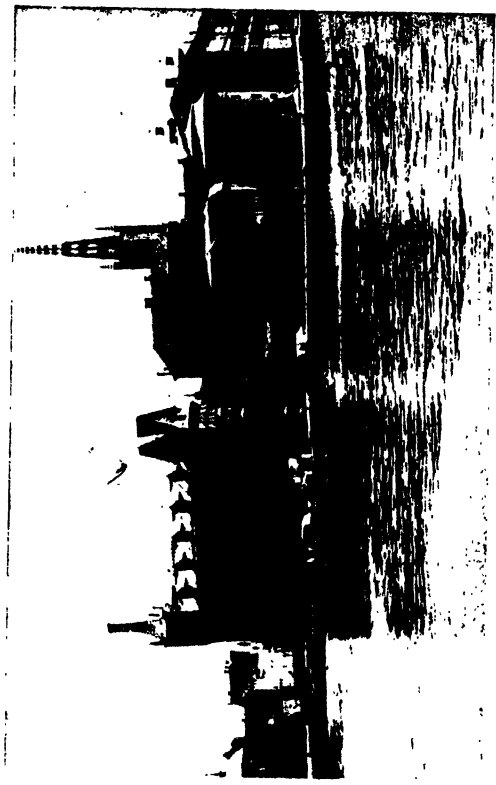
সুইডিশ স্থাপত্যকলার নিদর্শন, ষ্টকহল্‌ম

উল্‌ভিকের নির্জ্জন নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য পথে একাকী চল্‌তে চল্‌তে মনে হয়েছে যে পৃথিবীর শেষ মানব অনন্ত গোধূলির তীর্থযাত্রায় চলেছে; নর্‌হাইম্‌সুণ্ডে "মধ্যরাত্রি"র মলয়-কম্পনে শুন্‌তে পেয়েছি কত ভাইকিং মধুচন্দ্রের লুপ্ত গুঞ্জরণ।

উল্‌ভিক্‌ থেকে নর্‌হাইম্‌সুণ্ডের পথে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল; নাম তার সিগ্রিড, ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানীতে পড়াশুনা করেছে, কিন্তু প্রাণটা আছে এখনও পুরোমাত্রায় নরওয়েজিয়ান্‌। এর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা হয়েছিল। নরওয়েতে অনেকেই ইংরেজী জানে, স্কুলে প্রত্যেককেই ইংরেজী এবং জার্ম্মান পড়তে হয়। ষ্টীমারে ঘণ্টা-পাঁচেকের পথ। সিগ্রিডকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি ওস্‌লোতে না থেকে ফিয়র্ডের বনবাসে কেন থাক? সে বললে—ফিয়র্ডে আমার জন্ম, ফিয়র্ডই আমার প্রিয়; শহরের কোলাহল আমার ভাল লাগে না। তার সঙ্গে আলাপে ফিয়র্ড-জীবনের নানা রহস্যের এবং মাধুর্য্যের খবর পেলাম। নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ দেখে তার দেশের গল্পে সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। গন্তব্য স্থানে নামবার কিছুক্ষণ আগে সিগ্রিড আমাকে জিজ্ঞেস্‌ করল—"তুমি কি কর?"—অস্বাভাবিক কৌতূহল। বললাম, "দূর দেখি।"

"তার মানে?"

"তার মানে আমি ভবঘুরে।"

"তোমাকে দেখে ত তা মনে হয় না।" সিগ্রিডের মত হাসিখুশী, সরলবিশ্বাসী কৌতুকপ্রিয়া সহযাত্রিণীর কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে, যে-কোন লোকেরই থাকত।

নরওয়েতে ফিরে যাওয়ার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কেউ করে নি, কিন্তু ওদেশ থেকে বিদায় নেবার দিন নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করতে প্রবৃত্তি হ'ল যে নরওয়েতে আবার ফিরে আসব।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেনের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক গঠনে কোন পার্থক্য ছিল না। একই ভাইকিং সভ্যতা, এবং প্রায় একই ভাষা উভয় দেশে প্রচলিত ছিল। ডেনমার্কও এই একই সভ্যতার অন্তর্গত ছিল ব'লে, এই তিনটি দেশকে নিয়ে গঠিত ছিল স্কাণ্ডিনেভিয়া। ক্রমশ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তিনটি দেশই এখন পৃথক হয়ে গেছে। গুস্তাফ ভাসা সুইডেনকে স্বাধীনতা দিয়েছিল ডেনমার্কের শাসন থেকে; তাই সুইডেনের জাতীয় ইতিহাসে ভাসার স্থান সর্ব্বোচ্চে। তিনিই প্রথম সুইডেনের রাজপদে অভিষিক্ত হন ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত সুইডেনের সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে আসছে। গুস্তাফ ভাসাই সর্ব্বপ্রথমে সুইডেনের ইতিহাসকে পৃথক করেছিলেন স্কাণ্ডিনেভিয়ার ইতিহাস থেকে, আর হান্‌সা লীগের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন সুইডেনের আর্থিক স্বার্থকে। অনেক রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের পরে ১৮০৯ সনে সুইডেন স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করল তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো যা আজও পরিবর্ত্তিত হয় নি। ভাসা-বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় তিন-শ বছর পর্য্যন্ত সুইডেনের জাতীয় জীবনে গেছে স্বর্ণযুগ। দেশাত্মবোধে, শিল্পে, বাণিজ্যে, চিত্রকলায় এবং স্থাপত্যে সুইডেন অসাধ্য সাধন করেছে। এই যুগে প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রাসাদগুলো আজও তার সাক্ষ্য দেয়। সুইডেনে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে এই প্রাসাদশ্রেণী। কাল্‌মার, গ্রিপ্‌সহল্‌ম্‌, স্কানে, উপ্‌সালা, এই চারিটি প্রাসাদ বিশ্ববিখ্যাত। এদের মধ্যে প্রায় সব ক'টিরই ভাসা-যুগ থেকে নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়েছিল। আজকাল অধিকাংশ প্রাসাদের ভিতরে হয় মিউজিয়ম্‌ নয় মিউনিসিপাল পুস্তকাগার দেখতে পেলাম। একটি দ্বীপের উপরে কাল্‌মার প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং সুইডেনের এটিই ছিল সর্ব্বপ্রধান রেনেসাঁস প্রাসাদ। মালারেন্‌ হ্রদের পারে গ্রিপসহল্‌ম্‌ প্রাসাদটির দৃশ্য মনোরম। উপ্‌সালার প্রাসাদটি রাজা ভাসাই প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছিলেন, শুধু নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। উপ্‌সালা ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ থেকে খুব কাছে, এবং সুইডেনের সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এই শহরে। কুইন ক্রিশ্চিনা এই প্রাসাদের দরবার-গৃহ থেকেই সুইডেনের সিংহাসন থেকে তাঁর বিদায় নেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। নরওয়ে-সুইডেন পুরাণকথার দেশ। এখানকার প্রাসাদগুলোর সঙ্গেও নানা রকমের উপাখ্যান জড়িত আছে। স্কানের ট্রোল-ল্যাজবী প্রাসাদটির

"কোং ডাগ" জাহাজ। মধ্যস্থলে লেখক।

সঙ্গে যে উপাখ্যানটি জড়িত আছে তাকে ভূতের গল্পও বলা চলে। এই গল্প থেকেই ওর নামকরণ। সুইডেনের এই প্রাসাদ-নির্ম্মাণে যে স্থাপত্যশিল্পের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বলা যেতে পারে যে সুইডিশ শিল্প-সাধনার পুরোহিত ছিলেন গুস্তাফ ভাসা; কারণ তিনিই এই শিল্প-প্রতিভাকে আবিষ্কার ক'রে তাকে আত্মচেতন করেছিলেন, যেজন্যে সুইডিশ শিল্প-প্রতিভার আজ একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হয়েছে, যার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ষ্টক্‌হল্‌মের পথেঘাটে, উপ্‌সালা এবং কাল্‌মারের মিউজিয়মে।

অতীত গৌরবের দাম্ভিক স্মৃতি আজও নরওয়ে সুইডেনের নরনারীর মন থেকে মুছে যায় নি। তাই তারা অতীতকে বাদ দিয়ে চলতে জানে না। ভাইকিং আমলের যত কিছু সম্পদ, তার ভগ্নাবশেষের স্মৃতিচিহ্নটুকু যত্ন ক'রে সংগ্রহ করেছে মিউজিয়ম বোঝাই করতে। ওস্‌লোর লোকশিল্পমন্দির দেখলেই তা বোঝা যায়। অতীতকে এরা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাই প্যারিস্ থেকে আমদানি ফ্যাশানের যতই কাট্‌তি হোক ষ্টক্‌হল্‌মের নাগরিক মহলে, গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও পিতৃপুরুষের আমলের বেশভূষার প্রচলন খুব বেশী। নরওয়েতেও তাই। বিভিন্ন ফিয়র্ডের বেশভূষার সমৃদ্ধি এখন পর্য্যন্ত একটুও নষ্ট হয় নি। নরওয়ের হার্ডাঙ্গার এবং সুইডেনের ডালার্নার সাজ-পোষাকের কয়েকটি নমুনা এই প্রবন্ধে দেওয়া গেল।

ষ্টক্‌হল্‌মের মত সুন্দর শহর খুব কমই দেখেছি। একটি দ্বীপপুঞ্জের উপর শহরটি তৈরি, অনেকটা ফিয়র্ডের ধরণ; কিন্তু অত উঁচু পাহাড় নেই। ষ্টক্‌হল্‌মে সমুদ্রগামী জাহাজ আসে যায়, এবং একটি বন্দরও আছে। টাউন্‌-হল, রাজ-প্রাসাদ, পার্লেমেণ্ট-গৃহ, হাইকোর্ট ইত্যাদি ষ্টক্‌হলমের আধুনিক স্থাপত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

ইউরোপের অন্য কোন দেশে নরওয়ে-সুইডেনের মত স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই। তার মানে এই নয় যে মেয়েদের স্বেচ্ছাচার বেশী, আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে ঠিক উল্টো, অর্থাৎ নিজেদের মন তারা খুব ভাল ক'রে জানে। তারা প্রত্যেকেই স্পোর্টে যোগদান ক'রে এবং কাজ ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করে। তাদের স্বাধীনতায় উপবাসীর প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি নেই, আছে আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাস। নর্ডিক চরিত্র যতটুকু বুঝেছি তাতে বিশ্বাস হয়েছে যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সমাজে না আছে ল্যাটিন্ ইউরোপের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, না আছে টিউটনিক্ ইউরোপের নীতিজ্ঞানের মিথ্যা মুখোস, আর না আছে স্লাভিক্ ইউরোপের অবোধ্য ভাবপ্রবণতা। নর্ডিক সমাজে ভাইকিং বীরত্ব আর আধুনিক কর্ম্মকুশলতা এক হয়ে মিশে গেছে।

"যাহা পাই তাহা চাই না"

শ্রীপারুল দেবী

১

বাঁকিপুর শহরের যেদিকটা নূতন পাটনায় পরিণত হয় নাই, শহরের সেই দিকে একটি পুরাতন ছোট বাংলো। বাংলোটি ছোট হইলেও বাড়ীর চারি পাশের জমি কিন্তু অনেকখানি। কোনও এক সময়ে এই জমিতে বোধ হয় বাগান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান।

সেইখানে এক দিন সকালবেলা একটা ছায়াবহুল নিমগাছের তলায় বসিয়া পিতা ও কন্যাতে শেলীর স্কাইলার্ক পড়া চলিতেছিল। পড়াটা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার, কিন্তু ভবানীবাবু বা ইন্দু কাহারও কবিতা-পড়ায় স্কুলের তাগিদ ছিল না। শরতের প্রভাতে, নির্ম্মল আকাশের নীচে, গাছের তলায় বসিয়া কবিতা পড়িতে পড়িতে পিতা-পুত্রীর ভাবপ্রবণ হৃদয় শেলীর লার্কের সহিত আকাশে উড়িয়া গিয়াছিল—ভাবটা কতকটা এইরূপ: পাখী উড়িয়াছে—উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উড়িতে উড়িতে পাখী দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল, কিন্তু তখনও তাহার সুরের রেশ থামে নাই এবং ইন্দুর কানে তাহাই আসিয়া বাজিতেছে। স্কাইলার্ক পড়া হইয়া গেল। ইন্দু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া দীপ্ত মুখে বলিল, "কি সুন্দর—না বাবা?" পিতা কন্যার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া আদর করিলেন।

পাটনা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক তিনি; চিরটা কাল বই পড়িয়া ও পড়াইয়া কাটিল কিন্তু পড়ার তৃষ্ণা এখনও তাঁহার মেটে নাই। বাড়ীতে অনেকগুলি পরিবার—আয় তদনুরূপ নহে। ছেলেমেয়ের উপদ্রবে বাড়ীতে বসিয়া মন দিয়া পড়াশুনা করিবার সময়ও পাওয়া যায় না—স্থানেরও অভাব। নিজের একটি লাইব্রেরি করা আজন্মের আকাঙ্ক্ষা হইলেও তাহারও সুযোগ মেলে নাই। মনে মনে আশা ছিল যে নিজের পুত্রকন্যা লইয়া বাড়ীর নিভৃত অবসরে শেষ জীবনে নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাচর্চ্চা করিবেন, কিন্তু বড় ছেলেটি বার বার তিন বার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করিয়া গত বৎসর পিতার সে আশা চূর্ণ করিয়া মোটরের কারখানায় ঢুকিয়া পড়িয়া পড়াশুনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বাঁচিয়াছে। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির ১৩ বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ভবানীবাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী "মেয়ে বড় হইল, মেয়ে বড় হইল" বলিয়া এমনই সোরগোল তুলিয়াছিলেন যে সে মেয়েটিকে কিং রীডার হইতে "I remember, I remember the house where I was born" কবিতাটি পড়ান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ভবানীবাবু তাহার বিবাহ দিবার পথ পান নাই। তাই নিভৃত অবসরে বাড়ীতে সসন্তান বিদ্যাচর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা ভবানীবাবুর এখনও অপূর্ণ। তবে মধ্যমা কন্যা ইন্দু হয়ত পিতার সে আশা কিছু পূর্ণ করিতেও পারে, এইরূপ একটা চিন্তা কিছু কাল হইতে ভবানীবাবুর মনে স্থান পাইয়াছে। উপর্য্যুপরি প্রথম দুইটি পুত্রকন্যার নিকট বাধা পাইয়া তিনি ইন্দুর লেখাপড়ার দিকে প্রথমে তেমন মন দেন নাই। ভাবিয়াছিলেন বড়মেয়ে বিন্দুবাসিনীর মত এ মেয়েরও ছোটবেলায় মনোমোহিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে পড়িতে এবং মায়ের ও পিসীমার নিকট গৃহকর্ম্মাদি শিখিতে শিখিতে এক দিন কোন্ সময়ে বিবাহ হইয়া পরের ঘরে চলিয়া যাইবে—কবিতা পড়াইবার সময় আর হইবে না। কিন্তু ইন্দু পিসীমা ও মায়ের প্রত্যহ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও অনুযোগ সত্ত্বেও এক দিনও রান্নাঘরে ঢুকিল না, রুটি বেলিতে শিখিল না এবং এক দিন মনোমোহিনী বালিকা-বিদ্যালয় হইতে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া রৌপ্যপদক লইয়া গৃহে ফিরিল।

কন্যার কৃতিত্বে মা গৌরব বোধ করিলেন। পদকখানি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া হাসিমুখে কনিষ্ঠপুত্র রমণীমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা ত রে, রায়বাড়ীর মেজ বৌদিকে এটা দেখিয়ে আয় ত। বলিস্ মেজদি ভাল ক'রে পাস করেছে, তাই মেডেল পেয়েছে। মোহিনী কলেজের এগজামিন পাস করতে পারে নি ব'লে বাছাকে ওরা কত কথাই না শোনাত বাপু—আমার গা জ্বালা করত শুনে। এই ধর, দেখিয়ে আয় গিয়ে।"

পিসীমা পাশের ছোট ঘরে রান্না করিতেছিলেন। উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, মেয়েমানুষের বিদ্যে আর অত জাঁক ক'রে ব'লে বেড়াতে হবে না। ছেলে পাস ক'রে মেডেল ঘরে আন্‌ত ত হ্যাঁ—সে হ'ত বটে সুখের কথা। যার যা কাজ। এ মেয়ের এতখানি বয়সে একটা তরকারি রাঁধবা

যুগ্যতা হ'ল না—এদিকে পুরুষমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাস করেছেন। আরে বাপু সেই ত দু-দিন বাদে বিয়ে হবে আর রান্নাঘরে ব'সে হাঁড়ি ঠেলতে হবে—এ মেডেল নিয়ে কি তখন ধুয়ে খাবে?"

ইন্দু মুখখানা রাগে লাল করিয়া বলিল, "পিসীমা কেবল ঐ বিয়ে আর হাঁড়ি ঠেলা—এই দুটি কথা শিখে রেখেছ—সব তাতে তুমি সেই কথা টানবে। কি তোমাদের হাঁড়ি-ঠেলার ভয় দেখাও? কতকগুলো আনাজ কুটে খানিকটা হলুদ গোলা জলে ফুটিয়ে দিলেই ত তরকারি হয়ে যায়—এতে এত শেখবার কি আছে? ও কে না পারে? রমা দিদের বামুনটা ত এত বোকা যে একটা জন্তু বললেই হয়—তা সে অবধি যখন রাঁধতে পারে তখন রান্নায় এত বাহাদুরীটা যে কি আছে তা ত বুঝি নে। কিন্তু আসুক্ না অমনি বোকা একটা লোক পাস ক'রে একটা মেডেল—এ বিদ্যে শিখতে তার জন্ম কেটে যাবে না?"

মেয়ের সদ্যপ্রাপ্ত মেডেল দেখিতে ভবানীবাবুও অন্দরমহলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা ইন্দু ত ঠিকই বলেছে। দিদির কি না এই রান্নাঘরেই জন্ম কেটে গেল, তাই দিদি আর অন্য দিকটা দেখতেই পাচ্ছেন না। মেয়েদেরও কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাটা দরকার বইকি—কেবল রান্নাঘরে থাকাটাই কি ভাল? তুমি কিচ্ছু ভেবো না দিদি—যখন হাঁড়ি ঠেলবার সময় আসবে ইন্দু তখন চালিয়ে নেবেই কোনও রকমে, এমন কিছু আটকাবে ব'লে ত আমার মনে হয় না—আর যদি একটু-আধটু আটকায়ও ত তাতে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে না।"

পিসীমা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। "বকিস নে, বকিস নে ভবানী—তোর কথা শুনলে আমার হাড় অবধি জ্বলে যায়। আহা কি কথার ছিরি! রান্নাবান্না ভারি ফেলনা জিনিষ, না? মেয়েমানুষের সংসারই হ'ল সব—রান্নাবান্না শিখবে, ঘরের কাজকর্ম্ম শিখবে, সেই হ'ল মেয়েদের আসল শিক্ষা। তা না, সংসারের কিছু জানলাম না, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে কেবল বই পড়তে লাগলাম—তা হ'লেই সংসারে একেবারে লক্ষ্মীশ্রী উথলে উঠবে আর কি! যা করছ এখন কর—মেয়ের বিয়ে দিয়ে তখন সব বুঝবে ঠেলা! এই ত তোমার হরিপদ বাবুর ছোট ছেলের বৌ হয়েছে পাস করা—কি কাজে লাগছে এখন তার ও ছাইপাঁশের বিদ্যে! সেই ছেলেকে দুধ খাওয়ান আর বাটনা-বাটাই করতে হচ্ছে না শ্বশুরবাড়ী এসে?

ননদিনীর রাগ দেখিয়া ইন্দুর জননী মেডেলখানি হাতে লইয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন—মেজবৌদির কাছে মেডেল দেখাইতে পাঠাইবার সাহস তাঁহার অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইন্দুর পিসীমা ইন্দুর পিতা অপেক্ষাও পাঁচ-সাত বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা—তাঁহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলে, কেবল ইন্দু ছাড়া। পিসীমার মুখের উপর কথা কহিবার সাহস এ-বাড়ীতে ঐ ইন্দু ছাড়া আর কাহারও নাই। ইন্দুর মায়ের বিশ্বাস বেশী লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার কন্যার গুরুজনদের প্রতি সম্মানজ্ঞানটা কমিয়া যাইতেছে—এজন্য তিনি প্রায়ই স্বামীকে অনুযোগ ও ইন্দুকে ভৎসনা করেন—কিন্তু ইন্দুকে পারিয়া উঠেন না।

ভবানীবাবু আবার হাসিয়া দিদির বাক্যের কিছু মৃদু প্রতিবাদ বোধ করি করিতে যাইতেছিলেন—ইন্দু বাধা দিয়া বলিল, "শ্বশুরবাড়ী ত আমার হয় নি—হবে কি না তারও ঠিক নেই—যদি হয় ত যখন হবে তখন আমি ছেলেকে দুধও খাওয়াব, বাটনাও বাট্‌তে পারব, তোমায় ভাবতে হবে না পিসীমা। ওঃ—বাটনাবাটা আবার একটা কাজ যে ঘটা ক'রে তা শিখতে হবে। যার দুটো হাত আছে সে-ই ত বাটনা বাটতে পারে। কি যে তোমরা ভাব! তোমরা কেবল ছোট কাজটাকে মিথ্যে বড় ক'রে তোল—বড় কাজটা বোঝ না কিনা তাই।"

রাগের মুখে শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ইন্দু থামিয়া গেল। কথাটা পিসীমাকে বলা ঠিক হয় নাই—মায়ের কাছে বকুনি খাইয়া মরিতে হইবে। কথাটা মনে করিতে করিতেই ইন্দু যা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল। পিসীমার নিরামিষ রন্ধন-গৃহের পাশে আমিষ রান্নাঘরে মা ছিলেন—শুনিতে পাইয়া ডাকিলেন, "ইন্দু।"

পিসীমা ইন্দুর কথার ঠিক উত্তর দিলেন না, বকিতে লাগিলেন। "ধিঙ্গী একেবারে! লজ্জা নেই, সরম নেই, বড়দের সমীহ নেই—ঘরের কাজকর্ম্মে মন নেই—ও কি ছাই শিক্ষা হচ্ছে? বিয়ে হ'লে বুড়ো শাশুড়ী হয়ত দু-বেলা হেঁসেলে খেটে মরবে, আর বিদুষী বৌ চেয়ারে ব'সে পাসের পড়া পড়বেন। কালে কালে এ সব হ'ল কি! আর এ পোড়া সংসারে কি সবই উল্টো? ছেলে পারলে না একটা পাস করতে, আর মেয়ে চলল কলেজে!"

জননীর আহ্বানে ইন্দু একবার পিতার মুখের দিকে করুণ নয়নে তাকাইল, তার পর ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি মা?"

মা অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বলিল, "পাস ক'রে একেবারে সাপের পাঁচ-পা দেখেছ, না? বিদ্যে হচ্ছে, না ছাই হচ্ছে! ঠাকুরঝি কি সাধে বকেন। পিসীমার মুখে মুখে কথা বলিস, এত সাহস তোর? আমি মরি ভয়ে ভয়ে এখনও তোর পিসীমার কথার জবাব দিতে, আর তুই একেবারে সমান সমান জবাব করিস্? তোদের ইস্কুলে বুঝি আজকাল এই সব সহবৎ শেখায়?"

ইন্দু মেডেলখানি লইয়া উৎসাহদীপ্ত মুখে বাড়ী ঢুকিয়াছিল—এখন মায়ের ভৎসনায় মুখখানি ম্লান করিয়া

নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নখ দিয়া দেওয়ালের এক অংশে কি খুঁটিতে লাগিল। পিসীমার উপর রাগ হইতে লাগিল—মিছামিছি একটা অশান্তি সৃষ্টি করা পিসীমার একটা রোগ।

মা আবার বলিলেন, "পিসীমা কি মন্দ বলেন? ঠিকই ত বলেন। ও-বাড়ীর সরমা ত তোরই বয়সী, সেদিন তিন-বাড়ীর লোক নেমন্তন্ন ক'রে একা হাতে বিশ রকম রান্না ক'রে খাইয়েছে। সরমার দিদিশাশুড়ী এসে কত সুখ্যাতি করতে লাগলেন। আর তোমাকে সেদিন ঝোলটা শুধু সাঁতলে রাখতে বলেছিলাম, তা কি ছরকোট করেই রেখেছিলে মা! সে শোধরাতে আমার দুগুণ সময় গেল। কাজ করবার সামর্থ্য নেই—তা বললে আবার রাগ কি?"

পিসীমার বকুনি ইন্দু গায়ে মাখে না, কিন্তু মায়ের ভৎর্সনা শুনিতে শুনিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণে ইন্দুর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পাশের নিরামিষ রান্নাঘর হইতে পিসীমা ডাকিলেন, "ও বৌ, হাত ধুয়ে দুটি কালোজিরে দিয়ে যাও তো আমাকে তোমাদের ভাঁড়ার থেকে। আমার এদিকে কালোজিরে ফুরিয়েছে দেখছি—কাল যখন বাজার যাবে, মনে ক'রে আনতে ব'লে দিও। গঙ্গাজল আছে ঐ ঘড়ায়, কালোজিরে কটা ধুয়ে দিও বাপু একটু। তোমাদের ভাঁড়ারের জিনিষে তো যে যখন খুশী হাত দিচ্ছে, বিচার ত নেই। এ-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব নবাব কিনা—কাউকে কিছু শেখান হবে তার জো কি। সবই উলটো। শিক্ষা—ছেলেরা শিখলে না বিদ্যে, মেয়েরা শিখলে না বিচার!"

অন্য সময় হইলে নিঃসন্দেহ ইন্দু পিসীমার এই অবান্তর কথার জবাব ভাল করিয়াই দিত, কিন্তু এখন সে কাঁদিতেছিল, কিছু বলিল না।

মা চাহিয়া দেখিলেন—বোধ করি মায়া বোধ হইল। নরম স্বরে বলিলেন, "যাও, ভাঁড়ার-ঘর থেকে দুটি কালো-জিরে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে পিসীমাকে দিয়ে এসো গে। বড়রা যা বলেন, ভালর জন্যেই বলেন—রাগ করিস কেন সব তাতে?"

চোখের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে ইন্দু মায়ের নির্দ্দেশ মত ভাঁড়ার-ঘরে চলিয়া গেল। ভাঁড়ারে ছোট ছোট জারে ও শিশিতে এত রকমের ডাল মশলা ইত্যাদি সাজান যে তাহার ভিতর যে কালোজিরা কোন্‌টি তাহা ইন্দু প্রথমে কতক্ষণ বুঝিয়া উঠিতেই পারিল না। বড় বড় পাত্রের গায়ে কোনটিতে লেখা রহিয়াছে "মুগের ডাল," কোনটিতে "ময়দা," কোনোটিতে "আটা"—কিন্তু ছোট ছোট শিশির গায়ে কোনটিতেই কিছু লেখা নাই। ইন্দু ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া খুঁজিতে লাগিল। সব শিশির দ্রব্য বাহির করিয়া হাতে ঢালিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল ইহাদের ভিতর কোন পদার্থটির কালোজিরা হইবার সম্ভাবনা অধিক। মৌরী ইন্দু চেনে, গোলমরিচও সেদিন মুড়িতে মাখিবার জন্য গুঁড়া করিয়াছিল, তাহাও জানা আছে; আর জোয়ান ত বাবা প্রায়ই খান। ইন্দু খুব ভাল করিয়াই জোয়ান চেনে। কালোজিরা যখন নাম, তখন ইন্দু আশা করিল দ্রব্যটি কালো রঙেরই হইবে। একমাত্র সরিষা ছাড়া আর কোনও কালোটে রঙের মশলা ইন্দু উহাদের ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। বারাণ্ডা দিয়া পিসীমার পুত্র নরেন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া ইন্দু কতকগুলা সরিষা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি ভাঁড়ারের দরজার নিকট গিয়া ডাকিল, "নরেনদা ভাই, দেখ না, এইটে কি কালোজিরে?"

নরেনদা একবার মাত্র থামিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বলিল, "কালোজিরে চিনিস না এত বড় মেয়ে? আমাকে ডাকছিস চিনতে? লজ্জা করে না? ছি!" বলিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দু সরিষা কয়টি লইয়া গঙ্গাজলে ধুইল, তার পর অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পিসীমার রান্নাঘরের চৌকাঠে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পিসীমা কি চেয়েছিলে, এনেছি।" পিসীমা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ঐ পাথরবাটিতে রেখে যাও।"

ইন্দু পিসীমার নির্দ্দিষ্ট পাথরবাটিতে সরিষা কয়টি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে পিসীমা যেন ফাটিয়া পড়িলেন। "হ্যাঁ ইন্দু, এই তোমার কালোজিরে? ওমা, কোথায় যাব গো! ও বৌ, তোমার মেয়ে কালো-জিরে নিয়ে এলো একবার দেখবে এস। ও ভবানী—ভবানী, বলি গেলি কোথা? দেখে যা দেখে যা, তোর পাস-করা মেয়ে আমাকে কালোজিরে এনে দিয়ে গেছে, একবার এদিকে এসে দেখেই যা না।...ন বাবা, এত বড় ধাড়ি মেয়ে, কাজকর্ম্ম করা দূরে থাক, এখন অবধি মশলা-পাতি চিনতে অবধি শিখলে না, এ আমি বাপের জন্মে দেখি নি সত্যি। তা বলবই বা কাকে, মেয়েকে শেখালে তবে তো শিখবে। বাপ তো কেবল মেয়েকে বই পড়াচ্ছেন—আর ইস্কুলের মাইনে গুণছেন—সংসারের দিকে মেয়েকে আসতে দেবে তবে তো শিখবে এসব। আজ বাদে কাল বিয়ে দিতে হবে, সংসারের ভার মাথায় পড়বে তখন—আর মেয়ে এখনও হলুদ লঙ্কা ধনে কোন্‌টে কি তা জানলে না!"

ভগিনীর হাঁকাহাঁকিতে ভবানীবাবু সশঙ্কচিত্তে নিজের পাঠগৃহ ছাড়িয়া আবার ভিতরে আসিয়াছিলেন—না জানি আবার কি ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু কালোজিরার সমস্যা তাঁহাকে তিলমাত্র বিচলিত করিয়াছে এমন বোধ হইল না। তিনি কন্যার হাত ধরিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "খুকু, পালিয়ে

আয়, পালিয়ে আয় এখান থেকে। তুই সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে দিদির বকুনি কি আর আজ থামবে? আয় বাইরে।"

পিতার হাত ধরিয়া ইন্দু বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল, পিসীমা বকিতেই লাগিলেন।

বাহিরে আসিয়া ইন্দুর চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। বলিল, "কি যে বাবা রাতদিন বকেন পিসীমা—কোথাও কিছু নেই, শুধু শুধু এত বকতেও পারেন! কালো-জিরে না চিনলে কি যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় তা উনিই জানেন। কোনও দিন দেখি নি, তাই ভুল হ'ল। এক দিন দেখিয়ে দিলেই তো চিনে যেতাম, না বাবা? সাধে কি আর আমার রান্নাঘরের দিকে পা দিতে ইচ্ছে করে না? গেলেই খালি বকুনি—কেন এটা জান না, কেন এটা পার না। বাবা বাবা!"

ভবানীবাবু কন্যাকে নিজের কাছে বসাইয়া বলিলেন, "কাল থেকে তো তোকে আমি পড়াব খুকি, রান্নাঘরে যাবার সময়ই বা পাবি কোথা? কলেজ খোলবার আগেই আমি তোকে পোয়েট্রি টেক্‌স্‌টা পড়িয়ে দেব মা—আমার এখন ছুটি কিনা, সময় আছে। বইখানা আগে থেকে পড়ে রাখলে তোর অনেক সুবিধা হবে।"

ইন্দুর চোখের জল এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। হাসি-মুখে বলিল, "পড়াবে বাবা? খুব মজা হবে। সকালবেলা ঐ মাঠে গাছের তলায় ব'সে পড়ব আমরা দু-জনে—পিসীমা তো আর তাহলে তখন কাজ করতে ডাকতে পারবেন না। রান্না আর বান্না, আর জিরে আর হলুদ—এমন বিচ্ছিরি লাগে আমার।"

ভবানীবাবু সস্নেহে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "না মা ও কথা কি বলতে আছে? শিখতে হয় বইকি সব কাজই কিছু কিছু। দেখ, তোমার মা, পিসীমা, তোমাদের ভাল খাওয়াবেন, যত্নে রাখবেন ব'লে কত কষ্ট ক'রে বারো মাস রান্নাবান্না করছেন, পরিশ্রম করছেন—একটু বিশ্রাম দেন না নিজেদের শরীরকে। এ কি কম কথা ভাব? তা নয়—খুব বড় কথাই মা। তবে আমি জানি তোমারও বিয়ে হ'লে, ঘাড়ে পড়লে, তুমিও ঠিক ওদেরই মত নিজের স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনকে সেবা করবে, খাটবে, রেঁধে খাওয়াবে, সবই করবে। যে কয়দিন আমার কাছে আছ—না-ই করলে, এই আর কি।"

পিতার উপদেশ-বাক্য শুনিতে শুনিতে ইন্দুর চোখে আবার জল আসিবার উপক্রম হইল। সে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বলিল, "না বাবা, তুমি অমন ক'রে বলো না; আমার ভয়ানক কান্না পায়। আমার বিয়ে হবে না। আমি বিয়ে করব না, শ্বশুরবাড়ী যাব না, কাউকে রেঁধে-টেঁধে খাওয়াব না—বরাবর তোমার কাছে থাকব আর পড়াশুনা করব, আর পিসীমার কাছে বকুনি খাব। তুমি এখন এস, আমার কলেজের বইয়ের লিষ্ট এনেছি তুমি দেখবে এস।"

পিতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ইন্দু তাঁহাকে নিজের পড়িবার ছোট ঘরটির দিকে লইয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে সত্য সত্যই প্রতিদিন ভবানীবাবু ইন্দুকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাই হইল উক্ত শরৎ-প্রভাতে নিমগাছতলায় বসিয়া পিতা-পুত্রীর কাব্য-আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২

কিন্তু ইন্দুর আপত্তি টিকিল না। কান্নাকাটি, রাগারাগি করিয়াও ইন্দু নিজের বিবাহ বন্ধ করিতে পারিল না। বিবাহ হইয়া গেল এবং এক দিন শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন দিনে পিসীমা ও মায়ের উপর রাগ এবং পিতার উপর অভিমান করিয়া নীরবে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ইন্দু স্বামীর সহিত শ্বশুরঘর করিতে চলিয়া গেল।

অনুকূলের সহিত বিবাহে ভবানীবাবুর গোড়াগুড়ি হইতেই তেমন মত ছিল না। ছেলেটি বি-এ পাস বটে, কিন্তু ভবানীবাবু গোপনে জানিয়াছিলেন যে সে একবারের চেষ্টায় বি-এ পাস করে নাই। তাহার উপর ছেলেটি প্রোফেসার নহে, ইস্কুলের মাষ্টারও নহে—অর্থাৎ বিদ্যাচর্চ্চার সহিত যে কাজের সম্পর্ক থাকে, সেরূপ কিছুই নহে—ছেলেটি একটি দোকানের মালিক, সাদা কথায় যাহাকে বলে দোকানদার। হয়ত সারা দিন হিসাব কষে ও দোকানে বসিয়া খাতা মেলায়; কাব্যচর্চ্চা হয়ত তাহার পক্ষে অত্যন্তই অনাবশ্যক বস্তু। সে কি তাঁহার কন্যার আদর করিবে? স্ত্রীর নিকটে ভবানীবাবু এ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্ত্রী নীরবে রহিলেন, কিন্তু ভগিনী শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। "তুই ক্ষেপলি নাকি ভবানী? এমন ছেলে তোর পছন্দ না? পুরুষমানুষ—টাকা রোজগার করছে কি না এইটে দেখবি; তা না, কে বই মুখে ক'রে রাত-দিন ব'সে থাকে তোর মেয়ের মত, তাই দেখে জোড় মিলিয়ে তুই জামাই খুঁজবি নাকি? অনাছিষ্টি কথা ক'স্ নে। খাসা ছেলে এ। চেহারাও দিব্যি, শুনছি দোকানে দিব্যি রোজগারও করে, তিনটে পাস করেছে—এ সম্বন্ধ যদি তোমার মেয়ের পছন্দ হবে কি না-হবে ভেবে ফিরিয়ে দাও তো ও মেয়ের আর বর জুটবে না তা আমি তোমায় স্পষ্টই ব'লে দিচ্ছি। কথায় বলে বাড়া ভাত আর যাচা সম্বন্ধ কখনও ফেরাতে নেই। ছেলে নিজে এসে সম্বন্ধ ক'রে গরজ দেখিয়ে বিয়ে করতে চাইছে, এ ভাগ্যি ব'লে মানবি—তা না সব উলটো কথা দেখ না!"

ভবানীবাবু মন স্থির করিতে সময় পাইলেন না—এদিকে ভগিনীর তাড়ায় ও ওদিকে অনুকূলের আগ্রহে বিবাহ হইয়া গেল।

ইন্দুর স্বামী অনুকূল ও তাহার এক বন্ধু সুরেশ এই দুই জনে যখন বছর তিন আগে একসঙ্গে বি-এ পাস করিয়া বাহির হয় তখন অ-সহযোগ আন্দোলনের কাল। দুই জনেই মনে মনে জানিত যে চাকুরী পাওয়া অসম্ভব, কাজেই জোর গলায় প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা পরের দাসত্ব কখনও করিবে না; স্বাধীন ব্যবসা করিবে। ভাগ্যে থাকে তো ইহা হইতেই এক দিন যে তাহারা লক্ষপতি হইবে না তাহা হলফ করিয়া কে বলিতে পারে? দুই জনে অনেক কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সেই বৎসর হইতেই বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত এমন একটি শহরে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে যেখানে সত্যই এইরূপ একটি দোকানের অভাব ছিল। শহরটি নেহাৎ ছোট নহে—তাই দুই বন্ধুর ব্যবসায়ের আরম্ভটা হইল বেশ আশাপ্রদ, এবং স্বাধীন ব্যবসায়ে নামিয়া এইবার দুই জনের বুক ফুলাইয়া বেড়াইবার পক্ষে আর কোনও বাধা রহিল না।

সুরেশ আগেই বিবাহ করিয়াছিল—দোকান ফাঁদিয়া এত দিন পরে স্ত্রীকে পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিল। তাহার স্ত্রী অপর্ণা গৃহস্থঘরের সাধারণ মেয়ে—কাজকর্ম রন্ধনাদিতে সুনিপুণা। স্বামীর ঘরে আসিয়া ঘষিয়া-মাজিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া দু-দিনেই সে দিব্য গৃহস্থালী পাতিয়া বসিল। নিকটেই অন্য একটি ছোট বাড়ীতে অনুকূল একা থাকে। তাহার চাকরটা বাজার হইতে যতক্ষণ না ফেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে আলো জ্বলে না; ছেঁড়া পর্দ্দা ঘরের জানলায় তিন মাস হইতে একই ভাবে ঝুলিতেছে, বদলাইবার লোক নাই। খাইতে বসিয়া দুধের ভিতর সেদিন মাছি পাওয়া গেল, এবং সেই কারণে অনুকূল চাকরটাকে ভর্ৎসনা করিল বলিয়া তাহার পরদিন সে অসুখের অছিলা করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, কাজে আসিল না। একমাত্র ভৃত্যের অনুপস্থিতিতে সারাদিন ধরিয়া অনুকূলের পদে পদে নানা অসুবিধা ঘটিতে লাগিল এবং সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া সুরেশের বাড়ী গিয়া অপর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় রহিল না।

তখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরের চৌকিতে শুইয়া পায়ের উপর পা দিয়া সুরেশ রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা খুলিয়া জোরে জোরে পড়িতেছিল—

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট।"

অনুকূল মূর্ত্তিমান অকবিতার ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরেশের হাত হইতে বইখানা কাড়িয়া দূরে চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া দিল। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল—অনুকূল নিজের আধভিজা পাঞ্জাবীটা টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া চৌকির এক ধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচাস নে ভাই—খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, সহ্য হবে না। ডাক দিকিনি বৌদিকে একবার, দুঃখ জানাই—অচিরে ফল পাব সন্দেহ নেই। সত্যি সারাদিন খাই নি রে সুরেশ—বেটা বজ্জাত চাকর আচ্ছা জব্দ করেছে আমায় আজ। ওটাকে আর দূর না ক'রে দিলে চলছে না। কাল আমাকে মাছি খাইয়ে মারছিল—এই কলেরার সময়, দুধ খেতে গিয়ে দেখি কিনা তার ভেতর মরা মাছি। তাইতে একটু বকেছিলাম, সেই জন্যে নবাব-পুত্তুরের এমন রাগ হ'ল যে আজ সারাদিন এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি—কিছুতে নিজের বিছানা ছেড়ে উঠল না। বলে কিনা আমার পেট দরদ করছে। এদিকে সারাদিনে বার চার-পাঁচ ষ্টোভে চা ক'রে ক'রে খেয়ে আমারও পেটে এখন দরদ ওঠবারই জোগাড়। কিছু খেতে না দিলে ত আর বাঁচব না আজ।"

বন্ধুর দুর্গতির ইতিহাস শুনিয়া সুরেশ কবিতা ভুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আচ্ছা, কেন বল তো তোর এ দুর্দ্দশা? এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলি শেষটা খেতে? কি বিপদ। নিজের একটা ঘরসংসার পাত না বাপু এবার। ঘরে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা কর, কোনও কষ্ট আর পেতে হবে না—অন্ততঃ খাওয়া-দাওয়ার আরামের বিষয়ে তো নিশ্চিন্ত হবি।"

তাহার পর উঠিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো শুনছ? অনুকূল খাবে আজ এখানে—ভাল ক'রে কিছু রেঁধে ওকে খাওয়াও। খিদেতে ও চোখে অন্ধকার দেখছে—একটু শীগ্‌গির ক'রে ক'রো কিন্তু যা করবে।...আয়, আয় রে অনু ততক্ষণ বোস এখানে। আয় তাস খেলা যাক তোর খিদের কষ্ট ভোলাতে। যা বৃষ্টি আসছে—দোকানে তো এখন যাওয়া যাবে না।"

অপর্ণা রাঁধিতে এবং রাঁধিয়া খাওয়াইতে ভালবাসে; এবং আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধে অনুকূলের যে একটু দুর্ব্বলতা আছে তাহা এই কয় মাসের পরিচয়েই অপর্ণার জানিতে বাকি নাই। তাই তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে অপর্ণার বড় আনন্দ। নিজের স্বামীর ত খাওয়ার বিষয়ে ভালমন্দের এতটুকুও যদি জ্ঞান থাকে! তাঁহার কাছে অনুকূলের উড়ে চাকরটার জঘন্য হাতের রান্নাও যা, অপর্ণার এত যত্নের রান্নাও তাহাই—বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা পাত্রে দেওয়া যায় সুরেশ মুখ বুজিয়া তাহাই নিঃশেষে খাইয়া উঠিয়া পড়ে। অপর্ণা যেদিন সাধ করিয়া বিশেষ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাঁধে, সেদিন নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া সুরেশ উঠিয়া পড়িলে সে ক্ষুণ্ণমনে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, "তরকারিটা বুঝি আজ ভাল হয় নি?" সুরেশ

বলে, "কোন্‌টা? ঐ বাটিতে যেটা দিয়েছিলে, না থালায় যেটা ছিল? কেন—বেশ তো হয়েছে। সবই বেশ হয়েছে।"

অপর্ণা আর কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে, "কি মানুষ বাপু। খাইয়ে যদি এতটুকু তৃপ্তি আছে।"

শুধু অনুকূল যেদিন এ-বাড়ীতে খায় সেদিন অপর্ণার রান্নার সুখ্যাতিতে ঘর ফাটাইয়া দেয়। "কই বৌদি, আসুন আসুন, ঐ মাছের দমটা আরও নিয়ে আসুন।... কি রে সুরেশ তুই কি ঘোড়া নাকি? অমৃতে আর ঘাসে তফাৎ বুঝিস নে? বেগুনভাজাটা সবটা খেলি আর এমন মাছের দমটা এখনও অর্দ্ধেকটা পড়ে?...নাঃ, বৌদি তোকে রোজ রোজ অমৃত খাইয়ে খাইয়ে দেখছি একেবারে মাটি ক'রে দিয়েছেন। খেতে হ'ত আমার চাকরটার রান্না রোজ রোজ তো বুঝতিস এর আদর!...না বৌদি, দম আর অত বেশী দেবেন না; চাটনিটা ভাবছি আর একটু নেব। পেটেও তো আবার ধরা চাই কি না। চমৎকার রান্না হয়েছে। এদিকে আবার পান্তুয়া যে-রকম সাজিয়ে দিয়েছেন—জানি তো আপনার হাতের পান্তুয়া কি জিনিষ—ও তো পেট ফেটে গেলেও আমি পাতে ফেলে রেখে উঠতে পারব না। আপনার কাছে খেতে এলে আমার মহা সমস্যা হয় দেখছি—কোন্‌টে ফেলি, কোন্‌টে খাই!"

অপর্ণা আনন্দিত হাসিমুখে বলে, "একটাও ফেলবেন না, ব'সে ব'সে খান, ওটুকু বেশ খেতে পারবেন। বেশী তো দিই নি কিছুই। আপনি খাবেন ব'লেই যা যা ভালবাসেন রেঁধেছি, ফেলে রাখলে আমার মনে কষ্ট হবে না?"

সুরেশ হাসিয়া বলিল, "অনুকূলটা যে পেটুক—ওই ঠিক ব্রাহ্মণের নাম রেখেছে। তুই বাপু একটি রাঁধুনী বামনী বিয়ে ক'রে আনিস। ভবানীবাবুর আই-এ পাস করা মেয়ের কথা যে সেদিন বলছিলি, ওদিকে ঘেঁষিস না। কি করবি তুই কাব্য-জানা বৌ নিয়ে? তার চেয়ে মাছের দম জানে কিনা সেটা খোঁজ নিস বরং—কাজে লাগবে।"

অনুকূল মহা উৎসাহে মুখে গ্রাস তুলিতে তুলিতে বলিল, "দাদা, ওসব তামাশা রাখ। ঘরে পেয়েছ অন্নপূর্ণা, এখন তাই তামাশা করছ, খাটে শুয়ে সুর ক'রে কবিতা পড়ছ। খিদেতে জ্বলত পেট আমার মত, তো দেখতাম ওসব তোমার কোথায় থাকে!"

কিছুদিন পূর্ব্বে, অনুকূলের মনে আছে সুরেশের সংসারের অবস্থাও তাহার অপেক্ষা বিশেষ কিছু ভাল ছিল না। তাহারও গৃহে তখন প্রতিদিন আলো জ্বলিত না এবং মাসে এমন পাঁচ-সাত দিন ভৃত্যের অনুপস্থিতির কল্যাণে বাজার হইতে পুরী কচুরি আনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। আজ অপর্ণার গৃহিণীপনায় সুরেশের রাজার হাল দেখিয়া এইবার অনুকূল বিবাহ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল এবং পছন্দ করিয়া ইন্দুকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়া স্ত্রীর কল্যাণী হস্তের সেবাযত্নের প্রত্যাশায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

অনুকূলের আত্মীয়স্বজনের বালাই ছিল না—ইন্দু প্রথম হইতেই একেবারে একা স্বামীর ঘর করিতে আসিল। স্ত্রীকে আনিয়া ঘর-সংসার বুঝাইয়া দিয়া অনুকূল বাক্সের চাবি ইন্দুর হাতে দিয়া বলিল, "ঘরদোর সব কি রকম অগোছাল দেখছ তো? চাকরটাকে কত বুঝিয়ে গিয়েছিলাম যে তুমি আসবে, সব যেন পরিষ্কার ক'রে রাখে—তা উড়ের বুদ্ধি কিনা—এর নাম গোছান! তোমার কত কষ্ট হবে এখন এসব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে। আমি যদিও খুবই অকর্ম্মণ্য কিন্তু তবু তোমাকে সাহায্য করতাম ইন্দু—কিন্তু কি করব, ক'দিনের ছুটি নিয়েছিলাম, আজ তো আর দোকানে না গেলেই নয়। একা সুরেশ হাবুডুবু খাচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু আজ তুমি এ-সব নিয়ে খেটো না বেশী—ট্রেনে এসেছ, রাত্রে ঘুম হয় নি ভাল ক'রে, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম কর। ওসব গোছগাছ পরে ক্রমে হবে তাড়া তো নেই কিছু।"

অনুকূল আহারাদি সারিয়া দোকানে চলিয়া গেলে চাবির গোছা হাতে করিয়া গৃহিণীপনায় অনভ্যস্তা ইন্দু এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কোন্ জায়গায় কি দ্রব্য গুছাইতে হইবে। বেশ তো সব রহিয়াছে। গৃহস্থালী বলিতে তিনখানি মাত্র ঘর—ইন্দু সকল ঘরে ঢুকিয়া ঢুকিয়া স্বামীর এই অপরিচিত সংসারের সহিত নিজের পরিচয় স্থাপন করিতে লাগিল। যখন কোথাও কিছু গুছাইবার মত খুঁজিয়া পাইল না, তখন ইন্দু নিজের বাক্সগুলা খুলিয়া গুছাইতে বসিল। মনে হইল, ঠিক কথা—ইন্দুর নিজের জিনিষপত্র তো এতক্ষণ খোলা হয় নাই, ইহাই গুছাইবার কথা নিশ্চয় অনুকূল বলিয়া গিয়াছে।

কাপড়গহনা জিনিষপত্র বিবাহে ইন্দু এমন কিছুই বেশী পায় নাই যাহা গুছাইতে অনেক সময় লাগিবে। শুধু একটি মস্ত প্যাকিং বাক্স ভরিয়া ভবানীবাবু কন্যার স্কুল ও কলেজ পাঠ্য সমস্ত পুস্তকের সহিত নিজের যত্নসঞ্চিত অনেক বই ইন্দুর সহিত দিয়াছিলেন। সেই বাক্স খুলিয়া পিতার স্বহস্তে সজ্জিত বইগুলি দেখিয়া ইন্দুর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রতি বইয়ে ভবানীবাবু স্বহস্তে ইন্দুর নাম ও তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার ভিতর কত বই সে পিতার সঙ্গে একসঙ্গে পড়িয়াছে—

তাঁহার নিকট ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছে—কোনটি পড়াইতে পড়াইতে পিতা কোন্ কথাটি বলিয়াছিলেন, তাহা একে একে মনে পড়িয়া নির্জ্জন গৃহে ইন্দুর চোখের জল আর কিছুতে থামিতে চাহিল না। আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া পুস্তকগুলি সে বাক্স হইতে বাহির করিল ও তার পর শয়নগৃহের দেওয়াল-আলমারি হইতে ঔষধের খালি শিশি, কাঠের বাক্স, হাতপাখা, কিছু ছেঁড়া খাতাপত্র ইত্যাদি বাহির করিয়া সেগুলাকে ঘরের এক কোণে রাখিয়া সেই আলমারিতে পুস্তকগুলি সাজাইতে বসিল। কবিতার বই হাতে পাইলে তাহা না খুলিয়া, দুই-চার লাইন না পড়িয়া ইন্দু থাকিতে পারে না। তাহার আদরের বইগুলি খুলিয়া দেখিয়া, তাহার পর তাহা সাজাইয়া রাখিতে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখনও ইন্দুর কার্য্য অসমাপ্ত। ভৃত্য ঘরে আলো দিতে প্রবেশ করিয়া একটু ইতস্ততের পর নূতন গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা আজ কি রান্না হবে?"

ইন্দু এ প্রশ্নের জন্য বোধ করি প্রস্তুত ছিল না—মুখ তুলিয়া চাহিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "রোজ যা হয় তাই হবে। আমার জন্যে আলাদা ক'রে কিছু করবার দরকার নেই। তোমাদের যা হবে, আমিও তাই খাব।"

নূতন গৃহিণী কি খাইবেন ভৃত্য ঠিক সে-কথা হয়ত জিজ্ঞাসা করে নাই—কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা না-করিয়া সে তাহার প্রাত্যহিক কাজে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর অনুকূল যখন গৃহে ফিরিল তখন ইন্দু চুল বাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া একখানি কাব্য-গ্রন্থ হাতে করিয়া জানলার ধারে আসিয়া বসিয়াছে। অনুকূল বোধ করি মনে মনে আশা করিয়াছিল যে নববধূর হস্তস্পর্শে তাহার গৃহসজ্জা ও শয্যারচনায় প্রতিদিনকার মলিনতা আজ ঘুচিয়া গিয়া থাকিবে—কিন্তু চারি দিক চাহিয়া কোনও খানে গৃহলক্ষ্মীর শ্রীহস্তের স্পর্শচিহ্ন তাহার চোখে পড়িল না। প্রথমেই মনটা যেন ছোট হইয়া গেল—কিন্তু তরুণী স্ত্রীর দিকে চাহিতেই তাহার আর আনন্দের যেন অবধি রহিল না। ইন্দু একখানি বর্ষার মেঘের মত নীল শাড়ী পরিয়াছে। তাহার কাপড় পরিবার ভঙ্গী, তাহার চুল বাঁধিবার ধরণ, তাহার স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, তাহার সুকুমার মুখখানি, প্রদীপের স্বল্প আলোকে অনুকূলের চোখে যেন অপরূপ সুন্দর মনে হইল। মনে হইল জীবনের এতগুলা বৎসর বৃথাই নষ্ট করিয়াছি—লক্ষ্মীপদস্পর্শে যে-গৃহ নন্দনকানন হইয়া উঠিতে পারিত, এতদিন মিথ্যাই তাহা শ্মশান করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয্যা আজিও মলিন, ছিন্ন পর্দ্দা এখনও বর্ষার বাতাসে দুলিতেছে, কিন্তু ইন্দুর উপস্থিতির অভাবনীয় সৌন্দর্য্য গৃহের সকল মলিনতাকে চোখের আড়াল করিয়া দিল।

রাত্রে খাইতে বসিয়াও প্রাত্যহিক নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল না। ভোজ্যদ্রব্যের দিকে চাহিয়া আবার যেন অনুকূলের মন ছোট হইয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু অনুকূল নিজের মনকে ধমক দিয়া ভাবিল—ছি, আমি যেন কি! আজ প্রথম দিনেই বেচারী ক্লান্ত হয়ে রয়েছে—আজ কি ক'রে সব দিক দেখবে? আমার ওরকম ভাবাই অন্যায়।" মুখে বলিল, "চাকরটা যা বিশ্রী রাঁধে—আমার তো তবু খেয়ে খেয়ে এক রকম অভ্যাস হ'য়ে গেছে—তুমি কি এ মুখে দিতে পারবে?"

ইন্দু সলজ্জে বলিল, "হ্যাঁ। খাওয়াতে আমার কিছু বাচবিচার নেই—আমি সব খেতে পারি।"

৩

ইহার মাসখানেক পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনুকূল সুরেশের কাছে আসিয়াছে। সুরেশ তাহার বাটীর সম্মুখের ছোট বাগানে একটি বেতের চেয়ার লইয়া তখন বসিয়াছিল —হাতে একখানা সুচিত্রিত বাঁধাই মেঘদূতের বাংলা অনুবাদের বই—পার্শ্বে রক্ষিত অপর চেয়ারখানা খালি পড়িয়া আছে। অনুকূল হাসিয়া ডাকিল, "কি রে, মুখটা অত বিরস কেন? হাতে মূর্ত্তিমতী বিরহ নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছিস; পার্শ্বসঙ্গিনী তোকে ফেলে গেলেন কোথা?"

সুরেশ বইখানা মুড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। বলিল, "আয় আয় তুই-ই না হয় বসবি আয় পাশে—আমার যেমন কপাল! পার্শ্বসঙ্গিনী আর যাবেন কোথা? যেখানে তাঁর স্থান—অর্থাৎ রান্নাঘরে।"

অনুকূল হাসিয়া বলিল, "সে গানটা শুনেছিস? সেই যে বর্ষাসন্ধ্যায় কৃষ্ণ রাধিকার জন্যে দোলনায় ব'সে কুঞ্জবনে অপেক্ষা করছেন—এদিকে শ্রীরাধা গৃহ কাজে বাঁধা, আসতে পাচ্ছেন না। বনমালীর কালো মুখ নিরাশার অন্ধকারে আরও কালো হয়ে গেছে—'ব্যাকুলিত বনমালী কালো মুখে লাগে কালি'—সেই যে রে, মনে নেই? ছন্দটন্দ সব যে আমার মনে থাকে না ছাই, তাই সবটা বলতে প'রছি নে।—তোকে দেখে মনে পড়ল গানটা, তাই বললুম।"

সুরেশ বলিল, "কৃষ্ণের অবস্থার সঙ্গে কতকটা মিলেছে বটে আমার, কিন্তু ভাই রাধা যে মেলে না। এ রাধার তো এখানে আসতে আটক নেই, ইচ্ছে ক'রেই গৃহকাজে বেঁধেছেন নিজেকে। কৃষ্ণের সান্নিধ্যের চেয়ে রান্নাঘরটাই এঁর যে বেশী পছন্দ।"

অনুকূল আসিয়া খালি চেয়ারটাতে বসিল। বলিল, "সুসংবাদ। বৌদিকে জানিয়ে আসি যে আমিও এসেছি

এবং প্রতীক্ষা ক'রে আছি, বর্ষার সন্ধ্যা যেন মিথ্যা না যায়। অবিশ্যি আমি কেবল এই চিঁড়েভাজা বা ঐ জাতীয় কিছু জিনিষের প্রত্যাশী—তুই আবার ভুল বুঝিস নে। তোর ও মেঘদূতের চেয়ে হাতে একখানা চিঁড়েভাজার থালা পেলে আমি খুশী হব বেশী। সত্যি কি করিস রাতদিন বই হাতে নিয়ে? ঐ কবিতার ঘ্যানঘ্যানানি রাতদিন ভাল লাগে?"

সুরেশ বইখানা খুলিয়া বলিল, "বলিস কি রে অনুকূল? এ-সব কবিতা সম্বন্ধে অমন ক'রে কথা বলিস নে—শুনলেও কষ্ট হয়। শুনবি একটা জায়গা, পড়ব? আহা—শোন্ একবার।"

অনুকূল হাতজোড় করিয়া বলিল, "রক্ষে কর দাদা। তুমি যদি কবিতা সুরু কর ত আমি এখনি রান্নাঘরে বৌদির কাছে পালাব। বাড়ীতে অহোরাত্র কবিতার বই দেখে দেখে এই এক মাসেই আমার চক্ষু ক্ষয়ে গেছে ভাই—এখানে দু-দণ্ড এসেও আবার সেই উপদ্রব আর|সত্যি বলছি সহ্য হবে না।"

সুরেশ ক্ষুণ্ণমনে বই বন্ধ করিল। বলিল, "জীবনে ভাল জিনিষ উপভোগ করতে শিখলি নে? এই মেঘদূতের বাংলা অনুবাদখানা আগে পড়ি নি—এই আনিয়েছি। আজ বর্ষার সন্ধ্যায় এটা পড়তে পড়তে এতই ভাল লাগল যে অপর্ণাকে ধরে এনেছিলাম শোনাব ব'লে। এক পাতা শুনতে-না-শুনতে উঠে গেল—বললে বর্ষার সন্ধ্যে নাকি কিছু না খেলে জমে না; তাই মাছের কচুরি ভাজতে গেল। মেঘদূত পড়ার চেয়ে মাছের কচুরি ভাজা যে বেশী পছন্দ করে—তাকে আর কি বলব বল্?"

অনুকূল বলিল, "দেখ্ সুরেশ, অত কবিত্ব করিস নে—বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেঘদূত পড়া একটা ভাল জিনিষ হ'তে পারে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে মাছের কচুরি ভাজা যে তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল জিনিষ তা আমি এক-শ বার বলব। আরে বাবা—খাটলাম খুটলাম, কাজকর্ম্ম করলাম—বাড়ী এসে গিন্নির হাতের রান্না পেট ভ'রে খেলাম—কবিতা যদি একান্তই পড়তে হয় ত সে তার পরে। কাজেই বোঝ্ প্রাত্যহিক জীবনে কবিতার স্থানটা কত পরে। দিনরাত তোর মত কবিতার বই হাতে ক'রে ব'সে থাকলেই সংসার আপনি চলবে কি না?"

সুরেশ প্রতিবাদে বোধ করি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রেকাবি-হাতে অপর্ণাকে এই সময়ে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া অনুকূল চেয়ার ছাড়িয়া কলকোলাহলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল—সুরেশ কিছু বলিবার সুযোগ পাইল না।

"আসুন আসুন বৌদি। খবর পেয়েছি আপনি রান্নাঘরে গেছেন—জানি খালিহাতে কখনও অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হবে না—তাই আশা ক'রে ব'সে আছি। এই সুরেশ, হাঁ ক'রে ব'সে রইলি কেন? ওঠ না, আর একটা চেয়ার টেনে আন বারাণ্ডা থেকে।...দিন বৌদি আমার ভাগ কোন্‌টে।"

অপর্ণার চুল বাঁধা হয় নাই—বস্ত্রে রন্ধনগৃহের সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান। হলুদমাখা মলিন হাতে একখানি রেকাবি অনুকূলের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি রান্নাঘর থেকে আপনার গলা শুনেছি। বসুন, খান।...ওগো, ধর না রেকাবিখানা; খাও তোমরা দু-জনে। আমি ততক্ষণ কাজ সেরে আসি। না না, চেয়ারে কাজ নেই, আমি ত এখন বসতে পারব না।"

অনুকূল খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কচুরি মুখে দিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখরিত হইয়া বলিল, "সত্যি বৌদি, আপনার হাতের মত রান্না আমি কখনও খাই নি। কি করেন বলুন ত? ইন্দুকে দিন না একটু শিখিয়ে। আপনার কাছে রোজ রোজ খাবার চাইতে এলে বাঁদর সুরেশটা আবার কোন্ দিন কি বলবে।"

সুরেশ নীরবে খাইতেছিল। এখন বলিল, "আসিস না রোজ—রোজ কেন দু-বেলাই আসিস না, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

অপর্ণা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল; থামিয়া বলিল, "আমার কাছে রোজ রোজ আসতে হবেই বা কেন? ইন্দু কি আর এই সামান্য কচুরি ভেজে আপনাকে খাওয়াতে পারবে না, আপনি যদি চান?"

অনুকূল খাইতে খাইতে বলিল, "বেচারীকে দোষ দেব না বৌদি; কাল সত্যিই রেঁধে খাইয়েছিল। সেদিন আপনার কাছে যে ঘুগ্‌নি খেয়ে গিয়েছিলাম আমরা দু-জনেই, কাল তাই বলেছিলাম সেই রকম করতে। বেচারী কষ্ট ক'রে করেছিল—কিন্তু এত হলুদ না কি মসলার গন্ধ যে পাতে নিয়ে মহা মুস্কিল। ফেলে ত দিতে পারি নে—কষ্ট হবে ওর মনে। মনে ভাবলাম ওরও সাজা, আমারও সাজা—আর কখনও বলব না।"

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ—ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনা নিয়েই কাটিয়েছে—সব দিক শেখবার সময় কোথা পাবে বলুন? আর যা বিদ্যে ওর আছে তা আমার এ কচুরি-বিদ্যের চেয়ে ঢের ভাল। আমি ত ওর এক কণা পেলে বেঁচে যেতুম। আপনার বন্ধু ত দিনে পাঁচ বার নালিশ করেন যে আমি ছোটবেলায় রান্না না শিখে কেন লেখাপড়া শিখি নি। কি করব বলুন—যার যেমন ভাগ্য।"

অপর্ণা চলিয়া গেলে অনুকূল মুখের গ্রাস নামাইয়া রাগ করিয়া বলিল, "বৌদিকে তুমি লেখাপড়ায় খোঁটা দাও রাস্কেল? এমন দ্রৌপদীর মত হাতের রান্না—তোর

লক্ষ্মীছাড়া সংসারে লক্ষ্মীশ্রী এনেছেন উনি, তা বোঝবার ক্ষমতা নেই—যেটা বেচারী জানেন না সেইটে নিয়ে খোঁটা দিচ্ছ আর নিজে কাব্য করছ ব'সে? বি-এ পাস ক'রে নিজে ত একটি আস্ত গাধা হয়েছ; আমিও গাধার চেয়ে যে কোনও অংশেই বড় হই নি তা ত নিজের চোখেই দেখছিস—তবু তোর লেখাপড়ার মোহ কাটল না?"

সুরেশ নীরবে খাইতে লাগিল, উত্তর দিল না এবং পুনর্ব্বার কচুরি মুখে তুলিয়া অনুকূলের রাগও বোধ করি পড়িয়া গেল, কেন-না ইহার পর সেও তর্ক ভুলিয়া বিনা-বাক্যে কচুরির থালা নিঃশেষ করিতে মন দিল।

দুই বন্ধুতে খাওয়া শেষ করিলে অনুকূল রেকাবিখানা চেয়ারের নীচে নামাইয়া হাত ধুইল। রুমালে মুখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খুব খাওয়া হ'ল। যাই, বাড়ী যাই—ইন্দু একলাটি আছে।"

সুরেশ বলিল, "একলা রেখে এলি কেন? দু-জনে এলেই পারতিস।"

অনুকূল হাসিয়া বলিল, "আরে দাদা দুঃখের কথা বল কেন? ওখানেও যে মেঘদূত! ঐ তোমার হাতে যে রকম একখানা বই ছিল ঐ রকম একখানা যে শ্বশুর-মশাই ওখানে ইন্দুকে আজ পাঠিয়েছেন কি না—ডাকে এল আজ দেখলাম—আর ইন্দু তাই নিয়ে একেবারে ডুবে গেছে। আমাকে ধরেছিল—বলেছিল পড়ে শোনাতে। চক্ষু চড়কগাছ আর কি! এই একটু ঘুরে আসছি ব'লে পালিয়ে এসে বৌদির শরণ নিয়েছিলাম। যাক্‌, এখন পেট ভরেছে—এবারে যাই, দেখি দু-একটা কবিতা হয়ত সইতেও পারে।"

সুরেশ হাসিল। বলিল, "তোমার কপালে ঠিক বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার হয়েছে আর কি। একেবারে বাঁদর তুই অনু—মুক্তো চিনলি নে?"

অনুকূল যাইতে যাইতে বলিল, "কি ক'রে চিনব দাদা? দেখি নি যে কখনও। তবে ভয় নেই, এবার মনে হচ্ছে চিনব বোধ হয় ক্রমে ক্রমে। বাড়ীর পাশে তুমি, ঘরের মধ্যে ইন্দু—এমন দুই মূর্ত্তিমান কবিতার দিবারাত্রির সংসর্গেও যদি একদিন দ্বিতীয় রবি ঠাকুর না বনে যেতে পারি ত ধিক্‌ আমাকে।"

অনুকূল চলিয়া যাইবার পরেই ঝম-ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল। সুরেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বইখানা ও চেয়ারগুলা টানিয়া লইয়া বারান্দায় উঠিল ও একখানা চেয়ার টানিয়া আলোর নিকটে গিয়া পড়িতে বসিয়া একটু পরেই একবারে বইয়ের ভিতর যেন ডুবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অপর্ণা যখন সুরেশকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিল সে তখন সুর করিয়া কবিতা পড়িতেছে; অপর্ণাকে দেখিতে পাইল না। অপর্ণা সুরেশের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে কিছুক্ষণ শুনিল—কিছু বুঝিয়া কিছু না-বুঝিয়া তাহার মন যেন কি এক অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে স্বামীর মাথায় হাত দিয়া ডাকিল, "খাবে না? রাত হ'ল যে!"

সুরেশ চমকাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। "তুমি কখন এলে? দেখতে পাই নি তো। এস—বসবে?"

অপর্ণা বলিল, "রাত হয়েছে অনেক—খাবে চল। এখন কি আর বসে?"

সুরেশ মুখ নামাইয়া আবার বইয়ের পাতায় মন দিয়া বলিল, "আবার খাব? আমি কি একটা রাক্ষস নাকি? এই তো কতকগুলো কচুরি খেলাম খানিক আগে, আবার কি খাওয়া যায়?"

অপর্ণা ক্ষুণ্ণ হইল, ম্লান মুখে বলিল, "ওমা কত ক'রে খিচুড়ী রাঁধলাম তুমি খাবে ব'লে, তা মুখে দেবে না? ঐ ক'টি কচুরি খেয়েই পেট ভ'রে গেল?"

সুরেশ উত্তর দিল, "পেটটা তোমার কল্যাণে প্রায় ভরাই থাকে অপর্ণা—মনটা ভরাই মুস্কিল।"

সুরেশ আবার পড়িতে আরম্ভ করিল—অপর্ণা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল।

সেই একই সময়ে অনুকূলের বাটীতে ইন্দু বলিতেছিল, "তুমি যে সেই সন্ধ্যেবেলা 'এখনি আসছি' ব'লে চলে গেলে, তার পর আর এলে না তো। আমি ভেবেছিলাম দু-জনে আজ একসঙ্গে নতুন বইখানা পড়ব। আমি বরাবর বাবার সঙ্গে পড়েছি কিনা সব বই—তাই একলা কিছু পড়তে আমার ভাল লাগে না। তা তুমি আজ কত দেরি ক'রে এলে বল তো? কখন আর পড়া হবে? রাত তো কম হয় নি।"

অনুকূল উষ্মার সহিত উত্তর দিল, "দেরি ক'রে আসব কেন? সুরেশদের বাড়ী গিয়েছিলাম—বৌদি খাওয়ালে—খেয়েই তো চ'লে এলাম তাড়া ক'রে। কিন্তু এসে দেখলাম, না এলেও ক্ষতি ছিল না। তুমি তো বই নিয়ে এমন বসেছিলে যে কখন যে আমি এলাম, দেখলেও না চেয়ে। এখনও বোধ হয় দেখতে না যদি আমি না ডাকতাম।"

ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বড় বড় চোখ তুলিয়া বিস্ময়ে বলিল, "কখ্‌খনো না। আমি এমন পড়ছিলাম যে তুমি ঘরে এসেছ আর আমি টেরই পাই নি?"

অনুকূল বলিল, "পাওই নি তো। কি এত পড় ইন্দু রাতদিন? আমার একটুও ভাল লাগে না।"

স্বামীর কঠিন স্বরে ইন্দু আহতা হইল। ধীরে ধীরে

বলিল, "রাতদিন পড়ি না তো। আজ বাবা নতুন একখান বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাই। তা তুমি এসে আমাকে ডাকলে না কেন? আমরা তো দু-জনে পড়তে পারতাম—আমি তো তাই ভেবেও ছিলাম।"

অনুকূল রাগিয়াই ছিল। বলিল, "কবিতা-টবিতা অত আমার ভাল লাগে না। সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে অ আ ক খ সুরু করেছিলাম, আর কুড়ি বছর বয়েস অবধি তো রাতদিন বইপড়ার অত্যাচারে জীবনে আর সুখ ছিল না। এখন এই মাত্র কিছুদিন হ'ল পড়ার হাত থেকে সবে রেহাই পেয়েছি। এখন তুমি এসেছ, তুমি কোথায় ঘরসংসার করবে, আমরা দু-জনে গল্পস্বল্প করব, আরাম করব—তা না, এখনও সেই বই আর বই! আমার তো দেখলে বিরক্ত লাগে!"

ইন্দু মুখখানি নত করিয়া চুপ করিয়া অপরাধিনীর মত বসিয়া ছিল—বসিয়াই রহিল। জবাব দিবার চেষ্টামাত্র করিল না।

অনুকূল ঘরে পায়চারি করিতে করিতে আবার বলিল, "তোমারও কি ইচ্ছে করে না ইন্দু? সুরেশের স্ত্রী দেখ তো কি রকম সংসার করছে। ওরও তো এই সেদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে, কিন্তু যেমন রান্নাবান্নায়, তেমনি ঘরদোর গোছানয়—সুরেশদের সংসার দেখ, আর এ বাড়ীটি দেখ! সেদিন ওদের দুটি খেতে বলেছিলাম—তা শেষে খেতে বসিয়ে লজ্জায় মারা যাই আর কি! এখন তোমার সংসার হয়েছে, সেটা দেখাও তো একটা কর্ত্তব্য—এখন রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে কেবল বই নিয়ে ব'সে থাকাটাই কি ভাল? লেখাপড়া তো এত শিখেছ—কিন্তু এটুকু বোঝ না কেন?"

অনুকূল অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা সে রাত্রে আর থামিল না। নিদ্রাহীন শয্যায় পাশাপাশি দুইটি বাড়ীতে দুই স্বামী ও দুই স্ত্রী নিজ নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিল।

যাত্রী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সংশয়ের অন্ধকারে লুপ্ত ছিল সুদুর্গম পথ
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-ধার সম, সে পথে তোমার যাত্রা সুরু;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, পুরোগামী হে পুরোধা গুরু
অজানার অভিযানে চালাইলে শঙ্কাহীন রথ।

আলোকের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল তমিস্র-জঠরে;
গতিহীন মহাশূন্যে মৃত্যু-নীল, অমৃতের লাগি;
আঁধারে আবেগ জাগে, ঈথারে তরঙ্গ উঠে জাগি;
স্বয়ম্-প্রকাশ ঊষা উদ্ভাসিত উদয় শিখরে।

"এক প্রাণ নিত্য কাল স্পন্দমান জড় ও চেতনে"
শিহরি শুনিল সবে; মৃতদেহ ফিরে পেল প্রাণ;
কণ্ঠেতে ফুটিল বাণী; স্থির চক্ষে পড়িল নিমেষ।
মৃত্যুহীন সেই প্রাণ; সে যাত্রা হয় নি আজও শেষ;
আবর্ত্তিত গতিবেগে জীবনপ্রবাহ জ্যোতিষ্মান্
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে সঞ্চারিল ভুবনে ভুবনে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

তরাইয়ের তরুণী

[শ্রীযুক্তা ডক্টর সেলমা লাগেরলভের মূল সুইডিশ উপন্যাস হইতে তাঁহার অনুমতি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত]

শ্রীসেলমা লাগেরলভ ও শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

৩

গুডমুণ্ড সোজাসুজি আদালতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মন আনন্দে ভরপুর, হেল্‌গার কথা সে আর মোটেই ভাবিতেছিল না। বাড়ীতে ঠিক প্রথমেই হিলডুরের সঙ্গে যে তাহার দেখা হইয়াছে এবং হিলডুরও যে তাহার সুন্দর ঘোড়া ও চক্‌চকে নতুন গাড়ী লক্ষ্য করিয়াছে, এই জন্য তাহার বিশেষ আনন্দবোধ হইতেছিল।

আদালতে বিচার দেখা গুডমুণ্ডের জীবনে এই প্রথম। সে ভাবিয়াছিল যে, আদালতে অনেক কিছু শুনিবার ও জানিবার আছে—সারাটা দুপুর সে সেখানেই কাটাইয়াছে। হেলগার মামলার বিচারের সময় সে সেখানে উপস্থিত ছিল। কি ভাবে হেল্‌গা বাইবেল টানিয়াছে এবং আদালতের চাপরাশী ও বিচারকের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছে—সমস্তই সে দেখিয়াছে। মোকদ্দমা শেষ হওয়ার পর বিচারক হেল্‌গার করমর্দ্দন করিতেছেন দেখিয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তার পর সে তাড়াতাড়ি করিয়া ঘোড়া দুইটিকে গাড়ীতে জুড়িয়া আদালতের দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। আদালতে হেলগার আচরণ তাহার কাছে খুবই নির্ভীক বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং সেজন্য সে তাহাকে সম্মান দেখাইতে চায়। কিন্তু তরুণী এত ভয়াতুর যে, গুডমুণ্ডের উদ্দেশ্য সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই এবং গুডমুণ্ড তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিল, তাহা হইতে সে নিজকে বঞ্চিত করিয়া রাখিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গুডমুণ্ড চোরাবালির কৃষিক্ষেত্র-বাটিকায় গিয়াছিল। উক্ত পরগণার চারি দিকে কেবল পাহাড় ও বন; উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাইন-বনের মধ্যে চোরাবালির কৃষিক্ষেত্র-বাটিকা অবস্থিত। শীতকালে বরফ পড়িয়া রাস্তাঘাট ঢাকা পড়িয়া গেলেই শুধু এখানে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাওয়া চলে। সেজন্য আজ গুডমুণ্ডকে সেখানে হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু পথ-ঘাট এত জঙ্গলাকীর্ণ ও পাথুরে যে, হাঁটিয়া যাওয়া বেশ শক্ত কাজ। পথে কয়েক বারই সে বড় বড় পাথরে এমন হোঁচট খাইয়াছে যে, তাহার পা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম। এখানে-সেখানে আবার ছোট ছোট পাহাড়ী নদী পার হইয়া যাইতে হয়। সেদিন পরিষ্কার চাঁদের আলো না থাকিলে এরূপ পথ হাঁটিয়া ঐ কৃষিক্ষেত্র-বাটিকায় পৌঁছা অসম্ভব হইত। অনেক বারই চলিতে চলিতে তাহার মনে হইয়াছে যে এই পথ বাহিয়াই ত হেলগাকে আজ যাওয়া-আসা করিতে হইয়াছে।

ঐ পাহাড়ের গায়ে উচ্চভূমির মাঝখানে চোরাবালির কৃষিক্ষেত্র-বাটিকাটি অবস্থিত। পূর্ব্বে সে কখনও সেখানে যায় নাই কিন্তু সময় সময় নিজের কৃষিক্ষেত্র-বাটিকা হইতে এই স্থানটা লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া তাহা এত ভাল করিয়া তাহার জানা ছিল যে, পথভুল হওয়াটা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

চোরাবালির কৃষিক্ষেত্রের চারি দিকে দীর্ঘ বৃক্ষশাখার বেড়া, ডিঙাইয়া যাওয়া বেশ শক্ত কাজ। চারি দিকের মরুভূমির মত পাথুরে জমি হইতে কৃষিক্ষেত্রটাকে রক্ষা করিবার জন্য যেন বেড়াটাকে অতিরিক্ত উঁচু করা হইয়াছে। তাহার উপরে ঢালু জায়গায় ছোট বাড়ীটি। ঘরের সামনের ঢালু উঠানটি সবুজ ঘাসে ভরা, ইহার নীচে

এক কোণায় ছোট ছোট কয়টি জীর্ণ এক-চালা ঘর—সেগুলিতে কৃষিকাজ-সংক্রান্ত জিনিষপত্র রাখা হয়। পাশে গোলাঘর। ইহার চালের রং সবুজ। কৃষিক্ষেত্রটি খুবই ছোট হইলেও ইহা যে আদর্শ স্থানে অবস্থিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার এক পাশে জলপূর্ণ চোরাভূমি এবং সেই জন্যই হয়ত স্থানটির চোরাবালি নাম হইয়াছে। জলাভূমি হইতে কুয়াশা উঠিতেছে, সেই কুয়াশার উপর চাঁদের আলো রূপার মত ঝলমল করিতেছে। পাহাড়ের পাদদেশের কৃষিক্ষেত্র, ঘরবাড়ীগুলি এবং সাপের মত আঁকাবাঁকা সরু নদীটি চাঁদের আলোতে বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। নদীর জলস্রোতের উপর কুয়াশা যেন পাতলা ধোঁয়ার মত গড়াইয়া চলিয়াছে। এখান হইতে পাহাড়ের নিম্নদেশ খুব দূরে নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নীচের ঘরবাড়ীগুলি যেন কোন অচেনা রাজ্যের বলিয়া মনে হইতেছিল, যেন পাহাড়ী গাছপালা ঐ অচেনা দেশে জন্মায় না, জন্মিলেও বাঁচে না। আবার পাহাড়ের বাসিন্দারাও যেন চিরকালের মত বনাঞ্চলেই বাস করিতে ভালবাসে। মনে হয়, পাহাড়ের উপরের বাসিন্দাদের পক্ষে নিম্নভূমিতে বাস করাটা পাহাড়ের গাছপালা ফলফুল অপেক্ষা বেশী ভাল লাগার কথা নয়।

গুডমুণ্ড বৃক্ষলতাহীন সবুজ তৃণভূমি পার হইয়া ছোট ঘরটির দিকে অগ্রসর হইল। জানালায় কোন পর্দা নাই, জানালার কাচের মধ্য দিয়া ঘরের ভিতরের চিমনীর আগুন বেশ ভাল করিয়াই দেখা যায়। হেল্‌গা ঘরের ভিতর আছে কি না তাহা সে বাহির হইতে দেখিতে চেষ্টা করিল। জানালার পাশে টেবিলের উপর একটি বাতি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে—পাশে গৃহকর্ত্তা বসিয়া জুতা মেরামত করিতেছেন। অদূরে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী চিমনীর ধারে বসিয়া। চিমনীতে আগুন বেশ জ্বলিতেছে। বৃদ্ধার হাতের কাছে একটি চরকা, কিন্তু তিনি সুতাকাটা বন্ধ করিয়া পাশের শিশুটিকে দোল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দোলনায় দোল দিতে দিতে আকার-ইঙ্গিতে তিনি যে শিশুটির সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহাও গুডমুণ্ডের কানে পৌঁছিল। গৃহকর্ত্রীর মুখের উপর বয়সের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিলে শুষ্ক কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শিশুকে দোল দিতে দিতে বৃদ্ধার মুখে যে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, যে অসীম স্নেহের আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহাতে মনে হয় যেন তিনি নিজেই শিশুটির মা।

গুডমুণ্ড হেল্‌গাকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর কোথাও তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। অবশেষে সে স্থির করিল, বাহিরে দাঁড়াইয়া হেল্‌গার জন্য অপেক্ষা করিবে। হেল্‌গা যে এখনও বাড়ী ফেরে নাই তাহা তার নিকট খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হইল। তাহা হইলে কি সে ফিরিবার পথে বিশ্রাম বা আহারের জন্য কোন বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছে? কিন্তু সে যদি আপন ঘরে রাত কাটাইতে চায়, তাহা হইলে যে শীঘ্রই তাহাকে ঘরে ফিরিতে হইবে।

গুডমুণ্ড কান পাতিয়া উঠানের মাঝখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু কাহারও পায়ের শব্দ কানে আসিল না—চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা! এমন কি বাতাসের গতি পর্য্যন্ত বুঝা যায় না। তাহার মনে হইল এমন গভীর নীরবতা সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই; যেন শান্ত বনরাজি শ্বাস বন্ধ করিয়া কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

পাহাড়ী বনের পথে এখনও কেহই চলে নাই। গাছের পাতা পর্য্যন্ত নিশ্চল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে সঞ্চরমান কোন পথিকের পায়ে লাগিয়া পাথরের নুড়ি পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায় নাই। গুডমুণ্ডের চিন্তা হইল—"আমার জানিতে ইচ্ছা করে, হেল্‌গা এখানে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে কি মনে করিবে! সে হয়ত ভয়ে চীৎকার করিয়া বনে ঢুকিবে, সারা রাত্রি আর বাড়ী ফিরিতে সাহস করিবে না।"

আবার তাহার মনে হইল, কেনই বা সে অকস্মাৎ এই পাহাড়ী তরুণীর ব্যাপার লইয়া এত মাথা ঘামাইতেছে।

দুপুরবেলা গুডমুণ্ড আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া অন্যান্য সকল দিনের মত সোজাসুজি মায়ের নিকট গিয়া, সারাদিন কি দেখিয়াছে না-দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়াছে। গুডমুণ্ডের মা গুণবতী বিদুষী মহিলা, তাঁহার মনটা খুব উদার। তিনি ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেন, যার ফলে গুডমুণ্ড ছোট শিশুর মত এখনও মাকে

বিশ্বাস করে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাতে অসুস্থ, পা পর্য্যন্ত নড়াইতে পারিতেন না। সেজন্য তাঁহাকে চেয়ারে বসিয়াই ঘরে দিন কাটাইতে হয়। গুডমুণ্ড বাহিরের নানা সংবাদ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যখন মার কাছে গিয়া বসিত, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হইতেন।

গুডমুণ্ড চোরাবালির তরুণী হেল্‌গার কথা শেষ করার পর দেখিল যে, তাঁহার মা বিশেষ চিন্তান্বিত। নিষ্পলক নেত্রে সামনের দিকে তাকাইয়া তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর হঠাৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তবু মনে হয় এই মেয়ের মধ্যে অনেক বড় গুণ আছে; এক দিনের ভুলের জন্য এক জন সারা জীবন দুঃখ পাইবে, সে কি উচিত? মনে হয়, এ সময়ে যদি কেহ তাহাকে সাহায্য করে তবে তাহার বড়ই উপকার হইবে।"

গুডমুণ্ড কথাটা শুনিয়াই বুঝিল যে তার মা কি ভাবিতেছেন। তিনি মোটেই নড়াচড়া করিতে পারেন না, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সব সময়েই কাহারও তাঁহার নিকট থাকা দরকার। কিন্তু প্রয়োজন মত নিজের নিকট কাহাকেও রাখা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই—নিজের ইচ্ছামত সব জিনিষ তিনি হাতের কাছে পান না এবং বাড়ীর লোকের পক্ষেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কঠিন। তা ছাড়া বাড়ীর চাকরাণীরা অন্য কাজে বিশ্রাম করার সময় বেশী পাওয়া যায় বলিয়া এই কাজ অপেক্ষা অন্য কাজই বেশী পছন্দ করে। তাঁহার মা নিশ্চয়ই চোরাবালির হেল্‌গাকে নিজের কাছে রাখিবার কথাই এখন ভাবিতেছেন। এই প্রস্তাবটা তাঁহার নিকট অতি চমৎকার বলিয়া মনে হইল। হেল্‌গা নিশ্চয়ই অতি যত্নসহকারে তার মার সেবা করিবে! অনেক দিনের জন্য বাড়ীর লোককে আর ভাল চাকরাণীর ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

কিছুক্ষণ পর তাহার মা আবার বলিলেন, "শিশুটির কি ব্যবস্থা হইবে বুঝা কঠিন।" গুডমুণ্ড বুঝিল যে তাহার মা এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবিতেছেন। সে উত্তর দিল, "ওর ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা ত ঘরেই আছেন তাঁরাই শিশুর যত্ন করিবেন, নয় কি? শিশুর সঙ্গে শিশুর মার সম্পর্ক থাকিবে না সত্য, কিন্তু হেল্‌গা আর নিজের ইচ্ছামত না চলে সেটাও বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় যে সে নিয়মমত খাবারও পায় না—ওদের বাড়ীতে কেহই বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় না।"

এ কথার উত্তরে তাহার মা আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন। বিষয়টি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ যে তাঁহার সিদ্ধান্তের পথে দাঁড়াইয়াছে, সেটা স্পষ্ট বুঝা গেল।

এইবার গুডমুণ্ড তাহার মাকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে কিসের ছুতা করিয়া সে এলবোক্রার বড় বাড়ীতে গিয়াছিল। সেখানে সে হিলডুরের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। নিজের ঘোড়া ও গাড়ী সম্বন্ধে হিলডুর কি বলিয়াছে, সে কথাটাও সে মাকে বলিতে ছাড়িল না আর তাহাতে সে যে খুবই আনন্দিত সে ভাবটাও তাহার মুখের উপর প্রকাশ পাইল। তাহার মা ইহাতে খুব সুখী হইলেন। ঘরে বসিয়া সর্ব্বদাই তিনি নিজের ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেন—ইতিপূর্ব্বেই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এলবোক্রার বড় গৃহস্থের সুন্দরী মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া আনার চেষ্টা করা হোক্। এলবোক্রার ঐ পরিবারের লোকদের খুব সম্মান। সেই গ্রামে তাহাদের জমিজমাই সকলের চেয়ে বেশী আর বাড়ীর কর্ত্তা বেশ ক্ষমতাবান্ ও ধনী। কিন্তু তিনি শুধু গুডমুণ্ডের মত জামাতা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন এরূপ আশা করা প্রায় কঠিন, কারণ গুডমুণ্ড তেমন ধনী নহে। কিন্তু ইহাও খুবই সম্ভব যে মেয়েটি গুডমুণ্ডকে পাইয়া খুব সুখী হইবে। গুডমুণ্ড যে ইচ্ছা করিলেই হিলডুরকে নিজের ঘরে আনিতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাহার মা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন।

আজ প্রথম গুডমুণ্ড তাহার মাকে বুঝিতে দিল যে, সে হিলডুরের কথা ভাবে। সে হিলডুরকে বিবাহ করিলে যে মেয়ের বাবার ধনসম্পত্তি দানস্বরূপ পাইতে পারে সে পর্য্যন্তও আলোচনা গড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার মা অন্য কথা আরম্ভ করায় বিবাহের আলোচনা শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। তিনি আবার বলিলেন, "তুমি কি হেল্‌গাকে এখানে আনাইতে পার? আমি তাকে কাজে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে একবার দেখিতে চাই।" উত্তরে গুডমুণ্ড বলিল, "মা, তুমি তার যত্ন করিতে চাও, এ অতি ভাল কথা।" গুডমুণ্ড ভাবিয়াছে যে হেল্‌গার মত চাকরাণীর সেবায় তাহার মা আরও সুখে থাকিবেন এবং সে নিজে

বিবাহ করিলে তাহার স্ত্রীও বাড়ীতে অধিকতর সুখে থাকিবে।—পরে সে বলিল, "তুমি দেখিবে, মেয়েটি সত্যই বড় পছন্দসই।" ইহার উত্তরে মা বলিলেন, "ওর যত্ন করাও ত ভাল কাজ।"

অসুস্থতাবশতঃ গুডমুণ্ডের মা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যার আশ্রয় লইলেন। সে নিজে ঘোড়াগুলির তদারক করিবার জন্য আস্তাবলে গেল। আকাশ বেশ পরিষ্কার, মৃদু বাতাস বহিতেছে, চাঁদের আলোয় চারি দিক উজ্জ্বল। সে ভাবিল যে, আজ সন্ধ্যায়ই মার জন্য খবরটা আনিতে চোরাবালিতে গেলে ভাল হয়। কারণ, পরের দিন বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতের ফসল বাড়ীতে আনাইবার জন্য এত কাজ পড়িবে যে, নিজের বা বাড়ীর আর কাহারও পক্ষে চোরাবালিতে যাওয়া সম্ভব হইবে না।

* * *

এখন সে চোরাবালির খামার-ঘরের আঙিনায় দাঁড়াইয়া হেল্গার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; মাঝে মাঝে অতিক্ষীণ কয়েকটি শব্দ হইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়াও গেল, কিন্তু কাহারও পায়ের শব্দ নাই। শব্দগুলি যেন কাহারও দুঃখের অতি অস্পষ্ট অভিযোগ,—কেহ যেন রান্না চাপাইয়া অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে! সেই শব্দ একই কণ্ঠ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে দেখিয়া গুডমুণ্ড সেদিকে অগ্রসর হইল। ঘরের নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্রই যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দটা থামিয়া গেল কিন্তু কেহ যে ঘরের মধ্যে জ্বালানী কাঠের স্তূপের উপর নড়াচড়া করিতেছে, সেটা বেশ স্পষ্ট। ঘরের মধ্যে মানুষটি যে কে গুডমুণ্ড নিঃসন্দেহে তাহা অনুমান করিল।—"হেল্গা, তুমি বুঝি এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ?"—বলিয়াই সে দরজাটা আগলাইয়া দাঁড়াইল, পাছে তরুণী তাহার সঙ্গে কথা না বলিয়াই পলাইয়া যায়।

আবার নিস্তব্ধতা! হেল্গা বসিয়া কাঁদিতেছে—গুডমুণ্ডের এই অনুমান সত্য। তরুণী ইতিমধ্যে কান্না থামাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিল যেন গুডমুণ্ড মনে করে যে সে ভুল শুনিয়াছে। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, তাই হেল্গাকে দেখা গেল না।

হেল্গা সেদিন কূলকিনারাহীন নিরাশার সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। কান্না থামান তাহার পক্ষে সহজ নয়। সে এখন পর্য্যন্ত ঘরে গিয়া বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে নাই। কঠিন পাহাড়ে পথ বাহিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার মনে হইয়াছে যে, এইবার ঘরে গেলেই সমস্ত কথা বাবা-মাকে বলিতে হইবে, যেমন প্যের মোরটেনসনের কাছ হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। সেজন্য তাহার বাবা-মা হয়ত এমন ব্যবহার করিবেন যাহার ভয়ে সে ঘরে ঢুকিতে সাহস করে নাই। সে মনে করিয়াছে যে ঘরের লোকেরা না-ঘুমান পর্য্যন্ত বাহিরেই কাটাইবে; কারণ তাহা হইলে শুধু পরদিন সকালবেলা নিজের দুঃখের কাহিনী তাহাদিগকে বলিতে হইবে। এই কথা ভাবিয়া সে এক-চালার জ্বালানী কাঠের স্তূপে আশ্রয় লইয়াছিল। সারাদিন সেখানে বসিয়া সে ক্ষুধায় ও শীতের জ্বালায় ভুগিতেছিল; তাহার দুঃখ ও অপমানের আর অবধি নাই। সকল প্রকারের লজ্জা ও অপমান তাহাকে অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে—সারাটা জীবন যে আরও কত বেশী দুঃখ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে সেই সব কথা ভাবিয়া আর শেষ করিতে পারিতেছিল না। চরম নিরাশার দুঃখ তাহার ক্লান্ত মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। সমাজে তাহার স্থান এত নীচে যে, কেহই তাহাকে দেখিতেও চায় না। এই সব ভাবিয়া সে কাঁদিতেছিল। হঠাৎ ছোটবেলার একটা ঘটনা তাহার মনে পড়িল,—সে একবার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী চোরাবালিতে আট্‌কা পড়িয়াছিল, যতই সে উপরে উঠিতে চেষ্টা করে ততই সে শুধু ডুবিয়াই যায়। গাছের ডালপালা যা সে তখন সম্মুখে পাইয়া ধরিয়া বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করে সবই তাহার সঙ্গে ডুবিয়া যায়। এখনও তাহার অবস্থা ঠিক ঐরূপ! বাঁচিবার জন্য যাহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল, সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে! কেহই যে তাহাকে আশ্রয় দিতে চায় না। সেবার চোরাবালিতে ডুবিবার সময় এক গোপালক রাখাল তাহাকে টানিয়া বাঁচাইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? তাহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে, এইবার কেবল মৃত্যুই তাহাকে এই হীন অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পারে।

চোরাবালির কথায় তাহার মনে হইল, এখন তাহার মরিয়া বাঁচিবার একটা পথ আছে। তাহার পক্ষে চোরাবালিতে ঝাঁপ দেওয়াই যে ভাল! চোরাবালি আপনা হইতেই তাহাকে অতলে টানিয়া সমাধি দিবে! এ সংসারে যে সকলেরই ঘৃণার পাত্র তাহার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরা যে অনেক ভাল। আর সে মরিলে তাহার শিশুর পক্ষেও মঙ্গল, কারণ তাহার মা শিশুটিকে খুবই ভালবাসেন, কিন্তু সে নিজে বাড়ীতে থাকিলে তিনি সেই ভালবাসা কখনও দেখান না! সে যদি চিরকালের মত এ সংসার হইতে বিদায় নেয়, তবে শিশুর ঠাকুরমা নিজের মার মত শিশুর যত্ন নিশ্চয়ই করিবেন।

হেল্‌গা মোটেই বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার বর্ত্তমান গ্লানিময় জীবনের মাঝখানে আপাততঃ এমন কিছু ঘটিয়াছে যে, সেজন্য সকলেই তাহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখে। ক্রমেই তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, চোরাবালিই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই কথা সে যতই ভাবে, ততই তার চোখের জলের ধারা কেবল বাড়িয়াই চলে।

* * *

তাহার পক্ষে কান্না থামান সহজ নয়। কয়েক মিনিট যাইতে-না-যাইতেই তার কান্নাচাপা শ্বাস আরও ঘন ঘন বহিতে আরম্ভ করিল।

মেয়েদের চোখের জল দেখা অপেক্ষা আর অস্বস্তিকর জিনিষ যে কিছু আছে গুডমুণ্ড তাহা জানিত না। সে হয়ত তখনই সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু তাহার মনে হইল যে, যখন এতটা পথ হাঁটিয়া আসা হইয়াছে তখন উদ্দেশ্যটাও সারিয়া যাওয়া আবশ্যক। সে কঠিন সুরে প্রশ্ন করিল, "তোমার হইয়াছে কি? ঘরে যাইতেছ না কেন?"

উত্তর দিতে গিয়া ভয়ে তরুণীর দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইবার জো হইল। সে বলে, "আমার সাহস হয় না।"

—তোমার ভয় কিসের? তুমি আদালতে বিচারকের কাছে এমন নির্ভীক ব্যবহার আজ করিয়াছ! তা ছাড়া নিজের বাপ-মার কাছে আবার ভয় কিসের?

—তারা বাহিরের লোকের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর।

—কিন্তু ঠিক আজই তাঁদের রাগিবার কি কারণ আছে?

—এখন যে আমি কোন সাহায্যই পাইব না!

—তুমি এমন সাহসী মেয়ে যে নিজেই ত নিজের ও তোমার শিশুর জীবিকার্জ্জন করিতে পার।

হঠাৎ হেল্‌গার মনে হইল যে, তার বাবা-মা হয়ত বা তাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন এবং বাহিরে কে কাঁদিতেছে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহা হইলে সমস্ত কথাই যে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে। তখন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আর চোরাবলিতে যাইতে পারিবে না। একথা মনে হওয়ায় সে লাফ দিয়া দাঁড়াইল এবং গুডমুণ্ডের পাশ কাটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গুডমুণ্ড তার চেয়েও বেশী দ্রুতগামী। সে চট করিয়া হেল্‌গার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "না, পলাইতে পারিবে না, আগে আমার কথা শোন।" হেল্‌গা আবেগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমাকে দয়া কর,—দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" চাঁদের আলোতে এখন হেল্‌গার মুখ পরিষ্কার দেখা যায়—তাহার মুখের ভাব দেখিয়া গুডমুণ্ড বলিল, "তুমি কি তবে ডুবিয়া মরিতে চলিয়াছ?" হেল্‌গা উত্তর দিল, "যদি বা তাই করি, তাতে কি আসে যায়?" এই বলিয়া সে পিছনের দিক হেলাইয়া গুডমুণ্ডের চোখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। আবার বলিতে লাগিল, "আজ সকালে তোমার গাড়ীর এক কোণে করিয়া আমাকে নিতে রাজী ছিলে না। কেহই ত আমার সঙ্গে মিশিতে চায় না। তোমার বুঝা উচিত, জীবনধারণ যার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা মাত্র তার পক্ষে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়াটাই ভাল।"

* * *

গুডমুণ্ড কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। সে ভাবিল, এ রকম ব্যাপার হইতে দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার আবার মনে হইল যে, নিরাশা যার জীবনে চরমে পৌঁছিয়াছে তাকে একা ফেলিয়া যাওয়াও সঙ্গত নয়।

—এখন আমার কথা শোন। প্রতিজ্ঞা কর, আমি যাহা বলিতে চাই তাহা তুমি শুনিবে। তার পর তুমি যেখানে খুশী যাইও, যা খুশী করিও।

"হ্যাঁ,"—হেলগা স্বীকার করিল।

"এখানে বসা যায় কি ?"

"এই যে কাঠের গুঁড়িটা।"

"তুমি ইহার উপর শান্ত হইয়া বস।"

হেল্‌গা সুশীলা বালিকার মত তাই করিল। এবার গুডমুণ্ডের মনে হইল যে, তরুণী শান্তভাবে তাহার কথা শুনিবে। সে ভূমিকা করিয়া কথা আরম্ভ করিল।

"শোন, এখন আর কাঁদিতে পারিবে না।"

বলিয়াই বুঝিল, কাঁদার কথাটা না তুলিলেই ভাল হইত। কারণ, তখনই তরুণী গুডমুণ্ডের বাহুর উপর মাথা হেলাইয়া দিয়া আরও বেশী করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গুডমুণ্ড এবার প্রায় ধৈর্য্যহীন হইয়া আদেশের স্বরে বলিয়া উঠিল, "কাঁদিও না। তোমার চেয়েও দুঃখী এ সংসারে অনেক আছে।"

"না, আমার চেয়ে অসুখী কেহ হইতে পারে না।"

"তোমার বয়স অল্প, শরীরেও বেশ শক্তি আছে। আমার মার অবস্থা জান ? বাতে তিনি এমন হইয়াছেন যে নড়াচড়া পর্য্যন্ত করিতে পারেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন দুঃখ প্রকাশ করেন না।"

"তাঁহাকে ত আমার মত সকলেই ছাড়িয়া যায় নাই ?"

"তুমিও ত একা নও। আমার মার সঙ্গে তোমার কথার আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

এবার তরুণীর কান্না প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। আবার দারুণ নিস্তব্ধতা—যেন সকলেই কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায় আছে।

"আমার মা তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন, যদি তুমি আগামী কাল নীচে নামিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে পার। তিনি তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং জানিতে চান, তুমি আমাদের বাড়ীতে কাজ করিতে রাজী আছ কি না।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, তিনি তোমাকে দেখিতে চান।"

"তিনি কি জানেন যে--যে—"

"অন্যেরা তোমার সম্বন্ধে যা জানে, আমার মাও ততটুকু জানেন।"

তরুণী আনন্দের উচ্ছ্বাসে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পর মুহূর্ত্তে গুডমুণ্ড অনুভব করিল, এক জোড়া বাহু তাহার গলা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। গুডমুণ্ড ইহাতে ভয় পাইয়া গিয়াছিল। একবার ভাবিল, তরুণীকে জোর করিয়া সরাইয়া দেয়। পর মুহূর্ত্তেই নিজের মনকে সংযত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, তরুণী আনন্দে এত আত্মহারা হইয়াছে যে সে কি করিতেছে তাহা নিজেই বুঝিতেছে না। এত দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত ও নৈরাশ্যের সময়ে তাহার অতিবড় শত্রুও তাহাকে অনুকম্পা দেখাইলে সে হয়ত তাহারও গলা জড়াইয়া ধরিতে পারিত।

গুডমুণ্ডের বুকের উপর মাথা রাখিয়া তরুণী বলিতে লাগিল—

"তিনি কি সত্যই আমাকে কাজে নিযুক্ত করিতে চান ? তাহা হইলে যে আমি বাঁচিয়া যাই।"

এই বলিয়া সে আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে—যদিও পূর্ব্বের ন্যায় নিরুপায় ভাবে নহে। সে বলিয়া চলিল—

"আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি চোরাবালিতে আশ্রয় লইবার জন্য চলিয়াছিলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

এ পর্য্যন্ত গুডমুণ্ড অসাড় ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এবার তাহার প্রাণে মায়ার সঞ্চার হইয়াছে। সে তরুণীর মাথায় হাত দিয়া চুলগুলি বুলাইয়া দিতে লাগিল। হঠাৎ তরুণী লাফ দিয়া উঠিল—যেন সে স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"এখানে আসার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

তাহার মুখ, এমন কি গুডমুণ্ডের মুখও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা, তাহা হইলে কাল তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিবে।"

এই বলিয়া গুডমুণ্ড করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইল।

হেল্‌গা বলিল, "আজ আপনার এখানে আসার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।"

কৃতজ্ঞতা তাহার লজ্জাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। গুডমুণ্ড

তাহাতে মনে মনে আনন্দ বোধ করিল। অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আসিয়াছিলাম, তাহাতে হয়ত ভালই হইয়াছে।"

এই বলিয়া সে হেল্‌গাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তবে তুমি ঘরে যাইতেছ ত ?"

"হ্যাঁ, ঘরে এখন অবশ্যই যাইব।"

কেহ অপরকে সত্যিকার সাহায্য করিতে পারিলে যেরূপ আনন্দ পায় হেল্‌গা-সম্পর্কে সেই আনন্দই গুডমুণ্ড উপভোগ করিতেছিল। সে তখনও দাঁড়াইয়া আছে, বাড়ীর দিকে রওনা হয় নাই।

"তুমি ঘরের চালের নীচে পৌঁছিয়াছ দেখিয়া আমি ফিরিতে চাই।"

"আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, বাবা-মা শুইয়া পড়ুন, তার পরে আমি ঘরে ঢুকিব।"

"না, তুমি এখনই ঘরে যাও, নহিলে হয়ত তোমার খাওয়া হইবে না।"

গুডমুণ্ডের মনে হইল, হেল্‌গার যত্ন করা তাহার জীবনে একটা সৎ কাজ।

হেল্‌গা তখন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল এবং গুডমুণ্ড তাহাকে আগাইয়া দিতে ঘর পর্য্যন্ত গেল। হেল্‌গা তাহার খুব বাধ্য বুঝিয়া সে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল, ঘরের কাছে পৌঁছিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইল। কিন্তু গুডমুণ্ড কয়েক পা যাইতে-না-যাইতেই হেল্‌গা পিছু ফিরিয়া আবার তাহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল—

"আমি ঘরে না ঢোকা পর্য্যন্ত আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কেহ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে জানিলে আমার ঘরে ঢোকা সহজ হইবে।"

গুডমুণ্ড উত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, সঙ্কটকাল পার না-হওয়া পর্য্যন্ত আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

হেল্‌গা দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে; কিন্তু গুডমুণ্ড দেখিল যে, সে দরজার বেশ খানিকটা খোলা রাখিয়াছে, যেন সে অনুভব করিতে পারে যে সাহায্যকারী তাহার পিছনেই আছে। ঘরের ভিতর কি হইতেছে-না-হইতেছে গুডমুণ্ড সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

হেল্‌গা ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাহার বৃদ্ধা মা ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া মেয়েকে অভিবাদন জানাইলেন। তার পর তিনি শিশুটিকে দোলনার উপর রাখিয়া ভাঁড়ার-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বড় এক পেয়ালা দুধ ও রুটি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

"এখন বসে খাও—"

এই বলিয়া বৃদ্ধা চিম্‌নীর আগুনটাকে আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

"আমি আগুনটাকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম—তুমি ঘরে ফিরিয়া জামাকাপড় যাহাতে শুকাইতে পার। কিন্তু প্রথমে খাইয়া লও। আগে তোমার খাওয়া প্রয়োজন, নয় কি ?"

হেল্‌গা তখনও দুয়ারের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে। অস্ফুটস্বরে সে বলিল—

"আমাকে এত আদর করিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। প্যেরের নিকট হইতে আমি কোন সাহায্যই পাইব না। তাহার সাহায্য না লওয়াই আমি স্থির করিয়াছি।"

বৃদ্ধা মা বলিতে লাগিলেন, "আজ বিকালবেলা আমাদের এক বন্ধু দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আদালতে বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্তই শুনিয়াছেন। আমরাও সব শুনিয়াছি।"

হেল্‌গা বেশ কিছুক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহাকে কি করিতে হইবে, যেন সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ইতিমধ্যে তাহার পিতা বৃদ্ধ কৃষক হাত হইতে কাজ নামাইয়া চশমাটা ভ্রূর উপর রাখিলেন এবং সমস্ত বিকাল-বেলা ধরিয়া যে-কথা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার জন্য গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন, "হেল্‌গা, শোন। আমি ও তোমার মা দু-জনেই সারা জীবন সৎভাবে কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তোমার আচরণে আমরা সমস্ত সম্মানই হারাইয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছিল;—কি ভাল, কি মন্দ, তাহা যেন আমরা তোমাকে কোন দিন শিখাই নাই। কিন্তু আজ তোমার আচরণ জানিতে পারিয়া আমি ও তোমার মা পরস্পর আলোচনা করিয়াছি যে, যাহা হউক সকলেই দেখিয়াছে যে অন্ততঃ তুমি কুশিক্ষা পাও নাই। আমাদের মনে হইয়াছে যে, তোমার আচরণে আমাদের আনন্দিত হইবার কারণ আছে। তোমার মা তুমি না-ফেরা পর্য্যন্ত শুইতে যাইতে চান নাই, যাহাতে তুমি অভ্যর্থনা ও সম্মান পাইয়া ঘরে ঢুকিতে পার।" ক্রমশঃ

রাজা রামমোহন রায়ের অপবাদ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দুইটি গুরুতর অপবাদ স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথম, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত জীবনচরিতে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কথিত হয়, তিনি ডিগবী সাহেবের অধীনে চাকুরি করিয়া এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন (he is said to have realized as much money) যে তদ্দ্বারা বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের জমীদারী খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পর লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই কথা যদি সত্য হয় (if this assertion is true), তবে এই কথা আমাদের মনে এই অসাধারণ পুরুষের চরিত্র (moral character) সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায়ের সহযোগী চন্দ্রশেখর দেব ১৮৬৩ সালে বলিয়াছিলেন, "গুজব (rumour has it), এক সময় রামমোহন রায়ের একটি উপপত্নী ছিল; রাজারাম তাহার গর্ভজাত;—যদিও রামমোহন রায় নিজে বলিতেন, রাজারাম তাঁহার পালিত পুত্র।"* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ে"র জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, "রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি দুর্নাম আছে।" তাহার পর, ১৮৩৫ সালে, ভারতবর্ষ হইতে ডাক্তার কার্পেণ্টারকে একজন অজ্ঞাতনামা চিঠিলেখক কর্ত্তৃক রাজারামের যে বিবরণ পাঠান হইয়াছিল, "রাজারামের প্রকৃত বৃত্তান্ত" বলিয়া তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আবার লিখিয়াছেন, "অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"*

রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের দুর্নামের অনুকূলে এই প্রকার গল্পগুজব ভিন্ন বিচারশীল (critical) ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ আদৌ উপস্থিত ছিল না। তাহার পর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-গবর্ণমেণ্টের সাবেক কাগজপত্রের দপ্তরে (Imperial Records) রক্ষিত পবলিক বডি শীটএ (Public Body Sheet), অর্থাৎ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পবলিক বা হোম ডিপার্টমেণ্ট যে সকল আদেশ করেন তাহার সংগ্রহ পুস্তকে দুইটি খবর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একটি খবর, ১৮৩০ সালের ২১শে অক্টোবর সেক্রেটারী কাউনসিলকে জানাইতেছেন—

"The Secretary reports that an order for the reception on board the Albion of a native Gentleman named Rammohun Roy proceeding to England was granted on the 7th instant on an application duly made by him for the purpose (Public Body Sheet, 21 Oct. 1830, no. 95.)

অর্থাৎ রামমোহন রায়কে এলবিয়ন জাহাজে ইংলণ্ড যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় খবর—

"(The Officiating Secretary reports that orders for the reception of) Ramrutton Mookerjee, Harichurn Doss and Sheik Buxoo', 15th November, proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the Albion (having been issued on applications duly made for the purpose)" (Public Body Sheet, dated 16th Nov., 1830).

অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অনুচর রূপে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস এবং সেখ বক্সুকে এলবিয়ন জাহাজে ইংলণ্ডে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাবেক কাগজপত্রে রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড যাত্রা সম্বন্ধে আর কোন খবর নাই।

* Quoted by S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, 2nd edition, p. 161.

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়", চতুর্থ সংস্করণ, ৪৩৫-৪৩৬ পৃঃ।

তাহার পর ডাক্তার কার্পেন্টার সানুচর রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে পৌছার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"On the 18th April, 1831, the Rajah arrived at Liverpool, accompanied by his youngest son, Rajah Ram Roy, and two native servants, one of them a Brahmin."*

এখানে অবশ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর ভৃত্যের নাম নাই। কিন্তু রাজার সমাধির সময় অপর এক ভৃত্য, রামহরি দাস, উপস্থিত ছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরিয়া লওয়া হয়, লিভারপুলে রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে দুইজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাহাদের একজন রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এবং আর একজন রামহরি দাস। তাহার পর প্রশ্ন হইল, সরকারী কাগজে উল্লিখিত সেখ বক্সু কোথায় গেল, এবং রাজারাম কোথা হইতে আসিল। প্রশ্নের উত্তর হইল, সেখ বক্সুই রাজারাম রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে চন্দ্রশেখর দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গপুরের চাষ'-ভুষার গল্পগুজব পর্য্যন্ত অকাট্য প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হইল।

ব্রজেন্দ্র বাবুর পর আর একজন পণ্ডিত, ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সম্বন্ধীয় হাইকোর্টের এবং সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র অনু-সন্ধান এবং নকল করিতে আরম্ভ করেন। অনেক কাগজের নকল সংগৃহীত হইলে তিনি এই লেখককে তাঁহার সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন আমরা স্থির করি, হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যত কাগজ পাওয়া যাইবে তাহা একত্র প্রকাশিত করিতে হইবে। এই কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন। আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করিবার জন্য এবং কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিবার জন্য আমরা প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এবং সংগৃহীত কাগজপত্র ছাপার ব্যয়ভার বহনের জন্য ডক্টর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহাকে অনুরোধ করিলাম। উভয়েই আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। আমাদের ভাণ্ডারে প্রথম দাতা ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক ঋষিকল্প সর্ জগদীশচন্দ্র বসু (৩৫০৲)। প্রস্তাবিত পুস্তকের একখণ্ড তাঁহাকে উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য আর আমাদের ঘটিবে না।* মৃত্যু আমাদের আরও দুইজন বিশেষ উৎসাহদাতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, হরণ করিয়াছে।

ডক্টর মজুমদার যখন বোর্ড অব রেভিনিউর এবং বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর কাগজের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভারত-সরকারের সাবেক কাগজপত্র (Imperial Records) কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়া-ছিল। সুতরাং তাঁহাকে দিল্লীতে যাইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি দিল্লীতে অনুসন্ধানে রত আছেন। সেখানে পাবলিক (হোম) ডিপার্টমেন্টের কাগজপত্রের মধ্যে তিনি এক অভাবনীয় বস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। নিম্নে সেই সকল চিঠিপত্রের অবিকল নকল দেওয়া হইল—

Pub. (Home)
O. C. 19, April, 1833.
No. 36

Messrs. Mackintosh & Co.
Calcutta April, 19th 1833.

G. A. Bushby Esqre
Officiating Secretary to Government
General Department

Sir,

We beg to enclose a Certificate from Captain Owen of the Zenobia of the return to this country of one of the native servants named Buxco who went to England in attendance on Rajah Rammohun Roy and request the favor of your directing the Sub Treasurer to receive a Government Promissory note from us for Sa. Rs. 2000 returning the one for Rs. 3000 deposited at the General Treasury for 3 servants, as per Sub Treasurer's Certificate herewith sent.

We have the honor to be &c.
(Signed) Mackintosh & Co.

---

* Mary Carpenter, *The Last Days of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, p, 88.

† "রামমোহন রায় ও রাজারাম," প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ২১৯-২২৯ পৃঃ।

*অন্যান্য চাঁদাদাতৃগণের নাম—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১১১৲ (প্রথম কিস্তী); সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১০০৲; পীঠাপুরমের মহারাজা, ৫০০৲; শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৫৲; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১০৲; শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন এবং ভ্রাতৃগণ ৫০৲।

Calcutta 7th February 1833

No. 37.

This is to certify that a Mahomedan Native servant, named Buxshoo, was sent on board the Zenobia in London by Messrs Rickards Mackintosh & Co. the agents of Rajah Rammohun Roy, whom he attended home and in England, and that he has been landed in Calcutta from that vessel.

(Signed) W. Owen
Captain of the Zenobia

Pub. (Home)
O. C. 19, April, 1833
No. 38

To Messrs Mackintosh & Co.

Gentlemen,

I am directed to inform you that the officiating Sub Treasurer has been authorized to deliver up to you the deposit which was made at the General Treasury on account of the Native Servant mentioned in your letter of this date, on your returning to that officer the Certificate granted for the deposit and lodging a fresh deposit for Ramrutun Mookerja and Hurichurn Doss, the two other servants who accompanied Rajah Rammohun Roy to England and who have not yet returned.

2d. The Sub Treasurer's Certificate which accompanied your letter is herewith returned.

I am &c.

Council Chamber (Signed) G. A. Bushby
The 19th April, 1833. Offg. Secy. to Govt.

Ordered that the necessary Instructions be issued to the Sub Treasurer.

কলিকাতার মেকিণ্টস কোম্পানী ১৮৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বুসবী সাহেবকে লিখিতেছেন—

আমরা এই চিঠির সঙ্গে জেনোবিয়া জাহাজের কাপ্তান ওয়েন সাহেবের একখানি সার্টিফিকেট পাঠাইতেছি। সার্টিফিকেটে উক্ত হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য ইংলণ্ডে গিয়াছিল তন্মধ্যে বক্‌সু নামক ভৃত্য এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনাকে অনুরোধ করিতেছে, আপনি সব-ট্রেজারারকে আদেশ করিবেন, তিনি যেন আমাদের নিকট হইতে ২০০০৲ টাকার একখানি প্রমিসরী নোট গ্রহণ করেন এবং জেনারেল ট্রেজারিতে তিন জন ভৃত্যের জন্ত যে ৩০০০৲ টাকার প্রমিসরী নোট আমানত আছে তাহা ফেরৎ দেন। এই নোট সম্বন্ধে সব-ট্রেজারারের সার্টিফিকেট পাঠান হইল।

এই পত্রের সঙ্গে প্রেরিত জেনোবিয়া জাহাজের কাপ্তেনের সার্টিফিকেটে উক্ত হইয়াছে—

আমি সার্টিফিকেট দিতেছি, রাজা রামমোহন রায়ের এজেণ্ট রিচার্ড মেকিণ্টস কোম্পানী রাজার বক্‌সু নামক দেশীয় মুসলমান ভৃত্যকে লণ্ডন হইতে জেনোবিয়া জাহাজে পাঠাইয়াছিলেন, এবং বক্‌সুকে সেই জাহাজ হইতে কলিকাতায় নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মেকিণ্টস কোম্পানীর পত্রের উত্তরে সেক্রেটারী বুশবী ১৮৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল লিখিতেছেন,—

আমি আপনাদিগকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে সহযাত্রী যে দুই জন ভৃত্য, রামরতন মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ দাস, এখনও ফিরিয়া আসে নাই তাহাদের জন্ত নূতন করিয়া টাকা আমানত দিলে এবং (পূর্ব্ব) আমানতের সার্টিফিকেট ফেরত দিলে আপনাদিগের চিঠিতে উক্ত ভৃত্যের (বক্‌সুর) জন্ত জেনারেল ট্রেজারিতে যে টাকা আমানত আছে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্ত সব-ট্রেজারারকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল চিঠিতে দেখা যায় সেখ বক্‌সু নামক একজন মুসলমান ভৃত্য রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, এবং ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। ইহার পরে, ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টলে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ১৮ই অক্টোবর তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। সমাধির সময় রাজারাম রায় উপস্থিত ছিলেন। রাজারাম কলিকাতায় ফিরিয়া ছিলেন ৫ বৎসর পরে, ১৮৩৮ সালে। সুতরাং চন্দ্রশেখর দেবের মতে রাজারামের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্ত সরকারী কাগজে উল্লিখিত সেখ বক্‌সুকে হাজির করা যায় না। রাজারাম ও সেখ বক্‌সু দুই জন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের লিখিত জীবনচরিতে রাজা রামমোহন রায়ের ঘুষের টাকায় জমিদারী খরিদ করিবার যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যত্র দলীল দস্তাবেজের সহায়তায় খণ্ডন করিয়াছি (প্রবাসী, ১৩৪৩, কার্ত্তিক, ৪০ পৃষ্ঠা)। রাজারাম সম্বন্ধীয় অপবাদ খণ্ডনের জন্ত এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না। আমরা অন্যত্র রাজারামের বয়স হিসাব করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার জন্ম ১৮১৮ সালে। (প্রবাসী ১৩৪২, পৌষ, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)। তাহার চারি বৎসর পূর্ব্বেই রামমোহন রায় কলিকাতায়

আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু সমাজের সহিত ঘোরতর বিবাদে রত ছিলেন। ১৮১৬ সালের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির বিবরণে লিখিত হইয়াছে—

"He is said to be very moral; but is pronounced to be a most wicked man by the strict Hindus."*

অর্থাৎ,

রামমোহন রায় অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক বলিয়া কথিত হয়েন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা তাহাকে অতি দুষ্ট লোক বলেন।

নিরপেক্ষ সমাজে যাঁহার এইরূপ সুখ্যাতি ছিল, যে নির্ভীক পুরুষ শৈব বিবাহ এবং শাস্ত্রানুমোদিত মদ্যপান সমর্থন করিয়া গিয়াছেন,† তিনি যে রাজারামের জন্ম সম্বন্ধে সত্য গোপন করিবেন ইহা মনে করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজা রামমোহন রায়ের চরিতকারগণ তাঁহার বিরোধী জনশ্রুতি এমন ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে সহজেই পাঠকের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চন্দ্রশেখর দেব রাজারাম সম্বন্ধে প্রথমতঃ গুজবের উল্লেখ করিয়া তাহার পর রামমোহন রায়ে নিজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায় জমিদারী খরিদ করিবার টাকা কোথায় পাইলেন এই সম্বন্ধে গুজবের উল্লেখ করিয়া, "যদি এই কথা সত্য হয়" (if this assertion is true) এইটুকু বলিয়া রামমোহন রায়ের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন; এই কথা যে মিথ্যা হইতে পারে, এমন ইঙ্গিত মাত্রও তিনি করেন নাই। রাজা রামমোহন রায়ের চরিতকারগণের মধ্যে একমাত্র মিস্ কলেট রাজারামের সম্বন্ধীয় অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দেশীয় জীবনচরিতকারগণ যে রীতিতে রামমোহন রায়ের অপবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই মহাপুরুষের প্রতি নির্ম্মমতার পরিচয় দেয়। রামমোহন রায়ের অপবাদ সম্বন্ধে এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও বিশ্বাসের প্রবৃত্তি বা ঔদাসীন্যই লক্ষিত হয়। এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণও মমতার (sympathyর) অভাব। এদেশের শিক্ষিত লোকেরা রামমোহন রায়কে খুব প্রশংসা করিতে পারেন, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে যেন ঠিক আপন জন মনে করেন না। ইহার কারণ কি?

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি এইরূপ মমতার অভাবের কারণ, তাঁহার মধ্যে এমন সকল গুণের মিলন দেখা যায় যাহা এদেশের লোকের মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না; সুতরাং তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া চেনা যায় না। এক দিকে তিনি শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। রাজা রামমোহন রায় কেবল উপনিষৎ এবং বেদান্ত দর্শন নহে, পুরাণ, তন্ত্র, রঘুনন্দনের নিবন্ধাদি সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া নিরাকার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ সেবধি"তে প্রামাণ্য হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শাস্ত্রকেই ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য উপদেশ-বাক্যের একমাত্র আকর মনে করেন। তাঁহারা নূতন নূতন অবতার বা ঈশ্বরানুগৃহীত সাধু-মহাত্মার মুখের নিত্য নূতন আদেশ-উপদেশের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। এদেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা চৈতন্যকে কখনও অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বর্ত্তমানে বোধ হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও করেন না। শাস্ত্রনিষ্ঠ রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রচারে রত হইয়া বরাবর শাস্ত্রের প্রমাণই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কখনও সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণীর বা উপদেশের দোহাই দেন নাই। তিনি কখনও অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান দাবী করেন নাই। ইংরেজীতে যাহাকে বলে মিষ্টিক (mystic), তিনি তাহা ছিলেন না। এইরূপ ধর্ম্মসংস্কারক পাণ্ডিত্যের জন্য প্রশংসা ভিন্ন এদেশের লোকের নিকট আর কিছু পাইতে পারেন না। তাঁহার অপবাদে কাহারও কিছু আসে-যায় না। সুতরাং শত্রুপক্ষে যাহাই কেন বলিয়া থাকুক না, তাহা লইয়া পূর্ব্বে কেহ মাথা ঘামান কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।

এক দিকে রাজা রামমোহন রায় যেমন শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, আর এক দিকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ইউরোপীয় তত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন। কর্ণেল ফিটজ্‌ক্লেরেন্স (পরে

* "মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের উদ্ধৃত। *Last days of Raja Rammohun Roy*, p, 29.

† "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার।"

আর্ল মান্‌ষ্টার) ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে কলিকাতায় রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ফিটজ্‌ক্লেরেন্স তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

His learning is most extensive, as he is not only conversant with the best books in English, Arabic, Sanskrit, Bengalee and Hindoostanee, but has even studied rhetoric in Arabic and English, and quotes Locke and Bacon on all occasions.*

'তাঁহার পাণ্ডিত্য অত্যন্ত বিশাল। তিনি কেবল উৎকৃষ্ট ইংরেজী, আরবী, বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সহিত পরিচিত নহেন, তিনি আরবী এবং ইংরেজী অলঙ্কারশাস্ত্রও অনুশীলন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদাই বেকনের এবং লকের বচন উদ্ধৃত করেন।'

রামমোহন রায় ভারতবর্ষে থাকিয়া পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে সম্মত ছিলেন না, তিনি ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল শাস্ত্রের যথারীতি অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ফিটজ্‌ক্লেরেন্স লিখিয়াছেন—

He is very desirous to visit England and enter one of our universities where I shall be most anxious to see him, and to learn his ideas of our country, its manners and customs.*

'তিনি ইংলণ্ডে আসিতে এবং আমাদের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বিশেষ ইচ্ছুক। এখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের দেশের সম্বন্ধে, এবং ঐ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে, তাঁহার মতামত শুনিতে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে।'

১৮১৬ সালে রামমোহন রায় একখানি চিঠিতে জন ডিগবীকেও লিখিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন।† বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে যাওয়া রামমোহন রায়ের পক্ষে ঘটিয়া উঠিয়াছিল না। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের বিচারপ্রণালীর মাহাত্ম্য তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন এখনকার দিনের অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই বোধ হয় বুঝিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে রামমোহন রায় লোকশিক্ষার যন্ত্ররূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনকে বেদান্তের উপরে স্থান দিয়াছেন। অথচ তিনিই ১৮২৬ সালে বেদান্তের পঠন-পাঠনের জন্য বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যে শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনের অনুশীলন এ-দেশে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে এ-দেশের শিক্ষিত সমাজে যুক্তিনিষ্ঠা (rationalism) বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বিশ্বাসপ্রবণতা হিন্দুর মনোবৃত্তির একটা প্রবল অঙ্গ। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্রের সীমা আছে; কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাসের শক্তির সীমা নাই। রাজা রামমোহন নিরঙ্কুশ বিশ্বাস-প্রবণতার পোষক ছিলেন না। নিরঙ্কুশ বিশ্বাস-প্রবণতা হয়ত মোক্ষ লাভের সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একত্র এই চতুর্ব্বর্গ লাভের সহায় হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুর শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের প্রতীক ছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিলে তাঁহার জীবনকথা এবং গ্রন্থাবলী এই সামঞ্জস্যসাধনে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু সেই জীবনকথা গল্পগুজববর্জ্জিত শুদ্ধ সত্য হওয়া আবশ্যক।

* Lt.-Col. Fitzclarence, Journal of a Route across India, through Egypt to England, in the years 1817 and 1818, quoted by Mary Carpenter in *Last Days of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, pp. 54-57.

† S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 37.
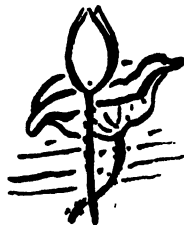
ডাক্তারদের বেকার-সমস্যা ও পল্লীর চিকিৎসা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা

আমি মফঃস্বলের ডাক্তার এবং পল্লীগ্রামেই প্রায় পনর-কুড়ি বৎসর যাবৎ ব্যবসায় করিয়া আসিতেছি, কাজেই পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ-পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া দাবি করিতে পারি, তাই ডাক্তারদের বেকার-সমস্যা ও শহর-প্রীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি।

আজ শিক্ষিত ডাক্তারদের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং শহরে শহরে ডাক্তারদের মধ্যে হীন প্রতিযোগিতার কথা শুনিলে লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে হয়, অথচ পল্লীগ্রামে ডাক্তার পাওয়া দুরূহ। এই কারণে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ও চিকিৎসকদের সভা-সমিতি ও কন্‌ফারেন্স ইত্যাদিতে চিকিৎসকদিগকে শহরের বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া পল্লী-অঞ্চলে বসিয়া গ্রামের উন্নতি ও নিজের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিবার অতি সহজ উপদেশ দেওয়া হয়।

যাঁহারা খবরের কাগজে লিখেন অথবা কন্‌ফারেন্স ইত্যাদিতে বক্তৃতা করেন, বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহারা হয়ত পল্লীগ্রামের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। স্বাস্থ্যের কথা বাদ দিলেও বাংলার পল্লীগ্রামগুলি সাধারণতঃ দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এসবগুলি বর্ত্তমানে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া ডাক্তারদের শহরে যাওয়ার একমাত্র কারণ নহে। কারণ অনেক ডাক্তার নিজে পল্লীগ্রামের অধিবাসী হইয়াও বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া ডাক্তারী পড়িয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলেও শহরে গিয়া বেকারের দল বৃদ্ধি করিয়া বসিয়া থাকে, অথচ পল্লীগ্রামে আসিতে চাহে না। ইহার কারণ কি নিছক শহর-প্রীতি?

শিক্ষিত ডাক্তারদের পল্লীগ্রামে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিবার প্রবল অন্তরায় হাতুড়ে ডাক্তারদলের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইহারা প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রাম জুড়িয়া বসিয়া আছে। গ্রামে গিয়া ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া অন্নসংস্থান করা অনেক শিক্ষিত ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব নহে। এই সব হাতুড়ে সৃষ্টির জন্য বাংলার, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ও ঢাকায় দুই-তিনটি প্রাইভেট ব্যবসাদারী স্কুল আছে। পল্লীগ্রামের যেসব বয়াটে ছেলে কোন দিকেই কিছু সুবিধা করিতে পারে না, তাহারা এই সব স্কুলে দুই-এক বৎসর কাটাইয়া নিজদিগকে খুব বড় ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া থাকে। পাশাপাশি কোন শিক্ষিত ডাক্তার থাকিলে ইহারা নানা উপায়ে তাঁহাদিগকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

উকীল হইতে হইলে আইন পড়িয়া পাস করিতে হয়, মাষ্টারী অথবা অনুরূপ ব্যবসা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার নিদর্শন লওয়ার প্রয়োজন হয়, অথচ ইহাদের ভুলে লোকের হয়ত সামান্য মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু যাহাদের সামান্য ভুলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহাদের যোগ্যতার কোন নিদর্শনেরও প্রয়োজন হয় না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমাদের এখানেই কতকগুলি শিক্ষিত বেকার ডাক্তার মাসে পনর-কুড়ি টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন না, অথচ গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের চোখের সামনেই হাতুড়েরা নানা উপায়ে প্রচুর উপার্জ্জন করিতেছে। কাজেই গ্রামে বসিলেই ডাক্তারদের বেকার-সমস্যার সমাধান হয় না।

আসন্ন মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা যখন কাহারও নাই তখন সেই সব ক্ষেত্রে হাতুড়েরা শিক্ষিত ডাক্তারদের দুই-এক বার আনিয়া দেখাইয়া পরে নানা উপায়ে ইহারা প্রচার-কার্য্য চালাইয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। হাতুড়েদের হাতে অনেক ডাক্তারের অসম্মান, এমন কি

মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে হাওড়া জেলার বসন্তপুর গ্রামে ডাক্তার-হত্যার মামলা সংবাদপত্রে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই এ-বিষয়ে অবগত আছেন।

১৯১৫ সালে যখন ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টির সৃষ্টি হয় তখন আইন করিয়া সব প্রাইভেট মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বহু দিনের স্থাপিত অনেক স্কুল উঠিয়া যায় এবং অনেক হাতুড়ে ডাক্তার ফ্যাকাল্‌টির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়। কিন্তু ডাক্তারদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ এরূপ কোন আইন এখন পর্য্যন্ত হয় নাই বা অদূর ভবিষ্যতে হইবে এরূপ সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ এণ্ডারসন্ সম্প্রতি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ঐ একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের ডাক্তারী ব্যবসায় নিরাশাব্যঞ্জক, কারণ এখানকার দর্শনীর হার খুব কম ও নানা প্রকার হাতুড়ে চিকিৎসার প্রাবল্য ও শহরের ডাক্তারদের সংখ্যাধিক্য।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রাদেশিক চিকিৎসক-সম্মিলন হইয়া গেল। সেখানেও পল্লীগ্রামে চিকিৎসার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি সর্ব্বাংশে সমীচীন, কিন্তু আমরা জানি সেগুলি হয়ত কোন কাজেই আসিবে না। কারণ গবর্ণমেণ্ট যে টাকা-পয়সা খরচ করিয়া বাড়ী ও বাগান তৈয়ার করিয়া দিয়া ও আরও কিছু সাহায্য করিয়া ডাক্তারদিগকে গ্রামে যাইতে প্রলুব্ধ করিবে এরূপ কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয় না।

কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় সেখানকার গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে নূতন ডাক্তারদের পসারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন এবং তাঁহার মতে সেখানকার হেলথ্ ইনসিওরেন্স সোসাইটির মত সোসাইটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইলে ডাক্তারদের সুবিধা ও পল্লীস্বাস্থ্য-সমস্যার অনেক সমাধান হয়।

পল্লীগ্রামের চিকিৎসার আর একটি অসুবিধা, ঔষধের অতিরিক্ত মূল্য। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, টিংচার ও এলকোহল সম্বন্ধীয় ঔষধের উপর ডিউটি তুলিয়া লইয়া হাসপাতাল ইত্যাদিতে যে-মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়* সেই মূল্যে ডাক্তারদের ঔষধ পাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে কুইনাইন ও সিন্‌কোনা সম্পর্কীয় ঔষধাদির মূল্য কম করিয়া পল্লীচিকিৎসার অনেক সাহায্য করিতে পারেন।

যাহা হউক, যদি বর্ত্তমানে শুধু আইন করিয়া হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসা বন্ধ করা যায়, তবে অনেক ডাক্তার শহর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বেকার-সমস্যা-সমাধানের ভার নিজেরাই অনেকখানি গ্রহণ করিতে পারেন।

* হাসপাতালে ছয় আনা মূল্যে যে স্পিরিট পাওয়া যায় ডাক্তারদিগকে তাহা ছয় টাকা দিয়া কিনিতে হয়। ডিউটির জন্য অনুরূপ অনেক ঔষধের মূল্যের আকাশ-পাতাল তারতম্য হয়।

গান

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

তা'রা কত-না বাঁধনে বেঁধে যায়,
যবে কেঁদে চায় মোর পানে।
হরে' নিতে চায় ব্যথার বেদন;
গড়ে' দিতে চায় জীর্ণ কেতন
মোহন সহন দানে।

সম্বল তার পায় কি পায়,
অন্তর যবে ক্লান্ত, ভ্রান্ত,
সন্ধ্যার অবসানে?
বুঝি না—জানি না, তবু কেঁদে চাও,
মোহের বাঁধনে মোরে বেঁধে যাও
মাতায়ে চেতনা প্রাণে

জওহরলাল নহরুর আত্মচরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত। মূল্য চারি টাকা।

এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি যখন প্রথম ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, তখন ভারতে ও বিদেশে বহু সংবাদপত্রে ও বহু সুধীজনের দ্বারা ইহার উচ্চ প্রশংসা ও বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছিল। ভারতীয় বহু ভাষাতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। বাংলা ভারতবর্ষের একটি প্রধান ভাষা। ভারতীয় কংগ্রেস নেতার ইংরেজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ না থাকা লজ্জার কথা। সুতরাং মজুমদার মহাশয় এই সুবিশাল বইখানির অনুবাদ করিয়া বাঙালীর একটা কঠিন কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিতজীর নাম জওহরলাল নহে, জওআহরলাল।

মূল গ্রন্থখানির অধিকাংশই কারাগারে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন, "কারাগারের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রাখাই ছিল এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।" উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিবার সময় এই বইখানি ঐতিহাসিকদের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিবে। যদি ইহা কারা-প্রাচীরের বাহিরে স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিত হইত, গ্রন্থকার বলেন, 'তাহা হইলে স্থানে স্থানে ইহা অধিকতর সংযত হইত।' এ কথার সত্যতা আমাদেরও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, তবু কারাগারের রচনা সেই মত থাকাই ভাল।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং রাজনৈতিক সংগ্রামক্ষেত্রের বর্ণনায় অপরের অপেক্ষা তাঁহার নিজের কথা বেশী থাকাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। নিজের জীবনের ভালমন্দ কোনটাকেই তিনি চাপা দিতে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া মনে হয়। তবে সময়ে সময়ে অপরের সমালোচনা কঠিন মনে হইয়াছে। তিনি নিজেও ইহা স্বীকার করেন। এই সকল সমালোচনা সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিবে।

আত্মচরিত রচনার সূত্রে তাঁহার পিতার চরিত্র-চিত্রণ ও জীবনধারা-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। গ্রন্থের হিমালয় ভ্রমণ' পর্য্যন্ত প্রথমাংশ জেলে মানবপ্রকৃতি ও জীবজন্তুর বর্ণনা, পুস্তকের নানা অংশে বহু বিখ্যাত লোকের খণ্ডচিত্র, অযোধ্যার কৃষক-আন্দোলনের চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর বর্ণনা উপন্যাসের মত মুগ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষও পড়িবে। কৃষক-আন্দোলন ও কারাগারের বহু সংবাদ, যাহা খবরের কাগজে ঘটনামাত্র বলিয়া মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, এখানে তাহা জীবন্ত হইয়া মানুষের চোখের উপর সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠে।

বইখানি এত বড় ও এত বিভিন্ন বিষয় ও চিন্তা লইয়া লেখা যে ইহার সমালোচনা করিতে হইলে আর একখানি বই লেখা দরকার হইয়া পড়ে। মোটের উপর বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস, অসহযোগ, আইন-অমান্য, কংগ্রেস, কৃষক-আন্দোলন, মতিলাল নেহরু ও গান্ধী মহাশয়ের কথা, কারাজীবন, ইত্যাদিই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যাহা রাজনীতি একেবারেই নয় এমন অসবর্ণ বিবাহ, যৌনসমস্যা, ধর্ম্ম কি (?), ইত্যাদিও ইহাতে অল্পবল্প আলোচিত হইয়াছে।

নেহরু মহাশয়ের ইংরেজী রচনাপদ্ধতি সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। অনুবাদে ভাষায় সেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা কঠিন। তাহাড়া এই জাতীয় পুস্তকের উপযোগী অনেক বাংলা কথা এখনও তেমন চলতি হয় নাই। যাহা হউক, বইখানির সর্ব্বত্র অনুবাদের তীব্র গন্ধ নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদের ভাষা আরও সহজ হইবে আশা করা যায়। ইংরেজীকে বাংলা করার অপেক্ষা ইংরেজী ভুলিয়া বাংলা লেখা বেশী সহজ। সুতরাং শুধু এই বাংলা বইখানির দিকে চাহিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার ছোট ছোট ত্রুটিগুলি সংশোধন করা সহজ হইবে। বইটিতে অনেকগুলি ফোটোচিত্র আছে। ইহার কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, বহিরাবরণ ভাল।

শ

ডাকের চিঠি—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। তাঁর বর্ত্তমান গ্রন্থখানিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় এ নিয়ে প্রথমে একটু গোলমাল বাধে। লেখক গ্রন্থের যে নামকরণ করেছেন, সে হিসেবে একে কতকগুলি চিঠির সংগ্রহ ব'লে বিবেচনা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্রাবলীর ধরণে লিখিত হ'লেও লেখকের ভাষার সরসতা ও রস পরিবেশনের ক্ষমতার গুণে এখানি নিপুণ গল্প-বলিয়ের কথাসাহিত্যের বইয়ের মত মনোহারী হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার কথা বাদ দিই—কারণ ওটা আমাদের দেশে সাহিত্যের বেওয়ারিশ জমি No man's land। ওখানে যে যা করে তার জন্যে নিন্দা বা প্রশংসার মূল্য কেউ দেয় না—কিন্তু মানুষের মর্ম্মকথার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও হরেক ধরণের চরিত্র জীবন্ত ভাবে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করতে লেখক তাঁর পাকা হাতের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বইখানি তাঁর প্রবাস-জীবনের দিনগুলির ডায়েরীর সংগ্রহ। সে হিসেবে লেখকের ঘটনা-নির্ব্বাচনের কৃতিত্ব প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বহু তুচ্ছ ঘটনা ও চরিত্র-সমষ্টির যাতায়াত থেকে তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে বেছে বেছে এমন সরস ঘটনা ও অভিনব চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন যা পাঠকের কৌতূহল ও রসবোধকে উদ্রিক্ত না ক'রে পারে না। তাঁর কয়েকখানি চিঠি অনবদ্য রস-পরিবেশনে ছোট গল্পের মত সুখপাঠ্য, যেমন পচা ডাকাতের কথা, বা রথযাত্রার মেলায় বৈরাগীর কাহিনীটি।

বইখানি ছাপা ও কাগজ ভাল। শিল্পী যামিনী বাবুর প্রচ্ছদপটের ছবিটি মনোজ্ঞ হয়েছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সচিত্র মহাভারত—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক ভারতবাণীভূষণ। ১২৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা। ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

বইখানায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীটি একটু আড়ষ্ট এবং মনে হয় যেন পাণ্ডিত্যেরই ভারে ভারাক্রান্ত। যতটুকু প্রকাশ করার জন্য যে পরিমাণ ভাষার প্রয়োজন, গ্রন্থকার সব সময় সেটুকু ব্যয় করিতে চান নাই বলিয়া ভাব একটু মন্থর ও অচঞ্চল। মধ্যে মধ্যে বাক্যের শব্দযোজনা ও ব্যাকরণের নিয়ম এমন ভাবে অতিক্রম করিয়াছে যে, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রভৃতি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—"উহার সহিত ধর্ম্মবিপ্লব ও বংশপরিচয় যেমন মহাভারতের আদিপর্ব্বের কথা, তদ্রূপ সৃষ্টিরহস্য, দেশাচার, কুলাচার, সভ্যতা ও সভ্যের কেন্দ্রস্থল নির্ণয় রাজা ও ধর্ম্মবিচারাদি মানব ইতিহাসের সূচিপত্রস্বরূপ যাহার সহিত মহাভারতের নায়ক-নায়িকার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, বিবাহ, জন্মলাভ ও প্রয়াণযাত্রার কথায় সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।" (ছেদ ও বানান গ্রন্থকারের নিজের।)

এই দোষটুকু উপেক্ষা করিলে বইখানিতে জানিবার ও ভাবিবার বস্তু পাওয়া যাইবে। লেখক যে প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত মহাভারতখানা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাভারত সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ইহা হইতে সাহায্য পাইতে পারেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঘরের ছেলে বাহিরে—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। অনুবাদক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃ. ১৪৫।

আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী রচনার সহিত শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী বাঙালী মাত্রেই পরিচিত। My Brother's Face, A Son of Mother India Answers Caste and Outcast প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নিকট কেবলমাত্র বাঙালী কেন সমগ্র ভারতবাসীই কৃতজ্ঞ। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষকে ভিত্তি করিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের চিত্তলোকের ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনার যে মহাব্রত তিনি জীবন পণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একটি জীবনে উদ্‌যাপিত হইবার ব্রত নহে, তবুও তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ ভারতবাসীর নিকট যেন অসমাপ্ত ব্রতের গভীরতম বেদনার রেশেই বিশেষভাবে দুঃসহ।

'ঘরের ছেলে বাহিরে' গ্রন্থখানি জীবন-সাধক এই তরুণ বাঙালীর প্রবাস জীবনের একটি প্রারব্ধ পরিচ্ছেদ মাত্র; তাঁহার Caste and Outcast-এর শেষাংশের অনুবাদ। প্রাণশক্তির প্রচণ্ডতায়, মনন ও বোধশক্তির গভীর ব্যাপকতায় নিত্য আলোড়িত সে জীবন। কিন্তু সেই আপাত-উচ্ছল সিন্ধুতরঙ্গের অন্তরে যে আত্মসমাহিত একাগ্র মূর্ত্তি বিরাজিত তাহাই ধনগোপালের আত্মার স্বরূপ। তাঁহার এই আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রসারের ঐকান্তিক আগ্রহের ইতিকথা স্বচ্ছ বাংলায় প্রকাশ করিয়া অনুবাদক বাংলার কিশোর পাঠকদের পরম উপকার করিয়াছেন। ভূমিকায় ব্যক্তিগত পরিচয় হইতে ধনগোপালবাবুর স্বরূপ যাহা আঁকা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে পুস্তকটিকে তাঁহার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিবার সহায়তা করিবে। আমরা ভরসা করি এই গ্রন্থখানির সাহায্যে বাংলার ঘরে ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের প্রবাসী ভাই বাংলার ঘরের ছেলে ধনগোপালকে হৃদয়ের অতি নিকটে ফিরিয়া পাইবে।

প্রচ্ছদপটে ধনগোপালের প্রতিচ্ছবিখানি গ্রন্থটিকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিবাহ-কল্যাণ—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভবন, বজবজ। মূল্য—উৎকৃষ্ট সংস্করণ ছয় আনা, এবং সাধারণ সংস্করণ চার আনা। ত্রিশ পৃষ্ঠা।

বিবাহের উপযোগী উপহারস্বরূপ লাল কালিতে পাইকা অক্ষরে মোট আর্ট পেপারে ছাপা। লেখকের ভাষায়—"সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণ্য-বিবাহের উদ্দেশ্য প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের লক্ষ্য, এবং সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সাম্, ঋক্ ও যজুঃ তিন বেদ হইতেই মন্ত্রসকল উদ্ধৃত হইয়াছে।" বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রাচীন মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত এবং তাহাদের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় বইখানি সারগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। নানা রকমের হাল্কা বই বিবাহে উপহার দেবার রীতি আছে। তাহার বদলে এই বই উপহার পাইলে বিবাহিত যুবক-যুবতী মিলিত জীবনের আদর্শ ও পবিত্রতার সন্ধান লাভ করিবে।

গুপ্ত

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীজহরলাল বসু, বি-এল প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকার, উত্তরপাড়া পোঃ।

যে-দেশে সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাই এখন পর্য্যন্ত ভরসা করিয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একখানি প্রামাণিক বিস্তৃত ইতিহাস যথাযথ মালমশলার অভাবে রচনা ও প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, সে-দেশের একজন আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে বাংলা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটা কিছু খাড়া করিয়া তোলা কম প্রশংসার কথা নয়। জহর বাবুর উদ্যম ও সৎসাহস দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

অবশ্য একথাও বুঝিতেছি যে তিনি বহু ক্ষেত্রেই 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' বা 'থার্ড হ্যাণ্ড' মালমশলা লইয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশ্বকোষ, সুবল মিত্রের অভিধান, এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবিধ সাময়িক পত্রের প্রবন্ধকে ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি সম্ভব ও অসম্ভব নানাবিধ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন তথাপি তিনি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একটা কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণ পাঠকের সহজপাঠ্য করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহাও কম কথা নয়। মূল উপাদান লইয়া কাজ করা তাঁহার মত ভিন্ন ব্যবসায়ীর পক্ষে কঠিন। বাংলা গদ্যের প্রথম এক শত বৎসরে রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য এবং সেগুলির সন্ধান জানাও সহজ নয়। আশা করি ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা এ-বিষয়ে গবেষণা যতখানি অগ্রসর হইয়াছে জহর বাবু তাঁহার পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি ব্যবহার করিয়া এখানিকে দোষমুক্ত করিবেন।

পুস্তকের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার বাংলা-গদ্যের যুগ-বিভাগ করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যকে তিনি 'আদিযুগ' এবং রামমোহন রায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'দ্বিতীয় যুগ বা মুসলমান যুগ' বলিয়াছেন। এই বিভাগ অর্থহীন। আসলে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-গদ্যের সূত্রপাত। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১ম যুগ বা অনুবাদের যুগ। ১৮০০ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ। ১৮১৮ হইতে সংবাদপত্রের যুগ। যুগ-বিভাগ এইরূপই হওয়া উচিত।

দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে ভুল বলিয়া যে-সকল বস্তু পরিত্যক্ত হইয়াছে; যে-সকল নাম ও তারিখ সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহের অবকাশ নাই সেই সকল পরিত্যক্ত বস্তুর ব্যবহার এবং সেই সকল নাম ও তারিখ সম্বন্ধে ভুল আমরা জহর বাবু অব্যবসায়ী বলিয়াই ক্ষমা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া কিছু শিখিতে চান তাঁহাদিগকে সাবধান হইয়া শিখিতে বলি। বাংলা-সাহিত্যচর্চ্চাকে যাঁহারা ড্রইংরুম বিলাস করিতে চান তাঁহারা কাজের অবসরে এই বই পড়িয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ একটা কৌতুককর ধারণা করিতে

পারিবেন; কোম্পানীর সাহেব কর্ম্মচারীরা কি করিয়াছেন, মিশনরী সাহেবদের কীর্ত্তিই বা কি, ইত্যাদি নানা কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা খুশী হইবেন।

বড় এবং ছোট ভুলের সংখ্যা কম নয়; তালিকা দেওয়াও সম্ভব নয়—জহর বাবুর পক্ষে ভুলগুলি অমার্জ্জনীয়ও নয়। তিনি বাংলা-সাহিত্যের গবেষক নহেন—এক জন সেবকমাত্র। সেই হিসাবে তিনি প্রশংসার পাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি পুস্তকখানিকে উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ করিয়া ছাত্রদের উপযোগী একখানি ইতিহাস প্রকাশ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়ী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নবজীবন সংঘ, ৪ নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থটি চারণ-সিরিজের প্রথম পুস্তক; চারণ-সিরিজের উদ্দেশ্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা। ইংরেজী pamphlet শব্দের যোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ কি আছে জানি না, তবে প্রচারপুস্তিকা শব্দটি এই জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে; "ত্রয়ী" সেই ধরণের রাজনৈতিক প্রচারপুস্তিকা। ইহাতে স্বাধীনতার বেদীমূলে, বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষ ও থিয়োরির ভূত এই তিনটি প্রবন্ধ আছে। লেখকের ভাষা জোরাল ও বলিবার ভঙ্গী আকর্ষক; সুতরাং তাঁহার মতের সহিত সর্ব্বত্র মতের মিল না হইলেও প্রবন্ধগুলি পড়িতে ভাল লাগে।

অগ্রদূত—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নবজীবন সংঘ, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন এরূপ কয়েক-জন পাশ্চাত্য মনীষীর জীবন ও বাণীর সহিত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্যই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ইহাতে প্লেটো, সক্রেটিস, ভলটেয়ার, শোপেনহয়ার, এমার্সন, এডওয়ার্ড কার্পেনটার ও ব্রাউনিং—এই কয় জনের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। সে আলোচনা এতই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ যে তাহা পড়িয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করিয়াই লেখক অন্য অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বের একটি সমগ্র বিবরণ দেন নাই; প্লেটোর রচনার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন gymnastic ও music প্লেটোর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা-প্রণালীর প্রথম ধাপমাত্র। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছেন এবং সেই কথাগুলিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে পারিতেন। তিনি সক্রেটিসের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা মনোরম হইয়াছে; কিন্তু ভলটেয়ারের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহাতে ভলটেয়ারের বিদ্রোহী অগ্রদূতের রূপের চেয়ে অন্য রূপটিরই উপর যেন বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে মনে হইল। গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলিরও এই ভাবে স্থানে স্থানে অঙ্গহানি হইয়াছে।

কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বেশী নাই, সুতরাং কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও বইটি পড়িবার মত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল, ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গী ভাল; সেই জন্যও তাঁহার লেখা পড়িতে ভাল লাগে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

পৌষ-ক্ষেতে

শ্রীগোপাললাল দে

তোমরা হেরেছ কত নদী গিরি নির্ঝর উপবন,
কত মনোহর হ্রদ প্রান্তর সিন্ধু অবন্ধন,
পল্লীর পথে নিম-বাব্‌লায়, হেরেছ কি কত লতিকা জড়ায়,
ডালে পাখী ডাকে, ভরা ফুল শাখে ভ্রমর-গুঞ্জরণ?

গিয়েছ কি কভু হেন পথ পারে পউষ ফসল ক্ষেতে,
সারা গ্রামখানি হেরেছ কি কভু সেথায় উঠেছে মেতে;
চাষী কাটে ধান গেয়ে মেঠো গান,
রহি রহি উঠে আড় বাঁশে তান,
বউ বোঝারীরা তাল রাখি চলে পসারী বেসাতি পেতে?

সদ্য-ফসল-কাটা ক্ষেতগুলি, গাভী মেষ ছাগ চরে,
জোড়া জোড়া ঘুঘু, শালিক, ময়না, শুক, পারাবতে ভরে,
মূষিকের পালে লেগে গেছে ভীড়,
গোলা ভরে উঠে কাঠবিড়ালীর,
বালক-বৃদ্ধ-বনিতা মিলেছে পৌষলা-ভোজ তরে!

মাঠের খামারে সারাদিন ধরে আঁটি ধান ঝাড়ে চাষী,
শীষ পাছড়ায় বধূ পাশে তার শিশু তার কলভাষী,
মকরের দিনে 'পোষ-পার্ব্বণ',
ভারী সমারোহে তারই আয়োজন;
কুমারীরা ফিরে ফুল-আহরণে তুষু পূজা ভালবাসি'।

সরষে গুঁজোর ফুলে ফুলময় ক্ষেতগুলি দর্পণ,
যবশীষ দুলে, কুসুমের ফুলে ফাগে রঙে রঞ্জন;
ইক্ষু-বিতানে অড়রের ফুলে,
হেরেছ কি লোভী শলভেরা বুলে,
ছোলা মটরের ফুলে ফলে করে রূপে রসে রঞ্জন।

পড়ন্ত রোদে উত্তর বায়ু খরতর হয়ে লাগে,
ঘুরিতে ফিরিতে হেরিবে গোধূলি রঙিছে রক্তরাগে,
ফিরিবার পথে পূর্ব্ব গগনে,
'আগুন লেগেছে বুঝি শালবনে'?
'আগুন ও নয়, পূর্ণিম চাঁদ!' এ শোভা কি মনে জাগে?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণ

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি গত কয়েক বৎসর আগেকার মত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছিলেন না বটে—ব্যাধিতে তাঁহার দেহ অপটু হইয়াছিল; কিন্তু তিনি পরামর্শ, উপদেশ ও পরিচালনা দ্বারা অনেককে গবেষণার পথে অগ্রসর করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রেরণা লাভ করিতেছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে-শ্রেণীতে, জগদীশ চন্দ্রের স্থানও সেই শ্রেণীতে। ইহা শুধু অবৈজ্ঞানিক আমাদের মত নহে। বৈজ্ঞানিক কেহ কেহও এইরূপ মনে করেন, এবং আমরা মনে করি, যে, যত সময় যাইবে ততই অধিকসংখ্যক বৈজ্ঞানিক তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

ভাস্করাচার্য্যের পর বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-জগতে নূতন কিছু করে নাই। জগদীশ চন্দ্রের নানা আবিক্রিয়া বিজ্ঞানে ভারতের নব জাগরণের সূচনা করে। কেবল সূচনাই যে করে, তাহা নহে। তিনি ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এরূপ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেন, যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অপরিজ্ঞাত—হয়ত অচিন্ত্য—ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতীয়দিগকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের লোকেরা স্বপ্নবিলাসী এবং কেবল কাব্যে ও দর্শনে কিছু কৃতী মনে করিত। এরূপ জাতির মধ্যে জন্মিয়া, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরাও করিতে পারি," এই বিশ্বাস পোষণ করিবার সাহস ও পৌরুষ তাঁহার ছিল, এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিবার মত দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা তাঁহার ছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত কোন কোন তত্ত্ব বিনা দ্বন্দ্বে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও উদ্ভিদ- ও জীব- বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার মহৎ আবিক্রিয়াগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানজগতে তিনি এক জন বড় যোদ্ধা। যদি তাঁহার কোন কোন মত এখনও সকল বিজ্ঞানবিৎ স্বীকার না-করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে করিতে পারেন। কারণ, মানুষের অন্য কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে যেমন কেহ কেহ তাঁহাদের সমসাময়িকদিগের আগেই এমন অনেক মতের, পথের ও সত্যের সূচনা করেন যাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সমসাময়িকেরা তখনও অর্জ্জন করে নাই, অতীত কালে বিজ্ঞান-জগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা সম্বন্ধেও তাহা সত্য হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতেও এমন মানুষ জন্মিবেন যাঁহারা অগ্রদূত।

এখন কলেজের ছাত্রেরাও গবেষণা করে এবং কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। জগদীশ চন্দ্র যখন গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন, তখন ছাত্রদের কথা দূরে থাক্, ভারতবর্ষে তখন বিজ্ঞানাধ্যাপকের প্রধান পদগুলির দখলিকার ইংরেজ অধ্যাপকেরাও গবেষণা করিতে পারিতেন না ও করিতেন না—কেবল মোটা বেতনটা লইতেন। জগদীশ চন্দ্রের কৃতিত্বে এই জন্য ভারতবর্ষীয় তরুণ বিজ্ঞানাধ্যায়ী-দিগের মনে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁহার অতি মূল্যবান "আত্মচরিত" গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

'বসু পরে উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে যুগান্তরকারী সত্য আবিষ্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান এ নয়। সে বিষয়ে কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একটি বিষয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য—ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগৎ কর্ত্তৃক কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"
—১৫৮ পৃষ্ঠা।

"একজন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা বাংলা কাউন্সিলে একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, যে, আইন এদেশের বহু প্রতিভার সমাধিক্ষেত্রস্বরূপ হইয়াছে।" ১৫৯ পৃষ্ঠা।

"বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্ক্রিয়া-সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব, ধীরে ধীরে হইলেও, নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।" ১৫৯ পৃষ্ঠা।

পাছে কেহ ভুল বুঝেন, এই জন্য এখানে একটি কথা স্পষ্ট-ভাবে বলা আবশ্যক। জগদীশ চন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক যুগে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করায় কেহ যেন মনে না-করেন, গবেষকবহুল ও বৈজ্ঞানিকবহুল পাশ্চাত্য কোন দেশের পক্ষে তাঁহার গবেষণা ও আবিষ্কার বিস্ময়কর হইত না। সেখানেও বিস্ময়কর নিশ্চয়ই হইত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন আচার্য্য বসুর একটি গবেষণা সম্বন্ধে ত বলিয়াইছিলেন, "ইহা আমার মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়াছে।" আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, যাহা বিজ্ঞানোজ্জ্বল কোন দেশেও প্রশংসনীয় হইত, তাহা বিজ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত তাৎকালিক ভারতবর্ষে অধিকতর শ্লাঘনীয় হইয়াছিল।

জগদীশ চন্দ্র জীবিতকালে প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া নিদ্রালস বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, নিন্দায় কখনও দমিয়া যান নাই। এখন তিনি নিন্দা-প্রশংসার অতীত লোকে গিয়াছেন।

—

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয়

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয় ছিল প্রথমতঃ পদার্থ-বিদ্যার তড়িৎশাখার কোন কোন বিষয়। সেগুলির কিঞ্চিৎ আভাসও এখানে দেওয়া চলিবে না। কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গুণাবলী সম্বন্ধে জানলাভার্থ যে যন্ত্র উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন, পরে বে-তার বার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহৃত কোহিয়্যারার (coherer) যন্ত্রের সহিত তাহা প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ তিনিই এইরূপ যন্ত্র প্রথম উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন। এই কথাটিই "এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা" নামক ইংরেজী মহাকোষের নূতন, চতুর্দ্দশ, সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের ৯২৬ পৃষ্ঠায় একটুকু পেঁচাইয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যথা:—

"His first appearance before the British Association at Liverpool in 1896 was to demonstrate an apparatus for studying the properties of electric waves almost identical with the coherers subsequently used in all systems of wireless."

তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ও টাউনহলে বিনা তারে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইয়া প্রাচীরের অন্তরালে স্থিত পিস্তল আওয়াজ ও ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তাঁহার যন্ত্রের কার্য্য-কারিতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহা মার্কোনির বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র প্রচারিত হইবার আগেকার কথা।

তাঁহার কোহিয়্যারার-সদৃশ যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি দেখেন, তাহার মধ্যস্থিত ধাতুখণ্ডগুলি জীবের পেশীর মত কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, আবার বিশ্রামের পর বা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে কার্য্যক্ষম হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাকে জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবের সাদৃশ্য ও ঐক্য নির্দ্ধারণের দিকে চালিত করেন, এবং তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। উক্ত এন্সাইক্লোপীডিয়াতে সংক্ষেপে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা:—

"His discovery of a parallelism in the behaviour of the receiver to the living muscle led him to a systematic study of the response of inorganic matter as well as animal tissues and plants to various kinds of stimulus. After laborious researches he proved to the satisfaction of various scientific bodies that the life mechanism of the plant is identical with that of the animal."

বসু মহাশয়ের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়ার বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় এখনও বাহির হয় নাই। তাহার কিছু পরিচয় পরলোক-গত অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিস্তৃততর ও সংক্ষেপে সম্পূর্ণ পুস্তক রচনা ও প্রকাশের দুটি প্রধান বাধা আছে। বাংলায় অনেক পারিভাষিক শব্দ নাই, কিন্তু সংস্কৃতের সাহায্যে তাহা রচিত হইতে পারে। তাহা করিবার ও বহি লিখিবার লোক পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বাধা, এরূপ বহি প্রকাশিত হইলে কিনিবে কে ও পড়িবে কে? কিনিবার ও পড়িবার কিছু লোক পাওয়া যাইবে বটে। কিন্তু পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যয়ের সংকুলান তাহাতে না-হইবারই কথা। অতএব, এই অত্যাবশ্যক কাজটির জন্য যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ টাকা তুলিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বাঙালীদের একটি কর্ত্তব্য করা হয় এবং বঙ্গসাহিত্যেরও সমৃদ্ধি বাড়ে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নানা বিষয়ে নানা রকমের হইয়া থাকে। বসু মহাশয় মানবজ্ঞানের যাহা গোড়াকার কথা,

এ রকম নানা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, এবং বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রাণের, জীবনের, ও জৈব মূল পদার্থের (protoplasmএর) প্রকৃতি, অজৈব জড়ের ও জৈব পদার্থের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, জীব ও উদ্ভিদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রভৃতি নানা কঠিন প্রশ্ন তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। তিনি প্রকৃতিদেবীর গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃপুরে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার কারখানার গোপন কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধনায় যত দূর সিদ্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর।

—

বসু মহাশয়ের গবেষণা ও দর্শন

বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা দার্শনিকদিগের, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। ইহা তাঁহার ঐক্যসাধনা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধির পরিচায়ক। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায়, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া দার্শনিক হইবার ইচ্ছা করিলে দার্শনিকদিগের মধ্যেও অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। তাঁহার ঐক্যসাধনার তিনটি দিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় যাহাদিগকে অচেতন-জড়, উদ্ভিদ ও জীব বলা হয়, তাহাদের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য ও সমধর্ম্মিতা আবিষ্কার করেন; বিজ্ঞানের নানা শাখার মধ্যে তিনি একাত্মতা উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞানের অখণ্ডত্বের আভাস দেন, এবং বিজ্ঞানের ও দর্শনের জগৎ দুটি যে সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তাহাও তাঁহার গবেষণা দ্বারা উপলব্ধ হয়। নানা দিকে এইরূপ ঐক্যের অনুসন্ধান করা এবং তাহার সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া বসু মহাশয়ের প্রতিভার ভারতীয়ত্বের পরিচায়ক। এই কারণেই হয়ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁহার কোন কোন গবেষণার সত্যতা বুঝাইতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

আর একটা কারণ, তিনি কোন কোন বিষয়ে ছিলেন অগ্রদূত, অগ্রনায়ক, পথনির্ম্মাতা (pioneer)। ইহার আভাস অধ্যাপক বীরবল সাহনীর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধীয় লেখাটিতে পাওয়া যায়। ডক্টর সাহনী বর্ত্তমানে জীবিত রয়্যাল সোসাইটীর ভারতীয় তিন জন ফেলোর এক জন। তিনি বলেন, "...it is possible that he was well ahead of the times..."। "সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।"

—

যন্ত্রোদ্ভাবক জগদীশ চন্দ্র

অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অন্যের উদ্ভাবিত ও নির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা গবেষণা করিয়াছেন। বসু মহাশয়কে অনেক বিস্ময়কর এবং অতিসূক্ষ্মপরিবর্ত্তন-প্রদর্শক (delicate) যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে ও নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল। এখানে কেবল একটির উল্লেখ করিব। তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ—বাংলায় বৃদ্ধিমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে এই যন্ত্র অতি সামান্য বৃদ্ধিকে এক কোটি গুণ বড় করিয়া দেখাইতে পারে—ইহার বৃহদীকরণ শক্তি (magnifying power) এক কোটি গুণ (ten million times)। ভাল অণুবীক্ষণগুলির বৃহদীকরণ শক্তি এখন যন্ত্রনির্ম্মাতারা কত বেশী করিতে পারিয়াছেন জানি না, বোধ হয় দু-তিন হাজার গুণের বেশী হইবে না। কিন্তু বসুর বৃদ্ধিমান যন্ত্রের বৃহদীকরণ শক্তি এক কোটি গুণ। অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ যদি রস আকর্ষণ করিয়া এক ইঞ্চির এক-কোটিতম অংশ (১০০০০০০০০) বাড়ে, তাহা হইলে এই যন্ত্র দেখাইবে, যে, উহা এক ইঞ্চি বাড়িয়াছে।

অতিসূক্ষ্মপরিবর্ত্তনপ্রদর্শক এইরূপ সব যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য্য বসু এমন সব ব্যাপার মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, যাহা অভাবনীয় ছিল। তিনি তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে দেখাইয়াছিলেন, মানুষের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে গাছ কেমন বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদেরও হইয়াছিল।

এই রকম যন্ত্র তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ম্মাণ করিতে পারে, তিনি এইরূপ সুনিপুণ এক জন বাঙালী কারিকর পাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। কোন এক ব্যক্তি (বৈজ্ঞানিক) অধিক বেতনের লোভ দেখাইয়া এই কারিকরটিকে ভাঙাইয়া লইয়াছিল। কিন্ত

তাহাতে বসু মহাশয়ের কাজ বন্ধ হয় নাই। তিনি অন্যান্য কারিকরকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। অসূয়াপরবশ ঐ বৈজ্ঞানিকের নাম করিব না। তাহা সহজে অনুমেয়।

—

আচার্য্য বসুর আত্মসম্মানবোধ

আচার্য্য বসু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে গবর্মেণ্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চান; তাহার কারণ, তিনি ভারতবর্ষীয় লোক। তিনি কম বেতন লইতে রাজী হন নাই, তিন বৎসর কোন বেতনই গ্রহণ করেন নাই। শেষে তাঁহার আত্মসম্মানবোধের জয় হয়—তিনি তিন বৎসরের পুরা বেতন একসঙ্গে পান। তিনি যখন কম বেতন লইতে রাজী না হইয়া বিনা বেতনে তিন বৎসর কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল ও তজ্জনিত সংগ্রাম চলিতেছিল।

—

আচার্য্য বসুর বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানানুসরণ

ফাদার লাফোঁ কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার এক সভায় বলেন, যে, জগদীশ চন্দ্র যদি তাঁহার বেতার যন্ত্রের পেটেণ্ট লইয়া ঐ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে মার্কোনীর পরিবর্ত্তে তিনিই বেতারবার্ত্তা প্রেরণের উদ্ভাবক ও পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, এবং, শুধু প্রসিদ্ধ নহে, প্রভূত ধনশালীও হইতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ধনী হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার অন্য বহু যন্ত্রের পেটেণ্ট লইলেও তিনি ধনী হইতে পারিতেন। কোন কোন পাশ্চাত্য যন্ত্রনির্ম্মাতা কোম্পানী প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তাঁহার কোন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার চাহিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার কোন কোন পাশ্চাত্য বন্ধু তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার প্রাথম্যের প্রমাণ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার জন্য কোন কোন যন্ত্রের পেটেণ্ট লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল, যে, তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রগুলি যাঁহার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে তিনিই মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করুন।

তিনি মিতব্যয়িতার দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বসু বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য ব্যয় করিয়াছেন ও রাখিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সৎকার্য্যের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই সঞ্চিত ধনের পরিমাণ সতর লক্ষ টাকা।

—

আচার্য্য বসুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি যন্ত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "শোষণ-গ্রাফ"। তিনি বাংলা লিখিয়াছিলেন কম, কিন্তু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কবিত্বপূর্ণ, তাহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। ইংরেজী যাহা লিখিতেন—এবং ইংরেজী পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বিস্তর লিখিয়াছিলেন, তাহাও সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য সুবিদিত। বস্তুতঃ তিনি যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করিয়া সাহিত্যের সেবায় জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইলে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মনোজ্ঞ, তেজোগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ ও শক্তিসঞ্চারিণী রচনার দ্বারা সাহিত্যকে সম্পৎশালী করিতে ও যশস্বী হইতে পারিতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেন। পরে তিনি উহার সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গবেষণার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তিনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ ঐ সম্মেলনের অভিভাষণগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা যত দূর জানি, প্রবাসীর সম্পাদক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" নামক মাসিক পত্রিকার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়, তাহাই মাসিকপত্রে তাঁহার প্রথম রচনা। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবে

তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র-প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; বহু-দূর-প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল* এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত উর্দ্ধে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণবায়ু দেবধূপের† সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমস্ত পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্ব্বতের বজ্রনিনাদ, স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য! সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম।

মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার-শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

† তুষারক্ষেত্রজাত এক প্রকার সুগন্ধ গুল্মবিশেষ।

জগদীশ চন্দ্র ও সুকুমার শিল্প

আগে বলিয়াছি, জগদীশ চন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সাহিত্যসৃষ্টিতে মন দিতেন, তাহা হইলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। কবি-প্রতিভার অনুরূপ প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সুকুমার শিল্পের, ললিতকলার, অনুশীলন করিলে, তাহাতেও কৃতী হইতে পারিতেন। বসু-বিজ্ঞানমন্দির, তাহার উদ্যান ও অন্যান্য অংশের পরিকল্পনায় তাঁহার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের চিত্র অন্যের অঙ্কিত, কিন্তু পরিকল্পনা তাঁহার। তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রাচীর-গাত্রে এবং ছাদের ভিতর পিঠের উপর অঙ্কিত ছবিগুলি অন্যের আঁকা। কিন্তু কি আঁকিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। একটি প্রাচীরের গাত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মাতৃমূর্ত্তি" অঙ্কিত আছে।

কথিত আছে, ম্যাক্সিম-কামান ও নানাবিধ আকাশ-যানের উদ্ভাবক বিখ্যাত যন্ত্রনির্ম্মাতা সর্ হীর‍্যাম ম্যাক্সিম জগদীশ চন্দ্রের নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার হাতখানি দেখিতে চান। তাহা দেখিয়া ও নাড়িয়া-চাড়িয়া বলেন, এরূপ সূক্ষ্ম অনুভবশক্তিসম্পন্ন হাত কেবল হিন্দুরই হইতে পারে। যে প্রতিভা ও সূক্ষ্ম স্পর্শশক্তি তাঁহাকে বিস্ময়কর নানা যন্ত্র-উদ্ভাবনে সমর্থ করিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে চারু-

শিল্পের সাধনাতেও সিদ্ধি দিতে পারিত, যদি তিনি সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কবি ও শিল্পী হইতে হইলে যে সৌন্দর্য্যবোধ, যে সুষমার উপলব্ধি, যে রসানুভূতি আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আকস্মিক নহে। উভয়ের প্রকৃতি ও প্রতিভার সাদৃশ্য এই বন্ধুত্বের কারণ। আমরা তাহা অনুভব করিতাম। কবি নিজেও তাহা বলিয়াছেন।
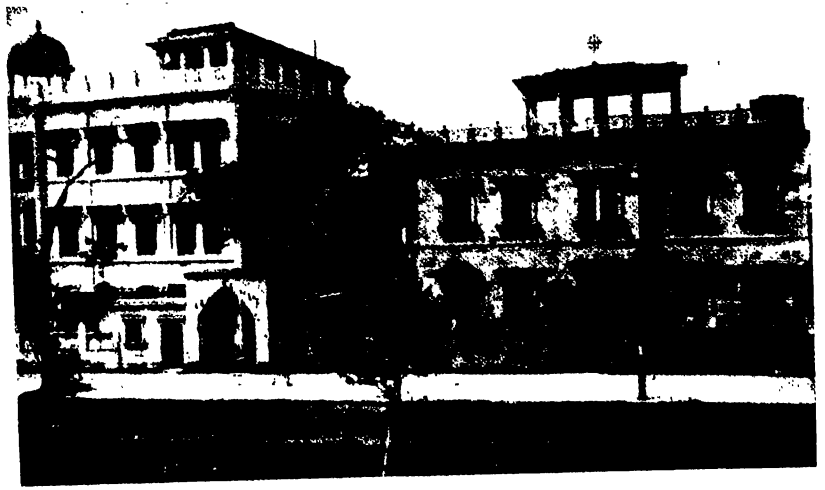
বসু-বিজ্ঞানমন্দির

দেশী জিনিষের প্রতি জগদীশ চন্দ্রের অনুরাগ

ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গীয় পণ্যশিল্পজাত নানা সামগ্রী জগদীশ চন্দ্রের প্রিয় ছিল। ইহা যাঁহারা না-জানেন, তাঁহার গৃহসজ্জা হইতে তাহা অনুমান করা তাঁহাদের পক্ষেও সহজ।

বঙ্গের পল্লীগ্রামের জীবন এবং পল্লীগ্রামবাসী লোকদের খাদ্য তাঁহার কিরূপ প্রিয় ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব।

একবার তিনি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন অপরাহ্ণের জলযোগের সময়। উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আসিল। তিনি বলিলেন, এ-সব রাখ; মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা আন। তাহা আনা হইলে কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে লাগিলেন। যাহাতে মুড়ি মিয়াইয়া না যায়, সেই জন্য তাঁহার মুড়ি কাচের ছিপিযুক্ত বড় কাচের পাত্রে রাখা থাকিত।

জগদীশ চন্দ্রের ভারতভক্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা

আচার্য্য বসুর সহিত যাঁহারা মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ ভারতভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও তাঁহার সহিত যে ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের গভীর যোগ ছিল, ইহা তাহার প্রধান কারণ।

রয়্যাল ইনষ্টিটিশনে আচার্য্য বসু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার বর্ণনা করিতেছেন (১৮৯৬-৯৭)

পরমার্থ চিন্তায় জগদীশ চন্দ্র

জগদীশ চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং বৈদান্তিক মত যেরূপ বুঝিতেন তদনুসারে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন উপাসনায় ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আরাধনা পাঠ করিতেন। প্রার্থনা তিনি কিংবা তাঁহার সহধর্ম্মিণী, যেদিন মনের ভাব যেরূপ হইত, সেইরূপ করিতেন। কবি রজনীকান্ত সেনের নিম্নমুদ্রিত গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল :—

কেন বঞ্চিত হব চরণে!
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা! তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারী!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ, তার,
এ কি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু মরমে।

আচার্য্য বসু তাঁহার একটি বক্তৃতার শেষে বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধে ইংরেজীতে ঋষিদের বাক্য বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি,
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ,
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

"সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একেশ্বর যিনি আপনার এক রূপকে বহু করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ (আপনাদের মধ্যে স্থিত) দেখেন, তাঁহাদের সুখ শাশ্বত, অন্যদের নহে।"

বহুর মধ্যে এককে যিনি জানেন, তিনিই সত্য জানিয়াছেন, অন্যেরা নহে, এই মর্ম্মের উপনিষদ্‌বাক্য তাঁহার প্রিয় ছিল। বহুর মধ্যে এই একের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন।

পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কর্ম্মের পথ, রসানুভূতির পথ, ও জ্ঞানের পথ তাঁহার অধিগম্য ছিল, এবং তিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—

ভিয়েনার অধ্যাপক হান্স মোলিশ

ভিয়েনার সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক হান্স মোলিশ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে কয়েক
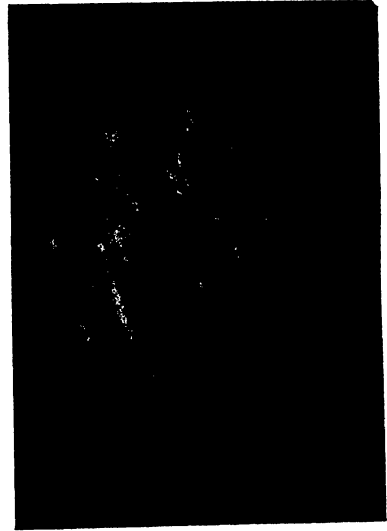
অধ্যাপক হান্স মোলিশের প্রতিমূর্ত্তি

মাস ছিলেন। তিনি যেমন বিদ্বান ও প্রতিভাবান্ গবেষক ছিলেন, মানুষটিও তেমনি সরল ছিলেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় খাদ্য পর্য্যন্ত, খুব ভালবাসিতেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের কোন কোন যন্ত্র তিনি এরূপ বিস্ময়কর মনে করিতেন যে, বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে সেই যন্ত্রগুলির পাশ দিয়া যাইবার সময় প্রতিবার নমস্কার করিতেন। তিনি ১৯২৯ সালের ১৩ই এপ্রিলের বিখ্যাত বিলাতী বৈজ্ঞানিক কাগজ নেচ্যরে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের এবং আচার্য্য বসুর আবিষ্ক্রিয়া-সমূহের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল—হয়ত বরাবরই এখানে থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইতে থাকায় তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। তিনি আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের প্রতি বিশেষ প্রীতিমান্ ও অনুরক্ত ছিলেন। এখন ভাবিতে ভাল লাগে উভয়ে পরলোকে মিলিত হইয়াছেন।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার লিখিয়াছি, এবার পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। অধিবেশনে কি কি কাজ হইবে, অভ্যর্থনা-সমিতির এবং অধিবেশনের কি কি কাজে কাহারা নেতৃত্ব করিবেন, তাহাও জানান হইয়াছে।
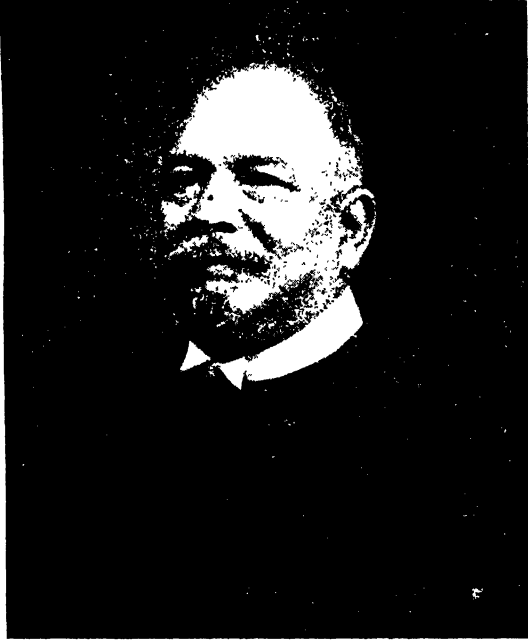
সর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতি

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—মূল সভাপতি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন—সভাপতি, বৃহত্তর বঙ্গ শাখা
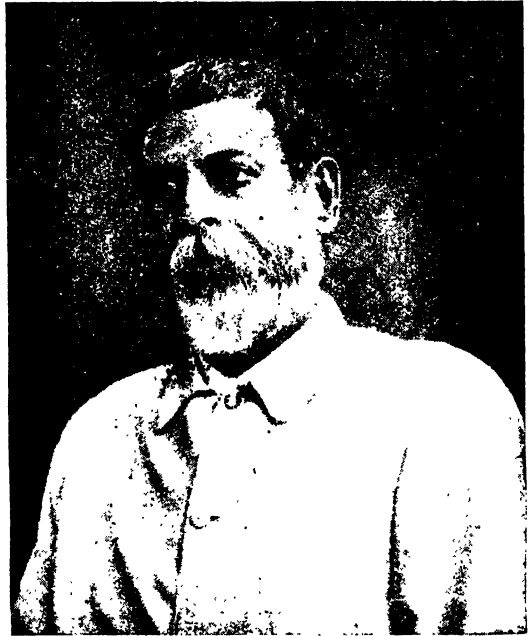
শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী—সভাপতি, দর্শন শাখা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে একবার মীরাটে, সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে, সভাপতি হইয়াছিলেন। এখন পুনর্ব্বার সভাপতিত্ব করিবেন। সম্মেলনে অর্থনীতির চর্চা হইয়া থাকে। প্রবাসী বাঙালীদের সাংসারিক অবস্থা ভাল

শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী—সভানেত্রী, সঙ্গীত-শাখা

শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী - সভানেত্রী, মহিলা সভা

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার—সভাপতি, সাহিত্য-শাখা

রায় সাহেব শ্রীঅন্নদাকুমার ঘোষ—সাধারণ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার—সভাপতি, ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল—সভাপতি, বিজ্ঞান-বিভাগ

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ—সভাপতি, অর্থনীতি-বিভাগ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি, কলা-বিভাগ

না হইলে, সচ্ছল না হইলে, তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে, বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও সম্পদবৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং যদি কেবল বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও সম্পদবৃদ্ধিই সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলেও, বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের আর্থিক অবস্থার সম্যক্ আলোচনা সম্মেলনের একটি কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু সাহিত্যসেবা ও সাহিত্যচর্চ্চার সহিত আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক বিবেচনা না করিলেও, প্রবাসী বাঙালীদের আর্থিক অবস্থা ও তাঁহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্মেলনের একটি উদ্দেশ্য।

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন—সভাপতি, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সমিতি

ইহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সম্বৎসর কাজ করিবার নিমিত্ত একটি কমীটি নিয়োগের বিষয় সম্মেলন বিবেচনা করিতে পারেন। ইহা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি।

বঙ্গের বাহিরে সকল প্রদেশে, বঙ্গেও, নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক ও শৈক্ষিক কি কি পরিবর্ত্তন করিলে আমরা টিকিয়া থাকিতে পারিব, শুধু টিকিয়া থাকিতে পারিব এমন নহে, অধিকন্তু সমাজের কল্যাণ করিতে পারিব, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তিতব্য। এ বিষয়ে আচার্য্য রায় মহাশয়ের উপদেশ ও পরামর্শের মূল্য যে কত বেশী, তাহা বলা অনাবশ্যক। তিনি একাধারে শিক্ষা, পণ্যশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এবং মানবসেবাব্রত।

একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের অবস্থার অবনতির জন্য অপর কাহাকেও দোষ দিয়া কোন লাভ নাই। আত্মপরীক্ষা ও স্বাবলম্বনে অধিকতর মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবাসী বাঙালীদের পরস্পর সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পে অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, ইহা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। এ বিষয়ে প্রত্যেক বাঙালীর অন্য বাঙালীর সহায় হওয়া উচিত।

এবার আমরা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিব না। রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যাইতে হইবে। পাটনায় যে-সকল মহিলা ও ভদ্র ব্যক্তি সমবেত হইবেন, তাঁহাদিগকে সাদর নমস্কার করিয়া তাঁহাদের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করিতেছি।

—

শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সভা

শান্তিপুরের সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে গত মাসে শান্তিপুর গিয়াছিলাম। এই প্রসিদ্ধ স্থানটিকে এখানকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রাম বলিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা একটি ছোট শহর। এখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় আছে, সাধারণ লাইব্রেরি ও পাঠাগার আছে, তদ্ভিন্ন সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরি ও পাঠাগার আছে, এবং সিনেমাও আছে। টাউনহল আছে। এখানকার ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরটি পুরাতন। এখানে এক দিন প্রাতে উপাসনা করিয়াছিলাম। শান্তিপুর যে মধ্যযুগে অদ্বৈত আচার্য্যের জন্মস্থান ও সাধনার ক্ষেত্র ছিল তাহা বঙ্গে সুবিদিত। এই কারণে ইহা এখনও বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান। আধুনিক কালে ইহা ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও সাধু অঘোরনাথের জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। বিজয়কৃষ্ণ যে ঘরটিতে লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, কেবল সেই ঘরটি আছে, তাঁহাদের বাড়ীর অন্য সকল অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপুর সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। কিন্তু এখন তাঁহাদের বংশের কেহ সেখানে থাকেন না।

আমি সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিপুর গিয়া পরিষদ সম্বন্ধে যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, তাহাতে প্রীত ও উৎসাহিত হইয়াছি। মফঃসলে সাহিত্য-পরিষদের নিজের বাড়ী অল্প জায়গাতেই আছে। শান্তিপুরেও এখনও নাই বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মীরা একটি প্রশস্ত জায়গা কিনিয়াছেন এবং পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত টাকা তুলিতেছেন। শান্তিপুরের কৃতী সন্তানেরা যিনি যেখানেই থাকুন, এই কাজটির জন্য তাঁহাদের মুক্তহস্ত হওয়া উচিত।

পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন দু-দিন হইয়াছিল। প্রথম দিন গোড়া হইতেই খুব লোকসমাগম হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনও শেষ পর্য্যন্ত খুব লোক হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত অভিভাষণ, ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মফঃসলের অনেক জায়গায় সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধপাঠ ও কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি প্রভৃতি অল্পবয়স্কেরাই করিয়া

শান্তিপুর ষ্টেশনে শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসবের অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা

থাকেন। শান্তিপুরে তাহার অভাব হয় নাই। কিন্তু দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সেখানে বর্ষীয়ান্ (৭৬ বৎসর বয়স্ক) সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পড়িলেন। ভাল প্রবন্ধ আরও ছিল। সব মনে নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যালের কবিতাটি ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতাও মননশীলতা ও ভাবুকতার পরিচায়ক হইয়াছিল। ভাল কবিতা আরও ছিল মনে হইতেছে। কিন্তু নাম মনে নাই। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী ও কর্ম্মিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিকের কার্য্যবিবরণটি হইতে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়।

লোকমুখে যে আশানন্দ ঢেঁকির অনেক বীরত্বকাহিনী বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি শান্তিপুরবাসী ছিলেন। তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। পুরাতন অনেক শহরের মত শান্তিপুর ক্ষয়িষ্ণু নহে দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। এখানকার বহু সাহিত্যিকের নানা পুস্তক দেখিয়া মনে হয়, এখানে সাহিত্যচর্চ্চাও সোৎসাহে হইয়া থাকে।

নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে প্রবাসীর সম্পাদককে সাধারণ সভাপতির কাজ করিতে হইবে। এই পাঁচ দিনের কার্য্যসূচি আপাততঃ যেরূপ স্থির হইয়াছে, তাহা নীচে মুদ্রিত হইল। ইহার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

২৪শে ডিসেম্বর। অপরাহ্ণ। উদ্বোধন; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের অভিভাষণ; সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ। রাত্রে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

২৫শে ডিসেম্বর। প্রাতঃকাল ৮টা সাহিত্য-শাখার অধিবেশন। সভাপতি—'প্রতাপসিংহ'-কাব্যরচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী। অপরাহ্ণ ৩টা, সাহিত্যালোচনা; সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬টা, ললিতকলা ও সঙ্গীত শাখার অধিবেশন; সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

২৬শে ডিসেম্বর। প্রাতে ৮টার সময় ইতিহাস-শাখার অধিবেশন; সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনার‍্যাল। অপরাহ্ণ ৩টায় বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন; সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার। সন্ধ্যা ৭টায় বালিকাদের ব্রহ্মদেশীয়, মণিপুরী ও ভারতীয় নৃত্য, এবং রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র অভিনয়।

২৭শে ডিসেম্বর। প্রাতে ৮টায় দর্শন-শাখার অধিবেশন; সভাপতি পণ্ডিত শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্ণ ৩টায় অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব-শাখার অধিবেশন; সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভৌমিক (ভূতপূর্ব্ব সাইমন কমিটির প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক)। সন্ধ্যায়; কবিতা আদি আবৃত্তি ও রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয়।

২৮শে ডিসেম্বর। প্রাতে সম্মেলনের শেষ অধিবেশন। ইহাতে

ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের নানা সমস্যার আলোচনা হইবার কথা আছে। অপরাহ্ণে সামাজিক প্রীতিসম্মেলন।

—

রেঙ্গুনে চিত্রপ্রদর্শনী

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি চিত্রপ্রদর্শনী হইবে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আশা করেন, যে, বঙ্গের চিত্রশিল্পীগণ তাঁহাদের কিছু কিছু ভাল চিত্র পাঠাইয়া ব্রহ্মদেশে বঙ্গের চিত্রকলার সুনাম রক্ষার সাহায্য করিবেন। প্রদর্শিত চিত্রসমূহ সম্মেলনের ব্যয়ে ভাল অবস্থায় ফেরত দেওয়া হইবে। শিল্পপ্রদর্শনী উপসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর লিখিয়াছেন, "এই প্রদর্শনীতে ব্রহ্ম ও চীন দেশের শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এদেশীয় শিল্পীদের কেহ কেহ বাংলার চিত্রের সঙ্গে তাঁহাদের চিত্র প্রদর্শিত হইবে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। যদি আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তবে ইহা একটি অভিনব প্রদর্শনী হইবে। এইরূপ প্রদর্শনীর আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এবং তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা এই—ব্রহ্ম, চীন ও বাংলার শিল্পীদের চিত্রাবলী একত্র প্রদর্শিত হইলে এমন একটি নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা যাহাতে সত্যিকার প্রাণের টান থাকিবে। ইহার দ্বারা ক্রমে একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। এই ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে সুফল ফলিবে নিশ্চয়; উল্লিখিত জাতিগুলির মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে; বিস্মৃতপ্রায় ভারতীয় সভ্যতার আলোক এই জাতিগুলির মধ্যে পুনরায় বিকীর্ণ হইবে।"

চিত্রপ্রদর্শনী উপসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর মহাশয়ের ঠিকানা, 74, Fraser Street, Rangoon.

চিত্র সংগ্রহের জন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাবিমল চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং শিল্পীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। তিনি এ পর্য্যন্ত ৭৫টি চিত্র পাইয়াছেন।

—

জাপানের অভিযান, পথ, ও লক্ষ্য

ব্রিটিশ জেনার‍্যাল সর্ আয়্যান হামিল্টন লিখিয়াছেন, যে, জাপানের লক্ষ্য ভারতবর্ষের মালিক হওয়া; জাপান চীন দখল করিতে পারিলে তাহার পর ব্রহ্মদেশ, তাহার পর আসাম এবং তৎপরে বাংলা দেশ আক্রমণ করিবে ও দখল করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা তিনি না বলিলেও আমরা অনেকেই ইহা অনুমান করিয়াছি। এবং শুধু অনুমান নহে। যখন লর্ড কারমাইকেল বঙ্গের গবর্ণর এবং মিঃ লায়ন তাঁহার শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন, তখন আমরা জাপানের একটি গোপনীয় কাগজের বিষয় মর্ডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ দখল করা যে জাপানের অভিপ্রেত, তাহা তাহাতে ছিল। এই বিষয়টি মিঃ লায়নের গোচর করা হইলে তিনি জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়কে বলেন, যে, গবর্মেণ্ট ইহা অবগত আছেন, কিন্তু কি করা যায়?

এই যে "কি করা যায়?" ভাব, ইহা এখনও চলিতেছে। এ বিষয়ে পরে আরও কিছু লিখিব।

সর্ আয়্যান হামিল্টন যাহা বলিয়াছেন, যদি বাস্তবিক তাহা ঘটে, তাহা হইলে, ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষ রক্ষা সম্ভবপর হইলেও ভারতীয়েরা আত্মরক্ষার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। কারণ, ভারতবর্ষের অধিক প্রদেশের লোকদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখান হয় নাই। আধুনিক যুদ্ধে জয় শুধু বহু সৈন্য থাকিলে হয় না। নানাবিধ যে-সব যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন (mechanization) আবশ্যক হয়, তাহারও যথেষ্ট ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করা হয় নাই। এখন মরণকালে হরিনামের মত ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ছয় লক্ষ পাউণ্ড ভারতবর্ষকে দিবেন বলিয়াছেন! ইহাতে কি হইবে? হয়ত গোরা সৈন্যদের সমরসজ্জা কিছু ভাল হইবে, কিন্তু সিপাহীদের আধুনিক যুদ্ধসজ্জা সম্বন্ধে অবস্থা "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"ই থাকিবে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যথেষ্ট সংখ্যায় সামরিক শিক্ষা পাইলে ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাইলে যে, শুধু আত্মরক্ষা নহে, ইউরোপকে পর্য্যস্ত বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ, তাহা জেনার‍্যাল সর্ আয়্যান হামিল্টন তাঁহার "এ স্টাফ অফিসার্স স্ক্র্যাপ-বুক ডিউরিং দি রাসো-জাপানীজ ওয়ার" (A Staff Officer's Scrap Book During the Russo-Japanese War) নামক পুস্তকের প্রথম ভল্যুমের ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। যথা—

> "All this is supposed to be a secret, a thing to be whispered with bated breath, as if every sepoy did not already know who does the rough and dirty work, and who, in the long run, does the hardest fighting. Nevertheless, these very officers who know will sit and solemnly discuss whether our best native troops would, or would not, be capable of meeting a European enemy! Why—there is material in the north of India and in Nepaul sufficient and fit, under good leadership to shake the artificial society of Europe to its foundations if once it dares tamper with that militarism which now alone supplies it with any higher ideal than money and the luxury which that money can purchase."

এই সব কথা বলিবার পর লেখক সিপাহীদের সহিত জাপানী সৈন্যদের তুলনামূলক কথাও বলিয়াছেন, এবং এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, জাপানীদের মত শিক্ষা পাইলে ভারতীয় সিপাহীরা কোন অংশে নিকৃষ্ট থাকিবে না। তিনি উত্তর-ভারত ও নেপালের কথাই এই জন্য বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল হইতে গবর্মেণ্ট সৈন্য সংগ্রহ করেন না বলিলেও চলে।

ভারতীয় সৈন্যেরা যে ইউরোপীয় যে-কোন দেশের সৈন্যদের সমকক্ষ তাহা গত মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা ফ্রান্সে যথাসময়ে না পৌঁছিলে জার্ম্যানরা ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যদিগকে পরাভূত ও অভিভূত করিয়া ব্রিটেন আক্রমণ করিতে পারিত। কেবল ভারতীয় সিপাহীরাই যে তখন আশ্চর্য্য সাহস ও সংগ্রাম-সামর্থ্য দেখাইয়াছিল তাহা নহে; যুদ্ধে বিস্তর ব্রিটিশ সেনানায়কের মৃত্যু হওয়ায়, ভারতীয় সেনা-নায়কদিগকে সৈন্য পরিচালন করিতে হইয়াছিল। এই নেতৃত্ব-কার্য্যে তাঁহারা ব্রিটিশ সেনানায়কদিগের সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষম এত লোক থাকিতেও ব্রিটেন স্বার্থপরতা বশতঃ এবং ভারতবর্ষ পাছে স্বাধীন হইয়া যায় সেই ভয়ে ভারতবর্ষের সমুদয় যুদ্ধক্ষম লোকদিগকে যুদ্ধ শিখিবার সুযোগ দেয় নাই। সুযোগ দিলে, ভারতবর্ষ দখল করিবার কল্পনা জাপানীদের মনে উদিত হইত না।

—

"আকাশযান-চালক হইতে দিব না"

আধুনিক যুদ্ধে সকলের চেয়ে বেশী দরকার, এরোপ্লেন ও এরোপ্লেন-চালক এবং এরোপ্লেনের বন্দুক, কামান ও বোমা। ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগ এ বিষয়ে যথেষ্ট আয়োজন এখনও করে নাই। ভারতবর্ষীয়দিগকে সামরিক এরোপ্লেন-চালনা শিখান দূরে থাকুক, যাত্রীবাহী ও মালবাহী এরোপ্লেনের চালক যাহাতে যথেষ্টসংখ্যক ভারতীয় হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও নাই। ইহার বিপরীত ব্যবস্থাই বরং আছে। ব্যবস্থা কিরূপ তাহা বলিতেছি।

ব্রিটেনে এবং ইউরোপের যে-কোন দেশে দু-হাজার টাকা খরচ করিলেই বাণিজ্যিক এরোপ্লেনের চালক হইবার মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে যায় না। অবস্থা এইরূপ দেখিয়া কোন কোন ভারতীয় যুবক বিলাত গিয়া বাণিজ্যিক চালক হইবার অনুমতিপত্র লইয়া আসেন। এখানকার কর্ত্তারা কিন্তু বলিলেন, ওটা বিদেশী অনুমতি-পত্র (licence), এদেশে চলিবে না! অথচ গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাধারণ, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক, চিকিৎসা-বিষয়ক ডিগ্রীগুলিকে এদেশের ডিগ্রীগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, আইন-ব্যবসা করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টারদিগকে এদেশের উকীলদের চেয়ে উচ্চ স্থান দেন!

প্রথমে এদেশে নিয়ম করা হয়, বাণিজ্যিক এরোপ্লেন-চালকের অনুমতিপত্র পাইতে হইলে ৫০ ঘণ্টা এরোপ্লেন চালনার অভিজ্ঞতা চাই। তাহাতে খরচ হইত ২০০০৲ টাকা। তাহা অধিকাংশ ভারতীয় যুবকের সাধ্যাতীত হইলেও, দু-এক জন তাহা ব্যয় করিয়া অনুমতি পাইবার চেষ্টা করিল। গবর্ন্মেণ্টের উড্ডয়ন বিভাগের ব্রিটিশ কর্ত্তারা প্রমাদ গণিয়া নিয়ম করিলেন, ১০০ ঘণ্টা না উড়িলে অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাতে খরচ হয় ৪০০০৲ টাকা। ইহাতেও সমুদয় ভারতীয় যুবককে নিবৃত্ত করা গেল না। সুতরাং এখন নিয়ম হইয়াছে, যে, ২০০ ঘণ্টা না উড়িলে বাণিজ্যিক এরোপ্লেন-চালক হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহার খরচ ৮০০০৲ টাকা।

অবশ্য, যদি কখনও কেহ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন করে, যে, ভারতীয় সরকারী সামরিক বা অসামরিক উড্ডয়ন বিভাগে যথেষ্ট উড্ডুক্কু ভারতীয় নাই কেন, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা হইবে, উপযুক্ত ভারতীয় যুবক পাওয়া যায় না।

—

আকাশপথে আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়

ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তারা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, আকাশপথে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে! এখন কার্য্যতঃ বলিতেছেন, "তোমরা সব নিজের নিজের বাড়ীর নীচে গর্ত্ত খোঁড়, আকাশ থেকে যখন বোমা পড়বে, তখন ইন্দুরের মত গর্ত্তে লুকিও; আর যদি বড্ড বেশী ভয় করে, তা হ'লে নিকটবর্ত্তী কোন বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বতগুহা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটে রাখ; সেই পথ দিয়ে পালিও।" অবশ্য, ৩৫ কোটি মানুষের জন্য দু-শ পাঁচ-শ বা দু-হাজার পাঁচ হাজার বিষাক্ত-গ্যাস-প্রতিরোধক মুখোসেরও ব্যবস্থা হইতেছে। তবে কি না, সেগুলা ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগকে দিতেই ফুরাইয়া যাইবে।

বাহির হইতে কেহ যদি আকাশপথে এরোপ্লেন-যোগে আক্রমণ করে, ভারতীয় এরোপ্লেন তৎক্ষণাৎ উড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করিবে, এই উৎকট কল্পনা ভারতবর্ষের মনুষ্যমূর্ত্তিধারী ভাগ্যনিয়ন্তাদের মাথায় স্থান পাইতেছে না। কারণ, ভারতবর্ষের লোকেরা আকাশে উড়িবে, এ চিন্তা অসহ্য। তাহারা চিরকাল মাটিতে হামাগুড়ি দিবে, কিংবা আরও ভাল, কেঁচোর মত বুকে হাঁটিবে।

—

মহাত্মাজী আইন-আচার্য্য হইবেন

স্বরাজলাভের জন্য আবশ্যক হইলে ব্রিটিশ-রচিত আইন অহিংসভাবে ভাঙা যাইতে পারে, এই ব্যবস্থা দেন, এবং স্বয়ং ভাঙেনও মহাত্মাজী। এখন তাঁহাকে ব্রিটিশ আইন দ্বারা স্থাপিত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় এল্‌.এল্‌. ডী, অর্থাৎ

আইনসমূহের ডাক্তার, উপাধি দিবেন, এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদকেও এই উপাধি দিবেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। জবাহরলাল গ্রহণ করিবেন না।

—

সাংবাদিকের ডক্টরত্ব লাভ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাহার জুবিলী উপলক্ষ্যে কোন কোন ধনী দাতাকে এবং কোন কোন বিদ্বান বা রাজনৈতিক আন্দোলককে ডক্টর অর্থাৎ আচার্য্য উপাধি দিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে "লীডার" দৈনিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিরুরাভরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণিকেও এল্‌.এল-ডী উপাধি দিবেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণও নহেন, কিন্তু খুব যোগ্য লোক। ভারতীয় সাংবাদিকের পক্ষে এই বোধ হয় প্রথম সুযোগ্য সাংবাদিক বলিয়া "আচার্য্য" উপাধি লাভ ঘটিল।

আমরা কিছু কাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, যে, কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমৃতবাজার পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়কে এবং কোন বড় বাঙালী ব্যবসাদারকে এল্‌ এল্‌-ডী ও ডী-কম্‌ উপাধি দিলে "একটা নূতন কিছু" করা হইবে। কিন্তু সাংবাদিককে ডক্টর করিলে অতঃপর নূতন কিছু হইবে না।

—

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে "উড়িষ্যার চিত্র" লিখিয়া তিনি প্রথম যশস্বী হন। তাহার পর তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের বহি এবং উপন্যাসাদি লিখিয়াও খ্যাতি-লাভ করেন। তিনি ধর্ম্মমতবিষয়ে পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণির মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ভিন্নমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁহার "সন্ধি" উপন্যাসটি পড়িলে বুঝা যায়, তিনি সুব্যবস্থিত ও সুনীতি-নিয়ন্ত্রিত নারীপ্রগতি চাহিতেন। তাঁহার জন্ম নদীয়া জেলায়, কিন্তু তিনি বাস করিতেন ফরিদপুরে। সেখানকার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিরূপে তিনি তথাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন ও তাহার উন্নতির চেষ্টা করিতেন।

—

পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ৯৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি খুব স্বল্পাহারী ছিলেন। তাঁহার বয়স এত হইয়াছিল, যে, তাঁহার অনেক বৃদ্ধ পুরাতন ছাত্রও জানিতেন না, যে তিনি বাঁচিয়া আছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভাট্টাচার্য্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, আর কিছুদিন পরে আমরা জীবিত এক বিদ্বানের শতবার্ষিক উৎসব করিব। তাহা আর হইল না। কবিরত্ন মহাশয় "শব্দসার" অভিধান প্রণেতা পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র এবং স্বয়ংও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৯০এর কাছাকাছি।

—

লক্ষ্ণৌপ্রবাসী অধ্যাপক হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্‌-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তৃত ও গভীর ছিল, এবং তিনি ইংরেজী লিখিতেন ভাল। তিনি অনেক কলেজে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে অধ্যাপক ছিলেন, গোয়ালিয়রে ভিক্টোরিয়া কলেজে। তিনি লক্ষ্ণৌতে গঙ্গাপ্রসাদ স্মারক লাইব্রেরী এবং গোয়ালিয়রে সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর উদ্যোক্তা ছিলেন। গোয়ালিয়রে থাকিবার সময় তিনি একটি বাংলা লাইব্রেরীর জন্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে কোন কোন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা তাঁহার নিকট বাংলা শিখিতেন। এই বৎসর মে মাসে তিনি গোয়ালিয়রের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় নম্র অথচ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন।

—

লক্ষ্ণৌপ্রবাসী সুধীরকুমার সেন

লক্ষ্ণৌপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেনের মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজের এক জন উদ্যোগী মানুষের তিরোভাব হইল। তিনি বিখ্যাত লোক ছিলেন না, কিন্তু যাহা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কিছু প্রবাসী বাঙালীরা ও বঙ্গের বাঙালীরা—বিশেষতঃ বেকারেরা, করিলে আপনাদের উপকার ও দেশের কল্যাণ করিতে পারিবেন। তিনি লক্ষ্ণৌতে মজবুত ও সুদৃশ্য জুতা ও বুট প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়া অনেক বৎসর হইতে চালাইতেছিলেন। তাঁহার জুতার কিছু কাটতি বাংলা দেশেও ছিল। বাঙালীরা সকল রকম কারখানা ও ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে সুফল ফলিবে। জুতা সেলাই হইতে বিক্রি পর্য্যন্ত কোন কাজই তুচ্ছ বা নিন্দনীয় নহে। গোঁড়া হিন্দুদের মতও এইরূপ মতের অনুকূল। সুরাটে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন

হয়, তাহাতে এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যে, হিন্দু সমাজে হিন্দুদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-কোন সামগ্রী আবশ্যক হয়, তাহা প্রস্তুত করা হিন্দুদের কর্ত্তব্য এবং তাহা প্রস্তুত করা সকল জাতির ও শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে বৈধ।

বহি বাঁধাইবার জন্য চামড়ার মলাটে এবং ছোট ছোট চর্ম্মপেটিকায় শোভন চামড়ার কাজ আজকাল অনেক ভদ্র হিন্দু গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরাও শিখেন ও করেন।

—

ডারুইনের ও জগদীশ চন্দ্রের আবিক্রিয়ায় নূতনত্ব

ডারুইন ক্রমবিকাশ বাদ, বিবর্ত্তন বাদ বা অভিব্যক্তি বাদের আবিষ্কারক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অভিব্যক্তি বাদের মত একটি মত ছিল। ভারতবর্ষেও কোন কোন দর্শনে এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত সৃষ্টির বৃত্তান্তে বিবর্ত্তন বাদের মত একটি মত লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও কোন কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বাদের মত একটি মত প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং ডারুইন যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল না; তাহার সামান্য কিছু আভাস বিদ্বৎসমাজ অতীত কালেও পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে যুগান্তরকারী আবিষ্কারক কেন বলা হয়? বলা হয় এই জন্য, যে, আধুনিক সময়ে যাহাকে সায়েন্স্ নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং যাহার বাংলা করা হইয়াছে বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। বিনাপ্রমাণে কোন বৈজ্ঞানিক মত গৃহীত হয় না। ডারুইন যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতের যে-যে অংশের প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়াছে, আবার তাঁহার মতের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবীতে গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান অনেক আছেন যাঁহারা ডারুইনের মতে বিশ্বাস করেন না। আমেরিকার ইউনাটেড ষ্টেটসের কোন কোন স্থানে এই গোঁড়ামি এত বেশী, যে, তথাকার শিক্ষালয়সমূহে অভিব্যক্তি বাদ শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ; কোন শিক্ষক তাহা শিখাইলে তাহার চাকরি যায়, কোন শিক্ষালয়ে তাহা শিখান হইলে তাহার সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়।

এইরূপ নানা বিরুদ্ধবাদিতা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ডারুইন খুব বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া জগতে সম্মানিত, এবং তাঁহার মত মোটের উপর সত্য বলিয়া স্বীকৃত। এই সম্মান ও এই স্বীকৃতির তিনি যোগ্য।

আধুনিক সময়ে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা একটি দৃষ্টান্ত লইলে সহজে বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে রামায়ণে ও অন্য কোন কোন কাব্যে ও নাটকে পুষ্পক রথের উল্লেখ ও তাহাতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত দেখা যায়। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে, যে, ডীডেলস ও তাঁহার পুত্র আইকেরস নিজ নিজ স্কন্ধদেশে পক্ষ জুড়িয়া উড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরব্য উপন্যাসে ঐন্দ্রজালিক গালিচায় বসিয়া বা ঐন্দ্রজালিক ঘোড়ায় চড়িয়া আকাশপথে গমনাগমনের বর্ণনা আছে। কিন্তু এ সমুদয় সত্ত্বেও বর্ত্তমান সময়ে যত প্রকার আকাশযান আছে, তাহা নির্ম্মাণ করিতে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও কারিগরীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নূতন মনে করা হয় ও তাহার প্রশংসা করা হয়। এই যানগুলি আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে এগুলি নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা যোগ্য ব্যক্তি মাত্রেই শিখিতে পারে। কিন্তু আগেকার পুষ্পক রথ, ডীডেলস ও আইকেরসের পাখা, এবং ঐন্দ্রজালিক গালিচা ও ঘোড়া যে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, বা আবার হইতে পারে, কোথাও লেখা নাই, কেহ জানে না, জানিতে পারে না। সুতরাং আগেকার ঐ সব জিনিষের উল্লেখ বা বর্ণনার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিগণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির বলে সমুদয় বিশ্বের ঐক্য, সর্ব্বত্র এক আত্মার অস্তিত্ব, এবং বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এ কথাও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকিবেন। ইউরোপেও কেহ কেহ মোটামুটি এইরূপ কিছু বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ এবং তাহাদের সাহায্যে বহুসংখ্যক পরীক্ষা করিয়া জগদীশ চন্দ্র জীবিত ও অজীবিতের, উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত প্রকার সাদৃশ্য পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রাচীন কালে সেরূপ কিছু কেহ করেন নাই, ও বলেন নাই। প্রাচীনেরা সমুদয় বিশ্বে একের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু সেই উপলব্ধি অন্যকে অকাট্য বাহ্য প্রমাণ দ্বারা দেওয়া যায় না। জগদীশ চন্দ্র যে-সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেগুলি অন্যকে দেখান, শুনান, বোঝান যায়। প্রয়োজনানুরূপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যাঁহার আছে, তিনিই তাঁহার পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন, এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

এই সমস্ত কারণে জগদীশ চন্দ্রের আবিক্রিয়াগুলি

আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান, প্রাচীনদের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান নহে।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে বহু দার্শনিককে মুনি বা ঋষি বলা হইত, বহু কবিকেও মুনি বা ঋষি বলা হইত, বৈজ্ঞানিক কাহাকেও কাহাকেও ঐ নামে অভিহিত করা হইত। তাহা হইতে এই সত্যেরই আভাস পাওয়া যায়, যে, মুনি ঋষি কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক—ইঁহাদের পরস্পরের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে। তাঁহাদের মনের সাদৃশ্য আছে, সংযোগস্থল আছে। আধুনিক ইউরোপে ইহা হয়ত স্পষ্ট অনুভূত হয় না; প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জগদীশ চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সাধনা ও সিদ্ধি ভারতবর্ষের পূর্ব্বানুভূতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ও জড়বাদী—যদিও সকলে নহেন। তাঁহারা জড়ের দ্বারা চেতনের ও চেতনার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী। তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। হৃদয় মন প্রাণ আত্মা, যে শব্দই ব্যবহার করা যাক্, তাঁহারা সমস্তই জড়ের কোন গুণ বা প্রক্রিয়ার ফল বলিয়া বুঝাইতে চান। তাঁহারা আত্মাকে অনাত্ম দ্বারা, শ্রেষ্ঠকে অশ্রেষ্ঠের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া জড়কেই একমাত্র সত্তা বলিতে চান। জগদীশ চন্দ্র ইহার বিপরীত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রাণের, আত্মার, শ্রেষ্ঠের লীলা দেখিতে ও দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে।

—

রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের পুস্তক

বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের প্রবন্ধটিতে পাঠকেরা দেখিবেন, বাংলা গবর্মেণ্টের ও ভারত-গবর্মেণ্টের রেকর্ডসমূহের মধ্যে, হাইকোর্টের রেকর্ডসমূহের মধ্যে এবং কোন কোন জেলার রেকর্ডসমূহের মধ্যে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় যে-সকল দলিল পাওয়া যাইতেছে, তাহা মুদ্রিত করা হইতেছে। এই কাজটিতে যাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের সকলের নাম রমাপ্রসাদ বাবু করিয়াছেন, কেবল নিজের নাম করেন নাই। কলিকাতায় দলিল অনুসন্ধান, তাহার নকল লওয়া ও মূলের সহিত নকল মিলাইবার কাজ প্রভৃতিতে তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম হইয়াছে। নিজ ব্যয়ে তিনি দিনের পর দিন বাংলা-গবর্মেণ্টের রেকর্ড অফিসে ও হাইকোর্টে গিয়াছেন। কাগজপত্র সমুদয় পড়িয়া প্রয়োজন মত প্রবন্ধ লিখিতেও তাঁহাকে হইতেছে। দলিলগুলি হইতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার করিবার সুবিধা হইতেছে ও হইবে। রামমোহন রায়কে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যকে জগতের, ভারতবর্ষের ও বঙ্গের পক্ষে মূল্যবান মনে করেন, তাঁহারা রমাপ্রসাদ বাবু ও ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের প্রতি এবং অন্যবিধ সাহায্যকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবেন।

—

ইটালীর লীগ অব নেশ্যন্স ত্যাগ

ইটালী বৎসরাধিক কাল লীগ অব নেশ্যন্সের সহিত কার্য্যতঃ কোন সম্পর্ক রাখে নাই ও তাহার আদর্শের অনুসরণ করে নাই; এখন প্রকাশ্য ভাবে নামেও লীগের সদস্যত্ব পরিত্যাগ করিল। তিনটি সামরিক প্রবল শক্তিশালী দেশ, ইটালী, জার্ম্মেনী ও জাপান, এখন এক দিকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া যদি বিপরীত দিকে দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ইটালী, জার্ম্মেনী ও জাপানের পরদেশ-গ্রাসের ইচ্ছা ও চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা দলবদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত, তাহার নীচে ফ্রান্স ও রাশিয়ার। তাহারা নিজ নিজ অধিকৃত দেশসমূহ আপনাদের দখলে রাখিতে ব্যস্ত। ইটালী, জার্ম্মেনী, বা জাপান ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করিয়া যদি কোন দেশ গ্রাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা কেন উক্ত তিন দেশের পরদেশলোলুপতা নিবারণের চেষ্টা করিবে? এই তিন দেশের কাজে বাধা দিতে গেলে অর্থব্যয় ও লোকক্ষয়ও অনেক হইবার কথা। স্বার্থপরতার যুক্তি এই প্রকার।

—

জাপান-চীন যুদ্ধ

জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া লইবার চেষ্টা করে, তখন হইতেই যদি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া সমবেতভাবে জাপানের কাজের প্রতিবাদ করিত, এবং প্রতিবাদ না শুনিলে তাহারা চীনের সাহায্য করিবে বলিত, এবং সাহায্য করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান জাপান-চীন যুদ্ধ ঘটিত না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উক্ত তিনটি দেশ সেরূপ কিছু করে নাই। ফলে, এখন যদি জাপান চীন দখল করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে চীনে ব্রিটেনের যে কোটি কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছে তাহা নষ্ট হইবে এবং চীনে বাণিজ্য করিয়া ব্রিটিশ বণিকরা যে প্রভূত লাভ করিত, তাহাও যাইবে। শুধু তাহাই নহে। এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে।

ফ্রান্সেরও এইরূপ ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে—যদিও তাহার ক্ষতি ও অসুবিধা ব্রিটেনের মত অত বেশী হইবে না।

এ সব কথা সত্য হইলেও চীনকে ব্রিটেন বা ফ্রান্স সাহায্য করিবে মনে হয় না। রাশিয়া যে সাহায্য করিবে, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না—যদিও রাশিয়ার কম্যুনিজ্‌মের

প্রবল শত্রুতা করিতে জাপান বদ্ধপরিকর। তাহার সঙ্গে জার্মেনী ও ইটালী যোগ দিবে।

চীনকে একাই জাপানের সহিত লড়িতে হইতেছে, ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। জাপানের যুদ্ধশিক্ষা ও যুদ্ধের আয়োজন চীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহা সত্ত্বেও এবং চীনের হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হওয়া সত্ত্বেও, চীন অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। রাজধানী নান্কিং যদিও জাপানের হস্তগত হইয়াছে, তথাপি চীন যুদ্ধ করিতে থাকিবে। এই প্রকার যুদ্ধ যদি আরও ছয় মাসও চলে, তাহা হইলে জাপান কি খরচ চালাইতে সমর্থ হইবে? কয়েক বৎসর চলিলে ত পারিবেই না। অবশ্য, চীনেরও এত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা, জানা নাই। চীনের হারিয়া হারিয়া জিতিবার সম্ভাবনাই এখন তাহার স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র সম্ভাবনা মনে হইতেছে।

—

ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট ও ফাসিষ্ট, এবং বুর্জোয়া

ভারতবর্ষে অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেছেন কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে আবার অন্ততঃ দুটি দল আছে। সাধারণ কংগ্রেসওয়ালারা একটি দলের আর সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসীরা অন্য দলের। এই সমাজতন্ত্রীরা কম্যুনিষ্ট কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা যে কার্ল মার্কসের অনুমোদিত শ্রেণীযুদ্ধ (class war) চান, তাহা সুস্পষ্ট। শ্রমিকে ধনিকে এবং রায়তে জমিদারে যাহাতে খুব সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এরূপ বক্তৃতা এই সমাজতন্ত্রীরা অনেকে করেন। তাঁহাদের একটি সংবাদপত্র লক্ষ্ণৌ হইতে বাহির হইবে, তাহার নাম হইবে "সংঘর্ষ"। সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসীরা সাধারণ কংগ্রেসীদের বিরোধী এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে খুব চোখা চোখা বাক্যবাণ ঝাড়েন। তাহার পর কংগ্রেসওয়ালা মাত্রেই দেশী রাজ্যের রাজাদের বিরোধী, এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরও বিরোধী। মুস্লিম লীগের বিরুদ্ধতাও কংগ্রেসকে করিতে হয়। তাই ভাবি, কংগ্রেসীরা কত পক্ষের সহিত কত রকমের যুদ্ধ চালাইবেন। অবশ্য এটা অহিংস যুদ্ধ। কিন্তু সহিংস যুদ্ধের মত অহিংস যুদ্ধও অনেকগুলা শত্রুর সঙ্গে যুগপৎ না-চালাইয়া ও না-ঘোষণা করিয়া, প্রথমতঃ একটারই বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়া চালাইলে হইত না কি?

আমরা অবশ্য কারখানার মালিক, শ্রমিক, জমিদার, রায়ত, দেশী রাজ্যের রাজা, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট—কিছুই নই। তবে বোধ হয় সমাজতন্ত্রী নেতারা আমাদিগকে বুর্জোয়া শ্রেণীতে ফেলিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা নিজেই বুর্জোয়া, এবং আমরা তাঁহাদের কাহারও চেয়ে দৈনিক পরিশ্রম কম করি না। আমাদের পেশা কলম-চালান, তাঁহাদের পেশা শ্রমিক-নেতৃত্ব।

সাধারণ কংগ্রেসী ও সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসী সবাই বলেন তাঁহারা অহিংস। এটা ঠিক্ যে, তাঁহারা দৈহিক ভাবে অহিংস, কারণ তাঁহারা কোন অস্ত্র চালান না, লাঠি চালান না, কিল চড় লাথি চালান না। কিন্তু মনটা কি তাঁহাদের সকলের অহিংস? যাঁহারা শ্রেণীযুদ্ধের ভক্ত, তাঁহারাও কি মনে মনে অহিংস? হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের চেলা বিহারের কৃষক ও কানপুরের মজুররা দৈহিকভাবেও অহিংস থাকিতেছে না।

সুতরাং ভয় হয়, ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও ফাসিষ্ট কম্যুনিষ্টের যুদ্ধ বাধিতে পারে। ইহা দুর্লক্ষণ। শ্রেণীযুদ্ধ না বাধাইয়া কি সর্ব্বসাধারণের উন্নতি হইতে পারে না? অবশ্য, সমাজতন্ত্রী এদেশে দেখা দিয়াছে, ফাসিষ্ট এখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু দিবেই না, কে বলিতে পারে?

শ্রমিক-নেতারা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাঁহারা জানেন, কারখানার মজুরদের চেয়ে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ—বিশেষতঃ বেকারদের। তাঁহারা ইহাও জানেন, যে, কারখানার মজুরদের আর্থিক অবস্থা যতই খারাপ হউক, তাহা পল্লীগ্রামের চাষী ও ক্ষেতের মজুরদের চেয়ে ভাল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রমিকনেতারা গরীব মধ্যবিত্তদের জন্য লড়েন না বলিলেও চলে, চাষী ও ক্ষেতের মজুরদের জন্য কিঞ্চিৎ আন্দোলন করেন, কিন্তু খুব উৎসাহ দেখান কারখানার শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশার কথা বলিতে। কারণ, বোধ হয় তাঁহাদিগকে এক জায়গায় পান ও ধর্ম্মঘট করাইয়া খুব একটা কোলাহল ও হুজুক সৃষ্টি করিতে পারেন।

তাঁহারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেশে খুব কল-কারখানার বৃদ্ধি চান। কিন্তু বেশী বেশী ধর্ম্মঘট করাইলে কলকারখানা যথেষ্ট না-বাড়িতেও পারে। কলকারখানা বৃদ্ধি হইতে পারে ধনিকদের চেষ্টায়, কিংবা "রাষ্ট্রীয় সমাজ-তন্ত্রবাদে"র (state socialismএর) প্রভাবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলে ভারত-রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রী হইবে না, অথচ এদেশে বিদেশী পণ্য বিক্রয় দ্বারা বিদেশী বণিকদের ভারত-শোষণ বন্ধ করিতে হইলে এদেশেই সেই সকল পণ্য উৎপাদনার্থ দেশী লোকদের যথেষ্ট কলকারখানা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তাহা ধনিকদের চেষ্টাতেই হইতে পারে। এই জন্য দেশী লোকেরা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য মালিকদের সহিত আপোষে আলোচনার দ্বারাই করান উচিত, অন্ততঃ ধর্ম্মঘট যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। যে কয়টি প্রদেশে গবর্মেণ্ট কংগ্রেসী, অন্ততঃ তথায় ধর্ম্মঘট না হওয়া উচিত। এ দেশে বিদেশী কল-

কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে সালিসী বা আপোষে মিটমাটে সহজে রাজী না হইতে পারে তখন অগত্যা ধর্ম্মঘটই উপায়।

প্রধানতঃ ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও ফাসিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের সংগ্রামে মানবসভ্যতা নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা মনে করিয়াছিল, তাহারা সব দেশে প্রভু হইবে, কোথাও সামাজিক শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না, এবং একবার রক্তপাত দ্বারা অভিজাত ও মধ্যবিত্তদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিলে তাহার পর সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু ঐরূপ নিঃশেষের চেষ্টা রাশিয়াতে যত দূর সম্ভব করিয়াও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে কি? এখনও ত সেখানে হত্যা চলিতেছে। অন্য দিকে ইটালী, জার্ম্মেনী, জাপান, স্পেন, জুগোস্লাভিয়া প্রভৃতিতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ফাসিষ্টরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখন রাশিয়ায় কম্যুনিষ্টদিগকে এবং অন্যত্র সমাজতন্ত্রীদিগকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। সংগ্রাম ও সংঘর্ষের পথে শান্তির ও উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

ভারতবর্ষে যাঁহারা শ্রেণীযুদ্ধ (class war), ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনভিপ্রেত ভাবে, ঘটাইতেছেন এবং আরও ব্যাপক ভাবে ঘটাইবার আয়োজন করিতেছেন, তাঁহারা কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিতেছেন। আমাদের কথা তাঁহারা শুনিবেন না জানি, কিন্তু যাহা বলা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি। তাঁহারা অভিজাত ও ধনিকদের প্রতি বিদ্বেষ অপেক্ষা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও দরদের দ্বারা চালিত হইয়া সামঞ্জস্য ও সদ্ভাবের পথ আবিষ্কার করিলে ফল ভাল হইতে পারে।

জমিদার ও অন্য ধনিকরা ধনশালিতার দায়িত্ব বুঝুন। তাঁহারা ধনের মালিক নহেন, অছি মাত্র, এই বিশ্বাসে মানবের কল্যাণার্থ ধনের সদ্ব্যবহার করুন।

—

লীগ অব নেশ্যন্সের ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ প্রচেষ্টা

লীগ অব নেশুন্সের অর্থাৎ বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ ও জগদ্ব্যাপী শান্তিস্থাপন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু সংঘ অন্য অনেক ভাল কাজ ও কাজের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহার একটির বিবৃতি নীচে দেওয়া হইল।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাস্থ্যসমিতি স্থির করিয়াছেন, যে, পৃথিবীতে কুইনিন এবং ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক অন্যান্য ঔষধের সরবরাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন রাজসরকারের সহযোগিতায় একটি সম্মেলন আহ্বান করা প্রয়োজন। সেই হেতু, স্বাস্থ্য-সমিতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন, উক্ত সম্মেলন আহ্বানে বিভিন্ন রাজসরকারের সম্মতি আছে কিনা, মন্ত্রণা-সভা যেন তাহা জানিতে চেষ্টা করেন। তবে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হওয়া সম্ভব নহে; কেন না ইহার সম্যক আয়োজন করিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে।

উক্ত সম্মেলন বিষয়ে বিভিন্ন রাজসরকার এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট প্রশ্নপত্র পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য্যসূচী অনুসারে প্রশ্নপত্রে তিনটি আলোচ্য বিষয় থাকিবে। প্রথম আলোচ্য বিষয়—পৃথিবীতে কি পরিমাণ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধের প্রয়োজন ও বর্ত্তমান উৎপাদনের পরিমাণ এবং ভবিষ্যৎ উৎপাদন ও প্রয়োজনের পরিমাণ। এই বিষয়টি দুই ভাগে আলোচনা করা স্থির হইয়াছে: (ক) ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধের বর্ত্তমান উৎপাদন; (খ) ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না?

স্বাস্থ্য-সমিতির মতে, ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধাদির উৎপাদন সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুহার এবং ম্যালেরিয়ায় কত লোক পীড়িত হয়, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন দেশীয় সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ কর্ত্তৃক এই বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য-সমিতি আরও বলিয়াছেন, যে-সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ম্যালেরিয়াপীড়িত অধিবাসীরা সাধারণতঃ দরিদ্র, তাহাদিগের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ ম্যালেরিয়া-নিবারণ-প্রণালীর অনুষ্ঠান না করিয়া, যাহাতে তাহারা সহজেই এবং সুলভে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করাইবার সুযোগ পায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই বেশী দরকার।

কার্য্যসূচীর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়—ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ উৎপাদনের ব্যয় এবং বাজার দর। সেই হেতু, (ক) ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধাদি উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় বাজার দর; (খ) বিভিন্ন রাজসরকার ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি কি দরে উক্ত ঔষধাদি ক্রয় করিয়া থাকেন; এবং (গ) ব্যক্তিগত ক্রেতার জন্য খুচরা দর ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়—ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধাদি বিতরণের ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে কি ব্যবস্থায় ঔষধাদি বিতরণ করা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ঔষধ-বিতরণের আরও ভাল ব্যবস্থা করা যায় কি না সে বিষয়েও সমাচার ও প্রস্তাব সংগৃহীত হইবে।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিল

যে-সব বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, সেগুলিকে উচ্চ বিদ্যালয় বলা হয়। তাহার নিম্নস্থানীয়গুলিকে মধ্যইংরেজী বা মধ্যবাংলা বিদ্যালয় বলা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এই পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় ও পাঠ্যপুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারণ করেন। প্রশ্নপত্র-রচয়িতা ও পরীক্ষক-মনোনয়নও বিশ্ব-বিদ্যালয় করেন। কোন্ কোন্ বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদিগকে

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠাইবার অনুমতি পাইবে, তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বিলের যে খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে লইয়া প্রস্তাবিত বোর্ডকে দিতে চাওয়া হইয়াছে।

বঙ্গের বিদ্যালয়সকলের—তন্মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহেরও—শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষা-প্রণালী, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিতে সংস্কার আবশ্যক এবং তৎসমুদয়ে উন্নতি আবশ্যক, ইহা স্বীকার্য্য ও স্বীকৃত। কিন্তু বিলটিতে সংস্কারের, উন্নতির ও শিক্ষা সম্প্রসারণের কোন উল্লেখ নাই। হেতুবাদে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত আইনটির উদ্দেশ্য নিয়মিত করণ ও নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং বঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা চান, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এইরূপ আইন দ্বারা সিদ্ধ হইবে না।

স্যাডলার কমিশন বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চাহিয়াছিলেন অটোনমাস বোর্ড, স্বাধীন কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট বোর্ড, গবর্মেণ্টের বা শিক্ষা-বিভাগের হাতের পুতুল চান নাই। প্রস্তাবিত আইনে যে বোর্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে গবর্মেণ্টের অধীন হইবে।

কয়েক বৎসর হইতে গবর্মেণ্ট শিক্ষা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের দ্বারা শিক্ষার উন্নতির নামে প্রায় ১২০০ উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে কেবল ৪০০ রাখিয়া বাকীগুলি ছাঁটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এই বিল আইনে পরিণত হইলে গবর্মেণ্ট তাহা করাইতে পারিবেন। সুতরাং ইহার দ্বারা বঙ্গে উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচন সাধিত হইবে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিলে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইবে কম ছাত্রছাত্রী, সুতরাং কলেজগুলিতেও ছাত্রছাত্রী কমিবে, তাহার ফলে কলেজের সংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীসমূহেও ছাত্রছাত্রী কমিবে। যদি এমন প্রস্তাব হইত, যাহার ফলে বর্ত্তমান প্রকারের বিদ্যালয় ও কলেজ কমিয়া অন্যবিধ রকমের বিদ্যালয়ে ও কলেজে এখনকার মত বা তদপেক্ষা অধিক ছাত্রছাত্রী বর্ত্তমান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহা আপত্তিজনক হইত না। কিন্তু প্রস্তাব সেরূপ নহে। প্রস্তাব যেরূপ, তাহাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে, কলেজে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্কোচন সাধিত হইবে।

বোর্ড সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হইবে। ইহাতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কত জন সদস্য মুসলমান হওয়া চাই। তাহা অপেক্ষা অধিক সদস্যও মুসলমান হওয়ায় বাধা নাই।

আপত্তি মুসলমান বলিয়া নহে। শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমিতিতে ধর্ম্মমতের প্রশ্ন তোলাটাই আপত্তিজনক। যোগ্যতম ব্যক্তিরা বোর্ডের সদস্য হউন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত যাহাই হউক না। কোন বৎসর বা কোন সময়ে যদি মুসলমানরাই যোগ্যতমতা দ্বারা সব সদস্যপদ পান, তাহা আপত্তির কারণ হইবে না। বিলের ব্যবস্থা অনুসারে বোর্ডের ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন মুসলমান হইবেনই, ১৮।১৯ জনও হইতে পারেন। বাকী লোকেরাও অনেকে গবর্মেণ্টের আজ্ঞাধীন হইবেন। গবর্মেণ্টের অনুগ্রহভাজন মুসলমান সদস্য এবং গবর্মেণ্টের আজ্ঞাধীন অমুসলমান সদস্যেরা সর্ব্বদা যে বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবে, তাহা স্বাধীনকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট বোর্ড হইতে পারে না। তাহা গবর্মেণ্টের হুকুম তামিল করিবার যন্ত্রবৎ হইবে।

বোর্ডে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ৪ জন প্রতিনিধি সদস্য থাকিবে। তাহার মধ্যে ২ জন মুসলমান হওয়া চাই। সহস্রাধিক উচ্চ বিদ্যালয় হিন্দুদের শিক্ষানুরাগ, দান, স্বার্থ-ত্যাগ ও উৎসাহের ফলে তাহাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের প্রতিনিধি হইবে ২ জন, এবং মুসলমানদের দ্বারা স্থাপিত মুষ্টিমেয় সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিও হইবে ২ জন, ইহা চমৎকার ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহায্য দেওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত বোর্ডের যে কমীটি গঠিত হইবে, তাহাতেও মুসলমান সভ্যদের প্রাধান্য থাকিবে, যদিও অধিকাংশ বিদ্যালয় হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, এবং সরকারী টাকার রকম বার আনা হিন্দুরা ট্যাক্সরূপে দেয়। মক্তব মাদ্রাসা প্রভৃতিতে সরকারী সাহায্য দান ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত যে কমীটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু এক জনও থাকিবে না। অর্থাৎ প্রধানতঃ হিন্দুদেরই বিদ্যালয়সকলকে সরকারী সাহায্য দেওয়া বিষয়ে প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন মুসলমানেরা—তাঁহারাই যোগ্যতম ব্যক্তি, কিন্তু মুসলমানী বিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে টুঁ শব্দ করিবারও যোগ্যতা এবং অধিকার হিন্দুদের নাই—তাহারা অযোগ্যতম, যদিও সরকারী টাকাটার অধিকাংশ তাহাদেরই দেওয়া।

বোর্ড ও বোর্ডের সদস্যেরা বোর্ড হিসাবে ও সদস্য হিসাবে যাহা কিছু করিবেন, তাহার জন্য কোন আদালতে বিচার প্রার্থনা বা নালিশ চলিবে না, বিলে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে কথা আছে, The King can do no wrong, "রাজা অন্যায় কিছু, মন্দ কিছু, করিতে পারেন না।" বোর্ড ও বোর্ডের সদস্যেরা এইরূপ নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতা পাইবেন।

ইন্সপেক্টর দ্বারা গবর্মেণ্ট বোর্ডের ও তদধীন সব বিদ্যালয়ের সব কিছু তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাইতে পারিবেন। এই রূপ নানা ব্যবস্থার দ্বারা বোর্ডকে ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে গবর্মেণ্ট নিজের মুঠার মধ্যে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। বিলের একটি

চীন-জাপান যুদ্ধ

নানকিং
চিয়াং কাই-শেক ও তাঁহার পত্নী বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত কথাবার্ত্তায় রত।

শাংহাই
জাপানী কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্থানান্তর করিবার অনুমতি দিলে জনতা ও যানবাহনের বিপুল সমাবেশ।

শাংহাই
জাপানী অশ্বারোহীর সমাবেশ

চীন-জাপান দ্বন্দ্বের এক প্রধান কেন্দ্র শাংহাই

ধারায় লেখা আছে, যে, গবর্মেণ্ট যদি মনে করেন, যে, বোর্ডের দ্বারা কাজ ঠিক্‌ মত হইতেছে না বা মন্দ কিছু হইতেছে, তাহা হইলে সমুদয় সদস্যকে অপসৃত করিয়া তাঁহাদের জায়গায় অন্য সদস্য মনোনয়নের আদেশ করিবেন। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট বোর্ডের ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিবেন।

নূতন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন অনুসারে বাংলা-গবর্মেণ্ট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে তাহার কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না, আমরা এইরূপ মনে করি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আইন করিবার ও বদলাইবার ক্ষমতা কেবল ভারত-গবর্মেণ্টের আছে। বঙ্গের মন্ত্রীরা ইহা বিবেচনা করিয়াছেন কি? হয়ত তাঁহারা ভারতশাসন-আইনটারই পরিবর্ত্তন করাইতে পারিবেন ভাবিয়াছেন। দেখা যাক, কি হয়।

আমরা সাম্প্রদায়িকতার ভূতাবিষ্ট বোর্ডের বিরোধী, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। কিন্তু যদি সম্প্রদায় অনুসারে শিক্ষাবোর্ডের সদস্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতেই হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতা এবং বিদ্যালয়-স্থাপনাদি কার্য্যে উৎসাহ, দান, ও কৃতিত্বই বিবেচিত হওয়া উচিত, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নরনারী কোন্‌ সম্প্রদায়ে কত আছে, তাহা বিবেচ্য নহে। মনে করুন, দেশে মোট কয়েক হাজার চিকিৎসককে চিকিৎসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে, এইরূপ একটা আইন হইবে এবং তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, যে, হাজারে ৫৫০ জন চিকিৎসক হইবে মুসলমান এবং ৪৭০ জন হিন্দু এবং বাকী ১০ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজারকরা ৫৫০ জন মুসলমান চিকিৎসক না-থাকায় যাহারা চিকিৎসা জানে না, এইরূপ মুসলমান ধরিয়া কি কাজে লাগাইতে হইবে? তাহার ফল যাহা হইবে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ফলভোগী মুসলমানেরাও হইবে। সেই রূপ শিক্ষা সঙ্কোচনের কুফল মুসলমানেরাও ভুগিবে।

মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা বঙ্গে কিরূপ, সে-বিষয়ে কতকগুলি অঙ্ক ভারত-গবর্মেণ্টের আইন-সচিবের বহি হইতে দিতেছি। সংখ্যাগুলি শতকরা।

মেডিক্যাল কার্য্যে ব্যাপৃত—মুসলমান ১৭, হিন্দু ৭৯·৭। মেডিক্যাল শিক্ষালয়ে শিক্ষাধীন—মুসলমান ১২·১, হিন্দু ৮৬·২। লিখনপঠনক্ষম—মুসলমান ৩৩·৫, হিন্দু ৬৪·২। ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম—মুসলমান ২৪·৯, হিন্দু ৬৯·৬। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন—মুসলমান ১৭·৯, হিন্দু ৭৯·৬। ইণ্টারমীডিয়েট ক্লাসে—মুসলমান ১৩·৬, হিন্দু ৮৩·৬। ডিগ্রী ক্লাসে—মুসলমান ১৪·২, হিন্দু ৮২·৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ও গবেষণায় মুসলমান ১৩, হিন্দু ৮৫·৭।

হিন্দুদের স্থাপিত সংখ্যাধিক উচ্চ বিদ্যালয়ে সকল ধর্ম্মের ছাত্রদের জন্য দ্বার অবারিত। মুসলমান ছাত্রেরাও তাহাতে উপকৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও সকলে উপকৃত হইতে থাকুক, আমরা ইহাই চাই।

যদি বোর্ড গঠন করাই স্থির হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি অঙ্গ করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কমীটি বিলটার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সকলে একমত হইয়া বিলটার প্রতিকূলে রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহারা আত্মকর্তৃত্ববিশিষ্ট, অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বোর্ড চান।

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধক বিল

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধনার্থ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যা বেগম হাশিনা মোর্শেদ একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, বা তাঁহার নামে উহা প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধির পৃথক্‌ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে, মুসলমানদের সংখ্যা বা প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণ অনুসারে যাহা প্রাপ্য কেহ মনে করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধি বাড়ান হইয়াছে, মুসলমানদিগকে মিউনিসিপালিটীর চাকরির একটা বেশী রকম নির্দ্দিষ্ট অংশ দিবার ব্যবস্থা আছে—ইত্যাদি।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ সর্ব্বত্র ঢুকাইবার এবং যোগ্যতমতাকে অধিকারচ্যুত ও স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে।

দেশ-বিদেশের কথা

পরলোকগত লর্ড রাদারফোর্ড

লর্ড রাদারফোর্ড গত ত্রিশ বৎসর বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অংশে (রেডিও-এক্‌টিভিটির ক্ষেত্রে) অধিনায়কত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন প্রথম পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে টমসন-কল্পিত পূর্ব্ব-প্রচলিত মতের বিরোধিতা করিলেন তখন সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-জগৎ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা অনুভব করিল। এই মতের জন্য তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার মত অনুসারে, অণুর মধ্যে একটি ধনাত্মক কোষকে কেন্দ্র করিয়া ঋণাত্মক বিদ্যুতিনগুলি অবিরাম ঘুরিয়া অণুর বৈদ্যুতিক সাম্য রক্ষা করিতেছে। পরবর্ত্তীকালে বোর (Bohr) অণুর এইরূপ গঠনকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। রাদারফোর্ডের এই আণবিক চিত্রের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত জড়জগৎকে, বিশেষ করিয়া রসায়নকে একটি নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। লে বোঁ এবং রাদারফোর্ড সর্ব্বপ্রথম দেখান যে রেডিয়ামের ন্যায় তেজবিকীরক বস্তু সাধারণত তিন প্রকার রশ্মি নির্গত করে—ক-রশ্মি, খ-রশ্মি এবং গ-রশ্মি। রেডিয়ামকে ভগ্ন করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে ঐ ক-রশ্মি একটি তড়িন্ময় হিলিয়ম-অণু (Ionised Helium atom)। ক-রশ্মির দ্বারা রাদারফোর্ড অণু-কোষের ভর (mass) নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি বস্তুর অণুকে ভগ্ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ইহার ভগ্নাংশ হাইড্রোজেন-অণুর ন্যায় একটি কোষ এবং একটি বিদ্যুতিন দ্বারা গঠিত।

লর্ড রাদারফোর্ড

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত নেলসন শহরে রাদারফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। রাদারফোর্ড নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. এবং বি. এসসি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগদান করেন এবং ক্যাভেণ্ডিশ-পরীক্ষাগারে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে পরিচিত হন। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়া তিনি পূর্ব্বেই নানা গবেষণা করিয়াছিলেন, পরে মন্ট্রিলে ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে তেজবিকীরক পদার্থের বিভিন্ন রূপান্তর সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে তিনি ঐ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানের ঐ অংশকে অধিকতর উন্নত করেন। তাঁহার বহু কৃতী এবং প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যথা ডেন বোর, মোস্‌লে, গাইগার, ডারউইন্ এবং চ্যাডউইক। ইহারা প্রত্যেকেই আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের এক একটি স্তম্ভ।

১৯১৪ সালে আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড নাইট উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯৩১ সালে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ইংলণ্ডের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মন্ত্রণাসভার এবং রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ঐ বৎসরেই টিউরিনের বিজ্ঞান-সমিতির ব্রেসা পুরস্কার লাভ করেন।

শ্রীঅশোককুমার বসু

পরলোকগত দ্রবময়ী ঘোষ

পরলোকগত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

দ্রবময়ী ঘোষ

ঢাকার উকীল স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের পত্নী দ্রবময়ী ঘোষ সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে জন্মিয়াও তিনি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং নানাপ্রকার শিল্পকলার চর্চ্চাও করিয়াছিলেন।

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক সংঘের বঙ্গীয় বিভাগের সভাপতি, বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি এবং বয়স্কাউট সমিতির ও বহুবিধ জনহিতকর সমিতির সদস্য ছিলেন।

কৃতী বাঙালী যুবক

রেঙ্গুন-প্রবাসী শ্রীবিনয়ভূষণ মণ্ডল ওয়েলস ইউনিভার্সিটি কলেজ হইতে কৃষিবিজ্ঞানের উপাধি এবং গোপালন দুগ্ধরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তিনি ইউনাইটেড ডেয়ারিজ্ লিমিটেড ও মিডল্যাণ্ড কাউন্টিজ ডেয়ারি (বার্মিংহাম) নামক দুইটি সুপরিচিত গোপালন ও গব্যপদার্থ প্রস্তুতের কেন্দ্রে শিক্ষানবীশী করেন। ডেন্মার্ক সুইডেন, জার্ম্মেনী, হাঙ্গারী প্রভৃতি স্থানের বিশিষ্ট কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপদ্ধতিও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন।

বোম্বাই গ্রাণ্ট মেডিকাল কলেজের ডাঃ বি. এন. সরকার এম. বি, বি, এস এনেস্থেসিয়া (Anaesthesia) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সোরাবজী টাটা ভাণ্ডার হইতে এই জন্য একটি বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। শিক্ষান্তে তিনি বোম্বাইতে টাটা-মেমোরিয়াল ক্যান্সার-হাসপাতালে যোগ দিবেন।

শ্রীঅমিয়নাথ সরকার ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজে কর্ম্মিষ্ঠতা ও সংগঠন-শক্তির জন্য বহুকাল সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিক বার বিদেশে ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই পরিষদের রোম ও প্রাগ অধিবেশনের সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য। তিনি রোমে প্রাচ্য দেশীয় ছাত্রসম্মিলনেরও সম্পাদক ও "তরুণ-এশিয়া" পত্রের সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিখ্যাত কতকগুলি ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে শিক্ষালাভ করিয়া সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ মণ্ডল

ডাঃ বি. এন. সরকার

শ্রীঅমিয়নাথ সরকার

শ্রীমীরা রায়

স্পেন-সরকারের সাহায্যার্থ ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থে এই ভারতীয় এম্বুলেন্স স্পেনে কাজ করিতেছে

চীনজাপান যুদ্ধের নৃশংসতার একটি দৃশ্য। আহত মুমূর্ষুর পার্শ্বে সন্তানক্রোড়ে পত্নী দণ্ডায়মান, চীনা স্বেচ্ছাসেবকগণ পরিচর্য্যায় রত।

"বরদান" নৃত্যনাট্য-অভিনয়ের একটি দৃশ্য

শ্রীমীরা রায়

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৩৭ সালের সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে যাঁহারা পুরস্কৃত হইয়াছেন, কুমারী মীরা রায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি 'খেয়াল' এবং 'ভজনে' সম্মানের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং নেপালের প্রধান মন্ত্রী রাণা সামসের জন্ম প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিদ্যালয় কর্ত্তৃক কলিকাতায় "বরদান" নৃত্যনাট্যাভিনয়

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জাহাঙ্গীর ভকীল, বি. এ. (অক্সফোর্ড) আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে বোম্বাইতে শান্তিনিকেতনের আদর্শে "পিউপিলস্ ওন স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীবাচুভাই শুক্ল, শ্রীপিনাকিন্ ত্রিবেদী প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র তাঁহার সহকর্ম্মী। সাধারণ পাঠক্রমের সহিত এই বিদ্যালয়ে নৃত্যগীত ও অভিনয়, চিত্রবিদ্যা, হাতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

বোম্বাই-অঞ্চলে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়-নৈপুণ্য ইতিপূর্ব্বেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী," "তোতা-কাহিনী" প্রভৃতি অভিনয় করিয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সমঝদার লোকের সাধুবাদ পাইয়াছে। সর্ রিচার্ড টেম্পল, উদয়শঙ্কর প্রভৃতি কলারসিক ব্যক্তিরা ইহাদের অভিনয় ও নৃত্যে প্রীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুত জাহাঙ্গীর ভকীল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কলিকাতা ও শান্তিনিকেতন ভ্রমণে আসিয়াছেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ইহারা 'বরদান" নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে সর্ রিচার্ড টেম্পল যে লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অভিনয় তিনি ইউরোপে অনেক স্থানে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বিদ্যালয়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখেন নাই—সে-কথা অতিরঞ্জন নহে বলিয়া মনে করা যাঁহারা 'বরদান" নৃত্যনাট্য দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। সঙ্গীতের বাক্যগুলি গুজরাতী হইলেও, সুরের মাধুর্য্য ও নৃত্যের নৈপুণ্যে, গুজরাতী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেও অভিনয়টি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

—

চিত্র-পরিচয়

"অনন্তের আহ্বান"

কথিত আছে, পুরীর সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহার আরাধ্য দেবতার কল্পনায় ভাবাকুল হইয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই চিত্রে শ্রীচৈতন্যের সেই ভাবব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে।

"কৃষ্ণলীলা"

কাহিনী আছে, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়ে, আত্মীয়স্বজনের গঞ্জনার ভয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সখা সুবলের বেশ পরিধান করিয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণসকাশে গিয়াছিলেন। চিত্রে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চিত্রে গোবৎস-ক্রোড়ে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণসমীপে দেখা যাইতেছে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাছ ধরা

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
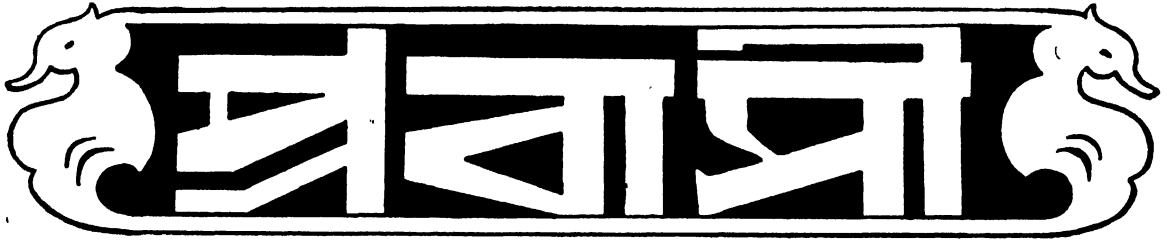
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৪ | ৪র্থ সংখ্যা

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

(বুদ্ধমন্দিরে কোনো জাপানী সৈন্যদলের বর প্রার্থনার সংবাদে রচিত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হোলো বাঁকা, চোখ হোলো রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোলো দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী।
ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে,
করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা ;—
কেননা ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ করে,

ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্তপল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাইতো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুক্‌রোর ছড়াছড়িতে।
ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠচে তূরী ভেরী গরগর শব্দে
কেঁপে উঠচে পৃথিবী॥

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "হিন্দুস্থান" কবিতার ষষ্ঠ পংক্তি ভ্রমক্রমে এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে—"অন্তরের তালে তালে"। ঐ পংক্তিটি "তাণ্ডবের তালে তালে" পড়িতে হইবে।

সত্যাগ্রহের দার্শনিক ভিত্তি ও কৌশল

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

উইলিয়ম জেমস আমেরিকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মানুষে মানুষে যুদ্ধ করে ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। যুদ্ধের নানা দোষ, অথচ সংগ্রাম করিলে মানুষের অন্তরে সাহস, দৃঢ়তা, পরস্পরের সহিত সহযোগিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ বৃদ্ধি পায় ইহাও তিনি বুঝিতেন। সেই জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল মানুষে মানুষে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া এমন কোনও উপায় বাহির করা যাহার দ্বারা যুদ্ধের সুফলগুলি মানুষের অন্তরে ফুটিয়া উঠিবে, অথচ যুদ্ধের ক্ষতি মানবসমাজকে ভোগ করিতে হইবে না। তিনি এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, মানবসমাজে সংগ্রাম বন্ধ না করিয়া যদি তাহার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় এবং মানুষের পরিবর্ত্তে যদি নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান যায় তাহা হইলে এই সুফল ফলিতে পারে। একজন মানুষ বা এক দল মানুষ অপর দলের মুঠা হইতে খাদ্যসামগ্রী ছিনাইয়া না লইয়া যদি প্রকৃতি-দেবীর কবল হইতে খাবার ছিনাইয়া লয় তাহা হইলে সব দিক দিয়া মঙ্গল হয়। প্রকৃতি সহজে মানুষকে খাইতে পরিতে দেয় না। ঝড়, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বনের পশু, কীট, পতঙ্গ, রোগ তাপ সবই মানুষের সহজ সুখের অন্তরায়। তাহাদের সঙ্গে যুঝিয়া মানুষকে বাঁচিতে হইবে। আগুন, জল, মেঘ, বিদ্যুৎ, সূর্য্যের কিরণ প্রভৃতির মধ্যে এমন অনেক শক্তি লুকান আছে যাহা আজ আমাদের কোনও কাজে লাগে না। সেগুলিকে বুদ্ধির দ্বারা কাজে লাগাইতে হইবে। উইলিয়ম জেমসের কল্পনা ছিল, যদি এই সংগ্রামের অজুহাতে জগতের সকল মানুষকে একতাবদ্ধ করা যায় তবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের যে সুফল তাহা মানবচরিত্রে বিকশিত হইবে, কিন্তু মানুষে মানুষে লড়াইয়ের কুফল হইতে সমাজকে আর ভুগিতে হইবে না। উইলিয়ম জেমস ইহাকে "মর‍্যাল ইকুইভ্যালেণ্ট অব ওয়ার" নাম দিয়াছিলেন।

উইলিয়ম জেমস ১৯১০ সালে মারা গিয়াছেন। তাহার পর জগতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ কেহ গ্রহণ করে নাই, বরং মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাড়িয়াছে, যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জগতে দুঃখের ভার পরিমাণে হয়ত আরও বেশী হইয়াছে। সমগ্র মানবজাতি একতাবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিলে ভাল হইত। কিন্তু সেই একতাবদ্ধ হইবার যে-শিক্ষা তাহা বচনে বা কর্ম্মে কেহ মানুষকে শিখাইতেছে না। স্বার্থের দ্বারা অন্ধ হইয়া তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িতেছে এবং যাহারা এই সুযোগে দু-পয়সা কামাইয়া লয় এবং যাহারা জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে নিজেদের কবলে রাখিয়াছে তাহারা মানুষকে ভুল পথে চালিত করিতেছে। ঐক্যের শিক্ষা পাইয়া যাহাতে তাহাদের অন্ধত্ব না ঘোচে সে-বিষয়ে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। স্বার্থের বশে তাহারা নিজেই যখন অন্ধ তখন অপরের অন্ধত্ব তাহারা ঘুচাইবে কেমন করিয়া? ধুতুরার গাছে ধুতুরা ভিন্ন আর কি ফল ফলিতে পারে?

এমন অবস্থায় পড়িলে প্রকৃত সজ্জনের কি করা উচিত? মানবসমাজ ছাড়িয়া বনে পলাইয়া গেলে ত চলিবে না। বনের মধ্যে একাকী থাকিয়া মানবের একত্বে বিশ্বাস করিয়া লাভই বা কি? যে একত্বের বিশ্বাস সংঘাতের মধ্যে, বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় জয়যুক্ত হয় না তেমন বিশ্বাসে সমাজের কি উপকার হইতে পারে? যে মাটির পাত্র এমন ঠুনকা যে দশ জনের হাতে দিলেই তাহা ভাঙিয়া যায়, তেমন পাত্রে সংসারের কয়জনের তৃষ্ণা নিবারণ করা যাইতে পারে?

তাই সংসারে এমন একটি কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছে যাহা সত্য সত্যই "মর‍্যাল ইকুইভ্যালেণ্ট অব ওয়ার" অর্থাৎ যুদ্ধের নীতিসিদ্ধ কৌশল বলিয়া গণিত হইতে পারে। যাহা দ্বারা শুধু যে মানুষের অন্তরে ক্ষাত্রধর্ম্মের সুফল

প্রস্ফুটিত হইবে তাহা নয় কিন্তু মানুষের অন্তরে সমগ্র মানবজাতির একত্বের বোধ ফুটিয়া উঠিবে, অথচ যে কারণে মানুষ মানুষের সহিত কলহ বা সংগ্রাম করে সে সকল ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্যারও একটি ভাল সমাধান হইবে। এমন একটি যুদ্ধ-কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

সত্যাগ্রহ এমনই একটি কৌশল। সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগত-ভাবে জগতের ইতিহাসে কোন কোন মনীষী ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বে এত বৃহৎ ক্ষেত্রে তাহা কখনও প্রযুক্ত হয় নাই। প্রায় এক-শ বৎসর আগে হাঙ্গেরিতে অসহযোগ আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু পুরা সত্যাগ্রহীর মনোভাব লইয়া বোধ হয় তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের সহিত স্থানীয় রাজশক্তির সংগ্রামে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ইহা ১৯১৭ সালে চম্পারণ জেলায় প্রযুক্ত হয়। তাহার পর ১৯১৭-১৮তে খেড়া জেলায়, ১৯১৮তে আমেদাবাদ কলের মজুরদের দ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজী রাউলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহার পর খিলাফৎ এবং পঞ্জাব-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে করিতে ১লা আগষ্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। ইহা ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে ভাইকম ও অমৃতসরে ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টায় সত্যাগ্রহ অনুসৃত হইয়াছিল। তাহার পর ১৯২৮ সালে গুজরাটে বারদোলিতে ব্যাপকভাবে চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত ইহা প্রযুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৩০-৩৩এর আইন-অমান্ত আন্দোলনের সময়ে ইহা পুনরায় সারা ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৭ এবং ১৯২৮ এর আন্দোলনে সত্যাগ্রহীগণ পুরাপুরি জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৬-১৩, ১৯২০-২২, ১৯২৪ এবং ১৯৩০-৩৩ এর সংগ্রামে সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রগত এত বেশী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা এত অধিক সচেতন, সাহসী এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে যে দেশ এখন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতের জন্ত যে কতকাংশে তৈয়ারী হইয়াছে ইহা কেহ অস্বীকার করে না।

সেই সত্যাগ্রহের কৌশল আমাদের ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। যে যুদ্ধের অস্ত্র ভারতবাসীরা আজ হাতে ধরিয়াছে তাহার ব্যবহার যদি ভাল করিয়া জানা না থাকে তবে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হইবার সম্ভাবনা, এবং হয়ত যুদ্ধের দ্বারা যতটা লাভ আমাদের সংগ্রহ করা উচিত অজ্ঞানের বশে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, সে ফল সম্যক্‌ভাবে সঞ্চয় করিতে পারিব না।

সত্যাগ্রহের প্রথম নিয়ম হইল প্রেম বা অহিংসা। আমাদের বুঝিতে হইবে যে মানুষ যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করে, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, নিজের স্বার্থকে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ হইতে পৃথক করিয়া দেখে, তাহা আসলে ভুল দৃষ্টির বশে করে। এই জ্ঞান সত্যাগ্রহীর সমস্ত চেষ্টার মূলে থাকা চাই। ইহাতে বিশ্বাস হয়ত গোড়া হইতেই হইবে না, কিন্তু অন্তরে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ প্রেম এবং স্বার্থহীনতা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইলে প্রেমের পরিমাণও সত্যাগ্রহীর অন্তরে বাড়িতে থাকিবে, অবশেষে সমগ্র মানবের স্বার্থ যে শেষ পর্য্যন্ত এক এই ধারণাও গভীরভাবে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে। এই ধারণাটি সত্যাগ্রহীর পক্ষে থারমোমিটারের মত। সত্যাগ্রহ যুদ্ধের মধ্যে যদি তিনি দেখেন, যুদ্ধ অবিরাম চালাইয়াও মানবের প্রতি প্রেম তাঁহার কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তবে তিনি ঠিক পথে চলিয়াছেন। আর যদি তাঁহার প্রেম কমে বা মানুষে মানুষে ভেদের বোধ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ তাঁহার থারমোমিটারের অঙ্ক নীচের দিকে নামিতে থাকে, তবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার সত্যাগ্রহে কোথাও না কোথাও ভুল হইয়াছে। মানুষের ঐক্যে বিশ্বাস সত্যাগ্রহের ভিত্তি এবং সেই তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি এক হিসাবে সত্যাগ্রহীর লক্ষ্যও বটে।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় বিশ্বাস হইল এই যে মানুষ ও তাহার নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠান এক নহে। মানুষকে তাহার নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। যে ইংরেজ আজ জগতে সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছে তাহার সাম্রাজ্যবাদ যতই অনিষ্টকর, যতই হীন হউক না কেন, সেই ইংরেজ জাতিকে তাহার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হইতে আলাদা

করিয়া দেখিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস চাই, ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংস চাই। কিন্তু যাহারা সেই প্রতিষ্ঠান চালাইতেছে সে-সব মানুষের নহে। কেননা, তাহারা যখন মানুষ তখন সত্যাগ্রহের দ্বারা আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব এবং তাহাদের হৃদয়ে ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মত সঙ্কীর্ণস্বার্থ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সুমহান ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার শুভ ইচ্ছা জাগাইতে পারিব এই ভরসা এবং এই আশা সত্যাগ্রহীর অন্তরে থাকা দরকার।

সত্যাগ্রহীকে মানুষের মন লইয়া কারবার করিতে হয়। সকল যোদ্ধাকেই তাহা করিতে হয়, কেননা, জয়পরাজয় শেষ পর্য্যন্ত মানুষের মনের ব্যাপার। সত্যাগ্রহী যেমন প্রথমতঃ সমস্ত মানুষকে এক জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, দ্বিতীয়তঃ, তিনি যেমন সকল মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত ভাল করা যায় এই বিশ্বাস পোষণ করেন, তেমনই তিনি ইহাও একটি মূল নীতির মত মানেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বা তর্কের দ্বারা মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা বা অন্ধত্ব ঘোচান যায় না।

যে-ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ চালাইতেছে, যাহার সহায়তায় ধনতন্ত্রবাদ জগতে কায়েমী হইয়া আছে, তাহার দৃষ্টি আজ ছোট হইয়া গিয়াছে। সে সমগ্র মানুষের একত্বে বিশ্বাস করে না, সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণের যে শেষ পর্য্যন্ত একটিমাত্র পথ আছে তাহাও সে মানে না। নিজের শ্রেণীর স্বার্থকেই সে বড় করিয়া দেখে, তাহাতেই তাহার দৃষ্টির গগন ছাইয়া যায়। এই মোহগ্রস্ত অবস্থা হইতে মানুষকে বুদ্ধির দ্বার দিয়া উদ্ধার করা যায় না। কেননা, তাহার বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহা শুদ্ধ নয়। হৃদয়ে স্বার্থের সংস্কার দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তি সেই স্বার্থের প্রভাবে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। তাহাকে মুক্ত করিতে হইলে তাহার হৃদয়ের উপরে স্বার্থের যে কঠিন আবরণ পড়িয়াছে সেই আবরণকে ভেদ করা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী বলেন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করিয়া প্রতিপক্ষের মোহের আবরণকে ছিন্ন করিতে পারেন। সত্যাগ্রহী মানুষকে ছোট না ভাবিয়াও মানুষের তৈয়ারী প্রতিষ্ঠানকে ছোট ভাবিতে পারেন এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ভাঙিতে গেলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে দুঃখ দিবে, শারীরিক কষ্ট দিবে। সেই দুঃখে যদি তিনি অবিচল থাকেন তবে তাঁহার স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ দেখিলে, সত্যাগ্রহীর অটল প্রতিজ্ঞার স্পর্শ পাইলে স্বার্থান্ধ মোহগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সহানুভূতি জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার বুদ্ধির উপরের আবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে। হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিলে তাহার বুদ্ধিকেও স্পর্শ করা যাইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদ ভাঙিতে হয়ত আজ যাহারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাদেরই সহায়তা লাভ করা যাইবে। বুদ্ধির রাস্তা দিয়া বুদ্ধিকে স্পর্শ না করিয়া হৃদয়ের রাস্তা দিয়া মানবের বুদ্ধিকে স্পর্শ করিতে হইবে ইহাই সত্যাগ্রহীর তৃতীয় এবং সর্ব্বোত্তম নিয়ম।

সত্যাগ্রহের পথ দুঃখের পথ, তপস্যার পথ। কিন্তু সে দুঃখ হইল স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ এবং সত্যাগ্রহী জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধিকে স্বার্থের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, স্বার্থসংঘাতের মধ্যেও সমগ্র মানুষের একত্বের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করেন। তাই সত্যাগ্রহীর নিকট স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ শেষ পর্য্যন্ত বিজয়তিলকের মত সুখদায়ী হইয়া উঠে।

তাঁহার অসহযোগের ফলে প্রতিপক্ষের সুখের নীড় যদি ভাঙিয়া যায়, যদি সে পরোক্ষভাবে দুঃখ পায়, তাহাতে সত্যাগ্রহী কখনও কাতর হন না। কিন্তু প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে দুঃখ দিয়া, তাহাকে ভয় দেখাইয়া তিনি জয়লাভ করিতে চান না। তাহাতে প্রতিপক্ষের স্বার্থসংস্কার আরও দৃঢ় হইয়া যায়। যে সকল মোহের বশে সে শোষণের প্রতিষ্ঠানগুলি জগতে কায়েমী রাখিয়াছে, বিপদের সম্ভাবনায় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার মমতা আরও বাড়িয়া যায় এবং সত্যাগ্রহীর পক্ষে স্থায়ী ভাবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিঃশেষ করা আরও কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলিয়াছেন এ ভাব কখনও দেখান না, তাহার হৃদয়ে যাহাতে সে ধারণা না জাগে বরং তাহারই চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করেন, স্বতন্ত্রভাবে মানুষের নহে।

যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে হিংসার অস্ত্র দ্বারা ভাঙা যায়, প্রতিপক্ষের অন্তরে যে মোহের বশে সেই শোষণকারী

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই বীজকে কিন্তু ভাঙা যায় না। বরং হিংসার যুদ্ধের দ্বারা আরও স্থায়ীভাবে সেই বীজ প্রতিপক্ষের অন্তরে গাঁথিয়া যায়। তাহা আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার সুযোগ খোঁজে। ইহাকে গান্ধীজী স্থায়ী প্রতিকার বলিয়া বিবেচনা করেন না। শোষণের বীজ মানুষের অন্তরে নিহিত আছে। তাহা প্রতি নবজাত শিশুর সহিত প্রত্যহ জগতের ক্ষেত্রে সঞ্জাত হইতেছে। স্বার্থের বুদ্ধি যে কেবলমাত্র শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং একবার তাহাদিগকে হিংসার অস্ত্রের দ্বারা শাসনে আনিতে পারিলেই যে জগতের সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নহে। চিরকাল মানুষকে মানব-অন্তরে অবস্থিত স্বার্থের বীজের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। যথোচিত শিক্ষার দ্বারাই ইহা সম্ভব। সমাজতন্ত্রবাদিগণ এক্ষেত্রে বলেন, "হাঁ, শিক্ষার নিত্য প্রয়োজন ত আছেই। কিন্তু আমাদের সে শিক্ষা দিবার সুযোগ কোথায়? যাহারা কায়েমী ভাবে রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের হিংসার অস্ত্রের দ্বারা আগে সরাইয়া তার পর আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব। এই উপায়ে সব চেয়ে কম যুদ্ধ করিয়া জগতের আর্থিক এবং সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব আনিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।" গান্ধীজী এই জায়গায় বলেন তাহাদের সরাইবার জন্যও হিংসার প্রয়োজন নাই, অহিংস অসহযোগের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সম্ভব, এবং এই উপায়ে রাষ্ট্রকে অধিকার করিতে পারিলে ভবিষ্যতে জগতে নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা দেওয়া আরও সুসাধ্য হইবে। বস্তুতঃ অহিংস অসহযোগের সূচনা হইতেই সত্যাগ্রহী আচরণের দ্বারা মানুষকে সে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন।

গান্ধীজী মনে করেন হিংসার দ্বারা হিংসার বিনাশ সাধন করা যায় না। অহিংসার দ্বারাই হিংসা বিনষ্ট হয়, স্বার্থ-হীনতার দ্বারাই স্বার্থপরতাকে দূর করা যায়, ঐক্যে বিশ্বাসের দ্বারাই ভেদবুদ্ধির অবসান হয়। ইহাকেই তিনি সনাতন পথ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইহাই হইল সত্যাগ্রহের দার্শনিক ভিত্তি। এইবার আমরা তাহার কৌশলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে বিভিন্ন কালে যে সকল নিয়ম রচনা করিয়াছেন আমরা একে একে সেগুলির আলোচনা করিব।

(১) সত্যাগ্রহীকে দুঃখ বরণ করিতে হইবে এবং কেন করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুঃখবরণ শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়ায় তাহা স্পষ্টভাবে জানা দরকার। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে সত্যাগ্রহীকে অবশেষে মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইতে হইবে। মরণের দাম দিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহাই মূল্যবান। তাহার চেয়ে অল্প দাম দিয়া যে বস্তু লাভ করা যায় তাহার মূল্যও কম!

কিন্তু হঠাৎ মরণের জন্য কেহ প্রস্তুত হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজ আমাদের কতকগুলি সুখ-সুবিধা দেয়, কিন্তু সমগ্র মানুষের স্বার্থের দিকে চাহিলে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রেণীবিশেষ এই সুবিধা পাইলেও অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া সুবিধাগুলি আহরণ করা হয়। আমরা সত্যাগ্রহের দ্বারা এই সমাজব্যবস্থার বিনাশ সাধন করিবার চেষ্টা করিলে আমাদিগকে দুঃখ বরণ করিতে হয়। বর্ত্তমান সমাজের দেওয়া সুখ-সুবিধাগুলি হাতছাড়া হইয়া যায় এবং নূতন দুঃখও মাথার উপর আসিয়া পড়ে।

গান্ধীজী বলেন, প্রথম হইতেই বৃহৎ দুঃখ যাচাই করিয়া লইও না। এমন একটি বিষয় লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ কর যাহাতে প্রথমেই বৃহত্তম দুঃখ আসিয়া না পড়ে। জনগণকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, অতএব অল্প দুঃখ হইতে বেশী দুঃখ, অল্প সাহস হইতে বেশী সাহসের পথে সকলকে লইয়া যাও। যে জনগণ বৃহৎ দুঃখের জন্য প্রস্তুত হয় নাই তোমার নেতৃত্বে হঠাৎ তাহাদের মাথায় বৃহৎ দুঃখের বোঝা নামাইও না। ক্রমবৃদ্ধিশীল দুঃখের পথে, তপস্যার পথে, সত্যাগ্রহী নিজে অগ্রসর হইবেন, অপরকে লইয়া যাইবেন।

ইহা সত্যাগ্রহের একটি মূল এবং প্রধান কৌশল। যিনি সত্যাগ্রহী তিনি স্বীয় অন্তরের সঙ্গে গোড়া হইতে যুঝিয়া মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিবেন, তাঁহার নিজের জন্য কোনদিনই দুঃখের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু যাহাদের তিনি সাথী করিয়া লইতে চান তাহাদের যেন অসম্ভব দুঃখের মধ্যে হঠাৎ না ফেলেন। তাঁহার লক্ষ্য হইবে সেই জনগণকেও শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করিতে শেখান। কিন্তু তিনি ক্রমশঃ সাধনার দ্বারা তাহাদিগকে সেই ভয় অতিক্রম করিতে শিখাইবেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজী সকলকে কারাবরণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। ১৯৩০ এ কিন্তু স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন জোতজমি, সংসার-সম্পত্তি সবই আমাদিগকে খোয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন যে অপরকে না মারিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইলে আমাদের দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে না। এইভাবে ক্রমবৃদ্ধির পথে তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকে স্বরাজ লাভের পথে আগাইয়া যাইতে বলেন।

কেহ কেহ বলেন যে গান্ধীজী বিপ্লবী নহেন, তিনি মডারেটগণের মত সংস্কারপন্থী। কিন্তু গান্ধীজী স্পষ্টতঃই বিপ্লবী, কেননা তিনি মৃত্যুর দাম দিয়া মূল্যবান স্বরাজ লাভ করিতে চান। মডারেটগণ একটি লাভ হইতে বৃহত্তর লাভের চেষ্টা করেন। সে লাভ বৈষয়িক। গান্ধীজী একটি লোকসান হইতে বৃহত্তর লোকসানের দিকে জনগণকে লইয়া যান। তাহাতে বৈষয়িক ভাবে লোকসান হয় বটে, কিন্তু অন্তরে মানুষের বল বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বৈষয়িক না হইলেও আধ্যাত্মিক লাভ হইয়া থাকে। যথাসময়ে ইহার দ্বারা মানুষ জগতে সুখের নীড় গড়িয়া তুলিতে পারিবে এই আশা গান্ধীজী সর্ব্বদাই পোষণ করেন।

অতএব সত্যাগ্রহ-বিপ্লবের প্রথম কৌশল হইল ইহা ক্রম-বৃদ্ধির পথে মানুষকে ত্যাগ ও সাহসের এবং আদর্শবাদের শেষ পর্য্যন্ত লইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় নিয়ম হইল যে সত্যাগ্রহের সময়ে সত্যাগ্রহী যে দাবি করিবেন তাহা যেন কদাপি অন্যায় না হয়। শুধু তাহাই নয়। আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি চার আনা হয় তবে সত্যাগ্রহী দুই আনা মাত্র দাবি করিয়া লড়াই করিতে থাকিবেন। কিন্তু সেই দুই আনা দাবির জন্য যে দিন লড়াই করা তাঁহারা স্থির করিবেন সেদিন হইতে যেন তাঁহারা পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেও কিছুতেই দুই আনাকে ছাড়িয়া এক আনা না করেন অথবা আশু জয়ের উৎফুল্লতায় যেন দুই আনাকে বাড়াইয়া তিন আনার দাবিও করিয়া না বসেন। সেই যুদ্ধ যত দিন চলিবে তত দিন দুই আনার অতিরিক্ত বা কম আর কিছুই যেন তাঁহাদের দাবি না হয়। দাবি দুই আনা কি তিন আনা করিবেন তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা সহস্রবার চিন্তা করিবেন। কিন্তু একবার তাহা স্থির হইয়া গেলে কখনও সেই দাবি হইতে তাঁহারা আগাইবেনও না, পিছাইবেনও না। এ নিষ্ঠা সত্যাগ্রহীদের নিশ্চয়ই থাকা চাই।

দাবি স্থির করার ব্যাপারে তাঁহারা সর্ব্বদা অল্পের দিকে থাকিতে চেষ্টা করিবেন ইহা সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের দ্বিতীয় কৌশল।

প্রতিপক্ষ হয়ত বৃহৎ দাবিতে ভয় পাইয়া ছোট দাবি স্বীকার করিয়া লইতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ভয় দেখান, মানুষ হিসাবে তাহাকে আরও হীন করিয়া কিছু আদায় করিয়া লওয়া সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের দাবি এমন হওয়া চাই যেন শত্রুতেও তাহা ন্যায়তঃ অস্বীকার করিতে না পারে। তাহা হইলে জগতের লোক সংবাদ পাইলে সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে এবং সত্যাগ্রহীদের নিজের মধ্যেও বাঁধন দৃঢ় থাকিবে, অন্যথা তাহা শিথিল হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী আরও একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন অনেক সময়ে জনগণকে সত্যাগ্রহে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময়ে কেহ কেহ তাহাদের জাগরিত করিবার জন্য খাজনা বন্ধ বা অনুরূপ কোনও আন্দোলনে আহ্বান করিতে চান। খাজনা বন্ধের লোভে অর্থাৎ আশু লাভের আশায় উত্তেজিত হইয়া হয়ত জনগণ সত্যাগ্রহীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু গান্ধীজী ইহাকে সত্যাগ্রহীর পক্ষে ভুল পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। যদি জনগণ ঠিক বুঝিয়া থাকে যে খাজনা বন্ধের ফলে তাহাদের জোত জমি, গরু বাছুর নিলাম হইয়া যাইবে, তাহাদের জেলে কঠিন কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে এবং বুঝিয়াও যদি তাহারা প্রস্তুত থাকে, অহিংসার সঙ্কল্পে অবিকল থাকে তবেই স্বরাজ লাভের জন্য খাজনা বন্ধের মত কঠিন পথে সত্যাগ্রহী নামিবেন। কিন্তু যদি জনগণকে জাগরিত করা যাইতেছে না বলিয়া সত্যাগ্রহীগণ শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাইবার জন্য এইরূপ আন্দোলন করেন তবে সত্যাগ্রহ আর সত্যাগ্রহ থাকিবে না। অহিংসা বজায় থাকিবে না এবং জনগণের পক্ষে জয়ের পরিবর্ত্তে অন্তে পরাজয়ের সম্ভাবনা বেশী হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪) সত্যাগ্রহের আর একটি নিয়ম হইল সত্যাগ্রহী সর্ব্বদাই

প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তাহার উপর বিশ্বাস করা যখন সত্যাগ্রহ-কৌশলের একটি অঙ্গ, তাহারই সহায়তায় শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান ভাঙা যখন তাঁহার লক্ষ্য, তখন প্রতিপক্ষ রফানিষ্পত্তির কথা বলিলেই সত্যাগ্রহীকে আগাইয়া যাইতে হইবে। গান্ধীজী ১৯২৪ সালে বলিয়াছিলেন, "একথা সত্য যে সময়ে সময়ে লোকে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে। অনেকে আমাকে ঠকাইয়াছে এবং অনেকের মধ্যে যে শক্তি ছিল বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহার অভাব দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাস করি নাই বলিয়া কোনও দিন আমার অনুশোচনা হয় নাই। আমি যেমন অসহযোগ করিতে জানি তেমনই অপরের সহিত সহযোগিতা করিতেও পারি। আমার মনে হয় সংসারে কোনও লোককে অবিশ্বাস করার মত সাক্ষাৎ কোনও হেতু না পাইলে তাহাকে বিশ্বাস করাই সব চেয়ে ভাল। তাহাতে কাজেরও যেমন সুবিধা হয় মানুষের প্রতি আমাদের অন্তরের বিশ্বাসও তেমনই প্রকটিত হয়। ইহার চেয়ে ভদ্র পথ আর কিছু নাই।" "প্রতিপক্ষ যদি বিশ বার সত্যাগ্রহীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে তবু সত্যাগ্রহী একুশ বার তাহাকে বিশ্বাস করিবে। কেননা, মানুষকে বিশ্বাস করিয়া ভাল করাই সত্যাগ্রহের মূল নীতি।"

ইহার দ্বারা শুধু যে মানুষের প্রতি সত্যাগ্রহী অন্তরের শ্রদ্ধা দেখান তাহা নয়, যুদ্ধকৌশল হিসাবেও এই নীতির বিশেষ মূল্য আছে। যদি প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ নাও হয় এবং পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে হয় তাহা হইলে সমস্ত দোষ এবং দায়িত্ব প্রতিপক্ষের উপরে চাপান যায়। ইহা যুদ্ধে কম লাভের কথা নয়। গান্ধীজী সত্যাগ্রহীকে সেই জন্য সর্ব্বদা নিজে নির্দ্দোষ থাকিতে বলেন, যেন দোষ কোথাও থাকিলে প্রতিপক্ষেরই হয় (Always place your adversary in the wrong)। ইহাকে কৌশল হিসাবেও সত্যাগ্রহের অন্যতম নীতি বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

(৫) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বরাজ লাভের জন্য জনগণকে শক্তি ও সংহতির পথে, ত্যাগ ও সাহসের পথে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার জন্য যেমন ভারতব্যাপী অসহযোগ বা সত্যাগ্রহের মত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজন তেমনই আবার স্থায়ী সংগঠনমূলক কাজেরও প্রয়োজন আছে।

যিনি আইন-অমান্য বা বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের সহিত অসহযোগ করিয়া স্বরাজ লাভ করিতে চান তিনি যে কোন আইনই মানেন না ইহা সত্য কথা নহে। আইনের প্রতি বিরাগবশে যে তিনি আইন অমান্য করেন ইহা ভুল ধারণা। তিনি নৈতিক এবং কল্যাণকর আইনকে মানেন বলিয়াই অন্যায় এবং অকল্যাণকর আইনকে ভঙ্গ করার সাহস পোষণ করেন। সমগ্র মানুষের কল্যাণকর অবস্থা আনিতে চান বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্রবাদের মত ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন করিতে চান এই কথাটি সত্যাগ্রহী যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহে উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নাই। ইহা শুধু ভাঙার কাজ নয়। বৃহত্তর একটি নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতেই সত্যাগ্রহীকে ভাঙনের কাজও করিতে হয়, এবং এই নৈতিক ও কল্যাণকর আইন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার শিক্ষা গান্ধীজীর মতে বুদ্ধিমানের মত সংগঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়াই সব চেয়ে সুচারু ভাবে দান করা যায়।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের মধ্যে সত্যাগ্রহী স্বীয় আচরণের দ্বারা যে-শিক্ষা ক্ষণিকের মধ্যে অপরকে দিয়া থাকেন যুদ্ধের অবসরকালে ধীর গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়া তিলে তিলে মৌমাছির মধু সঞ্চয়ের মত সাহস, ধৈর্য্য এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা জনগণের অন্তরে সঞ্চিত করিবেন, ইহা সত্যাগ্রহের পঞ্চম কৌশল। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "আমি জানি অনেকে আইন-অমান্যের সহিত গঠনমূলক কাজের কোনও যোগ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। বারদোলির মত স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে যেখানে একটি বিশিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পূর্ব্ব হইতে গঠনমূলক কাজের প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্বরাজের মত একটি অনির্দ্দিষ্ট এবং ব্যাপক বস্তুলাভের জন্য জনগণের পক্ষে সারা ভারতব্যাপী গঠনমূলক কাজের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ইহার দ্বারা জনগণের সহিত নেতাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হয় এবং জনগণ নেতৃবৃন্দকে একান্তভাবে বিশ্বাস করিতে ও অনুসরণ করিতে শিখে। অবিরাম সংগঠনমূলক কাজ চালাইয়া এই ভাবে পরস্পরের

প্রতি যে বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা জন্মায় তাহা সঙ্কটের সময় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। হিংসামূলক যুদ্ধে সৈন্য-গণকে প্রস্তুত করিবার জন্য যেমন ড্রিলের আবশ্যক আছে, অহিংস সংগ্রামেও সংগঠনমূলক কাজের তেমনই প্রয়োজন আছে। যদি জনগণকে যথাযথভাবে তৈয়ারী করা না যায় তবে কয়েকজন সত্যাগ্রহী ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের মধ্যে আইন অমান্য করিলেও কোন ফল হইবে না। যে নেতৃ-বৃন্দের প্রতি জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, যাহাদের তাহারা চেনে না, এমন নেতার আদর্শ জনগণের মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাপক-ভাবে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। অতএব আমরা সংগঠনমূলক কাজে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব আইন অমান্যের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

(৬) গান্ধীজী সত্যাগ্রহের আয়োজন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস সত্যাগ্রহের মত যে-যুদ্ধে প্রধানতঃ আত্মবলের উপর নির্ভর করিতে হয় সেখানে আন্দোলন চালাইতে হইলে একটি সংবাদ-পত্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণকে সত্যাগ্রহের বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষা দিবার ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামক সংবাদ-পত্রখানি খুব উপকার দিয়াছিল। ইহার সাহায্যে ভিতরেও যেমন, আফ্রিকার বাহিরেও তেমনই সর্ব্বত্র ভারতীয়গণকে আমরা সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে সজাগ রাখিতে পারিয়াছিলাম। আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের উপর নির্ভর করিয়াছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর চরিত্রে যেমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের পরিচালনায় ও চরিত্রেও তেমনই পরিবর্ত্তন সমান তালে চলিতে লাগিল।"

(৭) নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াও গান্ধীজী কিন্তু সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার শক্তি অপরিমেয়। তাই সত্যাগ্রহী ইহা সহসা প্রয়োগ করিতে ইতস্তত করেন। তিনি পূর্ব্বে অন্য সমস্ত উপায়ে প্রতিপক্ষের সহিত নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চালাইবেন, যে কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চায় তাহারই সহিত ধীরভাবে আলোচনা করিবেন। নিজের দাবী শান্ত ভাবে পেশ করিবেন। এরূপ চেষ্টার ফলেও যখন কিছুতেই সমস্যার সমাধান হইবে না তখনই তিনি সত্যাগ্রহের অস্ত্র ধারণ করিবেন। অন্তরের মধ্যে একান্ত ভাবে যখন সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইবার আহ্বান পাইবেন, যখন তদ্ভিন্ন উপায় আর অবশিষ্ট থাকিবে না, তখনই তিনি এই পথ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু একবার সত্যাগ্রহে নামিলে আর তাঁহার ফেরা চলিবে না।"

সত্যাগ্রহী সর্ব্বদা হিংসাকে পরিহার করিয়া চলিবেন। মনে বচনে ও কর্ম্মে তাহাকে পরিহার করিবেন।

যখন চারি দিকে হিংসার ঘনঘটা দেখা দিবে তখন সত্যাগ্রহী পরাঙ্মুখ না হইয়া সহকর্ম্মীদের হিংসা এবং প্রতিপক্ষের হিংসা, এই উভয় হিংসার মধ্যে শস্য যেমন করিয়া জাঁতার দুই চাকার মধ্যে পিষ্ট হয় তেমনই করিয়া পিষ্ট হইবেন। মেঘ যেমন নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া জল বর্ষণ করে তেমনই ভাবে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া জীবনকে ধূলিমুষ্টির মত হেলায় ছাড়িয়া সত্যাগ্রহী মৃত্যুকে বরণ করিবেন। তবু তাঁহার হৃদয় হইতে প্রতিপক্ষের প্রতি মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা এক কণাও ক্ষুণ্ণ হইবে না। তবেই জগতের হিংসাকে অহিংসার দ্বারা জয় করা যাইবে, মানুষকে পশুর পদবী হইতে উচ্চতর পদবীতে লইয়া যাওয়া যাইবে। তাহার কম চেষ্টায় কিছু হইবে না।

চারি দিকে হিংসা ও ভেদবুদ্ধির ঘটা যতই ঘোর হইয়া আসিবে সত্যাগ্রহীর দায়িত্ব এবং কর্ম্মতৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

১১

মৃগাঙ্ক বাড়ী পৌঁছিয়া মৃণালের কথা আবার সব ভুলিয়া গেলেন না। টাকাটা তুলিয়া সত্য-সত্যই মল্লিক-মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এবার বোনাইয়ের সত্যিই চৈতন্য হয়েছে দেখছি, কি বল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত মনে হচ্ছে। তা চক্রবর্ত্তীদের পঞ্চাননের কথা যে বলছিলে, সে প্রস্তাবটা একটু ওর জ্যাঠার কাছে তোল না? ছেলে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, ওরা আবার কোথায় হট ক'রে ঠিক ক'রে বসবে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "যাব একবার কাল সকালে। বুড়োর একটু টাকার খাঁই বেশী, সেই জন্যেই যা ভাবনা, নইলে মেয়ে আর আমাদের কোন্ দিক্ দিয়ে মন্দ?"

গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে কেমন তা আর আমাদের দেশে কেউ দেখে নাকি? নেহাৎ কানা-খোঁড়া না হ'লেই হ'ল। টাকার থলির দিকেই সকলের নজর, সেই থলিটি ভর্ত্তি রাখতে পার তবেই হয়।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ভর্ত্তি করার মালমশলা ত সহজে জোটে না? ওর বাপ দিয়েছে পাঁচ শ, আমি বড় জোর দু-তিন শ দিতে পারি, এই ত সম্বল।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, বুড়োকে ব'লে কয়ে ঐতে যদি রাজী করাতে পার। বড় ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখবে যে বলেছিলে তা লিখেছ নাকি?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "না লেখা আর হয় নি। সনাতন যাচ্ছিল জয়রামপুরে, তাকে কথাটা একবার ওদের কাছে পাড়তে বলেছিলাম। তাতে গিরিজা বলেছে, 'অবস্থা ত দেখছ বাছা, ওঁর শরীর ভেঙে পড়েছে, এখন এসব কথা কইতে গেলে রেগে উঠবেন'।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা দিনকাল, নিজের ঘর সামলে ক'টা মানুষ আর আত্মীয়স্বজনের দিকে চাইতে পারে? বড় ঠাকুরঝি কিন্তু আগে আগে মিনুকে খুবই ভালবাসত।"

পাশের ঘরে যে মৃণাল বসিয়া পড়িতেছে তাহা কর্ত্তা গৃহিণী কেহই খেয়াল করেন নাই, কাজেই গলার স্বরটাও তাঁহাদের স্বাভাবিক পর্দ্দা ছাড়াইয়া নামে নাই। মৃণাল তাঁহাদের সব কথাই শুনিতে পাইতেছিল। এইবার সুরু হইবে তাহার নির্যাতনের পালা, হাটে মাঠে সকলের কাছে তাহার রূপ-গুণের যাচাই, তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা। হিন্দু বালিকার জীবনের এই বেদনাময় অধ্যায়টিকে মৃণাল মনপ্রাণ দিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু অসহায় সে, অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিই বা করিতে পারে? তাঁহারা যে জগৎটাকে একেবারে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। যে কোনও মূল্য দিয়াই হউক, নারীকে একটি পুরুষের গলায় গাঁথিয়া দিতে হইবে, ইহার বাড়া সৌভাগ্য কোনও কন্যার জন্যই তাঁহারা কামনা করেন না। তাহার পর সে পুরুষটি গলার মণি গলায় রাখিল কি ছিঁড়িয়া পদতলে দলিত করিল, তাহা কেহই দেখিতে আসিবে না। অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের স্কন্ধে সকল দায় চাপাইয়া সকলেই সরিয়া দাঁড়াইবে।

পঞ্চানন, সেই চক্রাকার মুখ, আর কদমছাঁট চুল, তাহার মধ্যে ইহারই ভিতর একটি সূক্ষ্ম টিকি আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার চেহারাটা মনে করিতেই মৃণালের হাড়ের ভিতর জ্বালা করিতে লাগিল। কোনও দিকের গোঁড়ামিই সে সহ্য করিতে পারে না। তাহা সনাতনপন্থীরই হউক, কি আধুনিকেরই হউক। পঞ্চানন যে কালে একজন দিগ্‌গজ ধর্ম্মধ্বজী সনাতনপন্থী হইয়া উঠিবে তাহার সব ক'টা লক্ষণই তাহার ভিতর বর্ত্তমান। এখনই সে যে রকম লম্বা লম্বা কথা বলে তাহা শুনিলে হাসি সামলানো দায় হইয়া উঠে। মামা কি আর জগতে বর খুঁজিয়া

পাইলেন না? ক্ষোভে, রোষে মৃণালের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাবা এবারে আসিয়া দেখি তাহার ঘোরতর অপকারই করিয়া গেলেন।

ছুটির দিনকয়টা ত দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। দুই-তিন দিন পরেই মৃণাল কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। এবার মনের দুঃখ তাহার যেন দ্বিগুণ হইয়া পাষাণ-ভারের মত বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কলিকাতা বাস শেষ হইয়া যাইবে সে জন্য ত দুঃখ নাই, এই বৃহৎ কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু চিরদিনের মত অন্য এক নাগপাশ-বন্ধনে না বাঁধা পড়ে এই ভয় অহর্নিশি তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ব্যথার ব্যথী হইতে পারে এমন একটা মানুষও সে দেখিতে পায় না।

বেলা নয়টা-দশটার সময় সে চিনি-টিনিকে লইয়া পুকুর-ঘাটে স্নান করাইতে গিয়াছে। নিজে সে হয় ঘরে তোলা জলে স্নান করে, না-হয় শীতের তীব্র দংশন উপেক্ষা করিয়া ভোর বেলায় ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া আসে। হাজার লোকের চোখের উপর স্নান করিতে সে পারে না, দশ বৎসর কলিকাতাবাসের ফলে তাহার এই অবনতিটুকু ঘটিয়াছে। পাড়ার লোকে ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেও ত ছাড়ে না।

ঘাটে তখন অনেকগুলি মেয়ে। কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ জলে তখনও নামে নাই, উপরে দাঁড়াইয়া সখীদের সঙ্গে গল্প করিতেছে। বাতাসের তীব্রতা যেন শাণিত বর্শাফলকের মত দেহের এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। তবু এই নারীবাহিনীর অধিকাংশেরই অঙ্গে একের অধিক দ্বিতীয় কোন বস্ত্র নাই। শাড়ীর আঁচলখানা গায়ে দুই পাক করিয়া জড়াইয়া তাহারা নিশ্চিন্ত।

একটি তরুণী বধূ মৃণালের গরম জামার আস্তিনটায় এক টান দিয়া বলিল, "বাবা, কত জামাজুমিই যে তোরা পরতে পারিস, হাত পা চলে কি ক'রে?"

মৃণাল বলিল, "কেন গো, জামাটা কি লোহার? হাত চলবে না কেন? তুমি যে কনুই অবধি চুড়ি বালা দিয়ে ভর্ত্তি করেছ, তা তোমার কি হাত চলছে না?"

বউটির ননদ এতক্ষণ ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিতেছিল, সে একবার কুলকুচো করিয়া জল ফেলিয়া বলিল, "ঐ ত, লিখিপড়িদের সঙ্গে কথায় পারবার জোটি নেই। এক কথার উপর দশ কথা বলবে। আচ্ছা, এর পর দেখব লো, কত জামাজোড়া পরিস।"

মৃণাল বলিল, "তা দেখো এখন, চিরকালই পরব।"

"হ্যাঁ পরতে আর হয় না, এর পর বুক অবধি ঘোমটা টেনে চলতে হবে।" বলিয়া আর একটি বউ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মৃণাল মনে মনে একেবারে জলিয়া গেল। সব ফুলেই কাঁটা আছে, কোন-না-কোন সময় তাহা ফুটিবেই হাতে। তাহার এই সুন্দর শান্ত পল্লীজীবনটির ভিতরও কাঁটা এইখানে, এই মূর্খতা, এই গোঁড়ামি, এই অজ্ঞতা।

কিছুদূরে একটি প্রৌঢ়া রমণী বসিয়া একরাশ পূজার বাসন ধুইতেছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মামীমা, তোমাদের বড় বউ ঘোমটা দেয় না গা?"

প্রৌঢ়া ভারি গলায় বলিলেন, "ঘোমটা দেবে না কেন গা? এ কি শহরে বিবি, না বেম্মজ্ঞানী? আমাদের ঘরে ও সব খিরিষ্টানী চালচলন কেউ হ'তে দেয় না। ছেলে-মেয়েদেরও সে শিক্ষা নেই।"

টিনি-চিনিকে এক হ্যাঁচকায় জল হইতে তুলিয়া মৃণাল তাড়াতাড়ি তাহাদের মাথা-গা মুছিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, গায়ে ছোট র‍্যাপার দুইটি জড়াইয়া দিয়া, হন্ হন্ করিয়া ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। চিনি-টিনিও দিদির পিছন পিছন দৌড়িয়া চলিল।

যে বউটি প্রথম মৃণালের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছিল সে বলিল, "দেখেছ মেয়ের দেমাক, মাটিতে পা পড়ে না যেন। দুখানা বই পড়েছে কিনা, তাই মুখ্যু মানুষের সঙ্গে কথা কইতেও ওর ঘেন্না ধরে।"

তাহার ননদ বলিল, "রেখে দে লো, অমন দেমাক ঢের দেখেছি। কুড়ি বছর বয়স হ'ল, এখনও থুবড়ি হয়ে ব'সে আছে, তার আবার দেমাক। মামী-মাগীর গলা দিয়ে ভাত যায় কি ক'রে তাই ভাবি।"

মৃণালকে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া

তার মামী বলিলেন, "ওমা, এই গেলি, আর এই এলি? মেয়ে ছুটো চান করে নি নাকি?"

মৃণাল তখনও রাগে ফুলিতেছে, বলিল, "চান যথেষ্ট করেছে। তোমাদের গাঁয়ের আর্য্যনারীদের বক্তৃতার তোড়ে কি ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়াবার জো আছে?"

মামীমা বুঝিলেন, পঞ্চাননের সঙ্গে সম্বন্ধের কথাটা কিঞ্চিৎ ছড়াইয়াছে। হাসিয়া বলিলেন, "তা বাছা রাগ করলে চলবে কেন? একটা কথা শুনলেই তা নিয়ে মানুষ ভালমন্দ পাঁচটা কথা বলে।"

মৃণাল ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। মামীমাও ত মতে ঐ আর্য্যনারীদের দলে, তাঁহাকে মনের ব্যথা জানাইয়া ত কোন লাভ নাই? মনের জ্বালা তাহাকে মনেই পুষিয়া রাখিতে হয়। বিবাহ তাহার হইতই, কয়েক দিন আগে বা পরে, ইহা মৃণাল ভাল করিয়াই জানিত। কিন্তু আর দু-একটা বছর তাঁহারা ইহাকে কি নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন না? তাহার মধ্যে একটু ত সে মানুষের মত হইতে পারিত? আর নিতান্তই যদি এখনই তাহাকে বিদায় করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পঞ্চানন ছাড়া কি পাত্র ছিল না? স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এই বয়সেই পঞ্চাননের পাঁচ-মুখে খই ফোটে, সে মৃণালের মত মেয়েকে যে কতখানি আদর করিবে, তাহা বুঝাই যায়।

সেদিন তাহার মনটা এমন উতলা হইয়া রহিল যে দুপুরে পড়িতেও পারিল না। খানিক বৃথা চেষ্টা করিয়া, পরে টিনির সঙ্গে কাঁথা গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মল্লিক-মহাশয় সেদিন সকালেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, ফিরিলেন অনেক বেলা করিয়া। অনাহারে এতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গৃহিণীর মেজাজটা কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীকে দেখিয়াই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কোথায় এতক্ষণ বিশ্ব উদ্ধার করছিলে? তোমার না-হয় না খেলেও চলে, আমরা সারাদিন খাটি খুটি, আমাদের ত দুটি মুখে দিতে হয়?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এই জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী গিয়ে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেল একটু। এক-আধ দিন যদি বেশী দেরি হয় তুমি আগে খেয়ে নিলেই পার, আমি তাতে কিছু মনে করি না, তোমার শরীর ত তত ভাল নয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও সব শিক্ষা আমরা পাই নি বাপু, পাড়াগেঁয়ে মানুষ। নাও, এখন দুটো ভাত-জল খেয়ে কেতাথ কর।"

তিনি ভাত বাড়িতে বসিলেন, মল্লিক-মহাশয়ও তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া আসিলেন। খাওয়া আরম্ভ করিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু খেয়েছে ত?"

গৃহিণী তরকারিতে কাঁচা লঙ্কা ভাঙিয়া মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাকে খাইয়ে দিয়েছি, ছেলেমানুষ পিত্তি চুঁইয়ে যাবে। ওর ত এ সব অভ্যেস্ নেই, যদিও ওর বয়সে আমি ছেলের মা হয়েছি।"

মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে গৌরীদানের গৌরী হ'য়ে ঘর আলো করেছিলে গো। মিনুর সে তুলনায় বয়স ঢের হ'য়ে গেল। এখন ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে যায় তবেই। বুড়োর যা টাকার বাতিক, আর কিছু সে দেখতেই পায় না।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললে কি? অনেক টাকা চায় নাকি? তা হ'লে ত আমাদের অসাধ্যি। কথাটা মিনুরও কানে গেছে বোধ হয়, কেমন যেন মনমরা হয়ে আছে। বেশী বড় ক'রে রাখলেই এই সব আপদ জোটে। আমাদের হিন্দু গেরস্ত ঘরে বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন ছোটমোট থাকতে থাকতে দিয়ে দেওয়াই ভাল। তখন বোঝেও না কিছু, মা-বাপে যেখানে ধ'রে দেয়, সেখানে হাসতে হাসতে যায়।"

মল্লিক-মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কেন মনমরা কেন? এখানে বিয়ে হয় এ কি তার ইচ্ছে নয়? তা হ'লে ত মুস্কিল। বড় হয়েছে, নিতান্ত অনিচ্ছায় বিয়ে দিলে ত সুখী হবে না। আমি সেটা মোটেই চাই না। কিসে বুঝলে যে মনমরা হয়ে আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কিসে আবার বুঝব, তার ধরণেই বুঝেছি। ও কি আর আমায় মুখ ফুটে কিছু বলবে? তেমন মেয়ে নয়। কিন্তু আমার হাতে মানুষ, আমি বুঝি সব। এখন বিয়েতেও ওর মত নেই, আর পঞ্চাননকেও বোধ হয় দেখতে পারে না।"

মল্লিক-মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন গো, ছেলে ত মন্দ নয়? সুস্থ, সবল, স্বভাব-চরিত্রও ভাল। দেখতে অবশ্য খুব সুপুরুষ নয়, তা আমাদের মেয়েও ত তেমন ডাকসাইটে সুন্দরী কিছু নয়।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন, চেহারার জন্যে মোটেও নয়। পঞ্চানন শশুরেপনা, সাহেবীয়ানা দেখতে পারে না, তাই নিয়ে শক্ত শক্ত কথা বলে, তাইতে মিনির রাগ। পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিতে হ'লে তেমন ভাবে মানুষ করতে হয় বাপু। তোমরা মেয়েকে একেবারে সাহেবী শিক্ষা দিচ্ছ, তার পর বিয়ে দিতে চাও একেবারে গোঁড়া হিন্দুর ঘরে, কাজেই মেয়ের মনে খট্‌কা বাধে, পছন্দ হয় না। এত বড়টি করাই অন্যায় হয়েছে, তা গরীবের কথা বাসি হ'লে তবে মিষ্টি লাগে। বোঝ এখন।"

কর্ত্তা চিন্তিত মুখে নীরবে খাইতে লাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এখনই অত ভেবে আর কি হবে? আগে সম্বন্ধই ঠিক হোক্, তার পর ও সব ভাবনা। বুড়ো কি বললে শুনি?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "সে ত বলে দু-বছরের পড়ার খরচ দিতে, না-হয় এক হাজার টাকা পণ থোকে ধ'রে দিতে। আমাদের সম্বল সব কুড়লে-বাড়ালে হাজার-বারো শ বড় জোর হবে, সবই যদি পণ দিতে যায় তা বাকী খরচ কোথা থেকে আসবে? মেয়েকেও ত শুধু শাঁখা-শাড়ী দিয়ে বিদেয় করতে পারব না?"

গৃহিণী বলিলেন, "ইঃ, হাজার টাকা পণ! মিন্সে নিজের বড় ছেলের বিয়েতে কত হাজার টাকা পেয়েছিল? ন গাঁয়ের রায়েদের মুরোদ কত তা আর আমি জানি না? তাদের মেয়ে ত? হাতে দু-গাছা রুলি আর গলায় সরু বিছে-হার পরিয়ে মেয়ে পার করেছে, পণ চার শ টাকা দিয়েছে, তাও বছর ঘুরতে। আমি আর জানি না? আমার মামীর বাপের বাড়ী ঐ গাঁয়ে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথারও উল্লেখ একটুখানি করেছিলাম, তোমার কাছে শুনেছি কিনা? তাতে বললে, মেয়ে অতি সুন্দরী, অমন একটি এ গাঁয়ে নেই, তাই দে'খে গিন্নি জেদ ধরাতে এ বিয়ে হয়েছে, না হ'লে শীতলের জন্যে নাকি অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, দু-হাজার অবধি দর উঠেছিল।"

গৃহিণীর খাওয়াই বন্ধ হইয়া গেল। বাঁ হাতখানা গালে রাখিয়া বলিলেন, "মা, মা, মা, কোথায় যাব? ঐ মেয়ে হ'ল গাঁয়ের সেরা সুন্দরী? আমি আর তাকে দেখি নি? এই একরত্তি থেকে দেখছি। ও যদি সুন্দরী, তা হ'লে আমি পদ্মিনী।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমার চোখে ত বটেই। তা বাপের বয়সী বুড়োকে সে কথা আর বলি কি ক'রে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না গো না, ঠাট্টার কথা নয়। কথায় বলে, 'যার রান্না খাই নি সে বড় রাঁধুনী, আর যাকে চোখে দেখিনি সে বড় রূপসী।' তা এ যে চোখে দেখা মেয়ে? এই মাঠ কপাল, কুৎকুতে চোখ, চুলও নেই মোটে। রূপের মধ্যে গায়ের চামড়াটা একটু শাদা, এই আমাদের টিনির মত হবে। চিনুর তার চেয়ে ঢের ছিরি আছে, যে যাই বলুক। চুল খুললে ত হাঁটুর নীচে পড়ে। বলব ত আমি বুড়ীকে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "থাক্, এখনই কিছু বলতে যেয়ো না, আমিই আগে একটু কথাবার্ত্তা ভাল ক'রে কয়ে দেখি, তার পর দেখা যাবে।"

খাওয়া দু-জনেরই চুকিয়া গেল। কর্ত্তা উঠিয়া গেলেন, গৃহিণী বাসন উঠাইয়া জায়গা নিকাইয়া তবে রান্নাঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন। শুইবার ঘরে গিয়া দেখিলেন মৃণাল তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মনে বলিলেন, "এর চেয়ে নাকি কুসমী ছুঁড়ী দেখতে সুন্দর! কি বা কথার ছিরি। একে সাজিয়ে দাঁড় করালে রাজ-বাড়ীতে বিয়ে দেওয়া যায় না?"

মৃণাল উঠিয়া দেখিল বেলা একেবারে গড়াইয়া গিয়াছে। চিনি, টিনি উঠিয়া গিয়াছে কখন। বাহিরে তাহাদের হুড়োহুড়ির শব্দ আর মিহি গলার চীৎকারে দিক্ কাঁপিয়া উঠিতেছে। রান্নাঘরের কাজও বিধিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখেমুখে জল দিয়া রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "বেশ মামীমা, আমাকে ডাকতে হয় না? এতখানি বেলা গড়িয়ে গেল, আজ সকাল থেকে আমার পড়াশুনো কিছু যদি হ'ল।"

মামীমা বলিলেন, "শুয়ে ঘুমুচ্ছিস না, তাই আর ডাকি নি।

কোনও দিন ত দুপুরে ঘুমোস না, ভাবলাম শরীর হয়ত ভাল নেই। তা দু-দিন বাদে ত বোর্ডিঙে গিয়ে উঠবি, তখন খুব ঠেসে পড়িস্।"

মৃণাল বলিল, "যাব ত দু-দিন পরে, কিন্তু কার সঙ্গে যাব তা কিছু মামাবাবু ঠিক্ করলেন? একলা ত আর তোমরা আমায় যেতে দেবে না? যদিও তাও আমি পারি, ক' ঘণ্টারই বা পথ?"

মামীমা ডালে কাঠি দিতে দিতে বলিলেন, "তা আর পার না, তোমরা না পার কি? খালি সব চেয়ে সোজা জিনিষ-গুলোই তোমাদের গলায় বেধে যায়। যাক্ গে, একলা তোমায় যেতে হবে না, অনেক লোক শনিবারে গাঁ থেকে যাচ্ছে। সকলেরই ইস্কুল-কলেজ ঐ সময়েই খুলবে ত। সেই সঙ্গে যাবি এখন। কিছু খেতে দেব তোকে? সেই কোন্‌কালে খেয়েছিস্।"

মৃণাল বলিল, "না এখন আর আমি কিছু খাব না, কেমন যেন মাথাটা ভার ক'রে রয়েছে।"

মামীমা বলিলেন, "ভিজে চুলে শুলি যেমন। ঐ এক কাঁড়ি চুল শুকোবে কখন? একটু চা ক'রে খা না, মাথাটা হাল্কা লাগবে।"

মৃণাল চায়ের মোটেই পক্ষপাতী নয়। কিন্তু আজ শরীরটা সত্যই ম্যাজ ম্যাজ করিতেছিল, হয়ত চা খাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। বলিল, "আচ্ছা দাও একটু গরম জল ক'রে, চা-ই খাই এক পেয়ালা।"

এ বাড়ীতে চা হওয়াও এক মহাপর্ব্ব। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই। পাথরের একটি চুম্‌কী ঘটীতে গরম জলে চা ভিজাইয়া মৃণাল বাটি চাপা দিয়া রাখিল। চিনি, টিনি ও খোকার মাথার টনক অমনি কেমন করিয়া নড়িয়া উঠিল, তিনটি মূর্ত্তিই অবিলম্বে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত। অগত্যা সকলকেই চা দিতে হইল। কেহ বা পাথর বাটি, কেহ বা পানের ডিবার খোল কেহ বা গেলাস লইয়া বসিয়া গেল। চা মৃণালের ভাগ্যে অল্পই জুটিল। ছেলেমেয়েদের পেটেও যে বেশী গেল তাহা নয়, মেঝের উপরেই ঢেউ খেলিতে লাগিল বেশীর ভাগ। সবাইকে নড়া ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া গৃহিণী বক্‌বক্ করিতে করিতে ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

১২

মৃণাল প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেনে একটা ওয়েটিং-রুম আছে অবশ্য, কিন্তু সেখানে বসিতে মৃণালের ভাল লাগে না, তাহার উপর আজ সে ঘরখানিও স্ত্রীলোক ও বালকবালিকায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামটিকে মৃণাল যতই ভালবাসুক পল্লীবাসিনীদের সঙ্গ সব সময় ভালবাসিত না। তাহারা এক কথা বই কথা জানে না, আর সেই কথাটি শুনিতেই এখন মৃণালের সবচেয়ে আপত্তি। বিবাহের নামে এখন তাহার গায়ে জ্বর আসে।

বিবাহ ব্যাপারটার প্রতিই যে তাহার কোনও বিতৃষ্ণা ছিল তাহা নয়; থাকিবার কথাও নয়। স্বাভাবিক মনোবৃত্তি লইয়াই সে জন্মিয়াছিল, স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বিবাহের কথা, প্রেমের কথা সে ভাবিয়াছে বই কি? খুবই ভাবিয়াছে। তাহার তরুণ জীবনে অধীশ্বর-রূপে যে মানুষটি দেখা দিবে তাহার মূর্ত্তি স্বপ্নে জাগরণে কত রকম করিয়া দেখিয়াছে, কল্পনায় কত ভাবে তাহাকে বরণ করিয়াছে। কিন্তু এখন এসব কথা ভাবিতে গেলেই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পঞ্চাননের বৃহৎ চক্রাকার মুখ, আর খোঁচা খোঁচা চুল যেন তাহার চোখের সম্মুখে জগৎ-সংসারকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। এই বিবাহটা দিবার জন্ম মল্লিক-মহাশয় যেন আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। কত কথা হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই, দর কষাকষির বিরাম নাই। ব্যাপারটা এমন কুৎসিত যে ভাবিতেই মৃণালের বুকের ভিতরটা ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া উঠে।

আজ লোক চলিয়াছে বিস্তর, বেশীর ভাগই কলিকাতার যাত্রী। ট্রেনে জায়গা পাইবে কি না, সেও এক ভাবনা। সারাপথ হয়ত দাঁড়াইয়াই যাইতে হইবে। দাঁড়াইতেও আপত্তি নাই, কিন্তু পুরুষদের গাড়ীতে যাইতে হইলেই সর্ব্বনাশ, কারণ দেখা যাইতেছে যে স্বয়ং পঞ্চাননও চলিয়াছে এই ট্রেনে। কাজেই মৃণালের মনে ভারের উপর আরও ভার চাপিয়া উঠিয়াছে।

মল্লিক-মহাশয় একবার ভাগ্নীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই রোদে কত আর দাঁড়াবি? ঘরে বসবি চল্ না? আজ আবার ট্রেন কিছু লেট হয়েছে শুনেছি।"

মৃণাল বলিল, "না মামাবাবু, আমি এইখানেই থাকি। ঘরে ঢুকলে বক্‌বক্ ক'রে সবাই আমার মাথা ধরিয়ে দেবে।"

তাহার মামাবাবু বলিলেন, "তা হ'লে এই ছাতাটা নে। যা ভিড়, গাড়ীতে উঠতে পারলে হয়। অনেক লোক যাচ্ছে এই গাঁ থেকেই, পরে আরও কত উঠবে কে জানে? বীরু আবার তেমন চটপটে মানুষ না, জায়গা-টায়গা ক'রে দিতে পারবে কি না কে জানে। নেহাৎ জায়গা না পাস্ ত বিছানাটার উপরই বসিস্।"

মৃণাল গ্রামেরই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চলিয়াছে, তাঁহার নাম বীরেন্দ্র ভৌমিক। ভদ্রলোক বৃদ্ধা মাতাকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া চলিয়াছেন।

মৃণাল বলিল, "দেখি কি করতে পারি, আগে ট্রেনে উঠি ত?"

ট্রেন লেট হইল বটে তবে খুব বেশী নয়, মিনিট পনর মাত্র। থামিবার আগেই দেখা গেল, ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরা যাত্রীতে ভর্ত্তি। মাত্র এক মিনিট ট্রেন থামে, অত দেখিয়া শুনিয়া উঠিবার সময় কোথায়? সুতরাং বাক্স বিছানা লইয়া যাত্রীর দল প্রথম যে গাড়ী পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িবার জন্ম পাগলের মত ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের ভয়াকুল চীৎকার, শিশুর কান্নায় জায়গাটা ভরিয়া উঠিল।

মৃণালকে মল্লিক-মহাশয় এক রকম কোলে করিয়াই গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। তাহার সহযাত্রী ভদ্রলোক তখন বৃদ্ধা মাতা আর তাঁহার অসংখ্য পোঁটলা-পুঁটলি লইয়াই ব্যস্ত, মৃণালের তদারক করিবার তাঁহার সময় নাই।

কামরাটি একেবারে যাত্রীতে আর লটবহরে মাল গাড়ীর অবস্থা পাইয়াছে। বসিবার জায়গা ত নাইই, ভাল করিয়া দাঁড়াইবারও স্থান নাই। এ উহার গায়ে ধাক্কা দিতেছে, মানুষের গায়ে বাক্স-পেঁটরা উল্টাইয়া পড়িতেছে, এবং তাহা লইয়া তুমুল কলহ বাধিয়া যাইতেছে।

মৃণালের বাক্স বিছানা জান্‌লা গলাইয়া কোনও মতে ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বসবার জায়গা কোনও মতে হবে না?"

মৃণাল কিছু বলিবার আগেই বীরেন্দ্র বলিলেন, "তা ত হবেই না। আমরা না-হয় দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু বুড়ীকে নিয়ে কি করি?"

মৃণাল এক কোণে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে যাত্রী অবশ্য অসংখ্য এবং জিনিষপত্রও তদধিক, কিন্তু সবাই যদি নিজের নিজের জিনিষ যথাসাধ্য গুছাইয়া রাখে, এবং অন্য লোকগুলির সুবিধা-অসুবিধার কথা একটু ভাবে, তাহা হইলে ইহারই মধ্যে একটু ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু সে শিক্ষা ত পল্লীবাসী বাঙালী কোনও দিন পায় নাই, মেয়েরাই যেন আরও বিশেষ করিয়া পায় নাই। বসিতে পাইলেই তাহারা শুইতে চায়, কোন মতে নিজের এবং নিজের সাঙ্গোপাঙ্গের জন্ম বেশী জায়গা দখল করিতে পারাই যেন তাহাদের জীবনের এখন একমাত্র ব্রত। নিজের স্বজাতীয়াদের ব্যবহার দেখিয়া মৃণালের হাড়ে হাড়ে জ্বালা করিতে লাগিল।

অবশ্য, বাঙালী পুরুষগুলিও যে খুব চমৎকার কিছু ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা নহে। যে যেখানে পারিয়াছে গায়ের জোরে নিজে আগে চাপিয়া বসিয়াছে, সঙ্গের স্ত্রী-কন্যা দাঁড়াইয়া আছে কি না সেদিকেও দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি থাকিবেই বা কেন? গৃহে যাহারা চিরকাল দাসীর ব্যবহার পাইয়া সন্তুষ্ট, বাহিরে তাহারা সম্মানের আশা রাখিবে কি করিয়া? ভয়ে সংকোচে জড়সড় হইয়া যে যেখানে পারে দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে মৃণাল নিজের বাক্সের উপর বিছানাটা চাপাইয়া দিয়া সঙ্গের বৃদ্ধাকে বলিল, "আপনি এখানে বসুন।"

তিনি বসিতে পাইয়া ত বাঁচিয়া গেলেন, অবশ্য, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত পথ কি ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে মা?"

মৃণাল বলিল, "লোকজন নামবেও ত মাঝে মাঝে তখন জায়গা ক'রে নেব।" অবশ্য লোক যে নামিবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল।

পঞ্চানন এই গাড়ীতেই উঠিয়াছে, এবং একটা বেঞ্চে বেশ গদীয়ান হইয়া বসিয়া আছে। মৃণালের ইচ্ছা করিতেছিল তাহার টিকিটা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। ভগবান্, এই মানুষটা যেন তাহার জীবনে ধূমকেতুর মত উদিত না হয়।

পঞ্চানন বসিয়া বসিয়া মৃণালকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছিল। সে আদর্শ সনাতনপন্থী হিন্দু, বিবাহের আগে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরকে চোখে দেখাটাকেও অনাচার বলিয়া প্রচার করে। তাই বলিয়া ভাবী বধূ সামনে যদি দৈবগতিকে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে দোষ কি? দেখিতে ত বেশ ভালই লাগে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ইহা ভিন্ন মেয়েটির চেহারার বিশেষ কোন খুঁৎ নাই। তরুণ লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি নয়নাভিরাম, শরীরের গঠন চমৎকার, গ্রীবার উপর বিপুল কবরী এলাইয়া পড়িয়াছে, খুবই সুকেশী হইবে। ইহার সহিত বিবাহটা ঘটিয়া গেলে পঞ্চানন নিজেকে হতভাগ্য মনে করিবে না।

কিন্তু মেয়েটি বোধ হয় অতিরিক্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, ধরণ-ধারণ কেমন যেন উগ্র। ইহার ভিতর স্ত্রীসুলভ নম্রতা, লজ্জা হয়ত কমই। তাহা হইলেও উহাকে পথে আনিতে পঞ্চাননকে বেগ পাইতে হইবে। তা নিজের ক্ষমতার উপর পঞ্চাননের আস্থা আছে। বিরক্তির ভাবটা তাহার মুখে মানাইয়াছে মন্দ নয়, কিন্তু হিন্দুকুলনারীর বিরক্ত হওয়াও উচিত নয়, ইহাই ছিল পঞ্চাননের মত। তাহারা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সকল অবস্থাতেই শান্ত থাকিবে। যদিও মৃণাল এখনও তাহার পত্নী হয় নাই, তবু পঞ্চাননের মনে তাহাকে হিন্দুনারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা উপদেশ দিবার ইচ্ছা ক্রমে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল।

পরের ষ্টেশনটায় কপালগুণে সত্যই তিন-চারজন মানুষ নামিয়া গেল, কিন্তু উঠিয়াও পড়িল চার-পাঁচজন। কাজেই বসিবার জায়গা পাওয়ার আশা মৃণালের মনে উদিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। যাহারা উঠিল তাহারা সব কয়জনই পুরুষ, কাজেই ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাদের ভিতর বসিয়া পড়াও সম্ভব নয়।

মৃণাল যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই পাশের বেঞ্চে দুইজন যুবক আসিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু একজন চারিদিকে চাহিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃণালের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি বসুন।"

মৃণাল বসিল, বসিতে পাইয়া বাঁচিয়াই গেল। যে-যুবকটি নিজে উঠিয়া তাহাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিল, তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। মানুষটা বেশ সুশ্রী, রং ফরসা, লম্বা একহারা চেহারা। মুখের ভাব বেশ মার্জ্জিত, সপ্রতিভ। কলিকাতাবাসী মানুষ বোধ হয়, পাড়াগাঁয়ে বেড়াইতে আসিয়া থাকিবে। সহযাত্রিণীদের সম্বন্ধে অত্যুগ্র কৌতূহলও নাই, আবার তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতনও নয়।

উল্টাদিকের বেঞ্চ হইতে পঞ্চানন হঠাৎ হাঁক দিয়া উঠিল, "বিমলে, এ দিকে আয়।"

ছেলেটি ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে পঞ্চাননের কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার? বসবার জায়গা আছে?"

পঞ্চানন মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, জায়গা ত কাঁদছে। গাধার মত জায়গা পেয়েও ত ছেড়ে দিলি।"

কথাগুলা অবশ্য সে নীচু গলাতেই বলিল, কিন্তু এতটা নীচু নয় যে গাড়ীর অন্য লোকে শুনিতে পাইল না। মৃণাল মনে মনে বলিল, "গাধা ও ত নয়, গাধা তুমি।"

বিমল নামক ছেলেটি বলিল, "তা কি করব, অতগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

পঞ্চানন বলিল, "তা থাক্ না দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশের মেয়েরা ত মেমসাহেব নয় বা মোমের পুতুলও নয়। পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেই মূর্চ্ছা যাবে না।"

বিমল বলিল, "না, তা কি যায়? তুমি থাক না ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে, কেমন আরাম লাগে দেখি।"

পঞ্চানন বলিল, "খুব পারি, তোমাদের মত শহুরে 'গ্যালাণ্ট' নই। নিজেও গ'লে যাই না, অন্যের গ'লে যাবার ভয়ও রাখি না।"

বিমল বলিল, "তা বেশ কর। এখন ঐ ঢাকাই জালাটি বাক্সটার ওপর থেকে নামাও দেখি, আমি বাক্সটার ওপরে বসি। এক জালা ভর্ত্তি ক'রে কি নিয়ে যাচ্ছ? গঙ্গাজল নিশ্চয়ই নয়, সে ত কলকাতাতেই পাওয়া যায়।"

পঞ্চানন বলিল, "এই পাঁচ সেরি হাঁড়িটা হ'ল ঢাকাই জালা? তুমি একেবারে মূর্ত্তিমান চাঁদের আলো খেকো ক্যালকেশিয়ান্ কবি। ওতে ঘি আছে হে শ্রীমান, বাড়ীর তৈরি গাওয়া ঘি।"

বিমল বলিল, "সাধে এই বয়সে অত বড় ভুঁড়ি তোর। এই পাঁচ সের ঘি একলা গিলবি?"

মেয়েদের যতই অবজ্ঞা করুক, তাহাদের সামনে নিজের দৈহিক সমালোচনাটা পঞ্চাননের ভাল লাগিল না। মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "খাবার ঢের লোক আছে হে। গত বারে যে গুড় এনেছিলাম গ্রাম থেকে, তাতে তুমিও ভাগ বসিয়েছিলে।"

বিমল বলিল, "তা বসাব বই কি? বয়সে না-হয় তুই মাত্র এক বছরের বড়, তাই ব'লে সম্পর্কে যে মামা তা ভুলব কেন? যা আনবি তা আগে ভাগ্নেকে দিবি, তবে নিজে গিলবি। এত বড় আর্য্যবংশাবতংস হয়ে এটা জানিস্ না?"

গাড়ীর ভিতরের যাত্রীর দল নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত। কেহ কাহারও কথার দিকে বড় একটা মন দিতেছে না। মৃণালের কানে কিন্তু পঞ্চানন এবং বিমলের সব কয়টি কথাই আসিয়া পৌছিতেছে। অত মন দিয়া তাহাদের কথা শুনিবার তাহার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, তবু কেমন যেন শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। ঐ ছেলেটি সত্যই পঞ্চাননের ভাগ্নে নাকি, না শুধু গ্রাম-সম্পর্কেই মামা বলিয়া ডাকে? চেহারা বা চালচলনে কোথাও ত বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই?

ট্রেনটা বিশেষ জোরে চলে না, সারা মাটি মাড়াইয়া চলিয়াছে যেন। পনের মিনিট কুড়ি মিনিট পরে পরে এক একটি ছোট ষ্টেশন, কোথাও বা এক মিনিট দাঁড়ায়, কোথাও বা দুই মিনিট, কিন্তু ইহারই ভিতর যাত্রী উঠা-নামার হুড়াহুড়ি অবিশ্রাম চলিয়াছে। দেশসুদ্ধর যেন এই ট্রেনে কলিকাতায় গিয়া না পৌছিলেই নয়।

মৃণালের সহযাত্রী বীরেন্দ্রবাবু ঘণ্টা-দুই দাঁড়াইয়া থাকিয়া এতক্ষণে পঞ্চাননের বেঞ্চেই একটু বসিবার জায়গা করিয়া লইলেন। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, তোমাদের ভরসায়ই আমার বেরনো। গেঁয়ো মানুষ আমি, তোমাদের কলকাতার হালচালও জানি না, রাস্তাঘাটও চিনি না। আমাকে একটা হিন্দু হোটেল-টোটেল দে'খে উঠিয়ে দিও, আর এই মল্লিক-মশায়ের ভাগ্নীটিকে তার বোর্ডিঙে পৌছে দিও।"

পঞ্চাননের অত পরোপকার করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সোজাসুজি অস্বীকারই বা করে কি প্রকারে? তাহার উপর মৃণালকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিবার প্রস্তাবটা তাহার কাছে মন্দ লাগিল না। বলিল, "আচ্ছা, তা আমি আছি, বিমল আছে, ভাগাভাগি ক'রে হয়ে যাবে এখন।"

মৃণাল মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিবার ভারটা যদি পঞ্চানন গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি? যে যাহাই মনে করুক, সে বীরেনবাবুদের সঙ্গ ছাড়িতেছে না।

বিমল ফিশ ফিশ করিয়া বলিল, "লাকী ডগ।"

পঞ্চানন গম্ভীর হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "যা, যা, জ্যাঁঠামি করতে হবে না।"

মৃণাল দেখিয়া শুনিয়া আরও হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল।

যাহা হউক, গড়াইতে গড়াইতে ট্রেন অবশেষে গিয়া কলিকাতায় পৌছিল। লোকের ভিড় আর কুলীর চীৎকারে চক্ষুকর্ণ ব্যথিত হইয়া উঠে। যাত্রীদের জিনিষপত্রের উপর যেন ডাকাত পড়িল। একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

বীরেন্দ্র ভীত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখো বাপু, শেষ রক্ষা ক'রো। আমি ত এই বুড়ো মানুষকে সামলাব না জিনিষপত্র দেখব, কিছু ঠিক পাচ্ছি না।"

পঞ্চাননও তখন নিজের ঘিয়ের হাঁড়ি লইয়া ব্যস্ত। অজাত-কুজাতকে তাহা ছুঁইতে দিবার তাহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু অত বড় হাঁড়ি সামলাইয়া আর কিছু করাও ত শক্ত। সে হাঁকিয়া বলিল, "ওরে বিমলে, তোর সঙ্গে ত কিছু জিনিষপত্র নেই, তুই এ দিকে একটু দেখ্ না।"

বিমল অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, "আপনাদের জিনিষ কোন্‌গুলো একটু আমায় দেখিয়ে দিন। ওঃ, এই ক'টা মাত্র? আচ্ছা আপনারা নেমে পড়ুন, কিছু ভাবতে হবে না, আমি সব গুছিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখবেন সাবধান!"

অতিকায় এক ট্রাঙ্ক মাথায় করিয়া এক মুটে মৃণালের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। বিমল ব্যস্ত হইয়া তাহাকে টানিয়া সরাইয়া না দিলে মাথায় মৃণালের নিদারুণ আঘাত লাগিত। ভয়ে সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র আঁৎকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনেশে জায়গা রে বাবা, প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে যে বাঁচি।"

তাহার বৃদ্ধা মাতা প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিলেন, "এ কোথায় নিয়ে এলি রে বাবা! বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি?"

তাঁহার ছেলে চটিয়া গিয়া বলিলেন, "গেলেই ত ভাল। মা-গঙ্গার কোলে হাড় ক'খানা রেখে যেতে বড় যে সাধ হয়েছিল, বোঝো এখন ঠেলা।"

বিমল বলিল, "না, না, কোন ভয় নেই, এখনই ভিড় কমে যাবে। একটু এ পাশে স'রে দাঁড়ান। এ রকম ভিড় এখানে বার মাসই হচ্ছে, কখনও কেউ মারা যেতে ত দেখি নি। একটু লোকের ঠেলা কমুক, তার পর বেরিয়ে গিয়ে গাড়ী করা যাবে।"

পঞ্চানন ঘিয়ের হাঁড়ি দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এদিকে, এদিকে। এইখান দিয়ে বেরিয়ে এস।"

বিমল বলিল, "আমরা ঠিক বেরচ্ছি, তুমি তোমার ঘিয়ের জালা সাম্‌লাও।"

লোকের ভিড় পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে অনেকখানিই কমিয়া গেল। বিমল সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল, বৃদ্ধাকে অভয় দিয়া বলিল, "আর কোন ভয় নেই, এবার ক্রমে রাস্তা পরিষ্কার হতে থাকবে।"

পঞ্চানন তখন প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "একখানা গাড়ীতেই হয়ে যাবে বোধ হয়? হিন্দু হোটেল শিয়ালদ'র দিকে অনেকগুলি আছে, আমিও সেই পাড়ায় থাকি।"

বীরেন বাবু বলিলেন, "আগে মিনুকে পৌঁছে দি, তার পর আমরা যেদিকে হয় যাব। তোমার বোর্ডিং কোনদিকে মা?"

মৃণাল বলিল, "কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে।"

বিমল বলিল, "তাহ'লে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে। যাই হোক গাড়ী ত করি আগে।"

অনেক হাঁকাহাঁকি দরাদরির পর গাড়ী একখানা ঠিক হইল। জিনিষপত্র সমেত সকলকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিমল বলিল, "আমি আর অনর্থক ঠেসাঠেসি ক'রে উঠি কেন? এর পর পঞ্চানন মামাই সাম্‌লাতে পারবে।"

পঞ্চাননের এ প্রস্তাবে বেশ সম্মতিই ছিল, কারণ ঠেলাঠেলি, টানাহিঁচড়ার কাজ ত হইয়া গিয়াছে, আর এখন বিমলকে দরকার কি? কিন্তু বীরেনবাবু আবার বাদ সাধিলেন, বলিলেন, "তোমরা দুজনেই চল বাপু, মাকে নিয়ে একজন হোটেলে নেমে যেও, আর এক জন আমার সঙ্গে মিনুর বোর্ডিঙে চল। বুড়ো মানুষ তাঁকে আর ঘোরাব না, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।"

গাড়ী চলিল। সার্কুলার রোডে অনেকগুলিই হিন্দু হোটেল দেখা গেল। বিমল একটির ম্যানেজারকে চেনে বলিল, সুতরাং বীরেনবাবুর মা এবং তাঁহাদের লটবহর লইয়া তাহাকেই সেখানে নামিতে হইল। অনেকখানি হাল্কা হইয়া গাড়ী এবার মোড় ঘুরিয়া মৃণালের বোর্ডিঙের পথে চলিল।

ক্রমশঃ

শ্রাবণ-নিশীথে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উদ্দাম বায়ুর দোলা মন-কুঞ্জে লাগে এসে শ্রাবণ-নিশীথে,
উচ্ছৃঙ্খল বজ্র-ঝঞ্ঝা গুমরায় মোর বুকে দুর্বোধ্য ভাষায়,
মদির আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নে শিহরিত আমি মৌন কুণ্ঠাশূন্য হায়,
নেত্র-পদ্ম-অগ্রভাগে কে আসি দাঁড়াল যেন প্রেম-অর্ঘ্য দিতে
অপূর্ব্ব আগ্রহে মাতি, মন্ত্রমুগ্ধ হই তার মন্থর ভঙ্গিতে;
কুন্দশুভ্র নারীমূর্ত্তি এল কাছে মর্ম্মরিত উগ্র-ঘন-বায়,
ব্যগ্র বাহু বিস্তারিয়া বাঁধিনু উন্মাদ-হর্ষে নৈশ-তমসায়,
সে এল চম্পকগন্ধী, অভিনব কম্প্রপদে উল্লাসে ও গীতে।

আমার জীবন-শাখে উচ্ছ্বসিছে কৌতূহলী ফুল্ল-প্রাণ-পিক,
ব্রততী-বিতান-পার্শ্বে নদীবক্ষে উর্ম্মিমান সিন্ধু-ঘূর্ণি-বেগ,
আবির্ভূত বর্ষা-স্পর্শে শোভমান শ্যামস্নিগ্ধ ধরিত্রী-অঞ্চল,
হেরিনু তাহার চোখে উজ্জ্বল দাবাগ্নিজ্বালা পিপাসা-উদ্বেগ;
নিবিড় ঘনিষ্ঠ রাত্রে চন্দ্রবিম্ব মূর্ত্ত প্রিয়া গৌরী-শতদল,
নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি হেরিলাম বর-অঙ্গে জ্যোতি নির্নিমিখ।

চিন্ময় বঙ্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বীরাচার ও পশ্বাচার

আমাদের দেশের সাধকরা বলেন কায়া দুই প্রকার, মৃন্ময় ও চিন্ময়। মৃন্ময়ের সীমা এই দেহেরই মধ্যে। চিন্ময় কায়াকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিতে পারি। মানুষেরই এই ব্যাপ্তির সাধনায় অধিকার, পশুর ইহাতে অধিকার নাই। যে মানুষ আপনাকে বহুদূর ব্যাপ্ত করিতে পারে সে-ই বীর, নহিলে সে পশু। সাধকদের মতে ইহাই যথার্থ বীরাচার ও পশ্বাচার।

পশুও তাহার আপন সন্তান এবং কখনও কখনও আপন দলের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করে, কিন্তু সে ব্যাপ্তি সামান্য এবং অনেক সময় তাহার মূলে স্বার্থ ও দুর্ব্বলতা। নিস্বার্থ, নিষ্কাম অহেতুক ব্যাপ্তির মূলে চাই বৃহৎ বীর্য্য ও সাধনা। তাই বীরাচার ও পশ্বাচার স্বতন্ত্র বস্তু।

বীর সাধকেরও কায়া থাকে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জীবনসংগ্রাম তাহারও আছে কিন্তু তবু তাহার অন্তরে এমন একটি ঐশ্বর্য্য আছে যে সে আপনাকে কর্ম্মে, জ্ঞানে ও প্রেমে বহু দূর প্রসারিত না করিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধ বা চৈতন্য মৈত্রীর ছায়ায় আপনাকে সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত করিতে পারিয়াছেন, এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে কম দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই।

পশুকায়া স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ, বীরকায়া বহুদূর ব্যাপ্ত। এই ব্যাপ্তির জন্যই সাধকের দল যুগে যুগে অশেষ দুঃখ সহিয়া আসিয়াছেন।

প্রদীপ যেমন আপন মৃৎপাত্রে যত দিন সীমাবদ্ধ তত দিন সে সুখেই থাকে। যে মুহূর্ত্তে সে আলোক পরিবেশনের দ্বারা আপনাকে বহুদূরে ব্যাপ্ত করিতে চায় তখন হইতে তাহাকে আপন সকল সঞ্চয় ক্ষয় করিয়া পলে পলে জ্বলিয়া মরিতে হয়। অথচ এই ব্যাপ্তি ছাড়া তাহার সার্থকতা নাই।

ব্যক্তির মত জাতিরও পশু ও বীর এই দুই সাধনাই আছে। যখন জাতির সাধনা তাহার আপন সীমার মধ্যেই বদ্ধ তখন সেই পশু-সাধনাকে কিছুতেই বীর-সাধনা বলা চলে না। কিন্তু যখন তাহার সাধনা তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিল তখনই হইল তাহা বীরের ধর্ম্ম।

বন্ধন ও মুক্তি

জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি যদি আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে, তবে তাহা অমেধ্য। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বদেশে জয়ী হইয়া ঘরে ফেরে তখনই তাহা হয় যজ্ঞের যোগ্য। আস্তাবলের ঘোড়াকে দিয়া মজুরী করান চলে, কিন্তু তাহা অযজ্ঞীয়।

চিকিৎসক বলেন, বাসগৃহ ছাড়িয়া মুক্ত বায়ুতে নিয়মিত বিচরণ না করিলে স্বাস্থ্য থাকে না। নির্জ্জন কারাগারে বন্দী হইলে বড় বড় শক্তিশালী জোয়ান যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

কুলার্ণব তন্ত্র বলেন, মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যদি এক পুষ্পে বসিয়া থাকে তবে তাহার চলে না, ফুল হইতে ফুলে সে তার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায়। তেমনই সাধকও তাহার সাধনার খোঁজে গুরু হইতে গুরুতে গমন করিবে।

> মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
> জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।
> —কুলার্ণব, ১৩ শ উল্লাস।

তাই নানা তীর্থের জল একত্র না করিলে দেবতার পূর্ণাভিষেক হয় না।

তবে ভারতবর্ষ কেন এক সময় তাহার সীমার মধ্যেই বদ্ধ হইল? কোন্ অভিশাপে সে এইরূপ "Interned" হইল? একদিন যখন তাহার অর্ণবপোত সর্ব্বদিকে ধাবিত হইত, তখন তাহার শক্তি ও সম্পদের অন্ত ছিল না। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি বলেন, যেই দিন হইতে ভারতের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইল, তাহার আশী বৎসরের মধ্যে ভারতের

দ্বারে অন্যের আক্রমণ উপস্থিত হইল। জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভারত এই যে হারিতে আরম্ভ করিল তাহার পর তাহার দুর্গতির আর কোথাও অন্ত দেখা গেল না।

যাত্রাভেদ ও বাঙালী

কাজেই দেখা যাইতেছে ব্যক্তির মত জাতিরও আপনার সীমার বাহিরে না গেলে চলে না। এখন দেখা যাউক, আমাদের বাংলা দেশের এই প্রসারের ইতিহাস কিরূপ। বাংলা যদি আপনার ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম না করিতে পারিত তবে মনে করিতাম তাহার মধ্যে জীবন ছিল না। কিন্তু যুগে যুগেই বাংলা দেশের এই প্রসার-লীলা দেখা গিয়াছে। এখনকার ভাষাতে ইহারই নাম বৃহত্তর বঙ্গ।

যাত্রায় জাতিভেদ—নানা কারণে এক এক দেশ আপন সীমাকে হারাইয়া যায়। মানুষের জাতিভেদের ন্যায় এই যাত্রারও জাতি আছে।

ব্রাহ্মণযাত্রা—যখন ধর্ম্মজ্ঞান বা সংস্কৃতি প্রচারার্থ বা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে লোকে বাহিরে যায় বা জ্ঞান বা শিক্ষার জন্য দূর হইতে আহূত হইয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হয়, তখন হইল ব্রাহ্মণযাত্রা।

তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচারার্থ এক কালে এদেশের সব জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণ যাইতেন তাহাকে এই শ্রেণীর মধ্যে ধরা যায়। তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে যাত্রাও এই শ্রেণীর। বাঙালীর ব্রাহ্মণযাত্রায় উদাহরণ পরে বলা যাইবে।

ক্ষত্রিয়যাত্রা—দেশ জয়, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে যে দেশসীমাকে অতিক্রম, তাহাকে ক্ষত্রিয়যাত্রা বলা যায়। পাল রাজারা বিশেষ করিয়া ধর্ম্মপাল মালব দেশ, অবন্তী, গান্ধার, মদ্র প্রভৃতি রাজাকে বিনত করেন, কান্যকুব্জপতি ইন্দ্ররাজকে সরাইয়া চক্রায়ুধকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাম্রলিপ্তিপতি অনন্তবর্ম্মা উৎকল জয় করিয়া গঙ্গাবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে গৌড় সৈন্যদের একটি বীরত্বের কাহিনী চমৎকার ভাবে লিখিত হইয়াছে। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড় রাজাকে, "বিষ্ণুবিগ্রহ পরিহাসকেশবের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিব"—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজ রাজ্যে আনেন। তথাপি গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা গৌররাজকে নিহত করেন। গৌরপতির ক্রোধান্ধ অনুচরগণ প্রভুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, মধ্যস্থ নারায়ণবিগ্রহ পরিহাসকেশবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া ভ্রমক্রমে রজতময় রামস্বামীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সংখ্যায় তাহারা অল্প। বহুসৈন্যবেষ্টিত হইয়া তাহারা একে একে প্রাণ ত্যাগ করিল, তবু এক তিল সরিল না। (রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ)

সেনরাজগণ বারাণসী ছাড়াইয়া উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণে বহু দূরে প্রভাব বিস্তার করেন।

ত্রিপুরা পাটিকারার রাজকুমার ব্রহ্মদেশের পেগুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

মাণ্ডী সুকেত নাহান প্রভৃতি হিমালয়স্থ দুর্গমস্থানে বাংলার সেন ও পাল রাজাদের বংশীয়গণ রাজ্য স্থাপন করেন। মুসলমানদের দ্বারা যখন তাঁহাদের রাজ্য অধিকৃত হয় তখন এই সব স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কুলুতে বাংলার পাল-বংশীয়গণ রাজ্য স্থাপন করেন। কেওনথাল ও কিস্তওয়ারের রাজারাও বলেন তাঁহারা বাংলা হইতে আগত। (Sherring's Hindu Tribes and Castes, p. 71-73)

এই সব হইল ক্ষত্রিয়যাত্রা। ক্ষত্রিয়যাত্রার কথা ইতিহাসেই পাওয়া যায় বলিয়া তাহার বিশেষ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বৈশ্যযাত্রা—কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে যে দেখি বণিকরা সিংহলাদি দেশে যাইতেছেন তাহাকে বৈশ্যযাত্রা বলা যায়।

কিছুকাল যাবৎ যথেষ্ট কৃষিযোগ্য ভূমির অভাবে যে ময়মনসিংহের মুসলমান কৃষকগণ আসামের নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া চলিয়াছে; ইহাও বৈশ্যযাত্রারই অন্তর্গত।

শূদ্রযাত্রা—আজ ইংরেজ রাজাদের সঙ্গে যে বাঙালী কেরানীর দল দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন তাহাকে শূদ্রযাত্রা ছাড়া আর কি বলা যায়? বাঙালী লাল পল্টনের যে বিদেশে যাত্রা তাহাও এই শ্রেণীর। দক্ষিণ দেশে তাহারা স্থল- ও জল- পথে ইংরাজের সহায়তার জন্য যাইত।

এখনকার দিনের যুদ্ধের নামে যে পৈশাচিকতা তাহা এই চারি শ্রেণীর বাহিরে। তাহাকে রাক্ষসযাত্রা বলা যায়।

বাংলায় জৈন

বাংলা দেশ হইতে যে যাত্রীর দল ব্রাহ্মণের মত দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা উচিত জৈন সাধকগণের। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে বাংলা দেশটা জৈনধর্ম্মেই প্লাবিত ছিল। অগণিত সব তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি বাংলার সর্ব্বত্র দেখা যায়। বাঁকুড়া ও রাঢ় দেশের নানা স্থানে তাহা এখন ভৈরব ও অন্য নানাবিধ নামে পূজিত। পার্শ্বনাথ পর্ব্বত জৈনদের মহাতীর্থ। ইহা তখনকার বাংলারই অন্তর্গত। ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২০ জনই এখানে নির্ব্বাণ লাভ করেন (পূরণচাঁদ নাহার)। বাঁকুড়াতে সরাক জাতি শ্রমিকদেরই অবশেষ। বাংলার সন্তান ভদ্রবাহু জৈনদের কল্পসূত্রের রচয়িতা। কাজেই সারা ভারতে যে জৈনধর্ম্ম ছড়াইয়াছে তাহাতে বাংলারও কিছু গৌরব আছে। এখনও জৈন বহু শব্দ বাংলায় বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাংলায় চলিত। জৈন লিপির সঙ্গে নাগরী লিপি অপেক্ষা বাংলা লিপিরই অধিক সামঞ্জস্য ছিল।

বাঙালী বৌদ্ধ সিংহলে

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারে বাংলা দেশ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বিজয়সিংহের কথা সর্ব্বজনবিদিত।

খনার বচন বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, সেই খনা নাকি সিংহল উপনিবেশের বঙ্গকন্যা। তবে এইসব কথা জনশ্রুতি মাত্র। আমাদের সকল গল্পের সদাগর-পুত্ররাই ত জাহাজ লইয়া বাণিজ্যে যান সিংহলে। শ্রীমন্ত তো সিংহল-রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া আসিলেন।

সিংহলের রাজা প্রক্রমবাহুর (১২৪০-১২৭৫) সময়ে বাংলার বরেন্দ্র দেশ হইতে মহাপণ্ডিত বৈষ্ণব-বংশীয় রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে যান। তাঁহার নিজ লিখিত পরিচয়—

> ভারদ্বাজ কুলোত্তবাভি জননী দেবীতি নাম্নী সতী
> শ্রীকাত্যায়নবংশজো গণপতির্ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
> সোদর্য্যৌ চ হলায়ুধশ্চ গুণিনাবাঙ্গীরসশ্চানুজৌ
> গ্রামো মে চিরবাটিকোঽথ বিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রয়ঃ।

অর্থাৎ বৈষ্ণব ও পণ্ডিত-বহুল চিরবাটিক গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গণপতি, মাতার নাম দেবী। হলায়ুধ ও আঙ্গিরস দুই ছোট ভাই। সিংহলে গিয়া রামচন্দ্র বৌদ্ধ হন ও ভক্তিশতক নামে কাব্য রচনা করেন। ছন্দঃশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার স্বরচিত বৃত্তমালা এবং কেদার ভট্টের বৃত্তরত্নাকরের সুবিখ্যাত টীকা "পঞ্জিকা" তিনি রচনা করেন। প্রক্রমবাহু রামচন্দ্রকে "বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার নাম আজও সিংহলে পূজিত। বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকায় জানা যায় তিনি "গৌড়দেশ-বাস্তব্য" এবং ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহলে উপস্থিত হন।

বাঙালী তিব্বতে

তিব্বতে প্রাচীনকালে যে বহু বাঙালী গিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। দীপঙ্করের নাম আপনাদের সবারই জানা। তিনি ছাড়াও বহু বাঙালী পণ্ডিত সেই দেশে গিয়াছেন। রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতির লেখা, কর্ডিয়ের সাহেবের তিব্বতীয় গ্রন্থাবলীর রচয়িতাদের নাম-সূচী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এখন আমার বন্ধুপ্রবর মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, অধ্যাপক তুচী, শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবাসুদেব গোখলে (বিশ্ব-ভারতী), শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে কাজ করিতেছেন তাহাতে আরও বহু নাম জানা যাইবে। কাজেই আমি তিব্বতের কথায় আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। বাংলা বহু গ্রন্থ প্রাচীন কালে তিব্বতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এইটুকু মাত্র এইখানে বলিয়া রাখি।

বাঙালী চীনে

চীনদেশেও প্রাচীন কালে বহু ভারতীয় পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভারতের পরিচয়দাতাগণ তাঁহাদের নাম করিয়াছেন। কাজেই সেই সব নাম করিয়া আপনাদের আর হয়রান করিতে চাহি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে বাঙালীও ছিলেন তাহা নিশ্চয়।

এটা যে গায়ের জোরের অনুমান তাহা নহে। ১৯২৪

খ্রীষ্টাব্দে যখন কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা চীনদেশে যাই তখন (নানকিনের নিকটে প্রকাণ্ড "জু সিয়া তুঙ" (Tzu hsia Tung) grotto অর্থাৎ গিরিগুহায় দেখি ভারতীয় সব পণ্ডিতদের মূর্ত্তি। একেবারে চাদর গায়ে দেওয়া বাঙালী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের মূর্ত্তি। আমাদের সঙ্গে শিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসু ও অধ্যাপক শ্রীযুত কালিদাস নাগ ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই সব মূর্ত্তি বাঙালী না হইয়া যায় না। নন্দলাল বসু তাঁহাদের সব স্কেচ নিলেন।

কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথকে পিকিং শহরে রাখিয়া আমরা তিন জন কয়েকটি স্থান দেখিতে বাহির হইলাম। নানা স্থান ঘুরিয়া ৫ই মে তারিখে আমরা বিখ্যাত কাইফং নগরে গেলাম। সেখানে একটি বিখ্যাত প্যাগোডা ১২ তলা উচ্চ। তাহা সুং রাজাদের সময় (৯৬০—১২৮০) নির্ম্মিত এবং মিং রাজাদের সময় (১৩৬৮—১৬৪৪) সংস্কৃত। মন্দিরটি বিরাট। তার গায়ে সব চীনা মাটির রং-করা ইট। সেই ইটের মধ্যে এক জায়গায় দেখি কীর্ত্তন চলিয়াছে, ঠিক বাংলা দেশের কীর্ত্তন। কীর্ত্তনীয়াদের কোমরে চাদর বাঁধা, কোঁচা ঝুলান, কারও কারও গায়ে চাদর, মাথায় ঝুঁটি, বাঁশী ধরিবার ভঙ্গীতে খোল-করতালে কীর্ত্তন চলিয়াছে। নন্দবাবু তাহার আলোকচিত্র তুলিয়া লইলেন।

চীনদেশের ধর্ম্মমন্দিরে অর্হৎদের সঙ্গে এদেশের দেবদেবী যথা মহাদেব, তারা ভৈরব স্কন্দ বিনায়ক প্রভৃতির নানা মূর্ত্তি বিরাজমান।

১২ই মে (১৯২৪) তারিখে পিকিনের নিকটে বু তা সু (Wu Ta ssu) অর্থাৎ পঞ্চচূড়া মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরটি বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দিরের ভঙ্গীতে তৈরি। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। তারপর দেখি সেখানে আমাদের অক্ষরে লেখা সব মন্ত্র বা ধারণী। বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি বাংলা দেশের মতই চাদর-মুড়ি দেওয়া।

শেষে জানা গেল, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ বঙ্গের এক ধনী বৌদ্ধ পাঁচটি স্বর্ণ নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ও সিংহাসন লইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার নাম নাদি "পণ্ডিত" (Bandida)। তখন সম্রাট ছিলেন মিং বংশীয় য়ুং লো (Yung Lo) (1403—1424)। মূর্ত্তিগুলি তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি সেগুলি এই মন্দিরে স্থাপন করান। এই মন্দিরটি সেই সাধুর নির্দ্দেশ অনুসারে চীনদেশী ও তিব্বতী কারিগরদের দ্বারা রাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত। কি দুঃখে তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া এই স্বর্ণমূর্ত্তিগুলি রক্ষা করিতে এই দেশে আসিলেন তাহা বলিতে পারি না, তবে তিনি চীন দেশেই জীবন কাটাইয়া গেলেন। এই মন্দিরটি ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চেন হুআর সময় পুনরায় নির্ম্মিত হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়েন লুঙের সময় একবার সংস্কৃতও হয়। এইবার বোধ হয় যুদ্ধে ইহা নষ্টই হইয়া গেল।

পিকিনে থাকিতে শুনিলাম এখানে এক জন বাঙালী আছেন। বড় আগ্রহ হইল তাঁহাকে দেখিতে। শেষে দেখি তিনি এক জন বিহারবাসী মুসলমান। তিনি তাঁহার বাঙালীত্বের কথা বলিলেন।

পিকিনে সত্যই এক জন বাঙালী বহু পূর্ব্বে ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া মারা যান। কিছু ভূসম্পত্তি ছিল ও তাহার উপর সিনেমা ও হোটেলও ছিল। তিনি উইল করিয়া যান যে কোন বাঙালী সেখানে ঐ সম্পত্তি চাহিলে তাহাকে যেন দেওয়া হয়। কিন্তু বাঙালী তখন কই? এই খবর পাইয়া বিহারবাসী শ্রী আবদুল বারি, চীনের ইংরেজ দূতের কাছে ঐ সম্পত্তি চাহিয়া তাঁহার পাসপোর্ট দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন বিহার বাংলারই মধ্যে। তাই তিনিই ঐ বিপুল বিত্তের অধিকারী হইলেন। আমরা বাঙালী বলিয়া তিনি আমাদের সহায়তা করিতেও উৎসুক ছিলেন।

এখানে বলা ভাল, চীনে শিখদের বাঙালী বলে। বেঙ্গল সেনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়ায় এইটা ঘটিয়াছে। তবে সেখানে শিখদের আচরণ আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

১৯শে মে (১৯২৪) তারিখে আমরা চীনের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার হু সীর (Hu Shih) সঙ্গে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের Sinologue বিভাগের কাজ দেখিতে গেলাম। তাঁহারা চমৎকার সব কাজ করিতেছেন দেখিলাম। নানা কাজের মধ্যে দেখিলাম পুরাতন সরকারী কাগজপত্রের ৮০০০ বস্তা ইঁহারা পুরাতন কাগজের দরে কিনিয়া তাহার মধ্যে চমৎকার সব ঐতিহাসিক দরকারী কাগজপত্র পাইয়াছেন। তার মধ্যে কয়েকটি তাঁহাদের

দুর্ব্বোধ্য কাগজ দিলেন। কয়েক টুকরা বাংলার জীর্ণখণ্ড। বাকী সব ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেপালের বঙ্গসীমা হইতে আগত দরখাস্ত হইবে। একটি হিন্দী অক্ষরে লেখা সুলিখিত দরখাস্ত নষ্ট হয় নাই। লেখা—পর্গানা মেল্যাপুর কোতিপুর হইতে লেখা—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী চীনরাজচক্রবর্ত্তীকে ১৮২৮ সনে লেখা। নেপালের রাজার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া চীন-রাজার কাছে আপীল।

বাঙালী কোরিয়া জাপানে

কোরিয়াতেও নাকি বাংলা তন্ত্র ধারণী বা মন্ত্র দেখা গিয়াছে। আমি নিজে সেখানে যাই নাই।

জাপানে নারা ও হরিউজীতে যে সব চিত্র ও মূর্ত্তি আছে নন্দলাল বাবু বলেন সেগুলি বাংলার সঙ্গে মেলে, সেখানকার বহু বুদ্ধমূর্ত্তির আশেপাশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ধারণীর বীজ লেখা।

কিয়োটোতে ওতানি (Otani) বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তাহার মধ্যে বহু বাংলা গ্রন্থও আছে। তাহা আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি।

নারাতে ও হরিউজিতে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যেন বাংলা দেশের কোন পূজার দালানে আসিয়াছি।

১৯২৪ সালে ৮ই জুন তারিখে আমি বিশেষ করিয়া জাপানে কোয়াসান (Koya San) তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানকার পর্ব্বতের চূড়ায় নাকি দশ হাজার মন্দির আছে। মোট কথা, কোয়াসান হইল জাপানী বৌদ্ধদের গয়া-কাশী। এ তীর্থের আদিগুরু কোবো দাইশি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাঁহাদের স্তুতিগুলি ও যন্ত্র দেখিলাম বাংলার সঙ্গেই মেলে। তিনিও এই দেশীয় দক্ষিণাচার তন্ত্র মতেই দীক্ষিত।

এখানকার লোকেরা পরলোকগত আত্মীয়জনের শ্রাদ্ধ করেন এবং অস্থি পবিত্র কোয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। তাহার পরে সেখানে যে কাষ্ঠ পোঁতেন তাহা এই আমাদের দেশেরই বৃষ কাঠ। তাহাতে যে সব অক্ষর লিখিয়া দেন তাহাও আমাদের দেশেরই মত, অথচ তাঁহারা নিজেরা তাহা বোঝেন না।

শুনিয়াছি জাপানের নানা বিভাগে বাঙালী শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ফিলিপাইনে বাঙালী অধ্যাপক উপেন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়। তিনি শান্তিনিকেতনে আমাদের ছাত্র ছিলেন।

যবদ্বীপে, বালীতে, সুমাত্রায়

যবদ্বীপ, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি সকল দেশ চিরদিন ভারতবর্ষকে গুরু মানিয়া আসিয়াছেন। যখন ভারতে সমুদ্রযাত্রা হঠাৎ বন্ধ হইল তখনও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ সব দেশবাসীরা ভারত হইতে গুরুদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বহু দিন চলিয়া গেল, ভারতীয় গুরুদের বেশ ও ভাষা তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন, তবু ভারতের দিকে মুখ করিয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময় আরব দেশীয় মুসলমান প্রচারকেরা প্রচার করিতে আসিয়া দেখিলেন ইঁহারা চান ভারতীয় গুরু। তাই তাঁহারা বলিলেন, "আমরাই সে-দেশের সব গুরু।" তখন লোকেরা তাহাদের স্বাগত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রীতিনীতি ভিন্ন রকম দেখিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিলেন না। বলীদ্বীপ-বাসীরা মোটেই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা বিশুদ্ধ শৈবই রহিয়া গেলেন। যবদ্বীপের পশ্চিমে এখনও কিছু শুদ্ধ হিন্দু আছে। তাঁহারা দুর্গম অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাস করেন। কাহারও সঙ্গে মেশেন না। আমার যবদ্বীপবাসী ছাত্রদের কাছে এই সব কথা শুনিয়াছি। তাঁহারা তাই এখনও রামায়ণ মহাভারত লইয়া জীবন যাপন করেন। উৎসবাদিতে শিব-দুর্গা স্মরণ করেন। তবে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের সময় ইস্‌লাম গুরুদের আশীর্ব্বাদ লইতে আসেন। এখনও তাঁহারা নিজেদের অর্জ্জুন বলরাম প্রভৃতির বংশ মনে করেন। কোথাও গানে, যাত্রায় বলরামের নিন্দা হইলে বলরাম-বংশীয় (?) মদুরাবাসীরা (Madura) ক্ষেপিয়া উঠেন।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপে যখন ভারতীয় সভ্যতা গিয়াছিল তখন সেই সব দেশের বিশেষ যোগ ছিল বাংলা দেশের সঙ্গে। ডি. আর. ভাণ্ডারকর মহাশয় এই কথাটিকে জোর দিয়া লিখিয়াছেন (Indian Antiquary,

January, 1911), বোম্বাই গেজেটিয়ারও এই কথায় সায় দেন (Vol. 1, Pt. 1. p 493)।

যবদ্বীপে আকারের উচ্চারণ ঠিক আমাদের বাংলা দেশের মত "ও"কার ঘেঁসা। অর্থাৎ হিন্দীতে যাহাকে বলে "গোল গোল।" সেখানকার বরবুদর প্রভৃতি মন্দিরের গঠনপ্রণালী বাংলা দেশের পাহাড়পুরের মন্দিরের সঙ্গে চমৎকার মেলে। পাহাড়পুর প্রাচীনতর।

শ্যাম, চম্পা প্রভৃতি দেশ

শ্যাম দেশেও হিন্দু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। হিন্দু আচার বিচার ব্রত নিয়ম উপবাস এখানে পালিত হয়। এখানে ব্রাহ্মণ আছেন। এখানে "পৌণা"ও আছেন। ব্রহ্মদেশের বিবরণে পৌণাদের কথা বলা হইবে। ব্রাহ্মণ এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের আচার্য্য বা আচান বলে। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় পদ্ধতিতেই জ্যোতিষ গণনা করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের জন্মকোষ্ঠি অষ্টোত্তরী রীতিতে রচিত হয়। বিংশোত্তরী পদ্ধতি এখানে নাই। পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও বৈদিক ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ সমান ভাবে অর্চ্চিত হন। আচার্য্যেরা অনেকে সৌর উপাসক। এখানকার নদীর নামও হিন্দু। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে নদীতে যাইতে হয়।

অঙ্কোরবট মন্দিরদ্বারে নাকি বঙ্গাক্ষরে শ্লোক লিখিত আছে। ঐতিহাসিক বাউরিং বলেন, "শ্যামদেশীয়গণ গঙ্গাতট হইতে খুব সম্ভব বাংলা হইতে আগত। তাঁদের চেহারা বাঙালীর মত। বাংলার সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যাদির যোগ ছিল। বঙ্গবণিকদের সন্ততি এখনও ঐ সব দেশে আছেন।" (Siam, vol. II) ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী নাকি আসাম রাজ্যে বাংলার সব যোগচিহ্ন দেখিয়াছেন। (বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪১-৪৪৩)

মহাপ্রাচ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সুফল

বাংলা দেশের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মগুরুগণও যথেষ্ট উদার। তাঁহারাও সেই যুগে ঐ সব দেশান্তরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের তো প্রচারে কোনো বাধাই নাই। তাই ভারতের পূর্ব্বদিকটাই ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার যোগে ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ হয়। একবার বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা কালে আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাংলা দেশ ভারতের পূর্ব্বদেশগুলিকে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়া আপন করিয়া ভারতকে ঐ দিক্ দিয়া নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতের পশ্চিম দিকে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও যদি ভারতের পশ্চিম সব দেশে তেমন করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করিতে পারিতেন তবে ঐ দিক্ হইতেও ভারতের আর কোন বিপদের শঙ্কা থাকিত না।"

বাঙালী ব্রহ্মদেশে

ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গিয়াছিল এবং তাহাতে বাংলা দেশের সঙ্গেও যোগ ছিল। ব্রহ্মদেশে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মও প্রবেশ করে, তাহাতে বাংলার আচার্য্যগণের হাত ছিল। ব্রহ্মদেশের কল্যাণীর শিলালেখ (১৪৭৬) অনুসারে বুঝা যায় গোলমট্টিকা নগর আসলে গৌরদের মাটির বাড়ীর নগর। তৈকুলও গৌরদের উপনিবেশ। এই সব সংবাদ দিয়াছেন সেই দেশের প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কর্ত্তা তাও-সেন-কো। ইণ্ডিয়ান্ এন্টিকোয়ারী ১৯শ, ২১শ, ২৩শ, ৩২শ, ৪২শ খণ্ডে এই বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়। বাঙালী মুসলমান ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বিস্তর বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের সে-দেশে বিবাহাদি করিবারও বাধা নাই।

ব্রহ্মদেশে সেই যুগের পরে আর এক শ্রেণীর বাঙালী গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম পৌণা। পৌণা শব্দ কেহ বলেন "পাবন" কেহ বলেন "ব্রাহ্মণ" হইতে উৎপন্ন। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণ আরাকান পথে ব্রহ্ম দেশে যান। তাঁহারা ব্রাহ্মণের আচার প্রতিপালন করেন। তন্ত্রে জ্যোতিষে তাঁহাদের বিলক্ষণ অধিকার; তাই ব্রহ্মে, শ্যামে এবং কাম্বোডিয়ায় পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমাদর।

পরে ব্রহ্ম-রাজারা মণিপুর জয় করিয়া কিছু মণিপুরী ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইয়া যান। তাঁহারাও পৌণা। রেশমের কাজ করিতে জানেন বলিয়া তাঁহাদের আদর ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন অমরাপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বসতি।

ব্রহ্মের রাজারা অনেক সময় বাঙালী কারিকর বিশেষতঃ কামান-ঢালাই কাজের শিল্পীদের ধরিয়া লইয়া যাইতেন। পূর্ব্বে ব্রহ্ম-রাজার বাড়ীর কাছে একটি বৃহৎ কামান ছিল। যাহাতে বাংলা অক্ষরে "কালীকুমার দে" নাম লেখা।

আশ্রমছায়ায়

শ্রীমতী রাণী চন্দ
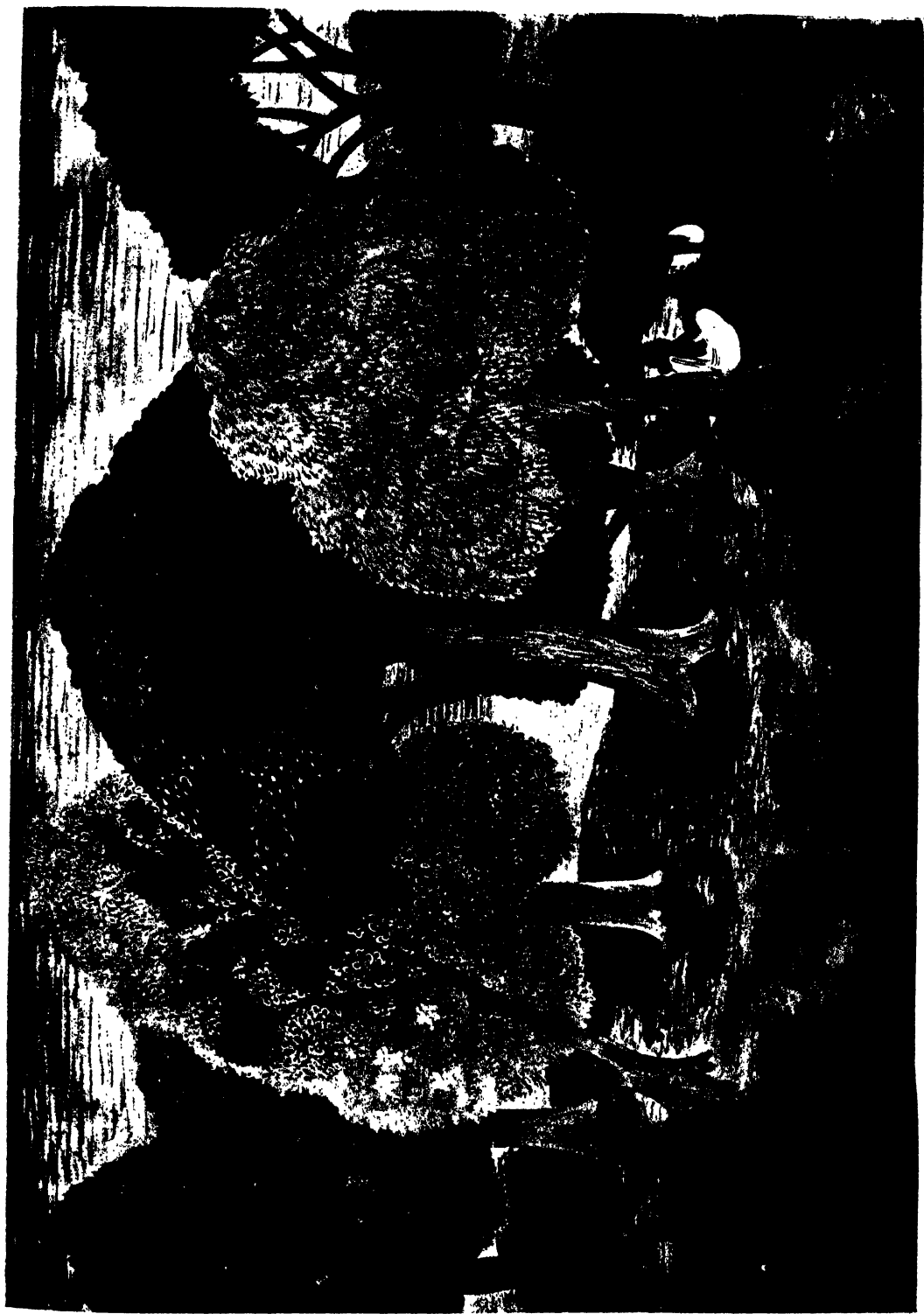
প্রবাসী প্রেস, কলিকা

"এবার আমার গেল বেলা. বলে কেতকী—শ্রীসান্ত্বনা গুহ

"শ্রাবণ ঘন অন্ধকারে"—শ্রীসান্ত্বনা গুহ

"বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা"—শ্রীপ্রমীলা মল্লিক

"ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে"—শ্রীমালবী সেন ও শ্রীঅশোকা মল্লি

["মহিলা-সংবাদ" দ্রষ্টব্য

মেমিয়ো বাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ইহা শুনিয়াছি।

ম্যাণ্ডালেতে যে সব পৌণা আরাকান-পথে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত পড়িতে নবদ্বীপ আসিতেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে পৌণা বংশীয় স্বর্গীয় রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে পড়িতে আসেন। সেই সময় উলা গ্রামের মহামারীতে শান্তিপুরের পরম সাধক স্বর্গীয় রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় পিতৃমাতৃহীন হইয়া সতর বৎসর বয়সে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ৺মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ছাত্র। উক্ত রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী স্বর্গীয় রাধিকানাথের পিতা শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য। তিনি তাঁহার গুরুপুত্রের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া নিজ দেশে লইয়া যান। সেখানে ৺রাধিকানাথ ব্রহ্ম-রাজার সভাপণ্ডিত হন। ব্রহ্ম-রাজা মিণ্ডোম তাঁহাকে রাজগুরু পদে বৃত করিয়া স্বর্ণ পত্রে তাহা লিখিয়া দেন। সেই দেশে বহু লোক গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য হন। তিনি মহামারী-ভয়ে ব্রহ্ম দেশ ছাড়িয়া দেশে আসেন ও বিবাহ করেন। আর একবার তিনি ব্রহ্মে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা থিবোর সময়ে নানা রাষ্ট্রগত গোলযোগে বহু সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি দেশে চলিয়া আসেন।

বুদ্ধগয়াতে যে ব্রহ্মরাজার উপহৃত ঘণ্টা আছে তাহাতে ব্রহ্মাক্ষরে লেখা শ্লোকগুলি সব গোস্বামী মহাশয়ের রচনা। ব্রহ্মদেশে তাঁহার এক জন পৌণা সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীঅচিন্ত্য রাজগুরু। বৃন্দাবনে তিনি এখনও জীবিত। তাঁহার বয়স ৮০।৮৫ বৎসর হইবে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি। পৌণা বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে একটি মন্দির তৈয়ার করাইয়াছেন। অচিন্ত্য-রাজগুরুকে সবাই বর্ম্মী পণ্ডিত বলে।

এই সব খবর আমি পাইয়াছি স্বর্গীয় রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর কাছে। তিনি পূর্ব্বে বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন, এখন তিনি আমাদের এক জন সহকর্ম্মী। তিনিও ১৩৩১ সালে ম্যাণ্ডালে গিয়া তাঁহার পিতার শিষ্য-সেবকদের দেখিয়া আসিয়াছেন।

এই পৌণারা সব সামবেদী। তাঁহারা বাংলা বলিতে পারেন, বাংলা ভাষায় লেখা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন, বাংলা কীর্ত্তনই গান করেন।

চীনদেশে আমাকে এক জন একটি বাংলা অক্ষরে লেখা বই দেখান। কাম্বোডিয়াতে এক জন ব্রাহ্মণের কাছে তাহা পাওয়া। বোধ হয় সেই ব্রাহ্মণ পৌণা। গ্রন্থখানি দেখিলাম "গোবিন্দালীলামৃত", বঙ্গাক্ষরে লেখা।

মণিপুর

মণিপুরে বৈষ্ণবেরা সব নরোত্তমের শিষ্য। নরোত্তমের গুরু হইলেন লোকনাথ গোস্বামী। কাজেই ইঁহারা সব অদ্বৈতশাখার মধ্যে। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজার আজ্ঞায় মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত হয়। তাহার পূর্ব্বেও মণিপুরে আচারনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণের প্রভাব দেখা যাইতেছিল।

মণিপুরে এক জন মহাতান্ত্রিকের অভ্যুদয় ঘটে যাঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি "শাক্তক্রম" (১৫৭১) শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি (১৫৭৭) প্রভৃতির লেখক পূর্ণানন্দ। তাঁহার জন্মস্থান রাজসাহী জেলায়। পূর্ণানন্দই কামাখ্যা-পীঠের পুনরুদ্ধার করেন। কাজেই পৌণাদের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রেরও প্রচার আছে।

মধুচন্দ্রিকা

শ্রীআশালতা সিংহ

বিবাহের সময় সুনন্দা যখন শুনিল তাহার স্বামী নিজে উপার্জ্জন করা দূরে থাক এখনও তাঁহার পঠদ্দশা, তখন তাহার মনটা বিরাগে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। নব্য শিক্ষায় এবং নব যুগের আলোতে সে ছোট হইতে মানুষ হইয়াছে। পাশ্চাত্য আলোকের প্রখরতা চোখে লাগিয়াছে ভাল। প্রথম হইতে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে বিবাহের পরই স্বামীর ঘরণী-গৃহিণী হইবে, তথাকার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরীর পদে অভিষিক্তা হইবে। আর কোন বন্ধন নাই, কোন দাবি-দাওয়া নাই, কোন জটিলতা নাই। সরল স্বচ্ছ স্বাধীন জীবন। যেমন ওদেশে হয়। ইউরোপে উপযুক্ত পুত্রও কখনও বিবাহের পর এক শহরে মা-বাপের সহিত একান্নবর্ত্তিতায় এক বাড়ীতে থাকে না। প্রত্যেকের স্বাধীন জীবনধারা আপন আপন স্বতন্ত্র পথে ও স্বতন্ত্র পরিবেষ্টনে চলে। কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ বাধিবার অবসর নাই। কিন্তু তাহার এই কল্পনায় ঘা পড়িল। শোনা গেল পাত্রের পিতা মস্ত বড় উকীল, মস্ত তাঁহার নামডাক, অর্থেরও অবধি নাই। কিন্তু ছেলেটি সবে মাত্র ল' কলেজে ঢুকিয়াছে। এখনও শেষ পাশ দিতে বছর দুয়েক দেরি। তাহার পর সে হাইকোর্টে ব্যবসায় সুরু করিবে স্বাধীনভাবে। ভবিষ্যতে কোন এক দিন স্বাধীন গৃহের স্বাধীন গৃহিণী সুনন্দা হয়ত হইবে; কিন্তু আপাততঃ তাহাকে হইতে হইবে শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের বধূ, অনেকগুলি দেবর ও ননন্দার বৌদি। তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ী আবার বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার। সেখানে আরও কত জ্যেঠশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী দিদিশাশুড়ী আছেন তাহার স্থির কি! সুনন্দার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল এই যে বাপ-মা যেখানে বিবাহ স্থির করিতেছেন তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার, খুঁৎখুঁৎ করিবার, মন ভার করিবার মত মনের সাবলীলতা শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বা আপত্তি করিবার মত বেহায়াপনা এখনও ধাতস্থ হয় নাই। তাই মনে মনে অনেক বিতর্ক-বিসম্বাদ করিলেও মুখে সে কিছুই বলিতে পারিল না। ছিঃ, তাও কি পারা যায়। বাড়ীতে কিন্তু ঠিক্ ইহার বিপরীত সুরই অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছিল। আত্মীয়-পরিজন যে শুনিতেছিল সে-ই বলিতেছিল, "সুনু অনেক তপস্যা করেছিল তাই এমন ঘরে-বরে বিয়ে হচ্ছে। শ্বশুর ত রাজা-বিশেষ! আর ছেলেটি যেন হীরের টুক্‌রো। লেখাপড়াতেও যেমন, চেহারাও যেন রাজপুত্রের মত; পানটি সিগারেটটি অবধি খায় না।" বরের নিকট-সম্পর্কীয় এক জন বন্ধু কার্য্যসূত্রে এ-বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আর যেমন বিনয়ী তেমনই পিতৃমাতৃবৎসল! কে বলবে যে আজকালকার ছেলে।"

সুনন্দা আড়াল হইতে বিশেষ করিয়া ঐ কথাটা শুনিয়া মুখ বাঁকাইল। মনে মনে বলিল, পিতৃমাতৃবৎসল! আহা যেন সত্যযুগের মানুষ! আর তাই যদি বাপু তবে একটি সেকালের তপোবন-কন্যাকে বিয়ে করলেই ত পারতেন। খুঁজে পেতে সুনন্দার মত মেয়ে যার বাপের বাড়ী কলকাতায় আর যে বেথুনে আই-এ অবধি পড়েছে, তেমন মেয়ের খোঁজে তাঁর কি প্রয়োজন ঘটেছিল?

কিন্তু অবশেষে সারা দেশ খুঁজিয়া-পাতিয়া সুনন্দাকেই তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন। কি-ই বা করা যায়। মনে মনে একটা গভীর দুঃখ, একটা মহৎ ত্যাগ বরণ করিয়া লইবার জন্য সুনন্দা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তাহার কলেজের বান্ধবীরা সেদিন বিদায়সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিতা, অনেকে আসন্ন বিবাহের সম্ভাবনায় অপেক্ষারতা এবং দুই-এক জনের সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে, এবং সকলেই প্রায় শিক্ষা, মানসিক আদর্শ এবং চিন্তাধারায় সুনন্দার সহিত

একশ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে রেবা প্রথমে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "সুনু এবারে পর্দ্দানশীন পরিবারের পর্দ্দানশীন বৌ হ'তে চলল। নিজের মত আর ত চলবে না। হয়ত কখনও কলকাতায় আর আসা হবে কি হবে না, তাই আমরা দেখা করতে এলাম।"

লটি মিত্রের মাস-দুই হইল এক হালী ডেপুটির সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "ও মা তাই না কি! কি আশ্চর্য্য, সুনুর যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে, স্বাধীন মতামত রয়েছে, সে যদি এ হীনতা স্বীকার করতে না চায়। বিয়ে মানে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন নয়! আজকের দিনে এ-কথা না মেনে উপায় নেই।" সুনন্দার মুখ চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল, কানের ডগা লাল হইয়া উঠিল।

লটি তখন বলিয়া চলিয়াছে, "এই আমাকেই দেখ না, শাশুড়ীর মত এঁর মত তাঁর মত অত জঞ্জালের মধ্যে আমি নেই। মিঃ ব্যানার্জ্জিকে বললাম সোজা, ক্রীস্‌মাসের বন্ধে আমি কলকাতা যাব। রাতদিন তোমার সঙ্গে সব মফঃস্বলের শহরে ঘুরে ঘুরে বিরক্তি ধরে গেছে, এইবার কলকাতায় একটু এন্‌জয় করতে চাই। উনি ছুটির আগের দিন বার্থ রিজার্ভের বন্দোবস্ত করে দিলেন, ব্যস্ আর কি!"

রেবা কহিল, "নিশ্চয়! এক জন শিক্ষিতা স্বাধীন স্ত্রীলোকের ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করবে, এমন স্বামী আজকালকার দিনে খুব কমই আছে।"

লটি বলিল, "সে কথা ঠিক্। তবে সুনন্দার স্বামী নিজেই স্বাধীন নন। তিনি এখনও তাঁর বাবার উপর নির্ভর করছেন। ইকনমিক্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ (আর্থিক স্বাধীনতা) এখনও তাঁর হয় নি। কাজেই যে নিজে স্বাধীন নয় সে নিজের স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা দেবে কেমন ক'রে?"

লতিকা রায় আরও এক পর্দ্দা সুর চড়াইয়া কহিল, "সত্যি তাই মনে হয়, নিজে আর্থিক স্বাধীনতা না অর্জ্জন ক'রে বিয়ে করা বর্ব্বরতা। তা সে যত বড় লোকের ছেলেই হোক্ না কেন। ইউরোপ এই আদর্শ মেনে চলে তাই তার এত উন্নতি। ধর না কেন, ওদেশে লোকে বিয়ে ক'রেই স্ত্রীর সঙ্গে হনিমুন্ (মধু-চন্দ্রিকা) করতে যায়। সংসারের অপর সমস্ত কর্ত্তব্য অন্য সব সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তারা দু-জনে দু-জনকে জানবার চেনবার সুযোগ করে নেয়। আমার নিজের বেলাতেও অতটা না হোক অনেকটা ঐ রকম গোছের হয়েছিল। বিয়ের পরের সপ্তাহেই ওঁর ছুটি ফুরুল, (লতিকার স্বামী মুন্সেফ) বদলী হলেন সাতক্ষীরায়। আমাকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে। নতুন জায়গায় দু-জনেই একেবারে একা।" লতিকা এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার সানুকম্প দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতে চাহিল, আমাদের সঙ্গে কিন্তু সুনন্দার কত তফাৎ! সে বেচারা হয়ত বিয়ের পরে প্রকাণ্ড এক সংসার এবং ততোধিক অপরিচিত পরিজনমণ্ডলীর মধ্যে আড়ষ্ট বধূ-জীবন যাপন করিবে।

সুনন্দা এই সমস্ত আলোচনা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। শুনিয়া শুনিয়া তাহার নিজেরও মনে হইতেছিল, রূপে গুণে শিক্ষায় সে নিজেও ত লতি বা লটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তবে তাহার কপালেই বা এমন নিগ্রহ হইতে চলিয়াছে কেন? সত্যই যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা মহা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। তথাপি সহপাঠিনীদের এই বিপুল সমবেদনা প্রকাশও সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তাই আতিথ্যের ছল করিয়া চা জল-খাবারের একটু আয়োজনের কথা মাকে বলিয়া আসিবার জন্য কিছু ক্ষণের ছুটি লইয়া সে হৃদয়ভারাক্রান্ত বেদনা বহন করিয়া তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিল।

২

বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া সুনন্দা দেখিল সত্যই মস্ত বড় সংসার। প্রাসাদোপম অট্টালিকার কত কক্ষ, কত অলিন্দ—সমস্তই উৎসুক নরনারীপূর্ণ। বাহিরের লোক ছাড়িয়া দিলেও বাড়ীর লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। অলক্তকরাগরঞ্জিতপদে নববধূ আসিয়া দুধে-আলতার পাথরের উপর দাঁড়াইল। নূতন বেনারসীর আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে শাশুড়ী আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া বড় আদরে পুত্রবধূকে বরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্বশুর মহামূল্য হীরকখচিত নেকলেসের ভেলভেট-মণ্ডিত বাক্সটি বধূর হাতে দিয়া মুখ দেখিয়া স্নেহহাস্যে কহিলেন, "যত বড় বড় মামলাতেই আমি জিতে থাকি না কেন তোমার এজলাসে

আমি চিরদিন হেরেই থাকলাম মা। এই কথাটি আজ থেকেই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।" দেওর-ননদেরা হাস্তময় কৌতুকমাখা অন্তরে আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ বাড়ীর ত্রিতলের উপর সবচেয়ে নির্জ্জন এবং সবচেয়ে ভাল ঘরখানি বধূর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে তাহার আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল রকম উপকরণই সজ্জিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ কথাবার্ত্তা আদর-উৎসবের মধ্যেও এই ঘরের অধীশ্বর যিনি তাঁহার লেশমাত্র ছায়া দেখা গেল না। সেই যে কলিকাতায় বাসরঘরে সুনন্দা তাহার স্বামীর গম্ভীর মধুর মূর্ত্তি চকিতের মত দেখিয়াছিল তাহার পর তাঁহাকে আর দেখে নাই কিংবা আলাপ হয় নাই। বিবাহের পরের দিন রাত্রিতে তাহারা ট্রেনে ছিল। সে রাত্রি কালরাত্রি বলিয়া নববিবাহিত দম্পতীর জন্য ট্রেনে আলাদা আলাদা কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কালরাত্রিতে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে বিষময় ফল হয়; তাই সুনন্দার শ্বশুরবাড়ী হইতে সেজন্য কঠোর বিধিনিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তার পর এ বাড়ীতে পদে পদে কত গুরুজন আত্মীয়-কুটুম্ব। সুনন্দার স্বামী শচীকান্ত আধুনিক কালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক হইলে কি হইবে, এ বাড়ীর হাওয়াতেই আজন্ম মানুষ হইয়াছে। সে লাজুক, ভীরু, ত্রস্ত। দিনের আলোয় গুরুজনের সান্নিধ্যে মনের একান্ত কামনাকে সংবরণ করিয়া সে প্রিয়তমার নিকট হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। হৃদয় যদি উতলা হইয়াছে বাহিরে তাহা প্রকাশ হইতে দেয় নাই।

ক্রমে সন্ধ্যার তন্দ্রাময় অন্ধকারের যবনিকা পৃথিবীর উপর প্রসারিত হইল। নক্ষত্রখচিত আকাশের মহান নীরবতা সেই ত্রিতলের ছাদে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সারাদিন উৎসবের পর সুনন্দা শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মোহ, মধুরতা এবং একটা নিঃসীম কারুণ্যে তাহার মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবী জীবনের অনাস্বাদিত মাধুর্য্য স্মরণে আসিয়া মনকে বিবশ করিয়া তুলিতেছে, অথচ আশৈশবের চিরপরিচিত প্রিয়জনদের পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জন্য সমস্ত মন এক এক বার বেদনায় টন টন করিয়া উঠিতেছে। ইহারই মধ্যে কখন এক সময় হঠাৎ সে অবাক হইয়া দেখিল, বিবাহের আগে সেই যেদিন নটি আর লতিকারা আসিয়াছিল, সেদিন যেমন দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত মনে হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার স্বাধীন সত্তাকে জোর করিয়া নিষ্পিষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে;—সে ভাবটা কেমন করিয়া জানি না কখন নিঃশেষে মিলাইয়া গিয়াছে। সে বেদনাবোধও আর নাই। এখন আর সুনন্দার ঘরে লোকজন নাই। আসন্ন সূর্য্যোদয়ের আগে সমস্ত প্রকৃতি যেমন উন্মুখ প্রতীক্ষায় নিথর নীরব হইয়া থাকে তেমনই সমস্ত ঘর নিঃশব্দ নির্জ্জন।

কখন এক সময় একটা স্নিগ্ধমধুর সুগন্ধে মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল শচীকান্ত খালি পায়ে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার গলায় মালতীফুলের একটা মালা। সহসা অলঙ্কারের শিঞ্জনের সহিত স্ত্রী-কণ্ঠের কলহাস্য শোনা গেল। খোলা জানালার ঠিক বাহির হইতে কে বলিল, "ঠাকুরপো, চিরকাল শুনে এসেছি শ্রীরাধাই অভিসারের পথে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এ যে তোমার অভিসারের বেশ! একালে কি ভাই সবই উল্টো হয়?"

শচী হাসিয়া বলিল, "দোহাই বৌদি আর জালিও না। সারাদিন কি কষ্ট দিয়েছ, আর কি কষ্টে কাটিয়েছি সেইটে মনে ক'রে এখন একটু দয়া কর।"

বাহির হইতে সানুকম্প কণ্ঠে কে কহিল, "সত্যি আমাদের অন্যায় হচ্ছে ঠাকুরপো। আচ্ছা এই চললুম ভাই। আকাশের দিকে চেয়ে দেখ সপ্তমীর চাঁদ উঠতে আর বড় দেরি নেই।"

কিছুকাল নীরবে কাটিল, শচী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সুনন্দা যতই হোক কলেজে আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এবং সপ্রতিভ। সে লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "সারাদিন আপনার কি কষ্টে কেটেছে? ওঁরা বুঝি খুব কষ্ট দিয়েছেন আপনাকে?"

শচী বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞও হইল। কলাবৌয়ের ঘোমটা খসাইয়া প্রথম কথা কহাইবার যে দুশ্চর তপস্যা তাহা তাহার কপালে এত সুগম হইল দেখিয়া সে কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া পারিল না। কোন

ক্রমে উত্তর দিল, "কষ্ট ?…হ্যাঁ, না, তা কষ্ট ঠিক নয়…মানে…" মানে কি ?—সুনন্দার ভারি হাসি পাইতেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-ব্যক্তি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে সে যে সামান্য একটা কথা বলিতে শীতকালে ঘামিয়া ওঠে তাহা আগে জানিত না।

"…মানে…সারাদিন…" শচী আবার থামিল।

আর একবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া ফেলিল, "এত কষ্ট হবে আমি আগে বুঝতে পারি নি…মানে সারাদিন তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। ওঁরা তোমাকে ঘিরে ছিলেন।"

সুনন্দা হাসিয়া মুখ নামাইল। তাহার পর আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। আচ্ছা, সত্যি যদি আপনার কষ্ট হয়ে থাকে ওঁদের না মানলেও ত পারতেন।" শচীকান্তর লজ্জা অনেকটা কাটিয়াছিল। সে নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিয়া কহিল, "কিন্তু ওঁরাই ত আমার জীবন-কবিতার ছন্দ সুনন্দা। কবিতা এত অসন্দিগ্ধভাবে আমাদের মনকে অভিভূত করে কেন জান, সে ছন্দের বাঁধনকে স্বীকার করে ব'লে। তোমাকে দেখবার যে ব্যাকুলতা সেটাকে ওঁরা বিধিনিষেধের ছন্দে বেঁধে কবিতা ক'রে তুলেছেন। এলোমেলো অসম্বন্ধ ভাবে আর ত তা প্রকাশ হবার উপায় নেই। সারাদিনের পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন অনিমেষ হয়ে উঠবে, তখন তোমায় আমায় দেখা। এর ভিতর কঠোরতা আছে, কিন্তু আর কিছু কি নেই ?"

৩

আরও কিছু ছিল নিশ্চয়, সুনন্দা ক্রমশঃ তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল। শচী তিন-চার দিন পরেই পাটনা চলিয়া গিয়াছে। তাহার ল-কলেজ খোলা। কামাই করিবার উপায় নাই। পরস্পরকে একান্ত করিয়া পাইবার কামনা যত দুর্ব্বার, বাধাও কি ততই অলঙ্ঘনীয়। কাল হইতে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি আরম্ভ হইবে, শচীকান্ত লিখিয়াছে রাত্রির ট্রেনে আসিবে। সমস্ত বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সবারই চেষ্টা একই পথগামী। শচীর মা ব্যস্ত হইয়াছেন, বড় মাছ পাওয়া গেল কি না, গোয়ালাকে বেশী করিয়া দুধ দিতে বলা হইয়াছে, শচীর জন্য ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ হইবে। বাগানের মালী ব্যস্ত হইয়া কাঁচি-হাতে পাতা-বাহারের পাতা সমান করিয়া ছাঁটিতে লাগিল। মস্ত বড় গোলাপের তোড়া বাঁধিয়া রামচরণ চাকরের হাতে বড় বাবুর উপরের ঘরে পাঠাইয়া দিল। তিনি ফুল খুব ভালবাসেন, ফুলের তোড়া পাইলে মালীর উপর হয়ত সন্তুষ্ট থাকিবেন। তেতালার ঘর রোজই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু আজ চাকরে বিশেষ করিয়া সকাল হইতে ঝাড়ামোছা সুরু করিল। আর সুনন্দা বাক্স খুলিয়া তাহার বহুযত্নে কারুকার্য্যখচিত করিয়া সেলাই করা ফুলকাটা ঝালর-দেওয়া বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, শয্যা-আস্তরণ বাহির করিল। এগুলি সে দ্বিপ্রহরের বিরাম অবকাশে কত দিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া সেলাই করিয়াছে। ইহারই ভিতর তাহার সেবাকুশল হাত দুখানির সমস্ত আদর যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সন্ধ্যা-বেলায় ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোর সঙ্গে সুনন্দার সমস্ত দেহমন যেন পূজারতির মত কাহার উদ্দেশে জ্বলিয়া আপনাকে সার্থক করিতে চাহিল। তখন নীচে সে পান সাজিয়া একটি রূপার ডিবার খোলে গোলাপজল ছিটাইয়া রাখিতেছিল। মোটরটা গেটের ভিতর ঢুকিল। একটু জুতার আওয়াজ, হাসি, সেই গলার স্বর…মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন। পাশের ঘরে সুনন্দার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে ছোট ননদ তরলা আসিয়া হাসি হাসি মুখে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "বৌদি ভাই, একবার তেতালায় যাও। জোর তলব এসেছে। দাদা যেমন ক'রে বললেন তাতে আমার হাসি পেল। দেখ যদি যাস, আমি বলে দি কেমন ক'রে। এইবেলা বাবা এখনও মক্কেলের কাজ দেখছেন সদরে। মা এইমাত্র রান্না-ঘরে গেলেন। সামনে কেউ নেই, দক্ষিণ দিকের দালানটা ঘুরে ওপাশের ঘরটা দিয়ে সামনেই সিঁড়ি পড়বে। আচ্ছা, আমি না-হয় বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিচ্ছি।" তরলা এই মধুর দৌত্যকার্য্যে সহায়তা করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল শেষ পর্য্যন্ত। সুনন্দা তাহার হাতের সোনার কঙ্কণ আর জড়োয়ার আর্মলেট এবং চোদ্দ গাছা চুড়ি সাবধানে

চাপিয়া সন্তর্পণে উপরে গেল। চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ পাছে শোনা যায়, পাছে তাহা কোন গুরুজনের কানে গিয়া তাহার ব্যাকুল অভিসার-যাত্রাকে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহার সাবধানতার অন্ত রহিল না।

একটি একটি করিয়া সিঁড়ি পার হইয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ ছাদের উপর জ্যোৎস্নালোক দেখা গেল, ঘরের খোলা জানালা দিয়া টেবিলের উপরকার ফুলের তোড়াটা দেখা যাইতেছে। আরও···আরও কাছে···কাহার উতলা দীর্ঘনিঃশ্বাস সুগন্ধভারাক্রান্ত কক্ষের বায়ুস্তরকে বিবশ করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ সুনন্দার মনে হইল, এই পদে পদে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অলঙ্কারের শিঞ্জনের শব্দে অবধি লজ্জায় মরিয়া গিয়া এত ভয় এত পরাধীনতার মিলন, সে কি কোন মধুচন্দ্রিকার চেয়ে মাধুর্য্যে এবং আকর্ষণে লেশমাত্র ছোট? সেই যে প্রথম দিন তিনি বলিয়াছিলেন, বিধিনিষেধের ছন্দে বাঁধিয়া সংসার ত তাহাদের মিলনকে কবিতা করিয়া তুলিয়াছে, সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল। হনিমুনের অবাধ বিস্তৃতি ও স্বাধীনতা নাই বা থাকিল, তবু ছন্দের বন্ধন স্বীকার করিয়া এই যে মিলন, গভীরতায় ও নিত্যনূতনতায় কবিতার মতই তাহা অনবদ্য এবং কবিতার মতই তাহা বেগবতী।

৪

কিন্তু বিধাতা সুনন্দার মনের কোণের গোপনতম সাধও অপূর্ণ রাখিলেন না। অন্য সব দিকে সে যথেষ্ট সুখী হইলেও, বোধ করি মাঝে মাঝে কখনও তাহার মনে হইত লতি আর লটিদের কথা। প্রকাণ্ড সংসারের সুনির্দ্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দের তালে সুনন্দার জীবন চলে। শচীকান্ত কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসে। সারাদিনের পর রাত্রির অন্ধকারে লজ্জাচকিত কম্প্রপদে শয়নকক্ষে তাহাদের দেখা হয়। একা অজানা নূতন দেশে কেবল সে আর তাহার স্বামী মুখোমুখী। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই, সময়ের কোন আদিঅন্ত নাই, কোন বিধিনিষেধ নাই। সেটা যে কেমন বস্তু ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু ধারণা করিতে সাধ যায়। এত দিন যাহা কল্পনার রঙে রাঙিয়া ছিল, এবারে হঠাৎ এক দিন তাহা সত্য হইয়া উঠিল। গরমের ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়া শচী জ্বরে পড়িল। জ্বর সামান্য কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর চিকিৎসা, ডাক্তারেরা সহজে হাতছাড়া করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিলেন, এখনও দুর্ব্বলতা যায় নাই, কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া বদলানো দরকার। শচীর বাবা ব্যস্ত হইয়া তখনই তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিয়া সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যকর এক শহরে ছোট বাসা ঠিক করিলেন। কথা ছিল, ঠাকুর-চাকর লইয়া শচী একা যাইবে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সে মায়ের কাছে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এমন ভাবটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, অসুস্থ শরীরে বাড়ীর লোক এক জন সঙ্গে না থাকিলে তাঁহার মন সুস্থির থাকিবে না, এই জন্য বৌমাকেও তিনি সঙ্গে দিলেন। নহিলে মায়ের মন মানে না। নদীর ধারে ছোট্ট শহরটি, রাঙা মাটির রাস্তা। চারি দিকে পলাশবন। মোটরে আসিতে আসিতে সুনন্দা আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে কেবল এক জন চাকর আর উড়িয়া ঠাকুর আছে।

মৃদুস্বরে সে কহিল, "দেখছ বিয়ের এক বছর পরে এত দিনে এই আমাদের মধুচন্দ্রিকা।"

দিগন্তবিস্তৃত আকাশের দিকে চাহিয়া শচীকান্ত হাসিয়া বলিল, "সত্যি।"

দিন পনর পরে :—

পূর্ব্বদিন একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া ফিরিতে রাত হইয়াছিল আর পথশ্রমে সুনন্দা ক্লান্ত ছিল, বেলা পর্য্যন্ত তাহার ঘুম ভাঙে নাই। শচী উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়াছে, চাকরটা আসিয়া বলিল, "বাবু কয়লা কুছু আছে নাই। চায়ের পানি হামি কি লিয়ে করিব?"

ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া শচী মুগ্ধবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ ভৃত্যের এবম্বিধ প্রশ্নে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল। চাকরটা আবার বলিল, "বহুমায়জী এখন উঠে নাই, বাকস খুলিয়ে আপনি পয়সা দিন, আমি কয়লা লিয়ে আসি।"

ঠিক সেই সময় ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সুনন্দা পাশের দরজা দিয়া বারান্দায় আসিল। আজ সূর্য্যোদয়ের আগে শচী উঠিয়াছে এবং একা বসিয়া সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, তাহাকে উঠায় নাই। এজন্য সহস্রবিধ অভিমান ও অনুযোগের বাণী মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সে আসিতেছিল,

শচী বলিল, "ওগো চাকরটা কি বলছে, কয়লা না কি যেন নেই। বাক্স খুলে ওকে পয়সা দাও না।"

সুনন্দা বাক্স খুলিবার জন্ম চাবির অন্বেষণ করিতে ঘরে গেল। বালিশের তলা, আলমারির দেরাজ, টেবিলের উপর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চাবি মিলিল না। তখন বিপন্ন মুখে বাহিরে আসিয়া কহিল, "চাবিটা যে পাচ্ছি নে। কাল আঁচলে বেঁধে পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ছুটোছুটি করবার সময় নিশ্চয় পড়ে গেছে।"

চাকর বলিল, "তবে তো মুস্কিল হ'ল বাবু। বিহানে উধারে কই চীজ মিলবে না ত।"

ক্রমশঃ সাঁড়াশি দিয়া বাক্সের তালা ভাঙা হইল।

অনেক বেলায় চা খাইয়া শচী ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "ওগো ব্লেড আনিয়ে রেখেছ? আজ কত দিন ধ'রে তোমাকে বলেছি আনিয়ে রাখতে। তিন-চার দিন আমার শেভ্ করাই হয় নি।" সুনন্দা তখন বারান্দায় বসিয়া বাজারের হিসাব মিলাইতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, ঐ যাঃ, বাজারে সব জিনিষই ত এক রকম আনিতে বলিয়াছিল কিন্তু ব্লেড বলা হয় নাই। কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া সে কহিল, "শোন, সত্যি ভুলে গেছি।" শচী বাহিরে আসিয়া বলিল, "কিছু তোমার মনে থাকে না। আর দিন কতক পরে উকীল হয়ে পাটনার হাইকোর্টে যখন আলাদা বাসা ক'রে বসতে হবে, তখন তুমি কি রকম গিন্নী হবে? তখনও কি সাঁড়াশি দিয়ে তালা ভাঙতে হবে? ও খুকী, ওটা কি করছ? মোচার আঠা যে দামী কাপড়টায় লাগছে, সরে ব'স।"

সুনন্দা তখন হিসাবের খাতার অঙ্কপাত কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছিল না, মৃদুকণ্ঠে হিসাবে ঠিক দিতেছিল, দু-সের বেগুন যদি ছ-আনা হয় আর দুটো কপি পাঁচ আনা, তা হ'লে…শচী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। তরকারি কুটিতে কুটিতে সুনন্দার মনে পড়িতে লাগিল, সেই যেবার গুডফ্রাইডের ছুটিতে প্রথম উনি বাড়ী আসেন তখন কতক্ষণ পর বারান্দার আলো নিবাইয়া এ-দালান সে-দালান ঘুরিয়া সে তেতালার ঘরে গিয়াছিল, তখন উনি কখনও সামান্য একটা ব্লেড আনানো হয় নাই বলিয়া এমন করিয়া বকিতে পারিতেন না। এক মিনিট দেরি তখন তাঁর কাছে এক যুগ ছিল।

শচী বারান্দার ঈজিচেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল, প্রথম যখন সে বাড়ী আসে, সুনন্দার সহিত দেখা হইলে একথা সে-কথার পরে সে বলিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতার একটি পদ আমার প্রায়ই মনে পড়ত সুনন্দা। আমি নিজে কবি নই, তাই সেই ধার-করা ভাষায় আমার মনের কথা বলছি,

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।"

আজ কিনা সারা সকাল সে-ই সুনন্দার সহিত কেবল কয়লার পয়সা, বাক্সের চাবি আর দাড়ি কামাইবার ব্লেডের বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলে নাই। নাঃ, ক্ষমা চাওয়া দরকার।

সুনন্দা তখন মোচার আঠা আঙুল হইতে ছাড়াইতে ছাড়াইতে ভাবিতেছিল, নাঃ দরকার নেই আমার মধুচন্দ্রিকার। সেই গোপন, মধুর, বাধায় প্রতিহত, মিলনে অসীম সেই পরাধীন জীবনই আমার ভাল। এইটুকুর মাঝে যে কত ধরেছে লটিরা তা জানে না।

বাংলা-সাহিত্যে 'পরশুরাম'

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

পরশুরাম শুধু বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যশিল্পী নন—বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর হাস্যশিল্পীদের সভায় তাঁর স্থান। সাধারণত, যে-সব হাস্যশিল্পী কেবল হাস্যপ্রধান সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁদের অনেকেরই অসাধারণ আবেষ্টন এবং অতি-অদ্ভুত চরিত্র-রচনার দিকে ঝোঁক যায়। অন্তত, পাঠকের চিত্তে হাসি জাগানো প্রধান লক্ষ্য থাকার জন্য অনেক সময় তাঁদের অতিরঞ্জন এবং অত্যুক্তির মধ্যে এমন একটা কৃত্রিমতার ভাব থাকে যে তাঁদের লেখা পড়তে পড়তে বাস্তবতার মায়া (illusion of reality) আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, আমরা নিজেদের স্থানকালের সীমাকে ভুলে গিয়ে চিত্রিত চরিত্রদের দলে মিশে যেতে পারি না। এই বাস্তবতার মায়াজাল বিস্তার করার মধ্যেই পরশুরামের বৈশিষ্ট্য। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এ যেমন অকৃত্রিম, তেমনি প্রাণবন্ত। এখানে যেন একটুও অতিরঞ্জন নেই, অত্যুক্তি নেই। অতিরঞ্জন এবং অত্যুক্তি ব্যতীত হাস্যরস রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই বোঝা যায়, পরশুরাম-সাহিত্যে দুই-ই আছে। কিন্তু শিল্পীর সোনার কাঠির স্পর্শ পাঠকের মনে এমনি মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে তোলে যে মনে হয় তাঁর চরিত্রগুলো আমাদের নিতান্ত পরিচিত,—যেন অনেক দিনের প্রতিবেশী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,* "বইখানি (গড্ডলিকা) চরিত্র-চিত্রশালা। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়,—ঠিক ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।"

পরশুরামের শিল্পদৃষ্টি যেমন প্রখর তেমনি সজাগ। জীবনকে তিনি নিবিড় ক'রে দেখেছেন। দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের সুপ্রাচীন সমাজ-জীবন নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে—তার দিকে দিকে দুর্ব্বলতা ও অসঙ্গতি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। পরশুরামের প্রতিভা এর মধ্যে পেয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা। অতি-অদ্ভুতের সন্ধান তিনি করেন নি। ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, রায় বংশলোচন ব্যানার্জি, ব্যাণ্ডমাষ্টার লাটুবাবু, বিরিঞ্চি বাবা, নকুড় মামা, নন্দ—সকলেই এসেছেন আমাদের চিরপরিচিত সমাজ-জীবনের সাধারণ স্তর থেকে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের অতল সিন্ধু থেকে শিল্পী পাকা জহুরীর মত শ্রেণীগত চারিত্রিকতার বিচিত্র উপকরণ আহরণ করেছেন। আর সেই উপকরণ দিয়ে রূপায়িত ক'রে তুলেছেন একটির পর একটি ব্যঙ্গচিত্র। ব্যঙ্গ দু-রকমের—ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষের দুর্ব্বলতা নিয়ে তিনি কোথাও উপহাস করেন নি। কিন্তু শ্রেণীগত অসঙ্গতি, উদ্‌ভ্রান্তি, অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে ভিত্তি ক'রে তিনি যে কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন, মনে হয় জগতের যে-কোন সাহিত্যেই তা একান্ত বিরল। তীক্ষ্ণ, সংযত, সরস ব্যঙ্গশিল্পে পরশুরাম শিল্পীশ্রেষ্ঠ।

পরশুরামের ব্যঙ্গচিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নতা এবং ঔদার্য্য। মনে হয়, ইংরেজী সাহিত্যে ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতির সাহিত্য-সৃষ্টির ফলে 'স্যাটায়ার' শব্দটাকে জড়িয়ে আছে একটা তীক্ষ্ণ, অনুদার আঘাতের ভাব। পরশুরামের ব্যঙ্গচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। কবিরাজী অবুদ্ধি, ভণ্ড ব্রাহ্মণের দুর্বুদ্ধি বা আধুনিক তরুণের উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে তিনি উপহাস করেছেন, কিন্তু তাঁর উপহাসের মধ্যে অবজ্ঞার চেয়ে হাসিটাই বড়। 'ভুশণ্ডীর মাঠে' তিনি হিন্দুর পুনর্জ্জন্ম-

---

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

ব্যাদকে এমন অপরূপভাবে ব্যঙ্গ করেছেন যে গোঁড়া হিন্দুও নির্ব্বিবাদে তা উপভোগ করে। তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে দেখা যায়, আঘাত করার চেষ্টা প্রধান প্রেরণা নয়,—রসনাভূতিই শিল্পীকে মূলত আকৃষ্ট করেছে। আঘাত তিনি দিয়েছেন কিন্তু সে আঘাত এত রসাত্মক যে তা কোনদিন কটু কটাক্ষে আমাদের জর্জ্জরিত করে না। তাঁর রচনায় হুল অবশ্য আছে। শ্যামানন্দ বাটপারিয়ার প্রতারণায় উন্মত্ত তিনকড়ি যখন চীৎকার করে ওঠে, "চোর—চোর—চোর, আমি এখনই বিলেতে কোল্ডহ্যাম সাহেবকে চিঠি লিখছি"—এখানে বড়সাহেবের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ডেপুটি-মনোবৃত্তির অবুদ্ধি নিয়ে পরশুরাম তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর মধুর তীব্রতা আমাদের এমন মত্ত করে রাখে যে হুলের তীক্ষ্ণতা পীড়ন করতে পারে না। পরশুরাম-সাহিত্যে এই ঔদার্য্যের প্রধান কারণ, লেখকের শিল্পীজনোচিত নির্ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য-জগতে দু-রকমের শিল্পী আছেন। যাকে রূপ দিতে চাই, তা শুধু রূপায়িত করাই, কেবল ছবি আঁকাই এক দলের প্রধান লক্ষ্য। আপন আপন সৃষ্টির মধ্যে এঁরা নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুট হতে দেন না। নিজেকে তাঁরা গোপন রাখেন। তাঁদের লেখা পড়তে পড়তে আমাদের চিত্তে এ বোধ জাগে না যে লেখক তাঁর নিজস্ব-দৃষ্টি-দিয়ে-দেখা জগৎ এবং জীবনকে আমাদের সামনে চিত্রিত ক'রে তুলেছেন। আর এক দল সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিত্ব, নিজেদের মত ও আদর্শ, অনুরাগ ও বিতৃষ্ণা সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা নিজেদেরকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন না। পরশুরাম প্রথম দলের শিল্পী। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তি পরশুরামকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যঙ্গশিল্পী পোপ-ড্রাইডেনও অনেক সময় ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন সমাজের দুর্বুদ্ধিকে সংযত করার উদ্দেশ্যে। তাঁদের মনের ভিতরে ব্যক্তি অনেক সময়ে শিল্পীর আসন টেনে নিয়েছিলেন। লোকরহস্যে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের তুলির রেখায় মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পরশুরাম সুদক্ষ শিল্পী। মানুষ-হিসাবে হয়ত তিনি সমাজের অনেক সমস্যার মীমাংসা-প্রয়াসী। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে সে পরিচয় কোথাও নেই। শ্যামানন্দের উপর তাঁর কি পরিমাণ বিরাগ, বংশলোচনের উপর তাঁর প্রীতি আছে বা নেই, কবিরাজী শাস্ত্রকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করেন কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত সহজে জানা যায় না, তাই তাঁর ব্যঙ্গের কটাক্ষে জ্বালা নেই।

হাস্যরসের রূপ বিভিন্ন। তাদের জাতিও এক নয়—আকারও এক নয়। রঙ্গের (fun) মধ্যে আছে শুধু ফাঁকা অট্টহাসি। তার উৎপত্তি নিছক জৈব প্রাণের হাস্য-প্রবণতা (animal spirit) থেকে। তার প্রকাশ সশব্দ উচ্চ হাসিতে। তা পাঠককে শুধু হাসায়—ভাবায় না। তার সৃষ্টির মাল-মশলা জীবনের বাইরের বিকৃতি বা ঘটনা-সমাবেশের অসঙ্গতি। 'হিউমার' ও 'উইট' রঙ্গের চেয়ে গভীরতর স্তরের হাস্যরস। তাদের প্রকৃতি লঘু নয়—সূক্ষ্ম সঙ্কেতময়তায় ভরপুর। তারা আমাদের কল্পনায় সাড়া জাগায়, মস্তিষ্ককে ক'রে তোলে চঞ্চল। শুধু ক্ষণিকের আমোদ দেওয়া তাদের ধর্ম্ম নয়। গানের শেষে সুরের রেশের মত আমাদের মনের কোণে তারা ঘুরে ফিরে বেড়ায়। হিউমার ও উইটের মধ্যেও আছে আকার এবং প্রকার দু-দিকেই পার্থক্য। উইটের সৃষ্টি এবং উপভোগের মধ্যে থাকে মস্তিষ্কের প্রাধান্য। হাসির সঙ্গে যেখানে মেশে অনুকম্পা সেখানেই হিউমারের উৎস। তা শুধু হাসায় না—সময়ে সময়ে কাঁদায়ও। কান্না-হাসির অপূর্ব্ব সম্মিলনে হিউমারের সৃষ্টি। উইট এবং হিউমার মানুষের সূক্ষ্ম ও জটিল মনের চিহ্ন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যতই জীবনের সূক্ষ্মতর রাজ্যের সন্ধান পেয়েছি, আমাদের আদিম রঙ্গানুভূতি ততই উইট এবং হিউমারে বিকশিত হয়েছে। পরশুরাম-সাহিত্যের প্রধান উপাদান উইট। তাঁর লেখার মধ্যে নিছক রঙ্গ খুব কম। ফাঁকা হাসি তিনি হাসতে পারেন নি। তাঁর প্রত্যেক চরিত্রের, প্রত্যেক চিত্রটির ভিতরে আছে গভীর অর্থের সঙ্কেত। কিন্তু তাঁর তুলির সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ স্পর্শ সঙ্কেতের আবছায়াকে কোথাও অর্থের চাকচিক্যে সৌন্দর্য্যহীন ক'রে তোলে নি। তা প্রথম বর্ষার ঘন কালো মেঘের মত পুরোপুরি সঙ্কেতময়—শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকের তীব্রতা আমাদের জানিয়ে দেয় তার অর্থের গুরুত্ব।

মনে হয়, পরশুরাম-সাহিত্যে হিউমারের অভাবও খুব চোখে পড়ে। কোথাও তাঁর হাসি অশ্রুভারে অনবদ্য হয়ে ওঠে নি। কোন চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখকের দরদ কোথাও উচ্ছল হয়ে পড়ে নি। অবশ্য, শিল্পীর দরদ প্রত্যেকে পেয়েছে। তা নাহলে শিল্পীর তুলির মুখে এমন নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণ সম্ভব হ'ত না। কিন্তু শিল্পীকে ডিঙিয়ে মানুষ পরশুরামের অবজ্ঞা যেমন কেউ পায় নি, তেমনি তাঁর অনুকম্পাও কারও অদৃষ্টে মেলে নি। কারও দুর্বুদ্ধিকে তিনি যেমন তীব্রভাবে আঘাত করতে পারেন নি, তেমনি কারও অবুদ্ধি দেখে অনুকম্পায় তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে নি। ফলে তাঁর মৃদু আঘাত খেয়ে পাঠকের মন যেমন দুঃসহ জ্বালায় বিষিয়ে ওঠে না, তেমনি তাঁর চরিত্র-চিত্রশালার মধ্যে কোন মানুষটি আমাদের কাঁদায় না। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার বংশগৌরবের দুর্ব্বলতায় আমরা নির্মমভাবে হাসি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মনের গোপন কোণে অপরিমেয় করুণাও জমা হয়ে ওঠে। চার্লস ল্যাম্বের টমাসটেম বা জি. ডি. কিংবা ডিকেন্সের মিকবার চরিত্রের অসঙ্গতি যেমন হাসায়, তেমনি অনুকম্পায় ভরিয়ে তোলে পাঠকের মন। মানুষের দুর্ব্বলতা আছে, অবুদ্ধি আছে—দুর্বুদ্ধিও আছে কিন্তু তার জন্য সকলকেই শয়তান বলা যায় না। এই দুর্ব্বলতা, অবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধিকে ঘিরে কত মানুষের জীবনে কত অপরিসীম ব্যথা ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। পরশুরামের প্রতিভা এই বেদনার সন্ধান পায় নি।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, পরশুরাম যা দিয়েছেন তা নিখুঁৎ ভাবেই দিয়েছেন। তাঁর দান বিচিত্র নয়, অজস্রও নয়। প্রাচুর্য্য তাঁর নেই। কিন্তু এমন শিল্পগত পূর্ণতা খুব কম শিল্পীর দানে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মত সংযত, নিখুঁত শিল্পী সাহিত্য-জগতে সুলভ নয়। তাঁর লিখনভঙ্গীর বিশেষত্ব হচ্ছে অনাড়ম্বরতা। তাঁর বেশীর ভাগ চরিত্র আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে সংগ্রহ-করা। সাধারণ জীবনের বিস্তৃত সীমা থেকে তিনি বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেছেন। তাঁর ভাষাও যেমন সংযত তেমনি সরল। তার মধ্যে পারিপাট্য আছে, কিন্তু আড়ম্বরের চাকচিক্য বা অলঙ্কারের গুরুভার নেই। হাস্যসাহিত্যসুলভ যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের আতিশয্য তাঁর লেখায় দেখা যায় না। তাই 'গড্ডলিকা,' 'কজ্জলী' পড়তে পড়তে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শিল্পসৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার দিকে শিল্পীর কোন চেষ্টা নেই। কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায়, চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার দিকে তাঁর এই নিরাসক্তি সম্পূর্ণ বাহ্য। প্রতিটি শব্দনির্ব্বাচনে শিল্পীর কতই না সতর্কতা, চরিত্রচিত্রণে তুলির প্রতিটি রেখায় কি প্রাণপণ যত্ন। হাস্যশিল্পীরা সময়ে সময়ে রসাত্মক কথার মোহে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। পরশুরাম-সাহিত্যে এ দুর্ব্বলতা কোথাও নেই। তিনি চরিত্র আঁকতে চেয়েছেন। শব্দসম্পদের মায়াজাল সৃষ্টি করা কোথাও তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয় নি। তাঁর শব্দব্যবহারের মধ্যে আছে সহজ, অকৃত্রিম সংযম এবং অপরিমেয় সঙ্কেতময়তা। কিন্তু লিখনভঙ্গীর সংযম এবং অনাড়ম্বরতার জন্য কোথাও রস উপভোগে বাধা জন্মায় না। একথা অবশ্য ঠিক, 'নারদে'র তুলি পরশুরামকে অপরূপভাবে সাহায্য করেছে। তাই এত অল্প কথায় অফুরন্ত হাস্যরসের চিরন্তন উৎস সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। তবু তাঁর শব্দনির্ব্বাচনের দক্ষতা পাঠকের চিত্তে বিস্ময় উৎপন্ন করে। তাঁর নরনারীর কথানুকথন যে সংযত হয়েও কত রসাল হ'তে পারে এবং তার মধ্যে সমষ্টিগত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি কত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় নন্দ ও তারিণী কবিরাজের আলাপের মধ্যে।

তারিণী। নেপাল? সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B. F.T.S.,—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অ:, স্থাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হ'ল কবে? বলি পাড়ার এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকৃতি ছেলে ছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বল্লে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্রচিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। বস্তিবাবুরি চেন? খুলনের উকিল বস্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিবিল সার্জ্জন পা

কাট্লে। তিন দিন অচৈতন্তি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক্ তারিণী স্যান্রে। দেলাম ঠুকে একদলা চ্যবন-প্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েচে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্লা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্ডা ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন, —'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হুঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো হয়েছিলো কখনো?'

নন্দ। অনেকদিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেচি। পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, ট্যানৃতি পার না।

কবিরাজ-মহাশয়ের প্রত্যেক কথায় শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ব্যঙ্গচিত্রের চরিত্রদের কথাবার্তা এত বাস্তববৎ, অনাড়ম্বর অথচ রসাত্মক বাংলা-সাহিত্যে আর কোথাও নেই। সময়ে সময়ে সঙ্কেতময়তায় পরশুরামের ভাষা অনবদ্য হয়ে উঠেছে!

ক্রম দুদ্দ্ড়্ দুড়্ দড়ড়ড়্ ড়। আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষে গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ, —গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।..................সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ,—কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার জুড়িয়া গেল। ঈশান কোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তার পিছনে যা কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ঐ এল, ঐ এল। গাছপালা শিহরিয়া উঠিল। লম্বা লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপ্টা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইঢিবি,—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা সহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন।............বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগ্নি আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ লক্ষ ভোল্ট্ ইলেক্ট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকটনাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

শিল্পী এত অল্প কথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের এমন স্বাভাবিক, নিখুঁৎ এবং জোরালো বর্ণনা করেছেন যে দুর্যোগ আমাদের চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়। প্রখর তাঁর দৃষ্টি, যা দেখেন তা ভাল ক'রেই দেখেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশ-শক্তি আরও প্রখর। এই বর্ণনার মধ্যে কোথাও হাস্যশিল্পীকে আমরা হারিয়ে ফেলি না। লঘু এবং গভীর রসের এরূপ অপরূপ সম্মিলন শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

আরণ্যক
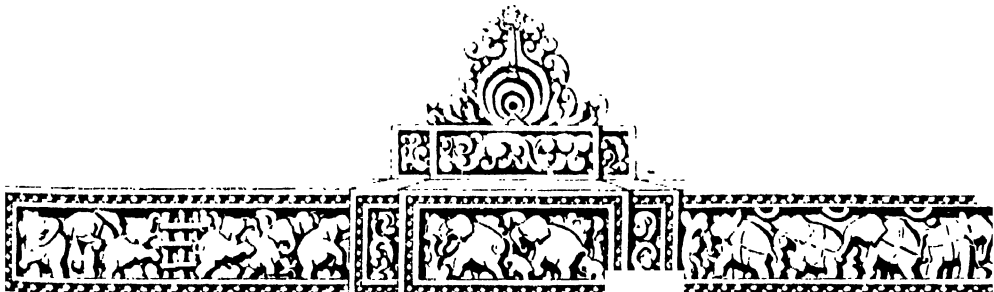
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

খুব জ্যোৎস্না, তেমনি হাড়ভাঙা শীত। পৌষ মাসের শেষ। সদর কাছারি হইতে লব্‌টুলিয়ার ডিহি কাছারিতে তদারক করিতে গিয়াছি। লব্‌টুলিয়ার কাছারিতে রাত্রে রান্না শেষ হইয়া সকলের আহারাদি হইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। এক দিন খাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি তত রাত্রে আর সেই কন্‌কনে হিমবর্ষী আকাশের তলায় কে একটি মেয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাছারির কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে। পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

পাটোয়ারী বলিল—ও কুন্তা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজার বাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট। তাই বলেছিলাম—যাস্।

কথা বলিতেছি এমন সময় কাছারির টহলদার বলোয়া আমার পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙা মাছের টুকরা, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারি ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ-ভাত—সব লইয়া গিয়া মেয়েটির আনীত একটা পেতলের কানাউঁচু থালায় ঢালিয়া দিল। মেয়েটি চলিয়া গেল।

আট-দশ দিন সেবার লব্‌টুলিয়া কাছারিতে ছিলাম, প্রতি রাত্রে দেখিতাম ইঁদারার পাড়ে সেই মেয়েটি আমার পাতের ভাতের জন্য সেই গভীর রাত্রে আর সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে বাহিরে শুধু আঁচল গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে একদিন কৌতূহল-বশে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা যে রোজ ভাত নিয়ে যায়, ও কে, আর এই জঙ্গলে থাকেই বা কোথায়? দিনে ত কখনও দেখি নে ওকে?

পাটোয়ারী বলিল—বলছি হুজুর।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা হইতে কাঠের গুঁড়ি আলাইয়া গন্‌গনে আগুন করা হইয়াছে—তারই ধারে চেয়ার পাতিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া কিস্তীর আদায়ী হিসাব মিলাইতে-ছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া মনে হইল এক দিনের পক্ষে কাজ যথেষ্টই করিয়াছি। কাগজপত্র গুটাইয়া পাটোয়ারীর গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

—শুনুন হুজুর, বছর-দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রব্‌রবা ছিল। তার ভয়ে যত গাঙ্গোতার আর চাষী ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকৃত। দেবী সিংয়ের ব্যবসা ছিল খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া এই সব লোককে—আর তার পর লাঠিবাজি ক'রে সুদ ও আসল টাকা আদায় করা। তার তাঁবে আট ন-জন লাঠিয়াল পাইকই ছিল। এখন যেমন রাসবিহারী সিং রাজপুত এ-অঞ্চলের মহাজন, তখন ছিল দেবী সিং।

দেবী সিং জৌনপুর জেলা থেকে এসে পূর্ণিয়ায় বাস করে। তার পর টাকা ধার দিয়ে আর জোর-জবরদস্তি ক'রে এ দেশের যত ভীতু গাঙ্গোতা প্রজাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেললে। এখানে আসবার বছর-কয়েক পরে সে কাশী যায় এবং সেখানে এক বাইজীর বাড়ী গান শুনতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পনর বছরের মেয়ের সঙ্গে দেবী সিংয়ের খুব ভাব হয়। তার পর তাকে নিয়ে দেবী সিং পালিয়ে এখানে আসে। দেবী সিংয়ের বয়েস তখন সাতাশ-আটাশ হবে। এখানে এসে দেবী সিং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বাইজীর মেয়ে ব'লে সবাই যখন জেনে ফেললে, তখন দেবী সিংয়ের নিজের জাতভাই রাজপুতরা ওর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রে ওকে একঘরে করলে। পয়সার জোরে দেবী সিং সে সব গ্রাহ্য করত না। তার পর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয় ক'রে এবং এই রাসবিহারী সিংয়ের সঙ্গে মকদ্দমা করতে গিয়ে দেবী সিং সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল। আজ বছর-চারেক হ'ল সে মারা গিয়েছে।

ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লব্‌টুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত—আজ ওর ওই দুর্দ্দশা। আরও মুস্কিল এই যে বাইজীর মেয়ে সবাই জানে ব'লে ওর এখানে জাত নেই, তা কি ওর স্বামীর আত্মীয়বন্ধু রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে। ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুক্‌রি ক'রে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ওর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে। কিন্তু কখনও হাত পেতে ভিক্ষে করতে ওকে দেখি নি হুজুর। আপনি এসেছেন জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, আপনার এখানে প্রসাদ পেলে ওর তাতে অপমান নেই।

বলিলাম—ওর মা সেই বাইজী, ওর খোঁজ করে নি তার পর কখনো?

পাটোয়ারী বলিল—দেখি নি ত কখনও হুজুর। কুন্তাও কখনও মায়ের খোঁজ করে নি। ওই দুঃখ-ধান্দা ক'রে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। এখন ওকে কি দেখছেন, ওর এক সময় যা রূপ ছিল, এ-অঞ্চলে সে রকম কখনও কেউ দেখে নি। এখন বয়েসও হয়েছে, আর বিধবা হওয়ার পরে দুঃখে কষ্টে সে চেহারার কিছুই নেই। বড় ভাল আর বড় শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে, নীচু চোখে দেখে, বোধ হয় বাইজীর মেয়ে ব'লে।

বলিলাম—তা বুঝলাম, কিন্তু এই রাত বারোটার সময় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও একা লবটুলিয়া বস্তিতে যাবে—সে ত এখান থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ?

—ওর কি ভয় করলে চলে হুজুর? এই জঙ্গলে হরবখত ওকে একলা ফিরতে হয়। নইলে কে আছে ওর, যে চালাবে?

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষ-কিস্তির তাগাদা শেষ করিয়াই চলিয়া আসিলাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আর একবার একটা ক্ষুদ্র চরি মহাল ইজারা-দিবার উদ্দেশ্যে লবটুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখনও শীত কিছুমাত্র কমে নাই, তার উপরে সারাদিন পশ্চিমা বাতাস বহিবার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শীত দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। এক দিন মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাছারি হইতে অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি—সেদিকটাতে বহুদূর পর্য্যন্ত শুধু কুলগাছের জঙ্গল। এই সব জঙ্গল জমা লইয়া ছাপরা ও মজঃফরপুর জেলার কলোয়ার-জাতীয় লোকে লাক্ষার চাষ করিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। কুলের জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পথ ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে আর্ত্ত ক্রন্দনের শব্দ, বালক-বালিকার গলার চীৎকার ও কান্না এবং কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে গালিগালাজ শুনিতে পাইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি একটি কে মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, সঙ্গে দু-তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা, দু-জন ছত্রি চাকরের মধ্যে এক জনের হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে আধঝুড়ি পাকা কুল। আমাকে দেখিয়া ছত্রি দু-জন উৎসাহ পাইয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে তাহাদের ইজারা-করা জঙ্গলে এই গাঙ্গোতীন চুরি করিয়া কুল পাড়িতেছিল বলিয়া তাহাকে কাছারিতে পাটোয়ারীর কাছে বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, হুজুর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

প্রথমেই ধমক দিয়া মেয়েটিকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইলাম। মেয়েটি তখন ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটি কুলঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া এত কষ্ট হইল!

ইজারাদারের লোকেরা কি সহজে ছাড়িতে চায়? তাহাদের বুঝাইলাম—বাপু, গরীব মেয়েমানুষ যদি ওর ছেলেপুলেকে খাওয়াইবার জন্য আধঝুড়ি টক্ কুল পাড়িয়াই থাকে, তাতে তোমাদের লাক্ষাচাষের বিশেষ কি ক্ষতিটা হইয়াছে, উহাকে বাড়ী যাইতে দাও।

এক জন বলিল—জানেন না হুজুর, ওর নাম কুন্তা, এই লব্‌টুলিয়াতে ওর বাড়ী, ওর অভ্যেস চুরি ক'রে কুল পাড়া। আরও একবার আর বছর হাতে হাতে ধরেছিলাম—ওকে এবার শিক্ষা না দিয়ে দিলে—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তা! তাহাকে ত চিনি

নাই? তাহার একটা কারণ দিনের আলোতে কুন্তাকে ত দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানেই ফেলিয়া গেল—বোধ হয় ভয়ে ও সঙ্কোচে। আমি উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে এক জনকে সেগুলি কাছারিতে লইয়া যাইতে বলাতে তাহারা খুব খুশী হইয়া ভাবিল ধামা ও আঁকশি সরকারে নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত হইবে। কাছারিতে আসিয়া পাটোয়ারীকে বলিলাম—তোমাদের দেশের লোক এত নিষ্ঠুর কেন বনোয়ারীলাল? বনোয়ারী পাটোয়ারী খুব দুঃখিত হইল। বনোয়ারী লোকটা ভাল, এদেশের তুলনায় সত্যিই তার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। কুন্তার ধামা ও আঁকশি সে তখনই পাইক দিয়া লব্‌টুলিয়াতে কুন্তার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

সেই রাত্রি হইতে কুন্তা বোধ হয় লজ্জায় আর কাছারিতেও ভাত লইতে আসে নাই।

শীত শেষ হইয়া বসন্ত পড়িয়াছে।

আমাদের এ জঙ্গল-মহালের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমানা হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি হইতে প্রায় চৌদ্দ পনর ক্রোশ দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে, এবার সেখানে যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেক দিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল। কিন্তু কাছারির লোকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিল, পথ দুর্গম ও ও পাহাড়-জঙ্গলে ভর্ত্তি, উপরন্তু গোটা পথটার প্রায় সর্ব্বত্রই বাঘের ও বন্যমহিষের ভয়, মাঝে মাঝে বস্তি আছে বটে, কিন্তু সে বড় দূরে দূরে, বিপদে পড়িলে তাহারা বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না ইত্যাদি।

জীবনে কখনও এতটুকু সাহসের কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই, এই সময়ে এই সব জায়গায় যত দিন আছি যাহা করিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কোথায় পাইব পাহাড় জঙ্গল, কোথায় পাইব বাঘ ও বন্যমহিষ? ভবিষ্যতের দিনে আমার মুখে গল্পশ্রবণনিরত পৌত্রপৌত্রীদের মুগ্ধ ও উৎসুক তরুণ দৃষ্টি কল্পনা করিয়া মুনেশ্বর মাহাতো পাটোয়ারী ও নবীনবাবু মুহুরীর সকল আপত্তি উড়াইয়া দিয়া মেলার দিন খুব সকালে ঘোড়া কসিয়া রওনা হইলাম। আমাদের মহালের সীমানা ছাড়াইতেই ঘণ্টা-দুই লাগিয়া গেল, কারণ পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমানাতেই আমাদের মহালে জঙ্গল বেশী, পথ নাই বলিলেও চলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন যানবাহন সে পথে চলা অসম্ভব, যেখানে সেখানে ছোট বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, শাল-জঙ্গল, দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউয়ের বন, সমস্ত পথটা উঁচুনীচু, মাঝে মাঝে উঁচু বালিয়াড়ি, রাঙা মাটির ডাঙা, ছোট পাহাড়, পাহাড়ের ওপর ঘন কাঁটা গাছের জঙ্গল। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে অশ্ব চালনা করিতেছি, ঘোড়াকে কদম চালে ঠিক চালানো সম্ভব হইতেছে না—খারাপ রাস্তা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দরুন কিছু দূর অন্তর অন্তর ঘোড়ার চাল ভাঙিয়া যাইতেছে, কখনও গ্যালপ, কখনও দুলকি, কখনও বা পায়চারি করিবার মত মৃদু গতিতে শুধু হাঁটিয়া যাইতেছে।

আমি কিন্তু কাছারি ছাড়িয়া পর্য্যন্তই আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার দিনটি হইতে এদেশের এই ধূ ধূ মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশঃ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে, কলিকাতা শহর ভুলাইয়া দিতেছে, সভ্য জগতের শত প্রকারের আরামের উপকরণ ও অভ্যাসকে ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত ভুলাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। যাক্ না ঘোড়া আস্তে বা জোরে, শৈলসানুতে যতক্ষণ প্রথম বসন্তে প্রস্ফুটিত রাঙা পলাশফুলের মেলা বসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে, ওপরে, মাঠের সর্ব্বত্র ঝুপসি গাছের ডাল ঝাড় ঝাড় ধাতুপ ফুলের ভারে অবনত, গোলগোলি ফুলের নিষ্পত্র দুগ্ধশুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুলের মত ফুল মধ্যাহ্নের রৌদ্রকে মৃদু সুগন্ধে অলস করিয়া তুলিয়াছে—তখন কতটা পথ চলিলাম, কে রাখে তাহার হিসাব?

কিন্তু হিসাব খানিকটা যে রাখিতেই হইবে, নতুবা দিক্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, আমাদের জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই এ সত্যটি ভাল করিয়াই বুঝিলাম। কিছু দূর তখন অন্যমনস্ক ভাবে গিয়াছি, হঠাৎ দেখি সম্মুখে বহুদূরে একটা খুব বড় অরণ্যানীর ধূম্রনীল

শীর্ষদেশ রেখাকারে দিগ্‌বলয়ের সে-অংশে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোথা হইতে আসিল এত বড় বন ওখানে? কাছারিতে কেহ ত একথা বলে নাই যে মৈষণ্ডির মেলার কাছাকাছি কোথাও অমন বিশাল অরণ্য বর্ত্তমান? পরক্ষণেই ঠাহর করিয়া বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি, সম্মুখের বনরেখা মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট না হইয়া যায় না—যাহা আমাদের কাছারি হইতে খাড়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এসব দিকে চলতি বাঁধা পথ বলিয়া কোন জিনিষ নাই, লোকজনও কেহ বড়-একটা হাঁটে না। তাহার উপর চারি দিক দেখিতে ঠিক একই রকম, সেই এক ধরণের ডাঙা, এক ধরণের পাহাড়, এক ধরণের গোলগোলি ও ধাতুপ ফুলের বন, সঙ্গে সঙ্গে আছে চড়া রৌদ্রের কম্পমান তাপ-তরঙ্গ। দিক্‌ভুল হইতে বেশীক্ষণ লাগে না আনাড়ি লোকের পক্ষে।

ঘোড়ার মুখ আবার ফিরাইলাম। হুঁসিয়ার হইয়া গন্তব্যস্থানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া একটা দিক্‌চিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ করিয়া বাছিয়া লইলাম। অকূল সমুদ্রে জাহাজ ঠিক পথে চালনা, অনন্ত আকাশে এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ ও এই সব অজানা সুবিশাল পথহীন বনপ্রান্তরে অশ্ব-চালনা করিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া প্রায় একই শ্রেণীর ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের এ-কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

আবার রৌদ্রদগ্ধ, নিষ্পত্র, গুল্মরাজি, আবার বনকুসুমের মৃদু মধুগন্ধ, আবার অনাবৃত শিলাস্তূপসদৃশ প্রতীয়মান গণ্ডশৈল-মালা, আবার রক্তপলাশের শোভা। বেলা বেশ চড়িল, জল খাইতে পাইলে ভাল হইত, ইহার মধ্যেই মনে হইল, কারো নদী ছাড়া এপথে কোথাও জল নাই জানি, এখনও আমাদের জঙ্গলেরই সীমা কতক্ষণে ছাড়াইব ঠিক নাই, কারো নদী ত বহুদূর—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

মুকুন্দি চাকলাদারকে বলিয়া দিয়াছিলাম আমাদের মহালের সীমানায় সীমানাজ্ঞাপক বাব্‌লা কাঠের খুঁটি বা মহা-বীরের ধ্বজায় অনুরূপ যাহা হয় কিছু পুঁতিয়া রাখে। এ সীমানায় কখনও আসি নাই, দেখিয়া বুঝিলাম চাকলাদার সে আদেশ পালন করে নাই। ভাবিয়াছে, এই জঙ্গল ঠেলিয়া কলিকাতার ম্যানেজার বাবু আর সীমানা-পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তুমিও যেমন! কে খাটিয়া মরে? যেমন আছে তেমনই থাকুক্‌।

পথের কিছু দূরে আমাদের সীমানা ছাড়াইয়া এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া সেখানে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে এক দল লোক কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিতেছে—এই কয়লা তাহারা গ্রামে গ্রামে শীতকালে বেচিবে। এদেশের শীতে গরীব লোকে মালসায় কয়লার আগুন করিয়া শীত নিবারণ করে, কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রি হয়, তাও কিনিবার পয়সা অনেকের জোটে না আর এত পরিশ্রম করিয়া কাঠ-কয়লা পুড়াইয়া পয়সায় চার-সের দরে বেচিয়া কয়লা-ওয়ালাদের মজুরীই বা কি ভাবে পোষায়, তাও বুঝি না। এদেশে পয়সা জিনিষটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত তা দেখিতেছি।

শুক্‌নো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে, আমি যখন গেলাম। লবণ ছাড়া অন্য কোন উপকরণ নাই। নিকটে বড় বড় গর্ত্তের মধ্যে ডালপালা পুড়িতেছে, একটা ছোকরা সেখানে বসিয়া কাঁচা শালের লম্বা ডাল দিয়া আগুনে ডালপালা উল্টাইয়া দিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ও গর্ত্তের মধ্যে, কি পুড়ছে?

তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া বলিল—লকড়ি কয়লা হুজুর।

আমার ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তি দেখিয়া লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, বুঝিলাম আমাকে বন-বিভাগের লোক ভাবিয়াছে। এসব অঞ্চলের বন গবর্ণমেণ্টের খাসমহালের অন্তর্ভুক্ত, বিনা অনুমতিতে বন-কাটা কি কয়লা-পোড়ান বে-আইনী।

তাহাদের আশ্বস্ত করিলাম। আমি বন-বিভাগের কর্ম্মচারী নই, কোন ভয় নাই তাদের, যত ইচ্ছা কয়লা করুক। একটু জল পাওয়া যায় এখানে? খাওয়া ফেলিয়া এক জন ছুটিয়া গিয়া মাজা ঝক্‌ঝকে জামবাটীতে পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কাছেই বনের মধ্যে ঝরণা আছে, তার জল।

ঝরণা ? আমার কৌতূহল হইল। ঝরণা কোথায় ? শুনি নাই ত এখানে ঝরণা আছে !

উঁহারা বলিল—ঝরণা না হুজুর, উন্থই। পাথরের গর্ত্তে একটু একটু ক'রে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফ পানি, ঠাণ্ডাও বহুৎ।

জায়গাটা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বনবীথি ! পরীরা বোধ হয় এই নির্জ্জন অরণ্যে শিলাতলে শরৎ বসন্তের দিনে কি গভীর নিশীথ রাত্রে জলকেলি করিতে নামে। বনের খুব ঘন অংশে বড় বড় পিয়াল ও কেঁদের ডালপালা-দিয়া-ঘেরা একটা নামাল জায়গা, তলাটা কালো পাথরের ; একখানা খুব বড় প্রস্তর-বেদী যেন কালে ক্ষয় পাইয়া ঢেঁকির গড়ের মত হইয়া গিয়াছে। যেন খুব একটা বড় প্রাকৃতিক পাথরের খোরা। তার উপর সপুষ্প পিয়াল শাখা ঝুপসি হইয়া পড়িয়া ঘন ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়াল ও শাল মঞ্জরীর সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে। পাথরের খোলে বিন্দু বিন্দু জল জমিতেছে, এইমাত্র জল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এখনও আধ ছটাক জলও জমে নাই।

উঁহারা বলিল—এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে হরবখ্‌ত বেড়াই, আমরা জানি।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়া কারো নদী পড়িল, খুব উঁচু বালির পাড় দু-ধারে, অনেকটা খাড়া নীচু নামিয়া গেলে তবে নদীর খাত, বর্ত্তমানে খুব সামান্যই জল আছে, দু-পারে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালুকাময় তীর ধূ-ধূ করিতেছে। যেন পাহাড় হইতে নামিতেছি মনে হইল। ঘোড়া জল পার হইয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ঘোড়ার জিন পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিল, রেকাবজলসুদ্ধ পা মুড়িয়া অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। ওপারে ফুটন্ত রক্ত-পলাশের বন, উঁচু নীচু রাঙা ডাঙা, শিলাখণ্ড, আর শুধুই পলাশ, আর পলাশ, সর্ব্বত্র পলাশ ফুলের মেলা। একবার দূরে একটা বুনো মহিষকে ধাতুপ্‌ ফুলের বন হইতে বাহির হইতে দেখিলাম—সেটা পথের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম কসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম, ত্রিসীমানায় কোথাও জনমানব নাই, যদি শিং পাতিয়া তাড়া করিয়া আসে ? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সেটা আবার পথের পাশের বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর গিয়া পথের দৃশ্য কি চমৎকার ! তবুও ত ঠিক-দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অপরাহ্নের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই—কিন্তু সেই নিস্তব্ধ খররৌদ্র মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকের বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্র কাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপ্‌ ফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত, অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতি মাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক-দুপুরের সেই খাঁ খাঁ রৌদ্র ! মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল ! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য—মাটিতে বন্য প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারি দিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না ত ? এ যেন ফিল্‌মে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হড্‌সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা-অঞ্চল।

মেলায় পৌঁছিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড মেলা, যে দীর্ঘ শৈলশ্রেণী পথের বাঁ-ধারে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশ-তিনেক ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তারই সর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে, চারি দিকে শাল পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাস-টোলা, মহালীমারূপ্‌ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানা স্থান হইতে লোকজন প্রধানতঃ মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ্‌ ফুল গুঁজিয়া, কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুণী আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই—তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানী কি জার্ম্মানীর সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি,

রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে।

হঠাৎ মেয়েমানুষের গলার আর্ত্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙায় যুবকযুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিখুশী, গল্পগুজব, আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তা নয়, কোনো একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনো মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এ দেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনো প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মরাকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ বুঝি মারা গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে। মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

এক জায়গায় বইয়ের দোকানী চটের থলের উপর বই সাজাইয়া বসিয়াছে—হিন্দী গোলেবকাউলী, লয়লা-মজনু, বেতাল পচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি। প্রবীণ লোকে কেহ কেহ বই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছে—বুঝিলাম বুকষ্টলে দণ্ডায়মান পাঠকের অবস্থা আনাতোল ফ্রাঁসের প্যারিসেও যেমন, এই বন্য দেশে কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলাতেও তাহাই। বিনা পয়সায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইতে পারিলে কেহ বড়-একটা বই কেনে না। দোকানীর ব্যবসাবুদ্ধি কিন্তু বেশ প্রখর, সে জনৈক তন্ময়চিত্ত পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল—কেতাব কিন্‌বে কি? না হয় ত রেখে দিয়ে অন্য কাজ দেখ। মেলার স্থান হইতে কিছু দূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে—ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তরিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শাল পাতার ঠোঙায় শুঁট্‌কী কুচো চিংড়ি ও লাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেঁপে, শুক্‌নো কুল, কেঁদ ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।

হঠাৎ কাহার ডাক কানে গেল—ম্যানেজার বাবু, ম্যানেজার বাবু,—

চাহিয়া দেখি ভিড় ঠেলিয়া লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো আগাইয়া আসিতেছে।—হুজুর, আপনি কখন এলেন? সঙ্গে কে?

বলিলাম—ব্রহ্মা এখানে কি মেলা দেখতে?

—না হুজুর, আমি মেলার ইজারাদার। আসুন, আসুন আমার তাঁবুতে চলুন, একটু পায়ের ধুলো দেবেন।

মেলার এক পাশে ইজারাদারের তাঁবু, সেখানে ব্রহ্মা খুব খাতির করিয়া আমায় লইয়া গিয়া একখানা পুরনো বেণ্টউড্ চেয়ারে বসাইল। সেখানে এক জন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দেখিব না। লোকটি কে জানি না, ব্রহ্মা মাহাতোর কোনো কর্ম্মচারী হইবে। বয়েস পঞ্চাশ-ষাট বছর, পা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। তাহার হাতে একটা বড় থলিতে এক থলি পয়সা, বগলে একখানা খাতা, সম্ভবতঃ মেলার খাজানা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, ব্রহ্মা মাহাতোকে হিসাব বুঝাইয়া দিবে।

মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র ভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ব্রহ্মা মাহাতো রাজা নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, কাহারও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নয়, গবর্ণমেণ্ট খাসমহালের জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা মাত্র—লইয়াছেই না-হয় মেলার ইজারা—এত দীন ভাব কেন ও লোকটার তার কাছে? তারও পরে আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা মণ্ডল আমাকে অত খাতির করিতেছে দেখিয়া লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশী চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীন-হীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার-বার আমি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven. এমন ধারা সত্যিকার দীন বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

ব্রহ্মা মণ্ডলকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তার বাড়ী কড়ারী তিনটাঙা, যে গ্রামে ব্রহ্মা মাহাতোর বাড়ী, নাম গিরধারীলাল, জাতি গাঙোতা। উহার এক ছোট ছেলে ছাড়া আর সংসারে কেহই নাই। অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম অতি গরীব। সম্প্রতি ব্রহ্মা তাহাকে মেলায় দোকানের আদায়কারী কর্ম্মচারী বহাল করিয়াছে—দৈনিক চার আনা বেতন ও খাইতে দিবে।

গিরধারীলালের সঙ্গে আমার আরও দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তার সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাতের সময়কার অবস্থা বড় করুণ, পরে সে-সব কথা বলিব। অনেক ধরণের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই। কত কাল হইয়া গেল, কত লোককে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাহাদের কথা চিরকাল মনে আঁকা আছে ও থাকিবে, সেই অতি অল্প কয়েক জন লোকের মধ্যে গিরধারীলাল এক জন।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই এ কথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে-না-যাইতে সূর্য্য যাইবে ডুবিয়া, না-হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ আছে, বিশেষতঃ পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক ত নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই ত সেদিনও এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বাঘে লইয়াছে, বেচারী জঙ্গলের পথে একা গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। অসম্ভব, হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন গরীবের ডেরায়। কাল সকালে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথ একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব্ব বন পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে! জ্যোৎস্নারাত্রে—বিশেষতঃ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ এক বার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার অর্থ হয়?

সকলের সন্দিগ্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বেই টকটকে লাল সুবৃহৎ সূর্য্যটা পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এই বার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্য্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্ব্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থমকিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জ্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছিল—

পথে সর্ব্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছু দূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জ্জন চারি দিক, দিনমানে যা হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্ম মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায় সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বার-বার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোঁসাই নামে আমাদের এক জন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুকনো ও পাকা কুল ছড়ান—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ এ বনে না থাকিলেও মোহনপুরা জঙ্গল হইতে ওবেলারমত এক-আধটা ছটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ? সম্মুখে এখনও পনর মাইল নির্জ্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

ভয়ের অনুভূতি চারি পাশের সৌন্দর্য্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক-এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্ব্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছ, কি একটা বন্য ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্য্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেসিয়ার বুশ-ভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে—বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু একথা বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোক পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম এ এক জীবন আলাদা, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই ত কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জ্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্ব্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শাল-পলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোনো সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারি ধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাকে কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল-চার গিয়া আমাদের সীমানা সুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি এক দল লোক কাছারির কম্পাউণ্ডে কোথা হইতে আসিয়া ঢোল বাজাইতেছে। ঢোলের শব্দে কাছারির সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও ডাকিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে জমাদার মুক্তিনাথ সিং দরজার কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একবার বাইরে আসবেন মেহেরবানি ক'রে?

—কি জমাদার, কি ব্যাপার?

—হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে ব'লে এসেছে, যদি হুকুম হয়, তবে নাচ দেখায়।

নাচের দল আমার আপিস-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে এক জন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্কর বাজি নাচ।

দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক না-জানুক, পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরণের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে।

অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এদের এই নাচ গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ :—

শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তাহার মাথায় কেঁদ-বন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা।

দিন খুব সুখেই কাটত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতাম না।

পাচনহরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি।

হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম রঙে ছোপান শাড়ী প'রে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে—ছিঃ, পুরুষমানুষে কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখী মারে ?

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আটা-কাঠির তাড়া।

বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন-পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে

চিরদিনের মত সে ধরা পড়ে গেল !

আমার সাত-নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ-কি করলে তুমি আমার ?

কাজটা কি ভাল হ'ল, সখি ?

ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভাল লাগিবে।

ইহাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা পয়সা। কাছারির আমলারা একবাক্যে বলিল—হুজুর, তাই অনেক জায়গায় পায় না। বেশী দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তা ছাড়া বাজার নষ্ট হবে। যা রেট্ তার বেশী দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়ীতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।

অবাক হইলাম। দু-তিন ঘণ্টা প্রাণপণে খাটিয়াছে কমসে কম সতর-আঠার জন লোক—চার আনায় ইহাদের জন-পিছু একটা করিয়া পয়সাও ত পড়িবে না। আমাদের কাছারিতে নাচ দেখাইতে এই জনহীন প্রান্তর ও বন পার হইয়া এত দূর আসিয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ইহাই রোজগার। কাছে আর কোনও গ্রাম নাই, যেখানে আজ রাত্রে নাচ দেখাইবে।

রাত্রে কাছারিতে তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সকালে তাহাদের দলের সর্দ্দারকে ডাকাইয়া দুইটি টাকা দিতে লোকটা অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাচ দেখিয়া খাইতে কেহই দেয় না, তার উপর আবার দু-টাকা দক্ষিণা!

তাদের দলে বারো-তের বছরের একটি ছেলে আছে, ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারী শান্ত, সুন্দর চোখ মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথমে সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে। ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে। সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুলাইয়া মিষ্ট সুরে গায় :—

রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যয় পরদেশি‌ঁয়া।

শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড়-একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি। চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড়জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি। আলুপটল নয়, জংলি গুড়মি ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুঁধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি তার সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব্ব লাবণ্য সারা অঙ্গে।

দলের অধিকারীকে বলিলাম, ধাতুরিয়াকে রেখে যাও এখানে। কাছারিতে কাজ করবে, আর থাকবে খাবে।

অধিকারী সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি সেও এক অদ্ভুত ধরণের লোক। এই বাষট্টি বছরেও সে একেবারে বালকের মত।

বলিল—ও থাকতে পারবে না হুজুর। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে এক সাথে আছে, তাই ও আছে ভাল। একলা থাকলে মন কেমন করবে, ছেলেমানুষ কি থাকতে পারে ? আবার আপনার সামনে ওকে নিয়ে আসব হুজুর। (ক্রমশ)

উদ্দেশে

শ্রীসুশীলকুমার দে

ফিরিনু যবে তোমার পথে, তখন ছিল অমা,
হে মোর মনোরমা,
আঁধার-কারা প্রহরহারা রাতি,
অশিব হানে অশনি, নাহি সাথী,
কলুষ-কূলে কুৎসা যত কালিমা করে জমা ;
—দুখের দিনে করে নি কেহ ক্ষমা।

তুমি কি তবু করেছ ক্ষমা, লয়েছ বুকে টানি
কুণ্ঠা নাহি মানি ?—
পাপের খেদ তাপের ক্লেদ মাঝে
নূপুরে কেন ঘৃণার বীণা বাজে ?
ক্ষমা ত নহে, দিয়েছ বুঝি কৃপণ কৃপা আনি,
নিয়মমাঝে নিয়ত সাবধানী।

আঁধারে বসি শিহরি তবু করেছি অনুভব
আগামী গৌরব,—
বিজয়-রথে উদয়-পথে উষা
আসিবে কবে, হাসিবে অকলুষা,
হেরিব আধ-আড়াল হতে আলোর উৎসব,
নমিব মানি পরম পরাভব।

না-জানা আর জানার পারে রুচির তব রুচি
সহজ সুখে শুচি
স্ফটিকে-ঢাকা দীপ্তিসম দূরে
ঘোরায় শুধু শোভার লোভাতুরে ;
ছায়ার ছাঁদে মায়ার ফাঁদে দিবে কি তৃষা মুছি ?
যাবে না ব্যবধানের বাধা ঘুচি ?

আঁধার-কীট আলোর পীঠে লুটিবে কত দিন
তৃষায় দিশাহীন ?
আপন দাহে দহিয়া আপনারে
আলোটি রহে আপন কারাগারে ;
সঙ্গহীন সীমার মাঝে মহিমা অমলিন,—
তৃপ্তি কোথা দীপ্তি-লীলা-লীন ?

তাই কি তব আনত মুখ আঁধারে ঢল-ঢল,
নয়ন ছল-ছল ?
বুকের মালা চাপিয়া বুকে ধর',
অধরে নাহি আদর থর-থর,
চলিতে গিয়ে দ্বিধার ভরে থমকি থামি চল',
বলিতে গিয়ে কথাটি নাহি বল'।

সহসা গানে কেটেছে তাল, বেধেছে লয় তানে,
—চেয়েছ মুখপানে ;
করেছি আমি করেছি অপরাধ,
নহে ত তাহা তোমার অপবাদ ;
আমারি-গড়া আমার হানি তোমারে নাহি হানে,
পূর্ণ তুমি আপন সম্মানে।

যে-হাতে হার দিয়েছ গলে, সে-হাতে অকাতরে
আনিবে চিরতরে
শাসনমাঝে ভাষণহীন গ্লানি,
ত্রুটির মাঝে ভ্রূকুটি শুধু হানি ?—
তবুও মোর অশ্রু হেরি অশ্রু কেন ভরে
আঁখিটি তব, আঁখির অগোচরে ?

ঝড়ের ক্ষণ-মিলন বুঝি নিকটে আনি, ঠেলি
সুদূরে দেয় ফেলি ;
প্রাণের টানে বারেক ধরে যারে
আঘাতে তারে হারায় বারে-বারে ;
আঁধারে তট খুঁজিয়া মরে অশ্রু উদ্বেলি,
দুরাশা-ধায় অবোধ বাহু মেলি॥

কলঙ্কের অহঙ্কারে আসি নি আমি ফিরে,
এসেছি আঁখিনীরে ;
অধীর-ধারা নদীর মত বেগে
ভাঙন-সুখে তটের বুকে লেগে
আসি নি আমি শিথিল করি প্রাণের গ্রন্থিরে ;
—অশুচি কর হানি নি মন্দিরে।

আপনি তুমি আসিলে মোর প্রাণের স্পন্দনে
ব্যথার বন্ধনে ;
চোখের জ্বালা সারাটি নিশি জাগি
নিজের লাগি লয়েছ নিজে মাগি,
দীপ্ত ভাল লিপ্ত করি ধূলার চন্দনে
শবের দুখে শিবের ক্রন্দনে।

তুষার-ঘন শুভ্র শোভা গরিমা-গিরি-শিরে
তোমারে ছিল ঘিরে,
নামিলে লয়ে অশ্রুজলধারা
ধূলায় কেন আপন-মান-হারা ?
পথের শেষে পঙ্কমাঝে পল্বলের নীরে
মিশিয়া আজ কেমনে যাবে ফিরে ?

জলের তলে যা আছে থাক্, পঙ্ক যাবে সরি,—
উঠিবে মঞ্জরি
বর্ণ লভি আলোর অর্ণবে
দুখের দান সুখের বাস্তবে,
রজনী জাগি ব্যথার রসে মরমে মধু ভরি
হেমন্তের তুহিনে সন্তরি।

বৃষ্টিভেজা-ফুলের হার খোঁপাটি রহে বেড়ি,—
সাঁঝের মাঝে হেরি !
অনেক দিন অনেক ছিল ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি আজ সুধা ;
গন্ধ আসে অন্ধকারে স্বপ্নসম ঘেরি,
স্মৃতিটি যেন বিগত জনমেরি।

ভস্ম হতে জাগালে কেন উদাস-উৎপথে
মনের মন্মথে ?
দাহের দাগ এখনো বুকে আঁকা,
রূপের রাগ ভস্মভারে ঢাকা,—
নূতন রতি-বিলাপ রচি, আসিয়া জয়-রথে
আড়ালে তাই দাঁড়ালে বুঝি পথে ?

মমতাহীন বক্রগতি চক্র নাহি সরে
পাষাণ-পথ 'পরে ;
মনের মাঝে অনেক ছিল বাধা,
হয় নি তাই সহজ পথ-বাঁধা,
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে, গভীর দাগ পড়ে,
চরণ বাজে পথের কঙ্করে।

ধূসর তাই উষর পথে এসেছ ধূলা মাখি,
আঁখিতে আঁখি রাখি ;
ব্যথার কাছে ব্যথা যে রহে ঋণী,
কেমনে তারে এড়াবে, গরবিণী ?
সীমন্তের সিঁদুরটুকু কেমনে দিবে ঢাকি
প্রাণের মাঝে প্রাণের যাহা ফাঁকি ?

অস্তছায়াতটের মোরা যাত্রী দুই জনে,—
কুণ্ঠা কেন মনে ?
নিশীথমাঝে নিবিড় পরিচয়,—
ভয় কি তব যায় না করি জয় ?
নির্ঝর-পলাতকার ছলা, দ্বিধাটি ক্ষণে-ক্ষণে,—
মরুর তৃষা মরে না গুঞ্জনে !

আমার অভিষেকের ধারা তোমার আঁখিজলে,
ধরার ধূলাতলে ;
উঠেছে ফুটি চরণ-কোকনদ,
প্রীতির প্রেতভূমির সম্পদ ;
কপালে সুধাকরের টীকা,—গরল থাক্ গলে !
অনল নাহি সজল চোখে জ্বলে।

অস্তাচল পিছনে রাখি উদয়াচলে চলি
নূতন বলে বলী ;
রাত্রি আসে আঁধারে মুখ ঢাকি,
সিঁথিতে তবু সন্ধ্যাতারা আঁকি,
শিশিরে-ধোয়া বুকের কাছে রয়েছে চঞ্চলি
আঁধার-পুটে আলোর অঞ্জলি।

সুরভি সাঁঝে পূরবী রচে পরম প্রীতি প্রাণে
পথের শেষ গানে,
মরম যাহা পারে না পাসরিতে,
চরম যাহা ধরে না বাঁশরীতে ;
নিশীথে নমে নিভৃত-চিতে উদয়-উষা পানে,
আঁধারে ভরি অর্ঘ্য তার আনে।

মরু ও সঙ্ঘ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্য-এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে বালু ও বাতাসের খেলা। বিরামহীন অস্থির চঞ্চল খেলা। রাত্রি নাই, দিন নাই, সমগ্র মরুপ্রান্তর ব্যাপিয়া এই খেলা চলিতেছে।

খেলা বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর খেলা; অবোধ শিশুর খেলার মত প্রাণের প্রতি মমতাহীন ক্রূর খেলা। ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট ক্ষুদ্র নিয়মের এখানে মূল্য নাই; জীবনের কোনও মূল্য নাই। দয়া করুণা এখানে আপন শক্তিহীন ক্ষুদ্রতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কোনও বিধি-বিধান নাই। কখনও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বায়ু ও বালুর দুর্লক্ষ্য ষড়যন্ত্রে একটি তৃণশ্যামল নির্ঝর-নিষিক্ত ওয়েসিস ধীরে ধীরে মরুভূমির জঠরস্থ হইতেছে; আবার কখনও একটি দিনের প্রচণ্ড বালু-ঝটিকায় তেমনই শ্যামল লোকালয়পূর্ণ ওয়েসিস বালুস্তূপের গর্ভে সমাহিত হইতেছে। দূরে বহু দূরে হয়ত আর একটি নূতন ওয়েসিসের সূচনা হইতেছে। এমনিই অর্থহীন প্রয়োজনহীন ধ্বংস ও সৃজনের লীলা নিরন্তর চলিতেছে।

এই মরু-সমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি হরিদ্বর্ণ দ্বীপ—একটি ওয়েসিস। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তৃষ্ণাদীর্ণ ধূসর বালুপ্রান্তরের উপর এক বিন্দু নিবিড় শ্যামলতা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কাছে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শতহস্তব্যাসবিশিষ্ট একটি শষ্পাঙ্কিত স্থান কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষের ধ্বজা উড়াইয়া এখনও মরুভূমির নির্দ্দয় অবরোধ প্রত্যাহত করিতেছে। খর্জ্জুর-ছায়ার অন্তরাল দিয়া একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সঙ্ঘারামের অর্দ্ধপ্রোথিত ঊর্দ্ধাঙ্গ দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাকৃতিক নির্ম্মমতার কেন্দ্রস্থলে মহাকারুণিক বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘারাম মাথা জাগাইয়া আছে।

এক দিন এই স্থান জনকোলাহলমুখরিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল—দশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নগর হাট উদ্যান চৈত্য বিরাজিত ছিল। শত ক্রোশ দূর হইতে সার্থবাহ বণিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া মরুবালুকার উপর কঙ্কাল-চিহ্নিত পথ ধরিয়া এখানে উপস্থিত হইত। ক্ষুদ্র রাজ্যে এক জন ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তাও ছিল। কিন্তু এখন আর কিছু নাই। এমন কি, যে কঙ্কালশ্রেণী মরুপথে বহির্জ্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত, তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বালু ও বাতাস এই স্থানটিকে লইয়া নৃশংস খেয়ালের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। মরু এবং ওয়েসিসের সীমান্ত চিহ্নিত করিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষের সারি চক্রাকার প্রাকারের মত ওয়েসিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; এই সীমান্তভূমির উপর সূক্ষ্ম বালুকার পলি পড়িতে লাগিল। কেহ লক্ষ্য করিল না। দুই-তিন বৎসর কাটিল। সহসা এক দিন একটি উৎসের জলধারা শুকাইয়া গেল। লক্ষ্য করিলেও কেহ গ্রাহ্য করিল না। আরও অনেক উৎস আছে।

দশ বৎসর কাটিল। তার পর এক দিন সকলে সন্ত্রাসে হৃদয়ঙ্গম করিল—ওয়েসিস সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; অলক্ষিতে মরুভূমি অনেকখানি সীমানা গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

অতঃপর ফাঁসির দড়ি যে-ভাবে ধীরে ধীরে কণ্ঠ চাপিয়া প্রাণবায়ু রোধ করিয়া ধরে, তেমনই ভাবে মরুভূমি ওয়েসিসকে চারি দিক হইতে চাপিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া আনিতে লাগিল। প্রথমে আহার্য্য পানীয়ের অপ্রতুলতা, তার পর বসবাসের স্থানাভাব হইল। যাহারা পারিল পলায়ন করিল; উষ্ট্র-গর্দ্দভপৃষ্ঠে যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া অন্য বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা শঙ্কাকুল চিত্তে মরুর পানে তাকাইয়া অনিবার্য্য পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জনপদের জনসংখ্যা অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়া গেল।

মরুভূমির ত্বরা নাই, ব্যস্ততা নাই। নাগ-কবলিত ভেকের ন্যায় ওয়েসিস অল্পে অল্পে মরুর জঠরস্থ হইতে লাগিল।

এক পুরুষ কাটিয়া গেল। যাহারা যুবক ছিল তাহারা এই অনির্ব্বাণ আতঙ্ক বুকে লইয়া বৃদ্ধ হইল। কিন্তু সৃষ্টিরও বিরতি নাই; ধ্বংসের করাল ছায়ার তলে নবতর সৃষ্টি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এক দিন গ্রীষ্মের তাম্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে দিগন্তরাল হইতে কৃষ্ণবর্ণ আঁধি উঠিয়া আসিল। মরুভূমির এই আঁধির

সহিত তুলনা করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কিছু নাই। মহাপ্রলয়ের দিনে শুষ্ক জীর্ণ পৃথিবী বোধ হয় এমনই উন্মত্ত বালু-ঝটিকার আবর্ত্তে চূর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

দুই দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া প্রখর সূর্য্য দেখা দিল। বিজয়িনী প্রকৃতির সগর্ব্ব হাসির আলোয় ওয়েসিস উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল ওয়েসিস আর নাই, পর্ব্বত-প্রমাণ বালুকার তলায় চাপা পড়িয়াছে; কেবল উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামের অর্দ্ধনিমজ্জিত চূড়া ঘিরিয়া কয়েকটি খর্জ্জুর বৃক্ষ শোকার্ত্ত ভাবে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থল পাহারা দিতেছে। মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।

দ্বিপ্রহরে সঙ্ঘের উপরিতলের একটি বালু-সমাহিত গবাক্ষ হইতে অতি কষ্টে বালুকা সরাইয়া বিবরবাসী সরীসৃপের ন্যায় দুইটি প্রাণী বাহির হইল। মানুষই বটে; এক জন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি বলিষ্ঠদেহ যুবা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুবা বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তার পরে উভয়ে বহুক্ষণ গবাক্ষের বাহিরে বালুর উপর পড়িয়া দীর্ঘ শিহরিত প্রশ্বাসে মুক্ত আকাশের প্রাণদায়ী বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণা-বিদীর্ণ অধরোষ্ঠে কালিমালিপ্ত মুখে মানুষী ভাব ফিরিয়া আসিল। চিনিবার মত কেহ থাকিলে চিনিতে পারিত, এক জন সঙ্ঘস্থবির পিথুমিত্ত, দ্বিতীয় ভিক্ষু উচণ্ড। বালু-ঝটিকা আরম্ভ হইবার সময় সঙ্ঘের অন্যান্য সকলেই ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়াছিল, তাহারা কেহ বাঁচে নাই; কেবল এই দুই জন সঙ্ঘের দ্বিতলস্থ পরিবেণে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।

বালুকার স্তূপ ঢালু হইয়া সঙ্ঘের গাত্র হইতে নামিয়া গিয়াছে। উভয়ের বায়ু-ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাঁহারা টলিতে টলিতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বাঁচিতে হইলে জল চাই, সঙ্ঘের পাদমূলে খর্জ্জুরকুঞ্জের মধ্যে একটি প্রস্তরগুহা হইতে প্রস্রবণ নির্গত হইত, সেখানে দুই জনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রস্রবণের মুখ বুজিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বালুবদ্ধ উৎসের স্বতঃপ্রবাহ রোধ করিতে পারে নাই; গুহামুখের বালুকা সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, সেই সিক্ত সিকতার উপর—দুইটি মানবশিশু। প্রথমটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মেরু-সংলগ্ন জঠর ধীরে ধীরে উঠিতেছে পড়িতেছে। দ্বিতীয়টি অনুমান দেড় বৎসরের একটি বালিকা; শুভ্র নগ্নদেহে একাকিনী খেলা করিতেছে, খর্জ্জুর বৃক্ষের চ্যুত পক্ব ফল কুড়াইয়া খাইতেছে, আর নীল নেত্র মেলিয়া আপন মনে কলস্বরে হাসিতেছে। মৃত বা জীবিত আর কেহ কোথাও নাই। প্রকৃতির দুরবগাহ রহস্য প্রভঞ্জনের ধ্বংস-তাণ্ডবের মধ্যে এই দুইটি সুকুমার জীবন-কণিকা কি করিয়া রক্ষা পাইল?

দুই ভিক্ষু প্রথমে বালু খনন করিয়া জল বাহির করিলেন। এক দণ্ড কাল অঙ্গুলি সাহায্যে গুহামুখ খনন করিবার পর উৎসের পথ মুক্ত হইল—উভয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে—খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়া পূর্ব্বদিগন্তের দিকে দীর্ঘতর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ অনাদি রহস্যের ইঙ্গিত জানাইতেছে। সঙ্ঘ-স্থবির পিথুমিত্ত একবার এই সমাধিস্তূপের চারি দিকে চাহিলেন; ঊর্দ্ধে সঙ্ঘের বালু-মগ্ন শিখর, নিম্নে তরঙ্গায়িত বালুকারাশি দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর দুইটি ধারা গড়াইয়া পড়িল। শিশু দুটিকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন—'তথাগত'!

অতঃপর মরুভূমির একান্ত নির্জ্জনতার মাঝখানে, বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘ-ছায়ায় এই চারিটি মানবজীবনের ক্রিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। স্থবির পিথুমিত্ত বালকের নাম রাখিলেন নির্ব্বাণ। বালিকার নাম হইল—ইতি।

* * *

মাধবী পৌর্ণমাসীর প্রভাতে স্থবির পিথুমিত্ত সঙ্ঘের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছিলেন। সঙ্ঘের একমাত্র শ্রমণ, ভিক্ষু উচণ্ড তাঁহার সম্মুখে মেরু-যষ্টি ঋজু করিয়া স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। শ্রোতা কেবল তিনিই।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর উভয়ের দেহেই কাল-করাঙ্ক চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। সঙ্ঘ-স্থবিরের বয়স এখন ন্যূনকল্পে সত্তর বৎসর। মুণ্ডিত মস্তকে মেদহীন চর্ম্মের আবরণতলে করোটির আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া শুষ্ক দাড়িম্বফলের ন্যায় মনে হয়। চক্ষুতারকা বর্ণহীন, দৃষ্টি নিষ্প্রভ—যেন মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসে চোখের জ্যোতি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তবু, এই জরা-বিশীর্ণ মূর্ত্তির চারি পাশে জীবনব্যাপী সচ্চিন্তা ও শুচিতার মাধুর্য্য একটি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শ্রী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ত্রিতাপ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ভিক্ষু উচণ্ডেরও যৌবন আর নাই; বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কিন্তু দেহ এখনও সবল ও দৃঢ়। সমান্তরালরেখা-চিহ্নিত ললাটতটে ঘন রোমশ ভ্রূ দুই-একটি পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি কঠোর ও বৈরাগ্যব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও তিনি পরাভব স্বীকার

করেন নাই ; বিদ্রোহীর সদা-জাগ্রত যুযুৎসা তাঁহার ছিন্ন গলিত চীবর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে।

পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ হইল। নিদান হইতে অধিকরণ শমথ পর্য্যন্ত বিবৃতি করিয়া পরিশেষে স্থবির বলিলেন—'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার নিকট পারাজিক সংঘাদিশেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম আবৃত্তি করিলাম। শেষবার প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন, আর যদি পাপ না-করিয়া থাকেন, নীরব থাকুন।'

দীর্ঘ পাতিমোক্ষ পাঠ শুনিতে শুনিতে ভিক্ষু উচণ্ড বোধ করি আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা বিষয়ান্তরে তাঁহার মন সংক্রামিত হইয়াছিল ; স্থবিরের শেষ জিজ্ঞাসা কর্ণে যাইতেই তিনি চকিত হইয়া একবার নিজের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ললাটের ভ্রূকুটি যেন ঈষৎ গভীরতর হইল। ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

স্থবির তখন কহিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনি পরিশুদ্ধ আছেন।' মনে হইল এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইল।

দিবা তখনও প্রথম প্রহর অতীত হয় নাই। অলিন্দপথে তির্য্যক সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া কক্ষের ম্লান ছায়াচ্ছন্নতা দূর করিয়াছে। উভয়ে এই তরুণ রবিকর অনুসরণ করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণাভ সিকতার পট-ভূমিকায় কয়েকটি আন্দোলিত খর্জ্জুরশীর্ষ চোখে পড়িল।

উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন।

সহসা উচণ্ড কহিলেন, 'থের, একটি কথা আপনাকে বলিবার অভিলাষ করিয়াছি। নির্ব্বাণকে উপসম্পদা দান করা কর্ত্তব্য ; তাহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।'

স্থবির উচণ্ডের মুখের পানে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্ব্বাণের যথার্থ বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।'

উচণ্ডের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল, তিনি কহিলেন, 'এস্থলে অনুমানই যথেষ্ট।'

স্থবির ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'নির্ব্বাণ কি উপসম্পদা লইতে ইচ্ছুক ?'

উচণ্ড কহিলেন, 'অবশ্য ইচ্ছুক। সঙ্ঘের উপাসক-রূপে সে এত কাল আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘেই সে পালিত ও বর্দ্ধিত, সঙ্ঘ ভিন্ন তাহার স্থান কোথায়!'

স্থবির আবার রবিকরোজ্জ্বল বহিঃপ্রকৃতির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' আমার মনে হইল একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

উচণ্ড তীক্ষ্ণ চক্ষে স্থবিরের পানে চাহিলেন ; একবার যেন কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাক্ সংযত করিয়া বলিলেন, 'উত্তম। তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিতেছি।' বলিয়া তিনি সঙ্ঘের বাহিরে চলিলেন।

গত পঞ্চদশ বৎসরে বিহারের বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই ; বালু-ঝটিকার পর যেমন অর্দ্ধপ্রোথিত ছিল তেমনই আছে। যে বিরাট বালুস্তূপ তাহাকে আবৃত করিয়া ছিল তাহা হইতে মুক্ত করা দুই জন মানুষের সাধ্য নয়। উপরিতলের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ কোনক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতেই ভিক্ষুদ্বয় শিশু দুইটিকে লইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন ; সঙ্ঘের নিম্নতল চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সঙ্ঘ হইতে অবতরণ করিয়া উচণ্ড খর্জ্জুরকুঞ্জের দিকে চলিলেন।

খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় গুহানিঃসৃত প্রস্রবণের মন্দ স্রোত স্বচ্ছ ধারায় বহিয়া গিয়াছে। কাকচক্ষু জল, মাত্র বিতস্তি-প্রমাণ গভীর, নিম্নে বালুকার আকুঞ্চিত স্তর দেখা যাইতেছে।

গুহামুখের সন্নিকটে নির্ব্বাণ অধোমুখে শয়ান হইয়া মৃদু-প্রবাহিত জলধারার প্রতি চাহিয়া ছিল, দুই বাহুর উপর চিবুক ন্যস্ত করিয়া অন্যমনে কি জানি চিন্তা করিতেছিল। খর্জ্জুরশাখার রন্ধ্রচ্যুত এক ঝলক রৌদ্র তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহার স্বর্ণাভ দেহবর্ণকে মার্জ্জিত ধাতু-ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ঋজু নাতি-মাংসল দেহে কেবল একটি শুভ্র বহির্বাস, কটি হইতে জানু পর্য্যন্ত আবৃত ; উন্মুক্ত স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। মস্তকের কৃষ্ণ কেশ সর্পশিশুর মত মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে। যৌবনের নবারুণ উষালোকে নির্ব্বাণের দেহ-কান্তি দেখিয়া গ্রীক ভাস্করের রচিত ভাস্কর-দেবতার মূর্ত্তি মনে পড়ে। কিন্তু তাহার মুখে ভাস্কর-দেবতার বিজয়দৃপ্ত গর্ব্বের ব্যঞ্জনা নাই ; নবযৌবনের স্বাভাবিক পৌরুষের সহিত চিৎ-শক্তির এক অপরূপ করুণ মাধুর্য্য মিশিয়াছিল, গ্রীক ভাস্কর এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না।

প্রস্রবণের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাণ চিন্তা করিতেছিল। কি গহন দুরবগাহ তাহার চিন্তা সে নিজেই জানে না। নিষ্পলক দৃষ্টি অগভীর জলের স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে, আরও নিম্নে, পৃথিবীর কেন্দ্রগুহায় যেখানে কেবল নিরাসক্ত প্রাণধর্ম্মের ক্রিয়া চলিতেছে—বোধ করি সেইখানে উপনীত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি তাহার মন ছিল না।

কিন্তু তথাপি, এই অন্তর্মুখী তন্ময়তার মধ্যেও তাহার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অলক্ষিতে সতর্ক উৎকর্ণ হইয়া ছিল।

সহসা তাহার বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস নির্গত হইল।

কিছু দিন যাবৎ নির্ব্বাণের মনে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শিশুকাল হইতে একসঙ্গে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মনে পরস্পর সম্বন্ধে প্রায় কোনও মোহ থাকে না; নির্ব্বাণের মনেও ইতি সম্বন্ধে মোহ ছিল না। বরং ইতি স্ত্রী-সুলভ নমনীয়তায় নির্ব্বাণকে পুরুষত্ব ও বয়োজ্যেষ্ঠতার মর্য্যাদা দিয়া সসম্ভ্রমে তাহার পিছন পিছন ঘুরিয়াছে। দুজনে কলহ করিয়াছে, আবার গলা জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইতির দেহে যৌবনের মুকুলোদ্গম হইয়াছে, আয়ত নীল চোখে সৃষ্টির অনাদি কুহক ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্ব্বাণের মনে ভাবান্তর আসে নাই। ইতি যে নারী এ অনুভূতি তাহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়াছে। তার পর সহসা এক দিন নির্ব্বাণের মনের কৌমার্য্য পরিণত ফলের প্রান্ত হইতে শীর্ণ পুষ্পদলের মত খসিয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নির্ব্বাণ একাকী খর্জ্জুরকুঞ্জে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে একটা ভ্রমরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভ্রমরটা প্রতি বৎসর এই সময় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহু দূরান্তর হইতে বোধ হয় বাতাসের মুখে বার্ত্তা পায়—মরুর খর্জ্জুরশাখায় ফুল ধরিয়াছে। কৃষ্ণকায় ভ্রমর, পাখায় রামধনুর বর্ণ; সে গভীর গুঞ্জন করিয়া এক পুষ্প-মঞ্জরী হইতে অন্য পুষ্পমঞ্জরীতে উড়িয়া যাইতেছে, নিঃশব্দে পুষ্পপাত্রে সঞ্চিত রস পান করিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। নির্ব্বাণ উজ্জ্বল কৌতূহলী চক্ষে মুগ্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সহসা ইতি পিছন হইতে আসিয়া দুই বাহু দ্বারা নির্ব্বাণের গলা জড়াইয়া ধরিল; উত্তেজনা-সংহত স্বরে তাহার কর্ণে বলিল, 'নির্ব্বাণ, একটা জিনিষ দেখিবে?'

ইতি স্বচ্ছন্দচারিণী, মরুভূমির যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়; কোথায় বালুর তলে শাখাপত্রহীন মূল বা কন্দ লুক্কায়িত আছে, আহরণ করিয়া আনে। মরুর নিষ্প্রাণ বক্ষে যাহা কাহারও চক্ষে পড়ে না, তাহা ইতির চক্ষে পড়ে।

নির্ব্বাণ ভ্রমরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'কি?'

ইতি দুই হস্তে সবলে তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইল, বলিল, 'এস, দেখিবে.এস।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া শবরীর মত নিঃশব্দ পদে লইয়া চলিল। নির্ব্বাণ দেখিল, আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহার দুই চক্ষু নৃত্য করিতেছে।

ওয়েসিসের সীমান্ত পার হইয়া তাহারা মরুভূমির উপর বহুদূর গমন করিল। মধ্যাকাশে জ্বলন্ত সূর্য্য, চারি দিকে কোটি কোটি বালুকণায় তাহার তেজ প্রতিফলিত হইতেছে। দুজনে নীরবে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ইতি নির্ব্বাণের মুখের পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া চুপি চুপি দু-একটি কথা বলিতেছে—যেন জোরে কথা বলিলেই তাহার রহস্যময় দ্রষ্টব্য বস্তু মায়ামৃগের ন্যায় মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে।

প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক পথ চলিবার পর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বালিয়াড়ি পড়িল। সেই বালিয়াড়ির কূর্ম্মপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতি দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ দেখ।'

অঙ্গুলির নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণ সহসা বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। দূরে দিগন্তরেখা যেখানে আকাশে মিশিয়াছে সেইখানে একটি হরিদ্বর্ণ উদ্যান,—শ্যামল তরুশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, তৃণপূর্ণ প্রান্তরে মেষ-ছাগ চরিতেছে; এমন কি, আকাশে নানা আকৃতির পাখী উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ সঞ্চরমান বিন্দুর মত দেখা যাইতেছে। একটি নদী এই নয়নাভিরাম শ্যাম-লতার বুক চিরিয়া খরধার তরবারির মত পড়িয়া আছে।

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতির পর প্রতিক্রিয়া আসিল, নির্ব্বাণ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। ইতি অপেক্ষা তাহার জ্ঞান বেশী।

ইতি কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে নির্ব্বাণের গলা বাহু বেষ্টিত করিয়া প্রায় ঝুলিয়া পড়িল, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দেখিতেছ? নির্ব্বাণ, দেখিতেছ? কি সুন্দর! চল, আমরা দুই জনে ঐখানে চলিয়া যাই। আর কেহ থাকিবে না, শুধু তুমি আর আমি।—চল চল নির্ব্বাণ!'

স্মিতমুখে নির্ব্বাণ তাহার পানে চাহিল। ইতির পলাশ-রক্ত অধর নির্ব্বাণের এত নিকটে আসিয়াছিল, যে, কিছু না বুঝিয়াই সে নিজ অধর দিয়া তাহা স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়ুর সীমান্ত পর্য্যন্ত একটা অনির্ব্বচনীয় তীক্ষ্ণ অনুভূতি অসহ্য হর্ষ-বেদনায় তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম চুম্বনের স্পর্শে ইতি দংশনোদ্যতা সর্পিণীর মত গ্রীবা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া নির্ব্বাণের মুখের পানে চাহিল। মনে হইল তাহার নীল নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া সে দুরন্ত ঝড়ের মত আবার নির্ব্বাণের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একবার, দুইবার, অগণিত বার নির্ব্বাণের অধর

চুম্বন করিতে করিতে অবশেষে যেন নিজের দুর্জ্জয় আবেগের নিকট পরাজিত হইয়া শিথিল দেহে অবনত মুখে বালুর উপর বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত ঝড়ের অবসন্ন আক্ষেপের মত তাহার বক্ষ হইতে এক প্রকার অবরুদ্ধ আর্ত্তশ্বাস বাহির হইতে লাগিল।

নির্ব্বাণও জানু মুড়িয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় আবির্ভাবের সম্মুখে উভয়ে যেন বিমূঢ় হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ দুই জনে এই ভাবে অগ্নিবর্ষী আকাশের তলে বসিয়া রহিল। তার পর শুষ্ক তপ্ত চক্ষু তুলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। শ্যামল উপবন তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

অস্ফুট স্বরে নির্ব্বাণ বলিল, 'মরীচিকা।'

সেই দিন হইতে নির্ব্বাণের সহিত ইতির সহজ সরল সখ্যের অবসান হইল; নির্ব্বাণ যেন ইতিকে ভয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে; তাহার সহিত কথা বলিতে রসনা জড়িত হয়, মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অথচ অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে ইতির দিকে টানিতে থাকে। ইতির তপ্ত কোমল অধর স্পর্শের স্মৃতি মাদক সুরার মত তাহার চিত্তকে বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে। সে এই সর্ব্বগ্রাসী মোহের আক্রমণ হইতে দূরে নির্জ্জনে পলায়ন করিতে চায়।

ইতির মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। এত দিন সে নির্ব্বাণের খেলার সাথী ছিল, অনুজা সখী ছিল, আজ বিপুল নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে নির্ব্বাণকেও যেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবে পাইয়াছে। নির্ব্বাণ তাহারই, আর কাহারও নয়,—নিজ অধর, দেহ, নারীত্বের নিষ্ক্রয়ে সে নির্ব্বাণকে আপন করিয়া লইয়াছে। এই চূড়ান্ত দাবির কাছে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দাবি মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।

তাহার আচরণে, এমন কি চাহনিতে ও দেহভঙ্গিমায় এই অবিসম্বাদী অধিকারের গর্ব্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নারী ও পুরুষের প্রভেদ বোধ করি এইখানে।

ইহাদের অন্তরের এই বিপ্লব অন্য দুই জনের কাছেও গোপন রহিল না। মনুষ্য-সমাজে যাহা লজ্জা নামে প্রচলিত তাহা ইতি কোনও দিন শিখে নাই, তাই তাহার মনের কথাটি কুণ্ঠাহীন অলজ্জিত আনন্দে প্রকাশ পাইল। পিথুমিত্ত ও উচণ্ড সব দেখিলেন, সব বুঝিলেন। স্থবিরের বর্ণহীন চক্ষু করুণায় নিষিক্ত হইয়া উঠিল; এত দিন যাহা আশঙ্কিত সম্ভাবনা ছিল, আজ তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। হায় তথাগত, সঙ্ঘের বৈরাগ্যস্তম্ভের মাঝখানে এ কোন্ ভঙ্গুর সুকুমার পুষ্প ফুটাইয়া তুলিলে! ভিক্ষু উচণ্ডের কঠোর ললাটে কিন্তু আঁধির অন্ধকার পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি অন্তরমধ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—'মার প্রবেশ করিয়াছে! সঙ্ঘে মার প্রবেশ করিয়াছে!'

প্রথম দিন হইতেই ক্ষুদ্র মানবিকা ইতির প্রতি ভিক্ষু উচণ্ডের মনে একটা বিমুখতা জন্মিয়াছিল। ভিক্ষুর মনে ভেদজ্ঞান থাকিতে নাই; কিন্তু ভিক্ষু উচণ্ড নির্ব্বাণকে কাছে টানিয়া লইলেন, ইতিকে দূরে দূরে রাখিলেন। নির্ব্বাণ ধর্ম্ম-বিনয়ে শিক্ষা পাইতে লাগিল, ইতি মরুবিহারিণী প্রকৃতি-কন্যা হইয়া রহিল। ইতির দেহে যখন প্রথম যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সর্ব্বাগ্রে উচণ্ডই তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হইল; ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্ত্তি ধরিয়া নিরন্তর তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। জর্জ্জরিত উচণ্ডের মস্তিষ্কে সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল—মার প্রবেশ করিয়াছে! মার প্রবেশ করিয়াছে!

নির্ব্বাণের প্রতিও তাঁহার আচরণ কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ইতি সর্ব্বদা নির্ব্বাণের সঙ্গে ঘুরিতেছে, এক দণ্ড উভয়ে পৃথক থাকে না। তাঁহার দেহে অগ্নিশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। মার প্রবেশ করিয়াছে—ইতি নির্ব্বাণকে প্রলুব্ধ করিবে! তার পর? বুদ্ধের সঙ্ঘ ব্যভিচারের আগার হইয়া উঠিবে? কখনও না—কখনও না! উচণ্ড নির্ব্বাণকে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইতে লাগিল তিনি নির্ব্বাণকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষু-জীবনের পরুষ নির্ম্মমতা নূতন করিয়া সঙ্ঘে প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

নিগৃহীত নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা যখন বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার স্বরূপ সকলে চিনিতে পারে না। সঙ্ঘে সত্যই মার প্রবেশ করিয়াছিল—কিন্তু কাহার দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ভিক্ষু উচণ্ড জানিতে পারেন নাই।

মরুভূমির স্বল্পায়ু বসন্ত এই ভাবে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে নির্ব্বাণ ও ইতির মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। তখন এক দিন মাধব পূর্ণিমার প্রভাতে উচণ্ড নির্ব্বাণকে উপসম্পদা দান করিয়া পরিপূর্ণ রূপে সঙ্ঘের নিয়মাধীন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

* * *

প্রস্রবণের মুকুরোজ্জ্বল জলে একটি চঞ্চল ছায়া পড়িল। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া নির্ব্বাণ উঠিয়া বসিল; ইতি আসিতেছে।

ইতির দেহে একটি মাত্র শ্বেতবস্ত্র। পঞ্চ হস্ত পরিমিত একটি দুকূল-পট্ট কটি ও নিতম্ব বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বক্ষ

আবরণ পূর্ব্বক গ্রীবার পশ্চাতে গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে; স্কন্ধ ও বাহুমূল উন্মুক্ত। তাহার রুক্ষ কেশভার সুকৃষ্ণ নহে, রৌদ্ররশ্মি পড়িয়া অঙ্গারাবৃত অগ্নিশিখার ন্যায় আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে।

লঘুপদে সঙ্কীর্ণ পয়োধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইতি নির্ব্বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পশ্চাতে রাখিয়া বলিল, 'চক্ষু মুদিত কর।'

নির্ব্বাণ চক্ষু মুদিত করিল।

'হাঁ কর।'

নির্ব্বাণ মুদিত চক্ষে মুখ ব্যাদান করিল।

ইতি তাহার মুখে মুষ্টিধৃত গুবাক ফলের মত একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য পুরিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'এখন বল দেখি, কি খাইতেছ?'

নির্ব্বাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মেলিয়া বলিল, 'শর্করা-কন্দ। কোথায় পাইলে?'

ইতি তখন নির্ব্বাণের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কোথায় শর্করা-কন্দ পাইল তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। বালুর নিম্নে মাটি আছে, নানা জাতীয় বিচিত্র বীজকণা সেখানে গিয়া সঞ্চিত হয়। তার পর এক দিন প্রকৃতির মন্ত্র-কুহকে অঙ্কুরিত হইয়া আলোকের সন্ধানে ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করে। কেহ বালু ভেদ করিয়া উঠিতে পারে, কেহ পারে না। বালুকার গর্ভে তাহাদের ফল-কন্দ বর্দ্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। কিন্তু ইতির চক্ষে আবরণ পড়ে নাই। সে দেখিতে পায়। বালু খুঁড়িয়া এই সব রস-পরিপুষ্ট স্বাদু উদ্ভিজ্জ হরণ করিয়া আনে। খর্জ্জুর ভিন্ন যাহাদের অন্য খাদ্য নাই, তাহাদের মুখে ইহা অমৃততুল্য বোধ হয়।

সানন্দে চর্ব্বণ করিতে করিতে নির্ব্বাণ বলিল, 'তুমি খাও নাই?'

ইতির চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া আসিল, সে অধরোষ্ঠের একটি বিমর্ষ ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'আর কোথায় পাইব? একটিমাত্র পাইয়াছিলাম।'

নির্ব্বাণের চর্ব্বণক্রিয়া বন্ধ হইল; সে ইতির প্রতি বিস্মিত চক্ষু ফিরাইল। ইতিও চক্ষু পাতিয়া পরম তৃপ্তি-ভরে নির্ব্বাণের বিস্ময়বিমূঢ় মুখ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া লইল, তার পর কৌতুকবিগলিত কলহাস্য করিয়া তাহার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

নির্ব্বাণ এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত ছিল, এখন বিদ্যুতাহতের মত চমকিয়া শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। ঠিক এই সময় পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিল—'নির্ব্বাণ!'

প্রথমে নির্ব্বাণের মনে হইল, এই ধ্বনি যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যেই মন্দ্রিত হইয়াছে। তার পর সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মূর্ত্তিমান তিরস্কারের ন্যায় ভিক্ষু উচণ্ড বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

সভয়ে অপরাধ-কুণ্ঠিত দেহে নির্ব্বাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। উচণ্ড অঙ্গারগর্ভ চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া গভীর কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'ধিক্!'

নির্ব্বাণের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উচণ্ড সঙ্ঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও। স্থবির তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।'

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রস্থান করিল।

ইতি এতক্ষণ নির্ব্বাক বিভিন্ন ওষ্ঠাধরে ভূমির উপর বসিয়া ছিল, এখন বিস্ফারিত নেত্র উচণ্ডের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ব্বাণ সঙ্ঘমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে উচণ্ড প্রজ্জ্বলিত চক্ষু ইতির দিকে ফিরাইলেন, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্কন্ধ আবৃত কর।'

ইতি চকিতে নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, তার পর আবার উচণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠলগ্ন বস্ত্র স্কন্ধের উপর প্রসারিত করিয়া দিল।

ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'সঙ্ঘের অলিন্দ পরিষ্কৃত করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'জল সঞ্চয় করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'ফল সংগ্রহ করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

উচণ্ড অধর দংশন করিলেন। ইতিকে শাসনাধীনে আনা অসম্ভব—সে নারী, ভিক্ষুসঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান নাই। উচণ্ড তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত সঙ্ঘের অভিমুখে চলিলেন। ইতি দুই চক্ষে দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি লইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নির্ব্বাণ স্থবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, 'বন্দে।'

স্থবির তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে আশীর্ব্বচন করিলেন—'আরোগ্য।'

নির্ব্বাণের অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত বোধ হয় স্থবিরের নিকট তীব্র ভর্ৎসনা প্রত্যাশা করিতেছিল, তাই তাঁহার স্নেহসিক্ত

বচনে তাহার হৃদয় সহসা দ্রবীভূত হইয়া গেল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে স্থবিরের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

স্থবির তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্ব্বাণ, তোমার উপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম তুমি উপসম্পদাগ্রহণে অভিলাষী। ইহা সত্য?'

নির্ব্বাণ যেন কূল পাইল, অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমাকে উপসম্পদা দান করিয়া সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।'

স্থবির কিছুকাল নীরব রহিলেন; তার পর বলিলেন, 'নির্ব্বাণ, তুমি সদ্ধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছ; সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে নশ্বর আসক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, ইহা নিশ্চয় তোমার অপরিজ্ঞাত নহে। সঙ্ঘের বিধি-বিধান অতি কঠোর, তুমি পালন করিতে পারিবে?'

এই সময় উচণ্ড প্রবেশ করিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; নির্ব্বাণ অবনত মস্তকে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, পারিব।'

'না পারিলে পাতিমোক্ষ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে—বিনয়পাঠে অবশ্য তাহা অবগত আছ?'

'আছি, ভদন্ত।'

স্থবির তখন করুণ বচনে বলিলেন, 'বৎস, ব্যাধতাড়িত পশু গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানব নিষ্কৃতির কামনায় ধর্ম্মের অনুরাগী হয়। বুদ্ধের সঙ্ঘ সেরূপ স্থান নহে। যাহার অন্তরে সংসারে বৈরাগ্য এবং নির্ব্বাণ-তৃষ্ণা জন্মিয়াছে সে-ই সঙ্ঘের অধিকারী। তুমি এই সকল বিচার করিয়া উত্তর দাও।'

গদ্গদশ্রু নির্ব্বাণ যুক্তকরে বলিল, 'আমি সঙ্ঘের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি—সংঘং শরণং গচ্ছামি। আমাকে উপসম্পদা দান করুন।'

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থবির বলিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

জলদগম্ভীর স্বরে উচণ্ড প্রতিধ্বনি করিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

অতঃপর বিধিমত প্রশ্নোত্তরদানপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও ত্রি-চীবর ধারণ করিয়া কেশ মুণ্ডিত করিয়া নির্ব্বাণ ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সংসারে আর তাহার অধিকার রহিল না।

ভিক্ষু উচণ্ডই নির্ব্বাণের আচার্য্য রহিলেন; নাম-পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইল না। ছায়া পরিমাপ ইত্যাদি বিধি সমাপ্ত হইবার পর উচণ্ড বিজয়োদ্ধত কণ্ঠে কহিলেন, 'বুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, মার পরাভূত হইয়াছে। ভিক্ষু, নিজ পরিবেণে গমন কর। অদ্য হইতে নারীর মুখদর্শন তোমার নিষিদ্ধ।'

নতনেত্রে নির্ব্বাণ নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিল।

স্থবির নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন কর, অজ্ঞানমসী দূর কর, সম্যক্ দৃষ্টি দান কর—'

তিন দিন নির্ব্বাণ নিজ পরিবেণ হইতে বাহির হইল না। আর ইতি? দেহবিচ্ছিন্ন ছায়ার মত সে সঙ্ঘ-ভূমির উপর দিবারাত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সঙ্ঘের প্রত্যেক অধিবাসীর পরিবেণ স্বতন্ত্র। সঙ্ঘারামের উপরিতলে যে-কয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল তাহার একটিতে ইতি রাত্রিযাপন করিত; অলিন্দের অন্য প্রান্তে তিনটি বিভিন্ন কক্ষে নির্ব্বাণ উচণ্ড ও স্থবির বাস করিতেন। স্থবিরের অনুমতি ব্যতীত একের প্রকোষ্ঠে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল

নির্ব্বাণের সহিত ইতির আর সাক্ষাৎ হয় না। ইতি সঙ্ঘের কাজ করে, আর নানা অছিলায় নির্ব্বাণের পরিবেণের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কখনও দেখে, নির্ব্বাণ পুঁথি সম্মুখে লইয়া নিমগ্নচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে; কখনও বা দেখিতে পায়, উচণ্ড তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। কদাচিৎ নির্ব্বাণ গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ইতির পদশব্দে তাহার চেতনা হয় না। ইতি নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যায়।

ভিক্ষু উচণ্ডের মন কিন্তু শান্ত হইতেছে না; কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ যতই কঠোর ভাবে নিজেকে নিগৃহীত করিয়া সঙ্ঘ-ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাঁহার অন্তরে সংশয় ও দ্বন্দ্ব ততই মাথা তুলিতেছে। নির্ব্বাণকে সঙ্ঘের শাসনে আবদ্ধ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না—ইতি ও নির্ব্বাণের মধ্যস্থিত আকর্ষণ-রজ্জু দূরত্বের ফলে দৃঢ়তর হইল মাত্র। কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ঈর্ষা ক্রমশঃ কণ্টক হইয়া উচণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল। আপন অজ্ঞাতে নির্ব্বাণকে তিনি নিবিড় ভাবে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক দিন মধ্যরাত্রে চন্দ্রের আলোক গবাক্ষপথে নির্ব্বাণের পরিবেণে প্রবেশ করিয়াছিল; অন্ধকার কক্ষে শুভ্র সূক্ষ্ম চীনাংশুকের মত এক খণ্ড জ্যোৎস্না যেন আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্ব্বাণের চোখে নিদ্রা নাই, সে ঐ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া ভূ-শয্যায় শয়ান ছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি; সঙ্ঘের কোথাও একটি শব্দ নাই। নির্ব্বাণ নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর ছায়ামূর্ত্তির মত অলিন্দ উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্ঘের বাহিরে উপস্থিত হইল।

খর্জ্জুরকুঞ্জতলে জ্যোৎস্না-তরলিত স্বল্পান্ধকার যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে। উর্দ্ধে খর্জ্জুরশাখা ক্বচিৎ তন্দ্রালস মর্ম্মরধ্বনি করিতেছে, নিম্নে প্রস্রবণের উৎসমুখে উদ্গত জলের মৃদু কলশব্দ। চারি দিকে অপার মরুভূমির উপর চন্দ্ররশ্মির শীতল প্রলেপ। নির্ব্বাণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। এই দৃশ্য তাহার চিরপরিচিত; কিন্তু আজ আর ইহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই—সে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

'নির্ব্বাণ!'

প্রস্রবণের কলধ্বনির মতই মৃদু কণ্ঠস্বর। চমকিয়া নির্ব্বাণ ফিরিয়া চাহিল। শুভ্র বালুকার উপর বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের ন্যায় ইতি তাহার পানে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার চরণ যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না; চন্দ্রকর-কুহেলির ভিতর দিয়া স্মিত-ক্ষুধিত মুখখানি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

'না—না—না—' দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া নির্ব্বাণ পলায়ন করিল। উর্দ্ধশ্বাসে নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অধোমুখে ভূতলে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় নির্ব্বাণের পদপাত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয় নাই; অন্য পরিবেণে আর এক জনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

পরদিন মধ্যরাত্রে আবার চন্দ্ররশ্মি নির্ব্বাণের গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া দুর্নিবার শক্তিতে বাহিরের পানে টানিতে লাগিল। নির্ব্বাণ অনেকক্ষণ নিজের সহিত যুদ্ধ করিল—কিন্তু পারিল না। মোহগ্রস্তের মত খর্জ্জুরছায়াতলে গিয়া দাঁড়াইল।

'নির্ব্বাণ!'

ইতি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর নির্ব্বাণ পলাইল না; সমস্ত দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'নির্ব্বাণ, আর তুমি আমার সহিত কথা কহিবে না?'

নির্ব্বাণ উত্তর দিল না; কে যেন তাহার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ইতি সশঙ্ক লঘু হস্তে তাহার বাহু স্পর্শ করিল।

'নির্ব্বাণ, আর তুমি আমার মুখ দেখিবে না?'

ইতির কণ্ঠস্বরে শক্তি নাই—ভাঙা ভাঙা অর্দ্ধোচ্চারিত উক্তি। নির্ব্বাণের স্নায়ু-কঠিন দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

'নির্ব্বাণ, একবার আমার পানে চাও'—ইতি চিবুক ধরিয়া নির্ব্বাণের মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

স্নায়ুপেশীর নিরুদ্ধ বন্ধন সহসা যেন ছিঁড়িয়া গেল; জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় নির্ব্বাণের উৎক্ষিপ্ত একটা বাহু ইতির মুখে গিয়া লাগিল। ইতি অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করিয়া অধরের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

নির্ব্বাণ ব্যাকুল চক্ষে একবার তাহার পানে চাহিল। তার পর—'না না—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—'

অন্ধের মত উন্মাদের মত নির্ব্বাণ সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এক জন অলক্ষিতে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার অশান্ত চিত্ত আশ্বস্ত না হইয়া আরও দুর্ব্বার ক্রোধে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মার পরাভূত হয় নাই। সঙ্ঘ অশুচি হইয়াছে। এ-পাপ দূর করিতে হইবে—নচেৎ বুদ্ধের ক্রোধানলে সঙ্ঘ ভস্মীভূত হইবে।

* * *

কৃষ্ণাপঞ্চমীর ক্ষীয়মান চন্দ্র প্রায় মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

সঙ্ঘ নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও শব্দ নাই; বুঝি ব্রাহ্ম-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় নির্ব্বাণ সমাধিতে নিমগ্ন।

ভিক্ষু উচণ্ড স্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে গাত্রস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। সর্পশ্বাসবৎ স্বরে তাঁহার কর্ণে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

নিঃশব্দে দুই জনে ইতির প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্লান তির্য্যক কাক-জ্যোৎস্না কক্ষের মসৃণ ভূমির উপর প্রতিফলিত হইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে স্থবির দেখিলেন, ইতি একটি উচ্চ পীঠিকার উপর বসিয়া আছে; আর, বেদীমূলে প্রণতি-রত উপাসকের ন্যায় নির্ব্বাণ নতদেহে তাহার জানুর উপর মস্তক রাখিয়া স্থির হইয়া আছে। ইতির কটি হইতে উর্দ্ধাঙ্গ কেবল বিস্রস্ত কেশজাল দিয়া আবৃত; শুভ্র মর্ম্মরে রচিত মূর্ত্তির ন্যায় তাহার যৌবন-কঠিন দেহ সগর্ব্বে উন্নত হইয়া আছে; আর দুই চক্ষু হইতে বিজয়িনীর নির্ব্বাধ উল্লাস ও অশ্রু একসঙ্গে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে।

স্থবির ডাকিলেন—'নির্ব্বাণ!'

নির্ব্বাণ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার-সম্মুখে পিতৃমিত্রকে দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, 'থের, আমি সঙ্ঘের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমার যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।'

স্থবির কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'নির্ব্বাণ, তোমার অপরাধ গুরু। কিন্তু আমার অপরাধ তোমার অপেক্ষাও অধিক। আমি সব জানিয়া-বুঝিয়াও তোমাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিয়াছিলাম বৎস।'

উচণ্ডের উগ্র কণ্ঠস্বরে স্থবিরের করুণাবাণী ডুবিয়া গেল, তিনি কহিলেন, 'থের, এই পতিত ভিক্ষু নিজমুখে পাপ খ্যাপন করিয়াছে, আমরাও স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পাতিমোক্ষ অনুসারে উহার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করুন।'

স্থবির কোনও কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, অপরিসীম করুণায় তাঁহার অধর থর থর কাঁপিতে লাগিল।

উচণ্ড তখন কহিলেন, 'উত্তম, আমি এই ভিক্ষুর উপাধ্যায় ছিলাম, আমিই তাহার দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি। ভিক্ষু তুমি পারাজিক ও সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইয়াছ, এই জন্য তুমি সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইলে। অদ্য হইতে সঙ্ঘের সীমাভুক্ত ভূমির উপর বাস করিবার অধিকার তোমার রহিল না; সঙ্ঘাধিকৃত খাদ্য বা পানীয়ে তোমার অধিকার রহিল না। ইহাই তোমার দণ্ড—বহিষ্কার! তুমি এবং তোমার পাপের অংশভাগিনী বুদ্ধের পবিত্র সঙ্ঘ-ভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলে।'

এই দণ্ডাদেশে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তবু কেহ কোনও কথা কহিল না। নির্ব্বাণ নতমস্তকে সঙ্ঘের অমোঘ দণ্ডাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইল। স্থবিরও মৌন রহিলেন। শুধু, পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ ও ইতিকে কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার শীর্ণ গণ্ডে যে অশ্রুর ধারা নামিয়াছিল, এত দিন পরে আবার তাহা প্রবাহিত হইল।

উষালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ইতি ও নির্ব্বাণ সঙ্ঘ হইতে বিদায় লইল। সঙ্ঘের পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইতেছে তাহারা জানে না; এ যাত্রা কি ভাবে শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত। কেবল, উভয়ের বাহু পরস্পর দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া আছে, দুস্তর মরু-পথের ইহাই একমাত্র পাথেয়।

যত দূর দেখা গেল, প্রাচীন নির্ব্বাপিত চোখে স্থবির সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সূর্য্য উঠিল, দূরে দুইটি কৃষ্ণ বিন্দু আলোকের ধাঁধাঁয় মিলাইয়া গেল। স্থবির ভাবিতে লাগিলেন, এই সূর্য্য মধ্যাকাশে উঠিবে; তৃষ্ণা-রাক্ষসী প্রতীক্ষা করিয়া আছে—

উচণ্ড আসিয়া স্থবিরের পাশে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'থের, আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু গৃহীজনোচিত মমত্ব কি নির্ব্বাণ-লিপ্সু ভিক্ষুর সমুচিত?'

স্থবির কহিলেন, 'উচণ্ড, অদৃষ্টবিড়ম্বিতের প্রতি করুণা ভিক্ষুর পক্ষে নিন্দনীয় নহে। শাক্য সকল জীবের প্রতি করুণা করিতে বলিয়াছেন।'

'সত্য। কিন্তু সেই মহাভিক্ষু শাক্যই পাপীর দণ্ডবিধান-কল্পে পাতিমোক্ষ সৃজন করিয়াছেন। দণ্ডবিধির মধ্যে করুণার স্থান কোথায়? থের, এই সঙ্ঘ কেবল বাস্তব পাষাণ দিয়া গঠিত নয়, ভিক্ষুগণের নির্ম্মমত্বের কঠিনতর

মর্ম্মর-পাষাণে নির্ম্মিত। তাই সংসারের শত ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যে প্রকৃতির রুদ্র বিক্ষোভ উপেক্ষা করিয়া সঙ্ঘ আজিও অটল হইয়া আছে। সঙ্ঘের ভিত্তিমূল যদি করুণার অশ্রুপঙ্কে আর্দ্র হইয়া পড়ে, তবে ধর্ম্ম কয় দিন থাকিবে? করুণার যূপকাষ্ঠে নীতির বলিদান কদাপি মহাভিক্ষুর অভিপ্রেত ছিল না।'

স্থবির দীর্ঘকাল উত্তর দিলেন না; তার পর ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, 'উচণ্ড, মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, পাতিমোক্ষ-মতে ভিক্ষুর দণ্ডদান অনুচিত হইয়াছে?'

'জানি না। বুদ্ধের ইচ্ছা দুরধিগম্য।'

'পাতিমোক্ষ কি বুদ্ধের ইচ্ছা নয়?'

'তাহাও জানি না।'

উচণ্ড তখন দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'তবে বুদ্ধ নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করুন। গোতম, তুমি আমাদের সংশয় নিরসন কর। তোমার অলৌকিক শক্তির বজ্রালোকে সত্য পথ দেখাইয়া দাও।'

সেই দিন মধ্যাহ্নে বাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবল প্রজ্জলিত বালুকার উপর হইতে এক প্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি-পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন উগ্র তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নিশ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দ্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

মধ্যাহ্ন বিগত হইল; খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়া সভয়ে মূল ছাড়িয়া নির্গত হইবার উপক্রম করিল।

'থের!'

স্থবির অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উচণ্ড নীরবে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দিক্‌প্রান্ত দেখাইলেন।

তাম্রতপ্ত আকাশের এক প্রান্তে চক্রবালরেখার উপর মুষ্টিপ্রমাণ কজ্জলমসী দেখা দিয়াছে। চিনিতে বিলম্ব হইল না। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে এমনই মসী-চিহ্ন আকাশের ললাটে দেখা গিয়াছিল।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে উচণ্ড কহিলেন, 'থের, আঁধি আসিতেছে!'

স্থবিরের অধর একটু নড়িল,—'বুদ্ধের ইচ্ছা! বুদ্ধের ইচ্ছা!'

উন্মত্তের ন্যায় স্থবিরের জানু আলিঙ্গন করিয়া উচণ্ড কহিলেন, 'থের, তবে কি আমি ভুল করিয়াছি? তবে কি আমার পাপেই আজ সঙ্ঘ ধ্বংস হইবে? ইহাই কি বুদ্ধের অলৌকিক ইঙ্গিত?'

দেখিতে দেখিতে আঁধি আসিয়া পড়িল। মরুভূমি ঝঞ্ঝা-বিমথিত সমুদ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্থবিরের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—'তমসো মা জ্যোতির্গময়! তমসো মা জ্যোতির্গময়!'

উচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—' ক্ষিপ্তের মত তিনি অলিন্দ হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; ঝড়ের হাহারবে তাঁহার চীৎকার ডুবিয়া গেল।

বালু ও বাতাসের দুর্ম্মদ দুরন্ত খেলা চলিতে লাগিল। পৃথিবী প্রলয়ান্ত অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ নিমজ্জিত হইল।

স্থবিরের শীর্ণ প্রাচীন কণ্ঠ হইতে তখনও আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হইতেছে, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিম কালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময় —তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

মানবজাতির শমন-ধৃত কণ্ঠ হইতে আজিও ঐ আর্ত্ত বাণীই নিঃসৃত হইতেছে।

চৈনিক শিল্পরীতিপ্রভাবিত কাম্বোজীয় মন্দিরাঙ্গন

কাম্বোজীয় প্যাগোডা
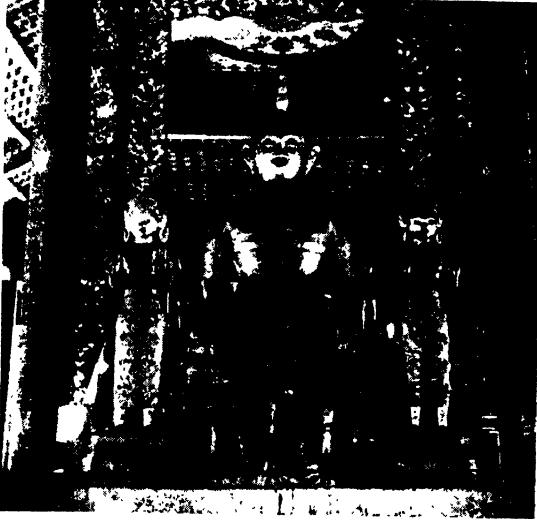
কাম্বোজের প্রত্যন্তবাসী

কাম্বোজের প্রত্যন্তবাসীর কেশসজ্জা
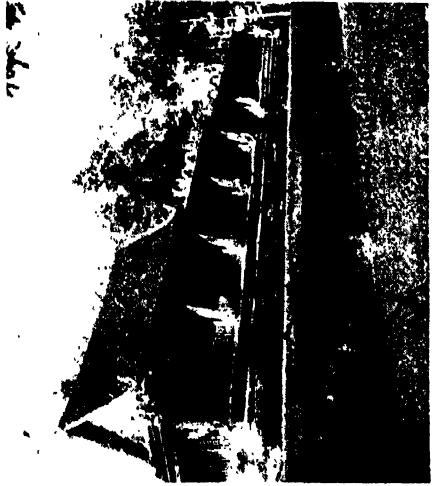
চীন কা য় মন্দির
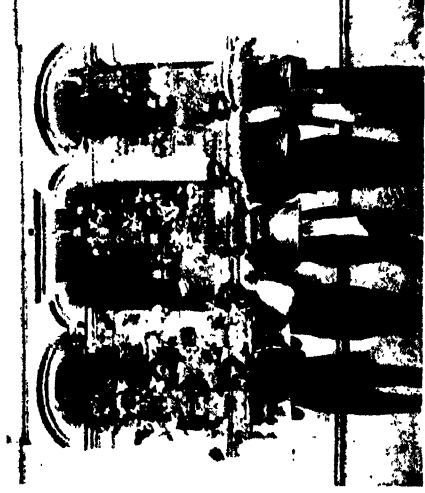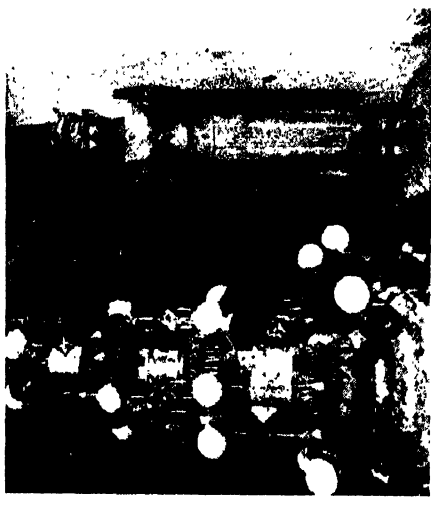
কাম্বোজীয় প্যাগে পুষ্পার্ঘ্য

দারুনির্ম্মিত কাম্বোজীয় বুদ্ধমূর্ত্তি

কাম্বোজীয় শ্রমণবর্গ ও অন্যান্যেরা গ্রামোফোনে কাম্বোজীয় সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ

কাম্বোজীয় শ্রমণগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রেডিও-প্রচারিত সংবাদ শুনিতেছেন

বেকার-সমস্যা ও কৃষিবৃত্তি

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

দেশের নিদারুণ অন্নসমস্যার সমাধান সহজ হবে মনে ক'রে অনেকেই এখন শিক্ষিত বেকার যুবকদের গ্রামে ফিরে যেতে ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া, পল্লীজীবনের প্রতি পক্ষপাত সঞ্চারকল্পে আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কার দরকার, এরূপ কথাও অনেকেই বলেছেন; এমন কি, ভারতবর্ষের একাধিক প্রদেশে এইরূপ সংস্কারের জল্পনা-কল্পনা ও আয়োজন চলছে। হয়ত শীঘ্রই এই সব প্রদেশে অন্ততঃ নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সাধিত হবে। সমস্ত কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে ইতিমধ্যেই ধুয়া উঠেছে যে আধুনিক উচ্চশিক্ষাও অত্যন্ত অব্যবহারিক, অতএব এরও সংশোধন আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই সব মতামতের মূল কথা হচ্ছে এই যে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে ক'রে তারা কৃষি, বাণিজ্য, বা শ্রমশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পরাঙ্মুখ না হয়।

যাঁরা কথায় কথায় "গ্রামে ফিরে যাও," "লাঙল ধর," ইত্যাদি রব তোলেন তাঁরা কিন্তু অনেকেই ভুলে যান যে এখনকার দেশব্যাপী মন্দার বাজারে সামান্য জোতজমিতে চাষ ক'রে বিশেষ কোনও লাভ নেই। দরিদ্র, অশিক্ষিত, গ্রাম্য কৃষকেরই দিন চলে না আজকাল, সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত, নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত যুবকেরা কি ক'রে লাঙল চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবে তা অনুমান করা সত্যই কঠিন। অধিকন্তু এও মনে রাখা দরকার যে সাধারণ জোতদারদের পেশা লাভের হ'লেও শিক্ষিত লোকের মনোমত হ'তে পারে না। বেকার শিক্ষিত যুবক শহরে অনাহারে দিন কাটাবে, তবু নিজের হাতে লাঙল ধরতে সহজে চাইবে না। অতএব ভেবে দেখা দরকার, কি ধরণে চাষ করলে বেশী লাভ হ'তে পারে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযুক্ত হয়।

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই কথাই মনে হয় যে শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে বৃহৎ জমিতে একক, বা যৌথভাবে মোটর-ট্র্যাক্টর দ্বারা বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করাই লাভজনক ও পছন্দসই জীবিকা হ'তে পারে। ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ শুধু রুচিকরই হবে না, তার দ্বারা উৎপাদন ও সেই সঙ্গে লাভের হারও বাড়বে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বহস্তে লাঙল চালানো শুধু শ্রমসাধ্যই নয়, বিরক্তিকরও বটে; ট্র্যাক্টর চালানো তার চেয়ে বহুগুণ সহজসাধ্য ও আধুনিক রুচির অনুযায়ী। ট্র্যাক্টর দিনে কয়েক ঘণ্টা চালালেই কাজ চলে, সমস্ত দিন চালাবার দরকার হয় না। সেই কারণেও

হরিহরপুরের জলপ্রপাত

আরণ্য স্রোতস্বিনীতে বাঁধ দিয়ে সুরম্য হ্রদ প্রস্তুত হয়েছে

তা শ্রমবিমুখ, শিক্ষিত যুবকদের সম্পূর্ণ উপযোগী। ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ করতে হ'লে অবশ্য গোড়ায় মূলধন প্রচুর থাকা চাই, এবং বিস্তীর্ণ জমির প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ দুটি বাধা অনতিক্রমণীয় নয়। যৌথভাবে কৃষিব্যবসা আরম্ভ করলে অর্থের অনটন হবে না। তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য যাতে কর্ম্মী যুবকেরা পায় সে-ব্যবস্থা করাও দুঃসাধ্য নয়।

কার্য্যতঃ ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ কিরূপ ফলপ্রদ হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমি সম্প্রতি পেয়েছিলাম। মানভূম জেলার একটি অপ্রসিদ্ধ গ্রামে এক প্রবাসী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙালী যুবক কি অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সাহসের সহিত ট্র্যাক্টর সাহায্যে কৃষিকার্য্য চালাচ্ছেন তার প্রতি বাঙালী বেকার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

পুরুলিয়া থেকে প্রায় মাইল-চল্লিশ দূরে হরিহরপুর একটি ছোট অথচ সুদৃশ্য গ্রাম। গ্রামটির জমিদার বাঙালী। এঁর নাম শ্রীরাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। পৈতৃক জমিদারী ইনি নিজের প্রতিভাবলে বহু গুণ বাড়িয়েছেন। নিজে যদিও তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তবু স্বকীয় জমিতে কৃষিব্যবসা করবার সখ তাঁর চিরকালই ছিল। তাই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা সমাপ্ত করলেন, তখন তাঁকে তিনি চাকরি গ্রহণ করতে না দিয়ে স্বগ্রামে কৃষিকার্য্য করতে উৎসাহিত করেন। পিতার স্বপ্ন পুত্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

অমিয়বাবু গোড়া থেকেই জেনেছিলেন যে সেকেলে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। অন্যান্য দেশে কি ভাবে মোটর ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ চলছে সে-সম্বন্ধে তিনি অনেক অনুসন্ধান ক'রে একটি মোটর ট্র্যাক্টর ও অপরাপর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করেন। নিজে এঞ্জিনিয়ার ব'লে তিনি সহজে ট্র্যাক্টর চালানো ও মেরামত করা শেখেন। হরিহরপুরের অধিবাসী সাধারণতঃ সাঁওতাল-জাতীয় ও অত্যন্ত দরিদ্র। অল্প মজুরী বা ধান পেলেই তারা আনন্দে সমস্ত দিন কাজ করে। তাদের সাহায্যে অমিয়বাবু জঙ্গল কেটে ও ছোট ছোট জোতজমি সম্মিলিত ক'রে বিস্তৃত চাষযোগ্য এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। অতঃপর ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ করা সহজ হ'ল। তাঁর জমিতে এখন বিবিধ শস্য, আখ এবং লাক্ষা উৎপন্ন হয়, এবং শুনলাম লাভের অঙ্কও কম নয়, যদিও অমিয়বাবু বললেন যে কাঁচা মালের দাম আজকাল অত্যন্ত কম। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত দাম পেলে ও উৎপন্ন শস্যের চাহিদা বাড়লে লাভ যে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হবে তাও তিনি বলেছিলেন।

এ-কথা জেনে আনন্দ ও গর্ব্ব হয়েছিল যে এদেশে অমিয়বাবুই বোধ হয় এক মাত্র শিক্ষিত জমিদার—যিনি নিজের হাতে ট্র্যাক্টর দ্বারা বৃহৎ কৃষিপ্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। দেশের জমিদার-বংশীয় যুবকেরা যদি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন তাহ'লে দেশের ও দশের মঙ্গল হয়, তাঁদের জমিদারীর উন্নতিও সেই সঙ্গে সহজ হয়। যাই হোক্, এক বাঙালী যুবক যে-কৃষির দ্বারা বেকার-সমস্যা সমাধানের উপায় হাতে কলমে ক'রে দেখাচ্ছেন তা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর জানা উচিত।

মানভূম জেলার অন্তর্দ্দেশে অবস্থিত ব'লে হরিহরপুর চমৎকার স্বাস্থ্যকর জায়গা। পুরুলিয়া থেকে মোটরে যেতে প্রায় ঘণ্টা-দুই লাগে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা পাকা ও সুন্দর। এখানে বলা উচিত যে অমিয়বাবু স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অন্যতম নির্ব্বাচিত সভ্য। বাংলার বাইরে বাঙালী যুবকের পক্ষে এরূপ সম্মানলাভ প্রকৃতপক্ষে কৃতিত্বসূচক।

পথের দু-ধারে উঁচু নীচু ধানের জমি, দূরে নাতিবৃহৎ পাহাড় ও নিবিড় শালবন দেখা যায়। মধ্যপথে ক্ষীণকায়া কাঁসাই নদী, মাঝে মাঝে ছোটবড় সাঁওতালী গ্রাম পথের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে। হরিহরপুরে পৌঁছে মনে হয় যেন সহসা এক পল্লীরূপ নন্দনকাননে এলাম, এমনই সুরম্য স্থান এটি। এই জনবিরল বনভূমি যেন প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র—এইখানে মুষ্টিমেয় সাঁওতাল প্রজা ও জনকয়েক আশ্রিত ও অনুগৃহীত প্রতিবেশীর সাহচর্য্যে অমিয়বাবু বৃহৎ কৃষিব্যবসা ফেঁদে বসেছেন।

হরিহরপুরে অমিয়বাবুর শ্রেষ্ঠ কাজ হয়েছে নিজের চেষ্টায় ও বহু ব্যয়ে তৈরি সুবিশাল এক কৃত্রিম হ্রদ। তাঁর জমিদারীভুক্ত জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিল, প্রতি বৎসর বর্ষার জলে স্ফীত হয়ে দু-পাশের বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি প্লাবিত ক'রে ক্ষতি করত কম নয়। অমিয়বাবু অনেক ভেবে স্থির করলেন যে বাঁধ দিয়ে যদি এই জলধারা অবরুদ্ধ করা যায় তা হ'লে বিস্তৃত এক জলাশয় সৃষ্টি হবে ও সেই থেকে সমস্ত চাষের জমিতে জল যোগান যাবে। এই বাঁধ তৈরি করতে যে উদ্যম ও এঞ্জিনিয়ারীং-কৌশল অমিয়বাবু প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয় ও গৌরব করবার মত।

অমিয়বাবু শুধু বাঁধ তৈরি ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, হ্রদ হ'তে এক খাল কাটিয়েছেন। এই খালও দেখবার মত জিনিষ। এটি এঁকে বেঁকে বহুদূর অবধি গিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে এই থেকে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে জল নেওয়া হবে। ফলে অমিয়বাবুকে কৃষির জন্য আর অনিশ্চিত বর্ষার জলের উপর নির্ভর করতে হবে না। এই খালও তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন করা হয়েছে এবং এতেও তাঁর মৌলিকতা দেখা গেল। হ্রদ ও খাল এ দুটির জন্য তিনি কম পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয় করেন নি; সুখের বিষয় তাঁর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আশা করা যায় এর দ্বারা তাঁর কৃষিকার্য্যের যথোপযুক্ত প্রসার হবে। ইতিমধ্যে জলাশয়ে তিনি মৎস্যের চাষ আরম্ভ করেছেন, ভবিষ্যতে এ থেকেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। বাঁধের তলায় নিম্নভূমির এক পাশে ছোট এক জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

অমিয়বাবু মোটর-ট্র্যাক্টর চালাচ্ছেন

অমিয়বাবুর ইচ্ছা এই প্রপাতের সাহায্যে নিজের মিল চালাবেন, ও বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করবেন। এখানে বলা উচিত যে তিনি ইতিপূর্ব্বে নলকূপ, ও সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কসহ, স্যানিটারী পায়খানা প্রভৃতি বাস-ভবনে নিজেই প্রস্তুত করেছেন। বৈদ্যুতিক আলো হ'লেই শহরের অনেক সুখসুবিধা গ্রাম থেকেও পেতে পারবেন।

অমিয়বাবুর মতে কৃষিব্যবসা যৌথভাবে ও বৃহদাকারে করা দরকার, তা নইলে লাভের আশা অল্পই। তিনি নিজে জমিদার ব'লে এক জায়গায় সুবিস্তীর্ণ চাষের জমি সহজে পেয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে তা জোগাড় করা সহজ নয়। সহস্রাধিক বিঘা জমির কমে ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষ লাভজনক হয় না। সেই জন্য তিনি মনে করেন গবর্ণমেণ্টের, বা ধনী-জমিদারদের সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত যুবকদের পর্য্যাপ্ত মুনাফার আশায় কৃষিকার্য্য করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দল বেঁধে সমবায় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করাই সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়। মোটর-ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জামের মূল্য

হ্রদ থেকে কাটানো খাল

যৌথ মূলধন থেকে, বা গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ লওয়া টাকা থেকে প্রথমতঃ তোলা যেতে পারে, পরে ক্রমশঃ কিস্তীবন্দী ক'রে সে ঋণ শোধ করা কঠিন হবে না

অমিয়বাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কৃষিব্যবসা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক কেউ যদি তাঁর কাছে হাতে-কলমে চাষের কাজ শিখতে চায় তাহলে কি তিনি তাকে সাহায্য করবেন? তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন, ও বলেছিলেন যদি সত্যই উৎসাহী ও পরিশ্রমী ছেলেরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয় তিনি সব রকমে তাদের সাহায্য করতে, এমন কি শিক্ষা দিতে, প্রস্তুত আছেন। যাঁরা চাষ বা ট্র্যাক্টর কর্ষণ সম্বন্ধে অতিরিক্ত খবর চান, তাঁরা স্বচ্ছন্দে অমিয়বাবুকে চিঠি লিখে জানতে পারেন। তাঁর ঠিকানা—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, হরিহরপুর, ডাকঘর মানবাজার, জেলা মানভূম।

কৃষিবিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, দেখা যায় তাঁদের অধিকাংশই চাকরির জন্য লালায়িত। নিজেরা চাষ করতে তাঁরা চান না। কাজেই তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা কার্য্যকরী হয় না। আশা করি উত্তরোত্তর বাঙালী যুবকেরা, চাকরির জন্য বৃথা ছুটাছুটি না ক'রে কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করবেন। অমিয়বাবু নিজে কৃষিব্যবসা ক'রে এ-কথা প্রমাণ করেছেন যে যদি বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করা যায় তা হ'লে শুধু বেকার-সমস্যার সমাধানই সহজ হবে না—দেশের, বিশেষ ক'রে পল্লীগ্রামের, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে। অনেকে আপত্তি করতে পারেন যে পল্লীজীবনের নানা অসুবিধা, পল্লীর স্বাস্থ্যও সব জায়গায় ভাল নয়। এ-কথা যদিও মূলতঃ সত্য, তবু এও স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে পল্লীজীবনে অভ্যস্ত হ'লে উদ্যোগী যুবকেরা সম্মিলিত হয়ে ইচ্ছানুরূপ বিবিধ সংস্কার সাধন করতে পারেন। পল্লীসংস্কার বিনা কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়; আর পল্লী-সংস্কারও তখনই সুসাধ্য হবে যখন ভদ্রলোকে জীবিকার জন্য গ্রামে থাকতে বাধ্য হবেন।

বাংলার বাইরে বাঙালী যুবকের চেষ্টায় যা সম্ভব হ'তে পারে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামেও তা অসম্ভব হ'তে পারে না। চাই শুধু অদম্য উৎসাহ ও পুরুষোচিত উদ্যম, যার অভাবে আজ দেশে অন্নসমস্যা দিন দিন মারাত্মক হয়ে উঠছে।

গাছপালার বংশবিস্তারের ফন্দী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাণী-জগতের বংশবিস্তারের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রবৃত্তি উদ্ভিদ-জগতেও সুপরিস্ফুট। প্রাণীরা যেরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ লাভ করিতে পারে, অধিকাংশ উদ্ভিদের সেইরূপ ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও তাহারা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছে। সাধারণতঃ উদ্ভিদের এত বীজ উৎপন্ন হয় যে, বিবিধ অবস্থার প্রতিকূলতায় তাহাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া গেলেও একেবারে বংশলোপের আশঙ্কা ঘটে না। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া অধিকাংশ বীজ নষ্ট হইবার দরুনই বোধ হয় ক্রমবিকাশের ফলে এমন বীজের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদের বহির্ভাগ কঠিন আবরণে আবৃত। কঠিন বহিরাবরণে সুরক্ষিত থাকার ফলে অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষশিশু অতিরিক্ত শৈত্য বা উত্তাপে সহজে নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু কেবল বীজ সুরক্ষিত হইলেই ত বংশবিস্তারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না! বীজ পরিপক্ক হইলে বৃক্ষের তলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। শক্ত খোলার আবরণে সুরক্ষিত থাকিয়া সময়মত না হয় বীজ উপ্ত হইবার সুবিধাই হইল; কিন্তু আর এক বিপদ তখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে একযোগে অসংখ্য বৃক্ষশিশু জন্মিয়া যখন ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তখন আলো, বাতাস ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া যায়। তাহার ফলে অধিকাংশই জীবনসংগ্রামে পরাভূত হইয়া যায়। অধিকন্তু এই উপায়ে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের গতিও মন্থর হইয়া পড়ে। এই সব অসুবিধার ফলেই হয়ত উদ্ভিদেরা বংশবিস্তারের জন্য ক্রমশঃ অভিনব কৌশল আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেকেই বংশবিস্তারে প্রাণী-জগতের সাহায্য লইয়াছে। জীবজগতে লেশমাত্র স্বার্থশূন্য হইয়া কেহ কোন কাজ করে না। এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করিয়াই যেন আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুরসাল ফলের গাছসমূহ তাহাদের বীজকোষের উপরে মনুষ্য ও পশুপক্ষীর রসনাতৃপ্তিকর মাংসল পদার্থের বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। প্রাণীরা সুস্বাদু ফলের লোভে নানা উপায়ে দেশদেশান্তরে ইহাদের বংশবৃদ্ধির সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। বিশেষতঃ মানুষেরা কেবল ফলের লোভেই নয়, ফুলের সৌরভ, পত্র-পল্লবের সৌন্দর্য্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনে তাহাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকে। তাহাদের কেহ কেহ মানুষের অপরিসীম আদরযত্নে লালিতপালিত হইয়া প্রজনন-ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। ডাল কাটিয়া বা কলম বাঁধিয়া তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করাইতে হয়। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে লাগে না পৃথিবীতে এমন উদ্ভিদের সংখ্যা কম

বামে হিজল ও দক্ষিণে শ্বেত মাকালের ফল

শুঁড়িকচু। শিকড়ের কাছে লতার মত অংশগুলি প্রবাহনী—প্রবাহনীর প্রান্তে নূতন গাছ জন্মিয়াছে

নহে। বংশবৃদ্ধির জন্য তাহাদের চেষ্টারও বিরাম নাই। বংশ বিস্তার করিয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কত রকম অদ্ভুত ফন্দীর আশ্রয় লইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের দেশীয় কয়েকটি উদ্ভিদের কথা আলোচনা করিব। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশীয় উদ্ভিদের কেহ কেহ জলস্রোত বা বাতাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ লতানো সংবাহক বা

প্রবাহণী-লতার সাহায্যে কচুরিপানার বংশবিস্তার

ফল দূরে ছিটাইয়া বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার প্রাণীদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন উপায় অবলম্বনকারী উদ্ভিদদের সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের খাল বিল বা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির ধারে ধারে বুনো বা শ্বেত-মাকাল নামে এক জাতীয় বড় বড় গাছ জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদের ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের ফুলের স্তবকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু গন্ধ বড়ই অপ্রীতিকর। গাছে মাকাল ফলের মতই বড় বড় গোলাকার ও শ্বেতবর্ণের ফল ধরে। পরিপক্ব অবস্থায়ও বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না। ফলগুলি পাকিয়া ফাটিয়া গেলে একটা ন্যক্কার-জনক দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীরাও দুর্গন্ধে ইহাদের কাছে ঘেঁষে না। কাজেই পশুপক্ষীদের দ্বারা বংশবিস্তারের সহায়তার কোন সম্ভাবনা ত নাই-ই, অধিকন্তু মানুষেরা তাহাদের বংশ লোপ করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা যেন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বংশ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে জলের ধারে ধারেই এই গাছের প্রাচুর্য্য। বর্ষার জলে যখন সমস্ত মাঠ ঘাট ডুবিয়া যায় এবং খাল-বিলে জলস্রোত বহিতে থাকে সেই সময়েই ইহাদের ফল পাকিয়া জলে পড়ে এবং ভাসিতে থাকে। জলস্রোতের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ফলগুলি বহু দূরে দূরে চলিয়া যায়। এইরূপে কেহ কেহ জলস্রোতের আশেপাশে আবর্জ্জনা বা ফাঁকফন্দীতে আটকা পড়িয়া যায় এবং অনেকে ইতস্ততঃ ভাসিতে ভাসিতে বর্ষার অবসানে জল নামিবার পর ডাঙ্গা পাইলেই অঙ্কুর উদ্গম করিতে থাকে। বৃক্ষশিশুগুলি অসম্ভব দ্রুতগতিতে লম্বালম্বি বাড়িয়া পুনরায় বর্ষাসমাগমের পূর্ব্বেই বেশ বড় হইয়া উঠে। পরবর্ত্তী বর্ষার জলে সে কোন গতিকে মাথা

পাথরকুচির গাছ মাটিতে লতাইয়া অবশেষে এক স্থানে শিকড় বাহির করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে

উঁচু করিয়া দুই-চারিটি পত্র বা কোন কোন স্থলে পত্রহীন অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া থাকে। তার পর আর বছরখানেক সময়ের মধ্যেই দস্তুরমত গা ঝাড়া দিয়া বাড়িয়া উঠে। এই ফন্দী অবলম্বন করিয়া তাহারা নিশ্চিন্তভাবে খালবিলের আশেপাশে বংশবিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

হিজল নামে এক প্রকার গাছও শ্বেত মাকালের মত উপায় অবলম্বন করিয়া বংশবিস্তার করিয়া থাকে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই হিজল গাছে অজস্র লাল রঙের ফুল ফুটিতে থাকে। জলের ধারে ধারেই হিজল গাছের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই বর্ষাকালে গাছের তলায় জলের উপর এত ফুল পড়িয়া থাকে যে দেখিয়া মনে হয়—কে যেন জলের উপর লাল মখমলের চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে। জল নামিয়া যাইবার পূর্ব্বেই হিজলের ফল পাকে এবং জলের উপর পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

মানুষের অতি প্রয়োজনীয় নারিকেল ফলের পূর্ব্বকথা আলোচনা করিলে অনুরূপ ইতিহাসেরই সন্ধান মিলিবে। মানুষ যখন এই ফলের ব্যবহার শিখে নাই তখন পর্য্যন্ত একমাত্র জলস্রোতই তাহাদের বংশবিস্তারে সহায়তা করিত। সমুদ্রের উপকূলে নোনা জায়গায় ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। শুষ্ক নারিকেল নদী বা সমুদ্রজলে ভাসিয়া বহু দূরে উপনীত হইয়া সুবিধামত স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইত। এখন মানুষেরাই তাহাদের উপরিউক্ত উপায় অবলম্বনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কতকগুলি গাছ আবার বংশবিস্তারের জন্য বীজের উপর নির্ভর করে না। ইহাদের বীজ বড় একটা হয় না; আর হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয় না। বংশবিস্তারের জন্য ইহারা

তাহাদের মূল কাণ্ড হইতে লতার মত এক প্রকার প্রবাহণী বাহির করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এক জাতীয় গুঁড়িকচু গাছের উল্লেখ করা

বামে, ওকরা গাছ। দক্ষিণে, দোপাটি গাছ ও তাহার ফল

আমরুল শাক ও তাহার ফল

যাইতে পারে। ইহাদের ফল হয় বটে, কিন্তু বীজ হইতে গাছ জন্মে না। বংশবিস্তারের জন্য ইহা অতি সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছে। গোড়ার দিক হইতে খুব সরল প্রায় পাঁচ-সাত হাত লম্বা লতার মত কতকগুলি প্রবাহণী চতুর্দ্দিকে চালাইয়া দেয়। প্রত্যেক প্রবাহণীর প্রান্তদেশে একটি গাঁট থাকে—উপযুক্ত স্থান পাইবামাত্রই ঐ গাঁট হইতে একটি নূতন চারাগাছ গজাইতে থাকে এবং শিকড় গাড়িয়া সেই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। কিছু দিনের মধ্যেই এই নূতন উপনিবেশ হইতে আবার প্রবাহণী ছড়াইতে আরম্ভ করে। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া ফেলে। পানা জাতীয় বিবিধ জলজ উদ্ভিদ—বিশেষতঃ সর্ব্বজনপরিচিত কচুরি পানা অনুরূপ উপায়েই দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করিয়া থাকে। নূতন গাছগুলি পরিণত হইলেই সাধারণতঃ এই সংযোগকারী প্রবাহণী নষ্ট হইয়া পুরাতন গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে এক জাতীয় ধান জন্মিতে দেখা যায়। গাছে ধান ফলিলেও প্রায়ই শাঁস হয় না। কাজেই বীজ হইতে তাহাদের বংশবিস্তারের সুবিধা হয় না। এই গাছের গোড়ার দিক হইতে লম্বা লম্বা অসংখ্য ডাঁটা বাহির হইয়া থাকে। কিছু দিনের

এক জাতের দুর্ব্বাঘাসের ক্রুশচিহ্নের ন্যায় বীজধারক দণ্ড

মধ্যেই এই ডাঁটার গাঁট হইতে ছোট ছোট চারা গাছ নির্গত হয়। এই চারা গাছগুলি ক্রমশঃ বড় হইলেই তাহাদের ভারে ডাঁটাগুলি আপনা আপনিই মাটিতে নুইয়া পড়ে। তখন চারাগুলি শিকড় বাহির করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নূতন উপনিবেশ সৃষ্টি করে। এই ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কয়েক জাতীয় অর্কিডের মধ্যে দেখা যায় তাহারা গোড়া হইতে নূতন নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া বংশবৃদ্ধি করে; কিন্তু বংশবিস্তারের জন্য উপর হইতে বটগাছের ঝুরির মত লম্বা লম্বা প্রসারণী নামাইয়া দেয়। প্রসারণীর প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে একটি করিয়া শিশু অর্কিড ঝুলিতে থাকে। তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত মাটির নাগাল পাইবার আশায় শিকড় বাহির

তেঁতুলে বা শালবনী গাছ ও তাহার ফল
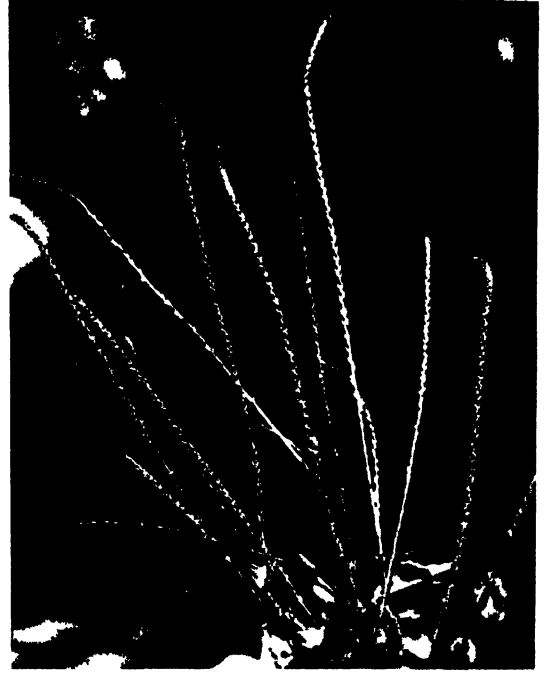
আপাঙের বীজ

করিতে থাকে। এই অবস্থায় হয়ত দুই-চার বছর কাটিয়া যায়—মাটির নাগাল পায় না, অবশেষে প্রসারণী শুকাইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িবার পর চারাগুলি নূতন নূতন উপনিবেশ গড়িয়া তোলে।

পাথরকুচির গাছ আবার ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত উপায়ে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। পাথরকুচির বীজ হইতে বংশবৃদ্ধি হয় না। তাহাদের পাতার ধারে ছোট ছোট খাঁজ কাটা আছে। পাতা মাটিতে পড়িয়া কিছু দিন রোদ জল পাইলেই প্রত্যেক খাঁজের কাছে এক একটি করিয়া ছোট ছোট চারা উৎপন্ন হয়, পাতাগুলি গাছ হইতে পড়িলেই জল, বাতাসের সহায়তায় দূরে দূরে নীত হয় এবং সুবিধামত স্থানে পাথরকুচির বৃহৎ উপনিবেশ সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত এক স্থানে বহু গাছ জন্মিবার পর গাছগুলি ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে মাটিতে লতাইয়া পড়ে। এইভাবে কিছু দূর লতাইয়া যাইবার পর সুবিধামত শিকড় বাহির করিয়া ওখান হইতেই আবার নূতন করিয়া উপনিবেশ সৃষ্টি সুরু করিয়া দেয়।

বীজ হইতে যাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এমন কতকগুলি গাছ নিজেরাই দূরে দূরে বীজ ছড়াইবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে আমলী বা আমরুল শাক নামে এক জাতীয় ছোট ছোট লতানে উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ফলগুলি হয় লম্বা লম্বা—মাথা সুচালো। এক একটার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল রঙের বীজ থাকে। ফল পাকিলে, একটুখানি বাতাস বা অন্য কোন রকমে নাড়াচাড়া পাইলেই—ফলের খোসা সবেগে ফাটিয়া বীজগুলি খুব জোরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বীজগুলির গায়েও আবার খাঁজ-কাটা, কাপড়চোপড়ে পড়িলে, সূতার আঁশে আটকাইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা আছে।

ওকরা বা ঘাগড়া নামে ছোট ছোট এক প্রকার অযত্নবর্দ্ধিত চারা গাছ মাঠে ঘাটে অনবরত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ফলগুলি দেখিতে কতকটা কুলবীজের মত। কিন্তু বীজের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া কতগুলি কাঁটা জন্মে। কাঁটার মাথাগুলি কিন্তু সরল নহে হুকের মত বাঁকানো। কাপড়চোপড়ে লাগিলে আটকাইয়া যায়। গরুবাছুরেরা মাঠে ঘাটে চরিবার সময় লেজের লোমের গোছায় আটকাইয়া তাহারা দূরদূরান্তরে উপনীত হয় এবং সুবিধা মত স্থানে অঙ্কুরিত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। দোপাটি ফুলের বীজও পাকিলে আমরুল শাকের ফলের মত জোরে ফাটিয়া যায় এবং বীজগুলি দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। বংশবিস্তারের সুবিধার জন্যই তাহাদের এ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

বনে জঙ্গলে এক জাতীয় দূর্ব্বাঘাস দেখিতে পাওয়া যায়। একটি লম্বা ডাঁটার মাথায় ক্রুশ-চিহ্নের মত তাহার চারিটি বাহুতে সারবন্দী ভাবে বীজ ধরে। বীজগুলি পরিপক্ক হইলে এক রকম সূক্ষ্ম শুঁয়ার সাহায্যে মানুষের কাপড়চোপড়ে আটকাইয়া দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

চোরকাঁটার বীজগুলিও কাপড়চোপড়ে বিঁধিয়া দূরে দূরে

হিটলারের বাসগৃহ

বার্লিনে ডিউক অব উইণ্ডসর ও তাঁহার পত্নী
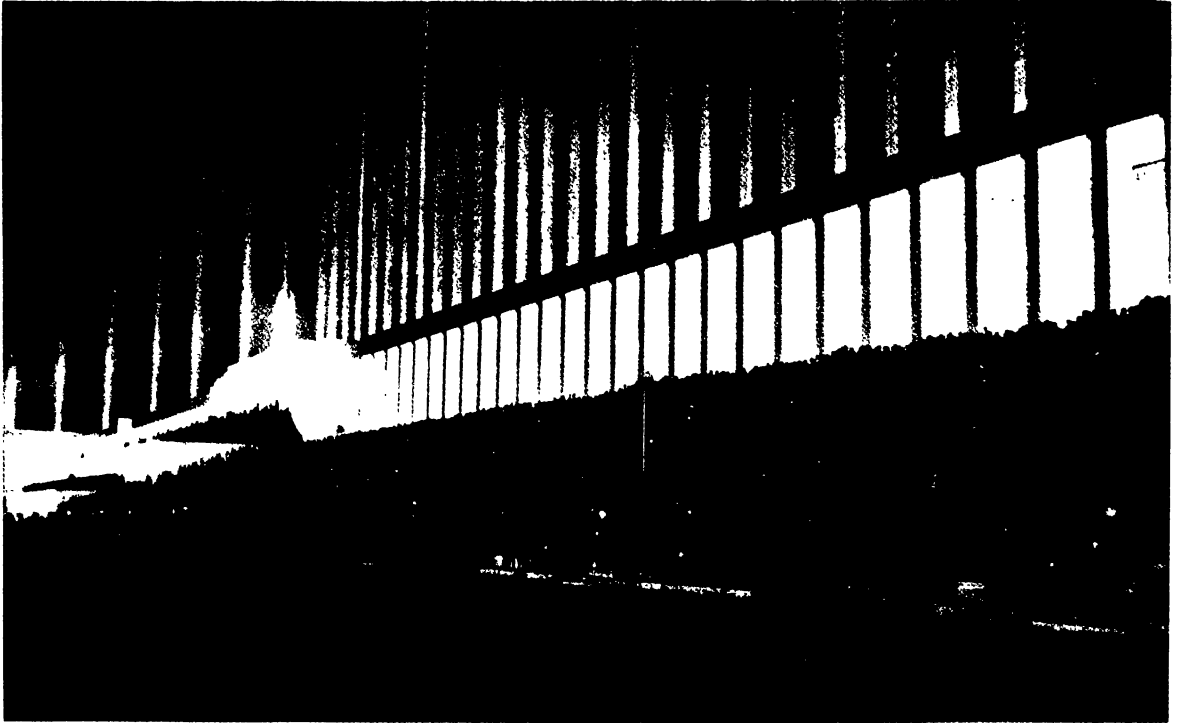
জর্ম্মন শ্রমপরিষদের সম্মিলন ও তদুপলক্ষে বিচিত্র আলোকসজ্জা

নূর্নবার্গে শ্রমিকদলের শোভাযাত্রা

ছড়াইয়া বংশ-বিস্তার করিবার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে।

তেঁতুলে বা শালবনী গাছ বনেজঙ্গলে বা পরিত্যক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ফলগুলি খুব ছোট ছোট চ্যাপ্টা তেঁতুলের মত দেখিতে। গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শুঁয়া আছে। পশুপক্ষীর গায়ে অথবা কাপড়চোপড়ে লাগিলে আঠার মত লাগিয়া থাকে। কৌশলে প্রাণীদের সাহায্য লইয়া ইহারা বংশ বিস্তার করিয়া থাকে।

আপামার্গ বা আপাং গাছ সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। বনেজঙ্গলে একটু ঘুরিলেই দেখা যাইবে পরিধেয় বস্ত্রাদিতে কাঁটার মত ছোট ছোট অসংখ্য বীজ যেন সার বাঁধিয়া লাগিয়া আছে। ইহারাই আপাঙের বীজ। ইহারা চোরকাঁটার মত গায়ে অথবা বস্ত্রাদিতে আটকাইয়া ঘুরে ঘুরে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য এইরূপ কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে।

[প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত]

ভগবান্ জাগৃহি

শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

নিপীড়িতা ধরিত্রীর উচ্ছ্বসিত আকুল ক্রন্দনে
উদ্বেলিত মহাসিন্ধুতল,
দীর্ঘশ্বাস অবরুদ্ধ সর্ব্বহারা বক্ষের স্পন্দনে
গ্রহলোক বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল।
কেঁপে কেঁপে নিবে যায় জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ্ত ভাস্কর,
জ্যোতিহাঁরা পুঞ্জ নীহারিকা,
নিস্তব্ধ অম্বরতল, নির্ব্বাপিত ভীম ভয়ঙ্কর
ধূমকেতু-পুচ্ছ-বহ্নিশিখা।
তপোবন বাণীহারা,—সে উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারণে
উদ্‌ঘোষিত নাহি হয় হোম,
ব্যথিতের অশ্রুজলে অসহায় আর্ত্তের রোদনে
পরিপূর্ণ মহাশূন্য ব্যোম।
অত্যাচারী দানবের অনির্ব্বাণ কাম-মহোৎসবে
সতীনারী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা
রোদন-সায়রে ঘেরা রত্নদ্বীপে কাঁদিছে নীরবে
বন্দিনী ভারতলক্ষ্মী সীতা।
প্রলয়পয়োধি জলে নিমজ্জিত সারা বিশ্বলোক—
অধর্ম্মের, অসত্যের গ্লানি

এ মহাজাতির ভালে আঁকিয়াছে কলঙ্ক-তিলক
সুপ্ত জাতি তবুও জাগে নি।
পাদ্য-অর্ঘ্য উপচারে, ঘন ঘোর শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে
দানবের পূজা ও আরতি:
অত্যাচারী, অনাচারী পশিয়াছে দেবতা-দেউলে—
কোথা তুমি হে পার্থ-সারথি!
তমোময় গাঢ়তম তমিস্রার নির্ম্মোক ভেদিয়া
নবারুণ সম আবির্ভাব
হউক হে রুদ্র তব, শতাব্দীর বন্ধন ছেদিয়া
ব্যক্ত কর তোমার প্রভাব।
হে পার্থ-সারথি এস, এ মহাজাতির মুক্তি লাগি
পাঞ্চজন্য ঘোষি দৃপ্ত স্বরে,
মোহজাল ছিন্ন করি নিমেষে উঠুক সবে জাগি
তব রথচক্রের ঘর্ঘরে।
যোগনিদ্রা ভঙ্গ করি এস মহাপতিতের ত্রাতা
ক্ষাত্র তেজে কর মহীয়ান্
নব-মহাভারতের মুক্তিদূত, গীতা-উদ্‌গাতা
জাগৃহি, হে ভগবান্!

তরাইয়ের তরুণী

[শ্রীযুক্তা ডক্টর সেলমা লাগেরলভের মূল সুইডিশ উপন্যাস হইতে
তাঁহার অনুমতি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্তৃক অনুদিত]

শ্রীসেলমা লাগেরলভ ও শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

৪

হেল্‌গা চোরাবালি হইতে নেরলুন্দায় আসিয়া কাজ আরম্ভ করার পর সেখানে তাহার দিনগুলি ভালই কাটিতেছিল। সে অতিশয় কর্ম্মপরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী। বাড়ীর লোকে দয়াপরবশ হইয়া যে যাহা বলিত, কৃতজ্ঞ চিত্তে সে তাহা পালন করিত। সর্ব্বদাই সে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিত, গায়ে পড়িয়া কখনও কাহাকে কিছু বলিত না। অল্প কালের মধ্যে বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নী এবং ঘরের অন্যান্য সকলেই তাহার কাজে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রথম দিকে গুডমুণ্ড হেল্‌গার কাছ ঘেঁসিয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। চোরাবালির তরুণী এক সময় তাহার সাহায্য পাইয়াছিল, সে জন্য হয়ত বা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে এমন একটা ভয় গুডমুণ্ডের মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ ভয় করিবার কোনই কারণ ছিল না। গুডমুণ্ডও শীঘ্রই বুঝিল যে, হেল্‌গার নিকট হইতে পলাইয়া থাকার কোন কারণ নাই, ফলতঃ হেল্‌গা তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিত।

সে বৎসর হেমন্তকালে হেল্‌গা নেরলুন্দায় আসার পর গুডমুণ্ড এলবোক্রার বড় বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া-আসা আরম্ভ করিল এবং তাহার যে সে-বাড়ীর জামাতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে লোকমুখে আলোচনা শোনা যাইতে লাগিল। বড়দিনের ছুটিতে গুডমুণ্ড নিশ্চিত বুঝিল যে তাহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তার পর এক দিন এলবোক্রার পরিবারের কর্ত্তা সস্ত্রীক ও কন্যাসহ নেরলুন্দায় বেড়াইতে আসিলেন। হিলডুর গুডমুণ্ডকে বিবাহ করিলে জামাতার ঘরে কেমন অবস্থায় থাকিবে তাহা দেখিতে আসাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

গুডমুণ্ডের সঙ্গে যাহার বিবাহের কথা, হেলগা সেই হিলডুরকে এই প্রথম দেখিল। ধনীকের মেয়ে হিলডুরের বয়স এখনও বিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সে যে চমৎকার গৃহকর্ত্রী হইতে পারে, তাহাকে দেখিলে ইহা মনে না করিয়া থাকা যায় না। হিলডুর দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী, তাহার চুলগুলি সোনালী, দেখিতে সে সত্যই খুব সুন্দরী,—যেন পরিবার-পরিজনের পরিবেষ্টনে থাকিয়া সে সকলের আদরযত্ন লইতে ভালবাসে। কথাবার্ত্তায় সে এত সুনিপুণা এবং সে এমন ভাবে সকল রকম আলোচনায় যোগ দিতে পারে যে মনে হয়,—যাহার সঙ্গে তাহার কোন বিষয় আলোচনা হয় তাহার অপেক্ষা সে যেন বেশী জানে ও বুঝে। সে শহরের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার পোষাক এত সুন্দর যে হেল্‌গা পূর্ব্বে কখনও তেমনটি দেখে নাই। তাহার রূপলাবণ্য ও ধনসম্পত্তি বিচার করিলে সে যে তাহার ইচ্ছামত যে কোন ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে বড়লোকের বউ হইয়া বিনা কাজে ঘরে বসিয়া থাকিতে সে পছন্দ করে না। সে গ্রাম্যবধূ হইয়া ঘরবাড়ীর কাজকর্ম্ম করা অধিক পছন্দ করে।

হিলডুরকে হেল্‌গার খুব পছন্দ হইয়াছে। পূর্ব্বে সে কখনও এমন চরিত্রবতী, সরলা ও চমৎকার মেয়ে দেখে নাই। সে কখনও ভাবিতে পারে নাই যে কেহ এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

হইতে পারে। ভবিষ্যতে এমন গিন্নীর ঘরে কাজ করিতে পারা সুখের বিষয় হইবে মনে করিয়া হেল্‌গার সত্যই আনন্দ হইয়াছে।

এলবোক্রা-পরিবারের নেরলুন্দায় বেড়াইতে আসার সময়টা সকল দিক দিয়াই ভালভাবে কাটিয়াছে; কিন্তু হেল্‌গা বিশেষ কোন কারণে নিজের মনের কোন এক জায়গায় অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। কারণটি এই, অতিথিরা ঘরে আসিয়া বসার পর হেল্‌গা কফি-পাত্র লইয়া সকলকেই পেয়ালা করিয়া কফি দিয়া আপ্যায়িত করিতেছিল। সে কফি-পাত্র হাতে অতিথিদের ঘরে ঢুকিলে পর অস্পষ্ট স্বরে হিলডুরের মা শুভমুণ্ডের মা'র দিকে ঝুঁকিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এই সে চোরাবালির মেয়ে কি না। শুভমুণ্ডের মা শ্রীযুক্তা ঈজেবর্গ মাথা নাড়িয়া সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলেন; তখন ঘরের মধ্যে অন্য কেহ তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তবে হেল্‌গা তাহা শুনিতে পায় নাই। মোট কথা এই যে, এমন মেয়েকে ঘরের কাজে রাখা হইয়াছে জানিয়া অতিথিরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি হেল্‌গাকে খুবই দুঃখ দিয়াছিল। কিন্তু সে এই বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছিল যে শুধু হিলডুরের মা-ই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিলডুর নহে।

* * *

বসন্তের প্রারম্ভে এক রবিবারে হেল্‌গা ও শুভমুণ্ড উপাসনালয় হইতে একত্রে বাড়ী ফিরিতেছিল। পাহাড়ের উপর অবস্থিত গির্জ্জা হইতে নীচের রাস্তায় নামিয়া তাহারা অন্যান্যদের সঙ্গে একই পথে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সকলই এক এক করিয়া যার যার বাড়ীর পথে চলিয়াছিল এবং শুধু হেল্‌গা ও শুভমুণ্ড বরাবর একই রাস্তায় ছিল।

তখন শুভমুণ্ডের মনে পড়িল যে চোরাবালির খামারে সেই সন্ধ্যার পর কখনও সে হেল্‌গাকে এমন একা দেখে নাই। এখন সেই সন্ধ্যাবেলার সমস্ত ঘটনার চিত্র তাহার চোখের সম্মুখে আবার ভাসিতে লাগিল। গত শীতকালে শুভমুণ্ডের মনে অতীতের ঘটনা অনেকবার জাগিয়াছে এবং সেই সব কথা মনে করিয়া সে এমন কোন সুখ পাইত যাহা তাহার সমস্ত চিত্তকে আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কোন কোন দিন একা কাজ করিবার সময় সে অতীতের সমস্ত ঘটনার চিত্রকে নিজের মনে ডাকিয়া আনিত: সেই সাদা মেঘ, উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে উঁচু পাহাড়ের অন্ধকার বন, চাঁদের আলোয় পাহাড়ের পাদদেশ এবং সকলের শেষে এই তরুণী,—যে আনন্দের আতিশয্যে সজল নয়নে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। প্রত্যেক-বারই যেন ঐ ঘটনার চিত্র বেশী সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিত এবং প্রতিবারই ইহা বেশী করিয়া তাহার মনকে আলোড়িত করিত। শুভমুণ্ড যখন দেখিত হেল্‌গা অন্যান্যদের ন্যায় ঘরের কাজ লইয়া ব্যস্ত, তখন সে যে সেই তরুণী, তাহা ভাবা শুভমুণ্ডের পক্ষে কঠিন হইত। গির্জ্জা হইতে ফিরিবার পথে এখন সে হেল্‌গাকে একা পাইয়াছে এবং এই ইচ্ছাটি তাহার মনে জাগরূক না হইয়া পারিল না, যে, যেন অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য এই তরুণীকে সেই সন্ধ্যাকালের মত আবার কাছে পায়।

পথে হাঁটিতে হাঁটিতে হেল্‌গা হিলডুরের সম্বন্ধে কথা পাড়িল। এই পরগণায় হিলডুরের ন্যায় এমন বুদ্ধিমতী ও চমৎকার মেয়ে যে খুব কম, এই বলিয়া সে তাহার প্রশংসা করিতেছিল, এবং এমন স্ত্রী ঘরে আসিতেছে বলিয়া সে শুভমুণ্ডকে অভিনন্দিত করিতেছিল।

—"তাঁহাকে বলিও যেন তিনি আমাকে নেরলুন্দায় থাকিতে দেন—" সে বলিল, "এমন গিন্নীর কাজ করিতে পারিলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

হেল্‌গার কথায় শুভমুণ্ড মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতেছিল এবং অতি সংক্ষেপে তাহার কথার উত্তর দিতেছিল,—যেন খুব মনোযোগের সহিত সে তাহার কথা শুনিতেছিল না। হিলডুরকে হেলগার ভাল লাগিয়াছে এবং শুভমুণ্ড তাহাকে বউ করিয়া ঘরে আনিবে বলিয়া সে যে আনন্দিত, তাহা শুভমুণ্ডের ভালই লাগিয়াছে।

শুভমুণ্ড এবার প্রশ্ন করিল—"এই শীতকালটা আমাদের বাড়ীতে তোমার ভালই কাটিয়াছে, তা নয় কি?"

—"তোমার কথা সত্য। তোমার মা শ্রীমতী ঈজেবর্গ ও বাড়ীর অন্যান্য সকলেই আমার প্রতি এত সদয় ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।"

—"বনের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্ত মাঝে মাঝে তোমার ইচ্ছা হইত না কি ?"

—"হাঁ, প্রথম প্রথম, কিন্তু এখন আর না।"

—"আমার ধারণা যাহারা একবার পাহাড়ী বনের মধ্যে বাস করিয়াছে তাহাদের পক্ষে সেখানে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা না-হওয়াটা অস্বাভাবিক।"

হেল্‌গা ঘাড় বাঁকাইয়া পথের অপর পার্শ্বে তাহার সঙ্গীকে একবার দেখিয়া লইল। শুভমুণ্ড তাহার নিকট অপরিচিত লোক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার কথাবার্ত্তায় ও হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, হেল্‌গা তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিল না। হাঁা, সেই সে পুরুষ,—যে অতি দুঃখের দিনে তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। সত্য বটে শীঘ্রই সে অপর একজনকে বিবাহ করিবে, তবুও শুভমুণ্ড যে তাহার বিশ্বাসী বন্ধু হইয়া থাকিতে চায়, সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না।

হেল্‌গা যে সর্ব্বদাই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিশ্বাস করিতে পারে, ইহা আবার সে অনুভব করিয়া মনে খুব আনন্দ পাইল। হেলগার মনের ভাব এই যে শুভমুণ্ডের নিকট তাহার মনের সমস্ত কথা না বলিলে এবং সে যাহা জানিতে চায় না জানাইলে আর কাহার কাছেই বা প্রকাশ করিবে।

—"সত্যি, নেরলুন্দায় আসার পর প্রথম সপ্তাহগুলি কাটানো আমার পক্ষে বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।"—এই বলিয়া সে কথা আরম্ভ করিল।

—"কিন্তু তুমি অবশ্য তোমার মার কাছে এসব বলিবে না।—তুমি যদি নীরব থাকা ভাল মনে কর, তবে আমিও চুপ করিয়া থাকিব।···প্রথম দিকে বনে ফিরিয়া যাইবার বেশী বাকী ছিল না।"

—"সত্যি! আমার বরং ধারণা, আমাদের এখানে তোমার ভাল লাগিয়াছিল।"—নিজের দোষ কাটাইয়া সে উত্তর দিল—"কিন্তু তাতে আমার কোন দোষ ছিল না। আমি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, তোমাদের বাড়ীতে কাজ করা আমার একমাত্র বাঁচিবার পথ, তা ছাড়া আমার প্রতি সকলেই সদয় ছিলেন এবং বাড়ীর কাজও আমার শক্তির বাহিরে ছিল না। কিন্তু তবুও বনে ফিরিয়া যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠিত,—মনে হইত যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমাকে বনের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এমন কি, বনে ফিরিয়া যাইবার জন্ত আমি আমার বড় বন্ধুকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিতাম।"

—"হয়ত বা—" বলিয়া শুভমুণ্ড কথা আরম্ভ করা মাত্রই তাহাকে আবার থামিতে হইল।

—"না, শিশুর জন্ত আমার মোটেই কোন ভাবনা ছিল না। সে যে যত্নে আছে, আমি ভাল করিয়াই জানিতাম। কারণ আমার মা শিশুর খুবই যত্ন করিতেন। তবে এই শক্তি কি, তাহা আমি কথায় বুঝাইতে পারিব না। আমি যেন বনের পাখী এবং জোর করিয়া যেন আমাকে খাঁচায় পুরিয়া রাখা হইয়াছে। আমার মনে হইত, আমাকে না ছাড়িয়া দিলে আমি মরিয়া যাইব।"

—"তাই ত! তাহা হইলে তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ।"—বলিয়া শুভমুণ্ড একটু হাসিল। এখন সে দেখিতে পাইল, এই তরুণীকে সে চেনে, যেন সে মাত্র গত সন্ধ্যাকালে চোরাবালি ফার্মের আঙিনায় তাহার নিকটে বিদায় লইয়াছিল। হেল্‌গাও হাসিল, কিন্তু সে তাহার দুঃখের কাহিনী এখনও শেষ করে নাই। সে বলিয়া যাইতেছিল—

"কোন রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারিতাম না। বিছানায় আশ্রয় লইলেই আমার কান্না পাইত এবং সকালে বিছানা ছাড়িলে দেখিতাম যে বালিশের ওয়াড় চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। দিনের বেলা অন্যের সহিত কাজ করিবার সময় চোখের জল থামাইয়া রাখা সহজ হইত কিন্তু নির্জ্জন হইলেই আবার চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িত।"

"সারাটা জীবন ভরিয়া তুমি অনেক কাঁদিয়াছ।" এই বলিয়া শুভমুণ্ড সহানুভূতি না দেখাইয়া বরং মুচকিয়া হাসিতে লাগিল। হেলগা দেখিল, সে তাহার সকল কথাতে হাসে। তখন তাহাকে বুঝাইবার জন্ত সে আরও গদগদ হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—

"হয়ত বা তুমি কোন দিনই বুঝিবে না—আমি কতই না অশান্তি ভোগ করিয়াছি। কোন এক অজানা

টান আমায় পাইয়া বসিয়াছিল এবং সেই টান আমার ব্যক্তিত্বকে একেবারে আপনার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি, এক মুহূর্ত্তের জন্ম আমি মনে শান্তি পাইতাম না। কিছুই আমার ভাল লাগিত না, কোন কিছুই আমাকে সুখ দিত না, কাহারও সহিত পুরা মন দিয়া মিশিতে পারিতাম না। ঠিক প্রথম দিনের ন্যায় সকলকেই আমার কাছে অপরিচিত বলিয়া ঠেকিত।"

"কিন্তু—" গুডমুণ্ড ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এইনা বলিলে আমাদের এখানে থাকিতে চাও ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"তবে আবার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হয় কেন ?"

"না, এখন আর হয় না। আমি এখন ইহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি। একটু অপেক্ষা কর, সব শুনিবে।"

এই কথার পর গুডমুণ্ড তাহাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধানকে সংক্ষেপ করিয়া হেলগার পাশ ঘেঁষিয়া হাঁটিতে লাগিল। সকল সময়েই তাহার ঠোঁটে মৃদু হাসি। হেলগার কথা শুনিতে যে তাহার খুব ভাল লাগিতেছে তাহা স্পষ্ট। কিন্তু সে হয়ত হেলগার সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেও প্রস্তুত ছিল না। ক্রমে ক্রমে হেলগার মনও আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন তাহার চারি দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিবার দীর্ঘ পথটা আজ মোটেই ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হইতেছিল না। কোন্ এক অজানা আনন্দ তাহার পথ চলাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। নিজের কথা বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে সব কথা এখন আর পূর্ব্বের মত প্রয়োজনীয় মনে হইতেছিল না। একটি কথা না কহিয়া এখন যদি সে গুডমুণ্ডের সঙ্গে নীরবেও পথ চলে তাহাও তাহাকে সমান আনন্দ দিবে।

"আমার মনের অশান্তি যখন চরমে"—সে বলিয়া যাইতেছিল,—"আমি এক শনিবারের বিকাল বেলায় বাড়ী যাইবার ও সেখানে রবিবারটা কাটাইবার জন্ম তোমার মার কাছ হইতে ছুটি চাহিয়াছিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা পাহাড় বাহিয়া চোরাবালিতে যাইবার সময় আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম যে আমি আর নেরলুন্ডায় ফিরিব না। কিন্তু তোমাদের মত লোকের বাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হইয়াছি, সে জন্ম মা-বাবা এত খুশী যে ভরসা করিয়া আর বলিতে পারিলাম না যে তোমাদের এখানে থাকিতে আমার ভাল লাগে না। আমি চোরাবালির পাহাড়ে পৌছিবামাত্র আমার মনের দুঃখ ও অশান্তি একেবারে চলিয়া গেল। আমার মনে হইল এ সমস্তই আমার মনের কল্পনা। তাছাড়া শিশুটির জন্মও আমার আশা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। নিজের মনে করিয়া আমার মা শিশুকে যত্ন করিতেন। শিশুটি আর আমার ছিল না, তাহা ভালই হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাবে অভ্যস্ত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল।"

গুডমুণ্ড প্রশ্ন করিল—"হয়ত বা তখন তুমি নীচে আমাদের বাড়ীতে ফিরিবার জন্ম অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলে।

—"কখনও না। শুধু সোমবার সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া যখন মনে হইল যে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে তখন আমার মনে কষ্ট হইয়াছিল। সে কি গভীর দুঃখ! তখন আবার আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং বড় অশান্তি বোধ করিতেছিলাম। কারণ তোমাদের বাড়ীতে যে কাজ করা উচিত এবং ইহাই যে আমার বাঁচিবার একমাত্র পথ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তখন আমার মনে হইয়াছিল যে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িব বা পাগল হইয়া যাইব। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল, এক সময় কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছিলাম, যদি কেহ নিজের ঘরের ছাই অন্য কোন বাড়ীর চিম্‌নিতে ছড়াইয়া দেয় তাহা হইলে আপন বাড়ীর আকর্ষণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।" "ও, এই ত ঔষধ,—সহজে পাওয়াও যায়, ব্যবহারও করা যায়"—এই বলিয়া গুডমুণ্ড হেলগার কথায় সায় দিল।

—"হ্যাঁ, কিন্তু ইহার ফল এই যে পরে আর অন্য কোন বাড়ীতে থাকা মোটেই ভাল লাগে না। যদি কখনও কাজ লইয়া অন্য বাড়ীতে যাইতে হয় তখন আবার ঐ বাড়ীর আকর্ষণে অশান্তি ভোগ করিতে হয়।"

"কিন্তু সেই বাড়ীর ছাই লইয়া কি নূতন বাড়ীতে যাওয়া যায় না ?"

"না, এই ঔষধ শুধু একবারই কাজ দেয়। পরে সকল

ঔষধই অকেজো। ইহা একবার ব্যবহার করা ভয়ের ব্যাপার।”

গুডমুণ্ড বলিল, “আমি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে কখনই সাহস পাইব না।”

হেল্‌গা বেশ বুঝিল, সে বিদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু বলিল, “আমি তবুও সাহস পাইয়াছিলাম। তোমার মা ও অন্যান্য সকলেই আমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ও এত সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন যে অকৃতজ্ঞ হইয়া কাজ করার চেয়ে ইহা অনেক ভাল। হ্যাঁ, আমি ফিরিবার সময় বাড়ী হইতে ছাই সঙ্গে লইয়াছিলাম এবং নিরলুন্দায় পৌছানর পর যখন ঘরে সবাই অনুপস্থিত ছিল, সেই সুযোগে চিম্‌নির খোপে ইহা ছড়াইয়া দিয়াছিলাম।”

“এবং তুমি বিশ্বাস কর যে এই ছাই তোমাকে সাহায্য করিয়াছিল?”

“অপেক্ষা কর। সব শুনিবে। আমাকে ফিরিয়াই ঘরের কাজ আরম্ভ করিতে হইল এবং সারা দিনের মধ্যে ছাইয়ের কথা ভাবিবার মোটেই সুযোগ হয় নাই। বাড়ীর টানে পূর্ব্বের ন্যায় অশান্তিই ভোগ করিতেছিলাম। ঘরের ভিতরে বাড়ীতে সেদিন অনেক কাজ বাড়িয়াছিল এবং দিনের শেষে গোশালার কাজ সারিয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম চিম্‌নির আগুন জ্বলিতেছে।”

গুডমুণ্ড বলিল, “তার পর?”

“ও মা, ভাব দেখি, বারান্দা দিয়া যাইবার সময় আমার ধারণা হইল ঘরের মধ্যে বাড়ীর গন্ধ। দরজা খোলা মাত্রই আমার মনে হইল যেন আমি বাড়ীর ছোট ঘরে ঢুকিতেছি এবং বাবা, মা, যেন আগুনের কাছে গিয়া বসিবেন। অবশ্য, এ সমস্ত যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বড় কোঠায় ঢুকিয়া বোধ হইল—আমি নিজের বাড়ীতেই আছি। তোমার মাকে এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলকেই সেদিন এত সদয় মনে হইতেছিল যেন পূর্ব্বে আমি সেরূপ কখনও দেখি নাই। এত আত্মহারা হইয়াছিলাম যে আনন্দে চীৎকার করিতে ও হাততালি দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল। মনে হইতেছিল তোমরা সকলেই একেবারে অন্য রকমের মানুষ, কেহই যেন অপরিচিত নও, এবং সেদিন হইতে বাড়ীর সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পার, আমার মনে কত না আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু আমি নিজেই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আমি কি কোন যাদুমন্ত্রে অভিভূত?” কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই চিমনির খোলে ছাই দেওয়ার কথা মনে পড়িল।”

গুডমুণ্ড বলিয়া উঠিল—“অ্যাঁ, এ ত খুব আশ্চর্য্যের কথা।” আসলে গুডমুণ্ড যাদুমন্ত্র বা তেমন কিছুতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু হেল্‌গার কথাও তাহার ভাল না-লাগার কারণ ছিল না। সে ভাবিল, এখন সত্যই বনের তরুণী কথা বলিতেছে। এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে যে, জীবনে যে-মানুষটি এত দুঃখ পাইয়াছে, সে এমন বালিকাটির মত কথা বলিতে পারে।

হেল্‌গা বলিল, “সত্যিই খুব আশ্চর্য্যের কথা, এবং সারা শীতকালটাই এরূপ ঘটিয়াছে। যখনই চিম্‌নিতে আগুন জ্বলিত, তখনই আমি বাড়ীর শান্তি ও সুখ বোধ করিতাম। কিন্তু আগুনের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ছিল। সেই চিম্‌নির আগুন ছাড়া অন্য কোন কথা মনেই আসিত না। প্রতি সন্ধ্যায় চিম্‌নিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিলেই মনে হইত, যেন বাড়ীর সকলেই আমার আপন জন, আর সেই আগুন যেন আমার কতই না পরিচিত। ইহা আনন্দে কখনও যেন খেলা করে, কখনও বা নাচে, আবার কখনও বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে—যেন ইহার মনটা ভাল নয়। ইহা যেন সুখ দুঃখ দিবার ক্ষমতা রাখে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঘরের আগুন এখানে আশ্রয় লইয়াছে এবং আপন বাড়ীর মত এখানেও ইহা গৃহসুখ দেয়।”

গুডমুণ্ড বলিয়া উঠিল—“যদি কোন দিন নেরলুন্দা ছাড়িয়া যাইতে হয়!”

“ওঃ, তখন সারা জীবনই ইহা আমাকে টানিবে।”

হেল্‌গার উত্তরে এবং কণ্ঠস্বরে বুঝা যায় যে সে সত্যই আপন অন্তরের কথা বলিতেছে। “হ্যাঁ, আমি কখনও তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিব না।” এই বলিয়া গুডমুণ্ড হাসিল বটে কিন্তু সেও যে আবেগ-বশে নিজের মনের কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা হেল্‌গার বুঝিতে বাকী রহিল না।

তাহার পর দুজনেই নীরবে একত্রে বাড়ী পর্য্যন্ত গেল। পথে তাহাদের মধ্যে আর কোন বিষয় আলোচনা হইল না। গুডমুণ্ড ঘাড় বাঁকাইয়া মাঝে মাঝে তার সঙ্গিনীর চলার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত এই তরুণী কতই না দুঃখভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন তাহাকে বেশ শান্ত দেখাইতেছিল। তাহার শরীর বেশ শুভ্র এবং মুখখানা বেশ ফুটফুটে গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে। আকারে সে ছোট কিন্তু বড়ই মিষ্টি ও কোমল; চুলের বেণী মাথার চারি দিকে গোল করিয়া বাঁধা; চোখগুলি সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা কঠিন। রমণীসুলভ কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সে মৃদুপদে হাঁটিয়া চলিয়াছে। যখন সে কথা বলে, শব্দগুলি তখন যেন একটার পর একটা করিয়া মুখ হইতে বাহির হয়। কিন্তু কথা বলিতে তাহার যেন সম্পূর্ণ সাহসের অভাব। পাছে কেহ উপহাস করে বলিয়া সে কোন কথা বলিতে ভয় পাইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে নিজের মনের কথা লুকাইয়া রাখিতে পারিত না।

গুডমুণ্ড নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল—"হিলডুরও ঠিক এইরূপ হয় তাহা কি তুমি চাও?" কিন্তু সে তাহা চায় নাই। হাজার হইলেও বিবাহ করার পক্ষে হেল্‌গা যে কিছুই নয়।

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর হেল্‌গা শুনিল যে, আগামী এপ্রিল মাসে তাহাকে নেরলুন্দা ছাড়িয়া দিতে হইবে। কারণ এক ঘরের ছাদের নীচে তাহার সহিত বাস করিতে ঈরিকের মেয়ে হিলডুর মোটেই রাজী নয়।

বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নী সেকথা গোপন রাখিয়াছিলেন, হেল্‌গাকে বলেন নাই। শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ সংবাদটা তাহাকে এইরূপ ভাবে দিয়াছিলেন যে, নূতন বউমা ঘরে আসিলে বাড়ীর কাজে তাহার এত সাহায্য পাওয়া যাইবে যে, তখন তাহাদের আর এত চাকর-চাকরাণী রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। অন্য এক সময় তিনি হেল্‌গাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোথাও ভাল একটা কাজের সন্ধান পাইয়াছেন, হেল্‌গা ঐ কাজ পাইলে নিশ্চয়ই বেশী সুখে থাকিবে।

কাজ যে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা বুঝিবার জন্য হেল্‌গার আর বেশী কথা শোনার প্রয়োজন ছিল না। সে তখনই জানাইল, সেও কাজ ছাড়িয়া দিতে চায়, অন্য কোন কাজ লইতে ইচ্ছা করে না। কারণ, সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক।

হেল্‌গাকে যে অনিচ্ছায় কাজ ছাড়ানো হইতেছে তাহা বাড়ীর লোকের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে বেশ ভাল করিয়া বুঝা গেল।

হেল্‌গার চলিয়া যাইবার দিন উপস্থিত হইলে পর বড় ঘরের টেবিলের উপর এত রকমের জিনিষ সাজানো হইল,—যেন সমস্তই বিশেষ কোন উৎসবের আয়োজন। শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ তাহাকে নানা রকমের পোষাক ও জুতা এত উপহার দিলেন যে তরুণীর বড় বাক্সেও সব ধরে না। যে-তরুণী এক দিন শূন্য ব্যাগ লইয়া তাহাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল, আজ তাহার পক্ষে সমস্ত উপহার-দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন।

শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ বলিলেন, "তোমার মত এমন কাজের মেয়ে আমি কখনই পাইব না, এবং এখন তোমাকে যাইতে দিতেছি বলিয়া আমার উপর রাগ করিও না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝ যে, ইহা আমার ইচ্ছায় হইতেছে না। কিন্তু আমি তোমাকে কখনও ভুলিতে পারিব না। যত দিন আমার শক্তি আছে তত দিন তোমাকে কোন দুঃখ পাইতে হইবে না।"

তিনি হেল্‌গার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে যেন বাড়ী ফিরিয়া তাহার জন্য বিছানার চাদর ও গামছা বুনে। তিনি হেল্‌গাকে অন্ততঃ ছয় মাসের মত কাজ দিয়াছিলেন।

হেল্‌গা চলিয়া যাইবার দিন সকাল হইতেই গুডমুণ্ড একচালার নীচে দাঁড়াইয়া জ্বালানী কাঠ টুকরা টুকরা করিতেছিল। ঘোড়ার গাড়ী সামনেই প্রস্তুত। কিন্তু তাহার বিদায়-মুহূর্ত্তে গুডমুণ্ড তাহাকে অভিবাদন জানাইতে আসে নাই। সে যেন নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে আর-কি হইতেছে না-হইতেছে তাহা দেখিবার তাহার অবসর নাই। অগত্যা হেল্‌গা বিদায় লইবার জন্য তাহার কাছে আসিল।

গুডমুণ্ড হাত হইতে কুড়াল নামাইয়া জোরে হেল্‌গার করমর্দ্দন করিল এবং খানিকটা অতিরিক্ত তাড়াতাড়িতে বলিল, "সেই সময়ের জন্য ধন্যবাদ।"—এই বলিয়াই সে

আবার কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। হেল্‌গা বলিবে ভাবিয়াছিল যে, শুভমুণ্ডের পক্ষে তাহার যত্ন করা যে সম্ভব নয় তাহা হেলগা নিজে বেশ বুঝে এবং ইহার জন্য সে নিজেই দোষী। কিন্তু শুভমুণ্ড দারুণ ব্যস্ততার সহিত কাঠ কাটিতেছিল। কাঠের টুকরা তাহার কুড়ালের মুখ হইতে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হেল্‌গা কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইল না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধ এরল্যাণ্ডসন্ নিজেই গাড়ী করিয়া হেল্‌গাকে চোরাবালিতে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন।

শুভমুণ্ডের পিতা দীর্ঘাকৃতি নন, তাঁহার মাথায় টাক পড়িয়াছে। দেখিতে তিনি অতি সুপুরুষ। চোখগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তিনি সর্ব্বদাই আপন মনে থাকিতেন এবং অত্যন্ত কম কথা কহিতেন যে, কোন কোন দিন তাঁহার মুখে একটি কথাও শোনা যাইত না। বাড়ীতে যতক্ষণ সমস্তই নিয়মমত চলিত, ততক্ষণ তাঁহাকে যেন কাহারও চোখেই পড়িত না, কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তিনি সকলের আগে তাহা ঠিক করিবার জন্য যাহা বলা ও করা প্রয়োজন তাহা করিতেন। সমস্ত বিষয়েই ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের বিশ্বাস ও সম্মান ভোগ করিতেন। অনেক জটিল মামলায় সালিস নিষ্পত্তি করিতে বড় বড় জমিদার অপেক্ষাও তাঁহাকে বেশী করিয়া ডাকা হইত।

হেল্‌গাকে একা পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া বাড়ী যাইতে না দিয়া এরল্যাণ্ডসন নিজেই গাড়ী করিয়া তাহাকে চোরাবালিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। চোরাবালিতে পৌঁছিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেলগাদের বাড়ীতে বসিয়া তিনি তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন। তিনি নিজে এবং শ্রীমতী ঈজেবর্গ যে হেল্‌গার কাজকর্ম্মে খুবই প্রীত, ইহাও তাহার বাপ-মাকে জানাইয়া দিলেন; এখন হইতে তাঁহাদের এত লোকের প্রয়োজন নাই, শুধু এই কারণে তাঁহারা হেল্‌গাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন; হেল্‌গা বয়সে ছোট, অন্যান্য চাকর-চাকরাণী যাহারা অনেক বৎসর ধরিয়া কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ছাড়ানোটা ত ভাল দেখায় না।

তাহার কথায় ইচ্ছানুরূপ কাজ হইয়াছিল। হেল্‌গার বাপ-মা আদর করিয়া হেলগাকে বাড়ীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আপাতত এত কাজ পাইয়াছে যে নিজের জীবিকা সে নিজেই অর্জ্জন করিতে পারে, ইহা বুঝিয়া তাঁহারা আনন্দসহকারে স্থির করিলেন, এখন হইতে হেল্‌গা বাড়ীতেই থাকুক।

সখিসংলাপ—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

প্রসাধন—শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

জলকন্যা
শ্রীচিন্তামণি কর
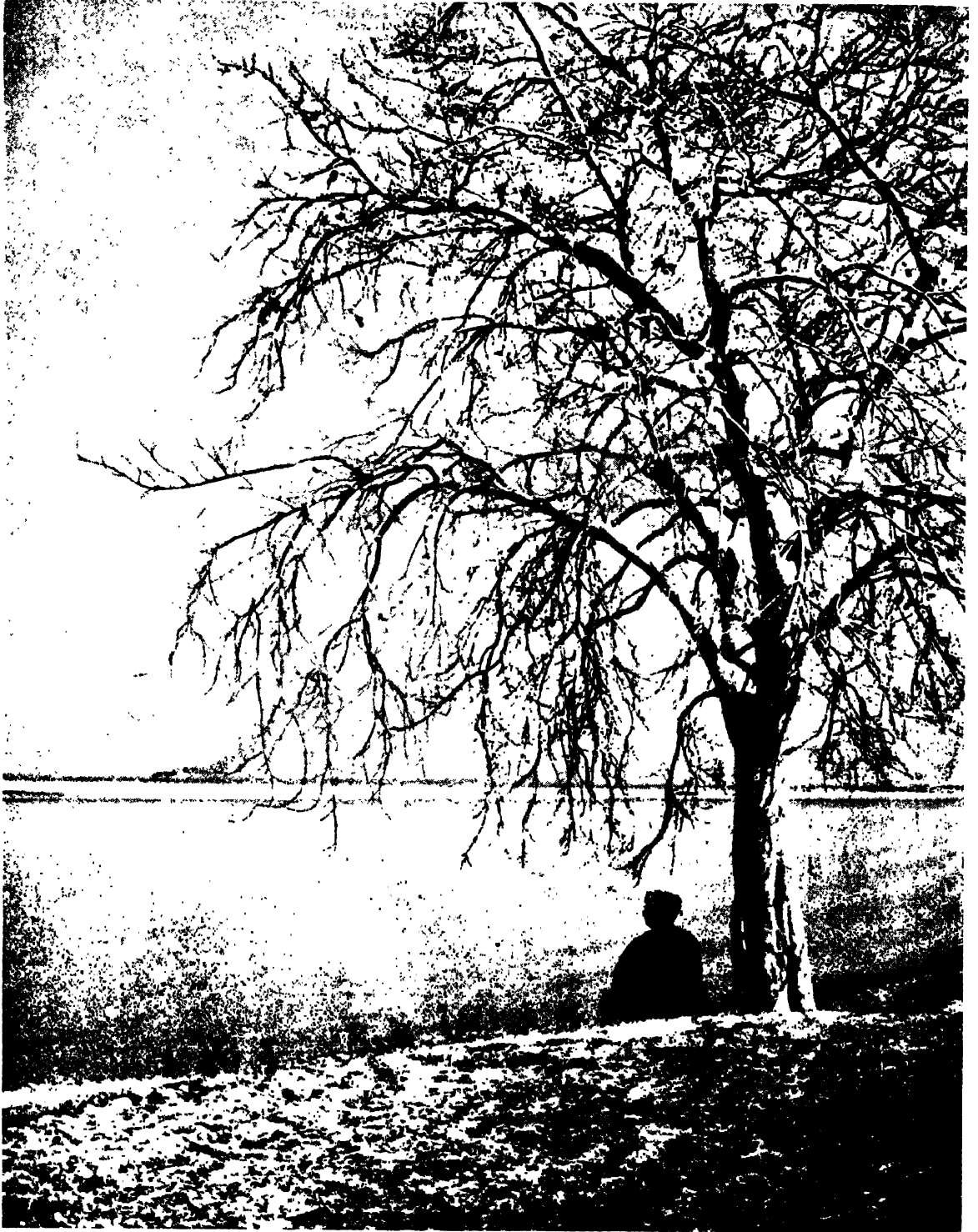
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শীতের শূন্যতা

শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ছায়াপথ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরণজিৎ মিত্র, ১৩৬।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সতেরটি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য। দুই-এক স্থানে ছন্দের ত্রুটি আছে—'অতল আঁধারে থাক তোমার মুখেতে চেয়ে' কিংবা 'কাঁদে প্রিয়া বুকের কপাট তলে'—এই ছত্রগুলির ছন্দ পূর্ব্বাপর ছত্রের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে নাই। মোটের উপর কবির প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়।

নূতন পুরাণ—অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল প্রণীত। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর হইতে এম. চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা।

পৌরাণিক অনেকগুলি গল্পকে লেখক আধুনিক গল্পে পরিণত করিয়াছেন। ছেলেদের পাঠ্য হিসাবে ভালই হইয়াছে। তবে গ্রন্থখানি ছোট ছেলেদের পক্ষে একটু কঠিন হইবে। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক।

ধরা ছোঁয়ার বাইরে—শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০।১ মদন মিত্র লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ১১৮। মূল্য এক টাকা।

রহস্যপূর্ণ সচিত্র গল্প। মনে বেশ কৌতূহল জাগাইয়া রাখে; কিন্তু গল্পের প্রধান ত্রুটি এই যে ঘটনাগুলি কোথায়ও বাস্তব বলিয়া বোধ হয় না। লেখক কলিকাতার ঘটনায় কলিকাতার বাস্তবতা ফুটাইতে পারিলে গল্পটি আরও ভাল হইত। ভাষা বিষয়ে লেখক মাঝে মাঝে উগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। গল্পের মধ্যে এক জায়গায় বন্ধুর একখানা গ্রন্থের নাম উল্লিখিত এবং তাহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহা উভয়ের পক্ষেই অগৌরবের হইয়াছে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

তপ ও তাপ—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক, শ্রীহেমচন্দ্র সাহা, নিউ বুক ষ্টল, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে লেখক লেখার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু গল্পাংশ তেমন জমাইতে না পারায় বইখানি স্থানে স্থানে কিছু নীরস ঠেকে। কিন্তু তবু স্বীকার করিব মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে লেখক যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার উপর পাঠকের নির্ভর জন্মে। লেখক বিষয়-নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন নতুবা উপন্যাসখানি নিখুঁত হইত সন্দেহ নাই। চরিত্র-অঙ্কনেও লেখকের হাত আছে, বিভাকে একেবারে জীবন্ত বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গগৌরব (দ্বিতীয় খণ্ড)—রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন প্রণীত এবং ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড কর্ত্তৃক ২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

ইহাতে বাঙ্গালা দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বালক-বালিকাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক।

প্রশ্নোত্তরিকা—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং ভারত বুক এজেন্সী কর্ত্তৃক ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহাতে সাধারণ জ্ঞানের ৩০০০ প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বালকদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও এই পুস্তকে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগের শিখিবারও যথেষ্ট আছে।

বিজ্ঞানের অ আ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত এবং শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৩এ, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

এই পুস্তকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সহজ আলোচনার মধ্যে সরলভাবে শিশুদিগের বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থকারের সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। এইরূপ শিশুপাঠ্য পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বন্দিনী—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত এবং চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক ৬এ, গোপাল ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহা একখানি উপন্যাস; বাঙ্গালার নবজীবনের চিত্র ইহাতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে এই নবজীবনের সাড়া বহুকালের পুঞ্জীভূত অজ্ঞতার নিকট কিরূপ বাধা পাইয়াছে, তাহাও ইহাতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গল্পটিতে নূতনত্ব আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রচনার দোষে গল্পটি জমে নাই। শেষ ভাগ কতকটা অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সোনার কাঠি—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী সম্পাদিত। দেবসাহিত্য কুটীর। পৃ. ২৮৮। ৭ খানি বহুবর্ণ ও ৫ খানি একবর্ণ পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও অন্যান্য বহু চিত্র সংবলিত। সচিত্র বোর্ড বাঁধাই। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বহু খ্যাতনামা লেখক কর্ত্তৃক শিশুদের জন্য নূতন রচিত চল্লিশটি কবিতা, গল্প, জীবনী, নাটিকা প্রভৃতি এই গ্রন্থে আহৃত হইয়াছে। রচনা-সংগ্রহে সম্পাদকগণ ত্রুটি করেন নাই; বইখানির উৎকর্ষ, আয়তন ও শোভন ছাপার অনুপাতে মূল্য খুব সুলভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে পুস্তক-চিত্রণের একঘেয়েমি ও নীচু ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে কবে দূর হইবে, তাহা একমাত্র পুস্তক-প্রকাশকগণই বলিতে পারেন; এই বইখানির ছবিগুলিও সেই একঘেয়েমি হইতে মুক্ত নহে।

টাকার কথা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সংবলিত। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ২২৩। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম বিভিন্ন পত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন পাঠক-সাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় ও গ্রন্থখানি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ন্যায় প্রবাসীতেও বিশেষ প্রশংসিত হয়। অতঃপর, বাংলা পুস্তকের পক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হইয়াছে।

বইখানির সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ ইহার প্রসাদগুণ, সহজ ও সরস বলিবার ভঙ্গী। গুরু গবেষণা ইহাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আর্থিক ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণে যাহা জানিতে চাহেন ও সাধারণেরও যাহা জানা প্রয়োজন, কিন্তু উপযুক্ত সহায়ের অভাবে জানিতে পারেন না কিংবা কোন কঠিন পুস্তকের সাহায্যে জানিতে গিয়া (বিষয়টি মূলত সহজ ও লঘু নহে) ব্যাহত হন, এই বইখানিতে লেখক সেই সব আর্থিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের একটি প্রধান অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন।

বইখানি যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে তাহাতে বিশেষ আশা ও আনন্দের কারণ আছে। লেখক একটি প্রবন্ধে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক ব্যাপারের আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ এসব তত্ত্ব অধিগত করা ও প্রয়োগ করা জাগতিক ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হইবার ও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একান্ত দরকার। এই বইটির সমাদর দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের দেশে যাঁহারা জ্ঞান আহরণ করেন তাঁহাদের সীমার বাহিরে যে সব সাধারণ পাঠক আছেন, বাংলাই যাঁহাদের সম্বল, এই একান্ত আবশ্যক তত্ত্বগুলি জানিবার ঔৎসুক্য সেই সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে।

বইটির লেখ-সূচী দ্বারা ইহার আলোচ্য বিষয়ের পরিধি বুঝা যাইবে—রাজনীতি বনাম অর্থনীতি, স্বর্ণমান, ভারতে মুদ্রানীতি, আমাদের রেশিও-সমস্যা, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট, দেশীয় শিল্পের অন্তরায়, যে দেশে টাকা নাই, অর্থ ও ঐশ্বর্য্য, আধুনিক ব্যাঙ্কিং, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং। বর্ত্তমান সংস্করণে পাঁচটি নূতন পরিচ্ছেদ যুক্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্টের "পরিভাষা" অধ্যায়টি আর্থিক বিষয়ে লেখকদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

দৈত্যে ও মানুষে—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ রচিত। প্রকাশক—যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস, ১৩ ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছেলেদের উপন্যাস। "পাতালবাসী দৈত্যদের রাজা প্রচণ্ডাসুর—রত্নপুরের রাজা অরীন্দ্রজিতের কন্যা দীপ্তিরাণীকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে আটকে রেখেছে।" সেই রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্য কাঞ্চীপুরের রাজপুত্র রাঘবেন্দ্র বদ্ধপরিকর। কিন্তু পাতালবাসী দৈত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হ'লে স্বর্গবাসী বড় বড় দেবতা, যথা 'শিবঠাকুর', 'সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা' প্রভৃতির সহায়তালাভ তথা বরলাভ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আবার, দেবতার বরলাভ বিনা-তপস্যায় হয় না। তার পর তপস্যা করতে গেলেই 'বানরমুখো' নন্দী আর বিশ-পঁচিশটা বিকটাকার ভূতের আবির্ভাব অনিবার্য্য। যাই হোক, ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে রচিত এই উপন্যাসখানির ভাষা সহজ সরল হলেও এবং বর্ণনভঙ্গী অস্পষ্ট না হ'লেও এই উপন্যাসখানি ছেলেদের কোন উপকারে আসবে কি না এবং তাদের প্রীতিপ্রদ হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ছয়-সাত খানি ছবি দিয়ে বইখানিকে চিত্তাকর্ষক করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

সারতত্ত্ব—শ্রীসন্তোষবিহারী বসু প্রণীত। বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কৃষি-অনুরাগী বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট সন্তোষ বাবু অপরিচিত নহেন। ইনি পূর্ব্বে সুরুল-শ্রীনিকেতনে ছিলেন; বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও বিহারে কৃষি-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে বহু দিন কার্য্য করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ "সরল কৃষিশিক্ষা", "ফুল বাগান", "বঙ্গদেশে তুলার চাষ" ইত্যাদি লিখিয়াছেন। "সারতত্ত্বে" নবপ্রবর্ত্তিত সারের অবস্থা, ক্রিয়া, প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে সরল ভাষায় আলোচনা আছে। কৃষিপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার পাইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বুদ্ধদেবকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে-সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উপস্থাপিত হয় বা হইতে পারে, পালিগ্রন্থ অবলম্বনে সেই সব যুক্তির অসারতা এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী যে-সমস্ত মতবাদ বুদ্ধদেবের উপর আরোপিত হয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে বুদ্ধদেব ঠিক সেই সমস্ত মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন না—ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সহিত তাঁহার মতের স্থানে স্থানে অনৈক্য থাকিলেও সম্পূর্ণ বিরোধ ছিল না। ব্রাহ্মণ্য দর্শনে—বিশেষ করিয়া বেদান্তে—গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য সুপরিচিত; আলোচ্য পুস্তকখানি পালিগ্রন্থেও তাঁহার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আধুনিক সাহিত্য—শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। সন্তোষ লাইব্রেরি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

লেখক আধুনিক সাহিত্যের সম্পদ এবং অভাব-অভিযোগের সম্পর্কে অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী সমালোচককে তিনি ভৎর্সনা করিতে ছাড়েন নাই, যেখানে সেরূপ সমালোচনা ভৎর্সনার উপযুক্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মন্দ দিক যেমন তিনি দেখাইয়াছেন, সেই সঙ্গে তেমনি আবার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন কি ভাবে হইতে পারে তাহারও আভাস দিয়াছেন। শিশুসাহিত্য, সাহিত্যে বাস্তবতা ও অশ্লীলতা প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তিকাখানিতে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অপর দিক দিয়া কয়েকটি ত্রুটির কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজী শব্দের মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ দেখা যায়। একটু সাবধান হইলেই বাংলা প্রতিশব্দ এ সকল ক্ষেত্রে চলিতে পারিত। আনাতোল ফ্রাঁসের "থাই"—একথা যিনি বলিতে পারেন, তিনি "জন ক্রিষ্টোফার" না বলিয়া "জাঁ ক্রিস্তোফ্" বলিবেন না কেন? "moto-justo" কথাটির অর্থ না বলিয়া দিলে উহার বিকৃত রূপ দেখিয়া কেহ অর্থগ্রহণ সহজে করিতে পারিবে না। যে-সকল সাহিত্যিকের নাম লেখক করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামের আগে "শ্রী", কাহারও বা নামের আগে "শ্রীমান্", কাহারও নামের আগে আবার কিছুই নাই। শচীন সেন "শ্রীমান্", তবে বাংলামতে নহেন।

লেখকের স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস আছে। এ সাহস আজকালকার বাজারে দুঃসাহস। তথাপি এই সব কথা তিনি ভাল করিয়া গুছাইয়া বলেন, ইহা আমরা আশা করি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আঠার বছর পরে

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আর্য্য সেনের বাড়ীটাকে খুঁজে বার করতে সুব্রতর বেশ খানিকটা অসুবিধে হ'ল। অসুবিধে হবারই ত কথা··· প্রায় আঠার বছর হবে সে কলকাতা ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একটা চাকরি নিয়ে। তখনকার কলকাতার সঙ্গে এখনকার কলকাতার অমিল যথেষ্টই। তখন রাস্তার দু-পাশে সবে যে কচি কচি গাছের চারা লাগান হয়েছিল সে গাছগুলো আজ ডালপালা মেলে অর্দ্ধেকটা পথের উপর ঝুলে পড়েছে। কত নূতন বাড়ী উঠেছে, হয়েছে কত পার্ক, কত অ্যাভিনিউ।

অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে সুব্রত অবশেষে একটা ছোট রাস্তার ভিতরকার এক দোতলা বাড়ীর সামনে এসে থামল। পকেট থেকে একটা চিঠি বার ক'রে সুব্রত আর একবার বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে নিল। না, আর সন্দেহের কারণ নেই; এইটাই আর্য্যের বাড়ী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পকেটের সিগারেট-কেস্ থেকে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সুব্রত দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল।

উত্তর এল কিছু পরেই। একটা চাকর এসে দরজা খুলে জিগ্‌গেস করল, কাকে চাই।

কোন ভূমিকা না ক'রেই সুব্রত বলল, "বাবু বাড়ী আছেন?—আর্য্য সেন?"

উত্তরে চাকরটা বলল যে বাবু বাড়ী নেই, তবে খুব সম্ভব অল্পক্ষণের ভিতরেই তিনি ফিরবেন। রিষ্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে সময়টা দেখে নিয়ে সুব্রত বলল যে সে অপেক্ষা করবে।

বসবার ঘরটা সাধারণ ভাবে সাজান—এক পাশে পুরু গদিতে ঢাকা একটা তক্তপোষ, তার উপর ছুটো সিল্কের তাকিয়া; ঘরের মাঝখানে আসবাবপত্র ছবি, যেমন থাকে তাই।

একটা সোফায় ব'সে প'ড়ে সুব্রত ভাল ক'রে ঘরটা দেখতে লাগল। ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে সাতটা বেজে গেল; রাস্তার আলোগুলো জলে উঠল একসঙ্গে; এক দল ছেলে ফুটবল খেলায় জিতে চীৎকার ক'রে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল।

সামনে টিপয়ের উপরকার গোল ছাইদানীতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সুব্রত ভাবতে লাগল। ভাবনার বিষয় তার প্রচুর। আঠার বছরের পুঞ্জীভূত ভাবনা যেন তার দেহে-মনে ফেঁপে উঠল! আর্য্য সেন··· আঠার বছর আগে তার সঙ্গে শেষ দেখা। তারা দু-জনে সবে তখন বি-এ পাস করেছে; সুব্রত ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল, আর আর্য্য রইল কলকাতায় প'ড়ে।

আঠার বছরেরও আগেকার কথা সুব্রতর আজও ভাল ক'রে মনে পড়ে। স্কুল থেকে তারা একসঙ্গে প'ড়ে এসেছে।···স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে তারা কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। সেদিন তাদের সে কি আনন্দ! কত অদ্ভুত কল্পনা দুটি কিশোর প্রাণকে দোলা দিয়ে যেত;···তারা দু-জনেই চলে যাবে বিদেশে! বাড়ী থেকে হয়ত অর্থ বা অনুমতি কোনটাই পাওয়া যাবে না; কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? তারা জাহাজেই কোনও চাকরি নেবে!···জাহাজের উপরকার সন্ধ্যা···চার দিকে নোনা জলের ঢেউ, কোথাও নেই উপকূলের ইসারা, হাওয়ায় অপূর্ব্ব এক মাদকতা··· পাতলা মেঘের গায়ে শুধু একটু সোনালী আভা, অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের সোনালী হাতছানির মত!

ঘড়িতে ঢং ক'রে শব্দ হ'ল···সাড়ে সাতটা বাজল।

সুব্রত আর একটা সিগারেট ধরাল।

···আচ্ছা, আর্য্য তাকে চিনতে পারবে ত? চিনতে না পারলেও তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ব্যবধান ত কম নয়···সুদীর্ঘ আঠারটি বছরের; পুরনো স্মৃতির উপর

তা হয়ত ধীরে ধীরে ফেলেছে একটা পুরু যবনিকা।— কিন্তু, আর্য্য তাকে চিনতে পারবে না? তাও কি কখনও সম্ভব? আর সে···সেও কি আর্য্যকে চিনতে পারবে? সমস্তাটা এবারে তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হয়ত কোনও অপরিচিত লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে সে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়বে, আর সে ভদ্রলোকটিও হয়ত আশ্চর্য্যের স্বরে তাকে জিগ্‌গেস করবে এখানে তার কিসের প্রয়োজন। তার পর···দু-জনেই সমান অপ্রস্তুত।

চাকরি নিয়ে সুব্রত যেদিন চলে গেল, সেদিনকার কথা আজও তার বেশ মনে আছে। আর্য্য তাকে ভারী গলায় বলেছিল, "কন্‌গ্র্যাচুলেশ্বন্‌স। কিন্তু ভুলিস না ভাই আমাদের ভবিষ্যতের প্ল্যান। তুই তত দিন কিছু টাকা জমিয়ে নে, আর এদিকে আমিও এম্‌-এ-টা পাস ক'রে নিই। বুঝেছিস্‌···পৃথিবী-ভ্রমণে আমাদের যাওয়া চাই-ই।"

উত্তর দিতে গিয়ে সুব্রতর গলাটা সেদিন ভারী হয়ে গিয়েছিল। সে তাই বিশেষ কিছু বলে নি, শুধু আর্য্যর হাত দুটোয় একটু জোরে চাপ দিয়ে সে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, না···সে ভুলবে না সে-কথা···কোনও দিন না। ভবিষ্যতের যে উষ্ণ কল্পনায় কত রাত তারা উৎসাহের আতিশয্যে না-ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সে কথা ভোলা কখনও কি সম্ভব? আর যার পক্ষেই সে-কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব হোক না কেন, আর্য্যর পক্ষেও তা সম্ভব না, সুব্রতর পক্ষেও না।

কিন্তু আজ সুব্রতর মনটা যেন কি রকম কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। সে যেন অপরাধ করেছে···একটা মারাত্মক অপরাধ! সে যেন অতি নিষ্ঠুর ভাবে অপমান করেছে নিজের আত্মাকে! অপমান··হ্যাঁ, অপমানই ত। ভবিষ্যৎ —তাদের সোনালী ভবিষ্যৎ চিরকালই ত থেকে গেল ভবিষ্যৎ হয়েই; চিরকালই ত তা রয়ে গেল কল্পলোকে। এক দিন তারা যেটাকে ধ্রুবসত্য ব'লে মেনে নিয়েছিল, আজ কিনা সেটাই নিষ্ঠুরভাবে প্রমাণিত হ'ল মিথ্যে ব'লে— আশ্চর্য্য মানুষের মন! সুব্রত মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল, উত্তেজিত হয়ে উঠল কোন্‌ এক অদৃশ্য মহাশক্তির উপর! আর সে নিজেই ত ভবিষ্যৎকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছে, বিনিময়ে পেয়েছে শুধু চাকরির নিশ্চিন্ততা আর সংসারের সচ্ছলতা! কিন্তু কেন এমন হয়,··কেন লোকে ভুলে যায় নিজেদের আদর্শের কথা, কেন লোকে ধরা দেয় মিথ্যের জালে, গতানুগতিকের নাগপাশে? সুযোগ ত কত বারই উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু মনে তখন অনুপস্থিত ছিল উৎসাহ।

আর আর্য্যটাই বা কি রকম? সেই বা কোন্‌ চেষ্টা করেছিল নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে? সে বলেছিল এম্‌-এ পাস ক'রে তারা বেরিয়ে পড়বে। যথাসময়ে সে এম্‌-এ পাস করল, পেল একটা সাধারণ চাকরি তার পর সে করল বিয়ে। নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠাতে সে ভুল করে নি। কিন্তু সুব্রতর মনে তা বিঁধেছিল বিধাতার অভিশাপের মত; লাল খামটাকে সে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। শেষকালে আর্য্যটাই কি না ও-রকম কাণ্ড করল? ওই কিনা প্রথমে গতানুগতিকের স্রোতে গা ঢেলে দিল? এবারে আর্য্যর উপর তার রাগ হ'তে লাগল···আর্য্যর দোষই ত সত্যিই বেশী! আর্য্য যদি এম্‌-এ পাশ ক'রে তাকে ডাকত বিদেশে পাড়ি দেবার জন্যে, তা হ'লে স্বচ্ছন্দেই সুব্রত এখনকার সমস্ত জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারত।

কিন্তু মানুষের মন কি অদ্ভুত! আর্য্যর উপর রাগ হ'লে হবে কি, তাকে দেখবার জন্যে সুব্রতর ত কই একটুখানিও কম ইচ্ছে নেই! বরঞ্চ সেটা যেন আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। সেটা আগেকার ভালবাসার জন্যে, না নিছক কৌতূহলের খাতিরে, তা সুব্রত হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। কৌতূহল···হ্যাঁ, কৌতূহল ছাড়া আর কি? আগেকার ভালবাসার কিই বা অবশিষ্ট আছে? প্রতিমার হয়েছে বিসর্জ্জন···খড়ের কুশ্রী কাঠামোটা শুধু মাথা তুলে রয়েছে··· আকাশে-বাতাসে কি রকম একটা নিরানন্দ ভাব!

কিন্তু সুব্রতকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। বাইরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ, তার খানিক পরেই দরজা ঠেলে ঢুকল এক ভদ্রলোক, শরীরে তার প্রৌঢ়ত্বের শিথিল বাঁধন, দেহ ঈষৎ স্থূল, দু-পাশের রগের চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা বেশ প্রশস্ত বলেই মনে হয়, গায়ে একটা মটকার পাঞ্জাবী, হাতে কয়েকটা বাদামী কাগজের প্যাকেট।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

এই কি আর্য্য ? হ্যাঁ··ওই ত তার কানের কাছটায় কাটার দাগ আজও মিলিয়ে যায় নি। সেবার স্কুলের হয়ে ফুটবল খেলতে গিয়ে ওখানটা কেটে যায়।

"আমাকে চিন্‌তে পারিস ?" সুব্রত জিগ্‌গেস করল।

"আপনাকে···আপনাকে...," ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত হয়েই মাথা চুলকাতে লাগলেন। "আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি...কোথায় যেন·· আরে আরে, তুই সুব্রত না কি ?"

"তোর আবিষ্কারের প্রশংসা করি।" সুব্রত বলল, "ও, কতক্ষণ তোর জন্যে অপেক্ষা করছি জানিস ? আরও দেরি করলে সত্যিই হয়ত আজ আমি চলে যেতাম !"

আর্য্য ততক্ষণে সুব্রতর পাশের সোফায় ব'সে পড়েছে। মরা গাছে লেগেছে যেন নবীন ফাল্গুনের উষ্ণ হাওয়া··· তার শুক্‌নো ডালপালাগুলো উঠেছে মর্ম্মরধ্বনি ক'রে।

"তুই একটা আস্ত ইডিয়ট।" অনেকটা আগেকার সুরে আর্য্য বলে চলল, "তা নইলে খবর না দিয়ে এমনি চলে আসিস্ ? বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে ; বসে থাকতে হবে না ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে খানিকটা !" আর্য্য হাসতে লাগল।

"থাম থাম। আর লেকচার দিতে হবে না। চায়ের জন্যে একটা হাঁক দে ভাই। দোকানের আর চাকরের তৈরি চা খেয়ে মুখটা ত তেতো হয়ে গেছে।"

আর্য্য ইঙ্গিতটা বুঝল, তাই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু এত পরিবর্ত্তন কি সম্ভব ?—সুব্রত ভাবতে লাগল। —এ কি চেহারা হয়েছে আর্য্যর ? তাকে ত আর চেনাই যায় না ! এ যেন কোন একটা বুড়ো মানুষের চেহারা। চোখে-মুখে নেই সেই বুদ্ধির প্রখরতা, দেহে নেই প্রাণের সেই উচ্ছল চাঞ্চল্য। শুধু চোখ দুটো যেন সাক্ষী দিচ্ছে তার মৃত অতীতকে ; সেখানে যেন এখনও বেঁচে রয়েছে সেই অদ্ভুত আলো এক সময়ে যা শুধু দেখা যেত আর্য্যর ভিতর !

"আচ্ছা সুব্রত, তুই এ রকম গুড্ বয় হলি কবে থেকে রে ? আমি ত তোর কাছ থেকে এসব আশা করি নি !"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তুই যে এই বৈঠকখানাতেই তখন থেকে ব'সে আছিস ! উপরে গিয়ে বাড়ীটা ঘুরে আসিস্ নি !"

"সে রকম দুঃসাহস আর যারই থাক না কেন, আমার একেবারেই নেই। এখন ত তোর উপর বা তোর বাড়ীর উপর আমার আগেকার সেই অধিকার নেই। সে রকম দুঃসাহস দেখাতে গেলে আমাকে হয়ত পথ দেখতে হ'ত !"

"হয়েছে হয়েছে !" কোনও ভাল উত্তর খুঁজে না পেয়ে আর্য্য ব'লে উঠল, "এখন উপরে চল দেখি। বিপদ যদি কিছু আসে এই বুক পেতে নেব তাকে বরণ করে।"— একটু থিয়েটারী ঢঙে আর্য্য কথাগুলো বলল।

দু-জনেই তারা হেসে উঠল।

উপরে তিনটি ঘর, সব কটিই বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো। সুব্রত চুপি চুপি বলল, "তোর ত কোনকালে এ রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার অভ্যাস ছিল না !"

"এখনও কিছু আছে না কি ?" একটু হেসে আর্য্য বলল, "তবে ভাই সমস্তই ওই গিন্নী !···আরে এই যে, যাচ্ছ কোথায় ? এ যে সুব্রত, যার কথা তোমাকে কত দিন বলেছি। এস এস, আলাপ করিয়ে দিই।···ইনি হচ্ছেন সুব্রত রায়, আমার পরম বন্ধু—আর ইনি আমার গৃহিণী, নাম সুরমা।"

হাত দুটোকে মাথার কাছে ঠেকিয়ে সুব্রত বলল, "নমস্কার বৌদি। আপনাদের জ্বালাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না যেন।"

সুরমা কি একটা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। কপালে তার পরিশ্রমজনিত মুক্তোর মত এক সার ঘাম, চুলগুলো এলোমেলো, ঘাড়ের কাছটায় গোল গোল হয়ে পাকিয়ে গিয়েছে, দেহ ঈষৎ স্থূল, তবে বিশেষ বেমানান নয়, গায়ে একটা নীল জ্যাকেট···ডান হাতের ওপরটা অনেকটা ছেঁড়া, পরনের লাল শাড়ীটার পাড় মাঝে মাঝে গুটিয়ে গিয়েছে, কয়েক জায়গায় অস্পষ্ট হলুদের দাগ। স্বামীর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবককে নিঃশঙ্কচিত্তে বাড়ীর ভিতর আসতে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরিচয় শুনে বিশেষ কুণ্ঠিত হ'ল না। সুব্রতর কথা সে শুনেছে অনেক অনেক বার ; সুব্রত তাই যেন অনেকটা চেনা-চেনা ! কুণ্ঠিত ভাবকে তাই চাপা দেবার জন্যে ঘাড়ের উপরকার খসে-আসা ঘোমটাটা

মাথার প্রায় মাঝামাঝি তুলে দিতে দিতে সেও হাত তুলে বলল, "নমস্কার।"

এক গাল হেসে আর্য্য বলল, "অন্য কেউ হ'লে তোমাকে এই বেশে দেখাতে হয়ত একটু কুণ্ঠিত হতাম। কিন্তু এ সুব্রত, তোমাকে আটপৌরে বেশে দেখবার অধিকার ওর ষোল আনাই আছে।"

তিন জনে তারা উপরের বসবার ঘরে গিয়ে বসল।

আর্য্য বলল, "সুব্রতকে দেখলে ত? ও আর আমি সমবয়সী। কিন্তু আমার চেয়ে ওকে কত ছেলেমানুষ ব'লে মনে হচ্ছে, দেখেছ? সত্যি ভাই সুব্রত, তোর স্বাস্থ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে! তোকে দেখে মনে হয় বয়েস তোর পঁচিশ-ছাব্বিশের ভিতর! কে বলবে, তুইও আমার মত চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছিস!"

"সে কথা ঠিক।" সুব্রত বলে চলল, "বনের হাওয়া আমার দেহে এখনও পাক ধরাতে পারে নি। আর সেখানকার টাটকা খাবারও এর জন্যে দায়ী। কিন্তু ভাই, কত দিন যে ঝোল-ভাত খাই নি, কে জানে! মাঝে মাঝে ঝোল-ভাতের জন্যে আমার রীতিমত মন-কেমন করেছে। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। আজ কিন্তু বৌদি আপনার রান্না ঝোল-ভাত আমি খাব···বুঝলেন? আমাকে পেটুক ভাবতে হয় ভাবুন, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে আমি অত্যন্ত প্র্যাকৃটিক্যাল।"

এতক্ষণ বাদে সুরমা প্রথম কথা বলল; ধীর-স্থির তার স্বর, নম্র তার প্রকাশ-ভঙ্গী;...যেন পদ্মার উপর শরতের প্রশান্তি! সে বলল, "খবর না দিয়ে যখন এসেছেন, বললেও তখন ত আর কালিয়া-পোলাও খাওয়াতে পারব না। আমার হাতের অখাদ্য ঝোল-ভাতই খেতে হবে।"

"অখাদ্য!···বেশ, বেশ!···আজ কিন্তু সত্যিসত্যিই অখাদ্য খেতে ইচ্ছে করছে! এত দিন যদি অড়হর ডাল আর এক ইঞ্চি পুরু লাল আটার রুটির মত সুখাদ্য হজম করতে পারলাম, তাহ'লে আজ আমি আপনার হাতের রান্নার মত অখাদ্যও হজম করতে পারব!" সুব্রত শিশুর মত হেসে উঠল।

আর্য্য বলল, "সুব্রত সেই আগের মতই ছেলেমানুষ আছে! যৌবন এখনও ওকে ছেড়ে যায় নি।"

কথাটা সামান্যই। কিন্তু সেটা সুব্রতর মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দিল। এত দিনের ভিতর সে কোনও দিন ভাবে নি যে বয়েস তার বেড়ে চলেছে! কলেজে পড়ার সময়কার মত মনের স্বাস্থ্যও তার এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। সে যে বড় হয়ে উঠেছে অনেক, তার বয়সী লোকেরা যে সংসার পেতে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, তা যেন সুব্রতর ধারণাতেই আসে নি! সে আর্য্যর দিকে চাইল· এক নূতন দৃষ্টি নিয়ে! সে যেন দেখল সামনে ব'সে রয়েছে এক প্রৌঢ় বাঙালী, সাধারণ কেরানীর মতই জীবন তার বৈচিত্র্যহীন, শরীরে সব সময়েই একটা ঢিলে ভাব, যার বেশীর ভাগ সময় কাটে নিতান্ত গদ্যময় সাংসারিক ভাবনায়! যাক, সে তা হ'লে অতটা বুড়িয়ে যায় নি, এত দিনেও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন আসে নি তার মধ্যে!

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকা যায় না। তাই সে বলল, "তোর ক'টি ছেলেমেয়ে রে আর্য্য? সে সব কোন খবরই ত আমাকে তুই জানাস নি!"

"আর ভাই, বলিস কেন! আমার এখন পাঁচ ছেলে-মেয়ে। ছেলেটি বড়, নাম নিমাই; এইবার সেকেণ্ড-ক্লাসে উঠেছে। আর সবগুলিই নিতান্ত ছোট ছোট। ওগো, নিমুকে একবার পাঠিয়ে দাও ত···তার কাকাবাবুকে প্রণাম ক'রে যাক।"

"তা হ'লে আপনারা গল্প করুন ঠাকুরপো। চা পাঠিয়ে দিয়ে আপনার জন্যে কিছু অখাদ্যর বন্দোবস্ত করতে যাই। ওরে নিমু···এতক্ষণে ফেরা হ'ল দুষ্টু ছেলে? কোথায় গিয়েছিলি? এত রাত হ'ল যে? ফুটবল খেলতে? ও ঘরে গিয়ে দেখ কে এসেছেন!"

সুব্রতর আশ্চর্য্য লাগছিল! আর্য্যর ছেলে···সে তাকে কাকাবাবু বলবে? তার হাসি পেল! আঠার বছর আগে কে জান্‌ত সে কথা?

আর্য্যর দিকে চেয়ে সুব্রত বল্‌ল, "যাক্ গে। তোর কৃপায় আমার তা হ'লে কাকাবাবু হওয়াটা আটকাল না। কিন্তু কি অন্যায় বল্ দেখি ভাই! কাকাবাবু এল কিন্তু

ভাইপোর জন্তে না আনল একটা কিছু ··· শুধু-হাতে!

সুব্রতর কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে ঘরে ঢুকল। পরনে তার কালো হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা বিচিত্র রঙের ইউনিফর্ম্ম, পায়ে ধুলোকাদা, ঘাড় ও কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে, চুলগুলো উস্কখুস্ক, অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তার ফরসা গাল দুটো টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে।

সুব্রত চম্‌কে উঠল! তার চোখের সামনে হঠাৎ যেন ফুটে উঠল বহু বছর আগেকার এই রকম আর একটি ছবি! স্কুলের হয়ে খেলতে গিয়ে আর্য্যও সেদিন ঐ রকম ঘেমে উঠেছিল···হুবহু এই রকম! আর নিমাই···সে ত আর্য্যরই অতীতের ছবি যেন! সেই রকমেরই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি জড়িয়ে রয়েছে এর দুটি কালো চোখে! মুহূর্ত্তের জন্তে সুব্রতর মনে হ'ল কার যেন যাদুযষ্টি-স্পর্শে মৃত অতীতটা তার সামনে বেঁচে উঠেছে, কথা কয়ে উঠেছে তার অনন্ত গাম্ভীর্য্যের মুখোস সরিয়ে!···

আর্য্যর কথায় তার চমক ভাঙল। ছেলেকে সে বলছে, "নিমু, এই তোর সুব্রত-কাকা। প্রণাম কর্ পায়ে হাত দিয়ে।"

কুণ্ঠিত হয়ে সুব্রত ব'লে উঠল, "থাক্ থাক্, হয়েছে হয়েছে!"

ততক্ষণে নিমাই কিন্তু তার পায়ে হাত দিয়ে চট্ ক'রে প্রণামটা সেরে নিয়েছে! তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে সুব্রত জিগ্‌গেস্ করল, "কোথায় এতক্ষণ ছিলে নিমু?"

শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিমাই বলল, "ফুটবল-ম্যাচ ছিল কাকাবাবু। আজ ছিল ফাইনাল! স্কুলের হয়ে খেলতে গিয়েছিলাম; আমরা জিতলাম; আমিই পেয়েছি বেষ্ট-ম্যানের মেডেল্‌টা—জানেন কাকাবাবু?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিমাইয়ের সঙ্গে সুব্রতর আলাপটা জমে উঠল। সুব্রত যেন সরলভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল। এতক্ষণ তার কাছে কিসের একটা বিরাট অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু একটি কিশোর ছেলের সরল সুরে সেই অপ্রীতিকর আবহাওয়াটা মুহূর্ত্তে গেল কেটে। এই নিমাই যেন নিজেদের অতীতের সাক্ষী, মনে পড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা! মনে পড়ে যায়, এরই মত ফুটবল খেলায় জিতে তারাও এক দিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত, এর চোখে যে আলো এখন জ্বলে উঠেছে এক দিন সেই আলোই জ্বলেছিল তাদের চোখে, এরই মত নিশ্চিন্ত ছিল তারা এক দিন!

সুব্রতর হঠাৎ আজ মনে হ'ল, পৃথিবীতে কোন্ এক অনাদি যুগ থেকে যেন চলে আসছে অতীতেরই অভিনয়; বড় গাছ যাচ্ছে শুকিয়ে, নূতন গাছ হেসে উঠছে তার বদলে; মানুষ হচ্ছে প্রৌঢ়, বৃদ্ধ···আর তাদের ছেলেরাই আবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে তাদের শৈশবের কথা। তারা যেন তাদের বাপ-মা'র কাছ থেকে সমস্ত হাসি-উল্লাস নিঙড়ে নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠছে,···পৃথিবীর নিয়মই বোধ হয় এই!

পাশের ঘর থেকে সুরমা চেঁচিয়ে উঠল, "এই নিমু! কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু গল্প করলেই চলবে? মুখহাত ধুয়ে নে।"

এক দৌড়ে নিমাই ভিতরে চলে গেল, ঝোড়ো হাওয়ার খুশী নেচে উঠল তার গতিতে। বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসতে লাগল, তার সঙ্গে শোনা গেল নিমাইয়ের গলা, "ও মা, মাগো! শিগ্‌গির খেতে দাও। নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেল; বুঝলে?"

সুব্রত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মনে পড়ল তার অতীতের কথা। তারা কত দিন নিজেদের মায়ের কাছে এই রকম জুলুমের সুরেই খাবার চেয়েছে! আর আজ? সে নিজে হয়ত আজও ওই রকম সুরে খাবার চাইতে পারে, সে হয়ত আজও পারে ওই রকম ক'রে ছুটে বেড়াতে, ওই রকম করে বাথরুমে নিষ্প্রয়োজন জল ঢালতে। কিন্তু আর্য্য?···অসম্ভব তার পক্ষে! এরই মধ্যে তার মাংসপেশীগুলো হয়ে এসেছে শিথিল, রক্তের সুর এসেছে ঘুমিয়ে! তার উপর সে এখন পিতা। অনেকগুলি তার ছেলেমেয়ে···সংসারের জালে সে প'ড়ে গিয়েছে আটকা। যতই সে এখন ছট্‌ফট্ করুক না কেন, এ-জালের বাঁধন সে আর শিথিল করতে পারবে না; বরং এ জাল বস্‌বে আরও কেটে কেটে।

আর্য্য বললে, "কি রে সুব্রত? অত ভাবছিস্ কি?"

"ভাবছি? না, বিশেষ কিছু নয়। আচ্ছা ভাই, মনে আছে তোর সেই বুড়োর কথা, যাকে আমরা প্রতি সপ্তাহে কিছু ক'রে সাহায্য করতাম? সেই যে, যার চোখের চশমা অসম্ভব পাওয়ারফুল ছিল? মনে পড়ে কি তাকে পয়সা দেবার জন্যে কত দিন আমরা দারুণ রোদে কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ী ফিরে পয়সা বাঁচিয়েছি?"

আশ্চর্য্য হয়ে আর্য্য বলল, "কার কথা বল্ ত?... ও সেই বুড়োটার কথা? কে জানে ভাই, তার কি হয়েছে। বহু দিন ত তার দেখা পাই নি; খুব সম্ভব সে পটল তুলেছে।" আর্য্য একটু হাস্‌তে চেষ্টা করল।

তার উৎসাহহীন ঠাণ্ডা সুরে সুব্রত বেশ একটু আঘাত পেল। কত দিন তারা বলাবলি করেছে, নিজেরা উপার্জ্জন করতে আরম্ভ করলেই সেই বুড়োকে বেশী রকম সাহায্য করবে। সে যেন এই সে দিনের কথা! আর এরই মধ্যে মানুষের মন গেল এতটা বদ্‌লে?...কই এখনও ত তার মনে হয় সেই বৃদ্ধ যদি তার বাঁকা লাঠিটা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হয়, আজও সে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। কিন্তু সে দান যে শুধু অনুকম্পার তা নয়!

চারি দিকে অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, বাদলা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে জানালার পাতলা পর্দ্দাটা। বহুকাল আগে ঠিক এই রকম সময়েই এক অন্ধ ভিক্ষুক তার বাঁশের লাঠির পরিচিত শব্দ ক'রে এক অদ্ভুত করুণ গানের সুরে গেয়ে যেত, "বাবা গো আমি অন্ধ, আমায় দয়া কর,"...তার গানের আর কোনও পদ ছিল না! কিন্তু "আমি অন্ধ" আর "আমায় দয়া কর" এই কটি কথা সে যখন সুর ক'রে গেয়ে যেত, তারা দু-জনেই তখন হয়ে যেত অন্যমনস্ক, অন্ধের সেই অতিপরিচিত করুণ সুরে তাদের দুটি কিশোর প্রাণ এক অব্যক্ত বেদনায় বারে বারে গুমরে উঠ্‌ত!

সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করল, "আর সেই অন্ধ ভিখারীটার কথা তোর মনে আছে, যে ঠিক্ এই সময়েই রাস্তায় লাঠি ঠুকে সুর ক'রে গেয়ে যেত...'বাবা গো, আমি অন্ধ, আমায় দয়া কর?' তার সেই করুণ সুর আজও আমার বেশ মনে আছে! বাংলা দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে সন্ধ্যার অন্ধকারে পাখীর চীৎকারে যখন মুখর হয়ে উঠ্‌ত নির্জ্জন প্রান্তর, কত দিন তখন যেন আমার কানে এসেছে এক অন্ধ ভিখিরীর করুণ স্বর...সে স্বর ছাপিয়ে উঠেছে অন্য সমস্ত শব্দকে!"

আশ্চর্য্য হয়ে আর্য্য বললে, "বাব্বা, এত কথাও তোর মনে থাকে! তুই চলে যাবার পর কয়েক বছর তার গান, (সত্যিই তাকে যদি গান বলা যায়!) শুনেছি। তার পর আমিও আর শুনতে চেষ্টা করি নি, তার গলা আর শোনাও যায় নি। সেও বোধ হয় মারা গিয়েছে।" আর্য্যর স্বরে কোনও উত্তাপ নেই!

সেই অন্ধ ভিক্ষুকের, সেই বৃদ্ধ দরিদ্রের মৃত্যু তার কাছে আজ সামান্য দৈনন্দিন ঘটনার চেয়ে কিছু মাত্র বেশী নয়। কিন্তু আঠার বছর আগে তারা যদি হঠাৎ এক দিন জানতে পারত সেই অন্ধ ভিক্ষুকের মৃত্যুর কথা, তা হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াত অন্য রকম! তখনকার তাদের রাজ্যে অন্ধ ভিক্ষুক, দরিদ্র বৃদ্ধ, এই রকম কত নগণ্য লোকদের আধিপত্য ছিল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু আজ যেন তারা সে রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে এসে পৌঁছেছে! এখনকার অবস্থা... না না, একে আর কোনও মতে রাজত্ব বলা চলে না, এ নিতান্ত সাধারণ এক প্রৌঢ় কেরানীর জীবনযাত্রা! রাজা,...হ্যাঁ, তখন তারা রাজাই ছিল! আজ হারিয়ে গিয়েছে তাদের রাজত্ব, ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে তাদের রাজমুকুট!

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সুব্রতর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল! আজ যেন হঠাৎ তার মনে হ'ল সে চলেছে বুড়ো হয়ে; আজ সকালেও সে স্বীকার ক'রে নেয় নি নিজের বার্দ্ধক্যের কথা, কিন্তু আর্য্যর সংস্পর্শে এসে মনে হ'ল সে যেন বুড়ো হয়ে চলেছে...রক্তে নেই যেন সেই উত্তাপ, সেই উন্মত্ত ছন্দের উল্লাস!

আর্য্য একটু যেন অসহিষ্ণু হয়েই বললে, "তুই অত ভাবছিস্ কি রে, সুব্রত? তোর বাইরেটাও যে রকম ছেলেমানুষ, ভিতরটাও দেখছি তাই! তা হবে না কেন বল্, সংসার ব'লে যে একটা জিনিষ আছে তা ত তুই স্বীকারই করলি না!" তার পর একটু থেমে অনেকটা যেন অনুনয়ের সুরেই আর্য্য বলল, "অনেক দিন ত হ'ল, এবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর। বয়সের জন্যে ভাবিস্ কেন...বাংলা

দেশে আর যা কিছুর অভাব থাক্ না কেন, কনের অভাব যে কোন দিনই হবে না, সে কথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি! তুই যদি বলিস্ বিয়ে করব তা হ'লে এখনও অনেক ভাল ভাল পাত্রী আস্‌বে; বুঝেছিস্?"

সুব্রত কেমন একটু করুণ ভাবে হাস্‌ল। আজও তার বেশ মনে পড়ে যায় যে আঠার বছর আগে সে কিংবা আর্য্য যদি শুনত কোনও প্রৌঢ় বাঙালী বিয়ে করতে চলেছে, সে বিয়ে পণ্ড করবার জন্তে তারা তাদের শক্তির শেষ বিন্দুটি খরচ করতেও কার্পণ্য করত না!

"তুই হাসছিস যে?" আশ্চর্য্য হয়ে আর্য্য প্রশ্ন করল।

"তোর এই অনার্য্য বর্ব্বরের মত কথা শুনে।" সুব্রত আবার হেসে উঠল; তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'তে চেষ্টা ক'রে বলল, "আচ্ছা আর্য্য, মনে পড়ে কি এ-রকম বিয়ের প্রস্তাব যদি আঠার বছর আগে কোনও চল্লিশ বছরের বাঙালী প্রৌঢ় আমাদের কাছে করত, তা হ'লে তার পক্ষে অক্ষত নাকমুখ নিয়ে ফিরে যাওয়া বোধ হয় যথেষ্ট কষ্টকর হ'ত; নয় কি?"

বিজ্ঞের হাসি হেসে দার্শনিকের মত মাথা নেড়ে আর্য্য বলল, "দেখ হে; রক্ত গরম থাকলে লোকে অমন কত কথাই বলে! ও-সব কোনও কাজের কথা নয়। আমি বলি কি, কত দিন আর এই রকম একা একা ঘুরবি; বিয়ে-থা ক'রে এবার গেরস্ত হ, বুঝলি?"

সুরমা এদিকেই আসছিল। কাপড়জামা তার ধোপ-ভাঙা; চুলগুলো ভত্রস্থ। ঘরে ঢুকে সেও বলল, "সত্যি ঠাকুরপো, এবারে আপনার বিয়ে করা উচিত!"

"উচিত যদি বলেন, তা হ'লে বিয়ে করা আমার অনেক আগেই উচিত ছিল। কিন্তু ঔচিত্যবোধ তখন যখন হয় নি এখন আর সে-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করাই ভাল। কোনও মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে আমি রাজী নই।"

সর্ব্বনাশ?—সুরমা যেন আকাশ থেকে পড়ল! "আপনার মত স্বামী পেলে কত মেয়ে ধন্য হয়ে যাবে জানেন? তা ছাড়া পুরুষমানুষের বয়েস, সে আর কে দেখতে যাচ্ছে বলুন?"

"অন্য কেউ না দেখুক, আমি একাই আছি তা দেখবার জন্তে।"—একটু হেসে সুব্রত বলল, "কিন্তু এই নারী-প্রগতির যুগে আপনি যদি ও-রকম যুক্তি দেন, আপনাকে তাহ'লে কেউই যে মানবে না তা আমি জোর ক'রে বলতে পারি।"—সুব্রত আবার স্বচ্ছ হাসিতে ফেটে পড়ল।

"আপনি দেখছি এক কথায় রাজী হবেন না!" একটু চিন্তিত হয়ে সুরমা বলল; "আচ্ছা, ও তর্ক না-হয় পরে হবে। উপস্থিত উঠুন, খাবার প্রস্তুত। সেটার সদ্ব্যবহার করা বিয়ের মত অমন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়; আর সুবিধে এই যে প্রৌঢ়রা দু-বেলাই ওটার সদ্ব্যবহার করেন, এবং তাতে লোকনিন্দার ভয় একেবারেই থাকে না।"

দু-বন্ধুই হো হো ক'রে সরল হাসিতে ফেটে পড়ল।

খাবার ঘরে ঢুকেই সুব্রত চেঁচিয়ে উঠল, "আরে·· কোন রকম অখাদ্যই যে বাদ যায় নি বৌদি! মাংস আর লুচি থেকে আরম্ভ ক'রে কোন্ জিনিষটা যে নেই তা দস্তুরমত গবেষণাসাপেক্ষ! নাঃ বৌদি," গম্ভীর হ'তে চেষ্টা ক'রে সুব্রত ব'লে চলল, "লোকনিন্দার ভয় থাকলেও এ সমস্ত অখাদ্যগুলো আমি ছাড়ছি নে!"

হেসে সুরমা বলল, "দেখুন, যে লোক বেশী কথা বলে তারই পাতে খাবার পড়ে থাকে সবচেয়ে বেশী! অতএব···"

বাধা দিয়ে সুব্রত ব'লে উঠল, "আর-যার সম্বন্ধে সে রকম দুর্ভাবনা থাকুক না কেন আমার সম্বন্ধে যে নেই, সে কথা আর্য্যই বোধ হয় ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারবে।"

হাল্‌কা হাসি ও গল্পের ভিতর খাওয়া শেষ হ'ল। নিমাইয়ের খাওয়া আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল; সারাদিনের খেলাধুলোর পর ক্লান্ত হয়ে এরই মধ্যে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে!

দুই বন্ধুতে আবার যখন উপরের ঘরে এল, রাত তখন দশটা। বাইরে আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে পড়েছে। জান্‌লাটা খুলে দিতেই ভিজে মাটির গন্ধে ঘরটা ভ'রে গেল।

"এই বৃষ্টিতে সুব্রত তুই বাড়ী যাবি কি ক'রে?" আর্য্য জিজ্ঞেস করল।

"বাড়ী যাব মানে? এই বৃষ্টিতে কেউ কখনও বাড়ী যায়? আর বৃষ্টি না থাকলেও আমি বুঝি আজ বাড়ী যেতাম?"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর্য্য বলল, "না না, মানে, তোরই অসুবিধে হবে ভেবে তোকে এখানে থাকতে বলতে সাহসী হই নি।"

"তোর সাহস যে আগের চেয়ে বেড়েছে তা ভাই কিছুতেই স্বীকার করতে পারলুম না! মনে পড়ে কি আগে · মানে আঠার-উনিশ বছর আগে কত রাতে তুই আমাকে ডেকে নিয়ে যেতিস্, কত রাত তোদের বাড়ীর ছাতে না-ঘুমিয়ে গল্প ক'রে কাটিয়ে দিয়েছি! তখন যে শোবার খুব সুবিধে হ'ত তা ত ভাই মনে হয় না। বিছানার মধ্যে থাকত একটি মাত্র চাদর ও একটি মাত্র ছোট মাথার বালিশ। কিন্তু অসুবিধের কথা ত তখন কারুরই মাথায় আসত না!"

"...না না, তা বলছি না। তবে তুই এখন বড় হয়ে গিয়েছিস কি না! হয়ত কোনও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়ে যাবে..."

"তাই এই ইচ্ছাকৃত দুর্ভাবনা!" বাধা দিয়ে সুব্রত ব'লে উঠল। "দেখ আর্য্য, অসুবিধে আর কষ্ট বেশীর ভাগই মানসিক! তখন কি আর আমাদের অসুবিধে হ'ত না,—নিশ্চয়ই হ'ত। কিন্তু সে-কথা মোটেই আমরা ভাবতাম না অতএব অসুবিধের কথা তুই ভুলে যা।"

আর্য্যও উৎসাহিত হয়ে উঠল।

খাওয়া শেষ ক'রে পানের ডিবে নিয়ে সুরমা ঘরে এল। কোন ভূমিকা না ক'রেই সে বলল, "বাইরে যা দুর্য্যোগ, আজ রাতটা এখানে থেকে যান্ না ঠাকুরপো।"

"দেখলি ত আর্য্য, বৌদির বুদ্ধি তোর চেয়ে কত বেশী!...হ্যাঁ বৌদি, এখানে আজ থাকার কথাই আমি বলছিলাম, কিন্তু আর্য্য কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না!"

আর্য্য শুধু একটু ফিকে হেসে চুপ ক'রে রইল।

দোতলার বসবার ঘরে দুই বন্ধুতে শোবে ঠিক হ'ল। সুব্রতই দুটো সোফা টেনে এনে, সুরমার কাছ থেকে দুটো মাথার বালিশ চেয়ে নিয়ে শোবার বন্দোবস্ত এক নিমেষে ক'রে ফেলল। সুরমা শুতে চলে গেল।

ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে, আলোটা নিবিয়ে অন্ধকারে দুটো সিগারেট জ্বালিয়ে তারা দু-জনে গল্প ক'রে চলল।

সুব্রত হঠাৎ বলল, "আচ্ছা আর্য্য, মীরার খবর কি রে?"

প্রশ্নটা ছোট। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস! মীরা অঙ্কের প্রফেসারের মেয়ে। সুব্রত যেত সেখানে পড়তে, তখনই তার মীরার সঙ্গে আলাপ হয়। আঠার বছর আগে এই রকম কত বর্ষামুখর রাত্রে সুব্রত ব'লে চলেছে মীরার কথা, আর্য্যকে। তার তরুণ জীবনের কত আশা, কত স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল শুধু এই তরুণীকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা দমকা বাতাস এসে সমস্ত ওলটপালট ক'রে দিল; ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি পেয়ে সুব্রত চলে গেল দূর দেশে। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সে মীরার কোন খবরই পায় নি।

আর্য্য উত্তর দিল, "ওঃ, সেই মীরা? মানে মৃগাঙ্কবাবুর মেয়ে? তার ত অনেক দিন বিয়ে হয়ে গেছে শেখরের সঙ্গে! শেখরকে মনে আছে ত; সেই যে আমাদের ক্লাসের রোগা চেহারার ভাল ছেলেটি! সে আই-সি-এস্ হয়ে আসার পরেই বিয়ে হয়েছে।"

নিতান্ত সাধারণ ভাবে "ওঃ" ব'লে সুব্রত শুধু আর একটা সিগারেট ধরাল! তার পর চল্‌ল আরও কতকগুলো মামুলি কথাবার্ত্তা, কিন্তু গল্প আর জমল না; কোথাকার কোন্ এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম তার যেন কেটে গিয়েছে, গল্পের সুর তাই যেন মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে কেটে যাচ্ছে!

আর্য্য ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু সুব্রতর চোখে আজ ঘুম নেই! কত এলোমেলো কথা তার মনে আসছে আজ, মনে আসছে ধূসর অতীতের কত নিষ্প্রয়োজন ঘটনা, তুচ্ছ হাসি-কান্নার কথা! সমস্ত মিলে মনটা তার এক অদ্ভুত সুরে বারে বারে বেজে উঠতে চাইছে যেন; কিন্তু প্রকাশের ভাষা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে, সে যেন মৃত অতীতেরই মত আজ বোবা হয়ে গেছে!

রাত্রি অনেকটা হ'ল। কোথাকার একটা পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল। বৃষ্টিটা থেমে এসেছে; ভিজে হাওয়ায় ঘরের লঘু অন্ধকার বারে বারে কেঁপে উঠছে, হাওয়ায়-কাঁপা সুদূর অতীতের কার পাতলা চুলের মত!

বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে জানালার গরাদ ধরে সুব্রত দাঁড়িয়ে রইল। আকাশের উন্মত্ত মেঘের আবরণ

ছিঁড়ে বেরিয়ে এল একটিমাত্র তারা; কার চোখের হারিয়ে-যাওয়া দীপ্তি যেন তার ভিতরে!

সুব্রতর চোখে হঠাৎ আজ এই নির্জ্জন রাত্রির অন্ধকারে, এই একটি মাত্র পবিত্র তারার আলোর নীচে জ্বলে উঠল সেই ফেলে-আসা কিশোর-জীবনের উত্তপ্ত আগুন!··সে বেরিয়ে পড়বে এদেশ ছেড়ে·সে সফল করবে তাদের কিশোর-জীবনের সোনালী স্বপ্নকে! এখনও ত সে বেশ ভাবতে পারে জাহাজে জাহাজে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে···চাঁদনি রাতে পিরামিডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে···আফ্রিকার বনে তাঁবু ফেলে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রে করছে বিশ্রাম।

আকাশের সেই করুণ তারাটার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হ'ল ওটা যেন মরে গিয়েছে! সে কথা হয়ত জানা যাবে আরও অনেক বছর পরে! হয়ত ওটার ভিতরকার আগুন গিয়েছে নিবে, তবুও ওটাকে ঘুরতে হচ্ছে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণে প'ড়ে। ওটার নিজের গতি নিজের শক্তি হয়ত পঙ্গু হয়ে গেছে!

আর আর্য্য? সেও ত গিয়েছে মরে! শুধু তার মৃত কাঠামোটা রয়েছে পড়ে! নেই তার ভিতরকার জীবনের উষ্ণতা, বেঁচে থাকার গতি! তার কল্পনার নেই স্বাধীনতা, মনের নেই জোর। সেও তার মরা-কাঠামোটা নিয়ে ঘুরে চলেছে ওই মৃত নক্ষত্রটার মত···সংসারের আকর্ষণে-বিকর্ষণে সে শুধু পরিবর্ত্তন করে তার স্থান!

শীঘ্রই সুব্রত বেরিয়ে পড়বে দেশ-ভ্রমণে।

তার পর আবার কত বছর পরে হয়ত দেখা হবে এই বন্ধুর সঙ্গে! সংসারের চাকা তখন অনেকটা ঘুরে গিয়েছে! সেদিনও কি তার মনের ভিতরকার এই স্ফূর্তি, এই চাঞ্চল্য থাকবে বেঁচে?

কে জানে!

স্বরলিপি

গান

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সাথীহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্যছায়াতলে।
কী জানি সেথা আছে কিনা আজো বিজনে
বিরহী হিয়া
নীপবন গন্ধ ঘন অন্ধকারে,
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়॥
হায় জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে
জানি সে নাই নাই।
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়,
ডাকে তবু হৃদয় মম মনে মনে
রিক্ত ভুবনে,
রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II সা সমা । গমা রা সা । সমা মা । মা মা মা I মা -া । মা -গপা পা । পা -স্মা । ধপা -া -া I
শ্রা ব ণে র প ব নে আ কু ল. বি ০ ষ ণ্ ন স ন্ ধ্যা ০ য়্

I ন্ধা -ধর্সা । নর্সা -ধা ধা । ধা -র্ণা । পধা -পা পা I পা -স্মা । পক্ষা -ধা ধপা । পা -মা । -া -া -া I
সা ০০ থী ০ হা রা ০ ঘ ০ রে ম ০ ন ০ আ মা ০ ০ ০ র্

I সমা মা । মা মা -গা । গা -পা । -া -া -া I ধা না । র্সা ধনা -ধা । ধা -পা । -মা -া -া I
প্র বা সী পা ০ খি ০ ০ ০ ০ ফি রে যে তে ০ চা ০ ০ ০ য়্

I নধা -ধর্সা । নর্সা ধা -ধপা । পা -ক্ষা । পক্ষা ধপা -পমা I মা -া । মা মা -া । গা -মা । রা সা -া II
দূ ০০ র কা ০ লে ০ র অ ০০ র ০ পা ছা ০ য়া ০ ত লে ০

II পা ধা । পা নধা না । না -র্সা । র্সা নধা না I না -র্সা । র্সনা ধনধা না । না -র্সা । -া -র্সনা -ধা I
কী জা নি সে থা আ ০ ছে কি না আ ০ জো বি জ নে ০ ০ ০ ০

I ধা না । র্সনা -ধনর্সা -ধনা । ধপা -া । -া -া -া I ধা -ণা । ণা পধা পা । পা -ক্ষা । পা পধা ধপা I
বি র হী হি ০০ য়া ০ ০ ০ ০ নী ০ প ব ন গ ন্ ধ ঘ ন

I মা -া । গমা রা -া । সা -া । -া -া -া I র্সা র্সর্গা । র্গা র্রা র্রা । র্সা -না । র্র্সা ধা পা I
অ ন্ ধ কা ০ রে ০ ০ ০ ০ সা ড়া দি বে কি গী ০ ত হী ন

I ধা ধণা । ণা ধা পা । রা -গা । -মা -পা -া II
নী র ব সা ধ না ০ ০ য়্ ০

II সা -া । সা মা গমা । রা -সা । সমা -া গমা I রা সা I
হা য়্ জা নি সে না ই জী ব্ ন নী ড়ে

। সা মা মা । মা -গা । গা -পা -া I -া -া । ধা -ণা ণা । পধা পা । পা -ক্ষা পা I
জা নি সে না ই না ০ ই ০ ০ তী র্ থ হা রা যা ০ ত্রী

I পধা ধপা । রা -গা পধপা । মা রা । সা -া -া I
ফি রে ব্য ০ র্থ বে দ না ০ য়্

I -া -া । পা -ধা পা । নধা না । নর্সা র্সা র্সা I নধা না । না -র্সা র্সনা । ধনা -ধনধা । ধা -র্সা -া I
০ ০ ডা ০ কে ত বু হৃ দ য় ম ম ম ০ নে ম ০০০ নে ০ ০

I -র্সনা -ধা । ধা -না র্সনা । ধনা নধা । ধপা -া -া I -া -া । র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা র্রা । র্সা -না র্র্সা I
০ ০ রি ক্ ত ভু ব নে ০ ০ ০ ০ রো দ ন জা গা স ঙ্ গী

I ধা পা । র্সা র্সা ধর্সা । ধা -পা । পা -ক্ষা -ধা I ধপা -মা । মা -া -া । -া -া । -া -া -া II II
হা রা অ সী ম শূ ০ ন্যে ০ ০ শূ ০ ন্যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বহু মৃত্যু

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কুড়ি বৎসর পরে গ্রামের নীচের স্বল্পপরিসর শুষ্কপ্রায় বাঁওড়ে এবার বন্যার জল ঢুকিয়াছে প্রচুর, কুড়ি বৎসর বাদে সুসজ্জিত একখানি নৌকা জলস্রোতের তালে তাল রাখিয়া বাঁওড়ের বুকে মৃদুমন্দ গতিতে আসিতেছে দেখা গেল।

এক গ্রীষ্মকাল ছাড়া বিলের ধারে বড়-একটা লোক-সমাগম হয় না। শুষ্কপ্রায় খাতে সামান্য একটুখানি জল থাকে—ওপারের চাষীরা হাট সারিয়া হাঁটুর কাপড় না তুলিয়াই অনায়াসে সেটুকু পার হইয়া যায়। তাদের সঙ্গে পার হয় গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি। ওপারের সুবিস্তীর্ণ চরে পুরা উদ্যমে চাষ চলিতেছে। বর্ষার ধোয়াটে কর্ষিত জমির আলগা মাটি নামিয়া বিলের বুক প্রতি বৎসর ভরাট করিয়া তুলিতেছে; কয়েক বৎসর পরে হয়ত বিলের খাত আর চরভূমি সমান হইয়া যাইবে। যাহা হউক, বিলের অনেক গৌরব বিলুপ্ত হইলেও হাঁটুভোর জলে এখনও অজস্র পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। এপারের ঢালু তীর আর ওপারের শ্যামল মাঠের মাঝখানে স্বল্পতর মরণোন্মুখ বিলে ফুটন্ত কমলের সৌন্দর্য্য এখনও অতীত সমারোহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য দেখিতে গ্রামবাসীদের বিশেষ উৎসাহ নাই।

যাহাদের বাড়ীতে পাতকুয়া নাই অর্থাৎ জলাভাব তাহারাই সকাল-বিকাল বিলের ধারে আসিয়া নিজেদের প্রয়োজন সারিয়া লয়, ধোপার দল পাটা পাতিয়া হিস্ হিস্ শব্দে সোডা-মাটিভরা কাপড় আছড়াইয়া সেই জল আরও মলিন করিয়া তোলে, হয়ত কোন নিষ্কর্ম্মা পল্লীযুবক কঞ্চির ডগায় কেঁচো গাঁথিয়া চুপ করিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে ভাল মৎস্য শিকারের স্বপ্ন দেখে। গ্রামান্তরের নানা লোক নানা প্রয়োজনে বিলের ধারের সংক্ষিপ্ত পথ ধরিয়া যাতায়াত করে এবং কখনও কখনও শুষ্কপ্রায় বিলের পানে চাহিয়া ভাবে, 'বাঁওড় আর কদিন! এই জলটুকু না থাকিলে ওপারে পৌছিবার পথ হয়ত আমাদের আরও সংক্ষিপ্ত হইবে!'

দারুণ গ্রীষ্মে কোথাও যখন হাওয়া থাকে না, তখন রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত অনেকে গামছা বিছাইয়া বিলের ঢালু তীরভূমিতে আধ-শোওয়া অবস্থায় সঙ্গীর সঙ্গে গল্পগাছা করে, বাঁশের বাঁশী বাজায়, মোটা গলায় তান ধরে, তর্ক করে। বর্ষাকালে বিলের জল বাড়ে, তখন নৌকা নহিলে পারাপার চলে না। জলবিলাসীরা দলে দলে তখন জল দেখিতে আসে, বিলের দুঃখ-দুর্দ্দশা লইয়া আলোচনা করে, নৌকা লইয়া কেহ কেহ বা 'বাচ' খেলে।

তার পর শরতের ছোঁয়া লাগিয়া আকাশ ঘন নীল হইলে বিলের উঁচু ঝোপে সাদা কাশ আর অগভীর জলে পদ্ম-শালুক ফুটিয়া তার শোভা শতগুণ বাড়াইয়া দেয়, তখন বিলের বুকে নৌকা চলে না।

শরৎকাল। কুমুদ-কহ্লারে-ভরা বিল এবং সে-বিল বন্যার মহিমায় দুটি কূল ছাপাইয়া টলটল করিতেছে। সেই বিলের বুকেই সুসজ্জিত নৌকা আসিতেছে দেখা গেল।

নৌকার আরোহী গ্রামের জমিদার না হইলেও এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রাম ছাড়িয়াছিলেন। অভাবের তাড়না অথবা কর্ম্মের প্রেরণা কোন্‌টা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল সে-কথা আলোচনা করিয়া আজ কোন লাভ নাই। মোট কথা, কুড়ি বৎসরের মধ্যে গ্রামে আসিবার অবসর তাঁর হয় নাই। কুড়ি বৎসরে তিনি মোটামুটি সঞ্চয় করিয়াছেন অর্থ এবং নাম। একটিকে ধরিয়া আর একটি অনায়াসলভ্য হইয়াছে। শরতের আকাশ এত কাল প্রবাসীকে গৃহমুখী হইবার অবসর দেয় নাই, আজ কর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইবামাত্র মনের মধ্যে জন্মপল্লীর আহ্বান আসিয়াছে, সুতরাং নৌকা ভাসাইয়া অলক রায় গ্রামে ফিরিতেছেন।

কিন্তু অলক রায়ের চোখে চারি দিকের দৃশ্য সহসা এমন বদলাইয়া গেল কেন? বিশ বছরের যুবক আর চল্লিশ বছরের

প্রৌঢ়ের মধ্যে এতটা ব্যবধান কি সম্ভবে? অবশ্য, ছিপছিপে অলক রায় মেদবাহুল্যে হইয়াছেন সুস্থূল। সে চোয়াল-উঁচু গাল, ভাসন্ত চোখ অথবা টিকলো নাক তাঁর নাই। মাথার কেশ-পারিপাট্যে রুচির বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হাসিলে গালে তেমন টোল পড়ে না বা হাত নাড়িলে হাতের পেশী শিরা সমেত সুপ্রকট হইয়া উঠে না। অনেকখানি লম্বা ছিলেন বলিয়া মোটা হইয়াও বামনাবতার হন নাই।

মনের মধ্যে তাঁর আঁকা আছে বিশ বৎসর পূর্ব্বের ছবি। সেই ছবি দেখার মোহেই হয়ত তিনি গ্রামে ফিরিতেছেন।

বিলের ঢালু তীরভূমি আর শরতের সুনীল আকাশ কোনটারই বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিশেষ করিয়া অপরিবর্ত্তিত আছে ঐ নীল আকাশ। চতুর্থীর ক্ষীণ কলাময় চাঁদ অপরাহ্ণেই চিত্রলেখার মত আকাশে উঠিয়াছেন, তরল অন্ধকারে তারার চুমকিতে আশমানী শাড়ীখানি একটু পরেই ভরিয়া উঠিবে।

নৌকা বড় বেশী দুলিতেছে; অলক রায় মাঝখানে সরিয়া বসিলেন।

নৌকার দু-পাশে কুমুদ-বহ্লারের ঝাড়; চকচকে পাতার শোভা ও ফুটন্ত ফুলের শোভা কোনটাই উপেক্ষণীয় নহে, তথাপি অলক রায় মাঝখানে সরিয়া বসিলেন।

জনশ্রুতি, মৃণাল-বৃন্তের তলায় বন্যা-বিতাড়িত বিষধর আসিয়া আশ্রয় লয়। মৃণাল তুলিতে গিয়া কত হতভাগ্যই না অহি-দংশনে প্রাণ দিতেছে প্রতি বৎসর! এক সময়ে অবশ্য শোনা কথায় অলক রায়ের তেমন বিশ্বাস ছিল না। নৌকায় চাপিয়া কমলদলের এমন নিরাপদ সান্নিধ্যে আসিয়া সেগুলি নাড়াচাড়া করিবার সৌভাগ্যও হয় নাই তখন। বাজী রাখিয়া সাঁতার কাটা ও সবচেয়ে বড় পদ্মফুল তুলিবার গৌরব লাভের আকর্ষণ ছিল খুব বেশী। চকচকে পদ্মপাতায় ভাত খাইবার তৃপ্তিই কি ছিল কম!

আজ মনের ইচ্ছা প্রবল হইলেও ভয়ের খাদটা সেখানে বেশী করিয়াই মিশানো রহিয়াছে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মমতাও বুঝি বাড়িয়া চলে। মাঝখানে সরিয়া বসিয়া অলক রায় সভয় বিস্ময়ে একদৃষ্টে কমল-কহ্লারের শোভা দেখিতে লাগিলেন। নৌকাটা বড় বেশী দুলিতেছে, মাঝিকে হুঁসিয়ার করিয়া দিলেন। একবার সাঁতার শিখিলে জীবন-ভোর নাকি ভোলা যায় না, তথাপি আপন পরিবর্দ্ধমান স্থূল দেহটার উপর অলক রায়ের বিশ্বাস নাই। এই গুরুভার কোন্ কৌশলে তিনি জলের উপর ভাসাইবেন, সে-ও একটা সমস্যার কথা!

ভয়ের কি একটিই রকম? আশ্বিনের শিশির লাগিয়া শরীরের বৈকল্য যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে, তাই অপরাহ্ণ হইতেই তিনি কোটের উপর পাতলা এণ্ডি চাদরখানি জড়াইয়াছেন, গলা বেড়িয়া পাতলা সিল্কের মাফলার মাথার খানিকটা ঢাকিয়াছে, পায়েও রেশমী মোজা উঠিয়াছে। তীরে অনেকগুলি লোক নৌকার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও গায়ে সামান্য একটি ফতুয়া, অধিকাংশেরই পায়ে মোজা ত দূরের কথা, জুতা পর্য্যন্ত নাই। কেহ কেহ বা খালি গায়ে নদীর হাওয়া লাগাইয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতেছে। এই রকম তাঁহারও এক দিন গিয়াছে। আশ্বিনের গুমোটে খালি গায়ে মৃদু মুক্ত বাতাস লাগিলে মন শুদ্ধ তৃপ্তিতে হাল্কা হইয়া উঠিত। সেই অতীত আশ্বিনের দিনগুলিতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোন বিধানই লেখা ছিল না, অথচ স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলেও সেদিন ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি মুখচোখ মলিন করিয়া তুলেন নাই!

যাহা হউক, হেলিতে দুলিতে নৌকা আসিয়া অশ্বত্থ-তলায় লাগিল। সেই সুপ্রাচীন শিকড়-ওঠা প্রকাণ্ড বনস্পতি। কুড়ি বৎসরের কালপ্রবাহ অশ্রান্ত ভাবে তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও স্থূল দৃষ্টিতে কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যায় না। অশ্বত্থতলার ধার দিয়া যে-রাস্তা সোজা গ্রামের মধ্যে গিয়াছে সেটার অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনকার ধূলায়-ভর্ত্তি কাঁচা রাস্তা ইট-বাঁধানো পাকা হইয়াছে। ধারে ধারে বহুদূর অন্তর কেরোসিনের আলোকস্তম্ভও দেখা যায়।

নৌকা থামিতেই অনেকগুলি লোক সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা একদৃষ্টে সুসজ্জিত নৌকা দেখিতেছে, কি অলক রায়ের প্রকাণ্ড দেহটার পানে চাহিয়া আছে, বোঝা দুষ্কর। অবশ্য, দুটি জিনিষই পল্লীবাসীদের চোখে খুব কম পড়ে। এমন নৌকার পাশে এদেশের মাছধরা জেলে-ডিঙি—যেগুলির দরমার ছই, ভিতরে ঢুকিতে গেলে

প্রায় শুইয়া পড়িতে হয়, বাঁশের নড়বড়ে পাটাতনের সঙ্কীর্ণ জায়গায় আড়ষ্ট হইয়া বসিতে হয়, সাজসজ্জা বা ছাদের বাহুল্য নাই—যেন রাজরাজেশ্বরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সমবেত গরিব ভিখারীর দল! তীরের রোগজীর্ণ দুর্ব্বল চেহারাগুলির মধ্যে অলক রায়ও তেমনি দ্রষ্টব্য।

তীরলগ্ন হইতেই নৌকা একটু বেশী দুলিয়া উঠিল, অলক রায় বসা অবস্থায় হেলিয়া পড়িতেছিলেন—কাঠের পাটাতন ধরিয়া সামলাইয়া লইলেন। তীরস্থ লোকগুলির মুখ তৎক্ষণে কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

যে-দৃশ্য এক জন উপভোগ করে অন্যের তাহাতে পীড়া জন্মায়; একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস অলক রায়ের বুক ঠেলিয়া বাহির হইল।

হায় রে কুড়ি বৎসর আগেকার অলক! একটি লাফে নৌকা হইতে দশ হাত দূরে পড়িয়া যে একটুও টলিত না, তীরলগ্ন নৌকা হইতে নামিবার মুখে তার সারা দেহে দারুণ অস্বস্তি, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিতেছে! নামিতেই হইবে, এতগুলি লোকের কৌতুক-উপভোগের বস্তু হইয়া তাঁহাকে নামিতেই হইবে। অথচ বিশ বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ প্রশ্ন করিত, পাঁচ মাইল সাঁতারে প্রথম হ'ল কে? ফ্ল্যাট রেস, হাই বা লঙ জাম্পের শ্রেষ্ঠ গৌরবভাগী কোন্ ছেলেটি?

সমস্বরে উত্তর উঠিত, সে অলক—অলক—আমাদের হরিপুরের অলক রায়।

সেই হরিপুরের বিলে অলকের নৌকা লাগিয়াছে, সেই অলক আজ অলক রায়, অর্থে, মর্য্যাদায়, বয়সে এবং দেহেও—সব দিক দিয়াই তিনি গুরুস্থানীয়।

সুতরাং পদমর্য্যাদার অনুযায়ী তাঁর তীরাবতরণ ঘটিল। নিজের চেষ্টা, মাঝিদের চেষ্টা এবং তীরচারী দুই-এক জন সহানুভূতিসম্পন্ন প্রৌঢ়ের চেষ্টায় সত্যসত্যই তিনি নির্ব্বিঘ্নে ভূমিস্পর্শ করিলেন।

মাটিতে পা দিয়া একটু যেন হেলিয়া পড়িতেছিলেন, পার্শ্বস্থিত প্রৌঢ়ের কাঁধে হাত রাখিয়া একটু হাসিলেন। প্রৌঢ়ও হাসিয়া বলিল, 'আপনি—আপনাকে আর চেনাই যায় না।'

অলক রায় মুখ ফিরাইয়া হাসির সঙ্গেই জবাব দিলেন, 'বয়সটা ত কম হ'ল না, আজ কুড়ি বছর গ্রাম-ছাড়া।'

কিন্তু না-চেনার প্রধানতম হেতু তাঁর অসাধারণ দৈহিক পরিবর্ত্তন সে-কথা প্রৌঢ় বা অলক রায় মনে মনে বুঝিলেও মুখে প্রকাশ করিলেন না। প্রৌঢ় একটু থামিয়া বলিলেন, 'প্রায় দু-যুগ পরে আপনি…কিন্তু আমাকেও বোধ হয় চিনতে—'

'না ত।' সবিস্ময়ে অলক রায় তাঁহার পানে চাহিলেন। বর্ত্তমানের ঘন কুয়াশার পর্দ্দা ঠেলিয়া যদি বা একটু অতীতের ক্ষীণ রৌদ্ররেখা সেখানে দেখা যায়! কিন্তু কুয়াশা গাঢ়—অলক রায় তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিলেন।

'আমি রমেশ।'

তথাপি অলক রায়ের বিস্ময় কাটিল না।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিলেন, 'মিত্রদের রমেশ। একসঙ্গে একজামিন ফেল ক'রে স্কুল ছাড়ি, একসঙ্গে—'

একসঙ্গের অনেক স্মৃতি বাঁধভাঙা বন্যা-জলের মত অলক রায়ের মনের কিনারায় উত্তাল হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'তুমি রমেশ! তুমি… কি আশ্চর্য্য! বিশ বছর বাদে।' বিশ বছর বাদে দেখা হওয়াটাই পরমাশ্চর্য্য।

'তার পর, ভাল ত?'

প্রশ্নটা না-বক্তা না-জিজ্ঞাসিত কাহারও ভাল লাগিল না।

বিশ বৎসরের মধ্যে সামান্য একখানি পত্রের দুটি ছত্রে যে-জিজ্ঞাসার অবসর মিলে নাই, সহসা সাক্ষাতে সেই শিষ্টাচার অশোভন ও প্রাণহীন বলিয়াই মনে হইল। অথচ শিষ্টাচার-রক্ষার ঐ একটি মাত্রই পন্থা এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অলক রায় হাসিলেন, 'এক রকম। তুমি কেমন আছ? তোমার'—বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিলেন। না-জানিয়া আরও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন কি না সেই দ্বিধায়।

রমেশ হাসির প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিল এবং ঘাড় নাড়িয়া উত্তর সংক্ষেপ করিল।

ততক্ষণে তাঁহারা পাকা রাস্তায় উঠিয়াছেন।

রমেশ বলিল, 'এসেছ যখন সবই টের পাবে। তোমার পরিবার, ছেলেমেয়ে—'

অলক রায় বলিলেন, 'তারা কল্‌কাতার জীব—পাড়া-গাঁয়ের নামে মূর্চ্ছা যায়। তারা আসবে এই গাঁয়ে! আমি বলে কত কষ্টে—'

রমেশ বলিল, 'তোমরা গাঁ ছেড়েছ, গাঁয়েরও দুর্দ্দশার সীমা নেই।'

অলক রায় যে-জিনিষ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে সংযম-রক্ষাই উচিত মনে করিয়া অন্য প্রশ্ন পাড়িলেন, 'ভূপেশ কোথায়? হীরু? বোসেদের ধীরাজ বেঁচে আছে? নেই? কলকাতায় থাকতেই ভুলু-ঠাকুর্দ্দার মৃত্যুসংবাদ পাই। তাঁর ছেলেরা বিষয়-আশয় দেখছে কেমন?'

প্রশ্নবাণে রমেশ বিব্রত হইল না, মুখস্থ পড়ার মত গড় গড় করিয়া উত্তর দিয়া গেল। অলক রায় যেটুকু জানিতে চাহিয়াছিলেন, রমেশ তাহার চেয়ে জানাইল অনেক বেশী। অতিরঞ্জনের দোষ না-থাকিলেও রমেশ যে বাগ্‌বিস্তারে অপটু নহে সে-কথা সে ভাল করিয়াই জানাইয়া দিল।

কথাশেষে সে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'সব কথাই জিজ্ঞাসা করলে—এক জনের কথা ছাড়া।'

—'কে এক জন?' অলক রায় প্রশ্ন করিলেন।

—'মনে ক'রে দেখ।' সকৌতুকে রমেশ হাসিতে লাগিল, অলক রায় বহুক্ষণ মাথা চুলকাইয়া, পায়চারি করিয়া, কাশিয়া এবং চক্ষু বুজিয়াও 'সেই এক জনকে' স্মরণে আনিতে পারিলেন না। অবশেষে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, 'কে বল ত?'

রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'অমলা গো,—অমলা। মনে নেই বল?'

অলক রায়ের মুখে মৃদু হাস্যের মলিন আভা ফুটিল। অমলাকে মনে নাই!—অমলা! অমলা!

অমলাকে কেন্দ্র করিয়া একদা জীবন-প্রভাতের প্রথম আলো ফুটিয়াছিল। স্বপ্ন, ভালবাসা, বুদ্‌বুদ যে-নামই দেওয়া যাক্‌ না কেন, তরুণ মনের অতবড় সম্পদ আর নাই।

কিন্তু অমলাকে তিনি সত্যই ভুলিয়াছেন। সে-নাম বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে তলাইয়া গিয়াছে। দু-হাতে সাফল্যের মণিমুক্তা কুড়াইয়া জীবনের দেউল তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। কোথায় পল্লীপ্রান্তরে অখ্যাত অমলা, কোথায় বা যৌবনের খামখেয়ালীভরা দিন! ছেলেবেলায় কাদার পুতুল গড়িয়া পর মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া ফেলার মত—এ-ও একটা বিলাস। বিলাস ছাড়া কি? অমলা—অমলা!

আজ যদি সৌদামিনীর পরিবর্ত্তে অমলা,—কিন্তু অমলার জন্য যে কঠিন মূল্য তাঁহাকে দিতে হইত সারা জীবনে সে-ঋণের বোঝা বহিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল কি? তাহা হইলে নদীপথ দিয়া বিলাস-বৈভবভরা ঐ নৌকা অখ্যাত পল্লীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িত না। নৌকার পিছনে শহরের সম্পদও উঁকি মারিত না এবং শহরের মণিহর্ম্ম্যে যে বৈদ্যুতিক দীপ জ্বলিতেছে এত দূর হইতে তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিও অলক রায়ের সমস্ত অঙ্গে মর্য্যাদার ভূষণ পরাইত না।

অলক-অমলা, অলক-অমলা।

কবিতার মিলে ও অনুপ্রাসে চমৎকারিত্ব আনিয়া দেয়। কিন্তু বিশ বৎসর আগেকার বাস্তব অলক রায়ের কানে আর একবার সে-দিনের কাহিনী পুনরুক্তি করিল—

—'তোমরা কুলীন ওরা ভঙ্গ, বিবাহ হ'তে পারে না।'

—'আমি কৌলীন্যপ্রথা মানি না।'

—'তোমাদের খ্যাতি আছে,—বংশমর্য্যাদা আছে—'

—'মর্য্যাদা আমি চাই না।'

—'জামাই হয়ে কি ময়লা ছেঁড়া বিছানায় গিয়ে বসবে?'

—'যদি বসি?'

—'পৈতৃক সম্পত্তি যা-কিছু আছে তা থেকে হবে বঞ্চিত। ভেবে দেখ, তখন ভিক্ষা ছাড়া আর কোন পথই থাকবে না।'

—'বেশ ভিক্ষাই করব।'

কিন্তু ভিক্ষা তাহাকে করিতে হয় নাই। এক মাত্র পুত্রকে বিষয়সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ পিতারও ছিল না, কাজেই কিছু কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল। পুত্রকে শহরবাসী করিয়া তিনি তাহার অন্তরনয়ন খুলিয়া দিলেন। চারি দিকে বৈভব আর বিলাস, দু-পাশে কর্ম্মব্যস্ত জনতা আর দু-চোখে অর্থসংগ্রহের নেশা,—

ভোগের বেগবতী স্রোতে ত্যাগের কুটা ভাঙিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। পল্লীর অলক রায় শহরের আলোকে নবজন্ম লাভ করিলেন। নবজন্ম ও নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

নূতন অলক রায় বহু দিন পরে পুরাতন মাটিতে পা দিয়া অনেকগুলি পুরাতন প্রশ্নই করিয়া ফেলিলেন।

হঠাৎ অলক রায় অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করিলেন, 'আমাদের বাড়ী আর কত দূর?'

পরিচিত পথও এত অপরিচয় বহন করে। যেখানে মাঠ ছিল সেখানে হয়ত পুকুর তৈয়ারী হইয়াছে কিংবা বাড়ী উঠিয়াছে, যেখানে বাড়ী ছিল সেখানটা জঙ্গলে ভরা। কোথাও ভগ্ন চালার পরিবর্ত্তে দ্বিতল অট্টালিকা, কোথাও ভগ্নপ্রায় দ্বিতল অট্টালিকায় চামচিকা ও বাদুড় ঝুলিতেছে। কুমোরপাড়ার অনেক লোক কমিয়াছে, কলুদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁতঘর বাড়িয়াছে, কিন্তু কামারশালার চিহ্নমাত্র নাই।

রমেশকে ধরিয়া অলক রায় নিজের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নিজের বাড়ীতে পৌঁছিবার মুখে অনেকগুলি নবীন ও প্রবীণ তাঁহাকে কুশল-প্রশ্ন, নমস্কার কিংবা প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিল। তিনি মাথা হেলাইয়া ও হাসি ফুটাইয়া সার্ব্বজনীন শিষ্টাচার বজায় রাখিলেন।

বাড়ীতে যে-আত্মীয়টি ছিলেন, তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানা-ঘরটি যথাসম্ভব সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনতাসমেত অলক রায় তাহার মধ্যে গিয়া ঢুকিলেন।

গড়গড়া আসিল। অলক রায় সেটি স্পর্শ না করিয়া সুদৃশ্য সিগার-কেস বাহির করিলেন। আত্মীয়কে বলিলেন, গোটাকতক ডাব যেন পাড়াইয়া রাখেন, আর সোডা-লেমনেড নৌকার মধ্যেই আছে; যে কয়দিন তিনি গ্রামে থাকিবেন এখানকার অস্বাস্থ্যকর জল পান করিবেন না।

আত্মীয় বলিলেন, 'শ-খানেক ডাব পাড়ান আছে, আনব একটা?'

অলক রায় হাসিলেন, 'না। রাত্রিতে ডাব সহ্য হবে না, সোডা একটা দিও। আর রাত্রিতে ভাত আমি খাই না, খুব বেশী হয়ত চারখানা লুচি কিংবা পাউরুটি আধখানা।'

তার পর আত্মীয়ের নির্দ্দেশমত বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিল। তাঁদের মধ্যে গুরুসম্পর্কীয় নমস্য আছেন, আবাল্যসুহৃদ্ আছেন, নাম-জানা অথচ অপরিচিত বহু আত্মীয় আছেন। সে-কালের বহু কথা হইল এবং ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র টানিয়া অলক রায়ের নিকটতম হইবার চেষ্টাও দেখা গেল কিছু কিছু। মোটের উপর অলক রায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না। কুড়ি বৎসর আগেকার রং বহুলাংশে ফিকা হইয়াছে, হৃদয়ের যোগসূত্রটি ঠিক খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; এই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মত বাসিন্দাগুলিও কেমন খাপ খাইতেছে না—বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতিওয়ালা লোকের জামা যেমন বত্রিশ ইঞ্চি ছাতি-ধারীর গায়ে বেমানান হয়! পুরাতন পরিচয়ের ক্ষণিক প্রীতি বিদ্যুদ্বিকাশের মতই অলক রায়ের মনের আকাশ ধাঁধিয়া দিতেছে, পরক্ষণেই গভীর অন্ধকার। বহু শত ক্রোশ পায়ে চলিয়া চলিয়া গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিয়াই কোন পথিক কি পুরাতন আবেষ্টনে ফিরিবার লোভে যাত্রারম্ভের স্থানটিতে আসিবার চেষ্টা করে? অনন্ত চলার পথে জীবনের মেয়াদ কতটুকু? যাদের অগ্রগতি নাই, জীবনের বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও বিকাশ ম্লান হইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের অস্ত্রলেখা যাদের সর্ব্বাঙ্গে—পুরাতন পথকে সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করে তাহারাই।

বাক্যালাপে অলক রায় শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদে তাকিয়ার উপর হেলিয়া চক্ষু মুদিতেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রমেশ কিন্তু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অলক রায়ের পিছনে লাগিয়াই রহিল। এখানকার যা-কিছু দেখা অলক রায় রমেশের চোখেই দেখিলেন, যা-কিছু শোনা রমেশের কানেই শুনিলেন এবং যত কিছু ধারণা রমেশের মন্তব্যের উপরই গড়িয়া উঠিল। তথাপি রমেশকে তাঁর ভাল লাগিল না। রমেশের বহু অভাব—সাংসারিক ও মানসিক। সাংসারিক অভাবটাই বড় নহে, যত বেশী চিত্ত-দৈন্য। ঠিক

যদি বন্ধুর মত রমেশ সমান তালে মাথা উঁচু করিয়া অলক রায়ের হাতে হাত রাখিত, ত এতটা বিরক্তিকর সে হইত না। পুরাতন বন্ধুত্বের দাবিতে সে ভৃত্যের চেয়েও পরিচর্য্যা-পটুত্ব দেখাইতেছে!

নদীর ধারে ঝাউবন দেখাইয়া রমেশ বলিল, স্কুল পলাইয়া ঐ বনে কত দিন তাহারা চড়ুইভাতি করিয়াছে। অলক রায় ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া হাসিলেন। যে-বনের সঙ্গে গভীর ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া তিনি একদা অসীম উল্লাস উপভোগ করিয়াছেন, আজ পোকা-মাকড়ের ভয়ে সে-বনের ধারে ঘেঁষিতেও তাঁর ভয়। ফুটবলের মাঠে অলক রায়ের নাম ছিল; বাঁশের খুঁটি পোঁতা গোল-পোষ্ট দেখিয়া তাঁর মনে হইল, মাঠটা খুবই বড়। মাঠে গরুর পাল চরিতেছে, অলক রায় হাতের মোটা লাঠি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওর মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়, কি জানি যদি দুষ্ট গরু—'

অন্য পথই তাঁহারা ধরিলেন। এই পথে সারি সারি চাষীর কুটীর—রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ভূমিলক্ষ্মীর সেবা করিয়া যাহারা দিন গুজরান করে। অলক রায়ের মন্দ লাগিল না। দু-দণ্ড বসিয়া দু-একটি সহানুভূতির কথা জানাইতে বড় ইচ্ছা হইল। বসিবার ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে, হাঁটার পরিশ্রমে দেহ কিছু বিশ্রামের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

সম্পন্ন এক মোড়লের উঠানে মোড়া পাতিয়া তাঁহারা দুই বন্ধু বসিলেন। অতঃপর অলক রায় প্রশ্ন করিলেন, 'এবার ধান কেমন হবে মনে হয়? পাটে কিছু পেলে?'

মোড়ল করজোড়ে কহিল, 'হুজুর কোষ্টার বাজার মাটি। নেহাৎ জমি পড়ে থাকে তাই বুনি। ধান এবার কিছু হবেন, কিন্তু মুগ-কলুয়ের আশা নেই।'

—কেন?

—মাঠ সব জলের মধ্যে। জল না সরলে বীচি ফ্যালাবো কোথায়!

—ও। তা তোমরা কলের লাঙল আনাও না কেন? ওতে জমি চষা হয় ভাল, ফসল হয় দু-গুণ।

মোড়ল হাসিল, 'এই হাল-বলদই রাখতে পারি নে, বাবু, তা কল! পর পর ক-সন অজন্মা, মোরা বেঁচে আছি এই যথা নাভ।'

—আমি যদি কল কিনে পাঠিয়ে দিই তোমরা চালাতে পারবে?

—কেনে পারব না বাবু। আপনি পেঠিয়ে দিও।'

মোড়ল হাসিয়া অলক রায়কে প্রণাম করিল। সে জানে এখান হইতে পিছু ফিরিলেই বাবু সব ভুলিয়া যাইবেন। শহর হইতে যে-বাবুই আসেন, কলের কথা বলিয়া চাষাদের কাছে বাহাদুরি লন। কল কিনিবার প্রতিশ্রুতিও কেহ কেহ দিয়াছেন, কিন্তু সে ঐ পর্য্যন্তই। আসলে বলদ জুড়িয়া পুরাতন লাঙলের গোড়ায় দাঁড়াইয়া চাষীকে 'হট' 'হট' শব্দে হলচালনা করিতে হয়। কল এ-যাবৎ তাহাদের চোখে দেখাই ঘটিল না!

যাহা হউক, চাষাপাড়া ছাড়াইয়া অলক রায় একটা পোড়ো বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাড়ীটা যেন চেনা-চেনা বোধ হইল। বাহির অঙ্গনে দুটি বৃদ্ধ জামরুল গাছ শাখাপ্রশাখা মেলিয়া অনেকখানি জায়গা অন্ধকার করিয়াছে। অলক রায়ের মনে হইল, জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহরে কোলাহল করিতে করিতে কত দিন তাঁহারা ওই গাছে চাপিয়া জামরুল পাড়িয়াছেন। যত না খাইয়াছেন তত ছড়াইয়াছেন, ডাল ভাঙিয়াছেন, এ-গাছ হইতে ও-গাছে জামরুল ছুঁড়িয়া যুদ্ধাভিনয়ও কত হইয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গাঙ্গুলীদের বাড়ী না?'

রমেশ বলিল, 'হাঁ গো। অমলা এই বাড়ীতেই থাকে।'

—অমলা? কেন? বিহ্বলের মত অলক রায় প্রশ্ন করিলেন।

রমেশ বলিল, 'গাঙ্গুলী-মশাইয়ের কেউ ছিল না, জামাইটিরও তিন কুলে কেউ নেই, কাজেই অমলা এখানে রয়েছে।'

—জামাই কি করে?

—একটা দোকানে খাতা লিখত, মুহুরীগিরি। যা পেত কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাত। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি।

এমন সময় জামরুল গাছের সামনের দুয়ার খুলিয়া এক বর্ষীয়সী বিধবা বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে তাঁর ময়লা থান, মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ। সংবাদ-

পত্রে এইবার বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর যে-সমস্ত ছবি বাহির হইতেছে, ঐ বর্ষীয়সীকে অনায়াসে তাহার মধ্যে স্থান দেওয়া যায়।

অলক রায় মৃদুস্বরে বলিলেন, 'অমলার মা বোধ হয়। চল, দেখা ক'রে আসি।'

রমেশ বলিল, 'অমলার মা বহুদিন হ'ল স্বর্গলাভ করেছেন। ও অমলা।'

বিস্ময় অলক রায়ের খুব বেশীই হইল, সারা দেহ কেমন যেন একবার শিহরিয়া উঠিল। ত্রস্ত স্বরে তিনি কহিলেন, 'চল, অন্য কোথাও চল।'

রমেশ বলিল, 'ঐ দেখ অমলা আমাদের দেখতে পেয়েছে, আর পালানো মিছে। ঐ দেখ, হাত-ইসারায় আমায় ডাকছে।'

পরে চুপি চুপি কহিল, 'ওদের অবস্থা খুব খারাপ, পরের সাহায্যেই চলে। করবে কিছু সাহায্য?'

অলক রায় প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'পাগল! সাহায্য করবার নামে ভদ্রমহিলাকে আমি অপমান করতে পারি! চল, চল।'

রমেশ বলিল, 'তুমি জান না, গ্রামে কেউ বড়লোক এলেই অমলা সেখানে যায়। যার দিন চলবার কোন উপায়ই নেই, তার হাত পাততে কিসের লজ্জা!'

অলক রায়ের অস্বস্তি দেখিয়া রমেশ বলিল, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি শুনে আসি ও কি বলে।'

রমেশ ভাঙা ফটকের মধ্যে ঢুকিতেই অলক রায় আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। কি জানি, অমলা যদি সাহায্য চাহিয়াই বসে! দুঃস্থকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি অলক রায়ের প্রবল, কিন্তু অমলাকে? যাহাকে এক দিন অনেক কিছু দিবার ইচ্ছাই ছিল, অথচ দৈবের প্রতিকূলতায় একটি কানা-কড়িও দিতে পারেন নাই। সময়ের খরস্রোতে বিপরীত মুখে দু-জনে ভাসিয়া গিয়াছেন। এখন ও-সব চিন্তা মনে না ওঠাই ভাল।

পলাইয়াও অলক রায় রেহাই পাইলেন না। সেই দিন সন্ধ্যাকালে রমেশ নাই, আর কেহ নাই, বৈঠকখানায় তিনি একা বসিয়া আছেন, অল্প একটু ঝিমুনি আসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলেন।

চমক ভাঙিতেই কি দেখিলেন? দেখিলেন, ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বের দেখা বৃদ্ধা—কুৎসিত অমলা দুঃস্বপ্নের মত ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। মুখের লোলচর্ম্ম মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহের জরা সুপ্রকট করিয়া তুলিতেছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা ও পাকিয়া গিয়াছে, শীর্ণ হাতে ঘোমটাটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া সে হাসিল—দন্তহীনার কুৎসিত হাসি! এবং মেঝের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'আমি ত চিন্‌তেই পারি নি, ভাগ্যিস রমেশ-দা বললেন। ভাল ত? ছেলেপুলে, বউ—সব ভাল আছে?'

অলক রায় নিজের অজ্ঞাতসারে কখন উত্তর দিয়া ফেলিয়াছেন। মনে দারুণ বিরক্তি, এইবার টাকা চাহিবে অমলা! ভিক্ষা করিবে। হায়! উহাকে এই অপমান হইতে বাঁচাইবার কেহ কি নাই এখানে?

অমলা কিন্তু টাকা চাহিল না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া অলক রায়ের সাংসারিক সংবাদ লইতে লাগিল। বউয়ের কথা, ছেলেমেয়ের কথা, কলিকাতার কথা, কর্ম্মজীবনের কথা। অলক রায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে অমলার কৌতূহল মিটাইলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এইবার অমলা আপনার প্রার্থনা জানাইবে।

—দেশকে তোমার মনেই পড়ত না, না? তা পড়বে কেন? সে শহরে কত গাড়ীঘোড়া, কত আলো, জাঁকজমক, কত সায়েব-মেম—এ পচা ডোবা, খানা-খন্দ—মনেই বা পড়বে কেন?

অলক রায় মৃদু প্রতিবাদ করিলেন, 'মনে না পড়লে আসব কেন—এত দিন পরে।'

অমলা বলিল, 'সে ত বড়লোকদের দয়া। তাঁরা আসেন এ আমাদের ভাগ্যি। তিনি যে ছেড়ে দিলেন বড়?'

অলক রায় বলিলেন, 'না ছেড়ে উপায় কি, আমি যখন আসবই।'

অমলা বলিল, 'তা ভাল। কিন্তু বেশীদিন থেকো না, যে ম্যালেরিয়া! আর ভালই লাগবে না তোমার। এসে ঠকা ছাড়া জিত ত হ'ল না।'

এ-ক্ষেত্রে যে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল—অন্তত

সৌজন্যের খাতিরেও—অলক রায় সে-ধার দিয়াও গেলেন না। ইচ্ছা করিয়াই তিনি অমলাকে আঘাত করিলেন, 'ঠিক বলেছ, এতে আমার ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।'

উত্তর-শেষে অমলার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু অমলার স্বভাব-পাংশু মুখের বর্ণ-পরিবর্তন তাঁহার চোখে পড়িল না। সে যেন হাসিবার ভঙ্গীতেই জবাব দিল, 'তবে এলে কেন?'

এই প্রশ্নে অলকনাথ নিজেই পাংশু হইয়া গেলেন। মুখখানি নামাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন, 'কি জান, সব 'কেন'র মানে হয় না। এমনি, খেয়াল আর কি।'

অমলা শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'তা সত্যি, খেয়াল তোমাদেরই মানায়।'

অলক রায় ত্বরিতে নত দৃষ্টি তুলিয়া অমলার মুখের পানে চাহিলেন। এত দিন পরে এ-কথার অর্থ কি? অমলা কি—

কিন্তু অমলা ততক্ষণে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে এবং প্রণাম করিবার জন্যই বোধ হয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন সে করিল না, অবগুণ্ঠন সরাইয়া অলক রায়কে আপন মুখভাব দেখিতে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া অলক রায় বলিলেন, 'যাক বাঁচা গেল!' তার পর তাকিয়া ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া সেই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথাই বোধ করি ভাবিতে লাগিলেন।

—কি হে অমলাকে দিলে কিছু?

চমক ভাঙিয়া অলক রায় রমেশের পানে চাহিলেন। মুখে-চোখে তাঁর প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, 'না। অমলা বুদ্ধিমতী, নিজের মান-অপমান সে আজও ভোলে নি।'

রমেশ বলিল, 'অভাবের কাছে মান-অপমান! আমায় ত তখন বললে নিজে এসেই চাইবে। এসেও ছিল, কিন্তু চাইল না কেন বুঝতে পারলাম না!'

—তোমায় ঠাট্টা করেছিল?

—না, ঠাট্টা নয়। চোখের জল ফেলে কেউ ঠাট্টা করে না, অলক। হয়ত লজ্জায় সে বলতে পারে নি।

সহসা অলক রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, 'তা হবে। দেখ ত ভাই আমার মাঝি রহমৎ কোথায়? ডাক ত তাকে?'

—কেন?

—আজই আমায় কলকাতায় ফিরতে হবে, এই রাত্রিতে। জরুরি কাজ আছে।

সবিস্ময়ে রমেশ বলিল, 'তুমি চিরদিনই খামখেয়ালী।'

—ঠিক বলেছ। খেয়াল আমাদের সাজে বলেই খামখেয়ালী আমি। আর দেরি নয় ভাই, ডাক রহমৎকে।

রহমৎ আসিল এবং দণ্ডখানেকের মধ্যেই নৌকা যাত্রার জন্য তৈয়ারী হইল।

কেহ জানিল না অলক রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি কলিকাতায় রওনা হইতেছেন।

রমেশের হাত ধরিয়া তিনি গ্রামের মাটি স্পর্শ করিয়াছিলেন, আবার রমেশের হাত ধরিয়াই নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া রমেশকেও উঠাইলেন। বলিলেন, 'তোমায় একটু কষ্ট দেব, ভাই। এই নৌকা ক'রে আমার সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে যেতে হবে একবার।'

—বল কি, এই রাত্রে?

হাসিয়া অলক রায় বলিলেন, 'ভয় কি। এতগুলো লোক রয়েছি, আর তা ছাড়া সে বড় পবিত্র স্থান।'

অলক রায়ের হাসি রমেশের ভাল লাগিল না।

পুরা এক দিন তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া সে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির মতলব আঁটিতেছিল—কি করিয়া নিজের ছেলেটিকে অলক রায়ের কারবারে ঢুকাইয়া দিবে! আর খেয়ালী অপদার্থটা কিনা এই রাত্রিতেই কলিকাতায় পলাইতেছে। লোকে যাহা বলে মিথ্যা নহে, টাকার কুমীর অলক রায় হাড় কৃপণ। পাছে গরিব-দুঃখী কেহ একটা আধলা চাহিয়া বসে, সেই ভয়ে অন্ধকারে চুপি চুপি পলাইতেছে।

তথাপি শেষ চেষ্টা স্বরূপ সে বলিল, 'অমলাকে কিছু সাহায্য করা তোমার উচিত, অলক।'

অলক রায় ঘাড় নাড়িলেন।

রমেশ অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, 'টাকাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় বস্তু নয়; টাকা সঙ্গে যায় না!'

অলক রায় হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'তা জানি। আরও জানি, গরিব-দুঃখীকে দেওয়াতেই টাকার যথেষ্ট সদ্ব্যয়, তাতে পুণ্যও হয় বেশী।'

—তবে? টাকা খরচের ভয়ে তুমি পালাচ্ছ কেন?

—না রমেশ, টাকা খরচের ভয়ে আমি পালাই নি, আমি পালাচ্ছি এখানে আমার জায়গা নেই ব'লে। কুড়ি বছর ধরে এই গাঁ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কুড়ি বছর পর্য্যন্ত এই গাঁ ছিল আমার ধাত্রী, কিন্তু আজ বুঝলাম এখানে আমার স্থান নেই।

—কেন? কিসে বুঝলে? তুমি যদি এখনও এই গাঁয়ে এস—আমরা গাঁয়ের লোক মাথায় ক'রে তোমায় রাখব।

অলক রায় হাসিমুখে বলিলেন, 'তাও জানি। এখানে রাজার মর্য্যাদায় থাকতে পারি, কিন্তু থাকতে পারলাম না, কারণ সে মর্য্যাদার ভিত্তি কোথায় আমি জানি। উত্তর রূঢ় শোনাবে, তবু একটা সত্যি কথা শোন, রমেশ। এখানে যারা আছে, এই গাছপালা, রাস্তাঘাট, আকাশ-নদী, মানুষ, কেউ আমার আপন নয়। এদের সবার কাছেই আমার মৃত্যু হয়েছে অথবা আমার চোখে এদের মৃত দেখছি। সময় বড় নিষ্ঠুর, রমেশ, কাউকে সে রেহাই দেয় না।'

—তোমার প্রলাপ আমি বুঝতে পারি নে। নৌকা লাগাও, নামি।

—চল না শ্মশানে একবার। সেখানে যে-মৃত্যুর ভয়ে আমরা ঘেঁষি না, তা সত্যকার মরণ নয়। সেখানে যাঁরা আছেন—ভাই, বন্ধু, প্রিয়, আত্মীয়—আমার মনে হয় তাঁরাই সত্যিসত্যি বেঁচে আছেন।

—ছাড়, ছাড়, ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি যা হোক।

—পাগলামি নয়। ভাব দেখি, দশ বছর আগে যাকে এখানে রেখে গেছ, তোমার মনের মধ্যে সে কি দশ বছর বেড়ে গেছে? তার দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে, না চামড়া কুঁকড়ে গেছে? বল ত, তাকে তখন যেমন ভালবাসতে, এখনও মনে মনে তেমন ভালবাস কিনা? তার আচরণে ও কথায় কোন খুঁৎ ধরতে পারবে কি আজ?

রমেশ মুখ ভার করিয়া কহিল, 'রাত-দুপুরে প্রলাপ ভাল লাগে না, ছাড়। ঠাণ্ডা লেগে আবার অসুখ করবে। তোমার কি, পয়সা আছে ডাক্তারের অভাব নেই—হ্যাঁ।'

রমেশের প্রবল আপত্তিতে নৌকা পুনরায় তীরে লাগিল।

রমেশ তীরে নামিয়াই বলিল, 'চামার, চশমখোর, হাড়-কিপ্পন কোথাকার।' বলিতে বলিতে অন্ধকারের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অলক রায় নৌকার উপর শুইয়া পড়িয়া একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া উপরের নক্ষত্রভরা আকাশের পানে চাহিলেন। বিশ বৎসর আগেকার শরতের আকাশ তেমনই নীল, তেমনই অসংখ্য নক্ষত্রভরা, অথচ তার নীচের গ্রামখানি—অলক রায়ের জন্মভূমি?

চলন্ত নৌকার পাশে জলস্রোতের অশ্রান্ত কল কল ধ্বনি অলক রায়ের কানে বার-বার আঘাত করিতে লাগিল। সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া পাশ ফিরিয়া তিনি অন্ধকারমাখা খালের জলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রলয়ের সৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময়ে, এই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম যুগে সৃষ্টি ও প্রলয়ের দ্বন্দ্বনৃত্য চলেছিল, সৃষ্টি ও প্রলয়ের শক্তির মধ্যে কে যে বড় তা বুঝবার জো ছিল না, চারি দিকে নিয়ত সংঘাত চলেছিল। তখন যদি বাইরে থেকে কেউ এই পৃথিবীকে দেখতে পেত তাহলে বলত এই বিশ্ব প্রলয়েরই লীলাক্ষেত্র, সৃষ্টির নয়। চারি দিকে তখন ক্রমাগত ভয়ংকরের নাট্যলীলা চলেছিল। সেই মহাতাণ্ডবের যুগে আমরা যাকে প্রাকৃত জগৎ বলি তাই ছিল, তখন পৃথিবীতে জীব আসে নি। কিন্তু এই মহাপ্রলয়ের অন্তরে সৃষ্টির সত্যই গোপন হয়ে ছিল; যা বিনাশ করে, যা ভীষণ, বাইরে থেকে তাকেই সত্য ব'লে মনে হ'লেও তা সত্য নয়, এই ভীষণ তাণ্ডবলীলাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম কথা নয়। ক্রমশ সব আলোড়ন-উপদ্রব থেমে গেল, এর অন্তরে যে সৌন্দর্যলীলা গোপন ছিল তাই প্রকাশ পেল। সেই প্রলয়ের তাণ্ডব, সেই ঝড়ঝঞ্ঝামহামারী আজো আছে বটে, কিন্তু সে আছে নেপথ্যে, সে একবার দেখা দেয় আবার চলে যায়, তাকেই আমরা চরম পরিণাম বলি নে। সমস্ত উপদ্রব শান্ত হয়ে আসে, উপনিষদে যাঁকে শান্তম্ বলেছে তারই রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে যে হোম-হুতাশন অগ্নির উচ্ছ্বাস, আমরা দেখি তার শান্তরূপ, নক্ষত্র-লোক জুড়ে কী অসহ্য উপদ্রব কী অগ্নিবাষ্পের উচ্ছ্বাস চলেছে সে কথা আমরা ভাবি নে; আমাদের শয়নগৃহের বাতায়ন দিয়ে যখন আকাশকে দেখি, তখন দেখি তার স্নিগ্ধ রূপ, তখন দেখি আকাশ হাসছে—সে আমাদের নিদ্রাকে ব্যাহত করে না। এই শান্তিই চরম সত্য—এ শান্তি দুর্বলের শান্তি নয়, এ প্রবলের শান্তি।

পৃথিবীতে প্রচণ্ডের মধ্যে সংঘাতের মধ্যে শান্তির যে-অভ্যুদয় দেখি আদিযুগে, তাই দেখি আজ মানুষের ইতিহাসেও। উদ্দাম নিষ্ঠুরতা আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলছে সমুদ্রের তীরে তীরে; দৈত্যেরা জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধ্যে এই যে অসুর, এই কি সত্য? এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শান্তির প্রয়াস, সে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি এই দুঃখের দিনেও কত মহা-পুরুষ দাঁড়িয়েছেন শান্তির বাণী নিয়ে, সেজন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। এঁদের সংখ্যা বেশি নয়, সাম্রাজ্যলুব্ধরা এঁদের হিংসা করে মারে, তবু এঁদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারে না। এখনো মানুষ বিপদকে স্বীকার করেও দূর ভবিষ্যতের বাণী বহন ক'রে চলেছে অকুতোভয়ে। সত্য এখানেই। আজ চীনে কত শিশু নারী কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; আজ এই সংগীতমুখর শান্তপ্রভাতে আমরা যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে, পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের প্রাণের কোন মূল্য নেই—সে কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপর দিকে আছে আপন সাম্রাজ্যলোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবদের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত। চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—যেমন অপমান আমাদের দেশেও হয়ে থাকে—তখন এই প্রতাপ-শালীর দল কোনো বাধা দেয় নি, বরং চীনকে দাবিয়ে দিয়েছে, বলেছে, চীনের চঞ্চল হবার কোনো অধিকার নেই। আমাদের দেশেও দেখি দুর্বলকে অবমাননার কোনো প্রতীকার নেই। তবুও একথা বলব, যারা আজ দুঃখ পাচ্ছে প্রাণবিসর্জন করছে, সৃষ্টি করছে তারাই। এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপমানিত জাতিরাই নূতন যুগকে রচনা করছে। প্রতাপশালী ভীরুরা তাদের ঐশ্বর্যভারে নত, পাছে কোনো জায়গায় তাদের কোনো ক্ষতি হয় এই জন্য তারা দুর্বলের পক্ষে দাঁড়াল না—

তবু হতাশ হব না; যারা পীড়িত হচ্ছে মৃত্যুকে বরণ ক'রেই তারা নূতনকে সৃষ্টি করছে, যারা দুঃখ পেল তারাই ধন্য। যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ-আশা দুরাশা নয়; বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হ'তে পারে না, তাহ'লে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড় বড় কামনা মরে নি, কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস নয় সে, এখনো মানুষ চলেছে, এখনো তার মহত্ত্বের উৎস শুকোয় নি। মানুষের ইতিহাসের অন্তরে যদি মহতের কোনো স্থান না থাকত তবে মানুষের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকত না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এইই মানুষের আশ্বাসবাণী। সমস্ত সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সমস্ত দুঃখের মধ্যে সমস্ত পাপের মধ্যে পুণ্যের আবির্ভাব এই আমাদের আশা।

চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে, আমরা কী করতে পারি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি, কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা ক'রে কী লাভ? এই দুঃখবোধ দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি; এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই কিন্তু আমাদের মন আছে; আমরা লড়াই না করতে পারি; কিন্তু এ-কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি এ-কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—এ-কথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি; আমাদের মেশিন-গান্ নেই কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে, তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব।

শান্তিনিকেতন

৭ই পৌষ ১৩৪৪

[শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে আচার্যের উপদেশ]

প্রাচীন ভারতে আর্য্যধর্ম্মে অনার্য্যপ্রভাব—যোগ

শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আর্য্যাণাং সৃষ্টিকর্ত্তারমনার্য্যাণাং তথৈব চ।
ধ্যাত্বাহমীশ্বরং কুর্ব্বে আর্য্যানার্য্যাবিচারণাম্।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই। আমাদের পুরাতন মনীষীরা ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না। এই সদাপরিণামশীল জগতের সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করায় যে কাহারও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয় তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। পুরাণাদি গ্রন্থে বংশ ও বংশানুচরিত প্রসঙ্গে যে নামগুলি পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ইতিহাসের ক্ষুধা মেটে না, আর তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহার পরিহার বড়ই কঠিন ব্যাপার। রাজতরঙ্গিণী ত অতি অর্ব্বাচীন কালের ইতিহাস; উহাতে প্রাচীনকাল সম্বন্ধে যে দু-চার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন করাও যায় না।

এই কারণে পাশ্চাত্য মনীষিগণ যখন আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা প্রামাণিক ইতিহাসের অভাবে অনুমানের আশ্রয় লইলেন এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে অনুমান ও অর্থাপত্তির দ্বারা তাৎকালিক অবস্থা কি ছিল তাহা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইহা স্থির হইয়াছিল যে সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক্, লাতিন, ইংরেজী প্রভৃতির মূলে এক ভাষা ছিল, সেই ভাষার নাম দেওয়া

হয় "ইন্দো-ইউরোপীয়" বা "আর্য্য"। এক বিশিষ্ট ভাষার এক বিশিষ্ট জাতির সহিত সম্বন্ধ অনেক সময়েই দেখা যায়। সেই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিলেন যে সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি ভাষাভাষীগণ মূলতঃ এক জাতি হইতে উদ্ভূত; এই জাতিরও নাম দেওয়া হইল "ইন্দো-ইউরোপীয়" বা "আর্য্য"। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করিতে লাগিলেন যে এই মূলসূত্রের দ্বারা আমরা তাঁহাদের সহিত সংবদ্ধ। অতএব তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে যাহা ভাবেন, তাহার কিছু কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধেও ভাবিতে লাগিলেন। মানুষ নিজেকে যতই বুদ্ধিমান মনে করুক, ভুল সে করেই। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত বা জাতিগত দৃষ্টিদোষ থাকে। তাহার ফলে অনেক সময়েই তাহার দর্শন বা বোধ বিকৃত হয়। এস্থলেও তাহাই হইল। আমাদের ইংরেজ প্রভুরা মনে করেন যে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর সভ্যতা লইয়া এদেশে আসিয়া আমাদের "সভ্য" করিতেছেন। ইহার উপমানে তাঁহারা কল্পনা করিলেন যে প্রাচীন কালে আর্য্যরাও ঠিক এই ভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া স্থানীয় "অসভ্য" জাতিদের পরাজিত করিয়া তাহাদের ধীরে ধীরে "সভ্য" করিয়াছিলেন। ইংরেজদের এই অনুমান পাশ্চাত্য অন্যান্য জাতির পণ্ডিতদের মনেও স্থান পাইল। আর পাইবেই না কেন? তাঁহারা সকলেই "সভ্য", এবং ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা বা স্পৃহা তাঁহাদের সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। এই কারণে আজকাল স্কুলপাঠ্য সকল ইতিহাসের প্রারম্ভে দেখিতে পাই আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক "অসভ্য" দ্রাবিড়ীয় বা কোল-জাতীয় আদিম অধিবাসীদের পরাজয়ের কথা।

বেদে, বিশেষ প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্-সংহিতায়, আমরা অনেক যুদ্ধের কথা পাই। তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দাস ও দস্যুর পরাজয়ের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনার কথা আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনা করিলেন যে দাস বা দস্যু বলিতে আদিম অধিবাসী বুঝিতে হইবে, এবং ইহাদের সহিত আর্য্যদের অনবরত যুদ্ধ হইত। আর্য্যসভ্যতা যে অনার্য্যসভ্যতা হইতে উৎকৃষ্ট হইবেই, সে-বিষয়ে ইঁহারা সন্দেহ করিতে পারিলেন না, যেহেতু ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে তাঁহারা আর্য্য।

আজ কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বুঝিবার বিষয়ে এক নূতন যুগ আসিয়াছে। আমাদের দ্রাবিড়ীয় ভ্রাতারা কিছু কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা আর্য্যসভ্যতা হইতে নিকৃষ্ট নহে, বরং কয়েক অংশে উৎকৃষ্ট। ইহাও বোধ হয় পাশ্চাত্যদের মত জাত্যভিমানের কথা। কিন্তু ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কল্যাণে আজ উভয়বিধ দৃষ্টি-কোণ ছাড়িয় আমাদের নূতন ভাবে সত্যকে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও সর্ জন মার্শাল ও তাঁহার সহযোগীদের অধ্যবসায়ের ফলে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের যে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রাচীন অনার্য্য সভ্যতাকে আর নিম্নস্তরের বলা চলে না। এই সভ্যতাকে আর্য্যসভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা অনেকেই করিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে এইগুলির অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৈদিক সভ্যতার সহিত এ সভ্যতার কোনই সম্বন্ধ নাই। এ-বিষয়ে *Mohenjo-daro and the Indus Civilization* গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১২) সর্ জন মার্শালের উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা সম্বন্ধে যে-চিত্র পাই, মোএঞ্জোদড়ো, হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন অধিবাসিগণ তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর সভ্যতার দাবী করিতে পারিত, এবং এই সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা মনে করিবারও পর্য্যাপ্ত কারণ আছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় যুদ্ধের কথা অনেক থাকিলেও সেগুলি যে সব আর্য্য-অনার্য্য সংঘর্ষের কথা, তাহা কিন্তু গ্রন্থদ্বারা ঠিক সমর্থিত হয় না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় "Survival of the Pre-historic Civilisation of the Indus Valley" নামক নিবন্ধে (পৃ. ১-৮) দেখাইয়াছেন যে আমরা অনেক স্থলে আর্য্য রাজার সহিত আর্য্য রাজার যুদ্ধের কথাই দেখিতে পাই। তা ছাড়া দেব-দানবের সংঘর্ষের কথা ত আছেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "দাস" বা "দস্যু" শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থ করেন, তাহার মূলে কোন প্রমাণ নাই। আমি ঋক্-সংহিতা

অধ্যয়ন করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে "দাস" ও "দস্যু" এই উভয় শব্দই দানব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অতএব প্রাচীন আর্য্যরা অসভ্য অনার্য্যদের বিজিত করিয়া তাহাদের সুসভ্য করিলেন, এ-কথা আমাদের স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের প্রাচীন সভ্যতা পার্থিব দৃষ্টিতে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা হইতে অনেক উচ্চে; যাঁহারা মন দিয়া বেদ পড়িয়াছেন এবং মোএঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পায় গিয়াছেন, অথবা সর্ জন মার্শ্যালের সুবিস্তৃত গ্রন্থখানির তিন খণ্ড আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এ ত গেল পার্থিব সভ্যতার কথা। আমি এখানে আধ্যাত্মিক সভ্যতার কথাই বলিতে চাই। বেদ সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিলে আমরা বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ এবং স্থানে স্থানে বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও যে বৈদিক ধর্ম্মের ধারা মোএঞ্জোদড়ো-বাসীদের ধর্ম্ম হইতে একেবারে ভিন্ন, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈদিক আর্য্যগণ বিভিন্ন দেবতাদের এবং কখনও কখনও পরমা দেবতার স্তুতি করিতেন, এবং তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে যে মূর্ত্তিপূজার কোথাও স্থান ছিল তাহা আমরা পাই না।[১] অথচ মূর্ত্তিপূজা মোএঞ্জোদড়োবাসীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে শাক্ত ও শৈবদের যথেষ্ট প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বেদে শিব ও শক্তির উল্লেখ পাই কোথায়? বেদের রুদ্র ত পুরাণের শিব নহেন। ঋক্-সংহিতার দুই স্থলে (৭।২১।৫ ও ১০।৯৯।৩) অনার্য্যদের লিঙ্গপূজার উপর কটাক্ষ আছে।[২]

কিন্তু মোএঞ্জোদড়োতে শিবপূজা ও শক্তিপূজার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, সেই শিব-

(১) ঋক্-সংহিতা ৪।২৪।১০ এবং ৮।১।৫এ যে ইন্দ্রবিক্রয়ের কথা বা ইন্দ্রের মূল্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের প্রতিমার উল্লেখ নাই, কারণ এই ঋগ্‌দ্বয়ের উপক্রম ও উপসংহার এবং ৭।৮২।৬ প্রভৃতি ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্রের অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এস্থলে দক্ষিণার বিনিময়ে পুরোহিত কর্তৃক ইন্দ্রের কৃপা বিতরণের কথাই বলা হইতেছে, তাঁহার প্রতিমা-বিক্রয়ের কথা নহে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে কোথাও দেব-প্রতিমার আভাসমাত্র পাই না।

(২) এই দুই স্থলে "শিশ্নদেব" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম পদে উদাত্তস্বর থাকায় শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাসরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার যৌগিক অর্থ হওয়া উচিত "শিশ্নোপাসক" বা লিঙ্গোপাসক। কিন্তু যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে (৪।১৯) "দেব" শব্দকে গৌণ অর্থে লইয়া "শিশ্নদেব" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অব্রহ্মচারী"; সায়ণ উভয় স্থলেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে "মাতৃদেব." "পিতৃদেব," "আচার্য্যদেব." "শ্রদ্ধাদেব," এবং পরবর্ত্তী কালের "শিশ্নোদরপরায়ণ" প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে "শিশ্নদেব" শব্দে "দেব" পদের "পরায়ণ" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্য অর্থ অসম্ভব না হইলে লক্ষণার দ্বারা গৌণ অর্থের আশ্রয় লওয়া উচিত নহে ("লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ"—ভাষাপরিচ্ছেদ ৮২ কারিকা—তুলনীয় "যথাশ্রুতোপপত্তের্ণ সন্ত্যায়ঃ"—ঋক্-সংহিতাভাষ্যে সায়ণাচার্য্য কর্তৃক পুরুষার্থানুশাসন হইতে উদ্ধৃত সূত্র)। "শিশ্নদেব" শব্দের স্থলে যখন মুখ্য অর্থে কোন বাধা দেখা যাইতেছে না, তখন গৌণ অর্থের কল্পনা করা ন্যায়বিরুদ্ধ। শুধু তাহাই নহে। এস্থলে গৌণ অর্থের আশ্রয় লইলে মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ হয় না। "ইন্দ্র অব্রহ্মচারীদের হত্যা করিয়া শতদ্বার গৃহের (বা দুর্গের) ধন সংগ্রহ করিলেন" (ঋক্-সংহিতা ১০।৯৯।৩) ইহার কি অর্থ হইতে পারে? বরং "ইন্দ্র লিঙ্গোপাসকদের হত্যা করিয়া তাহাদের ধন নিজ উপাসকদের দিলেন" এই অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হয়। এইরূপে ঋক্-সংহিতা ৭।২১।৫এ "লিঙ্গোপাসক যেন আমাদের যজ্ঞে না আসে" এই অর্থই সহজবোধ্য। ঋক্-সংহিতায় "শিশ্নদেব" ভিন্ন আরও অনেকগুলি সমাসযুক্ত পদ আছে যাহাদের অন্তে "দেব" শব্দ পাই, যথা—"অদেব" "অস্তিদেব" "অর্ধদেব" "উগ্রদেব" "মূরদেব" "বামদেব" ও "বিশ্বদেব" (বহুব্রীহি); এই সকল পদেই "দেব" শব্দের মুখ্য অর্থ লইতে হইবে, গৌণ অর্থের কল্পনা করিলে চলিবে না। ঋক্-সংহিতা ৭।১০৪।১৪তে প্রযুক্ত "অনৃতদেব" পদেও যে "দেব" শব্দের অর্থ "দেবতা," "পরায়ণ" নহে, তাহা ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে। ঋক্-সংহিতার ব্যাখ্যায় ঋক্-সংহিতাগত শব্দ প্রয়োগ যে শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতির শব্দ-প্রয়োগ হইতে অধিক প্রামাণিক, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর এই সকল গ্রন্থের "মাতৃদেব" "পিতৃদেব" "আচার্য্যদেব" প্রভৃতি পদেও "দেব" শব্দের অর্থ "দেবতার ন্যায় পূজনীয়"; "শিশ্নদেব" পদের স্থলে আমরা সেই অর্থই কল্পনা করিতেছি।

ঠাকুরটি যে সকল বিষয়ে আমাদের পৌরাণিক শিবের সদৃশ, তাহাও দেখিতে পাই।[৩] তা ছাড়া লিঙ্গপূজা ও তজ্জাতীয় অন্যান্য প্রতীক-পূজা ত আছেই।[৪]

এ ত গেল পূজার কথা। পূজা ধর্ম্মের চরম কথা নহে, যোগই হইল সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক সাধন। বৈদিক ধর্ম্মে এই যোগের স্থান কতটুকু? দেবতার স্তুতি কর, (পরবর্ত্তী কালে) খুব আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ কর, ইহাই যেন বৈদিক ধর্ম্মের মূলকথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মোএঞ্জোদড়োতে যোগসাধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নাসিকাগ্রদৃষ্টি স্তিমিত-লোচন এক পুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কিছু কাল পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন যে উহা যোগীর মূর্ত্তি।[৫] সে সময় আমরা অনেকে এ অনুমান ভিত্তিহীন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ এই অনুমান সমর্থন করিবার পর্য্যাপ্ত সামগ্রী বর্ত্তমান। ১৯২৭ সালের পর শ্রীযুক্ত ম্যাকাই (Mackay) মোএঞ্জোদড়োতে একটি মুদ্রা (seal) পান, যাহাতে নানা প্রকার পশু-পরিবেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিমুখ (বা চতুর্ম্মুখ) শিবের মূর্ত্তি খোদিত আছে।[৬] এই মূর্ত্তিটিকে দেখিলেই কালিদাসের "পর্য্যঙ্কবন্ধস্থির-পূর্ব্বকায়ম্" প্রভৃতি ধ্যানস্থ শিবের বর্ণনা (কুমারসম্ভব, ৩য় সর্গ) স্বতঃ মনে পড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য মুদ্রাতেও যোগাসনের চিত্র আছে। ১৯৩২ সালের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় "Sind Five Thousand Years Ago" নামক প্রবন্ধে চন্দ মহাশয় সে-সব প্রমাণ একত্র করিয়া দিয়াছেন। অতএব যোগাভ্যাস যে মোএঞ্জোদড়োবাসীদের জানা ছিল, তাহাদের দেবতা ও পুরোহিতগণ যে যোগী হইতেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

এই যোগই হইল হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রত্ন। এখন মনে করিতে পারিতেছি যে এই যোগ আর্য্যরা অনার্য্যদের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। চন্দ-মহাশয় বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের সভ্যতাগত ও জাতিগত যে ভেদের কথা তাঁহার *Indo-Aryan Races* গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তী নিবন্ধাবলীতে বলিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে মাত্র বৃত্তিগত ভেদ ছিল, কোন জাতিগত ভেদ ছিল না, এবং আর্য্যজাতীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের মোএঞ্জোদড়ো-বাসীদের সহিত কোন জাতিগত ঐক্য ছিল না। চন্দ-মহাশয় তাঁহার "Survival of the Pre-historic Civilisation of the Indus Valley" নামক নিবন্ধে (পৃ. ২৫-৩৪) ধ্যান বা যোগ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিদের অনাদরের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ যে ক্ষত্রিয় বলিয়াই এ-বিষয়ে আদর করিতেন, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভের

> ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
> বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।
> এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
> স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

ইত্যাদি শ্লোক হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে ধ্যান বা যোগ ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব সম্পত্তি। প্রথম শ্লোকের "যোগ" শব্দের অর্থ ত পতঞ্জলির "যোগ" নহে। এই "যোগ" বলিতে বিগত তৃতীয় অধ্যায়ের অনাসক্ত কর্ম্মযোগই বুঝা যাইতেছে, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি নহে। মনে রাখিতে হইবে যে গীতারই এক স্থলে (২।৫০) যোগ শব্দকে কর্ম্মে কৌশল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমার ত মনে হয় যে পাতঞ্জল যোগের উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে না হইয়া প্রাচীন অনার্য্যদের মধ্যে হইয়াছিল; এই মতই উপলভ্যমান প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক ধর্ম্মে ক্রমবিকাশ ও কিছু কিছু বিজাতীয় প্রভাব আছে। দেবতা বিষয়ে কি কি বিজাতীয় প্রভাব বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

---

(৩) *Mohenjo-daro and the Indus Civilization,* Vol. 1. pp. 52-6.

(৪) *Ibid,* pp. 58-63.

(৫) *Survival of the Pre-historic Civilization of the Indus Valley,* pp. 25 *ff.* and Plate 1. (b)

(৬) Marshall, *loc. cit.* Plate XII (17).

আমি এক্ষেত্রে আলোচনা করিতে চাই না। আমার আলোচ্য বিষয় যোগ। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশে আমরা যোগের বা যোগীর অথবা তপস্বীর উল্লেখ পাই না, কিন্তু অর্ব্বাচীন অংশে কিছু কিছু পাই। ঋক্-সংহিতার ১০ম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্ত যে অর্ব্বাচীন, তাহা ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্ব্বজনসম্মত। সেই ১০ম মণ্ডলের ১৩৬তম সূক্তে আমরা "কেশী" অর্থাৎ জটাধারী এবং "বাতরশন" অর্থাৎ যোগলব্ধ ঋদ্ধির দ্বারা বায়ুলোকে বিচরণ সমর্থ মুনিদের কথা দেখিতে পাই, যাঁহাদের পরিধানে কপিলবর্ণ মলিন বস্ত্র। এই কেশীকে অগ্নির সহিত, সূর্য্যের সহিত, সমগ্র বিশ্বের সহিত এক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং শেষ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে কেশী এক পাত্রে রুদ্রের সহিত জল (বিষস্) পান করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় পুরাণে সমুদ্রমন্থনের পর শিবকর্ত্তৃক বিষপানের গল্প সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে ঋদ্ধির চরম মহিমা দেখান হইয়াছে; কারণ বায়ু যখন মুনিদের মেখলা, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই মনে করা হইত যে তাঁহারা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ। বেদ-সংহিতার অর্ব্বাচীন অংশে ইহা ভিন্ন অন্য স্থলেও যোগের মহিমা গীত হইয়াছে। জর্ম্মন দেশীয় টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ডক্টর হাউয়ার (Dr. J. W Hauer) তাঁহার *Dia Anfaenge der Yogapraxis* গ্রন্থে এবং পরে প্রকাশিত *Der Yoga als Heilweg* গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে যোগের কথা বিশেষ না পাইলেও, কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন উপনিষদে যোগ যে ব্রহ্মসাধনের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত।[৭] সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রথম প্রথম আপত্তি ও অনাদর থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে তাঁহারা এই যোগকে আপন করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-সাধনার প্রধান সহায় করিলেন। এই যোগ ভিন্ন তৎসংশ্লিষ্ট তপস্যার উল্লেখও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বার-বার পাওয়া যায়। দেবতারা বা প্রজাপতি যে তপস্যা[৮] করিয়া নানারূপ সৃষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহার মূলে মোএঞ্জোদড়ো সভ্যতার সেই যোগী ও তপস্বী পশুপতি, ইহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

এই যোগ ভিন্ন যোগলব্ধ আর একটি রত্ন আর্য্যরা অনার্য্যদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে আমাদের জন্মান্তরবাদ দার্শনিক গ্রন্থে সর্ব্বত্র মানিয়া লওয়া হইয়াছে, কোথাও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। এ-কথা মাত্র আংশিক ভাবে সত্য, কারণ জন্মান্তরবাদের পক্ষে কোন কোন গ্রন্থে "অন্যথা কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম"[৯] রূপ দুইটি যুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন মতের আসল প্রমাণ কি? আমার মনে হয়—যোগজ প্রত্যক্ষ। এই যোগের সঙ্গে আর্য্যরা অনার্য্যদের নিকটে জন্মান্তরবাদও শিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে কি বিশেষ কষ্টকল্পনা করা হয়? বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে অর্থাৎ উপনিষদগুলিতে এবং জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা যে সহসা অতি পরিণত ভাবে জন্মান্তরবাদ দেখিতে পাই, তাহা কি পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শের ফল হইতে পারে না?

---

(৭) Chanda, *Survival of the Pre-historic Civilization of the Indus Valley*, pp. 26-7.

(৮) শতপথব্রাহ্মণ ২।২।৪।১ "সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত" প্রভৃতি হইতে "তপস্" শব্দের তপস্যারূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে, "জ্ঞান" (*Indian Historical Quarterly*, Vol. IX. pp. 104-06) নহে। শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতিগণ নিজ সিদ্ধান্তের কারণে জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের ক্রিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য তাঁহারা বাধ্য হইয়া স্থলবিশেষে "পর্য্যালোচন" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা শ্রুতিসঙ্গত অর্থ নহে। নিত্যজ্ঞানরূপ পর্য্যালোচন বিষয়ে "শ্রম" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

(৯) যথা, বেদান্ত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে প্রকাশানন্দ :—
আত্মা নিত্যোঽথবানিত্যো ভেদস্তাদ্যে স্ফুটো মতঃ।
অন্ত্যে কৃতস্য হানিঃ স্যাদকৃতাভ্যাগমস্তথা॥ (২য় কারিকা)

অর্থাৎ "আত্মা নিত্য অথবা অনিত্য? যদি তাহাকে নিত্য ধরা হয়, তাহা হইলে আত্মা অবশ্যই (ধ্বংসশীল) দেহ হইতে ভিন্ন (সুতরাং দেহের প্রত্যক্ষে আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না)। কিন্তু যদি আত্মাকে অনিত্য (অর্থাৎ শরীর পর্য্যন্ত স্থায়ী) মনে করা হয়, তাহা হইলে আত্মা (জীবনের শেষ অবস্থায়) যে-সব কাজ করিবে, সেগুলি নিষ্ফল হইবে, এবং (জীবনের প্রথমেই) যে-সব ভোগ অনুভব করিয়াছে, সেগুলি বিনা কোন পূর্ব্বকর্ম্মে (সুতরাং

এই যোগের সঙ্গে আরও একটি তত্ত্বের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা সাংখ্য। সাংখ্যের ভিত্তি যোগের অনুভূতির উপর। মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রের সত্তা যোগজ প্রত্যক্ষ হইতে জানা যায় এবং সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট সাংখ্যমত যদিও অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহাদের বাস্তব মূল কিন্তু যোগজ অনুভূতি। মনে রাখিতে হইবে যে পতঞ্জলির যোগসূত্র সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামে খ্যাত। এই সাংখ্যমত পরবর্ত্তী কালের উপনিষদে এবং মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে কিছু কিছু লওয়া হইয়াছে তাহা পণ্ডিতেরা জানেন। কিন্তু খাঁটি নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য যে অবৈদিক, তাহা বেদান্ত সাহিত্য হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি। ব্রহ্মসূত্র-কর্ত্তা বাদরায়ণ প্রথম চার অধিকরণে বলিলেন, "জগতের স্রষ্টা ব্রহ্ম, এবং উপনিষদের সমন্বয় করিলে এই কথাই পাওয়া যায়।" তাহার পরই পঞ্চম অধিকরণে এক আপত্তি উঠিতেছে। সাংখ্যবাদী বলিতেছেন, "কেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে যখন বলা হইয়াছে যে সমস্ত জগৎ জল, অগ্নি এবং অন্ন এই তিন তত্ত্বের মিশ্রণে উদ্ভূত, তখন কি সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির সমর্থন হইতেছে না?" সিদ্ধান্তী তাহাতে এই উত্তর দিতেছেন যে "উপনিষদের ঐ স্থলে চৈতন্যগুণযুক্ত পুরুষকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিকে নহে—'ঈক্ষতের্নাশব্দম্'—অতএব প্রধান কারণবাদ উপনিষদে সমর্থিত হইল না।" এস্থলে প্রধান কারণবাদের জন্য "অশব্দ" (অর্থাৎ অবৈদিক) এই নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম ও তৃতীয় অধিকরণে সাংখ্য-পক্ষ হইতে বেদান্তের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি করা হইয়াছে, এবং তাহাদের খণ্ডনও করা হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণে মাত্র একটি সূত্র "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহ অপি ব্যাখ্যাতা:" (অর্থাৎ ইহার দ্বারা শিষ্টগণের অপরিগৃহীত মতও খণ্ডিত জানিবে)। খুব সম্ভব এস্থলে বৈশেষিক প্রভৃতি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সহিত এক শ্রেণীতে রাখায় সাংখ্য যে শিষ্টদের গ্রহণের অযোগ্য, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে না কি? এই পাদের তৃতীয় অধিকরণের "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগেরও খণ্ডন হইল) এই সূত্রে ত অবশ্যই সাংখ্য ও যোগকে এক আসন দেওয়া হইতেছে। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবক্তার নাম আমরা পাই কপিল বা কপিল মুনি। আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে "কপিল" মূলতঃ ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া, ঋক্-সংহিতার ১০।১৩৬।২ মন্ত্রে উল্লিখিত পিশঙ্গ অর্থাৎ কপিলবস্ত্রধারী মুনিগণকে বুঝাইত, এবং পরবর্ত্তী কালে ইহা হইতে এক আদিভূত (eponymous) কপিলের কল্পনা করা হয়, যাঁহার নাম আমরা অর্ব্বাচীন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৫।২) হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যে দেখিতে পাইতেছি। সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র দুই ত অনেক যোগজ ঋদ্ধির উল্লেখ করে। অতএব অনার্য্য মুনিদের এবং ঋক্-সংহিতার ১০।১৩৬ সূক্তে উক্ত মুনিদের নিকট হইতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা কল্পনা করায় বাধা দেখিতেছি না। সাংখ্য-সম্প্রদায়ের বিষয় ইহা জানিতে পারি যে "কপিলে"র প্রথম শিষ্যের নাম "আসুরি"। এই "আসুরি" (=অসুর-পুত্র) নাম সন্দেহজনক নহে কি? পরবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু সাহিত্যে মূলতঃ অবৈদিক সাংখ্য ও যোগের তত্ত্বের খুবই উপযোগ করা হইয়াছে।

চন্দ-মহাশয় যে পূর্ব্বকথিত "Sind Five Thousand Years Ago" ও "Survival of the Pre-historic Civilisation of the Indus Valley" নিবন্ধদ্বয়ে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সহিত ও জৈনদের কায়োৎসর্গ আসনের সহিত মোএঞ্জোদড়ো সভ্যতার যোগাসনের তুলনা করিয়াছেন, তাহা অতি সারবান্ হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম অনার্য্যবহুল এবং বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত মগধদেশে[১০]

বিনা কারণে) আসিয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হইবে। আত্মাকে অবশ্যই নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে, এবং নিত্য মানিলেই কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য—অর্থাৎ কর্ম্ম এবং ভোগের সামঞ্জস্য করিবার জন্য—আত্মার জন্মান্তরগ্রহণও স্বীকার করিতে হইবে।

(১০) শতপথব্রাহ্মণের বিদেঘ-মাথব ও গোতম-রাহুগণ সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে সদানীরা নদীর পূর্ব্বদেশে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণ-বাস করিতেন না, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সঙ্কলনের সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞের দ্বারা সে দেশ বাসযোগ্য করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন (১।৪।১।১৪-১৬)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মগধে আর্য্যসভ্যতার প্রসার অনেক বিলম্বে হইয়াছে।

উদ্ভূত। সুতরাং অনার্য্য প্রভাব বা প্রাচীন অনার্য্য সম্প্রদায় যে এদেশে পাওয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে নিজেদের প্রসার যত বিস্তৃত করিয়াছেন, সুসভ্য অনার্য্যদের সহিত তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদান ততই অধিক হইয়াছে, তাহাতে অনেক স্থলে আর্য্যরাই লাভবান্ হইয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির সংমিশ্রণে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তাহা আর্য্যও নহে, অনার্য্যও নহে, তাহা "হিন্দু" অর্থাৎ সিন্ধু নদীর এ পারের সভ্যতা। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতা।

খেয়াপারে

শ্রীশান্তি পাল

অন্ধকার নিশীথিনী, নিস্তব্ধ প্রহরে
দূর বনান্তর হ'তে ডাকে আর্ত্তস্বরে
'চোখ-গেল' পাখী এক, ক্ষীণ কণ্ঠ তার
ঝিল্লীকণ্ঠে মিশি গিয়া হয় একাকার।
শূন্যশয্যা একাকিনী শঙ্কিতা কিশোরী
লোল-হস্তে গাঁথে মালা অশ্রু-শতনরী ;
বিহঙ্গের কলধ্বনি অরণ্যেতে মরে—
'চোখ-গেল' নহে পাখী, 'বুক-গেল', ওরে !

মনে পড়ে এক দিন—কবেকার কথা—
দেখা হ'তে দু-জনায় হ'ল পরিচয়,
আধ সঙ্কোচের ভরে লজ্জাবতী লতা
সরমের গ্রন্থি ছিঁড়ি চিত্ত নিবেদয়।
অপরাহ্ণ বেলা শেষ, সান্ধ্য-সরোবরে
স্নানহেতু আসি চুপে পদ্মপত্র ছিঁড়ি
হিজিবিজি কি যে লিখি সুনন্দিত করে
ভাসাইল জলে তায় শৈবালেতে ঘিরি।

সদ্যস্নাতা—নমিতাক্ষ নীলাঞ্চলে ঝাঁপি
ঘটকাঁখে ফিরি গেল গ্রামপথে একা,
রহি রহি ডাকে দূরে নীড়গামী পাখী,
বলাকার পিছে ধায় মসীঅঙ্কলেখা ;
ধরিত্রীর মুখে যেন স্তব্ধ হয় বাণী ;
ঘনাইয়া আসে কোন্ রহস্য গভীর ?
শেষশয্যা রচিয়াছে ম্লান সন্ধ্যাখানি
কৃষ্ণকান্তি বনশ্রেণী, শান্ত স্নিগ্ধ, স্থির।

প্রেম-অশ্রুবিগলিত কম্পমান বুকে
কত কি যে ভাবিতেছি কৈশোরের কথা,
উদ্বেলিত তনুমন বাণী নাহি মুখে
কপোতাক্ষ-তীরে ছুটে মোর কল্পলতা।
অন্তরের অনুরাগ প্রচ্ছন্ন বিলাপ
মেঘাবৃত তারাসম থাক্ ঢাকা থাক্ ;
একখানি ক্ষুদ্র তরী যায় পালভরে,
মাঝি শুধু ব'সে আছে হালখানি ধ'রে।

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস মিউজিয়মে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার চটক সহজেই চোখে লাগে। সুমাত্রার কিংখাপের মত জরির কাপড় ও পোষাকগুলিতে বেশীর ভাগ লাল কালো ও বেগুনী রঙের পুরু রেশমের উপর সাঁচ্চা জরির কাজ। মাথার সাজ ও পুরুষের পরনের মত পায়জামায় আগাগোড়া জরির ফুল তোলার অভাব নেই। আমাদের সেকালের বেনারসী কাপড়ের ও শালের কাজের সঙ্গে এই সব কাজের সাদৃশ্য আছে। তবে আমাদের দেশের মত কল্কা কোথাও দেখলাম না, জরিতে জলের ঢেউ ও ফুলের নক্সাই বেশী। বাটিক কাপড়ের চেয়ে এখানে তাঁতে-বোনা নানা রঙের ভরাট নক্সা ও জরির কাজের কাপড়ই বেশী। গাছের বাকলের পোষাকও অনেক রকম আছে। এসব অন্য দেশে বড় দেখি নি। এখানকার যাদুঘরে যত মূল্যবান পোষাক ও কাপড় আছে অন্য কোথাও তত দেখেছি মনে হয় না। যাঁরা নানা দেশের—বিশেষতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভাল ক'রে জান্‌তে চান সিঙ্গাপুর মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাঁদের নিশ্চয় দেখা উচিত। জামা, পায়জামা, মাথায় জরির রুমাল কত রকম যে আছে তার ঠিক নেই।

বর-কনে ও যোদ্ধাদের মালয় দেশে প্রকৃত সাজ কি রকম তা দেখাবার জন্যে মূর্ত্তি গড়ে সাজ পরানো রয়েছে। সকলেরই পোষাকে কিংখাপের মত জরির কাজ করা, কনের মাথায় মোটা কিংখাপের রুমাল চার কোণ মুড়ে বাঁধা, পাগড়ির মত দেখায়; গায়ে ভুটিয়াদের মত মোটা মোটা সোনার গহনা। যোদ্ধাদের পরনে রেশমের অধোবাস; সত্যি তারা তাই পরত কি না কে জানে?

এদেশী গহনার নমুনাও অনেক আছে। কানের গহনাগুলি মস্ত বড় বড়। আমাদের দেশের সেকালের পাশা ও কানবালার চেয়ে অনেক বড়। চার-পাঁচটা কানবালাকে ছোট বড় অনুসারে ভিতরে ভিতরে সাজিয়ে এক-একটি কর্ণভূষণ করা হয়েছে। সোনার, রূপার, কাঠের, শোলার এবং বোধ হয় পাতারও নানা রকম কর্ণভূষণ আছে।

এদেশটা নাংকেল ও সুপারির দেশ ব'লে এখানে চ্যাটাই বোনার খুব চলন। বেতের জিনিষও খুব বোনে, বাজারে ত সর্ব্বত্র ছড়াছড়ি। মিউজিয়মে চ্যাটাই ও শীতলপাটির অসংখ্য রকম নক্সা দেখা যায়। চ্যাটাইয়ের বিছানা বালিশ, টুপি, ব্যাগ প্রভৃতি নানা রঙের সূক্ষ্ম কাজের নমুনা আছে। এই রকম গদি বালিশ ও তোষক এদেশে রাজসভায় ব্যবহৃত হ'ত। এই সব রঙীন চ্যাটাই ও মাদুর আজকাল বাজারে পাওয়া যায় না, বায়না দিয়ে করিয়ে নিলে তবে পাওয়া যেতে পারে। চ্যাটাইয়ের টুপিগুলি এখনও রিক্‌শওয়ালাদের ও ডিঙি-নৌকার মাঝিদের মাথায় দেখা যায়।

সমুদ্রের ধারের দেশ ব'লে এখানে মাছধরার যত আয়োজন, অন্যত্র বোধ হয় তত নয়; জাতিটার মধ্যে অনেকেই বোধ হয় মৎস্যজীবী। মাছধরার নৌকা ও নানা রকম ফাঁদ ও নানা জাতীয় মাছের নমুনা যাদুঘরে খুব আছে। সেই সঙ্গে সিঙ্গাপুরের আশেপাশে ধরা-পড়া হাঙর ইত্যাদির অভাবও কম নয়। মিউজিয়মের নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরি ও পড়বার ঘর আছে। লাইব্রেরির কিয়দংশ উপরে। নীচে অনেক নভেল, সেইখানেই মেম-সাহেবদের ভিড় বেশী।

শহরের অনেক দোতলা বাড়ীরই উপরতলাগুলি কাঠের ব'লে মনে হয়। এখানকার পথঘাট বিশ্ববিখ্যাত, কাজেই শহরটা দেখায় ভাল। যানবাহনের যাতায়াত সামলাবার জন্য পুলিস মস্ত একটা চৌকো ছাতার মত জিনিষের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতাটাকে ক্রমাগত ঘোরাতে হয়, তার এক দিকে লেখা থাকে stop(থাম) আর এক দিকে লেখা থাকে go (যাও)। পথে অনেক রিক্‌শ, বাংলা দেশের রিক্‌শর চেয়ে এগুলির চাকা অনেক বড় এবং হাল্কা। তাতে গাড়ীটা টানা সহজ হয় নিশ্চয়। রিক্‌শওয়ালাদের মাথায় বেতের

বোনা বড় বড় ছাতার মত টুপি। টুপির মাঝখানটা চূড়ার মত উঁচু। রোদবৃষ্টির সময় এতে বেশ সুবিধা হয়। আমাদের দেশের বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রোদেও রিক্শ-ওয়ালারা শুধু-মাথায় ছোটে। এই রকম টুপির চলন করলে তাদের অনেক কষ্ট কম হয়। পথে ফিরিওয়ালারা বাঁকে ক'রে চলন্ত দোকানের মত বড় বড় ঝুড়ি দু-ধারে সাজিয়ে খাবার বিক্রি করছে। মঙ্গোলিয়ানরা বাড়ীর বাইরে খেতেই বেশী ভালবাসে, তাই বোধ হয় এই ব্যবসা খুব চলে। এখানে অন্যান্য জিনিষও বাঁকেই বেশী বওয়া হয়।

চীনা বাজারে মাংসের দোকানে ছাল-ছাড়ান ব্যাং ও অন্যান্য জীব ঝুলছে দেখে গা কি রকম করে, কিন্তু পথে আতপ চাল রান্নার গন্ধ পেয়ে অনেক দিন পরে দেশের কথা মনে হচ্ছিল। জাহাজে ক্রমাগত ময়দা-গোলা-দেওয়া বাসি মাছ ইত্যাদি খেয়ে এমন অরুচি হয়ে গিয়েছিল যে নেমে গিয়ে খোঁজ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কে এমন সুগন্ধি ভাত রাঁধছে। জাহাজে ভাত চাইলে আঠার মত চট্‌চটে এক রকম ভাত পাওয়া যায় বটে এবং মাঝে মাঝে তরকারি সিদ্ধও কিছু জোটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-দুটি একসঙ্গে পাওয়া যায় না। ভাত চাইলে হয় তার সঙ্গে আরও চট্‌চটে মাংসের কারি, নয় জাপানী ঝোল আসে। আর তরকারি আসে বেশীর ভাগ মাংসের চাব্‌ড়ার সঙ্গে। একদিন মাত্র শুভক্ষণে ভাত মাখন ও আলু-কুমড়ো-সিদ্ধ একসঙ্গে পেয়েছিলাম।

সিঙ্গাপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্ ভারী সুন্দর। এখানকার মাটি সমতল নয়, বাগানটির ত সমস্তটাই পাহাড়ে পথ। গাড়ী কেবল গড়গড় ক'রে নামে আর ওঠে। প্রত্যেক রাস্তায় ওঠবার সময়ই মনে হয় এইবার বুঝি গাড়ী উপর থেকে গড়িয়ে পড়বে, তার পরেই দেখা যায় পাশ দিয়ে আর একটি সরু রাস্তা নেমে গিয়েছে। বাগানটি সবুজে সবুজ, ঝিলে লাল নীল সাদা কত পদ্ম ফুটে আছে, অন্য অনেক রকম ফুলও চারি ধার আলো ক'রে আছে। এদেশের গাছপালার রং এত সুন্দর এবং সর্ব্বত্রই এমন চমৎকার পথ ও গাছের সারি যে বাগান থেকে বেরিয়ে এসেও অনেক দূর পর্য্যন্ত মনে হয় বাগানের মধ্যেই রয়েছি। দার্জ্জিলিঙের তরকারির বাগানের মত থাক্ থাক্ সবুজ মাঠ অনেক জায়গায় দেখা যায়, দার্জ্জিলিঙের মত অত গভীর হয়ে অবশ্য নামে নি, পাহাড়গুলি ত বেশী উঁচু নয়। কিন্তু প্রত্যেকটা থাক্ চওড়ায় দার্জ্জিলিঙের বাগানের চেয়ে অনেক বেশী।

এদেশের মালয়রা অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু চীনার ভিড়ে পথে তাদের দেখা প্রায় মেলেই না। মাঝে মাঝে দেখ্‌লাম চিকণের কাজ-করা সাদা জামা গায়ে দিয়ে ও মুসলমানী মেয়েদের মত মাথায় ওড়নার ঘোমটা দিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা হেঁটে স্কুলে চলেছে। কখনও বা একসঙ্গেই ছেলেরা ও মেয়েরা যাচ্ছে।

ইউরোপীয়ানরা যেখানেই রাজত্ব করে সেখানেই দেশের সব চেয়ে ভাল জায়গাগুলি দখল ক'রে নেয়। এখানেও সব চেয়ে উঁচু উঁচু জায়গায় প্রকাণ্ড সবুজ কম্পাউণ্ডওয়ালা সুন্দর বাড়ীগুলি তাদের। জবাফুলের বেড়া দিয়ে জমিগুলি ঘেরা, একে সাহেবদের এলাকা, তাতে এদেশের সাধারণ লোকেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাজেই বাড়ীগুলি দেখায় ছবির মত।

সিঙ্গাপুরের বাঙালী অধিবাসীদের সঙ্গে ফেরবার পথে আলাপ হয়েছিল, তাঁদের আতিথ্য ও সৌজন্য ও অন্যান্য বিষয়ে পরে লিখব। জাপান যাবার পথে এখানে দেশের কোন মানুষ দেখি নি। পোষ্ট অফিস প্রভৃতি ঘুরে আমরা জাহাজে ফিরলাম, সময় ত বেশী ছিল না। ডাকঘরে নানা দেশের যাত্রী আসে ব'লে এখানে ছবির কার্ড বিক্রির খুব ঘটা। ছোট দোকানও আছে, তা ছাড়া হাতে ক'রে নিয়েও দেখিয়ে বেড়ায় বিদেশীদের লুব্ধ করবার জন্যে।

ডাঙা থেকে ফিরে জাহাজে উঠেই দেখ্‌লাম সমস্ত ডেকটা কালো পায়জামা-পরা চীনা-সুন্দরীতে ভ'রে গিয়েছে। গরম দেশে এলেই চীনা জাপানীরা কালো হয়ে যায় দেখ্‌ছি। এতগুলি মেয়ের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলিই আমাদের দেশের মত কালো, চেহারা আরও খারাপ এবং পোষাকের ত কোনও শ্রীই নেই। এরা সবাই জনকয়েক চীনাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল। একটু পরেই সবাই নেমে গেল। খুব মোটা আর নোংরা একটা চীনা খোকাকে নিয়ে তার মা-বাবারা রয়ে গেল।

বেলা ২টা ২॥ টার সময় আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুর ছাড়িয়ে চলল। তখন 'ভিক্টোরিয়া' ব'লে মস্ত একটা সাদা ইটালীয়ান জাহাজ বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বোম্বাই থেকে বারো দিনে সিঙ্গাপুরে এসেছি, শুনলাম ভিক্টোরিয়া ছয় দিনেই এসেছে। সন্ধ্যা ৭টা ৭॥ টায় শুনলাম উপরের ডেকে মহা কোলাহল হচ্ছে "something wonderful" কে দেখবে ছুটে এস। ছুটে গিয়ে দেখা গেল আলোয় ঝল্‌মল্ করতে করতে ভিক্টোরিয়া আস্‌ছে। নাচের ঘরে এত আলো দিয়েছে যে দেখ্‌লে চোখ ঝল্‌সে যায়। দূর থেকে মনে হয় হীরার গহনা-পরা প্রকাণ্ড একটা রাজ-হাঁস ভেসে চলেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাঁ ক'রে আমাদের জাহাজকে পিছনে ফেলে চলে গেল। যাত্রীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "leaving it behind like a dirty shirt." বেশী পয়সা দিতে পারলে তাঁরাও ঐ ইন্দ্রপুরীর মত জাহাজে যেতে পারতেন মনে মনে বোধ হয় এ-কথাও বলছিলেন।

মালাক্কা প্রণালী ছাড়ার পর সমুদ্র আর তেমন শান্ত নেই। আবার তার অল্প অল্প নৃত্য সুরু হয়েছে। কিন্তু শীতের এখনও নামগন্ধ নেই। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি হয়। একটি মিশনরী মহিলা এক দিন আমাকে ধ'রে বসলেন, "খ্রীষ্টধর্ম্মকে তুমি কি রকম মনে কর? মানুষকে তা কি দিয়েছে?"

আমি বললাম, "সংক্ষেপে এ-কথার উত্তর দিতে আমি পারি নে, এ-বিষয়ে আমি খুব বেশী কিছু ভাবি নি।"

কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। আমাকে দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম সব বিষয়েই কিছু না বলিয়ে ছাড়লেন না। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা কোন্ ধর্ম্মমতে চলে ইত্যাদি—আরও অনেক বিষয়েই তিনি প্রশ্ন সুরু করলেন। সারা পৃথিবীর ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা ক'রে যখন প্রাণ নিয়ে পালাব ভাবছি, তখন তিনি আমায় ধ'রে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করলেন। সেদিন থেকে আমি সাবধান হ'য়ে থাকতাম যেন আবার কারুর কাছে বিনা নোটিসে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করতে না হয়।

হংকঙে কয়েক জন যাত্রী নেমে যাবেন ব'লে তার আগে জাহাজে একটা 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি' করবার জন্তে এক দল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা এ-বিষয়ে সর্ব্বদা তৈরি থাকে দেখলাম। এই ত ছোট্ট জাহাজ, এতে ওসব কোনও দিন হয় না, তবু বলবামাত্রই অনেকের কাছ থেকে নানা রকম পোষাক বেরোতে আরম্ভ করল। আমাকে সবাই ধরল "তুমি মহারাষ্ট্রীয় সাজ।"

আমি বললাম, "ও রকম পোষাক করা আমার অভ্যাস নেই।" কিন্তু ছাড়ে কে? এক জন মেম সাহেব বললেন, "আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।" শিখিয়ে দিলেও যে আমার পরবার ইচ্ছা নেই সেটা স্পষ্ট না বললেও মেম-সাহেবরা ক্রমে বুঝলেন।

কথা হ'ল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ও জাহাজের কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণ করা হবে। তাঁদের আগে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, শুনলাম তাঁরা আসতে রাজী আছেন, কিন্তু জাহাজের আইন-মত সব নিমন্ত্রণ-পত্র নোটিস ইত্যাদি দিতে হবে। আমাদের ষ্টুয়ার্ড এক দিন সারাক্ষণই কাগজপত্র ও দু-পক্ষের জবানী কথা নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। অবশেষে কাগজ টাইপ করতে দেওয়া হ'ল।

২৩শে জানুয়ারী আমাদের দিকে স্মোকিং-রুমে মহা-উৎসব লেগে গেল। স্বয়ং কাপ্তেন মুসলমান ফকির সেজে হাজির। পোষাক বিষয়ে ভারতবর্ষেরই জয়-জয়কার। কেউ সাজলেন রাজপুতানী, কেউ নেপালী, কেউ কাশ্মীর-বাসিনী, কেউ পশ্চিমী মুসলমান বেগম। অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি নেই। ওড়না, ঘাঘরা, পেশোয়াজ, সেরবাণী কোট, নাগরা জুতা জরির পাগড়িতে চারি দিক ঝল্‌সে উঠল। তার উপর নাকের বেশর, হাতের তাবিজ, পায়ের মল, চুটকী, বুড়ো আঙুলে আয়না-বসান আংটি, জরির কাঁচুলী এ সবও দেখলাম যাত্রিণীরা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। নাকে কানে ফুটো নেই, কিন্তু যথাস্থানে সবই ঠিক পরেছিলেন তাঁরা।

কাপ্তেন পাঁচটা পুরস্কার ঘোষণা করলেন, ভোটে যে যত স্থান পাবে সে সেই-মত পুরস্কার পাবে। বোধ হয় কাপ্তেনকে খাতির ক'রে সকলে তাঁকেই দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়ে দিলেন। প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তিনি সেজেছিলেন আরব। মাথায় শাল বেঁধে দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে বিরাট জোব্বা পোষাক প'রে এমন সেজেছিলেন যে মনে হ'ল তখনই বুঝি
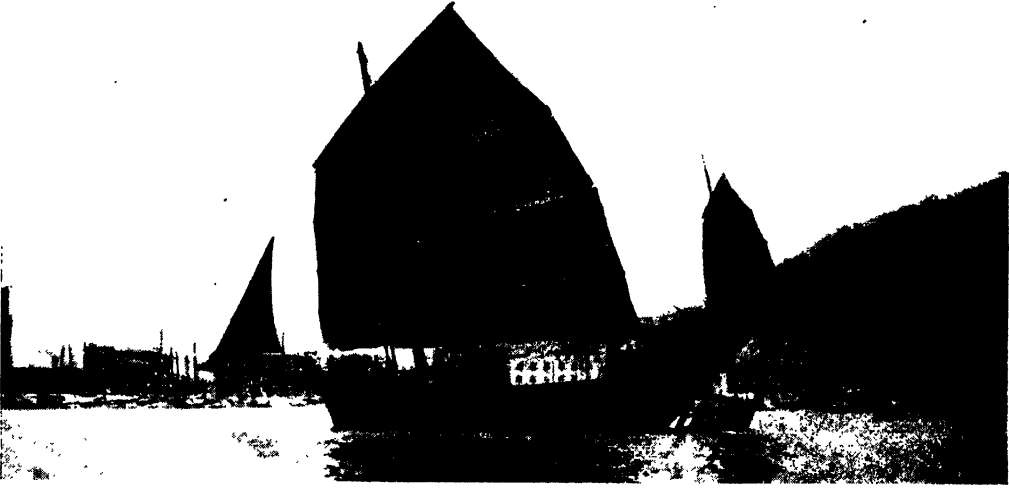
উপরে : চীনা নৌকা ॥ মধ্যে : তলা-চ্যাপ্টা চীনা নৌকা ॥ নীচে : মালয় জলক্রীড়া

মালয়বাসী

গ্রাম্য মালয় তরুণী

বালি নাচের সাজ

উটের পিঠ থেকে নামলেন। আমার মেয়েটি পেলেন চতুর্থ পুরস্কার। তাকে মেমসাহেবরা নিজেদের পুঁজি থেকে সাজপোষাক ধার দিয়ে আগ্রাঅঞ্চলের মুসলমান বালিকা সাজিয়েছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে কাপ্তেন, পর্সর সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে ডিনার খেলেন। ডিনারের পর নাচগান। ফরাসী ভদ্রলোক তাঁর সুবিশাল দেহ ও বিরাট টাক নিয়ে শাড়ী ও মল প'রে বাইজী সেজে নাচতে এলেন। এক জন মেয়ের কাছে "প্রেম নগর মে" গানের একটা রেকর্ড ছিল, তারই তালে ফরাসী ভদ্রলোক বাইনাচ সুরু করলেন। নাচটা ভালই হয়েছিল, তবে বাইরা কস্মিন্ কালেও এ-রকম নাচ দেখেছে কিনা সন্দেহ। তার পর সুরু হ'ল যুগল নৃত্য। জাপানীরা আজকাল নাচগান পোষাক-আষাক সব কিছু আধুনিকতায় পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ব'লে এবং জাহাজে বড় কর্ত্তাদের এসব জানাও দরকার যাত্রীদের কাছে মান রক্ষার জন্যে, তাই কাপ্তেন, ষ্টুয়ার্ড সবাই নাচ শিখে রাখে। জাহাজে পুরুষ-যাত্রী কম এবং যারাও বা আছে তাদের অনেকে নাচে না। কাজেই কাপ্তেন ও দুই জন ষ্টুয়ার্ডকেই প্রায় সকলের মান রাখতে হ'ল। যাত্রীদের মধ্যে একটি মাত্র পুরুষ নাচে যোগ দিলেন। জাপানী যে মহিলা বোম্বাই থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি খুব অল্পবয়স্কা নন। তবে তিনি সর্ব্বদা ইউরোপীয় পোষাক পরতেন এবং নাচতেও অল্পস্বল্প জান্‌তেন। কাপ্তেনের সঙ্গে তিনিও একবার নাচলেন। মেমসাহেবদের মধ্যে যাঁরা খুব আধুনিকা তাঁরা আড়ালে কাপ্তেনের নাচের অনেক সমালোচনা করলেন। কিন্তু নাচবার বেলা কাপ্তেন যাকে যত বেশীবার অনুরোধ করছিলেন তিনিই তত খুশী হচ্ছিলেন। এ নিয়ে রাগ ঈর্ষার প্রকাশও যে অল্পস্বল্প হয় নি তা নয়।

দলের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী এবং ভাল নাচিয়ে তিনি মানুষটা একটু কুনো বলেই বোধ হয় তাঁকে প্রথমে কেউ যুগল নৃত্যে নামতে অনুরোধ করে নি। হঠাৎ এক জন কি মনে ক'রে তাঁকে কিছু একটা করতে বল্‌লেন। তিনি বললেন 'সোলো' নাচ দেখাবেন। কিন্তু হাতে তাল রাখবার একটা বাজনা চাই। 'বাজনা পাওয়া গেল না। অগত্যা একটা ঘুঙুর-দেওয়া মল হাতে ক'রে তিনি আসরে নাম্‌লেন। এতক্ষণে সত্যি একটা নাচের মত নাচ হ'ল। দিশী ও বিলাতী মেলানো হ'লেও মহিলাটির নাচ যে অনেক দিনের সাধনার ফল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একে এতক্ষণ নাচতে না বলায় সবাই অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন। তার পর ঘন ঘন একক ও যুগল নাচে তাঁকেই সবাই ডাকাডাকি লাগিয়ে দিল। মেয়েটির পায়ের নাগরা জুতা আর চলে না। তখন জুতা জোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু নূপুর-পরা পায়েই নাচের পর নাচ হ'তে লাগল। পরে শুনেছিলাম এঁদের কেবিনে বড় বড় বাক্স-বোঝাই পৃথিবীর নানা দেশের ভাল ভাল পোষাক

শহুরে মালয় বালিকা

আছে। এঁরা সাত বছর ধ'রে স্বামী-স্ত্রী কেবল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছেন বার-বার। কিন্তু কে এঁরা এবং কি উদ্দেশ্যে এত পোষাক-আষাক সংগ্রহ করেছেন কাউকে তা বলতেন না। এঁদের জীবনে একটা কিছু রহস্য আছে সেটা এঁরা কাউকে ভেদ করতে দিতে চান না, যাত্রীদের এই ছিল এঁদের বিষয়ে মত। কারুর সঙ্গে বেশী মিশতে কিংবা কাউকে নিজেদের পরিচয় দিতে এঁরা চাইতেন না। লোকে বলত হয়ত এঁরা কোথা হতেও বিতাড়িত ইহুদী-দম্পতি।

নাচের পর হ'ল বীয়ার খাওয়া। ইউরোপীয়দের মধ্যেও

সকলেই বীয়ার খায় না দেখলাম। গান-বাজনা ও নানা দেশের জাতীয় সঙ্গীতে শেষে আসর খুব জমে উঠল।

জাপানীদের মধ্যে বড় ছোটর ভেদ খুব বেশী নেই। আজকের যে উৎসবে কাপ্তেন ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা যোগ দিয়েছিলেন, সেই উৎসবেই হাসির গান ও অভিনয় শোনাল জাহাজে যে মেথর ঝাড়ুদারের কাজ করে সে। জাহাজের নাপিতও ইভনিং ড্রেস প'রে জাপানী ভাষায় গান ইত্যাদি শুনিয়ে গেল।
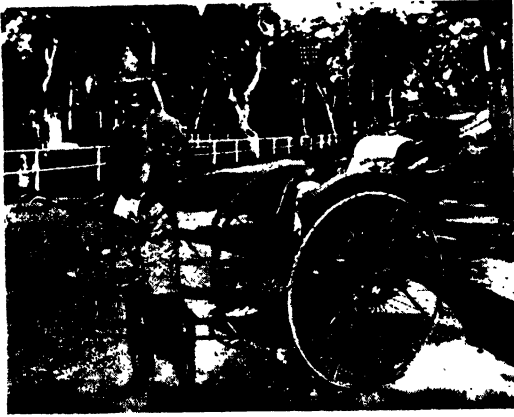
মালয় রিক্‌শ

নাচগানের পরদিনই জাহাজ শীতের রাজ্যে এসে পড়ল। মনে হ'ল প্রথম দিনেই একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। খানিক ডেকে বসে সমুদ্রের হাওয়ায় সর্দ্দিটা কেটে গেল। তবু একবার ডাক্তার দেখাতে গেলাম। শীতের দেশে যাচ্ছি কি জানি কি হয়! যে-দেশের শীত সে-দেশের ডাক্তারের উপদেশ নিয়ে রাখা ভাল। ডাক্তার দেখে বললেন, "কোথাও সর্দ্দি বসে নি।" বললাম, "আমার একটু বেশী ঠাণ্ডা-লাগা ধাত, শীত কতটা বাড়বে জানি না, কি রকম সাবধান হওয়া উচিত যদি ব'লে দেন ভাল হয়।" যতই যা বলি না কেন তিনি কেবল ব্যারমিটারটা দেখিয়ে দেন যে ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছে। আবার বললাম, "জাপান অচেনা দেশ, সেখানে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেন বিপদে না পড়ি এমন একটা ওষুধ-বিষুধ কিছু ব'লে দিন।" ভদ্রলোক কেন যে এতক্ষণ শুধু ব্যারমিটার দেখাচ্ছিলেন তা এর পর বোঝা গেল। তাঁর আছত অভাব ভাষার। একে ইংরেজী সামান্য জানেন, তাতে উচ্চারণ এমন যে কেউ বুঝতে পারবে না। সুতরাং তিনি কাগজ এনে লিখতে আরম্ভ করলেন, "Japan very kind people. No anxious. Some wise people. Some no wise." বোঝা গেল সেখানে পথে পড়ে বেঘোরে মারা যাবার ভয় নেই। তিনি উত্তর শুনেও ভাল বুঝতে পারেন না, লিখে দিতে হয়। কাগজে লিখে যখন সব বোঝাতে পারেন না, তখন তিনি ডাক্তারী ছবির বই দেখিয়ে বোঝান। ছবি দেখিয়ে ব'লে দিলেন কোন্‌খানে সর্দ্দি আছে এবং কোথায় নেই। অধিকাংশ শিক্ষিত জাপানীরই বিদেশী ভাষাজ্ঞান এই রকম। অথচ এতে তাদের উন্নতির পথে কোন বাধা এসেছে ব'লে ত দেখা যায় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজী শিক্ষাকে এত উচ্চ স্থান দিয়েও প্রকৃত উন্নতির পথে এদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন কোথায়?

জাহাজে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটির পালাও বেশ চলত। নাচগানের পরদিন দেখলাম আমাদের টেবিলের জনকয়েক একেবারে তোলো হাঁড়ির মত মুখ ক'রে খাওয়া সেরেই উঠে চলে যাচ্ছেন। নাচের দিনের সে স্ফূর্তির ভাব এবং অন্যান্য দিনের গল্প-গুজব হাসি-তামাশা কোথায় উড়ে গেছে। পরে এক জনের কথায় বোঝা গেল মস্ত একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। দুই দল দুই দলকে জাত তুলে গালাগালি করেছেন। এক জন মহিলা শীঘ্র নেমে যাবেন, তিনি অন্য জনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলেছিলেন, "যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ ক'রে থাকি, ক্ষমা ক'রো।" অন্যটি বললেন, "তোমাদের জাতির ধরণ-ধারণ আমি পছন্দ করি না।" মহিলা চটে বললেন, "তোমাদের জাতের ভদ্রতাও যে আমি খুব পছন্দ করি তা নয়, তবে ওটা বলা শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করি না।" ইতিপূর্ব্বে এই দুই পক্ষে মহা বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু এক পক্ষের স্বামী অন্য জনের সঙ্গে বেশী ভাব করবার সম্ভাবনা দেখানোতেই বোধ হয় কলহের সৃষ্টি। স্বামী-স্ত্রীও দিন-দুই পরস্পরের দিকে তাকাতেন না, থালার দিকে তাকিয়ে প্রাণপণে একমনে খেয়ে যেতেন।

ঠাণ্ডা ক্রমেই বাড়তে লাগল। যাত্রীদের আর ডেকে বেড়াবার কি চেয়ারে পিঠ দিয়ে সমুদ্রের নাচ দেখবার উৎসাহ নেই। ডেক খালিই পড়ে থাকে। ডেক-গল্ফ

খেলায় আমরা সুদ্ধ যোগ দিতাম, এখন কেবল অফিসাররা খেলছেন, কারণ ঠাণ্ডার সময়ই খেলার সরঞ্জামগুলি যাত্রীদের হাত থেকে বিশ্রাম পায়। ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা থেকে খুব ঠাণ্ডা। সবাই বড় বড় ওভারকোট প'রে ডেকে এক পাক ঘুরে এলেন। দুই দিন আগে মাঘ মাসের শীতেও সারারাত পাখা চালিয়ে তবে কেবিনে শোওয়া যেত। এবার দুটো ক'রে কম্বল গায়ে দিতে হচ্ছে। আগের দিন একটাতেই কাজ চলেছিল। ঠাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোরও বেড়েছে। দরজা জানালা খুলে রাখা যায় না, কেবলই ধড়াম ধড়াম ক'রে পড়ে। হাওয়ার ধাক্কা সামলে দরজা খোলাও শক্ত। রীতিমত যুদ্ধ ক'রে খুলতে হয়। জাহাজ এত দুলছে যে খাবার থালাও মুখের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। শুধু যে লম্বালম্বি দুলছে তা নয়, পাশের দিকেও দুলছে। হাঁটতে গেলে গড়িয়ে এদিক-ওদিক চলে যাবার সম্ভাবনা। আমি অনেক সময় রেলিং ধরে হাঁটতাম। সিঁড়ি ওঠা খুব সোজা, এক সিঁড়ি থেকে পা তোলবামাত্র তলা থেকে ঠেলে আর এক সিঁড়িতে তুলে দেয়।

২৬শে সকাল থেকেই দিগন্তরেখা চীনা নৌকায় ভরে গিয়েছে। হংকং থেকে তখনও আমরা ৬০।৬৫ মাইল দূরে, ইতিমধ্যেই বার-চৌদ্দটা নৌকা দেখা গেল। তার ভিতর দুই-চারটা জাহাজের কাছে এগিয়ে আসছিল। দূর থেকে পালগুলি ভারি মজার দেখাচ্ছিল। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি, কি উপকথায় পড়ছি। পালগুলি বল্কলের রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালপাতার অর্দ্ধপাখার মত। প্রথম দূর থেকে দেখে আমি পাতা দিয়ে তৈরি মনে করেছিলাম, কাছে আসতে কাপড়ের উপর বাঁশের শিরা বাঁধা ব'লে বোঝা গেল। যে নৌকাগুলি তখন দিঙ্মণ্ডলে উঁকি দিচ্ছিল তাদের দুটো ক'রে পাল, একটা নৌকার ঠিক মাঝে ডানার মত, একটা পিছনে লেজের মত। সামনে সরু একটা বাঁকানো কাঠ পাখীর লম্বা গলার মত ঝুঁকে আছে। যেন মস্ত বড় বড় সব আজগুবি রাজহংসরা সমুদ্রে সাঁতার দিতে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে। এরা সারাদিন সারারাত সমুদ্রে ভাসবে, জেলেরা নৌকায় মাছ ধরে পরদিন সকালে বাড়ী ফিরবে। এখানে মাছের ব্যবসা বড় ব্যবসা; তাই সমুদ্রে জেলেডিঙির খুব ঘটা। এখানে জেলেদের বড় বড় পল্লী আছে পাহাড়জোড়া।

চীন দেশের এত কাছে এসে আবহাওয়া, দেশের চেহারা সব কিছুই বদলে গেছে। এত দিনে গরমের আর কোন চিহ্ন নেই। এবার আদত শীতকাল।

বন্দী—শ্রীকিরণময় ধর

চিন্তার সঙ্গী—শ্রীকিরণময় ধর

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী লক্ষ্মী হালদার এবার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি শ্রীযুক্ত প্রমদা-কান্ত হালদার মহাশয়ের কন্যা এবং পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন হালদার মহাশয়ের ভগ্নী।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

শ্রীমতী লক্ষ্মী হালদার

উড়িষ্যার রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতিকল্পে প্রধান কর্ম্মীদিগের অন্যতমা রূপে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সুপরিচিতা। তিনি কটকের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সর্ব্ব প্রথম মহিলা ডিরেক্টর। তিনি বর্ত্তমানে উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা ও কংগ্রেস দলের 'হুইপ' পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বঙ্গমহিলা সমিতি

প্রধানতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানটি বছর চারেক পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছে। দিল্লীর কয়েকটি বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। প্রথমে কেবল ২৭ জন সভ্যা নিয়ে মাননীয়া লেডী প্রতিমা মিত্রের নেত্রীত্বে এই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরস্ত্রীগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে শিক্ষার আদানপ্রদান করবেন, সাধ্যানুসারে পরস্পরকে সহায়তা করবেন এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দের বন্ধন স্থাপন করবেন, এই হ'ল এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এ কাজ পুরুষেরাই প্রথম আরম্ভ করেন—সম্ভবতঃ আপন সুবিধার জন্য। এখন কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। স্ত্রীশিক্ষার ভার আর পুরুষদের হাতে আবদ্ধ নেই। অন্তঃপুর-

শিক্ষার ভার মাতৃজাতিই গ্রহণ করেছেন। শিশুশিক্ষার ভারও মায়েদের হাতেই চলে যাচ্ছে।

দিল্লীর মহিলা-সমিতির সুশিক্ষার দিকে বিশেষ প্রয়াস আছে। আনন্দের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রচারের সুযোগের দিকেও এই মহিলা-সমিতির বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিছুদিন হ'ল এই মহিলা-সমিতি রবীন্দ্রনাথের "শেষবর্ষণ" গীতিনাট্যের নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন ক'রে সর্ব্বসাধারণকে যে আনন্দ দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখ এবং প্রশংসার যোগ্য। এই নৃত্যাভিনয়ের প্রযোজনায় প্রকৃত রসজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় ছিল। "শেষবর্ষণে"র এক-একটি গান উপযুক্ত ভূমিকাসহ এমন সুন্দর ভাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল এবং তার মর্ম্মকথাটি অবলম্বন ক'রে এমন একটি অপূর্ব্ব নৃত্যসঙ্গীতমুখরিত খণ্ডকলা প্রদর্শিত হয়েছিল, যা শুধু সুন্দর নয়, যা প্রীতিপ্রদ, উত্তম এবং সুমঙ্গলজনক। নাট্যের অংশ-চয়ন হ'তে আরম্ভ ক'রে গানের সুর, আবৃত্তি-কৌশল এবং নৃত্যলীলা সবগুলিই সমিতির সভ্যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে এইটুকু বলা আবশ্যক যে এই রসকল্পনার পশ্চাতে মহিলা-সমিতির সভ্যারাই আছেন, কিন্তু নৃত্যাভিনয়ের কৃতিত্ব সবটুকু তাঁদের কুমারী কন্যাদেরই প্রাপ্য।

ছোট বড় ২২টি মেয়ে ভূমিকা নিয়েছিলেন। নৃত্য-ভূমিকায় ছিলেন—কুমারী মালবী সেন, সান্ত্বনা গুহ, কল্যাণী সেন, মালশ্রী সেন, অশোকা মল্লিক, প্রমীলা সেন, উর্ম্মিলা সেন, উমা মুখোপাধ্যায়, অরুণা বসু, সুলেখা সেন, সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়। গীতাংশে ছিলেন—কুমারী রেখা সেন, অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জরী সেন, সবিতা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, রমলা সেন, জয়শ্রী সেন, অতসী সেন, রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী বীটু বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং ভূমিকা আবৃত্তি করেছিলেন কুমারী সুজাতা গুপ্ত। ছোট মেয়েদের এই নৃত্যাভিনয় অতীব সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। কতখানি সুশিক্ষা, সংযম, আদর্শপ্রিয়তা তারা ঘরে পেয়েছে, যার পরিচয় তারা সাধারণকে দিতে পেরেছে এবং এর থেকে সহজে ধারণা ক'রে নেওয়া যেতে পারে যে, নারীর স্থান শিক্ষায় দীক্ষায় পুরুষের খুব নীচে নয়, এমন কি উপরেও হ'তে পারে।

যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহিলা-সমিতিটি গড়ে উঠেছে তার প্রধান কথা হ'ল শিক্ষা ও সঙ্গ দ্বারা পরস্পরের জীবন উন্নত ও মধুময় ক'রে তোলা। বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য নাকি ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই থাকা। পার্থক্যের মধ্যেই অপ্রেম সহজে বেড়ে ওঠে, ঐক্যবন্ধন শিথিল হয়। যে-দেশের ইতিকথায় আছে যমের হাত থেকে মৃতপতিকে ফিরিয়ে আনার কথা, সেই দেশের শক্তিস্বরূপিণী হিন্দুনারীগণ স্বামী ও ভাইদের ঐক্যবন্ধনে বেঁধে আনতে পারেন যে-কৌশলে, সে-কৌশল এই নারী-সমিতির মধ্যে আছে।

এই মহিলা-সমিতির প্রতি মাসে একবার ক'রে অধিবেশন হয়ে আসছে। প্রতি অধিবেশনে কোন-না-কোন সভ্যাকে একটি ক'রে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়। প্রবন্ধগুলিতে উচ্চ চিন্তা, আদর্শপ্রিয়তা, সমাজসেবা, পুত্রকন্যাদের শিক্ষাসমস্যা প্রভৃতি নানা হিতকর বিষয়ের আলোচনা হয়। মাননীয়া লেডী সরকার মহোদয়া এই সমিতির বর্ত্তমান সভানেত্রী, সহকারী সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীহারনলিনী সেন ও সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা গুহ। অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্রীগণ—শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দত্ত, শ্রীযুক্তা সরলা গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা বীণাপাণি সেন, শ্রীযুক্তা সরোজবালা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা পূর্ণেন্দু সেন, শ্রীযুক্তা প্রমোদিনী লাল। উপস্থিত সভ্যা-সংখ্যা ৮০ জন।

সমিতির বিশেষ লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনের দিকে—যাতে তারা সত্যিকারের বাঙালী-মহত্ত্বটুকু, ঔদার্য্যটুকু গ্রহণ ক'রে আধুনিক কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বড় হতে পারে। কেবল তাই নয়, দুঃস্থ ও সহায়হীনদের দুঃখ ও অভাব অপনোদনের চেষ্টা এঁরা সাধ্যমত ক'রে থাকেন। সমিতির আয় খুব অধিক নয়; তা সত্ত্বেও সমিতি কয়েকটি দুঃস্থ আশ্রমে, দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে গরিব-দুঃখীর সহায়তায় এপর্য্যন্ত প্রায় তিন শতেরও অধিক টাকা সাহায্য করেছেন। "শেষবর্ষণ" অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য নানা হিতকর কাজের জন্য একটি দান-ভাণ্ডারের সৃষ্টি করা। এই ভাণ্ডার থেকে দিল্লীর বাংলা স্কুলকে সমিতি পাঁচ শত টাকা দান করেছেন। সমিতির এই সকল প্রচেষ্টা ও উদ্যম সমাজ ও দেশের পক্ষে অতীব হিতকর। আশা করা যায়, এই মহিলা-সমিতিটি উত্তরোত্তর বাঙালীদের একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হবে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

চীন-জাপান প্রসঙ্গ

[দৈনিক সংবাদপত্রের মারফৎ পাঠকগণ চীন-জাপান যুদ্ধের গতির বিবরণ অনুবর্ত্তন ক'রে থাকবেন। এই যুদ্ধসম্পর্কিত দু-একটি জ্ঞাতব্য বিষয়, যা বর্ত্তমান যুদ্ধের দিনলিপির অন্তর্গত নয়, তা বিভিন্ন পত্রের ও লেখকের রচনা থেকে পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে সংকলিত হ'ল।]

চীনে শান্তি-প্রতিষ্ঠাই জাপানের একমাত্র লক্ষ্য, এই নির্লজ্জ উক্তি জাপান-সরকারের প্রধান ব্যক্তিগণ বারংবার ক'রে
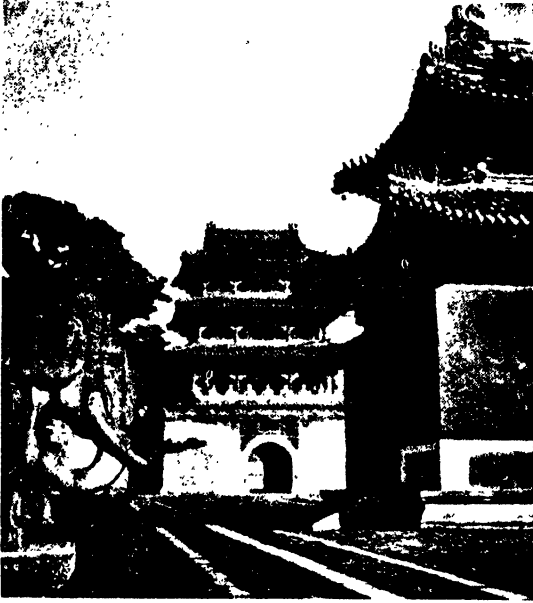
মাঞ্চুবংশের রাজধানী, বর্ত্তমানে জাপান-নিয়ন্ত্রিত মুকডেনের একটি সমাধি-মন্দির

এসেছেন, এখনও তার পুনরুক্তি করছেন। এই উক্তির অযাথার্থ্য সম্বন্ধে কারো মনে বিশেষ সংশয় নেই। তবু, উত্তর-চীনের যে-সকল অংশ ইতিপূর্ব্বেই জাপানের করায়ত্ত আছে এবং অন্যান্য যে-সব স্থানের উপর জাপানের আধিপত্য আছে, তাদের অবস্থার সম্বন্ধে যা জানা যায় তা থেকে জাপানের এই শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার, ভূস্বর্গ-সৃষ্টির দাবি যে কতদূর নিরর্থক তা আরও ভাল ক'রে বোঝা যেতে পারে।

চিয়াং কাই-শেক ও তাঁহার পত্নী
চিয়াং কাই-শেকের বিগত জন্মতিথিতে গৃহীত চিত্র
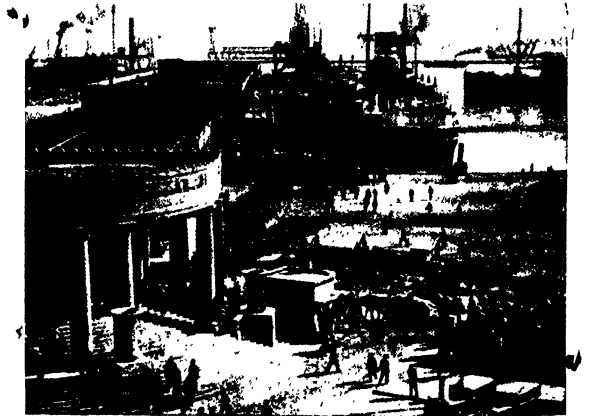
জাপানী অধিকারভুক্ত ডাইরেনের প্রধান বন্দর

"মাঞ্চুকুয়ো"র কথা প্রথমে ধরা যাক। ছয় বৎসর পূর্ব্বে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়াকে আয়ত্তাধীনে আনে তখন এই কথাই বলা হয়েছিল যে মাঞ্চুরিয়ার জনসাধারণকে মুক্তিদানই জাপানের উদ্দেশ্য। মাঞ্চুকুয়োতে জাপানকর্ত্তৃক

মাঞ্চুকুয়ো অঞ্চলে কাঠের পায়ের সাহায্যে বিচিত্র নৃত্যক্রীড়া

প্রচলিত শিক্ষাবিধির প্রতি লক্ষ্য করলেই এই কথা কত দূর সার্থক তা বোঝা যাবে। পূর্ব্বে এখানে যে শিক্ষাতন্ত্র প্রচলিত ছিল তার যতই দোষ-ত্রুটি থাকুক দেশের প্রয়োজন এক রকম ক'রে পূর্ণ করে এসেছে। কিন্তু জাপান এ-কথা জানে যে শিক্ষাবিধিকে সম্পূর্ণ অনুগত না করতে পারলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। শিক্ষা-সংস্কার আরম্ভ হয়েছে পাঠ্যতালিকা-নিয়ন্ত্রণ দিয়ে। চীনের ইতিহাস বা ভূগোল, চীনের বীরপুরুষদের কথা, পাঠ্যতালিকা থেকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা হয়েছে। অথচ জাপানের শৌর্য্যবীর্য্যগাথা পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত। তালিকার বহির্ভূত কোন কিছু পড়াতে হ'লে শিক্ষককে প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসছে, বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে শ্রমশিক্ষা ও ব্যবসায়িক শিক্ষার উপরে।

ক্রীড়ারত কোরীয় তরুণী
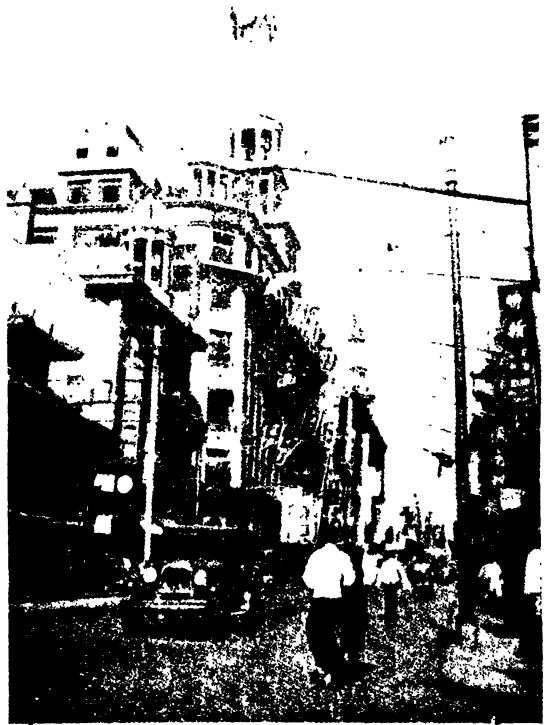
নানকিন রোড, ক্যাণ্টন

স্পষ্টই বোঝা যায়, কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য, সাধারণের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের চিরনিরোধ, তাদের শারীরিক বা আর্থিক

কোরিয়ায় বস্ত্র পরিষ্করণের একটি বিচিত্র দৃশ্য

স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, তাদের প্রাণ ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা বা তাদে জীবনযাত্রার কোন শ্রীবৃদ্ধিসাধন হ নি।

উত্তর-চীনের জাপান-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব্ব হোপেহ্ "স্বায়ত্তশাসিত" অঞ্চলে অবস্থাও এই একই প্রকার। সেখানে পাঠ্যতালিকাকে নির্মমভাবে "সংশোধন করা হয়েছে; জাপানের সাম্রাজ্যবা বা অত্যাচারের কোন প্রসঙ্গ, চীনে জাতীয়তা সম্বন্ধে কোন কথা কো পাঠ্যপুস্তকে যাতে না প্রবেশ করতে পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখ হয়েছে, স্বদেশপ্রেম যেন কোন ভাবে উন্নতি তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তরুণ বয়স থেকেই ছাত্রছাত্রীদের যে-রকম শ্রমিক-বৃত্তি ও ভৃত্যজনোচিত কাজে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে তাদেব মানসিক উন্নতি বিশেষ হবার কথা নয়। ছাত্রদের দিয়ে শুধু নিজেদের বাসস্থান, স্কুল-ঘর বা অধ্যাপকদের ঘরই যে পরিষ্কার করান হয় তা নয়, তাদের দিয়ে রাজপথ পর্য্যন্ত পরিষ্কার করান হয়, আর তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে মাঞ্চুকুয়ো হচ্ছে স্বর্গ-রাজ্য। এ ছাড়া, অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে, এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম কমিয়ে চার বৎসর করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার পরিধি আরও সংকীর্ণ। বলা বাহুল্য, জাপানী ভাষা প্রত্যহ ও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

তবু যদি কোন রন্ধ্র দিয়ে জাপানের পক্ষে আপত্তি- ও বিপত্তি- কর কোন শনি প্রবেশ করে, এই ভয়ে বিনানুমতিতে সভাসমিতি নিষিদ্ধ, গৃহে অতিথি-আগমনের বার্ত্তা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপনীয়।

জাপানের অধীনে মাঞ্চুকুয়োর বাহ্যিক নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান নিয়ে জাপান গর্ব্ব ক'রে থাকে এবং বই ও ছবির মারফৎ তা প্রচারের কাজেও লাগায়। সত্য বটে, রেলপথ, রাজপথ প্রভৃতির বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে, কিন্তু এসব দ্বারা মাঞ্চুকুয়োর চীনা অধিবাসীর মানসিক কোনো

কোরীয় তরুণী

সুন্দরী কোরিয়া

কোরিয়ার প্রধান নগরী কেইজো

জাপানের তোশোগো মন্দিরের প্রবেশদ্বার

জাপানের.আয়ত্তাধীন ফরমোজায় উৎসবে শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য : "অপ্সরী"

যুদ্ধে নিহত জাপানী সৈনিকদের আত্মার অধিষ্ঠানরূপে কল্পিত য়াসাকুনি মন্দির, টোকিয়ো

টোকিয়োর চেরীপুষ্পসজ্জা
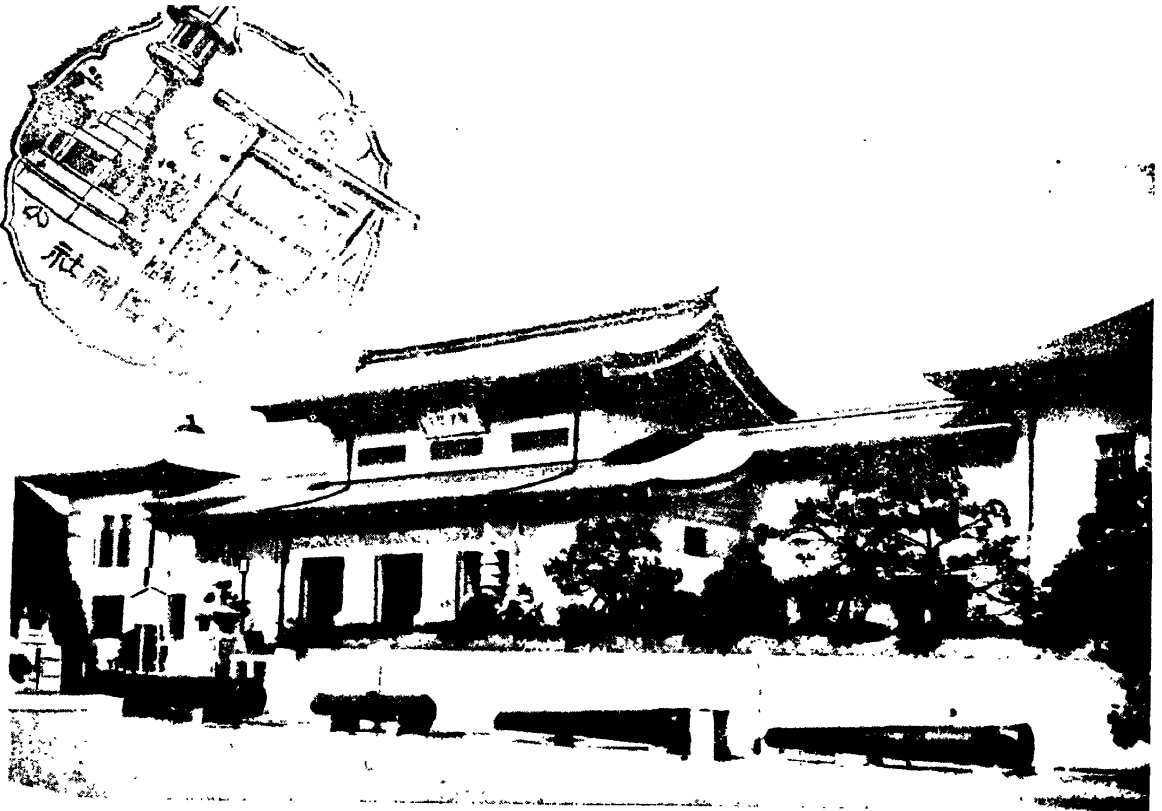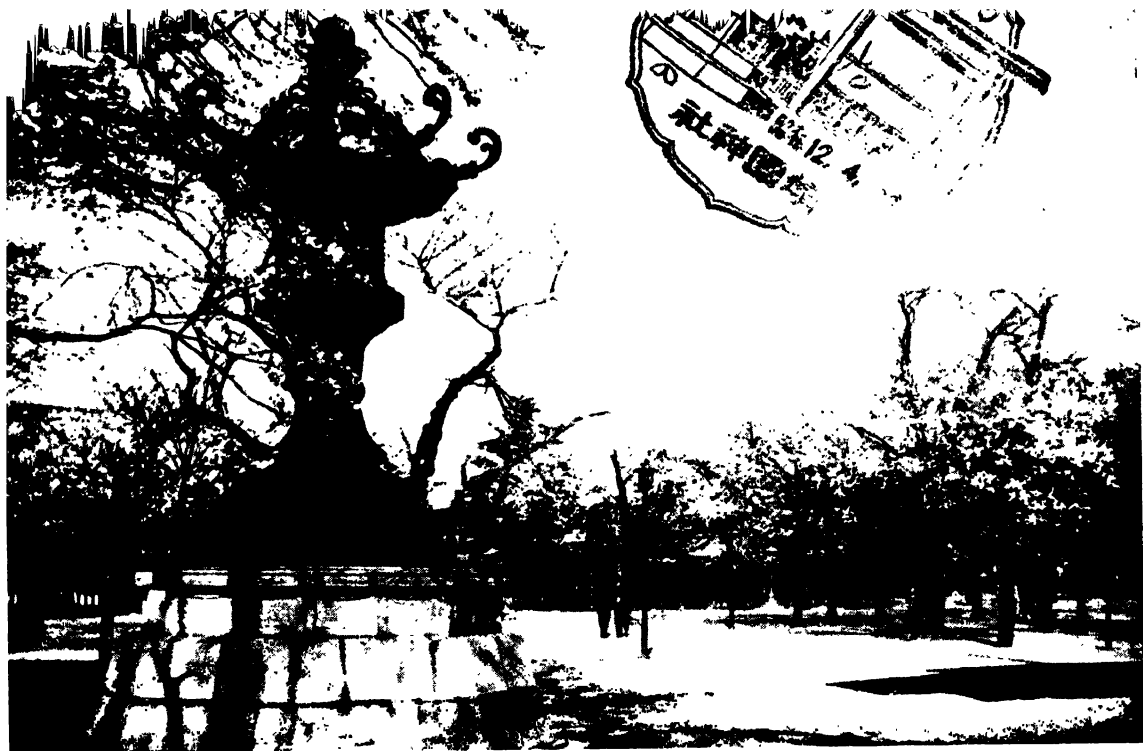
টোকিয়োর একটি মনোরম উদ্যান

জাগরিত হ'তে না-পারে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে চীনের মুক্তিদূত সান-ইয়াৎ সেনের বা চীনের কুয়োমিনটাং দলের কোন সামান্য প্রসঙ্গও দূষণীয় বিষয়। জাপানী ভাষা এখানেও অবশ্যপাঠ্য। পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত সাহিত্যের সাহায্যে যাতে এরা উদ্বুদ্ধ না-হতে পারে এই জন্য চীনের কোনও জাতীয়-সাহিত্যের এখানে প্রবেশ নিষেধ, যে-সকল দোকানে এই সমস্ত বই পাওয়া যেত সেগুলি হয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই অঞ্চল নামেই মাত্র স্বায়ত্তশাসনাধীন, আসলে জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন—এই অঞ্চলের প্রত্যেক বিভাগেই জাপানী পরামর্শদাতা আছে, এবং স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের তুলনায় তাদের ক্ষমতা অনেক অধিক—এরাই আসলে এই রাজ্যের প্রকৃত শাসক। জাপানী নিয়ন্ত্রণাধীনে এই রাজ্যের করভার কমা দূরে থাকুক, বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং নূতন করভার চাপানো হয়েছে—যদিও চাষীর প্রস্তুত জিনিষপত্রের দাম বাড়ে নি বরং কমেছে। চাষীর পক্ষে ঋণ পাওয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হয়েছে, সুদের হার দ্বিগুণ। গোপনে বিনা-শুল্কে জাপানী মাল আমদানী ক'রে দেশীয় শিল্পের বাজার একেবারে নষ্ট ক'রে দেওয়া হচ্ছে; এই রকম ক'রে এই অঞ্চলের কাগজ- ও বস্ত্র-শিল্প একেবারে নষ্ট হতে বসেছে।

চীনের ভবিষ্যৎ যাতে সম্পূর্ণ নষ্ট হ'তে পারে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে জাপানের প্রধান মারণাস্ত্র হচ্ছে আফিঙ-কোকেন। পূর্ব্ব হোপেহ্‌ "স্বায়ত্তশাসনাধীন" অঞ্চলের প্রত্যেক বিভাগে জেলায় জাপানীরা জুয়ার আড্ডা আর নেশার দোকান খুলেছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে চীনা যুবকদের আফিঙ-কোকেনের নেশা ধরানো, কিংবা এমনভাবে জুয়ার অভ্যাস সঞ্চারিত করে দেওয়া যাতে তাদের পরিণাম শোকাবহ হয়। অনেকেই মনে করেন যে জাপানী সরকারের সঙ্গে এই সকল জুয়ার আড্ডা ও নেশার দোকানের বিশেষ যোগাযোগ আছে।

আফিঙকে জাপানের এক প্রধান মারণাস্ত্র বলা হয়েছে। এই সম্বন্ধে উইলিয়াম টীলিং "স্পেক্টেটর" পত্রে যা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। "জাপান যখন ফরমোজা দখল করে তখন এই দ্বীপে যে আফিঙের ব্যবসা সুরু হয় তার লক্ষ্য ছিল অবস্থাপন্ন চীনা-পরিবারের সন্তানদের নেশার বশীভূত করা; উদ্দেশ্য ছিল, উন্নত শ্রেণীর চীনাদের ধ্বংস ক'রে ভবিষ্যৎ বিরুদ্ধতার মুখ বন্ধ করা। মাঞ্চুকুয়োতেও এই নীতিই জাপান অনুসরণ করছে, চীনের সর্ব্বত্রই তাই করবে।" (ফরমোজার উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক আরো বলেছেন, "উন্নতাবস্থার চীনা-

চীনের মাটিতে জাপান যে তাণ্ডব সার্কাস দেখাইতেছে তাহাতে জাপান জনসাধারণের মতামত, নয়-শক্তি চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন, প্রভৃতি বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অর্থ নৈতিক শাস্তির বাধার প্রস্তাবও তাহাকে আটকাইবে না।
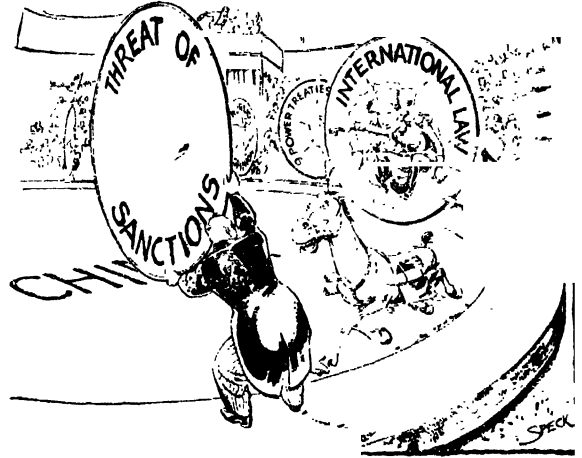
পরিবারের ছেলেরা যাতে উচ্চশিক্ষা না-পায়, ফরমোজায় এই ছিল জাপানের চাল। ছেলেরা বড় হয়ে যাতে পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবেশ না-করতে পারে এ জন্য জাপানী সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ফলে, আমি লক্ষ্য করেছি, ফরমোজায় বর্দ্ধিষ্ণু চীন-পরিবারে কোন পুত্রসন্তান নেই; পরে আবার এই সকল পরিবারের সন্তানদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, চীনের বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়েছে ও উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।" ফরমোজায় অনুসৃত শিক্ষানীতি জাপান তার অধীন অন্য স্থানেও অনুসরণ করছে দেখা যাচ্ছে)।

মাঞ্চুকুয়োর সরকারী বিবরণী অবলম্বন ক'রে চীনের একটি পত্রিকায় চারটি উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় জাপানের সেই একই নীতির প্রয়োগ। এই চারটি প্রদেশে প্রত্যেক চার জন চীনার মধ্যে এক জন নেশায় আসক্ত, এর মধ্যে অধিকাংশই তরুণ-বয়স্ক; ১৫-১৯ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ২০জন, ১৯-২৫

চীনা বাসনের দোকানে উন্মত্ত ষণ্ডের প্রবেশ। জাপান বলে, চীনের রক্ষা ও সংহতি সাধনই নাকি জাপানের আক্রমণের উদ্দেশ্য।

ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কেরা জাপানকে বাধাদানের নামে লঘুক্রিয়াদ্বারা ফলতঃ জাপানকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন— তাঁহাদের ক্ষীণ প্রতিবাদে উন্টা ফলই হইতেছে।

বৎসর বয়স্কের মধ্যে শতকরা ২৫জন, ত্রিশার্দ্ধ লোকদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন লোক নেশায় আসক্ত। এক মুকডেনেই ১০০০ নেশার দোকান আছে। এই সব দোকানে আফিঙের প্রস্তুত নানাবিধ নেশার আয়োজন আছে, এবং তার সঙ্গে আছে জুয়া এবং সর্ব্বপ্রকার নৈতিক অধঃপতনের পুরা ব্যবস্থা। উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রত্যেক কৃষক-পরিবারকে নিয়মিত পরিমাণ আফিঙের চাষ করতে হয় এবং সেজন্য কর দিতে হয়, এই কর আফিঙের চাষ না-করলেও অবশ্যদেয়। চাষীরা এই আফিঙ বাজারে নিজেরা বিক্রয় করতে পারে না, জাপানের সরকারী এজেন্টের কাছে বিক্রয় করতে হয় এবং এই ক্রয়বিক্রয়ের কাজে জাপানের লাভের অঙ্ক মোটা।

সুখস্বর্গভূমি মাঞ্চুকুয়োর কথা জাপান চিত্রে প্রচারপত্রীতে নানাভাবে বিজ্ঞাপিত ক'রে থাকে। তবু যে-সকল নিরপেক্ষ বৈদেশিক এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন সেই সকল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বিদ্রোহের ভয়ে এই অঞ্চলের বহু নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ড হয়ে থাকে এবং জাপানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সার্থক না হোক নিঃশেষ হ'তে চায় না। অথচ অধীন অঞ্চলগুলিকে ভূস্বর্গ ব'লে প্রচার করতে জাপান কখনও পরাঙ্মুখ নয়; এই প্রসঙ্গে কোরিয়ার কথাও স্মরণীয়; স্বর্গভূমি না ব'লে তাকে দাসভূমি বলাই শ্রেয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার বলতে কোরীয়-সাধারণের কিছুই নেই; চীনের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত কোরিয়ার ১৯২৭ সালের বিবরণ থেকে জানা যায় ঐ সময় কোরিয়ার প্রধান প্রধান সরকারী কাজে ২৮,৫০০ জাপানী নিযুক্ত ছিল। আর ১৬০০০ কোরীয় যারা সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল তারা অধিকাংশই ছিল নিম্নস্তরের কাজে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ১৩৪ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল কোরীয়। মুক্তিকামনা যাতে কোরীয়দের মনে বদ্ধমূল না হ'তে পারে, এবিষয়ে যারা কর্ম্মিষ্ঠ তারা যাতে নিরাপদে কারারুদ্ধ থাকতে পারে, সে-বিষয়ে জাপানী সরকার যথাবিধি তৎপর।

জাপান যদি চীনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে তবে জাপানী প্রচারপত্রীতে চীনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যেমনই লোভজনক বৃত্তান্ত ও চিত্র ভবিষ্যতে প্রকাশিত হোক না কেন, চীনাদের পক্ষে যে তা খুব আরামদায়ক হবে না সেটা কল্পনা করা কষ্টকর নয়।

গুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলন

আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই। তাহার কারণ, এইরূপ মিলন হইলে স্বরাজ লাভ ও তদনন্তর স্বরাজ রক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, এবং মিলন না-থাকায় ঝগড়াবিবাদে যতটা সময় ও শক্তির অপব্যয় হয়, চিত্তবিক্ষেপ হয় ও দুঃখ-অশান্তির উদ্ভব হয়, মিলন হইলে সেই সমুদয় নিবারিত হইতে পারে।

এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, হিন্দু-মুসলমানখ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির সমবেত চেষ্টা ভিন্ন যে স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। কেবল হিন্দুরা যদি স্বরাজ লাভের চেষ্টা করেন এবং স্বরাজ লব্ধ হইলে অন্য সকল ধর্ম্মের লোককেও সমভাবে স্বরাজের ফলভাগী করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলেও স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে—যদিও সমবেত চেষ্টা করিলে যত সহজে স্বরাজ লব্ধ হইবার সম্ভাবনা, এক এক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চেষ্টায় তত সহজে হইবে না। যদি মুসলমানেরা উক্ত রূপ স্বতন্ত্র চেষ্টা করেন ও অন্য সকলকেসমভাবে স্বরাজের ফলভাগী করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলেও স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে।

কিন্তু যদি একটি সম্প্রদায়ের লোক স্বরাজলাভের চেষ্টা করেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ ভাবে তাহাতে বাধা দিয়া ব্রিটিশ রাজকেই দৃঢ়তর করিতে থাকেন, তাহা হইলে স্বরাজলাভ দুঃসাধ্য হইবে। আমাদের মতে তাহা দুঃসাধ্য হইবে বটে, কিন্তু অসাধ্য হইবে বলিতে পারি না।

এ পর্য্যন্ত হিন্দুরাই সকল ভারতীয়দিগের জন্য স্বরাজলাভে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ, সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্যনিরপেক্ষ ভাবে, এমন কি অন্যেরা বাধা দিলেও, স্বরাজ লাভ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। মুসলমানদেরও তাহা আছে কি না, তাহা তাঁহারা বলিতে পারিবেন।

—

হিন্দু-মুসলমানের মিলন চেষ্টা

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে অনেক বার হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা সফল হয় নাই। বরং চেষ্টার আনুষঙ্গিক তর্কবিতর্কের ফলে ও শেষে ব্যর্থতার ফলে মনোমালিন্য ও অসদ্ভাব বৃদ্ধিই পাইয়াছে। সেই জন্য, যদিও মিলনের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তথাপি আমরা মনে করি, জোড়াতাড়া দিয়া মিলনের (অর্থাৎ বাহ্য মিলনের) চেষ্টা না করিয়া হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে নিজ নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে স্বতন্ত্র স্বরাজলাভচেষ্টা করিলে ফল ভাল হইবে, এবং মিলনের চেষ্টা না করিলেও এইরূপ স্বতন্ত্র স্বরাজলাভচেষ্টায় মিলনও ঘটিতে পারে।

—

মিঃ জিন্না কি চান

মিঃ মোহাম্মদ আলি জিন্নার সহিত আলোচনা করিয়া কংগ্রেসের সহিত মস্লেম লীগের কোন চুক্তি দ্বারা মিলন সাধিত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা হইতেছে। সে বিষয়ে পরে কিছু লিখিব।

মিঃ জিন্না কয়েক দিন পূর্ব্বে জব্বলপুরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সাম্যের ভিত্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সর্ত্তসমূহের আলোচনা করিতে রাজী আছেন। এই সাম্যের অর্থ কি তিনি খুলিয়া বলেন নাই। যে-প্রকার সাম্যে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, তাহা বলিতেছি। ব্যবস্থাপক সভাসমূহের এবং মিউনিসিপালিটি আদির সভ্যনির্ব্বাচনে ভোট দিতে যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে সমান হইবে; ব্যবস্থাপক সভা, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির সদস্য হইবার যোগ্যতা হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে সমান হইবে। অর্থাৎ হিন্দু বলিয়া বা মুসলমান বলিয়া কাহারও কম যোগ্যতা বা বেশী যোগ্যতা আবশ্যক হইবে না। হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধিপদপ্রার্থীর ও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী

প্রতিনিধিপদপ্রার্থীর নির্ব্বাচনে হিন্দু ভোটার ও মুসলমান ভোটারের ভোট দিবার সমান অধিকার থাকিবে।

এক কথায়, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমান হইবে, তাহারা হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পরিচিত ও গণিত না হইয়া ভারতবর্ষের সম-নাগরিক (ফেলো-সিটিজেন) বলিয়া গণিত হইবে।

সরকারী (অর্থাৎ গবর্মেণ্ট, গবর্মেণ্ট-রেলওয়ে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড প্রভৃতির) চাকরিতে হিন্দু বলিয়াই বা মুসলমান বলিয়াই কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে না বা নিয়োগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না; পদপ্রার্থী প্রত্যেক মুসলমান ও প্রত্যেক হিন্দুর যোগ্যতা সমভাবে বিবেচিত হইবে, এবং ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতমের নিয়োগ হইবে।

হিন্দুকে মুসলমান করিবার মুসলমানদের যেরূপ অধিকার আছে, মুসলমানকে হিন্দু করিবার সেইরূপ অধিকার হিন্দুদের আছে ও থাকিবে।

শিক্ষালয়সমূহে ধর্ম্মনির্বিশেষে বিদ্যার্থীদিগকে ভর্ত্তি করা হইবে। সকল বিদ্যার্থীর জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট স্থান না-থাকিলে যোগ্যতম বিদ্যার্থীদিগকে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লওয়া হইবে। যাহাদের স্থান হইবে না, তাহাদের জন্য অন্য শিক্ষালয় স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৃত্তি কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতম ছাত্রছাত্রীকে দিতে হইবে।

অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের মতের বর্ণনা অনাবশ্যক। মিঃ জিন্না বা অন্য কোন মুসলমান নেতা পূর্ব্বোক্তরূপ সাম্য চাহিলে তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, যে, তাঁহারা অন্য প্রকার তথাকথিত সাম্য চাহিতেছেন। তাহা কি, বলিতেছি। যদি তাহা পড়িয়া কোন মুসলমান নেতা মনে করেন, যে, তাঁহারা সেরূপ সাম্য চান না, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, যে, আমাদের অনুমান ভ্রান্ত। অনুমান এই—

সমগ্র-ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের প্রতিনিধি যত জন থাকিবে, মুসলমান প্রতিনিধিও অন্ততঃ তত জন থাকিবে—যদি মুসলমান প্রতিনিধি কিছু বেশী থাকে, তাহা হইলে আরও ভাল।

যে-যে প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী, তথায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা হিন্দুপ্রতিনিধি অপেক্ষা অনুপাত অনুসারে বেশী হইবে, যে-সব দেশী রাজ্যের নৃপতি মুসলমান তথায় মুসলমান প্রতিনিধি অধিকতম হইবে, এবং যে-যে প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, তথায় মুসলমান ও হিন্দুর প্রতিনিধি অন্ততঃ সমান সমান হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতেও ঐরূপ।

সমগ্র-ভারতবর্ষের সমুদয় সরকারী চাকরিতে হিন্দু যত জন থাকিবে, মুসলমান চাকর্যেও অন্ততঃ তত থাকিবে—মুসলমান চাকর্যে কিছু বেশী থাকিলে আরও ভাল। যে-সকল প্রদেশে, জেলায়, মিউনিসিপালিটিতে, ও দেশী রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী এবং যে-সব দেশী রাজ্যের নৃপতি মুসলমান, তথাকার চাকর্যেদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে বেশী হইবে। যে-সব প্রদেশ দেশী রাজ্য ইত্যাদিতে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে কম, তথায় মুসলমান চাকর্যেদের সংখ্যা হিন্দু চাকর্যেদের অন্ততঃ সমান হইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষালয়সমূহে মুসলমান বিদ্যার্থীদের জন্য হিন্দু বিদ্যার্থীদের সমানসংখ্যক আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সব আসনে বসিবার মত যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান বিদ্যার্থী না জুটিলে কতকগুলি আসন শূন্য রাখিতে হইবে। যে-সকল প্রদেশ ইত্যাদিতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তথাকার শিক্ষালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য অধিকতর আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে, এবং তদনুরূপ যথেষ্ট মুসলমান ছাত্র না জুটিলে কতকগুলি আসন শূন্য রাখিতে হইবে। যে-সকল প্রদেশ ইত্যাদিতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, তথায় হিন্দু ও মুসলমান বিদ্যার্থীদের জন্য সমান আসন রাখিতে হইবে এবং যথেষ্ট মুসলমান ছাত্র না জুটিলে কতকগুলি আসন শূন্য রাখিতে হইবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বৃত্তি মোটের উপর হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য সমান সমান রাখিতে হইবে। যে-সব প্রদেশ আদিতে মুসলমান বেশী তথায় মুসলমানদের জন্য বৃত্তি বেশী থাকিবে, অন্যত্র সমান সমান।

হিন্দুকে মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান করিবার অধিকার মুসলমানদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের সমান থাকিবে। হিন্দুকে

মুসলমান করিয়া কালক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সমান এবং তদনন্তর হিন্দু অপেক্ষা অধিক করিবার অধিকার মুসলমানদের থাকিবে। হিন্দুদের সংখ্যাসাম্য-রক্ষার বা সংখ্যাবৃদ্ধির অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমান-মিলন-চুক্তি নীরব থাকিবে।

বলা বাহুল্য, এই প্রকার "সাম্যে" হিন্দুরা রাজী হইবে না। কারণ, হিন্দুরা ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ, মুসলমানেরা সিকিরও কম। কংগ্রেস রাজী হইলে কংগ্রেস এইরূপ চুক্তি অনুসারে কাজ করিতে পারিবে না।

—

জবাহরলাল-জিন্না সংবাদ

কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু খবরের কাগজে এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন যাহাতে লেখা ছিল, যে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে যে-যে সর্ত্তে হিন্দু-মুসলমানের চুক্তি হইবার কথা ছিল, তাহা সংশোধন পরিবর্দ্ধনাদি করিবার জন্য মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিতে কংগ্রেস প্রস্তুত। মিঃ জিন্না এই বিবৃতির উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটির বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। তাহাতে বক্রোক্তি, শ্লেষ, অপ্রকৃত উক্তি অনেক আছে।

মিঃ জিন্না ইহাতে বলিয়াছেন, কংগ্রেস কি কি সর্ত্তে মস্লেম লীগের সহিত মিলন চান তাহা যদি মিঃ জিন্নাকে জানান, তাহা হইলে তিনি তাহা বিবেচনা করিবেন। মিঃ জিন্নার মতে সর্ত্তগুলি মহাত্মা গান্ধী লিপিবদ্ধ করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করিলে ভাল হয়। অর্থাৎ মিঃ জিন্নার ভঙ্গীটা এইরূপ যেন তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয়ভাগ্যবিধাতা, কংগ্রেসকে তাঁহার নিকট আবেদন পাঠাইতে হইবে; তিনি তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন, না-করিতেও পারেন।

আমরা যত দূর জানি বুঝি, তাহাতে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাঁহার পদমর্য্যাদা ও শক্তি এরূপ নহে। তিনি সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বা একমাত্র নেতা নহেন।

তিনি যদি বলিতেন, "আমি বা আমরা মুসলমানরা এই এই সর্ত্ত চাই," তাহা হইলে কংগ্রেসের সহিত আলোচনা সহজ হইত। মস্লেম লীগকে দরখাস্তকারী সাজাইবার অভিপ্রায়ে আমরা ইহা বলিতেছি না। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে শয়তানী শাসন বলিয়াছিলেন, কিন্তু আবার দেশের হিতার্থ সেই শাসনেরই প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারাল ও গবর্ণরদের সঙ্গে উপযাচক হইয়া দেখা-সাক্ষাৎও করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কোন অপমান বা লাঘব হয় নাই। মিঃ জিন্নার সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে গেলেও তিনি ছোট হইয়া যাইবেন না। বিদেশী ও দেশীদের মধ্যে কে বড় ও কে ছোট, সবাই জানে।

আমরা মিঃ জিন্নাকেই তাঁহার সর্ত্তগুলি নির্দ্দেশ করিতে বলিতেছি অন্য কারণে।

তিনি মস্লেম লীগের সভাপতি। মস্লেম লীগের সভ্যেরা সকলেই মুসলমান, অমুসলমান কেহ ইহার সভ্য নহেন। মস্লেম লীগ সাম্প্রদায়িক সংঘ। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় কি পাইলে সন্তুষ্ট হইবে, ঐ লীগ তাহা হয়ত বলিতে পারিবে।

অন্য দিকে, কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ইহার সভ্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টিয়ান বৌদ্ধ পারসী প্রভৃতি অনেক আছেন। মুসলমানরা কি পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা কংগ্রেসের মত অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুমান করা ও বলা সহজ নহে। আরও একটি বাধা আছে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের স্বার্থ-পরতাপ্রসূত পক্ষপাত ও চালবাজিতে যাহা পাইয়াছেন ও আরও যাহা চান, তদ্দ্বারা হিন্দুদের এবং মুসলমান ব্যতীত অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি হইয়াছে ও অধিকার হ্রাস পাইয়াছে। গণতান্ত্রিকতা ত সাংঘাতিক আঘাতই পাইয়াছে। এখন কংগ্রেস যদি গবর্মেণ্টের পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবস্থাপক সভার ও চাকরির সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে সায় দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস আত্মহত্যা করিবেন; যদি উক্ত বাঁটোয়ারার অতিরিক্ত আরও কিছু মুসলমানদিগকে দিতে চান, তাহা হইলে আত্মহত্যার বেশী কিছু করিবেন।

কংগ্রেস সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সব মানুষের প্রতিনিধি নহেন। যদি এক সম্প্রদায়ের কোন দাবীর বিচার কংগ্রেসকে করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য সম্প্রদায়গুলির লোকদের কি বলিবার আছে, তাহাও কংগ্রেসকে শুনিতে হইবে।

কংগ্রেস একটা সিদ্ধান্ত করিয়া মস্লেম লীগকে বলিতে

পারিতেন, "আমরা সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ইহা স্থির করিয়াছি ; লইতে চান লউন, না-লইতে চান, তাহা হইলেও আমাদের সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।" কংগ্রেস তাহা করিতেছেন না। কংগ্রেস বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মিলিত চেষ্টার ফল একটি প্রস্তাবিত চুক্তিকে ভিত্তি করিয়া আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নার মত জানিতে চাহিতেছেন। মিঃ জিন্না মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ত অন্য কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নহেন ; পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুও নহেন। সুতরাং মস্লেম লীগের অনুরূপ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের—হিন্দু শিখ খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের—মত নির্দ্ধারণ করা কংগ্রেসের উচিত। যথা, হিন্দু মহাসভার মত জানা উচিত।

মিঃ জিন্না তাঁহার সর্ত্তগুলির ফর্দ্দ দিলে নানা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের মত নির্দ্ধারণ সহজ হয়।

কংগ্রেসের অজানা নাই, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বঙ্গের হিন্দুরা, কংগ্রেসী হিন্দুরাও, গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ইহা না-গ্রহণ-না-বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে বর্জ্জনেই জোর দিয়া আলাদা কংগ্রেস ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টি (স্বাজাতিক দল) গঠন করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে এই দলের প্রার্থীরাই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাবিত রাজেন্দ্রপ্রসাদ-জিন্না চুক্তির সর্ত্তসমূহে বঙ্গের অনেক কংগ্রেস-সদস্য প্রকাশ্য ভাবে অমত জানাইয়াছেন। সুতরাং এখন বাংলা দেশকে—বাংলা দেশের কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী হিন্দুদিগকে—গণনার মধ্যে না আনিয়া ও তাহাদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস কিছু করিলে তাহা অন্যায় হইবে এবং তাহাতে কংগ্রেস হীনবল হইবেন।

কংগ্রেস যেমন মস্লেম লীগকে পোঁছিয়াছেন তেমনই হিন্দু মহাসভাকেও পোঁছা উচিত। কংগ্রেস যদি বলেন, "আমরা মুসলমান-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহি বলিয়া মস্লেম লীগকে পোঁছিয়াছি," তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইতে পারে, "আপনারা ত হিন্দু সম্প্রদায়েরও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহেন ; সুতরাং হিন্দু মহাসভাকেও পোঁছুন না"। যদি কংগ্রেস বলেন, "হিন্দু মহাসভার হিন্দু সভ্য যত আছেন, তার চেয়ে বেশী হিন্দু কংগ্রেসের সভ্য আছেন" ; তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, "পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মতে মস্লেম লীগের সভ্য-সংখ্যার চেয়ে কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যদের সংখ্যা বেশী।" অতএব, হিন্দুদের পক্ষ হইতে কোন রফাচুক্তি করিবার অধিকার যদি কংগ্রেসের থাকে, তাহা হইলে মুসলমানদের পক্ষ হইতেও রফাচুক্তি করিবার অধিকার কংগ্রেসেরই আছে—হিন্দু মহাসভাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই, তদ্রূপ মস্লেম লীগকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই।

—

মিঃ জিন্না কেন রফার সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন না

আমাদের অনুমান এই যে, মিঃ জিন্না কি চান তাহা বলিতেছেন না এই কারণে, যে, তাঁহার দাবী কংগ্রেস মানিয়া লইলে দর-কষাকষি চলিবে না, তাঁহার অনুচরদের বা তাঁহার দাবীকে ক্রমবর্দ্ধমান রাখা বা করা চলিবে না।

কিছু পাইলে তাহাকে ভিত্তি করিয়া আরও বেশী কিছু চাওয়া সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের কর্ম্মনীতি।

ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মিঃ জিন্না চান যে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে ও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সরকারী চাকরিতে গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সার অংশ মানিয়া লউন এবং তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু দিতে সম্মত হউন।

—

রাশিয়ার "ষড়যন্ত্রকারীদের" বিচার সম্বন্ধে ট্রট্স্কির মত

সম্প্রতি "The Case of Leon Trotsky" (Secker and Warburg) নামক যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। রাশিয়ায় সম্প্রতি ট্রট্স্কির দলভুক্ত লোক বলিয়া ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া বিস্তর লোকের বিচার হইয়া গিয়াছে ও চলিতেছে। ষ্টেলিনের উক্তরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ট্রট্স্কির মত এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেলিন্ ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনয়ন করেন, তাহার অনুসন্ধানকল্পে যে কমিশন আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

জন ডিউইর (John Deweyর) নেতৃত্বে মেক্সিকোতে গত বৎসরের ১০ই হইতে ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট উক্ত পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ট্রট্‌স্কি ষ্টেলিনের উক্ত অভিযোগ ও বিচারকার্য্যকে মানব-ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অলীক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ট্রট্‌স্কি বলেন যে, এ-কথা প্রতিপদেই এক্ষণে শুনা যায় যে, রাশিয়ায় তাঁহার মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা নগণ্য এবং তাঁহাদিগকে রাশিয়ার জনসাধারণও বিশেষ ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু বিচারালয়ে ঐ সকল ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের সময় যে সাক্ষ্য দেওয়ান হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সাক্ষ্যে বর্ণিত ঐরূপ কার্য্য গবর্মেণ্ট-শাসনযন্ত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রাধান্য বিনা সম্ভব নহে। এই দুই বাক্যের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। ট্রট্‌স্কির অভিমত এই যে, ষ্টেলিন্ এক্ষণে যে তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের অপসারণ বা হনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য রাজনীতিক। যাহা হউক, তিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান রুশ-গবর্মেণ্টের ব্যাপারের অন্তঃসারশূন্যতা (bankruptcy) এক নূতন "ইন্‌টারন্যাশন্যাল" প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়াছে। ট্রট্‌স্কি বলেন যে, ১৯৩৩ সাল হইতেই পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন বিদ্রোহী সম্প্রদায় "চতুর্থ ইন্‌টারন্যাশন্যাল"এর পতাকাতলে সমবেত হইয়া এক নূতন দল গঠনে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ষ্টেলিনের উক্ত কার্য্য এই "চতুর্থ ইন্‌টারন্যাশন্যাল"কেই অঙ্কুরে বিনাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। —ম.

—

সর্ চিমন্‌লাল শেতলবাদের অভিভাষণ

উদারনৈতিক সংঘের গত বাৎসরিক অধিবেশনে সর্ চিমনলাল শেতলবাদ তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই কম্যুনিজম্ হইতে ভারতের বিপদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, সোশ্যালিজমের ছদ্মবেশে ভারতে কম্যুনিজম যে-ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে তাহা কেবল যে কংগ্রেসের পক্ষে বিপজ্জনক তাহা নহে, উহা সমগ্র দেশের পক্ষেই বিপজ্জনক। সোশ্যালিজম্ ও কম্যুনিজমের মত ও পথে অনেক পার্থক্য আছে। যে সমাজতন্ত্রবাদ এক্ষণে ইউরোপের অনেক দেশে চলিত আছে, তাহাকে সোশ্যালিজম্ বলে, আর রাশিয়ায় যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তিত তাহাকে কম্যুনিজম বলে। কম্যুনিজমের মত ও পথ সংগ্রামমূলক (militant), কিন্তু সোশ্যালিজমের তাহা নহে। শ্রমিক প্রভৃতিদের অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে সোশ্যালিষ্টরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থা উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের মত ইহার বিপরীত। সর্ চিমনলাল বলেন, ইউরোপভূখণ্ডে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ জনসাধারণের সম্যক অধিকার লাভ, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে ন্যায্যভাবে লভ্যাংশ বণ্টন এবং কোন কোন শিল্পআদি গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্তকরণ, তাহাতে তাঁহার সম্মতি আছে। ভারতে কংগ্রেসীদের মধ্যে অধিকাংশেরই সোশ্যালিজমের সহিত সহানুভূতি আছে, কিন্তু তাঁহারা কম্যুনিজম্‌কে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইঁহারাই এক্ষণে কংগ্রেসের পরিচালক। কিন্তু বামপন্থীদের ইহাতে বিশ্বাস নাই। কংগ্রেস-মন্ত্রীরা যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহাতে উক্ত বামপন্থীদের আস্থা নাই। তাঁহারা উহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা এখনও শ্রমিক প্রভৃতিদের ক্ষেপাইয়া থাকেন। ইহাতে কংগ্রেস-মন্ত্রীদের অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, এবং তাঁহারা উক্ত আন্দোলনকারীদিগকে অনেক সময় সাবধান করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। বাস্তবিক ইহাতে দেশের অধিকাংশ লোকেরই সহানুভূতি আছে। কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্র ও সমাজের যে বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন এক দিনেই আনয়ন করিতে চাহেন, তাহা অনেকেই দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন সকলেই চাহেন, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরে ঘটুক ইহাই অধিকাংশের মত। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাহাই করিতে চাহেন বলিয়া লোকদের সহানুভূতি তাঁহাদের পশ্চাতে আছে। কিন্তু এই সহানুভূতি এক্ষণে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকিলে চলিবে না, উহা এমন রূপ ধারণ করা উচিত যাহাতে কম্যুনিষ্টদের প্রোপাগাণ্ডা দেশের ক্ষতিসাধন করিতে না-পারে। —ম.

মিঃ জিন্নার বাঞ্ছিত "সাম্য" সম্বন্ধে আমাদের অনুমান

মিঃ জিন্না জব্বলপুরে বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি হিন্দুদের সহিত আলোচনা সমানে সমানে করিতে প্রস্তুত আছেন, অর্থাৎ তিনি হিন্দুদের নিম্নস্থানীয় হইয়া কোন আলোচনা করিতে চান না। আমরাও চাই না, যে, কেহ কাহারও সহিত আলোচনায় আপনাকে অপর পক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের কিরূপ সাম্যে আমাদের সম্মতি আছে তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহার পর মিঃ জিন্না কিরূপ সাম্য চান, সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমানও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই অনুমানটা ভিত্তিহীন, অমূলক, নিছক ব্যঙ্গ মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। কেন নহে, তাহা বলিতেছি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বিবৃতির উত্তরে মিঃ জিন্না এক জায়গায় এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন:—

[ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের] ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এইরূপ সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, বার-বার এই কথাটি প্রচারিত হইতেছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা এইরূপ ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে পারি না। আমি চাই, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু আজ একথা উপলব্ধি করুন, যে, তাঁহার বা কংগ্রেসের আজিও সমগ্রভারতে এমন কোন চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হয় নাই, যাহার প্রভাবে বা ফলে তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যকর কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা ঘোষণা প্রচার করা সম্ভবপর। আমরা সুনির্দ্দিষ্ট ও কার্য্যকর এরূপ রক্ষাকবচ (safeguard) চাই এবং কার্য্যকর এরূপ হাতিয়ার চাই যাহার দ্বারা কেবল আমাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখাই সম্ভবপর হইবে না, পরন্তু আমাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং দেশ শাসনের ব্যাপারে আমাদের সম্যাক্ মর্য্যাদা ও অধিকার বজায় রাখার ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হইবে।"

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই—মিঃ জিন্নার এই মর্ম্মের কথা খুব সহজবোধ্য। মিঃ জিন্না যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে-ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তথায় ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিয়াছে, যদিও সমগ্র ভারতে তাহা জন্মে নাই। যাহা হউক, এ-প্রকার আলোচনা এখন আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাহা করিবার প্রয়োজনও নাই। কংগ্রেস (কিংবা হিন্দু সম্প্রদায়) মুসলমানদের ধর্ম্মে সংস্কৃতিতে ও ভাষায় ব্যাঘাত জন্মায় নাই, জন্মাইতে ইচ্ছাও করে নাই।

আমরা জানিতে চাই, যে, যদি মিঃ জিন্নার মতে কংগ্রেস নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে বা করাইতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের সহিত বা কংগ্রেসের কোন কোন নেতার সহিত চুক্তি বা রফার সর্ত্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা আগে কেন করিয়াছিলেন, এবং এখনই বা তিনি কেন বলিতেছেন,

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতেই হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া আবশ্যক," "মহাত্মা গান্ধী যদি প্রস্তাব রচনা করিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়?"

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের প্রস্তাবের কি মূল্য আছে? যাহা হউক, ইহাও আমাদের প্রধান আলোচ্য নহে।

মিঃ জিন্না এরূপ রক্ষাকবচ ও হাতিয়ার চান, যাহার বলে মুসলমানদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা এবং রাজনৈতিক অধিকার ও শাসনকার্য্যে সম্যক্ মর্য্যাদা আদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার আস্থা নাই। গবর্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা মুসলমানদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহাও তিনি যথেষ্ট মনে করেন না। কারণ, তিনি তাহা যথেষ্ট মনে করিলে নূতন করিয়া রক্ষাকবচ ও হাতিয়ার চাহিতেন না। তিনি যাহা চাহিতেছেন তাহা যাহাই হউক, একমাত্র গবর্মেণ্টই তাহা দিতে পারেন। সুতরাং এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক, কি হইলে মুসলমান বা অন্য কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্যনিরপেক্ষভাবে সম্পূর্ণ নিজেদের ক্ষমতায় সব দিকে আত্মরক্ষা করিতে পারে। অবশ্য ইহা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় অন্য সকলকে অধিকারচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে (যাহা সত্য নহে)।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে মুসলমানদের প্রতিনিধি মোট প্রতিনিধির সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু অধিক হইলে এবং

সমুদয় সরকারী চাকরির অর্দ্ধেকের কিছু অধিক মুসলমানদের হস্তগত হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন—আমরা মিঃ জিন্নার সাম্যের দাবীর যে অর্থ অনুমান করিয়াছি, সংক্ষেপে ইহাই তাহা। মুসলমানরা এইরূপ ক্ষমতা পাইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হিন্দুদের ন্যায়বুদ্ধির উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা কম ক্ষমতা পাইলে, তাঁহাদিগকে হিন্দুদের ন্যায়বুদ্ধির উপর কিঞ্চিৎ নির্ভর করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থা যে মিঃ জিন্নার বাঞ্ছিত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এখন কথা হইতেছে এই, যে, মুসলমানরা এইরূপ ক্ষমতা পাইলে হিন্দুরা এবং মুসলমান ভিন্ন সংখ্যালঘু অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। তাহা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে? হিন্দুদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য ব্যবস্থাপক সভার আসন এবং চাকরির অংশ হইতে তাহাদিগকে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও চাকরিবিষয়ক সরকারী আদেশ দ্বারা বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? অন্যায় ও অবিচার বোধ কি হিন্দুদের নাই?

এরূপ প্রশ্নও থাক্‌।

যেরূপ ব্যবস্থায় ও বন্দোবস্তে মুসলমানেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাহাতে হিন্দুরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন কি? ব্যবস্থাপক সভার যত আসন এবং চাকরির যত অংশ হিন্দুরা (যোগ্যতার বলেও) পাইলে মুসলমানরা বিপদ আশঙ্কা করেন, মুসলমানরা মুসলমানত্বের বলে তাহা পাইলে হিন্দুরা ও অন্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা কি আপনাদের বিপদ আশঙ্কা করিতে পারেন না? কংগ্রেস বা হিন্দুরা মুসলমানদের ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও ভাষায় হস্তক্ষেপ করে নাই। তথাপি তাঁহারা আশঙ্কা বা আশঙ্কার ভান করেন।

ধর্ম্মমত অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার আসনের ও সরকারী চাকরির ভাগবাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নহে, এবং দল গঠিত হওয়া উচিত নহে। গণতান্ত্রিক নীতিতে রাজনৈতিক মত অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় দল গঠন এবং যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ হওয়া উচিত। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার আসনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ও তদনুসারে ব্যবস্থাপক সভার দল গঠিত হইলে, দলগুলির সভ্যসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, প্রবলতম দল প্রবলতম এবং দুর্ব্বল দলগুলি দুর্ব্বলই থাকিয়া যায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতিতে রাজনৈতিক মত অনুসারে দল গঠিত হইলে দলগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়ে কমে, এবং প্রবলতম দল কখন কখন দুর্ব্বল হয়, দুর্ব্বল দলও প্রবলতম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, রাজনৈতিক মত অনুসারে দল গঠিত হইলে প্রত্যেক দলে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক থাকিতে পারে, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের উপর নিজ নিজ হিতের ও স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত অংশতঃ নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারে ও স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিতে পারে।

—

"চণ্ডীদাস-চরিত"

"চণ্ডীদাস-চরিত" নামক যে কাব্যটির কিয়দংশ প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীর যে-সকল পাঠিকার ও পাঠকের উহা ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহারা এখন সমগ্র গ্রন্থখানি পড়িবার সুযোগ পাইবেন।

গ্রন্থখানির সামান্য অংশও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি উহার সমালোচনা করেন, এবং উহা যে জাল এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন। কাব্যটি এখন ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্য সমর্থন করিতে কিংবা ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

—

রবীন্দ্রনাথের "প্রান্তিক"

পৌষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রান্তিক" নাম দিয়া তাঁহার আঠারটি নূতন কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি ছাড়া কবিতাগুলি তাঁহার কঠিন পীড়ার পর রচিত। আখ্যা-পত্রের আগের একটি পৃষ্ঠায় ভূমিকাস্বরূপ কবির হস্তাক্ষরে এই কথাগুলি মুদ্রিত আছে:—

"অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্ত পানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

খ্রীষ্টের জন্মদিন বলিয়া খ্রীষ্টীয় জগতে যে ২৫শে ডিসেম্বরে উৎসব হয়, সেই দিন পুস্তকখানির শেষ দুটি কবিতা কবি লিখিয়াছিলেন। একটিতে কবি বলিতেছেন:—

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্তধূমে
গর্জ্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুঙ্কার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণ-বিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো

ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন যথাযোগ্য সমারোহ ও উৎসাহের সহিত এবার পাটনায় হইয়া গেল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল "বাঙালীর ভবিষ্যৎ"। এবিষয়ে তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নানা কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। তথাপি তাঁহার পাটনার অভিভাষণটিতে নূতন কথা আছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্যর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে "সাহিত্য" শব্দটি সম্বন্ধে কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য কথা বলিয়াছেন। এই দুটি অভিভাষণ এবং বিভিন্ন শাখা-সমূহের সভাপতিদিগের এবং সঙ্গীত শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ কোন কোন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ উপকৃত হইয়াছেন।

সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনের উদ্যোক্তাগণ অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত "পাটনার বিবরণ" মুদ্রিত করিয়া সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে পাটনার পুরাতত্ত্ব জানিবার এবং পাটনা ও বিহারে বাঙালীর ইতিহাস ও কীর্ত্তি অবগত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার গোড়ার ছবিগুলি কাল কালিতে ছাপা হইলে স্পষ্টতর হইত। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক কার্য্যসূচী পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ায় প্রতিনিধি ও দর্শকেরা উপকৃত হইয়াছিলেন।

সম্মেলনের এই অধিবেশনে বহুপূর্ব্বেই যাহা করা উচিত ছিল তাহার সেইরূপ একটি কর্ত্তব্য করিয়া সম্মেলন প্রশংসাভাজন হইয়াছেন—তাঁহারা সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির কাণ্ডারী পরম শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

সম্মেলনে পঠিত অনেক প্রবন্ধ জ্ঞানগর্ভ ও মননশীলতার পরিচায়ক হইয়াছিল।

সম্মেলনের এই অধিবেশনে অনেকগুলি দরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

"বন্দেমাতরম্" সংগীতটি যাহাতে আদ্যোপান্ত গীত হয়, তাহার অনুকূলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অ-বাঙালীরা উহার কোন অংশ বা সমস্তটি গান করুন বা না-করুন, উহার অনুরাগী বাঙালীদের সব সভাসমিতির অধিবেশনে ত উহা আগাগোড়া গীত হইতে পারে; তাহা হয় না কেন? উহা কিন্তু ঠিক সুরে গাওয়া উচিত।

প্রবাসী বাঙালী সমিতি ও সাহিত্যসমিতি সকলকে আগামী বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে সহায়তা ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা হয়।

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ও পরীক্ষা লইবার অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে যথারীতি প্রেরিত হইয়াছিল কিনা এবং প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহার কি উত্তর আসিয়াছিল, জানি না। পাটনার সম্মেলনের প্রস্তাবটি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরসহ বিশ্ব-বিদ্যালয়দ্বয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠান হইবে আশা করি। নতুবা এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা নিরর্থক।

উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়, যে, যত দিন তদনুসারে কাজ না হয় তত দিন যেন ইণ্টারমীডিয়েট ও বি এ পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ একটি করিয়া বাংলা পুস্তক পঠনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই কথাটিও বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে জানান আবশ্যক।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বাংলাও একটি শিক্ষিতব্য বিষয় হউক, এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ফাইন্যাল ও হাইস্কুল পরীক্ষায় বাংলা লইবার ব্যবস্থা হউক, এইরূপ দুটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। প্রস্তাব দুটি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠান হইবে আশা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের প্রধান সব ভাষার কোনটিকেই বাদ দেন নাই, সকলকেই যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে তাহার প্রাপ্য সম্মান ত দেনই না, তাহার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে অর্থে ন্যাশন্যাল অর্থাৎ ভারতে সকল প্রধান

ভাষাকে এবং সকল প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছে অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা দেয় নাই।

একটি প্রস্তাবে বলা হয়, যে, লক্ষ্ণৌয়ের বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সঙ্ঘের নাম স্বর্গীয় অতুল প্রসাদ সেনের নাম অনুসারে "অতুল সমিতি" রাখা হউক।

অন্য কয়েকটি প্রস্তাবে বলা হয়, প্রবাসী বাঙালীদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হউক, এবং আগামী অধিবেশনে ছাত্রদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকদের মধ্যে পরিচয়ের জন্য আলোচনাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আগামী বৎসর গৌহাটীতে অধিবেশন করিবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমরা যখন গৌহাটী গিয়াছিলাম, তখন এই কথা তুলিয়াছিলাম।

—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে জগত্তারিণী পদক প্রদান

সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতার নামে এই স্বর্ণপদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং তদর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যথেষ্ট টাকা দিয়া গিয়াছেন।

"বাংলা ভাষায় সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতাকে" দুই বৎসর অন্তর এই পদক দেওয়া হয়। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এই পদক পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাহিত্যিক গ্রন্থের রচয়িতা, বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিয়া এ-পর্য্যন্ত কেহ এই পদক পান নাই। ১৯৩৭ সালের জন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে এই পদক দেওয়া হইবে। তিনিও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক নহেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালীদের মধ্যে কয়েক জন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকিলেও কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিক নিজের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ এরূপ বাংলা বহি লিখেন নাই যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে পদকপ্রাপ্তি-সম্মানের যোগ্য। প্রমথ বাবু এই পদক পাইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহা দিলে অন্যায় হইত না।

—

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বহি

আগে লিখিয়াছি, এ-পর্য্যন্ত কোন বাংলা বৈজ্ঞানিক বহির জন্য কোন বাঙালী গ্রন্থকারকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেওয়া হয় নাই। দেওয়া হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সাধারণ বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদিগের নিমিত্ত বাংলা বৈজ্ঞানিক বহি লিখিত হয় না—তাঁহারা ওরকম বহি প্রায় পড়েন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বৈজ্ঞানিক বহি লেখা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা বাংলা বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহাদেরই জন্য বাংলা বৈজ্ঞানিক বহি লিখিত হয়। সে রকম বালক-বালিকা-পাঠ্য পুস্তকে মৌলিক-গবেষণা-লব্ধ তত্ত্ব থাকিবার কথা নয়। যদি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহা হইলে উচ্চতর মানের (ষ্টাণ্ডার্ডের) বৈজ্ঞানিক বাংলা বহি লিখিত হইবে এবং তখন মৌলিক গবেষণার বহিও বাংলায় লিখিত হইবে। তাহার জন্য নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক হইবে। সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সংযোগে এই প্রকার শব্দ রচিত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যে বহু পারিভাষিক শব্দ রচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কাজ বৈজ্ঞানিক বহির ও প্রবন্ধের লেখকেরা করিয়াছেন, কোন কোন কোষকার করিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে কয়েক হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অভাব কত বেশী, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনের অভিভাষণের শেষে মুদ্রিত বিজ্ঞান-গ্রন্থপঞ্জী দেখিলে বুঝা যায়। তালিকাটি অবশ্য অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের স্বল্পতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।

—

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানকংগ্রেসের জুবিলী

গত মাসে কলিকাতায় বিজ্ঞানকংগ্রেসের জুবিলীর সঙ্গে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক এসোসিয়েশ্যনের অধিবেশন শুধু কলিকাতার বা বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ব্রিটেন হইতে বহু জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আসিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর অন্য কোন কোন সভ্য দেশ হইতেও বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মহিলা বৈজ্ঞানিকও অল্পসংখ্যক আসিয়াছিলেন।

ইঁহাদের সকলের ভারতবর্ষে আগমনে ও ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক অনেকের সহিত সংস্পর্শের ফলে তাঁহাদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অধিকতর স্পষ্ট ও সত্যসঙ্গত হইবে।

বিদেশিনী মহিলা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতার নানা দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান ও স্থান কয়েক জন বাঙালী মহিলা দেখাইয়াছেন।

বিজ্ঞানকংগ্রেস জুবিলীর সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ পদার্থ-বিদ্যাবিৎ ও পদার্থবিদ্যাবিষয়ক গবেষক লর্ড রাদারফোর্ডের

হইবার কথা ছিল। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সর্ জেমস্ জীনস্ সভাপতি মনোনীত হন। তিনিও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

ভারতীয় বিজ্ঞানকংগ্রেসের এই অধিবেশনের সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রধান সভাপতির, বড়লাটের, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের বক্তৃতা ছাড়া শাখাসভাপতিদের এবং অন্য অনেকের এত বক্তৃতা এই উপলক্ষ্যে হইয়াছে, যে, সবগুলির নামও আমরা প্রবাসীতে উল্লেখ করিতে পারিব না। কতকগুলি বক্তৃতা আদ্যোপান্ত এবং কতকগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে কোন কোন দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানকংগ্রেসের সম্পাদকেরা সমুদয় বক্তৃতা পুস্তকের আকারে বাহির করিবেন এবং তাহাতে পঠিত প্রবন্ধগুলিও থাকিবে। এরূপ পুস্তক পড়িলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে। বিজ্ঞানকংগ্রেসের সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহকগণ যেরূপ সুশৃঙ্খল কার্য্যপটুতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায়, যে, সুসম্পাদিত এইরূপ এক খানি পুস্তক যথাসময়ে বাহির হইবে।

—

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চা

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানকংগ্রেসের জুবিলী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় অনেক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে, যে, এদেশে বিজ্ঞানের আশানুরূপ চর্চ্চা এবং আশানুরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতেছে। কিন্তু এরূপ ধারণা কাহারও হইলে তাহা অমূলক। স্বর্গত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর এবং তাঁহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বারা আধুনিক ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হইবার পর গত ৪০ বৎসরে এদেশের যে-সকল বৈজ্ঞানিক বিদেশেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। যাঁহারা সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করিলেও মোট ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-সংখ্যা কমই থাকে। আমাদের এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষে কত বৈজ্ঞানিক থাকা উচিত অনুমান করিতে হইবে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুমিত হইয়াছিল, যে, সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৯৯,৭০,০০,০০০—প্রায় দুই শত কোটি। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি। তাহা হইলে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমুদয় লোকের এক-ষষ্ঠাংশের অধিক ও এক-পঞ্চমাংশের কম লোক বাস করে।

সুতরাং ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যথেষ্ট হইতেছে বলিতে হইলে দেখাইতে হইবে, যে, জগতের বৈজ্ঞানিকদিগের এক-পঞ্চমাংশের কম এবং এক-ষষ্ঠাংশের বেশী ভারতবর্ষের মানুষ। বলা বাহুল্য, তত বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষে নাই। থাকিবে কেমন করিয়া? এদেশের শিশু হইতে বুড়াবুড়ী পর্য্যন্ত সমুদয় নরনারীর মধ্যে শতকরা দশ জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম। তাহারাও সবাই বিদ্বান্ নহে। তাহাদের অধিকাংশ সামান্য লেখাপড়া মাত্র জানে ও নাম স্বাক্ষর করিতে পারে। সকল লিখনপঠনক্ষমের কথা দূরে থাক্, অধিকাংশ গ্রাজুয়েটও বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না। কেননা, ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানকে এ-পর্য্যন্ত অবশ্য-শিক্ষণীয় করা হয় নাই।

গত চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহা উৎসাহজনক ও আশাপ্রদ। তাহার বেশী কিছু নয়। বিজ্ঞানকংগ্রেসের উদ্যোক্তারা প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সমুদয় বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষা আবশ্যিক করিবার চেষ্টা করিলে বিজ্ঞানশিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চ্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে এদেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে।

—

ভারতীয় মহিলা বৈজ্ঞানিক

বিজ্ঞানকংগ্রেসের অধিবেশনে যে-সকল ভারতীয় মহিলা বৈজ্ঞানিক যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম দৈনিক কাগজে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী মহিলার নাম খুব কম। আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চার আরম্ভ বঙ্গে হইয়াছিল। ভারতীয় পুরুষ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বাঙালী বৈজ্ঞানিকদিগের সংখ্যা, বঙ্গের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে কম নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মহিলা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বাঙালী মহিলা বৈজ্ঞানিক কম। ইহার কারণ কি? একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বঙ্গে কেবল মেয়েদের জন্য সামান্য যে কয়টি কলেজ আছে, তাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে, এবং বঙ্গে সকলের চেয়ে ভাল বিজ্ঞানাগার-বিশিষ্ট কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রীদিগকে ভর্ত্তি করা হয় না। ইহাও হইতে পারে যে বাঙালী মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অধিক ভাবপ্রবণ এবং কাব্য ও ললিতকলা অধিক ভালবাসেন। কারণ যাহাই হউক, বিদ্যার কোন দিকে তাঁহাদিগকে অন্য কোন অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে কম অগ্রসর দেখিতে আমাদের ভাল লাগে না।

—

নদীসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বিষয়ে ডাঃ মেঘনাদ সাহার বক্তৃতা

আমরা যত দূর জানি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যে গ্রন্থখানি

ডক্টর সত্যচরণ লাহার উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল, বিজ্ঞানাচার্য্য মেঘনাদ সাহা তাহাতেই প্রথম নদীসমূহের গতি নিয়ন্ত্রিত করা সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। আমরা সে বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহার পর অধ্যাপক সাহাও নদীনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর, বর্দ্ধমানের এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের একটি চিঠি উপলক্ষ্য করিয়া তিনি পৌষের প্রবাসীতেও এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার এই সকল লেখা দৈনিক কাগজের সম্পাদকেরা দেখিবার অবসর হয়ত পান নাই। যাহা হউক, তিনি নদীনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কলিকাতায় একটি বক্তৃতা সম্প্রতি করায় দৈনিকপত্রসম্পাদকদিগের টনক নড়িয়াছে। যদি কর্তৃপক্ষেরও টনক নড়ে, তাহা হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ কিছু করুন বা না-করুন, উদ্যোগী ও ধনশালী বাঙালীরা—যেমন ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা—সাহা-মহাশয়ের ইঙ্গিত অনুসারে নদীর স্রোতের বেগ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন দ্বারা বঙ্গদেশকে কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যশালী করিবার চেষ্টা করিলেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিছু শান্তিলাভ করিতে পারেন।

—

বিদেশী বিদ্বানদিগকে বিদেশী ভোজ দেওয়া

বিজ্ঞানকংগ্রেস উপলক্ষে যে-সকল বিদ্বান ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কোন কোন ভারতীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভোজ দিয়াছিলেন। এই ভোজগুলি সাধারণতঃ ইউরোপীয় হোটেলে দেওয়া হইয়াছিল, আহার্য্যও ইউরোপীয় ধরণের হইয়াছিল। আমাদের দেশের খুব বিখ্যাত ব্যক্তিরা ইউরোপ আমেরিকায় গেলে কখন কখন তাঁহাদিগকেও সেখানে ভোজ দেওয়া হয়। সেই সব ভোজ ও আহার্য্য ইউরোপীয় ও আমেরিক রীতি অনুযায়ী হয়, ভারতীয় রীতি অনুযায়ী হয় না। আমাদের কি একটিও এমন হোটেল থাকিতে পারে না, যেখানে আমরা বিদেশী অতিথি-অভ্যাগত-দিগকে ভোজ দিলে দেশী আহার্য্যবস্তু দিতে পারি? আমাদের সব আহার্য্যই বিস্বাদ, অখাদ্য, দুষ্পাচ্য বা উদরাময়জনক নহে।

—

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা সংস্কৃত

উপরে উল্লিখিত নানা ভোজের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ ডক্টর টমাসকে কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা যে ভোজ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতে হইতেছে এই জন্য যে, ঐ ভোজসভায় কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ডক্টর টমাস তাহাতে প্রীতি প্রকাশ করিয়া, সংস্কৃত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা, বা সংস্কৃতকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা উচিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাঁহার এরূপ বলার অর্থ বা অভিপ্রায় ইহা ছিল না, যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা পরস্পরের সহিত কথা বলে সংস্কৃত, বা কথা বলুক সংস্কৃতে। তাঁহার কথার অর্থ আমরা এই রূপ বুঝিয়াছি, যে, যেমন প্রাচীন ভারতের সকল অংশে সংস্কৃতের চর্চ্চা হইত এবং সংস্কৃতে লিখিত ধর্ম্মসাহিত্য, কাব্য ও অন্যবিধ সাহিত্য তথায় অধীত হইত, বর্ত্তমানেও তেমনই সমগ্রভারতের উদ্দেশে লিখিত গ্রন্থাদি সংস্কৃতে লিখিত হইয়া সর্ব্বত্র পঠিত হওয়া উচিত। এই ইচ্ছা পূর্ণ না হইতে পারে। কিন্তু ইহা সাধু ইচ্ছা।

—

স্বরূপরাণী নেহরু

পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর সহধর্ম্মিণী বীরজায়া বীরজননী বীরাঙ্গনা শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মহৎ জীবনের স্মৃতি ভারতবর্ষকে চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী ও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে, এবং তাঁহার জীবন হইতে ভারতীয়েরা অনুপ্রাণনা লাভ করিতে থাকিবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ঐশ্বর্য্যে লালিত তিনি কিরূপ দুঃখ বরণ করিয়া এবং দুঃখ ও অপমান সহ্য করিয়া স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র জবাহরলালের আত্মচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

—

চীনকে সাহায্য করিবার চেষ্টা

জাপানের চীন অধিকার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত চীনের লোকেরা অসাধারণ সাহস ও স্বদেশভক্তি সহকারে যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার দ্বারা তাহারা ভারতবর্ষের মত দেশেরও স্বাধীনতাযুদ্ধ করিতেছে বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না। ভারতবর্ষ এখন পরাধীন বটে, কিন্তু এক পরাধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য পরাধীনতা চায় না, স্বাধীনতাই চায়। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সহিত অহিংস সংগ্রামই যথেষ্ট হইবে বলিয়া ভারতীয় নেতারা মনে করেন। কিন্তু জাপান যদি ভারতবর্ষ দখল করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অহিংস সংগ্রাম দ্বারা জাপানের কবল হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি যে ভারতবর্ষের উপরে আছে, তাহা ভারতের ও বিদেশের অনেকেই বলিয়াছেন। অল্প দিন পূর্ব্বেও ব্রিটিশ সেনাপতি জেনার্যাল স্যর্ আয়্যান হ্যামিল্টন সে কথা বলিয়াছেন। জাপান যদি চীন অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থবল ও সৈন্যবল এত বাড়িবে, যে, তখন ইংরেজদের পক্ষে ভারতবর্ষ স্বাধিকারে রাখা দুঃসাধ্য হইবে।

ভারতীয়েরা চীনের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে পারে না। তাহারা চীনকে অর্থ সাহায্য করিতে পারে, এবং ডাক্তার, ঔষধ ও য়্যাম্বুল্যান্স পাঠাইতে পারে। ভারতবর্ষের ধনী ব্যক্তিরা এ-বিষয়ে মনোযোগী হইলে চীনের কিছু সাহায্য হইতে পারে। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ভারতীয় ধনী নির্ধন সকলকে চীনকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন। পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে সমর্থ লোকও ভারতবর্ষে আছেন—যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী দরিদ্র।

চীনে ডাক্তার, ঔষধপত্র ও য়্যাম্বুল্যান্সের কিরূপ প্রয়োজন তাহা আমরা মডার্ণ রিভিয়ুর লেখিকা শ্রীযুক্তা য়্যাগ্নেস্ স্মেডলির চিঠি অনুসারে ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম। পরে কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয়ও সেই মর্ম্মের আবেদন করায় আমাদের লেখা সমর্থিত হইয়াছে।

—

"স্বর্ণময়ী বয়ন বিদ্যালয়"

মৈমনসিংহের স্বর্ণময়ী বয়ন বিদ্যালয় ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয়। ইহাতে মহিলাদিগকে তোয়ালে, ধুতি, শাড়ী, চাদর, মটকা ও পশমী বস্ত্র বুনিতে শিখান হয়, এবং কাপড় ও সুতা রঙান ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাদিগকে বাংলা ইংরেজী ও হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। সাহায্য মৈমনসিংহে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসুকে পাঠাইতে হইবে।

—

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী

কয়েক মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাঁহার কাঁঠালপাড়াস্থিত বাড়ীটি রক্ষিত হইলে বাঙালীর মান রক্ষা পাইবে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা নিজ লেখনী দ্বারা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গে দেশভক্তির অভিব্যক্তির ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

—

কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকী

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকীর কয়েক মাস পরে (১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। তাঁহার বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা, রচনাবলী প্রভৃতির একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবে। তাঁহাকে সচরাচর কেবল ধর্ম্মোপদেষ্টা ও সমাজসংস্কারক মনে করা হয়। তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা ও সমাজসংস্কারক ছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু তিনি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া মহাজাতি গঠনেও সাহায্য করিয়াছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরও তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছিল। ছেলেদের জন্য তিনি "বালকবন্ধু" নামক কাগজ বাহির করেন। তাঁহার এক পয়সা দামের "সুলভসমাচার" বাংলা প্রথম সুলভ খবরের কাগজ। পানদোষ-নিবারণে তিনি এক জন শক্তিশালী নেতা ও কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রভাবে এক সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা, রবীন্দ্রনাথের মতে, ইউরোপীয় তাৎকালিক তরুণ-তরুণীদের চেয়ে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

সংস্কারদিগকে ভাঙার কাজ অল্পাধিক করিতে হয়। কেশবচন্দ্রও ভাঙিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মানুমোদিত নূতন আচার অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুগত সাম্যবাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ভারতাশ্রম তাহার প্রমাণ।

—

ফুকার বিরুদ্ধে আন্দোলন

বীভৎস ও অনিষ্টকর ফুকা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার থিয়সফিক্যাল হলে ইহার বিরুদ্ধে যে সভা হয়, সি এফ্ এণ্ড্রুজ সাহেব তাহার সভাপতি হন। তিনি এবং সভায় অন্যান্য বক্তারা ফুকা প্রথার উচ্ছেদের জন্য কঠোরতর আইন আবশ্যক বলেন। সভা বড়লাটকে, কুমার 'সর্ জগদীশ প্রসাদকে এবং বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলকে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

—

নিখিল ভারতীয় শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

গত মাসে যে-সকল বৃহৎ সভা-সমিতি হইয়াছে, নিখিল ভারতীয় শিক্ষা কন্‌ফারেন্স তাহার মধ্যে অন্যতম। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সি আর রেড্ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই কন্‌ফারেন্সে তাঁহার ও অন্য কয়েক জন বক্তার বক্তৃতা শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কন্‌ফারেন্সকে শিক্ষাবিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ তাঁহার যে মন্তব্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা "বিশ্বভারতী সমাচার" ("Visva-bharati News") পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

—

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ও সেবাসমিতি

আগামী কুম্ভমেলা হরিদ্বারে হইবে। তখন ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী সেখানে সমবেত হইবে।

কর্ত্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও অনেকের পীড়া হইবে, অনেকে আহত হইবে, অনেকের আত্মীয়স্বজন বা শিশু হারাইয়া যাইবে, অনেকে রেলের টিকিট কিনিতে পারিবে না, ও অন্য নানা দুঃখ ও অসুবিধা অনেকের হইবে। এলাহাবাদের সেবাসমিতি যাত্রীদের সকল প্রকার সেবা করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এই সমিতির সভাপতি। কমিটি ২০,০০০ টাকা ও ১২০০ স্বেচ্ছাসেবক চান। যাঁহারা সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা সমিতির এলাহাবাদস্থ প্রধান কার্য্যালয় ১ নং কটরা রোডে সাহায্য পাঠাইবেন।

—

নিখিল ভারত দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলন

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর কলিকাতায় সেণ্ট পলস কলেজে নিখিল ভারত দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বলেন, "নূতন শাসনতন্ত্রে আপত্তিকর অংশ হইল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। রাষ্ট্রতন্ত্রে এরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভেদ সৃষ্টি করা ব্রিটিশ-পার্লিয়ামেণ্টের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। ইহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তিক্ত ভাব আনয়ন করিয়াছে ও হিন্দুদিগকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলিয়াছে। আমরা যেন না ভুলি যে, হিন্দুগণই বাংলা দেশে রাজনৈতিক চেতনা আনয়ন করিয়াছে ও বর্ত্তমান বাংলা গঠন করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাহার করা উচিত, অন্ততঃ উহার এরূপ সংশোধন করা উচিত যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে সঙ্গতভাবে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি হয়। খ্রীষ্টিয়ানগণ অত্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তাহাদের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত। বহু পূর্ব্বে আমরা ঘোষণা করিয়াছি, রাজনীতিক দিক হইতে আমরা আমাদিগকে প্রথমে ভারতীয় সাম্রাজ্যের নাগরিক বলিয়া মনে করি। আমরা সাম্প্রদায়িক যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া দাবী করি না। আমরা বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর বিরোধী, উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। তথাপি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্ট আমাদের উপর উহা চাপাইয়াছেন। উহার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করিয়াছি। আমরা সম্পত্তপদ সংরক্ষণ করিয়া যুক্তনির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। মিঃ জিন্না বিশেষ নির্ব্বাচনের জন্য সংগ্রাম করিয়া ভারতের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছেন। আমাদের আদর্শ স্বরাজ লাভ।"

লেডী মহারাজ সিংহ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া বলেন, "কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী যে মনোভাব লইয়া কার্য্য করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করার অপরাধ করে নাই। সম্প্রদায়ের স্বার্থের উপরে দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে হইবে।"

ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান সমাজের এইরূপ মত প্রকাশ প্রত্যেক প্রকৃত দেশভক্তকে আনন্দিত করিবে।

—

হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

১৯৩৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আহমদাবাদে হিন্দু মহাসভার উনবিংশ অধিবেশন হয়। সভায় ৫ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হন। তন্মধ্যে গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয়ই অধিক। দুই শত মহিলা উহাতে যোগ দেন। সভাপতি বিনায়ক দামোদর রাও সাভারকর বলেন, রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে কাহাকেও যেন জিজ্ঞাসা করা না হয় সে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান কিনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার দোষগুণের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলে এক ভোটের অধিকারী হউক।

হিন্দু মহাসভা অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। ডাঃ মুঞ্জে বলেন, "নূতন শাসনতন্ত্রের অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এবং উহা অসন্তোষজনক হইলেও হিন্দুস্থানকে একটি সম্মিলিত জাতিরূপে সংগঠন করার উদ্দেশ্যে যেটুকু সুবিধা আছে, তাহার সুযোগ হিন্দু জাতির গ্রহণ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে গবর্মেণ্টকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিতে বলা হইয়াছে। সম্প্রদায়ভেদে ভারতকে হিন্দু-ভারত ও মোস্লেম-ভারত এই দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে এ(?)স চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ সর গোকুলচাঁদ নারাঙ্গ বলেন, প্রদেশসমূহ মন্ত্রিত্বগ্রহণে যে শক্তিলাভ করিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণে সেইরূপ শক্তি লাভ হইবে।" মিঃ কারাণ্ডিকর বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে আর কল্পনা নহে, সুতরাং কংগ্রেস ও হিন্দু রাজন্যগণের বুদ্ধিমানের ন্যায় কার্য্য করা উচিত।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা করিয়া ও বাঁটোয়ারা বন্ধ না হইলে উহাকে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। মুসলমান শাসনাধীনে দেশীয় রাজ্যে হিন্দুদের অবস্থা তদন্তের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

—

নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রেঙ্গুন শহরে নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বাঙালীরা সমুদ্রপারে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন। সেই জন্য ভারতবর্ষের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন না। তাঁহাদের একটি আলাদা সাহিত্য সম্মেলন করিবার ইহাই কারণ। ব্রহ্মদেশে বাঙালী আছেনও ত কম নয়। আসাম প্রদেশে ও বিহার প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা বেশী হইবার একটি প্রধান কারণ, ঐ দুই প্রদেশের সহিত ভৌগোলিক বঙ্গের কোন কোন জেলা ও অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভৌগোলিক বঙ্গের অংশগুলিতে বিহারে ও আসামে যত বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে ঐ দুই প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। ঐ দুটি প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলিতে বঙ্গের বাহিরে যত বাঙালী বাস করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বাঙালী ব্রহ্মদেশে বাস করেন, এবং ব্রহ্মদেশের বাঙালীরা মোটের উপর ভারতবর্ষের বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিকৃতিত্ব ও সম্পদে নিম্নস্থানীয় নহেন। অথচ আমরা তাঁহাদের বিষয় কমই ভাবি। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ করিয়া স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছেন, যে, আমরা

তাঁহাদের অস্তিত্ব ভুলিয়াই থাকি। সত্য বটে, বঙ্গের নিজের দুঃখদুর্দ্দশা এত বেশী যে, আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, যে, আমাদের আর কাহারও কথা ভাবিবার অবসর নাই। কিন্তু আমরা বিহারের, আসামের, ছোট-নাগপুরের, আগ্রা-অযোধ্যার, মধ্যপ্রদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালীদের কথা ত এতটা ভুলিয়া থাকি না।

এই যে ভুলিয়া থাকার অপবাদ ইহা কেবল ব্রহ্মের বাঙালীরাই দেন নাই। একটি মুসলমান ব্যারিষ্টার, বাড়ী এলাহাবাদে, রেঙ্গুনে আমাকে বলিতেছিলেন, "ভারতীয় নেতারা আমাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন" ("Our leaders in India have neglected us")। এই ভদ্রলোকটি আইনের ডক্টর উপাধিধারী।

আমরা অনেকে জানি না, যে, ব্রহ্মদেশে ভারতীয়ের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ (৯,৮১,০০০)। ইহার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাও কম নহে। এ-বিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে। এখন সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে কিছু বলি।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মূল সভাপতি ও ভিন্ন ভিন্ন শাখার সভাপতিদিগের নাম পৌষের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। মূল সভাপতির বক্তৃতা লিখিত হয় নাই। অন্য সকলে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তদ্ভিন্ন মূল সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ-সূচক প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। লিখিত অভিভাষণগুলি বঙ্গে এইরূপ সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণসমূহের সহিত তুলনীয়। অনেকগুলি প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এবং পঠিত দুইটি প্রবন্ধে ও কোন কোন বক্তৃতায় ব্রহ্মদেশে বাঙালীদের অনেক সামাজিক, শৈক্ষিক ও আর্থিক সমস্যার উল্লেখ ছিল। সেগুলি তাঁহাদের এবং বঙ্গের বাঙালীদেরও গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া সমাধান করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেগুলির সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মদেশবাসী সমুদয় ভারতীয়কেই কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। জীবিকার সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। এই সমস্যা অন্য ভারতীয়দের চেয়ে বাঙালীদেরই পক্ষে কঠিনতম। কারণ, বাঙালীদের মধ্যে যত বেশী লোক চাকরিজীবী, অন্য ভারতীয়দের মধ্যে তত বেশী নহে। ব্রহ্মদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয়েরা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সরকারী চাকরি পাইতে থাকিবে। বাঙালীদিগকে তখন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, কিংবা বঙ্গে ফিরিবার পথ থাকিলে ফিরিয়া আসিতে হইবে, নতুবা বেকার হইতে হইবে।

ব্রহ্মের বিদ্যালয়সমূহে ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভার্থ ব্রহ্মদেশীয় ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়ায় বাঙালী বালকবালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাংলা না-জানিলে তাহারা বঙ্গের সংস্কৃতির সহিত যোগ রাখিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—ঠিক্ বাঙালী থাকিবে না; আবার বর্মা ভাষা না-শিখিলে তথাকার স্কুল-কলেজে স্থান পাইবে না। বঙ্গে ছেলেমেয়েদিগকে পাঠাইয়া বাংলা শিখাইবার সুযোগ ও সামর্থ্য কম অভিভাবকেরই আছে, ব্রহ্মদেশে কিছু শিক্ষা দিয়া পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বঙ্গে পাঠাইতে হইলেও বাংলা জানা চাই। অবশ্য ইংরেজী ছাড়া আরও দুটা ভাষা শেখা অসাধ্য নহে। জার্মেনীর বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা জার্ম্যান ছাড়া আরও দুটা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য হয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা তাহাদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান্ নয়।

আমি রেঙ্গুন, মাণ্ডালে ও মেমিও এই তিনটি শহর দেখিয়াছি। রেঙ্গুনে অনেক বৎসর হইতে বেঙ্গল একাডেমি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন চারি বৎসর পূর্ব্বে চট্টল-সমিতির গৃহে বাণীমন্দির স্কুল নামক যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে ৭ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাহাতে সব বিষয় পড়ান হয় বাংলায়, তা ছাড়া ইংরেজী ও ব্রহ্মভাষা শেখান হয়। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫০। ইহার নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার এই গৃহে প্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রবাসী-সম্পাদককে লইয়া যে ফোটোগ্রাফ তোলা হয়, তাহা মুদ্রিত হইল। ইহার কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ ও উদ্যোগিতা প্রশংসনীয়।

মাণ্ডালেতে বাঙালী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সম্প্রতি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কালক্রমে ইহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িবে এবং ইহা মধ্য ও পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ইহার কর্ত্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম।

মেমিও ব্রহ্মের গবর্ন্মেণ্টের গ্রীষ্মকালীন শৈলাবাস। এখানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মধ্য-বিদ্যালয় আছে। তাহার নিজের বাড়ী আছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭০এর উপর। ছেলেমেয়েদের খেলা ও দৌড়ঝাঁপ দেখিয়া প্রীত হই।

বেঙ্গল একাডেমি ছাত্রবিভাগ ও ছাত্রীবিভাগে বিভক্ত। উভয়ে মোট ৫০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়। বাড়ী নিজস্ব। বহু বৎসর ধরিয়া সরকারী পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং সরকারী অনেক বৃত্তিও পাইয়াছে। ইহার ছাত্রেরা খেলা ও নানাবিধ ব্যায়ামেও ব্রহ্মদেশের স্কুলসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ছাত্রীদের নানাবিধ ড্রিল দেখিয়া প্রীত হই।

মূল সভাপতি ও "নটীর পূজার" উদ্যোক্তাগণ
উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে): তৃতীয়, শ্রীবীণা চৌধুরী; চতুর্থ, শ্রীজ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়; পঞ্চম, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; ষষ্ঠ, শ্রীশান্তি দেবী।

মূল সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে) শ্রীপৃথ্বীশ সেন, শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (যুক্ত কর্ম্মসচিব) শ্রীসত্য চৌধুরী, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাশ (সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি), শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (মূল সভাপতি, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি,) শ্রীনিমাই দে শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ দত্ত।
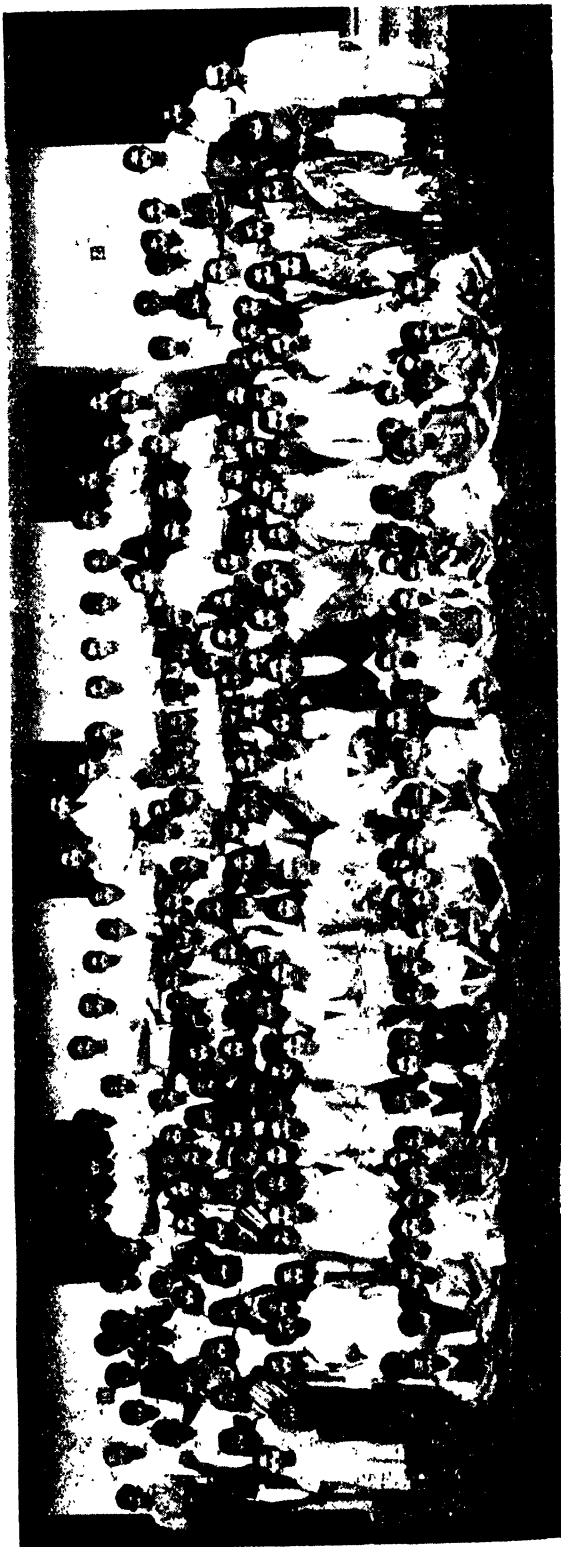
৫৭৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উপরের ছবির নামসূচী

মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতিগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে):

শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নৃপেশচন্দ্র দাশ, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র পালিত, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি, ইতিহাস শাখা) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাশ (অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মূল সভাপতি) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি, দর্শন শাখা), শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার (সভাপতি, বিজ্ঞান শাখা) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভৌমিক (সভাপতি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভাঙ্গালী (কোষাধ্যক্ষ) ও শ্রীশান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (যুক্ত কর্ম্মসচিব)।

দ্বিতীয় লাইন:

শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ শ্রীযুক্ত মট্, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ সেন (সহকারী কর্ম্মসচিব), শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য (যুক্ত কর্ম্মসচিব), শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন কর (সহকারী কর্ম্মসচিব) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি,) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় লাইন:

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সহকারী কর্ম্মসচিব) শ্রীযুক্ত সত্য চৌধুরী (সহকারী কর্ম্মসচিব), শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাস।

ব্রহ্মদেশের সেন্সসের একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার এই যে, ইহাতে চট্টগ্রাম হইতে আগত লোকদিগকে অন্য বাঙালীদিগ হইতে আলাদা করিয়া গণনা করা ও দেখান হয়! যেন তাঁহারা বাঙালী নহেন! সম্মেলনে এবার একটি প্রস্তাব দ্বারা গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যেন চট্টগ্রামীয় বাঙালীদিগকে অন্য বাঙালীদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়া গণনা করা হয়।

রেঙ্গুনে চট্টগ্রামীয় বাঙালীদের সমষ্টিগত উৎসাহের পরিচয় পাইলাম। তথাকার অন্য বাঙালীদের সেরূপ উৎসাহ নাই বলিতেছি না—আমার তাহার পরিচয় পাইবার সুযোগ হয় নাই। চট্টগ্রামীয়দিগের একটি সমিতি আছে, লাইব্রেরি আছে, নিজস্ব গৃহ আছে। তাহা ২৫০০০ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে চট্টগ্রামাগত সকলে ইহার সভ্য হইতে পারেন। জনাব আবদুল বারী চৌধুরী ইহার সভাপতি।

সম্মেলনের সংস্রবে একটি ললিতকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রায় ৮০টি ছবি লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন স্থানীয় বাঙালী ও ব্রহ্মদেশীয়দের ছবিও অনেক ছিল। বেঙ্গল একাডেমির একটি হলে ছবিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কয়েক দিনের মধ্যে দুই তিন দিন বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও দর্শকের সংখ্যা মন্দ হয় নাই।

সম্মেলনের প্রথম সাধারণ অধিবেশন রেঙ্গুনের সিটি হলে সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হয়। এই হলটি সুদৃশ্য ও বৃহৎ। রাত্রে ইহার আলোকের ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। একটিও বৈদ্যুতিক দীপ দেখা যায় না, অথচ ছোট অক্ষরের লেখাও অনায়াসে পড়া যায়। হলে আনুমানিক দুই হাজার লোক অনায়াসে বসিতে পারে। প্রথম অধিবেশনে হল পূর্ণ হইয়াছিল। বিস্তর মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অন্য সকল অধিবেশন বেঙ্গল একাডেমির নীচের হলে হইয়াছিল।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয় হইয়াছিল। "নটীর পূজা"র অভিনয় সিটি হলে হইয়াছিল ও বেশ হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় মনে হইতেছিল যেন বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভিক সেই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম যাহার এক পক্ষ আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান, অন্য পক্ষ পার্থিব সম্পদ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান। "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত দেখি নাই। যত দূর দেখিয়াছিলাম, তাহা মোটের উপর ভাল।

যখন কলিকাতা আসিবার জন্য ষ্টীমারে উঠিয়াছি তখন সম্মেলনের সাধারণ কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকান্ত বসু বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। আমিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাঁহাদের উপর যে কার্য্যের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই তাহা উৎসাহের সহিত করায় সম্মেলন সার্থক হইয়াছে।

সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে কিছু কিছু বলা ছাড়া, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এবং কয়েকটি অভিনন্দনের উত্তরে আমাকে কিছু কিছু বলিতে হইয়াছিল। অবশ্য সমস্তই বাংলায়। তা ছাড়া ইংরেজীতে দুই সন্ধ্যায় কিছু বলিতে হয়। একটি বক্তৃতার বিষয় "ঈশ্বরের সহকর্ম্মী মানুষ", অন্যটির "স্বরাজের যোগ্যতা", স্থান রেঙ্গুন ব্রহ্মমন্দির। এই ব্রহ্মমন্দির স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব সম্পত্তি।

রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম একটি সাতিশয় হিতকর ও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান। ইহার হাসপাতালে ১৫০টি শয্যা আছে। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে রোগী ও রোগিণী রাখা হয়। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ শত শত রোগী ও রোগিণী বাড়ী হইতে আসিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি লাইব্রেরি এবং পাঠাগারও রেঙ্গুনে আছে। লাইব্রেরিতে বাংলা ইংরেজী প্রভৃতি অনেক বহি আছে। পাঠাগারে দেশী ও বিদেশী ১৮৬ খানা খবরের কাগজ ও সংবাদপত্র আসে। রামকৃষ্ণ মিশনের যে অতিথিশালা আছে, তাহার জন্য নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম। তাহাতে লাইব্রেরিটিও থাকিবে। এখন লাইব্রেরিটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আছে।

রেঙ্গুনে বাঙালীদের একটি স্পোর্টিং ক্লাব আছে। তাহাতে টেনিস প্রভৃতি খেলা হয়।

মাণ্ডালেতে আমাকে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী বক্তৃতা করিতে হয়। যে দিন সেখান হইতে সন্ধ্যায় চলিয়া আসি, সেই দিন দুপরের পর একটি ভদ্রলোক (বোধ হয় পঞ্জাবী কিংবা গুজরাটী) আসিয়া বলিলেন, "আমাদের মহিলারা (অবাঙালী মহিলারা) অনেকেই বলিতেছেন তাঁহারা ইংরেজী বাংলা কিছুই বুঝেন না; আপনি হিন্দীতে তাঁহাদিগকে কিছু বলুন।" কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। নতুবা ভাঙা অশুদ্ধ হিন্দীতে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতাম।

মেমিওতেও বাংলায় একটি বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা

ব্রহ্মদেশে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এই দুই বার হইল। তাহার ফলে তথাকার বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা কিছু বাড়িবে। চর্চ্চা অবশ্য আগে হইতেই ছিল। রেঙ্গুনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আছে। কেহ কেহ বাংলা বহি লিখিয়াছেন। রেঙ্গুনে বাংলা পুস্তকাদি ছাপিবার একাধিক প্রেস আছে। ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের এক খানি মাসিক, ন্যূনকল্পে এক খানি ত্রৈমাসিক, পত্রিকা থাকা একান্ত আবশ্যক। এবারকার তত্রত্য সাহিত্য সম্মেলনে তথাকার সাহিত্য-পরিষদকে এইরূপ একটি কাগজ বাহির করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন দুই বারই রেঙ্গুনে হইয়াছে। ইহার অধিবেশন ব্রহ্মের অন্য যে কয়টি শহরে ইহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ যথেষ্ট-সংখ্যক বাঙালী আছেন, পর্য্যায়ক্রমে সেখানেও হইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। আগামী বৎসর মাণ্ডালের নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা তথায় সম্মেলনের অধিবেশনের ভার লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে অধিবেশন হইলে মেমিওর বাঙালীরাও উদ্যোগ আয়োজনে যোগ দিবেন।

ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের সমস্যা

ব্রহ্মদেশে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় এমন কয়েকটি বিল উপস্থাপিত হইবে যাহা আইনে পরিণত হইলে ব্রহ্মের ভারতীয়দের অসুবিধা হইবে। আগন্তুক কাহারা কিরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলে ব্রহ্মের স্থায়ী বাসিন্দা গণ্য হইবে, একটি আইন তদ্বিষয়ক। ঐ দেশের নারী ও ভারতের পুরুষদের কি প্রকার মিলন বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে বিবাহিত বলিয়া গণিত পুরুষনারী কিরূপ উত্তরাধিকার আইনের অধীন হইবে তাহারও ব্যবস্থা হইবে। এই সকল সমস্যার আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ ভারতীয়দের একটি কন্‌ফারেন্স রেঙ্গুনে হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ ও বাঙালী

ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে কিছু লিখিলে, উপরে সেই দেশের বাঙালীদের কোন কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কেন এত কথা লিখিয়াছি (আরও অধিক কথা বাকী রহিল) তাহা বুঝা যাইবে।

নীচের তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে ব্রহ্মদেশে আরও কত মানুষের স্থান ও জীবিকার সংস্থান হইতে পারে।

দেশ	বর্গমাইলে আয়তন।	লোকসংখ্যা।	১ বর্গমাইলে মানুষ।
বঙ্গ	৮২৯৫৫	৫০০৮৭৩৩৮	৬০১
ব্রহ্ম	২৬১৬১০	১৪৬৬৭১৪৬	৫৬

মোটামুটি বলিতে গেলে ব্রহ্মদেশটা বাংলা দেশের তিন গুণের চেয়েও বড় এবং ইহার লোকসংখ্যা বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশেরও কম; প্রায় সিকি। বঙ্গে প্রতি বর্গ-মাইলে ৬০১ জন লোকের বাস, ব্রহ্মদেশে ৫৬ জন মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মদেশবাসীদিগকে একটুও বঞ্চিত না করিয়া এখানে এখনও কয়েক কোটি লোকের স্থান ও জীবিকার উপায় হইতে পারে। ইহাতে নানাবিধ শস্য ফলমূল যত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার অল্প অংশই এ-পর্য্যন্ত উৎপাদিত হইতেছে। ইহার আরণ্যসম্পদ এখনও সম্পূর্ণরূপে মানুষের ব্যবহারে লাগান হয় নাই। খনিজ সম্পদও তাই। বস্তুতঃ, ইহার ভূগর্ভে কত প্রকার খনিজ পদার্থ আছে, এখনও তাহা নিঃশেষে নির্ণীত হয় নাই। বস্তুতঃ, মনুষ্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক অনধিকৃত ইহার প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশী বলিয়াই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন—যাহাতে ইহা প্রধানতঃ ব্রিটিশভোগ্য হয়, ব্রহ্মদেশীয়দের ও ভারতীয়দের ভোগ্য ততটা না হয়। পূর্ব্ব দিকের ভয়ের কারণ হইতে এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মদেশকে একটা সাম্রাজ্যিক ঘাঁটিতে পরিণত করা ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের বিচ্ছেদের আর একটা কারণ।

বলিয়াছি, ব্রহ্মে আরও অনেক মানুষের স্থান হইতে পারে। কিন্তু সরকারী চাকরিজীবীর স্থান হইবে না। উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারেরও বেশী নহে। কিন্তু উদ্যোগী, বুদ্ধিমান, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু মানুষ রোজগারের অন্য অনেক পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অবশ্য, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট, এবং ব্রহ্মদেশীয়েরাও, ব্রহ্মদেশে আর ভারতীয়ের প্রবেশ ও সংখ্যাবৃদ্ধির বিরোধী। কিন্তু স্পষ্ট নিষেধাত্মক আইন হইবে না। কারণ, ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশে প্রবেশ বন্ধ করিলে ইংরেজ কাহাদের বুদ্ধি, শিক্ষা, বা দৈহিক শ্রমের সাহায্যে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক ধন আহরণ করিবে?

অতএব, উদ্যোগী লোকেরা ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে খবর লউন। পুস্তকাদির সাহায্যে লউন, ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে লউন, এবং সর্ব্বোপরি সেখানে গিয়া লউন। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মের বাহিরে আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও ভারতীয়দের প্রবেশ ও

বসবাস অবাধ নহে—তাহারা কোথাও স্বাগত নহে। তথাপি উদ্যোগী ভারতীয়েরা সর্ব্বত্র যাইতেছে। ব্রহ্মে ভারতীয়েরা স্বাগত না হইলেও তাহাদের সেখানে গমনে এখনও বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং সেখানে যাওয়া সহজতর।

বসুন্ধরা যখন বীরভোগ্যা, তখন ব্রহ্মদেশ কেন বীরভোগ্য হইবে না?

ব্রহ্মদেশে এমনভাবে ধন আহরণ ও ব্যয় করা শ্রেয়ঃ যাহাতে ব্রহ্মদেশীয়েরাও উপকৃত হয়।

—

মুক্ত রাজবন্দীদের সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্র-সচিবের উক্তি

মুক্ত-রাজবন্দীদিগের বেকার-সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর সহিত বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার জন্য যে-বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী মহাশয় যাহা বলেন তাহার একটি বিবরণ, বঙ্গের প্রেস-অফিসার কর্ত্তৃক ৫ই জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত বিবরণীতে পাওয়া যায়। মন্ত্রী-মহাশয় প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিতেছেন,

"The difficulty must be faced that their employment cannot be divorced from the general problem of middle-class unemployment, and that there is no economic justification for asking the public to support ex-terrorists as a class, which does not apply with equal or greater force to the law-abiding classes. Nevertheless Government have thought it justifiable and proper to take the step which I have just described to avoid anything in the nature of destitution."

As to the provision of employment the attitude of Government is that they are anxious to see them employed, are sincerely desirous of facilitating their employment, but Government cannot be expected to proclaim that it regards past membership of a terrorist organisation as establishing preferential claims to employment, employment which is so often denied to thousands of young persons who have never had any such connection.........

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর এই সকল উক্তির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। তিনি মুক্ত রাজবন্দীদিগকে "ex-terro ist" বা ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসনবাদী বলিয়াছেন। এ-কথা অনেক বার বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগে ইহাদের দোষ সপ্রমাণ না-হইতেছে ততক্ষণ ইহাদের সকলকে [সন্ত্র]াসবাদী (বর্ত্তমান ব ভূতপূর্ব্ব) বলায় কোন সঙ্গতি [না]ই। এই ক্ষেত্রে আমরা সেই কথারই পুনরুক্তি করিলে [অ]ন্যায় হইবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আইনানুগ বহু যুবক যখন বেকার বসিয়া [আ]ছে তখন ভূতপূর্ব্ব আইনভঙ্গকারীদেরই বিশেষভাবে [কা]জ দিবার জন্য লোককে অনুরোধ করার কোনও অর্থ-[নী]তিসম্মত কারণ নাই, এবং এইরূপ বিশেষ সুবিধা [গ]বর্মেণ্টের নিকট হইতে প্রত্যাশাও করা যায় না।

ইহা একটি কুতর্ক মাত্র। মুক্ত রাজবন্দীগণকে অন্যের [তু]লনায় বিশেষ সুবিধা ("preferential claim") দিবার কথা কেহ বলে নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, যে-সময়ে বন্দীশালার বাহিরে অন্য যুবকগণ নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী কাজকর্ম্ম সংগ্রহ করিতে বা ব্যবসা আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়টা অধুনামুক্ত রাজবন্দীগণ বিনাবিচারে অবরুদ্ধ থাকায়, সেই চেষ্টা করিবার, এবং নিজ বিদ্যাবুদ্ধি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বন্দীদশায় অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, আরও নানা অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে, কাজ সংগ্রহ করিতে বা ব্যবসায় আরম্ভ করিতে সাহায্যক্ষম উপার্জ্জক অভিভাবকের মৃত্যু ঘটিয়াছে ইত্যাদি। এই জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী হওয়া সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলে দোষ দেওয়া যায় না।

স্বরাষ্ট্রসচিব মহাশয় এই বক্তৃতায় অন্যত্র বলিয়াছেন,

"You will perhaps urge that these young men should be encouraged to start afresh with a clean slate, that what is wanted to get them away from the atmosphere of being detenus. The longer they continue to be treated and are led to expect to be treated persons out of the ordinary, the more difficult is it for them to regain normality, to be re-absorbed into ordinary life. . . . . ."

সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে ইহাদের গৃহীত হওয়ার পক্ষে ও দেশে তদনুকূল মনোভাবের সৃষ্টির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা হইতেছে গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে বার-বার ইহাদিগকে "terrorist", "ex-terrorist" প্রভৃতি আখ্যাদান।

—

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতা

যে সকল মুসলমান ছাত্র স্বতন্ত্র মুসলমান ছাত্র-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আস্থাশীল নহেন তাঁহারা অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের অবাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতা মুসলমান ছাত্রসমাজ কর্ত্তৃক আলোচিত ও অনুসৃত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। মিঃ জিন্না প্রভৃতি যাহারা মুসলমান সমাজকে প্রথমে সংঘবদ্ধ হইয়া ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে নির্দ্দেশ দেন, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, স্বতন্ত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান স্থাপন দ্বারা মুসলমান সমাজের শক্তিশালী হইবার আশা ভুল। জাতীয় সংগ্রামে যোগ না দিলে ও তজ্জন্য দুঃখস্বীকার না করিলে মুসলমানদের বলশালী হইবার আশা নাই। চুক্তিদ্বারা যাহারা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করিতে আশা করেন তাহারা ভ্রান্ত—ব্রিটিশেরা ঐ সকল চুক্তি পালন করাইবার জন্য চিরকাল ভারত অধিকার করিয়া থাকিবে ইহারা এই কল্পনার বশীভূত। তিনি মুসলমান যুবকদিগকে সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতির দিকে মনোযোগী হইতে উপদেশ দেন।

—

দেশ-বিদেশের কথা

জাপান কর্ত্তৃক চীনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিনাশ

চীনের নিরস্ত্র অসামরিক জনসাধারণের উপর জাপানের বোমানিক্ষেপের বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রের মারফৎ পাঠকেরা অবগত আছেন। চীনের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাপানের বোমায় ধ্বংস হইয়াছে। তাহার কিছু বিবরণ নীচে সংকলিত হইল।

টিনশিনের নানকাই বিশ্ববিদ্যালয় চীনের একটি প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০০, অধ্যাপক ও গবেষকের সংখ্যা ছিল ৩৫০—চীনের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ গবেষণা চলিতেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের ক্ষতির পরিমাণ

নানকিঙের একটি গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ

শাংহাই নর্থ-ষ্টেশন

নানকিং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীভবনের দুর্দ্দশা

নানকিং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচূর্ণিত রসায়ন-ভবন

৫,০০০,০০০ ডলার। টিনশিনের অঞ্চলের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সম্মিলিত পরিমাণ ৭৫৫৫,০০০ ডলার।

ক্রমাগত তিন দিন ধরিয়া পর পর চারি বার জাপানীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফেলে। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরে জাপানী ও কোরীয়রা ইহাকে লুট করে ও কেরোসিন ধরাইয়া ও ডিনামাইট যোগে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়।

নানকিঙের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনঃ পুনঃ বোমা ফেলিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই ক্ষতির পরিমাণ ১,০০০,০০০ ডলার। কিয়াংসি প্রদেশের প্রধান শহর নানচাঙে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৮৯,৬০০ ডলার।

ক্যান্টনের চুংশান বিশ্ববিদ্যালয় চীনের সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতায় দ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত। জাপানের বোমাবর্ষণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ ৫০০,০০০ ডলার।

জাপান বলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয় নাই। কিন্তু এই কথার কোন মূল্য নাই। প্রথমতঃ, অনিচ্ছাকৃত হইলে বার বার একই স্থানে বোমা ফেলা হইত না, যেমন নানকাই ও নানকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিকাংশই সামরিক পরিধির বহির্ভূত। নানকিং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক আড্ডার অনেক দূরে স্থাপিত; ক্যান্টনের চুংশান বিশ্ববিদ্যালয় শহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কোনও সমর-ঘাঁটি নাই এবং ভুল করিয়া বোমা ফেলিবারও কোন হেতু দেখা যায় না। তা ছাড়া, এই বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার চারি দিকে আর কোন বাড়ী নাই—সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক না ফেলিলে ভ্রমক্রমে এখানে বোমা পড়ার কোন কারণ কল্পনা করা যায় না।

আসলে জাপান ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছে, কারণ এ-কথা তাহার জানা আছে যে এই সকল প্রতিষ্ঠানই চীনের যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরণের মূল, সুতরাং চীনকে "নিরাপদ" করিতে হইলে এই সকল মূল নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

—"চায়না উইক্‌লি রিভিউ" ও "চায়না কোয়ার্টার্লি"

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশের সর্ব্বত্র উৎসবের অনুষ্ঠান ও আয়োজন চলিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা ও গ্রন্থাবলীর একটি সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগামী ২১শে জানুয়ারি হইতে ২৮শে জানুয়ারি মেদিনীপুরের কাঁথিতে শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্ যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি এই উৎসবে যোগ দিবেন।

সিংহলে বাঙালী শিল্পী

সিংহলে হোরানায় শান্তিনিকেতনের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রতিষ্ঠিত "শ্রীপল্লী" নামে একটি বিদ্যালয় আছে। শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত কিরণশশী দে ঐ বিদ্যালয়ে শিল্প ও সঙ্গীতের শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দিল্লী লেডী আরুইন কলেজে ও শিমলা ইউনিয়ন একাডেমিতে শিল্প-শিক্ষক ছিলেন। শ্রীকিরণশশী দে ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের প্রচেষ্টায় সিংহলে বাংলা গানের বিশেষ প্রচলন হইতেছে।

শ্রীকিরণশশী দে

যুদ্ধদেবতা চীনের নিঃসহায় অসামরিক জনতায় নূতন শিকার পাইয়া উল্লসিত

ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাস রচনার মূলসূত্র

গত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ কাশী ভারতমাতা মন্দিরে ভারতীয় ইতিহাস-গবেষকদের একটি সম্মিলন হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জাতীয় পরিষৎ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। এই প্রস্তাবিত পরিষদের লক্ষ্য, ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা, ঐ সম্বন্ধে গবেষণা ও তাহার ফলাফল প্রকাশ। সম্মিলনের সভাপতি সর্ যদুনাথ সরকার মহাশয় ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল :

"ভারতের অতীত এবং জাতীয় জীবনের গঠনসম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে জানিবার প্রচেষ্টা একটা মহৎ আকাঙ্ক্ষা। ইহার দ্বারাই আমরা কি ছিলাম এবং আজ কি হইয়াছি, তাহা জানা যায়। অতীতের ইতিহাস যথার্থভাবে পাঠ করিলে ও ব্যবহার করিলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা জাতি নিশ্চিতভাবে ঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে। ইতিহাস মৃত রাজনীতি নহে, উহা বাস্তব শিক্ষা।
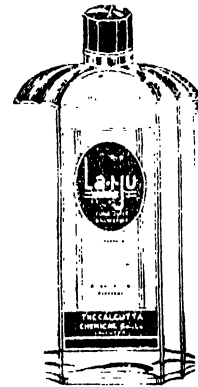
জাতির অতীতের ইতিহাস পুনরায় তৈয়ারী করিতে সেই জাতির লোকদের পক্ষে যে সুবিধা আছে, একজন বিদেশী প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তাঁহার পক্ষে সেই সুবিধা নাই। ভারতের অতীত ইতিহাসের জীবন্ত প্রতীক আমরা। সেই অতীতই আমাদের রক্তমাংস, আমাদের চিন্তা ও ধর্ম্ম এবং উহা কল্পনামাত্র নহে। জাতীয় ইতিহাসে সত্য ঘটনা এবং যুক্তির ভিত্তিতেই জাতিকে বিশ্লেষণ করা উচিত। আমাদের দেশের অতীতের কোন ঘটনাকে গোপন এবং জাতীয় চরিত্রকে চূণকাম করিয়া ইতিহাস রচনা করা নিন্দনীয়। উহা স্বীকার করিয়া জাতীয় মহত্বের দিকও যে আছে, তাহা দেখানই সঙ্গত। জাতির সমস্ত দিক উল্লেখ করাই ঠিক।

বৈদেশিক ইতিহাসপ্রণেতৃগণ কর্ত্তৃক আমাদের জাতির মহত্তর গুণগুলি গোপন করিয়া জগতের নিকট আমাদের দেশের রক্তবিপ্লব ও এক জাতির বিরুদ্ধে আর এক জাতির সংগ্রামের কথাই জাঁকালো ভাবে প্রচার করা হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহাসিকগণকে জাতির ক্রমোন্নতির সকল দিক উল্লেখ করিতে হইবে। আমরা যে-ইতিহাস লিখিব, উহাতে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন এবং সামরিক সাফল্যকে যে প্রকার প্রাধান্য দিব, জাতির সামাজিক জীবন ও আর্থিক পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মসম্পর্কিত আন্দোলন, চিন্তার উৎকর্ষ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকেও তদ্রূপই প্রাধান্য দিব। সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়াই আমাদিগকে উহা রচনা করিতে হইবে। এই সকল বিশ্লেষণ করিবার সময় ঐতিহাসিক নিজেই বিচার করিয়া নিন্দা বা প্রশংসা করিবেন।

ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে সমুদয় ঘটনা নির্ভুল ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, এক অংশের সহিত অন্য অংশের সংযোগ রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি লেখককে নিরপেক্ষ ভাবে এই কার্য্য করিতে হইবে।

জগতের জ্ঞানীজনের সমাদর লাভের জন্য আমাদের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈয়ারী করিতে হইবে। বিজ্ঞান সত্য ব্যতীত দেশ বা জাতিকে বুঝে না। জাতীয় ইতিহাসে অসংযত আবেগকে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে। আদর্শ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের শুধু ভারতসম্পর্কেই জ্ঞান থাকিলে চলিবে না, অন্যান্য দেশ ও জাতি সম্পর্কেও জ্ঞান রাখিতে হইবে,—তাঁহাকে উদারচেতা পণ্ডিত

হইতে হইবে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞান মারাত্মক। গ্রীস, রোম এবং প্রাচ্যের অতীতের ইতিহাস পাঠ করিলে হিন্দু-ভারত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার মধ্যযুগের পারস্য (ইরাণ), মধ্য এশিয়া এবং পরবর্ত্তী কালের রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠেই ভারতের মুসলিম রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়। দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ লইয়াই ভারতের জাতীয় ইতিহাস লিখিত হইবে।

জাতীয় বৈষম্য কৃত্রিম; উহার পিছনে সমস্ত মানবের মধ্যে যে সত্য নিহিত তাহাই রহিয়াছে। বিজ্ঞান ক্রমবিকাশ অথবা সুশৃঙ্খল পরিণতি শিক্ষা দেয়, উহা কুসংস্কার বিশ্বাস করে না। এই জন্য ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এক দিন সত্যযুগে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নাই,—উহা যে ক্রমে ক্রমেই সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমরা জগতের অন্যান্য জাতি হইতে আলাদা নহি।

প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতদের দ্বারাই ভারতের ইতিহাস তৈয়ারী হইতে পারে। যাঁহারা ভারতের ইতিহাস লিখিবেন, দেশের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রগাঢ় জ্ঞান থাকিবে, বহুভাষায় তাঁহারা পণ্ডিত হইবেন। তাঁহাদিগকে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে, অক্লান্ত পরিশ্রমী ও প্রকাশের ভঙ্গীতে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। ইচ্ছা করিলেই প্রতিভার সৃষ্টি হয় না, উহাতে সময়ের দরকার হয়। যদিও আমরা প্রতিভা তৈয়ারী করিতে পারি না, কিন্তু তাহার কাজকে আমরা সুগম করিয়া রাখিতে পারি। ঠিকভাবে গুছাইয়া রাখিলেই কাজ করা সহজ হয়। বিভিন্ন যুগের তথ্য সংগ্রহের জন্যই এখন কাজ করিতে হইবে। এই সকল কাজ হইলে পর আমাদের ঐতিহাসিক প্রতিভা আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত "ভারতমাতা ইতিহাস মন্দির" প্রস্তুত করিতে পারিবে।"

রেঙ্গুনে ভারতীয় ছাত্র-পরিষৎ

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক যোগরক্ষার উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি কলেজ ভারতীয় ছাত্র-পরিষৎ ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদের কার্য্যক্রম মাত্র ভারতীয় ছাত্রদের উন্নতি-প্রচেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ নয়। যাহাতে ব্রহ্ম-দেশবাসী অন্যান্য ছাত্রদের সহিত ভারতীয় ছাত্রদের সখ্য ও সৌহার্দ্যযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই পরিষদ বর্ত্তমানে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এই পরিষদের অধীনে একটি দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রশংসনীয় অন্যান্য ছাত্রকল্যাণকর কাজ চলিতেছে।

রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি কলেজের ভারতীয় ছাত্রসমিতি

শ্রীবিনয় রায়, সভাপতি

শ্রীবাণী ঘোষ, সহ-সভাপতি

শ্রীএস. কে. মজুমদার, সহ-সভাপতি

শ্রীশিবলাল, সম্পাদক

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
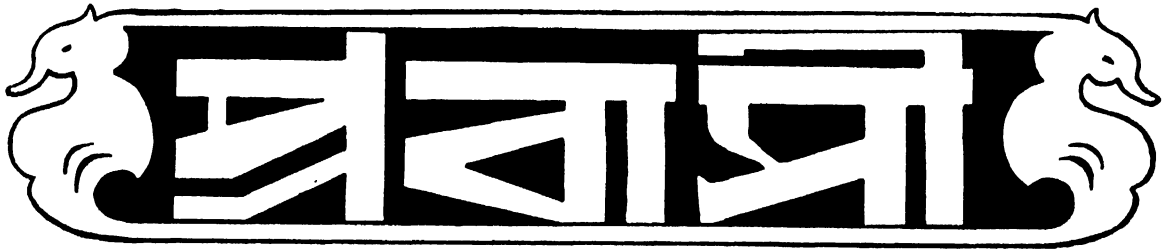
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

৩৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৪

৫ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে যত চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ১৩৩৩ সালে প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আরও কতকগুলি বসু-মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যেগুলিতে তারিখ নাই সেই-গুলি প্রথমে ক্রমে ক্রমে ছাপিব। এবার দুইটি ছাপিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

১

বন্ধু

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি—প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই—শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে:— পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight এর রচনা-নৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

বন্ধু

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জন-পুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না—তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে—বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা শুদ্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত—তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্ন মুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না—তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রম বৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছু দিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনি লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচুনীচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবদ্ধ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় বনঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতিশূন্য, কেবল মাইল-দুই দূরে একটা ছোট সাঁওতাল বস্তি আছে বলিয়া শুনিয়াছি, কখনও সেদিকে যাই নাই, সুতরাং দেখি নাই।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুঝিয়া শুইয়া ছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র? কেমন আছ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে কথার উত্তর দিল। বলিল—বাবু, একটা বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি ক'রে? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীন বাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীন বাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিন দিন এই রকম গেল। রোজই উনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে? মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে। গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড়-একটা গা করি নে। আজ চার দিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শীগগির এস বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি আলো নিয়ে ছুটে যেতে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তার পরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীন বাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে ত বার হয়ে গেল!

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি? মেয়ে-মানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে সুরু করেছ বুঝি? রিপোর্ট ক'রে দেব সদরে।

পরদিন রাত্রে আবার তাই ঘটল। আমি সজাগ হয়েছিলাম অনেক রাত পর্য্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীন বাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়েছি, এমন সময়

দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনি হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর? বিশেষ ক'রে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধিসন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হ'ল, মাটিতে আলো ধ'রে দেখি কোথাও পায়ের দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীন বাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে, হুজুর। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে, একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় ক'রে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন—ওই বটতলায় এসে দেখেন এক দল অল্প-বয়সী সুন্দরী মেয়ে হাতধরাধরি ক'রে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের, 'ডামাবাণু'—এক ধরণের জীনপরী, নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীন বাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে আর খাটের নীচে কি একটা ঢুকেছে। মাথা নীচু ক'রে খাটের নীচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হ'ল একটি মেয়ে যেন গুটিসুটি মেরে খাটের তলায় ব'সে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল যেখানটাতে ব'সে হিসেব করছিলাম সেখানে—হাত ছ-সাত দূরে। আরও ভাল ক'রে দেখব ব'লে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকুর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর? কি রকম কুকুর? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার স্বরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ? না কালো? বললাম—না সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হ'লেই বা আমীন বাবুর কি সুবিধে তাতে হবে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হ'ল কিছুতেই চোখের পাতা বুজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নীচেটা একবার কি মনে ক'রে ভাল ক'রে খুঁজতে গিয়ে দেখি সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষতঃ সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হ'ল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব ত এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোক্‌রা মানুষ, সে যে নেশাভাং করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের। নিকটতম লোকালয় হইতেছে

লবটুলিয়া—চার মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে? বিশেষ যখন এই সব নির্জ্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না।

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—উনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেই লাগিল, ক্রমশঃ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চীৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এই ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। এক জন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়; অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ী বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে, অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরুমহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল, খুব খুশী, বলিল—খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবাণী না হ'লে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়ত বলিতাম না। কারণ ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল ইজারা লইতে ঘেঁষে না রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় এক দিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্য্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন আজ প্রায়ই লক্ষ্য করছি, লজ্জা করে বলতে হুজুর —প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুবরি, হাত আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া। ও আর আমি দু-জনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম, তখন ওকে জিগ্যেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি ত কিছুই জানি নে? আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন এক দিন দিলাম আচ্ছা ক'রে ওকে মার। আমার চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন ক'রে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপার মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকী থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও অত কম হয় নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়েসও কম, কোনো দিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ী, কোনো দিন বা লাল, কোনো

দিন কালো। এক দিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলাম না। ফিরে এসে দেখি ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় ক'রে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হ'লে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোন দিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখ নি?

—না, হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোনো কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশী হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনর পরে এক দিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না?

—কেন বল ত?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে। বাবা ওই রকম করেন ব'লে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুনই হোক বা যার দরুনই হোক্। তাই আজ ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-এক দিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে শব্দ করতেই পালিয়ে যায়—কোনও দিন জেগে উঠলেই পালায়। সে কেমন বুঝতে পারে যে এইবার আমি জেগেছি। এ-রকম ত ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না, কেউ জানে না—আপনাকেই চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখি নি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানালার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয় তার পরেই, আমার সামনের জানালা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানালার পাশ দিয়ে ঘরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথায় কিছু না। বাবাকেও জানাই নি, বুড়ো মানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছি নে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম ও কিছু নয় চোখের ভুল, বলিলাম, যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহসহীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না. ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুই জন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের ঘরে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিষটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনি রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে-ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁতকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না-দেখিয়া তখনি লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্ব্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয় সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোনো কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ

মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কারণ নরম বালি মাটির ওপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনো পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনো রূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই হয় নাই, পুলিস আসিয়া কিছু করিতে না-পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতে ও-অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক ত এমন হইল যে কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে শাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জ্জন জ্যোৎস্না-রাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকারপ্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

মাঝে মাঝে রাজু পাঁড়ের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগিত। রাজুর মত মানুষ এ-সব অঞ্চলে বড় বেশী দেখা যায় না। প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরিব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি ষ্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কি না?

এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এত দূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, এক রকম বিনা-মূল্যেই। বলিয়া দিলাম জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু-বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ এক দিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরে লোকটা এক বারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ কর নি?

দেখিলাম ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা-আমতা করিয়া বলিল—হাঁ, হুজুর—চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ

আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি ত দেখা যায় নি। দিব্যি ষ্টেটকে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে ত ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠে নি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন মকাই কর নি?

—না হুজুর, বড্ড গজাড় জঙ্গল। একা মানুষ, ফরসা ক'রে উঠতে পারি নি। পনর কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া ক'রে, পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পেছনে পেছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূর গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরি ছোট নীচু দু-খানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আলসে কুঁড়ে লোক তা ত জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে!

—কেন, কি কর সারাদিন?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিষপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কাল পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম রাজু ভক্ত-মানুষ। ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর এক পাশে দু-এক খানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজা-আচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে. সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্ব্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। এক দিন দেখি একটা ছোট খাতায় খাঁকের কলমে বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? রাজু পাঁড়ে কবিতাও লেখে না কি? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব, চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোনো কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজী, তোমার বাড়ীতে কে আছে?

—সবাই আছে হুজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের দু-মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব ব'লেই ত হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি ক'রে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু দু-বিঘে জমির ফসলে অতবড় একটা সংসার চলবে? আর তাই বা তুমি উঠে পড়ে চেষ্টা করছ কই?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তার পর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বনজঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে।

টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন যাতে বিষয়সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে বাড়ীতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালই লাগে! সেই গভীর নির্জ্জন লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোন ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির ওপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। খুপরিতে পড়িয়া ঘুম দিতে দেখি নাই যদিও পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বয়সের বৃদ্ধকে রোদের সময় ঘুমাইতে দেখিলেও বিশেষ কিছু দোষ দিতে পারিতাম না। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরীতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোন দিন হাতে খাতা থাকে, কোন দিন থাকে না।

কিন্তু ওর দুঃখ ইহাতে দূর কি করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলাম না। রাজু যে ফসল পায়, ওর নিজের খাইতেই কুলায় না। পরিজনবর্গ যে কি খাইবে এ যেন আমারই ব্যক্তিগত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। এক দিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশী ক'রে চাষ কর, তোমার বাড়ীর লোক না-খেয়ে মরবে যে! রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তার পর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত। তার পরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল। কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়ীতে বসে দিব্যি ফুর্ত্তি করছ লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে কুশী নদীর জলে সর্ব্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। এক দিন শুনিলাম রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছু দিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর! আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জ্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া

উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্ত্তি কুটীরে কুটীরে! সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো বাতাস ঢোকে না কোনো ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না-ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারা রাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটায় শুইয়া, বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটী, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বৌ। কেউ নেই সংসারে মেয়েটার, বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নইলে মেয়েটা পথে বসবে।

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে হাত-তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত! ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে! কি সর্ব্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকা-বিহীন খোরায় ভাত!

একটা ছবি বড় স্পষ্ট হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত বালিকা পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্ত ভাত দুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিয়াছে। বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ! বালিকার করুণ সরল, অশ্রুভরা চোখ দুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ-ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ-ঘরে খাবার রাখে?

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল। ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজীদের বাড়ী থেকে কাল রাতে ঐ ভাত দুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এ-দেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। গরিব লোকেরা ভাত কালেভদ্রে খাইতে পায়। বুঝিলাম কত সাধের ভাত দুটি, কিন্তু একটু কড়া স্বরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচান গেল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়ীতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ী। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়ীতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে, এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ঔষধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশঃ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ওঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ঘুমুচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোকে স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর, সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়ীতে আর লোক নাই। রোগগ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ীর ঘর-জামাই, স্ত্রী আর-বছর মারা গিয়াছে। তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া সে কোথাও যায় নাই। সম্প্রতি তাহার অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করতে লাগিল। আমি ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ী থাকিলে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জ্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হ'ল, রাজু?

রাজু গুণিয়া গাঁথিয়া বলিল—এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশী হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, অতি গরিব দেশ। এক টাকা তিন আনা উপার্জ্জন এখানে কম নহে। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়া রাজুকে আজ পনর-যোল দিন ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই খাটিতে হইয়াছে। যত ঔষধের দাম পাইয়াছে, তাহার তিন গুণ ঔষধ বিলি করিতে হইয়াছে বিনামূল্যে ও ধারে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার এক জন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই, ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারি ধার ঘিরিয়া বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কখন কাহার পালা আসে।

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম ওবেলার সেই সদ্যোবিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামীগৃহের পাশের এক বাড়ীর গোহালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের এক পাশে কয়েক আটি গমের বিচালির উপর পুরনো চট্ পাতা, তাতেই বালিকা শুইয়া ছট্‌ফট করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হতভাগিনীকে বাঁচাইবার। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্য্যন্ত আসিল না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে গ্রামে, যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোকে ঘেঁষে না।

রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব, নিজে ডাক্তার নই, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কি না সন্দেহ, আমাদের অনেক তদ্বির ও অনুরোধে জন-দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল—ও বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থায়, তাতে ছেলেমানুষ, কি খেত, কে ওকে দেখত?

বলিলাম—তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর, বড় হতভাগা দেশ, রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

(৯)

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, কিন্তু সময় হইয়া

উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বনমোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় ভাল্লুক ঝোড়ে ভর্ত্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া বিশেষতঃ ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে ত এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন বনানী, এর নির্জ্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমারেখা। কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, সন্ধ্যায়, বৈকালে, জ্যোৎস্নারাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

এক দিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন-মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বনঝোপের মধ্য দিয়া শুঁড়ি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্ব্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্ব্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জ্জুন ও পিয়াল; নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এত দিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্য্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভালুকের নাকি লেখাজোখা নাই—এ পর্য্যন্ত ত একটা ভালুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে সব বন্যপাদপ, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছু দূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম,—উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বাম দিকে গিয়া পড়িয়াছে, পার্ব্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ব্যবধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত, হঠাৎ দু-কদম যাইতে-না-যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্ম্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারি ধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের ঘন নীল আকাশ। কত কাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্য্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এই বন তখনও এই রকমই ছিল, বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিটিতে এই গিরিচূড়া

গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত, তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কত কাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীকরাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে-রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্ত্তন করেন; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপের ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরি একটা ঢেঁকির মত কি আছে, আর এক বুড়ীকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে, শণের নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল—ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়ীটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীনা বৃদ্ধা—ওরই পূর্ব্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়, উহারা আজও সাতনলি ও আটাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ীর দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জ্জন দিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। বড় কৌতূহল হয়, মনে হয় উহাদিগের মনের ধারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার জন্য।

বুঝি না কেন এক এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কি বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায়, তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই এক স্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন? বর্ব্বর আর্য্য জাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্ত্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারী কানেড়া ও ফিফ্‌থ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল,—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ী, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?

অতীত কোনো দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্

এই বালুপ্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না, যে ধরণের গাছপালা, জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোনো মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে। মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালিবনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা-একাদশীর অন্ধকার রাত্রি,

বনমধ্যে কোথায় এক দল শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে এক দিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। এক জোড়া ছিল, আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন ময়ূর দেখিবার অবকাশ ছিল না, তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই, লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না, কি জানি, মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এরকমে সত্য হইয়া যায়?

ক্রমশঃ

সংস্কৃতির যোগসাধনা

[শান্তিনিকেতনে হিন্দী-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে স্বাগতবাণী]

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আজ মহোৎসব-তিথি, বহু মান্যগণ্য সজ্জন আজ এখানে অভ্যাগত, তাঁহাদের অমূল্য সব কথার জন্যই সময় দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের বক্তব্যের জন্য সময় অল্প থাকাই উচিত। অনেক কিছুই আজ মনে আসিতেছে, সংক্ষেপে তার মধ্যে দুই-একটি কথা মাত্র বলিব।

মানুষের জ্ঞান ও শক্তি তাহার প্রেম ও সাধনাকে অতিক্রম করিয়া আজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তাই সারা পৃথিবীতে আজ আর দুঃখের অন্ত নাই। সমগ্র মানবসভ্যতা আজ সঙ্কটাপন্ন।

ভরসার কথা এই যে দেশে দেশে এক-আধ জন মহাপুরুষ "চলতি" জাতীয়তার উপরে উঠিয়া সকল মানবকে বিশ্বজনীন সত্যের মধ্যে মহাযোগের ডাক দিয়াছেন। জাতীয়তার তরফ হইতে তাই তাঁহারা আজ বহু লাঞ্ছিত। কিন্তু কোনো দুঃখকষ্ট-অপমানই তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র নিরস্ত করিতে পারে নাই, পারিবেও না, কারণ তাঁহাদের কণ্ঠেই আজ বিশ্ববিধাতার বাণী ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সেই ডাকের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ এই বিশ্বভারতী। এখানে আর কিছু সম্পন্ন করা যদি না-ও সম্ভব হয় তবু এখানে পরস্পরের পরিচয়ের ও মিলনের যে একটি মহাক্ষেত্র রচিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কি মূল্য কম? যদি এখানে পরস্পরের পরিচয় ও মিলন অব্যাহত হইতে পারে তবে এই ক্ষেত্র ধন্য হইবে, রবীন্দ্রনাথের সকল দুঃখ কষ্ট ও শ্রম সার্থক হইবে।

রাজনীতির দৃষ্টিতে এক দিন এই মিলনের ডাক মনে হইত নিরর্থক। কিন্তু এখন সবাই বুঝিয়াছেন যে-ভীষণ দিন আসিতেছে তাহাতে কোনো বর্জন-ধর্মী (exclusive) রাজনীতি মানুষকে রক্ষা করিতে আর সমর্থ নহে।

পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া না-জানাটা যে কত বড় সর্বনাশা কথা তাহার সাক্ষী মহাভারত। কুরুক্ষেত্রের প্রলয়যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নির্মূল হইল, ভারতের সকল শক্তি রসাতলে গেল, এদেশের সর্বনাশের পথ চিরকালের জন্য খুলিয়া গেল। কিন্তু এই সবের মূলে একমাত্র হেতু, পরিচয়ের অভাব।

কর্ণ অর্জুন দুই সহোদর ভাই। দুইই মহারথী বীর। পরস্পরকে ভাই বলিয়া না জানিতেই লাগিল সঙ্ঘর্ষ। সেই সঙ্ঘর্ষেই মহাভারতের প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

এই দুর্গতির পুনরভিনয় না হয় তাই বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের বাণী সারা ভারতকে সারা জগতকে ডাক দিয়াছে—"সকলে এই সাধনার বেদীমূলে সমবেত হও, পরস্পর পরস্পরকে জান, ভাইয়ে ভাইয়ে সকল বৃথা দ্বন্দ্বের ও দুর্গতির অবসান হউক।"

তাঁহার এই মহামন্ত্র কি নিরাধার হইয়া আকাশে নিরালম্ব ভাবে ভাসিতেই থাকিবে? যদি আজও এই সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন্ত হইয়া না ওঠে, তবে কিসের আজ নব যুগ

কাজেই যাঁহারা এই মিলনের যজ্ঞবেদীর পাশে একটি একটি সাধনাকে ও সংস্কৃতিকে অগ্রসর করিয়া আনিতেছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য একটি মহাতীর্থ রচনা করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের নমস্য, তাঁহাদের নমস্কার করি।

এখানে বৈদিক, আবেস্তিক, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধনা সমবেত হইয়াছে, ইসলামের সাধনাও এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তিব্বত চীন ও বৃহত্তর ভারতের সাধনা এখানে যুক্ত হইয়াছে, শুধু কি ভারতের সকল প্রদেশের সংস্কৃতি এখানে সমবেত হইবে না? এই উপলক্ষ্যে প্রাদেশিকতার সর্ববিধ বেড়া কি বিলীন হইয়া আসিবে না? বড় দুঃখে সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর বলিয়াছিলেন, "বেড়াহী ক্ষেত খায়।" অর্থাৎ "বেড়াই খাইল ক্ষেত।"

এই দারুণ বেড়া যাঁহাদের সহায়তায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে তাঁহারা নমস্য, তাঁহাদের নমস্কার করি।

সমগ্র ভারতের পক্ষে এইরূপ একটি মিলনক্ষেত্রের যে কত দূর প্রয়োজন তাহা কি মুখের কথায় বুঝান সম্ভব? সমবেত না হইলে বিভিন্ন প্রদেশগুলির পক্ষেও কি আর কোন ভরসা আছে?

যাঁহারা সনাতন বর্জন-ধর্মের (exclusiveness) গর্ব করেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে "বিষ্ণু" আমাদের পরম দেবতা। বিষ্ণু অর্থই যিনি ব্যাপনশীল। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব হইয়াও যদি আমরা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আপনাদের বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই তবে তাহাই হইবে অবৈষ্ণবজনোচিত আচরণ।

সার্থকতার দিক দিয়াও এই পদ্ধতি একান্ত নিষ্ফল। চীনের মালীরা খুব রক্ষণশীল (conservative), তাহারাও তাহাদের ক্ষেত্রের জন্য দূর দেশের নূতন নূতন সব বীজ খোঁজে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "বীজ যদি পুরাতন হইয়া যায় বা বাহির হইতে যদি বীজ না আনা যায় তবে কখনই ফলন ভাল হয় না।" ইহা একটি জীববিজ্ঞানসিদ্ধ (biological) সত্য। তাই কি সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ?

সংস্কৃতির জগতে এই সত্যটি আরও বেশী সার্থক, হিন্দীর ক্ষেত্রে বাংলার চিন্ময় বীজ এবং বাংলার ক্ষেত্রে হিন্দীর চিন্ময় বীজ আরও বেশী সফল হইবার কথা। যাঁহাদের সহায়তায় এখানে এই দুইটি সংস্কৃতির মিলনের ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারিল, তাঁহারা আমাদের নমস্য, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

এখানে এই যে যোগ তাহা প্রেমের, কাজেই উভয়ের পক্ষেই ইহা সমান প্রয়োজন। এই প্রেমের মিলনে উভয় প্রদেশের সংস্কৃতিই নিরাপদ থাকা চাই। তাই কেহ কাহাকেও গ্রাস করিয়া রাক্ষসী রীতিতে আপনাকে বীভৎস ভাবে স্ফীত করিয়া তুলিবার কথা এক্ষেত্রে মনেও আনিতে পারিবে না। সেইরূপ বর্বর আচার চলিতে পারে শুধু ইম্পিরিয়ালিজমের নৃশংস ভূমিতে। রাজনীতির মিলন হইল সজারুর আলিঙ্গন। সেই ক্ষেত্রে কেহ কাহারও কাছে যাইতে কি কাহাকেও কাছে টানিতে সাহস পায় না, সবাই সবাইকে ভীষণ ভাবে গ্রাস করিতেই বদ্ধপরিকর! মাৎস্যন্যায়ের চরম লীলা সেখানে দিনরাত্রি চলিয়াছে!

ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ দেখা গিয়াছে ধর্মের পাশে ধর্ম, মতের পাশে মত বিরাজমান। কেহ কাহাকেও নিঃশেষ করে নাই, বরং একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অন্যকে মারিয়া গ্রাস করিয়া আপনি স্ফীত হইয়া উঠিবার রাক্ষসী বৃত্তিটা অভারতীয়, বাহির হইতে আমদানী করা। কাজেই এইরূপ সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রের কথা বুঝিতে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কঠিন হইবে না।

প্রেমের মিলনক্ষেত্রে কি এই সব বীভৎস নীচ প্রবৃত্তির স্থান থাকিতে পারে? এখানে কে উচ্চ কে তুচ্ছ

সে কথাও উঠিতে পারে না। বর ও কন্যা পরস্পরের পরিপূরক। তুলনার কথা কি সেই ক্ষেত্রে চলে? সেখানে দুইই, "বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ" অর্থাৎ "বাক্য এবং অর্থের মত পরস্পরে নিত্যযুক্ত"। শিব ও শক্তির মিলন না হইলে শিব ও শক্তি উভয়েই ব্যর্থ। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ প্রভবতি ... ...

নচেদেবং দেবঃ কথমপি সমর্থঃ স্পন্দিতুমপি।

"শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়াই শিব সব কিছু করিতে সমর্থ। নহিলে এমন যে দেবতা তাঁহার এতটুকু নড়িবার বা নাড়িবার শক্তিটুকুই বা কোথায়?"

এই কথাই বুঝাইতে গিয়া তুলসীদাস গোস্বামী বলিয়াছেন, "এই পার্থক্য শুধু মুখের কথার পার্থক্য, আসলে জল ও বীচিতরঙ্গ যেমন কথায় ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ এক, তেমনি প্রেমের এই অভিন্নতা।"

গিরা অরথ জল বীচি সম কহিয়ত ভিন্ন ন ভিন্ন।

(রামায়ণ, বালকাণ্ড, দোহা ৩৪)

মিলনের এই সাধনা জীবনের সাধনা। তাহার আরম্ভ অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু পরিণতিতে তাহা তো ক্ষুদ্র নহে। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই তো ভবিষ্যৎ মহারণ্য নিহিত।

তাই ক্ষুদ্র আরম্ভে ভয় নাই। কিন্তু কিছু কাল ধরিয়া চাই জল, চাই সেবা। আবদর রহীম খান-খানাঁকে সামান্য একটি গ্রাম-কন্যা যে অন্তরের ব্যথাটি শুনাইয়া দিয়াছিল সেই কথাটিই আজ আপনাদিগকেও শুনাইয়া রাখিতে চাই।

প্রেম প্রীতিকো বিরৱা চল্যো লগায়।
সীঁচন কী সুধী লীজো মুরঝি ন জায়॥

"প্রেম-প্রীতির তরুটি যে রোপণ করিয়া গেলে, তাহাতে রসসেচনেরও ব্যবস্থা করিও, যেন সে না যায় শুকাইয়া।"

এখানেও এই নবজায়মান লতিকার অঙ্কুরটিকে যাঁহারা নানা ভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার সহায়তা করিবেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

প্রত্যেক জলবিন্দুর অন্তরে মহাসাগরের মিলনের ডাক আসিতেছে। সেই ডাক কাহারও অন্তরে পৌছিতেছে আগে, কাহারও কাছে পৌছিতেছে একটু পরে। এই ডাকে সাড়া না দিলে বাঁচিবার আর আশা নাই। এই ডাকে ব্যাকুল হইয়া আবার যদি কোনো বিন্দু একলাই যাত্রা করে তবে পথেই সে মরে শুকাইয়া। তাই প্রাচীন যুগের ভক্ত রজ্জবজীর বাণীতেই তাঁহাদের বলিতে হয়—

বুংদ পুকারৈ বুংদ কৌ গতি মিলে সংজোয়।

"অর্থাৎ সকল বিন্দু একত্র হইতে পারিলেই যুক্ত ধারা অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে সাগরের পানে।"

এই সব বিন্দুদের মিলিত করিবার ব্রত যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা নমস্য, তাঁহাদের নমস্কার।

বিধাতার কৃপায় এবং সকল প্রেমী জনের সহায়তায় এই যোগসাধনা কখনও যেন অবরুদ্ধ না হয়, বার বার বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা। তাঁহার চরণে বার বার নমস্কার।

২ মাঘ, ১৩৪৪

বন্ধ্যা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

বহু সাধ্যসাধনা করা হইল, কত দেবতার কাছে মানত, কত সাধু-সন্ন্যাসীর দেওয়া মাদুলি, আর নিজেদের মধ্যে যে যা বলে সে-সব তুকৃতাক্ ত আছেই—কিন্তু মলয়ার বন্ধ্যা নাম আর ঘুচিল না। ছোট জা অঞ্জলিরই বেশী উৎসাহ এই সব দৈব ব্যাপার লইয়া চিন্তা করায়। যেখানে যাহার কাছে যা-কিছু শোনে অমনি অঞ্জলি ভাবে "এইবার নিশ্চয়ই দিদির ছেলে হইবে," কিন্তু পরে যখন আর কিছু হয় না তখন তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মলয়া বলে, "যাঃ তুই যেন কি মেয়ে! যেমন তোর সখ তেমনি তোর দুঃখু। বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই' তোর হ'ল যেন তাই," কিন্তু কিছুতেই বেচারী অঞ্জলিকে আর বুঝ মানান যায় না। আবার কামরূপ হইতে নবাগত কোন সন্ন্যাসীর দৈব মাদুলি কিনিবার জন্য সে আসিয়া বলে, "এবারটি দাও দিদি, আর চাইব না। টুনুর মা বলছিল মাদুলিটা নাকি একেবারে 'পেত্যক্ষি'। ওর দেখা। সুদ্ধ এই বারটির জন্যে পাঁচ সিকে দাও, আর চাইব না।"

মলয়ার প্রথম প্রথম এই নিঃসন্তান হওয়ার জন্য যে দুঃখ হইত না তা নয়, কিন্তু এখন তাহার ওসব কথা ভাবিবার আর অবসর নাই। অঞ্জলির বার বার এই চেষ্টার পর প্রতিবারই যে তাহার ম্লান মুখখানি দেখিতে হয় ইহাতেই তাহার ভয় ছিল বেশী। সে যে কিছু বলিবে তাহার উপায়ও নাই—অঞ্জলি বড় অভিমানিনী। বারণ করিতে গিয়া সে প্রতিবারই বিফল হইয়াছে। তাহার সেই বারণটাও যে খুব জোরের হইত তা নয়, কারণ অঞ্জলির সেই ঐকান্তিক অনুরোধ ছাড়াও কে যেন তাহার মনে অঞ্জলির কথার সুর টানিয়া বলিত, 'এবার হয়ত ফল ফলিতেও পারে।' তাই এই সব প্রক্রিয়ার পরে প্রতিবারের ব্যর্থতায় তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যায়। ভবিষ্যতের একটি চিরাকাঙ্ক্ষিত স্নেহময় ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কিসের একটা স্রোত তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া একটা রহস্যময় রুদ্ধতার সৃষ্টি করে, বুকটা যেন কিসের আবেগে দুলিয়া উঠে, নিশ্বাস কেন যেন জোরে বহিতে থাকে, বুকের নীচেটা হঠাৎ যেন টন্‌টন্ করে। আঁচল দিয়া তাড়াতাড়ি সে উদ্গত অশ্রুকে চাপিয়া ধরে। শেষ পর্য্যন্ত তাই অঞ্জলির কাছে প্রতিবারেই তার পরাভব। চাবির গোছাটা খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বলে, "নিয়ে যাও পয়সা—যা ইচ্ছে করগে যাও। এ বাতিক শান্তি হবে কত দিনে তাও আমি দেখি।"

হেঁট হইয়া নিঃশব্দে চাবির গোছাটি তুলিয়া লইয়া অঞ্জলি চলিয়া যায়, মলয়া চাহিয়া দেখে। একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার অসীম শূন্যতার ভার সাময়িক একটু লাঘব করিয়া শূন্যেই মিলাইয়া যায়।

দুটি জায়ের কত মধ্যাহ্ন এই সব কথায় বার্ত্তায় কাটিয়া যায়, রাত্রে দু-জনাকেই বিছানায় সে-কথাগুলি আকুল করে। অঞ্জলি স্বামীকে বলে, "ওগো শুনছ, হৃষীকেশের পাহাড়ে নাকি কে এক জন সাধু আছেন—"

দেবেশ ওদিকে মুখ করিয়াই বলে, "আবার তোমার সেই সব লাগালে এই রাতে। কিছু বোঝ না, কেবল মাদুলি আর পূজো আর সন্ন্যাসী নিয়েই আছ। ওসব হয় না ছাইও, কেবল অর্থনষ্ট আর তার ওপর মনঃকষ্ট, যা থাকবার তা ত আছেই।"

এ ত আর দিদি নয়, তাই অঞ্জলি আর কিছু বলে না, একটু পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকে। কিন্তু এ ভান বেশী ক্ষণ রক্ষা করা কঠিন। খানিক বাদে আবার সে ফিরিয়া বলে, "আমায় একটা সাদা পায়রা কিনে দিতে পার?"

দেবেশ হাসিয়া বলে, "কেন? আবার কিসের তুক?"

অভিমান করিয়া অঞ্জলি আর কিছু বলে না, চুপ করিয়া যায়। কিন্তু পরের দিন খাঁচাসমেত সাদা পায়রা হাজির হয়, তাহাতে বাধা হয় না।

আর ভাবে মলয়া। শুইতে গেলে হাতের মাদুলিগুলি শরীরে বেঁধে—গলার মাদুলিগুলি স্বর্ণহারের সংস্পর্শে কিরূপ একটা শব্দ করে। এক-এক বার সে ভাবে, এগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই, কিন্তু আবার একটা ক্ষীণ আশা তাহাকে বাধা দেয়, মাদুলিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবার সাহস আর তাহার হয় না। স্বামী কাজকর্ম্ম সারিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পিঠের উপর মুখটি রাখে, কিছুক্ষণ কি ভাবে—সে-সব ভাবনার মধ্যে অঞ্জলির বলা অনেক কথা মনে পড়ে—আবার পাশ ফিরিয়া একটা বালিশ প্রাণপণে মুক্ত বক্ষে চাপিয়া ধরে। সকালে ঘুম ভাঙে—কি সব স্বপ্ন রাত্রে দেখিয়াছে মনে পড়ে—দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া সে দরজা খুলিয়া বাহির হয়।

অঞ্জলির বার-বার তাগাদা এবং প্রচুর বিশ্বাস, এই দুইটি জিনিষই মলয়াকে এমন করিয়া দিয়াছিল যাহার ফলে তাহার মাদুলি-ধোওয়া জল খাইতে ভুল হয় না—পায়রাটিকে সযত্নে খাবার দেয়—কার্ত্তিকের ছবিখানার নীচে মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিতে হয়।

এখন এসব তাহার সহিয়া গিয়াছে। মলয়া এখন এসব যন্ত্রচালিতের মত করিয়া যায়।

অঞ্জলিরও দিন দিন বিশ্বাস কমিয়া আসিল।

সেদিন রাত্রে যখন দেবেশ অঞ্জলির কানে কানে বলিল, "কি গো লুকিয়ে লুকিয়ে সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়েছিলে নাকি?" তখন লজ্জায় অঞ্জলির গাল রাঙা হইয়া উঠিল।

আনন্দোদ্ভাসিত সলজ্জ চক্ষে সে স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "যাও তুমি ভারী বেহায়া।"

দেবেশ একটা টোকা মারিয়া বলে, "তাই বটে।"

কিন্তু দুই মাস পরে মলয়াও জানিল। আনন্দে তার মন নাচিয়া উঠিল। অঞ্জলির মাতাকে সে চিঠি লিখিল—"কাকীমা! অঞ্জলির ছেলে হবে ফাল্গুন মাসে।"

আর সত্যই ফাল্গুনে অঞ্জলির একটি ছেলে হইল। অঞ্জলির কষ্ট দেখিয়া মলয়ার বড় কষ্ট হইয়াছিল—সে স্বামীকে বলিল, "যাও টাকার জন্যে ত ভাবনা নেই। ও দাই দিয়ে হবে না। এক জন পাস-করা মিডওয়াইফ নিয়ে এস।" পাস-করা মিডওয়াইফ আসিল এবং সকল কষ্টের লাঘব হইল পুত্রমুখদর্শনে।

আঁতুড়ের মধ্যেই মলয়া ছেলেটাকে চুমা খাইতে লাগিল। পাস-করা দাই বলিল, "অমন করবেন না। এখন ওদের একটুতেই কিছু হ'তে পারে।"

মলয়া বলে, "আমি যে আর থাকতে পারছি না।"

জ্ঞান হইলে কাতর বিবর্ণ মুখে কাতর চক্ষে চাহিয়া অঞ্জলি বলিল, "দিদি কি হয়েছে?"

মলয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "সোনার চাঁদ হয়েছে, আমার বুকজুড়োনো মাণিক হয়েছে—এই দেখ।"

বিনা কারণে আজ মলয়ার চোখের জলে গাল ভাসিয়া গেল। সকলে ভাবিল, ও আনন্দে আজ আত্মহারা।

প্রসূতির সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গিয়াছে। রাত্রে ঘরে থাকিবার লোক ঠিক হইয়াছে, তবুও পাশের ঘরে স্থান করিয়া মলয়া বলিল, "আমি এইখানে শুলাম অঞ্জলি—দরকার হ'লে ডেকো।"

অঞ্জলি বলিল, "আচ্ছা।"

শুইয়া শুইয়া আজ মলয়ার কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, এই রক্তমাংসে গড়া একটি পুতুল—ও আজ অঞ্জলির ছেলে—ও বড় হইবে—অঞ্জলিকে মা বলিয়া ডাকিবে। অঞ্জলি ওকে বুকে জড়াইয়া ধরিবে, স্তন্য দিয়া ওর শরীর পুষ্ট করিবে, স্তন্যপানরত শিশুর বিচিত্র কলস্বরে অঞ্জলির প্রতি রক্তকণা নাচিয়া উঠিবে—আনন্দে স্নেহাতিশয্যে তাহার বক্ষ বাহিয়া তাহার মাতৃত্বের মমতার ধারা নামিয়া আসিবে ঐ শিশুর প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে। আজ অঞ্জলি মা হইয়াছে। একটি শিশুর মনোরাজ্যের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার। মলয়া আর ভাবিতে পারে না, দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরে। ঠিক সেই সময়ে নবশিশু কেমন যেন শব্দ করে। চমকিয়া ধড়ফড় করিয়া মলয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ডাকে, "অঞ্জলি"।

অঞ্জলি জবাব দেয় "কেন দিদি!" ওর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

"ছেলেটা কেন শব্দ করল দেখ ত।"

ক্ষীণ আলোটা উস্কাইয়া দিয়া অঞ্জলি ছেলেটিকে দেখে। কেমন সন্তর্পণে কত পটু হস্তে নেকড়া-জড়ানো শিশুটিকে তাহার বুকের কাছে তুলিয়া ধরে। একটু মৃদু দোল দেয়। একটি চুম্বন তাহার অতি কোমল মসৃণ কপোলে আঁকিয়া দেয়।

মলয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে। তাহার চোখ দুটা কিসের এক অস্বাভাবিক তৃষ্ণায় ভরা। ঐ মাতৃস্নেহের মূর্ত্ত প্রতীকের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অঞ্জলির চোখের দিকেও চোখ পড়িয়া যায়। মলয়া অঞ্জলির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়, যেন কি এক অপরূপ স্বপ্নে তার চোখ আজ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেন কিসের ভাষা—সে যেন ঐ শিশুর মুখে চোখে কি খুঁজিয়া ফিরিতেছে। লণ্ঠনের আলোয় অঞ্জলির পাংশু মুখ আরও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। তাহার শুভ্র গণ্ডের উপর নীল শিরাগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছিল। তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মলয়ার মনে হইল ঐ পাংশুবর্ণ শিরাগুলি—ওরা প্রত্যেকেই আজ অঞ্জলির মাতৃত্বকে বরণ করিবার জন্য কোথা হইতে একত্রে আসিয়া তাহার দেহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে চাহিয়াই থাকে। অঞ্জলি বলে, "দিদি অমন ক'রে চেয়ে আছ যে! শুতে যাবে না? যাও শোও গে।"

মলয়া বলে, "তা হোক গে—কিন্তু কেমন ছেলেটা হয়েছে বল ত! কেমন আদর করতে ইচ্ছে করে। যেন ননীর গোপাল। হ্যাঁ ভাই অঞ্জলি, ছেলেটা আমায় দেবে ভাই! তোমার ত আরও হবে। ওকে আমায় একেবারে দিয়ে দাও না। আমায় ও মা বলবে'খন।" বলিয়াই এই চাহিয়া ফেলার জন্য তাহার বড় লজ্জা হয়। কেন সে চাহিতে গেল! না চাহিলেও ত হইত! কি দরকার ছিল? বড় লজ্জা হয়!

কথাটা যে অঞ্জলির বেশ মনের মত হয় তা নয়। কিসের একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় তার বুকটা দুড়দুড় করিয়া উঠে। সে তবু দিদির এই আকুলতা দেখিয়া করুণা না করিয়া পারে না। এই প্রথম সন্তান, তবু যেন তার বয়স আজ দিদির চেয়ে কত বেশী, সে যেন দিদিকে কত উপদেশই দিতে পারে; তাই বেশ গিন্নীর মত সে বলিল "হ্যাঁ তোমার বইকি দিদি। আমার আর কি! নইলে তোমারই ত সব ভোগ পোয়াতে হবে।"

কিন্তু মলয়ার মন ভরে না। সে বলে, "ওসব কথায় ভুলছি নে। স্পষ্ট ক'রে বল, ও আমার। ও আমারই হবে, তুমি ওকে আমায় দিলে, ও একেবারে আমার খোকা।"

এই কাতরতা, এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া অঞ্জলির প্রাণ দয়ায় গলিয়া যায়। তাহার দিদিকে এত চঞ্চল সে কখনও দেখে নাই। গলা তাহার ভারী হইয়া উঠে—সে বলে, "হ্যাঁ দিদি, খোকা আজ থেকে তোমার—ওকে আমি তোমায়ই দিলাম।" কিন্তু একথাটা উচ্চারণ করিবার সময়ে মলয়ার প্রতি তাহার এত মমতা, এত শ্রদ্ধা, এত অনুকম্পা থাকা সত্ত্বেও অন্তর যেন কেমন কাঁপিয়া উঠে, স্বভাব কেমন যেন সাড়া দেয় না, মনের কোণে কিসের একটা খোঁচা যেন বেঁধে।

অঞ্জলির এমন স্পষ্ট দান-বাক্য শুনিয়াও মলয়ার শূন্য স্থানটা ভরে কই? সেটা যেন আরও বিরাট হাঁ করিয়া তাহার লোলুপতার পরিচয় দিতে থাকে। অঞ্জলির প্রতি ঐকান্তিক গাঢ় প্রেম থাকা সত্ত্বেও তাহার এই দানকে মলয়া হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার শূন্য মন্দির শূন্যই রহিয়া যায়, অসীম স্নেহের পাত্রী সখী মমতাময়ী অঞ্জলি বা তাহার এই নবজাত সুকুমার নবস্ফুট যূথী-কলির ন্যায় শিশু সে-শূন্যতা ভরাইয়া তুলিতে পারে না।

কিন্তু মানুষ মায়ায় গড়া জীব। মায়ার মোহে তাহার সব ব্যথা কোথায় মিলাইয়া যায় তাহা টেরও পাওয়া যায় না।

মলয়ার বেলায়ও ঠিক তাহাই হইল। অঞ্জলি খোকাকে লইয়া আঁতুড়-ঘর ছাড়ার পর হইতেই মলয়ার সব সময়কার কাজ হইল ঐ ছেলেকে আদর করা। কি যত্নে, কি আগ্রহে, কি ঐকান্তিক স্নেহ দিয়া যে মলয়া খোকাকে ভালবাসিতে লাগিল—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা অমন শিশুগতপ্রাণ! ওর জীবনটায় ও আর সন্তানের

মুখ দেখলে না। আর যাদের ঘরে খাওয়াবার নেই, দেখবার নেই, তাদের ঘরে যে কত দিয়েছ ভগবান!" মলয়ারও একথাটা আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়। কিন্তু সে খোকার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠে, "নাঃ, কি দরকার আমার ছেলের। এই ত আমার দুলাল রয়েছে, আমার আঁধারে আলো রয়েছে, আমার বুকজুড়ানো মাণিক রয়েছে।"

কিন্তু সত্যই কি তাই? বুক কি মলয়ার জুড়ায়? হয়ত জুড়ায়ও বা! তা না হইলে আর অমন স্নেহ কি সম্ভব। অঞ্জলিও দেখিয়া অবাক হইয়া যায়—বলে, "দিদি, তুমি নইলে খোকাকে দেখা আমার হয়ে উঠত না! বাবাঃ, যা ক'রে কর তুমি। আমি ও কিছুতেই পারতাম না।"

মলয়া কথাগুলি শুনিয়া ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরে আর চুমার পরে চুমা দিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলে।

আর ছেলেটাও কি সবই বোঝে! ঐটুকু ছয় মাসের ছেলে, কেমন তাকায় মলয়ার দিকে, চুমা দিলে কেমন হাসে। সুপুষ্ট ধবধবে হাত-পাগুলি কি উল্লাসে ছোড়ে; হাসিবার সময়ে ফুলো গালটায় কেমন টোল খায়; চিবুকের মাঝখানটা কেমন নামিয়া যায়। আর ভাষাহীন তৃপ্তিভরা কি এক বিচিত্র কলশব্দ কণ্ঠে। বেশী হাত-পা ছোড়ায় মাঝে মাঝে দুধ তোলে—মলয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া লয়, অঞ্জলি দেখিয়া বলে, "আঁচল দিয়ে মুছ্‌ছ দিদি, দেখবে এখন মজা।"

মলয়া বলে, "কেন মেজ কি?" যেন কণ্ঠে কত ত্রাস। কোন অমঙ্গল নাকি?

হাসিয়া অঞ্জলি বলে, "না গো ভয়ের কিছু নয়। তবে বলে ছেলেরা নাকি ওতে ভারী আঁচল-ধরা হয়। তাই বলছিলাম।"

মলয়া বলে, "নাও আর গিন্নীদের মত উপদেশ দিতে হবে না। আঁচল-ধরা হবে না ছাই। জ্ঞান নেই তাই, নইলে জ্ঞান হ'লে কি আর আমায় জানবে, না মানবে?"

অঞ্জলির দুঃখ হয় এ-কথাটা শুনিয়া, কারণ খোকা যে মলয়ার ছেলে নয় এ-কথাটা সে তাহাকে কিছুতেই ভুলাইতে পারিতেছিল না। তবু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলে, "নাঃ মানবে না বইকি! বরং ও ওর মাকেই জান্‌তে পারবে না দেখো।"

মলয়া বলে, "ও-সব আমার দেখা আছে। এখন একটু এ-ধারে এসে ওকে একটু খাইয়ে দাও ত। সেই কখন খেয়েছে।"

অঞ্জলি হাত ধুইয়া রান্নাঘরের বাহিরে আসে। ছেলেটার নিকটে আসিয়া একটু চাহিয়া দেখে। দু-বার হাততালি দেয়। আর ছেলেটাও কেমন চেনে। অমনি খাইবার জন্য মলয়ার কোলে নড়াচড়া করিতে থাকে। মলয়া বলে, "দেখ দেখ কেমন নেমকহারাম। এত ক'রে ক'রে মরি, কিন্তু যেই মা এসেছে অমনি আর কাউকে চান্ না। ও কি, ঐ ভিজে হাতে ছেলে নেবে নাকি! ভাল ক'রে আঁচল দিয়ে হাতটা মুছে ফেল।"

অঞ্চলের প্রান্তভাগে বেশ করিয়া হাতটা মুছিয়া ফেলিয়া সে ছেলেকে কোলে লইতেই ছেলেটা বুকের উপর কিসের অনুসন্ধানে মুখ ঘষিতে লাগিল।

মলয়া বলিল, "আহা বাছা রে, কত খিদে পেয়েছিল।" অঞ্জলি ছেলেকে স্তন্য দিতে থাকে। ছেলেটি চুকচুক্ শব্দ করিয়া খায়, আর মলয়া কেমন ভাবে ঐদিকে চাহিয়া দেখে, ঐ শব্দ শোনে, এক এক সময় ঐ অবস্থায় তাহার গালে দু-একটি চুমো দেয়।

এই ভাবেই দিন যায়। ছেলের ভবিষ্যৎ লইয়া দুই জায়ে কত কথাই হয়। দ্বিপ্রহরে দুই ভাই কাজে গেলে দুটি জায়ে ছেলেটিকে মাঝে লইয়া বসে। অঞ্জলি চুল শুকাইবার জন্য পিঠের উপর চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া পা ছড়াইয়া লাল কালো নানা রঙের সুতা দিয়া কাঁথা সেলাই করে। ছোট হাত-মেশিনটা দিয়া মলয়া খোকার জামা সেলাই করিতে থাকে। তাহার শব্দে ছেলেটা সেই ঘূর্ণায়মান চাকার দিকে চাহিয়া থাকে, মাঝে মাঝে মলয়া হাসিয়া চোখের ভঙ্গী করিয়া কত আদরের কথা বলিতে থাকে। অঞ্জলির এ-সব দেখিয়া খুব আনন্দ হয়।

সেদিন মলয়া বলিল, "সাত্যি মেজ, তোর উপর আমার ভারী হিংসে হয়, কেমন নিজের সংসারটা গুছিয়ে নিলে বল ত?"

অঞ্জলি বলে, "কেন দিদি, সংসার ত তোমারই। আমি আর ওর কি করি বল? বরং আমার হিংসে হয়, ও এসে তোমার কাছ থেকে আমার আদরটুকু কেড়ে নিয়েছে। এখন কি আর তুমি আমায় দেখ। আগে কত দেখতে বল ত?"

মলয়ার অন্তর অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠে, যেন তাহার সব অভাবই গিয়াছে। সে অঞ্জলির কথার উত্তরে বলে, "এখন ছেলের সঙ্গে হিংসে, নয়?"

অঞ্জলি "নয় ত কি?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া আরক্ত মুখে আবার কাঁথা সেলাইয়ের জন্য মাথা নামায়।

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ। মলয়া বলিল, "হ্যাঁ মেজ-ঠাকুরপোকে যা বলতে বলেছিলাম বলেছিলে?"

অঞ্জলি বলিল, "হ্যাঁ, তিনি বললেন যে সে-সব দাদা জানেন। আমি কি করব? আর সত্যি দিদি, তিনি কি করবেন? যা করবার তোমরা কর ভাই। আমরা শুধু হুকুম শুনব।"

মলয়া বলিল, "ঠিক ত? কিন্তু ঠাকুরপোর বন্ধুবান্ধব কাকে কাকে বলতে হবে সে ত জানা নেই। সেটা কে করবে?"

অঞ্জলি বলিল, আবার বন্ধুবান্ধবের হাঙ্গামা কেন দিদি? একে মা-বাবাকে আসতে লিখেছ, তার খরচ। এখানকারও লোকজন কম নয়; তার উপর আবার বন্ধুবান্ধব। তুমি যেন কি করবে ভেবে পাচ্ছ না। ব্যাপার ত একটা ছেলের ভাত।"

মলয়া একটু ভঙ্গীতে বলিল, "হ্যাঁ, তোমার আর গিন্নীপনা করতে হবে না। তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ। একটা ছেলের ভাত বইকি। এ একটি ছেলে আর সব ছেলের সমান নাকি? বলে আমার খোকামণির ভাত হবে। আমি আমার খোকামণির সারা গায়ে গহনা দিয়ে দেখাব। খরচ-পত্তর আর কার জন্য তুলে রাখব? খবরদার, আর এসব কথা ব'লো না বউ, রাগ হয়। সবার সঙ্গে আমার সোনার চাঁদের তুল্যি!"

বলিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া খোকাকে সে তুলিয়া লয়, আর কেবলই চুমা খাইতে থাকে, খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। মলয়া ত বোঝে না, কিন্তু অঞ্জলি বোঝে যে আজ তাহার কাছে ও-ছেলের যত দাম, সব মায়ের কাছেই সব সন্তানের ঐ একই দাম। অঞ্জলি মনে মনে হাসে এবং তাহার পুত্রকে এক জন এত ভালবাসে জানিয়া মনে অসীম তৃপ্তি অনুভব করে।

তার পর ক্রমশ খোকার অন্নপ্রাশনের দিন স্থির হইয়া গেল। দেবেশের দাদা শ্রীশ প্রবল উৎসাহে ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থায় লাগিয়া গেলেন। মলয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া আগাগোড়া কাজ দেখিতে লাগিয়া গেল। ভাতের বাকী আর পনর দিন। পনর দিন আগেই অঞ্জলির পিতামাতা ও ছোট ভাই আসিল, মলয়া তাহাদের যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিল। নাতিকে পাইয়া সুখদাসুন্দরী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন; আর কেই বা না হইবে। সত্যই ছেলেটি দেখিতে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলেরই মত, তাহার মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো রেশমের মত চুল, আর ঠোঁট দুটি কি লাল।

সুখদাসুন্দরী এখন প্রায়ই খোকাকে লইয়া থাকেন। মলয়া কাজে ব্যস্ত থাকে। অঞ্জলি দিদির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কাজে কাজেই মলয়া এখন আর সময় পায় না বেশীক্ষণ খোকাকে দেখিতে। সে এক রকম ভাল— কাজগুলি সারা হইতেছে ত। সারা বাড়ীটা ঝাড়িয়া মুছিয়া প্রসাধন করিল। অন্নপ্রাশনের দু-দিন আগে বাড়ীখানা ঝলমল করিতে লাগিল। সারাদিন খাটিয়া চুনকাম-করা বাড়ীখানা চাকরবাকর দিয়া সাফ করাইয়া সন্ধ্যার আগে দুই জায়ে কলতলায় গেল স্নান করিতে। সাবান দিয়া গা ঘষিতে ঘষিতে আজ মলয়ার গলার মাদুলিগুলি বড় বেশী শব্দ করিতে লাগিল। সেগুলি যেন একটা বোঝা। কি ভাবিয়া সে পট্ পট্ করিয়া সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। অঞ্জলি মুখে চোখে সাবান মাখিয়া কলের জলে মুখ ধুইতেছিল, সে কিছু

দেখিতে পায় নাই। হাতের মোটা তাগাটা ছিঁড়িবার সময় শব্দ করিতেই অঞ্জলি বলিল, "কি করছ দিদি?"

মলয়া বলিল, "কিছু নয়—কতকগুলো জঞ্জাল সাফ করছি। আজ ভাল ক'রে পরিষ্কার হব।"

অঞ্জলি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, শঙ্কিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "ও কি করলে দিদি, মাতুলিগুলো সব ছিঁড়ে ফেললে? ও যে দেবতার জিনিষ দিদি! ঠাকুরদেবতার জিনিষ নিয়ে কি খেলা নাকি?"

মলয়া একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ অঞ্জলি, ঠিক বলেছ—ঠাকুরদেবতার জিনিষ নিয়ে খেলা আর করব না ব'লেই আজ এগুলিকে ভালয় ভালয় বিদায় দিচ্ছি। নইলে আরও দিন গেলে যখন খেলার সময় কেটে যাবে, তখন এ জিনিষের দিকে কেউ চাইবেও না। তখনই এর প্রকৃত অপমান হবে। কি আর হবে কুঁড়ে-ঘরে এ মাণিক নিয়ে খেলা করে?"

অঞ্জলি আর বলিতে পারিল না। শুধু একটু স্বর নামাইয়া বলিল, "জান না তো দিদি কিসে কি হয়? হয়ত কিছু হ'ত তা আর হবে না, হয়ত যা হচ্ছে তাও থাকবে না।"

শেষের কথাটায় মলয়ার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, "চুপ কর্ অঞ্জলি, ওকি অলক্ষুণে কথা। কোন্ কথা কোন দেবতার "জো"য় পড়ে তা ত কেউ জানে না। ষাট ষাট। ব্যাপারটা এমনই হইয়া গেল আর কেহই কোন কথা বলিল না।

মাতুলিগুলি তুলিয়া লইয়া সে একটা কাঠের কৌটায় ভরিয়া রাখিল। সেগুলি সে আর যেখানে-সেখানে ফেলিতে পারিল না।

কাল অন্নপ্রাশন। আজ বৃদ্ধির ধান ভানা হইবে। বৈকালে পাড়ার বহু সধবা-সীমন্তিনী আসিয়াছেন। অঞ্জলি বলিল, "হ্যাঁ দিদি, আমি নাকি খোকার ভাত দেখতে পাব না।"

মলয়া বলিল, "আমি ত নিয়ম কিছু জানি না। কাকীমাকে জিগগেস্ কর গে যাও।"

বলিতে বলিতেই সুখদাসুন্দরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওমা সে কি কথা! মা কি আবার ছেলের ভাত দেখে নাকি। তোমাদের বাপু সবই দেখছি কেমন যেন নূতন। এসব চাল-চলন আমরা জানি নে বাবা। একটা কল্যাণ-অকল্যাণ নেই, যা হোক্ একটা করলেই হ'ল। যা ইচ্ছে কর গে যাও।"

মলয়া বলিল, "আমরা আবার কি জানি কাকীমা, যে করব। ছেলেমানুষ বই ত নই। আপনার নাতির কাজ আপনিই ত সব করবেন। আমরা হলাম হুকুমের বাঁদী ঘরের বউ। আমরা কি ছাই কিছু জানি।"

গলার স্বর একটু খাটো করিয়া সুখদাসুন্দরী বলিলেন, "তা আর জানবেই বা কোত্থেকে বউমা। তোমার ত আর দোষ নেই বাছা। ঘরে শাশুড়ী নেই যে ব'লে দেবে। তবে আমরা ছেলেবেলা থেকেই এ-সব কাজ দেখছি শুনছি। আমরা জানি। তোমরা ভাল বউ তাই মেনে চল। আবার অনেকে ত মানেও না। দেখি আবার বিদ্ধির কি হ'ল।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অঞ্জলি বলিল, "হ্যাঁ দিদি, তুমি ত উপোস ক'রে রয়েছ বিদ্ধির ধান ভানবে বলে। কই গেলে না? যাও।"

মলয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া অঞ্জলি বলিল, "ও কি, কথা কইছ না যে?"

মলয়ার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "না, ঐ কাকীমা উপোস ক'রে আছেন উনিই করবেন। আমি আর যাব না। উনি বড়।"

অঞ্জলি বলিল, "না দিদি তুমি যাও। তুমি আমায় কত আগে থেকে ব'লে রেখেছ, এখন তুমি কেন করবে না। তুমি করলে খোকার কত মঙ্গল। যাচ্ছি, মাকে গিয়ে আমি বলছি।"

হায় রে মঙ্গল-অমঙ্গল! সরল হৃদয়ে অঞ্জলি মঙ্গল বলিয়া যাহাকে বরণ করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিল, ঠিক তাহাকেই খোকার ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় অমঙ্গল বিবেচনা করিয়া সংস্কার তাড়াইয়া দিয়াছে। পুত্রহীনার রচিত প্রত্যেকটি উপচার অমাঙ্গল্যের বাষ্পে কলুষিত হইয়া খোকার ভবিষ্যৎ জীবনকে মাঙ্গল্যহীন করিয়া তুলিবে।

তাহাকে যাইতে দেখিয়া মলয়া হাত ধরিয়া বলিল, "না মেজ যাস্ নে ভাই। কাকীমা বলেছেন আমায় কিছু করতে নেই। আমি কিছু করলে সেটা খোকার অমঙ্গল হবে।" চোখের জল মলয়া আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ঝর ঝর করিয়া তাহার দু-চোখ বাহিয়া জল পড়িতেই সে চোখটা চাপিয়া ধরিল।

ঠিক্ সেই সময়ে সুখদাসুন্দরী সেখান হইতে ভাঁড়ারের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার হাতে একটা বিশেষ কিছু ভারী জিনিষ থাকায় তখন আর সেখানে অপেক্ষা না-করিয়া চলিয়া গেলেন।

অঞ্জলি বলিল, "সে কি দিদি, তোমার হাতে খোকার অমঙ্গল! মঙ্গল তবে হবে কার কাজে। আমিও খোকার অত মঙ্গল চাই না যে দিদি। তোমার কাছ থেকে খোকা যদি অমঙ্গলের পসরা পায়, তবে অমঙ্গল মাথায় ক'রেই সে বেঁচে থেকে দিগ্বিজয় করবে।"

মলয়া তাড়াতাড়ি অঞ্জলির মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঃ বোন্, তুই যে মা, তোর মুখে ও-সব কথা বলতে নেই। ওতে অকল্যাণ হবে খোকার, চুপ কর। আমি ত আর মা নই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে-স্থান ছাড়িয়া মলয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল।

অঞ্জলি ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই সুখদাসুন্দরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঞ্জলি একবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল, তাহার পর তাহার চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিল। কি বলিবে-বলিবে করিয়া তাহার আর কিছু বলা হইল না। আবেগে ঠোঁট দুইটা একটু কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। সুখদাসুন্দরী কিন্তু বলিতেই আসিয়াছিলেন তাই তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ অঞ্জলি, তোর জা অমন চোখের জল ফেলছিল কেন? ওকি তুইও ত কাঁদছিস্। তোদের হ'ল কি? যত সব অলক্ষুণে কাণ্ড! খোকার ভাত হবে তা তর যেন আর সইছে না। জন্মে ছেলের মুখ দেখলে না, উনি গেছেন কল্যাণের কাজে হাত দিতে। তার উপর চোখের জল ফেলা। ও কি চায়!"

অঞ্জলি বলিল, "চুপ কর মা, চুপ কর। দিদি শুনতে পেলে বিষ খেয়ে মরলেও তার দুঃখু যাবে না। তুমি বলছ কি! আমার খোকার অমঙ্গল হবে দিদির থেকে? তুমি জান না মা—"

অঞ্জলি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুখদা বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার আস্কারা না পেলে আর এমনতর হয়! আমি বলি কি হ'ল! ওলো গতরখাগী জানিস না লো বাঁজার ছোঁয়া জিনিষ কুকুরেও খায় না—তা দিয়ে আবার ছেলেমেয়ের শুভকর্ম্ম করতে হবে! কি লা? ছেলের মাথা খেতে চাও তো যত বাঁজা নিয়ে কাজ কর গে যাও।"

অঞ্জলি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। সে দ্রুতপদে সরিয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া সে শিকল দিয়া দিল। তার পর চলিল তার মনের মধ্যে যুদ্ধ। এও কি সম্ভব! যে-দিদি খোকাকে এত ভালবাসেন, যে-দিদির খোকাগত প্রাণ, তাঁর হাতে হইবে খোকারই অমঙ্গল! আর তার কোনই কারণ নাই। একমাত্র কারণ দিদির আমার এ বুকজুড়ান মাণিক নাই। তাঁর বক্ষ বাহিয়া যে দীর্ঘশ্বাস আসে সে কি এতই তপ্ত! তাঁর চোখ বাহিয়া যে জল আসে, সে কি এতই অকল্যাণকর! সে কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় সেই উৎসবমুখর ভবনে শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, হুলুধ্বনিতে প্রাঙ্গণ গুঞ্জিত হইয়া উঠিল। নানা কণ্ঠের বিচিত্র লোকসমাগমের কলহাস্তের মধ্যে কেহ অনুসন্ধান করিল না—মলয়া কই, অঞ্জলি কোথায়? অঞ্জলি বাহিরে আসিয়া দেখিল সুখদাসুন্দরী কয়েকটি বর্ষীয়সীর সহিত কি কথা গোপনে কহিতেছেন। সে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া খোকার খোঁজ করিতেছিল। ঈশ্বরের বিধানে মায়ের দেহ এমন ভাবেই নির্ম্মিত যে শত বিপ্লবের মধ্যেও জননী টের পায় তাহার সন্তানের ক্ষুধা পাইয়াছে কি না। সে সব জায়গা খুঁজিয়াও খোকাকে পাইল না। মলয়ার ঘরে সে আর যাইতে পারিতেছিল না। তাহার বড় লজ্জাবোধ হইতেছিল।

শেষ পর্য্যন্ত সে মলয়ার ঘরে গেল। ঘরের মধ্যে তখন অন্ধকার। সে আলোটা জ্বালিল। তার পর সে দেখিল, পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যায় মলয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আর তাহার হাতের উপর তাহার বুকের উপর হাত দিয়া

তাহারই দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে খোকা। আলোটা উঁচু করিয়া সে এই বিমল দৃশ্য দেখিতে লাগিল আর তার দুই চোখে জল আসিয়া গেল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান! এর ভিতরেও অকল্যাণ! অকল্যাণ এখানে আসতে পারে!" খোকাকে তুলিয়া লইতে যাইতেই মলয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কে?"

অঞ্জলি বলিল, "আমি দিদি।"

মলয়া বলিল, "কে, অঞ্জলি? ও!"

কিসের যেন বাধা। কেহই কোন কথা কহিতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি মলয়াকে বলিল, "তুমি অমন ক'রো না দিদি, ওতে আমার ভারী কষ্ট হবে। খোকার ওতে সবচেয়ে বেশী অমঙ্গল হবে। তোমার হাসিমুখ ওর মাথায় আজ দেবতার বরকে ডেকে নিয়ে আসবে।"

মলয়া হাসিয়া বলিল, "না গো রাণী, আমার কোন কষ্ট নেই। আমার খোকনধনের ভাত, আমি হাসব না, হাসবে কে?"

সে জানিত বৃদ্ধি এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে।

অঞ্জলিকে একা পাইয়া গৌরীপিসি ও নিতাইয়ের দিদিমা বলিল, "হ্যাঁ গো ছোটবউ, নিজের ভাল ত পাগলেও বোঝে, আর তুমি কি করছ! শুভকর্ম্মে কল্যাণ-অকল্যাণ ব'লে একটা কথা আছেই। যে দেখলে না জন্মে ছেলের মুখ, তাকে দিয়ে কি কোন শুভ কাজ হয়, না করাতে আছে? তাতে যে খোকার অমঙ্গল হবে।"

অঞ্জলি রাগিয়া বলিল, "হবে হবে, তাতে কার কি। সবাই মিলে কি আমায় পাগল করবেন নাকি।"

বলিয়া আর কোন কথা বলিবার বা শুনিবার অবকাশ না দিয়া সে চলিয়া গেল।

কিন্তু সারারাত্রি তাহার মনে এই মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব চলিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার কোমল মাতৃহৃদয়ে নবজাত শিশুর কল্যাণের শঙ্কার একটা ছায়াপাতও হইল। সে তাহার অস্তিত্ব টের পাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না।

মেয়েরা জল সইতে যায়। জলে ক্রিয়াকর্ম্ম সবই সুখদাসুন্দরীই করিতে লাগিলেন। তিনিই বড়। এদিক ওদিক চাহিয়া কোন্ ফাঁকে একটু দূরে গিয়া মলয়া বুকের মধ্য হইতে একটা কাঠের কৌটা বাহির করিয়া জলে ডুবাইয়া দিল। ভিতরের ভারে সেটা ডুবিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া পায়রাটাকে বাহির করিয়া দিবার জন্য সে খাঁচার দুয়ারটা খুলিয়া দিল। কিন্তু সেটা বাহির হইতে চাহে না। অঞ্জলি দেখিয়া বলিল, "ওকি দিদি, ওকে তাড়াচ্ছ?"

হাসিয়া মলয়া বলিল, "আজ খোকনমণির ভাতের দিন। এ জীবটাকে বেঁধে কষ্ট দিই কেন শুধু শুধু। যাক্, আমার খোকার আপদবালাই নিয়ে ও উড়ে যাক।" সেটাকে সে উড়াইয়া দিয়া শূন্য খাঁচাটা ঝুলাইয়া রাখিল।

হোম শেষ হইয়া গেল, আশীর্ব্বাদ করিবার সময় আসিল। সবার আগে ডাক আসে মলয়ার মনে,—খোকনকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে। দুই দিন ধরিয়া যে ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয় চঞ্চল হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের প্রসাদে সে-সবই শান্ত হইয়া গেল। তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্ন আসিয়াছে, খোকনমণির আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদে বাধা নাই, আশীর্ব্বাদে অমঙ্গল নাই,—হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদের গোত্র নাই।

নানা সাজসজ্জায় ভূষিতা পুরনারীর দল আসিয়া নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে দাঁড়াইয়াছে। হাসি-রঙ্গ, তামাশা, আনন্দ-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র, সকলের মন ভরিয়া আছে। তারই মাঝে জ্যেঠার কোলে চড়িয়া সুসজ্জিত কুমার। পরনে হলুদ রঙের চেলির জোড়, বেনারসীর জামার উপরে সুন্দর উত্তরীয়, গলায় স্বর্ণহার, মাথার চুলের গোছায় বিনাইয়া গাঁথা মুক্তার ঝালর,—কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা,—পরিশ্রমে মুখ-চোখ লাল, অথচ ভিতরের আনন্দে বিস্ফারিত নয়নে কুতূহলী জনতার পানে চাহিয়া আছে। মলয়ার নিকটে সে-বেশের তুলনা নাই। নয়ন ভরিয়া সে দেখিতেছে। খোকার দৃষ্টি পড়িল মলয়ার দিকে, অমনি জ্যেঠার কোল হইতে নামিয়া আসার জন্য সে কি প্রয়াস! হাত বাড়াইয়া অস্ফুট কাকলী করে। মধুর আনন্দে মলয়া

ধানদূর্ব্বা লইয়া অগ্রসর হইল। তখন তাহার মনে আর কোন জড়তা, কোন বিষাদ নাই।

সুখদাসুন্দরী ইহারই মধ্যে দুই-তিন বার অঞ্জলির পানে কঠোর নয়নে চাহিলেন। অঞ্জলি চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কিন্তু মলয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মায়ের মন দুড়দুড় করিয়া উঠিল। অজানিতে সে আবার সুখদাসুন্দরীর পানে চাহিল। সুখদাসুন্দরীর চক্ষে তখন অগ্নির তেজ। মন্ত্রচালিতের ন্যায় অঞ্জলি মলয়ার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, চকিতে মলয়ার ধানদূর্ব্বা-সমেত হাতখানি ধরিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "তোমায় নাকি প্রথম আশীর্ব্বাদ করতে নেই। আগে আর সবার হোক।"

শ্রীশ স্ত্রীর দিকে চাহিয়াই ছিলেন। মলয়া তাড়াতাড়ি হাতের ধানদূর্ব্বাগুলি থালার উপর ফেলিয়াই চাহিয়া দেখিল স্বামীর উদাসীন দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ। ক্ষিপ্র গতিতে সে উপরে চলিয়া আসিল।

উপরে তখন কেহ নাই, উৎসবমুখর অট্টালিকার সব কয়টি প্রাণী তখন নবকুমারের আশীর্ব্বাদ-লগ্নকে কেন্দ্র করিয়া আছে। শূন্য খাঁচাটা দুলিতেছে, কলরব ভাসিয়া আসিতেছে।

আজ মলয়ার বুকটা যেন বড় বেশী খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে গিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া সে শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "ভগবান, সন্তান না দিয়ে আমায় এমন ক'রে রেখেছ যে যেখানেই যাই সেখানেই একটা অমঙ্গলের হাওয়া সৃষ্টি করি। আমার নিশ্বাস লোকের বিষ,—আমার দৃষ্টি অমঙ্গলকে টেনে আনে। ভিখারী ক'রেই যদি পাঠালে, হৃদয়ে এত লোভ দিলে কেন?" সন্তান নাই বলিয়া আজ মলয়ার যত বড় ব্যথা বাজিল, তত বড় ব্যথা জীবনে সে আর কোন দিন পায় নাই। সে খোকার মাথায় দিবার ছোট বালিশটা প্রাণপণে বুকে চাপিয়া পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নে সেই একা ঘরে পড়িয়া রহিল।

আর নীচের তলা হইতে আনন্দোৎসবের বিচিত্র কাকলী, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটাছুটির কলরব, মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল।

মলয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

নানা কথা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

১

বাঙালীদের মধ্যে আজকাল কেহ কেহ নিজের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতেছেন না। ইহা উচিত কি নয়, বা ইহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে যুক্তি কী, একথা এখানে আলোচ্য নহে। আমার কথা হইতেছে যাঁহারা নামের পূর্বে নিজে শ্রী লেখেন না তাঁহাদের যুক্তি বুঝিতে পারি, শ্রী শব্দের অর্থ বিচার করিলে জানা যায় তাহা শোভন হয় না। নিজে নিজের নামের সঙ্গে কেহ বাবু শব্দ লেখে না। কিন্তু অন্য ব্যক্তি অন্যের নামের পূর্বে শ্রী লিখিবেন না কেন? ইহা না করাই অশোভন। ইহা এ দেশের শিষ্টাচার। দেশান্তরেও এরূপ আছে। নামের পূর্বে একটা উপপদ দিতে হয়।

শ্রীবর্জনকারীদের মধ্যে পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অন্যতম। তাঁহার সঙ্গে আমার একাধিক বার আলোচনা হইয়াছে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, অন্যে যদি তাঁহার নামে শ্রী লেখেন তো তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তির কারণ নাই, থাকিতেও পারে না, উহা করাই উচিত। কিন্তু দেখিতে পাই

অনেক লেখক ইহা করেন না। পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরাও ইহা করেন না।

২

আজকাল অনেকের, বিশেষত তরুণদের মধ্যে নামকে যত দূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিবার একটা ঝোঁক খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত হইবেন যো গি ন গুপ্ত, স ত্যে ন্দ্র না থ মি ত্র হইবেন স ত্যে ন মি ত্র। নিজেদের মধ্যে ঘরে আঠপৌরে ভাবে এ বেশ চলিতে পারে, চলুক, চলিবেই; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে সভা-সমিতিতে, সাহিত্যে, খবরের কাগজে ইহা নিতান্ত অশোভন ও অশিষ্ট প্রয়োগ মনে হয়।

ইহার প্রবর্তক হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নিজের নাম লিখিতে আরম্ভ করেন চা রু ব ন্দ্যো। ইঁহার সহিত আমার বহুবার আলোচনা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিতাম তাঁহার বাপ-মা তাঁহার নাম করিয়াছিলেন শ্রী চা রু চ ন্দ্র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়। সাহিত্যে তিনি তাহা ঐরূপ কাট-ছাঁট করিতে পারেন না।

ইংরাজী safety শব্দটার প্রতিশব্দ আ ন ন্দ বা জা র প ত্রি কা য় লেখা হয় নি রা প ত্তা, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এই সংস্কৃত শব্দটি আজীবন সংস্কৃত পাঠকেরও কানে বড় লাগে। ইহার পরিবর্তে নি র্বি ঘ্ন তা অথবা অ বি প ন্ন তা লেখা কি চলে না?

৪

বিনা বিচারে যাহাদিগকে সরকার বাহাদুর আটক করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদিগকে আমরা নাম দিয়াছি অ ন্ত রী ণ। ইহা কু ন্ত লী ন, জা র্ম লী ন, ইত্যাদির মত। এ স্থলে অনায়াসে আমরা অ ন্ত রি ত বলিতে পারি। এ কথাটা আরও আগে লিখিলে ভাল হইত।

৫

Compulsory education কি না বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বা ধ্য তা মূ ল ক হইতেছে "যথা বাধতি বাধতে"। ইহার বিরুদ্ধে বাধা দিতে গিয়া গুরুদেব যাহা লিখিয়াছেন তাহাই চরম। অনেক দিন হইতে এ আলোচনা চলিতেছে। আলস্যে আমার কথাটা বলা হয় নাই। আজ বলিয়া ফেলি। যাহা নিজের বশে অর্থাৎ ইচ্ছায় তাহা ব শ্য (√ব শ্‌, ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করা। ইহা হইতেই উ র্ব শী; উরু অর্থাৎ বেশী ব শ অর্থাৎ ইচ্ছা, কাম যাহার সে উ রু ব শী, উ র্ব শী)। অপর কথায় যাহা নিজের অধীন তাহা ব শ্য। যাহা ব শ্য নহে তাহা অ ব শ্য। অনেক সময়ে ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষণরূপেও করা হয়। অ ব শ্য আর আ ব শ্য ক একই, কেবল আকার বা প্রত্যয়ের ভেদ। Compulsory অর্থে এই দুইটি শব্দই প্রয়োগ করা চলিত, কিন্তু ইহা আমাদের বাঙ্‌লায় অন্য অর্থে চলিয়া গিয়াছে, তাই আমার মনে হয় অ ব শ্য ক লিখিলে আমাদের চলিতে পারে। কথাটার অর্থ সহজে ধরা যায়। কেহ কেহ লেখেন আ ব শ্যি ক। অ ব শ্য বা আ ব শ্য ক হইতে আবার আ ব শ্যি ক দুর্ঘট।

৬

দেখিতে পাই অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক 'ভোর' অর্থে লেখেন ঊ ষা (দীর্ঘ উকার)। কিন্তু বস্তুত ইহা হইবে উ ষা (হ্রস্ব উকার)। ইহা হইয়াছে প্রকাশার্থক √ব স্‌ ধাতু হইতে (√ব স্‌- অস্‌ হইতে উ ষ স্‌, বকার স্থানে উকার সম্প্রসারণ)। 'ভোর' বুঝাইতে সংস্কৃতে সর্বত্র উ ষ স্‌ শব্দই পাওয়া যায়। তবে ঊষা শব্দও আছে। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'ভোর' হইতে পারে, কিন্তু কোন প্রমাণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম ছিল ঊষা। ইহার প্রথম প্রয়োগটি দেখিয়া মনে হয় কেবল ছন্দের জন্য উকারটিকে ঊকার করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃতে চলে না, পণ্ডিতেরা ইহা জানেন।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

১৩

পঞ্চাননের সামনাসামনি বসিয়া থাকিতে মৃণালের অসোয়াস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু কিই বা করা যায়? এইটুকু পথ এই উৎপাত সহ্যই করিতে হইবে।

পঞ্চানন সারাপথ বক্‌বক্‌ করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রৌঢ় স্বগ্রামবাসী বীরেনবাবুকে পাইয়াই যে তাহার এত দিল্‌ খুলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, মৃণালকে কথাগুলি শোনানোই যে তাহার আসল উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে মৃণালের বাকী নাই।

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, "এই আপনার প্রথম এখানে পদার্পণ নাকি, বীরেন-কাকা?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "না বাবা, আরও বার-দুই এসেছি বই কি। তবে তোমাদের যা আজব সহর, যখনই দেখি মনে হয় নূতন।"

পঞ্চানন বলিল, "তা বটে, দেখলে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। এই-সব মোহে পড়েই না সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে জোটে? এসে তার পর মরে আর কি? এ ত আমাদের দেশের জিনিষ নয়, একেবারে পশ্চিমের আমদানী ব্যাপার। এখানে ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে চলতে পারে ক'টা মানুষ?"

বীরেনবাবু ভালমানুষ, তিনি বলিলেন, "সে ত ঠিক কথাই। এখানে সারাক্ষণ ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মেশামেশি, খাবার জিনিষে সব ভেজাল।"

পঞ্চানন বলিল, "আহা, ওগুলো ত হ'ল ছোট কথা। খাবারদাবারে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলা সহজেই যায়, কিন্তু আদত মানুষের মনটাই যে যায় কলুষিত হয়ে। তাদের ভাবনাচিন্তা সব বিলাতী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। আমাদের দেশের আদর্শ দেখতে দেখতে তাদের মন থেকে মুছে যায়।"

মৃণাল ভাবিল, 'আচ্ছা এক গোভূতের পাল্লায় পড়া গেছে। এখন শিক্ষিতা মেয়েদের সমালোচনাটা জুড়লেই বাঁচি।'

পঞ্চাননের সেই ইচ্ছাটাই বোধ হয় ছিল। তাহার মনে নারীত্বের কি উজ্জ্বল আদর্শ যে বিরাজ করিতেছে তাহা মৃণালকে জানাইয়া দেওয়া দরকার। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই মেয়েই তাহার গৃহলক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিবে।

কিন্তু বীরেনবাবু তখন পঞ্চাননের বক্তৃতা শুনিতে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি সারাপথ যাহা দেখেন তাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পঞ্চাননকে বারবার বাধা দিতে লাগিলেন, কাজেই তাহার বক্তৃতা বিশেষ জমিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীও মৃণালের বোর্ডিঙে আসিয়া দাঁড়াইল।

জিনিষপত্র সমেত তাহাকে নামাইয়া দিয়া বীরেনবাবু বলিলেন, "আমরা এখন ট্রামে ফিরতে পারি না? আবার হোটেল অবধি গাড়ী ক'রে গেলে অনেক ভাড়া লাগবে।"

পঞ্চানন বলিল, "তা বাসে যেতে পারি। ট্রামে ত আবার জিনিষ নিতে দেবে না। কিন্তু বাসে ত মুচি-মুদ্দফরাস সবাই উঠছে, কাউকে না বলবার জো নেই, ঘিটা সঙ্গে রয়েছে কিনা? তার চেয়ে চলুন একখানা রিক্‌শ ভাড়া করা যাক, ওতে বেশী খরচ পড়বে না।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "যা ভাল বোঝ তাই কর, বাবা।"

দুইজনে রিক্‌শ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। বীরেনবাবুকে তাঁহার হোটেলে নামাইয়া দিয়া পঞ্চানন এক মুটের মাথায় নিজের জিনিষপত্র চাপাইয়া, ঘিয়ের হাঁড়িটা হাতে করিয়া নিজের মেসের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বিমল এতক্ষণ বৃদ্ধাকে আগলাইয়া বসিয়াছিল। বীরেনবাবু ফিরিয়া আসাতে সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বৃদ্ধা এতক্ষণ বসিয়া তাহার সঙ্গে অনর্গল কথা বলিয়াছেন এবং গোটা তিন আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিমল বলিল, "এখন তবে আসি।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "আসি বললে চলবে না বাপু, খোঁজখবর রাখতে হবে। তোমাদের ভরসাতেই আসা। মায়ের গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দেখানো এ সব ক'রে দিতে হবে।"

বিমল বলিল, "আমার আবার পরীক্ষার বছর। আচ্ছা দেখি, কাল আসব একবার। পঞ্চুমামা আসবে না?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "পঞ্চা? ওকে দিয়ে কখনও কারও উপকার. হবে না। তুমি দাদা দয়া ক'রে আমার গঙ্গা-চানটি করিয়ে দাও। নয়ত আমার বোনঝির শ্বশুর-বাড়ী এখানে, তাদের বাসাটি যদি খুঁজে দাও তাহলে সেখানেই যাই। এ হোটেলে-মোটেলে আমাদের পোষায় না। কে যাচ্ছে কে আসছে তার ঠিক নেই।"

বিমল বলিল, "ঠিকানা বললে এখনই বাসা খুঁজে দিতে পারি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ঠিকানা ত জানি না, দাদা। তবে জামাইয়ের নাম কিশোরীমোহন রায়, খুব বড় সরকারী কাজ করে, তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে টেরাম যায়।"

বিমল ভাবিল, হইয়াছে আর কি? এ যে গ্রামোফোনের সেই রেকর্ডের অবস্থা! যাহা হউক, বলিল, "আচ্ছা, খুঁজে দেখব। আমি আসি তবে। ম্যানেজারকে ব'লে গেলাম, ভাল ক'রে আপনাদের দেখাশোনা করবে।"

বিমল বাহির হইয়া নিজের মেসের দিকে চলিল। বীরেনবাবুর মায়ের পাল্লায় পড়িয়া অনেক রাত হইয়া গেল। অবশ্য, তাঁহার সাদাসিধা গ্রাম্য কথাবার্ত্তা বিমলের খুব যে খারাপ লাগিতেছিল তাহা নয়। কলিকাতাবাসীদের অতিআধুনিক কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে তাহার কাছে বড় নিরস ও বিস্বাদ লাগিত, মধ্যে মধ্যে নিজের ছোট গ্রামখানির জন্য মন কেমন করিত। বীরেনবাবু তাহাকে যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন তাহাতে বিমলকে রোজই অন্ততঃ একবার তাঁহাদের খোঁজ করিতে যাইতে হইবে। কিশোরীমোহন রায়ের বাড়ীটা বাহির করিতে পারিলে মন্দ হইত না। ঐ হোটেলে বসিয়া বৃদ্ধার মনে ত এক তিলও শান্তি থাকিবে না। গঙ্গাস্নানের পুণ্যও বুঝি বা মাঠে মারা যায়। পঞ্চুমামা হয়ত উক্ত ভদ্রলোকের ঠিকানা জানিলেও জানিতে পারে। কাল সকালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে স্থির করিয়া বিমল নিজের মেসে ঢুকিয়া পড়িল।

বিমল সত্যই পঞ্চাননের ভাগ্নে হয়, যদিও সম্পর্কটা খুব নিকট নয়। তবে দুইজনেরই জন্মভূমি গ্রাম দুটি কাছাকাছি, এবং সম্প্রতি দু-জনেই কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেছে বলিয়া দেখাশোনা সর্ব্বদাই হয়। বিমল বাল্যে পিতৃহীন, মা এখনও বাঁচিয়া আছেন। তিনি গ্রামের বাড়ীতেই থাকেন। জমিজমা অতি সামান্য আছে, তাহাতে কায়ক্লেশে তাঁহার একটা মানুষের পেট চলে। বিমলকে নিজের খরচ বেশীর ভাগ ট্যুশনি করিয়া চালাইতে হয়, এক কাকা গোটা-দশ টাকা সাহায্য করেন

সে সামনের বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাস যদি করে তাহা হইলে যে কি করিবে, তাহা এখনও স্থির করে নাই। স্কলারশিপ পাইলে আবার পড়িতে পারে, কিন্তু তাহা পাওয়া না-পাওয়ার কোনও স্থিরতা নাই। হয়ত চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু চাকরির বাজারের অবস্থা দেখিয়া কোনও ভরসা হয় না। যাহা হউক, পাঁচ-ছয় মাস পরে এ-ভাবনা ভাবিলে চলিবে, সম্প্রতি পাস করার ভাবনাটাই ভাবা দরকার।

পঞ্চানন বয়সে তাহার চেয়ে এক বৎসরের বড়, কিন্তু পড়ে অনেক নীচে। তাহার কারণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত সে নবদ্বীপের টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হওয়ার চেষ্টায় ছিল। তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও খুব সচ্ছল, চাকরি কখনও করিবে না ইহাই স্থির ছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্রও আস্থা নাই, সুতরাং সে-সব দিকে

যাইবার সে কখনও চেষ্টা করে নাই। হঠাৎ একটা মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া তাহাদের সবচেয়ে ভাল ও বড় তালুকখানি বেহাত হইয়া গেল। অগত্যা তখন তাহাকে অর্থকরী বিদ্যার দিকে মন দিতে হইল। বয়স তাহার প্রায় চব্বিশ, এবার সে আই-এ দিবে। ইতিমধ্যেই ভাল পণ সহযোগে বিবাহ করিয়া নষ্ট তালুক ফিরাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। হাজার-খানিক টাকা হইলেই হয়। দুঃখের বিষয় যে পল্লীগ্রামে এমন শাঁসাল শ্বশুর পাওয়া খুবই শক্ত। নগদ টাকা কাহারও বেশী থাকে না। আর পাড়াগাঁ ভিন্ন শহরে পঞ্চাননের মহিমা বুঝিবে কে যে কন্যাদান করিবে? সে নিজেও অবশ্য কলিকাতার মেয়ে বিবাহ করার বিন্দুমাত্রও পক্ষপাতী নয়।

বিমল যে-মেসে থাকে তাহাতে খরচ খুবই কম। পঞ্চাননকেও সে সেই মেসে থাকিতে বলিয়াছিল, কিন্তু জাত যাইবার ভয়ে সে এখানে থাকে নাই। নিজে সে বাসা করিয়া থাকে, স্বপাকে রাঁধিয়া খায়। চেনাশোনা এক ভদ্রলোকের বাড়ীর চিলা কোঠার একটি ঘর ভাড়া করিয়া সে সংসার পাতিয়াছে। তাহারই পাশে টিন দিয়া ঘিরিয়া তাহার রান্নাঘর। ছাদের উপরেই বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কটা থাকাতে পঞ্চাননের খুব সুবিধা হইয়াছে। অনেকে তাহাকে ভয় দেখায় বটে, কিন্তু ভয় সে পায় না।

বিমল ক্লান্ত হইয়াই পড়িয়াছিল। সুটকেশটা খাটের তলায় ঠেলিয়া দিয়া, বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া সে সোজাসুজি ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার রুমমেট দুইজন আসিয়া প্রচুর চেঁচামেচি করিয়া তাহার ঘুম না ভাঙাইয়া দিলে রাতটা তাহার অনাহারেই কাটিয়া যাইত।

সকালে উঠিয়া চা খাইয়া সে ভাবিতে লাগিল একবার বাহির হইবে না পড়িতে বসিবে। অবশেষে বাহিরই হইল। সোজা পঞ্চাননের বাড়ী গিয়া অনেক ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল, বলিল, "এই বুঝি আর্য্য-পুঙ্গবের আচার রক্ষা? তোমাদের না ভোর তিনটেয় ওঠা নিয়ম?"

পঞ্চানন হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "তাই উঠি ত সচরাচর, কাল ক্লান্ত হয়ে পড়ায় বেশী ঘুমিয়েছি। তা বোস্, আমার এখানে চা-টা নেই কিন্তু।"

বিমল বলিল, "ভাবনা নেই, চা খেয়ে এসেছি। তুমি কি খাবে, গঙ্গাজল?"

পঞ্চানন খড়ম পায়ে দিতে দিতে বলিল, "না, দুধ খাই সকালে।"

বিমল বলিল, "সাধে কি আর এই বয়সে এমন বিশাল ভুঁড়ি? মামী এসে চ'টে যাবে কিন্তু। আজকালকার মেয়েরা অমন নধর দেহ পছন্দ করে না।"

পঞ্চানন গরম হইয়া উঠিল। বলিল, "মামী যিনি আসবেন, তিনি বেশী আধুনিকা না হন তা আমি দে'খে নেব।"

বিমল বলিল, "কই আর দেখছ? ভাবী মামী যিনি হবেন, তা ত এক রকম আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামে থাকতে মায়ের কাছে শুনেছিলাম, কাল ত চোখেই দেখলাম। তিনি বেশ পুরোমাত্রায় আধুনিকা হবেন, তোমার ভাবনা নেই এবং প্রথম নম্বরেই তোমার ভুঁড়ি এবং টিকি সংশোধন ক'রে দেবেন।"

পঞ্চানন বলিল, "যা যাঃ, ঝড়ের আগে কুটি নাচে। কোথায় কি তার ঠিক নেই। এখনও কিছু আসলেই ঠিক হয় নি।" কিন্তু বিমলের কথায় খুব যে সে রাগিয়াছে তাহা মনে হইল না। মোটের উপর মৃণালের সহিত তাহার বিবাহ হইবে ভাবিতে তাহার ভালই লাগে।

বিমল বলিল, "কি আসলে ঠিক হয় নি? কত টাকা মারবে তাই না? ও সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। মেয়ে পছন্দ করেছ ত?"

পঞ্চাননের শাস্ত্র অনুযায়ী নিজে মেয়ে পছন্দ করা অন্যায়, কাজেই সে বলিল, "জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা ওঁরা পছন্দই করেছেন।"

বিমল বলিল, "তাই নাকি? তোমার নিজের কেমন লাগল?"

পঞ্চানন বলিল, "অত খবরে তোর কাজ কি? আমি যাকে বিয়ে করব সে হবে তোর গুরুজন, তার সম্বন্ধে অত ছ্যাবলামি ভাল না।"

বিমল বলিল, "ঢের হয়েছে, থাম ত বৎস। যেমন

গুরুজন তুমি, তোমার স্ত্রী হবে তেমন। যাই হোক, আমি নেমন্তন্ন খেতে পেলেই খুশী। আচ্ছা কিশোরীমোহন রায়ের বাড়ী কোথায় বলতে পার? বীরেনবাবুর মাসতুতো ভগ্নীপতি। বৃদ্ধা ভার দিয়েছেন আমায় তাঁর বাড়ী খুঁজে দিতে।"

পঞ্চানন বলিল, "ঠিক বলতে পারি না, তবে সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকেন তিনি। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়টার কাছাকাছি।"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, খুঁজে নেব। তবে তুমি এখন দুধ খাও, আমি উঠি।"

পঞ্চাননের বাড়ী হইয়া সে চলিল সুকিয়া ষ্ট্রীটের দিকে। একেবারে জামাইয়ের খোঁজখবর সহ উপস্থিত হইতে পারিলে বৃদ্ধা খুশী হইবেন। তাঁহাদের স্কন্ধে একবার মাতাপুত্রকে তুলিয়া দিতে পারিলে বিমলও দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। পঞ্চুমামা যে পরোপকার করিতে এক পাও বাড়াইবে, এমন ত কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া তবে সে ভদ্রলোকের বাড়ী আবিষ্কার করিল। আগমনের কারণ শুনিয়া কর্ত্তা তাহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন। এধার-ওধার তাকাইয়া পরিবারটিকে বিমলের সম্পন্নই বোধ হইল। মাসীমাকে পুত্র সহ দিন-কয়েক স্থান দিতে ইঁহারা কাতর হইবেন না বোধ হয়। অবশ্য যদি সেরকম ইচ্ছা থাকে।

মাসীমার আগমন-সংবাদে অন্দরমহলে একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে বুঝা গেল। দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে আসিয়া তাহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেল। তাহাকে চা খাইতেও একবার অনুরোধ করা হইল, সে সেটা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে কর্ত্তা ভিতর বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন যে গৃহিণী গাড়ী করিয়া এখনই গিয়া মাসীমাকে লইয়া আসিতে চান। বিমল যদি অনুগ্রহ করিয়া কর্ণধারের কাজটা সারিয়া দেন ত ভাল, কারণ তাঁহার আবার আপিসের বেলা হইয়া যাইবে।

বিমলের আপত্তি ছিল না। তবে আরও মিনিট কুড়ি তাহাকে বসিতে হইল। এর কমে বাংলা দেশের স্ত্রীলোক বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন না। গৃহিণী তবু মধ্যবয়স্কা, তাঁহার সঙ্গে ছোট দুটি মেয়ে চলিল, তাহাদের চুলের ফিতা বাঁধা ও মুখে পাউডার মাখার ঘটাতেই দেরিটা বেশী করিয়া হইল।

অবশেষে সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় না থাকাতে বিমল আর গাড়ীর ভিতরে বসিল না, উপরে কোচম্যানের পাশেই বসিল।

হোটেলে পৌঁছিতে বেশী দেরি হইল না। বৃদ্ধা ত বোনঝিকে দেখিয়া বর্ত্তাইয়া গেলেন। পুণ্য করিতে আসিয়া এমন অদ্ভুত জায়গায় উঠিয়া তাঁহার আর অস্বস্তির সীমা ছিল না। বিশেষ করিয়া এখানকার ঝি, চাকর, ঠাকুর প্রভৃতিকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন। ইহারা যে সকলেই মুচি বা মুদ্দফরাস, জাত ভাঁড়াইয়া কাজ করিতেছে, এই মহাভয় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

বোনঝির চিবুকে হাত দিয়া বারবার হস্তচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যিস্ এলি মা, বাঁচলাম। এখানে জলটুকু খেতে সুদ্ধ ভরসা হচ্ছিল না।"

তাঁহার বোনঝি বলিলেন, "মাসীমা, গুছিয়ে নাও, এখনি বেরিয়ে পড়ি। ওঁর অফিসের গাড়ী, বেশীক্ষণ ত বসতে পারব না?"

গুছাইবার জিনিষ বড় বেশী কিছু ছিল না, ঘটিবাটি আর খান-কয়েক কাপড়। তাহাই পুঁটলি বাঁধিয়া হোটেলের বিল চুকাইয়া দিয়া, তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। বিমল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়া বলিল, "আমি তাহ'লে আসি এখন?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "একেবারে পালালে চলবে না, বাবা। দেখা করতে হবে রোজ। আমি এখানকার কিছু জানি না, চিনি না।"

বিমল বলিল, "নিশ্চয়, দেখা করব বই কি?"

বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঠিকানাটা কি, বাবা?"

বিমল ঠিকানা বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। তাহার ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে। পড়াশুনা তাহার ভাল হইতেছে না, স্কলারশিপের আশা রাখিলে আরও ভাল করিয়া পড়া উচিত। কিন্তু নানা দিকের নানা ঝঞ্ঝাট আসিয়া জুটে, সে কিছুই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।

সমস্ত সকালটা ত তাহার কাটিয়া গেল পরোপকার করিতে। এক মাসের মধ্যে তাহার টেষ্ট পরীক্ষা। কলেজেও হাজিরা দিতে হয়, না হইলে তাহার পার্সেণ্টেজ থাকে না।

স্নানাহার করিয়া কলেজ-যাত্রী ট্রামে সে উঠিয়া বসিল। বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টার নানা ছবি বার বার তাহার মনে উঁকি দিয়া যাইতে লাগিল।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া চা খাইয়া সে পড়িতে বসিল। কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ পড়া তাহার অদৃষ্টে ছিল না। বিকাল একটু গড়াইতে-না-গড়াইতে আবার ডাক আসিয়া পৌছিল। বৃদ্ধা পরশু ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন, আজ হইতে যোগাড় না করিলে কি করিয়া হইবে? সব ভার বোনঝির উপর ছাড়িয়া দিলে সে কি মনে করিবে? তাঁহাদেরও যথাসাধ্য করা উচিত।

বিমল প্রথমে একটু বিরক্ত হইল। এই রকম কাজে-অকাজে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাহার পড়াশুনা হইবে কি প্রকারে? তাহার পর আবার কি মনে করিয়া চিঠি লিখিয়া জানাইল যে সে রাত্রে গিয়া দেখা করিবে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং বাড়ীর গোটাবারো-তেরো লোক খাওয়াইবার জন্য একদিনের আয়োজনই যথেষ্ট, তাহার বেশী সময়ের দরকার নাই।

১৪

বীরেনবাবুর মা বোনঝির বাড়ী আসিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁহার মনে পুরাপুরি স্বস্তি আসিল না। শহরে বাস করিয়া ইহারাও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে। বোনঝি সুরবালা ততটা কিছু বদলাইয়া যান নাই, কিন্তু জামাই, ছেলেমেয়ে সবাই যেন একটু কেমন কেমন। সকালে টেবিলে বসিয়া সবাই চা খায়। রান্নাঘরে পৈতাপরা ঠাকুর আছে বটে, কিন্তু যে চাকরটা গরম জল প্রভৃতি লইয়া আসে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়। টেবিলও ত অশুদ্ধ, শুধু জল দিয়া মুছিলেই কি আর পরিষ্কার হয়? ছোট মেয়ে দুইটা ত সারাদিন জুতা পায়ে দিয়া হট্ হট্ করিয়া বেড়ায়, গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়, আর হি হি করিয়া হাসে। মোটের উপর বৃদ্ধার এ পরিবারটাকে বিশেষ পছন্দ হইল না। তবে যাহা করিতে আসিয়াছেন তাহা ত করিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার পর বিমল আসিতেই তিনি তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন। কাল বাজার করিয়া দিতে হইবে এবং মৃণালকে আনিয়া দিতে হইবে। মৃণালের সাহায্য পাইলে রান্না তিনিই সব করিতে পারিবেন, ক'জনই বা মানুষের ব্যাপার? ইহার জন্য আবার ঠাকুর কেন? দেশে কত বড় বড় ব্যাপারে তাঁহারা দুই জায়ে রাঁধিয়া দিয়াছেন তাহ অনেকগুলি ইতিহাস তিনি বিমলকে শুনাইয়া দিলেন। সুরবালাও কিছু সাহায্য অবশ্যই করিবেন, তবে তাঁহার শরীর ভাল নয়, তাই মাসীমা তাঁহার উপর বেশী চাপ দিতে চান না। পরিবেষণের ভার যদি পঞ্চানন আর বিমল নেয় তাহা হইলে ব্যাপারটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়।

বিমলের এমন ভাবে দুইটা দিন আগাগোড়া মাটি করার অবস্থা নয়, অথচ ইঁহাকে তাহা বুঝানোও ত যায় না? পরীক্ষা যে কি পদার্থ, তাহার জন্য কতখানি আদাজল খাইয়া পরিশ্রম করিতে হয়, কিছুই ত ইঁহার জানা নাই? সে অসম্মতি জানাইলে তিনি ধরিয়া লইবেন যে কাজ করিতেই ছেলেটার আপত্তি। অগত্যা তাহাকে রাজী হইতেই হইল।

বীরেনবাবু বলিলেন, "অমনি যাবার মুখে আমাদের পঞ্চুকেও খবর দিয়ে যেও, সেও যেন কাল একবার আসে।"

বিমল মুখে বলিল, "আচ্ছা।" মনে মনে বলিল, "সে ত অমনি এল ব'লে। তোমাদের জন্যে ত তার ঘুম হচ্ছে না। তবে বোর্ডিঙের দূতের কাজটা তাকে দিলে এলেও আসতে পারে।"

ফিরিবার পথে সে পঞ্চাননকে ডাক দিয়া গেল, কিন্তু তাহার দেখা পাইল না। অগত্যা একটা চিঠি রাখিয়া দিয়া গেল যে সে যেন কাল গিয়া বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কি প্রয়োজন সেটার আর কিছু উল্লেখ করিল না।

পরদিন সকালে চা খাইয়া সে সোজাসুজি সুকিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। বীরেনবাবু বাহির হইয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "পঞ্চুমামা আসে নি?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "কই, এখন অবধি ত এসে পৌঁছায় নি।"

বিমল বলিল, "আসবে এখন খানিকক্ষণের মধ্যেই সকালে তার নানা হাঙ্গাম, পুজোপালি ঢের করতে হয়, সব শেষ না ক'রে ত বেরতে পারে না? তা বাজারটা কি এখনই ক'রে দেব, না বিকেলে হ'লে চলবে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "দেখি মাকে জিগগেষ ক'রে তিনি কি বলেন।"

তাঁহার মা বলিলেন, "বাজার বিকেলের মধ্যেই হ'লে চলবে, আমরা রাত্রে তরকারিগুলো কুটে রাখব এখন। তবে মিনুকে এখন নিয়ে এলে হয়, চাল, ডাল, মশলা সব বাছতে হবে আরও কাজ আছে, খানিক ক'রে রাখত, আমিও একটা কথা কইবার লোক পেতাম।"

বিমল বলিল, "তাহ'লে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি একলা গেলে ত হবে না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তা চল। এখান থেকে গাড়ী ক'রে যাব? খরচের ত আর শেষ নেই?"

বিমল বলিল, "এখান থেকে ট্রামেই যাই। ওখানে গিয়ে গাড়ীও করা যেতে পারে, আর উনি যদি ট্রামে আসতে আপত্তি না করেন, তাহ'লে ট্রামেই ফেরা যেতে পারে।"

বীরেনবাবুর মা বলিলেন, "কাপড়চোপড় নিয়ে আসে যেন, ছদিন থাকতে হবে ত?"

বিমল আর বীরেনবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। বোর্ডিঙে পৌঁছিয়া শুনা গেল আজ দেখা করিবার দিন নয়, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি ছাড়া দেখা করা যাইবে না।

বীরেনবাবু হতাশ হইয়া বলিলেন, "তাহলে কি করা যাবে, বাবা?"

বিমল বলিল, "একখানা চিঠি লিখুন না লেডী প্রিন্সিপ্যালের নামে। লিখুন যে বিশেষ প্রয়োজনে আমরা দেখা করতে এসেছি।"

শিক্ষিতা এম্‌-এ পাস মহিলাকে চিঠি লেখা বীরেন-বাবুর চৌদ্দ পুরুষে অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন, "তুমি লিখে দাও, বাবা। আমি না-হয় নামটা সই ক'রে দিচ্ছি। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কি লিখতে কি লিখব।"

অগত্যা বিমলই চিঠি লিখিয়া দরোয়ানের হাতে ভিতরে পাঠাইয়া দিল।

মৃণাল তখন সবে স্নান সারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ছোট একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, "তোমার ডাক পড়েছে মিনু-দি, বিভাদির ঘরে।"

এখন যে কি কারণে তাহার ডাক পড়িতে পারে তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃণাল বিভাদির ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী স্লেটখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া মৃণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁদের তুমি চেন?"

মৃণাল বিমলের নাম দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। বিমল কি কারণে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়? মনের ভিতর তাহার একটা মৃদু পুলকশিহরণ খেলিয়া গেল।

শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "হ্যাঁ, চিনি বই কি? এঁদের সঙ্গেই আমি এবার কলকাতায় এসেছি।"

বিভাদি বলিলেন, "ও, আচ্ছা, তা হ'লে তুমি দেখা করতে পার।" মৃণালের ভিসিটার্স লিষ্ট বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল না, তাহার মামা বলিয়া দিয়াছিলেন যে সে নিজের গ্রামের যে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিবে তাঁহারই সঙ্গে যেন তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হয়।

দেখা করিতে যাইবার আগে মৃণাল একবার ড্রেসিংরুমে ঘুরিয়া গেল। চুলটা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইল। ভিজা চুল বাঁধিবার উপায় নাই, কাজেই খোলাই রহিল। আধ ময়লা, নিতান্ত বাজে একটা মিলের শাড়ী তাহার পরনে, এইটা পরিয়া বিমলের সামনে বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা করিল না। একখানা টকটকে লাল পাড়ের তাঁতের শাড়ী পরিয়া, চুলটা আর একবার একটু ঠিক করিয়া লইয়া সে ভিসিটার্স রুমের দিকে চলিল।

ঘরের ভিতর তাহার দুই দর্শনপ্রার্থী বসিয়া। বীরেন-বাবুকে ত প্রণাম করিল, কিন্তু বিমল সম্বন্ধে কি করা যায় তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সত্য বটে ট্রেনে এক সঙ্গে আসিয়াছে, কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই সে বিমলের

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সঙ্গে বলে নাই। তাহাকে ঠিক পরিচিত লোকের মত গ্রহণ করা যায় না, অথচ অপরিচিতও ত সে নয়? কলিকাতার মেয়েরা এ-অবস্থায় কি করিত তাহা মৃণাল আন্দাজে বোঝে, কিন্তু মৃণালের মনটা এখনও মামামামীর সনাতনপন্থী প্রভাবটা সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে যদি বিমলের সঙ্গে এখন পরিচিতের মত কথা বলে তাহা হইলে মামীমা বলিবেন, মৃণালের মনে শহুরে বেহায়াপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আবার একেবারে যদি বিমলকে না-দেখিবার ভান করে তাহা হইলে বিমল কি তাহাকে অভদ্র ভাবিবে না? ভাবিলে অন্যায়ও হইবে না।

যাহা হউক, বিমলই তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বীরেনবাবুকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই মৃণালকে সে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে আমরা হয়ত উৎপাত ঘটালাম, কিন্তু ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়লেন না।"

মৃণাল কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া একটু হাসিল মাত্র। বীরেনবাবু বলিলেন, "তোমার হয়ত পড়াশুনার অসুবিধে হবে, কিন্তু মা বুড়ো মানুষ, ও সব ত বোঝেন না? তার ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারে তোমাকে চাইই। এখানকার চাকরবাকরের কোনও কাজ তাঁর পছন্দও হয় না, আবার একলা ত সব ক'রে ওঠা সম্ভব নয়। তাই তোমাকে নিতে এলাম। কাল রাত্রির মধ্যেই তোমাকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাব। এতে কি তোমার বোর্ডিঙের এঁরা আপত্তি করবেন?"

মৃণাল বলিল, "দেখি ব'লে। আমার আবার ক'দিন পরেই টেষ্ট পরীক্ষা কিনা, সময় নষ্ট না করাই উচিত। কিন্তু ঠাকুরমা বলছেন যখন, দেখি ওঁদের জিগ্‌গেষ ক'রে," বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আসল কথা, এখনও মৃণালের মন দেশের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, বোর্ডিঙে মন বসে নাই। দু-এক দিন বাহিরে কাটাইয়া আসিতে পারিলে মন্দ কি? পড়ার ক্ষতি একটু হইবে, তা না-হয় হইলই?

মৃণালের কপাল ভাল ছিল। বিভাদির এক জ্যাঠ-তুতো বোনের বিয়ে শীঘ্রই। কাপড়চোপড় কেনা, গহনাগাঁটি করানো পূরাদমে চলিতেছে। অনেকটা কাজই তাঁহার হাতে। কাজেই বোর্ডিঙের কোন্ মেয়ে কত পড়ার কামাই করিতেছে তাহার ভাবনা অত ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল না। মৃণাল কবে ফিরিবে, এবং কোথায় থাকিবে, এই বিষয় দু-একটা প্রশ্ন করিয়াই তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

খবরের কাগজে খান-কয়েক কাপড় জামা জড়াইয়া মৃণাল ফিরিয়া আসিল। বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিছানা নিতে হবে কি? শীতকালের দিন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "না, না, একটা রাতের জন্যে আবার বিছানা কেন? যেমন ক'রে হয় কেটে যাবে। মায়ের সঙ্গেই ত শুতে পারবে।"

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী ডাকব কি? না ট্রামেই যেতে পারবেন?"

এবার উত্তর না দিলেই নয়। কাজেই মৃণালকে বলিতে হইল, "না, গাড়ীর দরকার নেই। আমি ট্রামেই যেতে পারব।"

তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল। মৃণাল ভিজা চুলটা হাতখোপা করিয়া জড়াইয়া লইল, মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। পল্লীগ্রামে অবিবাহিতা মেয়েদের মাথায় কাপড় দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু এখানে ত এই নিয়ম। বীরেন-বাবু একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল, "ওটা আমার হাতে দিন," বলিয়া মৃণালের হাত হইতে কাপড়ের বাণ্ডিলটা টানিয়া লইল। নিজের মনেই ভাবিল, "পঞ্চুমামা দেখলে চ'টেই খুন হয়ে যেত।"

তিনজনে গিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিল। কয়েক মিনিটেই সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিয়া তাহারা ট্রাম হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সদর দরজায় পা দিলেই হয়, এমন সময় উল্টাদিক্ হইতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পঞ্চানন। মৃণালকে এইভাবে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়াই তাহার মুখ ভীষণ গম্ভীর হইয়া গেল। তাও আবার সঙ্গে বিম্‌লে হতভাগা।

মৃণাল তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া হন হন করিয়া বাড়ীর

ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বিমল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটলিটা তাহার হাতে দিয়া আসিল।

আবার বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পঞ্চানন পেঁচার মত মুখ করিয়া বৈঠকখানার ঘরে একলা বসিয়া আছে। বীরেনবাবু কোথাও কাজে বাহির হইয়াছেন, নয় ভিতরে ঢুকিয়াছেন।

বিমলকে দেখিয়াই পঞ্চানন বলিল, "কি হে ভাগ্নে, সকালবেলাই কোথায় চরতে বেরিয়েছিলে?"

বিমল বলিল, "কোথায় আর চরব, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। তা তোমার মুখ দে'খে ত মনে হচ্ছে না যে নিজেও না চ'রে এসেছ, এত দেরি কেন?"

পঞ্চানন মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "সকালে আমার অনেক কাজ থাকে জানই ত। 'গ্যাল্যান্ট্রি' করবার লোভে ত খাওয়াদাওয়া পূজাআচ্চা ছেড়ে ভোরবেলাই ছুটে বেরিয়ে পড়তে পারি না?"

বিমল ভাবিল, "আহা, বাছার আমার গাছে না-উঠতেই এককাঁদি, দিতে হয় থ্যাবড়া নাকে কিল বসিয়ে।" মুখে বলিল, "তা গ্যাল্যান্ট্রি জিনিষটা জগতে যখন আছে তখন কেউ না করলে চলবে কেন? এতে তোমার মত ধার্ম্মিকরা বসে বসে পূজো করবার কত অবসর পায় দেখ না?"

পঞ্চানন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কলকাতা শহরে কি গাড়ীর অভাব পড়েছিল?"

বিমল বুঝিতেই পারিয়াছিল পঞ্চাননের রাগের আসল কারণ কোন্‌খানে। একে ট্রাম, তাহাতে সঙ্গে বিমল। মৃণাল যেন ইহারই মধ্যে তাহার সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিয়াছে, এমনই তাহার ধরণ।

সে বলিল, "গাড়ী থাকবে না কেন? কিন্তু ট্রামে উঠলেই বা ক্ষতি কি? গায়ে একটু বাইরের হাওয়া লাগলেই কি কেউ ক্ষয়ে যায়?"

পঞ্চানন বলিল, "ক্ষয়ে যায় কি ম'রে যায় সে কথা তোমার মত মূর্খকে বোঝাব কি ক'রে? আমার মতে কাজটা অন্যায় হয়েছে।"

বিমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার মতে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয় নি। আর যিনি এসেছেন, এবং যিনি তাঁকে নিয়ে এসেছেন, দুজনের একজনেরও যখন ট্রাম সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নেই, তখন তোমার অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যখন অধিকার হবে তখন খাটিও, এখন এগুলো অনধিকারচর্চ্চা।"

ইহার কোনও সদুত্তর ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্চানন চুপ করিয়া থাকিত না। কিন্তু বীরেনবাবু আবার এই সময় বাহির হইয়া আসায় তাহাকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "বাবা পঞ্চু, মা তোমাকে দশটি সদ্‌ব্রাহ্মণের নাম করতে বলছেন, তাঁদের এখনই নেমন্তন্ন ক'রে আসতে হবে। আর বিমল বাবা, তুমি যদি খাওয়া-দাওয়া সেরে একবার এস, তাহ'লে তখন বাজারটা সেরে আসা যায়।"

পঞ্চানন বলিল, "আচ্ছা দেখছি।" বলিয়া পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ফর্দ করিতে লাগিয়া গেল।

"আচ্ছা, আমি তাহ'লে নাওয়া-খাওয়া সেরে আসব" বলিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে মনের বিরক্তিটা খানিক তাহার কাটিয়া গেল। মেয়েটি সত্যই দেখিতে মনোরম, স্বভাবটিও কোমল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার অত্যুগ্র আধুনিকতা তাহার মধ্যে নাই, আবার পাড়াগাঁয়ের জড়ভরত ভাবটাও নাই। পঞ্চুমামার বোধ হয় মেয়েটিকে খুবই ভাল লাগিয়াছে, না হইলে এখন হইতেই তাহার সম্বন্ধে এমন উগ্র সচেতনতা কেন? যা মানাইবে, যেন মর্কটের গলায় মুক্তার হার। বেচারী মৃণাল! মল্লিক-মহাশয় কি আর জগতে পাত্র খুঁজিয়া পান নাই? কিন্তু জগতে যোগ্যের সহিত অযোগ্যের মিলন ঢের হয়, বিমল তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। তবে মেয়েটি কোমল-স্বভাব হইলেও একেবারে মাটির মানুষ নয়, তেজ আছে খানিকটা ভিতরে। পঞ্চু-মামার অদৃষ্টে কিঞ্চিৎ ঘোল খাওয়া আছে।

মেসের কাছে আসিয়া বিমল ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া নিজের মনকে মৃদু তিরস্কার করিল। সারাটা পথই সে মৃণালের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। পঞ্চানন জানিলে তাহাকে আস্ত গিলিয়া খাইবে। তাহার মতে মৃণাল এখনই বিমলের 'গুরুজন'-স্থানীয়া, সেইমত চলা উচিত বিমলের। তা আর কি করা যায়? মনের উপর ত মানুষের হাত নাই? [ক্রমশঃ]

গীতাঞ্জলির জন্মকথা

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় রচনার সঙ্গে-সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল গীতাঞ্জলি রচনা। অর্থাৎ ইংরেজী গীতাঞ্জলিতেও যে সব বাংলা গানের ইংরেজী রূপান্তর বা অনুবাদ স্থান পেয়েছে, সেই সব গানের রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় রচনায় রত ছিলেন। আমাদের মনে হয় এই দুইয়ের মধ্যে তাঁর একই মনোভাব। এটা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে বাঁধন কাটিয়ে নূতন মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়তে চান, এইটাই কবির স্বভাব। গীতাঞ্জলি রচনার আগেকার পালা ছিল তাঁর রস-সাহিত্যের পালা। "সোনার তরী" ও "ক্ষণিকা"য় তার পরিচয় পাই। সেই সময়টাতে তিনি বেশীর ভাগ থাকতেন শিলাইদহে—সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁর বিষয়কর্ম্ম। কিন্তু সেই কর্ম্মেও ছিল তাঁর পূর্ব্বজীবন হ'তে মুক্তি। বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হবার পূর্ব্বে ছিলেন তিনি পারিবারিক বেড়ার মধ্যে, শহরের গণ্ডিতে। কাজের ছুতোয় বেরিয়ে পড়লেন বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে; সেখানে প্রকৃতির এবং মানুষের স্পর্শ পেতে লাগলেন বিচিত্রভাবে,—তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে মিলে চলল বাংলার পল্লীতে জীবনযাত্রায় বাস্তবের বোধ। নূতন অভিজ্ঞতার বিস্তারে তাঁর আনন্দের লক্ষণ বিশেষ ভাবে দেখতে পাই গল্পগুচ্ছে।

যখন তাঁর বয়স পৌছল চল্লিশের কাছাকাছি, হঠাৎ তাঁর মন ব'লে উঠল, এর থেকেও বেরিয়ে পড়ব, কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি নেব। কিন্তু বিষয়কাজ ত ছিল। সে-কাজের ভিতর দিয়ে যত ক্ষণ সাহিত্য-রসলোকের দরজা খোলা পেয়েছিলেন, তত ক্ষণ সেটাই তাঁকে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল। কিন্তু কাজের দিক থেকে বিষয়-কাজ কখনও মুক্তি দিতে পারে না। তার বাঁধন কাটাবার জন্য, স্বার্থের বাইরে অবৈষয়িক কাজের ক্ষেত্রে তাঁর ডাক পড়ল। এই মুক্তির জন্যে তাঁর চাঞ্চল্যের আবেগ আমরা দেখতে পাই "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। আমার মনে হয় তারও আগেকার লেখা "যেতে নাহি দিব" কবিতার মধ্যেও অনিবার্য্য টানে পারিবারিকতার বাইরে বেরোবার একটা ঝোঁকের ভাব যেন পাওয়া যায়। হঠাৎ একটা সময়ে বিষয়-কাজের ভিতর থেকে অবৈষয়িক কাজের ক্ষেত্রে কবি বেরিয়ে পড়লেন। রইল প'ড়ে তাঁর বোট, তাঁর পদ্মার চর, শিলাইদহের নানা ফসলের নানা রঙের ক্ষেত, আর শিলাইদহের কুঠিবাড়ীর তিন তলায় সিঁড়িঘরের কোণটুকু। যেখানে এলেন সেখানে দিগন্ত-জোড়া শূন্য মাঠ; মাঝে মাঝে দূরে দূরে দুটো-চারটে তাল গাছ, নদীর বদলে মাটি-খোদাই-করা শুক্‌নো নদী-পথের মতই খোয়াই, লাল কাঁকরে বিছানো। তখন শান্তিনিকেতনে গাছপালা খুব কমই ছিল, কেবল আশ্রমের দক্ষিণ সীমানায় ছিল শালের বীথিকা, পশ্চিম সীমানায় ছিল এক জোড়া বহুকেলে ছাতিম গাছ, আর উত্তর দিক দিয়ে আশ্রমে ঢোকবার পথে দুধারে কয়েকটি আমলকী গাছের সারি। এখানকার প্রকৃতি শিলাইদহের ঠিক উল্‌টো, রুক্ষ শূন্য ফ্যাকাসে, ছায়াঘন গ্রামের আবাস থেকে দূরে। এই খানে তাঁর মনের সুর বদল হ'ল, জমিদারী-আবহাওয়া থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠে বেরিয়ে এলেন একটা এমন জগতে যেখানে রুদ্রের পীঠস্থান, জীবনটা হ'ল সাদাসিধে, এমন কি আমাদের মত মধ্যবিত্ত জীবনের মাপকাঠির নীচের মাপের সীমায়। সেদিন তাঁর এই অকিঞ্চনতা পোষাকী ছিল না, এ ছিল অগত্যা। যে-দায়িত্ব নিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে তার খরচ কুলোবার মত অবস্থা একেবারেই ছিল না। শুনেছি তখন ছাত্রেরা শুধু যে বেতন দিত না তা নয়, তাদের অনেকের খাওয়া-পরা বাসন-কোসন

বিছানাপত্র সমস্তই তাঁকে জোগাতে হত। তখন তাঁর মনে যে-ঋতুর আবির্ভাব হ'ল, সেই ঋতুর ফসল গীতাঞ্জলি। তখন বাইরে যে শুষ্কতা ও শূন্যতা ছিল তার মধ্যে রস এবং পূর্ণতা জোগাবার মত উৎস তাঁর অন্তরের মধ্য থেকে যেন অকস্মাৎ ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে।

অবশেষে তাঁর জীবন ঘিরে দুঃখ-জালের সূত্রগুলো ক্রমেই শক্ত এবং জটিল হয়ে উঠল। মস্ত একটা দেনার বোঝা কাঁধে চেপে ছিল, তার উপরেও যে কাজ চাপল তাঁর ঘাড়ে, প্রতিদিন তার দুঃসাধ্য আর্থিক দাবি তাঁকে শান্তির অবকাশ দিল না। সামান্য যা তাঁর নিজের সম্পত্তি ছিল তার কিছু দিলেন বেচে আর কিছু গেল বন্ধকে। বাইরে থেকে উৎসাহ বা কোন সাহায্য পান নি, মিথ্যে নিন্দের কুশাঙ্কুর প্রতিপদে বিঁধেছে তাঁর পায়ে। তার পর সংসারে ঘন হয়ে তাঁকে ঘিরে এল রোগ, শোকতাপ। সে সময় যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে যে বিবরণ শুনেছি তাঁর দুঃখের সেই ইতিহাস কোথাও লেখা রইল না; কিন্তু আর এক দিকে আর এক ভাষায় লেখা হ'তে থাকল গীতাঞ্জলির গানগুলিতে। যে সান্ত্বনা দুঃখ বিপদ নিন্দাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে, কঠিন দুঃখের আঘাতে সেদিন কবির কাছে তার দ্বার খুলে গিয়েছিল। কবির কাছে শুনেছি, পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির দিনে যেমন ঘোরতর বহির্বিপ্লবের তলায় তলায় একটা গভীর শান্তি সৃষ্টির কাজ করত, গীতাঞ্জলির গান এবং তৎ-কালীন অন্যান্য গান সেই রকম সৃষ্টির বেগে বাণী নিয়ে সুর নিয়ে দুঃখস্তরের ঊর্দ্ধে দিনে রাতে আপনা আপনি প্রকাশ পাচ্ছিল। বহু বারই কবির কাছে একথা শুনেছি যে, জীবনযাত্রায় মানুষ যে আরাম, যে সুযোগ কামনা করে, বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর পক্ষে সেটা দুর্লভ ছিল না। কিন্তু অন্তরে বাহিরে কে যেন সেটাকে দুর্লভ ক'রে দিল। তাঁর উপর একটা যে ফরমাইসের দাবি আছে সেইটেকেই পূরণ করবার জন্যে কে যেন বাইরের অবস্থাকে অনুকূল ক'রে দিচ্ছে। অথচ সংসারের আদর্শ অনুসারে প্রায়ই তাকে প্রতিকূলতা বই অন্য কিছু বলা চলে না। এক দিন শিলাইদহে তাঁর যে বাসা বাঁধা হ'ল, সাহিত্য-রসের সৃষ্টির জন্যে তার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ সেটাকে ফেলে দিয়ে তিনি চলে এলেন আর এক ক্ষেত্রে, এর মধ্যে ত পূর্ব্বাপরের কার্য্যকারণের কোন যোগ দেখতে পাওয়া যায় না। এই অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে বিনা ভূমিকায় তাঁকে যে টেনে আনা হ'ল সেটা তাঁর স্বভাবের বা অবস্থার অনুসরণ ক'রে করা হয় নি, একাজে না ছিল তাঁর কোন অভিজ্ঞতা, না ছিল অর্থ সামর্থ্য। তার উপর সামনে এল দুঃখ, দরদহীন পরিবেশে সঙ্গহীন সাধনা। এর পর থেকে যে সমস্ত বিঘ্ন ভিড় ক'রে এল এখনও দেখছি সে সমস্তই তাঁর দরকার ছিল সংসারী মানুষ হিসেবে নয়, কবি হিসেবে। অথচ এই হিসেবের ব্যাপারটা কবির ইচ্ছের মধ্যে ছিল একথা বলা চলে না।

গীতাঞ্জলি রচনা শেষ হয়ে গেছে এমন সময় পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেল যে কবি বিলেত যাবেন। কিন্তু যাত্রার দিনেই বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যাওয়া আর হ'ল না। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন, এখন লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছু দিন নিভৃতে গিয়ে বিশ্রাম করা ভাল। কাজেই গেলেন তিনি শিলাইদহে, কিন্তু মন তখনও তাঁর ভ'রে রয়েছে গীতাঞ্জলির গুঞ্জনধ্বনিতে। নূতন কিছু লিখে মাথাকে ক্লান্ত করবেন না ছিল কথা, তাই গীতাঞ্জলির গানগুলিকে নিয়ে তিনি ইংরেজীতে তর্জ্জমা করতে ব'সে গেলেন। এক ভাষার জিনিষকে আর এক ভাষায় ভোগ করবার মতলবে। তর্জ্জমা যখন অনেক খানি এগোলো তখন তাঁর বহুদিনের পুরাতন এবং কষ্টদায়ক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য, কবির পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ এবং কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই তাঁকে বিলেত যাবার পরামর্শ দিলেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এই পরামর্শে সায় দিতে পারেন নি, সায় দিতে না পারার প্রধান কারণ ছিল তখনকার দিনে তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের তখন নিতান্ত শৈশব অবস্থা, তাকে লালন করবার টাকা তাঁকে কর্জ্জ ক'রে সংগ্রহ করতে হচ্ছে, কাজেই অধিক ঋণ-সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতে জলসমুদ্র পার হবার ইচ্ছে তাঁর হয় নি। কিন্তু শেষটায় তাঁকে রোগযন্ত্রণার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিলেত যাবার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে হ'ল। তখনও তর্জ্জমার

কাজ চলছিল। অথচ নিজের ইংরেজীর 'পরে তাঁর বিশ্বাস ছিল খুবই কম। এই সব তর্জ্জমা লেখা ছিল একটি একস্‌রসাইজ বুকে, খাতাটিও পূর্ণ হ'ল, বিলেত যাওয়ার যা সামান্য বাধা ছিল তাও গেল কেটে, কবি গেলেন বিলেতে। বিলেতে পৌছেই ফেনচার্চ্চ ষ্টেসন থেকে হোটেলে যাবার পথে টিউবের গাড়ীতে এ্যাটাচি-কেস সহ তর্জ্জমার পাণ্ডুলিপিটি গেল হারিয়ে। তার পর দিন যখন জানা গেল লেফট-লাগেজ অফিসে সেটি আছে, সেখান থেকে উদ্ধার ক'রে আনা হ'ল। এরকম ভাবে এদেশে ছোটখাট ব্যাগ ট্রেনে বাসে হারিয়ে গেলে, হারান সেই সম্পত্তি উদ্ধার হয় না, হ'লেও কতটা হয়রানি ভোগ করতে হয় সেটা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাবার সংবাদে কবি খুব বেশী চঞ্চল হন নি, কেন না তাঁর ধারণা ছিল তর্জ্জমাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়।

বিলেতে গিয়ে গোড়ার দিকে কবি যে জায়গায় ছিলেন সেখানে কাছাকাছি সাহিত্যিকদের বসবাস ছিল না। কিছু দিন সে জায়গায় থাকার পরই অন্যত্র যাবার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠিক এমনি সময়ে তাঁর মনে পড়ল চিত্রশিল্পী মিষ্টার রোটেনষ্টাইনকে।* তাঁর ভারত ভ্রমণের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য কবির বাক্যালাপ হয়েছিল। কবি তাঁকে খবর দিতেই তিনি এলেন। কবিকে বললেন, "ভারতে থাকৃতে মনে পড়ছে না কেউ আমাকে বলে ছিল যে আপনি কবি, দেশে ফিরে এসে ভারতবাসী কারও কারও কাছে শুনেছি আপনি কবি। আপনার কবিতার কিছু পরিচয় পেতে চাই।" কবি রোটেন-ষ্টাইনকে নিজের তর্জ্জমা কবিতার কথা উল্লেখ ক'রে কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "এগুলো ইস্কুলের ছেলের একসরসাইজের মত, আমার ইংরেজী নেহাৎ কাঁচা।" রোটেনষ্টাইন বললেন, "আমি আর্টিষ্ট, ওটুকু বাধায় ভিতরের রস পেতে আমার ঠেকবে না।" এই ব'লে নিয়ে গেলেন সেই খাতাটি, পরের দিন ছুটে এসে বললেন, "এমন ভাষায় এমন কবিতা দীর্ঘকাল পড়ি নি।" কবির মুখে তবু সংশয়ের লক্ষণ দেখে বললেন, "আমি চিত্রশিল্পী ব'লে হয়ত আপনি মনে করছেন আমি সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের সমঝদার নই, সে ধারণা ঠিক নয়। আমি আর্টিষ্ট ব'লেই, শিল্পে হোক, সাহিত্যে হোক সৌন্দর্য্য আমার চোখ এড়ায় না। আচ্ছা, এদেশের কয়েক জন উঁচুদরের কবি ও ক্রিটিকের কাছে আমি এসব তর্জ্জমার কপি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁদের নিরপেক্ষ অভিমত জানতে পারলেই বুঝতে পারবেন আমি আপনার কবিতা এবং তর্জ্জমার ভাষা সম্বন্ধে অত্যুক্তি করি নি।" অতঃপর তিনি কবিতাগুলির নকল, কবি ইয়েটস এবং ব্রাডলি প্রভৃতি কয়েক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর পর রোটেনষ্টাইনের প্রস্তাবক্রমে কবি লণ্ডনের হ্যামষ্টেড হিথ নামক জায়গায় গিয়ে বাসা নিলেন। তাঁর সেই তর্জ্জমা পড়ার উপলক্ষ্য ক'রে কবির সঙ্গে কবি ইয়েটসের পরিচয় হ'ল। তিনি যে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, গীতাঞ্জলির ভূমিকা পড়লেই পাঠকবর্গ তা বুঝতে পারবেন। রোটেনষ্টাইন তাঁর নিজের বাসায় একটি বৈঠক আহ্বান

---

* "I happened, in *The Modern Review,* upon a translation of a story signed Rabindranath Tagore, which charmed me; I wrote to Jorasanko—were other such stories to be had? Some time afterwards came an exercise book containing translation of poems by Rabindranath, made by Ajit Chakravarty, a schoolmaster on the staff at Bolpur. The poems, of a highly mystical character, struck me as being still more remarkable than the story, though but rough translations. . . . . . Then news came that Rabindranath was on his way. I eagerly awaited his visit. At last he arrived, accompanied by two friends, and by his son. As he entered the room he handed me a note-book in which, since I wished to know more of his poetry, he had made some translations during his passage from India. He begged that I would accept them.

That evening I read the poems. Here was poetry of a new order which seemed to me on a level with that of the great mystics. Andrew Bradley, to whom I showed them, agreed: 'It looks as though we have at last a great poet among us,' he wrote.

I sent word to Yeats, who failed to reply; but when I wrote again he asked me to send him the poems, and when he had read them his enthusiasm equalled mine . . . . . .

Tagore's dignity and handsome presence, the ease of his manners and his quiet wisdom made a marked impression on all who met him. One of the first persons whom Tagore wanted to know was Stopford Brooke; . . . . . . Stopford Brooke asked me to bring Tagore to Manchester Square; 'but tell him,' he said, 'that I am not a spiritual man.'—Sir William Rothenstein: *Men and Memories,* vol. 2, page 262.

করলেন। লণ্ডনের কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বৈঠকে এসে সমবেত হলেন। সেই আসরে কবি ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকৃত তর্জ্জমা সকলকে পড়ে শোনালেন, কবি নিজেও সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতারা ইংরেজের স্বভাব অনুসারে চুপ ক'রে শুনে গম্ভীর মুখে যে যার ঘরে গেলেন ফিরে। কবিতাগুলি সম্বন্ধে তেমন কোন কথাই বললেন না। কবির মনে হ'তে লাগল তাঁর কাঁচা ইংরেজী লেখা অমন ক'রে সকলকে শুনিয়ে তাঁকে সভায় অপদস্থ করবার প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজীতে কিছু লিখতে তখন তাঁর বিশেষ সঙ্কোচ ছিল এবং আজও সে সঙ্কোচ সম্পূর্ণ কেটেছে ব'লে মনে হয় না। এক দিন যখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে ইংরেজীতে কিছু রচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি লাইনে দু-একটা অক্ষরের পরিবর্ত্তন ক'রে নিম্নলিখিতরূপে জবাব দিয়েছিলেন

বিদায় করেছি যারে
নয়ন জলে
এখন ফিরাব তারে
কিসের ছলে।" **

ইস্কুলে পড়বার কালে কত নয়ন-জলেই ইংরেজী ভাষাকে বিদায় করবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কাহিনী আমরা তাঁর কাছেই শুনেছি, কিন্তু এত ক'রেও ইংরেজী ভাষাটা তাঁর মগজের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে বাস করছিল। তার সন্ধান তিনি নিজেই পান নি। তাঁর প্রিয় শিষ্য পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যখন এক দিন তাঁর গীতাঞ্জলির দু-একটি তর্জ্জমা শুনে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তাতে কোন ভুল নেই এবং লেখা ভালই হয়েছে তখন কবি মাষ্টার মহাশয়ের কাছ থেকে পরীক্ষাপত্র ফুলমার্ক পেয়েছে মনে ক'রে তখনকার মত নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের আসরে তাঁকে বড় কিম্বা ছোট চৌকিতে ডেকে বসাবে এ প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। তাই গীতাঞ্জলি তর্জ্জমার উপর যদিচ তাঁর দরদ ছিল, যথোচিত বিশ্বাস ছিল না; সেদিনকার বৈঠকের নিঃশব্দ ব্যবহারে মনে মনে তারই প্রমাণ কল্পনা ক'রে লজ্জা অনুভব করলেন। রাত্তিরটা কাটল, পরের দিনকার ডাকে সেদিনকার শ্রোতাদের কাছ থেকে যখন আন্তরিক ভাষায় প্রচুর প্রশংসাপত্র আসতে লাগল সে তাঁর কাছে স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ল।

এর পর পাশ্চাত্য মহাদেশে তাঁর কবিতার এবং গীতাঞ্জলির কি রকম অভ্যর্থনা হয়েছে সেটা সকলেই জানেন। গীতাঞ্জলির বাংলা এবং ইংরেজী দেহপ্রাপ্তির কথা এক দিন তাঁর কাছে যা ধারাবাহিক শুনেছি,—তাই লিপিবদ্ধ ক'রে দিলুম। তাঁকে গল্প করানো ছাড়া এর মধ্যে আমার কৃতিত্ব আর কিছু নেই এ কথা অনুমান করা শক্ত হবে না। অতএব এই উপলক্ষ্য-সৃষ্টি করার গৌরব নিয়ে আমিও পাঠকদের কাছে কিছু ধন্যবাদ আশা করতে পারি।

** There is an impression abroad that no English translation by Rabindranath of any of his Bengali poems was published anywhere before the *Gitanjali* poems. That is a mistake. As far as I can now trace, the first English translations by himself of his poems appeared in the February, April and September numbers of *The Modern Review* in 1912. So far as my knowledge goes, this is how he came to write in English for publication. Some time in 1911 I suggested that his Bengali poems should appear in English garb. So he gave me translations of two of his poems by the late Mr. Lokendranath Palit. Of these *Fruitless Cry* appeared in May and *The Death of the Star* in September, 1911, in *The Modern Review.* When I asked him by letter to do some translations himself, he expressed diffidence and unwillingness and tried to put me off by playfully reproducing two lines from one of his poems of which the purport was, 'On what pretext shall I now call back her to whom I bade adieu in tears?' the humorous reference being to the fact that he did not, as a schoolboy, take kindly to school education and its concommitant exercises. But his genius and the English muse would not let him off so easily. So a short while afterwards, he showed me some of his translations, asking me playfully whether as a quondam school-master I would pass them. These appeared in my *Review.* These are, to my knowledge, his earliest published English compositions. Their manuscripts are with me now.—*Golden Book of Tagore*: Foreword by Ramananda Chatterjee: p. X.

যাত্রা শুভ

শ্রীবিজয় গুপ্ত

শেষরাত্রে সুবলগাঁ ষ্টেশনে নামিয়া জটাধর গ্রামাভিমুখেই চলিয়াছে। ফাল্গুনের শেষ; অস্পষ্ট কুয়াশায় দূরের গ্রামখানি ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। দশমীর চন্দ্র সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবছা, পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় নিদ্রিত ধরণীকে স্বপ্নপুরীর মত দেখাইতেছে। পথ চলিতে চলিতে কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া সহসা একান্ত সম্মুখে দেখা যায় পল্লববিস্তারী বিরাট বটবৃক্ষ অথবা গ্রামবাসীদের খড়ো চালের শ্রেণীবদ্ধ ধূসর ছবি।

জটাধর দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর একখানা গ্রাম পার হইলেই রূপোখালি। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বাণেশ্বরের সান-বাঁধানো চত্বরে জটাধর নতজানু হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। কি প্রার্থনা করিল সে-ই জানে। তার পরে বাণেশ্বরকে বামে রাখিয়া দ্রুতপদে মাঠে নামিয়া পড়িল।... প্রভাতের পূর্ব্বে কেশবের নিকট পৌছিতেই হইবে। এ-বৎসরটা বড়ই মন্দা গেল। দেখা যাক, শেষের দিকে যদি কিছু জুটিয়া যায়। শুভ কাজটা চুকিয়া গেলে কেশবের নিকট হইতে ঘটক-বিদায় হিসাবে দু-পাচ বিঘা জমি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। আজই, যেমন করিয়া হউক, মেয়ে দেখাইয়া একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। আজ না হইলে পঞ্জিকার মতে সমস্ত মাসের মধ্যে আর একটিও শুভদিন নাই।

ভাবিতে ভাবিতে পথটা ফুরাইয়া আসিল। বেলডাঙার শালুকদীঘির পাড় অতিক্রম করিয়া জটাধর কেশবের দাওয়ার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, 'কেশব, ও কেশব, ভায়া কি—'

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, 'কে জটিদা নাকি?'

জটাধর হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তবু ভাল, আমি বলি, ভায়া বুঝি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে।'

কেশব দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর, দীর্ঘচ্ছন্দ চেহারা, ত্রিশ বোধ হয় সবে পার হইয়াছে। চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে শিশুসুলভ সরল কোমলতা। জটাধর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেশবের মুখের প্রতি চাহিল। অমন মসৃণ ললাটেও যেন চিন্তার কুটিল রেখা জাগিয়াছে, মুখের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতেও যেন দুশ্চিন্তার ম্লানিমা দেখা দিয়াছে।

দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে জটাধর বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইলো যে, নাও তৈরি হয়ে নাও।'

তথাপি কেশবের কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। জটাধরের নিকট আগাগোড়া সমস্তটাই যেন দুর্ব্বোধ্য বোধ হইতে লাগিল।... এত দূর আনিয়া তরী বুঝি ডুবিয়া যায়। কত হাঁটাহাঁটি করিয়া যে মেয়ে দেখিবার জন্য কেশবকে সম্মত করা হইয়াছে তাহার আর আদি-অন্ত নাই। দুর্ব্বলতা ও নৈরাশ্যে জটাধরের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল; তবুও কণ্ঠস্বরে সরসতা আনিয়া জটাধর বলিল, 'নাও ভায়া, তৈরি হও,—শুভ সময়ে বেরুতে হবে।'

কেশব বিমর্ষ মুখে জবাব দিল, 'কিন্তু আজ কেমন ক'রে হবে জটিদা। আজ যে একবার কনকপুরে যাব ভাবছি।'

'কনকপুর?' জটাধরের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

'হুঁ', বলিয়া শয্যার তলদেশ হইতে কেশব একখানা চিঠি বাহির করিয়া জটাধরের হাতে দিল।

ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হইয়া উঠিতেছে, তথাপি ধীরভাবে জটাধর বলিল, 'তুমিই পড় না শুনি।'

কেশব উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল, তার পর চিঠিখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে পড়িল :—

পরম কল্যাণীয়,

বাবাজীবন, দুর্ভাগ্যক্রমে গত আট বৎসর তোমার সহিত কোন সম্পর্কই আমাদের নাই। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে জানাইতেছি যে, গত কয়েক মাস হইতে কল্যাণী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী। অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছে, চিকিৎসকেরা সকলেই প্রায় জবাব দিয়াছেন। পার ত শেষ দেখা দেখিবার জন্য একবার আসিও। আমি আমার কর্ত্তব্য করিলাম, তুমি তোমার বিবেচনায় যাহা হয় করিও। আশীর্ব্বাদ জানিও, ইতি

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিটা শেষ হইতে-না-হইতেই জটাধর বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল। হাসি যেন তাঁহার কিছুতেই থামিবে না। অবশেষে অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করিয়া কেশবের বিস্ময়বিহ্বল মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

কহিল, 'না ভায়া, এ আমি স্বীকার করব, আমার এতটা বয়সে এমনটি আর দেখলাম না।'

জটাধরের অদ্ভুত হাসি, দুর্ব্বোধ্য মন্তব্য সবই কেশবের আশ্চর্য্য বোধ হইল, বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কি দেখ নি, কি?'

জটাধর ততোধিক গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, 'হুঁ, কার সাধ্যি এড়িয়ে যায়!'

কেশবের ধূমাচ্ছন্ন সন্দিগ্ধতা উত্তরোত্তর কুণ্ডলী পাকাইতেছে, অধীর হইয়া বলিল, 'আঃ, কি এড়িয়ে যায় বল না?'

জটাধর ভাঙিবে, তবু মচকাইবে না। অনেক করিয়া শেষে বলিল, 'তোমার শ্বশুর মতলবটা করেছে বেশ। আরে ভায়া, সে বেশী দিন নয়, মাত্র সাতটি দিন আগে—যাচ্ছি একটা সম্বন্ধ ঠিক করতে পার্ব্বতীপুরের দিকে, দেখি, তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ মেয়েকে সঙ্গে ক'রে চলেছে ষাঁড়েশ্বরতলায় পূজা দিতে; তা বললাম—এক রকম গায়ে পড়েই বললাম যে, কেন বাপু এমন করছ, অনেক দিন ত হয়ে গেল, আর কেন! মেয়েটাও কষ্ট পাচ্ছে আর আমার কেশবভায়াও দিন দিন শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে।' চারি দিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গলার স্বরটা একটু খাটো করিয়া জটাধর বলিল, 'উত্তরে কি বললে জান ভায়া, বললে—অমন জামাইয়ের—থাক সে কথাটা আর না বলাই ভাল।'

কেশব স্তব্ধ হইয়া নিশ্চল পাষাণের মত বসিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

জটাধর রোগ বুঝিয়া ঔষধ দিতে জানে; ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া সে খুশী হইল। কেশবকে নীরব দেখিয়া আবার টানিয়া টানিয়া বলিল, 'নইলে আমারই বা কি মাথাব্যথা! এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার যে বিয়ে দেবার জন্যে সম্বন্ধ করছি, সে ত তোমারই সুখের জন্যে, না কি বল?' কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কেশবের হাত হইতে চিঠিখানা টানিয়া লইয়া বলিল, 'বুঝলে না ভায়া, মিথ্যে না হ'লে একটা উট্‌কো লোকের হাত দিয়ে চিঠি পাঠায়!'

জটাধরের অকাট্য যুক্তি, বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি!

সম্মুখের কদমগাছের মাথার উপরে এক দল পাখী কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

না, আর বিলম্ব নয়,—জটাধর উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কই হে ভায়া, দেরি হয়ে গেল যে। যাত্রালগ্নটুকু পার হয়ে যাবে দেখছি। হিন্দুর ছেলে পঞ্জিকা না মেনে উপায় কি, চল বেরিয়ে পড়ি।'

সেদিন বহু অনুরোধে যেটুকু ইচ্ছা জাগিয়াছিল, আজ সহসা সে উৎসাহ, সে ইচ্ছা যেন নির্ধূম হইয়া নিবিয়া গিয়াছে। জটাধরের বারংবার তাড়নায় কেশব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে সীমান্তরাল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যোদয় হইল।

চিন্তিত মুখে জটাধর বলিল, 'তাই ত ভায়া, সূর্য্য উঠে গেল যে!'

মৃদু আপত্তি করিয়া কেশব বলিল, 'তবে আজ আর গিয়ে কাজ নেই।'

জটাধর কথাটা বলিয়াছিল কেশবকে তাড়া দিবার জন্য, কিন্তু বিপরীত ফল হয় দেখিয়া বলিল, 'না, না, তা কি হয়, চল। সূর্য্য উঠলেও দোষ নেই, একে উষা বলা যায়, আর তাছাড়া খনা বলেছেন—মঙ্গলের উষা বুধে পা…।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেশবকে প্রস্তুত হইতে হইল। কেশব দুয়ারে চাবি দিতেছিল আর জটাধর অনর্গল বলিয়া যাইতেছিল, 'বুঝলে ভায়া, আঙুল নয় ত যেন চাঁপার কলি…রং নয় ত যেন কাঁচা সোনা। মুখ, চোখ, গড়ন-পেটন, সে আর কি বলব বাবাজী, গেলেই দেখতে পাবে।'

দূরে শববাহীদের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'বল হরি, হরিবোল।'

কেশব চাবি বন্ধ করিয়া পা বাড়াইয়াছিল; জটাধর সহসা কেশবের হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'ভায়া, দেখেছ, এ কি ব্যতিক্রম হবার জো আছে, কেমন যোগাযোগ দেখ,—খনা বলছেন, যাত্রাকালে মড়া দেখলে সেদিন নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি,—দাঁড়াও মড়া নিয়ে ওরা সামনে এলেই আমরা যাত্রা করব।'

শুভযাত্রার উল্লাসে জটাধরের মুখচোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শববাহীরা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে উঁকি মারিয়া জটাধর উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল, 'ভায়া, যোগাযোগ দেখ, শুধু মড়া নয়, এ আবার সধবা।'

শালুকদীঘির পাড় দিয়া ঘন আমবাগানের পায়ে-চলা পথটুকু অতিক্রম করিয়া শববাহীরা সম্মুখের পথে উঠিল।

কে জানে কোন্ সৌভাগ্যবতী! বস্ত্রাবরণের বাহিরে দেখা যায় রোগশীর্ণ অলক্ত-রঞ্জিত দুখানি পা। 'যাক বাঁচা গেল, যাত্রাটা শুভ হয়েছে, কই হে চল!' জটাধর আনন্দে কেশবের হাত ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। 'কি হে ভায়া, ব'সে পড়লে যে!'

কেশব সত্যই বসিয়া পড়িয়াছে। মুঠার মধ্যে শিহরিত কম্পমান আঙুলগুলার স্পর্শানুভূতিতে জটাধর ভীত হইয়া উঠিল। কেশবের মুখে চোখে যাতনার পরিব্যাপ্ত পাণ্ডুরতা। জটাধরের মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া যায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াটা বুঝি সহসা বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনেক ক্ষণ পরে জটাধরের মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে কেশব বলিল, 'আট বছর পরে আজ যে আমি দেখতে যাব মনে করেছিলাম জটিদা!'

মপাল-দীঘিতে প্রাপ্ত কাষ্ঠস্তম্ভযুগল • স্থিরচক্র মঞ্জুশ্রী ত্রিপুরার কৃষ্ণপুর গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি
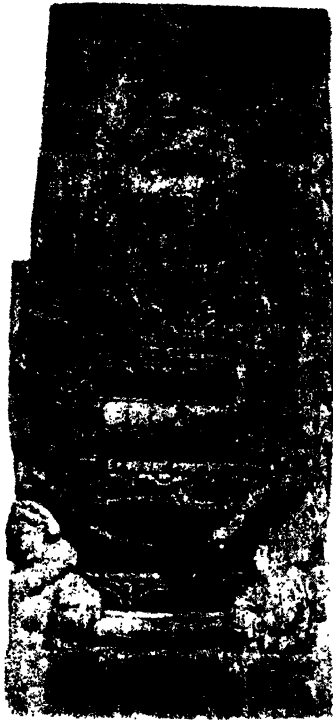
প্রথম স্তম্ভ : দ্বিতীয় পৃষ্ঠ — তৃতীয় পৃষ্ঠ — চতুর্থ পৃষ্ঠ

দ্বিতীয় স্তম্ভ : দ্বিতীয় পৃষ্ঠ — তৃতীয় পৃষ্ঠ — চতুর্থ পৃষ্ঠ
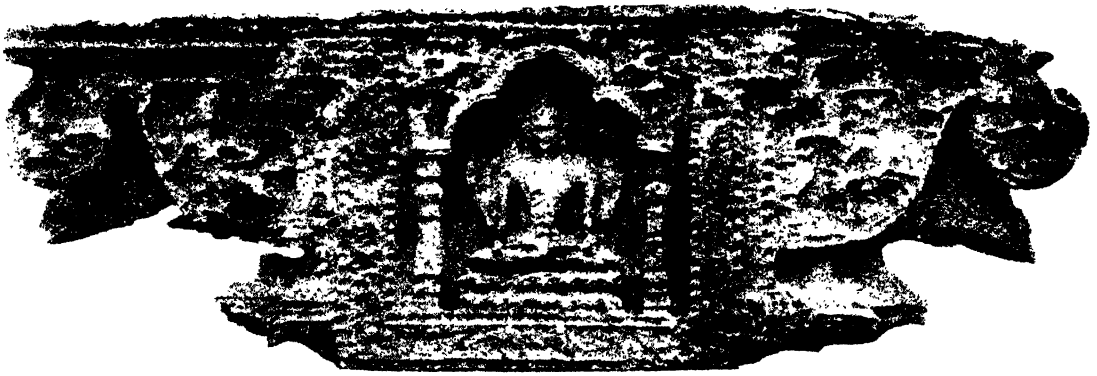
সোনারঙ্গ গ্রামে প্রাপ্ত স্তম্ভশীর্ষ

প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য্য

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকারগণ যে-সমস্ত উপাদানে দেবমূর্ত্তি গঠিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কাষ্ঠও তাহাদের মধ্যে একটি। আজিও তাই দেশের নানা দেবমন্দিরে কাষ্ঠময় দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীক্ষেত্রের বিখ্যাত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা কাষ্ঠনির্ম্মিত। পশ্চিম-বঙ্গের নানা স্থানে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত যশোমাধব-মূর্ত্তিও কাষ্ঠনির্ম্মিত। উপাদান-হিসাবে কাষ্ঠ কিন্তু অচিরস্থায়ী। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে যুগে যুগে প্রস্তরই অধিকতর আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। প্রস্তরে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপ্রস্তরে, নির্ম্মিত হইলে প্রতিমার আর জরা-মরণ নাই। বাংলা দেশে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রস্তরে যে-সমস্ত প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেশীয় চিত্রশালাগুলিতে তাহাদের অনেক নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। নমুনাগুলি আজিও এমন তাজা রহিয়াছে যে, তাহাদের বয়স যে হাজার বছর হইতে চলিল, উহাদের অবয়ব দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কালের সহস্র পদক্ষেপের কোন চিহ্নই প্রতিমাগুলির গাত্রে অঙ্কিত হয় নাই।

বঙ্গের এমন ভাস্কর্য্য আজ সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। বাঙালী-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দরসধারা আর দেবমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে না। বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য বলিতে আমরা বুঝি সেই ভাস্কর্য্য যাহা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, ঝড়ে যেমন করিয়া প্রদীপ নিবিয়া যায়, তেমনই নিবিয়া গিয়াছিল। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে, প্রাচীন গড়-খাল হইতে মাটি তুলিতে সেই আমলের শত শত প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়া আমাদিগকে বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের সহিত পরিচিত করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য্য কি প্রকারের ছিল, তাহা কি জানিবার কোন উপায় নাই? প্রস্তর অপেক্ষা কাষ্ঠ সহজপ্রাপ্য ও সস্তা। দারু-তক্ষণকার্য্যও প্রস্তরতক্ষণ অপেক্ষা সহজসাধ্য। কাজেই ভাস্কর্য্যে প্রস্তরের সঙ্গে সঙ্গে কাষ্ঠেরও প্রচুর ব্যবহার হইত, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। প্রাচীন বঙ্গের দারু-ভাস্কর্য্যের নমুনা কি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে?

বাংলা দেশ ঝড়বৃষ্টির দেশ। উই-ইঁদুরের উৎপাতও এদেশে অত্যন্ত বেশী। কাজেই সাত-আট শত বৎসর, নয় শত বা হাজার বৎসরের দারু-ভাস্কর্য্যের নমুনা সম্পূর্ণ

বিনষ্ট হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কলিকাতা-চিত্রশালায় প্রাচীন দারু-ভাস্কর্য্যের নমুনা বিশেষ আছে বলিয়া অবগত নহি। রাজশাহী চিত্রশালা অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার অবস্থাও একই প্রকারের। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর নগরীর নালা-পুষ্করিণী হইতে প্রাক্‌মুসলমান যুগের দারু-ভাস্কর্য্যের অনেকগুলি নমুনা আমরা ঢাকার চিত্রশালার জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ত্রিপুরা জেলা হইতেও একটি নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাস্কর্য্যের মত সেই আমলের দারু-তক্ষণশিল্পও কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, পাঠকগণ এই সমস্ত নমুনা হইতে আশা করি তাহার স্পষ্ট একটা ধারণা পাইবেন। বঙ্গের ভাস্কর্য্য ত লুপ্ত হইয়াছে, প্রস্তরশিল্পী বাংলা দেশে আজ নাই বলিলেই চলে। আর প্রস্তর দুষ্প্রাপ্যও, কাজেই অনিশ্চিত পৃষ্ঠপোষকের ভরসায় পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তর-সংগ্রহে শিল্পীগণের উৎসাহের আতিশয্য না-হইবারই কথা। কিন্তু কাষ্ঠ ত বাংলা দেশে আজও দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য নহে। প্রাচীন বঙ্গের দারু-তক্ষণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনও কি বাংলা দেশে আর সম্ভব নহে?

আজ দারু-ভাস্কর্য্যের যে চমৎকার নিদর্শনটির পরিচয় দিতে বসিয়াছি, উহা বাংলার প্রাচীন রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর নগরীর (রামপাল) কেন্দ্রে অবস্থিত বল্লাল-বাড়ীর চৌগাড়া ১-চিহ্নিত স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। সঙ্গীয় মানচিত্রে প্রাচীন রাজধানীর কেন্দ্রে বল্লাল-বাড়ী ও উহার চৌগাড়ার অবস্থান দ্রষ্টব্য। ঢাকা মিউজিয়মে সংগৃহীত প্রত্ননিদর্শন-সমূহের আধাআধি এই প্রাচীন রাজধানীর পুরাতন দীঘি-পুষ্করিণী গড়-খাল হইতে পাওয়া। প্রস্তরমূর্ত্তির ত কথাই নাই, এই আয়তন হইতে দারু-ভাস্কর্য্যের নমুনাও অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ সেগুলির পরিচয় দিতেছি।

সমালোচ্য দারুমূর্ত্তিটি রামপালের সন্নিহিত পঞ্চসার-বিনোদপুর নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছিলেন। একটি আমলকশীর্ষ রেখমন্দিরতলে দেবতা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। মস্তকে মুকুট, কানে কুণ্ডল, কেশভার স্ত্রীলোকের মত খোঁপা করিয়া বাঁধা,—খোঁপার প্রা টি পক্ষী-চঞ্চুর মত, দুই নহর মুক্তার মালা দিয়া চঞ্চুটি বেষ্টি । দেবতা দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি দিয়া অপূর্ব্ব লীলায় এক তরবারির বাঁট ধরিয়া আছেন, তরবারি নীচের দিকে ঝুলিতেছে। ধরিবার কোমল ভঙ্গীটি এবং তরবারির নিম্নমুখত্ব হইতে হিংসাধর্ম্মী অস্ত্রের অহিংসত্ব সূচিত হইতেছে। দেবতার বামস্কন্ধ হইতে একখানি কোঁচানো চাদর পুষ্পিতাগ্র হইয়া হাঁটুর নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আর একখানি কোঁচানো চাদর দেবতার বামহস্তে ধৃত। দেবতার গলায়, বাহুতে, কটিতে, মণিবন্ধে স্ত্রীলোকের মত অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য। কটিদেশ হইতে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ঝালরের মত কয়েক গুচ্ছ রত্নমালা দুলিতেছে। দক্ষিণ পদের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দেবতা বাঁ-পা খানি তাহার পিছনে নৃত্যভঙ্গীতে স্থাপিত করিয়াছেন, নূপুরশোভিত পা-খানি অঙ্গুলির উপর ভর করিয়া আছে। দেবতার পায়ের তলে পুষ্পরাশি ছড়াইয়া আছে। দেবতার মুখে এবং সর্ব্বাবয়বে নব-যৌবনের অপূর্ব্ব লাবণ্য এই হাজার বছরের পুরাতন কাষ্ঠ-খণ্ড খানিতেও যে-প্রকার অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে, তাহাতে শিল্পীর প্রশংসায় দর্শকের মন মুখর না হইয়া পারে না।

মূর্ত্তির মস্তকের উপর মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে এই মূর্ত্তি দেবমূর্ত্তি। এ নবযৌবনরসে উচ্ছল খড়্গধারী কিশোর মূর্ত্তি কোন্ দেবতার? বাহনের অভাব বৌদ্ধত্বসূচক এবং হস্তে খড়্গ ও সর্ব্বশরীরে অলঙ্কারবাহুল্য মঞ্জুশ্রীসূচক। মঞ্জুশ্রী বৌদ্ধগণের বিদ্যার দেবতা। ইঁহার নানা প্রকারভেদ আছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার *Buddhist Iconography* নামক পুস্তকে বাক্, ধর্ম্মধাতু, বাগীশ্বর, মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, বজ্রানঙ্গ, নামসংগীতি, বাগীশ্বর, মঞ্জুবর, মঞ্জুকুমার, অরপচন, স্থিরচক্র, বাদিরাট্, মঞ্জুনাথ,—এই ত্রয়োদশ প্রকার মঞ্জুশ্রীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত আলোচ্য মূর্ত্তিটির মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! একমাত্র স্থির-চক্র মঞ্জুশ্রীর বর্ণনার সহিত আলোচ্য মূর্ত্তিটির কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়।
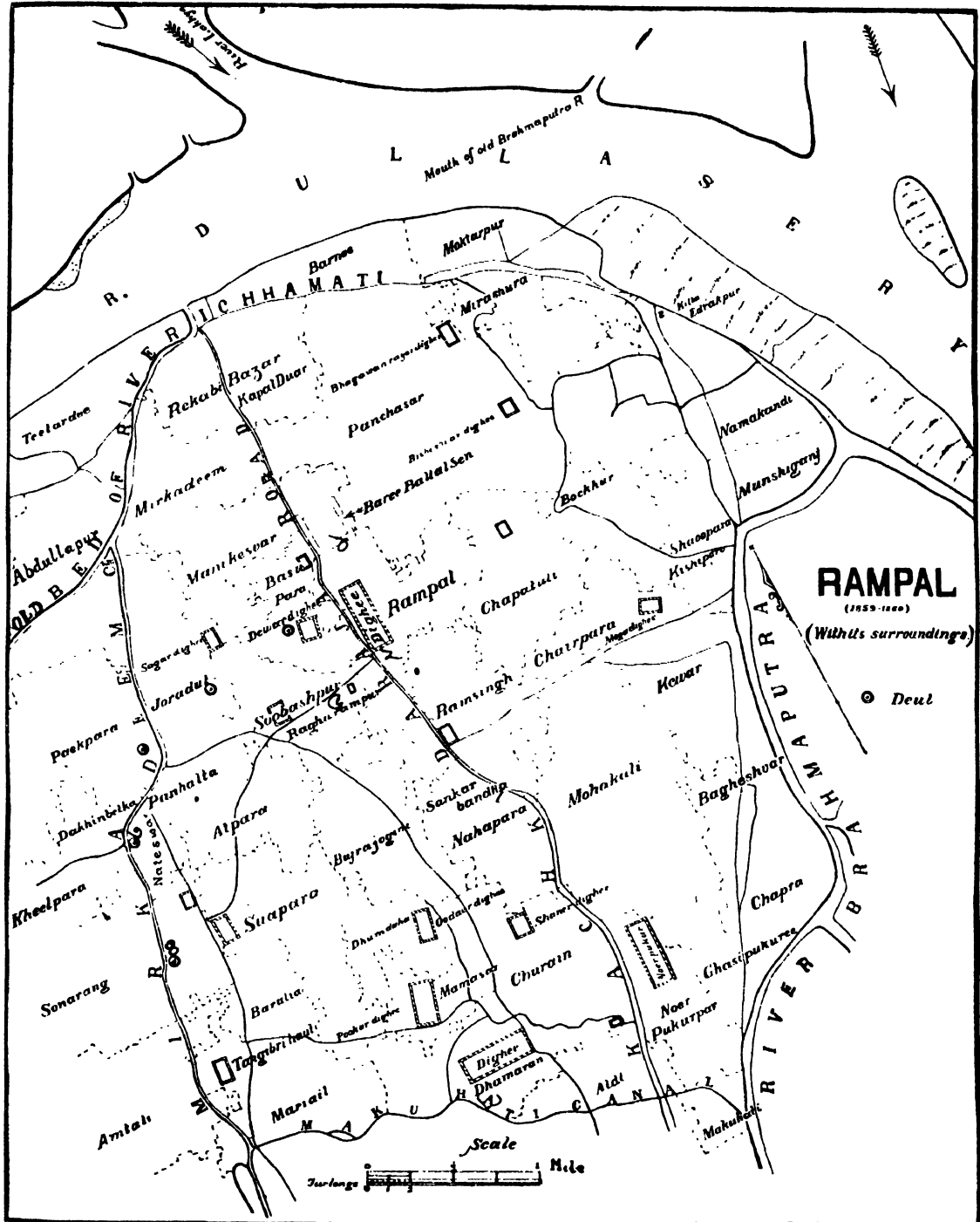
প্রাচীন বাংলার রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

ডক্টর ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত স্থিরচক্রের বর্ণনা নিম্নরূপ :—

"স্থিরচক্রের এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তদ্বারা তিনি বর প্রদান করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ শ্বেত, ভ্রমরবর্ণের অলঙ্কারে তাঁহার দেহ মণ্ডিত। পদ্মের উপর চন্দ্রাসনে তিনি উপবিষ্ট। তিনি চীরক(বস্ত্রসমূহ)ধারী. ঐ সমস্ত বস্ত্রের প্রভায় তাঁহার দেহ উজ্জ্বল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রাজকুমারের মত অলঙ্কার। তাঁহার আনন শৃঙ্গার-রসে সমুদ্ভাসিত। প্রজ্ঞাদেবী তাঁহার সঙ্গিনী, তাঁহারও আনন শৃঙ্গার-রসে সমুজ্জ্বল ও হাস্যদীপ্ত।"

ডক্টর ভট্টাচার্য্য স্থিরচক্রের কোন মূর্ত্তি দেখেন নাই, এবং ছবিও দিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত একটি মূর্ত্তিকে তিনি স্থিরচক্র বলিয়া সসন্দেহে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ছবিও দিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটির সহিতও উপরের বর্ণনার সর্ব্বাংশে মিল নাই।

তবে আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি কি স্থিরচক্র মঞ্জুশ্রী নহে? মিলও যে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে! আমাদের দেবতাটির হাতে এবং গলায় কোঁচানো চাদরখানি যে-ভাবে স্থাপিত তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা শুধু শোভার্থে প্রদত্ত হয় নাই, ইহা এই দেবতার একটি বিশেষ চিহ্ন। কাজেই স্থিরচক্রের "চীরক" পাওয়া যাইতেছে। হস্তে তরবারিও মিলিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে রাজকুমারের মত অলঙ্কারও দেখা যাইতেছে। কিন্তু সঙ্গে প্রজ্ঞাদেবী ত দেখা যায় না!

বৌদ্ধ "সাধনমালা" নামক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি গ্রন্থখানি ডক্টর ভট্টাচার্য্যের *Buddhist Iconography* গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন ছিল। সাধনমালায় কয়েকখানি প্রাচীন পুথি মিলাইয়া ১৯২৫ সনে ডক্টর ভট্টাচার্য্য এই সাধনমালার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ "গাইকোবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালা"র অন্তর্গত করিয়া বড়োদা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধনমালায় স্থিরচক্রের দুইটি সাধনপদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম সাধনটি (নং ৪৪) পদ্যময়, উহার অল্পাংশ গদ্যে লিখিত। দ্বিতীয় সাধনটি গদ্যে লিখিত, উহার রচয়িতার নাম মুক্তক। উভয় সাধন হইতেই প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

প্রথম সাধনের আরম্ভ :—

শ্রীমদ্‌গীর্গরিমানিরস্ত সকল ভ্রান্তি প্রতানোজ্জ্বলং
প্রোদ্যদ্গৌর গভস্তিবিম্ববিমলং বুদ্ধং চ বালাকৃতিং।
বিভ্রাণং করবালমুদ্গতরুচিং প্রজ্ঞাং চ নত্বাদরাৎ
আত্মানুস্মরণায় লিখ্যত ইদং তচ্চক্ররত্নং ময়া॥

এই শ্লোকটি সাধন-রচয়িতার মুখবন্ধ। বাংলায় ইহার নিম্নরূপ অনুবাদ করা যায় :—

"নবপল্লবের মত উজ্জ্বল, শ্রীমান, বাক্যগরিমা দ্বারা যিনি সকল ভ্রান্তি নিরস্ত করিয়াছেন, উদ্গত শ্বেত আলোকবিম্বের মত বিমল, যিনি জ্যোতিষ্মান তরবারি ধারণ করিয়া আছেন, সেই বালকের মত আকৃতি বুদ্ধকে এবং প্রজ্ঞাদেবীকে সাদরে নমস্কার করিয়া নিজের পুনঃ পুনঃ স্মরণের জন্য আমাকর্ত্তৃক এই চক্ররত্ন লিখিত হইল।"

এইখানে দেখা যাইতেছে, রচয়িতা বালাকৃতি স্থিরচক্রকে এবং প্রজ্ঞাদেবীকে নমস্কার করিয়া সাধন রচনা আরম্ভ করিতেছেন। স্থিরচক্রের সহিত প্রজ্ঞা থাকিবেন, এমন কোন কথা ইহাতে নাই।

পরের একটি শ্লোকে আছে, সাধক মুঃ এই বীজ হইতে জাত সুন্দর পত্রসমন্বিত ইন্দীবরের চিন্তা করিবেন। তাহার উপরে চন্দ্রাসনে উপবিষ্ট বাগীশ্বরের ধ্যান করিবেন। ভ্রমরের মত কৃষ্ণ এবং উজ্জ্বল বস্ত্রসমূহ হইতে নিঃসৃত রক্তরশ্মিসমূহ দ্বারা ইনি নিবিড় অন্ধকার দূর করিতেছেন এবং ইনি সর্ব্ব প্রকার বরপ্রদাননিপুণ।

লালিত্য শৃঙ্গাররসাভিরামং
ব্যাজৃম্ভমানাম্বুরুহাস্য লক্ষ্মীম্।
বীরং কুমারাভরণং দধানং
ধ্যায়াৎ পদং তস্য সমীহমানঃ॥

Buddhist Iconography গ্রন্থে ডক্টর ভট্টাচার্য্য প্রথম ছত্রের পাঠ ধরিয়াছেন (পৃ ৩০, পাদটীকা)—"লালিত্য শৃঙ্গাররসাভিরামাং।" সাধনমালাতে ইহার শুদ্ধ পাঠ—"রামং"ই আছে। কাজেই স্থিরচক্রের সহিত প্রজ্ঞা আছেন বলিয়া ডক্টর ভট্টাচার্য্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মূলে তাহার কোনই ভিত্তি নাই। উপরের শ্লোক হইতে দেখা যায় দেবতার মূর্ত্তি লালিত্য এবং শৃঙ্গার-রসের দ্বারা মনোরম, তাঁহার মুখশ্রী প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ। তিনি বীর এবং কুমারাভরণধারী।

মুক্তক-রচিত দ্বিতীয় সাধনটিতে আছে যে মুঃ-কার উজ্জ্বল কমলের উপর—

কুঙ্কুমাভং পঞ্চচীরং কুমারাভরণং শৃঙ্গারৈকরসং খড়্গপুস্তক-ধরং বাগীশ্বরমাত্মানং চন্দ্রস্থং ধ্যায়াৎ।"

প্রথম সাধনে পুস্তকের কথা নাই, দ্বিতীয় সাধনে পুস্তকের কথা বেশী আছে। যাহা হউক, বালাকৃতি, লালিত্য ও শৃঙ্গার-রসে উজ্জ্বল, চীরকধারী, কুমারাভরণে সজ্জিত, খড়্গাধর আমাদের এই মূর্ত্তিটি যে স্থিরচক্রমঞ্জুশ্রী দেবের এই বিষয়ে আমরা প্রায় নিশ্চিত হইতে পারি। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিপুণ শিল্পী দেবমূর্ত্তির গায়ে যে লালিত্য, শৃঙ্গার-রস এবং নবযৌবনের অপূর্ব্ব শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, দারু-ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই মূর্ত্তিটিতে তাহার লুপ্তাবশেষ দেখিয়া এ-যুগেও আমরা বিস্মিত ও প্রশংসামুখর না হইয়া পারি না।

মূর্ত্তিটি উচ্চতায় চারি ফুট সাড়ে-নয় ইঞ্চি। ইহার বয়স সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এইটুকুই বলা যায় যে, এই মূর্ত্তি প্রাক্-মুসলমান যুগের। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব-বঙ্গে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, আনুমানিক ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেন-বংশের পতনের পর ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর রাজধানীতে "নারায়ণকৃপাপ্রসাদসমাপাদিত গৌড়রাজ্যং" অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের বংশের রাজত্ব। এই অরিরাজ দনুজমাধব দশরথ দেব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট দনুজ রায় বলিয়া পরিচিত। ইনি পরম বৈষ্ণব, নারায়ণের কৃপায় গৌড়রাজ্য—অর্থাৎ বিস্তৃত সেন-রাজ্যের পূর্ব্ববঙ্গ অংশে অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া নিজের আদা-বাড়ী তাম্রশাসনে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশের অধিকারকালে রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে, অথবা অব্যবহিত বাহিরে বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। দনুজ রায়ের বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন-বংশ ও বর্ম্ম-বংশের অধিকারকাল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে এক কথা আছে। সামলবর্ম্মের বজ্রযোগিনী শাসনে দেখা যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতিকামনায় বিষ্ণুচক্রমুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত তাম্রশাসন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞা-পারমিতার মন্দিরে ভূমি দান করিতেছেন। কাজেই ঐ-যুগে রাজবাড়ীর নিকটেও বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান সম্ভব নহে। বর্ম্ম-বংশের পূর্ব্বে পরমসৌগত মহা-রাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর রাজধানী হইতে পূর্ব্ববঙ্গ

চৌকাঠের উপরের কাঠ। নাটেশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত

শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে (আনুমানিক ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবাড়ীতে বৌদ্ধ মন্দির থাকাই স্বাভাবিক এবং এমন অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ঐ আমলেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত। এই হিসাবে এই দারু-মূর্ত্তিটির বয়স প্রায় ৯৩৭ বৎসর হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়।

ইছামতী নদীর তীর হইতে দক্ষিণে প্রশস্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তার দুই পারে কি ভাবে বিক্রমপুর রাজধানীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মানচিত্রখানি অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। হিন্দু-আমলের এই সুপ্রশস্ত রাস্তা অদ্যাপি কাচ্‌কী দরজা নামে পরিচিত এবং এই ইছামতী-তীর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণস্থ প্রাচীন পদ্মা-মেঘনাসঙ্গম পর্য্যন্ত অদ্যাপি ইহার অস্তিত্ব অনুসরণ করা যায়। ইছামতী-তীর হইতে আরম্ভ করিয়া মাকুহাটীর খাল পর্য্যন্ত এই রাস্তার যে অংশ, সেই প্রায় ছয় মাইল বিস্তৃত স্থানে, রাস্তার দুই ধারে এবং বিস্তৃত জলাশয়গুলির পারে পারে নাগরিকগণের অট্টালিকা, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া বিস্তৃত নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। মানচিত্রে অনেকগুলি দীঘির অবস্থান দেখান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত রামপাল দীঘি লম্বায় মাইলের তৃতীয়াংশেরও বেশী। নৈর পুকুর* এবং ধামারণের দীঘি রামপালের দীঘি হইতে আয়তনে বড় কম নহে। বিক্রমপুরে প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ ঢিপিগুলি দেউল নামে পরিচিত। দেউলগুলির সংলগ্ন প্রায়ই একাধিক দীঘি বিদ্যমান। এই সমস্ত ছোট-বড় দীঘি হইতে সর্ব্বদাই কাঠ ও পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তি ইত্যাদি বাহির হইতেছে। এইরূপ কয়েকটি দারু-ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

রামপাল দীঘির দক্ষিণ পারে জল শুকাইয়া অনেকটা স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। ঐ ভরাট জমির ২-চিহ্নিত স্থান হইতে মাটি তুলিতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইটি কারুকার্য্য-মণ্ডিত কাষ্ঠস্তম্ভ পাওয়া যায়। স্তম্ভ দুইটি বহু দিন পর্য্যন্ত আবিষ্কর্ত্তা শেখ আবদুল গণি এবং শেখ আবদুল রহমন ভ্রাতৃদ্বয়ের বাড়ীতে পড়িয়া ছিল। সংবাদ পাইয়া আমি দেখিতে যাই। আমার অনুরোধে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় স্তম্ভ দুইটি ঢাকা মিউজিয়মে উপহার প্রদান করেন।

স্তম্ভ দুইটি লম্বায় নয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি, আকৃতিতে চতুষ্কোণ, নিম্নাংশে এক-একটি ধার এগার ইঞ্চি প্রশস্ত। স্তম্ভ দুইটির নিম্ন, মধ্য এবং শীর্ষ প্রদেশ নিপুণ কারুকার্য্য ও চিত্রাদি ভূষিত। স্তম্ভ দুইটির চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া গেল। নিম্নে পৃষ্ঠগুলির নিম্নাংশের কারুকার্য্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

১ম স্তম্ভ ১ম পৃষ্ঠ। দেবী খড়্গধারী অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। দেবীর হস্তেও হ্রস্ব একটি তরবারি।

ঐ, দ্বিতীয় পৃষ্ঠ। ঋষি ও মৃগের চিত্র।

ঐ, তৃতীয় পৃষ্ঠ। ভূমিতে পা গুটাইয়া বসা একটি উটের চিত্র।

ঐ, চতুর্থ পৃষ্ঠ। ধনুঃশর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া এক রাজকুমার হাতের উপর মাথা রাখিয়া বিষণ্ণ ভঙ্গীতে একটি গাছের নীচে বসিয়া আছেন।

দ্বিতীয় চিত্রের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে, "মৃগী-আসক্ত ঋষিপুত্র হত্যা করিয়া মহারাজা পাণ্ডুর বিষণ্ণতা" বলিয়া এই চিত্রখানির ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বিতীয় স্তম্ভ, প্রথম পৃষ্ঠ। কৃত্তিমুখ নামে প্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্য চিহ্ন।

ঐ, দ্বিতীয় পৃষ্ঠ। অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্যপরায়ণা রমণী।

ঐ, তৃতীয় পৃষ্ঠ। ধনুঃশরধারিণী রমণীর পাখী-শিকারের দৃশ্য। সঙ্গে একটি কিশোরী। উপরে দুইটি পাখী উড়িয়া যাইতেছে। ধনুর ছিলা পাখীর দিকে এবং বাণ রমণীর নিজের দিকে স্থাপিত। ব্যঙ্গচিত্র।

ঐ, চতুর্থ পৃষ্ঠ। লতাপাতা।

একটি স্তম্ভ যে কৃত্তিমুখ চিহ্নাঙ্কিত, ইহা হইতেই বলা যায় যে, স্তম্ভ দুইটি প্রাক্-মুসলমান যুগের। এগুলি ঐ আমলের দারু-তক্ষণ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই সঙ্গে একটি বৃহৎ দ্বারের চৌকাঠের উপরের কাষ্ঠখানির চিত্র দেওয়া গেল। ইহার উপরে পরস্পরে জড়ান দুইটি নাগের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দিনাজপুর

* এই নৈ এক জন অজ্ঞাতকুলশীল রাজার নাম বলিয়া মনে হয়। পুকুরের আয়তন দেখিয়া মনে হয়, ইনি বেশ বড় রাজা ছিলেন। ভাগীরথীর উভয় কূলেও নৈহাটি অভিধেয় গ্রামগুলির নামে, এই রাজারই নাম বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অপর পক্ষে বক্তব্য এই যে, নৈ নদী শব্দের অপভ্রংশ, হওয়াও অসম্ভব নহে।

জেলায় বাণগড়ে কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত অনুরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ নাগদ্বার আবিষ্কৃত হয়। উহা অদ্যাপি দিনাজপুর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। আমাদের নাগদ্বার কাষ্ঠখানি নাটেশ্বর গ্রামের দেউলের উত্তরস্থ একটি পুষ্করিণী হইতে মানচিত্রে ৩ চিহ্নিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

এই সঙ্গে যে একটি স্তম্ভশীর্ষের চিত্র দেওয়া হইল উহা সোনারঙ্গ গ্রামের দেউলের নিম্নস্থ পুষ্করিণীতে, মানচিত্রে ৪ চিহ্নিত স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। উহাতে দেখা যায়, স্তম্ভদ্বয়ের অভ্যন্তরে ত্রিভঙ্গ খিলানের নিম্নে যোগস্বামী বিষ্ণু যোগাসনে বসিয়া আছেন। এই স্তম্ভশীর্ষটি এত ভারী যে মনে হয় যেন কাঠ পাথর হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কাঠ কাঠই আছে, পাথর হয় নাই। কিন্তু যে কাঠ হাজার বছর পরেও এমন দৃঢ়সত্ত্ব, তাহা মূলে যে কত বড় বৃক্ষের সার ছিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

সজীব গরুড়-মূর্ত্তিটি রঘুরামপুর গ্রামে রামপাল দীঘি হইতে অনতিদূরে একটি পুরাতন পুষ্করিণী খুঁড়িতে পাওয়া গিয়াছিল। পঞ্চসার গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ মহাশয় নিজ ব্যয়ে এই পুষ্করিণী খনন করান এবং উহা হইতে কয়েকটি প্রস্তর ও ধাতব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত এই গরুড়-মূর্ত্তিটিও এই খননেই পাওয়া গিয়াছিল।• গরুড়ের মুখে বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্তি প্রকৃতই উপভোগ্য এবং শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মানচিত্রে ইহার প্রাপ্তিস্থান ৫-অঙ্কে চিহ্নিত করা গেল।

কাষ্ঠনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির যে একখানি ছবি দেওয়া গেল, ঐ মূর্ত্তি ত্রিপুরা জেলার মুরাদনগর থানায় কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে প্রাপ্ত। মূর্ত্তিটি কৃত্তিমুখসমন্বিত এবং সেন-যুগের বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলির অনুরূপ।

রঘুরামপুরে প্রাপ্ত গরুড় মূর্ত্তি

দারু-ভাস্কর্য্যের একটি সুন্দর নিদর্শন বিক্রমপুরস্থ আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের মিউজিয়মেও সংগৃহীত হইয়াছে।

ভিন্ দেশী

শ্রীসুশীল জানা

দুটি প্রৌঢ়ের সান্ধ্য বৈঠক। স্যানিটেরিয়ামের এক প্রান্তে একটি শান-বাঁধান বেদীর উপরে শীতলপাটি বিছাইয়া ভূতের গল্প চলিতেছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

রায়-মশায় বলিলেন, বুঝলেন গিরিধারী বাবু—যত মামদোবাজ এই আইবুড়ো ভূত—মানে, যারা বিয়ে না ক'রে মরে। উঃ, একবার যা ভুগেছিলাম আমি! সে কেবল আমার সাহস ব'লেই রক্ষা পেয়েছিলাম। সে-কথা মনে হ'লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

গিরিধারী বাবু চিৎ হইয়া শুইয়া ছিলেন—উঠিয়া বসিলেন। তিনি বিশেষ স্থূলকায়—শুইয়া, বসিয়া, কাৎ হইয়া কোনও দিক দিয়াই তিনি সুস্থির হইতে পারেন না—কেমন হাঁপাইয়া পড়েন। রায়-মশায়ের ভণিতায় তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া বলিলেন, কি রকম!

রায়-মশায় একটু কাশিয়া আইবুড়ো ভূতের গল্প সুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দুই জনের পশ্চাৎ হইতে নাকী সুরে কে বলিল, বাবু...

ওই!...বিপর্যস্ত রায়-মশায় ছুটিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এমন একটা মূর্ত্তির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল যে সাহসী রায়-মশায়ের ছুটিবার শক্তিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল—তিনি মূর্ত্তিটার দিকে হাতজোড় করিয়া নীরবে কাঁপিতে সুরু করিলেন। বেচারী গিরিধারী বাবু ছুটিতে অক্ষম—তাই তিনি সে-চেষ্টা না-করিয়া হিম দেহে সোজা শুইয়া পড়িয়াছিলেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া।

যে-মূর্ত্তিটি জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর আলোর মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল তাহা ভয় করিবার মত বটে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, উপরের পুরু ঠোঁটটা নাক পর্য্যন্ত কাটা—সম্মুখের দুইটা বড় বড় দাঁত সেই ফাঁকে উঁকি দিয়া তাহার ভীষণ আকৃতিটাকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। রায়-মশায় এবং গিরিধারী বাবুর অবস্থা দেখিয়া মূর্ত্তিটি কেমন অপ্রতিভ হইয়া আবার বলিল, বাবু!...

তাহার পুনরায় এই অনুনাসিক 'বাবু' সম্বোধনে রায়-মশায়ের হৃৎস্পন্দন প্রায় থামিতে চলিল। তিনি হাতজোড় করিয়া চক্ষু বুজিয়া কাঠের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গিরিধারী বাবু তাঁহার ঝুলিয়া-পড়া বিশাল লোমশ ভ্রূর ফাঁকে ফাঁকে পিট্ পিট্ করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন: মূর্ত্তিটির বগলে একটি পুঁট্‌লি, হাতে একটি অসংখ্য তালি-দেওয়া ছাতা। তবে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না, মূর্ত্তিটি কোন মানুষ-কি প্রেতাত্মা। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাঁহার এক প্রেততাত্ত্বিক শালার কথা—তিনি বলিয়াছিলেন, কখনও যদি কোন ভূত দেখ তাহা হইলে ভয় না-করিয়া তাহাকে সোজা জিজ্ঞাসা করিবে—সে কি চায়; বাসনাদগ্ধ প্রেতাত্মার নিকট হইতে একটি কোন উত্তর পাইবে যাহাতে তাহার কামনা শান্তি হইবে এবং উক্ত প্রেতাত্মা তাহা হইলে প্রেতলোক হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু গিরিধারী বাবুর গলা ফুটিতেছিল না—তিনি চক্ষু বুজিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে তবু কোন রকমে বলিয়া ফেলিলেন, তুমি কি চাও বাবা!...

অনুনাসিক কণ্ঠস্বর বলিল, আপনাদের যদি চাকর দরকার হয় বাবু...

ভূত অবিবাহিতই হোক্ আর বিবাহিতই হোক্—স্বাধীন তাহারা, চাকর হইতে চায় না নিশ্চয়ই। রায়-মশায় এবার চোখ খুলিলেন—পিট্ পিট্ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—মূর্ত্তিটা প্রেতাত্মা নয়, মানুষই বটে। তবে বীভৎস।

তাহার নাম রাইচরণ।

রাইচরণের সহিত প্রৌঢ় দুটির দু-একটি কথা হ...

ধীরে ধীরে—তার পর আলাপ জমিল। গিরিধারী বাবু বলিলেন, থাম—আমাদের বীরেনবাবুর একটা চাকরের দরকার ছিল—দেখি।···

পরদিন হইতে রাইচরণ স্যানিটেরিয়ামের বীরেন রায় নামক একটি ভদ্রলোকের অধীনে বহাল হইয়া গেল। লোকটি খাটিতে পারে পশুর মত—প্রভুপত্নী আরতি দেবী রাইচরণকে পাইয়া খুশীই হইল। কিন্তু ছু-এক দিন যাইতে আবার অসন্তুষ্ট হইল রাইচরণের উপর। রাইচরণ কেবল তার প্রভুর সংসারের কাজ করিয়াই ক্ষান্ত নয়—সময়মত সারা স্যানিটেরিয়ামটা সে টহল দিয়া বেড়ায়, যাচিয়া অন্যান্য সংসারগুলির ছু-একটি কাজও করে সে। কিন্তু আরতি ইহা পছন্দ করে না।

প্রভুপত্নী অসন্তুষ্ট হইলেও স্যানিটেরিয়ামের সকলেই কিন্তু রাইচরণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বিশেষ করিয়া তিন নম্বরের পরিবার। এই পরিবারটির সঙ্গে রাইচরণের ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী। সে একটু অবসর পাইলেই তিন নম্বর পরিবারের দরজার কাছে গিয়া ডাকে, কই গো মা!···

তুলসী দেবী এক গাল হাসিয়া বলেন, এস এস রাইচরণ।

তুলসী দেবী হয়ত কোনও কাজে ব্যস্ত ছিলেন—রাইচরণ তাঁহাকে রেহাই দিয়া বলে, সরুন মা সরুন আপনি। দিদিমণি কই? দেখছি নে যে তাঁকে!

রাইচরণের উক্ত দিদিমণি মুকুল—কুমারী; স্যানিটেরিয়ামের তরুণ-সমাজে সুন্দরী বলিয়া তাহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। মুকুল তাহার সুন্দর মুখ, সুগঠিত দেহটি লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করে সূচীশিল্পের সরঞ্জাম লইয়া। কদর্য্য রাইচরণের দিকে তাহার সুন্দর দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলে, রাইচরণ যে বড় আস্তে আস্তে কথা কইছ!

—চুপ্ চুপ্ দিদিমণি! রাইচরণ সন্ত্রস্ত ভাবে বলে, মা শুনলে আর রক্ষে রাখবে না। এখানে 'মা' মানে আরতি দেবী।

মুকুল বলে, তোমার যদি অত ভয় ত আস কেন রাইচরণ! বিশেষ ক'রে তোমার মা যখন এতে বিরক্ত হন!···

রাইচরণ অপ্রতিভ হইয়া বিশ্রীভাবে একটু হাসিল—কোনও কথা বলিল না। তুলসী দেবী মুকুলের উপর বিরক্ত হইয়া বলেন, কি বাজে বকিস্ মুকুল! আরতি ওর ওপরে বিরক্ত হবে কেন! তুই তোর নিজের কাজে যা ত বাপু।

মুকুল বলে, আমার কাজটুকু সেরেই আমি যাচ্ছি। দেখ রাইচরণ, তুমি অত সস্তায় উল কোত্থেকে আন বল ত! আমাদের চাকর চন্দ্র যে···

তুলসী দেবী বাধা দিয়া বলেন, তার গুণের কথা আর বলিস্ নে বাপু—চোরের ঝাড়। ও আমাদের জিনিষপত্র যে-দাম দিয়ে আনে তার চেয়ে অন্ততঃ ছুটো পয়সা সস্তায় রাইচরণ নিয়ে আসে। সমস্ত বাজার-হাট আমি এবার রাইচরণকে দিয়ে আনাব।

মুকুল বলে, সেই কথা আমিও ত বলছি মা। দেখ রাইচরণ, এই নমুনা নিয়ে যাও—মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওটা সময়মত এনে দিও আজ আমাকে।

মুকুলের আদেশে বিগলিত হইয়া রাইচরণ তাহার কদর্য্য মুখে বিশ্রীভাবে হাসিতে থাকে। তার পর তুলসী দেবীর কাজ মুলতুবি রাখিয়া মুকুলের উল আনিতে বাহির হয়। পথে সাত নম্বরের পরিবারে একবার উঁকি মারিতে ভোলে না। তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রৌঢ়া সতী দেবী বলেন, এস এস রাইচরণ—তোমাকেই খুঁজছিলাম।···

রাইচরণের গুণপনা ব্যাখ্যা করিতে রত হন সতী দেবী। রাইচরণের মত ভাল ছেলে তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই, এত অনুগত, বিশ্বাসী; বাড়ীর কর্ত্তাদের অপেক্ষাও সে জিনিষপত্র সস্তায় আনিতে পারে··· ইত্যাদি।

প্রশংসাবাদ, চাটুবাক্য কাহার না শুনিতে ভাল লাগে! রাইচরণ সবিনয়ে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে মৃছু মৃছু হাসে। অল্প অল্প প্রতিবাদ করিয়া বলে, না না—এমন বিশেষ কি···

বিশেষ বইকি! নিজের ট্যাঁক হইতে পয়সা দিয়া কে

তাহার মত সস্তায় আনিয়া দিবার বাহাদুরি করে! পাঁচ নম্বর পরিবারের ভৃত্য অভয়হরি যে-চাল টাকায় আট সের করিয়া আনে সেই চালই রাইচরণ লইয়া আসে নয় সের করিয়া। বাড়তি এক সের চালের দাম রাইচরণ যে নিজের ট্যাঁক হইতেই গোপনে দিয়া থাকে—তাহার খবর ত কেহ জানে না। একটু আদর, দুটা মিষ্টি কথা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্য স্নেহসতর্কবাণী—ইহার জন্য এই রাইচরণ যুবকটি পয়সা খরচ করে।

কিন্তু ইহা অন্য কেহ জানে না—তাই এই লইয়া কেহ মাথাও ঘামায় না। রাইচরণের ব্যক্তিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অত বড় ধনী গিরিধারী বাবু তাহাকে দেখিলে উঠিয়া বসেন—নিতান্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া বলেন, রাইচরণ, এখানে শরীরটরির ভাল থাকছে ত! একটু সাবধানে চলা-ফেরা ক'রো বাপধন—বড্ড সাপ এ-দেশে। তার পর স্ত্রী চন্দ্রপ্রভাকে ডাকিয়া বলেন, রাইচরণ এসেছে যে গো – চালের টাকাটা দাও না।

চন্দ্রপ্রভা বলেন, কালই ত চাল এল···এ-হপ্তায় আর আনাতে হবে না।

গিরিধারী বাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া আবার শুইয়া পড়িলেন—চালের পয়সাটা আজ আর বাঁচান গেল না। তিনি রাইচরণকে দিয়া টাকায় আট সের হিসাবেই চাল আনান এবং বাকী এক সেরের দামটা লাভ হিসাবে - সঞ্চয়া তিনি সঞ্চয় করেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রঙীন জামা পরিয়া প্রজাপতির মত ইতস্তত: ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শিকড়-ঝোলা এক অশ্বত্থ গাছের তলে—কুঁচিলা-বনের অন্তরালে বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের মৃদু গুঞ্জনে আকুল একটি ছোটখাট মজলিস—তাহাদের আচম্‌কা এক-একটি দম্‌কা উচ্ছল হাসিতে অলস শরৎ-মধ্যাহ্নের ধ্যানগম্ভীর ভাবটা মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইতেছে। ইহাদের কিছু দূরেই প্রৌঢ়ের দল দরো পাতিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া আছেন—আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তা সকলের মুখমণ্ডলে। ইহাদের কিছু দূরে ঘন কুঁচলা ও বেতের জঙ্গলের আড়ালে জন-কয়েক যুবক লুকাইয়া সিগারেট টানিতেছে। প্রৌঢ়দের বেপরোয়া তামাক খাওয়া দেখিয়া এবং নিজেদের এই হীনাবস্থায় অসন্তুষ্ট যুবকের দল প্রৌঢ়দের উদ্দেশে মুখভরা ধোঁয়া ছাড়িতেছে। মাঝে মাঝে দু-একটি তরুণ মেয়ে-মজলিসের পাশ ঘেঁষিয়া অকারণ কর্ম্মব্যস্ততায় ছুটিয়া যাইতেছে চোখমুখ রাঙা করিয়া। ইহার পরেই কাঁচাবয়সী মেয়েদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া যায়, তার পর কাচ ভাঙার মত হালকা এক লহর হাসি। কে যেন বলে, কমলেশ বাবু মুকুলের পাতে তখন পরিবেশনের সময় দুটো সন্দেশ বেশী দিয়েছিলেন। উত্তরে অপরাধিনী মুকুল ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে—সুন্দর চেহারা তাহার অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠে।

ইহাদের আজ পিক্‌নিক্ ছিল।

এই দলটির সকলেই স্বাস্থ্যান্বেষণে ভুবনেশ্বরে আসিয়াছেন, থাকেন একই স্যানিটেরিয়ামে, সকলেই বাঙালী। বিদেশে আসিয়া সকলের মধ্য দিয়া একটা স্নিগ্ধ প্রীতির স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই পরস্পর পরস্পরের শারীরিক কুশল-সংবাদ রীতিমত ব্যাকুলতার সহিত লইয়া থাকেন।

বর্ষীয়ান পুরুষদলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নজরে পড়ে গিরিধারী বাবুকে। শুইয়া, বসিয়া, আড় হইয়া তিনি হাঁসফাঁস করিতেছিলেন—আপাতত তিনি নিঃসঙ্গ ভাবে বৃক্ষতলে শীতলপাটি বিছাইয়া শুইয়াছিলেন—খাওয়ার পর তাঁহার অস্বস্তির মাত্রাটা বড্ড বাড়িয়া যায়। তিনি শুইয়া শুইয়া ঘামিয়া একাকার হইয়া ঘন ঘন গামছা খুঁজিতেছেন। রুমালে তাঁহার চলে না—কোথাও যাইতে হইলে অবস্থাবিশেষে তোয়ালে বা গামছা সঙ্গে লইয়া যান।

ভৃত্যদের মধ্যে দলটির সঙ্গে আসিয়াছে মাত্র দুই জন—অন্যেরা গৃহরক্ষক হিসাবে স্যানিটেরিয়ামে রহিয়া গিয়াছে। গিরিধারী বাবু কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া ভৃত্যদের সাড়া না পাইয়া অদূরে মেয়ে-মজলিসের মধ্যে উপবিষ্টা স্ত্রীকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন।

চন্দ্রপ্রভা উঠিয়া আসিলেন। গিরিধারী বাবু বলিলেন, হ্যাগো, তপেশকে একবার ডেকে দিয়ো ত। ছোকরার দুটো কবিতা শুনি তবু। সকলেই কিছু করছে—আমি

যে একেবারে···বলিয়া নিজের বিপুল দেহভারের অকর্ম্মণ্য অবস্থাটা দেখাইয়া দিলেন।

তপেশ তখন এক বেত-জঙ্গলের আড়ালে বসিয়া ফাউণ্টেন উঁচাইয়া কবিতার খাতা খুলিয়া রীতিমত বিহ্বল ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। কিন্তু আকাশে কোন ভাব পাওয়া গেল না—চোখ নামাইয়া দেখিল, দূরে তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা—রৌদ্রদগ্ধ গেরুয়াবরণ পথটা একগাছি মালার মত কালো পাহাড়ের বক্ষে ঝলমল করিতেছে। পথের উপর দিয়া একটা কুকুর যেন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সমতলভূমির দিকে নামিয়া আসিতেছে। তপেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—কবিতার ভাব আসিয়াছে। ওই কুকুরটাই ধর কোন শাপভ্রষ্টা অপ্সরী—মর্ত্ত্যে আসিতেছে। ইহার সম্বন্ধে এমন কবিতা সে লিখিবে···গিরিধারী বাবু 'সিম্পলি' মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। তপেশের শ্রেষ্ঠ রসমুগ্ধ ও গুণমুগ্ধ এই গিরিধারীবাবু।

তপেশ লিখিতে যাইবে, এমন সময় একটা সোরগোল—'পালাও ··পালাও।' তপেশ ভীতভাবে চারি দিকে চাহিল। শুনিতে পাইল—তাহাদের পার্টির জনকয়েক যেন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্যাপার কি! কেন?—বাঘ নাকি!

কাহারা যেন প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল, ক্ষ্যাপা কুকুর আসছে। জন-দুইকে কামড়েছিল—মরে গেছে তারা ··পালাও।···

কোন্ দিকে!···তপেশ বিবেচনা করিবার অবসর পাইল না, কবিতার খাতা ও ফাউণ্টেন পেন কোথায় যে পড়িল ছিটকাইয়া—তপেশ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বেত-জঙ্গলে জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া, দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া সোজা ছুটিল স্যানিটেরিয়ামের দিকে।

এমন জমাট বন-ভোজন পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

রাস্তার উপরে দুইটা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল—মেয়েরা যে যাহার জায়গা লইয়া বসিয়া গেল। পুরুষের দল হাঁটিয়া আসিয়াছিল—তাই গাড়ীর দিকে না চাহিয়া সোজা ছুটিতে আরম্ভ করিল। মুস্কিল হইল গিরিধারী বাবুকে লইয়া।

তিনিও হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এখন আর তাঁহার হাঁটিবার অবস্থা ছিল না—একে খাওয়ার পর, তাহার উপর ভয়—পশ্চাতে ক্ষ্যাপা মৃত্যু ছুটিয়া আসিতেছে।

গিরিধারীবাবু আতঙ্কিত ভাবে একবার চারি দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে গাড়োয়ানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি উপরের ছাদে ব'সে ত যেতে পারি গো—কি বল।

গাড়োয়ান তাঁহার দিকে করুণ চক্ষে চাহিয়া অপরাধীর মত বলিল, আজ্ঞে, গরীব লোক বাবু মশায়।

অর্থাৎ গিরিধারী বাবুকে সে ছাদে বসিতে দিতে নারাজ। গিরিধারী বাবুকে ছাদ সহ্য করিতে পারিবে না। ছাদটা ভাঙিয়া গেলে গরীব লোক সে—মহা দুরবস্থায় পড়িবে।

গাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা কোলাহল করিয়া উঠিল—কোন রকমে আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিল না তাহারা। ক্ষ্যাপা কুকুরটা আসিয়া যদি গাড়ীর ভিতরেই ঢুকিয়া পড়ে! ··

চন্দ্রপ্রভা গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত গিরিধারী বাবুকে সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, হ্যা গো, কোন রকমে ছুটতে পারবে না!—এইটুকু ত পথ!···

উত্তরে গিরিধারী বাবু হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

মেয়েরা অতিষ্ঠ হইয়া পুনরায় গুঞ্জন করিয়া উঠিল। গিরিধারী বাবুর মেয়ে মুখ বাড়াইয়া বলিল, তুমি এক কাজ কর বাবা। ভৃত্য অভয়হরিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ওই হরি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসবে—রাইচরণ জিনিষপত্র গুছিয়ে একাই আসবে না-হয়।

রাইচরণ অসহায় ভাবে হাত কচলাইতে কচলাইতে ভয়ত্রস্ত কণ্ঠে বলিল, আমি একা থাকব!···ক্ষ্যাপা কুকুর···

মেয়েরা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কুকুরে ওকে খেয়ে ফেলবে যেন!

মেয়েদের লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পিছনে পিছনে অভয়হরি গিরিধারী বাবুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। অভয় ছুটিবার উপক্রম করিয়া বলিল, বাবু, ছুটুন—কুকুরটা এসে পড়লে আর রক্ষা নেই।

গিরিধারী বাবুর চক্ষে তখন স্ত্রী মিথ্যা, কন্যা মিথ্যা, সংসার মিথ্যা। কিন্তু অভয়কে একটু আগাইয়া যাইতে

দেখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, বাবা অভয় রে, একটু আস্তে চল্ বাবা।

ওদিকে পথের উপরে দাঁড়াইয়া রাইচরণ ভাবিতেছিল, সকলেই বিপদের হাত এড়াইয়া চলিয়া গেল—পড়িয়া রহিল সে-ই একা। নির্জ্জন বনপ্রান্ত, ধর—কুকুরটা সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং একটা কামড়ও বসাইয়া দিল। তার পর···? সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রামের এক গাদা পরিচিত লোকের মুখ মনে পড়িয়া গেল। বিদেশে এই দাসবৃত্তির উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিল সে। আজ এইখানে মরিয়া পড়িয়া থাকিলে কেহই তাহার খোঁজ করিবে না।

নাঃ, ভয় করিয়া সময় কাটাইলে চলিবে না—জিনিষপত্র অনেক গুছাইতে হইবে তাহাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—জিনিষপত্র গুছাইয়া রাইচরণ নির্ব্বিঘ্নে বাসায় ফিরিল।

নির্ব্বিবাদে স্যানিটেরিয়ামে ফিরিয়া রাইচরণ সকলের মুখের দিকে একবার করিয়া তাকাইল, কিন্তু কেহই তাহাকে তাহার পথের বিপদের কথা কিংবা ক্ষ্যাপা কুকুরটার কথা আতঙ্কে একবার জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু কিছু একটা বলিবার জন্য সে তখন ছটফট করিতেছিল।

গিরিধারী বাবু মহাদেবের মত লোক, দয়ামায়া আছে। রাইচরণ তাহার কদর্য্য মুখটা ভীরু পাণ্ডুর করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "বুঝলেন বাবু, সেই কুকুরটা হঠাৎ সুমুখে এসে এই কামড়ায়···সেই কামড়ায়! তার পর···

গিরিধারী বাবুর মেজাজ খারাপ ছিল—গর্জ্জিয়া উঠিলেন, ভাগো হিঁয়াসে, সব স্বার্থপরের দল। তিনি গড়গড়ার নল তুলিয়া তাড়া করিলেন।

রাইচরণ সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। প্রভুপত্নীর কাছে গিয়া বলিল, জানেন মা, সেই কুকুরটা···

আরতি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, তোর বাবু যে এখনও ফেরে নি রে রাইচরণ! সেই কখন বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছেন···

রাইচরণের প্রভু বীরেন রায়, ছোকরা মানুষ—স্বাস্থ্য ও শিকার দুইটার খোঁজেই আসিয়াছে। প্রত্যহের মত বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াছে—রাইচরণও আজ সঙ্গে যায় নাই। অথচ কোথা হইতে একটা ক্ষ্যাপা কুকুর···আরতি বিচলিত হইয়া উঠিল। রাইচরণের দিকে ভীরু চোখ তুলিয়া বলিল, একটু এগিয়ে দেখ্ না রাইচরণ!

রাইচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, ক্ষ্যাপা কুকুরটা যে আবার এইখানেই ঘুরছে মা। তখন আমাকে···

রাইচরণ কথাটা শেষ করিতে পাইল না—আরতি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, বলিস্ কি রাইচরণ! কি হবে তা হ'লে রে! বাবু যে···

রুগ্ন শরীরে বেশী উত্তেজনা সহিল না—আরতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই স্যানিটেরিয়ামেরই অন্য একটি ঘরে তখন ক্রন্দন সুরু হইয়াছে। রাইচরণ বিরস বদনে সেখানে উঁকি মারিতেই সকলে আঁতকাইয়া উঠিল—ক্ষ্যাপা কুকুরটা আসিয়াছে বুঝি, দুটি লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে সে! কিন্তু রাইচরণকে চিনিতে পারিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। রোরুদ্যমানা যোগমায়া বলিলেন, আমাদের অতীশ কোথায় গেল একবার দেখ্ না রাইচরণ—দু'টা টাকা তোকে জল খেতে দেব বাবা। কোথায় ক্যামেরা নিয়ে গেল সে···

হারাধন বাবু শঙ্কিত নেত্রে জানালা দিয়া উঁকি মারিতে-ছিলেন—যদি অতীশকে দেখা যায়; কিন্তু তাহাকে দেখা গেল না। তিনি ফিরিয়া রাইচরণের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

রাইচরণ ইহার মানে বুঝিতে পারিল। কিন্তু সেই বা যাইবে কেন! তাহার জন্য ইহারা কেহ ভাবিতেছে না কেন? রাইচরণ বলিল, যে কুকুর বাবু, গায়-গতরে এত বড়টি—বলিয়া সে দুই হাত দিয়া আকৃতিটা দেখাইয়া দিল—অর্থাৎ একটা ময়ূরভঞ্জের হাতীর মত। রাইচরণ তাই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। এখন যদি মুখোমুখি প'ড়ে জব্দ করতে না পারি!···

—পারবি, পারবি রাইচরণ—লক্ষ্মী বাপ আমার। যোগমায়া রাইচরণের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, তোর মার মত আমি—হাতে ধরছি।··

রাইচরণ খুশী হইয়া বলিল, মার মতন কেন—মা-ই ত। তার পর জোর করিয়া দুশ্চিন্তার ভাব একটা লইয়া বলিল, কুকুরটা যে ক্ষ্যাপা; কামড়ালে কি আর রক্ষে আছে!—কি বল মা?

যোগমায়া বলিলেন, তবু তোরা জব্দ করতে পারবি। দেখ্ বাবা একবার।

রাইচরণ মনে মনে গোঙাইতে গোঙাইতে চলিয়া গেল। তাহার জন্ম কেহই ভাবে না। হুঃ, সত্যি যদি মা হইত, তাহা হইলে ওই ক্ষ্যাপা কুকুরের মুখে তাহাকে পাঠাইত না কি!

রাইচরণ ক্ষুণ্ণমনে অন্য একটা ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ মুখোমুখি দেখা মুকুলের সহিত। রাইচরণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জানেন দিদিমণি, ক্ষ্যাপা কুকুরটা তখন···আপনারা ত গাড়ীতে চলে এলেন···

অত ভণিতা শুনিবার মুকুলের ধৈর্য্য ছিল না—ভীরু চোখ তুলিয়া সে বলিল, কামড়ায় নি ত! কি সর্ব্বনাশ!··

দরদী পাইয়া রাইচরণ বলিল, কামড়েছিল আর একটু হ'লে।

—কি ভয়ঙ্কর!···

রাইচরণ খুশী হইয়া বলিল, দেখুন না ফের—এই আমাদের বাবুকে আবার খুঁজতে যেতে হবে। ধরুন যদি কামড়েই দেয়—মরে যাব ত! মা, ভাই-বোন কোথায় কে রইল, বিদেশে এসে···রাইচরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ তাহার সত্যই ছলছল করিয়া উঠিল।

তুলসী দেবী এই সময়ে আসিয়া বলিলেন, রাইচরণ বাবা, তোকে বকশিশ দেব বাবা।—তখন তাড়াহুড়োতে পানের ডিবেটা কোথায় যে ফেলে এলুম—দশ ভরি রূপোর ডিবে—সোনার মিনে···কেউ পেলে কি আর ছাড়বে! যা না বাবা এক্ষুনি একবার!···তুলসী দেবী ব্যাকুলভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে যখন তিনি প্রথম নববধূরূপে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন স্বামী তাঁহাকে উক্ত ডিবা প্রথম উপহার দিয়াছিলেন। স্বামী আজ বৎসর দুই স্বর্গগত···প্রথম স্মৃতিচিহ্নটাও হারাইতে বসিয়াছে।

রাইচরণ বুঝিল সমস্তই, কিন্তু অক্ষমের মত মাথা চুলকাইতে লাগিল। মুকুল তার হইয়া জবাব দিল, তুমি কি যে বল মা! শুনলে এই ক্ষ্যাপা কুকুরের কথা—একটা লোকের জীবন বড়, না তোমার পানের ডিবেটা বড়!

রাইচরণ কৃতজ্ঞ ভাবে মুকুলের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এই মেয়েটির সত্যি সত্যি দয়ামায়া আছে বটে। তুলসী দেবী হতাশ ভাবে চলিয়া গেলে পর রাইচরণ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, ঠিক বলেছেন দিদিমণি—যদি কামড়েই দেয় কুকুরটা! তখন ত কামড়েছিল এক রকম—মনে হচ্ছে, কোথাও যেন নখের আঁচড়-টাঁচড় একটু লাগিয়ে দিয়েছে।

দেহের উপর নখের আঁচড় খুঁজিতে লাগিল রাইচরণ।

কিন্তু সত্যই কোন কুকুরের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ না-হওয়ায় রাইচরণ কোন প্রকারের ক্ষতচিহ্ন দেখাইতে পারিল না। মুকুলের সম্মুখে সে একটু লজ্জায় পড়িয়া গেল—মনে মনে ভাবিল, মুকুল হয়ত তাহাকে মিথ্যাবাদী ভাবিল। তা ভাবুক, নিজেকে আজ সে কাহারও অপেক্ষা ছোট ভাবিতে পারিতেছিল না—হইতে পারে, শত মিথ্যাভাষণের দ্বারা তাহার এই অনুকম্পা আকর্ষণ করা কাঙাল বৃত্তি।

অনেকের অনেক কিছু বাহিরে রহিয়া গিয়াছে—প্রায় সকলের মুখেই তাই উদ্বেগের ছায়া। কিন্তু চার নম্বরের পরিবারে কোন রকম দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ছিল না। ক্ষ্যাপা কুকুরের অতর্কিত এই আবির্ভাবে এই পরিবারের কর্ত্তা প্রৌঢ় মনোহর বাবু খুশীই হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বুঝাইতেছিলেন, একে ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী—একটু কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তা না, কুঁচলা-জঙ্গলের মধ্যে ব'সে ব'সে অনবরত ছাইপাঁশ লেখা। এই ক্ষ্যাপা কুকুরের হিড়িকে তপেশ আমাদের যদি লেখা ছেড়ে, একটু ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তা হ'লে···বলিয়া মনোহর বাবু মাথা ঝাঁকাইলেন। অর্থাৎ তপেশের ডিস্‌পেপসিয়া তাহা হইলে সারিয়া যাইবে।

রাইচরণ সন্ধ্যার মুখে ফিরিয়া আসিল—প্রভু বীরেন রায় বা ক্যামেরা-পাগল অতীশকে কোথাও সে খুঁজিয়া পায় নাই। এই সংবাদটা দিতে গিয়া সে বারান্দার মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। বড় হলটায় বীরেন, অতীশ এবং আরও কয়েক জনকে ঘিরিয়া মেয়ে-পুরুষের রীতিমত ভিড়। সে সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছেঁড়া টুকরা কয়েকটা কথার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিল—মাঝখানে ঐ যে জন সাত-আট যুবক বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া, যাহাদের ঘিরিয়াই জনতা—তাহারা শিকারে গিয়াছিল···রীতিমত ভরতপুরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেখানে বাঘ, ভালুক ইত্যাদি হিংস্র পশুর দল পর্য্যাপ্ত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের কাহারও সহিত

শিকারীদের সাক্ষাৎ হয় নাই—কাজে কাজেই কয়েকটা বক শিকার করিয়া বীরের দল প্রত্যাগমন করিয়াছে।

রাইচরণ ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেল। প্রভু বীরেন রায়ের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ম্লান মুখে, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান বাবু। মা এদিকে ঘন ঘন ফিট হচ্ছেন।…

বীরেন গম্ভীর ভাবে হাসিল।

রাইচরণ তার পর ধীরে ধীরে জানাইল যে প্রভুর খোঁজে সে ত যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল বনে সারাটা দ্বিপ্রহর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বাঘের 'হালুম' শব্দে তাহার অন্তরাত্মা গুড়ুম হইয়া গিয়াছিল।

শিকারীর দল কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল, দূর গাধা, কোথায় বাঘ! জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বীরেন বলিল, যাকে আমরা গাইড হিসেবে নিয়েছিলুম সে বেটা খালি বলে, 'বাবু—আর একটু গেলেই বাঘ মিলবে, আর একটু গেলেই হরিণ মিলবে'—কিন্তু কোথায় কি! সারাটা বন ঘুরে ঘুরে হয়রান।

রাইচরণ বেইজ্জত হইল। জনতা হাসিয়া উঠিয়া বলাবলি সুরু করিল, আসা অবধি শুনছি—রাইচরণ আমাদের রাস্তায় বেরলেই অজগর সাপে তাড়া করে, নেকড়ে বাঘে তাড়া করে, বুনো মহিষে শিঙ নাড়ে।…

রাইচরণ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিল, সত্যিবাবু সত্যি মা, বনের মধ্যে আজ বাবুকে খুঁজতে খুঁজতে ইয়া এক কেঁদো বাঘ ··

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

তার পর জনতা ধীরে ধীরে ভাঙিয়া গেল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিকারীদের শাসাইবার জন্য অভিভাবকদের কণ্ঠস্বর এতক্ষণ শোনা যাইতেছিল, শিকারীদের প্রত্যাবর্ত্তনে আর তাহা শোনা যাইতেছে না। বরং শোনা যাইতেছে সস্নেহ কণ্ঠস্বর—'এখন আর স্নান করিস্ নে,'…'ঠাণ্ডা ভাত খাস নে—ওগো, ষ্টোভে ছুটো চট ক'রে বসিয়ে দাও,'… 'এক গ্লাস সরবৎ দাও ওকে গো'—ইত্যাদি।

অবহেলিত রাইচরণ একটা সিঁড়ির ধাপে বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, সে-ও ত বনপ্রান্তে গিয়াছিল, সে-ও ত কোন বিপদে পড়িতে পারিত! তাহার কথা কেহ ভাবিতেছে না কেন! আঃ, এই সময়ে একটা বাঘ হোক, সাপ হোক, সেই পাগলা কুকুরটা হোক—নিতান্ত পক্ষে একটা ইঁদুরও যদি তাহার পায়ের কাছ দিয়া ছুটিয়া যায়—সে আর্ত্তকণ্ঠে 'রক্ষা কর' বলিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠে। সকলে বোধ করি তাহা হইলে ছুটিয়া আসিতে পারে কি হইল বলিয়া। তাহার মা এখানে থাকিলে ছুটিয়া আসিত নিশ্চয়ই, এখানে আত্মীয় কেহ থাকিলে উঁহাদের মত কত কথাই না তাহাকে শুধাইত!

এমন সময়ে উপরের বারান্দা হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিল, রাস্তায় যাস্ নে—ক্ষ্যাপা কুকুর কোথায় আছে তার ঠিক কি! ভ্যালা মুলুক বাপু…।

আঃ, এই তো তাহাকে শাসন করিবার মত অন্ততঃ পক্ষে একজনও আছে—রাইচরণ ভাবিল। তার পর খুশী হইয়া সে তব্ তব্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, কিন্তু আসিয়া দেখিল, প্রভুপত্নী তাহার ছেলেমেয়েদের ধমকাইতেছে।

রাইচরণকে দেখিয়া আরতি বলিল, কোথায় থাকিস্ তুই রে! যা—চট্ ক'রে নোটখানা ভাঙিয়ে এক ডজন ডিম নিয়ে আয় দেখি।

—অন্ধকারে…ক্ষ্যাপা কুকুরটা…

আরতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, খেয়ে ফেলবে তোকে নাকি! এমন অবাধ্য চাকর—বললুম তখন…

আরতি নোটখানা রাইচরণের দিকে ছুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রাইচরণ নোটখানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় পিছন হইতে মুকুল বলিল, কোথায় যাচ্ছিস রে রাইচরণ?

—এই…এই দেখুন না দিদিমণি, বলুন ত, এখন বাজারে যাব—অন্ধকারে ক্ষ্যাপা কুকুরটা যদি কামড়াতে ছুটে আসে! এদের কি একটুও দয়ামায়া আছে।

মুকুল অত কথায় কান দিল না। বলিল, বাজারে যাচ্ছিস তো আমাদের জন্যে এক টিন বিস্কুট কিনে আনিস—দাদা চা নিয়ে ব'সে আছেন। এই টাকা নে।

মুকুল টাকা দিয়া চলিয়া গেল।

তাহাকে যত ক্ষণ দেখা গেল তত ক্ষণ রাইচরণ অশ্রুসিক্ত ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোয়াড়ে গাল বাহিয়া অশ্রুর ফোঁটা কয়েকটা ঝরিয়া পড়িল। গায়ের সুতীর চাদরটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বাজারে ডিম বা বিস্কুট কিনিতে দেখা গেল না—দেখা গেল ষ্টেশনে টিকিট কিনিতে।

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী-সংগঠনের আদর্শ

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সকলেই জগদ্বরেণ্য কবি রূপেই জানি। কিন্তু তিনি যে এক জন সত্যকার স্রষ্টা, সংস্কারক ও কর্ম্মী তাহা অতি অল্প লোকেরই জানা আছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার প্রেরণা ও প্রস্রবণ বঙ্গদেশের নিভৃত পল্লীতে। এই সকল নিভৃত পল্লীতে কবি শুধু নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই উপভোগ করেন নাই—পল্লীসমাজের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীর অভাব, অভিযোগ, দৈন্য কবির মনকে অভিভূত করিয়াছে; পল্লীবাসীর জন্য কবি অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কবির বিবিধ রচনার মধ্য দিয়া পল্লীজীবনের কত হৃদয়স্পর্শী কাহিনীই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সব রচনা মাত্র কবির কল্পনা-প্রসূত নহে—এগুলি তাঁহার বাস্তব জীবনের সত্যকার রূপ।

যখন কবির বয়স ত্রিশ বৎসর তখন তিনি স্বেচ্ছায় জমিদারী তদারকের গুরুভার গ্রহণ করেন। কোন প্রকার খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর এই গুরুভার গ্রহণ করেন নাই। এই প্রকার কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্বের বিষয় তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। যে দারিদ্র্য পল্লীবাসীর অভাব, অভিযোগ ও দৈন্য কবির মনকে এত দিন অভিভূত করিয়াছিল জমিদারী তদারকের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। এইখানেই কবি পল্লী বাস্তব জীবনের সহিত হাতে-কলমে পরিচিত হন এবং পল্লীর নানা প্রকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কবির পল্লী-সংগঠন-জীবনের এই সূচনা। এইখানেই কবি প্রথম বুঝিতে পারেন যে আমাদের দেশের লোক কত নিরুপায়, অসহায় ও দুর্ব্বল, কত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; পল্লীর সমস্ত দুঃখের মূলে যে প্রকৃত শিক্ষার অভাব ও সহযোগিতার অভাব তাহা কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন।

যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা সত্যকার কর্ম্মী ও দেশ-সেবক সৃষ্টি হয়, এই আদর্শ মনে রাখিয়াই ১৯০১ সনে কবি শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার অভাব, প্রাণহীনতা ও ব্যর্থতা কবির মনকে গভীরভাবে পীড়া দেয়। কবি অন্তরে অনুভব করেন যে শুধু বাহিরের লেখাপড়াই আমাদের শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। যাহাতে মানুষের প্রতি মানুষের সহজ সম্বন্ধ, প্রীতি, সেবা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়, যাহাতে মানুষের দুঃখে-কষ্টে, অভাব-অভিযোগে, বিপদে-আপদে আমরা আত্মোৎসর্গ করিতে পারি, যাহাতে আমাদের অন্তরের কোমল হৃদয়-বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্তি হয় সেই শিক্ষাই আমাদের আসল শিক্ষা, সেই শিক্ষারই আমাদের আসল প্রয়োজন। যাহাতে আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি, এই বাণীই কবির শিক্ষার মূলমন্ত্র। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কবি বলেন:—

ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিয়ম রক্ষা; যাহাতে সামাজিকতা-বৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন; আপৎকর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীর সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্যে তৎপরতা; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৎপ্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বোধের উদ্রেক; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে ন্যায়পরতার বিকাশসাধন; সভ্য সমাজে লোকহিতের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ;—এইগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপতঃ, মনে, হৃদয়ে, ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজেদের প্রতিবেশকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে। ('বিশ্বভারতী লোকসংসদ')

এই আদর্শকে পল্লীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে রূপ দিবার জন্যই ১৯২২ সনে তিনি শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জ্জীব পল্লীর মধ্যে যাহাতে প্রাণের সঞ্চার হয়, যাহাতে গ্রামবাসিগণ আত্মনির্ভরশীল, সচেষ্ট ও

কর্ম্মঠ হয়, যাহাতে গ্রামে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্য বিস্তারলাভ করে এই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়।

এক্ষণে আমরা পল্লীসংগঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ করিব। আমাদের দেশের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া কবি বলেন :—

অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়দের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, ১৯০৭)

এই কথাগুলিই কবি তাঁহার সুবিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,– ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার –
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে-অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

দেশের হিতানুষ্ঠান-কার্য্যের সম্ভাবনা ও গুরুত্বের বিষয়ে কবি বলেন :—

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিষটা যে কতই বড় এবং কত দিকেই যে তাহার অগণ্য শাখা-প্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোন সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মত নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি সুমহৎ কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানব সমাজের এত বড় একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শত সহস্র গ্রন্থি-ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে তাহার মাহাত্ম্য যেন এক মুহূর্ত্ত বিস্মৃত হইয়া আমরা কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। (রাজাপ্রজা—"পথ ও পাথেয়")

স্বায়ত্তশাসন ও স্বদেশসেবার প্রসঙ্গে কবি দেশসেবক-গণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন :—

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট কাড়িয়া লয় নাই—তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। (সমূহ—"দেশনায়ক")

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই সব বস্তুপিণ্ডের নয় দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব—একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্য সম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না, নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। (শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে অভিভাষণ—১৯৩২)

আমাদের দেশের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা সম্পর্কে এবং যে-সব কারণে আমাদের জনহিতকর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে তাহার বিষয় কবি বলেন :—

'আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি বর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরল ভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারো নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্বুদের মত ফুটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুই দিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জ্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তারপর কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়াই হউক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন রিপোর্ট, ধুমধাম ও খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে তাহার পরই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্য্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল পরিণতির শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় ও ভাবনার বিষয়। (রাজাপ্রজা—"ইংরাজ ও ভারতবাসী"—২৮)

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম. জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোন কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্ম্মের বাধা-বিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই ত কর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ নহে—স্থির বুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি. যে তাহার চেয়ে বড়। (রাজাপ্রজা—'পথ ও পাথেয়")

পূর্ব্বে কংগ্রেসে ও প্রাদেশিক সভায় ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতার প্রচলন ছিল। এই প্রকার বিদেশী ভাষা ও বিদেশী ভাবাপন্ন সভা-সমিতি কখনই দেশের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাই লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন:—

মনে কর প্রভিন্শ্যাল কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তন গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার আছে. যাহা কিছু সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত। (সমূহ—'স্বদেশী সমাজ")

আমাদের দেশের এই সব নানা প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আমাদের দেশের লোকের কি কর্ত্তব্য হওয়া উচিত সে সব বিষয়ে কবির মতামত—

আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্ত এখনই আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।" (সমূহ—"দেশনায়ক")

কোন উপায় নেই, এত বড় মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। (শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক অভিভাষণ—১৯৩২)

মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করব সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেচি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্তে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপন পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। 'দেবাঃ দুর্ব্বলঘাতকাঃ'। (শ্রীনিকেতনে অভিভাষণ, ১৯৩২)

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্ব্বলচিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্তকে ভুলাইবার জন্ত কেবল কতকগুলো ব্যর্থ বাক্যের ধূলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকে আবিল আকাশকে আরো অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়। ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগ প্রকাশের উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্ত্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে। (রাজাপ্রজা—"পথ ও পাথেয়")

আমরা সাধ্যমত বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

নিজ হাতে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে;—

তখন লর্ড কার্জ্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোন কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্ব্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। ("পথ ও পাথেয়")

বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজেরা ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটা প্রকৃষ্ট সাধনা। (শ্রীনিকেতনে অভিভাষণ, ১৯৩২)

যেখানে যাহার কোন অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্ত আমাদিগকে যাইতে হইবে; অন্ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্ত আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, আমাদিগকে আর কেহই আমাদের নিজের স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

শোষণ-নীতি অনুসরণ না করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করা দেশের জমিদারগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন :—

দেশের জমিদারদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে এ কাজ কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্ত্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব্ব হইবে বলিয়া আপাততঃ আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্ব্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ)

দেশে যখন সফলতার দিন দেখা দিয়াছে কবি তখন দেশবাসীকে আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন :—

মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে, এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। (রাজাপ্রজা—"সমস্যা")

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিও না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব। (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ)

দেশসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে কর্ম্মীকে কত কঠোর তপস্যা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে তাহার আদর্শ সম্বন্ধে কবি বলেন :—

ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে।—("এবার ফিরাও মোরে")

পল্লী-সংগঠনের এই সব সমস্যা ও উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই কবি শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক পল্লী-সংগঠন প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই প্রথম। পল্লী-সংগঠনের আজকাল নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে; দেশ যখন পল্লী-সংগঠনের কোন সুসম্বদ্ধ কার্য্যপ্রণালীই নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারীতে পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য্যের সূচনা করেন এবং তাহার পর হইতে কর্ম্মীদিগের সহযোগিতায় শ্রীনিকেতনে তাঁহার পল্লীসংগঠনের আদর্শকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।
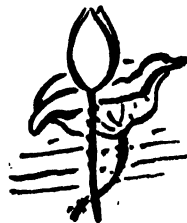
তরাইয়ের তরুণী

শ্রীযুক্তা ডক্টর সেলমা লাগেরলভের মূল সুইডিশ উপন্যাস হইতে
তাঁহার অনুমতি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত

শ্রীসেলমা লাগেরলভ ও শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

গুডমুণ্ডের মনে হইল, হিলডুর তাহার ভালবাসার সুযোগ লইয়া হেল্‌গাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিতে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত গুডমুণ্ড মনে করিয়াছে, হিলডুরের মত মেয়ে আর নাই; শতমুখে সে তাহার প্রশংসা করিয়াছে, সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে। হিলডুরের সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের তুলনাই চলে না—তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইবে বলিয়া গুডমুণ্ড খুবই গর্ব্ব অনুভব করিত। বিবাহ করিয়া তাহারা অনেক ধনসম্পদের মালিক হইবে এবং সকলেই তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে; হিলডুর যে-সংসারে গৃহিণী হইবে, সে-সংসারে বাস করা কতই না সুখের হইবে—এই সব চিন্তাই তাহার মন জুড়িয়া থাকিত। এ-কথাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছে যে বিবাহের পর অনেক ধন-সম্পদের মালিক হইয়া সে ঘরবাড়ী ও কৃষিক্ষেত্রের অনেক উন্নতি করিতে পারিবে, এবং নিশ্চয়ই গ্রামের মধ্যে বড় লোক বলিয়া সে পরিগণিত হইবে।

যে-দিন সকাল বেলা সে হেল্‌গার সঙ্গে চার্চ্চ হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিল সেই দিনই বিকালে সে গিয়াছিল লাবোক্রায়। হেল্‌গার কথায় হিলডুর সেদিন বলিয়াছিল, হেল্‌গা তাহাদের বাড়ী ছাড়িলে তবেই সে নেরলুন্দায় যাইবে। গুডমুণ্ড তাহার কথাকে বিদ্রূপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝা গেল যে হিলডুর সত্যই তাহা চায়। গুডমুণ্ড হেল্‌গার পক্ষ লইয়া বলিয়াছিল, দুশ্চরিত্র প্যের মোরটেনসনের বাড়ীতে হেল্‌গা যখন চাকরাণীর কাজ লয়, তখন তাহার বয়স ছিল অতি অল্প; প্যের মোরটেনসনের মত লোক যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তরুণীকে ঠকাইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু তাহার বাবা-মা হেল্‌গার তত্ত্বাবধানের ভার লইবার পর হইতে এখন তাহাকে চমৎকার মেয়ে বলা যাইতে পারে। তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া মোটেই উচিত নহে; তাহা হইলে আবার নিশ্চয়ই তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

হিলডুর কিন্তু নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। সে উত্তর দিল, "যদি এই মেয়ে নেরলুন্দায় থাকে তবে আমি কখনও সেখানে যাইব না। এরূপ মেয়েকে ঘরে রাখাটা আমি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিব না।"

গুডমুণ্ড বলিল, "তুমি কি করিতেছ তাহা বুঝিতেছ না। হেল্‌গার মত মা'র যত্ন আর কেহই করিতে পারে না। সে যে আমাদের বাড়ীতে কাজ করিতে আসিয়াছে তাহাতে বাড়ীর সকলেই সুখী। পূর্ব্বে সর্ব্বদাই মার মেজাজ রুক্ষ হইয়া থাকিত, দিন রাত তিনি বকাবকি করিতেন।"

"তাহাকে কাজ ছাড়াইয়া দিতে ত আমি তোমাকে বাধ্য করিতেছি না,—"এই বলিয়া হিলডুর চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল যে, গুডমুণ্ড হিলডুরের মতানুযায়ী না চলিলে সে তাহাকে বিবাহ নাও করিতে পারে। গুডমুণ্ড নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা হইলে তাই হইবে।"

হেল্‌গার জন্য সে নিজের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। কিন্তু হিলডুরের মতে সায় দেওয়ার পর ক্রমেই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত সন্ধ্যাকালটাই সে অবসন্ন মুখে চুপ করিয়া কাটাইল।

হিলডুরের সম্বন্ধে গুডমুণ্ড যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিত হয়ত বা তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয় এই কথা মনে করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হিলডুর যে জোর করিয়া নিজের মত তাহার উপর চালাইয়াছে এ-জিনিষটা তাহার মোটেই

ভাল লাগে নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হিলডুর নিজের মতকে যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়াও মত পরিবর্ত্তন করে নাই। শুধু জিদ বজায় রাখা ছাড়া ইহার অন্য কোন কারণ গুডমুণ্ড খুঁজিয়া পাইতেছিল না। হিলডুরকে সে বলিয়াছিল যদি হিলডুর নিজের মত প্রমাণিত করিতে পারে গুডমুণ্ড নিশ্চয়ই তাহা মানিয়া লইবে। কিন্তু ব্যাপার ঘটিয়াছিল ঠিক্ উল্টা—হিলডুর মাত্র নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্যই নির্দ্দয় ভাবে আপন মত তাহার উপর চালাইয়াছে।

ইহার পর হইতে গুডমুণ্ড হিলডুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে হিলডুরের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিত। সম্প্রতি সে হিলডুরের সম্বন্ধে যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাই কি তবে সত্য? একবার সন্দেহ হইবার পর সে হিলডুরের ব্যবহারে অবাঞ্ছনীয় অনেক ক্রটিই লক্ষ্য করিয়াছে। প্রতিবারই সে মনে মনে বলিয়াছে, "হ্যাঁ, আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম সত্যই ত দেখি তাই।" কত দিন পর্য্যন্ত হিলডুরের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই প্রশ্নই সর্ব্বদা তাহার মনে জাগিত। আবার সে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সংসারে সকলেরই ক্রটিবিচ্যুতি আছে, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িত হেল্‌গার কথা, তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত সেই আদালতের চিত্র—হেলগা বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাইবেল টানিয়া চীৎকার করিতেছে, "আমি মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে চাই। আমি এখনও তাহাকে ভালবাসি। যে মিথ্যা শপথ করে আমি তাহা চাই না।" হিলডুরও সেরূপ হউক, ইহাই তাহার ইচ্ছা। কাহাকেও বিচার করিতে হইলে এখন সে হেল্‌গার সহিত তুলনা করিয়া ভাবে, অধিকাংশ লোকই ভালবাসার ক্ষেত্রে হেল্‌গার সমকক্ষ নহে।

দিনের পর দিন হিলডুরের প্রতি তাহার ভালবাসার টান কমিয়া আসিতেছিল; অবশ্য, সে তাহাকে বিবাহ করিবে না এমন কথা মোটেই ভাবে নাই। এই বলিয়া সে নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে সাহসের অভাব কাপুরুষের লক্ষণ। এই সেদিনও ত সে হিলডুরকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণী বলিয়া স্থির করিয়াছিল!

বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে যদি এইরূপ ঘটিত তাহা হইলে হয়ত বা সে নিজের মত বদলাইবার সুযোগ পাইত; কিন্তু এখন সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এদিকে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির; এবং সেজন্য তাহাদের ঘরবাড়ী মেরামতের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে যে ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাও সে হারাইতে চায় না; আর এখন বিবাহ ভাঙিতে চাহিলে তাহার কারণ কি দেখাইবে? হিলডুর-সম্পর্কে সে যে-সব ক্রটি লক্ষ্য করিয়াছে তাহা লোকের কাছে এত তুচ্ছ যে বলিতে গেলে তাহা তাহার মুখেই থাকিবে, কেহই তাহা শুনিবেও না, বুঝিবেও না।

নিতান্ত মানসিক অশান্তির মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছিল; কোন কাজ লইয়া স্থানান্তরে গেলেই সে আনন্দলাভের আশায় মদের দোকানে ঢুকিয়া মদ কিনিয়া পান করিত। কয়েক বোতল মদ শেষ হইয়া গেলে আবার সে এই বলিয়া গর্ব্ব করিত যে হিলডুরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মনঃকষ্টের কারণ যে কি তাহা আর সে বুঝিতে পারিত না। প্রায়ই হেল্‌গার কথা তাহার মনে পড়িত, হেল্‌গাকে দেখিবার জন্য তাহার মন উতলা হইত। সে ভাবিত, হেল্‌গা নিশ্চয়ই তাহাকে অনুকম্পার চক্ষে দেখে; কারণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা সে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই জন্য সে হেল্‌গাকে এড়াইয়া চলিত।

এক দিন সকাল বেলা পথে হেল্‌গার সঙ্গে তাহার দেখা; হেল্‌গা তখন নিকটের এক গ্রাম হইতে দুধ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। গুডমুণ্ড হেল্‌গার সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু তাহার সঙ্গ হেল্‌গাকে আনন্দ দেয় নাই, সে যেন গুডমুণ্ডকে এড়াইয়াই চলিতে চায় এই ভাবেই দ্রুতপদে হেল্‌গা পথ অতিবাহন করিতেছিল, একটি কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। গুডমুণ্ড প্রায় নীরবই ছিল, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে তাহাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পথে চলিতে দূর হইতে দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ী তাহাদের দিকে আসিতেছে। গুডমুণ্ড চিন্তিত মনে পথ চলিতেছিল বলিয়া গাড়ী তাহার চোখেই পড়ে নাই, কিন্তু হেলগার চোখে তাহা ভাল করিয়াই পড়িয়াছে—সে হঠাৎ গুডমুণ্ডের দিকে চাহিয়া বলিল, "গুডমুণ্ড, তোমার ও আমার একসঙ্গে পথ চলা ভাল দেখায় না; আমার দৃষ্টির ভুল না হইয়া থাকিলে

নিশ্চয়ই ঐ গাড়ীতে এলবোক্রা-পরিবারের লোক আমাদের দিকে আসিতেছে।" গুডমুণ্ডও মাথা তুলিয়া দেখিল। সত্যই গাড়ী ও ঘোড়া এলবোক্রার। সে তখনই সরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পরমুহূর্তে শান্তভাবে হেল্‌গার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে যাত্রীসহ ঘোড়ার গাড়ী চলিয়া গেল। তখন ধীরে ধীরে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল; হেল্‌গা কিন্তু দ্রুতপদেই চলিতেছিল। পরে তাহারা পরস্পরকে ছাড়িয়া আপন আপন পথ ধরিল।

গুডমুণ্ড সেদিন হেলগার সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত বলে নাই, তবুও অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেই দিনই তাহার সুখে কাটিয়াছে।

৫

গ্রীষ্মের ছুটিতে এক দিন গুডমুণ্ড ও হিলডুরের বিবাহ হিলডুরের পিত্রালয়ে সম্পন্ন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। শুভ দিবসের কয়েক দিন পূর্ব্বে গুডমুণ্ড উৎসবের বাজার করিতে শহরে গিয়াছিল। পথে হঠাৎ গ্রামের কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে তাহার দেখা। বন্ধুরা জানিত যে বাজার করার জন্য বিবাহের পূর্ব্বে শহরে তাহার এই শেষ বারের মত আসা। তাই তাহারা তাহাকে কোন ভোজনালয়ে মদ্যপানে আপ্যায়িত করিবার জন্য ধরিয়াছিল। সকলেরই ইচ্ছা, এই দিনে সে নিজেও তাহাদের সঙ্গে মদ্যপান করে। তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই—গুডমুণ্ড সেদিন মদের নেশায় বিভোর হইয়াছিল।

পরের দিন সকাল বেলা সে এত দেরিতে বাড়ী ফিরিয়াছিল যে তাহার বাবা ও বাড়ীর চাকর-চাকরাণী সকলেই তখন যার যার কাজে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে পৌঁছিয়া কাপড়-চোপড় না ছাড়িয়াই সে বিকালবেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া কাটাইয়াছিল। ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে তাহার কোটের পকেটগুলি নানা জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে।—"আমি বোধ হয় মদের নেশায় গত রাত্রিতে মারামারিতে যোগ দিয়াছিলাম"— এই ভাবিয়া সে গত রাত্রের ঘটনা মনে করিতে চেষ্টা করিল। তাহার মনে পড়িল যে গতকল্য রাত্রি বারটার সময় বন্ধুদের সহিত এক সঙ্গে ভোজনশালা হইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তার পর? সে কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কাটাইয়াছে, না কাহারও বাড়ীতে গিয়াছিল—কিছুই তাহার মনে নাই। কে যে গাড়ীতে ঘোড়া জুড়িয়াছে, বাড়ীতেই বা সে কি ভাবে ফিরিয়াছে, কিছুই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

বড় কোঠায় ঢুকিয়া সে দেখিল, সমস্ত ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎসবের জন্য সাজান হইয়াছে। সেই দিনের গৃহকর্ম সমাপ্ত, সকলে একত্র বসিয়া কাফি পান করিতেছে, তাহার শহরে যাওয়া ও দেরিতে ফেরা সম্পর্কে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না—বিবাহের পূর্ব্বের কয় দিন সে নিজের ইচ্ছামত চলিবে এ যেন স্বাভাবিক বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইয়াছিল। সকলের সঙ্গে একত্র কফি পান করিবার জন্য সেও টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। গরম কফি একটু জুড়াইয়া লইবার জন্য পেয়ালা হইতে প্লেটে কফি ঢালিতেছে এমন সময় পিয়ন আসিয়া সে-দিনকার দৈনিক কাগজ দিয়া গেল। তাহার মা কফি পান শেষ করিয়া কাগজ খুলিয়া বড় বড় অক্ষরের হেডিংগুলি পড়িতেছিলেন।

ইহাদের মধ্যে একটি খবর :—

"গত কল্য রাত্রে শহরতলীতে গ্রামের মাতালদের সঙ্গে মজুরদের মারামারি হইয়া গিয়াছে। পুলিস তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সকলেই যে-যার পথে পলায়ন করে; শুধু এক জন মজুরকে মৃতপ্রায় অবস্থায় সেখানে পাওয়া যায়। মৃতদেহ থানায় আনার পর প্রথমে তাহার শরীরে কোন ক্ষতচিহ্নই পাওয়া যায় নাই এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে তাহার মাথার মধ্যে বড় একটি ছুরি পাওয়া যায়। ছুরির ফলা এমন ভাবে মাথায় বসিয়াছিল যে ইহা উক্ত ব্যক্তির সমস্ত তালু ভেদ করিয়াছে। হত্যাকারী হাতল লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এই গোলমালে যোগ দিয়াছিল, পুলিস তাহাদের সকলকেই চিনিতে পারিয়াছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই হত্যাকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।"

শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ যখন এই খবর পড়িতেছিলেন গুডমুণ্ড তখন হাত হইতে পেয়ালা নামাইয়া নিজের কোটের পকেটে হাত দিয়াছে। পকেট হইতে বাহির হইল তাহার ছুরি, কিন্তু তাহাতে একটি ফলা নাই। অন্যমনস্ক হইয়া তাহা দেখিতেছিল। হঠাৎ তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ সে আবার কোটের পকেটে ছুরিটা রাখিয়া দিল—যেন ইহা তাহাকে পোড়াইয়া মারিবে। সে আর কফি পান করিল না—চুপ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, সে যে একটা কিছু মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে বেশ বুঝা যায়।

অবশেষে সে সমস্ত শরীর টান করিয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিল, তার পর ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বলিল, "একটু ব্যায়াম করার প্রয়োজন মনে হইতেছে। সারাদিন শুধু ঘরেই কাটাইয়াছি।"

প্রায় একই সময়ে তাহার পিতা চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন। তাহার পাইপের তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তিনি তামাক আনিবার জন্য নিজের ছোট ঘরে গিয়াছেন। টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া পাইপে তামাক ভরিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে গুডমুণ্ড বাহিরে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ছোট কোঠার জানালা দিয়া ঘরের আঙিনার সমস্ত অংশ ভাল করিয়া দেখা যায় না। ছোট বাগানে কয়েকটি প্রকাণ্ড বড় নানা জাতের গাছ, তাহার পিছনে একটি জলাশয়। বসন্তকালে উহা জলে পূর্ণ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল একেবারে শুকাইয়া যায়। সাধারণতঃ ঐদিকে কেহ বড় যাইত না। বৃদ্ধ এরল্যাণ্ডসন মনে মনে ভাবিলেন—গুডমুণ্ড কি উদ্দেশ্যে অসময়ে ঐখানে যাইতেছে? তাঁহার চোখ গুডমুণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ছেলে কোটের পকেটে হাত দিয়া কি একটা জিনিষ বাহির করিয়া জলের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি নিজে ঘরের বাহির হইয়া ছোট বাগানের মধ্যে গেলেন ও বেড়া ডিঙাইয়া জলাশয়ের পথ হইতে কিছু দূরে অন্য দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার ছেলে সেখান হইতে অদৃশ্য হওয়া মাত্রই তিনি জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে কিছুক্ষণ জুতা খুলিয়া খালি পায়ে জলের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করিলেন কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার পায়ে কি একটা জিনিষ ঠেকিল, তিনি উহা হাতে তুলিয়া লইলেন। জিনিষ সেই ভাঙা ছুরির হাতল। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াই তিনি হাতলটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তার পর নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন। ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে আবার পকেট হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া কয়েকবার দেখিয়া লইলেন।

বাড়ীতে সকলেই শয্যা আশ্রয় করিবার পর গুডমুণ্ড ঘরে ফিরিল। বড় ঘরের টেবিলের উপর তাহার রাত্রির আহার্য্য সাজান ছিল, কিন্তু সে তাহা না ছুঁইয়া সোজা বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এরল্যাণ্ডসন ও তাঁহার স্ত্রী ছোট ঘরে শুইতেন। শেষ রাত্রে এরল্যাণ্ডসনের মনে হইল, অপর ঘরের জানালার পাশে যেন কাহার পায়ের শব্দ। তিনি বিছানা ছাড়িয়া জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন, গুডমুণ্ড জলাশয়ের দিকে যাইতেছে। সে সেখানে পৌঁছিয়া পায়ের জুত'-মোজা খুলিয়া জলে নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সে এখানে সেখানে থামিয়া পা দিয়া যেন কি একটা জিনিষ খুঁজিতেছিল। অনেকক্ষণ খোঁজার পর সে পাড়ে উঠিল, মনে হইল এখন সে চলিয়া আসিবে। কিন্তু খানিকক্ষণ পর আবার সে জলে নামিল। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক তাহার পিতা তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। অবশেষে গুডমুণ্ড ঘরে ফিরিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন রবিবার। গুডমুণ্ড গাড়ীতে করিয়া গীর্জ্জায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে ঘোড়া দুইটিকে গাড়ীতে জুড়িয়াছে এমন সময় তাহার পিতা গাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ঘোড়ার সরঞ্জাম পরিষ্কার করিতে ভুলিয়া গিয়াছ যে!" গাড়ীঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম সত্যই অপরিষ্কার। কিন্তু গুডমুণ্ড "এসব ভাবিবার সময় নাই" বলিয়া অন্যমনস্কভাবে কিছু লক্ষ্য না করিয়াই গাড়ী হাঁকাইল।

গীর্জ্জার উপাসনা শেষ হওয়ার পর সে সেখান হইতে হিলডুরকে সঙ্গে করিয়া এলবোক্রায় গিয়া সারাদিন কাটাইল। সেদিন তাহার কুমারী-জীবনের শেষ দিন উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার জন্য হিলডুরের অনেক বন্ধু তাহাদের বাড়ীতে একত্র হইয়াছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত বাড়ীতে নাচ-গান চলিল। সারাদিন গুডমুণ্ড প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি

কথাও বলে নাই, তবে মত্তভাবে নৃত্য করিয়াছিল। এক সময়ে সে এমন চীৎকার করিয়া হাসিয়াছিল—অন্যান্য সকলে এরূপ ব্যবহারের ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পায় নাই।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আস্তাবলে ঘোড়া রাখিয়াই আবার জলাভূমির দিকে অগ্রসর হইল। জুতা-মোজা খুলিয়া পরিধেয় হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া জলে নামিয়া সে কি খুঁজিতে আরম্ভ করিল। গ্রীষ্মকালের প্রশান্ত রাত্রি। তাহার পিতা জানালার পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া পুত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। সে যে মাঝে মাঝে জলে হাত ডুবাইয়া গত রাত্রির ন্যায় কি একটা জিনিষ খুঁজিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে সে পাড়ের দিকে আসিতেছিল, যেন জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়ার কোন আশা নাই। কিন্তু আবার খানিকক্ষণ পর জলে নামিতেছিল। একবার একটা পুরাতন বাল্‌তি কুড়াইয়া ছোট ছোট গর্ত্ত হইতে জল সেচিতে লাগিল। যেন সে গর্ত্তগুলিকে জলশূন্য করিয়া ফেলিতে চায়; আবার ইহা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া বাল্‌তি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আবার কোথা হইতে সে পুরাতন একটা মাছধরা জাল কুড়াইয়া আনিয়া জলে ফেলিল, কিন্তু কাদা ভিন্ন জালে আর কিছুই উঠিল না। তার পর সে সে-স্থান ছাড়িয়া আসিয়া যখন ঘরে ঢুকিল, তখন এত দেরি হইয়া গিয়াছে যে বাড়ীর সকলেই বিছানা ছাড়িয়া যার যার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল যে কাপড় না বদলাইয়াই বিছানার উপর শরীরকে হেলাইয়া দিল।

বেলা আটটার সময় তাহার পিতা তাহাকে জাগাইয়াছিলেন। শুভমুণ্ড লেপের উপরেই শুইয়া ছিল। তাহার জামা-কাপড় কাদামাখা কিন্তু সে কি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। শয্যা ত্যাগের সময় হইয়াছে, তিনি শুধু ইহা বলিয়া দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন। শুভমুণ্ড অন্য কোঠায় গিয়া অল্পক্ষণ পর জমকালো বিবাহের পোষাক পরিয়া নীচের তলায় বড় ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, চোখ চঞ্চল, কিন্তু তবুও এমন সুন্দর যেন কখনও আর তাহাকে দেখায় নাই। তাহার সর্ব্বদেহে প্রাণের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সে যেন আর রক্তমাংসের মানুষ নয়, প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

উৎসব উপলক্ষ্যে বড় ঘরটি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। তাহার মা বিবাহের যাত্রী হইয়া যাইতে অসমর্থ হইলেও উৎসবোচিত কালো-পোষাকে সাজিয়াছিলেন এবং সিল্কের শাল পরিয়াছিলেন। বাড়ীর চাকর-চাকরাণী সকলেই যার যার সর্ব্বোত্তম পোষাকে সাজিয়া আসিয়াছিল। সদ্যসংগৃহীত বার্চ গাছের পাতায় ঘরের চিম্‌নী মণ্ডিত, টেবিলটা অতি চমৎকার নূতন চাদরে আবৃত, তাহার উপর নানা প্রকারের খাদ্যবস্তু সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

সকলের খাওয়া শেষ হইলে পর শ্রীযুক্তা ঈভেবর্গ একটি স্তোত্র পাঠ করিলেন এবং পরে বাইবেল হইতে একটি অংশ বাছিয়া পড়িলেন। তার পর তিনি শুভমুণ্ডের দিকে ফিরিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন, চিরকালই সে সুপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। "ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হও" বলিয়া তিনি সর্ব্বশেষে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীযুক্তা ঈভেবর্গ নিজের বক্তব্য বেশ সুন্দর করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। তাঁহার কথা শুভমুণ্ডের মনকে অত্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। শুভমুণ্ডের চোখের জল যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল, সে তাহা সংযত করিয়া রখিল। তাহার পিতাও কয়েকটি কথা বলিলেন; "তোমার বাবা-মার পক্ষে তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া একান্তই দুঃখের বিষয়", এই বলিয়া তিনি নিজের কথা আরম্ভ করা মাত্রই শুভমুণ্ড আর চোখের জল রাখিতে পারিল না। চাকর-চাকরাণীরাও একে একে শুভমুণ্ডের করমর্দ্দন করিল; সকলেই এত দিন একত্র সুখে বসবাস করার জন্য ধন্যবাদ জানাইল। অশ্রুধারা তাহার চোখ দুটিকে বাষ্পাকুল করিয়া দিতেছিল। সে কয়েকবার গলা পরিষ্কার করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একটি কথাও সে পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিল না।

বিবাহের আসরে উপস্থিত থাকিবার জন্য শুভমুণ্ডের সঙ্গী হইয়া তাহার পিতার বিবাহবাড়ীতে যাওয়ার কথা। তিনি গাড়ীতে ঘোড়া জুতিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন। পরে রওয়ানা হইবার সময় উপস্থিত হইলে পর, তিনি

গুডমুণ্ডকে ডাকিলেন। গাড়ীতে বসিয়া গুডমুণ্ড লক্ষ্য করিল যে গাড়ীটাকে সযত্নে সুন্দর করিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সে নিজে যেমন করিয়া গাড়ী-ঘোড়া চক্‌চকে করিয়া রাখিত, ঠিক তেমনই ভাবেই এগুলিকে উজ্জ্বল করা হইয়াছে। তার পর তাহার চোখে পড়িল কেমন তকতকে করিয়া উঠানটাকে সাজান হইয়াছে, আঙিনার বাহিরের দরজার দুই ধারে ও পথের উপর মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নূতন বালি ছড়ান হইয়াছে। উঠানের কোণ হইতে অনেক দিনের পুরাতন জিনিষপত্র ও কাঠের গাদা সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। দুইটি পূর্ণ বার্চ-গাছ কাটিয়া আনিয়া গেটের দুই ধারে মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ বসান হইয়াছে; তাহার উপর নিশান উড়িতেছে, নিশানের মাঝখানে ছোট ছোট জংলি ফুলের মুকুট। ঘরের বাহিরে প্রত্যেকটি জানালার চারি দিক কচি সবুজ পাতা দিয়া সাজান হইয়াছে। গুডমুণ্ড এই সব আড়ম্বর দেখিয়া আবেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পিতা গাড়ী হাঁকাইতে যাইবেন এমন সময় গুডমুণ্ড পিতার হাত টানিয়া জোরে করমর্দ্দন করিল। তাহার ভাবখানা এই, যেন সে বাবার কাছেই থাকিতে চায়। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কিছু চাই?"

গুডমুণ্ড উত্তর দিল, "না, কিছুই না, এখন রওনা হওয়াই ভাল।"

বেশী দূর যাইতে-না-যাইতেই গুডমুণ্ডের আর এক জনের নিকট বিদায় লইবার প্রয়োজন হইল। চোরাবালির তরুণী হেল্‌গা বাড়ী হইতে বড় রাস্তার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গুডমুণ্ডের বাবা গাড়ী চালাইতেছিলেন, হেল্‌গাকে দেখিয়া তিনি গাড়ী থামাইলেন।

"আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ এই শুভদিনে আমি গুডমুণ্ডকে আমার শুভেচ্ছা জানাইতে চাই।"

গুডমুণ্ড গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া হেল্‌গার করমর্দ্দন করিল। তাহার মনে হইল, হেল্‌গা রোগা হইয়া গিয়াছে। হেল্‌গার চোখ দুটি লাল, নিশ্চয়ই সে নেরলুন্দার আকর্ষণে রাতের পর রাত কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু এখন নিজেকে সুখী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার অধরে মৃদু হাসির রেখা। গুডমুণ্ড আবার আবেগে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কোন কথাই বাহির হইল না। তাহার পিতা, যিনি বিনা প্রয়োজনে কোন সময়েই কথা বলিতেন না, তিনিও এইবার বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন।

—"আমার বিশ্বাস, তোমার শুভকামনা আজ গুডমুণ্ডকে সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ দিতেছে।"

—"হ্যাঁ বাবা, তোমার ধারণা সত্য।" গুডমুণ্ড এই বলিয়া থামিয়া গেল। তার পর সকলেই হাত নাড়িয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন, তাহার পিতা আবার গাড়ী হাঁকাইলেন। গুডমুণ্ড হেল্‌গার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাশ ফিরিয়া বসিল। হেল্‌গা যখন গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন গুডমুণ্ড পায়ের উপরের কম্বল সরাইয়া হঠাৎ নড়িয়া উঠিল—যেন সে গাড়ী হইতে লাফ দিয়া নামিয়া যাইতে চায়। তাহার বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হেল্‌গার সঙ্গে আরও কোন কথা বলিতে চাও?"

উত্তর আসিল, "না, মোটেই না।" এই বলিয়া সে আবার সোজা হইয়া বসিল।

তাহারা কিছু দূর চলিয়া আসিয়াছে। তাহার বাবা অতি ধীরে গাড়ী চালাইতেছিলেন, ছেলের সঙ্গে যাইতে যেন তাঁর খুবই ভাল লাগিতেছিল, তাই তিনি গাড়ী দ্রুতবেগে চালাইতে মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না।

হঠাৎ গুডমুণ্ড তাহার পিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "কি হইয়াছে"—জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি এত জোরে লাগাম টানিলেন যে ঘোড়াও হঠাৎ একেবারে থামিয়া গেল।

"তোমরা সকলেই আমাকে ভালবাস কিন্তু আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই।"

"তুমি ত কোনদিন কোন মন্দ কাজ কর নাই। তাই নয় কি?"

"বাবা, আমি মানুষ খুন করিয়াছি।"

তাহার বাবা অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। এ যেন কোন গুরুভার-লাঘবের শ্বাস গ্রহণ। গুডমুণ্ড আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে মাথা তুলিয়া চাহিল। তাহার পিতা আবার ঘোড়া হাঁকাইয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি যে নিজ হইতেই ইহা বলিতেছ, সেজন্য আমি সুখী।"

"বাবা, তুমি কি এ-কথা জানিতে ?"

"গত শনিবার দিন সন্ধ্যার সময়ই আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে বিশেষ কোন অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে। পরে তোমার একটি ছুরি জলাভূমিতে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

"অ্যাঁ, তাহা হইলে তুমি সেটা পাইয়াছ ?"

"হ্যাঁ, আমি পাইয়াছি, দেখিয়াছি উহাতে একটা ফলা নাই।"

"হ্যাঁ বাবা, আমি জানি যে ইহার একটি ফলা নাই। কিন্তু আমার মোটেই মনে পড়ে না যে আমি খুন করিয়াছি।"

"তা নিশ্চয়ই মদের নেশায় ইহা ঘটিয়াছিল।"

"কিন্তু আমি কিছুই জানি না, কিছুই আমার মনে পড়ে না। পোষাক দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে আমি মারামারিতে যোগ দিয়াছিলাম। ইহাও আমি জানি যে ছুরির একটি ফলা নাই।"

তাহার বাবা উত্তর করিলেন, "তুমি যে এ-বিষয়ে নীরব থাকিতে চাহিয়াছিলে, ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম।"

"আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুরাও মদের নেশায় বিভোর ছিল, তাহাদেরও কিছু মনে নাই। হয়ত ছুরির হাতল ছাড়া খুনের অন্য কোন প্রমাণ নাই, তাই আমি ইহা জলে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।"

"আমারও মনে হইয়াছিল যে তুমি এরূপ ভাবিয়াছিলে।"

"বাবা, তুমি ত দেখিতেছ যে, কে খুন করিয়াছে ইহার কিছুই আমি জানি না, হয়ত বা লোকটিকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি যে তাহাকে হত্যা করিয়াছি ইহার কিছুই আমার মনে পড়ে না। আর তাই আমিও ভাবিয়াছিলাম, যে-কাজ আমি অজ্ঞানে অনিচ্ছায় করিয়াছি তাহার জন্য আমি ভুগিব কেন ? কিন্তু পরে আমার মনে হইয়াছে যে ছুরির বাঁট জলে ফেলিয়া বুদ্ধিহীনতার কাজ করিয়াছি। গ্রীষ্মকালে জল ত শুকাইয়া যায়, তখন যে-কেহ তাহা কুড়াইয়া লইতে পারে, এবং সেজন্য গত কল্য ও তার পূর্ব্বের দিন রাত্রে আমি ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

"তুমি কি তবে স্বীকার না-করিতে করিয়াছিলে ?"

"না, শুধু গত কল্য আমার মনে হইয়াছে কি ভাবে সমস্ত ব্যাপারকে চাপা দিয়া রাখা যায় এবং সে জন্য গত রাত্রে আমি মত্ত হইয়া নাচিয়াছি ও মনটাকে ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াছি, যাহাতে কেহ কিছু সন্দেহ না-করিতে পারে।"

"তুমি তাহা হইলে স্বীকার না করিয়া বিবাহ করিতে চাও ? ইহা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কাজ। তুমি কি বোঝ না যে হাতলটা পাওয়া গেলে পর তোমার নিজের দুঃখের মধ্যে হিলডুর ও তাহার পরিবারের সকলকে টানিয়া আনিবে ?"

"আমার মনে হইয়াছিল তাহাদিগকে এসব না জানানই ভাল।"

গাড়ী পূর্ণ গতিতে সামনের দিকে চলিতেছিল। তাহার পিতা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সমস্ত সময় তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। জীবনে হয়ত তিনি এত কথা পূর্ব্বে কখনও বলেন নাই।

তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতেছি, কি জন্য তুমি হঠাৎ অন্যরূপ চিন্তা করিতেছ ?"

"হেল্‌গার আগমন ও শুভ কামনাই ইহার কারণ। পূর্ব্বে আমার মধ্যে যে কঠিনতাটুকু ছিল সেটা এখন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার ভাবাবেগ চরমে উঠিয়াছিল; তোমার ও মার সম্বন্ধে আমার মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম যে আমি তোমাদের এত স্নেহ-ভালবাসার যোগ্য নই; কিন্তু তখনও আমার মনের কঠিনতা আমাকে তাহা বলিতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু হেল্‌গা আসিবার পর আমি আর আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইয়াছিল যে আমার প্রতি হেল্‌গার রাগ করা উচিত। আমি তাহার নিকট দোষী; আমার জন্যই ত তাহাকে আমাদের বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছিল।"

তাহার বাবা বলিলেন, "আমার মনে হয়, এলবোক্রায় পৌঁছিয়াই সমস্ত জানান উচিত। এ বিষয়ে কি তুমি আমার সঙ্গে একমত ?"

অস্ফুট স্বরে শুভমুণ্ড উত্তর করিল, "হ্যাঁ"—কিন্তু খানিকক্ষণ পর জোর দিয়া শান্তভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই।

আমার দুঃখের মধ্যে হিলডুরকে টানিয়া আনিবার অধিকার আমার নাই। তাহা হইলে সে কখনও আমাকে ক্ষমা করিবে না।"

তাহার বাবা তাহাতে সায় দিয়া বলিলেন, "এলবোক্রার পরিবার অন্যান্যদের মত নিজেদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী। আমি তোমাকে বলিতেছি, শুভমুণ্ড—আজ বাড়ী হইতে রওয়ানা হওয়ার সময়ই ঠিক করিয়াছিলাম যে, তুমি নিজের কথা নিজে স্বীকার করিতে মনস্থ না করিয়া থাকিলে অন্ততঃ আমাকেই তাহা বলিতে হইবে। ইহা আমার কর্ত্তব্য। নরহত্যার অভিযোগে যে কোন মুহূর্ত্তে যে গ্রেপ্তার হইতে পারে, এমন লোককে হিলডুর বিবাহ করে, তাহা আমি কখনও অনুমোদন করিতাম না।"

তিনি ঘোড়াকে চাবুক লাগাইয়া যত দ্রুত সম্ভব গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিলেন,

"তোমার পক্ষে স্বীকারোক্তি করা যে কত কঠিন, আমি বেশ বুঝি; কিন্তু আমরা এমন ব্যবস্থা করিব যে তাহাতে অধিক সময় লাগিবে না। আমার বিশ্বাস যে এলবোক্রার পরিবার তোমার কার্য্যকে উচিত বিবেচনা করিবেন এবং সে জন্য হয়ত বা তাঁহারা তোমার প্রতি সদয়ও হইতে পারেন।"

শুভমুণ্ড কোন উত্তর দিল না। তাহারা যতই এলবোক্রার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তত বেশী করিয়া শুভমুণ্ডের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাহাকে সাহস দিবার জন্য তাহার পিতা অনবরত কথা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন, "এইরূপ একটি ঘটনা আমি পূর্ব্বেও একবার শুনিয়াছিলাম। ব্যাপারটি এক পুরুষ-সম্পর্কে। শিকার করিবার সময় তাহার এক বন্ধু মারা গিয়াছিল। সে ইচ্ছা করিয়া বন্ধুকে গুলি করে নাই, সে যে গুলি করিয়াছে তাহাও প্রতিপন্ন হয় নাই। কয়েক দিন পর তাহার বিবাহ হইবার কথা। বিবাহের দিন কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহ-আসরে উপস্থিত হইয়া সে তাহার ভাবী পত্নীকে জানাইল, তাহার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়। যে-দুঃখ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, বিবাহ করিয়া অন্যকে তাহাতে টানিয়া আনিতে সে চায় না। কন্যার মস্তকে তখন বিবাহের মুকুট পরান হইয়াছে, বিবাহের মাঙ্গলিক উৎসবের জন্য সব প্রস্তুত। বরের কথা শুনিয়া সে তাহার হাতে ধরিয়া অতিথিদের আসরে লইয়া গিয়া উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগত সকলের নিকট, তাহার বর এই মাত্র যে সংবাদ দিয়াছে তাহার বর্ণনা দিতে লাগিল। পরে বরের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "আমি তোমার কথা সকলের নিকট গোচর করিয়াছি যেন সকলেই জানিতে পারে তুমি কিছু মিথ্যা বল নাই। এখন বিবাহকার্য্য সমাধা হউক; দারুণ দুঃখ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তবু তুমি জানিও, তুমি চিরকাল আমার নিকট একই থাকিবে, আমি তোমার সঙ্গিনী হইয়া তোমার দুঃখের ভারকে লঘু করিতে চাই।"

তাহার পিতা এই কাহিনী শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী বড় রাস্তা ছাড়িয়া এলবোক্রায় যাইবার ছোট গলিতে পৌঁছিয়াছে। শুভমুণ্ড তাহার পিতার দিকে তাকাইয়া দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন আর সেরূপ কিছু হইবে না।"

এইবার তাহার পিতা সোজা সটান হইয়া বসিয়া উত্তর দিলেন, "কে জানে?" তিনি ছেলের দিকে তাকাইতেছিলেন—আজ তাহাকে এত সুন্দর দেখাইতেছিল যে তাঁহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, "আজ যদি অসম্ভব কিছু ঘটে তবে আমি মোটেই বিস্মিত হইব না।"

বিবাহকার্য্য গীর্জ্জায় সম্পাদিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। অনেক লোক ইতিমধ্যে এলবোক্রা-ফারমের আঙিনায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই বিবাহের বরযাত্রী হইয়া গীর্জ্জায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এলবোক্রা-পরিবারের অনেক আত্মীয়স্বজনও অনেক দূর হইতে বিবাহে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিল। দুই ও চারি চাকার অনেকগুলি গাড়ী ঘরের উঠানে আনিয়া রাখা হইয়াছে, আস্তাবলে ঘোড়াগুলিকে ডলান হইতেছে। মাটিতে ঘোড়াগুলির পায়ের শব্দ বাহির হইতে শোনা যায়। গ্রাম্য বাদক একা অন্য বারান্দায় বসিয়া বেহালায় সুর বাঁধিতেছে। পাত্রী বিবাহের বেশে সজ্জিত হইয়া বরকে দেখিবার জন্য ভিতরের জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছে।

এরল্যাণ্ড ও গুডমুণ্ড গাড়ী হইতে নামিয়াই হিলডুর ও তাহার পিতামাতার সহিত পৃথক ভাবে দেখা করিতে চাহিলেন। হিলডুরের পিতার পাঠ-গৃহে শীঘ্রই তাঁহারা আসিয়া একত্রিত হইলেন।

গুডমুণ্ড তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার মনে হয়, আপনারা সম্প্রতি সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন যে গত শুক্রবার রাত্রে শহরতলীতে মারামারির ফলে একটি লোক মারা গিয়াছে।"

বাড়ীর কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই পড়িয়াছি।"

গুডমুণ্ড বলিয়া যাইতে লাগিল, "ব্যাপার এই, সেদিন রাত্রে আমিও শহরে উপস্থিত ছিলাম।" কেহ তার কথায় কোন সাড়া দিল না। ঘর যেন হঠাৎ শ্মশানের মত নীরব হইয়া গেল। গুডমুণ্ডের মনে হইল, সকলেই একদৃষ্টে সশঙ্ক চিত্তে তাহাকে দেখিতেছে, সে আর কথা বলিতে পারিল না। তখন তাহার পিতা তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন—

"গুডমুণ্ড সেখানে কয়েক জন বন্ধুকে মদ্যপানে আপ্যায়িত করিয়াছিল। সে নিজেও সম্ভবতঃ ঐ রাত্রে অতিরিক্ত পান করিয়াছিল; পরে বাড়ীতে ফিরিয়া সে আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই।"

গুডমুণ্ড দেখিল প্রত্যেকটি কথা উপস্থিত সকলকেই ক্রমশঃ ভয়ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে; সে নিজে কিন্তু ক্রমশঃ শান্ত ভাব ফিরিয়া পাইতেছে। তাহার মনও ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজেই আবার বলিতে লাগিল—

"শনিবার দিন সংবাদপত্রে মৃত ব্যক্তির মাথায় ছুরি বসানোর কথা ও ছুরির হাতলের কথা পড়ি। আমি আমার ছুরি বাহির করিয়া দেখিলাম, তাহার একটি ফলা নাই।"

বাড়ীর কর্ত্তা তখন বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা বড় দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। একথা গতকল্য জানাইলেই ভাল হইত।"

গুডমুণ্ড নীরব হইয়া রহিল। তাহার পিতা বলিতে লাগিলেন, "গুডমুণ্ডের পক্ষে স্বীকারোক্তি করা সহজ হয় নাই। এ-ব্যাপারে নীরব থাকিবার প্রলোভন খুব বেশী। এই স্বীকারোক্তির জন্য তাহাকে অনেক কিছু হারাইতে হইবে।"

বাড়ীর কর্ত্তা তিক্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, এখন যে সে এ-কথা স্বীকার করিতেছে, সেজন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত;—বিশেষ করিয়া এই জন্য যে তাহার দুঃখের মধ্যে আমাদিগকে সে আর টানিতে পারিবে না।"

গুডমুণ্ড একদৃষ্টে হিলডুরকে দেখিতেছিল। তাহার মাথায় মুকুট, তাহাতে আঁচল ঝুলান। সে দেখিল, হিলডুর হাত দিয়া মুকুট হইতে একটি বড় পিন খুলিয়া লইতেছে। সে হয়ত বা অন্যমনস্ক হইয়া ইহা খুলিতেছিল। গুডমুণ্ডের চোখ তাহার উপর ন্যস্ত দেখিয়া তখন সে আবার পিন যথাস্থানে বসাইয়া হাত নামাইল।

গুডমুণ্ডের পিতা বলিলেন, "গুডমুণ্ড যে হত্যাকারী, তাহা এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই, কিন্তু বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ যে বন্ধ রাখা উচিত, আমি তাহাই ভাল মনে করি।"

কন্যার পিতা উত্তর দিলেন, "বিবাহ বন্ধ রাখার কথা তোলা নিরর্থক বলিয়া মনে করি। আমার মনে হয়, গুডমুণ্ড নিজের কার্য্য সম্বন্ধে এত নিশ্চিত যে তাহার ও হিলডুরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

গুডমুণ্ড তখনই সেই কথার কোন উত্তর দিল না। সে হাত বাড়াইয়া হিলডুরের দিকে অগ্রসর হইল। হিলডুর নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে যেন গুডমুণ্ডকে দেখিতেছে না এই ভাব দেখাইতেছিল।

"হিলডুর, তুমি কি আমার শেষ করমর্দ্দন লইবে না?"

এখন হিলডুর তাহার দিকে চাহিয়াছে। অশ্রদ্ধায় তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল "তুমি কি এই হাতেই ছুরি বসাইয়াছিলে?"

গুডমুণ্ড এই কথার উত্তর না দিয়া হঠাৎ জুরী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি এখন স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি—বিবাহ বন্ধ রাখার কথা নিরর্থক।"

ইহার পর কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। গুডমুণ্ড ও এরল্যাণ্ড বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহাদিগকে ছোট বড় অনেক ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হইল—সর্ব্বত্রই বিবাহ-উৎসবের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রন্ধনশালার

দরজা খোলা; অনেক লোক তাহার ভিতরে ও বাহিরে আনাগোনা করিতেছে, তাঁহারা দেখিলেন। নানা প্রকারের মিষ্টান্ন, রুটি ও মাংসের গন্ধ চারি দিক ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল। উনুনের চারি দিক ছোটবড় নানা আকারের বাসনে পরিপূর্ণ। সুন্দর তাম্রপাত্রে ও অন্যান্য বহুপ্রকার জিনিষপত্রে ঘার ঘরের দেয়াল সুসজ্জিত। গুডমুণ্ড বাহির হইবার সময় মনে মনে ভাবিল, "দেখ, আমার বিবাহের উৎসবে এত লোক মত্ত হইয়া কাজ করিতেছে।"

ঘরের ভিতর দিয়া বাহির হইবার সময় বাড়ীর লোকেরা যে কিরূপ ধনী সে তাহার আভাস পাইয়াছিল। ভোজনগৃহে প্রকাণ্ড টেবিলের উপর কেমন ভাবে রূপার কাঁটা-চামচ সাজান হইয়াছে তাহা তাহার চোখে পড়িল। নানা প্রকারের মূল্যবান উপহার সামগ্রী কিভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, একটা কোঠায় ছোটবড় বাক্স বোঝাই, সবই সে দেখিতে পাইল। তারপর বাহিরে আসিয়া দেখিল,—নূতন-পুরাতন অনেকগুলি গাড়ী সারি করিয়া রাখা হইয়াছে, আস্তাবল হইতে একটি একটি করিয়া চমৎকার ঘোড়াগুলি বাহিরে আনা হইতেছে, মূল্যবান চাদর দ্বারা গাড়ীর গদিগুলিকে মণ্ডিত করা হইতেছে। গুডমুণ্ড বাড়ীর গোশালা, আস্তাবল, মেষশালা, গোলা-ঘর এবং অন্যান্য ছোটবড় একচালার চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিল, "এ সমস্তই ত আমার হইতে পারিত।"

[ক্রমশঃ]

সীমাহীন এই প্রেম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আমি আছি—এই সত্য প্রথম করিনু অনুভব
দিবা আর রজনীর সংখ্যাহীন প্রতিটি নিমেষে,
শব্দহীন কালের প্রবাহে। আনন্দ-উদ্বেল প্রাণ,
যখনি স্মরণ করি প্রিয়া আছে নিভৃত কুটীরে—
যখনি স্মরণ করি লুপ্ত হয় বিরহ-ভাবনা;
—সীমাহীন এই প্রেম, প্রণতি জানাই বারম্বার।

নরদেহে লভিলাম জন্ম আর মৃত্যুর আস্বাদ,
নরনেত্রে হেরিলাম জ্যোতিষ্কলোকের আবর্ত্তন—
শুনিলাম ছন্দোময় জীবনের প্রণব-ঝঙ্কার,
প্রেমহীন জীবাত্মার অব্যক্ত আকুল দীর্ঘশ্বাস—
প্রেমহীন জীবনের দেখিলাম ভয়ার্ত্ত শূন্যতা,
কোটি জন্ম-জন্মান্তের প্রেতস্পর্শ লভিনু নীরবে!

এমনি খসিয়া গেল কালস্রোতে পাঁচটি বছর—
দুঃখের নখর-ক্ষত আজি চাই একান্তে ভুলিতে,
মনে হয় ক্লান্ত বড়,—যদি তুমি আসিতে এখানে
আমার কল্পনাসম লঘুপদে নিঃশব্দ সঞ্চারে
অদৃশ্যচারিণী লক্ষ্মী,—রচিতাম বন্দনা তোমার—
পৃথিবীর কবিদল স্তব্ধ হয়ে যেত একেবারে।
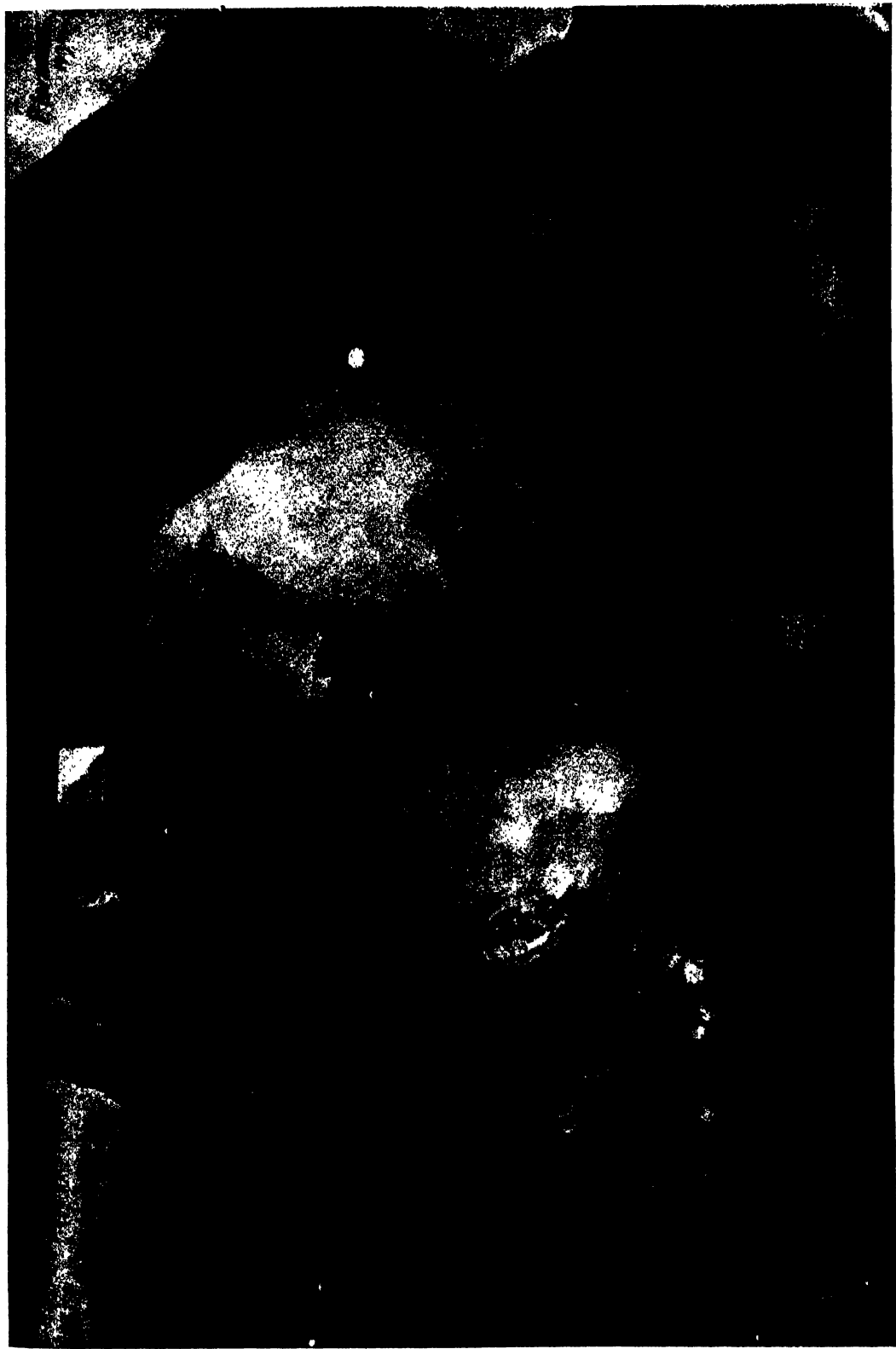
"আগুনে পুড়ে লাল যে-দেশে মাটি"

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আগুনে পুড়ে লাল যে-দেশে মাটি
ধুধু তেপান্তর মাঠ,
ধূসর ধরণীর হৃদয় ফাটি
রাখে নি সোজা পথঘাট।

কালির আঁচড়েতে আকাশপটে
তালের ঘন সারি আঁকা,
রুক্ষ ঋজু শোভা মানায় বটে
দু-ধারে যে উদার ফাঁকা!

কাজলী মেয়ে দূর হাটের পথে
মাঠের বুকে সুখে চলে,
রঙীন ধূলা উড়ে চায় যে হ'তে
ফাগের গুঁড়া পা'র তলে।

এদের ভালবাসা সহজ সোজা
পলকে ঝলকিয়া ওঠে,
কথার লতাজালে নহেক বোজা
পুলকে উথলিয়া ছোটে।

হাসির রাশি জাগে জোয়ার-জলে
তেমনি হাসি জাগে প্রাণে,
গোপন হৃদয়ের গভীর তলে
লুকানো ছল নাহি জানে।

এদেশে আজো বনে পলাশ ফোটে—
ফাগুনে আগুনের মেলা,
শালের মঞ্জরী মাটিতে লোটে
অঘোর ধারে সারা বেলা।

দিনের শেষ কাঁপে সুরের রেশে
বেণুর বেদনায় দূরে,
চাঁদিনী রাতি মেতে ওঠে এদেশে
আজিও কামিনীর সুরে।

মহুয়াবনে সবে মাধবী-রাতে
মধুপ সম তৃষা বুকে
চাঁদের সুধা আর সুরার সাথে
যামিনী যাপে ঘন সুখে।

মাতাল-করা তালে মাদল বোলে
মাতন তুলি দেহে মনে,
বাহুতে বাহু বাঁধি বঁধুয়া দোলে
ভুবন দোলে তার সনে।

বিবশ তনুদেহে বিতথ বেশ
বিফল তারে টেনে রাখা,
কবরী-বন্ধন-শিথিল কেশ
জ্যোৎস্না-রেণুকণা মাখা।

নিমীল আঁখি নীল আবেশ লেগে,
কামনা কাঁপে দুই ঠোঁটে,
পুরুষ-রমণীর প্রাণের বেগে
প্রমোদরাতি পুরে ওঠে।

এদেশে মাটি, প্রিয়া! আগুন-রাঙা
আগুনে খাক্ তৃণ-তরু,
আগুন-জ্বালা প্রেম হৃদয়ভাঙা
তৃষার দাহে দেহ মরু!

স্বরলিপি

গান

আমি তখন ছিলেম মগন গহন
ঘুমের ঘোরে।
যখন বৃষ্টি নাম্‌ল তিমির নিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে
প্লাবন ঢালা শ্রাবণ-ধারাপাতে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে।

আমার স্বপ্ন স্বরূপ বাহির হয়ে এল,
সেথায় বুঝি সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্ন দোসর সাথে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে।

দেহের সীমা গেল পারায়ে
ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে
মত্ত হাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে
সেদিন তিমির নিবিড় রাতে।

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

না না -া II র্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সনা I ধা না নধা । পা ধা ধপা I মা পা পা ।
আ মি ০ ত খ ন ছি লে ম ম গ ন গ হ ন ঘু মে র

। মা -ধা -ধপা I মগা -া -া । গা গা -া I গা -মা মা । মা -া -পা I পা -া -া । -া -া -া I
ঘো ০ ০ রে ০ ০ য খ ন্ বৃ ষ্ টি না ০ ম্ ল ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা । না র্সা র্সা I না ধা -নর্সা । র্সনা ধপা -া I পা -মা মা । মা -া -পা I পা -া -া ।
তি মি র নি বি ড় রা তে ০০ য খ ন্ বৃ ষ্ টি না ০ ম্ ল ০ ০

। -া -া -া I পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -া I না র্রা র্রর্সা । না র্রা র্রর্সা I না -া র্সা । না না -ধা I
০ ০ ০ দি কে ০ দি কে ০ স ঘ ন গ গ ন ম ত্ ত প্র লা ০

I পা -ধা -ধনা । -া -া -ধা I পা পা না । ধা না -ধা I পা পা ধা । পা ধা -পা I মা পা -মা ।
পে ০ ০ ০ ০ ০ প্লা ব ন ঢা লা ০ শ্রা ব ণ ধা রা ০ পা তে ০

। গা গা -মা I পা পা না । ধা ধা না I নধা ধা -পা । পা পা -া II
সে দি ন্ তি মি র নি বি ড় রা তে ০ "আ মি" ০

পা পা -ধা II ধা -র্সা র্সা । র্সা র্সা -র্রা I -র্গা -র্গরা -র্সা ।
আ মা র্ স্ব প্ ন স্ব রূ ০ ০ ০ প্

। -া -া -া I পর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -র্রর্সা I না না -র্সা । না ধা -পা I পা -া না । না ধা -নধা I
০ ০ ০ বা হি র্ হ য়ে ০০ এ ল ০ আ মা র্ স্ব প্ ন স্ব রূ ০০

I -পা -া -া । পা পা -ধা I পা -া না । না ধা -া I -পা -া -া । র্সা র্সা -না I { র্সা সর্মা র্মা —
প্ ০ ০ সে যে ০ স ঙ্ গ পে ল ০ ০ ০ ০ আ মা র্ সু দূ র

। র্জ্ঞা -া -র্মর্জ্ঞা I র্রা -া -া । -র্জ্ঞা -র্সা -া I র্সা -া র্রা । র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা I সর্রা র্সা -না । (না না -ধা I
পা ০ ০ রে ০ ০ ০ র্ ০ স্ব প্ ন দো স র সা থে ০ সে যে ০

I পা -া না । না ধা -া I -পা -া -া । র্সা র্সা -না)} I
স ঙ্ গ পে ল ০ ০ ০ ০ আ মা র্

। না না -ধা I পা পা না । ধা ধা না I ধা ধা -পা । পা পা -া II
সে দি ন্ তি মি র নি বি ড় রা তে ০ "আ মি" ০

-া -া -া II { মা মা -পা । পা পা -া I (পা পা -ধা । না ধা -না I নধা -পা -া । পা গা -মা)} I
০ ০ ০ দে হে র্ সী মা ০ গে ল ০ পা রা ০ য়ে ০ ০ আ মা র্

I ধা -র্সা র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা -না র্রা । র্সা র্রর্সা -না I না না -র্সা । র্সা র্সা -না I ধা -া -র্সা ।
সু র্ থ ব নে র্ ম ন্ ত্র র বে ০ গে ল ০ হা রা ০ য়ে ০ ০

। না ধপা -া I মা মা -পা । পা পা -া I -া -া -া । -া -া -া I র্সা র্সা -র্মা । র্মা র্মর্জ্ঞা -া I
আ মা র্ দে হে র্ সী মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মি লে ০ গে ল ০

I র্জ্ঞা -র্রা র্রা । র্রা র্মর্জ্ঞা -র্রা I র্সা -া র্রা । র্রা র্জ্ঞা -র্রা I র্সা -া -র্রর্সা । না -া -া I না -র্সা র্সা ।
কু ন্ জ বী থি র্ সি ক্ ত যূ থী র্ গ ০ ন্ ধে ০ ০ ম ত্ ত

। র্সা র্সা -া I র্সা -া -া । র্সা -র্রা -র্সা I -না -া -া । -া -া -া I না না -র্সা । র্সা র্সা -া I
হাও য়া র্ ছ ০ ন্ দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মে ঘে ০ মে ঘে ০

I পর্সা র্সা -া । র্সা র্রা -র্সা I না না -র্সা । র্সা -া র্সনা I ধনা ধপা -া । পা পা -মা I পা পা না ।
ত ড়ি ৎ শি খা র্ ভু জং ঙ্ গ ০ প্র য়া তে ০ সে দি ন্ তি মি র

। ধা ধা না I নধা ধা -পা । পা পা -া II II
নি বি ড় রা তে ০ "আ মি" ০

'বালক বীরের বেশে'

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

টাটুর চোখের আলো কে চুরি করলে? চোখেতে যেন মেঘ্‌লা সন্ধ্যা নেমেছে।

মস্তবড় বাদামী দুটি চোখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে যখন তখন আলো ঝক্‌মকিয়ে উঠত। মাথার কটা রেশমী চুলের চেয়ে ঢের গাঢ় রঙের সুদীর্ঘ পক্ষ্মপুট যেন অবসন্ন হয়ে আনত হয়েই আছে। গোলাপী পাতলা দুটি ঠোঁটের ঝক্‌ঝকে হাস্য-রূপের উপর তার করুণ ছায়া পড়েছে।

বাড়ীর সামনের ছোট বাগানে পোলু হরিণটা তেমনি চুপ ক'রে শুয়ে কেমন নিরুদ্দেশের পানে চেয়ে আছে; রুমী কুকুরটাকে তার নূতন ছানাগুলো তেমনি পাগল ক'রে তুলেছে; তার বঁজু টাটু ঘোড়াটা দানা খেতে খেতে পেছনের পা ছোড়া শেষ ক'রে সামনের পা ঠুকছে। টাটু তার ছোট মুঠো ভর্ত্তি ক'রে বঁজুকে চিনি খাওয়াতে দৌড়বে না; বারাণ্ডায় রেল পাতা, রেলগাড়ীর ষ্টেশন দাঁড়িয়েই আছে, গাড়ী বুঝি আর ষ্টেশনকে ফেলে দৌড়বে না, কেউ ব্যস্ত হয়ে ঘণ্টাও দিচ্ছে না, কেউ হুইসিলও দিচ্ছে না; ভেলভেটের 'মহারাণা'-হাতিটার পিঠে চ'ড়ে ডিগ্‌বাজী খাবার জন্য সারা সকাল নূতন মেমসাহেব দাঁড়িয়েই আছে। টাটু আজ ক-দিন এই নিঝুম পুরীর সোনার কাঠি তার বাবার একবারও দেখা পায় নি। বলিষ্ঠ প্রকাণ্ড দুটো হাত দিয়ে কেউ তাকে উঁচুতে দোলা দিতে দিতে নিজের একটুখানি খচখচে দাড়িতে টাটুর নরম তুলতুলে গাল চেপে ধরে নি; তাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে বাড়ীর পেছনে গোয়াল-ঘরের পাশে তেপান্তরের মাঠের দিকে নিয়ে যায় নি; তার রেলের যাত্রীও হয় নি, যাত্রাও হয় নি, একখানা টিকিটও কাটা হয় নি। বিস্কুটে বেশী বেশী জেলি দিলে কি হবে? শুধু শুধু মার্মালেড দিলেই হয় বুঝি! জল পড়ে না, তবু চোখ ছলছল করতেই থাকে, কোন বিরুদ্ধ কথা না শুনেও ঠোঁট কেমন উল্টে যায়, গলায় কিসের ডেলা যেন আটকে যায়। বাবা না এলে কেমন ক'রে খেলব—কি ক'রে থাকব!

পিসীমা কই আর ত কলরব করেন না, কেমন চুপ, চোখ সব সময়েই লাল, জিজ্ঞাসা করলে বলেন—সর্দ্দি হয়েছে; কিন্তু, দুপুর বেলা ত ভাত খেলেন। ছোট খুড়ীমা তার উল্টো, যখন তখন কেমন অনির্দ্দেশের পানে চোখ তুলে, কে একটা হতভাগা বাউণ্ডুলে পাজী কোন এক লক্ষ্মী-প্রতিমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিল সে কথাই কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছেন। টাটুর বড্ড ইচ্ছে করছিল জানতে—দুষ্টু টাই বা কে, লক্ষ্মীটিই বা কে? প্রশ্ন করলে, ছোট খুড়ীমা তাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে আরম্ভ করলেন—হারে, অবোধ শিশু! বলেন, আর সে কি ফোঁপানি! সে যে কি বিশ্রীই লাগল! সে মরলেও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। বাবার কথা জানতে গেলে কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য দৈত্যের হাত মুখ চেপে ধরে। পিসীমা কেন, বাড়ীর আর সবাইয়েরও কেমন চোখ লাল। টাটু দেখেছে, সে একটু অন্য দিকে ফিরলে, তার দাই কেমন ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখে যেন জলের আভাস দেখা যায়। বাড়ীর বুড়ো দরওয়ান আখলু কেমন কাঁদ-কাঁদ হয়ে তাকে খোকাবাবা ব'লে দু-বার জড়িয়ে ধরেছে। আর এই ক-দিন দিদু এসেছে; এসে পর্য্যন্ত এক ঘরে একাই ব'সে আছে; আর প্রথমে এসে ত মা-মণিকে বুকে জড়িয়ে ঝরঝর কান্না। টাটু দিদুকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলে না, আর বাবার কথা বলতেই দিদু তার দিকে কেমন ক'রে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে কোন কথা না ব'লে সোজা উঠে গেল। এক দিনও দিদু তাকে বায়োস্কোপে নিয়ে গেল না, পুতুলের দোকানে না, চিড়িয়াখানায় না—সেই যেখানে ঝক্‌ঝকে টেবিলে ব'সে কেক খায়, আইস্‌ক্রীম খায়, টাটু কবার খেয়েছে, আরও সব কত টেবিলে সাহেব-মেম আর তাদের পুতুলের মত সুন্দর ছেলেমেয়েরা খায়—কোথাও নয়।

বাবার নাকি কি ভয়ানক চিঠি এসেছে। সারাদিনে মা-মণি একবারও তার ঘর থেকে বেরুল না। টাটু লুকিয়ে

দেখেছে, মা-মণি পাথরের মূর্তির মত বসেই আছে। মা-মণির চোখও যেন পাথরের। কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু কি ভয়ানক যেন কি!

বড়মামা রোজ আসেন। শুঁকো পরাণবাবু প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা দোলাতে দোলাতে তাঁর সঙ্গে আসেন। টাটু শুনেছে, ওঁকে নাকি বলে টুর্নীবাবু। টুর্নীবাবু নাকি মানুষের গলা কাটে। পুলিসেও নাকি ওকে ধরতে পারে না। শোনা গেছে বড়মামা ব্যারিষ্টার। ব্যারিষ্টার কি? খানসামা সেদিন দাইকে বলছিল, টুর্নী-ব্যারিষ্টারে ভিটেয় ঘুঘু চরায়। ঘুঘু ছোট ছোট পাখী, টাটু তা জানে। সে কিন্তু কখনও ঘুঘু দেখে নি। বড় হ'লে ব্যারিষ্টার হয়ে সে অনেক ঘুঘু পুষবে চরাবে। আচ্ছা ঘুঘু চরায় কেমন ক'রে? ছাগল চরায়, গরু চরায়, কিন্তু ঘুঘু চরায় কেমন ক'রে? ঘুঘুদের কি চার পা, তারা কি উড়তে পারে না? ওরা এলেই মা-মণির সঙ্গে কি-সব খুব দরকারী কথা হয়। তার ত্রিসীমানায় টাটুর কিছুতেই যেতে নেই। তাই ত টাটু পাশের ঘরে পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে কি হয় দেখতে গেছে। একটুও বোঝা যায় না, অর্দ্ধেক আবার ইংরিজী। টাটু ত ইংরিজী জানে, কিন্তু এ সে ইংরিজী নয়। বাংলাও ত বোঝা যায় না।

ভোরের ফুলের মত মা-মণির মুখ যেন আরও শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম দিন রাত্তির বেলা, তাকে বুকে পুরে মা-মণির কি কান্না। তারও খুব কান্না পেয়েছিল। তার পর মা-মণির সঙ্গে বুঝি আর একটাও কথা হয় নি, আর দেখাই হয় নি। মা-মণি রোজ রোজ কি সুন্দর কাপড় পরত, এ-কদিন কি যা-তা প'রে আছে; কি উস্কোখুস্কো চেহারা, এক দিনও বোধ হয় নায় নি। মা-মণির কাছে বাবার কথা বলতে টাটু তিন চার বার গেছে। মা-মণি কেমন শক্ত ক'রে চাইতে পারে, এখন এমন শক্ত ক'রে চায়! মনে হয় ও কথা কিছুতেই বলতে দেবে না। নিজের ঘরেই ত দিন-রাত বসে থাকে। ওখানে ঢুকতেই পারা যায় না। খুব মনে জোর ক'রে দুপুর বেলা সে যখন পা টিপে টিপে ও-ঘরে যাচ্ছিল, দেখলে মা-মণি তেমনি শক্ত হ'য়ে চোখ বুজে ব'সে আছে, হঠাৎ ব'লে উঠল—ও ভগবান্, ভগবান্! মা-মণির রাগ সে দেখেছে, শুধু শুধু ভয়ানক রেগে বাবাকে যখন বকেছে, সে তা দেখেছে। এ কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক ভীষণ। তখন ও-ঘরে ঢুকতে কিছুতে তার সাহস হয় নি।

টাটু আজ কিন্তু আর কিছুতেই সইতে পারলে না। দেখলে কোথাও কেউ নেই। রুদ্ধ আত্মা যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল—বাবা, বাবা!

'মা-মণি', একটু চুপ ক'রে থেকে টাটু বললে, 'একটা কথার মানে বলবে?'

—কি কথা? বলবার হ'লে বলব।

টাটুর মনে হ'ল এ ত মা-মণি কথা কইছে না।

—"একমাত্র সন্তানের হেপাজতের স্বত্ব, ত...ত... তত্ত্বাবধানের অধিকার", মানে কি? হেপাজত—হাজত মানে ত পুলিসে ধরা, ঐ স্বত্ব—ত...তত্ত্বটা আমি সাঁটতে ঠাওরাতে পারছি না।

—খোকা—টাটু নামটা বাবার আদরের বলে মা যেন ঐ নামটা নিতে চায় না—ঐ সাঁটতে ঠাওরাতে বলতে নেই।

ঘাড় একটু বেঁকিয়ে, যেন লড়াই করবে গোঁ ধরে টাটু বললে—কেন, বাবা ত বলে। যত বড় দৈত্যের যত বড় হাতেই মুখ চাপা দিক্, 'বাবা' এই শব্দটি বলবার জন্য টাটু আজ মরে যাচ্ছিল। বাবা ত বলে—কেটে পড়। ঘাড় আর একটু বেঁকিয়ে নিজের অক্স-ব্লাড্ রঙের জুতোর দিকে চোখ রেখে যেন এবার স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করলে—আমি যখন বড় হব, সব বাবার মত হব।

—খোকা...। গলার স্বর যেন বড় একটা কাচের গ্লাসকে একখানা ধারাল ছুরি দিয়ে ঘা মারলে। এদিকে চাও।

টাটুর কেমন একটু ভয়, খুব লজ্জা করতে লাগল।

—আমার দিকে চাও।

টাটু যতই উঁচু ক'রে চোখ তুলুক, মার চিবুকের ওপরের দিকে চাইতে পারলে না।

তোমার কথার মানে আমি বলছি শোন্—আমার আর তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তুমি। তোমার বাবা ছেলে মানুষ করবার যোগ্য নয়; এখন থেকে তুমি শুধু আমার হেপাজতে থাকবে। তুমি ছাড়া আর আমার

ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটু থেমে বললেন—তুমি শুধু মার খোকা। কথার শেষের দিকে পুরনো মা-মণির গলা যেন একটু পাওয়া গেল।

পাতলা ভ্রূ একটু কুঁচকে একটু যেন অবাক হয়ে টাটু বললে—হেপাজত! কিন্তু মেয়েরা ত পুলিস হ'তে পারে না। একটু পাতলা উপ-হাস্যের রেখা ঠোঁটে দেখা দিলে।

—হ্যাঁ, পারে। মেয়েরা সবচেয়ে ভাল গোয়েন্দা-পুলিস হ'তে পারে। বলতে বলতে চোখে যেন এক ঝলক আগুন দেখা গেল। কুন্তী আমার গোয়েন্দা হয়ে খুব কাজ করেছে। তোমার বাবার···বলতে বলতে থেমে গেলেন।

দু-জনেই কিছুক্ষণ কোন কথা কইতে পারল না। মা খোকার দিকে চেয়ে তাকে ছাড়িয়ে দূরে যেন চেয়ে আছেন।

টাটু মার চিবুকের দিকে চেয়েই বললে—আর একটা কথা বলব?

—বল।

কেমন যেন মরিয়ার মত হয়ে বললে—আমি মার খোকা?

মা কিছু বললেন না।

টাটুর ঠোঁট কাঁপছিল, নিজের বুকের মধ্যের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল, শরীর এমন কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল, হয়ত পড়ে যাবে—আমি তোমার খোকা, কিন্তু বাবার টাটু, বাবারও খোকা। বাবাকে এনে দাও। বাবা কোথা?

—আমি জানি না। কথা ত নয়, টাটু যেন আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে।—যাকে, তোমার আমার চেয়ে তোমার বাবার ভাল লাগে তার কাছে তিনি আছেন। আমরাও তার কেউ নই, সেও আমাদের কেউ নয়।

—সেও আমাদের কেউ নয়। মায়ের কথার শেষ কথাকয়টি টাটু উচ্চারণ করলে। তার পরই উচ্ছ্বাসে যেন সে ভেঙে পড়ল—বাবা, কেমন ক'রে কেউ আমাদের নয়! আমার ত বাবা! বাবা!

মা মুখটা কেমন ঘুরিয়ে নিলেন। একটু পরেই চেঁচিয়ে ডাকলেন—দাই, বেয়ারা।

দাই বেয়ারা ডাকার মানে টাটুকে ধরে নিয়ে যাওয়া।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, এবার সোজা মা'র মুখের দিকে চেয়ে টাটু বললে—ডাকতে হবে না, আমি নিজে যাচ্ছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এসে দাঁড়াল হলে। ঠিক সামনেই বাবার একখানি ছবি। দার্জ্জিলিঙে কোন প্রসিদ্ধ শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, তার নিদর্শন। বাবার ডান পাশে একটা প্রকাণ্ড কাল ঘোড়া। ঘোড়াটা চলবার জন্যে যেন একটু অধৈর্য্য হয়েছে। আঁটসাঁট ঘোড়ায় চড়ার পোষাকপরা দেহযষ্টি ছন্দাবনমিত, হাতে টুপী, একটু ঝুঁকে কা'কে যেন অভিবাদন করছেন, বাতাসে মাথার লম্বা কোঁকড়া চুল একটু অবিন্যস্ত, অদৃশ্য লোকটির প্রতি বাবার হাসি, সে হাসি ঠিক যেন টাটুর ওপর এসে পড়েছে। টাটুর তখন বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে।

হলের সামনে গাড়ী দাঁড়াবার জায়গায় শোফার বাসুদেব টাটুর আয়াকে বলছিল—মেয়ে জাতটার ধর্ম্মই এই, মেয়েমানুষের সুখ সইতে পারে না। কুন্তী মাগীটা কি পাজী—বাপরে বাপ! আমিও বলছি—দেখো ও মাগীর কপালে অনেক দুঃখ আছে। আয়া কিছু বললে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু খুব ঘাড় নেড়ে সায় দিল দেখা গেল।

হলে আলো নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসছে; ঝুরঝুর ক'রে নতুন শীতের মৃদু বৃষ্টি হচ্ছে; মলিন কুয়াশা কোথা থেকে নেমে আসছে। হলের বাইরের দিকের কাচের দরজাটা খানিকটা ফাঁক করা রয়েছে। দরজা দিয়ে ঢুকলেই ডান পাশে টাটুর বাবার ছবি। তার সামনে দাঁড়িয়ে টাটু ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল। ওরা ওখান থেকে টাটুকে দেখতে পাবে না। ওদের কথায় টাটুর একটুও মন ছিল না, কিন্তু বাবার কথা উঠতেই সে দিকে মন গেল।

বাসুদেব বলেই যাচ্ছে—সাহেবের কসুরটা কি? বিবির মেজাজ চিরকালটাই ঐ এক রকম। অমন হ'লে অনেক ঘরে খুনোখুনি হয়ে যায়। তার ওপর আবার সাহেব বাইস্কোপের ছবি তৈরির ব্যবসা আরম্ভ করলে। গোড়ায় বিবির ছিল ঐ বুদ্ধি—তা ত সবাই জানে। কিন্তু, এতেই বিবির মেজাজ একেবারে বেগড়াল। এমন রাজার মত পয়সা,

এমন রাজার মত চেহারা, এতকাল বিলেতে থাকা, কিন্তু কেউ সাহেবের নামে একটা কথা কইতে সাধ্যি করে? আর, তোমার বিবির এই সন্দেহ ত এই সন্দেহ। উঠতে সন্দেহ, বসতে সন্দেহ, শুতে সন্দেহ। সারাদিন খেটে বাড়ী ফিরলে কখনও বলতে শুনলুম না—এস। উল্টে বিশ্রী সন্দেহ।

আয়া এবার বললে—মেমসাহেবের শুধু শুধুই কি সন্দেহ হয়? ঐ চেহারা, ঐ টাকা আর ঐ সঙ্গ—এতে বিশ্বেস রাখা যায়!

বাসুদেব চটে গেল—ঐ বুদ্ধিতেই ত মেয়েমানুষ জাতটা গেল! নিজেদের ওপর নিজেদের বিশ্বেস নেই কি না।

আয়াও চটে গেছে—নিজেদের ওপর বিশ্বাস নেই! হ্যাঁ, পুরুষজাতকে খুব জানা আছে।

বাসুদেব এবার খুব বিজ্ঞভাবে বললে—ওরে, পুরুষজাত অবিশ্বেসী নয়। তারাও ঘর চায়। বাইরের হাঙ্গাম থেকে পালিয়ে ঘরের সুখশান্তি খুব চায়। তা না, দিনরাত্তির ঐ পাপকথার ঘ্যানঘ্যানানি; এই অবিশ্বাসের পাপ-মন্তর পড়ে পড়ে পুরুষমানুষকে অবিশ্বেসী ক'রে তোলে। একটু ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, যেন দম ফেলে বাঁচলে, এমনি ক'রে বললে,—তবে বলি, ঐ কুন্তী মাগীটাই যত সব বানিয়ে বানিয়ে মেমসাহেব-সাহেবের সর্ব্বনাশ করছে। এ কথা আমি বলছি—সাহেব আজ পর্য্যন্ত কখনও অবিশ্বেসের কাজ করে নি। ড্রাইভারেরা সব সাহেব-বাবু-বিবিদের খবরের চাবিকাঠি। তবে এবার বিবি কুন্তীর কথায় অমন ক'রে সাহেবকে দূর ক'রে দিলে, আর ওখানকার কুসুম বিবির রূপ ত ছবিতে কে না দেখেছে, আর সে ত সাহেবের জন্যে মরে যাচ্ছে—তাই না ভাবনা! কুসুম বিবির মন কি দরের যদি জানতিস! আবার একটু থেমে বলল—এবার বড় রাগের ঝোঁকে সাহেব তার কাছে যাচ্ছে। আবার একটু থেমে বলেই চলল—শোন্, আর একটু পরে আজ রাত্তিরে আমি আমাদের গাড়ী ক'রে এক জনকে নিয়ে ব্যাণ্ডেল যাব—সেখানে সাহেব নিজে থাকবেন। খবরদার, একেবারে কেউ যেন জানতে না পারে। কিন্তু, এও বলছি, এসব আমাদের মেমসাহেবই ঘটালে।

ঠাণ্ডায় বর্ষায় দূরে যেতে হবে ব'লে আয়া শোফারকে চা খেতে নিয়ে গেল।

টাটু এদের সব কথা শুনে—তার বাবার ভাষায়—'মোদ্দাকথাটি' বুঝলে—এই গাড়ীতে যেতে পারলে বাবার কাছে যাওয়া যায়; এই পৃথিবীতে বাবার কাছে যাওয়ার আর কোন পথ নেই; বাবার কাছে যাওয়ার এই একমাত্র পন্থা। এ-বাড়ীর আবহাওয়ায় দম আটকে যাচ্ছে। মা-মণির মুখের দিকে কিছুতেই আর চাইবার সাহস হচ্ছে না।

শোফার যখন ফিরে এসে গাড়ী চালিয়ে দিলে, তখন গাড়ীর এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে টাটু চুপ ক'রে পড়ে আছে; ঢিপঢিপ ক'রে নিশ্বাস পড়ছে, তার ভয় হচ্ছে, গাড়ীর শব্দ ছাপিয়ে বুঝি সে শব্দ শোনা যাবে।

একটু পরেই গাড়ী থামল। মোটেই বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না। বেশ বোঝা গেল গাড়ীর পেছনে ক্যারিয়ারে কি সব বাঁধা হচ্ছে। তার পর গাড়ীর দরজা শোফার খুলে দিলে। একখানি কি সুন্দর পা। তখনই আর একখানি পা গাড়ীতে প্রবেশ করল। কালো সোয়েডের জুতো, পাথর বসানো। তাতেই বুঝি পা এত সুন্দর দেখাচ্ছে। মানুষটি ঢোকার আগেই বুঝি নার্সিস্যসের গন্ধে গাড়ী ভরে গেল। গাড়ী চলল। গাড়ীর মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। টাটু গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে মুখ কম্বলের বাইরে এনেছিল। বৃষ্টির ছোট ছোট দু-এক ফোঁটাও তার মুখে লাগল। একটা পা কম্বল থেকে একটু বেরিয়ে ছিল—অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু সাহস হ'ল না কম্বলটা টেনে পায়ের ওপর দিতে বা পা-টা আরও ভেতরে টেনে নিতে। কুয়াশাটা বেশ বেড়েছে—বাইরেটা আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাড়ীর মানুষটি একবারও টাটুর দিকে চান নি। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর যেন কি হয়েছে। গায়ে মোটা জামা ত নেই, কোন গরম জামাও নেই। কিন্তু, একবারও কম্বলটার দিকে তিনি চাইলেন না। তাঁর পাতলা সিল্কের শাড়ীর আঁচলটা উঠে টাটুর নাকে

লাগল, তাতেই হোক, ঠাণ্ডা হাওয়াতেই হোক বা কম্বলের প্রান্তের সরু সরু পশমী গোছাগুলো লেগেই হোক—টাটুর এল হাঁচি। তের বেলা উপোস করলে যদি এ হাঁচি ঠেকানো যেত তাতেও টাটু স্বীকার পেত। অসংখ্য মানুষের ভাগ্যবিধাতা হিটলার, মুসোলিনী, ষ্টালিন কেউই একটাও হাঁচি আটকাতে পারে নি—টাটুও পারলে না। গাড়ীর মানুষটি একটা গানের আধ লাইন খুব গুনগুন করে গেয়েছিলেন। অনেকক্ষণ থেমে একবার, দু-বার টাটুর বাবার নাম খুব আস্তে আস্তে বললেন। তার পর তিনি যেমন বাইরের দিকে চেয়েছিলেন, তেমনই চেয়েই ছিলেন। হাঁচবার পর টাটু খুব ছোট হয়ে গেল, নিজেকে কুঁকড়ে-মুকড়ে সে যেন একেবারে গদির মধ্যেই ঢুকে যাবে; চোখ বুজে ভরসা করছিল—হাঁচিটা কেউ শুনতে পায় নি। কিন্তু, পাশে যিনি ছিলেন, তিনি যেন একটু হেসে ডাক্‌লেন—পুসী। সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন—পুসী, আয়।

এবার টাটু অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল—পুসী নয়, আমি টাটু।

—উ…। খিল খিল ক'রে তিনি হেসে উঠলেন। তার পর কেমন মিষ্টি ক'রে ডাকলেন—টাটু নাকি, এস, এস।

টাটু আস্তে আস্তে কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁ পায়ে ভারি ঝিঁঝিঁ ধরেছে। ড্যাবডেবে প্রকাণ্ড চোখ দিয়ে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। কেমন একটু ভয়ও করছিল, খুব ভালও লাগছিল। সামনের চোখ দুটি টাটুর বড়ই ভাল লেগেছিল। খানিকটা যেন তার বাবার মতন। সেই চোখের দিকে চেয়ে তার মনে খুব ভরসা হচ্ছিল; খুব সুন্দর শান্ত আবার অশান্ত, একটু শ্রান্ত; হড়বড় ক'রে বলে গেল—এ ত আমার বাবার গাড়ী; নইলে আসতুম না। বাসদেও বলছিল কি না আমাকে–বাবার কাছে গাড়ী যাচ্ছে। বুঝলেন—কত দিন বাবাকে—বাবাকে দেখি নি কিনা! চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। জামার হাতা দিয়ে তা গোপনে মুছে নেওয়ার প্রয়াস সঙ্গের যাত্রীটি দেখলেন। চোখের জল মুছে টাটু বলছে—বাবার জন্যে কষ্ট হয় না—।

এবার তিনি টাটুকে কেমন সহজে জড়িয়ে নিলেন, বললেন—বুঝেছি। এই মানুষটির প্রথম ছোঁয়া লাগতেই টাটুর বুঝতে বাকী রইল না, 'বুঝেছি' কথাটি মিথ্যা নয়, হ্যাঁ বুঝেছে। বুঝতে কেউ পারছে না, দুঃখের অন্তরের এই হচ্ছে অসহ্য দুঃখ। এবার সে-দুঃখের অবরুদ্ধ অশ্রু মুক্তি পেল। অমনি ক'রে যদি কেউ চায়—সব আপনি থেকে বলা হয়ে যায়:—পোলু হরিণ নিয়ে একা খেলা যায়? বঁজু ঘোড়া কে চড়াবে? একা একা রেল চালান যায় নাকি? টুর্ণীবাবু এসে শুধু মায়ের হাতে একমাত্র সন্তানের হেপাজত ত…তত্ত্বাবধানের স্বত্ব দেবে কেন? মা-মণি কেন বলবে—আমার চেয়ে যাকে ভাল লাগে, বাবা শুধু তারই কাছে থাকবে। কেন কুসুমবিবি তাকে নিয়ে যাবে? কুসুমবিবি ভয়ানক দুষ্টু। সে রাক্ষসি। রাক্ষস নয়, রাক্ষুসী। একথা সত্যি হতেই পারে না। মিথ্যে, মিথ্যে—বাবা আর আমার থাকবে না, বাবা আর কখনও থাকবে না—, যতই যা মা-মণি বলুন না কেন! বাসদেও আমাকে বলেছে—এই গাড়ীতে 'এক জন' বাবার কাছে যাচ্ছেন, তিনি ফিরিয়ে দেবেন টাটুকে তার বাবা? একবার বাবার কাছে টাটু যেতে পারলে—ঠিক ঠিক বাবাকে টাটু একেবারে ধরে নিয়ে আসত, কক্ষণও ছাড়ত না। বাবা সত্যি সত্যি কিছুতেই টাটুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। বাবার মত সে যে কাউকে ভালবাসে না। বাবার সঙ্গে একবার দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা বাসদেও যে আমাকে বলেছে 'এক জন' বাবার কাছে যাচ্ছেন, তিনি কি টাটুকে বাবার কাছে নিয়ে যাবেন না? তিনি কি টাটুর বাবাকে টাটুর কাছে ফিরিয়ে দেবেন না? বাবাকে না পেলে টাটু মরে যাবে। কুসুমবিবি কি তা জানে! তবে কেন সে চুরি করবে বাবাকে? কান্না এর মধ্যে বন্ধ হয়েছিল, এবার আবার ঠোঁট ফুলতে লাগল।

গাড়ী হু হু ক'রে চলেছে। কালো শীর্ণ নদীর মত গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্। এক এক জায়গায় রাস্তার দু-পাশের লম্বা গাছের মাথাগুলো একসঙ্গে মিলে গেছে। অন্ধকার দৈত্য পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। কখনও পৃথিবীর রাস্তা ঐ বাঁকের মুখে শেষ হয়ে গেল বুঝি, তার পর অস্পষ্ট মহাশূন্য আকাশ। হেড্‌লাইটের হিংস্র আলো অন্ধকারের সাগরে উন্মাদের মত

কোথায় ছুটছে! কেমন ক'রে টাটু তাঁর গায়ে এলিয়ে পড়ল। সুকোমল দুটি হাত তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে। তার গায়েতে কম্বল টেনে দিলেন। এসেন্সের গন্ধটি কি সুন্দর! এমন এসেন্স সে আর কখনও দেখে নি। টাটুকে যেন আরও বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। তাঁর চোখের জল কি টাটুর কপালে পড়ল! কি মিষ্টি চুমু! টাটুর আর কিছুই মনে পড়ে না।

ষ্টেশনের হাঁকডাকে, বিশ্রী চক্‌চকে আলোয় টাটুর ঘুম ভেঙে গেল। সারা গদিটা জুড়ে সে শুয়ে আছে। গাড়ীতে 'এক জন' ত নেই। কম্বলটা সে ঠেলে ফেলে দিলে। কেমন সুন্দর ফুলের গন্ধ আসছে। একটা মস্ত বড় সাদা গোলাপ তার বুকে আঁটা, তার পাশে এক তোড়া লিলি। যিনি দরজা খুললেন, লাফিয়ে উঠে 'অ্যা' ব'লে চেঁচিয়ে টাটু তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল—বাবা! বাবা!

—টাটু?—টাটু!

শোফার তখন বেরিয়ে এসেছে।

তিনি তার দিকে চেয়ে বললেন—বাসুদেও!

সে স্বর শুনে বাসুদেব সেলাম করতে ভুলে গেল—হুজুর আমার কসুর নেই। বিবিজী আসতে আসতে গাড়ী ঘোরাতে বললেন; হাওড়া এসে নেমে গেলেন, বললেন—একটা খুব ভুল হয়ে গেছে, টাটুবাবার কাছে হুজুরের জন্যে চিঠি লিখে রেখে গেলেন।

তিনি কারও দিকে না চেয়ে বললেন—বাসুদেও!

—হুজুর, পরমাত্মা জানেন—

টাটুর বুকের সাদা গোলাপের পাশে পিনে-আঁটা ছোট এক টুকরা কাগজে সেই চিঠি। গাড়ীর পাশের ষ্টেশনের সেই বিশ্রী চক্‌চকে আলোয় টাটুর বাবা সেই চিঠি পড়লেন। জ্যান্ত মানুষের মুখ এক মুহূর্তে মৃত হয়ে গেল, নিরতিশয় বেদনায় শুধু দুই ভ্রূর মধ্যের গভীর রেখা, মুখের কোণের ক্ষীণ রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল, আর টাটুর মতই গাঢ় বাদামী চোখ দুটি জলজ্বল ক'রে উঠল।

চিঠিতে বড় বড় অক্ষরে পেন্সিলে লেখা ছিল।—তোমার স্ত্রীর স্বামীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে আমার বাধত না, কিন্তু টাটুর বাবাকে টাটুর কাছ থেকে চুরি আমি করতে পারলুম না। আমার সঙ্গে আর তুমি দেখা ক'রো না। চিঠি লিখো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা ঘটবে না।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে প্রাচীন বাংলার চিত্র

শ্রীসুশীলচন্দ্র কর

মঙ্গলকাব্য রচনায় অনেক কবিই হাত দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্য রচনা করিলেন পল্লীজীবন লইয়া। পল্লীবাসীর দুঃখ-দৈন্য, আচার-নিষ্ঠার কথা তিনি যত হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সমসাময়িক আর কোন কবি তাহা পারেন নাই। তখনকার লোকে কি খাইত পরিত, কি ভাবিত, কেমন করিয়া ঘরকন্না করিত—এই সবই তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। সেকালের সমাজ এবং রাষ্ট্রকেও তিনি ভোলেন নাই। ফুল্লরার বার মাসের দুঃখের মধ্য দিয়া আমরা প্রাচীন দরিদ্র গৃহস্থের করুণ আর্ত্ত-ধ্বনি শুনিতে পাই। কালকেতুর জীবন-মুকুরে প্রাচীন যুগের চরিত্র-বল ও মাহাত্ম্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রে "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল"—এই ভাবটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। মুরারি শীলের কথাবার্ত্তার ম্যারপ্যাচের ভিতর দিয়া কপট-প্রকৃতি লোকের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বণিক-সভায় মালা-চন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙালীর সামাজিকতা আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। লহনা ও খুল্লনার কোন্দলের মধ্য দিয়া সপত্নী-

বিদ্বেষ তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে। কংসনদীর কুলুধ্বনি! তাহার সহিত ফুল্লরা ও কালকেতুর প্রেমময় স্মৃতি যেন মিশিয়া আছে। বিরহিণী খুল্লনাকেও আমরা ভুলিতে পারি না, কখনও বা সে বিহ্বলচিত্তে পতি-ভ্রমে নির্জ্জীব অশোক ও কিংশুক পুষ্পকে আলিঙ্গন করিতেছে, কখনও বা অনাথার মত সখীর কাছে বিলাপ করিতেছে। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহা প্রতিবাসিনীদের পতি-নিন্দা। গৌরীর এমন সুন্দর স্বামী জুটিয়াছে দেখিয়া প্রতিবাসিনীরা অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিল। শিবের মদনমোহন রূপের কাছে তাহাদের স্বামীদের বিরূপতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, শতমুখে নিন্দা চলিল।

খোঁড়া কুব্জা খান্দা স্বামী কার স্বামী ব্যাধি।
কান্দিয়া তাহারা অবিরত নিন্দে বিধি।

ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোক-চরিত্রই এই কাব্যখানিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। এক দিকে কালকেতু ও ফুল্লরার দরিদ্র বেশ, অপর দিকে ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা প্রভৃতি মহামূল্য পরিচ্ছদের চাকচিক্য ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। বুলান মণ্ডল, মুরারি শীল প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। ইহাদের জীবনেও জানিবার মত অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে।

তার পর 'বৃক্ষ কর্ত্তন', 'নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন', 'পশুগণের বিলাপ' প্রভৃতি হইতে পশুপক্ষী, ফুলফল এবং বৃক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এমন কি রন্ধন-সংক্রান্ত সামান্য বিষয়টিও কবির চোখ এড়ায় নাই। সেকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতিরও দীর্ঘ তালিকা কবি দিয়াছেন। নানা দেশ হইতে যে-সকল সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া বাংলায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের বিষয়েও অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা খুব স্বাভাবিক এবং সত্য বলিয়াই বোধ হয়। চণ্ডীমঙ্গলের প্রত্যেক চিত্রটিই অপর হইতে স্বতন্ত্র অথচ কাহারও ঔজ্জ্বল্যে কেহই ম্লান হয় নাই।

প্রাচীন বাংলা-সংক্রান্ত যে যে বিষয়গুলি জানিবার জন্য আমরা নিরতিশয় উৎসুক, তাহার সম্বন্ধেই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

দেশের তৎকালীন অবস্থা

দেশের অধিকাংশ স্থান সে সময় ছিল বনজঙ্গলে ঘেরা। বনে যাহারা বাস করিত, বন্যজন্তুদের সহিত যুদ্ধ তাহাদের লাগিয়াই ছিল। কালকেতুর সঙ্গে পশুরাজের যুদ্ধের ভিতর দিয়া তাহার স্পষ্ট আভাস মিলে।

পশুরাজ সনে যুঝে বীর কালকেতু।
দেবাসুর রণ যেন হৈল সুধা হেতু।

আবার দেখা যায় অরণ্যচারী ব্যাধজাতিরা সময় সময় অতিশয় পরাক্রান্ত ও দলবদ্ধ হইয়া বন কাটাইয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিত। কালকেতুর উপাখ্যানেও দেখিতে পাই, যখন চণ্ডী-দত্ত অঙ্গুরীর মূল্যস্বরূপ সাত কোটি টাকা কালকেতুর হাতে আসিল, তখনই সে গুজরাট বন আবাদ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু রাজ্য স্থাপন করিয়াই রাজা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। কেননা, অনেক সময় আবার পুরাতন রাজার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়া যাইত। নূতন রাজা প্রবল হইলে, পুরাতন রাজা সহজেই বশ মানিতেন। গুজরাটের গহন কানন যখন কালকেতুর রাজধানীতে পরিণত হইল, তখন দেবীর মায়ায় কলিঙ্গদেশ জলে ডুবিয়া গেল। 'রাজার পাপে প্রজা ক্ষয়' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাকুল কালকেতুকেই তাহাদের রাজা মানিয়া লইল এবং সুখে বসবাস করিতে লাগিল। কিন্তু তখন দেশ ছিল অরাজকতার মধ্যে। ন্যায্য অধিকারের দোহাই কেহ শুনিত না। তাই কাহারও ধনসম্পত্তির নিশ্চয় ছিল না। পাঠানেরা হিন্দুরাজ্য পাইলেই লুণ্ঠন করিত। আবার মোগলদের আক্রমণে পাঠানরাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সিংহ-শার্দ্দূলের লড়াইয়ের মধ্যে পড়িয়া সাধারণ লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডী-কাব্যের কবি মুকুন্দরামকেও ভিটা ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল। সেই দুঃখ সরল ভাষায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন, "নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।" বড় জমিদার, তালুকদার হইলে না-হয় উপদ্রুত হইবার সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এত টানা-হেঁচড়া কেন! আপামর-জনসাধারণের উপরেও অত্যাচার চলিত।

ভক্তির প্রভাব ও পূজা-আর্চ্চা

প্রাচীন সমাজে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রবল প্রভাব দেখা

যায়। ধনপতি ও শ্রীপতির আখ্যান জুড়িয়া ভক্তির ফল্গু ধারা নিরন্তর প্রবহমান। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে হরি-কথার ছড়াছড়ি ও ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দেখিয়া মনে হয়, সেই কালের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও প্রভাব ছিল। শ্রীমন্ত চণ্ডীর ব্রতদাসীর বরপুত্র হইয়াও চণ্ডীর কীর্ত্তন না করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহা তৎসময়ে বৈষ্ণব-প্রাধান্যের পরিচায়ক। বাঙালী জীবনের সেই নবাগত প্রেম-ভক্তির ধারাই উৎসারিত হইয়া খুল্লনার চরিত্রকে অনুপম মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। তখনকার লোকদের মধ্যে গণেশ-বন্দনা, সূর্য্য-বন্দনা, চৈতন্য-বন্দনা, মহাদেব-বন্দনা, চণ্ডীবন্দনা, লক্ষ্মী-বন্দনা এবং সরস্বতী-বন্দনা প্রচলিত ছিল।

তখনও আশ্বিন মাস আসিলে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শারদীয়া পূজার সাড়া পড়িয়া যাইত। মাঘ মাসে প্রাতঃ-স্নানান্তে সকলে সুপাঠকের নিকট ভক্তিপুর্তচিত্তে পুরাণের কাহিনী শুনিত। আবার ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমার অভিনব আনন্দ আসিয়া বাঙালীর প্রাণকে দোলা দিয়া যাইত। সর্ব্বত্র দোলমঞ্চ নির্ম্মিত হইত। সকলে হরিদ্রা, কুঙ্কুম এবং চুয়ার দ্বারা অঙ্গ-প্রসাধন রচনা করিত। 'হোলি উপলক্ষ্যে নানা রকম নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া উৎসবটিকে প্রাণবান্ করিয়া তুলিত। বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সকলেই পুণ্য সঞ্চয় করিত। পাঠক-ঠাকুরের রামায়ণ ও পুরাণ পাঠের মধ্য দিয়া শাস্ত্রের অতি নিগূঢ় তত্ত্বও নিম্নশ্রেণীর লোকদের কাছে সহজবোধ্য হইয়াছিল। এই ভক্তি ও পূজাপ্রসঙ্গের পরেই সামাজিক বিধিব্যবস্থা নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক।

সামাজিক বিধিব্যবস্থা

আমাদের সমাজের বিধিব্যবস্থা চিরকাল ধরিয়া সমাজের লোকেরাই করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন সমাজেও জন্ম, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

বিবাহ-বিধি

তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের বিবাহের জন্য মা-বাপকেই মাথা ঘামাইতে হইত। ঘটকালির ভার পড়িত কুল-পুরোহিতের উপর। কন্যার পিতার লক্ষ্য ছিল বরটি যেন কুলে শীলে নির্দ্দোষ হয়। তখন ব্রাহ্মণ-সমাজে বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথার প্রাধান্য ছিল। ইহাতে অনেক কুফল ফলিয়াছিল। ছেলেমেয়েদের বিবাহ হইত খুব অল্প বয়সে। বেশী বয়সের কন্যা ঘরে রাখিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। সমাজে ইহা লইয়া কাণাঘুষা হইত। পঁচিশ বৎসরেও ছেলেদের বিবাহ না হওয়ার মত বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছুই ছিল না। নীচের ছত্র দুইটির মধ্যে সেই বিস্ময় পরিস্ফুট।

> ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল, নাম তার শিবা।
> পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা।

কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে। বর ও কন্যা উভয়েরই ছিল পণ পাওয়ার অধিকার। কিন্তু এই নিয়ম সকল শ্রেণীর লোকে মানিত না। উচ্চ সমাজে পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারিত। ধনপতি ও শ্রীমন্তের ছিল দুই দুই স্ত্রী। ধর্ম্মকেতু ও কালকেতুর এক এক বিবাহ ছিল, বিবাহের আগের দিন নিরামিষ আহারের বিধি ছিল। স্ত্রী-আচারও বাদ পড়িত না। মেয়েকে একখানি পিঁড়ির উপর বসাইয়া অপরে তাহা বহন করিয়া বর প্রদক্ষিণ করাইত, আর কন্যাপাত্রের শুভদৃষ্টি হইত। বিবাহের সময় শাশুড়ী জামাতার চরণে দধি ঢালিয়া দিতেন। ইহার পরে যাহা যাহা ঘটিত, তাহা ধনপতির বিবাহ-চিত্রে অতি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডপে বাজনা বাজিয়া উঠিল। লক্ষপতি বসিলেন কন্যা সম্প্রদান করিতে। শুভক্ষণে তিনি কন্যা ও বরের পাণি গ্রহণ করিয়া তাহাদের উভয়ের কর একত্র করিলেন। উচ্চস্বরে বেদ পাঠ হইল। আত্মীয়স্বজনে ঘরবাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, কাড়া এবং মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছে, মাঝে মাঝে দামামার গুরুগম্ভীর ধ্বনি। তাহার সহিত বাজিয়া উঠিল সানাই, ভেরী, শিঙ্গা আর রুদ্র বীণা। সঙ্গীত-মন্দির হইতে গানের রেশ ভাসিয়া আসে। লক্ষপতি জামাতাকে নানা রত্ন দান করিলেন। ভোজনের থালা, বেড়াইবার জন্য ঘোড়া এবং শয়নের নিমিত্ত দিলেন খাট, চাঁদোয়া আর ফিতার মশারি। আর দিলেন ঝারি, খুরি, তাম্বুল-সাপুড়া, শস্যপূর্ণ ভূমি, এবং বসিবার চন্দন-চৌখরী—কিছুই বাদ পড়িল না।

অবশেষে স্বামী-স্ত্রী অগ্নিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বাসর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেবতার নামে ঘৃতের গণ্ডুষ করিয়া ধনপতি ভোজনে বসিলেন। পিঠা, মিষ্টান্ন আর ক্ষীরে ভোজন সারিয়া দুই জনে কুসুম-শয্যায় শয়ন করিলেন। চারি দিকে ভিড় জমাইল বণিক-রমণীগণ। তাহাদের পরিহাসের জ্বালায় সাধু উঠিল অতিষ্ঠ হইয়া। রজনী প্রভাত হইলে রমণীগণ শয্যা-তোলানীতে পঞ্চাশ কাহন কড়ি পাইল। তার পর সকলকে বিনয়-বচনে তুষ্ট করিয়া ধনপতি বিদায় লইলেন।

এখনকার মত তখনও অন্তঃসত্ত্বা রমণীদের নানা দ্রব্য খাইবার সাধ হইত। সুপ্রসবের জন্য গর্ভিণীরা জলপড়া বা ঔষধ সেবন করিত। তাহারা স্বামীকে বশে আনিবার জন্যও নানারূপ মহাস্ত্র প্রয়োগ করিত। ঔষধপ্রবন্ধে সেই সব ঔষধের বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। এই ঔষধসংগ্রহের কথা মনে করিলেও ভয় হয়।

আদেশ পূড়াতী গাছ হাইহামলাতি,
আকুল কুণ্ডল করি আন মধ্যরাতি,
ইহার ছামণী যোগে বশ হয় পতি।

হাল ফ্যাশানে স্বামীকে বশে আনিবার যে মন্ত্র আধুনিকারা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে আর যাহাই থাকুক, এমনতর উৎকট রুচি কখনও প্রশ্রয় পায় না। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা স্বামীর উপর এক-অধিকার বিস্তার করিবার প্রলোভন। সপত্নীকে স্বামীর চক্ষুশূল করিয়া নিজে স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা ঔষধ সাধিত। কালকেতুর উপাখ্যানেও আমরা দেখিতে পাই, কবি চণ্ডীকে সপত্নীর ছদ্মবেশে সাজাইয়া ফুল্লরার মনে কেমন সংশয়ের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে

এই সামান্য কথা কয়টি ফুল্লরার সরল প্রাণে কত বড় সন্দেহের রেখাপাত করিয়া দিল!

কোন স্ত্রীলোকের অপবাদ রটিলে স্বামীকে তজ্জন্য নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

বরযাত্রী

বিবাহের কথা বলিতে গিয়া বরযাত্রীদের কথা না বলিলে তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। বিশেষতঃ তখনকার দিনের বরযাত্রীরা এখনকার মত অনাবশ্যক বোঝা বলিয়া গণ্য হইতেন না। তাঁহাদিগকে রীতিমত সম্মানের সহিত ভোজ্য ও উপহার দিতে হইত। বরপক্ষের কাছেও বর-যাত্রীদের এই দাবী ছিল।

এই গেল বিবাহের বিবরণ। ইহার পরেই "মায়ের কোল আলো করে খোকার কচি মুখ।" কিছু দিন পরে গণক আসিয়া খোকার নাম রাখিয়া যায়। তাই "গণক আনীঞা নাম থুইল কালকেতু।" তখন ছোট ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্য "ঘুমপাড়ানী গানে"র প্রচলন ছিল। তখনও আমাদের দেশে স্কুল, কলেজের প্রচলন হয় নাই; টোল ছিল, টোলেই পণ্ডিতের কাছে থাকিয়া ছেলেরা পাঠাভ্যাস করিত।

শ্রাদ্ধাদি বিষয়ক কথা

সেকালে শ্রাদ্ধাদি বিষয়েও অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। পিতৃ-বিয়োগে অশৌচ হইত এক বৎসর। বৎসরের শেষে সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ করিয়া তবে অশৌচ ভঙ্গ করিতে হইত। এই সকল বিরাট কাজকর্ম্মে জ্ঞাতি লোকদের মালাচন্দন দিয়া সমাদর দেখাইতে হইত। কুলে শীলে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই মালাচন্দন পাইতেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন। তাই তুমুল বাদবিতণ্ডা বাধিয়া যাইত। তখন ভোট দেশের কম্বলের খুব আদর ছিল। পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আসন ও ভোট-কম্বল দিয়া অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রথা ছিল। রাজদর্শনে গেলে ভেট লইয়া যাইতে হইত। দুই সখীতে বা বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেখা হইলে পরস্পর কোলাকুলি করিত। আজকাল আমরা করি প্রীতি-নমস্কার। অকুলীনের বাড়ী গেলে কুলীনেরা রাঁধিয়া খাইত। বর্ত্তমানে এই প্রথা কচিৎ দেখা যায়। রন্ধনে পটু হওয়া তখনকার কালের মেয়েদের কাছে ছিল গৌরবের বিষয়। কারণ বরপক্ষ তখন এইটির উপরই বেশী জোর দিত। ভাল রাঁধিতে না পারিলে নিন্দার কথা ছিল। আজকাল বরপক্ষ চায় মেয়েটি লেখাপড়া নৃত্যগীত জানে কি না, তাই আধুনিকাদের লক্ষ্য রান্নাঘর হইতে সঙ্গীতালয়ের দিকে ফিরিয়াছে। তখনকার দিনের মেয়েরা বড় বেশী ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিলে জল

আনিবার ছলে সকলে কলসী-কাঁখে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত। আজকালকার মেয়েদের সে-বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে। তাহারা দিব্যি বাহিরের আলোতে বেড়াইয়া সুস্থ দেহ-মনে বিরাজ করিতেছে। অবশ্য, এখনও কোন কোন পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের এ-অবস্থা ঘোচে নাই।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার

তখন পোষাক-পরিচ্ছদের বাড়াবাড়ি ছিল না। ধুতি চাদর আর পাগই (পাগ্ড়ি) ছিল প্রধান পোষাক। কোঁচা লম্বা করিয়া মাটিতে ঝুলাইয়া দেওয়াই ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ। তখনকার দিনের রীতিই ছিল বড় বড় চুল রাখা। জুতা লোকে খুব কমই ব্যবহার করিত। মাঝে মাঝে গায়ে দিত 'অঙ্গরাখি'।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অলঙ্কারের প্রভা আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। তখনকার অলঙ্কার—চুড়ি, কণ্ঠমালা, গজমতি হার, নূপুর, সুবর্ণের কড়িমাছি, কুলুপিয়া শঙ্খ। কঙ্কণে ও অঙ্গুরীতে দর্পণ সংযুক্ত থাকিত। সেকালে কাঁচুলি দুর্লভ ছিল ও তাহাতে নানারূপ কারুকার্য্য থাকিত। শিশুদের অলঙ্কার ছিল—

> বিচিত্র কপাল তটি, গলায় সুবর্ণ কাঁঠি,
> কটিতটে শোভে হার কনক শিকলি,
> পদ যুগে মল বাঁকি্ করে ঝলমিলি।

অপর পক্ষে এমন দরিদ্র অবস্থার লোকও তখন ছিল, যাহারা পশুর চর্ম্ম দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিত, শীতে কষ্ট পাইত।

খাদ্য

সেই সময়কার খাদ্যেরও বৈচিত্র্য ছিল।

তখনকার খাদ্য—চিড়া, মুড়ি, খই, লাড়ু, ক্ষীর, ফেনী, দধি, কাঞ্জি বা ভাতের ফেন।

> কলার বড়া মুগ সাউলী, ক্ষীরমোননা ক্ষীরপুলি,
> নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।

এই সকল পিঠার স্বাদ এখনও আমরা পাই।

তার পর

> দুগ্ধের গুড়ে ছিলে মিশায়ে লাউ।
> দধির সহিত খুদের জাউ।

বিচিত্র সমাবেশ! দুধের সর দিয়াও অনেক মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হইত। সুশীলার বারমাসীতে দেখা যায় প্রাচীন বাংলার সহিত পাটালি গুড়েরও পরিচয় ছিল। সুশীলা তাহার স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

> খাওাব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে।

তখন পায়েসেরও খুব আদর ছিল।

শিম, খোড়, ডুমুর, কাঁচকলা, কচু, বেগুন, শাক-সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। তাহা দ্বারা গৃহস্থেরা "ভাজা, শুক্তা, ঝোল, ঘণ্ট, সুপ" প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। মাছ-মাংসেরও কোন অভাব ছিল না। তবে অনেকে দেবদেবীর কাছে নিবেদন করিয়া খাইত। কবি মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্যের স্থানে স্থানে অনেক মাছের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার মাছ—কই, চিংড়ী, পুঁটি, বোয়াল, চিথল আর রোহিত। হরিণ ও ছাগলের মাংসই তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

বাসন-পত্র

এই সকল বিচিত্র ব্যঞ্জন রাঁধিবার জন্য নানা রকম পাত্র ছিল। সেকালের বাসনপত্র—গাড়ু, ঘটী, ঘড়া, সরা, হাঁড়ি তাম্বুল সাঁপুড়া, ঝারি, খুরি, খোরা, পাথর, থালা, বাটি, ডাবর প্রভৃতি।

অঙ্গপ্রসাধন

তখনও এসেন্স, আতর সরল গ্রাম্য যুবতীদের সুরুচিকে বিকৃত করে নাই। তাহাদের কাছে এ-সব ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। সিন্দুর তাহাদের কপালে শোভা পাইত আর চুলে তৈল মাখিয়া তাহারা কবরী রচনা করিত। পায়ে দিত আলতা। সেই আলতা ঘরেই প্রস্তুত হইত। কাজল, কুঙ্কুম এবং চন্দনই ছিল তাহাদের প্রিয় প্রসাধন।

ফুল-ফল

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে-সকল ফুলফল দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন বাংলার লোকেরা নানা স্থান হইতে আনিয়া রোপণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এইগুলির নাম করা যাইতে পারে:—

কদলী, পনস-রম্ভা, তাল, নারিকেল, গুয়া, দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, চাঁপা, তুলসী, মালতী, জাতী, শেফালি; অতসী, মল্লিকা, কুন্দ, কুরুবক, কেতকী, ধাতকী, করবী ও চন্দন।

পক্ষী

তখনকার পাখী—

কপোত, কুক্কুভ, কঙ্ক, কলবিঙ্ক, কর্কট, কীর, কোক, কুবর, খঞ্জন, করট, চাতক, ফিঙ্গা, টেঁসকোনা, মাছরাঙ্গা, সারস, গাঙ্ চীল, বলাকা, বর্ত্তিক, হংস, শ্যেন, বাবুই, কোকিল, টুনী, পানকৌড়ি।

তখনকার খেলাধূলা

শ্রীমন্তের খেলাধূলার সম্পর্কে কবি অনেক খেলার নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

বাঘঝালি (বাঘচালি, বাঘবন্দী), সাতঘর্‌যা, ঝালি (জলে ঝাঁপাইয়া পড়া), ভাঁটা, ছায়াবাজী, ধাড়্যাটিকা, কুচি, পাশা, ইত্যাদি।

ধাড়্যাটিকা—বর্ত্তমানে ইহাকে আমরা বলি দাঁড়িয়াবাঁধা। শ্রীমন্তের আরও কয়েকটি প্রিয় খেলা ছিল।

পাতি খেলে বাগ চালি,
জুয়া খেলে পাতি বালি।

* * *

জলে খেলে মাছ মাছ
ঝালি খেলে চড়ি গাছ।

বাণিজ্যপোত ও বাণিজ্য

সেকালে রণতরী-নির্ম্মাণকার্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, ব্রহ্মা স্বয়ং ছিলেন এই বাণিজ্যপোতের নির্ম্মাতা। তাঁহার পুত্র দারু-ব্রহ্মাও পিতাকে সাহায্য করিতেন। এই কাজে তাঁহারা হনুমানের সহায়তাও পাইয়াছিলেন। শ্রীমন্ত যখন সিংহলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন ব্রহ্মা সাতখানি নৌকা গড়িয়া দিলেন। নাম তাহাদের মধুকর, গুয়ারেখি, রণজয়া, রণভীমা, মহাকায়া, সর্ব্বধারা, নাটশালা।

মধুকরের আকৃতি ছিল মৌমাছির মত। গুয়ারেখির গলুই দেখিতে সিংহের মাথার মত ছিল। যুদ্ধকে জয়যুক্ত করে বলিয়া জলযান-বিশেষের নাম ছিল রণজয়। রণভীম নামেই বুঝায় যুদ্ধে ইহার পরাক্রম ভীমের সমান। মহাকায় যেন দ্বিতীয় টাইট্যানিক। সকল জিনিষেরই সঙ্কুলান হইত বলিয়া এক রকম জলযানের নাম রাখা হইল সর্ব্বধারা। নাটশালাতে নৃত্যগীতের কক্ষ ছিল। এই সব বিভিন্ন নাম দিয়া সাতখানি বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীমন্ত সিংহলের উদ্দেশে রওনা হইল। সিংহলের পথে কতকগুলি স্থানের তালিকা পাওয়া যায়—ভাওসিংহের ঘাট, মাটিয়ারি সফর, চণ্ডীগাছা, বোলনপুর, পূরথন, নবদ্বীপ, মুজাপুর ঘাট, আম্বুয়া, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, মহেশপুর, ফুলিয়া ঘাট এবং হালিসহর। ইহার পরেই কালিদহ। ভাগীরথীর তট-বর্ণনার মধ্যেও কোন কোন স্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে আছে, মগরা অতিক্রম করিয়া রাতদিন ডিঙা বাহিয়া সাধু অবশেষে হাত্যাগড় পৌছিল। এখানে মগরা হইতে হাত্যাগড় যে অনেক দূরের পথ তাহা বুঝা যায়। ক্রমে কালিঘাট হইয়া কলিকাতা আসিলেন। এই স্থান দুইটি যে অতি কাছাকাছি তাহা বর্ণনার মধ্যেই ধরা পড়ে। এই সকল স্থান হইতে অনেক দ্রব্য লইলেন। দুই তীরের ঘাট ছিল পাষাণে রচিত। যাত্রীরা বসিয়া আমোদ উৎসব করিতেছে। বাম দিকে হালিসহর। ত্রিবেণী তখনও প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই স্থানে বিশ্রাম এবং স্নান সারিয়া লইয়া সদাগর আরও অনেক দ্রব্য কিনিলেন। সাধু আবার কোঙরনগরে (বর্ত্তমান কোন্নগরে) আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। এই গ্রামের বাঁম দিকে কোদালিয়া ও গুপ্তিপাড়া। সদাগর এইবার আঁবুয়া মুলুক দিয়া চলিলেন। মাঝিদের মধ্যে "বাহ", "বাহ" সাড়া পড়িয়া গেল।

বাণিজ্য-বিনিময়

প্রাচীন কালে আমাদের এই বাংলা দেশের সহিত সিংহল প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য চলিত। আমাদের দেশের লোকেরা কুরঙ্গের বদলে তুরঙ্গ আনিতেন। নারিকেলের বদলে আনিতেন শঙ্খ। বিড়ঙ্গের বিনিময়ে পাইতেন লবঙ্গ। গাছফল দিয়া জায়ফল লইতেন। বয়ড়াতে আর গুয়াতে, সিন্দূরে আর হিঙ্গুলে বিনিময় চলিত। পাটশণ বেচিয়া ধবল চামর মিলিত। কাচের বিনিময়ে নীল পাথর পাওয়া যাইত। চঞ্চ দিয়া চন্দন জুটিত। শুক্তার মূল্য দিত মুক্তা। তখন ভেড়ার সহিত ঘোড়ার বিনিময় হইত। মাসকলাই, মসুরী, তণ্ডুল, বরবটী প্রভৃতির বদলে পাওয়া যাইত তৈল, ঘি, যব, সরিষা, মুগ, তিল এবং ছোলা।

এই-সব বাণিজ্যের মধ্য দিয়া এক দেশের সহিত অন্য

দেশের পরিচয়ের সুবিধা হইত। ধনপতি ও শ্রীমন্তের আখ্যানে দেখা যায় এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের বিবাহও হইত।

সমরপ্রণালী

তখন ছিল মুসলমান রাজত্ব। তাই যুদ্ধপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি ছড়া হইতে তখনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা আমরা লাভ করিতে পারি। যোদ্ধার হাতে থাকিত গুলফি। 'অস্ত্র গুলফি হাতে'। ইহা বোধ হয় শূলের মত কোন অস্ত্র হইবে। পায়ে থাকিত বাজন নূপুর। অনেকে আবার রায়বাঁশও ব্যবহার করিত। আগের দিনে যুদ্ধের সময় কুঠার ব্যবহৃত হইত। কেহ আবার 'বাণ' মারিতেন। মহাবীরেরা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেন। তখন যোদ্ধার এক হাতে অস্ত্র, আর এক হাতে ঢাল থাকিত। মহিষের চামড়া দিয়া ঢাল প্রস্তুত হইত। হাতীর পিঠে মাহুত এবং অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। যুদ্ধক্ষেত্রের হুঙ্কারধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত। উভয় পক্ষ রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত।

রণবাদ্য

প্রাচীন বাংলার যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় রণবাদ্যও কম ছিল না। কবি মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনা করিতে গিয়া যে-সকল রণবাদ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু আগেই দামামা বাজিয়া উঠিত। সেই দামামা এবং ঢাকঢোলের শব্দে সৈন্যদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়িয়া যাইত। রণবাদ্য সকলকে জাগাইয়া তুলিত। তার পর সুরু হইত যুদ্ধের বাজনা।

> বায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা
> দগড় দগড়ী বায় শত শত জনা।
> হাথীর গলাতে ঘণ্টা বাজে ঠনঠনী।
> কাংস্য করতাল বাদ্য করতাল শুনি।

জয়পত্র

বাণিজ্য অথবা যুদ্ধের ব্যাপারে স্বামীকে অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতে হইলে স্ত্রীকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া যাইতে হইত। ধনপতি যখন সিংহল-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তখন খুল্লনা ছয় মাস গর্ভবতী। সাধুকে তাই জয়পত্র লিখিয়া দিতে হইল। এই জয়পত্র থাকিলে লোকে কোন কলঙ্ক রটাইতে পারিত না। খুল্লনার জয়পত্রে ধনপতি লিখিয়াছিলেন, তুমি আমার পরম ভালবাসার পাত্রী। তোমার প্রতি লোকের যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তজ্জন্য সন্দেহভঞ্জনপত্র রাখিয়া গেলাম। তোমাকে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়াও রাজাদেশে আমাকে প্রবাসে যাইতে হইতেছে। আমাদের কন্যা হইলে তাহার নাম রাখিও 'শশিকলা'। উত্তম বংশজাত বরের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিও। আর যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিও।

> এইমত পত্র সাধু করিয়া লিখন।
> খুল্লনার হাতে হাতে কৈল সমর্পণ।

নগরপত্তন

ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপত্য-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। জয়পুর শহর ও গুজরাট নগরের পত্তনের ভিতর দিয়া বাঙালীর বাস্তু-বিন্যাস-শৃঙ্খলার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে ছিল নিবিড় অরণ্য, দেখিতে দেখিতে তথায় রম্য নগর শোভা পাইতে লাগিল। পাঠশালা, দেবালয়, নাটশালা, অনাথ-মণ্ডপ অতিথিশালা স্থাপিত হইল। মুসলমানদের ছিল পৃথক্ পাড়া। সেখানে মসজিদ ও রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইল। স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য নগরে ভাল ঘরবাড়ী ছিল। আর আগন্তুকদের জন্য ছিল সরাই। নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ পড়িতে আসিত। তাহাদের থাকিবার জন্যও উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। জলাভাব দূর করার নিমিত্ত কূপ ছিল বাড়ীতে বাড়ীতে। ইহা ছাড়া স্বচ্ছ জলপূর্ণ জলাশয়ও বিস্তর ছিল। কালকেতুর হাট স্থাপন ব্যাপারেও দেখিতে পাই,

> বেরুনিয়া জন আনি বান্ধিল বিপণি।

আজকাল আমাদের দেশে যেমন ছৈয়ালরা ভাল ঘর বাঁধিতে পারে, তখনকার দিনেও সেইরূপ এই বেরুনিয়া-সম্প্রদায় ঘর-বন্ধন-কার্য্যে পটু ছিল। বাংলার সুবাদার মানসিংহ দিল্লী ফিরিয়া যাইবার সময় যশোহর-নিবাসী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামে এক জন নগর-পত্তন-দক্ষ এঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া যান। ইনি এবং ইঁহার পুত্র শ্রীধরই জয়পুর শহর পত্তন করেন। ইহা হইতেই স্থাপত্য-শিল্পে বাংলার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়।

বিভিন্ন জাতির কথা

নগর এবং রাজধানী প্রস্তুত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক আসিয়া রাজধানী ভরিয়া ফেলিল। তখনকার হিন্দুসমাজে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, ভাট, অগ্রদানী, গোপ, তেলী ও কলু, কামার, তাম্বুলী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালী বারুই, নাপিত, আগারী, মোদক, শরাক, গন্ধবেণে, শঙ্খবেণে, মণিবেণে, কাঁসারি, স্বর্ণবণিক, সেকরা, দাস, জেলে, ধোবা, দরজী, সিউলী, ছুতার, পাটনী, চণ্ডাল, কোয়ালি বা কোয়ালা, কোল, হাড়ী, চামার, ডোম, মারাঠা।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এত শ্রেণীবিভাগ ছিল না। বৃত্তি-অনুসারে মুসলমানদের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল। যাহারা রোজা এবং নামাজ করিত না, তাহাদের বলা হইত গোলাম। এক সম্প্রদায়ের আখ্যা ছিল 'জোলা'। তাহারা কাপড় বুনিত। পীঠা বেচিত, তাই নাম হইয়াছিল 'পিঠাহারী'। মাছ যাহারা বিক্রয় করিত, তাহাদের বলা হইত 'কাবাড়ি'। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা দাড়ি রাখিত না, সমাজ তাহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। ঘরে আস্তর লাগাইত তাই নাম হইল 'সানাকর'। 'সুন্নত' করিয়া এক দল লোক 'হাজাম' আখ্যা লাভ করিল। যাহারা গোমাংস বেচিত, তাহাদের 'কসাই' বলা হইত। কাপড় কাটিত বলিয়া কেহ কেহ 'দরজী' আখ্যা পাইল। মুসলমান-সমাজে বংশেরও আদর ছিল। 'সৈয়দ', 'মোগল', 'কাজী' ছিল আভিজাত্যে সকলের চেয়ে প্রধান। বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলে অনেকে গ্রামের 'মোড়ল' হইত। সকলে তাহাকে 'মোল্লা-সাহেব' বলিয়া সম্মান করিত। মুসলমান-পাড়াকে লোকে 'হাসানহাটী' বলিত। তখনও দরগায় গিয়া পীরকে 'ছিন্নি' দিতে হইত। প্রাণ গেলেও কেহ রোজা নামাজ ছাড়িত না। লম্বা দাড়ি রাখাই ছিল তখনকার দিনের রীতি। মাছ যাহারা বেচিত, তাহাদের দাড়ি থাকিত না। তাহারা কোন আচারবিচার মানিত না। যে-হাতে মাছ ধরিত, সেই হাতই আবার কাপড়ে মুছিত। বিবাহ অল্প লোকেই করিত। অধিকাংশের ভাগ্যেই জুটিত 'নিকা'।

ব্রাহ্মণ

সেকালের ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা নানারূপ শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। মূর্খ ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কাজ করিতেন। অনেকের আবার পেশা ছিল ঘটকালি করা। কিন্তু আশানুরূপ পুরস্কার না পাইলে তাহারা কুলের নামে নিন্দা রটাইত। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা নাচগান এবং হরির নাম জপ করিয়া দিন কাটাইত।

ক্ষত্রিয়

ইহারা শরীর চর্চ্চা করিত। আখড়াতে প্রতিদিন দণ্ডযুদ্ধ হইত। গদার মত এক রকম দণ্ড ছিল, তাহা ঘুরাইত। কেহ কেহ মৃগয়ায় যাইতে ভালবাসিত। দানে ইহারা ছিল মুক্তহস্ত। পুরাণ-গান ইহাদের কাছে খুব প্রিয় ছিল।

কায়স্থ

চালচলনে ইহারা সভ্যভব্য ছিল। ইহারা ছিল নগরের শোভাস্বরূপ। লেখাপড়ার কাজ লইয়াই থাকিত।

বৈদ্য

সুচিকিৎসক হিসাবে বৈদ্যগণের খ্যাতি ছিল। তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই পুঁথি থাকিত। তাহাদের পোষাকও সাদাসিধা ধরণের ছিল। পরণে ছিল ধুতি, মাথায় ছিল পাগড়ি এবং কপালে থাকিত ফোঁটা। কঠিন রোগ দেখিলে এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া পড়িত।

তখন হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষ একটি শ্রেণী ছিল দেখা যায়। সমাজে তাহাদের প্রাবল্যও ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষ কোন সম্প্রদায় নাই বলিলেই চলে। তার পর দেখিতে পাই মারাঠারাও বাংলার হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ মারাঠারা বাঙালী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।

উপসংহারে মঙ্গলকাব্যের দেবতা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতারই বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। নিছক শক্তির জোরে তাঁহারা নিজেদের পূজা প্রচার করিয়াছেন। নানা রকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যত ক্ষণ না মানুষ স্ত্রী-দেবতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছে, ততক্ষণ দেবীর শান্তি নাই। এই পূজা পাইবার জন্য ধনপতির উপর চণ্ডী কি অপরিসীম লাঞ্ছনাই না বহাইয়া দিয়াছেন। ধনপতি নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াও তেজের সহিত বলিয়াছে,—মানিব না তোমায় দেবতা বলিয়া, তাহার জন্য যাহা কিছু লাঞ্ছনা সহিতে হয়, সহিতে রাজী আছি। চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অবশেষে সেই দুরন্ত চণ্ডীর কাছেই মাথা হেঁট করিতে হইয়াছিল।

অলখ-ঝোরা—শ্রীশান্তা দেবী। প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। ৪১০ পৃঃ।

শ্রীমতী শান্তা দেবী বাংলা-সাহিত্যের সুপরিচিতা লেখিকা—কিন্তু রচনা যদি লেখকের প্রকৃষ্টতম পরিচয় হয়, তবে তিনি আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নিজের মনের যে ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্দ্বারা আমাদের দেশের পাঠকবর্গ লেখিকাকে নূতন করিয়া জানিবার সুযোগ পাইলেন। একটি মেয়ের বালিকা বয়স হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত মনের ক্রমবিবর্ত্তন ও উন্মেষ যেভাবে নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনো বাংলা উপন্যাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অনেক দিন পূর্ব্বে লেখিকার আর একখানি উপন্যাস আলোচনাকালে লিখিয়াছিলাম যে তাঁহার পুস্তকে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎকার লাভ করি, মনে হয় যে তাহারা আমাদের পরিচিত জগৎ হইতে পুস্তকের দেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কোথায় যেন তাহাদের সহিত পূর্ব্বেও দেখা হইয়াছিল। বর্ত্তমান উপন্যাসের সুধা একটি নিপুণ সৃষ্টি। তাহার সঙ্গে যেন জীবনের পথে আমরাও অগ্রসর হই, তাহার তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন যেন আমরা আমাদের মনের মধ্যে অনুভব করি। আর একটি নিপুণ সৃষ্টি সুধার পিসিমা সুরধুনী। সুরধুনীর জীবনের ইতিহাস ও তাঁহার বঞ্চিত নারীত্বের কাহিনী একটি ছোটগল্পের মত সুকুমার রচনা। যদিও বইখানির মধ্যে সুরধুনীর সাক্ষাৎ আমরা বেশীবার পাই না, তবুও বই শেষ হইয়া গেলে দেখি সুরধুনীর কথা আমাদের মনে অনেকখানি গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

লেখিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর কথাবার্ত্তা। কথোপকথনের ভাষা অত্যন্ত সহজ, কোথাও কষ্টকল্পিত সৌকুমার্য্যের ছায়া না থাকাতে সেগুলি নিতান্তই বাস্তব। অনেক সময় একটি মাত্র কথায় চরিত্রের অনেকখানি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন কলিকাতার স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হইয়া অজ্ঞ সুধা সহপাঠিনীর সহৃদয় সতর্ক বাণীর উত্তরে বলিতেছে বেঞ্চির উপর দাঁড়ালে কি হয়? খুব ছোট একটি কথা কিন্তু যাহা লইয়া ঝাড়া একটা প্যারাগ্রাফ বকিয়া মরিতে হইত, লেখিকা একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্য দিয়া সে কার্য নিষ্পন্ন করিলেন। নিপুণ হাতের রচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতির যে-পটভূমিতে সুধার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে, লেখিকা সে-পল্লীসৌন্দর্য্যের চমৎকার রূপ দিয়াছেন। অনেক দিন বাংলা উপন্যাসে এমন প্রকৃতির বর্ণনা পড়ি নাই কারণ ও জিনিষটা আজকাল সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতির চিত্র অলঙ্কার নয় উহা অনেক সময় রচনার চালচিত্র—উহা জীবন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মার্ণা-নন্দিনী—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। বুলবুল পাবলিশিং হাউস। ২৩ ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

তুর্কী বীরনারী খালিদা এদিব খানুমের উপন্যাসের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে বঙ্গানুবাদ। তুরস্কের নবজাগরণের এক সুন্দর পরিচয়। যুদ্ধ, প্রেম এবং দেশাত্মবোধের অভিনব সম্মেলন। স্মার্ণা-নন্দিনী আয়শার আদর্শ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাহিনীর মাদকতা আছে, এবং তাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

পুস্তকের সাজসজ্জা ভাল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কলেবর—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত এবং চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক ৬এ গোপাল ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

আলোচ্য গ্রন্থে 'কলেবর', 'জগদম্বা মেস', 'অশরীরী'—এই তিনটি কৌতুক-নাটিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'কলেবর' নাটিকাটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, উহাতে দুই একটি গান সন্নিবিষ্ট হইলে উহা আরও সরস হইত। 'অশরীরী' নাটিকার গতি একটু মন্থর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অভিনয়ের পক্ষে ইহাতে অসুবিধা হইতে পারে। যাহা হউক, নাটিকা তিনটিই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

খোসগল্প—শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী, বি-এস্‌সি প্রণীত। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

ছোটদের জন্য লেখা সচিত্র গল্পের বই। গল্প বলার ভঙ্গী সরস ও মধুর। ভাষা ঝরঝরে। গল্পগুলি প'ড়ে ছেলেমেয়েরা খুশীই হবে। খোসগল্প হ'লেও এতে শেখবার কথাও আছে।

সুইস্ ফ্যামিলী রবিনসন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিত। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আট আনা।

বিখ্যাত The Swiss Family Robinsonএর গল্পটি ছোটদের জন্য সংক্ষেপে লিখিত। ভাষা সরল ও মনোজ্ঞ। এই ধরণের বইয়ের উপকারিতা যথেষ্ট। সাহসিকতার গল্পপাঠে ছেলেরা সাহসী ও স্বাবলম্বী হ'তে শেখে।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

১। **ময়ূরাক্ষী**—২০৯ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০।

২। **গৃহকপোতী**—শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যগুণে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে মানুষের প্রাণের সত্যকার সুখদুঃখের সন্ধান পাওয়া যায়, সে দৃষ্টি তাঁহার আছে। তাই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর এই মহানগরী লেক, ড্রইং রুম, মোটর, পানীয়, মেকী সমাজবিদ্রোহের ছড়াছড়ি হইলেও তাঁহার দৃষ্টি

বাংলা দেশের নিপীড়িত প্রাণের সন্ধানে বাংলার নদীতীরের কৃষিক্ষেত্রের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলার প্রাণ আজও কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে স্তন্যপায়ী শিশুর মত পড়িয়া আছে, আর এই কৃষিক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে বাংলার নদনদী। ময়ূরাক্ষী পশ্চিম-বাংলার একটি শাখানদী। পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ-বঙ্গের নদনদীগুলির সহিত এই নদীগুলির পার্থক্য আছে এগুলি বাংলার নদী-প্রকৃতির মধ্যে এক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পরিচয় সাহিত্যে প্রকাশ করিয়া সরোজবাবু ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই নদীতীরে হারাণ ও বিনোদিনী একটি কৃষক-দম্পতী। তাহাদের সুখদুঃখ লইয়া এই উপন্যাস। লিপিকুশলতায় নদীতীরের শ্যামল পটভূমির উপর পল্লীসমাজের রীতিনীতির অনাড়ম্বর ছন্দের মধ্য দিয়া পশ্চিম বাংলার কৃষকজীবন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গৃহকপোতী' নামে স্বতন্ত্র হইলেও ময়ূরাক্ষীরই দ্বিতীয় অংশ। পাত্রপাত্রী পটভূমি সবই এক। যেখানে ময়ূরাক্ষীর শেষ, গৃহকপোতীর আখ্যানভাগের সেইখানে আরম্ভ। ময়ূরাক্ষীর নায়িকা বিনোদিনী স্বামীর উপর অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া (কুলত্যাগ করিয়া নয়) এক বৈরাগী-দম্পতীর আশ্রয়ে আসিয়াও পরম যত্নে নীড় রচনা করিয়া চলিয়াছে। এইখানে সরোজবাবু অপূর্ব্ব সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিয়াও গৃহকপোতীর গৃহরচনায় কি মমতা, কি আগ্রহ! বৈরাগী-দম্পতী রসময় ও ললিতার পরিচয়ে বাংলার আর এক সম্প্রদায়ের জীবনের নিখুঁত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর জীবনের আদি খাঁটি কাব্য সিনেমায় নাই, পাশ্চাত্য বিলাসিতায় নাই, আছে বৈষ্ণব-কবিতায় এবং বৈষ্ণব-জীবনে। বই দুইখানি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে বলিয়া আশা করি। কিন্তু দুইখানি পুস্তকেও যেন আখ্যানভাগে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই, তৃতীয় পুস্তক রচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশক পুস্তক-প্রকাশে যে যত্ন লইয়াছেন, প্রচ্ছদ-কল্পনায় যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ত্যেষ্টি—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ. ২৩১। মূল্য দুই টাকা।

একটি সাহিত্যিকের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত উপন্যাস। আকারে বড় হইলেও উপন্যাসটি ঘটনাবহুল নয়, যাহাকে বলিতে পারা যায় ভাববহুল। গল্পাংশের পুরোভাগে আছে দুঃখনিরাশার মধ্য দিয়া একটি সাহিত্যিক-জীবনের সাফল্যে পরিণতি। নেপথ্যে রহিয়াছে অন্তঃপুর – লেখকের দাম্পত্যজীবন, যাহা তাহার সাহিত্য-জীবনকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। সুষ্ঠু লিপিকুশলতার সঙ্গে লেখক এই দুইটি ভাবধারাকে মিলাইয়া উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন; মনে হয় যেন দুইটি সুরের মিশ্র একটি করুণ রাগিণী।

বহিটি প্রায় আগাগোড়া করুণ হইলেও সুখের বিষয় এই যে, ভাবটি কোথাও দুঃখবিলাসিতায় এলাইয়া পড়ে নাই। লেখক দুঃখকে সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্য বেশ একটি সুস্থ দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে তাহাকে স্বীকার করিতে পারিয়াছেন। এ জিনিষটা ভাবপ্রবণ বাঙালীর সাহিত্যে খুব সুলভ নয়।

বইয়ের ভাষায় বেশ ঝঙ্কার আছে, যদিও—"মেঘল চুলের দীঘল বিননী" নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ে। আশা করি, শক্তিমান লেখক এ ধরণের মোহ কাটাইয়া উঠিবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

যৌন-জ্ঞান—শ্রীসুনীলকৃষ্ণ মিত্র, এম-এসসি, বি-এল প্রণীত। মণ্ডল প্রেস, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

যৌন-বিজ্ঞানের নানাবিধ পুস্তক বাংলা ভাষায় বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে কামশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় যে-সকল পুস্তক বাংলায় দেখা যাইত তাহাদের সহিত এই পুস্তকগুলির প্রভেদ আছে। গত চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে-পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলির মালমশলাই ইংরেজী বই হইতে সঙ্কলিত। গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিরুচি অনুসারে বক্তব্য আহরণ করিয়াছেন; ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ চিকিৎসক বা কামবিদের মতের প্রাধান্যই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা হইতেও তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কামবিদ্গণ হয়ত তাহা মানিবেন না। তত্রাচ সাধারণের পক্ষে এই সকল কাহিনীতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ একাদশটি অধ্যায়ে কামশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যই জনসাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ্রতত্ত্ব সহজভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় সচরাচর ভাষার যে দোষ আসিয়া পড়ে আলোচ্য পুস্তকে তাহা নাই। পারিভাষিক শব্দকল্পনা সকলক্ষেত্রে উপযুক্ত না হইলেও গ্রন্থকারের ভাষা মার্জ্জিত, সুরুচিসম্পন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত। যৌনব্যাধি-প্রতিকারে কবিরাজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি তিন প্রকার ব্যবস্থাই উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুস্তকখানি যাঁহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, সকল দিক দিয়াই তাঁহাদের উপযোগী হইয়াছে। পুস্তক-প্রণয়নে গ্রন্থকার যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আশা করি, পুস্তকখানির বহুল প্রচারে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

সন্তদাস মহারাজের জীবনস্মৃতি—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা লিখিত ও ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি, রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৪১।১বি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাংলার গৌরব বাঙালী সন্ন্যাসী সন্তদাস বাবাজীর জীবনবৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচ্য পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত বাবাজীর যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত লেখিকার গয়া, কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণের ও অন্যান্য পারিবারিক ঘটনার বিবরণ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বাবাজীর সুযোগ্য সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বাবাজীর পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ. ২৬৮-৭০) তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত উপকরণ অবলম্বন করিয়া ও যথাসম্ভব অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক এই সাধকপ্রবরের অগণিত শিষ্যসম্প্রদায় গুরুদেবের রচিত গ্রন্থ ও ধর্ম্মমতের পরিচয় সহ তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সাধারণের গোচরীভূত হইবে। বস্তুতঃ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু সাধকের এইরূপ বিবরণ প্রকাশের প্রয়োজন আছে।

তীর্থভ্রমণ—শ্রীরাজকুমার বসু লিখিত। প্রাপ্তিস্থান—২২১, জঙ্গমবাড়ী, কাশী, গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য এক টাকা।

ভারতের প্রধান প্রধান বহু তীর্থ সম্বন্ধে তীর্থযাত্রীর জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। দিনপঞ্জীর আকারে লিখিত এই ভ্রমণ-

বৃত্তান্তে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনের বহু খুঁটিনাটি বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠকের পক্ষে এ বিবরণ রুচিকর হইবে না আশঙ্কা করিয়া ইহা বাদ দিয়া পড়িতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তবে গ্রন্থ-মুদ্রণের সময়েই এগুলি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হইলে ইহার আকার ছোট হইত কিন্তু উপযোগিতা ও আদর বাড়িত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পথের সন্ধানে—৫২ এ, মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা, যোগদা সৎসঙ্গ ভবন হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪। মূল্য ছয় পয়সা।

স্বামী যোগানন্দজীর প্রদত্ত বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত ঈশ্বরোপলব্ধি-বিষয়ক পুস্তিকা।

অনন্তের ধ্যানে—স্বামী যোগানন্দ। যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম, রাঁচি। পৃষ্ঠা ৯৬। মূল্য আট আনা। ভক্তি, প্রেম, সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে ধ্যানমূলক ১২টি ছোট ছোট নিবন্ধ।

মরণান্তে পুনর্ম্মিলন—শ্রীইন্দুভূষণ রায়। নড়াটা, যশোহর। পৃষ্ঠা ২৯। জন্মান্তর ও মরণান্তে পুনর্ম্মিলন সম্বন্ধে বিচার।

জরামরণ মোক্ষোপায়—শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর সংযোগী ব্রহ্মচারী। মোহন লাইব্রেরী, ফরিদপুর। পৃষ্ঠা ৩১। মূল্য চারি আনা। পুস্তিকাখানির প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মজ্ঞান লাভই জরামরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়।

সাধন সঙ্গীত—লেখক শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—শ্রীশরৎচন্দ্র সেন, ৮৯ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য চারি আনা। ভগবৎপ্রেমোদ্দীপক ১০৩টি নানা ভাবের সঙ্গীত।

ব্রজরাখাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা ৪৯। মূল্য চারি আনা। ব্রজরাখাল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাকীর্ত্তন-বিষয়ক কবিতা-পুস্তক।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য অথবা অদৃষ্টবাদ—শ্রীভবানীনাথ সেন প্রণীত। কিশোরগঞ্জ আর্য্যচন্দ্র প্রেসে মুদ্রিত, ময়মনসিংহ। পৃষ্ঠা ৫১। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকারের মতে অদৃষ্টই আমাদের সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা; আমাদের জীবনে পুরুষকারের কোন স্থান নাই। লেখকের এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

দত্তা পরিচয়—শ্রীপ্রমথনাথ পাল প্রণীত। ৪৯ নং বাহির শুঁড়া রোড, বেলেঘাটা, হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৭২ মূল্য আট আনা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা' উপন্যাসের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণে বেশ যত্নের পরিচয় আছে, এবং যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবেই প্রত্যেকটি চরিত্রের রূপ ও পরিণতি দেখান হইয়াছে। তবে লেখক মাঝে মাঝে দুই-একটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহা তাঁহার আলোচনার ক্ষেত্রবহির্ভূত। যেমন, "সে বিলাতফেরৎ বড় ডাক্তার, ইচ্ছা করিলেই সে ইউরোপীয় মহিলা বিবাহ করিতে পারিত, আর তাহাতে তাহাকে হাতী পোষার হয়রাণ ভোগ করিতে হইত।" এইরূপ মন্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। উপমাও দুই এক স্থানে বিসদৃশ। যেমন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পিপীলিকার যেমন একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, একটা বিরাট কলকারখানার মধ্যে সামান্য একটা কাঁটার যেমন সুস্পষ্ট অস্তিত্ব আছে, তেমনি 'দত্তা' আখ্যায়িকায় পরেশেরও একটা বিশেষ স্থান আছে।"

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বলাই-স্মৃতি বা জীবের পরিণতি—অধ্যাপক ডাঃ পরেশ-চন্দ্র দত্ত, ডি-এস্‌সি প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রশান্তকুমার গুহ, বি-এ, ১৩ নং ইণ্টালী মার্কেট, কলিকাতা। ২২১ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া জীবাত্মার 'পরিণতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হন; এবং এ-বিষয়ে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সাধারণতঃ প্রেতাত্মার সহিত যেভাবে আলাপ করা হইয়া থাকে, গ্রন্থকারও সেই ভাবে তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতা বলাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন (৭৬ পৃঃ ও তৎপর)। অবিশ্বাসী হয়ত মনে করিবে, এই সব আলাপে প্রশ্ন ও উত্তর সব একই ধরণের।

মৃত্যুর পর আত্মার কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না, তাহা লইয়া মতভেদ এখনও দূর হয় নাই। আবহমান কাল হইতে এই প্রশ্ন আলোচিত হইয়া আসিয়াছে এবং আবহমান কাল হইতেই এই বিষয়ে জিজ্ঞাসুরা 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। মৃত্যুর কথা এবং মৃত্যুর পরের কথা আমরা সব সময়েই ভাবি না; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রিয়জনবিয়োগে বিধুর ব্যক্তিরাই এসব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। যেখানে হারানো জিনিষকে হারানো মনে করিতে মন সহজে চায় না, সেখানে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একটু কষ্টকর হইয়া পড়ে। কাজেই, ইহার চারি দিকে একটা বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও বিষয়টি এখনও ঘোরালই রহিয়া গিয়াছে। তথাপি বিষয়টি এমনই ধরণের যে, কোন-না-কোন সময়ে ইহার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হইবেই। পরেশবাবুর এই বইখানা এ সব আলোচনার সহায়তা করিবে, ইহা আমরা মনে করি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সন্ধান—উপন্যাস। লেখক শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী। দামের উল্লেখ নাই।

একটি মেরুদণ্ডহীন যুবকের বখিয়া যাওয়া হইতে সুরু করিয়া অকাল-মৃত্যু পর্য্যন্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উপন্যাসটি রচিত। অবাস্তব ও অবান্তর ঘটনা সমন্বয়ে রচনা প্রায় অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। যোগ্য হস্তে পড়িলে, এরূপ কাহিনী অবলম্বনেও সুপাঠ্য উপন্যাস রচনা অসম্ভব নহে, যথা দেবদাস। কিন্তু লেখক সে যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে সুকৌশলে স্থানে স্থানে বৃহৎ তত্ত্বকথা সন্নিবেশ করিলেই রচনায় উৎকর্ষসঞ্চার হয় না, লেখকের ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। ভাষা ভাল। ছাপা বাঁধাই মন্দ নহে।

শ্রীমণীশ ঘটক

মজার পদ্য—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্, ১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ১৪টি গল্প সরল পদ্যে লিখিত হইয়াছে। পড়িয়া তাহারা আমোদ পাইবে।

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

আলোচনা

"ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ"

পৌষ মাসের প্রবাসীতে "ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একটি সন্দেহ মনে উদয় হইতেছে। একটা বিশাল সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের নিকটে আসিয়া তাহা হইতে একটা পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ড টানিয়া বাহির করিতে পারিল, আর সেটাকে লইয়া যাইতে পারিল না? সেইরূপ জড়পিণ্ড অন্যের টানে যাহা হইতে বাহির হইল, আবার তাহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল, এরূপ কি হইতে পারে? যে টানে বাহির হইল সে-টানটা কি হইল? তাহার আর কোন শক্তি থাকিল না কেন?

আবার ঐ বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ডটা কাহার মাধ্যাকর্ষণে কিরূপে ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আমাদের সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই বা কি কথা? একটা বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড সূর্য্য হইতে সমদূরে অর্থাৎ বুধ হইতে শুক্র যত দূরে, শুক্র হইতে পৃথিবী তত দূরে, পৃথিবী হইতে মঙ্গল তত দূরে, মঙ্গল হইতে তত দূরে একটি খণ্ড ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া মঙ্গলের মতই সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহা হইতে তত দূরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে তত দূরে শনি, শনি হইতে তত দূরে ইউরেনাস্, তাহা হইতে তত দূরে নেপচুন, নেপচুন হইতে তত দূরে প্লুটো থাকিয়া আমাদের সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, ইহা কি রূপে সম্ভব হয়? অনুগ্রহ করিয়া এ-সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করিলে বাধিত হইব।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়, বেদরত্ন

"বাঙালীর ব্যবসায়"

গত ভাদ্রের প্রবাসীতে "বাঙালীর ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয়, লেখক শুধু একটা দিকই দেখিয়াছেন। সব দোকানদারই এক রকম নন। শুধু ফাঁকি দেওয়ার মত কাজ সকলেই করেন না, সত্যিকারের কাজ করিবার আশা লইয়াই তাঁহারা ব্যবসা করিতে নামিয়াছেন। আর একটি কথা লিখিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, আমরা কম টাকা দিব অথচ কাজ আদায় করিবার বেলা ইউরোপীয় ফার্ম্মের নিকট হইতে যে রকম কাজ পাওয়া যায় সে রকম কাজ আদায় করিব, যদিও ইউরোপীয় ফার্ম্ম সে কাজের মজুরী চার গুণ বেশী আদায় করে। প্রত্যেক কাজের প্রয়োজন-মত দাম দিলে আশা করি, অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীও ইউরোপীয় ফার্ম্মের ন্যায় কাজ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বাঙালী-পরিচালিত ছোট ছোট দোকানের কথা কিছু বলি। পাশাপাশি মাড়োয়ারী ও বাঙালী দোকানদারের একের সাফল্য ও অন্যের অকৃতকার্য্যতা একই সঙ্গে চোখে পড়ে। কেন এমন হয়? অনেকেই বলিয়া থাকেন মাড়োয়ারীরা পরিশ্রমী ও সততাপরায়ণ বলিয়াই তাহারা টিকিয়া থাকে, আর বাঙালীরা তাহা পারে না বলিয়াই অকৃতকার্য্য হয়। কিন্তু যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় তবে প্রত্যেক ফেল-করা দোকানদারই বলিবে যে ধার অনাদায়ের দরুনই তাহার কারবার উঠাইয়া দিতে হইয়াছে। বাকী কাহাদের কাছে পড়ে? তাঁহারা বাঙালী নহেন কি? আমার যত দূর বিশ্বাস বাঙালীরা বাঙালীর দোকান হইতে ধারে জিনিষ লইয়া তাহার দাম সময়মত দেন না; অথচ অবাঙালীর দোকানে হয় ধারে পান না, কিংবা ধারে পাইলেও সময়ে পরিশোধ করিতে হয়। বাঙালীরা একটুও বোঝেন না যে একটা দোকান উঠিয়া গেলে একটি বেকার বাড়ে এবং কোন-না-কোন বাঙালীর উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। এ-কথাটা একেবারে অস্বীকার করা চলে না যে আমরা বাঙালীরা একটু অলস; অবাঙালীর মত ততটা পরিশ্রমীও নই, আর বুঝিয়া ব্যয়ও করি না। আমাদের আর একটা দোষ আমাদের ব্যবসায়ে সাধারণ চাকুরীর মত রোজগার হইলেও তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হই না; মাসিক বাঁধা-মাহিনার চাকুরীকে সকল সময়ই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করি। বাঙালী ক্রেতাগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন বিবেচনা করিয়া দেখেন যে আমাদের দোষত্রুটি থাকিলে তাহার জন্য কেবল আমরাই দায়ী নহি, আমাদের শিক্ষাদাতারাও দায়ী। আমরা ত ব্যবসায়ীর মত শিক্ষা পাই নাই?

শ্রীপরেশ ভৌমিক

"যতীন্দ্রমোহন সিংহ"

স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন সিংহ রায়বাহাদুর মহাশয়ের জন্ম নদীয়া জেলায় ও পরে তিনি ফরিদপুরে বাস করিতেন, পৌষের প্রবাসীতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

ফরিদপুরের সদর মহকুমার অন্তর্গত বাউসখালি গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ

অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ ও তাহাদের জীবনস্পন্দন

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একই জীবনীশক্তি ক্রিয়া করিলেও তাহারা উভয়ে ক্রমবিকাশের পথে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করিয়া পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণীদেহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা বাহিরের উত্তেজনায় শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বা অবস্থা-বিশেষে চীৎকার বা অঙ্গভঙ্গী করিয়া সাড়া দিয়া থাকে। এমিবা নামক আণুবীক্ষণিক প্রাণী শরীর প্রসারিত করিয়া চলে; কিন্তু হঠাৎ একটু নাড়া পাইলেই সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তুলাকার ধারণ করে। উত্তাপ, শৈত্য, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ মাত্রই উহারা একই ভাবে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া সাড়া দেয়. প্রয়োজনের তাগিদে অথবা উত্তেজনা প্রয়োগে অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা দেখিয়াই সাধারণতঃ আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য বুঝিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের দেশীয় লজ্জাবতী-জাতীয় উদ্ভিদ-

স্থল-লজ্জাবতী পাতা মেলিয়া আছে

সমূহের অঙ্গসঞ্চালন-ক্ষমতা সর্ব্বজনবিদিত। বিভিন্ন অবস্থায় ইহাদের অঙ্গসঞ্চালনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় ইহারা এমন দ্রুত গতিতে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া সাড়া দিয়া থাকে যে অনেক উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও সেরূপ ক্ষিপ্রতা পরিদৃষ্ট হয় না। এক আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া প্রাণীর সঙ্গে আর কোন পার্থক্যই সহজে উপলব্ধি হয় না। আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে লজ্জাবতী নামে এক বোঁটায় চারটি পাতাওয়ালা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের গায়ে গোলাপ গাছের মত কাঁটা। পাতাগুলি দেখিতে ছোট ছোট তেঁতুল-পাতার মত। শুঁয়ার মত পাপড়ি-পরিপূর্ণ বেগুনে রঙের গোল গোল ফুল ফোটে। একটু স্পর্শ করিলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রগুলি অতি দ্রুত গতিতে পর পর মুদ্রিত হইয়া যায়। স্পর্শজনিত আঘাত একটু বেশী হইলেই ক্ষুদ্র পত্র-গুলি মুড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা লম্বা বোঁটাগুলি ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচের দিকে শুইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিবার পর ধীরে ধীরে আবার পত্র মেলিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যাসমাগমে পত্র মুদ্রিত হইলেও আঘাতের ফলে পড়িয়া যাওয়ার অবস্থা হইতে তাহার পার্থক্য পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। একটু জোরে বাতাস বহিলে, ফুঁ দিলে, বা জলের ফোঁটা পড়িলেও তৎক্ষণাৎ পত্র মুদ্রিত হইয়া যায়, বাতাসে পাতা নড়িয়া পরস্পর ঠোকাঠুকি হইলেও পাতা মুদ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ বাতাস বহিতে থাকিলে বা বার বার আঘাত পাওয়ার পর ইহারা এমন অসাড় হইয়া পড়ে যে, অল্পসময়ব্যবধানে পুনরায় বাতাস বহিলে বা জোরে আঘাত দিলেও আর সহজে মুদ্রিত হইতে চাহে না। কিন্তু অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিবার পর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন স্থলে সামান্য একটি পোকায় দংশন করিলেও দেখিতে দেখিতে পত্রগুলি এক দিক হইতে মুদ্রিত হইয়া বোঁটাগুলি ক্রমে

স্থল-লজ্জাবতীর পাতা আঘাতের ফলে বুজিয়া গিয়াছে

ক্রমে ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইতে থাকে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ একটি পাতা মুড়িয়া বোঁটাসমেত কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। আভ্যন্তরিক কোন অস্বস্তির কারণেই বোধ হয় ওরূপ ঘটিয়া থাকে। শত শত গাছ একসঙ্গে জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। কাঁটার ভয়ে তার মধ্যে পা বাড়াইবার জো নাই। হঠাৎ তাহার মধ্যে একটা ঢিল ছুড়িলে দেখা যাইবে চক্ষের নিমিষে যেন রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। একটু পূর্ব্বেই যেস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পত্রাবৃত ঝোপ ছিল, এখন আর সে-সব কিছুই নাই, সব ফাঁকা, কেবল কতকগুলি নেড়া কাঠি যেন এদিক ওদিক ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ভোজবাজীর মত স্থানটার চেহারা এমনই বেমালুম বদলাইয়া যায়। আত্মরক্ষার

জন্ত কাঁটা থাকিলেও অনেকে অনুমান করেন ইহা তাহাদের শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার একটা কৌশল মাত্র। একথা সত্য হইলে ইহারা আত্মরক্ষার্থ অনুকরণকারী প্রাণীদিগের অপেক্ষা এ-বিষয়ে অধিকতর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনেক জাতের প্রজাপতি ও অনুকরণকারী কীটপতঙ্গ ভয় পাইলেই পাতার সঙ্গে দেহ মিলাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। মুদ্রিত অবস্থায় ইহাদিগকে দেখিলে সেইরূপ কিছু একটা মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এ-পর্য্যন্ত বহু জাতের লজ্জাবতী গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে ছোট ছোট জল- ও স্থল- লজ্জাবতী সর্ব্বজনপরিচিত। কিন্তু তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় বড় বড় লজ্জাবতীর গাছও বিরল নহে।

স্বতঃস্পন্দনশীল বনচাঁড়াল। বড় পাতাগুলির বোঁটায় নীচে যে ছোট ছোট পাতা দেখা যাইতেছে সেগুলিই অনবরত তালে তালে ওঠানামা করিয়া থাকে।

জল-লজ্জাবতী হিঞ্চে বা কলমী দলের মত জলের উপর লতাইয়া চলে। বর্ষাসমাগমেই ইহাদের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক গাঁটের মধ্যস্থলে সাদা স্পঞ্জ বা জড়ানো তুলার মত এক প্রকার হাল্কা পদার্থ জন্মে। এইগুলিই ইহাদিগকে জলের উপর শোলার ন্যায় ভাসাইয়া রাখে। প্রত্যেক গাঁট হইতে একটি করিয়া বোঁটা বাহির হয়। তাহার প্রান্তদেশে আলাদা ভাবে দুই জোড়া করিয়া পত্র থাকে। ইহাদের পত্রগুলিও দেখিতে স্থল-লজ্জাবতীর মত; কিন্তু সামান্য একটু চওড়া, একটু নাড়াচাড়া পাইলেই ইহাদের পত্র মুদ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহাদের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। ইহাদের ফুলের রং হলদে এবং বোঁটার মাথায় গুচ্ছাকারে ফুটিয়া থাকে। জল-লজ্জাবতীর গায়ে কাঁটা নাই। শীতকালে ইহাদিগকে যত্ন করিয়া জিয়াইয়া রাখিলে দেখা যায়—ডাঁটার গায়ে পূর্ব্বোক্ত শোলা-জাতীয় ভাসমান পদার্থ জন্মায় না, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই শোলা-জাতীয় পদার্থ গজাইতে থাকে। ডাঙায় জমিতে দিলেও ইহারা বেশ লতাইয়া থাকে কিন্তু শোলা জন্মায় না।

আমাদের দেশে বড় বড় লজ্জাবতীও দুই-তিন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গাছ-লজ্জাবতীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া থাকে, ইহারা লম্বায় পাঁচ-সাত হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। এই গাছের গায়েও কাঁটা আছে। পাতার ডাঁটাগুলি খুব বড় হইয়া থাকে এবং এক-একটি বোঁটায় সাত জোড়া করিয়া পাতা থাকে। প্রত্যেক জোড়া পাতার সন্ধিস্থল হইতে উপরের দিকে লম্বা লম্বা এক-একটা কাঁটা বাহির হয়। জোরে হাওয়া দিলে বা ছুঁইয়া দিলে পাতাগুলি মুদ্রিত হইয়া যায়। তবে মুদ্রিত হইবার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। অন্য আর এক প্রকার গাছ-লজ্জাবতী দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা দেড় হাত দুই হাত উঁচু হয় এবং ঝোপ হইয়া জন্মে। ইহাদের বোঁটায় এক জোড়া করিয়া পাতা থাকে। ছুঁইয়া দিলে ইহাদের পত্রগুলিও মুদ্রিত হইয়া পড়ে।

আর এক প্রকার ছোট ছোট গাছও আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ভুঁই-আমলা বলে। আঘাত-উত্তেজনায় ইহাদের পাতাগুলিও মুদ্রিত হয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে।

কামরাঙা আমাদের দেশের সুপরিচিত উদ্ভিদ। এই কামরাঙার পাতারও বেশ স্পর্শানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য খুব মৃদু স্পর্শে ইহারা সহজে সাড়া দেয় না। আর দিলেও তাহা পরিষ্কার ভাবে আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু পাতার উপর একটু জোরে আঘাত করিলেই দেখা যায় পাতাগুলি জোড়ায় জোড়ায় বুজিয়া আসিতেছে।

এই ত গেল আঘাত-উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত। কিন্তু জীবদেহে হৃৎস্পন্দন বলিয়া যে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন উদ্ভিদে ঠিক একই রকম ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবের হৃৎপিণ্ড নামক পেশীটি, যত ক্ষণ জীবন থাকে তত ক্ষণ আপনাআপনি যেন তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে। বন-চাঁড়াল নামে এক জাতীয় উদ্ভিদের এরূপ স্বতঃস্পন্দন অতি পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের গাছ প্রায়ই ঝোপের মত হয় এবং প্রায় দুই হাত আড়াই হাত উঁচু হইয়া থাকে। এক একটি বোঁটায় তিনটি করিয়া পাতা থাকে। বোঁটার প্রান্তদেশের পত্রটি খুবই বড় এবং সম্মুখভাগের পত্র দুইটি অতি ক্ষুদ্র এবং ইহারাই তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস তুড়ি দিলেই বন-চাঁড়ালের পাতার নাচ সুরু

কামরাঙা গাছের পাতা। বাঁ-দিকের পাতাগুলি মেলিয়া আছে— আঘাতের ফলে ডান দিকের পাতা বুজিতেছে।

জল-লজ্জাবতী লতা। উপরের পাতা মেলিয়া আছে; আঘাতের ফলে নীচের পাতাগুলি বুজিয়া আসিতেছে।

কিন্তু তাহা ঠিক নহে। রৌদ্রের সময় ইহারা আপনাআপনিই উঠা-নামা করিতে থাকে।

লজ্জাবতী বা বন-চাঁড়াল-জাতীয় উদ্ভিদের স্বভাব সাধারণ উদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কিন্তু তথাপি একটু লক্ষ্য করিলেই সাধারণ অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও এরূপ পত্রসঞ্চালনের ক্ষমতা দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বা বর্ষা-বাদলের দিনে অনেক উদ্ভিদের পত্রই আপনাআপনি মুড়িয়া যায়; আবার আলো দেখিলেই ঘুমের ঘোর কাটিয়া যায় এবং পত্র প্রসারিত করিতে থাকে। পত্রের এইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণ যতই মন্দ-গতিতে হউক না কেন, ইহাতে তাহাদের অঙ্গসঞ্চালন-ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রাণীজগৎ ছাড়াও আমাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এই বিরাট উদ্ভিদ-জগৎ ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু প্রাণীজগতের বাহ্য লক্ষণগুলি সাধারণত তাহাতে পরিস্ফুট না হইলেও এই অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদগুলির অদ্ভুত ব্যবহার প্রাণীজগতের সহিত যথেষ্ট সৌসাদৃশ্যের পরিচয় দেয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভিদ-দেহের জীবন-ক্রিয়ার বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ ছাড়াও অন্যান্য সকল প্রকার উদ্ভিদেরই প্রাণীর জীবন-ক্রিয়ার সহিত কোনই পার্থক্য নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় এ বিষয়ের অতি নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের ঐক্য বুঝিতে হইলে বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা প্রয়োজন, কিন্তু আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন কি উপায়ে জানা যাইবে? বৃক্ষ উত্তেজিত বা অবসাদগ্রস্ত হইলে তাহার ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে? আঘাত বা উত্তেজনায় গাছ সাড়া দিলে তাহা কোন যন্ত্রে ধরিতে ও মাপিতে পারিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জীব বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হইলে অবস্থা-বিশেষে চীৎকার করিয়া নতুবা হাত-পা নাড়িয়া প্রতিক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে। বাহিরের আঘাত বা নাড়াচাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার আকৃতি-প্রকৃতি মিলাইয়া দেখিলেই জীবন-ক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রচণ্ড সাড়া পাওয়া যায়, আবার অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায়ও ক্ষীণ সাড়া দিয়া থাকে। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে, হঠাৎ সর্ব্বপ্রকার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

জীব আঘাত পাইলে সঙ্কুচিত হয়, সেই সঙ্কোচনই জীবনের সাড়া। বৃক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু সেই সঙ্কোচন অতি ক্ষীণ বলিয়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। কলের সাহায্যে সেই ক্ষীণ সঙ্কোচন বৃহদাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। আঘাতে যদি গাছ সাড়া দেয়, তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে তাহার কত সময় লাগে? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? আহার দিলে অথবা আহার বন্ধ করিলে কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না? ঔষধ সেবন বা বিষপ্রয়োগে কি অবস্থা হয়? জীবের হৃৎপিণ্ডের মত উদ্ভিদের কোন স্পন্দনশীল পেশী আছে কি না? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, গাছ মাত্রেই বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিয়া থাকে এবং এ-বিষয়ে জীবে উদ্ভিদে কোনই পার্থক্য নাই। তবে লজ্জাবতী গাছ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, আর সাধারণ গাছ দেয় না কেন? আমাদের বাহুর এক পাশের মাংস-পেশীর সঙ্কোচন-ফলেই হাত নাড়িয়া সাড়া দিতে পারি; উভয় দিকের পেশী একই সময়ে সঙ্কুচিত হইলে হাত নাড়িয়া সাড়া দেওয়া চলিত না। সাধারণ উদ্ভিদের পত্র-পল্লবের চতুর্দ্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, কাজেই কোন দিকেই নড়াচড়া করিতে পারে না। যদি ক্লোরোফরম প্রয়োগে এক দিকের পেশী অসাড় করিয়া দেওয়া যায়, তবেই দেখিতে পাওয়া যাইবে আহত হইলে যে-কোন গাছ পাতা নাড়িয়া সাড়া দিবে। ব্যাঙের গায়ে চিমটি কাটিলে তন্মুহূর্ত্তেই সাড়া পাওয়া যায় না—সাড়া পাইতে প্রায় এক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগিয়া

গাছ-লজ্জাবতী। নীচের পাতা সম্পূর্ণ মেলিয়া আছে; চিমটি কাটিবার ফলে উপরের পাতা বুজিয়া গিয়াছে।

থাকে। বাহিরের অবস্থানুসারে এই অনুভূতি-কালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। অপেক্ষাকৃত প্রবল আঘাত অনুভব করিতে অতি কম সময়ই লাগিয়া থাকে, কিন্তু মৃদু আঘাতের অনুভূতিতে একটু সময় ব্যয় হয়। সতেজ অবস্থায় লজ্জাবতীর অনুভবশক্তি ব্যাঙের তুলনায় ছয় গুণ বেশী, কিন্তু যখন শীতে বা অন্য কোন কারণে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে তখন এই অনুভূতিকাল অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যায়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতি-শক্তির সাময়িক বিলোপ ঘটে, তখন গাছ মোটেই সাড়া দেয় না। এই সম্বন্ধে লজ্জাবতী গাছের আচরণ পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে তাহার এই জড়তা শীঘ্রই বিদূরিত হয়। জন্তুদেহের এক স্থানে আঘাত করিলে তাহার ধাক্কা স্নায়ুসাহায্যে দূরে প্রবাহিত হয়। উষ্ণতায় স্নায়ুপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায় আবার ঠাণ্ডায় বেগ হ্রাস পায়। বৃক্ষদেহে স্নায়ুপ্রবাহ প্রাণীদেহ অপেক্ষা মন্থর গতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, তাহার সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা, জীব ও উদ্ভিদে যে এ-সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই তাহা পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবদেহের অংশ-বিশেষে একটি আশ্চর্য্য পেশী আছে। যত কাল জীবন থাকে তাহা তত কাল অহরহ স্পন্দিত হইতে থাকে। কিন্তু কি করিয়া এই স্বতঃস্পন্দন ঘটিয়া থাকে, তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বন-চাঁড়ালের পত্রেও এরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষদেহের এই স্বতঃস্পন্দনের কারণ অনুসন্ধানের ফলে হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে এই স্পন্দন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। শারীরতত্ত্ববিদেরা হৃৎপিণ্ডের এক অদ্ভুত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর হৃদয় কাটিয়া লইয়া পরীক্ষা করেন। কিন্তু শরীর হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া লইলেই তাহার স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে রক্তের চাপ প্রয়োগ করিলে অনেক ক্ষণ ধরিয়া স্পন্দন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। তখন নানা ভাবে ইহার উপর পরীক্ষা চলিতে পারে। উত্তাপ-প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, কিন্তু শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে স্পন্দনের তাল নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। ঈথার-প্রয়োগে সাময়িক ভাবে স্পন্দন স্থগিত হয়, কিন্তু একটু হাওয়া করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্লোরোফরম-প্রয়োগেও হৃৎপিণ্ড অসাড় হইয়া পড়ে। মাত্রা বেশী হইলে হৃৎস্পন্দন চিরতরে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। বন-চাঁড়ালের স্পন্দনশীল পত্রেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আঘাত-উত্তেজনায় কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আণবিক সংস্থান বিপর্য্যস্ত হইলেই জীব ও উদ্ভিদে একই নিয়মে সাড়ার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। তবে কোন উপায়ে এই আণবিক সন্নিবেশ নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে কি? এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' অথবা 'বিমুখ' হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে বিদ্যুৎপ্রবাহ এক দিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক-শলাকাগুলি ঘুরিয়া একমুখী হইয়া যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ অন্য দিকে প্রেরণ করিলে শলাকাগুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী হয়। বিদ্যুৎবাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণুসন্নিবেশ বিদ্যুৎস্রোতের দিক্ অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে।

"স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই বিভিন্ন প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম যে লজ্জাবতী তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোন দিনও টের পায় নাই, এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম, এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও, লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

"তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক কোন দিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে 'সমুখ' আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুন' প্রয়োগ করিলাম; এবার ব্যাঙ ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম অমনই বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।"

[চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

মহিলা-সংবাদ

কুমারী জানকী অম্মল

কুমারী মৈনা পরাঞ্জপে

বিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি-ধারিণী কুমারী জানকী অম্মল, এম-এ, ডি-এস্‌সি, কোইম্বাটরস্থ রাজকীয় ইক্ষু-জন্মলালন-পরীক্ষাক্ষেত্রের পরীক্ষক (সুগার-কেন জেনেটিসিষ্ট)। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিগত জয়ন্তী অধিবেশনে তিনি জীবকোষ এবং জন্ম ও বংশবিচার (সাইটোলজি ও জেনেটিক্‌স্‌) বিভাগের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুমারী মৈনা পরাঞ্জপে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিৎ অধ্যাপক পরাঞ্জপের কন্যা। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আবহ-বিদ্যায় এম-এস্‌সি উপাধি লাভ করিয়া উক্ত বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত ১৯৩৫ সালে বিলাত যাত্রা করিয়া লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে যোগদান করেন। তথায় ডক্টর ব্রাণ্টের তত্ত্বাবধানে দুই বৎসরকাল গবেষণার ফলে কুমারী পরাঞ্জপে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি এবং ডি-আই-সি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে শেঠ শীতলদাস কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা।

শ্রীমতী মণিবেন নানুভাই দেশাই

গুজরাটী মাসিক 'স্ত্রীবোধ' মহিলা-সংখ্যা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করিয়া শ্রীমতী মণিবেন নানুভাই দেশাই বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

নামরহস্য

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম-এ

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না জানিয়াও হয়ত কোন স্নেহান্ধ পিতা চক্ষুহীন পুত্রের এক দিন ঐ নাম দিয়াছিল। সন্তানের বাহিরের অন্ধতা ঢাকিতে গিয়া সে যে আপনার অন্তরের অন্ধতাই জগতের কাছে প্রকাশ করিতেছে, এ কথা হয়ত সেদিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

বস্তুত নাম মানুষের বাহিরের পরিচয় মাত্র। অন্তরের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই, তাই শেক্‌স্‌পিয়র এক দিন বলিয়াছিলেন, "নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামই দাও না কেন, তাহার গন্ধের কোন তারতম্য হইবে না।" কথাটি নিতান্তই সত্য। গোলাপ-হাস্নুহানা, মল্লিকা-মালতী, ডেজি-ড্যাফোডিলকে ক১-ক২, খ১-খ২, গ১-গ২ এই রকম নাম দিলে কাজ যে চলে না এমন নয়। বরং কাহারও কাহারও কাজ তাহাতে সুগমই হয়, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা অবৈজ্ঞানিকের সংখ্যাই বেশী। তাহারা আবার নামের মধ্যে কোথাও বা মাধুর্য এবং কোথাও বা গাম্ভীর্য আশা করিয়া বসে। এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা পুত্রকন্যার নামকরণের জন্য অভিধানের শরণাপন্ন হন। তাহাতেও ফল না ফলিলে শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে সঙ্গে লইয়া সম্বামিক কবি-গুরুর শ্রীচরণ সন্দর্শনে যাত্রা করেন।

কবিগুরুর কথাই যখন উঠিল তখন নাম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি সেটি বলি। তিনি বলেন—

> "মানুষের মাধুর্য···সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেক-গুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃজন কার্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।"

কাব্যের নায়ক-নায়িকা বা ক্ষুদ্র বৃহৎ চরিত্রগুলি কবি নিজেই সৃষ্টি করেন। কবি তাহাকে যেমনটি করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে চাহেন, ঠিক তেমনটিই যে আমরা দেখি তাহা নয়। আকৃতি-প্রকৃতির যে বিবরণ দিয়া কবি তাঁহার নায়কের মূর্তি রচনা করেন, আমরা কল্পনার রঙে তাহাকে আর একটু রাঙাইয়া লই। এই সকল ক্ষেত্রে নামও চরিত্রের অন্যতম পরিচয়। অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা এই দুইটি নাম দিয়াই কবি কালিদাস শকুন্তলার দুই সখীর চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের নাম সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কালকেতু, শ্রীমন্ত, চন্দ্রশেখর, কপাল-কুণ্ডলা, বিক্রম, সুমিত্রা প্রভৃতি নামগুলিও যথেচ্ছাসঞ্জাত নয়, পরন্তু চিন্তাসম্ভূত।

সত্যই রচনার মধ্য দিয়া যে রস পরিবেশন করা হয়, সুনির্বাচিত নাম তাহার পাত্র-স্বরূপ। কনক-কটোরা আধার-হিসাবে নিতান্ত নিন্দনীয় না হইলেও সিরাজি সেবনের পক্ষে পেয়ালাই যে সমধিক প্রশস্ত, একথা ওমর খৈয়াম হইতে অত্যাধুনিক খুনখারাপি গজল গান রচয়িতাগণ পর্যন্ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে নামের দাম আরও অধিক, সেই জন্য যেখানে 'নিমাই'চন্দ্রও যথেষ্ট তিক্ত প্রতিপন্ন হন না সেখানে 'গদাই' নামে দ্বিতীয়বার নামকরণ করার প্রয়োজন হয়। কাছেপিঠে না পাইলে অন্তত বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ী হইতে শ্রীমতী 'কাদম্বিনী'কে পাল্কি করিয়া আনাইয়া লইতে হয়। 'রসিকদাদা'র রসিকতা এবং 'ভাঁড়ু দত্তে'র ভাঁড়ামি এক শ্রেণীর না হইলেও দুই জনের নামে ও আচরণে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। চিরকুমার সভার এই রসিক-দাদা নৃপ ও নীরর জন্য যে দুইটি ফাঁড়ার আয়োজন করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের সহিত আপনাদের অবশ্যই পরিচয় আছে

তাঁহাদের "একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতাপরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালিপড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটি খুশী হইতে পারে।" ইঁহার নাম "মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী"। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি "বেঁটে খাটো, অত্যন্ত দাড়িগোঁফসঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার এবং আরও নানাবিধ শারীরিক সুলক্ষণ সমাক্রান্ত। ইঁহার নাম দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।"

যাহার যে নাম তাহাকে সে নামে না ডাকিয়া অন্য নামে ডাকিলে খুশী হয় না—বিশেষতঃ ঐ নূতন নামকরণের মধ্যে যদি তাহার শারীরিক, ব্যবহারিক বা আর কোন প্রকারের কোন ত্রুটির সম্বন্ধে কোন রকমের ইঙ্গিত থাকে। যাহার নাম বিশেষ সুশ্রাব্য নয় সেও তাহার পরিবর্তন চায় না। "এমন কি যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে অসহ্য বোধ হয়।" আর নামটিকে বিকৃত করিলে যে পীড়া দেওয়া হয় তাহার যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। "গিন্নি"গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের এই তত্ত্বটি ভাল রকম জানা ছিল। বাচনিক যতগুলি অস্ত্র তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত এইটি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিদারুণ। তাই শশিশেখরকে "ভেটকি" এবং আশুকে 'গিন্নি' নাম দেওয়ায় তাহারা যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, পানিবেত ও বিছুটির জ্বালাও তাহার তুলনায় অনেক আরামের।

গ্রন্থোক্ত পাত্রপাত্রীর নামই নয়, গ্রন্থের নাম সম্বন্ধেও গ্রন্থকাররা মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা করেন। চিন্তার বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে লেখকেরা সাধারণত কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। কেহ বা নামের মধ্য দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়-বস্তুটির পরিচয় দিয়া দেন। যেমন—মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, সরল বাংলা অভিধান, ধাতুরূপ কল্পদ্রুম। কেহ বা আলোচ্য বিষয়ের মূলসূত্রটি ধরাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন; যেমন—কৃষ্ণকান্তের উইল, বৈকুণ্ঠের খাতা, নীলদর্পণ। পাত্র-পাত্রীর নাম লইয়া গ্রন্থের নাম দেওয়াটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। উহার উদাহরণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রধান পাত্র-পাত্রীর কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য অথবা আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সঙ্কেত-মূল নাম গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করে তাহাই এ যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এরূপ নাম নির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন এবং সে দক্ষতার অভাব অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'নষ্ট নীড়', 'অচলায়তন', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'পণ্ডিত মশাই', 'দত্তা', 'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'বলিদান' প্রভৃতি নামে গ্রন্থকারদের যে নাম-নির্বাচনের নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্বত্র সুলভ নহে।

পুস্তকের প্রথম নাম পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী সংস্করণে অন্য নাম দিলে পাঠকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জাগে। মনে হয়, প্রথম নামে লেখক যে ভ্রম করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নামে তাহা সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। কালির আঁচড় না দিলে অশুদ্ধও শুদ্ধ বলিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু দাগ পড়িলে খাঁটিকেও দাগী মনে হয় এবং কাটা শব্দটির পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য মন তখন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। সেদিন যখন শ্রীমতী 'দত্তা' 'বিজয়া' নামে নাট্যশালায় পদার্পণ করিলেন, তখন হঠাৎ মনে হইল 'দত্তা' নামটি দিয়া শরৎচন্দ্র কি এত দিন অনুতাপ করিতেছিলেন? অথবা, উপন্যাসের নাট্যরূপে নামেরও পরিবর্তন আইন অনুসারে অবশ্যকর্তব্য? 'দত্তা'র মধ্যে যে সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, 'বিজয়া' নামে তাহা নাই। পিতা বনমালী কন্যার নাম দিয়াছিলেন 'বিজয়া'—দৈবজ্ঞ শরৎচন্দ্র রাশি-নাম লিখিয়াছিলেন 'দত্তা'। তাঁহারই দেওয়া 'দত্তা' নাম প্রত্যাহার করায় তাঁহাকে দত্তাপহরণ পাপে লিপ্ত হইতে হইল। 'ললিতা'র প্রচুর লালিত্য সত্ত্বেও 'পরিণীতা' নাম বর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চে উঠিতে দিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। 'অরক্ষণীয়া'র 'জ্ঞানদা' সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী'র সংস্কৃত রূপকে যে 'তপতী' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অর্থ লক্ষ্য করা যায়। সুমিত্রার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই নাটক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কাজেই 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে কাহারও নাম দিতে হইলে রাণীর নামটির প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু 'রাণী' বস্তুত রাণী নহেন, তাই শুধু 'রাণী' নামটিও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। সুমিত্রা নাম রাখা যাইতে পারিত, কিন্তু তপতীর মধ্যে যে-সঙ্কেতটি

রহিয়াছে শুধু সুমিত্রার মধ্যে সেটি নাই, পরিবর্তিত নামের প্রসঙ্গে 'শেষ রক্ষা'র কথা মনে আসে। 'গোড়ায় গলদ' হইলে যে শেষ রক্ষা হইবেই এমন কোন মানে নাই। কিন্তু যেখানে বলি শেষ রক্ষা হইয়াছে সেখানে গোড়ায় গলদ হইয়াছিল এ-ধারণা আপনা হইতেই মনে জাগে। 'গোড়ায় গলদ' ট্রাজেডি, 'শেষ রক্ষা' ট্রাজেডি-মূল কমেডি।

গল্পে উপন্যাসে, কাব্যে নাটকে নাম স্বয়ং খানিকটা কাজ করে। কিন্তু যাহাকে প্রতিদিন দুই বেলা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, যাহার নাড়ি এবং হাঁড়ি—এ-দুয়েরই খবর আমার সুবিদিত তাহার নাম যাহাই হউক না কেন, কি আসে যায়? কল্পনা-জগতে নামের যে দাম, বস্তুজগতে সে দাম নাই—ইহা মানিতেই হইবে। মাসের দোশরা তারিখে গৃহিণীর যে মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়, তিরিশে তারিখে তাহার কি কোন পরিবর্তন হয় না? কিন্তু সেদিনও আপনাকে মঞ্জুভাষিণী—নিদেন পক্ষে মঞ্জু বলিয়াই ডাকিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন ত কি রকম বিড়ম্বনা।

এই যে ঘরবাড়ী, দোকান-দেবালয়, ব্যাঙ্ক-বাজার, যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি সব কিছুরই নিত্য নূতন নামকরণ হইতেছে। তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের নবপ্রবর্তিত রুচি ও মনোভাবের একটি বিচিত্র রূপ দেখা যায় মাত্র। এখন শু-ষ্টোর্সের স্থান অধিকার করিয়াছে বিনামা-বিপণি বা পাদুকা-প্রতিষ্ঠান, আইডিয়াল কাফের জায়গায় দেখা যায় আদর্শ পেয়াবাস, থিয়েটারের নাম হইয়াছে নাটমন্দির বা রংমহাল বা প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু পাদুকা, পেয় ও প্রেক্ষ্যের কতটুকু তারতম্য হইয়াছে তাহার সংবাদ গোচর করাইবার ভার আমি লইতে রাজী নই। সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজনও নাই। সেদিন কায়স্থ-সভার উদ্‌যোগে একটি বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়। জনৈক বন্ধু ভোজ খাইয়া আসেন, এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে একটি ভোজ্য-তালিকা জুটে। তাহার মধ্যে হঠাৎ একটি নামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভোজ্য হিসাবে বস্তুটি কি রকম উপাদেয় হইবে, নাম দেখিয়া তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, বন্ধুর সাহায্যে বুঝিয়াছিলাম। খাদ্যের নামটি হইতেছে 'ললনাঙ্গুলিকা'। বঙ্গভাষার প্রতি বাঙালীর যে অত্যুগ্র অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে, তাহার জন্য ভাষাজননী অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু সে-কথা এখন থাকুক।

মোট কথা, এই দেখা যাইতেছে যে বাস্তব জগতে নামটি নামধারীর চিহ্নমাত্র পরিচয় নয়। নাম যদি কাহারও পরিচয় দেয় ত সে নামদাতার, নামের অধিকারীর নয়। সেই হিসাবে সামাজিক জীবনের ইতিহাসে নামের মূল্য অনেক।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন :—

> সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী গিরি নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর!···নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী।

সত্যই মানুষের ব্যবহার, মনোবৃত্তি ও রীতিনীতির সহিত নামের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কোন সময়ের কতকগুলি নাম আলোচনা করিয়া সেই সময়ের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবদেবীর নামে পুত্রকন্যার নামকরণের প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। কলিযুগে নাম-কীর্তন ভিন্ন আর ভবসংসার হইতে উদ্ধার পাইবার দ্বিতীয় তরণী নাই। মৃত্যুকালে গঙ্গানারায়ণকে স্মরণ না-ও হইতে পারে, কিন্তু পুত্রের নাম যদি গঙ্গানারায়ণ হয় তাহা হইলে মায়ামুগ্ধ নর সে নাম একবার উচ্চারণ না করিয়া পারিবে না।

দেবতাকে পূজা করিয়া যে সন্তান লাভ হয় তাহাকে উমাপদ, শ্যামাচরণ, কালীকিঙ্কর নাম দিয়া ইষ্টদেবতার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। বিনা পূজাতেও যাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন, পিতামাতা তাঁহাদেরও দেবপ্রসাদ বলিয়াই মনে করেন।

যাহাকে বড় বেশী ভালবাসি তাহাকে হারাইবার ভয়ে মানুষের মন সর্ব্বদাই আতঙ্কিত থাকে। কয়েকটি নামের মধ্যে এই আশঙ্কার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'রাখহরি' 'থাকমণি' প্রভৃতি নামের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় অবশ্যই আছে। মৃতবৎসা বা নিঃসন্তান জননীর

কোন সন্তান হইলেই মনে ভয় হয়—ভগবান যদি ইহাকেও কাড়িয়া লন। তাই তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানান হয়, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। প্রতিবার সন্তানের নামোচ্চারণ-প্রসঙ্গে ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই পৌঁছিতে থাকে।

মৃতবৎসার মনে হয়;—মায়ের স্নেহ না পাইয়াই তাঁহার স্নেহের দুলাল, তাঁহার আদরের দুহিতা অভিমানে কোল খালি করিয়া গিয়াছে। এবার আর তাহাকে ছাড়া হইবে না। তাই আবার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'থাক' বলিয়া অভ্যর্থনা করেন।

দুর্ভাগিনী রমণীর কোন পাপের ফলেই হয়ত তাঁহার পুত্রশোক। এ হয়ত তাঁহার পূর্বকৃত দুষ্কর্মেরই ফল। এরূপ চিন্তাও মধ্যে মধ্যে জননীর মনকে প্রপীড়িত করে। তাহারই ফলে 'এককড়ি', 'দুকড়ি' 'তিনকড়ি' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি। যে-ব্যক্তি ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙে আইনে তাহারই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সে যদি তাহার ঘর-বাড়ী অন্যের নামে বেনামী করিয়া রাখে, তাহা হইলে সরকারের তাহাতে হস্তার্পণ করিবার উপায় থাকে না।

'এককড়ি' 'দুকড়ি' 'বেচারাম' 'কেনারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যে এইরূপ আইন বাঁচাইবার চেষ্টা দেখা যায়। দুর্ভাগিনী জননী ভাবেন—আমার সন্তান বলিয়াই ভগবান ইহাকে কাড়িয়া লন, কিন্তু আমি যদি ইহার মাতৃত্বের অধিকার অপরের হস্তে তুলিয়া দিই তাহা হইলে আর তিনি ইহাকে গ্রহণ করিবেন না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত শিশুটিকে তিনি ধাত্রীহস্তে তুলিয়া দেন। পরে অবশ্য এক কড়া কি দুই কড়া কড়ি দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে তাহাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু যেহেতু মাতৃত্বের অধিকার একবার ধাত্রীকে দেওয়া হইয়াছে সেই হেতু অমুকের সন্তান বলিয়া বিধাতা তাহাকে আর হরণ করিতে পারেন না। এখন চিত্রগুপ্তের জন্ম-রেজিষ্টারীতে ঐ শিশুর মাতৃনামের স্থানে ধাত্রী-নাম লিখিত হইয়া গিয়াছে। আইন মানিয়া চলিতে হইলে উহার উপর তাঁহার কোন হাত নাই। তবে রাজার আইন এবং প্রজার আইন সকল সময়ে একরূপ হয় না।

মানুষের মত দেবতারও সুন্দর জিনিসের প্রতি বড় লোভ। আবার যাহা কিছু কুৎসিত তাহার প্রতি তেমনই বিদ্বেষ। রসগোল্লা দেখিলে আমাদের জিহ্বা সরস হয় কিন্তু যদি কেহ বলিয়া দেয় উহা অনেক দিনের বাসি, পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর সেদিকে মন দিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সন্তানের জননী ভাবেন, ভগবানের মনোভাব আমাদেরই মত। তাহারই ফলে 'ফেলারাম' 'গুয়ে' 'মেথরা' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি।

কোন পাঠশালার গুরুমহাশয় একটি পড়ুয়ার নাম দিয়াছিলেন 'নিমাই'; নিমাইয়ের এক সহপাঠী গুরুমহাশয়কে এক দিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন,—"আরে তা-ও জানিস না, ও যে আমাকে দিন একটি করিয়া নিমের দাঁতন আনিয়া দেয়।" নিমাইয়ের সহপাঠী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুমহাশয়, আমি যদি প্রত্যহ একটি করিয়া জামের দাঁতন আনিয়া দিই?" গুরুমহাশয় আর কোন জবাব দিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার 'নিমাই' নামকরণ অসঙ্গত হয় নাই। বস্তুত, 'নিমাই' শব্দ 'নিম' হইতেই আসিয়াছে। মৃত্যুদেবতাও মানুষের মত তিক্ত দ্রব্যের কাছে ঘেঁষিবেন না—এইরূপ মনোভাব লইয়াই জননী সন্তানের দীর্ঘ জীবন কামনায় এইরূপ নাম দিয়া থাকেন। সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে এক দিন শচীমাতাও নবজাত সন্তানের এই নামই দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে 'তিতারাম' নামও শুনিয়াছি।

অবস্থাবিশেষে মানুষ আবার সন্তান চায় না। 'আন্নাকালী', 'ক্ষান্তমণি' প্রভৃতি নামই তাহার প্রমাণ। কৌলীন্য প্রথার দুঃখময় ইতিহাসের সহিত এই নামগুলির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

তাই বলি কাব্যের নাম নামধারীর পরিচয়। আর জীবন্ত মানুষের নাম তাহার সমাজের প্রতিবিম্ব।

আজকাল তরুণ সমাজে নামের মধ্যাংশটি ছাঁটিয়া ফেলার রেওয়াজ হইয়াছে। শুনিয়াছি জনৈক স্বনামধন্য প্রবীণ সাহিত্যিকই নাকি এইরূপ মধ্যপদলোপী নামের প্রথম প্রবর্তন করেন। শুধু তাহাই নয়, এখন যুক্তাক্ষরবিহীন সুকোমল সুললিত নামেরও বহুল প্রচলন হইতেছে। ফলে কি হইয়াছে এবং কি হইতে পারে সে আলোচনা কচিসংসদেই হইয়া গিয়াছে—এখানে পুনরালোচনা নিরর্থক। কিন্তু

ইহা হইতে অতিআধুনিক বাঙালী সমাজের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা খুব সতেজ এবং সমুন্নত বলিয়া মনে হয় না।

কন্যার দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করিয়া বাঙালী পিতামাতা 'সীতা' নাম রাখিতে ভয় পান। ইহা হৃদয়ের কোমলতা এবং ভীরুতা উভয়েরই পরিচায়ক। আজকাল দুই-একটি বাড়ীতে এই নামটির চলন দেখিতেছি। কেহ কেহ সংস্কার মানেন না—জনসমাজে ইহা দেখাইবার জন্যই এরূপ নাম রাখেন শুনিয়াছি। অবশ্য, তাহা না-ও হইতে পারে।

ইভা, নিভা প্রভৃতি কয়েকটি নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না, কিন্তু সন্ধান করিলে প্রয়োগের কারণ আবিষ্কার করা কঠিন হইবে না। 'ইভ' শব্দের অর্থ হস্তী। স্ত্রীলিঙ্গে রূপ হয় ইভী। ধরিয়া লইলাম 'ইভা'ই হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন্ মাতা হস্তিনীবাচক শব্দ দিয়া কন্যাকে অভিহিত করিবেন? বর্ণসংক্ষেপ ও শ্রুতিমাধুর্য হেতু এমন হইতে পারে যে ইভাননী শব্দের দ্বিতীয়ার্ধ বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইভানন মাতার পছন্দ হইলেও জামাতার তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ না-ও হইতে পারে। 'নিভ' শব্দের অর্থ সদৃশ। অন্য শব্দের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার ত প্রয়োগই হয় না। হয়ত বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম বিভা, সাদৃশ্য এবং অনুপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য মধ্যমা এবং তৎপরবর্তী দুই ভগিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'ইভা' ও 'নিভা'। তাহার পর ধীরে ধীরে নিরর্থক হইলেও নামগুলি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন 'ইভা' নামটি ইংরেজী হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যেও এই ধরণের নামের নিদর্শন পাওয়া যায়। ময়নামতীর গানে দেখি রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক রাজার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম চন্দনা অপরের নাম ফন্দনা। "পদুনার বোন অদুনা"র নাম লইয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু 'চন্দনা'র বোন 'ফন্দনা'র কি আর কোনও গতি আছে?

প্রশ্ন

শ্রীসুপ্রভা দেবী

এসেছিল, চলে গেল, শুধু এইটুকু
এতটুকু সে কাহিনী? তাহা নহে, নহে
দুর্নিবার চিত্তস্রোত রক্তধারে বহে,
লক্ষ রূপে উচ্ছলিয়া পূর্ণ করে বুক।
কোথায় রাখিব তারে, কোথা তারে রাখি
কোথায় লুকাব মোর এ রাঙা স্বপন!
ক্ষণিকের ইন্দ্রধনু, চকিত-মরণ!
তার পরে চিররাত্রি পিপাসিত আঁখি!
আমি কি মানিতে পারি হেন পরাভব?
অনন্তের বুক হ'তে চুরি করি ল'য়ে,
মহাকালগ্রাস হ'তে রাখিব ছিনায়ে,
আমার প্রাণের তলে সে পরাণতম
জাগি রবে সঙ্গোপনে, মোর বেদনায়
ছায়ার আড়াল গড়ি লুকাব তাহায়।

মরণ চুমিল আসি নয়নের পাতে
শিথিল আলসরাশি মর্ম্মতলে পশে
সর্ব্বাঙ্গ জড়াল মোর সোহাগ-পরশে;
নির্ভয়ে সঁপিয়া কর তার দুই হাতে
কহিনু মিনতি করি, "কহ মোরে অয়ি,
ওগো মৃত্যু, ওগো রাত্রি, হে রহস্যময়ী।
অলক-আঁধার পাশে অনাগত কাল
ভবিষ্যৎ পথ মোর করেছ আড়াল,
তবু করিব না ভয়; শুধু কহ মোরে,
ওই যে বাড়ায়ে বাহু কুটীর-প্রাঙ্গণে,
আমার পরাণপ্রিয় অসীম রোদনে
আমার অতীত কাল দেয় সিক্ত করি,
নূতন জীবনে সে কি পথতরুছায়
আবার বাহুর ডোরে বাঁধিবে আমায়?

কৃষি ও রসায়ন

শ্রীআনন্দকিশোর দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এত কাল কৃষকগণ নিতান্ত সাধারণ ভাবেই কৃষিকার্য্য চালাইয়াছে; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ কোন প্রয়াস পায় নাই; তাহার পর, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দায় হইতে শস্যরক্ষার কোন বিধানই তাহারা করিতে পারে নাই। তাহা হইলেও দিন এক রকমে কাটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজকাল দারুণ জীবনসংগ্রামে ইহাতে আর চলিবে না। বিপদ ক্রমেই ঘনাইতেছে; সাবধান হওয়া দরকার।

সুখের বিষয় দেশের আবহাওয়া কতকটা বদলাইতেছে। সত্য সত্যই যেন একটু জাগরণের চিহ্ন গোচর হইতেছে। এই অবস্থায় কৃষিসংক্রান্ত আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাণীদিগের প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ অত্যাবশ্যক—অম্লজান বাষ্প ও শরীরপোষণোপযোগী খাদ্য। ইহাদের মধ্যে অম্লজান বায়ু হইতে আহৃত হয়, কিন্তু খাদ্যসংগ্রহ ততটা সহজ নহে।

প্রাণীদিগের খাদ্য সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) শর্করা-জাতীয়, (২) শালি-জাতীয় (কার্ব্বোহাইড্রেটস্), (৩) প্রোটিন বা পনীর জাতীয়, (৪) লবণ-জাতীয় ও (৫) জলীয়। ইহাদের অধিকাংশই প্রাণিগণ উদ্ভিদ হইতে সংগ্রহ করে।

শালি-জাতীয় খাদ্যে অম্লজান, কার্ব্বন ও জলজান এই তিনটি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। চাউল, গম, আটা, চিনি ইহারা এই জাতীয় খাদ্য। উদ্ভিদ তাহাদের দেহে এই সকল খাদ্য প্রস্তুত করে ও নিজের ও প্রাণিগণের ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই জাতীয় খাদ্য দেহের উত্তাপ-রক্ষার সহায়ক।

প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যে কার্ব্বন ও জলজান ইত্যাদি ব্যতীত যবক্ষারজান আছে—উহার পরিমাণ শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ। ডিম, মাছ, মাংস ও ডালে প্রচুর প্রোটিন বিদ্যমান। শরীরের মাংসপেশীতে এই জাতীয় খাদ্যই শক্তিদান করে।

প্রাণবান্ জীবের পক্ষে যবক্ষারজান একান্ত আবশ্যক। জীবকোষের (প্রোটোপ্ল্যাজম্) চাঞ্চল্য, উহার বৃদ্ধি ও নাশ, ইহা হইতেই সম্ভব হয়। এই মূল পদার্থের অভাবে জীবনধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি প্রাণিদিগকে যবক্ষারজান-সংক্রান্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে উহারা রোগগ্রস্ত হইয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অন্য কোন মূল পদার্থ ইহার অভাব পূরণ করিতে সমর্থ নহে।

কিন্তু জীবনধারণের জন্য যুক্ত যবক্ষারজান দরকার। প্রাণিগণ উহাকে মুক্তাবস্থায় হজম করিতে পারে না। যুক্ত অবস্থায় আনীত হইলে তবেই উহা খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাণিদেহে মুক্ত যবক্ষারজান কোন কাজেই লাগে না। যবক্ষারজানযুক্ত খাদ্য আমরা উদ্ভিদের নিকট হইতে পাই। উদ্ভিদেরা প্রাণীদিগকে উহা জোগায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উদ্ভিদ্গণ উহা কোথায় পায়?

প্রাণীদিগের মত উদ্ভিদকেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই খাদ্য উহারা কতক চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি হইতে সংগ্রহ করে, কতক ভূমি হইতে মূলের সাহায্যে গ্রহণ করে।

আমরা জীবনধারণের জন্য বায়ুরাশি হইতে অম্লজান নিশ্বাসে গ্রহণ করি ও কার্ব্বনিক এসিড বায়ু প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া দি। দহন এবং পচনের (putrefaction) সময়েও অম্লজান গৃহীত ও কার্ব্বনিক এসিড বায়ু পরিত্যক্ত হয়। কাজেই ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বায়ুরাশিতে ক্রমে অম্লজানের অভাব ও কার্ব্বনিক

এসিডের প্রাচুর্য্য হইবে। কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। কারণ উদ্ভিদ্ দিবাভাগে কার্ব্বনিক এসিড গ্রহণ ও অম্লজান ত্যাগ করে এবং এই ভাবে অম্লজানের অপ্রতুলতা ও কার্ব্বনিক এসিডের প্রাচুর্য্য দূর করে। উদ্ভিদ্ পত্রের সাহায্যে কার্ব্বনিক এসিড বায়ু গ্রহণ করে এবং সূর্য্যকিরণ ও পত্রহরিতের (ক্লোরোফিল) সাহায্যে উহাকে ক্রমে শর্করা-জাতীয় পদার্থে পরিণত করে।

ভূমি হইতেও উহারা খাদ্য আহরণ করে; ভূমিতে শিকড় ঢুকাইয়া উহাদের সাহায্যে তাহারা প্রধানতঃ দ্রবণীয় যবক্ষারজানমূলক খনিজ পদার্থ শোষণ করিয়া আনে ও তাহাকে বিবিধ উপায়ে ক্রমে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদ্-দেহেই সম্ভব, প্রাণী-দেহে নহে। এই ভাবে খাদ্য আহরণের জন্য ভূমি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে উদ্ভিদ-খাদ্যের অভাব হইতে থাকে। এই অভাবের পরিপূরণ অত্যাবশ্যক, নতুবা ঐ ভূমি ক্রমে উদ্ভিদের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে।

এই উদ্ভিদ-খাদ্যকেই সার বলে। জমির উর্ব্বরতাশক্তি লোপ পাইলে অর্থাৎ যবক্ষারজানসংযুক্ত পদার্থ নিঃশেষিত-প্রায় হইলে উহাতে সার দিয়া উদ্ভিদধারণোপযোগী করিতে হয়।

এই সার কতক প্রকৃতি উদ্ভিদের জন্য অহরহই প্রস্তুত করিতেছে। যখনই উদ্ভিদের পত্রাদির অথবা জৈবিক কোন পদার্থের শটন সুরু হয়, তখন নানাবিধ আণুবীক্ষণিক কীটাণু উহাদিগকে আক্রমণ করে এবং ক্রমে উহাদিগকে সোরা অথবা এমোনিয়া-জাতীয় পদার্থে পরিণত করে। এই উভয় পদার্থেই যুক্ত-যবক্ষারজান বিদ্যমান। তার পর প্রাণিগণের মলমূত্রাদিও ঐভাবে ক্রমে ঐ জাতীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। কয়লা হইতে গ্যাস হয়—এই গ্যাস তৈয়ারীর সময়েও এমোনিয়া প্রস্তুত হয়। এই সব উপায়ে স্বতই এই জাতীয় পদার্থ ভূমিতে আহৃত হয়। সর্ব্বোপরি মাতা বসুন্ধরা তাঁহার সন্তানের কল্যাণকামনায় নিজবক্ষে স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় বহু উদ্ভিদখাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রোপকূলে চিলি নামক দেশে একটি সোরার খনি আছে। তাহাতে যে পরিমাণ সোরা-সার মজুত আছে, তাহা পৃথিবীর যাবতীয় কর্ষিত ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই খনির দৈর্ঘ্য ২৬০ মাইল, প্রস্থ ২॥ মাইল ও গভীরতা ৫ ফুট। সমুদ্র উপকূল হইতে উহা প্রায় ২৫।৩০ মাইল দূরে, ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। চিলির আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, প্রায় মরুভূমির তুল্য। বৃষ্টি ঐ দেশে মোটেই হয় না। এই অনাবৃষ্টিই সোরার খনিকে রক্ষা করিতেছে। কারণ, সোরা জলে দ্রবণীয়; বৃষ্টি হইলে সমস্ত জলে গলিয়া সমুদ্রে নীত হইত, ঐ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারিত না। চিলিবাসিগণ এই সোরার খনি হইতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ ইহা তাহাদের প্রায় একচেটিয়া। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই খনি হইতে সোরা-সার সংগৃহীত হয়।

কিন্তু সোরা-ব্যবসায়ীদিগের জীবন খুব আরামপ্রদ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোরার খনি বৃষ্টিপাতশূন্য দেশে অবস্থিত—উহা অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ। যদিও এই সোরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শস্যোৎপাদনের সহায়ক, তথাপি ঐ খনি একেবারে শস্যশূন্য মরুভূমি। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত সূর্য্যকিরণ বর্ষিত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। নলকূপের জল অখাদ্য, বিস্বাদ। ৫০ হইতে ১০০ মাইল দূরস্থিত এণ্ডিজ পর্ব্বতমালা হইতে নল-সংযোগে পানীয় জল আহরিত হয়। কাজেই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে বিলাতের হুইস্কি অপেক্ষাও চিলিতে পানীয় জল বেশী মূল্যবান। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও চিলি ধরার স্বর্গ। কারণ, এই মরুভূমির পাথরের নিম্নে যে অমূল্য পদার্থ লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা পৃথিবীর যাবতীয় জমির উর্ব্বরতা সাধন করে, তাহাকে সারবান করে এবং ফসল জন্মিতে সাহায্য করে। এঞ্জিনীয়ারগণ প্রথমতঃ খনিতে কোথায় কি পরিমাণ সোরা-সার আছে, তাহা পরীক্ষা করে; সোরা জলে দ্রবণীয় বলিয়া গর্ত্ত করিয়া, জলে গলাইয়া পম্পদ্বারা উহাকে উপরে আনয়ন করে; তার পর বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে কি পরিমাণ সোরা আছে তাহা নির্ণয় করে; পরীক্ষা সন্তোষজনক হইলে ডাইনামাইট যোগে ফাটাইয়া উহার অভ্যন্তরস্থ সোরা-বালি সংগ্রহ করে। এই সোরা-বালি জলে গলাইয়া বালি কাদা হইতে মুক্ত করিয়া রৌদ্রের

উত্তাপে ঘন করা হয়। সর্ব্বশেষে দানাদার হইলে আহরণ করিয়া থলিতে বাঁধিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সোরাখনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল, যাহাতে পৃথিবীবাসী শঙ্কিত হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সে বৎসরের সভাপতি সর্ উইলিয়াম ক্রুক্স সে মহাসভায় ঘোষণা করিলেন, যে, গমভোজী মানবসমাজের অদৃষ্টাকাশ দারুণ মেঘাচ্ছন্ন; শীঘ্রই এমন এক সমস্যার উদ্ভবের সম্ভাবনা, যখন তাহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। গমফসল খুব বেশী যবক্ষারজান-সংযুক্ত সার গ্রহণ করে। এত কাল এই সার মূলতঃ চিলিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, তাঁহার গণনা অনুযায়ী এই চিলির সোরাখনি আর ২৫।৩০ বৎসরের বেশী থাকিবে না। ইহা ক্রমেই নিঃশেষ হইতেছে। তত দিনে একেবারে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা।

যাহারা গম-ফসল ভক্ষণ করে তাহাদের শীঘ্রই অন্য ফসল আহারে অভ্যস্ত হওয়া দরকার, যাহাতে এত সোরা-সার না লাগে। তাহা না হইলে লোকসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ জমি সীমাবদ্ধ এবং যে-জমিতে গম জন্মে তাহা আরও সীমাবদ্ধ। সেই জাতীয় জমি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। লোকসংখ্যা যত বাড়িতেছে, খাদ্যের পরিমাণও তত কমিতেছে। সুতরাং বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সর্ উইলিয়াম শুধু মুখের কথা দিয়াই লোকের এই ত্রাস উপস্থিত করেন নাই—হাতে-কলমে তিনি সর্ব্বসাধারণকে উহা বুঝাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ গম-ফসলের চাষ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা দেখাইলেন, যথা:—

১৮৮১-১৮৯০—১৯২,০০০,০০০ একর

১৯০০-১৯১৯—২৪২,০০০,০০০ „

জমির পরিমাণ—৩০০,০০০,০০০ „

তার পর তিনি দেখাইলেন—সাধারণ জমিতে গড়ে ১২.৭ বুশেল গম হয়; সোরা-সার দিয়া উহাতে ২০ বুশেল পর্য্যন্ত করা সম্ভব, এবং তাহা করিতে হইলে ১২ লক্ষ টন সোরা পৃথিবীতে বিতরণ করিতে হইবে। এক-এক টন গমের জন্য ৪৭ পাউণ্ড যবক্ষারজান অথবা ৩০০ পাউণ্ড সোরা দরকার।

সোরা-সার দিয়া বিভিন্ন দেশে গমের পরিমাণ কতটুকু পাওয়া যায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

	১৮৮৯-৯০	১৯১৩
জার্ম্মেনী	১৯ বুশেল	৩৫ বুশেল
ফ্রান্স	১৭ „	২০ „
ইংলণ্ড	২৮ „	৩২ „
আমেরিকা	১২ „	১৫ „

জার্ম্মেনীর জমিতে এত ফসল বৃদ্ধির কারণ এই যে, জার্ম্মেনী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চিলি হইতে ৫৫,০০০ টন ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪৭,০০০ টন (অর্থাৎ প্রায় ১৪ গুণ বেশী) সোরা আনয়ন করে।

অতঃপর সর্ উইলিয়াম কি হারে সোরার খনি ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা দেখান:—

১৮৭০— ১৫০,০০০ টন

১৯০০—১,৪০০,০০০ „

১৯১২—২,৫৪২,০০০ „

ইহার মধ্যে জার্ম্মেনী শতকরা ৩৩.৩ অংশ, আমেরিকা ২২.২ অংশ, ফ্রান্স ১৪.৩ অংশ এবং ইংলণ্ড ৫.৬ অংশ আনে।

বিগত মহাসমরের সময় এই সোরার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল, কারণ গোলা তৈয়ারে সোরা অন্যতম প্রধান উপকরণ। ভগবান ব্রহ্মা যেমন বিষ্ণুরূপে পৃথিবীর রক্ষক এবং শিবরূপে সংহারক, সোরারও তেমনি দুই রূপ আছে। যখন উহা গ্লিসারিণ বা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহা ডাইনামাইট ও ব্লাষ্টিং জিলাটিনের উপকরণ হয় এবং ভীষণ বিস্ফোরক হিসাবে সংহারক মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। আবার যখন উদ্ভিদের সাররূপে ব্যবহৃত হয় তখন ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া এই ধরাকে শস্যশ্যামলা করে ও জীবসমূহের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের প্রাণদাতা হয়।

যুদ্ধ ও খাদ্যের জন্য উহার চাহিদা এত অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল যে ক্রমেই উহার নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিতে লাগিল। সর্ উইলিয়াম হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, খুব হিসাব করিয়া ব্যবহার করিলেও ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশী

কাল এই খনি সোরা জোগাইতে পারিবে না। কিন্তু তার পর ?

এই প্রশ্নই সর্ উইলিয়ামকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর কি হইবে ? সোরা-সার যখন নিঃশেষ হইবে, তখন মাতা বসুন্ধরা নিঃস্ব হইবেন ; তখন তিনি কি উপায়ে মানবসমাজের খাদ্য জোগাইবেন ? সর্ উইলিয়াম দিব্যচক্ষে দেখিলেন, যদি বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তবে অভাব-অনটন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে, নিশ্চিত মৃত্যু প্রাণীবর্গকে গ্রাস করিবে, সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িবে। তাই তিনি সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমাজের মনোযোগ ইহার প্রতি আকর্ষণ করিলেন—তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আপনারা অবহিত হউন, তৎপর হউন, এই সমস্যার সমাধানে যত্নবান হউন—নতুবা ত্বরায় পৃথিবী প্রাণীশূন্য হইবে।

তিনি কেবল এই ভীষণ সম্ভাবনার সূচনা করিয়া, মানব-মনে এই ত্রাস জন্মাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই—যথার্থ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় এই আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির উপায়ও আলোচনা করেন। তিনি বলিলেন, রাসায়নিকগণের দ্বারা রসায়ন-সার হইতেই উহার সমাধান সম্ভব।

কি উপায়ে উহার সমাধান হইতে পারে তাহার একটি পন্থা, যাহা সর্ উইলিয়াম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

সোরা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। সোরা একটি যৌগিক পদার্থ। উহার মূল উপাদান যবক্ষারজান, অম্লজানও একটি ধাতব পদার্থ। ইহাদের মধ্যে যবক্ষারজান ও অম্লজান বায়ুরাশিতে বিদ্যমান। বায়ুর $\frac{4}{5}$ অংশ যবক্ষারজান ও $\frac{1}{5}$ অংশ অম্লজান। কিন্তু বিপদ এই যে, এই যবক্ষারজান মুক্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুক্ত-যবক্ষারজানই উদ্ভিদের খাদ্য, মুক্ত-যবক্ষারজান নহে। এই যুক্ত-যবক্ষারজানের জন্যই হাহাকার, উহাই লোকে পয়সা দিয়া কিনিতে প্রস্তুত। মুক্ত-যবক্ষারজান বায়ুরাশিতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, প্রতি নিশ্বাসে মানব ও উদ্ভিদ্ উহা গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু মানব বা উদ্ভিদ্ উহা হজম করিতে পারে না বলিয়া উহা তাহাদের কোন কাজেই লাগে না। যদি মুক্ত-যবক্ষারজান মানবের আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত, তবে মানবের অনেক দুঃখেরই হ্রাস হইত। মারামারি, চুরি, ডাকাতি, সব দূর হইত, অভাব-অনটন লোপ পাইত, ঘরে বসিয়া বায়ুরাশি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিত এবং দুই-চার বার নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারিত—আহার্য্য সংগ্রহের জন্য এই যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মুক্ত-যবক্ষারজান কোন কাজেই লাগে না। এন্‌শেণ্ট মেরীনার যেমন সমুদ্রে ভাসিয়াও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল, চারি দিকে জলের মধ্যে থাকিয়াও পানীয় জলের অভাবে শুষ্কতালু হইয়াছিল, প্রাণিগণও তেমনি যবক্ষারজান-সমুদ্রে বাস করিয়াও তাহা হইতে বিশেষ কোন উপকার পাইতেছে না।

যবক্ষারজানের বড় একেশ্বর ধাত। উহা অন্য পদার্থের সঙ্গে সহজে যুক্ত হইতে চাহে না। ইহাকে উত্তেজিত করিতে হইলে, মিশুক করিতে হইলে, তড়িতের সহযোগ আবশ্যক। যদি তড়িৎ প্রবেশ করান যায়, তবে তাহার অমিশুক ভাব দূর হয় ও পার্শ্বস্থ অম্লজানের সহিত যুক্ত হয় এবং তখন আরও সঙ্গী খোঁজে। এই ভাবে প্রথমতঃ নাইট্রিক অক্সাইড ও পরে নাইট্রোজেন পেরোক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। অতঃপর বৃষ্টির জলে গলিয়া নাইট্রিক এসিড রূপে পৃথিবীতে পতিত হয় ও মৃত্তিকাতে অবস্থিত সোডা বা পটাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে সোরার আকার ধারণ করে। মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ এই সোরাকে দ্রবণীয় অবস্থায় গ্রহণ করে। উহা উদ্ভিদ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্রমে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। প্রাণিগণ উদ্ভিদ-দেহ হইতে প্রোটিন সংগ্রহ করে এবং নিজদেহ পরিপুষ্ট করে। তার পর যখন প্রাণিদেহ ধ্বংস হয় তখন ঐ যবক্ষারজানসংযুক্ত প্রোটিন নানাবিধ আণুবীক্ষণিক কীটাণুর সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয় এবং কতকাংশ মুক্ত-যবক্ষারজান অবস্থায় আকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সর্ উইলিয়াম প্রস্তাব করিলেন যে, পরীক্ষাগারে বিদ্যুতের সাহায্যে যদি যবক্ষারজান ও অম্লজানকে এই ভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়, তবে এই প্রক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে সোরা প্রস্তুত হইতে পারিবে, এবং আমাদিগকে চিলি প্রদেশের সোরার খনির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

সর্ উইলিয়ামের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া অতঃপর রাসায়নিকগণ এই বিষয়ে গবেষণায় রত হইলেন এবং ক্রমে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে সম্ভব করিয়া তুলিলেন।

ইহার জন্য উচ্চ-ক্ষমতার বিদ্যুৎ দরকার এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তি যত সস্তায় হইবে—কৃত্রিম সোরার দরও বাজারে ততই কমান যাইবে। সেই জন্য আজকাল বড় বড় জলপ্রপাতের শক্তি আহরণ করিয়া তাহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয় এবং সেই বিদ্যুতের সাহায্যে বায়ুসমুদ্রের অম্লজান ও যবক্ষারজানকে সংযুক্ত করিয়া তাহা চুনাপাথর বা সোডা-পটাশ ক্ষার দ্বারা শোষাইলে ক্রমে সোরাতে পরিণত হয়।

সুইডেনের অন্তর্গত টেলিমার্কেন প্রদেশে বড় বড় জলপ্রপাত আছে। তাই সর্ব্বপ্রথম দুই জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সেখানে পতনশীল জলের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিলেন এবং তাহার সাহায্যে বায়ুরাশিকে অম্লজান ও যবক্ষারজান-সংযুক্ত করিয়া ক্রমে তাহা হইতে উল্লিখিত উপায়ে প্রকৃত সোরা তৈয়ারী করিতেছেন। যেখানে যেখানে হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা আছে, সেখানেই উহা অনেকটা সম্ভব তবে বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ উচ্চ (আন্দাজ ৪০০০-৫০০০ ভোল্ট্) হওয়া দরকার।

উল্লিখিত প্রপাতের জলধারা ৮২০ ফুট নীচে পড়িতেছে—এই পতনশীল জলের দ্বারা টারবাইন্ ঘুরান হয়—এবং উহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। ঐ শক্তির ক্ষমতা ৫০০০ হইতে ১০,০০০ ভোল্ট পর্য্যন্ত।

দু-রকম ভালবাসা

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

এক ভালবাসা আছে,
সব ভাল তার কাছে।
সে ভালবাসায় ছোটখাট ত্রুটি
ঝড়ের নেশায় যেন খড়কুটি,
উড়ে যায়, কোথা ভেসে যায়—
বুঝি স্মরণ-শেষের দেশে যায় ;
তাই থেকে যায় ভালবাসা
আরো সুখ আরো আশা।
নীল শরতের উদার গগন
আপন ধেয়ানে আপনি মগন
মানে না মেঘের ঘোর আয়োজন
অবিরল যাওয়া-আসা —
তেমনি এ ভালবাসা !

আরো ভালবাসা আছে,
এই মরে, এই বাঁচে !
সে ভালবাসায় পলকে পলকে
পরাণ-ত্রাসন বিজলী ঝলকে
বেদনায়, বুক চিরে যায়
শুধু বজ্র-শাসন গরজায়,
তাই মূরছায় ভীরু আশা
নিবে আসে ভালবাসা !
কালো বরষার ঘোর অভিমানে
যত দূরে ঠেলে তত কাছে টানে,
কল-কোলাহল প্রলয়াবসানে
নয়নের জলে ভাসা—
তেমনি এ ভালবাসা !

খ্যাতিভোলা দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি তো জানো আমার মনের মধ্যে একটা যেন ষড়ঋতুর পর্যায় আছে, হাওয়া বদল হয় যখন, ফসল যায় বদলে। একটা সময় আসে যখন মনের উত্তুরে হাওয়ার গতি থাকে বাইরের দিকে, সমুদ্র পেরিয়ে। সেদিকে আজ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগেছে, পাতা ঝরে-পড়া বনস্পতির শাখায় শাখায় আর্তস্বর জেগে উঠল। তা হোক, সেদিকের দিগন্ত দূর-প্রসারিত, তার ভাষার মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের কলকল্লোল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আমার তো মাঠের ধারে বাসা, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটার সরু পথ, চলেছে সেই পল্লীর দিকে, যার সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশেছে সবুজ বনের ছায়া, যার স্বর গুঞ্জন-ধ্বনির উপরে ওঠে না। দূর সমুদ্রতীরের আহ্বানে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিতে যাই, নিজের বাণীর সূত্রে সেখানকার সঙ্গে পরিচয়ের সম্বন্ধ গাঁথতে চাই, কিন্তু দুই সূত্রে গ্রন্থি বাঁধবার নৈপুণ্য আমার নেই ব'লে সন্দেহ হয়। তখন বুঝতে পারি বাইরের বিশ্বে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করা চলে কিন্তু বাস করতে হয় নিজের বাস্তুসীমানার মধ্যে। সেখানকার বাস্তুদেবতার বাণী দিয়ে যখন শিল্প সৃষ্টি করি তখন সম্পূর্ণ ভোলা ভালো বাইরের বাজারের কথা, সব দেশের সব কবিরাই তাই করে থাকে। আমাদের সঙ্গে ওদের দেশের তফাৎ এই যে ওদের পারবেশটাই বড়ো, ওদের আত্মপরিচয়ের পরিপ্রেক্ষণিকা ওদের আপন সীমানার মধ্যেই মস্ত, তার মূল্য অনেক বেশি। মানুষের মধ্যে আপন পরিচয়ের সম্বন্ধ বড়ো করা সত্য করাই বড়ো ক'রে বাঁচা। সেই জন্যে সেই বহুবিস্তৃত পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্যে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল আমার মনে একটা বৈরাগ্য প্রবল হয়ে উঠছে। আমার মনে হয় অপরিচিত থাকার গর্ব আর্টিস্টের মানসিক আভিজাত্যের লক্ষণ। অজন্তা গুহার আর্টিস্টরা কেবল যে দুর্গম নিরালোক গুহার মধ্যে আপন বহুসাধনার সৃষ্টিকে সঞ্চিত করেছে তা নয়, নিজেদের নামটা মুছে ফেলে গেছে—নিজের অন্তরাত্মার কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছে তারা পুরস্কার দাবী করতে হাত বাড়ায় নি। আমার তো ঈর্ষা হয় মনে। বলতে গেলে আমাদের দেশটা অন্ধকার গুহার মতোই কঠিন সীমা-বেষ্টিত—এখানে সেই আলোক নেই যাতে বাইরের দৃষ্টি সঞ্চরণ করতে পারে। কিন্তু এটা তো সত্য, সৃষ্টি তার বেষ্টনের মধ্যে থেকেও সীমাকে বহুদূরে অতিক্রম করে—যেমন করেছে গুহাচিত্রগুলি। এই অতিক্রম করার মানে এ নয় যে প্রাচীর-সীমার বাইরে তারা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মানে এই যে খ্যাতিহীনতার দ্বারা তাদের সাধন হোতে পারে না। সৃষ্টিকর্তারা যখনি তাদের সৃষ্টি করে তখনি সেই মুহূর্ত টুকুতে তাদের দেনা-পাওনা দেশকালের অতীত হয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এ কথাটা কেন বিশেষ ক'রে আজ আমার মনে হোলো সে কথা তোমাকে বলি। আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড় সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে চালান করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন ব'লে আশাই রাখি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন, যে সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তাগুহায়—তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে, এর মৌতাত যখন ফিকে হয়ে আসবে তখন ছবি নিয়ে পড়ব, সে আরেক জাতের নেশা, সেও খ্যাতির দাবি রাখে না, অর্থাৎ মাৎলামি করবার অবাধ স্বাধীনতা দেয়। ইতি ২১।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত]

চীনে জেলে পাড়া

চীনা বিবাহের শোভাযাত্রা

শেষ যাত্রা
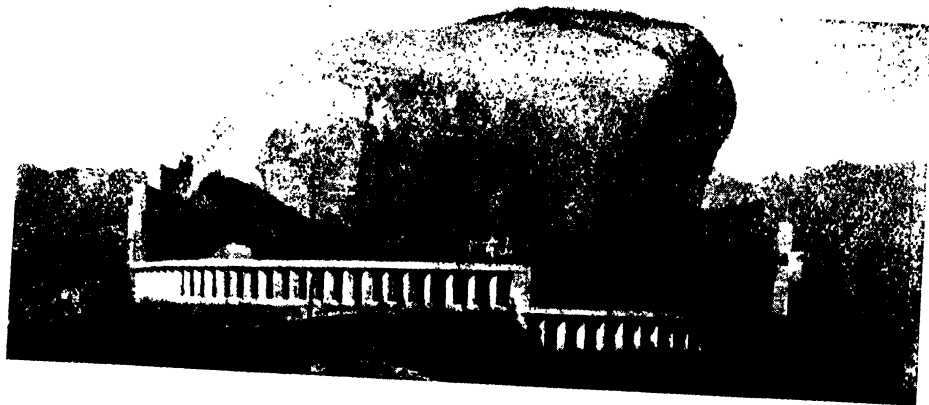
স্থং সম্রাটের প্রাসাদে শিলালিপি

হংকং ওয়েলিংটন স্ট্রীট
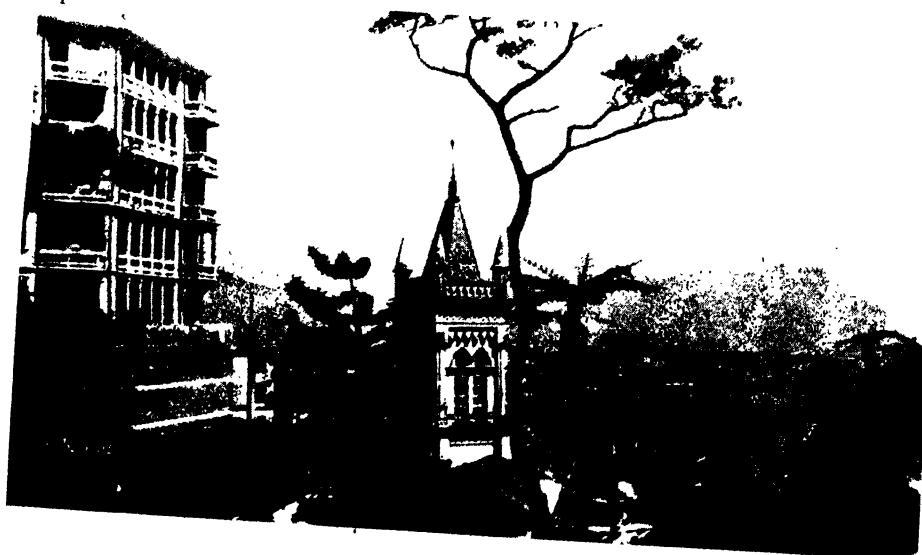
হংকঙের চূড়ায় হোটেল

হংকঙের চূড়া

ক্যান্টন মন্দিরের পথ
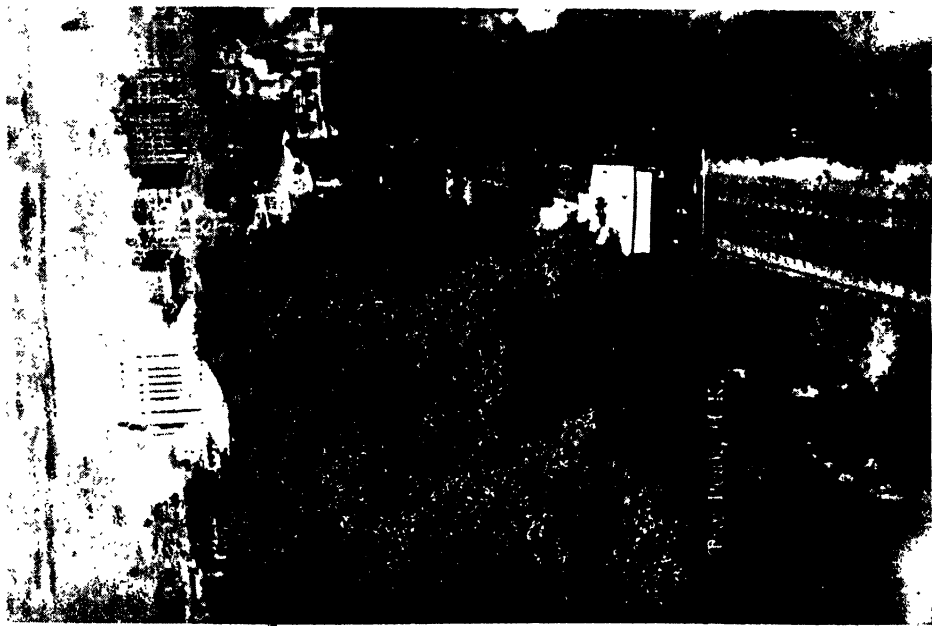
কম্যুনিজম-বিরোধী ত্রিশক্তি-চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে, জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রী হিরোটার বাসভবনের সম্মুখে সমবেত জনতার অভিনন্দন গ্রহণে হিরোটা (মধ্যস্থলে). ইতালীর রাজদূত (বামে) ও

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

চীন-জাপান আজ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; এদের রাজনৈতিক সমস্যা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ই বাহিরের লোকে জানতে উৎসুক। মাত্র এক বৎসর আগে মানুষের দৃষ্টির ঠিক এই রকম অবস্থা ছিল না; তখন পৃথিবীর এই অংশগুলিকে বিশেষ একটা কোনও রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে দেখি নি, ছুটে চলে যাবার পথে সহজ চোখে যেমন পড়েছে শুধু তেমনই দেখেছি।

২৬শে জানুয়ারী বেলা ১১টা আন্দাজ আমরা ডাঙার খুব কাছে এসে পড়েছি, সিন্ধু-শকুনরা মাথার উপর খুব উড়ে বেড়াচ্ছে। জাহাজ বন্দরে ঢুকছে, দু-পাশে এবার জমি, তাই হংকং পৌছবার ৩৫।৩৬ মাইল আগে থেকেই দুই পাশে পাহাড়ের রেখা দেখা দিয়েছে। ডাঙার কাছে জলের রং ফিকা সবুজ হয়ে এল, উত্তাল তরঙ্গ ধীর শান্ত হয়ে শুধু একটু ছলাৎ-ছলাৎ করে দুলছে। ৩টার সময় আমাদের হংকং পৌছবার কথা। ১২টায় খাওয়া-দাওয়ার পর থেকেই যাত্রীরা মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছে ডাঙায় একবার লাফিয়ে পড়বার জন্যে। প্রায় সাত দিন মাটিতে কারুর পা পড়ে নি, তার উপর খোলা সমুদ্রে শীতের হাওয়া হু হু ক'রে বইছে, আর জাহাজের গর্ত্তে কারুর ভাল লাগছে না। আমরা ডেকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম জলের দু-ধারে ন্যাড়া পাথরের পাহাড়, তার গায়ে মাঝে মাঝে সবুজ শ্যাওলার ছাপ ছাপ দাগ, কোথাও সামান্য একটু মাটির ..., তারই গায়ে দু-চারটা ছোট্ট গাছ। চীনা চিত্রকরদের ছবিতে এত ন্যাড়া পাহাড় আর ক্ষুদ্র গুল্মের একটুখানি আমেজ কোথা থেকে আসে বোঝা গেল। প্রকৃতির এই রকমের চেহারা আমাদের দেশে দেখি নি। মনে হচ্ছিল আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কাঁধে চড়ে হঠাৎ চীন রাজ্যে চলে এসেছি। এত দিনের সমুদ্রযাত্রাটা ভুলে গিয়েছিলাম।

মনে হয় জমি এখান থেকে এত কাছে যেন এক মিনিটে সাঁতরে চলে যাওয়া যায়। ন্যাড়া পাহাড়গুলি পার হ'তে-না-হ'তে তার অন্তরালে ও একই রেখায় পরে পরে ঘরবাড়ীওয়ালা পাহাড় দেখা দিতে লাগল। এ আর উপন্যাসের রাজ্য নয়, একেবারে বাস্তব কংক্রিটের অতিআধুনিক বাড়ী, কোন কোনটা সাত-আট তলা উঁচু মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে বাড়ী, একটার পিছন থেকে আর একটা উঠেছে, একটার যেখানে চারতলা, অন্যটার সেই লাইনে দু-তলা, কাজেই কোন্ বাড়ীটা কত উঁচু দূর থেকে বলা শক্ত।

সান্ ইয়েৎ সেন

দেখতে দেখতে হংকং এসে পড়ল। তখন ২টা বেজেছে, জলপথে বোধ হয় পাঁচ-ছয় মাইল পথ বাকী, কিন্তু শহরের ঘরবাড়ী, পথঘাট, ট্রাম, লরী, বাস,—সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত পরিচিত জগতের মত চেহারা দেখতে ভাল লাগে না। কিন্তু কি করা যাবে? ইউরোপীয়
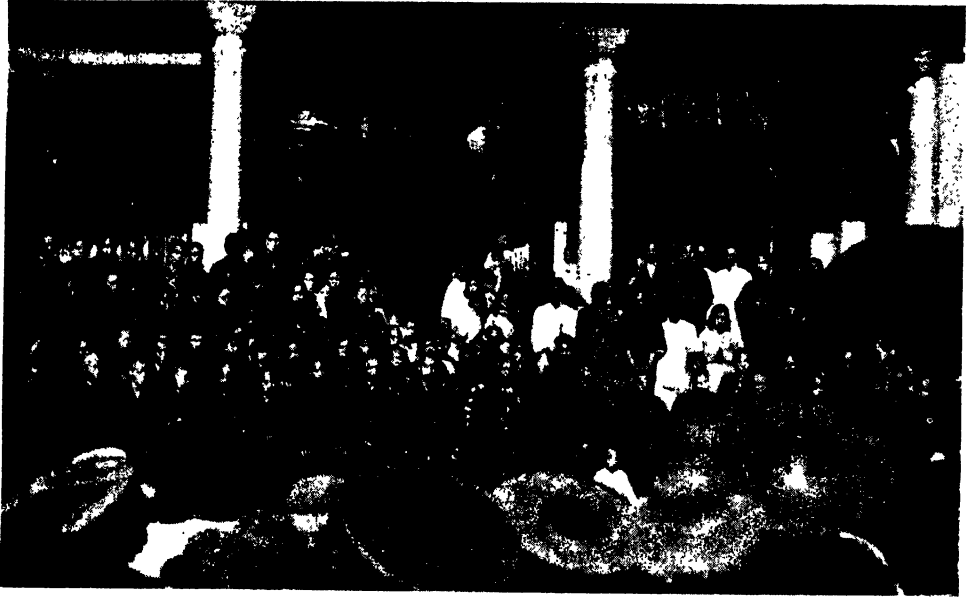
বৌদ্ধ মন্দিরে পুরোহিতবৃন্দ

সভ্যতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেখানেই ছড়িয়েছে সেখানেই এই এক ছাঁচে ঢালা পৃথিবী। যাত্রীরা সব ভারী ভারী ওভারকোট ও গরম টুপি পরে ব্যাগ-হাতে সিঁড়ির কাছে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা হংকং ইতিপূর্ব্বে দেখেছে তারা নবাগতদের দূর থেকে আঙুল বাড়িয়ে কোন্‌টা কি চিনিয়ে দিচ্ছে।

পাসপোর্টে ছাপ নেওয়া অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। ৩টায় রোজ চা খাবার কথা, কিন্তু আজ আর সে-সব কথা কারুর মনে নেই। যারা এইখানেই একেবারে নেমে পড়বে তাদের চেয়ে যারা শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য বেড়াতে নামবে তাদেরই উৎসাহ বেশী। ৩টা বেজে যায় দেখে যাত্রীদের ডেকেডুকে টেবল-বয়রা কোন রকমে একটু চা খাইয়ে দিল। সেখানে বসে পেয়ালা-হাতে গল্প আজ আর জমল না। সকলে আবার হুড়মুড় ক'রে উপরে ছুটল। কিন্তু ষ্টীম-লঞ্চের তখনও দেখা নেই। যে-চীনারা দেশে ফিরছিল তারা ডিঙি নৌকা ডাকিয়ে পিঠে নক্সাকাটা ঝোলায় তাদের খোকাখুকী বেঁধে চটপট নেমে পড়ল। ঘাটে জাহাজ ঠেকছে না, কাজেই মাঝজল থেকে সবাইকে নৌকা কি ষ্টীমারে যেতে হবে।

এইবার এল আদত বন্দর। হংকং বিরাট বন্দর, প্রকাণ্ড শহর। কত যে অসংখ্য নৌকা আর সারি সারি জাহাজ বন্দর ভ'রে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক নেই। মাল-বোঝাই নৌকায় আমাদের দেশের মতই রান্নাবান্না, তরকারি কোটা চলেছে, জেলে নৌকায় সারি সারি দড়ি বেঁধে ভিজে জামাকাপড় শুকচ্ছে, ছোট নৌকায় করে বিলাতী টুপি মাথায় ডানপিটে চীনে ছেলেরা বাঁশ লাগিয়ে জাহাজ বেয়ে চড়তে আসছে। লম্বা লম্বা বেণী-ঝোলানো কালো পায়জামা-পরা চীনা-নন্দিনীরা সব দাঁড় বেয়ে নৌকা চালাচ্ছেন, অন্য কারুর নৌকা ঘাড়ে এসে পড়লে দাঁড়ের এক ঠেলায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। নৌকা বাঁধবার কাছির শেষে বেতের একটা করে ঝোড়া ঝোলান। মানুষের মুখ সব নূতন রকম। এই অতি জীবন্ত বন্দরের নৌকা, পাল, মানুষ ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছিল, এত দিনে সত্যি একটা নূতন দেশে এসেছি বটে। নৌকাগুলি এবার কাছ থেকে দেখলাম, পালগুলো কাপড়েরই বটে, পাতা
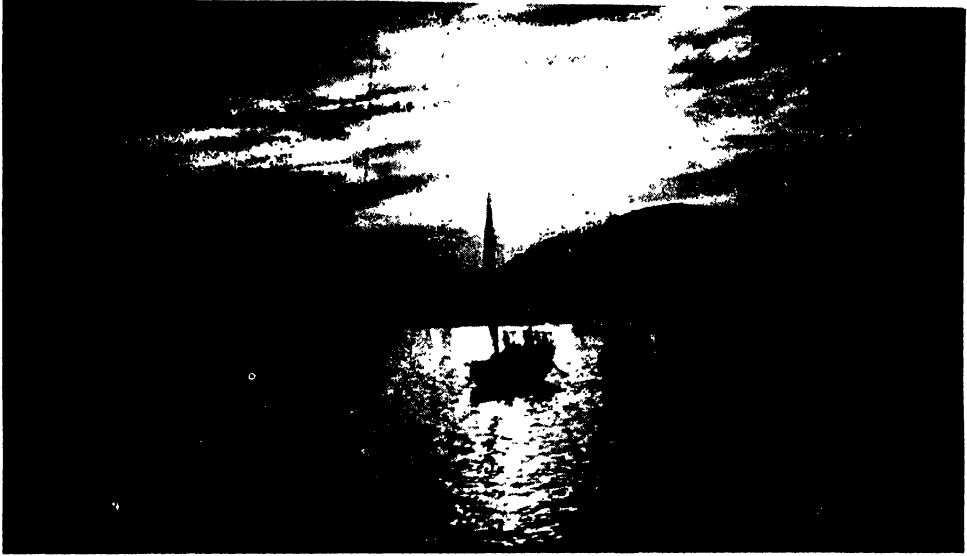
হংকং সমুদ্রে সূর্য্যোদয়

নয়। কাপড়ের উপর তালপাতার শিরার মত করে বাঁশ বাঁধা, তাই দূর থেকে বিরাট তালপাতার মত দেখায়। রংটা কি কারণে বাকলের মত জানি না, ঝড়ে ঝাপটায় হয়েছে কি রঙিয়ে করা বলতে পারি না। এক পাল, দুই পাল, তিন পাল নানারকম নৌকাই আছে। নৌকার গড়নও ঠিক আমাদের দেশের নৌকার মত নয়। যারা এই রকম নৌকার প্রথম সৃষ্টি করে, তারা বোধ হয় কিউবিষ্ট ছিল, তাই নৌকার গায়ের রেখাগুলি বক্র নয়, সব সরল রেখা। জোড়গুলো সব কোণাকৃতি। সেকালের চীনা পাথরের নৌকার এই রকম ছবি দেখেছি।

সমস্ত হংকং শহরটাই পাহাড়ের উপর। রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠে শহরটাকে অনেক তলা দেখায়। সিঙ্গাপুরে যেমন টিপি টিপি পাহাড় এ সেরকম নয়, মস্ত উঁচু পাহাড়। দার্জিলিঙে কার্ট রোডে দাঁড়িয়ে জলা পাহাড় যেমন উঁচু দেখায় হংকঙের একতলার রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাথার উপরের পাহাড়ের চূড়া তার চেয়ে উঁচু দেখায়। লঞ্চ থেকে নেমেই আমরা টমাস কুকের আপিসে হেঁটে গেলাম। বিদেশে বেড়াতে বেরোলে এই সব আপিসের সঙ্গে সবার আগে দেখা করা দরকার বলে বোধ হয় অধিকাংশ জায়গাতেই ঘাটের কাছেই এদের আস্তানা। জাহাজ থেকে এদের সাইনবোর্ডটা দেখা যায় না, কিন্তু লয়েড ট্রিষ্টিনো প্রভৃতি অনেক বড় বড় আপিসের নাম জাহাজ বন্দরের মাঝখানে আসতেই দেখা যায়। টমাস কুকের বাড়ীটার নাম কুইন্‌স্ বিল্ডিং এবং বোধ হয় ওই রাস্তাটার নাম কুইন্‌স্ রোড। এই রাস্তায় এবং আশেপাশে এক একটা বাড়ী ভীষণ উঁচু সাত-আট তলা। পাহাড়ে দেশে হালকা বাড়ীই মানুষে করে ভাবতাম, কিন্তু হংকঙে ঠিক তার উল্টো মনে হল। এই সব বাড়ীর পিছন দিক সমুদ্র থেকে দেখা যায়, মনে হয় যেন পায়রার খোপের কি মৌমাছির চাকের মত অসংখ্য ঘরকাটা।

নূতন দেশে এলেই সর্ব্বপ্রথম পয়সার সমস্যা এ এক বেশ মজা! যতবারই জাহাজ থেকে নাম্‌বে ততবার পুরানো টাকা পয়সা সব বদ্‌লে নূতন করে নিতে হবে, এবং নূতন মুদ্রাগুলির মূল্য মুখস্থ করে রাখ্‌তে হবে না হলে কাকে যে কি দিচ্ছি কিছু হিসাব থাক্‌বে না। মনে মনে নাম্‌তা পড়তে পড়তে এবং টাকা আনা সেণ্ট ডলার ইয়েন সেন পাউণ্ড শিলিং করতে করতে

প্রাণান্ত। ডলার আবার নানা রকম, চীনা ডলার, সিঙ্গাপুরী ডলার, আমেরিকান ডলার।

কুইন্‌স্ রোডে বড় বড় অনেক দোকানপাট আছে। কিছু চীনা জিনিষ কেনবার ইচ্ছায় টমাস কুকের এক জন চীনা ভদ্রলোককে একটা ভাল দোকানের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলে দিলে আমরা সেই দিকে চললাম। রাস্তায় পা দিয়েই চীনাম্যানের ভিড় দেখে কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। ম্যাপেতে চীন দেশ দেখে কল্পনায় তার সম্বন্ধে নানা রকম বেশ ভাবা যায়। কিন্তু সশরীরে মাটির দেশের উপর ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারি পাশে খালি শত শত চীনা দেখলে কেমন যেন নিজেকে নিজে এবং চীনকে চীন বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বিলেত দেশটা মাটির" গানটা মনে আসে। এমন বেশী বাস্তব এবং আধুনিক ভাবে চীন দেশ দেখলে তাকে চীন মনে করতে মনটা একটু ইতস্তত করে। অবশ্য, হংকং ইংরেজের চীন সে-কথা ভুললে চলবে না। যাই হোক্, পথে খানিকটা হাঁটতেই আমাদের কল্পনার চীনের নমুনা কিছু কিছু চোখে পড়তে লাগল। এখন আর মনে হচ্ছে না যে কলকাতার বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের পালিশ-করা সংস্করণরা অকস্মাৎ দলে দলে চৌরঙ্গীতে ছাড়া পেয়েছে এবং ভারতীয়দের কে রূপার কাঠি ছুঁইয়ে সব ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। চৈনিক শিশুর পাল সর্ব্বপ্রথম আমাদের সচকিত করে তুলল। যত ভারী ভারী গাল, খাঁদা নাক আর ছোট ছোট হাত পা নিয়ে কপালের উপর চুলের জাফরি কেটে মোটা মোটা পোষাক পরে ছেলে আর মেয়ের পাল "মামা" "মামা" করে ছুটেছে। তাদের বক্তব্য যে তাদের হাতে হাতে একটা করে পয়সা দিতে হবে। আমাদের সঙ্গিনী ক্যানেডিয়ান মহিলা একটা পয়সা এক জনকে দিতেই আর যায় কোথায়? পাইড পাইপার অব হ্যামলিনের বাঁশীর স্বরে যেমন সারা শহরের কুচোকাচা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি যেন কুইন্‌স্ রোড-নিবাসী সব চীন সন্তানসন্ততিরা পয়সার লোভে আমাদের পিছনে জুটে গেল। তাদের মোটা মোটা হাত আর হাসি হাসি মুখ দেখতে ভারি মজার। ক্যানেডিয়ান মহিলা অনেক পয়সা গচ্চা দিয়ে কোন রকমে মুক্তি পেলেন। তাঁর দশা দেখে আমি ভয়ে একটা পয়সা দিলাম না, শেষে হয়ত পঞ্চাশ জনে ছেঁকে ধরবে।

পথের ধারে চীনা মারা পিঠে নাদুসনুদুস খোকাখুকী বেঁধে খবরের কাগজ বিক্রী করছে। তারা অবশ্য কলকাতার মত "নায়ক, বসুমতী, এক পয়সা বাবু" বলে চীৎকার করছে না। তারা দিব্যি ফুটপাথের থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আরামেই কাগজ বিক্রী করছিল, ছুটোছুটি নেই। আমি যত জনকে খবরের কাগজ বিক্রী করতে দেখলাম সবাই স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যবসাটা ভাল।

আমরা কলকাতায় দুরকম পুরুষ চীনা দেখি, এক দল একটু বেশী সাহেব সাজা, আর এক দল গলাবন্ধ কোটের উপর বিলাতী হ্যাটপরা। কিন্তু মেয়েদের যা দেখি, সবই এক সনাতন কালো পাজামা, কালো কুর্ত্তি আর লম্বা বেণী। খোঁপাও অবশ্য দু-চার জন বাঁধে সামনের চুলটা যথাসাধ্য পিছনে টেনে। সিঙ্গাপুরে প্রথম বারে দুই-তিন ঘণ্টায় যত চীনা মেয়ে দেখলাম সবই একরকম কৃষ্ণ পাতলুনা। কিন্তু হংকং ফ্যাসানেবল শহর, তার নাগরিকাদের বেশভূষা সম্পূর্ণ ই প্রায় অন্য রকম। শহরের পথ কালোয় কালোয় অন্ধকার নয়, বেশ রঙের খেলা আছে। অল্পক্ষণের জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে কিংবা পথে হেঁটে যত পুরুষকে দেখলাম তাদের কারুর ছাই ও কালো ছাড়া পোষাক দেখি নি। বোধ হয় এটা অভিজাতদের পাড়া বলে অন্য রং বেশী চোখে পড়ে নি। আমরা ফেরবার সময় সাংহাই থেকে যত চীনা আমাদের জাহাজে ডেক-প্যাসেঞ্জার হয়ে উঠেছিল তারা কিন্তু সকলেই ঘন নীল জোব্বা পরা।

হংকঙের ঘাটে নৌকায় যে মেয়েরা দাঁড় টানছিল তারা সকলেই কালো পায়জামা ও কোর্ত্তাধারিণী কিন্তু কুইন্‌স্ রোডের পথে ধনী কি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েই ভিড় বেশী। তারা নানা রঙের দামী দামী রেশমী পোষাক পরেছে। এত রঙ যে শহর বেশ ছবির মত দেখায়। সবাই যে খুব ধনী তা নিশ্চয় নয়, কারণ তা হলে পায়ে হেঁটে বোধ হয় পথে বেড়াত না। মেয়েদের পোষাকে রঙের যতই বাহার থাকুক, এত সরু যে রেখায় সুষমার একান্ত অভাব। গোড়ালী পর্য্যন্ত সরু লম্বা কোটের মা।

চীনা কফিন

এত সরু যে দুই দিকে পায়ের পাশে প্রতখানেক করে চেরা না থাকলে হাটতে পারত না। আমাদের দেশে যেমন বাবুদের পাঞ্জাবীর দুটো পাশ চেরা, এদের মেয়েদের পোষাকও সেই রকম চেরা। কিন্তু চওড়াতে পোষাকগুলি একটা পাঞ্জাবীর প্রায় অর্দ্ধেক। এই রকম পোষাক প'রে মেয়েরা ওঠা-বসা করলে মোটেই ভদ্র দেখায় না। যারা মোজা পরে না, তাদের আরও বিশ্রী দেখায়। কুইন্‌স্ রোডে ভ্রাম্যমাণা সুন্দরীদের সকলেরই বব-করা চুল, ঠোঁটে লিপষ্টিক এবং অনেকের পায়ে দারুণ হাই-হিল জুতা। বেশীর ভাগ মেয়ের জুতার কিন্তু হিল একেবারেই নেই, নাগরা জুতার মত চ্যাপ্টা এবং রেশমের কাপড়ে রঙীন রেশমী ফুলতোলা, গড়ন ডেক-শু-এর মত। এখানে দেখলাম 'ফার্' দেওয়া ওভার-কোটের ঘটা খুব বেশী। কলকাতায় এক সময় ইংরেজের ভারতীয় রাজধানী ছিল, কিন্তু এখানে ত কোন দিন চৌরঙ্গীর পথে এত হাই-হিল, ববড্-চুল, লিপষ্টিক এবং ফার্-কোট শোভিতা বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না। সে হিসাবে আমাদের মেয়েদের চেয়ে এদের অনেক বেশী ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন মনে হয়। এ-শহরে পা-বাঁধা জুতা বোধ হয় আজকাল আর কেউ পরে না। চীন-নন্দিনীদের চুল সব একেবারে সোজা, কপালে ঝালর ও পিছনে ছাঁটা চুল এ-রকম সোজা চুলে একেবারেই মানায় না। ক্বচিৎ দুই-এক জনের কোঁকড়া চুল চোখে পড়ে। সেগুলি বোধ হয় কলে কোঁকড়ান।

আমাদের দেশে আধুনিক কলকাতার পাড়াতেও এত মেয়ের ভিড় পথেঘাটে নেই যেমন এখানে দেখলাম। পথে সঙ্গীর হাতের ভিতর হাত গুঁজে মেয়েরা চলেছে, হোটেলে দল বেঁধে পুরুষ-স্ত্রী খাচ্ছে, দোকানেও দলে দলে মেয়ে।

এখানে বড় বড় সাহেবী ধরণের দোকানপাটেও সব নামধাম আইন-কানুন ইংরেজীতে লেখা নয়, ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে চীনা ভাষাতেও লেখা রয়েছে। আমাদের দেশে খাঁটি বাঙালীদের ফ্যাশনেবল্ বাংলা দোকানেও কিন্তু ইংরেজী ছাড়া অন্য অক্ষর দেখা যায় না।

কুইনস্ রোড প্রভৃতি রাস্তায় খুব মোটা মোটা থামের উপর ফুটপাথ-ঢাকা বারান্দা। এই থামগুলি নানা রঙের চীনা অক্ষরে একেবারে ছাওয়া, উপরে আড় ভাবেও অনেক চীনা সাইনবোর্ড। তার ফলে সমস্ত পথই বেশ সুচিত্রিত মনে হয়। বড় বড় সিনেমার বিজ্ঞাপনে রাস্তাঘাট কদাকার করে তোলার তুলনায় এই রকম অক্ষরমালায় সজ্জিত পথে যে কতখানি শ্রী আছে দেখলেই বোঝা যায়। গহনা কিনতে যাবার আমাদের প্রয়োজন ছিল না, তবু দেখবার জন্য একটা দোকানে গেলাম। গহনার দোকানে জেডের গহনা আর হাতীর দাঁতের গহনার খুব আধিক্য, রূপা ও সোনারও কিছু দেখা যায়, কিন্তু তার সঙ্গেও নীল সবুজ জাতীয় স্ফটিক গাঁথা খুব। এদেশে নীল রঙের উপর বোধ হয় লোকের খুব টান। অবশ্য, আমরা দুই-তিনটা মাত্র দোকান দেখে মত প্রকাশ করছি; অন্যত্র আর কি আছে জানি না। হাতীর

দাঁতের কাজ এখানে প্রসিদ্ধ, কত মূর্ত্তি, খেলনা, কৌটা, গহনা, ছুরি, কাগজকাটা যে হাতীর দাঁতের তৈরি বলবার নয়। চীনেদের সুতা ও রেশমের সূচিশিল্প যে প্রসিদ্ধ তা ত সকলেই জানে। আমরা খুব ভাল কাজ বেশী দেখবার সুযোগ পাই নি, অল্পস্বল্প দেখেছি। রেশমের উপর হাতে আঁকা ছবি এখানে জলের দরে বিক্রী হয়। তবে দর করতে না জানলে যথেষ্ট ঠকতে হয়। চীনেরা শুধু যে কলকাতায় দর করে তা নয়, স্বদেশে অনেক স্থলে দুই-তিন গুণ দাম বলে সুরু করে। আমরা কিছু জিনিষ কিনে পরে জানতে পেরেছি।

আধুনিক সত্যিকারের চীনার চেয়ে চীনা পুতুলগুলি দেখতে বেশী সুন্দর। দুধারে টিকিবাঁধা, পাজামা পরানো, জরির কোমরবন্ধ-দেওয়া খোকা, উঁচু ঝুঁটি-বাঁধা জোব্বা-পরা সুসজ্জিতা মহিলা, লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো সব আসল সেকেলে চীনা মূর্ত্তি। দেখলেই নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিদেশে বেরলে এত জিনিষই নিতে ইচ্ছা করে যে সব নিতে হলে ফেরবার পয়সাটা থাকে না। গোটা-তিনেক দোকান ঘুরে আমরা একটু শহরে বেড়াব ঠিক করলাম। দোকানদারদের একজন টেলিফোন করে মস্ত একটা মোটর গাড়ী নিয়ে এল। আমরা চার জন ছিলাম, দোকানদারও আমাদের সঙ্গে উঠে পড়ল। গাড়ীর ভাড়া তার যা খুসী ঠিক করল। গাড়ীটা বাজারের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে উপরের রাস্তায় উঠতে লাগল। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য; চীন দেশের লোকসংখ্যা অগুন্তি যে বলে, তা একটা শহর দেখে স্বীকার করতে হল। পৃথিবীতে এত চীনে যে থাকতে পারে সহজে বিশ্বাস হয় না। বড় বড় রাস্তার দুই পাশ দিয়ে সরু সরু গলি পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়েছে। সেখানেও দোকানপাট পথচারী নাগরিক নাগরিকার ভীড় লেগে রয়েছে। মনে হয় যেন কি একটা উৎসবের দিনে সারা শহর জুড়ে মেলা বসেছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, পথে পথে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ে রাত্রির রহস্যময় রূপ আর উৎসবমত্ততা যেন আরও বেড়ে উঠল। বন্ধ গাড়ীতে পথ খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা, যেন স্বপ্ন দেখছি, চীনরাজকুমারী বেদুরার দেশে অকস্মাৎ ভ্রমণে এসেছি।

মন্দির, বাজার, গলি; অনেক উপরে হংকঙের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী। লোকটি বলল, সাত বছর আগে এই সব বাড়ী শেষ হয়েছে। আমরা দু-মিনিটের জন্যে নামলাম। ভারি সুন্দর জায়গা, এক দিকে প্রশস্ত পথের নীচে দৃষ্টি নেমে যায় গভীর অতল সমুদ্রের বুকে, আর এক দিকে পাহাড়ের উঁচু চূড়া চাঁদের আলোয় প্লাবিত হয়ে আছে। পাহাড়ের মাথা সেখান থেকে অনেক উপরে। আমাদের সেই মাথা পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে বলে আমরা তখুনি আবার গাড়ীতে উঠে পড়লাম।

চূড়ায় উঠবার মোটর ছাড়া ট্রাম পথও আছে। অনেকে সিডান-চেয়ারে করে ওঠে। আমরা সামান্য সময়ের জন্য এসে যা পেলাম তাই ধরেই যেতে বাধ্য হলাম। এই রাজপথটির দুধারেই যেরকম মোটা মোটা পাথরের পাঁচিল-ঘেরা ভারী ভারী বাড়ী তাতে সন্ধ্যা বেলায় সব জড়িয়ে হংকংটাকে একটা বিরাট দুর্গ মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি করে জমি অনেক জায়গায় সমুদ্রের উপর ঝুঁকে রয়েছে। তার উপর হোটেল প্রভৃতির ভাল ভাল বাড়ী। অবশ্য, এ-সবই বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ানদের। উপর দিকে এক জায়গায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ লেখা রয়েছে। হয়ত সমর বিভাগ, কি গবর্ণমেণ্ট-হাউসের পথ হবে।

পৃথিবীর মধ্যে হংকঙের মত সুন্দর ও ভাল বন্দর কমই আছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে সন্ধ্যায় এর সৌন্দর্য্য সব চেয়ে সুন্দর দেখায়। এতটা যে আশ্চর্য্য সুন্দর হতে পারে দেখবার আগে বুঝতে পারি নি। প্রায় দশ বর্গমাইল ব্যাপী এই বন্দর জুড়ে অসংখ্য বাণিজ্য-জাহাজ, নানা দেশীয় যুদ্ধ জাহাজ, চীনা শাম্পান, ষ্টীম-লঞ্চ, ডিঙী নৌকা মালবোঝাই গাধাবোট, লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বেলে আকাশের তারার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। দূর থেকে মাল-বোঝাইয়ের চীৎকার, দালাল ও কুলীদের নোংরামি চোখে কানে কিছু আসে না, মনে হয় যেন নীরবে দীপান্বিতার উৎসব চলেছে। উপরে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়

গ্রানাইট পাথর ও সবুজ গাছের মাথা রহস্যময় হয়ে উঠেছে, নীচে স্থির নীল সমুদ্রের বুকে চন্দ্র তারা ও দীপের আলো মিশে আর এক কুহক সৃষ্টি করেছে। সহজে মানুষের চোখ নড়তে চায় না।

আমরা ঘুরে যাবার পথে পাহাড়ের গায়ে ঘুমন্ত মৎস্যজীবী পল্লীর উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। সেখান থেকে হংকং বন্দরের সমারোহ চোখে পড়ে না। জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্নের মত অস্পষ্ট একটু সমুদ্র আর উপরে কুঁড়েঘরের স্তূপীকৃত অন্ধকার ছায়া দেখা যায়। মাঝে মাঝে মিট্ মিট্ করে দুই-একটি আলো জলছে। ভোর হবার আগেই এরা তিন-চার পালের নৌকা সাজিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বে।

হংকং একটি দ্বীপ, এত শীঘ্র একে দেখে শেষ করা যায় না। আমরা হুড়োহুড়ি করে নেমে একটা বড়
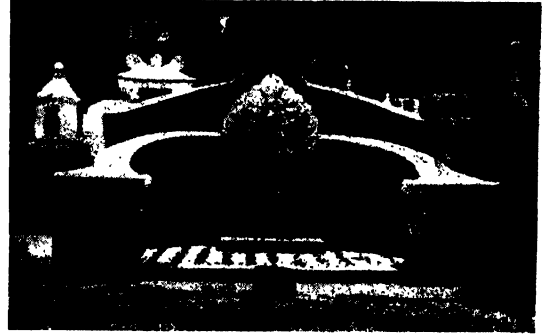
চীনের সমাধিক্ষেত্র

হোটেলে আনারসের মত মোটা মোটা চিংড়ি মাছ আর ভাত খেয়ে সত্যি সত্যি দৌড়ে গিয়ে কোনরকমে লঞ্চ ধরলাম। অনেক বছর এত জোরে দৌড়াই নি। তখন লঞ্চ ছাড়তে এক মিনিট বাকী।

লঙ্কাদ্বীপে বিজয়সিংহ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত

জয়পতাকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সাদা নিশান বাঁধা আমার জীবন-শলাকা,
উঠিয়ে দিলুম সেই সুদূরে যেথায় বলাকা
যাচ্ছে উড়ে ডানার তালে,
পরশ দিয়ে গগন-ভালে,
সাতটি ঘোড়ার স্বর্ণধূলে রঙীন্ পাখা,
উড়্‌ল যেন আকাশ জুড়ে জয়পতাকা।

দেহ আমার ভূমির উপর লুটিয়ে থাকে,
পঙ্কধূলা ঢুকেছে ঢের মনের ফাঁকে,
মাটির 'পরে নড়ানড়ি,
রাত্রিদিনে গড়াগড়ি,
ভিতর থেকে লুকিয়ে কে যে আড়াল ক'রে রাখে,
ধূলো যখন পুঞ্জ হয়ে ডাকে ঝড়ের হাঁকে।

ঝর্ণা যখন ছুটতে থাকে বন্যার টানে,
সে কি তখন শিলানুড়ির বাঁধন মানে,
মৃদু নাদের গানের কলকল,
নেচে-যাওয়া পায়ের ছলছল,
পাহাড় ফাটে পাথর কাটে বজ্র হানে,
বাধার বুকে যায় সে ছুটে সাগরপানে।

রাত্রিশেষের অন্ধকারে আগুন ঢালো,
তেল না থাকে বজ্র দিয়ে প্রদীপ জ্বালো,
শিথিল শিরা উঠুক দুলে,
রক্তধারার রঙীন্ ফুলে,
দিগঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ুক বুকের আলো,
দগ্ধ হবে হিসাব করা মন্দ ভালো।

আজকে যদি দুঃখ পেয়ে টনক্ নড়ে,
দুঃখেরে নে আদর দিয়ে মাথায় ক'রে,
পড়্‌বে যাহা পড়ুক না তা,
ছিন্ন ঝুলির পুঁজিপাটা,
কাঁচা মনের কাঁচা জীবন হাতে ক'রে,
নূতন কালের নূতন জীবন নে না গড়ে।

শিক্ষা নিবি সদ্য কাঁচা পাতার কাছে,
শুন্‌বি রে পাঠ মুকুলভরা আমের গাছে,
অশথ গাছের জীর্ণ ছালে,
ফল হবে না কোনও কালে,
গাঁথবি রে তোর মোহনচূড়া তাজা গাছের মাথে,
আলো যখন ঝিক্‌মিকিয়ে পড়বে তাদের পাতে।

মাটির ফাঁকে থাকে যদি থাক না রে তোর মূল,
সেখান থেকে আকাশ ফেড়ে উঠুক না তোর শূল
ঝড় যদি রে উচ্চে হাঁকে,
মেঘে যদি বজ্র ডাকে,
ভাবনা করা চলবে না রে ঘটুক যত ভুল
এম্‌নি ক'রে পেতে হবে কূলহারাদের কূল।

চীনের পক্ষীয় একটি সার্চ্চলাইট ব্যাটারী

উত্তর সান্‌শী প্রদেশে জাপানের বিরুদ্ধে
চীনের কম্যুনিষ্ট সেনাদল

চীনের কম্যুনিষ্ট সেনাদলের নায়ক চু-টে (দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয়); তাঁহার দক্ষিণে যথাক্রমে জনৈক
মার্কিণ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও চীনের কম্যুনিষ্ট-নায়ক মাও সে-টুং।

সাহারা। মরুস্থলীর মধ্যে 'তাঘিত' ওয়েসিস। এই মরূদ্যান মানুষের অসীম শ্রমের একটি নিদর্শন

সিরিয়া, ওরন্ত নদীতীরের গ্রাম

সিরিয়া, রসদবাহী দল

ত্রিপলি, কারামানলি মসজিদ

লিবিয়া, সমাধি-মন্দির

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলার একটি মহকুমার প্রধান শহর। এখন ইহার পরিচয় এই প্রকার। কিন্তু বিষ্ণুপুর প্রাচীন শহর। যখন 'বাঁকুড়া' নামটা অজ্ঞাত ছিল, যখন বাঁকুড়া জেলা গঠিত হয় নাই, তখনও বিষ্ণুপুর জনসমাজে পরিচিত ছিল। ইহা মল্লভূম সামন্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত, কোম্পানীর আমলে, ইহা অর্দ্ধ-স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন ছিল। ইহার প্রাচীন শাসনপ্রণালীর বহু প্রশংসা আছে। ইহার প্রাক্তন সমৃদ্ধির চিহ্ন এখন বিশেষ কিছু নাই। বাঁধ নামে খ্যাত কয়েকটি বৃহৎ সরোবর আছে, তাহাও বহু পরিমাণে মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন দুর্গের দু-একটি সিংহদ্বার আছে, এবং মৃৎপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ আছে। কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে। অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত যে-সকল ছোট ছোট মাটির মূর্ত্তি তাহার প্রাচীরগাত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি এখনও ভাল অবস্থায় আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রবাসীতে তাহার ফোটোগ্রাফিক চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। মন্দিরগুলির স্থাপত্য প্রশংসনীয়। যে-কয়টি কামান এখনও আছে, তাহার মধ্যে 'দলমাদল' ("দলমর্দ্দন") বিখ্যাত। বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বিষ্ণুপুর চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। ইহার কোন কোন প্রাচীন শিল্প এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

বাংলা দেশের অনেক পুরাতন শহর এখন শ্রীহীন। বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বগৌরব না-থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ শ্রীহীন হইয়া যায় নাই। অন্ততঃ এখন এখানে নূতন জীবনের, নবজাগরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

—

বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ষট্‌ত্রিংশ অধিবেশন বিষ্ণুপুরে গত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে হইয়া গিয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় ও ইহার সাধারণ কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদিগের উদ্যোগিতা ও কর্ম্মিষ্ঠতায় অধিবেশনের বন্দোবস্ত তাহা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আনুষঙ্গিক একটি কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাহার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গত ২৭শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুর গিয়াছিলাম।

সম্মেলনের মণ্ডপ খুব বড় করা হইয়াছিল। যেখানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান পূর্ব্বে দুর্গের মধ্যে ছিল। যাঁহারা বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অন্যান্য স্থানের অধিবেশন দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহা এই সম্মেলনের বৃহত্তম মণ্ডপ। আগে আগে কংগ্রেসের জন্য যেরূপ মণ্ডপ প্রস্তুত হইত, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য যত বড় মণ্ডপ হইয়াছিল, ইহা তদপেক্ষা বৃহৎ—বোধ হয় ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের মণ্ডপের চেয়েও বড়। তাহা আমি দেখিয়াছিলাম। নিজের জেলার বড়াই করিবার জন্য এ-কথা বলিতেছি না। বলিতেছি ইহাই বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য যে, আজকাল দেশের লোকদের, সাধারণ লোকদেরও, মধ্যে সার্ব্বজনিক বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল এত বাড়িয়াছে, যে, এখন আগেকার মত ছোট মণ্ডপে কৌতূহলী সব মানুষের জায়গা হইতে পারে না। তাহার আরও একটি কারণ, নারীরাও এখন সার্ব্বজনিক বিষয়ে কৌতূহলী ও আগ্রহী হইয়াছেন। কৌতূহলী ও আগ্রহীদিগের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় কর্ম্মী পাওয়া যাইতেছে।

মণ্ডপ যেরূপ বৃহৎ হইয়াছিল, শ্রোতার সমাগম তদনুরূপ হইয়াছিল কিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি না; কারণ, প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পরই আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। আশা করি, জনসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। খবরের কাগজে সেইরূপ পড়িয়াছি।

মণ্ডপে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠের বক্তৃতাও মণ্ডপস্থিত দূরতম শ্রোতারও

কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত ধ্বনিবিবর্দ্ধক যন্ত্র বসান হইবে, শুনিয়া আসিয়াছিলাম। অনেক প্রসিদ্ধ নেতার সমাগম হইয়াছিল! আশা করি, সকল শ্রোতাই তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতে পাইয়াছিলেন। মণ্ডপের যে মঞ্চে সভাপতি ও নেতৃবর্গের স্থান হইয়াছিল, তাহা বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের দ্বারা দুর্গসিংহদ্বারের ও অন্য চিত্র দ্বারা এবং রঞ্জিত শোলার ফুল মালা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল।

প্রতিনিধিদের আহারনিদ্রা-আদির ব্যবস্থা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা উত্তম! তাঁহাদের ব্যবহার্য্য জল যোগাইবার জন্য দুটি নলকূপ খনন করিয়া তাহাতে দমকল বসান হইয়াছিল। বহু নিমন্ত্রিতের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইলে বাঁকুড়া জেলায় শালপাতা ব্যবহৃত হয়। শুধু ভাত লুচি তরকারি নহে, বিষ্ণুপুরে শালপাতার এরূপ পাত্রও তৈরি হয় যাহাতে ডাল এবং নানাবিধ তরল পানীয়ও রক্ষিত হইতে পারে। এই সমুদয়েরও আয়োজন দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

সম্মেলনের অধিবেশন-স্থান শহর হইতে কিছু দূরে। রাত্রে প্রতিনিধি ও দর্শকদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য শহর হইতে অধিবেশন-স্থান পর্য্যন্ত রাস্তা উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত হইয়াছিল। প্রতিনিধি ও দর্শকদিগের সুবিধার জন্য এবং অন্য সকল প্রকার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্বেচ্ছাসেবিকা ও স্বেচ্ছাসেবকেরা সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়ের অভিভাষণ সুচিন্তিত এবং সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ইহাতে তিনি বিষ্ণুপুরের গৌরবময় ইতিহাস, বাংলার শোচনীয় অবস্থা, কংগ্রেস ও কৃষকসংঘ, আদর্শসংঘাত, অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অবসান, পল্লীসংস্কার-প্রহসন, শাসকমণ্ডলীর অভিনব রূপ, কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলি, গণ-আন্দোলনে মনোবৃত্তি, গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রভৃতি, এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ—প্রধানতঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করেন।

ভারতীয় আদর্শ ও প্রতীচ্য আদর্শের সংঘাত সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

প্রেমমূলক ভারতীয় কৃষ্টি, প্রতীচ্যের দাবীমূলক গণ-আন্দোলনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতের বৈশ্যঋষি সত্যসেবক মহাত্মা গান্ধী গণ-আন্দোলনকে ভারতীয় কৃষ্টিধারায় প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে যে ব্যাপকতা দিয়াছেন তাহার রূপ সন্দর্শনে জগৎ মুগ্ধ। প্রতীচ্যের আন্দোলন-আদর্শের তীব্র সংঘাতে আমরা আদর্শচ্যুত হইতে পারি, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ থাকিলেও আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রতীচ্যের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাদৃষ্টি রক্ষা করিয়া আমাদিগকে দুই আদর্শের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। ভারতীয় গণ-আন্দোলন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের গণ-আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া চলিতে না পারিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিবে।

আমাদের দেশ পল্লীগ্রামপ্রধান। দেশের উন্নতি করিতে হইলে পল্লীগ্রাম-সমূহের উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেস এ-বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অনেক আগে হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীগ্রাম-সমূহের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তাঁহার কাজ বৈদেশিক সহৃদয় সাহায্যে হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, কংগ্রেস তাহার কার্য্যতালিকায় এই জিনিষটিকে স্থান দেওয়ায় এ-বিষয়ে বাঙালীরা যে আগেকার চেয়ে বেশী করিয়া কথা বলিতেছেন, তাহাও মন্দের ভাল। কাজও সরকারী ও বেসরকারী প্রভাবে কোথাও কোথাও হইতেছে।

রাধাগোবিন্দ বাবু এ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। যেমন—

আমাদের শহরমুখী ভাবকে পল্লীমুখী করিতে হইলে পল্লীর সংবাদের বিস্তৃত প্রকাশের আয়োজন করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে পল্লীকর্ম্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাদৃষ্টি জাগ্রত করিতে হইবে। জেলাবোর্ড ও আইন-সভার সভ্যবৃন্দের গৌরবের উপর পল্লীকর্ম্মীবৃন্দের উচ্চতর গৌরবের স্থান প্রদান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সংবাদপত্রসমূহ যদি পল্লীর সংবাদ ও ত্যাগী পল্লীকর্ম্মীদের কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশ এবং তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি বাহির করিয়া তাঁহাদের কাজ জনসাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচারের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পল্লী-সংগঠনকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। সংবাদপত্রের প্রচারও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

পল্লীগ্রামসমূহের সমুদয় জনহিতকর কার্য্যের বৃত্তান্ত

প্রকাশ করা শহরের বড় বড় কাগজগুলিরও কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং প্রথম প্রথম তাহা সম্ভবপরও হইতে পারে। কিন্তু পল্লীসংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের কাজ সকল জেলার (সকল না হইলেও) বহু গ্রামে চলিতে থাকিলে সমুদয় বৃত্তান্ত মুদ্রিত করা বৃহত্তম কাগজের পক্ষেও সম্ভবপর না হইতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক জেলার ও মহকুমার কাগজগুলির এই কাজটি করা উচিত। শহরের দৈনিক ও সাপ্তাহিক গুলি হইতে পৃথিবীর নানা দেশের, ভারতবর্ষের ও বঙ্গের নানা খবর সংগ্রহ করিয়া ছাপা সহজ। তাহাদের কোন কোন প্রবন্ধ উদ্ধৃত করাও সহজ। আদালতের নিলামের বিজ্ঞাপন ছাপিলে ত লাভই হয়। কিন্তু যে কাজটি শহরের কাগজে অল্পপরিমাণেই হয় এবং অধিক পরিমাণে মফস্বলের কাগজেই হইতে পারে, তাহা মফস্বলের কাগজগুলিকেই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম হয়ত তাঁহাদের ব্যয়ই বাড়িতে পারে, কাটতি না-বাড়িতে পারে। কিন্তু কালক্রমে কাটতিরও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

—

"বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ"

কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বন্দেমাতরম্ সংগীতের প্রথম দুটি কলি গাইবার বিধি দিয়া বাকী সমস্তটি গাওয়া নিষেধ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অভ্যাসবশতঃ দুটি কলি অতিক্রম করিয়া আর একটি পংক্তি গাইবামাত্র তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং থুড়ি দিয়া আবার কেবল দুটি কলি গাওয়ান হয়! কংগ্রেসের হুকুম তামিল করা কংগ্রেসী সব প্রতিষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু হুকুম সত্ত্বেও বাংলা দেশের হিন্দুদের মনের ভাব কংগ্রেসী হিন্দুরাও প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় তাঁহার অভিভাষণে এ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী বাঙালীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন কতিপয় তথাকথিত মুসলমান-নেতাদের যুক্তিহীন ইঙ্গিতে হিন্দু-মুসলমান-মিলনপ্রয়াসী কংগ্রেস নেতৃবর্গের এইরূপ আচরণ হিন্দু বাঙালীকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিয়াছে। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমগ্র ভারতবর্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতির নির্দ্দেশে এই পূত সঙ্গীতকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের শীর্ষদেশে স্থান দিয়াছে—'বন্দেমাতরম' শব্দটিকে দেশসেবার মহান্ শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই পবিত্র শব্দ ভারতের জনসাধারণের হর্ষ-উল্লাস, শোক-দুঃখ, তেজবীর্য্য প্রকাশের তূর্য্যধ্বনিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এহেন অপার্থিব সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান নায়কগণ যেন বঙ্গমাতা তথা ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ভাবে আচ্ছন্ন মুসলমান ভাইগণ হিন্দু ভাইদের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বঙ্গমাতা যে অঙ্গহীন হইয়াছেন—ইহা কি তাহারই দ্যোতক?

কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা কামনায় যে সমস্ত ত্যাগী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ৪০ বৎসর কাল দেশসেবা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কখনও কাহারও মনে এই সঙ্গীতের ভিতর মূর্ত্তিপূজার দোষ স্পর্শ করে নাই।...ভোটের জোরে একটা জাতির প্রাণে শেল নিক্ষেপ করা যে কত নিষ্ঠুরতা, তাহা বাঙালী অনুভব করিতেছে।

অঙ্গচ্ছেদ করিয়াও এই পবিত্র সঙ্গীতকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে মাত্র। এই গীত জাতীয় গীতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে জানিয়াও জাতীয় মহাসভার উদ্বোধন-সঙ্গীত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুরের কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

কিছুদিন হতে "বন্দেমাতরম্" নিয়ে বিরোধের আর এক অছিলা খাড়া হয়েছে। দেশ-প্রীতির প্রকাশক হুঙ্কার হিসাবে "বন্দেমাতরম্"-এর তুলনা নাই। এই কয়টি শব্দ যেখান থেকেই নেওয়া হোক, প্রকাশ-শক্তি ও ধ্বনি-মাধুর্য্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই জাতীয় জীবনে এই মন্ত্র অক্ষয় হয়ে থাকবে। সমগ্র গানটি জাতীয় সঙ্গীত-রূপে গৃহীত হওয়ার বিরুদ্ধে, সভা-সমিতির পরিমিত সময় হিসাবে, এক দৈর্ঘ্য ভিন্ন আর কোনও আপত্তি উঠতে পারে, এ মনে আসে নাই। কিন্তু আপত্তি এসেছে। জোট রাখতে হ'লে আপত্তি খানিকটা মেনেই চলতে হবে। সুশিক্ষায় গোঁড়ামি নষ্ট হয়। দেশের লোককে শিক্ষিত করার কষ্ট স্বীকার না করলে তাদের অসংস্কৃত আবেগের আঘাত সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতা

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিষ্ণুপুর অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব তাহার ভাষা। তিনি চলতি বাংলায় নিজের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তিনি নিজের হৃদগত ভাব অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসী দলের দোষক্রটির উল্লেখ করিতে

তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলিয়াছিলেন—সেবকের দুর্গম পথ, দেশের দুর্দ্দশা, দেশের কাজে 'ভদ্রলোকে'র দান, ভ্রাতৃবিরোধ, অন্তবিরোধ, দেশসেবকের লাঞ্ছনা, ইংরেজের অবস্থা ও মনোভাব, মহাত্মার আহ্বান, দেশের লোকের মনোভাব, জনগণের দুরবস্থা, ইংরেজের ভরসা, কংগ্রেসের সাধনা, কংগ্রেস কি চায়, বাংলার কংগ্রেস, কংগ্রেসে মুসলমান, অন্ত্যজ দেশের সাধনার কথা, ভাগবাঁটোয়ারার সমস্যা, 'বন্দেমাতরম্' সমস্যা, দেশসেবকদের শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমান, দেশ স্বাধীন হবেই, কাজের ফর্দ।

যতীন্দ্র বাবুর অভিভাষণের অংশগুলি প্রায়ই পরস্পর সংলগ্ন। তথাপি কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

অশিক্ষিত অজ্ঞ নিদারুণ দারিদ্রে ভরা এই দেশ। কংগ্রেস এত দিন তাদের শুধু জনকয়েকের কানে জপেছে ধোঁয়াটে অস্পষ্ট স্বাধীনতার নাম। বেশীর ভাগেরই কানে তাও পৌঁছে দিতে পারে নাই। সে স্বাধীনতার মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, তাতে তাদের অন্নবস্ত্রের অভাব কি ভাবে ঘুচবে, তা তারা স্পষ্ট করে বোঝে নাই, শুনেছে স্বদেশী করলে দেশের টাকা দেশে থাকে, হয় তো বা থাকে, হয় তো দেশের কেউ কেউ তাতে ধনী হয়। সে দেখে ধনী মিল মালিকের বাড়ীতে কোঠার উপর কোঠা ওঠে, সে কোঠায় বিজলী বাতি জ্বলে। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? তাতে তো তার সাপে-ভরা ভাঙা ঘরের আঁধার ঘোচে না। মিলের অংশীদার স্বদেশী কাপড়ের দোকানদার, টাকা জমায়। গরীব নিজের দায়ের সময় তাদের কাছে চড়া সুদের হারে সে টাকা ধার করে। দিন চলে না, দেনা শোধ হয় না। ধনীর কাছে মাথা নুইয়ে থাকে। তার সম্বোধনে, তুই তোকারি! ধনীর বাড়ীতে এলে তার বসার আসন চট, বস্তা—বড়জোর এক টুকরা তক্তা। সে সব সয়েও ধনীর বেগার দেয়, ফুট ফরমাস খাটে! ভরসা, যদি সুদ কিছু কম নেয়—দয়া হয় না, হয় নালিশ। আইনের জোরে তার শেষ সম্বল চাষের জমি বাস্তুভিটা বিকিয়ে যায়। সে কেন করতে যাবে স্বদেশী, কেন শুনবে সে তোমার স্বাধীনতার গালভরা গল্প? সর্ব্বহারা দিনমজুরী করে নুন ভাত খায়। রোজ কাজ জোটে না। জুটলেও তার আজুবার উঠতি পড়তি আছে। যুদ্ধে গেলে তার চড়া আজুবারও তিনগুণ সে নিয়মিত পাবে। বেঁচে ফিরে এলে পেনসন পাবে, ম'লে পরিবার মোটা টাকা পাবে। "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্?" এ লোভ দেখালে ইংরেজ লোকও পাবে। তারা তাকে বাইরেও বাঁচাবার জন্য তার হয়ে লড়বে, ভারতেও তার আসন অটল রাখার জন্য নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করার জন্য তৈরি হয়ে থাকবে। অশিক্ষিত গরীবের দোষ কি? সরকারী চাকরি পেলে নেয় না এমন শিক্ষিত যুবক গরীবের মধ্যে কেন, মধ্যবিত্তের মধ্যেও কম।

এই বিপদের বেড়া আগুনের মধ্যে পড়েও ইংরেজের এই সাহস। এই বলে বলীয়ান হয়েই সে এখনও তার অর্ডিনান্স তুলছে না। গান্ধীজীকে তুচ্ছ করতে পারছে, কংগ্রেসকে গ্রাহ্য মাত্র করছে না। সে যেন বলছে, চালাও পানসী রোখে কে? রুখবে তুমি? তুমি ভারতের কংগ্রেস? তোমার বেশীর ভাগ সদস্যের মনের খাতা খতিয়ে দেখ—সেই পূর্ব্বপুরুষের গরীব-মারা ভদ্দরলোকীভাবে ভরপুর। তোমার সদস্যগণ আর তাদের আত্মীয় বন্ধুগণ জমিদার জোতদার মহাজন বণিক মিলমালিক রূপে, তোমারই দেশের গোবেচারা গরীবগুলিকে পায়ের তলায় চেপে রেখে তিল তিল ক'রে ছিঁড়ে খাচ্ছে; আমরা জাতি হিসাবে শক্তিশালী বড় জাতি, তোমরা পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে অপাংক্তেয় অন্ত্যজ, তোমারে আমরাও এই ভাবে রাখবো, এমনি করেই তোমাদের দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করবো। পারো, প্রতিকার করো।

এই কথার জবাব দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করছে কংগ্রেস। কংগ্রেস ত্রিশ বছরের বেশী কাল আমলাতন্ত্রকে হিতোপদেশ দিয়েছে, যুক্তি দেখিয়েছে, ন্যায়ের তর্ক শুনিয়েছে। অনুনয় বিনয় মিনতি ব্যর্থ হয়েছে। সমালোচনা করেছে, কড়া কথা শুনিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত অভিমানের ভঙ্গীতে অসহযোগের চেষ্টা করেছে। শক্তিহীন ভারতের কংগ্রেস শেষ পর্য্যন্ত তার অভিমানের বিশুদ্ধতাও রক্ষা করতে পারে নাই। বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর স্পর্দ্ধিত ভ্রূভঙ্গীর দু'একটি রেখা পরিবর্ত্তিত হলেও ভারত-সংসারে তার ঘরকন্নার ব্যবস্থায় এখনও তারই জিদ বহাল রয়েছে। ভারতাত্মার বৃহত্তর অংশ এখনও তার মোহিনীমায়ামুগ্ধ। তাই ভারতের কংগ্রেসকে সে অভিমান সম্বরণ করতে হয়েছে। অসহযোগ যাপ্য অবস্থায় রাখতে হয়েছে, মন্ত্রীত্ব স্বীকার করতে হয়েছে।

অনন্যকর্ম্মা দেশসেবকের সংখ্যা আমাদের দেশে কত কম, তাহা যতীন্দ্র বাবু দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

আই. সি. এস. ও তাদের সমপদস্থ লোক সাড়ে একত্রিশ শো। এতে জেলা-প্রতি আই. সি. এস.-এর সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে দশ জনেরও বেশী। থানায় থানায় কাজের লোক হিসাবে, আর আর লোক না ধরে যদি দারোগা পর্য্যন্তও ধরা যায় তবে প্রতি থানায় অন্ততঃ, দুজন করে আমলাতন্ত্রের পক্ষের চলনসই লোক আছে। কংগ্রেসের দিক দিয়ে থানা-প্রতি দূরের কথা, জেলা-প্রতি, অনন্যকর্ম্মা সেবক কজন করে আছে তা আপনারা ভেবে দেখুন।

অনন্যকর্ম্মা সেবক, আর তাঁদের সঙ্গে আর পাঁচটা কাজের অবসরে যাঁরা কংগ্রেসের কাজ করেন, তাঁদের দিয়ে মাঝে মাঝে দেশের কিছু কিছু জায়গায় কংগ্রেসের কথার আলোচনা হয়। এ অবস্থায় দেশের সকলের কাছে কংগ্রেসের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সব কথার আলোচনা অসম্ভব। প্রতিবৎসর কংগ্রেসের মহাধিবেশনে যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলিও পল্লীর উল্লেখযোগ্য লোকের কাছে, মোটামুটিভাবে উপস্থিত করবারও লোক নাই—তাই সবুর করতেই হবে।

কিন্তু লোক মজুত আছে, খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু অনন্যকর্ম্মা সেবকদের সকলের ত যথেষ্ট সঙ্গতি নাই। কেহ কেহ একেবারেই নিঃসম্বল। তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের দিন-গুজরান কি প্রকারে হইবে? এ-বিষয়ে যতীন্দ্রবাবু বলেন—

কংগ্রেস থেকে বেতনভুক্ সেবক নিয়োগের ব্যবস্থা হোক। সেবকের পক্ষে দরকারমত বেতন গ্রহণে অপমানবোধ প্রচ্ছন্ন দম্ভজনিত অপরাধ। গবর্ন্মেণ্টের চাকরি করে দেশকে পরাধীন রাখার সহায়তায় বেতন নিলে যদি অপমান না হয়, তো নিজের দেশ স্বাধীন করার উদ্যমের প্রতীক কংগ্রেসের হাত থেকে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়স্বরূপ বেতন গ্রহণ কখনও অপমানকর হ'তে পারে না।

আমাদেরও মনে হয়, অনন্যকর্ম্মা সেবক যথেষ্টসংখ্যক পাইতে হইলে তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যয় দেওয়া আবশ্যক। ইহা দেওয়া ও লওয়া নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহাতেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে। দারিদ্র্য এরূপ ব্যাপক হইয়াছে, শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা এত অধিক, যে, সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে এমন অনেকে কাজ করিতে রাজী হইতে পারেন যাঁহারা হয়ত দেশসেবার প্রেরণা অন্তরে অনুভব করেন নাই। তবে, এক বার কাজে লাগিলে এমন লোকও মজিতে পারেন।

—

"গবর্ন্মেণ্টের চাকরি ক'রে দেশকে পরাধীন রাখার সহায়তা"

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "গবর্ন্মেণ্টের চাকরি ক'রে দেশকে পরাধীন রাখার সহায়তায় বেতন নিলে" ইত্যাদি। সরকারী চাকরি করিলে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দেশকে পরাধীন রাখিবার সহায়তা করা হয়, ইহা সত্য কথা। ইহাও সত্য, যে, সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে যিনি যত কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎ ও কার্য্যদক্ষ তাঁহার দ্বারা এই সহায়তা তত বেশী পরিমাণে করা হয়। কারণ, এইরূপ লোকদের কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে, ইংরেজ রাজত্ব ভাল, অর্থাৎ দেশটা পরাধীন থাকা মন্দ নয়।

কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎ, কার্য্যদক্ষ ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অনুকূলেও দু-একটা কথা বলিবার আছে। তাঁহাদের কাজের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়, যে, ভারতীয় লোকেরা রাষ্ট্রীয় নানাবিধ ছোট বড় কাজ করিতে সমর্থ। ইহা সত্য, যে, স্বরাজ সকল দেশের সকল জাতির জন্মস্বত্ব। কিন্তু বিদেশী শাসকেরা বলুক বা না-বলুক, মনে করে, যে, যেমন অকর্ম্মণ্য জমিদারদের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আবশ্যক, সেইরূপ অকর্ম্মণ্য জাতিদের জন্য বিদেশী শাসন আবশ্যক। ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজের দ্বারা প্রমাণ হয়, যে, আমরা অকর্ম্মণ্য নহি। এবং দেশের হিতও তাঁহারা কিছু করেন।

ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যে, পরোক্ষভাবে যাহাই ঘটুক, সরকারী কর্ম্মচারী মাত্রেই যে দেশের পরাধীনতা চান, ইহা সত্য নহে। আমরা জানি তাঁহারা অনেকে পরাধীনতার বেদনা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ঐতিহাসিক বহি (যেমন রমেশচন্দ্র দত্তের, বামনদাস বসুর) এবং কাহারও কাহারও ঐতিহাসিক উপন্যাস নাটক কবিতা গান (যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের, ভূদেবের, চণ্ডীচরণ সেনের, রমেশচন্দ্র দত্তের, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের) পরাধীনতাবেদনার ও স্বাধীনতালিপ্সার উদ্রেক করে।

—

বিষ্ণুপুরে প্রদর্শনী

বিষ্ণুপুরে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আনুষঙ্গিক যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রবাসীর সম্পাদক বাঁকুড়া জেলার (বোধ হয়) বৃদ্ধতম সাংবাদিক বলিয়া তাঁহাকে এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিতে বলা হইয়াছিল। এই কাজটি করিবার পর তাঁহাকে একটি বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

আমরা এই বক্তৃতায় ইংরেজদের লেখা ইংরেজী বহি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ শুধু কৃষিজীবী কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না, পণ্যশিল্পের ও নানা পণ্যদ্রব্যের জন্যও ইহা বিখ্যাত ছিল। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, ভারতবর্ষেই তাহা বা তাহার অধিকাংশ উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইত। সেকালকার সভ্য পাশ্চাত্য জগতের অভিযোগ এই ছিল, যে, ভারতবর্ষ অন্য দেশ হইতে আগত

সোনা ও রূপা গ্রাস করে, অন্য দেশকে তাহা দেয় না; অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে এই দেশ সোনা ও রূপা পায়, কিন্তু সেই সব দেশ হইতে কোন জিনিষ কিনিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সোনা রূপা দেয় না। ভারতবর্ষের এই যে বহুবিধ পণ্যশিল্প তাহা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানী নিজের রাষ্ট্রীয় শক্তির ন্যায়বিরুদ্ধ অপব্যবহার দ্বারা নষ্ট করে।* পরাধীন ভারতে ভারতীয়দের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য কিছুই বাড়িতে পারে না এমন নয়। কিন্তু যেমন রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার দ্বারা ভারতের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করা হইয়াছিল, সেইরূপ রাষ্ট্রীয় শক্তির সুপ্রয়োগ দ্বারাই তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে। এই জন্য আমাদিগকে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ণস্বরাজ লাভ করিতে হইবে, এবং ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বরাজ-লব্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

পূর্ণস্বরাজ আমাদের জন্মস্বত্ব ত বটেই। কি কি কারণে তাহা আবশ্যক এবং আমরা যে পূর্ণস্বরাজের যোগ্য তাহাও এই বক্তৃতায় বলা হইয়াছিল। অবশ্য, এই যোগ্যতা আপেক্ষিক। কোন জাতিই পূর্ণস্বরাজের সম্পূর্ণ যোগ্য নহে, কোন জাতিই সম্পূর্ণ অযোগ্যও নহে।

আমি যখন বিষ্ণুপুরের প্রদর্শনী দেখিলাম, তখনও সকল জিনিষ আসিয়া পৌঁছে নাই, সকল জিনিষ সাজান হয় নাই। যাহা আসিয়াছিল ও সাজান হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর নানাবিধ চিত্র এবং নানা রোগে মৃত্যুর হার প্রভৃতি প্রদর্শক নক্সাগুলি বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত জ্ঞানবান্ ব্যাখ্যাতারা ছিলেন। যে-সকল পুরুষ ও নারী তাঁহাদের ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। অধিকাংশ পঠনক্ষম হইলে—৬।৭ বৎসরের অধিকবয়স্ক সকলে পঠনক্ষম হইলে—এইরূপ চিত্র ও নক্সা বিশিষ্ট পত্রী, পুস্তিকা ও পুস্তক দেশের সমুদয় নগর ও পল্লীগ্রামে প্রচারিত হইতে পারিত এবং তাহার দ্বারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান বাড়িতে পারিত।

প্রদর্শনীতে মহিলাদের নানাবিধ কারুকার্য্য রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের ইহা প্রমাণ। এই শিল্পনৈপুণ্য কি প্রকারে উপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে, তাহা দেশসেবকদের চিন্তনীয়।

—

বিষ্ণুপুরের রেশমশিল্প

বিষ্ণুপুরে প্রস্তুত মহিলাদের রেশমী শাড়ী যত রকম রাখা হইয়াছিল, তাহার পাড়গুলি অতি চমৎকার, কাপড়ের জমিও উৎকৃষ্ট। পুরুষদের পরিচ্ছদের জন্য পুরু ও মিহি উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড়ের থানও দেখিলাম।

—

বিষ্ণুপুরের মল্লভূম লোহার কারখানা

বিষ্ণুপুরের প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া সেখানে যত রকম সংবাদ পাইলাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহজনক সংবাদ এই যে, জ্যাকার্ড তাঁতের অনুরূপ তাঁত বিষ্ণুপুরেই নির্ম্মিত হইতেছে—নির্ম্মাণ করিতেছেন "মল্লভূম আইরন ফ্যাক্টরী" (মল্লভূম লোহার কারখানা)। জ্যাকার্ড এক জন ফরাসী যন্ত্র-উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল ১৭৫২ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার উদ্ভাবিত তাঁতে রেশমী শাড়ীর নানা প্রকার নক্সার ও রঙের উৎকৃষ্ট পাড় বোনা যায়। বিষ্ণুপুরে যাঁহারা এইরূপ তাঁত নির্ম্মাণ করিতেছেন তাঁহারা বলিতেছেন—

বিজ্ঞান-পরিচালিত আধুনিক যন্ত্রযুগে আমাদের দেশীয় কুটীর-শিল্প অনেক ধ্বংস হইয়াছে; কতকগুলি বা মরণের পথে। এমতাবস্থায় কুটীর-শিল্পকে আশু মরণের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে বৃহৎ যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় কুটীর-শিল্পের উপযোগী যন্ত্রই বিশেষ উপযোগী। ইহাতে কর্ম্মের উৎকর্ষ ও তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, অথচ শিল্পিগণ শ্রম-অভাবে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি করে না। এই সমস্ত ভাবিয়া আমরা এই বিষ্ণুপুরের কয়েক জন শিল্পী সমবেত ভাবে "মল্লভূম আইরন ফ্যাক্টরী" নাম দিয়া জ্যাকার্ড মেশিন (তাঁতের আধুনিক কল) তৈয়ারীর একটি কারখানা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ চালাইয়া আসিতেছি। আমাদের কারখানার নিজস্ব মেশিন (তাঁত-কল) অন্য বিদেশী মেশিন অপেক্ষা কার্য্যকারিতায় কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী প্রভৃতি রেশম-তাঁত-বহুল

* "British goods were forced upon her (India) without paying any duty; and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms."—*The History of British India*, by Horace Hayman Wilson, vol. i, p. 385.

স্থানগুলিতে আমাদের তাঁত-কলের আদর খুব বেশী। ইহার প্রমাণ, আজ এই প্রদর্শনীতে আমাদের প্রস্তুত মেশিনগুলিতে যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রবয়নের কৌশল দেখান হইতেছে, তাহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন শ্রীভগবানের কৃপায় ও দেশবাসীর সহানুভূতিতে আমাদের মেশিনগুলি তাঁতী-ভাইদের কিরূপ কাজে আসিয়াছে। অথচ দামে ইহা বিলাতী মেশিন অপেক্ষা সস্তা। এই বিষ্ণুপুর শহরে সিল্কের যে-সমস্ত মনোরম শাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতে যে তাঁত-কলগুলি ব্যবহার হইতেছে, তাহার সকলগুলিই আমাদের কারখানায় প্রস্তুত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ হইতে আমরা এ বিষয়ে প্রশংসাপত্র পাইয়াছি।

এই তাঁত ও তাহার কাজ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল।

—

বিদ্যাসাগর স্মৃতি

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত রচনাদি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। উহার প্রথম ভাগে তাঁহার রচিত সাহিত্য-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এবং তৃতীয় ভাগে সমাজসংস্কার-সম্বন্ধীয় রচনাসমূহ থাকিবে। আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রজত জুবিলি উৎসবের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-সম্পর্কিত পুস্তকগুলি প্রথম ভাগ রূপে প্রকাশিত হইবে।

—

ভারতীয় সাবান-প্রস্তুতকারকগণের অসুবিধা

গত ২৭শে পৌষ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের কক্ষে নিখিল ভারত সাবান-প্রস্তুতকারক সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিদেশীদের প্রতিযোগিতা, "স্বদেশী"র প্রতি দেশের লোকদের অনুরাগহ্রাস প্রভৃতি অসুবিধার কথা বলেন। আচার্য্য রায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

মাল চালানের অসুবিধা সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় শিল্পীদের উপর সুবিচার করেন না এবং মাল চালানের অসুবিধাগুলি উপলব্ধি করিতে রেলওয়ে বোর্ডের অত্যন্ত বিলম্ব হয়। কাঁচা মালের ভাড়া হ্রাস করা অত্যাবশ্যক। তিনি সাবান-প্রস্তুতকারকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান জগতে সমবেত প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক; সুতরাং সাবান-প্রস্তুতকারকগণেরও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া সমবেত প্রচেষ্টার প্রতি অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, তন্মধ্যে নীচে কয়েকটি মুদ্রিত হইল।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি আলোচনা শেষ করিতে অযথা বিলম্ব করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে বহুনিন্দিত অটোয়া চুক্তি বলবৎ রাখিতেছেন, এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে।

ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, গায়ে মাখা সাবানের উপর বর্ত্তমানে যে শুল্ক (শতকরা ২৫৲ টাকা অথবা হন্দরকরা ২০৲ টাকা এই দুই হারের মধ্যে যেটা বেশী) ধার্য্য আছে, জাপান বা অন্য কোনও দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করা হইলে তাহা যেন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়; শুল্কের হার কমান হইলে সস্তা বিদেশী সাবানে বাজার ছাইয়া ফেলিবে।

সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ও সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ তৈল ইংলণ্ড হইতে খুব কম আসে। উহা প্রধানতঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়া থাকে; সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যচুক্তিতে যেন এই সকল পণ্যে তাহাকে শুল্ক-সুবিধা না দেওয়া হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যে-সকল কারখানায় দশ জনের কম লোক কাজ করে, ঐ সকল কারখানায়ও ফ্যাক্টরী আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবে এই সম্মেলন আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, কারণ উহাতে সাবান শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষে সাবান শিল্প প্রধানতঃ কুটীরশিল্প। গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন তাঁহারা ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিতে প্রস্তুত; সুতরাং এই সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে ফ্যাক্টরী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছে; কারণ এই সিদ্ধান্ত উক্ত নীতির বিরোধী।

ট্রেড মার্ক রেজিষ্টার করণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবেন জানিয়া এই সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

রেলওয়ে বোর্ড যে ভাড়া সম্পর্কে কিছু সুবিধা দিয়াছেন আর একটি প্রস্তাবে তজ্জন্য রেলওয়ে বোর্ডকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং আরও সুবিধা দাবী করিয়া মালগাড়ীতে ন্যূনপক্ষে সাত সের মাল চালান দেওয়ার সুবিধা দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

—

অপমানকর জাপানী জুলুম হজম

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স নানাবিধ সাংঘাতিক ও অপমানকর জাপানী জুলুম হজম করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশ এরূপ অপমান করিত না, করিলেও তাঁহারা সহ্য করিতেন না। প্রবলের কাপুরুষতা এই প্রকারে প্রকাশ পায়।

—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের চিত্রপ্রদর্শনী

গত মাসে কলিকাতায় ভারতীয় প্রাচ্যকলা-পরিষৎ ভবনে শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত মোট ১৯২টি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল—সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নহে।

প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল চিত্রগুলির অঙ্কণরীতির ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। মণীন্দ্র বাবু বালক-অবস্থায় শান্তিনিকেতনে ছাত্র থাকার সময় তাঁহার শিল্পানুরাগ পরিস্ফুট হয় ও তখন হইতেই তিনি চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। পরে যখন শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি বি-এ পরীক্ষার্থী হইয়াও পরীক্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না-করিয়াই উৎসাহভরে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে কলাভবনে যোগ দেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থার সেই শিল্পোৎসাহ কালক্রমে ম্লান হয় নাই, এই প্রদর্শনীটি দেখিয়া তাহা বুঝা গিয়াছিল।

আধুনিক কালে ভারতীয় শিল্পকলার চর্চ্চার পুনরারম্ভের সময় প্রথমে স্বভাবতই শিল্পীদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর দিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক শিল্পীর দৃষ্টি আর উহার অধিক অগ্রসর না-হওয়ায় বঙ্গীয় চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' বলিতে এক বিশেষ ধরণে আঁকা দেবদেবীর চিত্র বুঝায়, ইহাও অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে এবং শিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে শিক্ষালাভ না-করিয়াও তথাকথিত ইণ্ডিয়ান আর্টের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গী (mannerism) গ্রহণ করিয়া অনেকে শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। আমাদের দেশে জন-সাধারণের যদি শিল্প সম্বন্ধে ঔৎসুক্য, সাধারণ জ্ঞান, রসবোধ ও ভালমন্দ বিচার অতিশয় সামান্য না হইত, তবে এই সকল বিকৃতিতে ভয় পাইবার অবশ্য কিছু ছিল না।

শিল্পের বিষয়বস্তুতে আপন পরিবেশের প্রতি এবং দৈনন্দিন জীবন ও দৃশ্যমান জগতের প্রতি উদাসীন না থাকিবার ও অঙ্কণ-পদ্ধতিতে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পদ্ধতি রুচি অনুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উৎসাহ সম্প্রতি আমাদের দেশের অনেক শিল্পী ও তাঁহাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের চিত্রপ্রদর্শনী এই দিক দিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চলতি ধরণে তিনি অনেক ছবি আঁকিয়াছেন; বস্তুত এই প্রদর্শনীরও অনেক ছবি তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়, এইগুলি এখন আর তাঁহাকে আনন্দ দেয় না, বিচারশীল দর্শককেও আনন্দ দেয় না। কিন্তু বীরভূম ও ঢাকার যে দৃশ্যচিত্রগুলি তিনি আঁকিয়াছেন সেগুলি প্রকৃত শিল্পীজনোচিত স্বতঃস্ফূর্তিতে প্রাণময় হইয়াছে। বীরভূম জেলার রুক্ষ পরিবেশ, পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম-অঞ্চলের শ্যামলশ্রী, তাঁহার আনন্দিত তুলিকার বর্ণ-সম্পাতে নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে, ছবিগুলি বাস্তবসম্পর্ক-শূন্য না-হইয়াও মনোহর হইয়াছে।—স

—

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা

মিঃ সী. এফ. এণ্ড্রুজের পৌরোহিত্যে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে যে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, নানা কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে বাঙালীদের মনে ঔৎসুক্যের ও একাত্মবোধের অভাব, এই অপবাদ সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও অনেকাংশে সত্য, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অন্যপ্রদেশীয়েরা বাঙালীর প্রতি সদয়মনোভাবসম্পন্ন কি না, সে আলোচনা এখানে করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অখণ্ড ঐক্যের কথা বিস্মৃত হইয়া আমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক অতীতে অ-বাঙালীদের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়াছি, একথা ঠিক। রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ও কর্ম্মে, সামাজিক উন্নতি-প্রচেষ্টায়, শিল্পকলায় ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই আধুনিককালে অগ্রণী হইয়াছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠতাভিমান আমাদিগকে অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে। গত কয়েক বৎসর সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে কোণঠাসা হইয়া থাকায় এই অভিমান এখন বাহিরে সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু ইহার মূল নষ্ট হয় নাই। সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে অন্যপ্রদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বাঙালীদের কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টার অন্যতম কারণও আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ।

সাহিত্যের কথা ধরা যাক। বাংলা সাহিত্য শ্রেষ্ঠ, অতএব অন্য প্রদেশের লোকেরা ইহা পড়িবেই, আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের যেন কোন খোঁজও লইবার দরকার নাই; তাহাতে ভালমন্দ কি আছে না আছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহলবোধ পর্য্যন্ত নাই।

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা-উৎসব
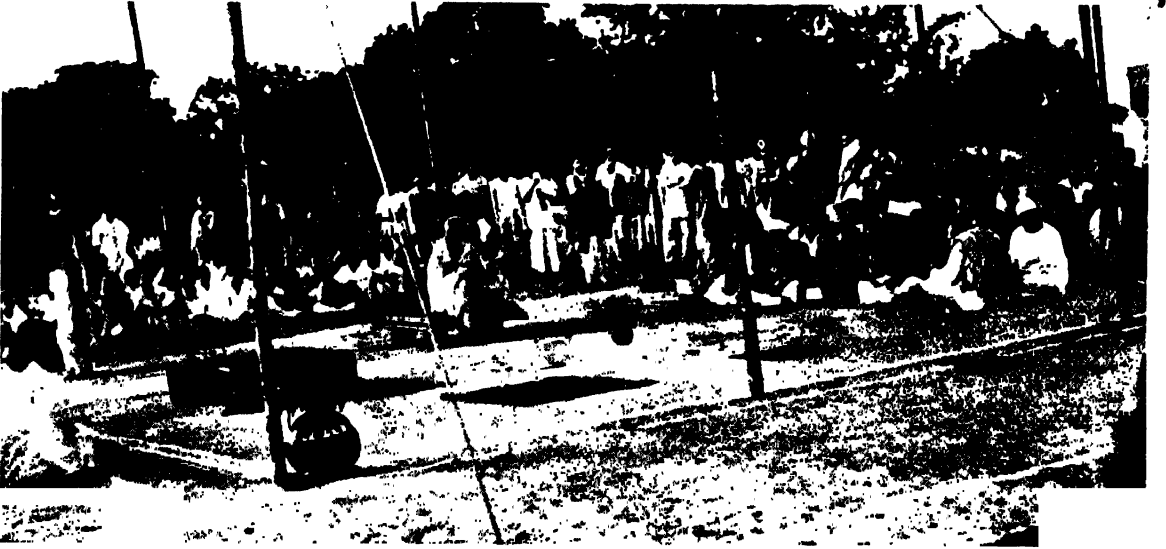
হিন্দীভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথ

বদরীনাথ

কেদারনাথের যাত্রী

গোধূলি রাগিণী

অন্দর

বাঙালী গ্রন্থকারদের বহু রচনা ভারতীয় অন্যান্য বহুভাষায় অনূদিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্য প্রদেশের আধুনিক গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন আলোচনা তেমন হয় নাই। এমন হইতে পারে, যে, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ বা সংকলনের যোগ্য আধুনিক গ্রন্থাদি যথেষ্টসংখ্যক নাই। কিন্তু সে-কথাটা আমরা আলোচনাদ্বারা পরখ করিয়া ততটা দেখিয়াছি কি না সন্দেহ, যতটা অনুমান করিয়া বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

তার পর বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র আচার-ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি-অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও আমাদের ঔদাসীন্য যথেষ্ট।

একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ আমাদের অজ্ঞতা সামান্য বিষয় ও দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়াও পরিস্ফুট। বিভিন্ন স্থানের ভাষাপার্থক্য অনুসারে কংগ্রেসের স্বকীয় নির্ব্বাচন-ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহ বিভক্ত, এবং ভবিষ্যতে সরকারী বিভাগেও এই ভাষাপার্থক্য অনুসারে প্রদেশসমূহের বিভাগ অনেকে চান। কিন্তু আমাদের মধ্যে সুশিক্ষিত অনেকেও অবগতই নহেন, যে দক্ষিণ-ভারতে তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মলয়ালম প্রভৃতি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত এবং ঐ সমস্ত ভাষাগত-ভাবে তাঁহারা অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন; আমাদের অনেকের কথায় মনে হয়, তাঁহারা সকলেই 'মান্দ্রাজী' এবং তাঁহাদের সকলের ভাষাও 'মান্দ্রাজী', যদিও মান্দ্রাজী বলিয়া কোন ভাষা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে আসন দিয়াছেন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহে এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিয়া কোন কোন বাঙালী প্রতি বৎসর উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন। অন্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন অন্য প্রদেশের ভক্তদের বাণী ও জীবন সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করিয়া ও শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মা গান্ধীর পুস্তকাবলী বাংলায় অনুবাদ করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত যোগাভিলাষীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তুলসীকৃত রামায়ণের কয়েকটি অনুবাদ আগেই হইয়াছিল, শিখদিগের 'জপজী' প্রভৃতির অনুবাদও হইয়াছিল।

বাঙালীরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই কাম্য মনে করি। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে উদাসীন ও অবজ্ঞাশীল থাকিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন কখনও সম্ভব নহে। বাংলাকে অন্য প্রদেশের নেতৃত্ব করিতে হইলে ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে, শ্রেষ্ঠত্ববোধের দ্বারা নহে।

হিন্দীকে আমরা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানিয়া লই বা না-লই, হিন্দী সাহিত্য উন্নত হউক বা না-হউক, একথা ত সত্য যে হিন্দী ভারতবর্ষের একটি প্রধান লোকসমষ্টির ভাষা। এজন্য হিন্দীভবন সুপরিচালিত হইলে, এবং ইহার কার্য্যক্রম বাঙালী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সুপরিব্যাপ্ত হইলে ইহা দ্বারা এই পারস্পরিক যোগরক্ষার কাজ অংশতও সুসম্পন্ন হইতে পারে।

—স

—

মফঃসলের কাগজে পল্লী-উন্নয়নের বৃত্তান্ত

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের গত অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতার একটি বক্তব্য অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিয়াছি যে, প্রত্যেক জেলার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের বৃত্তান্ত সেই জেলার খবরের কাগজে বাহির হওয়া আবশ্যক। এইরূপ কাগজ বাহির করিবার ও চালাইবার ভার কে লইবেন? পথপ্রদর্শক কে হইবেন? বাঁকুড়া জেলায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে এই কথাটি উত্থাপিত হইয়াছে। তথাকার উদ্যোগী লোকেরা পথ দেখাইতে পারেন না কি? কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিন্তু উদ্যোক্তা-দিগকে যথেষ্ট পুঁজি লইয়া বসিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে চমকপ্রদ রাজনৈতিক আন্দোলনের মোহ কাটাইতে হইবে। ইহাও বুঝা আবশ্যক যে, যাঁহাদের ঝোঁক বৈপ্লবিক, এরূপ একঘেয়ে আটপৌরে কাজ তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। বিপ্লব-প্রয়াসীরা এরূপ কাজকে বলিবেন সাংস্কারিক ("reformist"), বৈপ্লবিক ("revolutionary") বলিবেন না।

—

কৃষাণ ও শ্রমিকদিগের অসন্তোষ

কৃষাণ ও শ্রমিকদের অসন্তোষ পূর্ব্বে যে ভাবে চলিতেছিল, তাহাতে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, জনপ্রিয় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সহিত উহাও নিবারিত বা প্রশমিত হইয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা না হইয়া বরং উক্ত আন্দোলন যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে উহা যে কেবল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকেই চিন্তান্বিত করিয়াছে তাহা নহে, যাঁহারা দেশের শাসনকার্য্যে কংগ্রেসের সাফল্য দেখিতে চাহেন তাঁহাদিগের অন্তরেও চিন্তা ও উদ্বেগ জাগ্রত করিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর হইতে নিজেদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত কৃষাণ প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা বামপন্থী, বা যাঁহাদিগকে কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত বলা যায়, তাঁহারা উহা আদৌ যথেষ্ট মনে করেন না, এবং এ-বিষয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কেবল সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া কৃষাণ প্রভৃতিদের মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত করিতে পশ্চাদপদ হইতেছেন না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, উগ্রপন্থী বা বামপন্থীদের এই আন্দোলন কৃষাণ প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতিকল্পে যতটা না হউক, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রেণীবিরোধ জাগ্রত করা। কম্যুনিষ্টদের যে ইহাই প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য সে-বিষয়ে লুকাচুরি কিছু নাই, এবং তাঁহাদের কার্য্যাদি দেখিয়া লোকের মনে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উক্ত বামপন্থী নেতাদের আন্দোলন খর্ব্ব করিবার জন্য এমন কি পণ্ডিত জবাহরলালও সাবধানবাণী ঘোষণা করেন যে, উহারা অচিরে নিবৃত্ত না হইলে পার্টি-শাসনের দ্বারা উহাদিগকে সংযত করা আবশ্যক। ইহাতে উক্ত বামপন্থীরাও অসন্তুষ্ট হইয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস-নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন কি-না, সে-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য এক্ষণে কম্যুনিষ্টদের সহিত চরমে যাইতে প্রস্তুত নহেন, সেই জন্য উক্ত কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস ছাড়িয়া গেলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে এক্ষণে উক্ত সংগ্রাম চলিতেছে। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের নির্দ্দেশ মানিতে চাহিতেছেন না। এক দিকে যেমন বামপন্থীরা কৃষাণদের উত্তেজিত করিতেছেন, তেমনই অপর দিকে শ্রমিকদেরও উত্তেজিত করিতেছেন। বিশেষ করিয়া কানপুরে এক্ষণে শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ চলিতেছে, তাহার জন্য উক্ত বামপন্থীদেরই দোষী করা হয়। কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট উহা প্রশমন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এখনও সফল হন নাই। তাঁহারা একাধিক বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পক্ষপাতহীন হইয়া সকল গণ্ডগোলের বিচার করিতে হইবে ও উভয় পক্ষেরই স্বার্থের সামঞ্জস্য করিয়া উহার মীমাংসা করিতে হইবে। দেশে কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর লোকে শান্তি-শৃঙ্খলার যেরূপ আশা করিয়াছিল তাহা না হইয়া দেশে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র অবহিত হওয়া নহে, উহার যথার্থ মীমাংসার ভার নিজেদের হস্তে লওয়া বর্ত্তমান গণতন্ত্রশাসনাধীন লোকদের প্রধান দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বামপন্থীদের মতে চলিলে যে অনিষ্টের সম্ভাবনা সে-বিষয়ে লোককে সচেতন করিয়া দেওয়ার গুরুভারও তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে।

উত্তেজিত শ্রমিক ও কৃষাণদের আচরণে ও আন্দোলনে হঠকারিতা দেখা গেলে কোন গবর্ন্মেণ্টই তাহা বরদাস্ত ও উপেক্ষা করিতে পারেন না বটে; কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দমন প্রতিকার নহে। শান্তিরক্ষা গবর্ন্মেণ্টকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু কৃষাণ ও শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত কেন হয়, তাহাও তলাইয়া দেখিয়া অসন্তোষ ও উত্তেজনার সমুদয় কারণ বিনষ্ট করিতে হইবে।

কারখানার শ্রমিক বলিয়া একটি শ্রেণীর আবির্ভাব ভারতবর্ষে যত দিন হইয়াছে, কৃষাণদের আবির্ভাব ও অস্তিত্ব তাহার অনেক আগেকার কথা। জমির মালিক কৃষাণ (peasant proprietor) বঙ্গে কখনও ছিল কি না, থাকিলে কত দিন আগে ছিল, তাহা এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে। জমিদার ও রায়ত বাংলা দেশে যত দিন আছে, তাহাও দীর্ঘকাল। এই দীর্ঘ কালে রায়তদের দুঃখ-দুর্দ্দশা যাহা হইয়াছে ও এখনও আছে তাহার প্রতিকার চাই। চাষীদের সংখ্যা কারখানার শ্রমিকদের সংখ্যার চেয়ে বেশী। কৃষিক্ষেত্রের ভূমিশূন্য শ্রমিক

ও অল্প জমির চাষীদের অবস্থা কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে শোচনীয়। এই উভয় কারণে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে চাষ যাহাদের উপার্জ্জনের উপায়, তাহাদের অবস্থা কখনই অবহেলার যোগ্য নহে। তাহার উন্নতি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিও অবশ্যই আবশ্যক।

কিন্তু কারখানাগুলি রক্ষা পায় অথচ শ্রমিকদের অবস্থারও উন্নতি হয়,—এই ভাবে চলাই উচিত—বিশেষ করিয়া বঙ্গে, যেখানে বাঙালীরা এখন পর্য্যন্ত অল্পসংখ্যক কারখানাই স্থাপন করিয়াছে।

বঙ্গে যাঁহারা জমিদারের অধিকার বা তথাকথিত অধিকার খর্ব্ব করিয়া রায়তদের অধিকার বাড়াইতেছেন, তাঁহাদের জানা উচিত, জমি সম্বন্ধে ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নহে। সমুদয় জমিকে জাতির সম্পত্তি গণ্য করিয়া তাহার সমষ্টিগত চাষ (collectivization) পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—যেমন রাশিয়ায় হইয়াছে।

—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের গত অধিবেশনে যে প্রস্তাবগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু আর্থিক হিসাবে কয়েকটি প্রস্তাবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যেমন চৌকিদারী ট্যাক্সবিষয়ক প্রস্তাবটির, পাট সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির এবং বাঁকুড়া জেলার বাসন, রেশম, শঙ্খ প্রভৃতি কুটীরশিল্পগুলি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির।

—

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্রধর্ম্মঘটে আপত্তি

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের একটি প্রস্তাব এইরূপ—

এই সম্মেলন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাসমূহকে এই নির্দ্দেশ দেন যে যেন তাঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদের দাবি নিজ নিজ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করেন ও প্রয়োজন হইলে ঐ সকল দাবির উপর মন্ত্রিত্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য এই সম্মেলন সমস্ত কংগ্রেস-কমিটি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন জনসাধারণকে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন :—

(১) ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করা।

(২) শ্রমিক ও ছাত্রদের ব্যাপক ধর্ম্মঘট করা।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই, দেশের স্বাধীনতাও পূর্ণমাত্রাতেও চাই। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রদের ধর্ম্মঘট ঘটানর আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাতে ছাত্রদের অনিষ্টই করা হয়। রাজনীতির জ্ঞান লাভ করা, রাজনীতির চর্চ্চা করা ছাত্রদের নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হওয়া, নেতা হওয়া, নেতৃযশঃপ্রার্থী হওয়া তাহাদের উচিত নহে। তাহারা শতরঞ্চ খেলার ঘুঁটি নহে, যে, নেতারা রাজনৈতিক দাবাখেলায় তাহাদিগকে বোড়ের মত চালাইবেন। বাংলা দেশের ছাত্রেরা যে বিদ্যার্থী হিসাবে অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের চেয়ে বিদ্যাবত্তায় নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছেন, তাহার একটি কারণ অতিরিক্ত রাজনৈতিক হুজুক।

যদি ছাত্রেরা বা নেতারা মনে করেন বিদ্যাবত্তা অনাবশ্যক, তাহা হইলে ছাত্রেরা ছাত্র কেন, ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া পিতামাতার টাকা খরচ কেন করেন? ছাত্রত্ব ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হওয়া বা নেতাদের পোষ্য হওয়াই ত তাঁহাদের পক্ষে উচিত।

সাবালক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোট দিবার অধিকার প্রাপ্তি গণতন্ত্রের একটি লক্ষ্য। সেই আদর্শ অনুসারে সাবালক ছাত্রেরা নিজেদের পথ নিজেরা বাছিয়া লইবার দাবী নিশ্চয়ই করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, কিংবা বেশী পরিমাণে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করিবার অনুমতি প্রতিপালক অভিভাবকদের নিকট হইতে লইতে হইবে, কিংবা নেতৃবর্গের পোষ্য হইতে হইবে। অকপট সরল সত্যের সহিত সমঞ্জসীভূত পথ এই তিনটি।

আমাদের মন্তব্যে রাজনৈতিক নেতারা এবং ছাত্রেরাও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। তথাপি আমরা সেইরূপ নিঃসংশয়েই ছাত্রদিগকে বোড়ে মনে করার প্রতিবাদ করিতেছি, যেরূপ

নিঃসংশয়ে তাঁহাদিগকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াইবার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কি কি প্রস্তাব হয় নাই

প্রদেশের লোকদের মনে যে-যে কারণে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য আছে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীতে মোটের উপর তাহা আছে। কয়েকটি বিষয়ে নাই। যেমন, কংগ্রেস-নেতারা বঙ্গের হিন্দুদের মত জিজ্ঞাসা না-করিয়া, বস্তুতঃ তাহা অগ্রাহ্যই করিয়া, মিঃ জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মানিয়া লইয়া চুক্তি করিতে যাইতেছেন। ইহাতে বাঙালী হিন্দুদের, কংগ্রেসী হিন্দুদেরও, আপত্তি আছে। বিষ্ণুপুর অধিবেশনের আগে দিনাজপুর অধিবেশনে তথাকথিত জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর অধিবেশনে সম্মেলন সে দৃঢ়তা কেন দেখাইতে পারিলেন না?

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের খসড়া সম্বন্ধেও বঙ্গে খুব আন্দোলন হইতেছে, যদিও তাহাতে বঙ্গের কংগ্রেস-নেতারা যোগ দিতেছেন না। বিষ্ণুপুর সম্মেলনের দশম প্রস্তাবে বলা হইয়াছে,

> বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কি রাজবন্দী সমস্যায় কি শ্রমিক প্রশ্ন সমাধানে কি শিক্ষানীতিতে কি সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কি প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে ও অন্যান্য বিষয়ে এবং আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল অনুরূপ যে যে বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে ও তাহাদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

আর একটু খুলিয়া বলিলে ভাল হইত না কি?

—

ইংরেজ ইংলণ্ডে সাম্প্রদায়িক বিষ চায় না

বিলাতী পার্লেমেণ্টের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কক্ষে (হৌস অব কমন্সে) কর্ণেল ওয়েজউড জিজ্ঞাসা করেন, বিদেশে ব্রিটেনের দূত ও মন্ত্রীদের মধ্যে রোমান কাথলিক কয় জন আছেন? পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনী ঈডেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ—

> Members of the diplomatic service are not required at any time to state the church to which they belong. Any such enquiry would, in my view, imply a reversion to the standpoint of religious discrimination happily abandoned in this country for over a hundred years."

মিঃ এণ্টনী ঈডেন বলেন, যে, "দৌত্য ও তদ্বিধ কার্য্যে নিযুক্ত ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে কখনও বলিতে হয় না যে তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন্ শাখার লোক। এরূপ কোন প্রশ্ন করা হইলে তাহাতে ইহাই বুঝাইবে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে বাছবিচারের যে-রীতি সুখের বিষয় এদেশে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আবার ফিরিয়া যাওয়া হইয়াছে।"

মিঃ ঈডেন বলিয়াছেন, "ঐ বাছবিচার ইংলণ্ডে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।" সেই সঙ্গে তাঁহার ইহাও বলা উচিত ছিল, "এবং ইহা আরও সুখের বিষয় যে ব্রিটেনে পরিত্যক্ত এই রীতি ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল ব্রিটিশ গবর্মেণ্টেরই দ্বারা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।" ভারতীয় কোন কর্ম্মচারীকে সরকারী কাজ করিবার সময় কি বলিতে হয় তিনি কোন্ ধর্ম্মের লোক? ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারত-সচিবের কৌন্সিল, প্রিভি কৌন্সিল, বড়লাটের শাসন-পরিষদ, ফেডারেল বিচারালয়, হাইকোর্ট, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত যত লোক যেখানে সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে, সকলের মধ্যেই কোন্ সম্প্রদায়ের লোক কত, কোন্ জাতের লোক কত, সেই প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভা-আদিতে পুনঃ পুনঃ উঠিয়া থাকে বা উঠিতে পারে। সরকার-পক্ষের কেহ কখন এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিব না বলিতে সাহস করেন না, বরং সরকার আহ্লাদের সহিত সোৎসাহে উত্তর দেওয়াইয়া থাকেন। কারণ, আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, ব্রিটিশের যাহা বিষ, ভারতীয়ের পক্ষে তাহা অমৃত।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যেরূপ যোগ্যতা দেখিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়, তাহা তাঁহার যথেষ্ট আছে। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে তিনি যোগ্যতম। সমৃদ্ধ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

কংগ্রেস-সভাপতির মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। দেশের কাজ করিতে গিয়া স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণও তিনি খুব করিয়াছেন। বাংলা দেশ হইতে পনর বৎসর কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। এখন এক জন বাঙালী নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের নানা প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে এক জন বাঙালী নেতা কি ভাবেন তাহা ব্যক্ত হইবার সুযোগ হইল। বাংলা দেশের বিশেষ করিয়া কতকগুলি সমস্যা আছে। সে-বিষয়েও কিছু বলিবার সুযোগ হইতে পারে। সেগুলি সম্বন্ধে সব কথা বলা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কি না এখন বলা যায় না। বঙ্গের রাজবন্দী ও অন্তরিতদের কথা সম্ভবতঃ অনায়াসেই বলা যাইবে। বঙ্গে শিক্ষাসঙ্কোচনের যে অপচেষ্টা, স্বাজাতিক রাষ্ট্রনীতি অনুসারে না-হক্ অপচেষ্টা, হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা হইতেছে, তাহারও উল্লেখ সুভাষ বাবু সম্ভবতঃ করিতে পারিবেন। তবে এই অপচেষ্টা যে হিন্দুদিগকে খাটো করিবার জন্য হইতেছে, তাহা বলা সুবিধাজনক না হইতে পারে। কারণ, কংগ্রেস-রাষ্ট্রনীতির একটা অলিখিত নিয়ম আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, যে, হিন্দুদের সপক্ষে ন্যায্য কোন কথা বলাও নিষিদ্ধ। বঙ্গের হিন্দুদের মত না লইয়া তথাকথিত জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তি কায়েম করিবার যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বিষ্ণুপুরের রাষ্ট্রীয় সম্মেলন করেন নাই। সুভাষ বাবুও সম্ভবতঃ করিবেন না—যদিও বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিনাজপুর অধিবেশনে এই তথাকথিত চুক্তির দৃঢ় প্রতিবাদ হইয়াছিল। ব্যক্তিগত বলিদানও ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রসূত বা সম্মতি অনুসারে হইলে, তবে কোন কথা উঠে না। একটা লোকসমষ্টিকে বলি দিতে হইলে সেই সমষ্টির সম্মতি লওয়া অনাবশ্যক কি না, বিবেচ্য। মনে রাখিতে হইবে, যে, বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে বলি দেওয়া হইলে তাহা ভারতীয় হিন্দুদিগকে বলি দেওয়ার পূর্ব্বাভাষ হইবে। সমষ্টিকে বলি দিবার অধিকার কাহারও নাই ; শক্তিও নাই।

কংগ্রেস ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কি কি প্রস্তাব আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইবে, কংগ্রেসকার্য্যনির্ব্বাহক কমীটির প্রস্তাবগুলি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভারতশাসন-আইনে ভারতীয় ফেডারেশ্যন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, কংগ্রেস তাহার বিরোধী—যদিও কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরোধী নহেন, বরং সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চান। আমাদেরও মত ঐরূপ। গণতান্ত্রিক রীতিতে যুক্তরাষ্ট্রগঠন প্রার্থনীয়।

কংগ্রেস ভারতশাসন-আইনের ব্যবস্থাটার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা করিতে চান, এবং কন্সটিটিউয়েণ্ট এসেমব্লীর (গণ-পরিষদের) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রবিধি ও ভারতশাসনের অন্যান্য বিধি রচনা করাইতে চান। মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার উভয় কক্ষে একটু ভিন্ন রকমের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ সভা ভারতশাসন-আইনের যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপযোগিতা ঘোষণা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, যে, ঐ ব্যবস্থা যেন জোর করিয়া ভারতবর্ষের উপর চাপান না

হয়। পার্লেমেণ্টকে ব্যবস্থাটা সংশোধন করিয়া অন্ততঃ সাময়িক ভাবে অন্য প্রকারের কেন্দ্রীয় শাসনপদ্ধতি জাতীয় নেতৃবৃন্দের ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-সমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া রচনা করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ভারতবর্ষের জন্য আইন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস এই অধিকার স্বীকার করেন না। কংগ্রেসে কিরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হয়, কয়েক দিন পরে দেখা যাইবে।

লর্ড লোথিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন, যে, ভারতশাসন-আইনের সবটা—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসনপদ্ধতিটা পর্য্যন্ত—কিরূপ চলে না-চলে তাহা না-দেখিয়া পার্লেমেণ্ট ভারতশাসন-আইনের কোন প্রকার সংশোধন করিবেন না। তিনি স্বীকার করেন, যে, সরকারী যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাটাতে খুঁৎ আছে, কিন্তু তিনি ভারতীয়-দিগকে ঐ ব্যবস্থাটাই মানিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ চালাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে ব্রিটিশ জাতির জিদটা বজায় রাখিতে হইবে। 'প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্বে'র সরকারী ব্যবস্থাটাতেও খুঁৎ আছে, কিন্তু কংগ্রেস আপাততঃ তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেস যদি শেষ পর্য্যন্ত সরকারী ফেডারেশ্যন ব্যবস্থাটাও আপাততঃ মানিয়া লয়েন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

কংগ্রেস দুই উপায়ে সরকারী ফেডারেশ্যনে বাধা দিবেন ভাবিয়াছেন। (১) যে ছয়টি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্য, সেখান হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবেন না। (২) কংগ্রেসী ছয়টি মন্ত্রিসভার শাসিত প্রদেশগুলি হইতে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের প্রাপ্য ট্যাক্স আদায় করিবেন না। অর্থাৎ এই দুই বিষয়ে তাঁহারা অহিংস অসহযোগ করিবেন। তাহা হইলে ঐ ছয় প্রদেশের গবর্ণরেরাও কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া কন্সটিটিউশ্যন সস্পেণ্ড করিয়া স্বেচ্ছাশাসক হইতে পারেন।

—

দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ফেডারেশ্যন

হায়দরাবাদ ও মহীশূর এই দুটি বড় দেশী রাজ্যের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন; যে, তাঁহারা সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবেন কিনা, সে-বিষয়ে স্ব স্ব প্রজাদের সহিত পরামর্শ করিবেন; কিন্তু একথা বলেন নাই, যে, রাজ্যগুলির প্রতিনিধি প্রজাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হইবে। কংগ্রেস চান, যে, দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রজাদের ঠিক সেইরূপ অধিকার থাকিবে, ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে তথাকার অধিবাসীদিগের যেরূপ অধিকার আছে।

—

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

অশীতি বৎসর বয়সে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের তিরোভাবে বঙ্গদেশ এক জন ভক্তিভাজন ও সুদক্ষ শিক্ষক হারাইল। শিক্ষক হইবার যোগ্যতা তাঁহার সকল দিক দিয়াই ছিল। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য। এই সাহিত্যে তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। যে-সকল পুস্তক তাঁহাকে পড়াইতে হইত, তাহার মধ্যে কঠিনতম পুস্তক ও গদ্য বা পদ্য রচনাগুলির চিন্তা ও ভাবের গভীরতম প্রদেশে তিনি ব্যাখ্যার দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিতেন। আমি আধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমাকে অবস্থাচক্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে পড়িতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুটি কলেজে বাঙালী, ইংরেজ, এংলো-ইণ্ডিয়ান, এবং ইংরেজ নহেন এরূপ ইউরোপীয়, কয়েক জন যোগ্য ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের সকলের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে চাই, যে, গভীর ভাব ও চিন্তার ব্যাখ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কোনও অধ্যাপকের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কোন্ বাক্যে কোন্ শব্দটির ঠিক্ অর্থ কি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে তিনি বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। এই জন্য ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে তিনি প্রায়ই বড় বড় অভিধান দেখিতেন। তিনি মনোজ্ঞ ও বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। যাহা লিখিতেন তাহাতে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইত। কথিত আছে, তিনি এমার্সন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া গ্রিফিথ প্রাইজ পান, তাহার বস্তু ও ভাষার উৎকর্ষ এই সন্দেহের উদ্রেক করে যে, তাহা হয়ত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের লেখার হুবহু নকল। সেই জন্য এমার্সন

সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পুস্তক আনাইয়া দেখা হয় নকল কিনা। কোথাও প্রবন্ধটির কোন অংশ না-থাকায় প্রবন্ধটি পুরস্কৃত হয়। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না। তাহা সীল-করা স্বতন্ত্র খামে ছিল। প্রবন্ধ পুরস্কৃত হইবার পর তাহা জানা যায়।

আদর্শ শিক্ষক হইতে হইলে শুধু জ্ঞান থাকিলে ও শিক্ষাদান-নৈপুণ্য থাকিলেই চলে না। শিক্ষকের চরিত্র নির্মল হওয়া আবশ্যক, এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহা হইতে ছাত্রেরা অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারে। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় এরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

তিনি সুনীতির কঠোর ও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। অন্য দিকে, তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানিতেন তাঁহার হৃদয় কিরূপ কোমল ও পরদুঃখকাতর ছিল, তিনি কিরূপ স্নেহশীল ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি।

সুনীতি ও সুরুচির প্রতি যাঁহাদের সমধিক দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা অনেকে সৌন্দর্য্যের প্রতি বীতরাগ হইয়া থাকেন। হেরম্বচন্দ্র সেরূপ ছিলেন না। প্রকৃতিতে, মানুষে এবং মানুষের রচিত ও সৃষ্ট সমুদয় বস্তুতে, সাহিত্যে চিত্রে স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে, সৌন্দর্য্যের তিনি চির-অনুরাগী ও রসগ্রাহী ছিলেন।
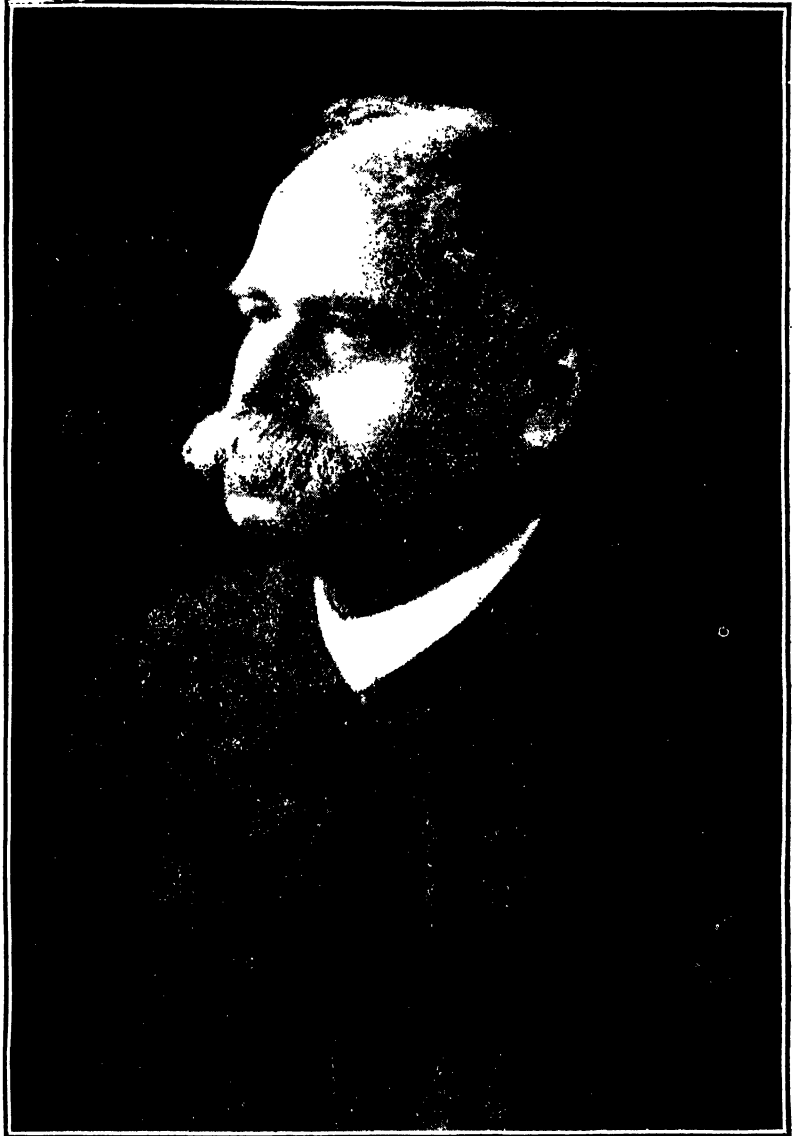
হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

জীবন-ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার-যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা-আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।
নিবিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

২রা মাঘ, ১৩৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। এই কারণে সরকারী শিক্ষাবিভাগে ভাল কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও অন্যায় ও অত্যাচার দেখিলে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ষোল বৎসর পূর্ব্বে, অসহযোগ-আন্দোলনের গোড়ার দিকে, কলেজ ষ্ট্রীট ও হারিসন রোডের মোড়ে কতকগুলা সৈনিককে অকারণ পথিকদিগকে আঘাত করিতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং তাহার ফলে নিজেও লাঞ্ছিত হন। ইহা তখনকার গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশের গোচর হওয়ায় গবর্ণর তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

মৈত্রেয় মহাশয় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। "সঞ্জীবনী"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন। আগেকার আমলের কংগ্রেসে বহুবার প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগ দিয়াছিলেন এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসম্পর্কে প্রায়ই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইত। তাঁহার এই সব বক্তৃতা কংগ্রেসের ভাল ভাল বক্তৃতার মধ্যে পরিগণিত হইত। তাঁহার ধর্ম্ম ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতাগুলি চিন্তার গভীরতা, ভাষার লালিত্য এবং অধ্যয়নের ব্যাপকতার পরিচয় দিত।

তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ মর্ম্মস্পর্শী হইত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, পরীক্ষক, এবং সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভ্যরূপে তাহার সহিত তিনি বহু বৎসর যুক্ত ছিলেন ও তাহার সেবা করিয়াছিলেন। এক বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাত গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থও ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ আদৃত হইয়াছিল।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের দীর্ঘকাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে আমি সম্পাদকতা শিখিয়াছিলাম।

তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি অপরের শোককে নিজের শোক করিয়া লইতেন। পারিবারিক শোক ব্যতীত যে ঘটনা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ দিয়াছিল, তাহা সিটি কলেজের ছাত্রদের বহু বৎসর আগেকার সেই আন্দোলন যাহা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাবে প্রবল হইয়া কলেজটিকে প্রায় বিনষ্ট করে।

তাঁহার অনেকগুলি ইংরেজী রচনা পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। তিনি সবগুলিকে ভাল করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া অনবদ্যরূপে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

—

"বিশ্বপরিচয়"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈজ্ঞানিক পুস্তক "বিশ্বপরিচয়" প্রথম প্রকাশিত হয় গত আশ্বিন মাসে। পৌষে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চারি মাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা দেশে সাধারণতঃ হয় না। এই বহিখানির যে তাহা হইয়াছে, তাহা ইহার উৎকর্ষের পরিচায়ক। ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিবার সময় ইহার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়াছিলাম। এবারেও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রের আকারে ভূমিকা আছে এবং তদ্ভিন্ন, পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার, এই ছয়টি অধ্যায় আছে। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকটি আড়াগোড়া সংশোধিত হইয়াছে। ইহা বালকবালিকাদের জন্য লিখিত হইলেও আমরা ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন বুক অব্ টাগোর" নামক ইংরেজী স্মারক গ্রন্থটির জন্য অনেক বিখ্যাত লোকের রচনা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সংগৃহীতও হইয়াছিল। মনে পড়ে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তখন এই দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অন্য বহু বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিয়াছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নাই। বৈজ্ঞানিক কিছুও এখন তিনি লিখিয়াছেন।

—

বামরাউলীতে রেলওয়ে দুর্ঘটনা

গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী বামরাউলী ষ্টেশনে যে রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা কয়েক মাস পূর্ব্বের বিহ্টা দুর্ঘটনা অপেক্ষাও সাংঘাতিক ও ভীষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনটা বোগি, যাহাতে সাধারণতঃ ২০০।৩০০

বামরাউলী রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বিচূর্ণ বোগি

যাত্রী থাকে, চুরমার হইয়া গিয়াছে, ধাক্কা এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে ট্রেনের সর্ব্বশেষের গাড়ীর গার্ড পর্য্যন্ত মারা গিয়াছে; অথচ রিপোর্ট বাহির হইয়াছে যে মোটে সাত জন লোক মারা পড়িয়াছে। এই কারণে নানা প্রকার গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল রেলওয়ের লোকেরা বা সরকারী অন্য লোকেরা তদন্ত করিলে সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ দূর হইবে না, বেসরকারী বিশ্বাসযোগ্য লোকদের সহযোগে প্রকাশ্য তদন্ত হইলে তবে লোকে সেই তদন্তের রিপোর্টে বিশ্বাস করিবে।

—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার বয়স মোটে ৬২ হইয়াছিল। সুতরাং আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, বাঙালী পাঠকদের এই আশা ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পান, তাহার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে অতঃপর তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করিয়া কিছু উপন্যাস লিখিবেন। অনেকের সেইরূপ উপন্যাস দেখিবার আগ্রহ ছিল।

তাঁহার ঔপন্যাসিক খ্যাতি যে ইউরোপে পৌঁছিয়াছে, তাহা এগার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জানা ছিল না। সেই সংবাদ প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বাহির হয়।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার রমঁ্যা রলাঁর সহিত জেনিভার নিকটবর্ত্তী ভিল্‌নভ্‌ গ্রামে প্রবাসী-সম্পাদকের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিয়ুতে ইংরেজী "লেটার্স ফ্রম দি এডিটার"এ এবং প্রবাসীতে "সম্পাদকের চিঠি"তে বাহির হয়। ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের ৮ নং চিঠিতে লেখা হইয়াছিল, "আমরা অবগত হইলাম, রলাঁ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম।" (প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৫০ ।)

শরৎবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখন হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিতও ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসম্মান লইবার জন্ম যখন তিনি ঢাকা যান, আমাকে তখন একটি কাজে ঢাকা যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার ছাত্র অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ছিলেন। ঐ বাড়ীতে এক দিন অনেকের নিমন্ত্রণ হয়। আচার্য্য রায় ও শরৎবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। শরৎবাবু প্রথম কি প্রকারে আচার্য্য রায়ের নিকট পরিচিত হন, তখন গল্প করিয়াছিলেন। তাহা আমার অস্পষ্ট মনে আছে। শরৎবাবু বলিলেন, অনেক বৎসর আগে (যখন বোধ হয় তাঁহার চুল পাকে নাই এবং বয়স বাস্তবিক যাহা তাহা অপেক্ষা কম দেখাইত), তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। রায় মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়াশুনা কি কর ?" (আচার্য্য মহাশয় বোধ হয় তাঁহাকে পোষ্ট-গ্রাড়ুয়েট কোন ক্লাসের ছাত্র মনে করিয়াছিলেন)। এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎবাবু জানাইলেন যে তিনি পড়াশুনা কিছুই করেন না। তাহাতে আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এর মধ্যেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ ?" তখন শরৎবাবুর যে বন্ধু তাঁহাকে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ইনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" তাহা শুনিয়া আচার্য্য রায় তাঁহার যে যে বহি পড়িয়াছেন তাহার সম্বন্ধে নিজের মত বলিতে লাগিলেন।

শরৎবাবুর সহিত আমার এক বার মাত্র কিছু দীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল। তাহা লিখিয়া রাখি নাই, এবং আমার স্মৃতিশক্তি আগেকার মত নাই। সামান্ত কিছু মনে আছে। তিনি ঢাকা হইতে উপাধি লইয়া ফিরিবার পথে যে ষ্টীমারে আসিতেছিলেন, আমিও সেই ষ্টীমারে আসিতে-ছিলাম। তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন হইতে গল্প করিতে
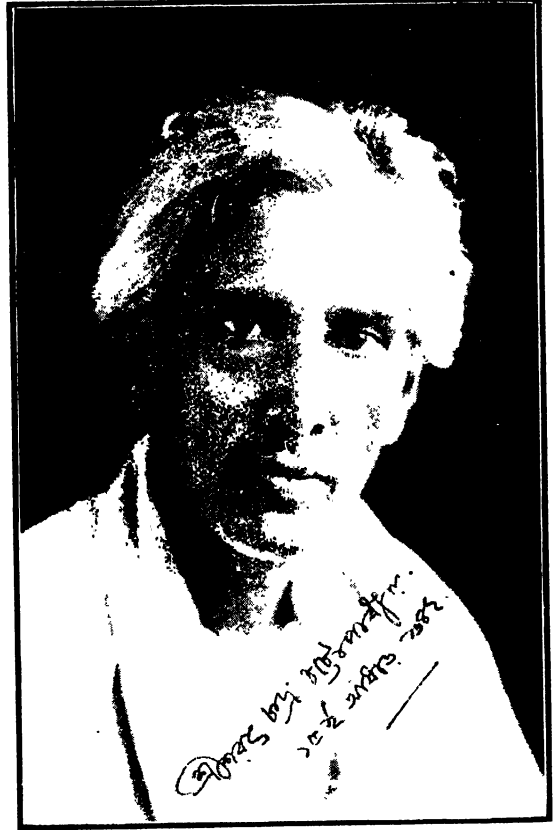
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আসিলেন। একটি যুবক তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার ভাইয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। ভাইটির কোন বৈপ্লবিক অভিযোগে কারাদণ্ড হইয়াছিল। শরৎবাবু বৈপ্লবিক সহিংস কার্য্যে সংশ্লিষ্ট যুবকদের খুব একটা বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের জন্য খুব উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহারা যাহাতে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের নদী বাহিয়া সেই অঞ্চলের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ লক্ষ্য করিতে করিতে চিন্তাশীল হিন্দুরা আসিলে তথায় হিন্দুর আপেক্ষিক সংখ্যা যে কমিতেছে, তাহা স্বতই মনে হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন চিন্তা হইতে কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু যুবক-যুবতীদের বিবাহ কঠিনতর হইতেছে, এই কথাও উঠে। তাহা হইতে কথাটা এই দিকে গড়ায় যে আজকাল বিবাহিত দম্পতিদের আগেকার মত

বহু সন্তানসন্ততি হয় না। তাহার নানা কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম, "সভ্য" সমাজে সন্তানসংখ্যা হ্রাসের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ও বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা তাহার প্রচার শরৎচন্দ্র নিন্দনীয় মনে করিতেন।

জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানার স্বতন্ত্র অট্টালিকা বিচিত্রা নামে পরিচিত। সেখানে আগে মধ্যে মধ্যে সাহিত্যিক আলোচনা হইত। একবার মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে শরৎবাবুও তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় এক পায়ের উপর আর এক পা তুলিয়া দিয়া দু-একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা কি, সামান্য মনে আছে; কিন্তু ঠিক্ মনে না-থাকায় লিখিলাম না।

—

অনশনে হরেন্দ্রনাথ মুন্‌শীর মৃত্যু

ঢাকা জেলে প্রায়োপবেশক রাজবন্দী হরেন্দ্রনাথ মুন্‌শী নামক যুবকের মৃত্যু হওয়ায় দেশে স্বভাবতই অত্যধিক উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সহিত গভীর সমবেদনা অনুভূত হইতেছে। কোন ব্যক্তি যে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিকপ্রিয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক জন দু-জন নয়, কচিৎ এক আধ বার নয়, বহু ব্যক্তি যে বহুবার অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করে, অতি প্রিয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, তাহা কম দুঃখে করে না। স্বেচ্ছায় উপবাসী কোন রাজবন্দীর মৃত্যু হইলে সরকারী সাফাইকারীরা সর্ব্বসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে চান, যে, উপবাসীদের দুঃখের কোন কারণই ছিল না! তাহা হইলে তাহারা কি অকারণে প্রাণ দিতে চায়? তাহারা কি পাগল? তাহা হইলে তাহাদিগকে মানসিক চিকিৎসালয়ে কেন পাঠান হয় নাই?

সরকারী সাফাই আমরা শুনিতে প্রস্তুত নহি। রাজবন্দী-দিগকে মুক্তি না-দেওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গে শান্তির সম্ভাবনা কম।

মুক্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত বন্দীরা ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকুন, প্রায়োপবেশন করিবেন না—মহাত্মা গান্ধী ও অন্য নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন। বঙ্গে ও অন্য কোন কোন প্রদেশে বন্দীরা এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। ভাল করিয়াছেন। নেতাদের এই অনুরোধে আমরাও মনে মনে সায় দিয়াছি। কিন্তু ইহাও অনুভব করিয়াছি, যে, এইরূপ অনুরোধ করিবার দায়িত্ব কিরূপ গুরু। আমি ত তাঁহাদের মুক্তির জন্য কিছুই করিতেছি না!

—

মার্চে মহাত্মাজী বঙ্গে আসিতে পারেন

হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইবার পর, স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, মহাত্মা গান্ধী মার্চ মাসের গোড়ায় বঙ্গদেশে আসিবার ও এখানে আসিয়া রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সুসংবাদ। মহাত্মাজী আসিলে এবং তাঁহার চেষ্টায় রাজবন্দীরা মুক্তি পাইলে সাতিশয় আনন্দিত হইব।

সংবাদটি পড়িবার পর একটি দুঃখকর অবসাদজনক চিন্তাও মনে উদিত হইয়াছে। বাংলা দেশে এমন দরদী, এমন বিচক্ষণ, ও এমন প্রভাবশালী মানুষ একটিও নাই যিনি একাগ্রতা, আশা ও উৎসাহের সহিত বন্দীদের বন্ধনমোচনের চেষ্টায় গবর্ণর ও মন্ত্রীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন!

—

অন্তরিত ও রাজবন্দীদের কথা

বাংলা দেশে যে-সকল বালক ও যুবক, বালিকা ও যুবতী সন্দেহে বিনাবিচারে অন্তরিত বা বিচারান্তে কোন রাজনৈতিক অভিযোগে কারারুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের কথা ভাবিলে মন বিষাদে নিমগ্ন হয়। তাহারা সকলেই বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছে, অনেকে বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ কেহ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহাতে মারা পড়িয়াছে, অনেকে প্রায়োপবেশন করিয়া স্বেচ্ছায় অনশনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহার মধ্যে দুই এক জনের প্রাণও গিয়াছে। শুধু কি তাঁহাদের দুঃখ? তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের পরিবারবর্গের কি দুঃখ! অনেক পরিবারের অবলম্বন আশাভরসার স্থল তাহারা ছিল। তাহাদের অভাবে সেই সব পরিবারের অভাবনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে।

ইহাই কি সব? এই সকল বালক-বালিকাদের অনেকের মধ্যে; যুবক যুবতীদের অনেকের মধ্যে, এমন বস্তু ছিল যাহা অন্য দেশে ভিন্ন অবস্থায় তাহাদিগকে দেশের গৌরব সমাজের পরম হিতকারী করিতে পারিত। বাংলা দেশ এই সম্ভাবিত কল্যাণ, এই সম্ভাবিত গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এতগুলি নবীন জীবনের ব্যর্থতা অন্য আরও অধিক-সংখ্যক নবীন জীবনে ভয়ত্রাস ও অবসাদ আনিয়াছে—ইহাও গুরুতর ক্ষতি।

হইতে পারে, তাহারা কেহ কেহ বিপথগামী হইয়াছিল, দোষ করিয়াছিল। যিনি কখনও বিপথগামী হন নাই, কোন দোষ করেন নাই, তিনিই তাহাদিগের কেবল নিন্দাই করিতে পারেন। আমরা ভাবিব, তাহারা বিপথগামী হইয়া থাকিবে, দোষ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্তও ত করিয়াছে। আর, তাহারা ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষায় ত বিপথগামী হয় নাই। আমাদের স্বাধীনতালিপ্সা কি তাহাদের মত দুর্দ্দমনীয়, আমাদের স্বদেশানুরাগ কি তাহাদের মত প্রবল? আমরা অন্য কারণে কি কখনও বিপথগামী হই না, দোষ করি না? তাহাদের দোষক্ষালন করিবার নিমিত্ত, দোষটা দোষ নহে বলিবার নিমিত্ত, এত কথা বলিতেছি না। শাস্তি তাহাদের হইয়া গিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এখন তাহাদের যতটুকু শক্তি আছে, তাহা তাহাদের পরিবারবর্গের, সমাজের, দেশের সেবায় নিযুক্ত হউক, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছি।

আর, যাহারা কোন দোষই করে নাই, কেবল সন্দেহে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের অকারণ শাস্তির সমাপ্তি ত বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল; অন্ততঃ এখন হউক।

—

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন

এই বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন কৃষ্ণনগরে হইতেছে। নদীয়া জেলা বাংলা-সাহিত্যের একটি পীঠস্থান। যে বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ ও গৌরব, তাহার উদ্ভব যিনি ব্যতিরেকে হইত না, সেই শ্রীচৈতন্যের সহিত নদীয়ার নাম জড়িত। কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতা ও গল্প নদীয়া জেলায় লিখিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের সহিত লেখকরূপে যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না, অদ্বৈতাচার্য্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি এরূপ পুণ্যাত্মারা এই জেলা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের মানুষ। সাহিত্যিকবৃন্দের সমাগমে এই নগর কয়েক দিন আনন্দমুখর হইবে।

—

"স্বাধীনতা-দিবস"

আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবস বলিলে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দিবস বলিলে তাহা বুঝায় না—ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারে। ভারতবর্ষে এখন স্বাধীনতা-দিবস বলিতে বুঝায় সেই দিবস যে-দিবস ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় কতকগুলি লোক পূর্ণস্বাধীনতাকেই ভারতবর্ষের কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা আমরা কত টুকু পাইয়াছি, তাহার বিচার আমরা এখানে করিব না। কিন্তু সামান্য যে এক টুকু লাভ হইয়াছে, স্বাধীনতা-দিবসের নানা সভায় উচ্চারিত ঘোষণা-বাক্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। ইংরেজ-শাসনের যে-সকল দোষ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া আগে আগে বহু সংবাদপত্র ও সম্পাদক দণ্ডিত হইয়াছেন বা অন্ততঃ ধমক খাইয়াছেন, স্বাধীনতা-দিবসের ঘোষণা-বাক্যে তাহার প্রধান দোষগুলি সংক্ষেপে স্পষ্ট ভাষায় নিবিষ্ট থাকিলেও তাহার প্রকাশ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় নাই, শত শত গ্রাম-নগরে তাহার আবৃত্তি হইয়াছে। লাভ এই টুকু।

—
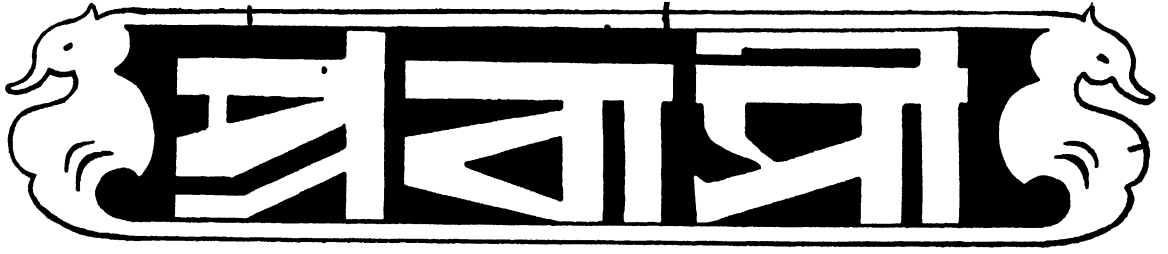
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

৩৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৪৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত]

ওঁ

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্ব্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

—

508 W. High Street
Urbana, Illinois U. S. A.

ওঁ

বন্ধু

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুত্বের কোন্ সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব একথা মনে করিয়া আসি নাই—যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে—বিশেষত ইংরেজি ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে—তাহাতে আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে—অনেকে বাংলা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা শুভফল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে ফিরিবার কথা আছে। সেখানে ম্যাক্‌মিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যোগী

হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জ্জমা করিয়াছি—সেগুলি এখানকার রসজ্ঞ ব্যক্তিদের ভাল লাগিয়াছে—এবং সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে—যতই আদর অভ্যর্থনা পাই না কেন—মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি—দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার অবারিত আকাশ অপর্য্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে—সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অন্যায় হইবে তাই এই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

[শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত]

ওঁ

বোলপুর

বৌঠাকুরাণী

আজ আপনার সস্নেহ পত্র পাইলাম। ইচ্ছা ছিল লিখি যে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ—কিন্তু দুই কারণে লিখিলাম না—এক, লিখিলেও আপনার দয়া উদ্রেক করিত না, দুই, সম্প্রতি আমার শরীর খারাপ নয়। শেষ কারণটা তেমন গুরুতর বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু প্রথমটা মারাত্মক—অতএব খুব উচ্চ কণ্ঠে সতেজে বলিতেছি বেশ আছি, ভাল আছি, রোগের কোনো চিহ্নও নাই।

নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না—আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন্। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্য প্রত্যাশায় রহিলাম।

আমি বোলপুর বিদ্যালয় খোলার অন্তত দুই সপ্তাহ পরে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হইব অতএব আপনাদের সঙ্গে তৎপূর্ব্বে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যদি বোলপুরে পদার্পণ করেন তবে আরো সত্বর দেখা হইতে পারে বিশেষ আপনি যখন অনেকবার—, থাক্, এ নিষ্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে—মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফরপুর গেছে—তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে।

অরবিন্দর সহপাঠীরা সকলেই কার্ত্তিক মাসের জন্য বাড়ি গেছে—কেবল যোগেন আছে। সেও দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কেবল ছুটির জন ছয় সাতেক ছাত্র থাকিবে। অজিতও আজ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লি অভিমুখে রওনা হইল। অরবিন্দ ফিরিয়া আসিলে, যদি ইচ্ছা করেন, ত এখানে পাঠাইতে পারেন। তাহার অঙ্ক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এখানে আছেন। ইতি। ৩১শে আশ্বিন ১৩ [কীটদষ্ট]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সোমবার

মাননীয়াসু

বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল—তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম—আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার বিশ্রাম—এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে? আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভস্ম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—

সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না—আমি রণে ভঙ্গ দিব না।

ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেড্‌মাষ্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে ফিরাইয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এখন হইতে আপনি আর কিছুই ভাবিবেন না।

আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জ্জিলিঙে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহিতাম না। কিন্তু বালককালে ইস্কুল পালাইয়াছি এ বয়সে আর চলে না। আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ মূলতবি আছে—আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম—ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম—কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি—আর কই মাছ নয়—দ্বিপদ চতুষ্পদের ত কথাই নাই। কলিকাতার চেয়ে শরীরটা অল্প একটু সারিয়াছে। যদি ছুটি লওয়া সঙ্গত ও আবশ্যক বোধ করি তবে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে নড়িব না। আমার বোটে কি আপনাদের টানিতে পারিব না? আমাকে নিঃসহায় পদ্মায় বিসর্জ্জন দিবেন? আমাকে যদি এমন করিয়া অবহেলা করেন তবে একলা এই শরীরটাকে লইয়া কত করিব?

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

মাননীয়াসু

ঠিক নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে আপনার চিঠি আনন্দসংবাদ বহন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই প্রান্তরের মধ্যে আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিত বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আমরা আমাদের বিদ্যালয়গৃহে বসিয়াছিলাম এমন সময় আপনার পত্রখানি আসিয়া আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিল। আমাদের এই বাংলা দেশের নববর্ষের আনন্দ-অভিবাদন আপনারা গ্রহণ করুন। অধ্যাপক মহাশয় জয়যুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না—নিঃশব্দ ভারতবর্ষ তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিবে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কেবলি ইচ্ছা হয় আপনাদের দেখিয়া আসি। নানা কারণে আমি তাহাতে অক্ষম। যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।

আমার এখানকার খবর আপনি নিশ্চয় জানেন। আমি এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভৃতে পড়াইতেছি। আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান্ হইয়া উঠিবে। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা
৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু

আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না—আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি।

বন্ধুকে তাঁহার কর্ম্ম সমাধার পূর্ব্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাঁহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব—তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন।

আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন—সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক!

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভ্যতার অভিব্যক্তি

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

সভ্যতার ভিত্তিমূলের অনুসন্ধানকল্পে তথাকথিত অসভ্য আদিম মানব সমাজের কিঞ্চিৎ অনুশীলন অপরিহার্য্য।

আদিম মানবের প্রকৃতি

আদিম জাতিদের উন্মুক্ত জীবন-স্রোত লক্ষ্য করিয়া কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

> উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত,
> সম্মুখে আঘাত করি, সহিয়া আঘাত
> অকাতরে। পরিতাপ-জর্জ্জর পরাণে
> বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে।
> ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়;—
> বর্ত্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
> নৃত্য ক'রে চলে যায় আবেগে উল্লাসি।
> উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি।

অসভ্য জাতি সম্বন্ধে কবির এ বর্ণনা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কবিবর্ণিত ইহাদের এই উন্মুক্ত উদ্দাম ভাব জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে স্থায়ী হইতে পারে না।

খাদ্যসমস্যা ও জীবন-সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসের শৈশব যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আবহমান কাল সকল জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। আধুনিক কল-কারখানার যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ ধনসম্পদ অল্পসংখ্যক ধনকুবেরের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সভ্য, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সকল সমাজেই জীবন-সংগ্রাম অধিকতর তীব্র ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। আদিম জাতিদের পক্ষে খাদ্যসমস্যা সভ্যতর জাতিদের অপেক্ষা অধিকতর কঠোর ও দুরূহ। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিষ্পেষণে ইহাদিগকে নিরন্তর খাদ্যান্বেষণে ও শীতাতপ ও আধি-ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় বিব্রত থাকিতে হয়। যদিও ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করে না, তবু বর্ত্তমানের অভাব পূরণ করাই তাহাদের পক্ষে অনেক সময় দুরূহ হয়। এ-সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানব মাত্রই প্রাণের পরিপূর্ণতার জন্য, অমৃতময় প্রাণসলিলে হৃদয়-কলস ভরিয়া লইবার সুযোগের জন্য উদ্‌গ্রীব। হিন্দুদর্শনের ভাষায়, তাহারা প্রাণময় কোষে বিচরণ ও অবস্থান করিবার জন্য লালায়িত।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আদিম মানবের—আদিম কেন—সভ্য সমাজেও অনেকের পক্ষে ইহার সুযোগ ও অবসর অল্পই ঘটে। তবে এ-সম্বন্ধে সভ্য মানবের সহিত আদিম মানবের প্রভেদ এই যে, যখন ভাগ্যক্রমে এরূপ স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় তখন সভ্যমন্য মানব আমরা জীবনের দুঃখদৈন্য, চিন্তা-জ্বর মন হইতে একেবারে বিতাড়িত করিতে পারি না। অপর পক্ষে, তথাকথিত অসভ্য মানব এইরূপ শুভ মুহূর্ত্তে সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভবিষ্যতের ভয় ভাবনা মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া অবাধে জীবন-মদিরাধারা পানে বিভোর থাকে, এবং সনির্ব্বন্ধে মধ্যে মধ্যে উহার সুযোগ ও অবসর খুঁজিয়া লয়। তখন তাহাদের প্রাণে

> চারিদিকে গান বেজে ওঠে—
> চারিদিকে প্রাণ নেচে ছোটে,
> গগনভরা পরশখানি লাগে সকল গায়।

জ্যোৎস্না রাত্রে কিম্বা উহাদের কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে উহাদের গ্রামে গেলে দেখা যায় উহারা দৈনন্দিন কার্য্যের অবসানে কাজের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সানন্দে নৃত্য-গীতে প্রাণসাগরে দেহমন ভাসাইয়া দেয়। হিন্দু-দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে তখন ক্ষণিকের জন্য তাহারা অন্নময় কোষ অতিক্রম করিয়া প্রাণময় কোষে বিচরণ করে। তখন এই সব অসভ্য মানবের প্রাণ কিছুক্ষণের জন্যও অনাবিল আনন্দে, গীতে ও ছন্দে, বর্ণে ও গন্ধে, আলোকে পুলকে প্লাবিত হয়। শরতে ও হেমন্তে ধানক্ষেতের সোনার গানে ইহারা সমান তানে যোগ দেয়; বর্ষায়

ভরানদীর কল্লোলিত জলধারে আপন হৃদয়ের স্বর মিলাইয়া দেয়; বসন্তের নবপল্লবের মর্ম্মরছন্দে, গন্ধবিধুর সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে, পাখীর আনন্দ-কূজনের সুধারসে, গ্রীষ্মের ও শরতের জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রির শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে ইহারা উচ্ছ্বসিত আনন্দে নব নব স্রোতে জীবন-রসধারা পান করে ও এই বিশ্বমেলার অন্তরালে যে বিরাট বিশ্বনৃত্য নিয়ত চলিতেছে তাহার ছন্দে যোগ দিবার জন্য, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বিশ্বগীতি নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে তাহার স্বরের আভাস আপন জীবন-বীণায় ক্ষণিকের জন্যও ধরিবার প্রয়াস পায়। ইহাদের জীবনের এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ ও আত্মহারা উল্লাস লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ আবেগভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণ-ঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণ পাল ভরে,
লঘুতরী সম!

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিম মানবের প্রাণের এই উদ্বেল, উদ্দাম, মুক্ত ভাবের বর্ণনায় কবি তাহাদের জীবনের কেবলমাত্র একটি ক্ষণিক ভাবের ছবি আঁকিয়াছেন।

তাহাদের জীবনের সমগ্র চিত্র আঁকিতে গেলে আমাদের ধারণায় হাসির অপেক্ষা কান্নার ভাগ, আলোর অপেক্ষা আঁধারের ভাগ বেশী আঁকিতে হয়।

সমাজের ও বাধাবন্ধের উৎপত্তি

আর তাহাদের সম্বন্ধে কবির চিত্রের অবশিষ্ট অংশ—অর্থাৎ, তাহাদের

নাহি কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোন প্রথা,
নাহি কোন বাধাবন্ধ, নাহি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
নাহি ঘর পর।

এই উক্তি পৃথিবীর বর্ত্তমান কোনও অসভ্য জাতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নহে। তুষারযুগের পশুভাবাপন্ন প্রাথমিক মানবের বা *Homo Primigenous*এর সম্বন্ধে হয়ত অনেকটা খাটিলেও, বর্ত্তমান মানব জাতির বা *Homo Sapiens*এর সম্বন্ধে এ উক্তি সম্পূর্ণ খাটে না। বস্তুতঃ বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের 'বাধাবন্ধ' বা 'taboo'র ফর্দ্দ অযথারূপ দীর্ঘ। এই 'বাধাবন্ধ' বা 'taboo'ই সমাজবন্ধনের প্রথম উপায়; পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হইবার সোপানের প্রথম ধাপ। অবাধ যৌনপ্রবৃত্তির ও অন্যান্য দৈহিক প্রবৃত্তির সংযমের উপায় স্বরূপই 'বাধাবন্ধে'র প্রথম সৃষ্টি।

যে সমস্ত জাতিকে আমরা অসভ্য-পদবাচ্য করিয়াছি তাহারাও বহু যুগ হইল সভ্যতা-সোপানের নিম্নতম স্তরে পদক্ষেপ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে-সব জাতি সাময়িক নিশ্চলতা, রুদ্ধগতি ও পশ্চাদ্গমন সত্ত্বেও প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাবে ও কোথাও কোথাও তথাকথিত সভমন্য জাতির সংস্পর্শে বিনষ্ট বা মুমূর্ষু না-হইয়াছে তাহারা ক্রমোন্নতির পথে অতীব মন্থর গতিতে আঁকাবাঁকা পথে চলিয়াছে। এই সব তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যেও বহুকাল হইতে অল্পবিস্তর 'প্রথা' ও নিয়ম, 'বাধাবন্ধ' ও আচার-বিচারও ধর্ম্মকর্ম্মের প্রচলনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাহাদের আপন জনের অর্থাৎ স্ব স্ব পরিবার, স্বগোত্র ও স্বজাতির ও হিতার্থীদের প্রতি প্রীতি ও আতিথেয়তা সুবিদিত হইলেও, তাহারা 'পর'কে অর্থাৎ অপরিচিত ও অপর জাতীয় লোককে বিশেষ সন্দেহ ও ভীতির চক্ষেই দেখে, এবং তাহাদিগকে শত হস্ত দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ, তাহাদের 'ঘর-পর'-বোধ অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান। ইহার প্রমাণ ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার আদিম জাতিদের অপর জাতীয় 'সাদান' বা 'দিকুর' প্রতি বিদ্বেষ-ভাব এবং তন্নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে 'উলগুলান' বা বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা। এই অপরিচিতের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ সম্ভবতঃ মানবের সুদূর পূর্ব্বপুরুষাগত বৈশিষ্ট্য। "অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাস দেয় ন কস্যচিৎ"—আমাদের এই নীতিবাক্য সম্ভবতঃ কতকটা সেই আদিম মনোভাবের পরিচায়ক।

বস্তুতঃ যে সমাজনীতি, শাসনতন্ত্র ও ধর্ম্মকর্ম্মের উপর মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তাহার বীজ এই সমস্ত তথাকথিত অসভ্য সমাজেই উপ্ত হইয়াছে; তাহার মূলপত্তন আদিম-মানবই করিয়াছে। সেই ভিত্তি কিরূপ ছিল এবং তাহার অভিব্যক্তি ও পরিণতি কিরূপে হইল সমগ্রভাবে তাহার ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানবসমাজের প্রাক্কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়

যে, যেমন স্বাভাবিক (instinctive) যৌনপ্রবৃত্তি হইতে পারিবারিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই প্রাণশক্তির রক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধন কল্পে পুরাতন প্রস্তর যুগের অন্ততঃ শেষার্দ্ধে আদিম-মানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের—এবং সকলের ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম্মজীবনের—মূল পত্তন হইয়াছে। সেই ভিত্তির ক্রমিক প্রসারণ ও সংস্করণ সাধিত হইয়া তাহার উপরই বর্ত্তমান সভ্য জাতিদের সভ্যতা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সমাজ-সংগঠনের সূত্রপাত

মানব-সভ্যতার শৈশব যুগে জীবনের সাফল্যের আদর্শ ছিল প্রাণশক্তির পূর্ণতা। মানবের প্রধান কাম্য ছিল, খাদ্যের সচ্ছলতা, বংশবিস্তার, শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং তজ্জনিত সুখ, সন্তোষ ও স্ফূর্ত্তি। খাদ্য সংগ্রহের জন্য ও আধিব্যাধি এবং হিংস্র পশ্বাদির ও অন্যান্য শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় একমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যম ও শক্তির অনুপযোগিতা ও নিষ্ফলতা পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিয়া আদি মানব পরস্পরের সহায়তা খুঁজিল এবং পরস্পর-সম্বদ্ধ কয়েকটি পরিবার দলবদ্ধ হইয়া মৃগয়া দ্বারা খাদ্যাদি অন্বেষণে ও আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হইল। ক্রমে এইরূপ একাধিক দল একত্র সম্মিলিত হইয়া এক বা একাধিক মনোনীত দলপতির নেতৃত্বে প্রাণশক্তির রক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধনের প্রয়াসে পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা ও দৈবশক্তির আমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যসমস্যার আংশিক সমাধান করিল।

পরস্পরের সহযোগিতায় কোনও কার্য্য করিতে গেলেই কেবল নেতার প্রয়োজন তাহা নহে, প্রথা বা নিয়ম এবং 'বাধাবন্ধ' বা বিধি-নিয়মের প্রয়োজন হয়। এইরূপে আদিম-জাতিদের মধ্যেই প্রথমে সমাজ ও সমাজপতি এবং শাসনতন্ত্রের ও আইনকানুনের সূত্রপাত হয়। আর ধর্ম্মভাব অর্থাৎ অজ্ঞাত অসীম শক্তির উপর নির্ভরতা মানব-হৃদয়ে অন্তর্নিহিত থাকুক বা নাই থাকুক বাহ্য প্রকৃতির প্রতিকূলতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই ইহাদের মধ্যে উহার প্রথম স্ফুরণ ও উদ্দীপন দেখা যায়। যখন আদিম-মানব দেখিল যে তাহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়াস ও সসীম ক্ষমতা কোনও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অসীম শক্তিদ্বারা বার-বার পরাহত হইতেছে তখন সে খুঁজিল সেই অসীম অজ্ঞাতের সহায়তা। হয়ত আদি-মানব স্বপ্নেই আত্মার পৃথক সত্তা ও আধ্যাত্মিক জগতের ও পরলোকের প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, শিশুর মনে পিতার অপরিসীম ক্ষমতার ধারণা হইতেই আদিম-মানবের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয়। এইরূপে আদিম-মানব সমাজে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরীকরণ ও অশুভ প্রভাবের প্রতিষেধ এবং কল্যাণপ্রদ প্রভাব ও ঈপ্সিত খাদ্যাদির আহরণ করিবার প্রচেষ্টাতেই যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র এবং নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়। আমাদের হাঁচি-টিকটিকি প্রভৃতির বাধা ও পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট ও মেয়েলী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আরও অন্যান্য নানা প্রকার বিধিনিষেধ সমাজের আদিম অবস্থার "বাধাবন্ধ" বা Primitive taboos-এর স্মারক হইতে পারে।

আদি-মানবের অনুষ্ঠানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাতন প্রস্তর-যুগের কতকগুলি গিরিগুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রে। মধ্য-ইউরোপ, স্পেন ও ফ্রান্স দেশের কয়েকটি গিরিগুহায় এবং ভারতের মধ্যপ্রদেশে রায়গড় রাজ্যের সিঙ্গানপুর গ্রামের একটি গিরিগুহায় ও হোসেঙ্গাবাদের নিকট একটি পাহাড়ের গাত্রে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মির্জাপুর জেলার লিখুনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গিরিগাত্রে অনেকগুলি সুন্দর, জীবন্ত, রঙীন মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি চিত্রে শিকারীদলের তীরধনুক কিংবা লগুড় হস্তে বিবিধ পশুপালের পশ্চাদ্ধাবনের জীবন্ত রঙীন প্রতিচ্ছবি আছে। এইগুলির উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ অনুকরণ-মূলক যাদুদ্বারা (imitative magic) মৃগয়া অনায়াস-লভ্য করা। সিঙ্গানপুরের চিত্রসম্বলিত গুহার নিকটে ভূগর্ভে কয়েকটি পুরাতন প্রস্তর-যুগের শেষার্দ্ধের (Upper Palaeolithic Period-এর—Aurignacion অন্তর্যুগের কুঠারের অনুরূপ) কুঠারফলক পাইয়াছিলাম। সেজন্য ঐ গুহাচিত্রগুলির জন্মকাল অন্যূন দশ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মির্জাপুর জেলার গিরি-

গুহাস্থ চিত্রগুলি সম্ভবতঃ নবপ্রস্তর-যুগের, অর্থাৎ আনুমানিক সাত সহস্র বর্ষ আগের।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার ফলে অনুমান হয় যে মানবের উদ্ভবকাল হইতে এখন অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ লক্ষ বৎসরের মধ্যে প্রথম দুই-তিন লক্ষ বর্ষে লগুড়াদি ও অমার্জ্জিত উষাশিলার (Eoliths-এর) যুগ ছিল। পরে লক্ষাধিক বর্ষ যাবৎ পুরাতন প্রস্তর যুগের (Palæolithic Age-এর) স্থিতিকাল ও তৎপরে কেবল তিন-চারি সহস্র বর্ষ যাবৎ নূতন প্রস্তর-যুগের (Neolithic A e) এর-স্থিতিকাল ছিল, অর্থাৎ পালিশ-করা নানাবিধ প্রস্তরায়ুধ নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এই যুগেই কৃষিকর্ম্মের প্রবর্ত্তনের প্রমাণ পওয়া যায়। তাহার পর আজ হইতে আনুমানিক কেবল সাত সহস্র বর্ষ মাত্র ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে ও ধাতুর অস্ত্র, অলঙ্কার ও তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণ ও ব্যবহার চলিতেছে। ইহার প্রথম ন্যূনাধিক তিন হাজার বৎসর তাম্র ও ব্রঞ্জের যুগ ছিল; পরে কেবল আজ হইতে আনুমানিক চারি হাজার বৎসর মাত্র লৌহ-যুগ, অর্থাৎ লৌহের অস্ত্রাদি নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু দেশভেদে বিভিন্ন যুগের স্থিতিকালে কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

যাদু ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি

সে যাহা হউক, প্রাগৈতিহাসিক কালের যে অনুকরণ-মূলক যাদুক্রিয়ার (imitative magic-এর) উল্লেখ করিয়াছি তাহার প্রাদুর্ভাব বর্ত্তমান কালের তথাকথিত অসভ্য জাতি-দের মধ্যেও দেখা যায়। আর সভ্যতর জাতিদের মধ্যেও এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান আদৌ বিরল নহে। ইহার মূলসূত্র এই যে ঈপ্সিত বস্তু বা অবস্থা বা ঘটনার বাহ্যিক অনুকরণ দ্বারা ও অনুরূপ শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঐ বস্তু, ঘটনা বা অবস্থার আবির্ভাব সম্ভাব্য। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের Intichiuma নামধেয় অনুষ্ঠানগুলি ইহার প্রকৃত উদাহরণ। খাদ্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ পশু-পক্ষীর রূপ ও ভাবভঙ্গীর অনুকরণমূলক নৃত্যাভিনয় ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া ঐ ঐ জাতীয় পশুপক্ষীর বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই Intichiuma অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ছোটনাগপুরের আদিম জাতিদের মধ্যে এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান-সমূহের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাহারা এবং তাহাদের কোনও কোনও সভ্যতর হিন্দু প্রতিবেশীরাও অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি-উৎপাদনের আশায় ঐরূপ অনুকরণমূলক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গ্রামের রমণীরা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামপুরোহিত-পত্নীর নেতৃত্বে অতি প্রত্যূষে স্নানান্তে জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া কোনও অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদদেশে যায় ও তথায় বৃষ্টির অনুকরণে জলধারা বর্ষণ করে। আর নিকটে কোন অনুচ্চ পাহাড় বা ঢিবি থাকিলে কেহ কেহ তাহার উপর উঠিয়া পাহাড়ের গাত্রের প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া দিয়া বজ্রনির্ঘোষের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা অচিরে বৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। অধিকন্তু, এই সঙ্গে দেবোদ্দেশ্যে কুক্কুট বলিও দিয়া থাকে। মানুষের ও গোমহিষাদির সংক্রামক রোগ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেও একাধিক অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ক্ষেত্রে প্রচুর শস্যাদি লাভের মানসে বীজবপনের পূর্ব্বে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাতে তাহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রচুর জল ঢালিয়া কাদা মাটি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে ও সূর্য্য দেবতার সহিত ধরিত্রীর উদ্বাহের অনুকরণ-কল্পে সূর্য্যদেবের প্রতীকস্বরূপ গ্রাম্য পুরোহিতের সহিত তাহার সহধর্ম্মিণীর বিবাহক্রিয়ার অভিনয় করে। তাহাদের বিশ্বাস যে এই অনুষ্ঠানের ফলে সূর্য্যদেব ধরিত্রীর গর্ভাধান করেন ও বসুমতী প্রচুর ফলপ্রসূ হন। হিন্দুর অম্বুবাচীর মূলেও ঐরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান। কোন কোন অসভ্য জাতি শস্যক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক উপায়স্বরূপ পর্ব্ব-বিশেষে স্ত্রী-পুরুষের অসংযত সঙ্গমের ব্যবস্থা দেয়। আদিম জাতিদের ন্যায় ছোটনাগপুরের হিন্দু জাতিরাও জলাশয়ের ও ফলোদ্যানের "বিবাহে"র অনুষ্ঠান করে।

প্রাণশক্তি, ও আদিম যোগসাধন

প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা

এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রকৃতির সহিত মিলন বা 'যোগ-স্থাপন' দ্বারা প্রকৃতিকে ইচ্ছানুবর্ত্তী করিবার প্রয়াস পায়। প্রকৃতির সহিত যোগযুক্ত বা একাত্ম হইয়া প্রকৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা আয়াসসাধ্য এই ধারণায় মানব অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া বৃষ্টির আমন্ত্রণ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সভ্য সমাজেও এইরূপ যাদুমিশ্রিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রাণশক্তি-বর্দ্ধন মানসেই সম্ভবতঃ প্রত্যেক অসভ্য দলের এক বা একাধিক দলপতি মনোনীত করিবার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

আদি-মানব "প্রাণশক্তি"কে বাস্তব পদার্থ বিশেষ (soul substance) বলিয়া গণ্য করে। তাহাদের ধারণা এই যে, এই প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি, সঞ্চারণ ও নিষ্কাশন এবং একাধার হইতে আধারান্তরে সঞ্চালন শক্তিমান ব্যক্তিবিশেষের আয়াসসাধ্য। তাহারা বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন দ্রব্যে ও বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন পরিমাণে এই প্রাণশক্তি নিহিত আছে; এবং জীব বা বস্তুবিশেষের প্রাণশক্তির পরিমাণ বা মাত্রা অনুসারে তাহাদের সংস্পর্শে অপরের প্রাণশক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভব। পলিনেসিয়ার অসভ্যেরা এই প্রাণশক্তিকে 'মানা' নামে অভিহিত করে এবং নৃতত্ত্ববিদেরা এই 'মানা' নামটি ঐরূপ বিশিষ্ট 'প্রাণশক্তি' অর্থে পারিভাষিক শব্দ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুর তন্ত্রসাধনায়ও এই জাতীয় বিশ্বাস ও আচরণ কোথাও কোথাও এখনও প্রচলিত আছে।

প্রবল প্রাণশক্তির বলে এবং মনোময় কোষের উন্মেষের সাহায্যে কোন কোন বিশেষ শক্তিমান ব্যক্তি যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান ও শব্দ-শক্তি বা মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে এই শক্তি সঞ্চরণ, বর্দ্ধন ও স্থানান্তরীকরণে সমর্থ, এইরূপ বিশ্বাস কেবল আদিম-জাতিদের মধ্যে নয়, সভ্যতর জাতিদের মধ্যেও দেখা যায়। এই বিশ্বাসেই এইরূপ প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই দলের প্রধান বা 'নায়ক' অর্থাৎ পুরোহিত ও দলপতি মনোনীত হইত। মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি কোন কোন জাতি ইহাকে 'পাহান' বা প্রধান আখ্যা দেয়; আর সাঁওতাল ভূঁইয়া প্রভৃতি কোনও কোনও জাতি ইহাকে "লায়া" 'নায়া' বা নায়ক আখ্যা দেয়। যেখানে বিশেষ কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশাসনের সূচনাও হয় নাই, সেখানেও প্রাণশক্তি বর্দ্ধনের ও পোষণের প্রচেষ্টায় এই দলপতির নেতৃত্বে ধর্ম্মক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়; এইরূপে দলবদ্ধ সমাজ সংগঠনের মূল পত্তন হয়। ইহারই ক্রমবিকাশ ও প্রসার বৃদ্ধিতে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির উদ্ভব ও পরিণতি হয়।

এই ক্রমবিকাশের একটি প্রধান সহায়ক বিভিন্ন জাতির পরস্পরের সংস্পর্শ কিংবা সংমিশ্রণ। মানব স্বভাবতঃ অভ্যাসের দাস। অবস্থা ও কাল বিশেষের উপযোগী 'বাধা-বন্ধ' বা বিধিনিষেধ একবার প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইলে, আমরা গতানুগতিক ভাবে সেগুলি সনাতন প্রথাজ্ঞানে অনুসরণ করি।

মহাপুরুষের প্রভাব

দীর্ঘকাল যাবৎ কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রণালীতে অভ্যস্ত মানব-সমাজ অবস্থার পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তন করিতে স্বভাবতঃ পরাঙ্মুখ। এই মানসিক জড়তা বা রক্ষণশীলতার প্রতিষেধ দুই প্রকারে ঘটে। বিভিন্ন জাতি বা সংস্কৃতির আনীত নূতন ভাবচিন্তা ও সংস্কারের সংস্পর্শে আমাদের গতানুগতিক ভাব ও চিন্তা আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত বা পরিপুষ্ট হয় এবং আমাদের অভ্যস্ত কোনও কোনও পুরাতন বিধিনিষেধের অনুপযোগিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি সবলে আকৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রচলিত বিধিনিষেধ গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া মূল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট ও ক্রমে হীনবল হয়।

আবার সকল জাতির মধ্যেই কখনও কখনও কোন মনীষাশালী ব্যক্তি প্রচলিত 'বাধাবন্ধ' 'বিধি-নিষেধ' জীর্ণ ও অসাময়িক বোধে সময়োপযোগী করিবার জন্য উহা শ্লথ কিংবা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন, এবং কোনও বিষয়ে বা নূতন বাধাবন্ধের প্রবর্ত্তন করিয়া জাতি ও সমাজের উন্নতির গতি উন্মুক্ত ও বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। এইরূপে সামাজিক জীবন তরঙ্গের ন্যায় উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব কখনও কখনও দেখা যায়।

তাহাদের দ্বারা কোনও নূতন সামাজিক প্রথা অথবা ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন অথবা পুরাতন প্রথা বা মত বা অনুষ্ঠানের আমূল সংস্কার সাধিত হওয়ায় তাঁহারা নিজ নিজ সমাজকে উন্নতির পথে সমধিক বেগে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছেন। ক্বচিৎ কখনও আদিম-সমাজে ও কোনও কোনও ব্যক্তি সবিশেষ একাগ্রচিত্ততার বলে নিমেষের জন্যও বিজ্ঞানময় কোষের ক্ষণিক প্রভা বা চমক (flash) অনুভব করেন ; এবং নিজের জাতি বা সমাজকে কোনও প্রচলিত কুরীতির দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন বা সমাজে কোনও নূতন হিতকর রীতি প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপ ব্যক্তি দেবাবিষ্ট (God-inspired) ও দেবানুগৃহীত বলিয়া পরিগণিত হন, ও মহাপুরুষরূপে সম্মানিত হন। সাধারণতঃ আদিম-জাতিদের প্রধান (পাহান) বা দলপতির ঐরূপ অসাধারণ শক্তি দেখা যায় না। তবে তাহারা মধ্যে মধ্যে দেবাবিষ্ট বা spirit-possessed হয়।

সমাজ-নেতার উদ্ভব

প্রথমে এই প্রধান ('পাহান') বা পুরোহিতের কার্য্য ছিল সমাজের ঋদ্ধি বা সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নায়কত্ব। অল্পায়তন আদিম সমাজগুলিতে পরস্পরের সহযোগিতাজনিত শৃঙ্খলা ও এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান ছিল। সকলেই সম্মিলিত হইয়া 'প্রধান' ও বয়োবৃদ্ধদের পরিচালকতায় প্রচলিত রীত্যনুসারে বিবাদাদির মীমাংসা ও জনহিতকর অনুষ্ঠান করিত। যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিত বা প্রধান (পাহান) সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ 'রাজা' বলিয়া গণ্য হইতেন। এখনও ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জাতিরা তাহাদের গ্রামপুরোহিতকে "পাহান-রাজা" আখ্যা প্রদান করে। আদিম-সমাজে পুরোহিতের প্রধান কার্য্য ছিল স্বদলের বা স্বগ্রামের প্রাণশক্তির পোষণ ও প্রাণশক্তিবিরোধী অশুভ-শক্তির প্রতিষেধ। তাই আদিতে তিনি ছিলেন একদিকে যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিত অপর দিকে শান্তিরক্ষক রাজা এবং রণ-নেতা (War-lord)। আদিম জাতিদের বিশ্বাস সমাজের কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ভর করে এই প্রধান বা "পাহান-রাজা"র শক্তি ও যোগ্যতার উপর। গ্রামের ও সমাজের কোনও বিপদ ঘটিলে এই রাজার অক্ষমতায়, অযোগ্যতায়, বা অবহেলায় ঘটিয়াছে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়। কোনও ওঁরাও বা মুণ্ডা গ্রামে বারংবার অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী হইলে গ্রাম-পাহানের ত্রুটি বা অযোগ্যতার জন্য ঘটিতেছে মনে করিয়া কখনও কখনও তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। আমাদের মধ্যে এখনও সমাজের বা দেশের বিশেষ কোন অমঙ্গল ঘটিলে রাজার দোষে ঘটিয়াছে, এবং কোনও কল্যাণ বা সৌভাগ্য ঘটিলে রাজার পুণ্যে হইয়াছে, এরূপ ধারণা বদ্ধমূল আছে। বাংলা প্রবচন—"ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ" ও উড়িয়া প্রবচন—"যদি বরষে মাঘের শেষ', ধন্য সে রাজা ধন্য সে দেশ", এইরূপ বিশ্বাসেরই পরিচায়ক।

সমাজের আদিতে একই ব্যক্তি হোতা বা ধর্ম্মনেতা, যুদ্ধনেতা ও রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। ক্রমে গোত্র বা গোষ্ঠী হইতে "জাতির" (tribe) ও গ্রামসঙ্ঘ হইতে "রাষ্ট্রে"র (State) উদ্ভব হইল। সমাজের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈব-ক্রিয়া ছাড়া, শাসন, যুদ্ধ, বিচার-কার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার জন্য সহকারী বা দ্বিতীয় নেতার প্রয়োজন হইল। ধর্ম্মনেতা বা "পাহান-রাজা" মন্ত্রতন্ত্র পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত শাসন ও যুদ্ধ প্রভৃতি বা বৈষয়িক (secular) কার্য্যের নেতৃত্বের জন্য প্রতিনিধি ('মুণ্ডা' বা 'মণ্ডল' ও 'মাহাতো' বা 'মহৎ') মনোনীত হইল। এখনও কোনও কোনও মুণ্ডাগ্রামে একই ব্যক্তি 'মুণ্ডা'র ও 'পাহানে'র অর্থাৎ রাজার ও পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নেতৃত্ব ও শাসনকার্য্য এবং যুদ্ধাদির নেতৃত্বের ক্রমে বিভাগ ঘটিয়াছে, সেখানে অনেক স্থলেই ক্রমে যুদ্ধনেতা ও রাষ্ট্রনেতা, প্রধান নেতার বা 'রাজা'র পদে উন্নীত, ও ধর্ম্মনেতা দ্বিতীয় স্থানে অবনমিত হইয়াছেন।

রাজশক্তির অভিব্যক্তি

যেমন আদিতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র দলের নেতাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম গঠিত হইত, তেমনই রাজার আবাসের অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠানের কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে জনসংখ্যা ঘনীভূত হইয়া 'নগর' বা 'পুর' গঠিত হইল। মূলপ্রধানের পদ দুই ভাগে

বিভক্ত হইলে রাষ্ট্রনেতার হস্তেই স্বভাবতঃ অধিকতর রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ক্রমে এই "রাষ্ট্রনেতা রাজা" জাতির ও সমাজের প্রধান হইয়া উঠেন। তিনি সমাজের প্রতীক ও প্রাণস্বরূপ পরিগণিত হন ও সর্ব্বদেবতার দেবত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয়। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে রাজা অষ্টদিকপাল বজ্রধারী ইন্দ্র, জগৎ-নিয়ামক বরুণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রভৃতি। রাজার শক্তিবর্ণনাকল্পে বিভিন্ন দেশে রাজাকে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, শ্যেন-পক্ষী, নাগ-সর্প প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইত। এখনও তাহার স্মৃতি-নিদর্শনস্বরূপ পরাক্রান্ত জাতিদের জাতীয় পতাকায় এবং কোন কোন জাতির রাজস্বাক্ষরে ঐরূপ পশুপক্ষীর চিহ্ন অঙ্কিত হয়। রাঁচি জেলার ওঁরাওদের বিভিন্ন 'পারহা' বা গ্রামসঙ্ঘের ঐরূপ বিশিষ্ট চিহ্নযুক্ত পতাকা এখনও আছে এবং তাহাদের রাজবংশের বিশেষ চিহ্ন ও স্বাক্ষর "নাগ-সর্প"।

এইরূপে দ্বিবিধ রাজশক্তি হইতে ক্রমে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মানুশাসনের (Church এবং State-এর) বিভাগ উৎপন্ন হইল। কালক্রমে পাশ্চাত্য প্রদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনেক স্থলে ধর্ম্মযাজকের (Church-এর) ক্ষমতা লুপ্ত হইল। কেবল ভারতেই ব্রাহ্মণ, দেবতার প্রতীকরূপে রাজা অপেক্ষা কোনও কোনও অংশে শ্রেষ্ঠতর পদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও রাজন্য-বর্গের মধ্যে এককালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রহিল—তাঁহাদের পার্থিব স্বার্থত্যাগের ফলস্বরূপ। ব্রাহ্মণ যদিও রাজমন্ত্রী রূপে রাজার অধীন এবং তাঁহার আসন রাজার নিম্নে তবু রাজগুরু ও রাজপুরোহিত রূপে তিনি রাজার নমস্য।

জাতিভেদের উৎপত্তি

এই প্রসঙ্গে ভারতের জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিতমাত্র করা অসমীচীন হইবে না। কার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত থাকায় ক্রমে পরিবারবিশেষের ঐ কার্য্যে স্বভাবতঃ পারদর্শিতা জন্মে। এইরূপ কর্ম্মজনিত পার্থক্য হইতে ক্রমে গুণগত পার্থক্য জন্মে। হিন্দুর জাতিভেদও সম্ভবতঃ এইরূপ কার্য্যঘটিত পার্থক্য হইতে সূচিত হইয়া গুণগত পার্থক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যজ্ঞ বা ধর্ম্ম-ক্রিয়ার হোতৃত্ব হইতেই ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি। এইরূপে পুরোহিত বংশগুলিকে সমাজ পৃথক করিয়া সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করে ও রাজন্য বংশগুলি ক্ষত্রিয় জাতি-রূপে পৃথক হইলে জনসাধারণ বৈশ্য বা Commonalty শ্রেণীতে, ও বিজিত দাস (conquered slaves) শূদ্রশ্রেণীতে পরিগণিত হইল। যে শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বে কর্ম্মগত ছিল তাহা কালে বংশগত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

সভ্যতার পরিণতি

সভ্য সমাজের পরিণতির ক্রম সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সমগ্র জাতি ও রাজ্যের কেন্দ্র রাজা। তাঁহাতেই দেশের বা সমাজের আত্মা অবস্থিত। রাজার সমৃদ্ধিতে দেশের ও জাতির সমৃদ্ধি। তাই সর্ব্বদেশে রাজাকে আড়ম্বর ও গৌরবে মণ্ডিত করিয়া রাখা হয়। সেজন্য ও রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। ইহার ফলে 'ভাগ'-প্রদান প্রথার উৎপত্তি হইল। রাজা সমাজের ও দেশের প্রাণস্বরূপ, সেজন্য দেশে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের একাংশ তাঁহার প্রাপ্য হইল। প্রতিদানস্বরূপ রাজা দেশের ও সাধারণের হিতার্থেই ঐ অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিতেন। এই রাজার প্রাপ্য অংশ পরে রাজ-করে পরিণত হইল ও কালে রাষ্ট্রের রাজস্ব ও হিসাব বিভাগের (Revenue, Finance and Accounts Department-এর) উৎপত্তি হইল।

সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান যে সুন্দরের অনুভূতি, তাহার উন্মেষ ও আংশিক বিকাশ আদিম-জাতিদের সঙ্গীত, উপাখ্যান, বা কল্পিত উপকথা (myths) প্রভৃতি রচনাতে দৃষ্ট হয়। সুন্দরের রূপ ধরিবার ও প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত কলাবিদ্যার প্রথম পরিচয় পুরাতন প্রস্তর-যুগের গুহাচিত্রে ও কোনও কোনও অসভ্য জাতিদের গৃহের প্রাচীরচিত্রে ও ধর্ম্মক্রিয়ার আলিপনায় এবং নৃত্যাদিতে পাওয়া যায়। সভ্য সমাজে রাজার ও রাজন্য-বর্গের ভোগবিলাসের তৃপ্তিসাধনের জন্য সেই কলা-বিদ্যার প্রভূত পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল; ও তাহার সম্যক্ স্ফুরণ ও শ্রীবৃদ্ধি মঠমন্দিরের ও দেবমূর্ত্তির স্থাপত্য

কৌশলে ও কারুকার্য্যে প্রকট হইল। ইহাদের রক্ষণ ও পোষণের জন্য বর্ত্তমান সভ্য রাষ্ট্রের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের (Archæological Department-এর) উৎপত্তি হইয়াছে।

আদিম অসভ্য জাতিদের বাঁধ-বাঁধা কূপখনন প্রভৃতি অবশ্যপ্রয়োজনীয় সাধারণের হিতকর কার্য্য গ্রামবাসীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় সম্পন্ন হইত। রাষ্ট্রস্থাপনের পর এই সমস্ত কার্য্যের তালিকা বৃদ্ধি হইল ও সেজন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ, বাঁধ-বাঁধা, ক্ষেত্রে জল সেচনোপযোগী কৃত্রিম খাল (canal) খনন, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও কূপ খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, সেতুবন্ধন প্রভৃতির জন্য পূর্ত্ত-বিভাগ বা Public Works and Irrigation Department-এর সৃষ্টি হইয়াছে।

ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি অনেকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকদের অবস্থানের ও সম্মিলনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হয়। ছোটনাগপুরের ওঁরাও, জাতি ঐ গৃহকে 'ধূমকুড়িয়া' বা 'ধাঙ্গড়কুড়িয়া' (Bachelors' House) অর্থাৎ অবিবাহিতদের গৃহ বলে। দশ-বারো বৎসর বয়স হইতে সাধারণতঃ কুড়ি-একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক ও যুবকেরা এই গৃহে রাত্রি যাপন করে। এই গৃহবাসী বালক ও যুবকেরা বয়ঃক্রমানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়ম পালন করিতে হয়। প্রত্যেক উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা বয়সে নিম্নতর শ্রেণীর বালকদিগকে জাতীয় বিধিনিয়ম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয় এবং উপাখ্যান, প্রহেলিকা ও জাতীয় প্রবাদবাক্য ও নীতি-বাক্য প্রভৃতি এবং গ্রহনক্ষত্রাদি ও গাছগাছড়ার গুণ সম্বন্ধে ও বন্য পশুপক্ষীদের প্রকৃতি ও স্বভাব (habits) সম্বন্ধে স্বজাতির পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জ্ঞান বিতরণ করে, এবং মৃগয়া ও যুদ্ধাদির কৌশল শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ, অবিবাহিত যুবকদের এই আবাসগৃহ উহাদের শিক্ষাকেন্দ্র। অপর গ্রামের বা অপর জাতির সহিত যুদ্ধ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিলে এই যুবকদিগকে সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়; ও গ্রামসেবক রূপে গ্রামের আপৎকালে ও উৎসবাদিতে সাধারণের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে হয়। এই যুবকদলের স্বতন্ত্র দলপতি ("ধাঙ্গড় মাহাতো") নিযুক্ত হয়, সে গ্রামের দলপতির তত্ত্বাবধানে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে।

সভ্য জাতিদের শিক্ষাবিভাগ ও সৈনিক বিভাগের (Residential University ও Military Department-এর) ইহাই মূল। আর অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের গ্রাম্য পঞ্চায়ত ও গ্রামসঙ্ঘের বৃহত্তর পঞ্চায়ত হইতে ক্রমে সভ্য জাতির আইন-আদালত বা বিচার বিভাগ (Judicial Department)এর প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

তথাকথিত অসভ্য জাতিদের সমাজ-শৃঙ্খলা সহযোগ-মূলক। বর্ত্তমান সভ্য রাষ্ট্রে যে সহযোগ-বিভাগ (Co-operative Departmentএর পুনঃপ্রবর্ত্তন হইতেছে তাহার ভিত্তি স্থাপন ও অল্পবিস্তর উৎকর্ষ সাধন অসভ্য সমাজেই হইয়াছিল; এবং সভ্য জাতির সংস্পর্শে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের (economic individualismএর) কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও এখনও অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান।

সমাজের প্রাণশক্তি পোষণ ও বর্দ্ধনের আদিম অখণ্ড (undifferentiated) প্রচেষ্টা সভ্যতার প্রসারের ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে বিবিধ বিশেষ বিশেষ বিভাগে পরিচালিত হইয়া বহুমুখী হইল। বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রসাদে ও যান্ত্রিক কৌশল (mechanical skill) ও মানসিক শক্তির সাহায্যে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি ও সভ্যতার প্রভূত উন্নতি সাধন হইতে লাগিল; ও বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার সংস্পর্শে উন্নতির গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সভ্য জাতির রাজার ও রাজ্যের সম্পদ ও শক্তিরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কিন্তু কালক্রমে গচ্ছিত ধনে ন্যাসধারী রাজার আত্ম-বুদ্ধি জন্মিল এবং রাজকর এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে উহার মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া উহার অযথা ব্যবহার হইতে লাগিল ও ক্রমে সভ্য দেশে কর প্রদান বিষম কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। পুরাকালে রাজা-প্রজার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের জন্যই রাজতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল; পরে রাজা-প্রজার মধ্যে আত্মীয়তা (personal relations) লুপ্ত ও হৃদয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাজা-প্রজার সম্বন্ধ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধে পরিণত হইল। তাই রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে

সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে পাশ্চাত্য প্রদেশে রাজতন্ত্র অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে দুই-চারিটি এখনও বর্ত্তমান সেগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশী পুরুষানুক্রমিক প্রজাতন্ত্র (Hereditary republics)। করপ্রদান ও গ্রহণ এবং প্রজার হিতকর কার্য্য দ্বারা তাহার প্রতিদান এখন কোনওরূপে যন্ত্রচালিতের ন্যায় (mechanically) সম্পন্ন হয়। যদিও ইউরোপে মধ্যযুগ হইতে কোনও কোনও সভ্য-সমাজে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পার্থিব রাজশক্তি (Church ও State) পরস্পর বিভিন্ন হইয়াছে, এবং কোন কোন আদিম-সমাজেও গ্রামপুরোহিত ও গ্রাম-মুণ্ডা বা মণ্ডলের পদ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তবুও ইহাদের স্থায়ী ও প্রকৃত বিচ্ছেদ সম্ভাব্য নহে, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য সমাজের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমাজের রক্ষণ ও কল্যাণ সাধন। এতদর্থে দুই রকমের নিয়মাবলী টিঁকিতে পারে না। এখনও সকল সমাজেই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণশক্তির অন্বেষণ বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়।

সভ্যতার ধর্ম্মভিত্তি

অসভ্য জাতির মৃগয়া ও কৃষিকার্য্য, গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্য জাতির বিদ্যারম্ভ, ব্যবসায় আরম্ভ, গৃহারম্ভ, যুদ্ধারম্ভ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে, এবং সভ্য অসভ্য সকল জাতিরই জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, দীক্ষা, নবান্নভোজন প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল বিশেষ কার্য্যই ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া আদিম-সমাজে কলাবিদ্যা, শিল্প, ও সাহিত্যের উদ্ভব হয় এবং বহুকাল যাবৎ সভ্য সমাজেও ধর্ম্মই কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের প্রেরণা প্রদান করিয়াছে।

এই প্রবন্ধে সময়াভাবে সংক্ষেপে ইঙ্গিত মাত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সভ্য সমাজের পরিণত সমাজ-নীতি, শাসন-তন্ত্র ও ধর্ম্মকর্ম্মের বিশিষ্ট মূলগুলির উন্মেষ আদিম-সমাজেই দেখা যায়। আর ধর্ম্মানুষ্ঠানই ঐসব সমাজের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আদিম অসভ্য সমাজের প্রাণশক্তি সঞ্চয়ের আদর্শ ছিল ধনধান্য, স্বাস্থ্য, ঋদ্ধি ও সৌভাগ্য অর্জ্জন; তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাম্য ছিল শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। সমাজের প্রতিনিধি বা পুরোহিতের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল, প্রকৃতি-নিয়ামক আদ্যাশক্তির সহিত সমাজের যোগ স্থাপন দ্বারা প্রাণশক্তির পোষণ ও বর্দ্ধন। ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুখের আদর্শ মার্জ্জিত ও উন্নত হইল। ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রগাঢ় সামাজিকতার ও জড় উপকরণবহুলতার আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিল; ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা প্রকট হইল। ভোগসুখের পরিবর্ত্তে বিশ্বপ্রাণের সহিত মানবাত্মার আধ্যাত্মিক যোগস্থাপন দ্বারা এক দিকে প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্বাবলীর আবিষ্কার ও অপর দিকে আত্মসত্তা উপলব্ধি ও ভগবৎ-সত্তা জীবনে মূর্ত্ত করিবার প্রচেষ্টা হইল। যে সব ভাগ্যবান সাধক এই উভয়বিধ যোগ-সাধনার কোনও সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারাই তাঁহাদের জাতির প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সভ্যতার পরিমাপ সূচিত হয়।

হিন্দুসভ্যতার আদর্শ

আমরা দেখিলাম যে, মানব আত্মপ্রসারের প্রচেষ্টায় জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয় ও ইহাদের শৃঙ্খলার জন্য বিধিনিয়মের উদ্ভাবন করে। এইরূপে আদিম উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হইয়া আসে। সাধারণতঃ সভ্য সমাজে দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি স্বাধীনচেতা, আদর্শবাদী ব্যক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাতন্ত্র্যের চরম আদর্শ কল্পনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জন হয়ত অরাজকতারও (anarchism-এর) পোষকতা করেন। কিন্তু অধিকাংশ আদর্শবাদী, রাজশক্তির পরিবর্ত্তে নৈতিক শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। হিংসাদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সহযোগিতা-বহুল প্রেমের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের কাম্য। প্রাচীন ভারতে এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সন্ন্যাসী-সমাজ গঠন করিতেন। এখনও এইরূপ আদর্শ সন্ন্যাসী একেবারে বিরল নহে। গুরু গোবিন্দের ন্যায়—

এঁদের কাছেতে ধরা দিবে ব'লে,
আসে লোক কত শত।

আর ইঁহারাও সকলকে ডাকিয়া বলেন,—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।

এইরূপে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের জীবনে নিজ-জীবনের আস্বাদনে তৎপর। সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও ইঁহারা সকলকে পান; প্রতি জীবে শিব দর্শন করিয়া ব্যক্তিত্বের ও একত্বের চরমভাবে উপনীত হন; "নমস্তভ্যম নমোমহ্যম" করিয়া থাকেন। এইরূপ আপনভোলা পুরুষ-সিংহ বাধাবন্ধের উর্দ্ধে থাকিয়াও স্বেচ্ছায় সমস্ত বিধি-নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া সমস্ত বিধি-নিয়মকে পূর্ণতা প্রদান করেন।

উপসংহার

এইরূপে দেখা যায় যে মানব-জীবনের ক্রমবিকাশ আত্মসংরক্ষণ-নীতি (Law of Self-preservation) দ্বারা প্রণোদিত ও প্রথমাবস্থায় পরিচালিত হইলেও ক্রমে আত্মার সংজ্ঞা বিস্তার লাভ করিতে থাকে; ও কোন কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ দেশকালপাত্রের আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের সহিত একত্বানুভূতির দিকে অগ্রসর হন। ক্ষুদ্র অহঙ্কারবুদ্ধি বিরহিত হইয়া ইঁহারা "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" ইহা উপলব্ধি ও ভূমানন্দ আস্বাদন করেন। ত্যাগ ও সেবাই জীবনের পূর্ণতা লাভের মূলসূত্র, এই সমস্ত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনই তাহার প্রমাণ। এই বর্ণগন্ধগীতময়, হাসি-ক্রন্দন-ভরা সৃষ্টির অন্তরালে যে মরণহরা মহান বিশ্বগীতি নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে তাহার এক বা একাধিক ছন্দ বা মূল সুর এই সাধক প্রবরদের জীবন বীণায় ঝঙ্কৃত হয়। ধ্যানলব্ধ ঐশী বাণীর প্রেরণায় ও ঐশী শক্তির সাহায্যে ইঁহাদের মধ্যে কেহ ভাবরাজ্যে কেহ বা চিন্তারাজ্যে, কেহ কর্ম্মজগতে কেহ বা জ্ঞান ও ধর্ম্মজগতে স্বজাতির বা সমগ্র মানবজাতির উত্তোলন দণ্ড (lever)স্বরূপ হন। এইরূপ মহাপুরুষগণ নিরত আনন্দময় কোষে বিচরণ করেন এবং স্বজাতীয় সভ্যতার আদর্শকে অধিকতর পরিস্ফুট, উন্নত, উজ্জ্বল ও প্রসার-যুক্ত করিয়া জাতি ও সমাজকে সভ্যতা-সোপানের এক বা একাধিক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেন।

মানব-প্রকৃতিতে দেব ও পশু একাধারে সম্মিলিত। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কেবল বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন নহে; ব্যক্তিগত ও সমাজের পশুপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির স্ফুরণ ও আধিপত্য স্থাপন, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, ও সমস্ত বিশ্বমানবের একত্ব স্থাপন,—ইহাই প্রকৃত স্বরাট্ বা স্বরাজ্য লাভ। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সভ্যতার আদর্শ। প্রাণের যে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য মানব আদিম অবস্থা হইতে অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে নিয়ত সচেষ্ট, এই একত্ববোধেই সেই পরিপূর্ণতার উপলব্ধি হয়। সেই একত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিলে ভাগ্যবান সাধক সমস্ত 'বাধাবন্ধ' 'প্রথা-নিয়মে'র উর্দ্ধে উপনীত হন। তখন তাঁহার—

দিকে দিকে টুটিয়া সকল বন্ধ;
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠে নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

তখন জ্ঞানযোগের সাধক যোগযাগ, ভজনপূজন, সাধন-আরাধনা সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া জগৎ-হিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন। তখন তিনি কর্ম্মযোগে ভগবানের সহিত যুক্ত হন। আর "যুক্ত হন সবার সঙ্গে, মুক্ত হয় সকল বন্ধ"। তখন, "এ জীবনে যা কিছু সুন্দর সকলি বাজিয়া উঠে সুরে,—তাঁহার পানে, তাঁহার পানে, তাঁহার পানে।"

তাঁহার বাণী দেয় সে আনি সকল বাণী বহিয়া।
হৃদয়ে এসে, মধুর হেসে, প্রাণের গান গাহিয়া।

এই সব ভাগ্যবান সাধকের কথা ছাড়িয়া সাধারণ মানবের দিকে ফিরিলে দেখিতে পাই, অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য মানব নানা দেবতাতে যে বিভিন্ন রূপ ও সত্তা আরোপ করে, জ্ঞানালোকে আলোকিত সভ্য মানব সে সমস্ত দেব-দেবীকে একই অখণ্ড পরা-শক্তির বিভিন্ন প্রতীক বলিয়া উপলব্ধি করেন। যে পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা এখনও তাঁহাদের সাধু বা সেণ্টদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধূপ-দীপ প্রদান করেন ও হাঁটু গাড়িয়া আরাধনা করেন, তাঁহারা হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও সাধারণ হিন্দু দেখেন—

জলে হরি স্থলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি
অনলে অনিলে হরি, হরিময় ভূমণ্ডল।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষির সঙ্গে আমরা বলি—

যো দেবোঽগ্নৌ, যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ

অভিনেতা

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

সন্ধ্যার অন্ধকারে পুকুরপাড়ে একাকী বসিয়া সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করিতেছিলাম ও আকাশপাতাল ভাবিতেছিলাম। দেবীপক্ষ শেষ হইয়া গিয়াছে; কালীপূজার কয়েক দিন আগে। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু তারার আলোয় ধরণীকে অস্পষ্ট আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, মসীকৃষ্ণ হইতে দেয় নাই।

আমার চিন্তার কারণ খুব বেশী গুরুতর নহে। কালীপূজার সময় গ্রামের ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক মহাসমারোহে দুইখানি যুগান্তকারী নাটকের অভিনয়। নাটক দুইখানি হয়ত যুগান্তকারী হইতে পারে, অথবা না-হইতেও পারে, কিন্তু অভিনয় যাহা হইবে, তাহাকে ঠিক যুগান্তকারী, এমন কি দিনান্তকারীও বলা যাইবে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহার কারণ অবশ্য ইহা নহে, যে, আমাদের গ্রামের সখের থিয়েটারের দল অত্যন্ত আনাড়ী এবং অভিনয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমাদের গ্রামে, বিশেষ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই, জনকয়েক বেশ ভাল অভিনেতা আছেন, এবং আমিও নাকি তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারি। অবশ্য, নিজের মুখে একথা না বলিলেই হয়ত শোভন হইত।

কিন্তু আসল বিপদ এই যে, আমাদের গ্রাম দীর্ঘকায় লোকের গ্রাম। এখানকার সখের থিয়েটারে নায়কের ভূমিকায় সুপুরুষ অভিনেতা মিলে, গুণ্ডার ভূমিকার জন্য ভীষণদর্শন লোকেরও অভাব নাই। যাহা মিলে না, তাহা স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করার লোক। আমি নিজে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মানুষ হইয়া পাঁচ ফুট সাড়ে-এগার ইঞ্চি নায়িকার সহিত প্রেম করিলে অভিনয় কি প্রকার জমিবে, সে-বিষয়ে একটু আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এবং বিশেষ করিয়া এই কথাটাই এই স্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জ্জন আকাশতলে আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এমন কঠিন চিন্তাও আমার মনকে বেশী ক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। কারণ শহরের লোক আমি, বৎসরান্তে একবার বড়জোর গ্রামে আসি, পুকুর-পাড়ে গভীর কালো জলের পাশে বসিয়া দূরের অসংখ্য খেজুর ও নারিকেল গাছ, বিস্তীর্ণ বাঁশঝাড়, হেমন্ত-সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার সহিত, দূর আকাশের তারার সহিত, পুকুরের ওপাড়ে যে মেয়েটি ছায়ার মত মাটির কলসীতে জল ভরিতেছে, সেই ছল ছল শব্দের সহিত, মিলিত হইয়া যে মায়া রচনা করিতেছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার শক্তি আমার খুব বেশী ছিল না। শুধু ভয় হইতেছিল, এখনই কে আসিয়া পড়িবে, আমার পল্লীস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া যাইবে।

নিজের গ্রামকে এ দৃষ্টিতে আগে কখনও দেখি নাই। আমার মনে হইল, এই বিস্তীর্ণ বাড়ী, এই পুকুর, বাগান, দূরের অদৃশ্য ধানক্ষেত, সমস্ত জিনিষে আমার অংশ রহিয়াছে, আমি এই পশ্চিমের বাড়ীরই সন্তান। জলের উপর আবছা অন্ধকারে যে সাদা রঙের নাল ফুল ফুটিয়া পুকুরের অবিচ্ছিন্ন কালোকে স্বল্প শুভ্রতা দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি পাপড়ি, অতি সূক্ষ্ম রেণুটুকুতে পর্য্যন্ত আমি অধিকারী, এ সকলের সহিত, এই বাড়ীর সম্পর্কিত দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তকিছুর সহিত, আমার অতীত, আমার বর্ত্তমান, আমার অনাগত ভবিষ্যৎ, সমস্ত ওতপ্রোত। ইচ্ছা করিয়া দূরে সরিয়া গেলেও ইহারা আমাকে ছাড়িবে না, অথবা ইহাদের উপর আমার অধিকার এক বিন্দুও কমিবে না। আমার জীবনের উষাকালে আমি ইহাদের সহিত পরিচিত হই নাই, বাংলাদেশের বাহিরে, সাঁওতাল-পরগণার এক শহরে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখিয়াছিলাম। আমার জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান আমি নগরের মায়ায় কাটাইতেছি, দুঃখিনী পল্লীর সহিত ক্ষণিকের পরিচয়

করিয়া আবার তাহাকে ভুলিয়া নগরের প্রখর আলোকে দিক্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের মত যৌবনের সকল উদ্যম, সকল শক্তি ডালি দিতেছি। আবার হয়ত জীবনের গোধূলিতে, যখন পল্লী, নগর, সারা পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া বিদায় লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইব, তখনও হয়ত খুলনা জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটির পশ্চিম কোণের এই লাল রঙের বাড়ী, এই চণ্ডী-মণ্ডপ, ঠাকুরঘর, বাহিরে স্থলপদ্ম ও শেফালি ফুলে ভরা এই বৃহৎ বাগান, এই ভাঙা পুকুরপাড়, কালো জলের উপর কলমীশাক, নালফুল—ইহাদের কেহ আমার জাগ্রৎ মনের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও অধিকার করিয়া থাকিবে না। আমার পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাকে নিতান্ত স্বল্পপরিচিত, ক্ষণিকের খেলাঘরের সাথী বলিয়া মনে করিয়াছি, আজ মনে হইল সে আমার জীবনের, আমার মৃত্যুর, আমার নিদ্রা এবং জাগরণের প্রধানতম বন্ধু, আমার নিতান্ত আপনার জন, আমি পথভ্রান্ত, প্রবাসী। জানি, এ গ্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-বছরের মত গ্রামের স্মৃতি আমার মন হইতে বিদায় লইবে, যেমন করিয়া আমার পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত লইয়াছে। কিন্তু ইহার আগে কি কখনও নিঃসঙ্গ পুকুরপাড়ে ভাঙা সিঁড়ির উপর কৃষ্ণা-নবমীর দিন বসিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়াছি? হয়ত না!

'নায়েব-মহাশয়ের ঘর' হইতে তারস্বরে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বুঝিলাম, রিহার্সালের সময় হইয়াছে; এবং এখনই নিজের অপেক্ষা দেড় ইঞ্চি দীর্ঘতর এক ব্যক্তিকে নায়িকা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত গভীর ও কাব্যভাবপূর্ণ প্রেমের অভিনয় করিতে হইবে।

মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, "রিহার্সাল ত রোজই রহিয়াছে, আজিকার মত স্বপ্নমায়াপূর্ণ সন্ধ্যা আর তুমি কবে পাইবে? যাহারা ডাকিতেছে, তাহারা ডাকুক, কিন্তু তোমার আজ একা থাকিতে হইবে, শুধু আজিকার সন্ধ্যা; দূরে চলিয়া যাও, যেখান হইতে কাহারও চীৎকার তোমার কানে ঢুকিবে না।"

মন যাহা বলিল, সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনা রহিত হইয়া তাহাই করিয়া বসিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিলে বুঝিতে পারিতাম, যাহা করিতেছি, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক, ও চরম বুদ্ধিহীনতা।

একাকী সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় গাঢ় বনভূমির ভিতরের সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কত ক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না, সহসা মনে হইল আধ ঘণ্টা আন্দাজ হাঁটিয়াছি। এত ক্ষণ চলিলে কতকগুলি পরিচিত বাড়ী চোখে পড়া উচিত, তাহারা যথাস্থলে রহিয়াছে কিনা দেখার জন্য পকেট হইতে ছোট টর্চটি বাহির করিলাম, এবং সভয়ে দেখিলাম, পথ ভুল করিয়াছি। যে-পথ দিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে দিনের বেলায় চেষ্টা করিলে হয়ত বাড়ী ফিরিতে পারিতাম, কিন্তু পল্লীর সহিত আমার যে স্বল্প পরিচয়, তাহা লইয়া এখান হইতে ঠিক পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাড়ী ফেরা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সেই ক্ষুদ্র টর্চটিকে সম্বল করিয়া ফিরিলাম, এবং আবার প্রায় আধ ঘণ্টা চলিবার পরও যখন পরিচিত কিছু চোখে পড়িল না, তখন বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি।

শহরের লোক আমি, এত দিন রাত্রির নিজস্ব মূল্য তাহাকে দিই নাই। নগরী রাত্রিতে বিলাসিনীর মত আলোকমালায় দেহ সাজাইয়া সেই আবরণে নিজের রূপের দৈন্য লুকাইয়া রাখে। এইটুকু শুধু সেখানে দিবা ও রাত্রির প্রভেদ। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময়ে রাস্তার উপরে সেখানে আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি না, সে উৎকণ্ঠা সঞ্চার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু এই বনানীবেষ্টিত পল্লীর আছে।

ভীতু ছেলে যাহাদের বলে, আমি সে-রকম নই। কিন্তু যেটুকু দৈহিক ও মানসিক সাহস এত দিন পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, দেখিলাম, সমস্ত সম্বল করিয়াও আমি একান্তভাবে নিঃসহায়।

অনেক ক্ষণ জ্বলিয়া আলোর শেষরশ্মিটুকুও নিবিয়া গেল। এই বিরাট অন্ধকারে, গভীর বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে হইল, এশুধু অকৃতজ্ঞ পুত্রের উপর পল্লীমাতার প্রতিশোধ। এত দিন ধরিয়া যাহার স্নেহ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহার কঠোর তিরস্কার অন্ততঃ খুব উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে না, তাহা সে জানে।

অত্যন্ত মৃদু বাতাস বহিতেছিল, ঘন পাতার আবরণের ভিতর দিয়া বাতাস আসিয়া যে অনৈসর্গিক সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা খুব ভাল লাগিল না। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। কিন্তু বুঝিলাম, দাঁড়াইয়া থাকিলে সে ভয়ের কোন কিনারা হইবে না, এবং সকলের বড় যে ভয়, অর্থাৎ সাপের ভয়, তাহা কমিবে না। তাহার চেয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে চলা ভাল। আবার পথ ধরিলাম।

পল্লীর পথে, বিশেষ করিয়া বনপথে, সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল থাকে না। তাই ইহার পরে আরও প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরিয়াও এমন একটি লোকের দেখা পাইলাম না, যাহার কাছে বাড়ীর পথের খবরটা একটু জানিয়া লইব।

নিজেরই মনে হইল, "কি লজ্জার কথা! নিজের বাড়ী হইতে সামান্য একটু দূরে আসিয়া তুমি নিজের বাড়ীর পথ হারাইয়া ফেল, এই ত তোমার পল্লীজননীর সঙ্গে সম্বন্ধ! আজ যদি সে পঁচিশ বৎসরের অবহেলার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়া থাকে, তোমার তাহাতে কি বলিবার আছে?" কিছুই নাই!

রাত্রি গভীর হইয়াছে। হয়ত খানিক পরে চাঁদ উঠিবে, কিন্তু এই ঘনসন্নিবিষ্ট অগণিত গাছের আড়াল দিয়া যে আলোটুকু আসিবে, তাহাতে যখন পথ দেখার কোন সুবিধা হইবে না, তখন চাঁদ উঠিলেই বা কি, আর না-উঠিলেই বা কি? তবু হাঁটিয়া চলিলাম, জানিতাম, একবার দাঁড়াইলে আর হাঁটার শক্তি খুঁজিয়া পাইব না, পা দুটিকে একটু বিশ্রাম দিলে তাহারা একেবারে জবাব দিবে। ক্লান্তির অবধি ছিল না, তবু সমস্ত ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া নানা অজ্ঞাত জিনিষের উপর সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিলাম।

কি অদ্ভুত এই বনের নিস্তব্ধতা! স্তব্ধতা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, ভাবিলাম একটু বেসুরো গলায় চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া একটু পরিচিত শব্দ শুনি। কিন্তু একবার মুখ খুলিতেই নিজের গলার স্বরে এতটা চমকাইয়া উঠিলাম যে মনে হইল, স্তব্ধতাই ভাল, আমার আওয়াজে কাজ নাই। যদি একটা লোকেরও দেখা পাইতাম, তাহাকে কিছু বক্‌শিশ দিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিতাম। অন্ততঃ বাড়ীর পথটার সম্বন্ধে একটু সচেতন হইতে পারিতাম। হয়ত আমি বাড়ী হইতে বেশী দূরে নাই। শুধু বনের গোলকধাঁধার মধ্যে অবিরত ঘুরিয়া মরিতেছি!

এত বিপদের মধ্যেও শুধু দুটি কথা আমার মনে সবচেয়ে বেশী করিয়া জাগিতেছিল। বাড়ীর সকলে, বিশেষ করিয়া মা এবং অন্যান্য মেয়েরা কি পরিমাণ চিন্তিত হইয়াছেন, এই হইল সবচেয়ে বড় চিন্তার কথা, এবং দ্বিতীয়, যদি কোনও উপায়ে বাড়ী ফিরিতে পারি, তবে পুরুষদের কাছে শহুরে ভূত নামে সম্বর্দ্ধিত হইয়া কি প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিব। একেই ত যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও খাঁটি খুলনার ভাষা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে মুখ দিয়া বাহির করিতে পারি না বলিয়া বেশ একটু ঠাট্টা সহ্য করিতে হয়। তাহার উপর আবার এই।

হঠাৎ মনে হইল জঙ্গল পাতলা হইয়া আসিয়াছে, এবং কয়েক পা আগাইয়া দেখিলাম, জঙ্গল ছাড়িয়া খোলা মেঠো রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। মনে ভরসা হইল। যদি কোন লৌকিক অথবা অলৌকিক উপায়ে লোকালয় চোখে পড়ে, তবে বাড়ী ফিরিবার আর বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবে না। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ কপালে আছে, কিন্তু তাহা লইয়া ভাবিয়া মরিলে লাঞ্ছনার মাত্রা কমিবে না।

রাত্রি বোধ হয় বারোটা। যখন পা আর চলে না, ঠিক্ সেই সময়ে দূরে গাছপালার আড়াল দিয়া লোকালয়ের আলো চোখে পড়িল। বুঝিলাম, এত ক্ষণে মানুষের বাড়ীর কাছে আসিয়াছি। বাড়ীতে যে-ই থাক্ এবং যে-অবস্থাতেই থাক্, আমার এই জঙ্গল-জীবন ছাড়িয়া সভ্য জগতের আলো দেখিতেই হইবে, তাহা যত দূর অভদ্রতাই হোক্ না কেন!

কাছে আসিয়া দেখিলাম পাকা বাড়ী। সেই মধ্য-রাত্রির অন্ধকারেই বুঝিলাম অত্যন্ত পুরাতন, এবং জীর্ণ। দেওয়ালে বালির আবরণ নাই, ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর বাহিরে খানিকটা জমি লইয়া বাঁশের বেড়া।

এত রাত্রে লোকের বাড়ী গিয়া ঢোকা অন্যায় এবং অভদ্রতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-অবস্থায় পড়িয়াছি তাহার অভিধানে অন্যায় এবং অভদ্রতা বলিয়া কোন কথার অস্তিত্ব নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দরজায় ধাক্কা দিলাম, এবং প্রায় একই সঙ্গে দরজা খুলিয়া লণ্ঠন-হাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেখা দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, এত রাত্রে—?" বলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে, সুনীল না?"

আমি যে সুনীল নহি, এ-কথা বলিবার আগেই আলো আরও বেশী করিয়া আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "না, আমারই ভুল হয়েছে, কিছু মনে ক'রো না বাবা। কিন্তু এত রাত্রে—?"

বুঝাইয়া বলিলাম। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিলাম, নিজের গ্রামে আসিয়া পথ হারাইয়া সন্ধ্যা হইতে বন-জঙ্গল দিয়া ঘুরিতেছি। এখন তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে একটি লোক দিতে পারেন, অন্ততঃ গ্রামের পথটা যদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন—।

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ী কোন্ গ্রামে?"

"জলগাঁ।"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "জলগাঁ? সে ত এখান থেকে ছ-সাত মাইলের উপর! আপনি ত কম পথ হাঁটেন নি!"

স্বীকার করিতে হইল, অনেকখানি পথই হাঁটিয়াছি, এবং বনের ভিতর লক্ষ্যহীন ভাবে না-ঘুরিয়া সোজা পথে হাঁটিলে চৌদ্দ-পনর মাইল হাঁটা হইত।

তিনি হাসিলেন। বলিলেন, "সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে আর লোক কোথা থেকে দেব, কাল সকালে বরং যাবেন। আজকের রাতটা কোনও রকমে এখানেই কাটিয়ে যান।"

বলিলাম, "আপনার অনেক অসুবিধে হবে। তা ছাড়া বাড়ীর সবাই কি পরিমাণ ভাবছেন, সে-কথা ভেবে আমারই ভাবনা হচ্ছে। পথটা যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন—"

তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়ে দিলেই যে আপনি ঠিক ভাবে যেতে পারবেন তা কে বললে? কল্‌কাতার রাস্তা নয়! আবার পথ হারিয়ে গেলে কে আপনার আত্মীয়দের ভাবনা কমবে? আমার অসুবিধে হবে না, আপনি আজকের রাতটা থেকে যান।"

যুক্তি মানিতে হইল। কহিলাম, "উপায়ই যখন নেই, তখন আপনার অসুবিধে ক'রেও থাক্‌তে হবে। আমার জন্য ভাববেন না, এই বারান্দার তক্তাপোষে—"

তিনি শশব্যস্তে কহিলেন, "সে কি কথা, আপনি এখানে থাকবেন কেন? বাইরের ঘরের খাটে ফরাস পাতা আছে, আজ কষ্ট ক'রে সেইখানেই রাতটা কাটান। আপনি অতিথি, আপনাকে যত্ন করতে পারছি না, তার উপর আবার বাইরে তক্তাপোষে? ক্ষেপেছেন? আপনি আসুন ভিতরে।"

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া তিনি একটা চৌকির উপর আলো রাখিয়া বলিলেন, "আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি এখনি।"

ঘরটির চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম। এমন দৈন্যদশা-পূর্ণ ঘর জীবনে খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। দেওয়ালের চুণ বালি খসিয়া পড়িয়াছে, এবং ছাদের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝে পর্য্যন্ত ঝুল নামিয়া ঘরখানিকে অত্যন্ত কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে। দেওয়ালে বহু পুরাতন ধূলিধূসরিত কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি, এবং একটি ছোট ফটোগ্রাফ।

একটু অসঙ্গত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ফটোখানি ভাল করিয়া দেখিলাম। একটি নববিবাহিত দম্পতীর চিত্র। মেয়েটি সুন্দরী, বছর ষোল-সতের বয়স। কিন্তু আমি অবাক হইলাম ছেলেটিকে দেখিয়া। মনে হইল, অনেকটা ইহারই মত চেহারার একটি লোককে আমি খুব ভাল করিয়া চিনি। কিন্তু সে যে কে, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। হাল ছাড়িয়া দিয়া খাটে আসিয়া বসিলাম, এবং সেই মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, কাহার কথা ভাবিতেছি। সে আমি নিজে। এবং এ-কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিলাম ইহারই নাম সুনীল, এবং ভদ্রলোক আমাকে এই লোকটি ভাবিয়াই ভুল করিয়াছিলেন।

অকৃতজ্ঞের মত মনে হইল, ভদ্রলোকের এতখানি সৌজন্য, এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতকে বিনাবাক্যব্যয়ে রাত্রিতে আশ্রয় দেওয়া, এ সকলের মূলে রহিয়াছে এই সুনীলের সহিত আমার চেহারার সাদৃশ্য।

এমন সময় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "জল-গাঁয়ের কোন্ বাড়ীর ছেলে আপনি ?"

"পশ্চিম বাড়ীর।"

"অনন্তবাবু আপনার কে হন ?"

"জ্যেঠামশায়।"

"কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নাম—?"

নাম বলিলাম।

তিনি খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এ-গ্রামের নাম কি ?"

"কালীহাট।"

খানিকটা আত্মগত ভাবেই তিনি বলিলেন, "আপনার জ্যেঠামশায় আমাকে চিন্‌তেন। সমস্ত বন্ধুবান্ধব যখন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু তাঁর কাছ থেকেই আমি সহানুভূতি পেয়েছি।"

সহসা তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় আমার নাম শোনেন নি, আমার নাম সারদাচরণ বসু। চেনেন ?"

মনে পড়িল না।

তিনি কহিলেন, "আপনার একটু খাবার জোগাড় করতে পারলে হ'ত, কিন্তু—"

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "একটুও দরকার নেই, একটুও না। আমার এখন একমাত্র দরকার ঘুম। আর কিছু না।"

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা ছাড়া এদিকের কেউ ত আমার হাতে খায় না, আমি একঘরে।"

সবিস্ময়ে কহিলাম, "একঘরে ?"

"হ্যাঁ।"

এইবার তাঁহাকে চিনিলাম। কালীহাটের সারদা বসু। সুন্দরী মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন বড় ঘরে কলিকাতায়। ছেলেটি সুশ্রী এবং সচ্চরিত্র। তাঁহার মেয়ে এবং জামাতার মধ্যে মনের বে-মিল হইয়াছিল, এতখানি নাকি সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু বিবাহের দু-তিন বছর পরে মেয়ের নামে কুৎসা রটে, এবং ফলে পিতৃভক্ত জামাই আবার বিবাহ করেন, এবং কলঙ্কিনী মেয়েকে ঘরে স্থান দেওয়ার অপরাধে সারদাবাবু একঘরে। যত দূর শুনিয়াছি তিনি ও তাঁহার মেয়ে ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ নাই, এবং এই প্রৌঢ়ের উপর সংসারের সমস্ত ভার। মেয়েটি ঘটনার পর হইতেই রুগ্না।

সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রকৃতই মেয়েটির কোন অপরাধ ছিল কি না, জানি না; যদি থাকে, তাহা হইলে সুনীলকেও খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তবু এইখানে এই বাড়ীতেই বসিয়া সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া মনটা বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বোধ হয় একটু বেশী ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনিও নিশ্চয়ই একঘরের বাড়ী খাবেন না—?"

সমস্ত মনটা লজ্জায় নীচু হইয়া গেল; জোর করিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়ই খাব। আপনি এখনই দিন।"

সেই রাত্রে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বনের ভিতর ঘুরিয়া যে ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহাতে আহারের উপকরণ বিচার করা চলে না। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত বাসি মুড়ি গুড় দিয়া খাইয়া এক ঘটি জল নিঃশেষ করিয়া কহিলাম, "আর না, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, যত দূর সম্ভব। আপনি আর কষ্ট করবেন না, শুয়ে পড়ুন গে; আমিও একটু শুই।"

তিনি ম্লান মুখে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঘুমোবার ত উপায় নেই, মেয়ের অসুখ, তার ঘরেই এক বার যাই।"

অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলাম। মেয়ের কঠিন অসুখ, এবং তাহার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক আসিয়া এইরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছি, পাড়াগাঁয়েও সকলে ইহা সহ্য করে না; শহরে ত ইহা রূপকথা।

অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অসুখ ? অসুখ কি খুব বেশী ?"

"বেশী নিশ্চয়ই, কিন্তু অসুখটা যে ঠিক কি, সেইটেই ত জানি নে। ভুগছে অনেক দিন ধ'রে। ডাক্তার ত নেই, যে দেখাব!"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন এদিকে ডাক্তার নেই?"

"আছে; কিন্তু একঘরের বাড়ী কেউ চিকিৎসা করতে আসে না।"

যে-দুর্ব্বুদ্ধি আজ আমাকে সন্ধ্যার সময় ঘরছাড়া করিয়াছে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া বলিলাম, "দেখুন, আমি মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট। অবশ্য চিকিৎসার বিশেষ কিছু জানি নে। তবু আপনার মেয়েকে একবার দেখতে পারি কি?"

প্রৌঢ় যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। সাগ্রহে কহিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমার মেয়ের অসুখ হওয়া অবধি এক দিন ডাক্তার দেখাতে পারি নি, অথবা ভাল ওষুধ খাওয়াতে পারি নি। আর্থিক অবস্থা যে কি রকম, তা ত বুঝতেই পারছেন।" বলিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন।

আমার কিন্তু চোখে জল আসিল।

মেয়েটিকে দেখিয়া বুঝিলাম ইহার রোগনির্ণয় করিতে পাস-করা ডাক্তার, এমন কি মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টেরও প্রয়োজন হইবে না। ইহার চোখে, মুখে, সমস্ত দেহে, একটি মাত্র রোগের আগমন-চিহ্ন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা যক্ষ্মা।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রোগ যে কি তা হয়ত আমিও জানি, হয়ত যা ভাবছি, তাই। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।"

উভয়ে বাহিরে আসিলাম।

আত্মগত ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মীরা আমার কি সুন্দরীই ছিল! ভাল বিয়ে দিলাম সতের বছর বয়সে; তার পরে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি জানি। কিন্তু আপনার ও-কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই।"

অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে তিনি বলিলেন, "আপনি জানেন আমার মেয়ের কলঙ্কের কথা?"

বিব্রত হইয়া বলিলাম, "হয়ত জানি, কিন্তু সে-কথার আলোচনা এখন থাক।"

তিনি খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার জামাই সুনীলের চেহারার খানিকটা মিল আছে, তাই প্রথমটা আপনাকে দেখে চম্‌কে গিয়েছিলাম। কিন্তু চেহারায় তফাৎও আছে। সে আপনার চেয়ে একটু ফরসা, আর অত লম্বা নয়। আচ্ছা, আপনার বয়েস কত হ'ল?"

"পঁচিশ।"

"সুনীলের বয়েস এত দিনে হ'ল উনত্রিশ। আর আমার মীরার বয়েস হ'ল তেইশ।"

ভাবিলাম তিনি আবার তাঁহার মেয়ের কলঙ্কের কথা তুলিবেন, কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না। লণ্ঠনের আলোয় দেখিলাম তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

পাশের ঘরে অস্ফুট শব্দ শুনিয়া সারদাবাবু বুঝিলেন, মীরার ঘুম ভাঙিয়াছে। তিনি উঠিয়া তাহার কাছে গেলেন। আমি খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘুমের ইচ্ছা দমন করিয়া সেই ঘরেই ঢুকিলাম।

মীরার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সে যে এককালে সুন্দরী ছিল, তাহার যক্ষ্মাক্লিষ্ট দেহ দেখিলেও তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমি আর একবার তাকাইয়া দেখিলাম।

এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে তাকাইয়া মীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এসেছ, তুমি ফিরে এসেছ?"

একটুও বিস্মিত হইলাম না। আমি এই জিনিষটারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম।

সারদাবাবু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সোজা মীরার কাছে গিয়া তাহার বিছানায় বসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মীরা, আমি এসেছি, আমি সুনীল।"

সারদাবাবুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করিবার মত সময় আমার তখন ছিল না। আমার শুধু একটি কথা মনে হইল। এই মেয়েটি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিত্যক্তা। নিঃসন্দেহ সে তার স্বামীকে ভালবাসিয়া-

ছিল, পল্লীর অর্দ্ধশিক্ষিতা গরিবের ঘরের মেয়ে যেমন ক্রুরিয়া ভালবাসিতে পারে, তেমনই করিয়া। তাহার কলঙ্ক সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিছু আসিয়া যায় না। তাহার রুগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে দেরি হয় না যে তাহার অবশিষ্ট জীবন বৎসর বা মাস দিয়া গণনা করার প্রয়োজন নাই, বড়জোর কয়েকটি দিন বাকী। মনে হইল এই অসহায়া দুঃখিনী মেয়েটির জীবনে যদি কয়েক ঘণ্টার সামান্য আনন্দও দিতে পারি, তবে সে আনন্দ তাহার জীবনের অবশিষ্ট অতি অল্প কয়টি দিনের চরম দুঃখকেও ছাপাইয়া উঠিবে। আমার ও সুনীলের মুখের সাদৃশ্যটুকু সারদাবাবুর চোখে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি তফাৎও বুঝিয়াছিলেন। এই রুগ্না মেয়েটি তাহার অন্তর দিয়া শুধু সাদৃশ্যই গ্রহণ করিয়াছে, তাহার এই অসহ্য আনন্দের মুহূর্ত্তটিকে চূর্ণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

সাগ্রহে আমার হাতদুখানি বুকের উপরে লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মীরা কহিল, "এত দিন তুমি কেন আমাকে ত্যাগ ক'রে ছিলে, একবারও কেন এলে না?"

কহিলাম, "এই ত এসেছি মীরা!"

সে তেমনই করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এত দিন? আমি কত চিঠি লিখেছি, একখানারও কোন জবাব দাও নি কেন?"

উত্তর দিবার বিশেষ কিছু ছিল না। আমি শুধু তাহার রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম।

মীরা কহিল, "আমি বুঝতে পারছি, আমি স্বপ্ন দেখছি, সত্যি কখনও এত সুখের হ'তে পারে না—অন্ততঃ আমার জীবনে না।"

বলিলাম, "না মীরা, তুমি স্বপ্ন দেখছ না, আমি সত্যিই ফিরে এসেছি।"

অনুভব করিলাম, আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সারদাবাবু ঠিক এক ভাবেই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফিরিয়া, অত্যন্ত অন্যায় এবং অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে তাঁহাকে আদেশ করিলাম, "আপনি ঘুমোন গে যান।"

সত্যসত্যই বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত দেখিয়া তিনি এতটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, যে, প্রতিবাদ করার, অথবা কৈফিয়ৎ চাওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার অবশিষ্ট ছিল না।

অভিনয় আরম্ভ করিলাম। অভিনয় করিয়া কখনও এত তৃপ্তি পাই নাই, অথবা কোন শ্রোতাকে এত তৃপ্তি দিতে পারি নাই।

হয়ত আমার সে অভিনয় অতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। হয়ত নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিধি অনুসারে আমি কঠিন অপরাধে অপরাধী। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। হয়ত ভগবানের চোখেও আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। কিন্তু আমার মনের গড়া এক নীতিশাস্ত্র আছে, যাহা চলিত প্রথার সহিত মিলে না। তাহা আমার কাছে সাধারণ নীতি, সমাজবিধি এ সকলের অনেক উপরে, এবং তাহার চোখে, আমার নিজের মনের চোখে, আমি নিরপরাধ। ইহাই আমার কাছে যথেষ্ট।

সেই গভীর রজনীতে, জীর্ণ ক্ষুদ্র ঘরে, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় এক মৃত্যুপথযাত্রী শ্রোতার সম্মুখে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করিয়া চলিলাম। নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক। শ্রোতার একবারও মনে হইল না, ইহা মিথ্যা, ইহার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। অনেক প্রকার কল্পিত নায়িকার সহিত অনেক প্রেমের অভিনয় করিয়াছি, কিন্তু এই বাস্তব অভিনয়ের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার এ বউ খুব সুন্দরী, না?"

বলিলাম, "ছিঃ মীরা, ও কথায় আমি কষ্ট পাই, জান?"

আমি যাহাতে কষ্ট পাই, মীরা তাহা প্রাণ গেলেও করিতে পারিবে না। মীরা দ্বিতীয় বার ওকথা মুখে আনিল না। কহিল, "আজকের রাত্রি আমি ঘুমুব না। তোমাকেও ঘুমুতে দেব না। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমার জীবনের শেষ রাত। আজকে তুমি সমস্ত ক্ষণ আমার কাছে থাকবে, সমস্ত ক্ষণ।"

কহিলাম, "না মীরা, আজ আমি ঘুমুব না, তোমার কাছেই থাকব।"

মীরা কহিল, "তুমি আমাকে ছেড়ে আর যাবে না? আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকবে?"

সহসা কিছু জবাব দিতে পারিলাম না।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মীরা করুণ কণ্ঠে কহিল, "তুমি কথা বলছ না, তুমি নিশ্চয় আবার আমায় ছেড়ে চলে যাবে!"

এ-পর্য্যন্ত অনেকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আর একটি মিথ্যায় দোষের মাত্রা বিশেষ কিছু বাড়িবে না। তবু এই কথাটি বলার সময় গলা কাঁপিয়া গেল, বলিলাম, "না মীরা, আমি চলে যাব না, তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকব।"

মীরা আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু আমি জানি, আমি মীরার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকিব না। দিনের আলোয় তাহার চোখের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস আমার নাই। শুধু অকল্পিত সুখস্বপ্নের মত আসিয়া তাহাকে ক্ষণিকের মত সীমাহীন আনন্দের অধিকারিণী করিয়া রাত্রি-প্রভাতেই সুখস্বপ্নেরই মত মিলাইয়া যাইব। কিন্তু এই ক্ষণিকের সুখ তাহার জীবনের বাকী কয়টি দিন মধুর করিয়া রাখিবে।

আমাদের জীবনে আলোকের আবির্ভাব অহরহ হয় না, দুঃখের অন্ধকার রাত্রির মধ্যে ক্ষণিক তড়িতের মত সমস্ত দুঃখ রাঙাইয়া তুলে। সেই আনন্দের মুহূর্ত্তটুকু আমরা বহু দিনের সম্বল করিয়া রাখি আর একটি বিদ্যুৎ-চমকের প্রতীক্ষা করিয়া।

মীরার জীবনে বিদ্যুতের আবির্ভাব আর হইবে না। কিন্তু যাহা সে পাইল, তাহার মূল্য তাহার জীবনের মসীলিপ্ত বাকী দিনগুলির চেয়ে অনেক বড়।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। একটি লাল রঙের ভাঙা টুকরা মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের ঘোর কালো আঁধার তাহার আগমনে পলায়ন করিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি প্রেমের অভিনয় করিলাম। ভোরের দিকে মীরা ঘুমাইয়া পড়িল। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, সে-ঘুম যেন তাহার না ভাঙে।

বাড়ী যখন ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় আটটা। শুনিলাম, সারা রাত ধরিয়া তিন-চার জন আমার খোঁজ করিয়াছে, এবং তাহাদের খুঁজিয়া আনিবার জন্য আরও তিন-চার জনকে পাঠানো হইয়াছিল, কিছু ক্ষণ আগে তাহারা সকলে ফিরিয়াছে।

বাবা ও জ্যেঠামহাশয় কথা কহিলেন না। মা, খুড়ী ও জ্যেঠীর দল, সকলে মিলিয়া যে-পরিমাণ গালাগালি ও লাঞ্ছনা করিলেন, তাহা শুনিলে চোরেও অপমানিত বোধ করে। আমি সমস্ত রাত যেখানে ছিলাম, সেখানেই যেন থাকি, এবং আমার দগ্ধ আনন যেন আর তাঁহাদিগকে, বিশেষ করিয়া মাকে, দর্শন করিতে না হয়, ইত্যাদি।

আমি স্থাণুর মত নিশ্চল, ও গীতায় উক্ত মহাপুরুষের মত নির্ব্বিকার ভাবে সমস্ত শুনিয়া গেলাম। কারণ, বলিবার মত কথা তাঁহাদের অনেক ছিল, এবং আমার একটিও ছিল না।

রাঙাদা তর্জ্জন করিয়া কহিল, "তোর জন্যে কালকের রিহার্সালটা মাটি।"

গম্ভীরভাবে কহিলাম, "রাঙাদা, অভিনয় দু-রকমের আছে। এক রকম অভিনয়, যা তোমরা বাঁশের খুঁটির উপর ভাঙা খাট পেতে, ছেঁড়া সিন টাঙিয়ে ছয় ফুট লম্বা পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে গেঁয়ো অডিয়েন্সের সামনে কর, যেখানে অভিনেতা জানে সে অভিনয় করছে, দর্শকও জানে, অভিনয়ই—আর কিছু নয়। আর এক রকম—"

রাঙাদা চটিয়া কহিল, "ওঃ! কতবড় আমার পাবলিক ষ্টেজের অ্যাক্টর রে।"

"—আর এক রকম, যেখানে অভিনেতা জানে সে অভিনয় করছে, কিন্তু শ্রোতা তার প্রত্যেকটি কথা ধ্রুবসত্য ব'লে মনে করে, অবিশ্বাস করার কল্পনাও তার মনে আসে না।"

আমার সম্পাদক-খুল্লতাত মুখবিকৃত করিয়া কহিলেন, "থাক্, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।"

জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার (আড়ালে নায়েব) খুল্লতাত সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "কাল তোর কি কুক্ষণেই সকাল হয়েছিল রে!"

অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলাম, "কুক্ষণে, না পরম শুভক্ষণে, তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চ্চা

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি

বাংলা দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য ঐতিহাসিকগণ

ঐতিহাসিকগণ কালের পরিবর্ত্তনের সাক্ষী, কাল-প্রবাহের বেলাভূমিতে বসিয়া তাঁহারা কালতরঙ্গের গণনায় প্রবৃত্ত। জগতের কিছুই যে স্থায়ী নহে, এ-সত্য তাঁহাদের অপেক্ষা আর কে ভাল জানে? অক্ষয়কুমার, হরপ্রসাদ, রাখালদাস—কেহই চিরজীবী হইয়া জগতে আসেন নাই। কাল পূর্ণ হইলে সকলকেই পরপারে যাত্রা করিতে হইত। কিন্তু রাখালদাসের কি কাল পূর্ণ হইয়াছিল? এই অসাধারণ কর্ম্মী, এই বিরাট্-হৃদয় পুরুষ, এই বন্ধুবৎসল বাংলার সুসন্তান অকালে যে খেলা থামাইয়া চলিয়া গেলেন, আমাদের সেই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? অকালমৃত্যু বাংলা দেশের পরম অভিসম্পাত,—এই দস্যু কেশবকে হরণ করিয়াছে, এই দস্যু বিবেকানন্দকে ছিনাইয়া লইয়াছে। যাঁহার কণ্ঠধ্বনি, যাঁহার মুখাবয়ব চিন্তা করিলেই আজিও অসীম অশ্রুর উৎস লইয়া স্মরণপথে সমুদিত হয়, আমাদের অনেকেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু সেই রাখালদাসও ইহারই করাল কবলগত হইয়াছেন। অক্ষয়কুমারও বাণীচরণে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যানুযায়ী অঞ্জলি দান আরম্ভ করিতে-না-করিতেই তিরোহিত হইলেন। আমরা হরপ্রসাদের সার্থক সাধনার সশ্রদ্ধ বন্দনাগীতি রচনা করি, অক্ষয়-কুমারের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি, কিন্তু অশ্রুজল ভিন্ন রাখালদাসের স্মৃতি-তর্পণের আর কোন উপাদান খুঁজিয়া পাই না।

দুর্ভাগ্যের অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে জাগে যে বিধাতার করুণার কথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক-শল্য বক্ষে অহর্নিশি ধারণ করিয়া রোগজর্জ্জর দেহে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ যেভাবে অনন্যমনা হইয়া বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে নিযুক্ত আছেন, তাহা পুরাণ-বর্ণিত দধীচিকেই মনে করাইয়া দেয়। এই প্রকার দুরবস্থার মধ্যেও যে তাঁহার এতখানি কর্ম্মক্ষমতা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই নিষ্ঠুর বিধাতার করুণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অক্ষয়কুমারের সহকর্ম্মী রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর কর্ম্মবহুল জীবনের অপরাহ্নে অদ্যাপি কর্ম্মবিমুখ নহেন। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমের ফলে মহাপুরুষ রামমোহন রায় সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। তাঁহার আরব্ধ ময়ূরভঞ্জের ইতিহাস সমাপ্ত হইলে ইতিহাস-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমারের অপর সহকর্ম্মী ডক্টর্ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক "উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস" নামক পুস্তক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাংলা ভাষায়ও ইনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন তথ্য বঙ্গবাণীকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এই ত্রয়ীর মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ হিসাবে তাঁহার নিকট আমাদের অদ্যাপি অনেক পাওনা রহিয়াছে।

সমস্ত জীবন যিনি একলব্যের একনিষ্ঠার সহিত ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছেন সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি সর্ যদুনাথ সরকার যে পরিণত বয়সেও অক্লান্ত উদ্যমে অদ্যাপি ইতিহাসের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিয়াছেন, ইহাও বিধাতার বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি। তাঁহার "আওরংজীব", তাঁহার "শিবাজী," তাঁহার "মোগল-সাম্রাজ্যের পতন" এবং মোগল রাজত্বকাল সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধাবলী চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব-ভারতের সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রত্যক্ষদর্শী মির্জ্জা নাথন প্রণীত বাহার্-ই-স্তান-ই-ঘায়বী গ্রন্থের আবিষ্কার, ও তাহার সারমর্ম্ম প্রচার অধ্যাপক

সরকারের এক অমর কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'প্রবাসী' পত্রিকায় পনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি ছয়টি প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠেই প্রথম আমরা প্রতাপাদিত্য, ওসমান, ঈষা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ, সাহাজাদপুর, খলসী ও চাঁদপ্রতাপের হিন্দু জমীদারগণ ইত্যাদি অসংখ্য বাঙালী বীরগণের বিস্মৃত কীর্ত্তিকাহিনী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারি। কি পরিমাণ বাধা প্রতিহত করিয়া জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁকে বাংলা দেশ মোগল-শাসনে আনয়ন করিতে হইয়াছিল, মোগলপক্ষীয় প্রত্যক্ষ-দর্শী লিখিত তাহার বিবরণ পড়িয়া আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্ত-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর বরা মূল পারসী হইতে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করিয়া আসাম গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহা প্রকাশিত করিয়া এই অমূল্য পুস্তক সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য করিয়াছেন।

সর্ যদুনাথ অক্লান্ত উদ্যমে আজীবন স্বয়ং ইতিহাসের চর্চ্চা ত করিয়াছেনই, সেই উদ্যম তাঁহার শিষ্যবৃন্দে সঞ্চারিত করিয়া তিনি যে একটি ঐতিহাসিকমণ্ডলী গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সেই কীর্ত্তি কল্পান্ত-স্থায়ী হইবে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিকারঞ্জন কাননগো প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া মোগল ও মোগল-পর যুগের ইতিহাসের অনেক-গুলি অন্ধকার কোণ প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত আলো-কিত করিয়া তুলিতেছেন।

সর্ যদুনাথের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" সঙ্কলিত করিয়া আধুনিক কালের ইতিহাসচর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছেন।

ডক্টর ভাণ্ডারকরের সস্নেহ লালনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ইতিহাসচর্চ্চার এক প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়ায়। ডক্টর ভাণ্ডারকরের কৃতী ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী স্বীয় কৃতিত্ববলে গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বহুদিন পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দী-রূপে বিরাজ করিবে। তাঁহার সহকর্ম্মী ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় মারাঠা শাসনযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অন্যতম সহকর্ম্মী ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত বৃহৎ দুই খণ্ড "উত্তর-ভারতের রাজবংশসমূহের ইতিহাস" (*Dynastic History of Northern India*) অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ ভবিষ্য অনুসন্ধিৎসুগণের নিত্যসহচর হইয়া থাকিবে। ইঁহাদের নিপুণ শিক্ষা-প্রভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্য হইতে অনেক ঐতিহাসিক উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বর্ত্তমান ভাইসচান্সেলর ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রথম জীবনে ভারতের ও বাংলার ইতিহাসের একনিষ্ঠ সেবা করিয়া ইতিহাসক্ষেত্রে অনেক নূতন তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরে তিনি বৃহত্তর ভারতের ইতিহাসই নিজের গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়া নিষ্ঠার সহিত তাহার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। পরলোকগত অক্ষয়কুমারের বড় সাধ ছিল, তিনি বাঙালীকে এই ইতিহাস শুনাইবেন। তাঁহার "সাগরিকা" এই উদ্যমেরই পূর্ব্বাভাসরূপে সমাজ-পতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ডক্টর মজুমদার অক্ষয়কুমারের সেই সাধ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এত কাল দেশীয় ভাষায় এই বিষয়ে ত পুস্তক ছিলই না, ইংরেজী ভাষায়ও এই বিষয়ের পুস্তকের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল। ডক্টর মজুমদারের পুস্তক সেই অভাব মোচন করিয়াছে। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় রচিত "চম্পা" ও "সুবর্ণদ্বীপ", চম্পা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ও মালয় উপদ্বীপে হিন্দু রাজ্যসমূহের সম্পূর্ণাঙ্গ বিবরণরূপে আদৃত হইয়াছে। ডক্টর মজুমদারের লালনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক দল নবীন ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীমান ধীরেন্দ্র-চন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীমান হিমাংশুভূষণ সরকার, শ্রীমান নীরদ-ভূষণ রায়, শ্রীমান প্রমোদলাল পাল এবং শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্তা বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা খ্যাতিভাজন হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী করুণাকণা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ উভয়েই প্রশংসনীয় গবেষণা-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিদুষী তরুণীদ্বয়ের আগমন সানন্দে অভিনন্দনীয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ম্মবীরত্রয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়গণের সাধনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভারতের প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ সেই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতেই। প্রশংসনীয় অধ্যবসায় এবং কৃতিত্ব সহকারে তিনি অক্ষয়কুমারের আরব্ধ কর্ম্ম গৌড়লেখমালার কার্য্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তিনি চন্দ্র, বর্ম্ম এবং সেনরাজগণের শাসনাবলী ও শিলালিপিসমূহ (*Inscriptions of Bengal*, vol.-III), নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া বাংলার প্রত্নপ্রেমিকগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলার প্রত্নক্ষেত্রে আদর্শ গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। মাতৃভাষা অবলম্বনে প্রত্নচর্চ্চায় যে নীতি গৌড়রাজমালা ও গৌড়লেখমালা প্রকাশে অনুসৃত দেখিতে পাই, মজুমদার-মহাশয়ের সম্পাদিত "ইন্‌স্ক্রিপশ্যনস্ অব বেঙ্গল" গ্রন্থে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকের মুখবন্ধ এবং ভূমিকা পড়িয়া জানিতে পারি যে বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিবার উদ্দেশ্যই এই নীতি-পরিবর্ত্তনের কারণ। বাংলায় যাঁহারা প্রত্নচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের শতকরা নিরানব্বই জনই ইংরেজীনবীশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এই মাতৃভাষা পরিত্যাগে তাহাদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এবং ইংরেজী ভাষার সহায়তায় বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিবার সম্ভাবনাও মিথ্যা নহে। কিন্তু তথাপি কেন যেন মনটা প্রসন্ন হয় না। প্রত্নলিপিক্ষেত্রে ননীবাবুর পুস্তকের পরেই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলিত "কামরূপ শাসনাবলী" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই সুসম্পাদিত পুস্তকখানি গৌড়লেখমালার মতই বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এই পুস্তক ইংরেজীতে সম্পাদন করিলে বৃহত্তর পাঠকসঙ্ঘের নিকট পৌঁছিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। বাংলায় এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশ কেহ কেহ পাগলামি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মনের উপর ত কাহারও জোর খাটে না।

বস্তুতঃ, বাংলা দেশের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধেই আমার এই সাধারণ নালিশ যে তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল হইতে মাতৃভাষা অন্যায় রকমে বঞ্চিত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকত্রয় —ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর সেন ও ডক্টর রায় বাংলা ভাষায় কলম ধরেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ, তাঁহাদের চোখের উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রবন্ধাভাবে শুকাইয়া মরে! তাঁহারা যদি দয়া করিয়া তাঁহাদের ইংরেজী প্রবন্ধাবলীর সারমর্ম্ম একটু সোজা করিয়া লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় প্রেরণ করেন, তবে বাংলা দেশের মাসিক পত্রিকাগুলি রাবিশ ছাপিবার দায় হইতে অব্যাহতি পায় এবং বাংলা দেশে ইতিহাস-চর্চ্চা খরবেগে প্রবাহিত হয়। সর্ যদুনাথ সেই যে পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার পরে বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে তদ্রচিত শিবাজীর বাংলা সংস্করণ দেখিয়া এবং গত বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধীয় বঙ্গভাষায় প্রদত্ত অধরচন্দ্র বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া আমাদের মনে আবার ভরসার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধেও আমার সেই একই নালিশ। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় যখন কিছু লিখিয়াছেন, তাহা কি প্রকার সমাদরের সহিত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছিল, আশা করি তাহা তাঁহার স্মরণে আছে। দেশবাসিগণ তাঁহাদের গবেষণার ফল জানিতে উন্মুখ হইয়া থাকে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা একটু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের গবেষণার ফল যদি বাংলা ভাষায় লিখিয়া দেশবাসিগণকে জানাইতে আরম্ভ করেন, তবে বঙ্গভাষায় ইতিহাস-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, দেশবাসিগণও
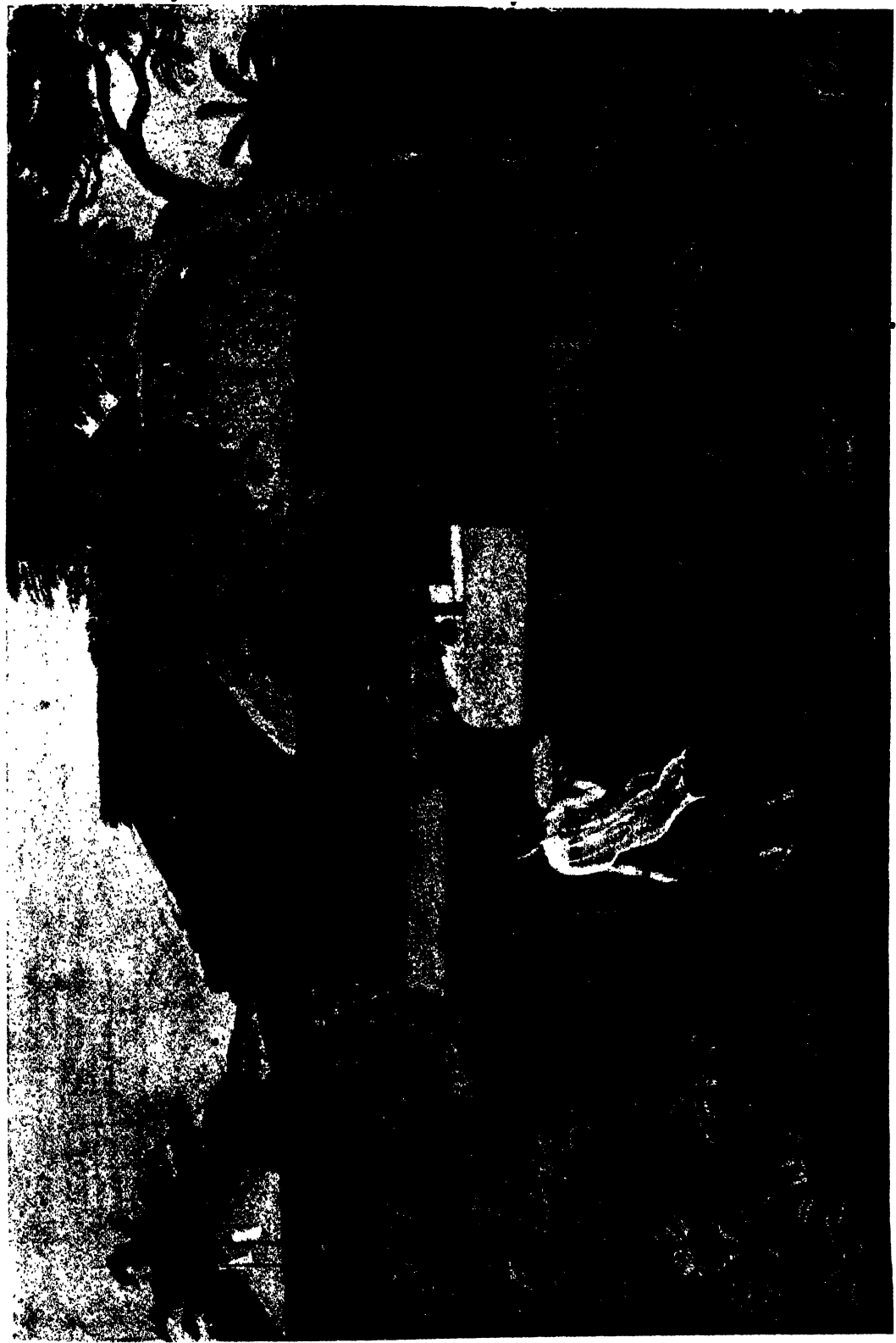
মণিপুর-পল্লী

শ্রীবাসুদেব রায়

কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হয়। বঙ্গভাষা-জননীর কোলের সন্তানগণ সমর্থ হইবামাত্র যদি দুঃখিনী মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা সমৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ইঙ্গভাষার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যই অহরহ লোলুপতা প্রকাশ করেন তবে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? মৌলানা শিবলি ত তাঁহার প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ উর্দ্দু ছাড়িয়া ইংরেজীতে প্রকাশ করেন নাই। মারাঠা ঐতিহাসিকগণ ত মাতৃভাষাতেই ইতিহাস চর্চ্চা করিতেছেন! মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার "ভারতীয় প্রত্নলিপিতত্ব" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ এবং প্রামাণ্য প্রকাণ্ডকায় রাজপুতানার ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইলে অধিকতর সুপ্রচারিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ত সেই অজুহাতে হিন্দীভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করেন নাই!

আমি জানি, যে-সমস্ত মনীষীর নাম করিয়াছি, ইঁহাদের কাহারও অবসর প্রচুর নহে। জগতের গবেষণা-ক্ষেত্রের সহিত যোগ রাখিবার জন্য ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের লিখিতেই হয়, এবং তাহার পরে আবার তাহা বাংলা ভাষায় লিখিতে যে পরিশ্রম ও সময় আবশ্যক, ইঁহাদের কেহই তাহা দিতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি তাহাই চিন্তনীয়। এই মনীষিগণের প্রত্যেকেরই অনুগত ছাত্রসঙ্ঘ আছে। যদি ছাত্রগণের সাহায্যে তাঁহারা নিজেদের গবেষণাগুলি বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশিত করেন, তবেই সমস্ত দিক্ রক্ষা হয় বলিয়া মনে হয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রস্তরমূর্ত্তি-সংগ্রহ বাংলা দেশে অতুলনীয়। কুমার শরৎকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অক্ষয়কুমার প্রমুখ কর্ম্মিগণের চেষ্টায় এই সংগ্রহের আরম্ভ। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় যখন এই সমিতির চিত্রশালার অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় এই সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীরদবন্ধু সান্যাল এই সমৃদ্ধ সংগ্রহকে সমৃদ্ধতর করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠে অবগত আছি যে এই বিচিত্র সংগ্রহের একটি বিস্তৃত বিবরণমূলক সচিত্র তালিকা শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় সঙ্কলন করিয়াছেন। বঙ্গের প্রত্নপ্রেমিক মাত্রেই এই তালিকা প্রকাশের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। এই তালিকা যাহাতে উপযুক্ত চিত্রসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, আশা করি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সেই চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবেন না। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সমিতির চিত্রশালাটির পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অবগত হইলাম। সংবাদ সত্য হইলে বঙ্গের এই অমূল্য প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়দ্বয়ের একনিষ্ঠ ইতিহাসসেবার কথা বাংলা দেশে সাহিত্যসেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। নরেন্দ্রনাথ *Indian Historical Quarterly* প্রচারিত করিয়া বাংলা দেশের ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাস-চর্চ্চা-স্রোতের জন্য যে সুপ্রশস্ত পথ কাটিয়া দিয়াছেন, ঐতিহ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ সেই জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্তের সম্পাদিত বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল্যবান গ্রন্থাবলীর কোন কোন খানি এই পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিমলাচরণের *Indian Culture* পত্রিকা *Indian Historical Quarterly*-র পরে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সুমুদ্রিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি মুদ্রণসৌষ্ঠবে পূর্ব্ববর্ত্তীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, প্রবন্ধগৌরবে পূর্ব্ববর্ত্তীর সমান মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ডক্টর বিমলাচরণ ডক্টর বড়ুয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধকীর্ত্তি সম্বন্ধীয় সারগর্ভ পুস্তকাবলীর প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া, বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনে বঙ্গ-ভাষায় অভিনব কোষগ্রন্থ "মহাকোষ' প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশের জন্য বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির হস্তে ন্যাস সমর্পণ করিয়া যে প্রত্নপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, বাংলা দেশে তাহার তুলনা মিলা কঠিন। নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলাচরণের অধিকাংশ গবেষণাই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, তবে তাঁহাদের গবেষণার সার-মর্ম্ম তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বাংলা মাসিকাদিতেও প্রকাশিত

করিয়া থাকেন। পরিণতবয়স্ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এবং তরুণবয়স্ক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী *Indian Historical Quarterly* এবং *Indian Culture* অবলম্বনেই প্রথম সুপরিচিত হইতে আরম্ভ করে।

বাংলা দেশে কয়েক জন ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত স্থানীয় ইতিহাস লিখিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বিক্রমপুরের ইতিহাস" ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বীরভূম বিবরণ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহার পাবনা জেলার ইতিহাস এবং শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত বড় বড় দুই খণ্ডে সমাপ্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রশংসনীয় গ্রন্থ। এই শ্রেণীর স্থানীয় ইতিহাস রচনা স্থানীয় লেখকগণের প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চ্চার এই যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন নিরাশ হইবার আমাদের কোন কারণ নাই। আর এক জন রাখালদাস বা আর এক জন হরপ্রসাদ আমরা শীঘ্র নাও পাইতে পারি, কিন্তু বহু জনের সমবেত চেষ্টার ফল দুই-চারি জন অতিমানবের অসাধারণ কীর্ত্তি হইতে গুরুত্বে কম হইবার কথা নহে। আমার অজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধির সঙ্কীর্ণতা বশতঃ যে-সমস্ত যোগ্য কর্ম্মীর কর্ম্মের সহিত আমি আজিও পরিচিত হইয়া উঠিতে পারি নাই, এই প্রসঙ্গে অনুল্লেখের জন্য তাঁহাদের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ইতিহাস-ক্ষেত্রের কোন্ কোন্ অংশে কর্ম্মীর অভাব ঘটিতেছে

ভারতীয় ইতিহাসচর্চ্চার পরিধি বর্ত্তমানে এত বৃহৎ যে কোন এক জন লোকের পক্ষে তাহার সমস্ত বিভাগ আয়ত্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ইতিহাসে বিষয়-বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কর্ম্মিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে অধীতব্য বিষয় বাছিয়া লইতেছেন। ইহার ফল হইতেছে এই যে, কতকগুলি বিভাগে উপযুক্তরূপ অথবা আদৌ কর্ম্মী জুটিতেছে না। বঙ্গীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব বা ভাস্কর্য্য অথবা স্থাপত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে হইলে মাত্র কলিকাতা রাজশাহী বা ঢাকা যাদুঘরের মূর্ত্তি-সংগ্রহ দেখিলে চলে না। উহার জন্য বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে হয়। কারণ যে বিশাল ভাস্কর্য্য-বন্যা এক দিন বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমরা এ-যাবৎ যাদুঘরগুলিতে আনিয়া তুলিতে পারিয়াছি। বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস-লেখকের আগমন আমাদিগকে আর কত দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে?

আমি অনেক দিন পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম, ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধে এবং নির্জ্জলা হুজুক বশতঃ দেশের সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান কুলশাস্ত্র-গুলিকে বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ বহু দিন ধরিয়া অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। এই পুরুষানুক্রমে সযত্ন-সঞ্চিত গ্রন্থগুলির সামাজিক প্রয়োজন তিরোহিত হওয়ায় অনাদরে এগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বঙ্গের প্রত্নপ্রেমিকগণের কর্ত্তব্য, এই গ্রন্থগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় ইহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুঁথি সংগ্রহে হাত দিয়া আমি এই বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের অনেকগুলি কুলগ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় স্থান লাভ করিয়াছে। সযত্নে এগুলি অধ্যয়ন করিলে ইহাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মূল্যবান তথ্য মিলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। ফলে, ইতিহাসের এই মহামূল্য উপাদানগুলি অদ্যাবধি কোন কাজেই লাগে নাই। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কুলশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যিনি সামাজিক ইতিহাস উদ্ধারের কার্য্যে হাত দিবেন, তাঁহাকে ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাসের

ন্যায় সত্যসন্ধ হইতে হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের, সত্যে যাঁহাদের কঠোর দৃঢ়নিষ্ঠা নাই, তাঁহাদের এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ।

ইতিহাসের আর একটি অবহেলিত বিভাগ বাংলা দেশের প্রাক্-মোগল যুগের মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রত্নলেখতত্ত্ব। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে সুলতানী আমলের প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখসমূহের পাঠ বিচার করিয়াই টমাস ও ব্লখমেন সাহেব ঐ আমলের বাংলা দেশের প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ব্লখমেন সাহেব কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রা ও শিলা-লিপির সাহায্যে সুলতানী আমলের বাংলার ইতিহাসের কাঠামো নির্ম্মাণ করেন। সেই অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপরেই আমাদের রাখালদাস অপূর্ণাঙ্গ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই ধারার গবেষণাপদ্ধতিই যেন আজকাল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী পণ্ডিত ষ্টেপলটন্ সাহেব ব্যতীত ব্লখমেন-প্রবর্ত্তিত ধারা অনুসরণ করিতে আর কাহাকেও দেখি না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরফুদ্দিন সাহেবকে এই পথে চলিতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ কৃতবিদ্য মুসলমান পণ্ডিতগণ তাঁহাদের আরবী পারসী ভাষাজ্ঞান লইয়া তাঁহাদের নিজস্ব এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চক্ষুহীন এবং বিবেচনাহীন শিক্ষা-বিভাগের মর্জ্জিমত আজ ঢাকা, কাল রাজশাহী ও পরশ্ব চট্টগ্রাম বদলী হইয়া এই প্রতিভাশালী উদীয়মান মুসলমান পণ্ডিতটির লেখা-পড়ার নেশা শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। ১৯১৮ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত সুলতানী আমলের কয়েকটি শিলালিপি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার লিখিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে বিহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান সমিতির পত্রিকায় এবং Epigraphia Indo-Muslemica নামক ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পত্রিকায় কয়েকখানি অপ্রকাশিত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র ষ্টেপলটন্ সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ আর এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

এই বিষয়ে স্যর্ যদুনাথ সরকারের নিকট আমার নালিশ আছে। হাতের লেখা পারসী পুঁথি পড়িয়া তাঁহার যে-সকল ছাত্র গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই চেষ্টা করিলে প্রাচীন মুদ্রা বা শিলা-লিপি পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু মুসলিম মুদ্রাতত্ত্ব বা প্রত্নলেখতত্ত্ব চর্চ্চার দিকে তাঁহার এক জন ছাত্রও মনোযোগ দেন নাই। পারসী ভাষায় অসামান্য পণ্ডিত হইয়াও তিনি নিজেও এই অবিমিশ্র প্রত্নতত্ত্বে অনেকটা উদাসীন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ আওরংজীবে আওরংজীবের বৈচিত্র্যময় মুদ্রাসমূহ সম্বন্ধে অথবা তাঁহার টাকশালগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত, গবেষণার মোড় যেদিকে ফিরাইবেন, গবেষণাস্রোত সেই দিকেই ফিরিবে। আমরা সানুনয়ে এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উল্লেখযোগ্য আরব্ধ কার্য্যাবলী

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভাস্কর্য্য-সংগ্রহের সচিত্র বিস্তৃত বিবরণীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি ঢাকাতে নিতান্ত একান্তে বাস করি। কাজেই আমার পক্ষে বাংলা দেশের সমস্ত উল্লেখযোগ্য আরব্ধ কার্য্যের সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে। যে দুই-একটির কথা জানি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকল্পিত বাংলার ইতিহাস। বাংলা দেশের বিশেষজ্ঞগণের সমবায়ে লিখিত এই পুস্তকখানি যে বহুদিন পর্য্যন্ত আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকিবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যত দূর জানি, ইহার কার্য্য আশানুরূপ দ্রুততার সহিত অগ্রসর হইতেছে না। এই রকম বৃহৎ ব্যাপারে বিলম্ব অনিবার্য্য, তাহার জন্য অধীর হইয়া লাভ নাই। এই কার্য্য কি প্রকার পরিশ্রমসাধ্য, ইহার সমাপ্তির পথে বাধা-বিঘ্ন কত, তাহা আমার ভালই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার এই মাত্র অনুরোধ যে বৃহত্তর ইংরেজী সংস্করণ অবলম্বনে ক্ষুদ্রতর

বাংলা সংস্করণ একখানি যে তাঁহাদের প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে, মূল কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই কার্য্যে যেন অযথা বিলম্ব না হয়।

প্রায় দশ বৎসর হইল, ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয়ের সম্পাদনে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে রামচরিতের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিবার উদ্যোগ হয়। সম্পাদকগণের মধ্যে মতভেদের দরুন উহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াও প্রকাশ স্থগিত ছিল। প্রায় বৎসরেক পূর্ব্বে ডক্টর বসাকের নিকট উহার মুদ্রিত কয়েক ফর্ম্মা দেখিয়াছি। উহার মুদ্রণকার্য্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে, আশা করা যায়। সকলেই জানেন রামচরিত দ্ব্যর্থ কাব্য—অত্যন্ত দুরূহ। দ্বিতীয় সর্গের কতকাংশ পর্য্যন্ত উহার টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহারই সাহায্যে রামপাল-পক্ষের ঐতিহ্যমূলক বাক্যাবলীর অর্থ বুঝা যায়। অভিনব সংস্করণের পণ্ডিত সম্পাদকত্রয় বহু পরিশ্রমে সটীক অংশের টীকা এবং ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। কাজেই বাংলা দেশের প্রত্নপ্রেমিক মাত্রেই এই পুস্তক প্রকাশের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। ডক্টর বসাকের অধ্যবসায়বলে আশা করি শীঘ্রই এই পুস্তক লোকলোচন-গোচর হইবে।

ইতিহাস-চর্চ্চার আদর্শ

যাঁহাদের পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া আমরা ইতিহাসের ক খ শিখিয়াছি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অদ্যাপি সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি ঐতিহাসিকগণের দুই-তিন জন বাঁচিয়া আছেন এবং সক্রিয় আছেন। ইতিহাস-চর্চ্চায় যে কঠিন আদর্শ তাঁহারা আজীবন অনুসরণ করিয়াছেন, সেই আদর্শই তাঁহারা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া যাইবেন, ইহাই আমরা তাঁহাদের নিকটে প্রত্যাশা করি। বিশেষ মত বা বিশেষ পক্ষ সমর্থন যে কৌশলী লোকগণের উদ্দেশ্য, বড় বড় ঐতিহাসিকগণকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া যেন তেন প্রকারেণ মোকদ্দমায় জয়লাভ করাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে সেই কৌশলী স্বার্থপর লোকগণের মিষ্টবাক্যে বা খোসামোদে ভুলিয়া জজের আসন ছাড়িয়া ঐতিহাসিকগণ উকীলের গাউন পরিয়া বিশেষ বিশেষ পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হইয়া যদি আত্মহত্যা করেন, তবে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? বাংলার ইতিহাসচর্চ্চার ক্ষেত্রে সম্প্রতি এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। যে দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা আমরা ব্যক্তিবিশেষের সহিত আজীবন যুক্ত করিয়া আসিতেছি, সহসা দেখি কৌশলী স্বার্থপর পক্ষসমর্থকগণের মিষ্টবাক্যে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে! এই কুহকীগণের কুহকে ভুলিয়া তাঁহারা অসত্যের পক্ষ সমর্থনে লাগিয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের অভ্রংলিহ খ্যাতিদুর্গ বালকেরও বেধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ইমার্সন বলিয়াছেন, আমরা কাচের জগতে বাস করি, পাপ করিয়া লুকাইবার স্থান এখানে নাই। যে কারণে, যে দুর্ব্বলতায়ই হউক, অসত্যের পক্ষ সমর্থন করিবামাত্র লোকের নিকট তাহা ধরা পড়িয়া যায়, এই অমোঘ নিয়ম হইতে কেহই অব্যাহতি পায় না। যাঁহারা মনে করেন, প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, তাঁহারা অবিশ্বাসী নাস্তিক,—জগৎনিয়ন্তা, জীবের, জাতির, কালপ্রবাহের নিয়ন্তা যে এক জন আছেন, এই অতি স্বচ্ছ সত্য তাঁহারা উপেক্ষা করেন। বাংলায় বাউল গাহিয়াছে—

> দেখ আমার গুরু গোসাঞী সাঁই —
> সে যে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল
> তাড়াহুড়া নাই।

সত্যের মুকুলই যে এই ভাবে যুগযুগান্তে ফোটে তাহা নহে, অসত্যের মুকুলও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া যদুবংশধ্বংসী মুষলে পরিণত হয়। যে-দেশ বা যে-জাতি বা যে-ব্যক্তি মনে করে যে চালাকি করিয়া আজ ত মোকদ্দমা জিতিয়া লই, পরের ভাবনা পরে করিব,—সেই মুহূর্ত্তে সে আত্মবিধ্বংসী মুষলের বীজ বপনকরে। চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্ক সেন গাহিয়াছেন,—কীর্ত্তিমন্দিরের দ্বারে কুলাহস্তে ধূমাবতী পাহারা দিতেছেন, ফাঁকা শস্যের সেথায় প্রবেশের অধিকার নাই,—বিরাট কুলার ভীষণ বাত্যায় ফাঁকা শস্য কালের নস্যে পরিণত হইতেছে। সত্যের মন্দির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অসত্য সেথায় প্রবেশ করিতে পারে না। "বুঝিবার ভুলে যে অসত্যসমর্থন উদ্ভূত, তাহা ক্ষমার্হ। কিন্তু দুর্ব্বলতায় যাহার জন্ম; তাহা ক্ষমার একেবারেই অযোগ্য।*

* কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণের প্রথমাংশ।

মাতৃভক্তি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

সওদাগরী আপিসের নিয়মকানুন না কি কড়া, তাই জরুরী পত্র পাইয়াও মহীতোষ বিশেষ ত্বরান্বিত হইতে পারিল না।

বিশ বৎসর লেজার নাড়িয়া, ফাইল ঘাঁটিয়া ও সাহেব-লোকের রুক্ষ মেজাজের আওতায় বাস করিয়াও মহীতোষ অবশ্য অন্তরে বাহিরে আপিস-মাফিক যান্ত্রিক কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে নাই। সে ভালমতেই জানে, শহরের জলবায়ু, শহরের আলো-হাওয়া তাহার মত নব্বই টাকা দামের কেরানীর ধাতুসহ নহে। আপিস-জীবনের উত্তর-কাণ্ডে তাহার জন্য বিছানো আছে পল্লীমায়ের কাব্যকলা-সমৃদ্ধ হরিতাঞ্চল; যে অঞ্চলখানির এক প্রান্ত রূঢ় বাস্তবের শত প্রকারের ভয়াল ভ্রূকুটি, অস্বাস্থ্য ও অভাবের সুস্পষ্ট আলিম্পনে বিচিত্রিত এবং অন্য প্রান্ত সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলার ধ্যানমহিমায় স্বর্গাদপি গরীয়সী। সেই স্বর্গকে বাঁচাইয়া সেখানে যিনি প্রতি প্রভাতে উঠান-ঝাঁট ও গোবর-ছড়া দিয়া এবং প্রতি সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন তিনি মহীতোষের বৃদ্ধা জননী।

২

শহরে বাস করিলে যা হয়, মহীতোষের মনেও সেটুকু জমা হইতে বিলম্ব হয় নাই। প্রথমে বৎসরে তিন বার সে বাড়ী আসিত—পূজা, বড়দিন এবং ঈষ্টার। চার বছর এই ভাবে চলিবার পর ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের পানে চাহিয়া ঈষ্টারের স্বল্পায়ু ছুটিটাকে সে পল্লীদর্শনের সূচী হইতে বিনা দ্বিধায় বাদ দিয়া ফেলিল। কিন্তু বিধাতার এমনই কৃপা, সেবার পূজায় বাড়ী আসিয়া ম্যালেরিয়ার আস্বাদ লাভ করিয়া মহীতোষ সভয়ে পূজার দীর্ঘতর ছুটিটাকেও এক পাশে সরাইয়া দিল। বাকী রহিল বড়দিন। তা সে নাতি-দীর্ঘ অবসর আরও দশটি বছর তালিকাভুক্ত করিয়া মায়ের মনঃক্ষোভ সে মিটাইতেছিল। অকস্মাৎ আপিসের সাহেব বদল হওয়াতে বড়দিনের ছুটি হ্রস্বতর হইয়া গেল। যাহারা বৎসরান্তে বাড়ী যায় তাহাদের জন্য বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্রটিও লুপ্ত হইয়া গেল।

মহীতোষের মা পাঁচ বছর পূর্ব্বে বড় দুঃখেই লিখিয়া-ছিলেন :—বাবা, বৎসরান্তে তোদের সবাইকে যদি এক বারও না দেখিতে পাই ত কোন্ আশায় জীবন ধারণ করি বল্! সকলে একসঙ্গে না খাইয়া যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম সে যে অনেক ভাল ছিল। এক দিন কিছু না খাইলেও পেট বোঝে, কিন্তু ভালবাসার ধনকে বৎসরান্তে না দেখিলে মনের সান্ত্বনা কোথায়? সাহেবকে এ-কথা বলিস, তাঁদেরও মা আছে, নিশ্চয় বুঝিবেন।

মহীতোষ সংক্ষিপ্ত চিঠির শেষে লিখিয়াছিল :—সাহেবদের মা আছেন, কিন্তু আপন সংসারে মাকে তাহারা জড়াইয়া রাখিতে চাহে না। শিক্ষার দ্বারা ওরা স্নেহকে হয়ত জয় করিয়াছে, আমাদের স্নেহকে তাই দুর্ব্বলতা বলিয়া উপহাস করে। বড়দিনের ছুটি না হোক, অন্য সময়ে ছুটি লইয়া আপনার শ্রীচরণদর্শনের ইচ্ছা রহিল।

৩

তার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর স্নেহের আদান-প্রদান চিঠিতেই চলিতেছে। মহীতোষ ছুটি লওয়ার সুবিধা করিতে পারে নাই।

এমন সময় হঠাৎ জরুরী পত্রের আবির্ভাব! পত্র পড়িয়া মহীতোষের মুখের ছায়া গাঢ়তর হইল। সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসরে অবসর-অভাবে যে শ্রীচরণদর্শনের পুণ্য-সঞ্চয় সে করিতে পারে নাই, যথাসময়ে না পৌঁছিতে পারিলে সে-পুণ্যসঞ্চয় হয়ত আর ইহজীবনে ঘটিবে না।

মহীতোষের মা শয্যা লইয়াছেন, এ-যাত্রা রক্ষা পান কিনা সন্দেহ! সন্তানকে একবার দেখিবার আকুল প্রার্থনা পত্রের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। অনাড়ম্বর সহজ প্রার্থনা, ভাষার পারিপাট্য নাই। পুকুরের যে অংশে গভীর জল সেখানে ঢিল ফেলিলে যেমন গম্ভীর শব্দ হয়, তেমনই এই অতি সংক্ষিপ্ত 'একবার এস' মহীতোষের স্নেহ-সরোবরের অংই জলে অন্তর্মুখীন আর্ত্তনাদ তুলিল। মা আপন জবানীতে অন্যকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। হয়ত তিনি শয্যায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। হয়ত সেই সঙ্গে মহীতোষের আগমন-মুহূর্ত্তের উল্লাসে সেই নিদারুণ বেদনাকে মনে স্থান দিতেছেন না। আশা-আনন্দের লঘুপক্ষে ভর করিয়া দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘতর রাত্রি কাটিতেছে, লূতাতন্তুজাল বুনিয়া মায়ামুগ্ধ মাতৃহৃদয় আপন তীব্র বেদনায় ও নিবিড় আনন্দে প্রতিনিয়ত দোল খাইতেছে।

৪

মহীতোষ চিঠিখানা হাতে করিয়া সহকর্ম্মী সুরেনের পানে চাহিল। নির্ব্বিকার চিত্তে সে লেজারে অঙ্কপাত করিয়া চলিয়াছে।

আপিসে আসিয়া বসিলে বাড়ীর চিন্তা সে ভুলিয়া যায়; সুখী বটে!

অল্প কাশিয়া লেজারে একটা শব্দ তুলিয়া মহীতোষ বলিল, "সুরেন, শোন।"

সুরেন মুখ তুলিয়া চোখের ইসারায় মহীতোষকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া লেজারে কয়েকটি অঙ্কপাত করিল। পরে লেজার বন্ধ করিয়া বলিল, "বল।"

মহীতোষ বলিল, "আজ এইমাত্র একখানা চিঠি পেলাম দেশ থেকে।" একটু থামিয়া বলিল, "মার খুব অসুখ।"

"বটে, তাহ'লে তোমার যাওয়া উচিত।"

"উচিত হ'লেও যাই কি ক'রে বল। এই সবে নূতন কোলিয়ারিটা নেওয়ার বন্দোবস্ত হ'ল, হাতে কাজের অন্ত নেই।"

সুরেন বলিল, 'সাহেব না হোক, বড়বাবুর কাছে ছাড়-পত্র পাবে কিনা সন্দেহ।"

মহীতোষ স্বরে জোর দিয়া বলিল, "কিন্তু মার অসুখ, যেতে আমায় হবেই।"

সুরেন ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, "কি অসুখ?"

"তা ত কিছু লেখা নেই। শক্ত অসুখ, বাঁচবার আশা নেই।"

"কে লিখেছেন?"

"মার জবানী।"

"তুমি ত পাঁচ বছর ও-মুখো হও নি। মার প্রাণ ত, হয়ত একবার দেখবার জন্য অসুখের কথা লিখেছেন।"

"না হে, আমার মাকে তুমি জান না। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, সুতরাং স্নেহের দুর্ব্বলতা তাঁর যথেষ্ট। তবু, আমার অসুবিধা ঘটিয়ে মিথ্যে অসুখের কথা তিনি লেখেন না কোন দিন।"

সুরেন বলিল, "যাই বল, পাঁচ বছর না-দেখায় স্নেহের সংযম রক্ষা করা কঠিন। যাও না একবার বড়বাবুর কাছে, কি বলেন, দেখ।"

৫

পত্রখানা মহীতোষ বড়বাবুর হাতেই তুলিয়া দিল। বলিল, "স্যর, এই দেখুন চিঠি। মা বাঁচেন কিনা সন্দেহ, বাড়ী যেতে হবে।"

বড়বাবু পত্র না পড়িয়াই মহীতোষের মুখের পানে আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বাড়ী! নতুন কোলিয়ারির লেজারটা না খুলেই?"

"সে হিসেব ঠিক করতে এক মাস লাগবে, স্যর।"

"তাহ'লে এক মাস পরেই ছুটি নিয়ো।"

মহীতোষ মনে মনে রুষ্ট হইয়া বলিল, "এক মাসে লেজার কমপ্লিট হতে পারে, মার দেখা হয়ত ইহজীবনে পাব না।"

বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিলেন, "আরে, তুমি ত বড় সেন্টিমেন্টাল! অসুখ হ'লেই কি লোক মারা যায়। শোন তবে আমার জীবনের একটা গল্প। সবে নতুন চাকরি, এক মাসও হয় নি, বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এল বাবার অসুখ। বেলা তখন বারটা। ছুটি চাইতেই বড়বাবু বললেন, 'ছোকরা এত উতলা হ'লে কখনও আপিসে

চাকরি চলে? পাঁচটা বাজুক, তার পর যেয়ো। বাবা গেলে ফিরে পাবে না এ-কথা যেমন সত্য, চাকরি গেলেও পাবে না এ তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্য।' বাবার শোক দু-দিনে ভুলবে, কিন্তু পেটের চিন্তা যত দিন বাঁচবে ভুলতে পারবে না।' তাঁর কথা শিরোধার্য্য করলাম। পাঁচটার পর বাড়ী গিয়ে অবশ্য বাবাকে দেখতে পাই নি। তখন মনে মনে খুব রাগ হ'লেও, আজ ভাবি, অন্নগতপ্রাণ কলির জীবকে বড়বাবু সেদিন কি অমূল্য উপদেশই দিয়েছিলেন!"

মহীতোষ ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "আমরা নব্বুই টাকা মাইনের কেরানী, আমাদের সেন্টিমেণ্টালিটি তাই বেশী।"

বড়বাবু বলিলেন, "আরও এক কথা। অদৃষ্ট মান ত? হিন্দুর ছেলে, বাঙালীর ছেলে, ওটা না মেনে উপায় নেই। তবেই বোঝ, অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাবে তোমার সাধ্য কি। মিছিমিছি মন খারাপ ক'রো না, কাজ করগে। টেলিগ্রাম নয়, সামান্য চিঠি—এর জন্য উতলা হয় কখনও। তেমন গুরুতর হ'লে টেলিগ্রাম আসত নিশ্চয়।"

শেষের কথা কয়টি মহীতোষকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল। জরুরী চিঠি না-আসিয়া জরুরী তার আসিলে ভাবনার কারণ ছিল বটে। হাজার হোক্, বড়বাবু, একটা অভিজ্ঞতা আছে ত!

৬

দুই দিন হইল ছোট ছেলের অল্প অল্প গা গরম হইতেছিল। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আজ মহীতোষ দেখিল, জ্বর তার বেশীই হইয়াছে। সোনার মা শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে ও রুগ্ন ছেলের মাথায় হাত বুলাইতেছে।

জামা কাপড় না ছাড়িয়াই মহীতোষ উদ্বিগ্ন স্বরে ডাকিল, "সোনা!"

জ্বরঘোরে অচৈতন্য সোনা চক্ষু মেলিল না, কিংবা অস্ফুট কোন শব্দও করিল না।

মহীতোষের স্ত্রী বলিল, "তুমি আপিস যাওয়ার পর ভাত খাবার বায়না ধরলে, তার পর ভাত খেয়েই হুহু করে জ্বর এল।"

মহীতোষ বলিল, "ডাক্তার ডাকা হয়েছে?"

স্ত্রী বলিল, "কে ডাকবে? নন্তুদের আজ ক্রিকেট-ম্যাচ, ইস্কুল কামাই ক'রে সেই দশটার সময় বেরিয়েছে।"

মহীতোষ রাগ করিয়া বলিল, "যত সব ভূত কোথাকার। বুড়োধাড়ি ছেলে, খালি খেলা আর খেলা। দূর করে দিতে হয় সব বাড়ী থেকে।"

কাপড়-জামা না-ছাড়িয়াই গজগজ করিতে করিতে মহীতোষ বাহির হইতেছিল, স্ত্রী বলিল, "মুখে হাতে জল দাও, একটু জিরোও, তার পর যেয়ো।"

মহীতোষ রুক্ষস্বরে বলিল, "জুড়োব চুলোতে শুয়ে। আগে ডাক্তার ডেকে আনি।"

৭

তিন দিন পরে সোনার জ্বর ছাড়িয়াছে। আজ সে চোখ মেলিয়া চাহিতেছে ও বাবার সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিতেছে। মহীতোষের মুখে আনন্দের ছায়া।

সোনার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল, "আজ আপিস যাই, কি বল সোনামণি?"

সোনা ক্ষীণ কণ্ঠে আব্দার ধরিল, "না।"

"না কি রে? তিন দিন আপিস কামাই করেছি, আজ না গেলে সাহেব বকবে যে, সোনা।"

সোনা গাল ফুলাইয়া বলিল, "বকুক গে। তোমাদের সাহেবটা ভারি দুষ্টু কেন, বাবা? খালি খালি বকে কেন?"

"পড়া না-বলতে পারলে তোমাদের মাষ্টার কেন বকে, সোনা?"

"সায়েব বুঝি রোজ তোমাদের পড়া নেয়? কই বাড়ীতে ত বই খুলে কখনও পড় না?"

এমন সময় সোনার মা ঘরে ঢুকিতেই মহীতোষ তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "শুনছ, তোমার সোনামণি কি বলে? বলে আমি বাড়ীতে ত পড়ি না। তুমি কি বল?"

স্ত্রী হাসিয়া বলিল, "ঠিকই ত বলেছে, সোনা।"

"ঠিক বলেছে? ককৃখনও নয়। সকাল থেকে বেলা নটা অবধি হাটবাজার, দোকান, পড়া নয়? বেলা

দশটা থেকে ছটা-সাতটা অবধি আপিসের পড়াই কি কম! তার পর বাড়ী এলে আবার হাটবাজার, ওষুধ, ডাক্তার, ভাবনাচিন্তা ছাইপাশ কত পড়া বল দেখি।"

কথাশেষে মহীতোষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্ত্রী বলিল, "খুব ভাল পড়ার কথা ছেলেকে শোনাচ্ছ যা হোক্!"

মহীতোষ বলিল, "ইস্কুলের পড়া ত এই বই পড়ার প্রথম ভাগ গো। তুমি না বোঝ, ওদের এখন থেকে কিছু কিছু বোঝা ভাল।"

স্ত্রী বলিল, "আজ তা হ'লে আপিস যাবে না ত? যাক্ বাঁচা গেল। তোমার জামা-কাপড়ে সাবান দিয়ে নেয়ে নিই।" একটু থামিয়া বলিল, "এক দিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে আসি চল। সোনার অসুখে আমি মানত করেছি যে।"

"বেশ, কালও না-হয় আপিস কামাই করি। মঙ্গলবার আছে, মায়ের পূজোটা ভাল ক'রেই দেওয়া যাক্।"

৮

মহীতোষের সাম্‌নে ভাতের থালা সাজাইয়া দিয়া তাহার স্ত্রী বলিল, "জামা কাচবার সময় একখানা চিঠি পেলাম তোমার পকেট থেকে। জলে ভিজে লেখাগুলো মুছে গেছে, জরুরী চিঠি নয় ত?"

মহীতোষ ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া উত্তর দিল, "না, তেমন জরুরী নয়। মার অসুখের খবর দিয়ে মা নিজে লিখেছেন।"

স্ত্রী বলিল, "অনেক দিন বাড়ী যাও নি, হয়ত তাঁর দেখবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই অসুখের কথা লিখেছেন।"

"সুরেনও তাই বলে। বড়বাবু বললেন—অসুখ বেশী হ'লে জরুরী তার আসত।"

"তা না-হয় একবার গেলেই পারতে?"

"বাপ রে, তা হ'লে আপিসে আর ঢুকতে হ'ত না। ছেলের অসুখ, বউয়ের অসুখ এ সবে কোম্পানী ছুটি মঞ্জুর করে, মা-বাপের অসুখ বললে গ্রাহ্যই করে না।"

স্ত্রী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আপিস ত! তা সোনার অসুখ ব'লে আর দিন কতক না হয়—"

মহীতোষ মাছের মুড়া ভাঙিতে ভাঙিতে জবাব দিল, "এই বলে কত কষ্টে মঞ্জুর করিয়েছি! আচ্ছা, কাল যদি কালীঘাটে মার পূজো দিতেই হয়, কি কি জিনিষ লাগবে একটা ফর্দ্দ কর ত। ঘণ্টাখানেক পরে সব কিনে কেটে এনে রাখি।"

পর দিন ভক্তিমান মহীতোষ সস্ত্রীক কালীঘাটে গিয়া মায়ের চরণ বন্দনা করিল এবং ফুল, বিল্বপত্র, চিনির নৈবেদ্য প্রভৃতি যোড়শোপচারে পূজা দিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিল।

প্রদীপের আলোয় মনে হইল, দেবীর মুখের হাসি বিদ্যুতের মত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের মূলে যারা বাসা নেয়, তাদের আমরা অনেক সময়ে ভুলে থাকি। আমরা ভুলে থাকি আকাশের তারাকে, বনের ফুলকে—তবুও তারা প্রাণের নিঃশ্বাস-বায়ুকে সুমধুর করে, ভুলের শূন্যতাকে সুর দিয়ে ভরিয়ে রাখে। এমন যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য—সেও ত অনেক সময়ে আমাদের চেতন-মনের বাহিরে থাকে। কিন্তু এই ভুলে থাকার নাম ত ভোলা নয়। সূর্য্য আর তারা আর ফুল বিস্মৃতির মর্ম্মে ব'সে আমাদের রক্তে দেয় নিরন্তর দোলা। পৃথিবীতে যা-কিছু বিরাট, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু প্রাণস্পর্শী—তাদের সান্নিধ্যে যখনই আমরা আসি, তখন থেকেই তারা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে যায়, আমাদের সত্তা থেকে তাদের আর পৃথক ক'রে দেখতে পারি নে। বাহিরের কোন কিছুকে অবলম্বন ক'রে তাদের স্মরণ করতে যাওয়া এক হিসাবে প্রকাণ্ড একটা ভুল।

বঙ্কিমের গগনস্পর্শী প্রতিভাকে স্মরণ করতে যাওয়ার মধ্যে এই রকমের একটা ভুল আছে। আমাদের জীবনের ঠিক কোন্‌খান থেকে তাঁর প্রভাব সুরু হয়েছে—তা আবিষ্কার করা কঠিন। বাতাসের সঙ্গে যেমন ফুলের গন্ধ মিশে থাকে, বঙ্কিম তেমনি ক'রেই মিশে আছেন আমাদের কৈশোরের অসংখ্য স্বপ্নের সঙ্গে। চাঁদের আলোয় ঠাকুরমার মুখ থেকে রূপকথার গল্প শোনাকে যেমন জীবনের প্রভাত থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারি নে, তেমনি বঙ্কিমকেও আমাদের জীবন-প্রভাতের সহস্র স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার কোন উপায় নেই। সেই অতীতের অস্ফুট চন্দ্রালোকে জেগে আছে বালক প্রতাপ আর বালিকা শৈবলিনীর ছবি। ভরা গঙ্গায় দু-জনে সাঁতার কেটে চলেছে পাশাপাশি। প্রতাপ ডুবছে আর মৃত্যুভয়ে শৈবলিনী ফিরে আসছে কূলে। সেখানে জাগছে কাপালিকের খড়্গ এবং তার রক্তচক্ষুর পার্শ্বে বন্দী নবকুমারের ম্লান মুখচ্ছবি। সেই বাল্যের আলো-অন্ধকারে-মেশা জগতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি কাপালিকের খড়্গ দিয়ে নবকুমারের লতাবন্ধন ছেদন করছে। বন্দীর সেই মুক্তির আনন্দ কি আমাদের কৈশোরের সহস্র আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে নেই? সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিশোর-বয়সের কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র যার পটভূমিতে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত ক'রে নির্নিমেষলোচনে দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণা অনিন্দ্যসুন্দরী কপালকুণ্ডলা। সপ্তগ্রামের নিবিড় অরণ্য-পথে একাকিনী কপালকুণ্ডলা যেখানে ঔষধের সন্ধানে চলেছে, সেখানে ভয়মিশ্রিত আনন্দের মধ্যে কিশোর-হৃদয়ের কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে আমরাও বারম্বার তার সাথী হয়েছি। পরিশেষে অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহের মধ্যে কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক জীবন যেখানে বিলুপ্ত হয়ে গেল আমাদের কিশোর-মনের শূন্যতার হাহাকারের মধ্যে, সেখানকার অশ্রুসজল স্মৃতি অতীতের আরও বহু স্মৃতির বেদনার সঙ্গে কি মিশিয়ে নেই?

আমাদের ছেলেবেলার কল্পনাকে বঙ্কিম যেমন ক'রে নাড়া দিয়েছেন, এমন ক'রে তাকে নাড়া দিয়েছে আর কে? বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে অশ্বারূঢ় জগৎসিংহ গড়-মান্দারণের পথে চলেছেন একাকী। প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যে সেই নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের ছবিকে কল্পনা ক'রে আমাদের বাল্যজীবনের কত মুহূর্ত্ত ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। জনহীন প্রান্তরে শৈলেশ্বরের মন্দিরে বর্ষাধারী জগৎসিংহ, অবগুণ্ঠিতা তিলোত্তমা, শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি আর চতুরা বিমলাকে নিয়ে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির সঙ্গে আজও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের কল্পনার জগৎ বঙ্কিমের মানসপুত্র আর মানসকন্যা-গণের দ্বারা পরিপূর্ণ। সেখানে সুন্দরী তিলোত্তমা

আপনার অজ্ঞাতসারে পালঙ্কের কাষ্ঠে লিখেছে 'কুমার জগৎসিংহ' আর সেই লেখা পড়ে লজ্জায় তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। জল দিয়ে বারে বারে প্রিয়তমের নামটি ধৌত ক'রেও বীরেন্দ্র সিংহের কন্যার হৃদয়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সেখানে চন্দ্রালোকিত রজনীতে বজরার ছাদের উপরে বহুরত্নমণ্ডিতা দেবীচৌধুরাণী বীণা বাজায়, শত শত বীরপুরুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবীর আদেশ পালন করে। সেখানে ভবানী পাঠকের নির্দ্দেশে প্রফুল্ল বাছা বাছা লাঠিয়ালদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, নিভৃত মন্দিরমধ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে মহেন্দ্রসিংহ সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা নেয়, স্বামীর স্বদেশ-সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য কল্যাণী বিষ খায়, মুখে বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে ভবানন্দ মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সেখানে মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহায় পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুয়ে কলঙ্কিনী শৈবলিনী দেখে নরকের বিভীষিকা, চাঁদের আলোয় স্থির গঙ্গার মাঝে চন্দ্রশেখরের হতভাগিনী স্ত্রী প্রেমাস্পদের হাতে হাত রেখে বাষ্পবিকৃত স্বরে প্রতিজ্ঞা করে,

> শুন, তোমার শপথ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতেই আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।

সেখানে শৈবলিনীর আর চন্দ্রশেখরের দাম্পত্যজীবনকে সুখী করবার জন্য প্রতাপ অশ্বারোহণে চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, রমণীরত্ন আয়েষা স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরায় অলঙ্কার। সেখানে নৃত্যগীত-কৌতুকে মত্ত কতলু খাঁর বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিয়ে বিমলা বলছে,

> "পিশাচী নহি, সয়তানী নহি, বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী।"

সেখানে মহামহীরুহের শ্যামল পল্লবরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে তেজস্বিনী শ্রী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য জনতাকে দেয় প্রেরণা, একাকিনী চঞ্চলকুমারী সশস্ত্র মোগল অশ্বারোহীদের সম্মুখে যায় এগিয়ে, রূপনগরের বিপন্না রাজপুত্রীকে উদ্ধার করবার জন্য রাজসিংহ করে সর্ব্বস্বপণ। সেখানে বারুদমাখা সীতারামের অব্যর্থ সন্ধান শত্রুসেনাকে করে ছিন্নভিন্ন, রাজমহিষী নন্দা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় জয়ন্তীকে করে উদ্ধার, রুধিরাক্ত কলেবরে বীরেন্দ্র সিংহ নিষ্কোষিত অসি-হস্তে করে সংগ্রাম। সেখানে জগৎসিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ওসমান ধরাশায়ী, পর্ব্বতের শিরোদেশে দাঁড়িয়ে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক মোগল সৈন্যবাহিনীর উপরে করে শিলাবৃষ্টি, শাহান্‌শাহ বাদশাহ হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ নামিয়ে রেখে নতজানু হয়ে মাথায় দেন পর্ব্বতের কাঁকর। সেখানে গভীর রাত্রে চন্দ্রশেখর নিদ্রিতা শৈবলিনীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডলের পানে চেয়ে নিঃশব্দে করে অশ্রুমোচন, অভাগিনী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের চরণে মাথা রেখে নবীন যৌবনে মরণের অন্ধকারে যায় বিলুপ্ত হয়ে, অভিমানিনী ভ্রমর গোবিন্দলালের পদরেণু মাথায় নিয়ে চিরনিদ্রার কোলে পড়ে ঘুমিয়ে। সেখানে রোহিণীসুন্দরী বারুণী পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে কলসী ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে কাঁদে, কৃষ্ণকান্ত রায় শয়নমন্দিরে উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা ক'রে আফিমের নেশায় ঝিমায়, রত্নখচিত পালঙ্কে শুয়ে শাহজাদী জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য চোখের জলে বুক ভাসায়।

বাংলা সাহিত্য যত কাল বেঁচে থাকবে তত কাল বাঙালীর মনের মধ্যে বঙ্কিমও সগৌরবে বেঁচে থাকবেন। বন্দেমাতরম্ যাঁর কণ্ঠ থেকে প্রথম উৎসারিত হয়েছে, কমলাকান্তের দুর্গোৎসব বেরিয়ে এসেছে যাঁর লেখনী থেকে, লোকরহস্য আর মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত লিখে, দিগ্‌গজ গজপতির আর গোবরার মা'র ছবি এঁকে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে যিনি অফুরন্ত হাস্যরস বিতরণ করেছেন, যাঁর লেখার মধ্যে আজও লক্ষ লক্ষ বাঙালী এবং অবাঙালী খুঁজে পায় চিত্তের অনাবিল আনন্দ—আমাদের মনের মন্দিরে প্রভাত-সূর্য্যালোকে আলোকিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী মহিমায় তিনি জেগে রইবেন চিরদিন। চির-অম্লান দিগ্বিজয়ী প্রতিভা নিয়ে তিনি আমাদের হৃদয়সিংহাসনে সমাসীন থাকবেন জাতীয়তার প্রথম পুরোহিতরূপে, বাংলার সাহিত্যিকগণের সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করবে তাঁর জন্মভিটা, স্বাধীনতার পর্ব্বতশিখরে আরোহণের পথে তাঁর গ্রন্থ আমাদের অবসাদ করবে দূর, আমাদের হৃদয়ে দেবে প্রেরণা। নবীন বাংলার এবং নবীন ভারতবর্ষের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সকলের শীর্ষে বঙ্কিমের নাম জেগে থাকবে আকাশের জলজলে

শুকতারার মত। তিনি আমাদের প্রাণের বেদিতে রাজোচিত গরিমায় জেগে রইবেন তাঁর মাধবাচার্য্য, রামদাস স্বামী, সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক আর অভিরাম স্বামীকে নিয়ে। বাঙালী কি কোন দিন ভুলতে পারবে সূর্য্যমুখীকে আর রোহিণী সুন্দরীকে, রজনীকে আর মৃণালিনীকে, কমলমণিকে আর শ্যামাসুন্দরীকে, দরিয়াকে আর নির্ম্মল-কুমারীকে, দলনী বেগমকে আর লুৎফ-উন্নিসাকে, সর্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর হীরাকে আর ফুলমণি নাপিতানীকে?

বঙ্কিম বাঙালীর বড় আদরের ধন, বঙ্কিম বাঙালীর আত্মীয়ের চেয়েও পরমাত্মীয়; বঙ্কিমকে বাদ দিয়ে বাঙালী নেই, বাঙালীকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম নেই। বঙ্কিম আমাদের প্রাণের এমন সব নিভৃত তারে আঘাত ক'রে থাকেন যেখানে আর কারও পক্ষে আঘাত দেওয়া এক রকম অসম্ভব। বাঙালীর ভাবপ্রবণ চিত্তে আর কারও লেখা কি এমন ক'রে সাড়া জাগাতে পেরেছে?

কিন্তু সামান্য একটি প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমের বিশাল প্রতিভার সকল দিকের আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই আমি শুধু তাঁর সাহিত্যে প্রগতির দিকটাকে দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকব।

কেবল সুন্দরের পূজায় আত্মনিবেদন ক'রে বঙ্কিমের প্রতিভা সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা বাস্তবের দাবিকে ফাঁকি দিয়ে কল্পনার ইন্দ্রলোকে বাস করতে ভালবাসেন। এই জগতের লক্ষ লক্ষ ভাঙা হৃদয়ের কান্নার সুর তাঁদের প্রাণের উপকূলে গিয়ে পৌঁছয় না। রোম যখন পুড়ে যায় তখনও তাঁদের হাতে বাজে বীণা। দেশ জুড়ে যখন অত্যাচারের ঝটিকা বয় তখন তাঁদের স্বপ্নবিলাসী মন কল্পলোকে করে বিচরণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণতম সুরটিও তাঁদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে না।

বাস্তবের দাবিকে এড়িয়ে যাবার এই যে অমার্জ্জনীয় ভীরুতা, এই ভীরুতার কালিমা বঙ্কিমের তেজস্বী হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। উদার-চিত্তের দিগন্ত-প্রসারী কল্পনার আলোকে বাস্তবের মধ্যে তিনি দেখে-ছিলেন সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের বীভৎস রূপ, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, মেরুদণ্ডহীন অসংখ্য নরনারীর পৌরুষের একান্ত দৈন্য, দেশব্যাপী তামসিক জড়তা এবং ক্লৈব্য। তিনি দেখেছিলেন অনশনক্লিষ্ট সহস্র সহস্র গ্রামে দুর্ভিক্ষের দিগন্তব্যাপী ছায়া, দিকে দিকে বুভুক্ষু নরনারীর শীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকার। তিনি দেখেছিলেন শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব। তারা কেবল উমেদারিতে তৎপর, তাম্বুল-চর্ব্বণে উৎসাহী, তামাকু-সেবনে অভ্যস্ত এবং গৃহিণীতে অনুরক্ত। বঙ্কিমের অননুকরণীয় ভাষায়—

যিনি নিজগৃহে জল খান বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।

এই ইংরেজী-শিক্ষিত, পরানুকরণপ্রিয়, স্বার্থসর্ব্বস্ব, মনুষ্যত্বহীন চাকুরীজীবী ভদ্রসম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমের হৃদয়ে ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে বঙ্কিম এই খেতাবধারী, খোসামুদে, সাহেবঘেঁষা বাবু-সম্প্রদায়ের মুখোস খুলে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেবের দর্শনপ্রার্থী মুচিরাম বাহির থেকে সাহেবের মুখে 'নিকাল দেও শালাকো' শুনে যেখানে দুই হাতে সেলাম ক'রে বলছে, 'বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে—' সেখানে বঙ্কিম শিক্ষাভিমানী ভদ্রসম্প্রদায়ের নৈতিক অধোগতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। নিজের স্বদেশবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আত্মসম্মানবোধের একান্ত দৈন্য, মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিত। তাঁর ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে এই সুতীব্র বেদনার প্রকাশ, তাঁর হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে চোখের জল।

বাস্তবের মধ্যে কোন সান্ত্বনাই তিনি খুঁজে পান নি। সেখানে ছিল না কোন আলো, ছিল না কোনও আশা, ছিল না কোনও আশ্রয়। সেখানে ছিল শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দারিদ্র্য, ক্লৈব্য, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, উদ্যমের ঐক্যের সাহসের এবং অধ্যবসায়ের একান্ত অভাব। দেশজননী তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিলেন শীর্ণ মলিন মূর্ত্তিতে। পরাধীনতার গ্লানিকে বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন

এই জন্যই কপালকুণ্ডলার মত নিছক সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে তাঁর প্রতিভা ক্ষান্ত থাকতে পারে নি। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস লিখেও তাঁর চিত্ত পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায় নি। কঠিন বাস্তব তাঁকে ডাক দিয়েছিল, শৃঙ্খলিত হতভাগ্য জাতিকে নূতন ক'রে তৈরি করবার জন্য লেখনীকে তরবারির মত ধারণ করতে। বাস্তবের সেই দুর্জ্জয় আহ্বানে তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারে নি। আর সেই সাড়া দেওয়ার ফলে রাজসিংহ, আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, কৃষ্ণচরিত্র। নির্ব্বীর্য্য, শতধাবিচ্ছিন্ন, কর্ম্মকীর্ত্তিহীন স্বদেশকে নবজীবনের প্রভাত-অরুণিমার মধ্যে জাগানোর জন্য সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে তিনি দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলেন শৌর্য্যের আদর্শ, ঐক্যের আদর্শ, দেশাত্মবোধের আদর্শ, আত্মসম্মানবোধের আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ। জনসাধারণের চিত্তে যত ক্ষণ একটা বড় আদর্শকে সৃষ্টি করতে না-পারা যায় তত ক্ষণ গণতন্ত্র কেবল কথার কথা হয়ে থাকে। সাহিত্য জাতির মনে এই আদর্শকে সৃষ্টি করে। বঙ্কিম সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে তাই আদর্শ-প্রচারে ব্রতী হলেন।

অসামান্য প্রতিভার আলোকে বঙ্কিম দেখেছিলেন, এক-জাতীয়ত্ব ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নেই। ঐক্যের অভাবই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেছে—ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষকে নবজীবন দান করবে। এই ঐক্য আসবে জাতি-প্রতিষ্ঠার পথে। ভারতবর্ষে যদি কখনও জাতি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় তবেই ভারতবাসীরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হ'লে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ কঠিন হবে না, আর ভারতবর্ষ যদি একবার স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়, তবে তার সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। বঙ্কিম তাই ভারতবর্ষকে কল্যাণের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, শক্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে রূপান্তরিত দেখবার জন্য দেশাত্মবোধের আদর্শকে প্রচার করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। "ভারত-কলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর মনের কথা খুলে লিখেছেন। সেখানে আছে—

'ইতিহাস-কীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুই বার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এক আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল-সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল।...

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ। ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয়বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল।...পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোনো প্রদেশখণ্ডে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত ?

এইখানেই পাই বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূলসূত্রটি। আনন্দমঠ লেখার নিগূঢ় রহস্য—সমুদয় ভারতবর্ষকে কি একজাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না? বাংলার সঙ্গে পঞ্জাবকে, মাদ্রাজের সঙ্গে আসামকে, বিহারের সঙ্গে গুজরাটকে, উড়িষ্যার সঙ্গে সিন্ধুকে কি প্রীতির দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেওয়া সম্ভবপর নয়? বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন, দুর্ভাগা ভারতবর্ষের মুক্তির পথ মৈত্রীর মধ্য দিয়ে—affection shall solve the problem of freedom yet. যারা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, জয়লাভ তাদের অনিবার্য্য। একের জন্য যেখানে হাজার জন তাদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, সেখানে অকল্যাণ আসতেই পারে না। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান যদি প্রেমের মধ্যে এক হয়ে যায়, ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়তে এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু ঐক্যের পথে, মিলনের পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় আদর্শের অভাব। সেই আদর্শ কোথায় যার পতাকাতলে আমরা হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমবেত হ'তে পারি? আমরা সকলের কথা কখনও ভাবি নি। আমরা ভেবে এসেছি কেবল নিজেদের কথা। আমাদের কল্পনা কেবল নিজের মুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে তার চার দিকে

ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেয়েছি নির্ব্বাণ নিজের আত্মার কল্যাণ কামনা ক'রে। নির্ব্বাণের উপর জোর দিতে গিয়ে বাস্তবের সমস্যাগুলিকে করেছি উপেক্ষা। আমাদের বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনগুলি আমাদের চিত্তকে বহির্জগতের সমস্যাগুলি থেকে সরিয়ে এনে তাকে করেছে অন্তর্মুখী। আমরা রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণকে করেছি আশ্রয় এবং বৃহৎ জগতের বিশাল চঞ্চল জীবনধারাকে করেছি অস্বীকার। ফলে এসেছে দেশব্যাপী নিশ্চেষ্টতা। কর্ম্ম-শক্তি ক্রমে ক্রমে পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। ইহজগতে আমাদের বাঁচার মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ দেখতে পাই পারিবারিক জীবনের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তির ভিতরে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচতে শিখিয়েছি কেবল পরিবারের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় স্বাধীনতা—এসব আইডিয়া আমাদের হৃদয়ে কখনও প্রাধান্য লাভ করে নি। সাধারণ লোক ক্ষেতে খামারে কাজ করেছে, অবসর-সময়ে সতরঞ্চ দাবা আর দশ-পঁচিশ খেলেছে, জমিদারকে খাজনা দিয়েছে, শানাইয়ের সুরের মধ্যে ছেলের বউ এনেছে আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছে, সদলবলে মেলায় গিয়ে সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ কিনেছে, ছিপে মাছ ধরেছে, কামারবাড়ীতে গিয়ে দা আর বঁটি গড়িয়েছে, খামারের ধান গোলায় তুলেছে, সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনের রোলের মধ্যে দিবসের দুশ্চিন্তাকে ভুলেছে, উঠানে বেগুনের আর লঙ্কার চারা পুঁতেছে, পুকুরে মাছ ছেড়েছে, দোলের দিনে রং খেলেছে, রাত জেগে যাত্রা শুনেছে, পৌষ-সংক্রান্তির দিন পিঠাপুলি খেয়েছে, গ্রামসুদ্ধ লোক পৌষল্যায় আনন্দে মত্ত থেকেছে, জ্ঞাতিশত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে দল পাকিয়েছে এবং সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার বিপদকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। দেশের স্বাতন্ত্র্য থাকল আর গেল—এ নিয়ে কখনও তারা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে নি। কোন্ রাজার আবির্ভাব ঘটল আর কোন্ রাজার তিরোভাব ঘটল এ-চিন্তা কোনো দিনই তাদের মনকে নাড়া দেয় নি। "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন;

যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছে, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেননা, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্যরক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাঁহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্য রক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই।

সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই—এই খানেই বঙ্কিম আমাদের অধঃপতনের মূল কারণটি আবিষ্কার করেছেন। আমাদের কল্পনা ওপারে ঘুরে বেড়িয়েছে কল্পিত স্বর্গের নন্দনকাননে, আর এপারে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। আমরা আমাদের কল্পনাকে কখনও বিরাট দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে শিখি নি আর এই কল্পনাশক্তির দৈন্যের জন্যই আমাদের সর্ব্বাঙ্গে আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলভার।

বঙ্কিমই প্রথম আমাদের চিত্তকে গৃহপ্রাচীরের গণ্ডী আর নির্ব্বাণ-কামনার সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি দিলেন স্বদেশের বিশালতার মধ্যে, আমাদের দৃষ্টির অস্পষ্টতা দিলেন ঘুচিয়ে আর আমাদের আঁখির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করলেন দেশজননীর রূপ। এই উদার নব-জীবনের মধ্যে আমাদের চিত্তের যে মুক্তি—তারই সুর বেজে উঠেছে বন্দেমাতরমের অমর সঙ্গীতের মধ্যে। মাৎসিনি যেমন ইটালীকে একরাজ্যভুক্ত করবার জন্য তার কানে দিলেন ইটালীয়ান রিপাব্লিকের মহামন্ত্র, বঙ্কিম তেমনি একই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তার কানে শোনালেন বন্দেমাতরমের গায়ত্রীগাথা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঋষিদৃষ্টি দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষকে তার অশেষ দুর্গতি থেকে মুক্ত করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব যদি জনসাধারণের চিত্তে দেশাত্মবোধ জীবন্ত হয়ে না-ওঠে। পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে তার চিত্তকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে ছড়িয়ে দিতে হবে স্বদেশের উদার বক্ষের মধ্যে। জন্মভূমির চরণপ্রান্তে শতধাবিভক্ত দেশকে ঐক্যের মধ্যে মেলাতে

হবে। আর্ট নয়, নির্ব্বাণ নয়, খ্যাতি নয়, বিষয়সম্পত্তি নয়, ছেলেমেয়ের বিবাহ নয়, পল্লীর নিভৃত বক্ষে আম-বাগানের শীতলছায়ায় শান্তির মধ্যে ডুবে থাকা নয়। দেশবাসীর চিত্তকে সকল ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে সেখানে একটিমাত্র সর্ব্বগ্রাসী কামনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সে কামনা হ'ল স্বদেশের মুক্তির কামনা। তেত্রিশ কোটি নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে একটিমাত্র প্রতিমাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, সে প্রতিমা হ'ল জন্মভূমির স্বর্ণপ্রতিমা। অমর উপন্যাস আনন্দমঠে মহেন্দ্রকে ভবানন্দ বলছেন,

আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি. জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—

মহেন্দ্র সিংহের কর্ণে এই যে অমূল্য কথাগুলি ভবানন্দ একদা উচ্চারণ করেছিলেন, এই কথাগুলির মধ্যে বাংলা দেশ একদিন খুঁজে পেল তার নবপ্রভাতের উদ্বোধন-মন্ত্র। সেই মন্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষ আজ একাগ্রচিত্তে জপ করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। বঙ্কিম নেই—কিন্তু ভবানন্দের মুখ দিয়ে যে বাণী তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বিরাট দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।

পারিবারিক জীবনের গণ্ডী থেকে বাঙালীর চিত্তকে মুক্ত করবার জন্য তিনি যে এতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন তার কারণ তিনি জানতেন দাম্পত্যপ্রেমের সঙ্কীর্ণতা দেশাত্ম-বোধের জাগরণের পথে সবচেয়ে প্রবল অন্তরায়। দেশাত্ম-বোধের কাজ হচ্ছে মানুষকে বহু জনের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করা, তার চিত্তকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। দাম্পত্যপ্রেম দু-জনের মধ্যে সংসারকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়—বাসরঘরের তপ্ত কোটরের মধ্যে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে স্থান দিতে একান্ত নারাজ। পারিবারিক জীবনে যারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত তারা বাহিরের মানুষগুলিকে দূরে ঠেলে রাখতে চায়। এই জন্যই আনন্দমঠের সন্তানদের জন্য গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা।

সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। মাতাপিতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতাভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাসদাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতার কথা বঙ্কিমের অজানা ছিল না। এই জন্যই ইন্দ্রিয়জয় এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে না-বসা সন্তানধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। মেয়েদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল নীড় বাঁধা। পুরুষের কাজ সভ্যতাকে গড়ে তোলা। সেই কাজকে সফল করতে হ'লে নীড়কে আঁকড়ে থাকলে চলে না। এই জন্যই দেখা যায়, যেখানে পুরুষের জীবনে সভ্যতার এবং সংস্কৃতির দাবি প্রাধান্য লাভ করেছে, সেখানে নারীর প্রেমের দাবি গৌণ হয়ে গেছে। ফ্রয়েড তাঁর *Civilisation and its Discontents* নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির আর দাম্পত্যপ্রেমের এই দ্বন্দ্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

Since man has not an unlimited amount of mental energy at his disposal, he must accomplish his tasks by distributing his libido to the best advantage. What he employs for cultural purposes he withdraws to a great extent from women and his sexual life; his constant association with men and his dependence on his relations with them even estrange him from his duties as husband and father.

মানুষের মনের শক্তির একটা সীমা আছে। এই জন্যই তাকে কোন বড় কাজ করবার জন্য যখন শক্তি ব্যয় করতে হয় তখন নারী এবং যৌন জীবনের দিকে তার মন দেবার অবসর থাকে না। একটা মনকে আর কত দিকে দেওয়া যায়? স্বামীর আর পিতার কর্ত্তব্য পুরাপুরি পালন করতে গেলে বহু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সময় থাকে না, আর বৃহৎ জগত থেকে যে মানুষ বিমুখ হয়ে থেকেছে মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে তার দানের পরিমাণ কখনও বেশী হ'তে

পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর দুর্ব্বলতা কোথায় তা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। আমাদের দুর্ব্বলতা আমাদের ঘরের মায়ায়। ঘরের প্রতি অত্যধিক মায়া, ভায়ের মায়ের অত্যধিক স্নেহ আমাদের চিত্তে দেশাত্মবোধের উন্মেষকে যে ঠেকিয়ে রেখেছে, মর্ম্মে মর্ম্মে বঙ্কিম তা উপলব্ধি করেছিলেন আর সেই জন্যই বাঙালীকে কুটীরের আঙিনা থেকে টেনে এনে তাকে মুক্ত পথের বুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্ত তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতাকে লাভ করতে হ'লে কেবল ঘরের মোহকে ভাঙলেই যথেষ্ট হবে না। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তিলাভ দেশাত্মবোধের অপরিহার্য্য অঙ্গ সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশকে আপনার করতে হ'লে শৌর্য্যও চাই। যারা বলহীন তাদের জন্ত মুক্তির স্বর্গ নয়। স্বাধীনতা আসে শক্তিসাধনার পথে, অত্যাচারের অবসান ঘটায় সাহস এবং বীর্য্য। বাঙালীর এই শক্তিসাধনার পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় সৃষ্টি করেছে আমাদের ধর্ম্ম। যেদিন থেকে আমরা ভগবানের শিরে শিখীপুচ্ছ আর হাতে মোহন বাঁশী দিয়ে তাঁর মধুর-রূপের উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাতে আরম্ভ করেছি—সেই দিন থেকে আমাদের জীবনে ক্লৈব্যের পালা সুরু হয়েছে। আমরা শক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে প্রেমের পথ ধরেছি, আর প্রেমের সাধনা করতে করতে অপদার্থ হয়ে গেছি। বহিঃশত্রু এসে আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের অধিকারে হাত দিয়েছে আর অপমানের মধ্যে টেনে এনেছে। আমরা কিল খেয়ে কিল চুরি করেছি, আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অহিংসার মুখোস প'রে আমাদের ক্লৈব্যকে লুকিয়ে রেখেছি। কি কুক্ষণেই যে চৈতন্যদেব প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন! প্রেম শক্তিমানের ভূষণ, দুর্ব্বলের কলঙ্ক। যেখানে শৌর্য্য নেই সেখানে অহিংসা হ'ল ক্লৈব্যের পরিচয়। কিন্তু শৌর্য্য সেখানে আসবে কেমন ক'রে যেখানে ভগবান মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন কেবল প্রেমের ঠাকুর, হয়ে, যেখানে তিনি কেবল সুন্দর?

বঙ্কিম তাঁর স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে স্থাপন করলেন ভগবানের প্রচণ্ড-মনোহর রূপ—যে রূপে তিনি দণ্ডধারী হয়ে শাসন করেন আর মৃত্যুকে বিকীর্ণ করেন দিকে দিকে। তিনি ভগবানের শক্তিময় রূপকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর দেশবাসী সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়মন্দিরে। যারা শক্তিহীন কাপুরুষ তাদের কাছে Christian Ideal প্রচার করা অর্থহীন। Nothing is worthwhile unless it is strong, neither good nor evil. বঙ্কিম তাই দেশবাসীর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন তার মধ্যে রয়েছে শক্তির বাণী। মহেন্দ্র যখন বললে 'বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম,' তখন সত্যানন্দ সে কথার উত্তরে যা বলেছিলেন, নূতন বাংলা তার মধ্যে পথের আলো খুঁজে পেয়েছে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছিলেন—

'সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে বিকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা; দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংশ শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম দিলেন তাঁর স্বদেশকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা। নীট্‌শে এক দিন জার্ম্মানীকে এই শক্তিমন্ত্র শুনিয়ে তার অন্তরে জাগিয়েছিলেন পৌরুষের প্রতি দুর্ব্বার অনুরাগ। খ্রীষ্টের অহিংসার আদর্শকে ভেঙে ফেলে নীট্‌শে নব্য জার্ম্মানীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শক্তির আদর্শ তাঁর Will to Powerএর বাণী উচ্চারণ ক'রে। সে আদর্শ জার্ম্মানীকে দিয়েছে ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য। বঙ্কিমও নীট্‌শের মতই বাঙালীর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ক্ষত্রিয়ের পৌরুষের আদর্শ, আর সে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁকেও ভাঙতে হয়েছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুর্ব্বল প্রেমের বিকৃত আদর্শকে। বঙ্কিম বাংলা দেশের কানে শুনিয়েছেন এমন অগ্নিবচন যা তাকে ক্লৈব্যের গ্রাস থেকে মুক্ত ক'রে

অমৃতের পথে পরিচালিত করেছে। বঙ্কিমের প্রতিভার এই দিকটার কথা উল্লেখ ক'রে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন,

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি, তাহা ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি।…বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন নূতন স্বাধীন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করবার জন্য অন্যায়ের ধ্বংসের প্রয়োজন আছে। পুরাতনের মৃত্যুর পথে আসে নবজীবনের সমারোহ। সেই পুরাতনকে, সেই অমঙ্গলকে, সেই নিষ্ঠুর অন্যায়কে আর দুর্নীতিকে ভাঙতে গেলে ভগবানের বংশীধারী প্রেমিক রূপের উপাসনা করলে হবে না। বৃন্দাবনের রাধিকামোহন কৃষ্ণঠাকুরটিকে বঙ্কিম তাই আনন্দমঠে স্থান দেন নি। তিনি আবাহন গেয়েছেন সেই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের যিনি শক্তিময়, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে, যিনি সর্ব্বগ্রাসী বন্যায়, যিনি দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে যুদ্ধে আর ভূমিকম্পে, যিনি গড়বার জন্য বজ্র দিয়ে অন্যায়কে ভাঙেন। বঙ্কিম বিবেকানন্দের মতই ভারতবর্ষের কানে দিয়েছেন শৌর্য্যের বাণী। বঙ্কিম বাংলার নীট্‌শে।

স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে আর একটি আদর্শ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সে আদর্শটি হ'ল সাম্যের আদর্শ। স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন, সাম্যেরও তেমনি প্রয়োজন। বঙ্কিম এই সাম্যের আদর্শকেও জয়ী করেছেন তাঁর লেখায়। বঙ্কিম লিখেছেন,

বড়লোকে ছোটলোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড়লোক, যদু ছোটলোক কিসে?…যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং ছোটলোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন-সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভালমানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড়লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোটলোক। অথবা রাম কোনও বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সে বড়লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

বঙ্কিম কখনও ধনের আভিজাত্যকে সম্মান দান করেন নি। যাদের টাকা আছে, কিন্তু চরিত্র নেই, কর্ম্মক্ষমতা নেই, তাদের প্রতি বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা কি সুতীব্র ছিল, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তার অজস্র প্রমাণ আছে। অর্থের প্রাচুর্য্যের মাপকাঠি দিয়ে তিনি যেমন মানুষের মূল্য নির্দ্ধারণ করতেন না, কুলমর্য্যাদাও তেমনি তাঁর কাছে মানুষের মূল্য-বিচারের কষ্টিপাথর ছিল না। বর্ণবৈষম্যকে ধনবৈষম্যের মতই তিনি অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ভারতবর্ষের অবনতির একটি মূল কারণ তিনি দেখেছিলেন বর্ণবৈষম্যের মধ্যে। তার পর নারী-পুরুষের যে বৈষম্য সেই বৈষম্যকেও তিনি সমর্থন করেন নি।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।

এ-কথা বঙ্কিমের কথা। বঙ্কিম যেমন স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, সাম্য-মন্ত্রেরও তেমনি উপাসক ছিলেন। তাঁর "সাম্য" প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে মানুষকে তিনি কতখানি ভালবাসতেন এবং কাঞ্চনকৌলিন্যের প্রতি তাঁর কতখানি ঘৃণা ছিল।

বঙ্কিম আজ সুদূরে, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁর আরব্ধ সাধনা আজ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর একাকী কণ্ঠের উচ্চারিত বন্দেমাতরম্ আজ সমস্ত ভারতবর্ষের গায়ত্রীমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। জন্মভূমিকে মুক্ত দেখবার যে নিবিড় আকাঙ্ক্ষা এক দিন তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা আজ অগণিত মনে বাসা নিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের যে স্বপ্ন দেখে কত দিন তাঁর চিত্ত পুলকের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—সেই স্বপ্ন আজ সমস্ত ভারতবাসীর স্বপ্ন। বঙ্কিমের অমরত্ব এইখানেই।

বন্দেমাতরম্

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(১৫)

এই বাড়ীতে আসিয়া মৃণাল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বোর্ডিং জিনিষটা তাহার ধাতে একেবারেই সহ্য হয় না, এত কাল বাস করিয়াও সহিয়া যায় নাই। ভগবান্ জন্মের পরেই তাহার ঘর ভাঙিয়া দিয়াছিলেন, তাই যেন ঘরের প্রতি তাহার হৃদয়ের এমন অদম্য টান। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াও সে একটি সুন্দর পল্লীনীড় ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ সেই ঘর বাঁধার সঙ্গী হিসাবে কাহাকে সে পাইবে সে জানে না, বেশী ভাবিতে গেলেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে। অজানা ভয়, অজানা পুলকের দোলায় তাহার মন দুলিতে থাকে।

বীরেনবাবুর মায়ের কাজ করার চেয়ে গল্প করার দিকে ঝোঁক ছিল বেশী। তবে গৃহিণী সুরবালার তাড়ায় কাজও কিছু কিছু হইতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীতে দশটা মানুষ খাইতে আসিবে, কিছু ত্রুটি হইলে লজ্জা তাঁহারই হইবে, মাসীমাকে ত আর কেহ চেনে না? কাজেই চাল-ডাল বাঁছা, মশলা বাছা, সুপারি কাটা ইত্যাদি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হইতে লাগিল। বিকালের দিকে পঞ্চানন আর বিমল দু-জনেই আসিয়া পৌছিল, এবং ফর্দ্দ লইয়া বাজার করিতে যাত্রা করিল। কোথায় কোথায় শুদ্ধ জিনিষ পাওয়া যায় তাহা দেখাইয়া দিবার ভার লইল পঞ্চানন, দরদস্তর করিয়া কিনিতে হইল বিমলকে। বীরেনবাবু সুধু পয়সা গণিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঝাঁকামুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া সন্ধ্যার পর তিন জন ফিরিয়া আসিল। মাছ সকালে কিনিতে হইবে, কাজেই বিমলের আর একবার আসা অনিবার্য্য। পঞ্চানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সাড়ে ন'টা দশটার আগে আমি আসতে পারব না।"

বীরেনবাবু কাতর ভাবে বলিলেন, "তাই এস অগত্যা। বিমল, বাবা, মাছটা তাহলে তুমিই একটু দে'খে শুনে কিনে দিও।"

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জাগিয়া মেয়েরা তরকারি কুটিল আর পান সাজিল। ছোট দুই মেয়ে রেবা আর সেবা কাজ যত করুক বা না-ই করুক, কাজের অজুহাতে পরের দিন স্কুল কামাই করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। তাহারাও সমানে রাত জাগিতে প্রস্তুত ছিল, তবে দশটার পর সুরবালা তাড়া দিয়া তাহাদের শুইতে পাঠাইয়া দিলেন। মৃণাল বৃদ্ধার সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া রাতটা কোনমতে কাটাইয়া দিল।

ভোর হইতে-না-হইতে সকলকে উঠিতে হইল। স্নান না করিয়া আজ রান্নাঘরে যাইবার উপায় নাই। মৃণালের জন্য সুরবালা তাড়াতাড়ি গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বৃদ্ধা অবশ্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। স্নানের পর রান্নাঘরে গিয়া কে আমিষ রাঁধিবে কে নিরামিষ রাঁধিবে তাহার আলোচনা চলিল। শেষে মৃণাল লইল আমিষের ভার, বীরেনবাবুর মা ও গৃহিণী মিলিয়া বাকী সব করিবেন স্থির হইল।

মাছও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। মুটের সঙ্গে সঙ্গে বিমলও ভিতর-বাড়ীতে ঢুকিয়া আসিল। বীরেনবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা, মাছ খুব খাসা পাওয়া গেছে।"

বাড়ীর সব মেয়ে এক জোটে মাছ দেখিতে বাহির হইয়া আসিল। মৃণালও পিছনে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সত্যই বেশ ভাল মাছ, একেবারে টাট্‌কা।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ দে'খে খুশী হয়েছেন ত ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা আর হব না ভাই, সুন্দর জিনিষ এনেছ।"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, মুড়োটা যেন আমার পাতে

পড়ে, আমিই মাছটা খুঁজে বার করেছি। মাছ আপনি রাঁধবেন ত?”

বৃদ্ধা বলিলেন, “না, মিনুর উপর মাছের ভার, আমি নিরামিষ রাঁধছি।”

বিমল আর কিছু না বলিয়া মুটেকে পয়সা চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মৃণাল একটু ভয়ে ভয়েই কাজে নামিল। রান্না করার অভ্যাস যে তাহার নাই তাহা নহে, তবে বাহিরের পাচ জন লোক খাইবে, রান্না ভাল না হইলে লজ্জার বিষয়। মামীমা সঙ্গে থাকিলে তাহার ভাবনা ছিল না, কিন্তু এখানে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হয়। যাহা হউক এগারটার মধ্যে সে নিজের কাজ সারিয়া ফেলিল, চোখের দৃষ্টিতে ত রান্না তাহার ভালই বোধ হইল, এখন খাইতে লোকের মুখে কেমন লাগিবে কে জানে?

বারোটার মধ্যে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের দল আসিয়া পৌছিলেন। পঞ্চানন আসিল তাহাদের মিনিট দশ-পনর আগে। তাহার পূর্ব্বে সে সকালের কাজ সারিতে পারে নাই।

বাহিরের ঘরে খাইবার জায়গা হইতে লাগিল। বাড়ীর দুই জন চাকর বীরেনবাবু ও বিমলের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতে লাগিল, এবং পঞ্চানন তদারক করিতে লাগিল বিমলকে।

সবাইকে বসাইয়া বিমল পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিল, “পঞ্চুমামা কি এখন বসবে, না পরিবেষণ করবে?”

পঞ্চানন বলিল, “যাতে তোমাদের সুবিধে, বসতেও আপত্তি নেই, পরিবেষণ করতেও আপত্তি নেই।”

বীরেনবাবু বলিলেন, “পঞ্চু ব'সেই যাক্, বেলা হয়ে যাচ্ছে, এই ক'জন ত লোক, আমি আর তুমিই দিতে পারব।”

বিমল বলিল, “নিশ্চয়, তা হ'লে বসে যাও পঞ্চুমামা!”

বাড়ীর মেয়েরা ঘরের দরজা পর্য্যন্ত জিনিষ অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল, এবং বিমলই পরিবেষণ করিতে লাগিল। পঞ্চানন অন্দরের দরজার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া খাইতে লাগিল। মৃণাল তরকারি, মাছ, দই, মিষ্টি সবই বহন করিয়া আনিতেছিল, কারণ ঠাকুরমা ছোট মেয়েদের হাতে কিছু দিতে চান না। মুখে বলেন, “ছেলেমানুষ, ফে'লে দেবে,” আসলে তাহাদের কাপড়-চোপড়ের শুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ যায় না। কাজেই মৃণালই একে একে সব জিনিষ আনিয়া পৌছাইয়া দিতে লাগিল। পঞ্চাননের মুখে বিরক্তির ভাবটা ক্রমে ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিল, বিমলের সঙ্গে এ-মেয়ের এত কথা বলা কেন? ইহার শিক্ষা ত ভাল হইতেছে না?

আসলে কথা যা বলিতেছিল বিমলই, মৃণাল শুধু হাসিয়া বা হাঁ-না করিয়াই তাহার উত্তর দিতেছিল। কিন্তু ইহাও পঞ্চাননের চোখে খোঁচা দিয়া তাহাকে বিরক্তিতে ভরপূর করিয়া তুলিল। খাইতেও সে বেশ ভালবাসে, রান্নাও হইয়াছে নানা রকম, কিন্তু সেদিকে সে মন দিতে পারিতেছে কই?

বিমল একবার ভিতরের দরজার দিকে গিয়া বলিল, “মাছরান্না খুব ভাল হয়েছে, সবাই চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে।”

মৃণাল একটু হাসিয়া বলিল, “বাঙালীরা নিরামিষের চেয়ে মাছ এমনিতেই পছন্দ করে বেশী।”

পঞ্চানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে বলিল, “এই ত সেদিন ট্রেনে দেখা, এরই মধ্যে গল্পের ঘটা দেখ না? এ-মেয়েকে নিয়ে বেগ পেতে হবে।”

খাওয়া চুকিয়া গেল। অতিথিদের দক্ষিণা দেওয়া হইল, পঞ্চানন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল না। বেশ গম্ভীর ভাবে ট্যাঁকে টাকা গুঁজিতেছে এমন সময় মৃণাল আবার পান হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন আরও গম্ভীর হইয়া সরিয়া গেল। এ-ব্যাপারটা মৃণালের চোখে না পড়িলেই ভাল ছিল, যা সাহেবী মেজাজের মেয়ে।

ইহার পর বাড়ীর ভিতরে ছেলেমেয়ে সকলে খাইতে বসিল, ইহাদের পরিবেষণ করিলেন বীরেনবাবুর মা আর সুরবালা। ইঁহারা সকলকে না-খাওয়াইয়া খাইবেন না। বৃদ্ধা বলিলেন, “বীরুও এই সঙ্গে বসুক না, সে আর একলা খাবে কেন বাইরে?”

গৃহিণী বলিলেন, “হ্যাঁ, ঢের বেলা গেছে, দাদার আর

দেরি ক'রে কাজ নেই। ঐ বিমল ছেলেটিকেও ডেকে আন, ও ত ঘরেরই ছেলের মত।"

বিমলকেও ডাকিয়া আনা হইল। এক লাইনে বসিলেন বীরেনবাবু, বিমল আর বাড়ীর একটি ছেলে। অন্য লাইনে বসিল মেয়ের দল। বাড়ীর কর্ত্তা কাজ কামাই করিতে পারেন না, তিনি দশটার মধ্যেই যাহা রান্না হইয়াছিল খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিমল খায় সাধারণ কলিকাতাবাসী ছেলেদের মতই। বৃদ্ধা কেবলই অনুযোগ করিতে লাগিলেন "তুমি ত কিছুই খাচ্ছ না ভাই, তোমাকে শুধু খাটিয়েই মারলাম।"

বিমল বলিল, "আজকালকার ছেলেরা এর চেয়ে বেশী খেতে পারে না ঠাকুরমা।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "কেন, এই যে আমাদের পঞ্চু, সেও ত আজকালকারই ছেলে, বেশ ত খেতে পারে।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "ওরে বাপ রে, পঞ্চুমামার সঙ্গে কার তুলনা? আমাদের সাধ্যিও নেই ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার।"

মৃণাল মনে মনে বলিল, "না হ'লে অমন চমৎকার চেহারা হয়!"

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে, বিমল আবার বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল অতঃপর মেসে ফিরিবার, কিন্তু বীরেনবাবু তাহাকে ছাড়িতে নারাজ। বলিলেন, "দিনটা ত মাটিই হয়েছে বাবা, তবে আর ক'-ঘণ্টার জন্যে কেন? সব চুকিয়ে রাত্রে দুটো ভাতে ভাত খেয়ে একেবারে মেসে গিয়ে ঘুমিয়ে থেকো।"

বিমল বলিল, "আজকের মত ঢের হয়েছে, আর ভাতে ভাত খাবারও জায়গা নেই। আর কাজ কি-ই বা বাকী আছে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "মিনুকে তার বোর্ডিঙে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না? আমার ত বাপু এ আজব শহরের রাস্তায় পা দিলেই মাথা ঘুরে যায়। এই কাজটুকু ক'রে দিতেই হবে।"

বিমল আর আপত্তি না করিয়া থাকিয়া গেল।

সন্ধ্যার মুখে মৃণাল চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় বদলাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধা রাতটা থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আর বেশী সময় নষ্ট করিতে মৃণালের সাহস হইল না।

রাস্তায় পা দিয়া বিমল বলিল, "এবার না-হয় একখানা গাড়ী করা যাক্।"

মৃণাল বলিল, "কি দরকার? ট্রামে এসেছি ট্রামেই যাব।"

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীর ওঁরা যদি কিছু মনে করেন?"

বীরেনবাবু একটু কৃপণ মানুষ, যেখানে চার আনায় সারা যায় সেখানে বারো আনা খরচের সম্ভাবনা তাঁহার মনে বড় আঘাত দেয়। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে না, না, মল্লিকদাদা আমাদের সেরকম মানুষই নয়, অত গোঁড়ামি ওঁর নেই।"

মৃণাল আন্দাজে বুঝিল, বিমল কেন আপত্তি করিতেছে। মনটা তাহারও বিগড়াইয়া গেল, এখনই কি পঞ্চাননের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া তাহাকে চলিতে হইবে? সে বলিল, "মামা কিছুই মনে করবেন না, আমি ট্রামেই যাব।"

ট্রামেই চড়িয়া বসিল তিন জনে। মৃণালকে বোর্ডিঙে পৌঁছাইয়া দিয়া বিমল সোজা নিজের মেসে চলিয়া গেল। বীরেনবাবু বার দুই-তিন যাতায়াত করিয়া রাস্তাটা চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি আর পয়সা না খরচ করিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়াই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুপুরে ঠাসিয়া খাওয়ার ফলে পঞ্চাননকে বাড়ী গিয়া খানিক বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিকাল হইতেই সে হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটু হাঁটা-চলা করিলে শরীরটাও ভাল বোধ হইবে, আর বীরেনবাবুদেরও একবার খবর লওয়া দরকার। শুধু খাইয়া বিদায় হইয়া গেলে তাঁহারা ভাবিবেন কি? আত্মীয় না হইলেও এক গ্রামের লোক ত বটে? তাহারই বেশী করিয়া উঁহাদের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু বিমলে হতভাগা যে "গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল।" তাহার জ্বালায় কাহারও কিছু করিবার জো থাকিলে ত? ছেলের মতলব যে ভাল নয় তাহা বুঝাই যাইতেছে। তবে সুখের বিষয় অমন চাল-চুলাহীন ছেলেকে কেহই পঞ্চাননের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ

করিতে সাহস করিবে না। স্বয়ম্বরার যুগ বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয় সুকিয়া ষ্ট্রীটে পৌছিয়া সে বাড়ীতে পুরুষ মানুষ এক জনও দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া তাহাকে খবর দিলেন যে জামাই এখনও ফেরেন নাই, ছেলে বিমলকে লইয়া মিনুকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছে এবং বাড়ীর অন্য ছেলেরা খেলিতে চলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চাননের গা জ্বলিয়া গেল। কোনমতে আর দুই-চারটা কথা বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতে তখনই ইচ্ছা করিল না। দুপুর বেলা যা গুরুভোজন গিয়াছে, রাত্রে আর রান্না-খাওয়ার হাঙ্গাম করিবে না সে স্থিরই করিয়াছিল। ফলাহার করিলেই হইবে নিতান্ত যদি ক্ষুধা পায়। তাহার যোগাড় বাড়ীতে সর্ব্বদাই থাকে।

হেদুয়ার ধারে বেঞ্চিতে বসিয়া সে অনেক ভাবনা ভাবিয়া লইল। বিবাহ করিবার বয়স তাহার হইয়াছে। ইচ্ছারও কিছুমাত্র অভাব নাই। পারিবারিক অবস্থার উন্নতিও যদি এই সূত্রে খানিকটা হইয়া যায় ত সোনায় সোহাগা। মেয়ের বংশ এবং শিক্ষাদীক্ষাই যে একমাত্র দেখিবার ইহা সে জোর গলায় প্রচার করে বটে, তাই বলিয়া মেয়ে সুন্দরী হইলে বা ধনবতী হইলে যে কিছু আপত্তির কারণ আছে তাহা ত নয়? সকল দিক্ দিয়াই মৃণালকে সুপাত্রী বলা চলে। জ্যাঠাইমার মতে মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী, তা পঞ্চাননের ইহাতে বাস্তবিক আপত্তি কিছু নাই, বরং খুকী মানুষ করার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। দাদার বউ দাদাকে যেরকম জ্বালাতন করিয়াছিল, সেই রকম করিলে ত পঞ্চাননের মত বদমেজাজী মানুষের ঘরে টেঁকাই দায় হইবে। তাহার চেয়ে বয়স্থা বধূই ভাল। একটু চাপ দিলে মল্লিক-মহাশয় হাজার টাকা পণ যে না দিতে পারেন তাঁহা পঞ্চাননের মনে হয় না। সব চেয়ে বড় কথা যে মৃণালকে তাহার পছন্দ হইয়াছে। নিজের কাছে স্বীকার করিতে ত আপত্তি নাই? ইতিপূর্ব্বে তাহার যে-কয়টি বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে একটিতেও মেয়ে বিশেষ পছন্দ মত নয়। এইখানে বিবাহ হইলে পঞ্চানন খুশী হয়, কিন্তু মেয়েটিকে আর বেশী মেমসাহেবী করিতে দিলে পরে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থের ঘরে তাহার মানাইয়া চলা শক্ত হইবে। কিন্তু মল্লিক-মহাশয়কে এ বিষয়ে কি ভাবে সাবধান করা যায়? জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা সেকেলে মানুষ, তাঁহাদের জানাইলে তাঁহারা হয়ত হাঁউমাউ করিয়া বিবাহই ভাঙিয়া দিবেন। মল্লিক-মহাশয়কে সে নিজে লিখিতে পারে না, সেটা শিষ্টাচার-বহির্ভূত হইবে। মৃণালকে জানানো ত অসম্ভব। কি তাহা হইলে করা যায়? বিমলেকে কিছু বলিতে গেলে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়া ব্যাপারটা বিশ্রী না হইয়া দাঁড়ায়। দাদার বৌটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম, কিন্তু আর উপায় না দেখিলে তাহারই সাহায্য লইতে হইবে।

ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া পঞ্চানন গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বোর্ডিঙের দোতলাটা এখান হইতে দেখা যায়, সেদিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। কিন্তু মানুষ চেনা ত যায় না?

পঞ্চানন আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাত্রেও খানিকক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে কাগজ কলম লইয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানা লেখা হইল বৌদিদিকে। সে যেন সময়মত মল্লিক-গৃহিণীকে একটু জানাইয়া দেয় যে খুব বেশী আধুনিক ও শিক্ষিতা মেয়ে পঞ্চাননের পছন্দ নয়। এমনিতে মৃণালকে যে তাহার মনে ধরিয়াছে তাহার ইঙ্গিত করিতে আপত্তি নাই।

(১৬)

শীতের খটখটে রোদ, এমন সময় ঘরে ঢুকিতে বড় ইচ্ছা হয় না। রোদে পিঠ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে বড় আরাম। কিন্তু মল্লিক-গৃহিণী কাজের মানুষ, আরাম করিবার সময় তাঁহার বড় কম। বাড়ীর সব কাজ একা হাতে করিতে হয়। রাধী আগে শুধু বাসন মাজিত, এখন ছেলেমেয়ে সামলানোর কাজও তাহাকে কিছু কিছু করিতে হয়, না হইলে উপায় নাই। খোকা অসম্ভব দামাল,

তাহাকে এক জন না ধরিলে রান্নাবান্না কিছুই করা হয় না। টিনি, চিনি কাজে বাগড়া দিতে দিব্য পারে, মায়ের কাজে সাহায্য করিবার যোগ্যতা এখনও তাহাদের হয় নাই।

কাজেই টিনি, চিনি এখন রাধীর সঙ্গে পুকুরে স্নান করিতে যায়। স্নান তাহারা নিজেরাই করে, রাধী তাহাদের গা হাত রগড়াইয়া দেয়, চুল মুছিয়া দেয়, কাপড়-গামছা কাচিয়া আনে। মল্লিক-গৃহিণী ততক্ষণ খোকাকে কোলে কাঁখে করিয়াই কোনমতে রান্না সারিয়া ফেলেন। বড় ছেলে ইহার মধ্যে খাইয়া স্কুলেও চলিয়া যায়। তাহার পর টিনি, চিনি ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ভাত বাড়িয়া খাইতে বসাইয়া দিয়া, খোকাকে রাধীর কোলে দিয়া তিনি স্নান করিতে যান। টিনি, চিনি ডাল-ভাত ছড়াইয়া, ঝগড়া মারামারি করিতে করিতে খাইতে থাকে, রাধী দাওয়ার নীচে ছায়ায় বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতে থাকে। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে ঘুমন্ত খোকাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া সে বাড়ী চলিয়া যায়। আবার বেলা গড়াইলে বাসন মাজিতে আসে।

আজও টিনি, চিনি বেলা এগারোটা নাগাদ স্নান করিতে চলিয়াছে। এতক্ষণে রোদটা বেশ খটখটে হইয়া উঠিয়াছে, নীলাকাশের উপর স্বচ্ছ কুয়াসার আবরণটা আর দেখা যায় না। মেয়েরা এতক্ষণ দোলাই মুড়ি দিয়া উঠানে বসিয়াছিল, এখন সেগুলি খুলিয়া ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়াছে। চুল খোলা, তেলে জবজব করিতেছে, নাক, কপাল, ঘাড় বহিয়া তেল গড়াইয়া পড়িতেছে। মল্লিক-গৃহিণী সেকেলে মানুষ, নারিকেল তেল, সরিষার তেল দুইয়েরই খরচ তাঁহার ঘরে খুব বেশী। শীত-গ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে মাথায় গায়ে বেশ করিয়া তেল মাখা বাড়ীর সকলেরই অভ্যাস। মৃণাল বাড়ী আসিলে মামীমা তাহাকে অনুযোগ দেন, "কি সব বিবিয়ানাই শিখেছিস বাছা, অমন যে কাগের ডানার মত কালো একরাশ চুল, তাও তেল না মেখে মেখে কটা ক'রে ফেলেছিস্।"

টিনি, চিনির পিছন পিছন রাধী চলিয়াছে, হাতে তাহার দুখানা ডুরে শাড়ী, লাল চৌখুপি একখানা গামছা, আর ছোট ছোট দুটি র‍্যাপার। স্নানের পর বড় শীত করে, তখন র‍্যাপার গায়ে না জড়াইলে চলে না।

ঘাটে তখন সবে মহিলা-সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। এত সকাল সকাল স্নান করিতে আসিবার অবসর বড় কাহারও হয় না, তবে ছোট ছেলেমেয়েরা এই সময় হইতে ভিড় করে, সঙ্গে এক জন করিয়া বয়স্কা কেহ আসেন।

টিনি, চিনি মল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। রাধী পৈঁঠার উপর এক ধারে বসিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া তাহাদের খবরদারি করিতে লাগিল।

সব চেয়ে নীচের ধাপে বসিয়া একটি বউ একটা ছোট মেয়ের পিঠে কষিয়া গামছা ঘষিতেছিল। টিনিকে দেখিয়া ঘোমটাটা একটু ঠেলিয়া খাটো করিয়া দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বয়স বেশী নয়, ষোল-সতের বছরের হইবে। চোখ দুইটা ছোট, নাকটাও বিশেষ উঁচু নয়, তবে রংটা ফরসা বলা চলে। বউ বলিল, "আমাদের টিনিরাণী যে গো? মা কখন আসবে চান করতে?"

চিনি বলিয়া উঠিল, "মা আসবে সে—ই বারোটার সময়।"

টিনি বলিল, "আমরা গিয়ে ভাত খাব, খোকন ঘুমবে তবে ত?"

বউ বলিল, "আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলিস্, বলবি যে চক্কোত্তিদের বউ সকাল সকাল আসতে বলেছে, একটা কথা আছে।"

"বলব গো" বলিয়া ঝপাৎ করিয়া দুই বোনে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহারা সাঁতার কাটে মাছের মত, জল পাইলে তাহাদের আর শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান থাকে না।

খানিক বাদে রাধীর চীৎকারে তাহাদের আবার ঘাটে আসিয়া ভিড়িতে হইল। তখন রাধী বেশ করিয়া গামছা দিয়া তাহাদের গা হাত পা রগড়াইয়া দিল। অতঃপর গোটাদুই ডুব দিয়া গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া তাহারা ফিরিয়া চলিল। রাধী তাড়াতাড়ি তাহাদের গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া দিল।

টিনি, চিনি গিয়াই, মাকে সংবাদ দিল, "মাগো,

চক্কোত্তিদের বড় বউ তোমাকে শীগ্‌গির নাইতে যেতে বলেছে।"

মা তাহাদের খাইবার জায়গা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন লা? কুসমি আবার আমাকে যেতে তাগাদা দেয় কেন?"

চিনি বলিল, "তার যে একটা কথা আছে।"

টিনি বলিল, "তুমি না গেলে সে মোটে যাবেই না ঘাট থেকে।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোরা এখন খেতে বোস্ দেখি। নে বাছা রাধী তুই খোকাকে ধর।"

খোকাকে রাধীর কোলে দিয়া, তিনি হেঁসেল গুছাইয়া নিজের শাড়ী, গামছা, তেলের বাটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। দিনের ভিতর এই সময়টুকু মাত্র তাঁহার অবসর ঘাট হইতে আসিতে একটু দেরিই হইয়া যায়। মানুষ-জনের সঙ্গে দেখা করিবার, কথা কহিবারও এই সময়। তবে তিনি খুব বেশী গল্পের ভক্ত নন এই যা রক্ষা, না হইলে এক এক বাড়ীর বৌ-ঝি স্নান করিতে ঘাটে আসে বারোটায়, বেলা গড়াইয়া যাওয়ার আগে বাড়ী ফিরিবার নাম করে না। নিতান্ত দজ্জাল শাশুড়ী ঘরে থাকিলে দুই-এক জন ফিরিয়া যায়। শীত-গ্রীষ্ম-নির্ব্বিচারে পুকুর-ঘাটের মাধ্যাহ্নিক 'ক্লব' সমান জোরে চলিতে থাকে।

মল্লিক-গৃহিণী ঘাটে পৌছিয়া দেখিলেন, মহিলা-সমাগম ইহারই ভিতর মন্দ হয় নাই। পঞ্চাননের জ্যাঠাইমাও আসিয়া পৌছিয়াছেন, এক ধারে বসিয়া পূজার বাসন মাজিতেছেন। ইহার মেজাজের গরিমায় বড় কেহ ইহার কাছে ঘেঁযে না। প্রৌঢ়ার আচার-নিষ্ঠা এবং সমালোচনা-প্রিয়তার জন্য পল্লীবধূদের কাছে তিনি একটি মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা।

তাঁহার বউ কুসুম তখন ঘোমটা টানিয়া মন দিয়া নিজের শাড়ী কাচিতেছে। পাড়াগাঁয়ে ধোপার পয়সা যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলাই নিয়ম। ময়লা কাপড় পরিলে কাহারও চোখে বড় সেটা লাগে না, ফরশা কাপড় পরিলেই সমালোচনা বেশী হয়। কুসুমের একটু সাজ-সজ্জার দিকে ঝোঁক বেশী, কাজেই প্রায় রোজই তাহাকে সাবান-জলে সিদ্ধ করিয়া শাড়ী, জামা, মেয়ের জামা সব কাচিতে হয়।

মল্লিক-গৃহিণী সিঁড়ির উপরের বাঁধানো চাতালে বসিয়া চুল খুলিয়া তেল মাখিতে বসিলেন। পাশে বসিয়া একটি মহিলা দাঁত মাজিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "চুল উঠে যাচ্ছে যে গো।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "বয়স ত হচ্ছে, চুলের আর দোষ কি? এখনও যে মাথা হাতের তেলোর মত শাদা হ'য়ে যায় নি সেই ঢের।"

মহিলাটি বলিলেন, "আহা, কিবা কথার ছিরি। তোমার আবার বয়স কি? আমাদের লতি বেঁচে থাকলে তোমার মতই হ'ত, কতই বা বয়স তা হ'লে? এখনও ত তবু বউ-জামাইয়ের মুখ দেখ নি।"

মল্লিক-গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "এইবার দেখব গো। তাই আগেভাগে ন্যাড়ামুড়ো হয়ে শাশুড়ীর চেহারা ধরছি।"

ঘাটের নীচের ধাপ হইতে কুসুম-বউ ঘোমটা উঁচু করিয়া হাতছানি দিয়া মল্লিক-গৃহিণীকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

মল্লিক-গৃহিণী নীচে নামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কুসমি, ডাকিস্ কেন? খবরটা কি?"

বউ ফিশফিশ করিয়া বলিল, "ব'স না বলছি। এখান থেকে চেঁচালে ঠাকুরুণ শুনতে পাবেন যে?"

মল্লিক-গৃহিণী তাহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি কথা শুনি?"

কুসুম নীচু গলায় বলিল, "ঠাকুরপো চিঠি দিয়েছে।"

মৃণালের মামীমা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? তোকে চিঠি দিয়েছে, না জ্যাঠাকে?"

কুসুম বলিল, "জ্যাঠাকে নয় গো, আমাকে, ও সব কথা কি গুরুজনের কাছে লেখা যায়?"

মল্লিক-গৃহিণী একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন কথাটা?"

বউ ফিশফিশ করিয়া বলিল, "তোমাদের মিনিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে গো। হবেই বা না কেন? দিব্যি সোমত্ত মেয়ে, দিব্যি গড়নপেটন, চোখে ত ধরবেই।"

মল্লিক-গৃহিণী চেষ্টা করিয়া আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই খবর? আমি বলি আর কিছু।"

বউ বলিল, "শুধু এই নয়, আরো কথা আছে গো। মিনিকে কোলকাতায় কোথায় কোথায় যেন দেখেছে, বড় নাকি সাহেবী চালচলন, হট্‌হট্‌ ক'রে রাস্তায় জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটে, টেরামে চাপে, এই সব আমাদের ছেলের পছন্দ নয়। আমাদের ঘরের রকম ত জান দিদি, সেই রকমই শিক্ষা না হ'লে পরে কষ্ট পাবে।"

মল্লিক-গৃহিণী তেল মাখা শেষ করিয়া বলিলেন, "সর্ দেখি, দুটো ডুব দিয়ে নি।"

তাঁহার মুখ বড় বেশী গম্ভীর দেখিয়া কুসুম-বউ আর কথা বাড়াইল না। মৃণাল যে নিঃসম্পর্কিত যুবকের সঙ্গে গল্প ক'রে সেটার আভাস দিতেও পঞ্চানন ত্রুটি ক'রে নাই, কিন্তু সেটা আর বলা হইয়া উঠিল না।

মল্লিক-গৃহিণী স্নান সারিয়া, ভিজা কাপড় কৌশলে পরিবর্ত্তন করিয়া, শাড়ী-গামছা কাচিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। কাহারও সঙ্গে গল্প করিতে আর ইচ্ছা করিল না। পঞ্চাননের চিঠির কথা শুনিয়া মনটা তাঁহার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটাও বোকা, যতই কলিকাতায় থাক, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ত, বিবাহও হইবে পাড়াগাঁয়ে, তাহার অত বিবিয়ানা করিতে যাওয়া কেন? তা আবার পঞ্চাননের সাম্‌নে। নিন্দা ত হইবেই? পাড়াগাঁয়ের লোক কি একটা কথা পাইলে কখনও ছাড়ে? তাও আবার মেয়েমানুষের নামে। পঞ্চাননেরও বাড়াবাড়ি। বিবাহ হইবে কি না তাহার কিছুরই ঠিক নাই। ইহারই মধ্যে পরের মেয়ের জন্য অত মাথাব্যথা কেন? তাহারই না-হয় মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, তাহার জ্যাঠার ত পণের টাকা পছন্দ হয় নাই? আর কুসমিও বজ্জাৎ কম নয়। কি বা কথার ছিরি। "সোমত্ত বয়স, দিব্যি গড়নপেটন", আ মর, ঝাঁটা মার মুখে!"

রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে গৃহিণী গিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। টিনি, চিনি তখনও চারিদিকে ভাত ছড়াইতেছে আর পরস্পরকে মিষ্ট সম্ভাষণে অভিষিক্ত করিতেছে। তাহাদের মা ঘরে ঢুকিয়াই নড়া ধরিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। রাধী বলিল, "খোকাকে ধর গো।"

গৃহিণী বলিলেন, "রোস, ধরছি, আগে এ আঁস্তাকুড় ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে নিই।"

এঁটো বাসন বাহির করিয়া, খাবার জায়গা গোবর-ন্যাতা দিয়া নিকাইয়া, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন; ঘুমন্ত খোকাকে রাধীর কোল হইতে তুলিয়া লইয়া ঘরে শোয়াইয়া দিলেন, কাপড়-গামছা উঠানে মেলিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে মল্লিক-মহাশয়ও বাহিরের কাজ সারিয়া, স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণী খাবার জায়গা করিতে করিতে বলিলেন, "মিনির বিয়ের কথাটা ঠিক ক'রে ফেল বাপু।"

কর্ত্তা বলিলেন, "হঠাৎ সে কথা মনে হ'ল কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "মস্ত ডাগর মেয়ে হ'ল, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে, শুনতে ভাল লাগে না। আর বেশী লিখিপড়িতে কাজ নেই, এর পর ঘর-সংসার করুক।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "বিয়ের কথা ত এক রকম হয়ে রয়েছে, টাকাটার যোগাড় হ'লেই হয়। বড় যে খাঁই ওদের, হাজার টাকার কমে রাজী হবে ব'লে মনে হয় না।"

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া আনিয়া পিঁড়ির সামনে নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীর জন্য থালা, বাটি, গেলাস কিছুর কম্‌তি নাই, নিজের ভাত বাড়িয়াছেন একখানা কাণা-উঁচু বড় কাঁসিতে, ডাল তরকারি তাহারই উপর ঢালিয়া দিয়াছেন। মাছের ঝোলের কড়াসুদ্ধ টানিয়া আনিয়া কাঁসির ধারে রাখিয়াছেন, দরকারমত ঢালিয়া লইবেন। মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে খেতে বসা এ জন্মে ঘুচবে না? ঘরে দুই সিন্ধুক ভর্ত্তি যে পিতল-কাঁসার বাসন সে কার জন্যে জিইয়ে রাখছ?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "ভাত জুড়ুচ্ছে খাও এখন, আমার থালা ঘটির ভাবনা ভাবতে হবে না। ও আমার দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে, ঐ রকম ক'রে খেতেই ভাল লাগে। সে কথা থাক্‌ গে। আজ কুসমির কাছে

ঘাটে কতকগুলো কথা শুনে এলাম, শুনে অবধি হাড় জ'লে যাচ্ছে। মিনির আমাদের মনটা খুব ভাল, কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশী নেই।"

মল্লিক-মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুমি আবার মিনির কি কথা তোমাকে বললে, সে জানেই বা কি?"

গৃহিণী তখন চক্রবর্ত্তীদের বধূর কাছে কি কি সব শুনিয়া আসিয়াছেন, সব খুলিয়া বলিলেন। মল্লিক-মহাশয় খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে খাইয়া চলিলেন, তাহার পর বলিলেন, "দোষটা আসলে বীরেনের, মিনুর নয়। মিনুকে নিয়ে আসবে যাবে তাতে আমি মত দিয়েছিলাম, কিন্তু সে অত ক'রে পঞ্চাননের চোখে না পড়ে সেটা বীরেনের দেখা উচিত ছিল। ওখানে যে বিয়ের কথা হচ্ছে তা ত ও জানতই।"

"পরের মেয়ের ভাল-মন্দের ভাবনা কে অত ক'রে ভাবছে বল?" বলিয়া গৃহিণী খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। "নিজেদের কাজ উদ্ধার হ'লেই হ'ল। সে যা হোক্ গে বাপু, আর গড়িমসি ক'রো না। ঐখানে বিয়ে দেওয়াই যদি ঠিক কর, তা হ'লে পাকাপাকি কথাবার্ত্তা কয়ে নাও, হাজার টাকাটা ব'লে কয়ে সাত-শ আট-শতে রফা কর। মিনির গহনা আছে ছ-সাত-শ টাকার, গহনা আর গড়াতে হবে না। ওর বাপ পাঁচ-শ দিয়েছে, তুমি কিছু দাও, বড় ঠাকুরঝির স্বামী এখন ভাল আছে, তার বড় ছেলেও চাকরিতে ঢুকেছে, ওদের ধ'রেবেঁধে আমি শ'দুই টাকা আদায় ক'রে নেব। এর মধ্যে যেমন ক'রে হোক বিয়েটা তুমি দিয়ে দাও। না-হয় ধুমধাম নাই হবে। আত্মীয়কুটুম ক'জনকে ডেকেই কাজ সেরে নেওয়া যাবে। মৃগাঙ্ক বউ-ছেলেপিলে নিয়ে আসবে, ঠাকুরঝি আবার তাকেই চায় এখন। আর নিতান্ত হাজার টাকা পণ না হ'লে যদি না হয় ত অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ। মোট কথা, এই বৈশাখ মাসে বিয়ে দিতেই হবে। মিনির পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তাকে নিয়ে আসব, আর ওমুখো হতে দিচ্ছি না।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "দেখি, আজ বিকেলে আর একবার বুড়োর কাছে গিয়ে। ছেলে যখন মেয়েকে অতটা পছন্দ করেছে, তখন দু-এক শ কমলেও কমতে পারে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই কর। কথাটা কয়ে এস, আমিও বড় ঠাকুরঝিকে একখানা চিঠি লিখি বুঝিয়ে-পড়িয়ে। মা-মরা মেয়ে, পাঁচ জনে না সাহায্য করলে চলবে কেন? আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহ'লে কি আর কাউকে বলতাম? পেটে ধরি নি, কিন্তু ও ত আমারই মেয়ে? টিনি, চিনির চেয়ে কি ওকে কম ভালবাসি?"

মল্লিক-মহাশয় উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "ক'দিন আগে মৃগাঙ্কের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তার শরীর নাকি খুবই ভেঙে পড়েছে। ভালয় ভালয় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে ভাল। সংসারে কখন কার কি ভাল-মন্দ ঘটে বলা ত যায় না?"

কর্ত্তা উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। দুপুরে ঘণ্টা-খানিক বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার কাজে বাহির হইয়া যান। গৃহিণী রান্নাঘরের পাট সারিয়া কোনও দিন গড়াইয়া লন, কোনও দিন সেলাই করেন, কোনও দিন বা চিঠিপত্র লেখেন। আজ বড় ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখিতে হইবে, তাই রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া তিনি ঘরে গিয়া কাগজ কলমের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ছেলেমেয়ের উৎপাতে কিছু কি খুঁজিয়া পাইবার জো আছে? শেষে আবার স্বামীর ঘরেই তাঁহাকে গিয়া হাজির হইতে হইল।

ক্রমশঃ
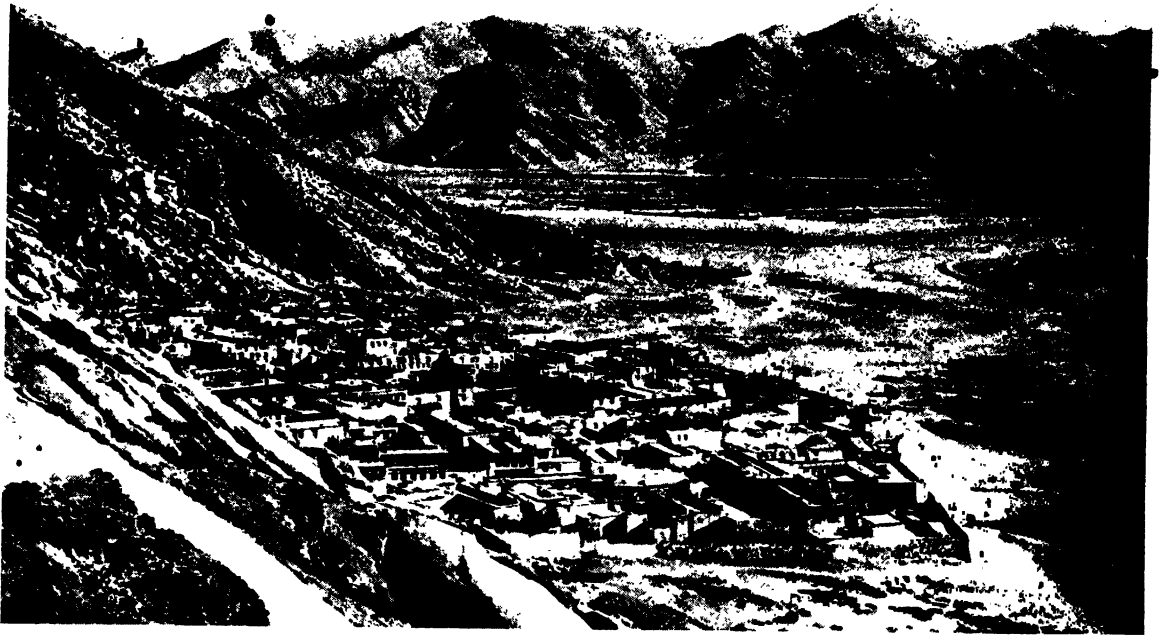
লাসার চতুর্দ্দিকে মঠের অন্ত নাই। এক সেরাতেই ৫,৫০০ শ্রমণের বাস
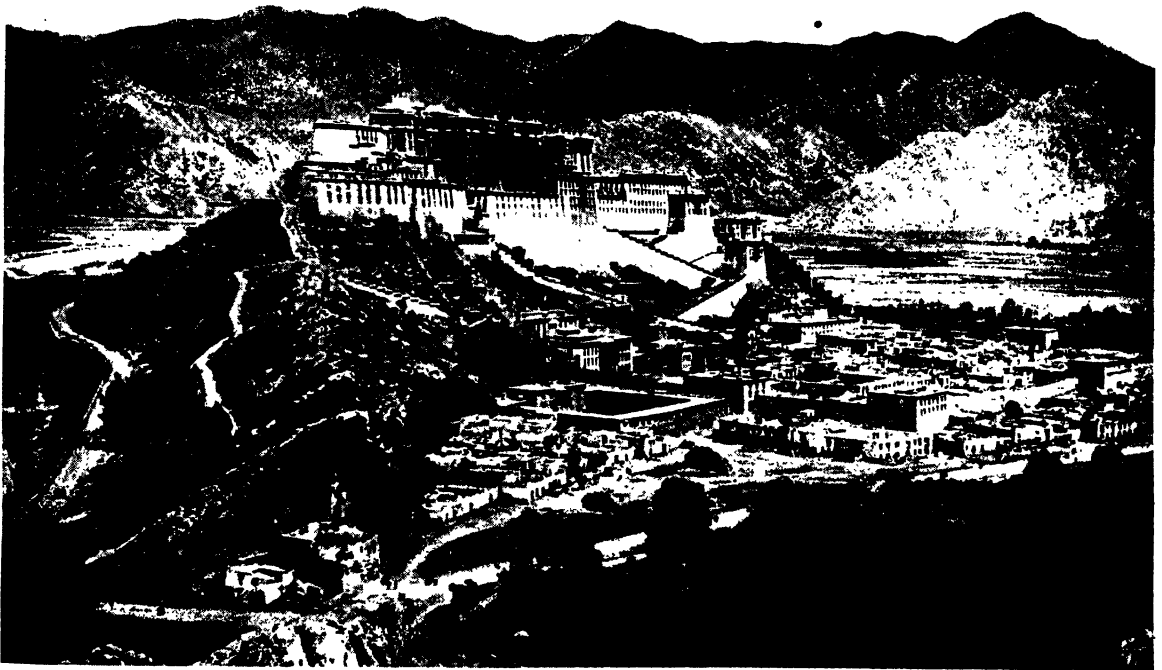
পোতালায় দালাই লামার সরকারী বাসস্থান
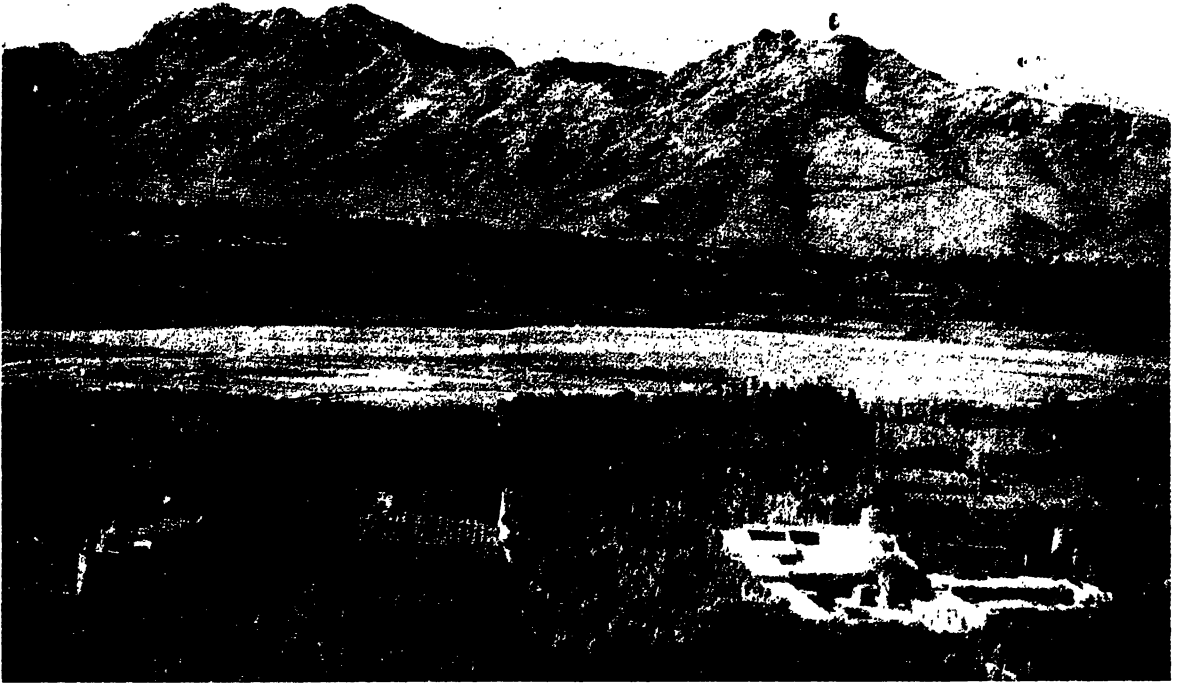
তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ইরাণের একটি বিখ্যাত পক্ষিবাটিকা

সোভিয়েট রাশিয়ার যুক্ত-রাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক নূতন স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন দল গঠন করিয়া ও নানারূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে, আবিষ্কৃত সোনার খনিতে কাজ চলিতেছে ও নূতন খনির সন্ধান করা হইতেছে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

গত বৎসর এই দিনে "ঋষিকাহিনী ও ঋষিপন্থা"-শীর্ষক বক্তৃতায় আপনাদের বলেছিলাম ঔপনিষদ্ ঋষিদের শ্রেণীভেদ, মতভেদ ও পন্থাভেদ সম্বন্ধে। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি, ঋষিদের এই তিন শ্রেণী। দেবর্ষিরা বৈদিক দেবতা, সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক পুরুষ নন। ঐতিহাসিক পুরুষ হ'লেও তাঁরা ঔপনিষদ্ যুগের লোক নন। কিন্তু সর্ব্বত্র-প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুসারে ঔপনিষদ্ রাজর্ষিগণের কেউ কেউ তাঁদের দার্শনিক মত কোন কোন দেবতার উপর আরোপ করেছেন। তাঁরাই উপনিষদের দেবর্ষি। ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রাহ্মণ-জাতীয় এবং রাজর্ষিগণ ক্ষত্রিয়-জাতীয় ঋষি। এই হ'ল ঋষিদের শ্রেণীভেদ। তাঁদের মতভেদ এই যে তিন শ্রেণীর ঋষিই অদ্বৈতবাদী বটেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিদের অদ্বৈতবাদ নির্বিশেষ, আর দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের অদ্বৈতবাদ সবিশেষ বা বিশিষ্ট। অর্থাৎ সব শ্রেণীর ঋষিই বলেন ব্রহ্ম মূলে জীব ও জগতের সহিত এক, ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগতের কোন স্বতন্ত্রতা নেই। কিন্তু দেবর্ষিরা ও রাজর্ষিরা বলেন যে এই মৌলিক একত্বের সঙ্গে এর অবিরোধী একটা ভেদ বা বিশেষত্ব আছে। এই মতটা ইংরেজীতে প্রকাশ করলে বোধ হয় ইংরেজী-জানা লোকেরা আরও স্পষ্টরূপে বুঝবেন। মতটা এই যে সসীম জীব ও জগৎ অসীম ব্রহ্ম থেকে distinct বা distinguishable, কিন্তু divisible বা separable নয়। যা হোক, ঋষিদের এই মতভেদ থেকে তাঁদের পন্থাভেদ হয়েছে। ব্রহ্মর্ষিদের মতে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধ সাধকের যত দিন থাকবে তত দিন তাঁর যজ্ঞ, পূজা বা উপাসনা চলবে। তত দিন তিনি পিতৃযাণ পথে পিতৃলোক বা স্বর্গলোকে গিয়ে তাঁর সঞ্চিত পুণ্যফল ভোগ করবেন আর পুণ্যফল-ক্ষয়ে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মপরম্পরা গ্রহণ করবেন, তাঁর মুক্তি হবে না। যখন জীব-ব্রহ্মে, সাধক ও সাধ্যে, একত্ব-বোধ হবে তখন তাঁর সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ মরণ-মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি হবে। দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের মতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীকে পিতৃযাণ পথে যেতে হবে না। তাঁর জ্ঞান ও পুণ্যের পরিপক্বতার জন্যে তিনি দেবযান পথে গিয়ে, নানা সোপান অতিক্রম ক'রে, ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মসন্নিধানে, উপনীত হবেন, এবং ব্রহ্মের আদেশে সেই লোকে, মুক্তাত্মাদের সঙ্গে, চিরবাস করবেন। তাঁর পুনর্জ্জন্ম হবে না, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তিও হবে না। এই মুক্তির নাম ক্রমমুক্তি। এই পন্থাদ্বয় আমি গতবারের বক্তৃতায় সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আমার বক্তৃতা 'প্রবাসী' পত্রের গত বৈশাখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; আপনাদের কারো ইচ্ছা হ'লে তা পড়তে পারেন। আজ আমি শেষোক্ত পন্থা সম্বন্ধে কিছু বিশেষভাবে বলতে চাই। দুটি কারণে আমার এ বিষয়ে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। একটি কারণ আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের দেহত্যাগ ও তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় কারণ ভারতীয় বিজ্ঞান-সঙ্ঘের রৌপ্য জয়ন্তী ও তদুপলক্ষে এদেশে কতিপয় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-প্রবরের শুভাগমন। গত ৫ই ডিসেম্বর আমি আচার্য্য জগদীশের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব আবিষ্কারগুলির সম্বন্ধে এই বেদী থেকে কিছু বলেছিলাম। আমার উপদেশের শেষভাগে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রণালীভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেছিলাম। আজ সে বিষয়ে আরও কিছু বলা আবশ্যক বোধ করছি। জগদীশ তাঁর গবেষণায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীই অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টার মূলে ছিল দার্শনিক সিদ্ধান্ত,—বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ। তা না থাকলে তিনি তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি করতে পারতেন না। সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে—"প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" (মুণ্ডক ৩।১।৪), অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন তিনি এই প্রাণ। এই উক্তি কেবল

বিশ্বাস নয়, দার্শনিক প্রণালীতে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রণালী আপাততঃ ভিন্ন ব'লে বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানলাভের প্রণালী একই। বিজ্ঞানের প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ (observation), আর দর্শনের প্রণালী জ্ঞানের পরীক্ষা (criticism of experience)। বিজ্ঞানের নিম্নতম স্তরে, যাকে ভূতবিজ্ঞান (physical science) বলা হয় তাতে, পর্য্যবেক্ষণ-ক্রিয়াকে স্থূলভাবে গ্রহণ করা হয়, পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পর্য্যবেক্ষণকারীকে কার্য্যতঃ ছেড়ে দেওয়া হয়, পর্য্যবেক্ষণের বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে সেটা বোঝা হয় না, মনে রাখাও হয় না, তাতেই বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রণালীতে একান্ত ভেদ করা হয়। মনোবিজ্ঞান পর্য্যন্ত না গেলে এই ভুলটা, এই একদেশদর্শিতা, ধরা পড়ে না। দর্শনাভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ এই ভুল বুঝতে পারছেন। আশা করা যায় যে অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হবে, তাঁদের প্রণালীর মৌলিক একতা স্বীকার করা হবে। ইতিমধ্যেই মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাকে mental or philosophical sciences (মানসিক বা দার্শনিক বিজ্ঞান) বলা হচ্ছে। তাতেই বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলবার ইচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। Metaphysics (দর্শন) হচ্ছে science of sciences (বিজ্ঞানসমূহের বিজ্ঞান)। গ্রীক দার্শনিক-প্রবর এরিস্‌টটল্‌ বারো-শ বছর আগেই Metaphysicsকে Theology (ব্রহ্মবিদ্যা) ব'লে গেছেন। ঔপনিষদ্‌ ঋষিরা তিন হাজার বছর আগেই পরা ও অপরা বিদ্যার ভেদাভেদ বুঝেছিলেন। মুণ্ডক উপনিষৎ-কার তাঁর প্রথম শ্লোকেই ব্রহ্মবিদ্যাকে বলেছেন "সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা"। যাহোক, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবলম্বন ক'রে দর্শনের প্রণালীটা বুঝাতে চেষ্টা করছি। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঈশ্বর, জগৎ, জীব, সকল বিষয়ে সন্দিহান হয়ে দেখলেন যে সন্দেহ ব্যাপারটা নিঃসন্দিগ্ধ, সন্দেহের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু সন্দেহ একটা চিন্তা, চিন্তাটা আমার, আমি চিন্তা করছি, *cogito*, এটা নিঃসন্দিগ্ধ, আর "আমি চিন্তা করছি"'র অর্থই "আমি আছি"। *Cogito ergo sum*, আমি চিন্তা করছি, সুতরাং আমি আছি; এটা অনুমান নয়, একটা মূল সত্যের প্রকাশ বা ব্যাখ্যা। এই মূল সত্যই হ'ল আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনের ভিত্তি। জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট এই ভিত্তিকে আরও স্পষ্ট করলেন। তিনি আর তাঁর দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা দেখালেন যে জ্ঞান অখণ্ড বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিদ্বারা যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু জানি, তা নয়। লোকে যে মনে করে যে আমরা ইন্দ্রিয় (sense) দ্বারা দেশকাল-গত জগৎকে জানি, বুদ্ধি (understanding)-দ্বারা নিজ নিজ আত্মাকে জানি, আর প্রজ্ঞা (reason বা intuition) দ্বারা অনন্তস্বরূপকে জানি, এই মত ভুল। এক অখণ্ড জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে ইন্দ্রিয়বোধ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অবিভাজ্য উপাদানরূপে রয়েছে, জ্ঞান-পরীক্ষারূপ প্রণালী অবলম্বন করলে জ্ঞানের সাক্ষ্য, জ্ঞানের গোটা (concrete) বিষয়, স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার অখণ্ডিত বিষয় এই,—"আমি বিশেষ দেশে, কালে, বিশেষ কোন বর্ণ দেখি, শব্দ শুনি" ইত্যাদি। এই জ্ঞানকণিকাতে দেশ-কালাশ্রিত সমগ্র বিশ্ব, সসীম জীব ও অসীম ব্রহ্মের জ্ঞান নিহিত রয়েছে, জ্ঞানক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে। বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, এসকলকে আপাততঃ আত্মা থেকে স্বতন্ত্র জড়বস্তুর গুণ ব'লে বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'আমি দেখি' এই তত্ত্ব থেকে বর্ণকে তফাৎ করা যায় না, 'আমি দেখি'র সঙ্গে বর্ণ অচ্ছেদ্য; বর্ণ আত্মার একটি বিজ্ঞান বা অনুভব (sensation)। শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ এসবই এরূপ বিজ্ঞান। এসব বিজ্ঞান কোন অচেতন পদার্থের গুণ, কোন অচেতন শক্তির কার্য্য (effect), একথার কোনও অর্থ নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ একটা বস্তু বা শক্তির কল্পনা করেন, আর তাকেই জড় বলেন। জড় বলতে তাঁরা আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচর এসকল বিচিত্র বস্তুকে বুঝেন না। তাঁরা জেনেছেন যে এই সাক্ষাৎ বিচিত্র জগৎ আত্মসাপেক্ষ। এ-বিষয়ে লৌকিক জড় আর বৈজ্ঞানিক জড় সম্পূর্ণ ভিন্ন। যা হোক্‌, এরূপ একটা বস্তু মেনে নেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বিজ্ঞান বা অনুভব যার ভিতরে নেই তা

কেমন ক'রে বিজ্ঞান বা অনুভব উৎপাদন করবে? বিজ্ঞান বা অনুভব উৎপাদন করতে পারে কেবল সেই যে জ্ঞানবান্, ইচ্ছাশালী। ব্রহ্মবাদদর্শন (Idealistic Philosophy) বিজ্ঞানের এরূপ কারণই স্বীকার করে। ফলতঃ জ্ঞান কেবল জ্ঞানকেই জানে; আর কিছু জানা, আর কিছু ভাবা, তার পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় আমরা কেবল জ্ঞানরূপী আত্মাকেই জানি, অন্য কিছু জানা অসম্ভব, অর্থহীন। আমরা নিজ জ্ঞানকে বিশেষ দেশকালে সীমাবদ্ধ ব'লে জান্‌তে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এ'কে এমন এক জ্ঞানের অচ্ছেদ্য অংশরূপে উপলব্ধি করি যে জ্ঞান অনন্ত, সর্ব্বাধার, যার বাইরে কিছুই নেই। আত্মাকে জানা একটি ক্ষুদ্র বস্তু জানা নয়। আত্মজ্ঞানের ভিতরে সসীম-অসীমের ভেদাভেদ ভাব অচ্ছেদ্যরূপে বর্ত্তমান রয়েছে। আমার ক্ষুদ্র সসীম জ্ঞানকে যে অনন্ত জ্ঞানের অংশ ব'লে জানছি তাঁকে আমারই পরম আত্মা (Higher Self) ব'লে জানছি। সমগ্র বিশ্বকে একটি সমষ্টি বিশ্বাত্মা ব'লে জানছি ও ভাবছি, এবং নিজেকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মূলে এক, অথচ প্রকাশ-তারতম্যে ভিন্ন ব'লে জানছি ও ভাবছি। অন্য কোনও প্রকারে জানা ও ভাবা অসম্ভব ও অর্থহীন। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায়, প্রত্যেক ভাবনায়, অনন্ত পুরুষ নিজেকে শান্ত পুরুষের কাছে তারই পরমাত্মারূপে প্রকাশ করেন, আত্মপরিচয় দেন। জীবের পক্ষে ব্রহ্মের এই সাক্ষাৎ পরিচয়-প্রাপ্তিই প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি, ধর্ম্মসাধনের সুদৃঢ় ভিত্তি। এই পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস অস্থির থাকে, ধর্ম্মসাধন নিষ্ঠাশূন্য, নিরুদ্যম থাকে। ব্রহ্মের পক্ষে জীবের নিকট এই আত্মপরিচয়-দানের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় সকল কার্য্যের কারণ যা, যে-কারণে আমরা প্রত্যেকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সৃষ্টিকার্য্যের কারণ তাই। সব কার্য্যের কারণ আনন্দ, ভাল লাগা, ভালবাসা, আত্মপ্রীতি বা পরপ্রীতি। সর্ব্বাধার অনন্তস্বরূপের ভিতরে অসংখ্য সসীম জীব নিত্য বর্ত্তমান। তিনি ব্রহ্ম, অর্থাৎ সর্ব্বাধার বৃহৎ বস্তু। তিনি একাকী নন, তিনি স্বগতভেদ-যুক্ত, তিনি সসীম-বিশিষ্ট অসীম। তা না হ'লে বিশ্বের এই অসংখ্য বিচিত্রতা হ'ত না। তাঁর আশ্রিত অসংখ্য সন্তানকে সৃষ্টি করা, অর্থাৎ কালে ব্যক্ত ক'রে তাদের সুখ ও শ্রেয়ঃ সাধন করা, তাঁর কর্ম্মপ্রবৃত্তির একমাত্র কারণ। এই কার্য্যেই তাঁর আনন্দ, এই কার্য্যই তাঁর ভাল লাগে, এতেই তাঁর ভালবাসা, তিনি প্রেমময়। এ-বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি তাঁর আনন্দবল্লীতে খুব স্পষ্ট কথা বলেছেন। তিনি বলছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"—অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দ হইতেই এই সকল প্রাণী জন্মে, জন্মিয়া আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে, আনন্দেই প্রতিগমন করে, প্রবেশ করে। এই জন্ম, জীবন ও প্রতিগমন প্রত্যহ, প্রতিনিয়ত ঘটছে। প্রত্যেক দিনের জাগরণে, প্রত্যেক জ্ঞানকণার প্রকাশে, প্রত্যেক বিস্মৃতি ও স্মরণক্রিয়ায়, প্রত্যেক রাত্রির নিদ্রায়, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কার্য্য হচ্ছে। সসীম-অসীমের ভেদাভেদ সম্বন্ধ ব্যতীত, মাতা-সন্তানের স্নেহসম্বন্ধ ব্যতীত, এই নিত্যলীলা সম্ভব নয়। জীব-ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠতা মানব-সম্বন্ধের চেয়ে অনন্ত গুণে অধিকতর। এই ঘনিষ্ঠতা যে প্রেম-মূলক, তা আমরা সাক্ষাৎ ভাবে দেখি নিজ প্রেমে। আমাদের নিজ জ্ঞান যেমন ব্রহ্মের জ্ঞানের অনুপ্রকাশ, আমাদের নিজ প্রেম তেমনি ব্রহ্মপ্রেমের অনুপ্রকাশ। আমরা বেশী লোককে ভালবাসতে পারি না বটে, কিন্তু যাদের ভালবাসি তাদের প্রাণভরেই ভালবাসি। তাদের হিতের জন্যে সর্ব্বস্ব, প্রাণ পর্য্যন্ত, বিসর্জ্জন করতে পারি। উচ্চ মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয় সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে। মানব-সীমার মধ্যেই যে প্রেম এমন সম্যক্, পূর্ণ, সুন্দর, মধুর, মানব-সীমার অতীত স্থানে তা যে অনির্ব্বচনীয় তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু যা আগেই বলেছি, প্রেমেই প্রেমের প্রকাশ। যারা প্রেম সাধন করে না, যারা বুদ্ধি-প্রধান (intellectualists), কেবল বোঝা আর বুঝানতেই ব্যস্ত, তাদের কাছে ব্রহ্মপ্রেম সন্দেহাচ্ছন্ন। আর ব্রহ্মপ্রেম তাদের কাছে সন্দেহাচ্ছন্ন ব'লেই ধর্ম্মবিশ্বাসের একার্দ্ধ-আত্মার অমরত্ব—তাদের কাছে একেবারে অনিশ্চিত, অনেকের কাছে একেবারে অসম্ভব কথা। কোন কোন ঈশ্বর-বিশ্বাসীকেও বলতে শোনা যায়—'ঈশ্বর মানি, কিন্তু পরকালে সন্দেহ করি।' আমার ধারণা এই যে এই

শ্রেণীর লোক প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরও মানে না। ঈশ্বর ও পরকাল দুটা মত নয়, এক মতেরই দুটা দিক্। তরল যুক্তিতর্ক, অনিশ্চিত অনুমান, এ-সকলের দ্বারা যে ঈশ্বর মানা হয়, সেই ঈশ্বর মানার সঙ্গে পরলোক মানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকতে পারে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে যে-ঈশ্বর মানা হয়, যে-ঈশ্বর আত্মার আত্মা, পরম আত্মা, যে-ঈশ্বরের অচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা, যে-ঈশ্বর মানবের পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ্, প্রভু, স্বামী, সে ঈশ্বর মানলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই মানবাত্মার অমরত্ব মানতে হয়। প্রকৃতিস্থ মায়ের পক্ষে সন্তান বধ করা যত দূর অসম্ভব, পূর্ণ প্রেমময় ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর প্রেমপাত্র মানবাত্মাকে বধ করা তার চেয়ে অনন্ত গুণে অসম্ভব। এই অসম্ভবত্বের ধারণা তত ক্ষণ উজ্জ্বল হয় না যত ক্ষণ না বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান আত্মজ্ঞানমূলক দর্শনে পরিণত হয়। এই উজ্জ্বল ধারণা স্থায়ী হয় না তত ক্ষণ, যত ক্ষণ না জ্ঞানসাধন ঐকান্তিক যোগ, ভক্তি ও প্রেমসাধনে পরিণত হয়।

যাহোক্, এখন ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের কথা আবার বিশেষ ভাবে বলি। যে ব্রহ্মবাদ পাশ্চাত্য প্রণালীতে এইমাত্র ব্যাখ্যা করলাম, ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ মূলে তার সঙ্গে এক। কিন্তু ঔপনিষদ্ ব্রহ্মর্ষিদের ব্যাখ্যাত মূল ব্রহ্মবাদ যেমন দৃঢ়রূপে ধরা দরকার, ব্রহ্মর্ষিরা এই ব্যাখ্যায় যে ভুল করেছেন, যে ভুল দেবর্ষিরা ও রাজর্ষিরা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাও তেমনি স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। এ-বিষয়ে এ-দেশের দর্শনালোচনায় অনেক দিন থেকেই খুব ভুল ও ত্রুটি চলে আসছে আর তাতে দেশে সত্য ও স্থায়ী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার খুব ব্যাঘাত হয়েছে। রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শাঙ্কর মায়াবাদের ভুল দেখিয়েছেন, কিন্তু মায়াবাদের বীজ যে উপনিষদেই আছে, আর সেই বীজের দোষ যে স্বাধীনচেতা রাজর্ষিরা দেখিয়েছেন, তা বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বুঝতে পারেন নি। আধুনিক বৈদান্তিকেরাও ঋষিদের এই মতভেদের কথা বলছেন না, বরঞ্চ মায়াবাদই বেদান্তের একমাত্র মত, কেউ কেউ এই ভাবই প্রকাশ করছেন। কিন্তু মায়াবাদ ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী, প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সাধনেরই বিরোধী, প্রকারান্তরে সামাজিক ও জাতীয় উন্নতিচেষ্টারই বিরোধী, সুতরাং সাধননিষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে এই মতের ভ্রম বোঝা ও বুঝাবার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য, পিপ্পলাদ, অঙ্গিরা, মাণ্ডুক্য, এই ব্রহ্মর্ষিদের মূল ভ্রম হচ্ছে ন্যায়ের অন্বয়প্রণালী (method of comprehension) দৃঢ় রূপে না ধরা। আরুণি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূল সদ্‌বস্তুকে দিয়ে বলিয়েছেন—"বহু স্যাম্", আমি বহু হই। একের ভিতর বহু, বহুর ভিতর এক, এক ও বহুর ভেদাভেদ, অন্বয়-ব্যতিরেক, না থাকলে এক কেমন ক'রে বহু হবেন, বহুর চিন্তাই বা তাঁর কেমন ক'রে হবে। আরুণির অদ্বৈতবাদ নির্বিশেষ; তিনি কেবল এককেই প্রকৃত মনে করেন, বহুকে অসৎ, কাল্পনিক মনে করেন, সুতরাং তাঁর দর্শনে জীব ও জগতের স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, সাধ্য-সাধক-ভেদের অভাবে সাধনের কোন ভিত্তি নেই। যাজ্ঞবল্ক্যের সম্বন্ধেও এই কথা ঠিক। তিনি স্থানে স্থানে জীব ও জগতের বিচিত্রতা উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে সব একাকার হয়ে যায়, বহুত্ব থাকে না, এই ভেবে তিনি একত্বকেই প্রকৃত বলেছেন, বহুত্ব তাঁর কাছে 'ইব', যেন, অর্থাৎ কাল্পনিক হয়ে গেছে। পিপ্পলাদ সুষুপ্তিতে সমুদয় বস্তু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে একথা স্বীকার ক'রেও মুক্তির অবস্থায় বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। অঙ্গিরা ও মাণ্ডুক্যও এই মতাবলম্বী। এই ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই অমৃতত্বের প্রয়াসী এবং অমৃতত্বকে পরম শান্তি ও আনন্দের অবস্থা মনে করেন। কিন্তু যে অবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ভেদ নেই, একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ নেই, কোনও বাসনা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিও নেই, সেই অবস্থা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ কেমন ক'রে হবে, সেই অবস্থা কিসের জন্যে স্পৃহণীয়, তা বোঝা যায় না। সুষুপ্তি সম্বন্ধে প্রজাপতিকে ইন্দ্র যা বলেছিলেন, আর প্রজাপতি যা স্বীকার ক'রে প্রকৃত মুক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন (ছান্দোগ্য ৮।১১।১) তাই আমার কাছে ঠিক বোধ হয়। সেই অবস্থা মৃত্যু না হোক্ কার্য্যতঃ মৃত্যুরই মত, তাতে স্পৃহণীয় কিছুই নেই। ব্রহ্মের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছি, এক হয়েছি, এই বোধ যদি না রইল, তবে এ'কে মুক্তি বলার, অমৃতত্ব বলার, সার্থকতা কি?

ব্রহ্ম ত নিত্যমুক্ত, অমর, আছেনই। জীব বন্ধন থেকে, মৃত্যু থেকে, মুক্ত হয়ে, অমর হবে, এই হচ্ছে ব্রহ্মসাধনের লক্ষ্য। জীবের মুক্তি, অমরত্বপ্রাপ্তি, এখানে কোথায়? এখানে জীবের জীবত্ব গেল। জীবের জীবত্ব যাওয়াতে কার্য্যতঃ তার বিনাশই হ'ল। যাঁরা এরূপ অমরত্ব লাভের আশায় সন্তুষ্ট তাঁদের আত্মপ্রতারিত ছাড়া আর কি বলব? যা হোক্, এখন প্রকৃত অমরত্বের আলোচনা করি।

ব্রহ্মর্ষিগণ জীবের সুষুপ্তিতে লয়ের আভাস পান। তেমনি জাগরণে সৃষ্টির আভাস এবং জাগ্রৎ জীবনে স্থিতির আভাস পান। তথাস্তু। কিন্তু যে লয় থেকে সৃষ্টি হয়, সে সুষুপ্তি থেকে জাগরণ হয়, তা ত একীভাব, একত্বের অবস্থা, নয়। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে, নিজ নিজ ভাব ও অভাব নিয়ে, নিজ নিজ বিশেষত্ব নিয়ে, সসীমত্ব নিয়ে, জাগ্রত হই। কারও সঙ্গে কারও মিশ্রণ হয় না; অসীমের সঙ্গেও আমাদের ভেদ বা ভেদাভেদ অব্যাহত থাকে। এই বিশিষ্টতা ও ভেদাভেদ ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানে বর্ত্তমান না থাকলে জাগ্রতে, সৃষ্টিতে, তা ব্যক্ত হ'তে পারত না। সুতরাং এখান থেকেই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের ভ্রম দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্ম অনন্ত বটেন; তাঁর বাইরে, তাঁর অতিরিক্ত, কিছু নেই বটে, আর এই অর্থে তিনি অদ্বৈত বটেন; কিন্তু তাঁর অনন্ত, অদ্বৈত স্বরূপের ভিতরে সান্তের, দ্বৈতের, স্থান আছে। এই সান্ত, এই দ্বৈত, তাঁথেকে অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, অথচ তাঁথেকে ভিন্ন (distinct, distinguishable)। সান্ত-অনন্তের মধ্যে এই আপাত-বিরুদ্ধ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অবিরুদ্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ রয়েছে। পরস্পরের মধ্যে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ না থাকলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কিছুই হ'তে পারত না। বিশ্ব ত ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানে নিত্যই রয়েছে। এ'কে সৃষ্টি করার অর্থ এ'কে ছাড়া। 'সৃজ্' ধাতু ছাড়া বুঝায়। বিশ্বকে ব্যক্ত করা, নিজ থেকে ভিন্ন কোন সসীম জ্ঞানের কাছে এ'কে প্রকাশিত করাই এ'র সৃষ্টি। স্রষ্টার সঙ্গে ভেদাভেদযুক্ত সসীম জ্ঞানবস্তু না থাকলে সৃষ্টি হ'তে পারে না। তার বা তাদের জ্ঞানেই স্রষ্টা বিশ্ব ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ নিজ রূপ, স্বরূপ প্রকাশিত করেন, আর নিজের সঙ্গে তাদিগকে সজ্ঞান যোগের দিকে আকর্ষণ করেন। কার্য্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে, নিজ নিজ কর্ম্মপ্রবৃত্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে, আমরা এই অতি যুক্তিযুক্ত কারণ-তত্ত্বে উপনীত হই। এ-বিষয়ে আধুনিক দার্শনিক-প্রবর হেগেলের *Philosophy of Religion*এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করছি। তিনি বলছেন,—

"The Holy Spirit is eternal love. When we say God is love, we are expressing a very great and true thought..... For love implies a distinguishing between two, and these two are, as a matter of fact, not distinguished (that is, not separated) from one another. Love, this sense of being outside of myself, is the feeling and consciousness of this identity. My self-consciousness is not in myself, but in another; but this other, in whom alone I find satisfaction and am at peace with myself....This other, just because it is outside of me, has its self-consciousness in me" (Vol. iii, pp. 10, 11).

হেগেলের কথাগুলির মর্ম্ম এই,—

পবিত্রাত্মা নিত্য প্রেম। "ঈশ্বর প্রেমময়" এই তত্ত্ব অতি মহৎ ও সত্য। কিন্তু প্রেম বস্তুটা বোঝা চাই। প্রেমে অন্ততঃ দু-জন বুঝায়, এমন দু-জন যারা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, অবিভাজ্য। আমি যাকে ভালবাসি তাকে আমার বাইরে ভাবি অথচ তার সঙ্গে নিজেকে এক ব'লে বোধ করি। সে আমার বাইরে বলেই, আমা থেকে ভিন্ন বলেই, তার আত্মবোধ আমাতে।

যাঁরা প্রকৃত প্রেম আস্বাদন করেছেন, পরকে আপন ব'লে অনুভব করেছেন, কেবল তাঁরাই এসব কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। যারা একান্ত বহির্ম্মুখী, ভাবসাধন যাদের নেই, কেবল শুষ্ক বুদ্ধি নিয়েই যারা ব্যস্ত, তাদের পক্ষে এসব কথার মর্ম্মগ্রহণ অসম্ভব। যাহোক, আমরা এ-পর্য্যন্ত যেখানে এসেছি সেখানে অমরত্বের কোনও আভাস পাচ্ছি কি না দেখা যাক্। যারা কেবল একটা বাহ্যজগৎ,—দেশে বিস্তৃত, কালে প্রবাহিত, একটা জগৎ—মানে, আর যে এই জগৎকে জান্‌ছে তার সঙ্গে এ'র কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখে না, তারা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করে যে জগৎ অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্থায়ী, কিন্তু জগতের জ্ঞাতা দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাবে। কিন্তু আপনারা শুনেছেন যে ঔপনিষদ্ ঋষিরা সকলেই বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—নিশ্চয় এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই আত্মা ব্রহ্ম। 'অয়মাত্মা' অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের

সহিত এক ব'লে কালের অতীত। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ২।১৮)—জ্ঞানবান্ আত্মা জন্মেও না, মরেও না। যাঁরা আত্মার ভূমিতে দাঁড়িয়ে পরমাত্মাকে জানেন, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্ব অনুভব করেন, তাঁরা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জীবাত্মাকে অমর ব'লে বিশ্বাস করেন; তাঁদের কাছে ঈশ্বরের অমরত্ব ও জীবের অমরত্ব একই তত্ত্ব, দুই তত্ত্ব নয়। যাদের ঈশ্বরবিশ্বাস আনুমানিক মাত্র, সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তারাই বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু জীবাত্মার অমরত্বে সন্দেহ করি। যা হোক্, আমাদের ঔপনিষদ্ ব্রহ্মর্ষিরা যে ভাবে আত্মার অমরত্ব ব্যাখ্যা করেন, তার অসন্তোষকরত্ব এই মাত্র দেখালাম। তাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অভেদ দেখতে গিয়ে ভেদটা একবারেই দেখেন না। ভেদ না দেখতে পেয়ে ঈশ্বরের প্রেমও দেখেন না। কাজেই অমৃতত্ব বিষয়ে তাঁদের মত অসন্তোষকর। কিন্তু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ দুই-ই দেখেছেন, আর স্পষ্টরূপে জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম স্বীকার করেছেন। তাতে তাঁদের অমৃতত্বের মত সন্তোষকর হয়েছে। তাঁরা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসন্নিধানে, মুক্তাত্মাদের চিরবাস যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা আপনারা আমার গত বৎসরের বক্তৃতায় শুনেছেন। এই সমস্ত তত্ত্ব কেবল বিশ্বাস নয়, যে বিশ্বাস আজ আছে, কালই সংশয়বাদের স্পর্শে চলে যাবে। এই সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় অনন্তস্বরূপ তাঁর আশ্রিত জীবকে আত্মপরিচয় দেন। এই আত্মপরিচয়ে জীবের প্রতি তাঁর প্রেম প্রকাশ পায়। জীব যেমন তাঁর জ্ঞান ও শক্তির ভাগী, সে তেমনি তাঁর প্রেমপুণ্যের ভাগী। আমাদের হৃদয়ে ও বিবেকে তাঁর প্রেমপুণ্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ। আমরা উচ্চ মুহূর্তে, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ উপাসনার সময়ে, তাঁর পূর্ণ প্রেমপুণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধিই আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিমাপক ও পরিচালক। এই উপলব্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'লে আর অমৃতত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। সংশয় হ'লেই বুঝতে হবে উপলব্ধি সম্যক্ হয় নি, পূর্ণ হয় নি। এই উপলব্ধি যেমন নিঃসংশয় বিশ্বাসের ভিত্তি, তেমনি এ' শান্তি, আনন্দ ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রস্রবণ। অন্য কোন অবস্থায়, পূর্ণ অনন্ত পুরুষের সঙ্গে অভঙ্গ যোগের অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায়, সসীম বস্তুর উপর নির্ভরের অবস্থায়, প্রকৃত শান্তি, গভীর আনন্দ, ও অদম্য শক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং ধর্ম্মহীন জীবনাদর্শ মূলে ভ্রমাত্মক। সে আদর্শ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও অন্তর্জাতীয় জীবনের আদর্শ হ'তে পারে না। ধর্ম্মের আদর্শ যে কেবল বিশ্বাস-মূলক নয়, তা যে সূক্ষ্ম, গভীর ও দর্শন-মূলক আদর্শ, তা আমি সংক্ষেপে দেখাতে চেষ্টা করলাম।

এখন আবার বলি বিজ্ঞানের কথা। 'বিজ্ঞান' বল্‌তে এখন এদেশের লোক বুঝে যাকে পাশ্চাত্যেরা বলেন 'science'। এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ সম্যক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যে জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ী, সসীম-অসীম, জীব-ব্রহ্ম, একত্র প্রত্যক্ষীভূত হয়। পাশ্চাত্য scienceএ তা ত হয় না। পাশ্চাত্য science বিভাগের উপর, একান্ত ভেদের উপর, abstractionএর উপর, প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 'বিজ্ঞান' শব্দটা আধুনিক সময়ে প্রথম থেকেই ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভুলের পরাকাষ্ঠা হয়েছে এই ধারণায় যে তথাকথিত বিজ্ঞানের প্রণালীই খাঁটি নিশ্চিত প্রণালী, আর সব প্রণালী ভুল, তাতে কেবল অসত্য ও কল্পনায়ই নিয়ে যায়। যা হোক্, আত্মপ্রতারিত এবং নিজ প্রণালীর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিজ্ঞানের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা বোধ হয় আপনারা এখন বুঝতে পারছেন। বৈজ্ঞানিকেরাও তা ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন। বৈজ্ঞানিকেরা যত দর্শনালোচনা করবেন ততই তাঁরা জ্ঞানের একত্ব এবং জ্ঞানপ্রণালীরও মৌলিক একত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করবেন। প্রণালীর একত্ব না দেখলে বস্তুর মৌলিক একত্ব, বিশ্বের একত্ব, উপলব্ধি হবে না। সার্ জগদীশ তাঁর নির্ম্মিত অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা দেখিয়ে গেছেন যে ধাতুখণ্ড পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় সাড়া দেয়। কিন্তু এই সাড়া স্বীকার ক'রেও চলিত দ্বৈতবাদ,—আত্মা ও অনাত্মার দ্বৈতবোধ—অচল থাকতে পারে। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অচ্ছেদ্য একত্ব না দেখলে এই দ্বৈতবোধ দূর হয় না। আত্মজ্ঞানই যে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি,

আর আত্মা যে আত্মাছাড়া আর কিছু জানতে পারে না, ভাবতে পারে না, আত্মবাদী দর্শনের এই মূলসূত্র ধরতে না পারলে দার্শনিক মতভেদ দূর হবে না, ধর্ম্মের ভিত্তিও অচল অটল হবে না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনোবৈজ্ঞানিক ওয়ার্ড তাঁর "Naturalism and Agnosticism" নামক Gifford Lecturesএ হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদের ভ্রম অতিশয় দক্ষতার সহিত দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থকে অনেকে বলেন "Death-knell of Agnosticism" অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদের মৃত্যু-সূচক ঘণ্টাধ্বনি। অজ্ঞেয়তাবাদ মরেছে বটে, কিন্তু তার প্রেতাত্মা "Neutral Monism" নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে প্রেতাত্মা বলছে যে এমন একটা বস্তু আছে যা জড়ও নয়, আত্মাও নয়, অথচ জড়রূপে ও আত্মারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক বারট্র্যাণ্ড্ রাসেল্ এই মতের পক্ষপাতী। তিনি তাঁর *Outlines of Philosophy* নামক গ্রন্থে সরল ভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি আত্মবাদ (Idealism) খণ্ডনে অক্ষম, অথচ জড়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস না ক'রে থাকতে পারেন না। তাঁর সরলতা প্রশংসাজনক বটে, কিন্তু অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় জড়শক্তি আছে আর সে শক্তি আত্মরূপ ধারণ করে, এরূপ বিশ্বাস মানসিক জড়তা-ব্যঞ্জক নয় কি? যা হোক, এরূপ মানসিক জড়তা অতি সাধারণ, অতি ব্যাপক। আত্মবাদীরাও সময়ে সময়ে এরূপ জড়তার অধীন হয়ে চলিত দ্বৈতবাদে সায় দেন। এই জড়তার ঔষধ কেবল দার্শনিক জ্ঞান নয়। এই জড়তা দূর করতে গেলে দার্শনিক জ্ঞান গভীর যোগসাধনে পরিণত হওয়া চাই, এবং যোগসাধন ভক্তিসাধনে অভিষিক্ত হয়ে মধুর হওয়া চাই। এই সাধন অতি দুর্লভ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সত্য এদেশে তিন সহস্র বৎসর ধ'রে গৃহীত হয়ে আসছে, কিন্তু এদেশেরও কত অল্প লোক এই সত্যের সাধক! জীবনে এ' মূর্ত্তিমান হওয়া তো দূরের কথা। গ্রেট বৃটেনে এই সত্য কেবল অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্পষ্টাক্ষরে প্রচারিত হয়েছে। এ'র সাধনা এখনও আরম্ভই হয় নি বললে অত্যুক্তি হয় না। যা হোক্, আশা করা যায় যে কেয়ার্ড ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি দার্শনিকেরা এ-বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন ক'রে গেছেন, জীন্স, এডিংটন প্রভৃতি দর্শনজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা সেই পথে অগ্রসর হবেন। ইংলণ্ডের শেষ দার্শনিক-প্রবর এফ, এইচ ব্র্যাড্‌লি কত দূর সাধক ছিলেন বলতে পারি না। কিন্তু তাঁর *Appearance and Reality* নামক অদ্বৈতবাদী গ্রন্থের অনেক স্থল ব্রহ্মসাধনের সহায়। আমি এরূপ একটি স্থান উদ্ধৃত ক'রে আর তার বঙ্গানুবাদ দিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ কারি। আজকের বক্তৃতার একাধিক স্থলে বলা হয়েছে যে আমরা প্রত্যেক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ও আস্বাদনে, প্রত্যেক মনন ও বিচারে, ফলতঃ আত্মার প্রতি স্পন্দনে, ব্রহ্মকেই জানি, তিনি ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় আর কিছু নেই। এ-বিষয়ে ব্র্যাড্‌লি বলছেন,—

"The Reality to which all content in the end must belong is, we have seen, a direct all-embracing experience. This Reality is present in, and *is* my feeling; and hence, to that extent, what I feel is the all-embracing universe. But when I go on to deny that this universe is more, I turn truth into error. There is a more of feeling, the extension of that which is now mine, and this whole is both the assertion and negation of *my* 'this.' My 'mine' becomes a feature in the great 'mine' which includes all 'mine's. (P. 253.)

অর্থাৎ "আমরা দেখেছি যে সমুদায় জ্ঞানের বিষয় মূলে যে সত্তার অন্তর্ভূত, সেই সত্তা একটি প্রত্যক্ষ সর্ব্বাধার অভিজ্ঞতা। এই সত্তা আমার অনুভূতিতে বর্ত্তমান, ইহা আমার অনুভূতিই, সুতরাং আমি যা অনুভব করি তা আমার অনুভবের পরিমাণে সর্ব্বাধার বিশ্বই। কিন্তু আমি যদি বলি যে বিশ্ব এই অনুভূতির অতিরিক্ত কিছু নয়, তবে আমার কথা আর সত্য রইল না, ভুল হয়ে গেল। আরো অনুভূতি আছে। এই মুহূর্ত্তে, আমার অনুভূতি যতটুকু, সেই অনুভূতি এই অনুভূতিরই বিস্তার, আর এই সমষ্টি আমার এই অনুভূতির সঙ্গে এক অর্থে এক, আর এক অর্থে এক নয়। যাকে "আমার" বলি তা সেই বৃহত্তর "আমার" এর একটা প্রকাশ যার অন্তর্ভূত হচ্ছে সমস্ত "আমার" গুলি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে এই সত্য উপাসনাকালে উপলব্ধি করলে উপাসনা কত গভীর ও আনন্দপ্রদ হয় তা প্রকৃত উপাসক মাত্রেই জানেন। কিন্তু উপাসনায় কেবল ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। সত্তোপলব্ধিতে ভূমানন্দ, অর্থাৎ অখণ্ডের সহিত একত্ববোধের আনন্দ,

লাভ হয়। কিন্তু ভূমানন্দের উপরে প্রেমানন্দ, ব্রহ্মপ্রেমোপলব্ধির আনন্দ। এই বক্তৃতার মধ্যভাগে সে আনন্দের কথা কিঞ্চিৎ বলেছি, আর সে-কথার সমর্থনে হেগেলের প্রেমবিষয়ক উক্তি উদ্ধৃত করেছি। ব্র্যাড্‌লি নির্বিশেষবাদ- ——— হেগেল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। উভয়েই ব্রহ্মবাদী ব'লে আমার গুরুস্থানীয়। আমার গুরুকুল পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় দিকেই। প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় গুরুকুলকে এবং চৈত্য গুরু পরমাত্মাকে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম ক'রে অদ্যকার উৎসব শেষ করি।

[বিগত ৭ই মাঘ তত্ত্ববিদ্যা-সভার বার্ষিক উৎসবে পঠিত।

শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ইউরোপে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ক্রমশই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে এবং তাহা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। জাতিগত অহঙ্কার, লোভ, বিদ্বেষের জন্য দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব তাহার সহিত এই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব যুক্ত হইয়া সমস্যাটিকে অতিশয় জটিল করিয়া তুলিয়াছে এবং পৃথিবীর সভ্যতা ও শান্ত প্রগতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। রুশিয়া ধনিক-শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। জার্ম্মানী ও ইটালীতে এই দ্বন্দ্ব জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছে, এবং সেখানে কার্য্যতঃ ধনিক-শ্রেণীই প্রভুত্ব করিতেছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তির জন্য এই সংগ্রাম এখনও উৎকটভাবে দেখা দেয় নাই। স্পেনে দুই শ্রেণী মৃত্যুপণ করিয়া সংগ্রাম চালাইতেছে, মনে হয় এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত না হইলে সে-দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে না; ইতিমধ্যে হয়ত স্পেনের গৃহযুদ্ধের অগ্নি বিস্তৃত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকেই এক বিরাট কুরুক্ষেত্র ও ধ্বংসলীলায় পরিণত করিতে পারে।

আমাদের দেশেও ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে ইচ্ছা করিয়াই এই দ্বন্দ্বকে ডাকিয়া আনিতে চান, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে ধনিক-শ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত না হইলে দেশের কল্যাণ নাই এবং এই উচ্ছেদসাধন কেবল শ্রেণীতে শ্রেণীতে উৎকট বিরোধের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এই মতাবলম্বী লোকের সংখ্যাধিক্য হয় নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে, কোন শ্রেণীরই উচ্ছেদ সাধন না করিয়া, সকলেরই প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নিরুপদ্রবেই সকল প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং এইটিই হইতেছে ভারতের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু কি ভাবে ইহা হইবে সে-বিষয়ে এ-পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই সকল নানা মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা এবং সেই নীতি অনুসারে কর্ম্ম করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা ঘটনাস্রোত এই হতভাগ্য দেশকে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন, সমস্যাটিকে ভাসাভাসা ভাবে না দেখিয়া ইহার গভীরতায় প্রবেশ করা এবং যে-সকল শক্তি মানবের সমষ্টি-জীবনকে পরিচালিত করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে ধৈর্য্যের সহিত জ্ঞান অর্জ্জন করা। অথচ ঠিক এইটিরই অভাব আমাদের দেশে খুব বেশী। আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে নূতন নূতন আদর্শ, নূতন নূতন বুলি গ্রহণ করিতে খুবই পটু, কিন্তু নিজেরা গভীর ভাবে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া নিজেদের পথ

নির্দ্ধারণের অভ্যাস আমরা অনেক দিনই হারাইয়া ফেলিয়াছি।

প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মধারার মূলে রহিয়াছে একটি নিরন্তর প্রবৃত্তি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ব্যষ্টি সমগ্র বা সমষ্টি কর্তৃক পুষ্ট হইতেছে, সমষ্টি ব্যষ্টি কর্তৃক গঠিত হইতেছে—প্রকৃতি জীবনের এই দুই প্রান্তের মধ্যে ভারসাম্য রাখিয়া চলিয়াছে। অতএব মানবজীবনের পূর্ণতার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন হইতেছে, আমাদের জীবনের এই দুই প্রান্তের মধ্যে, ব্যষ্টি ও সামাজিক সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। সিদ্ধ সমাজ হইবে সেইটিই যাহা ব্যষ্টির পূর্ণতম বিকাশের সম্পূর্ণভাবে অনুকূল; আবার ব্যষ্টির সিদ্ধি অপূর্ণ রহিয়া যাইবে যদি সে যে-সমাজের অন্তর্গত তাহার পূর্ণতালাভে এবং শেষ পর্য্যন্ত বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর, সমগ্র মানবজাতির পূর্ণতালাভে, সহায়তা না করে। সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ সমাজে এবং শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ মানবমণ্ডলে ব্যষ্টির জীবনের সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধি ও পূর্ণতা—ইহাই প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের মধ্যে সকল ব্যক্তির বিকাশ যুগপৎ সমানভাবে এবং সমগতিতে হয় না। কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া যায়, তাহাদের সহিত তুলনায় কেহ কেহ দাঁড়াইয়া থাকে, আবার কেহ কেহ পিছাইয়া পড়ে। অতএব সমষ্টির মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী, ঠিক যেমন সমষ্টিসকলের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দেশ বা জাতিরও প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি সাময়িক ভাবে তাহার প্রগতির জন্য (কিংবা এমনও হইতে পারে যে, পশ্চাদ্বর্ত্তনের জন্য) যে-গুণ চায়, যে-শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধভাবে সেই গুণের বিকাশ করিতে পারে সেই শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করে। যদি প্রকৃতি শক্তি ও চরিত্রবল চায়, তাহা হইলে অভিজাত-শ্রেণীর প্রাধান্য হয়; যদি সে জ্ঞান-বিজ্ঞান চায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ও পণ্ডিতশ্রেণীর প্রাধান্য হয়; যদি কার্য্যকরী দক্ষতা, চাতুর্য্য, অর্থনীতি ও সামর্থ্য সংগঠনের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বুর্জ্জোয়া বা বৈশ্যশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হয় এবং সাধারণতঃ উকীলেরাই তাহাদের নেতা হয়; যদি সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার এবং শ্রম-সংগঠনের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রাধান্যও অসম্ভব নহে।

কিন্তু এই যে ঘটনা, শ্রেণী-বিশেষেরই হউক, আর দেশ-বিশেষেরই হউক, প্রাধান্য ও আধিপত্য, ইহা কেবল একটি সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত আর বেশী কিছু হইতে পারে না। কারণ মানবজীবনে প্রকৃতির ইহা কখনই চরম লক্ষ্য হইতে পারে না যে, কতিপয় লোক অধিকসংখ্যক লোককে শোষণ করিবে (এমন কি অধিকসংখ্যক লোকই কতিপয় লোককে শোষণ করিবে), মানবসমাজের অধিকাংশকে অবনত ও পরাধীন করিয়া রাখিয়া কেবল কতকগুলি লোক পূর্ণতা লাভ করিবে; এ-সব কেবল সাময়িক কৌশল মাত্র হইতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, এই সব প্রাধান্যের মধ্যে সকল সময়েই তাহাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। হয় তাহাদের শোষণকারী শক্তিটি বিতাড়িত বা বিনষ্ট হয়, অথবা তাহারা সাধারণের সহিত মিশিয়া সমান হইয়া যায়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাধান্যশালী ব্রাহ্মণ এবং প্রাধান্যশালী ক্ষত্রিয় উভয় শ্রেণীরই উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে অথবা তাহারা জনসাধারণের সহিত সমান হইতে চলিয়াছে। এখন কেবল দুইটি তীব্রভাবে বিভক্ত শ্রেণী রহিয়াছে। এক দিকে প্রাধান্যশালী ধনিক-শ্রেণী এবং অন্য দিকে শ্রমিক-শ্রেণী এবং আজিকার সকল গুরুত্ববিশিষ্ট আন্দোলনেরই লক্ষ্য হইতেছে এই অবশিষ্ট প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করা। এই অবিচল প্রবৃত্তিতে ইউরোপ প্রকৃতির প্রগতির একটি মহান্ নীতি অনুসরণ করিয়াছে, সেইটি হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত সমতার দিকে তাহার গতি। অবশ্য, পূর্ণ সমতা সম্ভব না হইতে পারে, আর ইহাও ঠিক যে, পূর্ণ সমরূপতা ও "একাকার" অসম্ভবও বটে এবং আদৌ বাঞ্ছনীয়ও নহে; কিন্তু এমন একটা মূলগত সমতা যাহাতে বৈচিত্র্যের খেলা কোন অনর্থের সৃজন করিবে না —ইহা মানবজাতির প্রকৃত পূর্ণত্বের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অতএব প্রাধান্যশালী লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্ব্বোত্তম পরামর্শ হইতেছে, তাহাদের ক্ষমতা ত্যাগের যথাসময় উপস্থিত হইলেই অবিলম্বে তাহা স্বীকার করা

এবং সমষ্টি-জীবনের অন্যান্য অংশকে—অথবা যতটুকু অংশ এই প্রগতির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সেইটুকুকেই—তাহাদের আদর্শ, গুণ, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা প্রদান করা। যখন এইরূপ করা হয় তখন সমাজের সমষ্টিজীবন বিপ্লব, গভীর ক্ষত বা ব্যাধি এড়াইয়া স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইতে পারে; অন্যথা তাহা বিশৃঙ্খল ভাবেই অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়, কারণ মানুষের অহমিকা বরাবর প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে, প্রকৃতি ইহা বরদাস্ত করে না। প্রকৃতি প্রাধান্যশালী শ্রেণী-সকলের নিকট হইতে যাহা দাবি করিতেছে তাহারা যদি সেই দাবি এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সমাজের উপর অধমতম দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়িবে; ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি ভারতবর্ষে। এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ দেশের অধিকাংশ লোককে যত দূর সম্ভব নিজেদের স্তরে তুলিয়া লইতে শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া এবং নিজেদের এবং সমাজের বাকী অংশের মধ্যে প্রাধান্যের এক অনতিক্রমণীয় ব্যবধান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়া জাতির অবনতি ও অধঃপতনের প্রধান নিমিত্ত হইয়াছে। কারণ প্রকৃতির উদ্দেশ্যসকল যেখানে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে প্রকৃতি অপরাধী প্রতিষ্ঠানটি হইতে তাহার শক্তি অনিবার্য্যভাবে সরাইয়া লয় এবং শেষ পর্য্যন্ত অন্য এবং বাহ্যিক উপায় আমদানি করিয়া বাধাটিকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দেয়।

ব্যাকুলা
শ্রীযামিনী রায় অঙ্কিত চিত্র

ছবি আঁকা
শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত স্কেচ

ভাগাড় হইতে চর্ম্মশালা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম তখন ইহার ব্যবহারিক দিক মানুষের কত উপকারে আসিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা দেশের ধনসম্পদ কত ভাবে বর্দ্ধিত হয় তাহার উদাহরণ রূপে নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে ধরিতাম। আজ পুনরায় অনুরূপ একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

কলিকাতায় সার্কুলার রোডে, যেখানে আবর্জ্জনা ফেলিবার প্ল্যাটফর্ম্ম ছিল (সৌভাগ্যের বিষয় আজ তাহা শহরের বাহিরে গিয়াছে) সেখানে অনেক সময় গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর মৃত পূতিগন্ধযুক্ত দেহ স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত। একটি ইংরেজ কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত এই মৃত জন্তুর দেহগুলি উঠাইয়া লইবার চুক্তি করে। সেই কোম্পানী ধাপাতে এই জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সমস্ত মৃত জন্তুর পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়াস পাইতেছে এবং অনেক টাকা আয়ও করিতেছে। তাহারা মৃত জন্তুর চামড়া, হাড়, মাংস, চর্ব্বি, শিং, খুর সমস্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার ভাবে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে এবং বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছে। বোম্বাইয়ে এবং অন্য বড় বড় শহরেও এই প্রকার মৃত জন্তুর সদ্ব্যবহারের জন্য কারখানা রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি সমস্তই বিদেশীদের সম্পত্তি। দেশী এই প্রকার কোন কারখানা আছে কিনা অবগত নহি। আমাদের দেশে এত অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ নোংরা জিনিষের কারখানা প্রতিষ্ঠা করার দিকে লোকের মনও আকৃষ্ট হয় না।

প্রায় তিন বৎসর হইল খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। হরিজন-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করায় মুচি, চামার, ডোমদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া তিনি উপলব্ধি করেন—ইহাদের সেবা করার একমাত্র পথই হইতেছে ইহাদের কাজকে মর্য্যাদা দেওয়া, ইহাদের কাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

মৃতপশুশালা, হাবড়া

নিয়মিত করা। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং ছোট শহরে, গ্রামে হরিজনেরা যাহাতে মৃত জন্তুর পূর্ণ উপয়োগ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম, হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বাৎসরিক ৩,০০০ টাকায় উহার ভাগাড় ইজারা লইয়া সতীশবাবু "মৃতপশুশালা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; দ্বিতীয়, ধাপার নিকটে ট্যাংরায় চামড়া-পাকাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য "কুটীর চর্ম্মকারুশালা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে গ্রামোন্নয়ন নামে একটি দাতব্য ট্রাষ্ট্ সংগঠন করিয়া এই প্রতিষ্ঠান

ট্রলিতে করিয়া মৃতপশুশালায় মৃতজন্তু লইয়া যাওয়া হইতেছে

দুইটি তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।* গত আড়াই বৎসরের মধ্যে এই দুইটি শিক্ষাশালা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পঁচিশ-ছাব্বিশটি ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে। মুচি-চামার, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একসঙ্গে এই স্থানে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটি শিক্ষা-শালার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মোটামুটি ভাবে ভারতবর্ষের চামড়ার ব্যবসা কিরূপ ব্যাপক, এবং মৃত জন্তুর পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা দেশের যে কত সমৃদ্ধি হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতের চামড়ার ব্যবসা

ভারতের চামড়ার ব্যবসার প্রধান অঙ্গ কাঁচা চামড়া ও ছাল-পাকাই-করা চামড়া রপ্তানি করা। ইহার প্রায় অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় যায়। সম্পূর্ণ পাকানো (chrome-tanned leather) বিদেশে সামান্যই রপ্তানি হয়। ছাল-পাকাই চামড়া বিলাতে লইয়া পুনরায় উহা ক্রোম-ট্যান করা হয়, এজন্য ছাল-পাকাই চামড়া অর্দ্ধ-পাকাই (half-tanned) চামড়া বলিয়া কথিত হয়। যে-পরিমাণ চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিদেশে যায় তাহার সমস্তটাই এ-দেশে ছাল-পাকাই অথবা ক্রোম-পাকাই করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। তাহাতে দেশের ধনসম্পদ কত বাড়িতে পারে, কত নিরন্ন লোক যে কাজ পাইয়া বাঁচিতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যিক হিসাব হইতে ভারতবর্ষের চামড়া-রপ্তানির হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

কাঁচা চামড়ার রপ্তানির হিসাব

[১-৪-৩৬ হইতে ৩১-৩-৩৭ পর্য্যন্ত]

চামড়ার বিবরণ	সংখ্যা	ওজন	মূল্য
মহিষের চামড়া	৬,৫৩,১৫৬ খানা	৪,৪৮০ টন	২১,৫৭,০৩২
গরুর চামড়া	৪২,৩৪,৫৭৮ ,,	১৯,৪১৭ ,,	১,০৯,৪১,৬২২
বাছুরের চামড়া	১,৭৮,২৮৩ ,,	৩১৪ ,,	২,৩৬,১৬৫
ছাগলের চামড়া	২,৫১,৬৮,১৮০ ,,	১৭,৯৮৫ ,,	২,৭৮,১৩,৪৩৯
ভেড়ার চামড়া	১১,৫২,৮৮৪ ,,	৬০৩ ,,	১৪,৫৯,০৪৬
অন্যান্য চামড়া	৯,০৫,৮৪৫ ,,	২৮০ ,,	৮,৬৭,৭৮২
	৩,২২,৯২,৯২৬ ,,	৪৩,০৭৯ ,,	৪,৩৪,৭৫,০৮৬

ছাল-পাকাই ও ক্রোম-পাকাই চামড়ার রপ্তানির হিসাব

চামড়ার বিবরণ	ওজন	মূল্য
মহিষের চামড়া	১,৪৪৫ টন	২৪,০৭,২১৭
গরুর চামড়া	১৪,৮৬৭ ,,	২,৫৭,৪৭,৬৩৯
বাছুরের চামড়া	১,৫৮৫ ,,	৩৬,০২,০৮৫
ছাগলের চামড়া	৩,৭৯৭ ,,	১,৮৩,৭৯,৯৯১
ভেড়ার চামড়া	৩,৫৬৬ ,,	১,৬৭,৮৭,৫৬৮
অন্যান্য চামড়া	১০৯ ,,	৪,৮৫,৭০৪
	২৫,৩৬৯ ,,	৬,৭৪,১০,২০৪

এক্ষণে কোন প্রদেশ হইতে কত চামড়া রপ্তানি হয় দেখা যাউক :

প্রদেশ-অনুযায়ী কাঁচা চামড়ার রপ্তানির হিসাব

১৯৩৬-৩৭

প্রদেশ	ওজন	মূল্য
বাংলা	২৪,৬২০ টন	২,৬৬,৯০,৬২১
বোম্বাই	৩,৩৯৭	৫০,৭৬,০৭০
সিন্ধু	৮,১৫৪	৭৩,৪১,৩১২
মান্দ্রাজ	১,২৪১	২৭,৮৭,৪৮১
ব্রহ্মদেশ	৫,৬৬৭	১৫,৭৯,৫০২
	৪৩,০৭৯	৪,৩৪,৭৫,০৮৬

* গ্রামোন্নয়ন রেজিষ্ট্রীকৃত চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের ট্রাষ্টিগণ :—আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি), শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীহেমপ্রভা দেবী (সম্পাদিকা)।

মৃতপশুশালার ছিলাই-ঘর---মৃত গরুর চামড়া খালাই হইতেছে

প্রদেশ-অনুযায়ী অর্দ্ধ-পাকাই ও ক্রোম-পাকাই চামড়ার রপ্তানি
১৯৩৬-৩৭

প্রদেশ	ওজন	মূল্য
বাংলা	৮৮ টন	২,৫৯,১২৮
বোম্বাই	৮৯১ ,,	২৫,৯২,৪৬৪
সিন্ধু	৬৫ ,,	১,২৬,০২১
মান্দ্রাজ	২৪,৩১৪ ,,	৬,৪৩,১৯,৫১১
ব্রহ্মদেশ	১১ ,,	১৩,০৭০
	২৫,৩৬৯ ,,	৬,৭৪,১০,২০৪

অর্দ্ধ-পাকাই ও পাকাই চামড়ার সংখ্যার হিসাব না পাওয়াতে দেওয়া সম্ভব হইল না। এই সমস্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, সব রকমের কাঁচা চামড়া মিলাইয়া প্রতি টনের মূল্য গড়ে ১০০৯ টাকা এবং সব রকমের পাকা ও অর্দ্ধ-পাকা চামড়া মিলাইয়া প্রতি টনের মূল্য ২৬৫৭ টাকা। অর্থাৎ প্রতি টন কাঁচা চামড়া অপেক্ষা প্রতি টন পাকা চামড়ার মূল্য ১৬৪৮ টাকা অধিক। শুষ্ক কাঁচা চামড়া অপেক্ষা পাকা ও অর্দ্ধ-পাকা চামড়ার ওজন সর্ব্বদাই কম হয়। মহিষের ও গরুর চামড়া অর্দ্ধ-পাকা অবস্থায় কখন কখন শুষ্ক কাঁচা চামড়ার সমান ওজনেরই থাকে।

যাহা হউক, যদি মোটামুটি কাঁচা ও অর্দ্ধ-পাকা এবং পাকা চামড়ার ওজন সমানই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয় তাহা যদি সমস্ত এদেশে পাকানো হইত তাহা হইলে প্রতি টন চামড়াতে ১৬৪৮ টাকা দেশের অধিক আয় হইত। অর্থাৎ ৪৩০৭৯ টন কাঁচা

মৃতপশুশালায় পাত্রে করিয়া সিদ্ধকরা হাড়-মাংস ভাজিয়া শুকান হইতেছে

চামড়া যাহা কাঁচাই রপ্তানি হয় তাহা সমস্তটাই পাকাই হইয়া রপ্তানি হইলে ভারতবর্ষের ধনসম্পদ আরও ৭,০৯,৯৪,১৯২ টাকা বৃদ্ধি পাইত। চামড়া-পাকাইয়ের জন্য রসায়ন-দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির ব্যয় যদি ইহার অর্দ্ধেক ধরা যায়, তবে এই চামড়া-পাকাই কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের পারিশ্রমিক হিসাবে বাকী অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৩,৫৪,৯৭,০৯৬ টাকা আয় হইবে। এই কার্য্যে এক্ষণে কত লোক যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহা পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

অর্দ্ধ-পাকাই চামড়া মান্দ্রাজ হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। উপরে প্রদেশ-অনুযায়ী রপ্তানির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক সেই সেই প্রদেশের রপ্তানির হিসাব নয়। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন এই পাঁচটি বন্দরের মারফতে যে রপ্তানি হয় তাহাই এই ভাবে প্রদেশ-অনুযায়ী দেখান হইয়াছে। কলিকাতার মারফতে বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের চামড়া রপ্তানি হয়। চামড়া-পাকাইয়ের কার্য্যে বাংলা মান্দ্রাজ হইতে কত পশ্চাতে, উক্ত হিসাব হইতে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মান্দ্রাজ হইতে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার অর্দ্ধ-পাকাই ও পাকাই চামড়া রপ্তানি হয়। সেই স্থলে বাংলা হইতে এই প্রকার চামড়া রপ্তানি হয় মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার। অপর দিকে মান্দ্রাজ হইতে মাত্র আটাশ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়। সেই

কুটীর চর্ম্মকারুশালায় শিক্ষার্থীরা চামড়া-পাকাইয়ের কাজ করিতেছে

স্থলে বাংলা হইতে আড়াই কোটি টাকার অধিক কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলায় এই কাঁচা চামড়া রপ্তানির কাজও বাঙালীর হাতে কিছুই নাই।

ভারতবর্ষে চামড়ায় প্রস্তুত জুতা ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসায় খুব বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে। বাংলায় জুতার ব্যবসা ত সমস্ত চীনা ও পাঞ্জাবীদের হাতে। বাঙালীর হাতে এই ব্যবসায়ের যে সামান্য অংশ আছে তাহা একরূপ নগণ্য। চামড়ার তৈরি জুতা ও অন্যান্য জিনিষের জন্য আবশ্যক সমস্ত চামড়া আমরা দেশেই পাইতে পারি এবং আমাদের আবশ্যক চামড়ার প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্যও এদেশেই প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারি। কিন্তু বিদেশী জুতা ও বিদেশ হইতে আমদানি-করা চামড়া না হইলে ত আমাদের চলে না। কাজেই দেশ হইতে যেমন কাঁচা চামড়া বিদেশে যায়, তেমনই আবার বিদেশ হইতে পাকা চামড়া, তৈরি জুতা ও অন্যান্য চামড়ার দ্রব্যও এদেশে যথেষ্ট আসে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে :—

	১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব
জুতা	২১,১৯,৩০৮ টাকা মূল্যের
পাকা চামড়া, এবং চামড়ায় প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যাদি	৫১,১০,০১৯ ,, ,,
	৭২,৫৯,৩২৭ ,, ,,

এই ত গেল চামড়ার ব্যবসা সম্বন্ধে।

মৃত জন্তুর পূর্ণ উপয়োগ

এক্ষণে ভারতবর্ষে মৃত জন্তুর কোন প্রকার সদ্ব্যবহার না-হওয়াতে দেশের ধনসম্পদ কিরূপে অপচয় হইতেছে তাহা দেখা যাউক।

ভারতবর্ষে গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় আঠার কোটি, অর্থাৎ মোটামুটি বলিতে গেলে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যত, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক। গড়ে যদি এই গৃহপালিত পশুর জীবনকাল ছয় বৎসর করিয়া ধরা যায়, তবে প্রতি বৎসরে তিন কোটি পশুর মৃত্যু হয়। গ্রামে বা শহরে আজকাল গরু মরিলে উহা গৃহস্থের নিকট একটি বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়ে। গৃহস্থকে টাকা খরচ করিয়া উহা ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসার ব্যবস্থা করিতে হয়। চামারেরা মৃত গরুর চামড়াটাই শুধু খালাইয়া লয়। উহার হাড়-মাংস বা চর্ব্বি কিছুই সংগ্রহ করা হয় না। এই হাড়-মাংস ও চর্ব্বি সমস্তই মূল্যবান পদার্থ। হাড় ও মাংসকে জমির উৎকৃষ্ট সাররূপে পরিণত করা যাইতে পারে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি প্রধান শহরে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত হাড়-মাংস গুঁড়া করিবার বড় বড় কারখানা রহিয়াছে। তাহাদের নিযুক্ত এজেণ্ট গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃত জন্তুর শুষ্ক হাড় সংগ্রহ করিয়া এই সমস্ত কারখানায় লইয়া আসে। কারখানা হইতে সেগুলি গুঁড়া হইয়া প্রায়ই বিদেশে চালান যায়। আবার সারের জন্য এবং হাড়ের নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত করার জন্য বহু হাড় গুঁড়া না-করা অবস্থায়ও বিদেশে যায়। এই মূল্যবান সার আমরা বিদেশে পাঠাইয়া আবার বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার (chemical manure) আমদানি করি। রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উর্ব্বরাশক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হয় এবং উৎপন্ন ফসলের পুষ্টিকারক শক্তিও কম হয়। স্বাভাবিক সার (natural organic manure), যথা মৃত জন্তুর হাড়, মাংস, খৈল, গোবর ইত্যাদি জমির উর্ব্বরা-শক্তি রাসায়নিক সারের অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি করে, উৎপন্ন ফসলের পুষ্টিকারক শক্তিও ইহাতে বেশী হয়। কিন্তু আমরা সেদিকে কি দৃষ্টি দিই? হাড়, খৈল

কুটীর চর্ম্মকারুশালায় চামড়া ছিলাই হইতেছে

কুটীর চর্ম্মকারুশালায় ক্রোম-পাকাই চামড়া ঠুকাই করা হইতেছে

প্রভৃতির রপ্তানি ও রাসায়নিক সারের আমদানির নিম্নে প্রদত্ত হিসাব হইতে ইহা আরও সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৩৬-৩৭ সালের রপ্তানি

বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
হাড়—গুঁড়া না-করা, নানাবিধ হাড়ের জিনিষ প্রস্তুতের জন্য	৭৪,২৭৯ টন	৪৬,৪৫,৪৩৭
,, —গুঁড়া না-করা, সারের জন্য	২৫,৫১৮ ,,	২০,৩৪,০১৯
হাড় ও শিং, গুঁড়ানো সারের জন্য	৩৪,১৬৫ ,,	১৭,৮৪,৪৪৯
খৈল, বিভিন্ন রকমের	৩,৩৫,৬২০ ,,	২,২৬,৯৩,৩০৮
চর্ব্বি	৩,৪৬২ ,,	৯৫,৭৩৭

১৯৩৬-৩৭ সালের আমদানি

বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সার	৮৩,৫৫৩ টন	৮০,০৭,৭২২
চর্ব্বি	২,০৫,৪৯০ ,,	৩৫,৭০,৬০৪

সতীশ বাবু দেখাইয়াছেন যে একটি পরিণতদেহ গরু বা মহিষ হইতে চামড়া, হাড়, মাংস, চর্ব্বি ইত্যাদিতে প্রায় ছয়-সাত টাকা পাওয়া যায়। চামড়ার মূল্য তিন টাকা, হাড়-মাংসের মূল্য দেড় টাকা, চর্ব্বির মূল্য দেড় টাকা হইতে দুই টাকা এইরূপ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসর যে তিন কোটি গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যু হয় সেইগুলির মৃতদেহের পূর্ণ ব্যবহার করিলে জন্তু-পিছু গড়ে দুই টাকা করিয়া ধরিলেও দেশের সম্পদ বৎসরে ছয় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অধিকন্তু মৃত জন্তুর ব্যবহার দ্বারা এইরূপ আয়ের সম্ভাবনা দেখা গেলে গো-সেবার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইবে, গরুর পুষ্টির দিকে গৃহস্থের নজর আপনা-আপনিই পড়িবে, কারণ গৃহস্থ তখন বুঝিতে পারিবে যে গরুকে প্রকৃত সেবা করিয়া উহার জীবিতকালে সে যেমন লাভবান হইয়াছে, উহার মৃত্যুর পর উহার মৃতদেহ হইতেও তাহার যথেষ্ট লাভই হইতেছে।

হাবড়া মৃতপশুশালা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সতীশবাবু হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাগাড় ইজারা লইয়া, মৃত জন্তুর সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে যাহাতে সহজে অল্প ব্যয়ে এই কাজ হইতে পারে, এখানে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানকার কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। কোথাও গো-মহিষাদি মরিতেছে কি না তাহা ঘুরিয়া দেখার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে লোক নিযুক্ত আছে। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মৃতদেহ ভাগাড়ে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা ইহারা করে। সেখানে

কুটীর চর্ম্মকারুশালায় হাতে চালানো গ্লেজিং যন্ত্রে চামড়া গ্লেজ করা হইতেছে

লইয়া যাওয়া মাত্রই চামড়া খালাইয়া লওয়া হয়। হাড়-মাংস কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। নাড়ীভুঁড়ি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। চামড়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লবণ দিয়া রাখা হয়। কিছু কিছু চামড়া বিক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট ক্রোম-ট্যান করার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত কুটীর চর্ম্মকারুশালাতে পাঠান হয়। হাড়-মাংস তাজা অবস্থাতেই অর্থাৎ পচনের পূর্ব্বেই সিদ্ধ করা হয়। অনেক ক্ষণ সিদ্ধ করার ফলে হাড়-মাংস পৃথক হইয়া যায়। চর্ব্বিও জলের উপরে ভাসিতে থাকে। তখন চর্ব্বিটা তুলিয়া লওয়া হয় এবং হাড়-মাংস আলাদা করিয়া শুকাইয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ রৌদ্রে শুকান সম্ভব হয় না বলিয়া আগুনের উপর বড় বড় পাত্রে করিয়া ভাজিয়া শুকান হয়। এই শুষ্ক হাড়-মাংস ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া মহামূল্য সারে পরিণত করা হয়। বর্ত্তমানে পেষণযন্ত্রে (Disintegratorএ) হাড়-মাংস গুঁড়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে অবশ্যই ঢেঁকিতে গুঁড়া করার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। ঢেঁকিতে হাড় গুঁড়া করা কঠিন, কিন্তু সামান্য পুড়াইয়া লইলে সহজেই গুঁড়া করা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই গুঁড়ানো মাংসে শতকরা ১১-১২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। হাড়ে শতকরা ২১-২২ ভাগ ফস্‌ফেট আছে। জমির পক্ষে এইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সার। হাড়-মাংস সিদ্ধ করিয়া প্রাপ্ত চর্ব্বি রিফাইন করিয়া উহা সাবান-প্রস্তুতকারকদের নিকট বিক্রয় হয়। সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান কলাশালায় ব্যবহারের জন্য আবশ্যক সাবানও উহা হইতে তৈরি করিয়া লওয়া হয়। শিং ও খুর সাধারণতঃ পৃথক ভাবে বিক্রয় করা হয়। খুর অনেক সময়ে হাড়ের সহিত গুঁড়া করিয়া সারে পরিণত করা হয়। মহিষের শিং দ্বারা চিরুণী, বোতাম, ছুরির বাঁট, কলমের হোল্ডার প্রভৃতি তৈরি করা যাইতে পারে। পরিণতদেহ গরু বা মহিষের পৃষ্ঠদেশে ঠিক চামড়ার নীচেকার স্থানের লম্বা অংশ কাটিয়া লওয়া হয়—এগুলিকে "পুঠ" বলে। ইহা দ্বারা তাঁত (gut) তৈরি হয়। সোদপুর কলাশালায় পুঠ হইতে তাঁত তৈরি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চুলসমেত লেজগুলিও পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া বিক্রয় করা হয়। এখানে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়িক দিকও দেখা হয়। এই শিক্ষাশালা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ভাবে চলিতেছে।

ভাগাড়ের কল্পনাতেই আমাদের দেহমন আঁৎকাইয়া উঠে। মৃত পশুর উপয়োগ করিবার জন্য খাল খালাইবার অথবা হাড়-মাংস সিদ্ধ বা গুঁড়া করার কথা অনেকের কাছেই ন্যক্কারজনক।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবার পর মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন ও সমস্ত দেশে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত শত শত কেন সহস্র সহস্র উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত যুবক শবব্যবচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, পূতিগন্ধময় নরদেহ অপেক্ষা গরু-মহিষ-ছাগলের মৃতদেহ কি হিসাবে অস্পৃশ্য মনে হয়?

হাবড়ার ভাগাড় সতীশবাবুর হাতে আসিবার পূর্ব্বে যে-অবস্থায় ছিল, তাহাতে কখনও যে উহা পরিষ্কৃত হইয়া লোকের বাসোপযোগী হইতে পারে তাহা কল্পনাও করা যায় নাই। কিন্তু সতীশবাবু নিজে ওখানে দিবারাত্র থাকিয়া ও কর্ম্মীদের সাহস ও উৎসাহ দিয়া উহা এরূপ সুন্দর পরিষ্কৃত স্থানে পরিণত করিয়াছেন যে এক্ষণে উহা

কর্ম্মীদের বাসযোগ্য হইয়াছে। বাগান করিয়া শাক-সব্‌জী উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে ভাগাড়ের বীভৎস রূপ কল্পনাতেও আসে না।

কুটীর চর্ম্মকারুশালা

সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত অপর শিক্ষাশালায় গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্প হিসাবে চামড়া-পাকানোর কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিক্ষাশালার এক দিকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চামড়া পাকাই করিয়া একটা বড় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা হইতেছে; অপর দিকে গ্রামের মধ্যে যাহাতে হরিজনেরা সহজে চামড়া ক্রোম-ট্যান করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানকার তৈরি চামড়া বিলাতেও বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। কুটীর-বিভাগের চামড়া যন্ত্র-বিভাগের চামড়ার ন্যায় সমান উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং সব সময়েই উভয় বিভাগের চামড়ার তারতম্য পরীক্ষা করা হইতেছে। গ্রামের কাজের উপযোগী হাতে চালানো ট্যানিং ড্রাম, গ্লেজিং মেশিন, শেভিং মেশিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখান হইতে কুটীরের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। সতীশবাবু কুটীর-বিভাগে চামড়া-পাকাইয়ের পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে হরিজনেরা নিজেদের বাড়ীতে অল্প মূলধনে চামড়া ভালরূপে ক্রোম-ট্যান করিতে সমর্থ হইবে। বস্তুতঃ এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কয়েক জন ছাত্র এইরূপ কুটীরচর্ম্মশালা সাফল্যের সহিত প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছে। হরিজনেরা গ্রামে চর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাহাদের অবস্থা যে অনেক উন্নত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। চামড়ার ব্যবসায়ের ব্যাপকতা যে কিরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রকার চর্ম্মশালায় যে-চামড়া প্রস্তুত হইবে, তাহা উৎকর্ষ ও মূল্যের দিক দিয়া প্রতিযোগিতায় কোন বড় চর্ম্মশালার চামড়া অপেক্ষা হীন হইবে না।

কুটীরচর্ম্মশালার জন্য সতীশবাবু যে কর্ম্মপ্রণালীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

গ্রামে কুটীরচর্ম্মশালার কর্ম্মপ্রণালী

দুই জন লোক একত্রে কাজ করিবে। মাসিক তিন শত বর্গফুট ক্রোম চামড়া ও তিন শত পাউণ্ড সোলের চামড়া প্রস্তুত করিবে এবং বিক্রয় করিবে। বিক্রয় ও কাজের ব্যবস্থার জন্য একটি লোক মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ব্যয় করিবে ও বাকী দশ দিন অপর লোকটিকে কাজে সাহায্য করিবে।

হিসাব

গ্রামে গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য গড়ে প্রতি ফুট	৵১০
প্রতি ফুট চামড়া পাকাই করিতে রাসায়নিক দ্রব্যের খরচ	১০
পারিশ্রমিক ব্যতীত তৈরি চামড়ার মূল্য	৶০
বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি ফুট	।০
মহিষের কাঁচা চামড়া প্রতিখানা	৪৲
ইহাতে ২৫ পাউণ্ড সোলের চামড়া হইবে, তদনুপাতে প্রতি পাউণ্ড কাঁচা চামড়ার মূল্য	৵১০
প্রতি পাউণ্ড চামড়া পাকাইয়ের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য খরচ	⁄০
পারিশ্রমিক ব্যতীত প্রতি পাউণ্ড সোল চামড়ার মূল্য	৶১০
বিক্রয় মূল্য প্রতি পাউণ্ড	।⁄০

ব্যয়		আয়	
৩০০ বর্গফুট চামড়ার দরুণ ৶০ হিঃ	৫৬।০	৩০০ বর্গফুট ক্রোম চামড়ার বিক্রয়-মূল্য ।০ ফুট হিঃ	৭৫৲
৩০০ পাউণ্ড সোল চামড়ার দরুণ ৶১০ পাঃ হিঃ	৬৫॥৵০	৩০০ পাউণ্ড সোলের চামড়ার বিক্রয়-মূল্য ।⁄০ পাউণ্ড হিঃ	৯৩৸০
অন্যান্য খরচ—	৫৲		১৬৮৸০
	১২৬৸৵০		১২৬৸৵০
			৪১৸৵০

দুই জন লোক একত্রে ৪১৸৵০ মাসিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

আবশ্যক মূলধন

ট্যানারীর জন্য আবশ্যক সাজসরঞ্জামাদি ক্রয় ও প্রস্তুত করান	১১০৲
(বাহুল্যবোধে বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হইল না)	
সোলের চামড়া পাকাইয়ের জন্য এক মাসের রাসায়নিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি	১৫৲
ক্রোম চামড়া পাকাইয়ের জন্য তিন মাসের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি	২৮৲
এক মাসের উপযোগী গরুর চামড়া—	৪৬৸৵০
মহিষের চামড়া—	৪৬৸৵০
মোটামুটি ২৫০৲	২৪৬৸৵০

কুটীরচর্ম্মশালার জন্য আবশ্যক ঘরের ব্যয়ের হিসাব এখানে ধরা হয় নাই। এই জন্য একখানা সাধারণ ৩০ × ১২ ফুট ঘর, জলের জন্য একটি পাতকুয়া, এবং চামড়া শুকাইবার জন্য একটি ছোটখাট উঠান আবশ্যক হইবে।

শিক্ষিত যুবকেরা চামড়া-পাকাইয়ের কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া হরিজনদের গ্রামে বসিয়া সেবার দৃষ্টিতে তাহাদের দ্বারা যৌথভাবে এই প্রকার চর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালিত করিতে পারেন। ইহাতে এক দিক দিয়া তাঁহারা যেমন গ্রামে বসিয়া হরিজনদের সেবা, গ্রামের উন্নতি ও দেশের সম্পদ বাড়াইতে সমর্থ হইবেন, অপর দিকে পরিবারবর্গের জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানও করিতে পারিবেন। সামান্য চাকুরীর জন্য পরের দরজায় খোসামোদ করিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হইবে না।

[কুটীর চর্ম্মকারশালার কর্ম্মী শ্রীমান চারুভূষণ চৌধুরী প্রবন্ধ-রচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া না-দিলে এই প্রবন্ধ রচনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবীণা দেবী

রুদ্ধ অন্ধ গুহা মাঝে
বদ্ধ ছিল প্রাণের নিশ্বাস,
তুমিই আনিলে সেথা
মুক্তির বাতাস।
অপূর্ব্ব তুলিকাপাতে শুভ্র কাগজের বুকে,
পর্ব্বতের সুমহান্ রূপ ধরি' দিলে নয়ন সম্মুখে!
দ্রষ্টা তুমি, স্রষ্টা তুমি, এনেছ ফিরায়ে
বসনে ভূষণে লুপ্ত ভারতীয়-রীতি;
যে ধারা বহায়ে দেছ বাংলার বুকে
আজ তাহা পূর্ণ স্রোতস্বতী।
তুমিই ফুটালে চিত্রে অচলের অনন্ত বারতা,
শঙ্করের মর্ম্ম ভেদি প্রকাশিলে গৌরী শুচিস্মিতা!
মনে হয় আজ তোমা হেরি
স্তব্ধ শান্ত সমাহিত-জ্ঞান
মৌন গিরিনিভ, হইয়াছ
আজীবন হিমালয় করিয়া ধেয়ান!
মর্ত্ত্যমাঝে তুমি মৃত্যুঞ্জয়! মূর্ত্তি তব মহেশেরই সম,
ভারত-শিল্পের নবযুগ-প্রবর্ত্তক!
অবনী-অগ্রজ ঋষি!
গগনেন্দ্র, নমো নমঃ, নমঃ।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

দেশের জন্যে মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলা দেশের জন্যে, বাঙালীর জন্যে, নিজের গ্রামের জন্যে, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্যে মন কি রকম হু হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিষটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কতবার সদরে ছুটির জন্য চিঠি লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু কাজ এত বেশী সব সময়েই হাতে আছে যে ছুটি চাহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ এই জনশূন্য পাহাড় জঙ্গলের, বাঘ ভালুক নীলগাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কি কষ্ট! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধুনাগুগগুলের সৌরভ পাই নাই, বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালীর সে শান্ত, পূত ঘরকন্না, জলচৌকীতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি—সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবনস্বপ্ন!

শীত গিয়া যখন বসন্ত পড়িয়াছে, তখন আমার এই ভাবটা অত্যন্ত বেশী বাড়িল। কোথায় কত দূরে আছি পড়িয়া, সামান্য টাকার জন্য। দেশে গেলে এ টাকা আমার হয় না?

সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া সরস্বতী কুণ্ডীর ওদিকে বেড়াইতে গেলাম। একটা নীচু উপত্যকায় ঘোড়া হইতে নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চারি দিকে ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাশ ও বনঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণ-ফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোনো শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক যেন বেগুনী রঙের একখানা শাড়ীর মত। বর্ণ-হীন, বৈচিত্র্যহীন অর্দ্ধশুষ্ক কাশ-জঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে—ইহাদের উপরে প্রবীণ, বিরাট বনঝাউয়ের স্তব্ধ, রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীণতার ধৈর্য্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন-বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনী-ফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কত ক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতক-গুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে—এদৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙ্গার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যান-স্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার অথচ কি বিরাট! সেই অর্দ্ধশুষ্ক, পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য, বর্ব্বর, তরুণদের

বসন্তোৎসবের সরল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টায় উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল।

সে আমার জীবনের এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত্ত। কত ক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, দু-একটা নক্ষত্র উঠিল মাথার ওপরকার সেই নীল আকাশের ফালিটুকুতে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল চারি দিকে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি আমীন পূরণচাঁদ নাঢ়া বইহারের পশ্চিম সীমানায় জরীপের কাজ শেষ করিয়া কাছারি ফিরিতেছে। আমায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—হুজুর এখানে? তাহাকে বলিলাম বেড়াইতে আসিয়াছি।

সে বলিল—একা এখানে থাকবেন না সন্ধ্যাবেলা, চলুন কাছারিতে। জায়গাটা ভাল নয়, এখানেই সেদিন বাঘ বেরিয়েছিল। আমার টিণ্ডেল স্বচক্ষে দেখেছে হুজুর। খুব বড় বাঘ, ওধারের ওই কাশের জঙ্গলে। পর্ব্বতের সীমানা পর্য্যন্ত সব জায়গায় গরু বাছুর মারে। আসুন, হুজুর।

পিছনে অনেক দূরে পূরণচাঁদের টিণ্ডেল গান ধরিয়াছে :—

দয়া হোই জী—

সেই দিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলেই আমার মন হু হু করিয়া উঠিত বাংলা দেশের জন্যে। এ কোন্ দেশে আছি! যেখানে বসন্তের সম্বল মাত্র এই কাঁটার ফুলগুলি! আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ঐ গানই গাহিবে!

দয়া হোই জী—

এই যে-দেশের বসন্ত, সেখান হইতে কবে উদ্ধার পাইব? আসন্ন ফাল্গুন-বেলায় আম্রবউলের গন্ধভরা ছায়ায় শিমুলফুলফোটা নদীচরের এপারে দাঁড়াইয়া কোকিলের কূজন শুনিবার সুযোগ এ জীবনে বুঝি আর মিলিবে না, এই বনেই বেঘোরে বাঘ বা বন্যমহিষের হাতে কোন্ দিন প্রাণ হারাইতে হইবে।

বনঝাউ বন তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই ধূসর, উদাসীন দেখাইত।

•

এমনি এক দেশের জন্য মন-কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিংহের বাড়ী হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইলাম। রাসবিহারী সিং এ-অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট খাসমহলের প্রজা। তাহার গ্রাম কাছারি হইতে ১২।১৪ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের গায়ে।

নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ীতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ-অঞ্চলের যত গরিব দুঃস্থ গাঙ্গোতা-জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরিবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিবে। যদি কোন রকমে রাসবিহারীর মনে হইল অমুক বিষয়ে অমুক তাহাকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দেয় নাই বা তাহার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে সে হতভাগ্যের আর রক্ষা নাই। রাসবিহারী সিং ছলে-বলে কৌশলে তাহাকে জব্দ করিয়া, রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেই।

আমি আসিয়া দেখি রাসবিহারী সিংই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরিব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেনন। রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দ্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাস-বিহারীর হাতে আছে। খাসমহালের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে?

আমার প্রজার উপর রাসবিহারী সিং প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা-করে—তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু আমার মহালের কোনও প্রজার

কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না। গত বৎসর এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারী সিংয়ের লাঠিয়াল-দলের সঙ্গে আমার কাছারির মুকুন্দি চাক্‌লাদার ও গণপৎ তহশীলদারের সিপাহীদের একটা ক্ষুদ্র রকমের মারামারি হইয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসেও আবার একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। তাহাতে ব্যাপার পুলিস পর্য্যন্ত গড়ায়। পুলিসের দারোগা আসিয়া সেটা মিটাইয়া দেয়। তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ রাসবিহারী সিং আমার মহালের প্রজাদের কিছু বলে না।

সেই রাসবিহারী সিংয়ের নিকট হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

গণপৎ তহশীলদারকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসি। গণপৎ বলিল—কি জানি হুজুর, ও-লোকটাকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে, কি মতলবে আপনাকে নিয়ে যেতে চায় কে জানে? আমার মতে না-যাওয়াই ভাল।

আমার কিন্তু এ-মত মনঃপূত হইল না। হোলির নিমন্ত্রণে না-গেলে রাসবিহারী অত্যন্ত অপমান বোধ করিবে। কারণ হোলির উৎসব রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। হয়ত ভাবিতে পারে যে ভয়ে আমি গেলাম না। তা যদি ভাবে, সে আমার পক্ষে ঘোর অপমানের বিষয়। না, যাইতেই হইবে, যা থাকে অদৃষ্টে।

দুপুরের কিছু আগে খাসমহালে রওনা হইলাম। কাছারির প্রায় সকলেই আমায় নানা মতে বুঝাইল। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি এ-সব দেশের গতিক জানেন না। এখানে হট্‌ বলতে খুন ক'রে বসে। জাহিল আদমির দেশ, লেখাপড়া-জানা লোক ত নেই। তা ছাড়া রাসবিহারী অতি ভয়ানক মানুষ। কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওই মোহনপুরা জঙ্গলের ধারে ব'সে যদি ও একটা ছেড়ে দশটা খুনই করে, কে আসবে তদন্ত করতে, আর কে-ই বা মুখ ফুটে কোনও কথা বলতে ভরসা করবে। ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘর-জ্বালানি, দাঙ্গা, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সব-তাতেই মজবুত। অজস্র টাকা, টাকা ঢাললেই সব ঠাণ্ডা। পুলিস ত ওর হাতে, পুলিস এসে কি করবে?

ও-সব কথা কানে না-তুলিয়াই রাসবিহারীর বাড়ী গিয়া পৌছিলাম। খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালওয়ালা ঘর, যেমন এ-দেশে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী হইয়া থাকে। বাড়ীর সাম্‌নে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি, আলকাতরা-মাখানো। দু-খানা দড়ির চারপাই, তাতে জন-দুই লোক বসিয়া ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।

আমার ঘোড়া উঠানের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুই বন্দুকের আওয়াজ হইল। রাসবিহারী সিংয়ের লোক আমায় চেনে, তাহারা স্থানীয় রীতি অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিল, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু গৃহস্বামী কোথায়? গৃহস্বামী না আসিয়া দাঁড়াইলে ঘোড়া হইতে নামিবার প্রথা নাই।

একটু পরে রাসবিহারী সিংয়ের বড় ভাই রাসউল্লাস সিং আসিয়া বিনীত স্বরে দুই হাত সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আইয়ে জনাব, গরিবখানামে তস্‌রিফ্‌ লেতে আইয়ে—আমার মনের অস্বস্তি ঘুচিয়া গেল। রাজপুত জাতি অতিথি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করে না। কেহ আসিয়া অভ্যর্থনা না-করিলে ঘোড়া হইতে না-নামিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিতাম কাছারির দিকে।

উঠানে বহু লোক। ইহারা অধিকাংশই গাঙ্গোতা প্রজা। পরনের মলিন ছেঁড়া কাপড় আবীর ও রঙে ছোপানো, নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে মহাজনের বাড়ী হোলি খেলিতে আসিয়াছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী সিং আসিল এবং আমায় দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। অর্থাৎ আমি যে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহা যেন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক, রাসবিহারী আমার যথেষ্ট খাতির করিল। দেখিলাম আমি যাওয়াতে সে সত্যই খুব খুশী হইয়াছে।

পাশের যে-ঘরে সে আমায় লইয়া গেল, সেটায় থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই-তিন সিসম কাঠের দেশী ছুতারের হাতে তৈরি খুব মোটা মোটা পায়া ও হাতল-ওয়ালা চেয়ার এবং একখানা কাঠের বেঞ্চি। দেওয়ালে সিন্দুর-চন্দন লিপ্ত একটি গণেশমূর্ত্তি।

একটু পরে একটি বালক একখানা বড় থালা লইয়া আমার সামনে ধরিল। তাহাতে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচ-দানা ও মিছরিখণ্ড, এক ছড়া ফুলের মালা। রাসবিহারী সিং আমার কপালে কিছু আবীর মাখাইয়া দিল, আমিও তাহার কপালে আবীর দিলাম, ফুলের মালাগাছি তুলিয়া লইলাম আর কি করিতে হইবে না-বুঝিতে পারিয়া আনাড়ী ভাবে থালার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া রাসবিহারী সিং বলিল—আপনার নজর, হুজুর। ও আপনাকে নিতে হবে। আমি পকেট হইতে আর কিছু টাকা বাহির করিয়া থালার টাকার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলাম—সকলকে মিষ্টিমুখ করাও এই দিয়ে।

রাসবিহারী সিং তার পর আমাকে তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি গরু। সাত-আটটি ঘোড়া আস্তাবলে—দুটি ঘোড়া নাকি অতি সুন্দর নাচিতে পারে, এক দিন নাচ আমায় সে দেখাইবে। হাতী নাই কিন্তু শীঘ্র কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ-দেশে হাতী না-থাকিলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হয় না। আট-শ মণ গম চাষে উৎপন্ন হয়, দু-বেলায় আশী-পচাশী জন লোক খায়, সে নিজে সকালে নাকি দেড় সের দুধ ও এক সের বিকানীর মিছরি স্নানান্তে জলযোগ করে। বাজারের সাধারণ মিছরি সে কখনও খায় না, বিকানীর মিছরি ছাড়া। মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়—বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।

তার পর রাসবিহারী একটা ঘরে আমায় লইয়া গেল, তার ঘরের আড়া হইতে দু-হাজার আড়াই-হাজার ছড়া ভুট্টা ঝুলিতেছে। এগুলি ভুট্টার বীজ, আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা লোহার কড়া আমায় দেখাইল, লোহার চাদর গুল্-বসানো পেরেক দিয়া জুড়িয়া কড়াখানা তৈরি, তাতে দেড় মণ দুধ একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয় প্রত্যহ। তাহার সংসারে প্রত্যহই ঐ পরিমাণ দুধ খরচ হয়। একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার এত বেশী যে সেটাকে রীতিমত অস্ত্রাগার বলিলেও চলে।

রাসবিহারী সিংয়ের ছয় জন ছেলে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ত্রিশের কম নয়। প্রথম চারটি ছেলে বাপের মতই দীর্ঘকায়, জোয়ান, গোঁফ ও গালপাট্টার বহর এরই মধ্যে বেশ। তাহার ছেলেদের ও তাহার অস্ত্রাগার দেখিয়া মনে হইল, দরিদ্র, অনাহারশীর্ণ গাঙ্গোতা প্রজাগণ যে ইহাদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে, ইহা আর বেশী কথা কি?

রাসবিহারী অত্যন্ত দাম্ভিক ও রাসভারী লোক। তাহার মানের জ্ঞানও বিলক্ষণ সজাগ। পান হইতে চূণ খসিলেই রাসবিহারী সিংয়ের মান যায়, সুতরাং তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গেলে সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গাঙ্গোতা প্রজাগণ ত সর্ব্বদা তটস্থ অবস্থায় আছে, কি জানি কখন মনিবের মানের ত্রুটি ঘটে।

বর্ব্বর প্রাচুর্য্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিস-সাজানো বিছানা নাই। দেওয়ালে চূণের দাগ, পানের দাগ, বাড়ীর পিছনের নর্দ্দমা অতি কদর্য্য নোংরা জল ও আবর্জ্জনায় বোজানো, গৃহস্থাপত্য অতি কুশ্রী, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা। গত বৎসর বসন্ত রোগে বাড়ীর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে এক মাসের মধ্যে মারা গিয়াছে। এ বর্ব্বর প্রাচুর্য্য তবে কোন্ কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য্য অর্জ্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে? অবশ্য রাসবিহারী সিংয়ের মান বাড়িতেছে।

ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কিন্তু তাক লাগিল। এত কি এক জনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনর খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপোয়া, চাটনি, পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য্য উদরস্থ করিয়া থাকে এক বারে।

আহার শেষ করিয়া বাহিরে যখন আসিলাম, তখন

বেলা আর নাই। গাঙ্গোতা-প্রজাদের দল উঠানে পাতা পাতিয়া দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানা মহা আনন্দে খাইতে বসিয়াছে। সকলের কাপড় লাল রঙে রঞ্জিত, সকলের মুখে হাসি। রাসবিহারীর ভাই গাঙ্গোতাদের খাওয়ানোর তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। ভোজনের উপকরণ অতি সামান্য, তাতেই ওদের খুশী ধরে না।

অনেক দিন পরে এখানে সেই বালক-নর্ত্তক ধাতুরিয়ার নাচ দেখিলাম। ধাতুরিয়া আর একটু বড় হইয়াছে, নাচেও আগের চেয়ে অনেক ভাল। হোলি-উৎসবে এখানে নাচিবার জন্য তাহাকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে, রাসউল্লাস সিংয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম।

ধাতুরিয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—চিনতে পার ধাতুরিয়া ?

ধাতুরিয়া হাসিয়া আমায় সেলাম করিয়া বলিল—জী হুজুর। আপনি ম্যানেজার বাবু। ভাল আছেন হুজুর ?

ভারী সুন্দর হাসি ওর মুখের। আর ওকে দেখিলেই মনে কেমন একটা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক হয়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাহিয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। তাও রাসবিহারী সিংয়ের মত ধনগর্ব্বিত অরসিকদের গৃহপ্রাঙ্গণে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে তো অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত নাচতে গাইতে হবে, মজুরি কি পাবে ?

ধাতুরিয়া বলিল—চার আনা পয়সা হুজুর আর খেতে দেবে পেট ভ'রে।

—কি খেতে দেবে ?

—মাঢ়া, দই, চিনি। লাড্ডুও দেবে বোধ হয়, আর-বছর তো দিয়েছিল।

আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সব জায়গায় কি এই মজুরি ?

ধাতুরিয়া বলিল—না হুজুর, রাসবিহারী সিং বড়মানুষ, তাই চার আনা দেবে আর খেতেও দেবে। গাঙ্গোতাদের বাড়ী নাচলে দেয় দু-আনা, খেতে দেয় না, তবে আধ সের মকাইয়ের ছাতু দেয়।

—এতে চলে ?

—বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হ'ত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে ? যখন নাচের বায়না না থাকে, ক্ষেতে খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত সখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে। কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরি বেশী।

ধাতুরিয়াকে আমি আর এক দিন কাছারিতে নাচ দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম। ধাতুরিয়া শিল্পী লোক—সত্যিকার শিল্পীর নিষ্ঠা ও নিস্পৃহতা ওর মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খুব ফুটিলে রাসবিহারী সিংয়ের নিকট বিদায় লইলাম। রাসবিহারী সিং পুনরায় দুটি বন্দুকের আওয়াজ করিল, আমার ঘোড়া উহাদের উঠান পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সম্মানের জন্য।

রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ী হইতে যখন বাহির হইয়াছি দোল-পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না উদার, মুক্ত, প্রান্তরের মধ্যে তাহার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে, ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইলেও বেশ শীত, দীর্ঘ ঘাসের বন এরই মধ্যে শিশিরে ভিজিয়া উঠিয়াছে, আগাগোড়া সাদা বালির রাস্তা জ্যোৎস্নাসম্পাতে চিকচিক্ করিতেছে। দূরে একটা সিল্লি পাখী জ্যোৎস্নারাতে কোথায় ডাকিতেছে—যেন এই বিশাল, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পথহারা কোনো বিপন্ন নৈশ পথিকের আকুল কণ্ঠস্বর।

পিছন হইতে কে ডাকিল—হুজুর ম্যানেজার বাবু—

চাহিয়া দেখি ধাতুরিয়া আমার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিতেছে।

ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধাতুরিয়া ?

ধাতুরিয়া হাঁপাইতেছিল। একটুখানি দাঁড়াইয়া দম লইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরিশেষে লাজুক মুখে বলিল—একটা কথা বলছিলাম, হুজুর—

তাহাকে সাহস দিবার সুরে বলিলাম—কি বল না ?

—হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন ?

—কি করবে সেখানে গিয়ে ?

—কখনো কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা-

বাজনা নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলে যেতে বসেছি। উঃ কি করেই ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিষ।

গ্রামটা ছাড়াইয়াছিলাম। ধূ ধূ জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। ভাবে বোধ হইল ধাতুরিয়া লুকাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চায়, রাসবিহারী সিং টের পাইলে শাসন করিবে এই ভয়ে। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা ফুলেভর্ত্তি শিমুলচারা।

ধাতুরিয়ার কথা শুনিয়া শিমুল গাছটার তলায় ঘোড়া হইতে নামিয়া এক খণ্ড পাথরের উপর বসিলাম। বলিলাম—বল তোমার গল্প।

—সবাই বলতো গয়া জেলায় এক গ্রামে ভিটলদাস ব'লে এক জন গুণী লোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। আমার ঝোঁক ছিল ছক্করবাজি যে ক'রে হোক শিখবই। গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। অবশেষে এক দিন সন্ধ্যের সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্কর-বাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। অনেক রাত তখন, শীতও খুব। আমি বিচালি পেতে, বাথানের এক কোণে শুয়েছিলাম, যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া আমি অমনি লাফিয়ে উঠেছি। ওদের কাছে এসে বসি। কি খুশীই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব! যেন একটা কি তালুক পেয়ে গিয়েছি! ওদের কাছে ভিটলদাসের সন্ধান পেলাম। ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা ব'লে গ্রামে তার বাড়ী।

বেশ লাগিতেছিল এক জন তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষার আকুল আগ্রহের গল্প। বলিলাম—তার পর?

—হেঁটে সেখানে গেলাম। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। এক বুক সাদা দাড়ি। আমায় দেখে বললেন—কি চাই? আমি বললাম—আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আজকালকার ছেলেরা এ পছন্দ করে? এ ত লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন—আমার বংশে সাত পুরুষ ধরে এই নাচের চর্চ্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই। বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায় নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা তোমায় শেখাব। তা বুঝলেন হুজুর, এত কষ্ট ক'রে শেখা জিনিষ। এখানে, গাঙ্গোতাদের দেখিয়ে কি করব? কলকাতায় গুণের আদর আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন, হুজুর?

বলিলাম—আমার কাছারিতে এক দিন এস ধাতুরিয়া, এ-সম্বন্ধে কথা বলব।

ধাতুরিয়া আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল উহার এত কষ্ট করিয়া শেখা গ্রাম্য নাচ কলিকাতায় কে-ই বা দেখিবে, আর ও বেচারী একা সেখানে কি-ই বা করিবে?

ক্রমশ

পল্লীপ্রকৃতি

শ্রীভূহান দে

ত্যাগ

শ্রীআশালতা সিংহ

গৃহস্বামী সেদিন একটু দেরি করিয়া তাঁহার আপিস হইতে ফিরিয়াছিলেন। গৃহে পৌছিয়া দেখেন বন্ধুরা ইতিমধ্যে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। বিজয়নাথ হাতের ছড়িটা দেয়ালের কোণে রাখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমাদের গলার আওয়াজটা তর্কের উত্তেজনাবশতঃই বোধ করি কিঞ্চিৎ উত্তাল হয়ে উঠেছে। আসতে আসতে মোড় থেকে শুনতে পেলাম। ভাবলাম এতক্ষণ নিশ্চয়ই হিট্‌লার কিংবা মুসোলিনীকে সমালোচনার চোখা চোখা বাণে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছ কিংবা জাপানীদের বর্ব্বর নৃশংসতার কাহিনী বর্ণনা করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছ। মন্দ না। আমরা বাঙালীরা পুঁইশাকের চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাই, মাঝে মাঝে গৃহিণীর নথনাড়া যে না খাই তাও নয়। আর আপিসে যাই কলম পিষি, এবং বড় সায়েবের সবুট পায়ে খোসামোদের কিঞ্চিৎ তৈল বর্ষণ করি। আমাদের এই নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসানে সন্ধ্যাবেলাটায় এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে যদি রাজা-উজির না মারতে পাই তাহ'লে আর জীবনের স্বাদ থাকে কোথায়! আজ কি নিয়ে চলছিল তোমাদের?" প্রমথ হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আরে শুনেছ ভুলু আর গণেশ দু-জনে এক সঙ্গে মিলে যে 'গণেশ এণ্ড বসাক' নাম দিয়ে কারবার খুলেছিল সেটা যে ফেল পড়েছে। আমরা এইমাত্র খবর পেলাম। পাওনাদারের হাত এড়াবার জন্যে যত রকম ফন্দিফিকির আছে দুনিয়াতে তার কোনটাই ওরা বাদ দেয় নি। আমি জানতাম না, আজই হঠাৎ সতীশের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনলাম। জোচ্চোর ব্যাটারা! অনেক লোককেই ঠকিয়েছে।" সতীশ পাশেই চেয়ারে বসিয়াছিল, সে বলিল, "বাস্তবিক বিজয়, এই বাঙালী জাতটার মত অলস, স্বার্থপর এবং হিংসুটে জাত আমি আর একটাও দেখতে পেলাম না। হিট্‌লার, মুসোলিনীর জবরদস্ত নীতি নিয়ে আমরা সমালোচনার স্রোত বইয়ে দিই, কিন্তু একবার মনে ক'রে দেখ দিকি জাতির উন্নতির জন্যে সে দেশের প্রত্যেকটি লোক কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছে, নিজেদের কত কঠিন নিয়ম কত সুকঠোর নিষ্ঠার অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছে। ভেবে দেখলে মনে গভীর শ্রদ্ধা হয় নাকি? আর বাঙালী? নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু জানে ওরা? পারে কোন ত্যাগ করতে?"

বিজয়নাথের শুনিতে রীতিমত কষ্ট হইতেছিল। ভৃত্য রেকাবিতে করিয়া জলখাবার এবং চায়ের পেয়ালা আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে, পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "সতীশ, তুমি কি ঠিক জান বাঙালী ত্যাগ করতে জানে না? আমি তোমাকে একটি কথা মনে করিয়ে দিই। কথাটি বাঙালীদের মধ্যেই যিনি শ্রেষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা সেই রবিবাবু গোরার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে খুব অল্পই আছে।' কোন জিনিষ যথার্থ না জেনে সমালোচনা করতে নেই। বিশেষ ক'রে সমস্ত জাতির নিন্দা-ব্যাপারে।" সতীশ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি কি বলেছি বাঙালীদের মধ্যে স্বার্থ-ত্যাগ করতে কেউ জানে না? না, তেমন ক'রে খুঁজে দেখলে দু'চার জন মহান ব্যক্তির নাম মনে পড়ে না? কিন্তু সেটা হ'ল দৃষ্টান্ত। প্রতি দিনে আমাদের আশে-পাশের জীবনে ঠিক সেই দৃষ্টান্তের উল্টোটাই কি আমরা দেখতে পাই নে?"

বিজয়নাথ গভীর স্বরে বলিলেন, "না তা নয়। আমি ত তোমাদের মত বক্তা নই। গুছিয়ে দু-চার কথা বলতেও পারি নে, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি বাঙালীরা তাদের রোজকার জীবনেই যত ত্যাগ করে তাদের সে

তিল তিল আত্মত্যাগের পরিসীমা নেই। কত জায়গায় কত ছলে দেখেছি তাদের। অজ্ঞাত অখ্যাত তারা, তাদের কথা এ চায়ের আসরে বললে বেমানান শোনাবে। আর বলবার ভাষাও নেই আমার। কিন্তু আমি এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি ত্যাগ করবার ক্ষমতা তাদের কি অসীম! যখন তাদের ডাক আসবে তখন এ অক্ষমতার দোহাই তাদের কেউ দিতে পারবে না। জগতে তারা প্রমাণ করবেই এক দিন, এত দিন যে-অপবাদ তাদের নামে সবাই দিয়েছিল, তারা তার অনেক উর্দ্ধে। দেখে নিও তোমরা।"

সতীশ আর তর্ক না করিয়া একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বিজয় যে ভাবপ্রবণ সেকথা তাহারা সবাই জানিত। তাহার সকল কথাই যে বিশ্বাসের যোগ্য এমন কেহই মনে করিত না; আজও করিল না। তথাপি প্রসঙ্গটা বদলাইয়া বন্ধুরা চা এবং বাড়ীর তৈয়ারী শিঙ্গাড়া-কচুরির সহিত অন্যবিধ চর্চ্চায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু যাহাদের কথা চায়ের আসরে নিতান্ত বেমানান হইবে বলিয়া বিজয়নাথ সঙ্কোচে বলিতে চাহেন নাই, তাহাদেরই একজনের জীবনের করুণতম অধ্যায় যে সেই দিনই তাঁহার চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবে এ আশাও বোধ করি তিনি করেন নাই। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটিল তাহাই।

বন্ধুরা বিদায় লইবার পর বিজয়নাথ অন্তঃপুরে আসিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন। গৃহিণী একটি তোলা-উনুনে স্বামীর রাত্রির আহারের জন্য লুচি ভাজিতেছিলেন। এমন সময় বহির্দ্বারে একটা ছেকড়া-গাড়ী দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। এত রাত্রিতে কে আসিল দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া বিজয়নাথের স্ত্রী মন্দা বারান্দার রেলিং ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইল। গাড়ীর মাথায় অনেক মোটঘাট, পোঁটলাপুঁটলি। একটি অবগুণ্ঠনবতী বিধবা আধময়লা কাপড় পরিয়া নামিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছোট ছোট তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে।

সিঁড়ির মুখে আসিয়া তাহারা সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা লুচি ভাজা রাখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনার ছোট ননদ মাধুরী, আমি তারই খুড়তুতো জা। আমাকে হয়ত আপনি চিনবেন না, কখনও দেখেন নি। আমি কিন্তু মাধুরীর মুখে অনেক-বার আপনার গল্প শুনেছি। আমরা যাচ্ছি রংপুরে। সঙ্গে ঠাকুরপো আছেন, আপনার নন্দাই। ট্রেনটা লেট ছিল, গাড়ীবদল ক'রে ছোট-লাইনের গাড়ী ধরবার আর সময় মিলল না, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। তাই ঠাকুরপো বললেন, সেই কাল বেলা ন-টার আগে যখন আর গাড়ী নেই তখন আজ রাত্রিটার মত আপনাদের এখানে থেকে যেতে। তিনি ষ্টেশনে আটকা পড়েছেন, আসছেন।"

মন্দা তাহাদের সমাদর করিয়া কহিল, "তবু ভাগ্যি যে ট্রেন ফেল হয়েছে। নইলে ত আর আমাদের আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হ'ত না। আসুন আসুন, উপরে চলুন। তা আপনার ঠাকুরপো নরেশ আসুক, সে এলে তার সঙ্গে ঝগড়া করব। ট্রেন ফেল হোক বা না হোক এই যখন পথ, তখন তার আমাকে একটা খবর দিয়ে আপনাদের এখানে নামিয়ে অন্ততঃ দিন দুই জিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনার নামটি কি ভাই? চলুন, দাঁড়িয়ে কেন।"

"আমার নাম সুহাস"—সিঁড়িতে উঠিবার পথে মেয়েটি বলিল, বলিয়া একটু ম্লান হাসিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে আসিতে বিজলীবাতির উজ্জ্বল আলোর নীচে তাহার মুখখানি বড় ম্লান ও করুণ দেখাইল। একমাত্র পথশ্রমকেই হয়ত অতখানি বিষণ্ণ করুণতার জন্য দায়ী করা যায় না। তাহার পরিধানের বৈধব্য-বেশের দিকে চাহিয়া মন্দা ব্যথিত চিত্তে মনে মনে কহিল, আহা, বেচারীর এই ত বয়স, এরই মধ্যে কপাল পুড়েছে! উপরে আনিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের জন্য চাকরকে বিছানা করিতে বলিয়া সুহাসকে হাতমুখ ধুইবার জন্য স্নানের ঘরটা দেখাইয়া দিতেছে এমন সময় নীচের তলায় নরেশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "বৌঠান কোথা!"

বাক্স খুলিয়া স্বামীর একখানা ধোয়ানো নরুন-পাড়ের ধুতি বাহির করিয়া সুহাসকে গাড়ীর কাপড়খানা ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়া এবং স্নানের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মন্দা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

বাড়ীতে স্ত্রীলোক-অতিথির অভ্যাগমে বিজয়নাথ উপরতলা ছাড়িয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরেশ ততক্ষণ সেখানে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে এবং পাখার অভাবে পকেট হইতে রুমালটা বাহির করিয়া পাখার মত করিয়া সঞ্চালন করিতে করিতে ক্লান্তিবিনোদনের কিছু চেষ্টা করিতেছে। মন্দাকে দেখিয়া বলিল, "বৌঠান! তুমি ওঁদের চিনতে পেরেছ ত? আমার দূরসম্পর্কের এক জন খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী। আমার সঙ্গে আসাই উচিত ছিল কিন্তু লগেজগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে এত দেরি হয়ে গেল।" বলিয়া বারান্দার এক-পাশে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা জিনিষ-পত্রের রাশি নির্দ্দেশ করিল। বাসনের সিন্দুক, ভাঙা কেম্বিসের খাট, পিঁড়ি, জলচৌকি হইতে সুরু করিয়া গৃহস্থালীর টুকিটাকি সমস্ত প্রকার জিনিষই কতক চটে আচ্ছাদিত হইয়া কতক বা এমনই গাদা করা ছিল। সেই দিকে চাহিয়া মন্দা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "এত জিনিষ! ওঁরা কি গোটা একটা সংসার তুলে নিয়ে যাচ্ছেন না কি?"

নরেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অনেকটা তাই। আজ সাত দিন হ'ল সুহাস-বৌদির স্বামী মারা গেছেন। কলকাতায় সামান্য ভাড়াবাড়ীতে থাকতেন, বাসাতে আর দ্বিতীয় অভিভাবক নেই। কোথায় কার কাছে কেমন করেই বা থাকবেন, তাই আপাততঃ আমাদের ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।" মন্দা ব্যথিত হইয়া বলিল, "মোটে সাত দিন ওঁর স্বামী মারা গেছেন! আহা, কি হয়েছিল?"

নরেশ কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি হয়েছিল সে-কথা বলতেও কষ্ট হয়, শুনতেও তোমার কষ্ট হবে। তাঁর আজ ছ-মাস হ'ল যক্ষ্মা হয়েছিল। শুধু শেষের মাসটাই আপিস যান নি আর বোধ করি দু-এক বার বা ডাক্তারও দেখিয়েছিলেন। বড়সাহেব বোধ হয় দয়া ক'রে এক মাস অর্দ্ধেক মাইনেতে ছুটিও মঞ্জুর করেছিলেন। তার পরে আর কি, এক দিন আস্তে আস্তে সব শেষ হয়ে গেল। বেশী কিছু ব্যাপার না, আয়োজন আর বিস্তৃতিও খুবই সামান্য। পাছে রোগটা প্রকাশ পেলে চাকরি যায়, পাছে সংসার অচল হয়ে যায়, তাই নেহাৎ শেষ অবস্থা অবধি প্রকাশ-দা না নিজের কাছে না পরের কাছে কিছুতেই স্বীকার করে নি যে তার কিছু হয়েছে।"

মন্দা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি চাকরি করতেন তিনি?"

নরেশ উত্তর করিল, "চাকরি খুব সামান্যই। সকাল বেলায় উঠে ছেলে পড়াতে যেত। ফিরে এসে পাড়ার একটা লাইব্রেরিতে বই সরবরাহ করতে যেত। সেখানকার লাইব্রেরিয়ানের কাজ ক'রে মাসে বুঝি গোটা-দশেক টাকা পেত। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে আপিস যেত। কোন্ দিন স্নান হ'ত, কোন দিন বা সময়াভাবে হ'ত না। একটা আপিসে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি করত। ফিরে এসে সন্ধ্যা নাগাদ আবার এক জায়গায় টিউশনি করতে যেতে হ'ত। কলকাতায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয়ে তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হ'লে তাকে যে-ঘরে বাস করতে হয় এবং যা-খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, তার উপর ঐ খাটুনির বহরটা যোগ ক'রে সহজেই বুঝতে পারছ, প্রকাশ-দার কেন যক্ষ্মা হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রকাশ-দার আরও একটা দুর্ব্বহ চিন্তা ছিল। গত বৎসর ছোট বোনটির বিয়ে দিতে হাজার খানেক টাকা দেনা করতে হয়, সেই ঋণের বোঝাও তার এ-জীবনের মেয়াদকে আরও সংক্ষেপ ক'রে আনলে। সুহাস-বৌদির কাছে শুনছিলাম, মাসে মাসে সুদ এবং আসল টাকার কিছু ক'রে দিতেই হ'ত। তাই প্রকাশ-দা খাটুনির উপরে আবার একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টাইপ-রাইটার কিনে রাত্রি জেগে সস্তায় টাইপের কাজ জোগাড় ক'রে তাই করত। তাতেও সামান্য কিছু আয় হ'ত।"

মন্দা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কিসের জন্য করতেন? এই যে অকালে মারা গিয়ে তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়েকে একেবারে অনাথ ক'রে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, এখন তাদেরই বা কি হবে? আর তাঁর ঋণেরই বা কি হবে? এ-কথা ভেবেও তাঁর অমন অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত হয় নি কিছুতেই।"

নরেশ একটুখানি হাসিল, "তাকে আমি দোষ দিতে

পারি নে বৌঠান। ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়াগুলো সারাদিন চাবুকের মার খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যেবেলায় মরিয়া হয়ে ছোটে শেষ বিশ্রামের আশায়। তাদের সে উন্মাদ গতি কখনও দেখ নি। তাই এমন কথা বলতে পেরেছ। একটু আগে ট্রেনে আসতে আসতে তুমি আমাকে এই মাত্র যা প্রশ্ন করলে আমি নিজেকে নিজে ঠিক্ সেই প্রশ্নই করছিলাম, কেন প্রকাশ-দা এমন অসম্ভব অতিরিক্ত পরিশ্রমের তলায় নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললে?...চোখ ফিরিয়ে দেখি সুহাস-বৌদির চোখে জল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—কাল রবিবার নয়? বললাম,—কাল রবিবারই বটে; কিন্তু হঠাৎ একথা কেন? সুহাস-বৌদি নিজেকে সংযত ক'রে বললেন,—প্রত্যেক বারই রবিবারে উনি কাঙালের মত বলতেন, 'আজ রবিবার, নয়? আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে পাব।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সুহাস-বৌদির ঐ একটি কথায় আমি আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম। দিনের শেষে শুধু বোধ করিবা একটু ঘুমাবার আশাতেই সে প্রাণপণ করে চলেছে। চলা যখন ফুরোল তখন ঘাড় গুঁজে সেইখানেই শুয়ে পড়ল। এর পরেও কি হবে বা হ'তে পারে তার অবর্ত্তমানে তার সংসারের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে—এসব ভাববার মত সামর্থ্য তার আর ছিল না।" মন্দা অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, তথাপি কৌতূহলবশত এ প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইতেও পারিতেছিল না। বলিল, "সংসারে আর কি তাঁহার কেউ ছিল না? মা বাবা? তোমাদের জানালেও ত একটা উপায় হয়ত হ'তে পারত শেষ পর্য্যন্ত।"

নরেশ কহিল, "দরিদ্রের আত্মসম্মান জিনিষটা বড় তীব্র ও অসহিষ্ণু। ঘুণাক্ষরেও সে আমাদের কাছে তার অভাব-অভিযোগের কথা কখনও বলে নি। সংসারেও তার বিশেষ কেউ নেই। বাবা ছোট বেলায় মারা গেছেন। মা আছেন, কাশীবাস করেন। তাঁকে মাসে ছ-টি করে টাকা প্রকাশ-দাকেই নিয়মিত পাঠাতে হ'ত। গাঁয়ে যা হোক একটা ভদ্রাসন ছিল, মেজবোনের বিয়েতে বাঁধা দিয়ে বিয়ের খরচ যোগাড় হয়। সে-বাড়ী আর প্রকাশ-দা ছাড়াতে পারে নি। অনেকটা সেই ক্ষোভেই খুড়ীমা কাশীবাসিনী হয়েছেন—ছেলের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে।"

মন্দা বলিল, "যাই বল ভাই প্রকাশবাবুর অবস্থা যখন এত খারাপ তখন তোমার খুড়ীমার কিছুতেই তাঁর ঘাড়ে তাড়াতাড়ি একটি বৌ চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয় নি। অত অল্প আয়ে ঐ সর্ব্বনেশে বোঝা তাঁকে বহন করতে না হ'লে হয়ত এমন ঘটত না।"

নরেশ হাসিল, "হায় রে, বাঙালী-ঘরে তেমন আয় নেই ব'লে মা-বাপে ছেলের বিয়ে দিতে দেরি করছে এমন দৃশ্য কোথাও কখনও দেখেছ বৌঠান? সংসারের এই যূপকাষ্ঠে বাঙালীর কতখানি গেছে আর রোজ কত যাচ্ছে সে তিল তিল ত্যাগের খবর কেউ রাখে কি না জানি নে। কিন্তু কোন একটা বড় শক্তি, বড় প্রতিভা এই নিরর্থক পঙ্গু, ত্যাগের ক্ষেত্র থেকে টেনে যদি তাদের তুলতে পারে, তাহ'লে এই বিরাট শক্তি দিয়ে অনেক কিছু কাজই হওয়া সম্ভব।"

বিজয়নাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ নরেশ। এই কথাটা আমি আমার জীবনেও অনেকবার অনেক রকমে দেখেছি। আজ আরও একবার নূতন ক'রে দেখলাম। এই নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এই ঘরে বসেই আমার বন্ধুরা তর্কে তর্কে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বোঝাতে পারছিলাম না ঠিক, কিন্তু তোমার কথাগুলি যা এই মাত্র বললে বড় ব্যথার সঙ্গে স্মরণ করছিলাম।"

নরেশ হাতের রুমালটা রাখিয়া বলিল, "সারাদিন যা শ্রান্তি গেছে, এক পেয়ালা চা দাও বৌঠান। এই ত ভার নিয়ে যাচ্ছি, বাড়ীতে আবার কি রকম অভ্যর্থনা পাব জানি নে। মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরের অনিবার্য্য অভাব ও সেই হেতু সঙ্কীর্ণ অনুদারতার কথা, সব না জানো কিছু কিছু তো জানই। কিন্তু সে পরের কথা, যাই হোক, এখন উপস্থিত এক পেয়ালা চা না পেলে কিছুতেই ত চাঙ্গা হতে পারছিনে।" মন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত অবরুদ্ধ ক্লেশ সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাই আমি এখনই চা তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিই। দেখি সুহাসেরও বোধ হয় এতক্ষণ কাপড় ছাড়া হয়েছে। ওর ত অশৌচ যাচ্ছে, ফল আর দুধ ছাড়া বোধ হয় কিছু খাবে না।"

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

হংকং থেকে হুড়োহুড়ি ক'রে জাহাজে ফিরে এসে দেখলাম সহযাত্রী ও যাত্রিণীরা কেউ ফিরে আসেন নি। রাত ১১টা পর্য্যন্ত তাঁদের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটা আগে জানতে পারি নি, কাজেই আমাদের অনেকটা সময় জাহাজের খোলে মাটি হ'ল।

খানিক পরে দেখি আশেপাশের কেবিনে কুলিরা সব আলমারির মত বড় বড় কাঠের বাক্স এনে ঢোকাচ্ছে। রে এক-একটা বাক্সতে এক-একটা কেবিনের সব উদ্বৃত্ত জায়গাটুকুই ভরে যায়। মনে করলাম হয়ত বড় রকম কেউ যাত্রী আসছেন। পরে জানা গেল হংকঙের বাজারে চীনাদের কাঠের কাজ খুব সস্তায় পাওয়া যায়, তাই মেমসাহেবরা বাক্স কিনে তাকে আবার অন্য বাক্সে প্যাক ক'রে জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাক্সর ডালায় এবং চার পাশে সুন্দর কারুকার্য্য।

অনেক রাত্রে পাশের কেবিনের মেমসাহেবরা ফিরে এসে আমাদের দরজায় ধাক্কা দিতে সুরু করলেন। বেরিয়ে শুনলাম তাঁরা চাবির অভাবে নিজেদের ঘরে ঢুকতে পারছেন না। ভৃত্যদের কাছে চাবি জমা দেওয়া ছিল, তারা বোধ হয় সেগুলো পকেটে ক'রেই ডাঙায় হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছে। আমাদের চাবি দিয়ে দরজা খুলতে অনেক চেষ্টা ক'রেও খোলা গেল না। বেচারীরা সারাদিনের শ্রান্তির পর খাবার ঘরের চেয়ারে খাড়া হয়ে ব'সে কতক্ষণ থাকবে? অকস্মাৎ একজন কার শুভ বুদ্ধির উদয় হ'ল। সে নিজে থেকে এসে বলল যে চাকরেরা তার কাছে চাবি রেখে গিয়েছে, এঁরা এসেছেন জানলে সে আগেই চাবি নিয়ে আসত।

২৮শে জানুয়ারী আমরা ফরমোসা দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে পড়লাম। এখানেও সমুদ্র আবার মলাক্কা প্রণালীর মত স্থির, ঠিক যেন তেলের উপর জাহাজ ভাসছে। বোধ হয় আমরা ফরমোসা প্রণালীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। প্রণালীতে এলেই বুঝি সমুদ্র নদীর কি হ্রদের মত স্থির হয়ে যায়! জলের রং এখানে ফিকে সবুজ।

আকাশে এত মেঘ করেছে যে কোথাও একটু ফাঁক দেখা যায় না। মনে হচ্ছে সমুদ্রের উপর কে বড় একটা ঢাকনা-বাটি উল্টে দিয়েছে। পরিষ্কার দিনে আকাশের স্বচ্ছতায় এরকম মনে হয় না।

বেলা ২টার পর ডেকে এসে দেখলাম আবার নৌকায় নৌকায় সমুদ্র ছেয়ে গেছে। বেশীর ভাগ পাল ব্রাউন রঙের। কয়েকটা কমলা রঙেরও আছে। এক-এক নৌকায় তিনটে ক'রে পাল। পালের হাওয়ার ভরে নৌকা দুলে দুলে চলেছে। জাহাজের চেয়ে কত বেশী সুন্দর দেখতে। মনে হয় যেন মস্ত মস্ত সব জলচর জীব মাছ কি পাখী সমুদ্রের উপর গা ভাসিয়ে ছুটে চলেছে। পাশ দিয়ে একটা জাহাজ গেলে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া ফেলে ছুটে দেখতে আসে, কিন্তু এমন সুন্দর নৌকা ঝাঁক বেঁধে চলেছে, কেউ একবার দেখতে আসে না। শীতের হাওয়া না থাকলে ডেকে বসে সারাদিন এদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। এরা মানুষের মন এমন ক'রে টানে যেন এদেরও প্রাণ আছে।

হংকঙের চেয়ে এখানে শীত কম। কিন্তু জাহাজের আইনমত আজকের তারিখ থেকে বোধ হয় ঘর গরম করা নিয়ম। তাই পাইপের ভিতর দিয়ে গরম হাওয়া চালিয়ে সব ঘর গরম করা সুরু হয়েছে। ভিতরে এখন ঠাণ্ডা প্রায় লাগেই না। আমাদের কেবিনের ভিতর দিয়ে বড় পাইপটা গিয়েছে ব'লে রাত্রে ঘরে এমন গরম আর গন্ধ হয়ে উঠেছিল যে ঘরে ঢুকেই মাথা ধরে গেল। এমন গরমের চেয়ে শীত ঢের ভাল। শেষে বয়কে ডেকে পাইপ বন্ধ করিয়ে আধ ঘণ্টা বাইরে বসে থেকে তবে শুতে পেলাম। তবুও এত গরম ছিল যে কম্বলটা পায়ের উপর ফেলে রেখেই কাজ চলে গেল। তার আগের রাত্রে

ঘর গরম করা হয় নি ব'লে দুটো কম্বলে নাক পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়েও মনে হচ্ছিল নাক-মুখ দিয়ে গায়ের ভিতর ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে।

জাহাজে বোধ হয় ঘর গরম করার মত গরম পোষাক পরারও নির্দ্দিষ্ট দিন আছে। সেই তারিখের আগে শীত লাগলেও সুতোর কাপড় পরে নাবিক ও কর্ম্মচারীরা ঘোরে। এসব বিষয়ে এখানে "অচলায়তনে"র মত প্রথা।

তার পরদিন ১০টা আন্দাজ শুনলাম লুচু দ্বীপপুঞ্জের কাছ দিয়ে চলেছি। কাল সমুদ্র যেমন শান্ত ছিল আজ তেমনই উন্মত্ত নৃত্যে মেতেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, ফেন-ভূষণ তরঙ্গগুলি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছে। হাওয়ার তাড়নায় চূর্ণ ফেনা সাদা ধোঁয়ার মত উড়ে মেঘের বুকে গিয়ে লাগছে। জাহাজ দুলছে যেন একবার স্বর্গের দরজায় ধাক্কা দিয়েই আবার পাতালের গহ্বরে ছুটে নেমে যাচ্ছে। রেলিং না ধ'রে এক পা হাঁটা যায় না। ডেকে নদীর মত জলস্রোত বয়ে চলেছে। হাওয়া যেমন ভীষণ জোরালো, শীত তেমন নেই। অসংখ্য ক্রুদ্ধ দানব যেন কেশর দুলিয়ে মুখে ফেনা তুলে সগর্জ্জনে যুদ্ধে নেমেছে। বঙ্গোপসাগর কিংবা চীন সাগরও এতটা ক্ষেপে নি। কেউ কেউ বলছেন এইটা এখানকার সব চেয়ে ঝোড়ো সময় (roughest time)। তাই শাংহাইয়ের ঝোড়ো পথ ছেড়ে দিয়ে ওরই মধ্যে একটু ভাল পথে এরা সোজা কোবের দিকে চলেছে। মাঝ রাত থেকেই এই সাগর-তাণ্ডব সুরু হয়েছিল বোধ হয়। রাত্রে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি অকস্মাৎ বরুণদেবের এক অনুচর ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আমার গায়ে এক কলসী জল ঢেলে দিয়ে গেলেন। শীতের দিনে যা আরাম লেগেছিল বলবার নয়। বরুণের এই অনুচরগুলি যখন ক্ষেপে সত্যি মনে হয় তাদের প্রাণ আছে। জাহাজের মুখের কাছটায় উল্টা হাওয়া আর এঞ্জিনের ঠেলার সংঘর্ষে সারাক্ষণ শুভ্র ফেনা এবং ফেনচূর্ণে মেঘলোক হয়ে আছে। সমুদ্রমন্থনে এই রকম ক'রে মাখন তোলা হয়েছিল বোধ হয়।

জাপান পৌছতে আর বেশী দেরি নেই। দু-তিন দিন মাত্র বাকী। মালে যে জাহাজের পেট বোঝাই! সেই সব ত কোবেতে নামাতে হবে। কাজেই জাহাজে নানা রকম কাজের ঘটা লেগে গিয়েছে। জাপানে ডেক-প্যাসেঞ্জার যেতে আসতে দেয় না। সুতরাং ডেকগুলো একেবারে খালি। সেখানে দড়ি কাছি পাকানো চলছে, ছুতোরেরাও কাজ করছে। খোলা ডেক পেয়ে যাত্রীরাও খুব ডেক-গাল্‌ফ খেলায় মন দিয়েছেন। আমি আগে বিশেষ খেলি নি, কিন্তু এখন দেখলাম একটু চেষ্টা করলেই প্রথম হওয়া যায়।

৩১শে আমরা জাপান দ্বীপমালার পায়ের কাছে এসেছি। সকাল থেকেই অনেক পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এগুলি সব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের পাহাড়। অধিকাংশের নাম জাপানের ম্যাপে নেই। বেলা দশটায় আমরা একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির খুব কাছে এসে পড়লাম। তার নাম কুচিনো য়্যারাবু সীমা। জীবন্ত ব'লে অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। মাথার উপর এত মেঘ যে কোন্‌টা ধোঁয়া আর কোন্‌টা মেঘ বোঝা শক্ত। তবে মনে হচ্ছে পায়ের কাছ দিয়ে একটা সরু ধোঁয়ার রেখা বেঁকে বেঁকে চলেছে—রং তারও মেঘের মত, তবে সেটা স্থির নয়, চলন্ত। সাড়ে দশটার পর থেকে দুই দিকেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জাহাজের ম্যাপে এইখানকার দ্বীপগুলির নাম আছে। নিজেদের দেশ সম্বন্ধে সব মানুষেরই উৎসাহ বেশী হয়, জাপানীদের ত কথাই নেই। দেশের কাছে আসতেই এরা নিজেরা নূতন ক'রে বড় ম্যাপ এঁকে জাহাজের পথ এঁকে ক'টায় কোন্ দ্বীপের কাছ দিয়ে যাচ্ছি সব লিখে টাঙিয়ে দিয়েছে। অন্য দেশের সম্বন্ধে এরকম আঁকা কি লেখা কোনও দিন টাঙাতে দেখি নি। জাহাজের পথের দুপাশেই অনেক আগ্নেয়গিরির নাম ম্যাপে লেখা আছে। তবে চোখে দেখে কোন্ পাহাড়টা কি কিছুই বোঝা যায় না। সব পাহাড়ের মাথায় মাথায়ই মেঘ ভাসছে।

সমুদ্র বেশ শান্ত, শীত খুব বেশী নয়। যাত্রীরা সব হোটেল, জাহাজ ইত্যাদির তালিকা নিয়ে পরামর্শে ব্যস্ত। কে কোথায় নামবে, কোথায় থাকলে কম খরচ হয়, জাহাজে ক'দিন ঘুমোতে পেলে কত পয়সা হোটেল ভাড়া বাঁচান যায় ইত্যাদি নানা আলোচনা চলেছে।

দেশের কাছে এসে জাহাজের লোকজন মহা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। রাঁধুনী, বয় সবাই খালি ছুটে ছুটে ম্যাপ আর ঘড়ি দেখছে। প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত জাহাজ দিনে যতটা ক'রে চলেছে, কাল বাড়ী পৌঁছবার উৎসাহে তার চেয়ে অনেক বেশী দৌড়েছে। এক দিন এক রাতে ২৮৫ মাইল এসেছে।

২রা ফেব্রুয়ারী সকালে আমাদের জাহাজ জাপানের কোবে বন্দরে লাগল। ডেকে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া, জাহাজের কেবিনের ভিতর গরম হাওয়া দিয়ে গরম ক'রে রেখেছে, উপরে মানুষ সহজে যেতে চায় না। ডেকের দিকের দরজাগুলো বন্ধ করে যাত্রীরা সব ভিতরে ব'সে ছিল কাল সারাদিন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই জাপান পৌঁছবার উৎসাহে সবাই শীত ভুলে মোটা মোটা কোট প'রে, কেউ বা কম্বল নিয়ে ডেকে এসে হাজির হয়েছে। পাহাড়ের উপর বরফ পড়া আমি কখনও দেখি নি শুনে আমাদের জাপানী সহযাত্রী আমাকে ডেকে দেখালেন দূরে পাইন গাছে ঢাকা পাহাড়ের মাথায় বরফ রূপার রেখার মত গড়িয়ে গড়িয়ে যেন পড়ছে। অবশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরতুষারাবৃত মূর্ত্তি আমি অনেকবার দেখেছি। কিন্তু গাছপালার উপর বরফ পড়া ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি।

যে-ডেকটা তীরের দিকে সেই খানেই ভীড় বেশী। জাহাজ ঘাটে লাগবার আগে থেকেই তীরের কত লোক রুমাল টুপি নেড়ে বন্ধুদের সাদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন। আমি আশা করেছিলাম দেখব সবাই কিমোনো আর কাঠের জুতা প'রে সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু হতাশ হয়ে দেখলাম পুরুষরা অধিকাংশই সাহেবদের মত কোট প্যান্ট বুট হ্যাট ওভারকোট ইত্যাদিতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে হাজির। ঘাটে মেয়ে বেশী নেই, রক্ষা এই যে, যে কয়েক জনকে দেখতে পেলাম তারা কেউ বিদেশী পোষাক পরেন নি। সকলেই কিমোনো প'রে ও পায়ে কাঠের জুতা আর আঙুলচেরা মোজা প'রে খাঁটি স্বদেশী পোষাকে হাজির। জাপানী খোঁপার পঙ্খটি কিন্তু তাদের মাথায় নেই। আমাদের দেশের আর্টিষ্টদের আঁকা অজন্তার সুন্দরীদের বেশভূষার মত এই পঙ্খটিও প্রায় লোপ পেয়েছে। তবু দেখলাম দুটি মেয়ের মাথায় এই রকম ফাঁপানো খোঁপা। জাপানে যা দেখব মনে ক'রে এসেছিলাম প্রথম দিনেই মনে হ'ল জাপান ঠিক সে রকম নয়।

জাপানে মাঘ মাসের শীত আমাদের একেবারে কুলফি মালাইয়ের মত জমিয়ে দেবে এই রকম ভয় দেশ থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম। পথে বরফের উপর ছাড়া পা দেওয়া যাবে না, হাতে দস্তানা না দিলে আঙুল ফেটে যাবে ইত্যাদি মনে ক'রে এসে দেখলাম পথে একটুও বরফ পড়ে নেই এবং হাতদুখানাও খুলে রাখা চলে। কিন্তু জাপানীরা আমাদের চেয়ে ঢের সাবধান, তারা পায়ে ত মোটা মোটা বুট পরেইছে, হাতেও গরম দস্তানা আছে, তার উপর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সিকি ভাগের নাক মুখও অনাবৃত নয়। চামড়ার একটা ঠুলির ভিতর তুলা ও ন্যাকড়ায় ওষুধ দিয়ে চশমার মত ক'রে কানে দড়ি বেঁধে সব নাক ও মুখ ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। জাপানীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাত বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কাছে সৌন্দর্য্যকে বোধ হয় তারা বড় ভাবে না। তা না হ'লে সুন্দরী তরুণীরা পাউডার, লিপষ্টিক, রুজের উপর নাকে মুখে ঠুলি দিয়ে রাখত না। আমাদের দেশের অনেক মেয়ে খারাপ দেখাবার ভয়ে চোখে চশমা পর্য্যন্ত পরতে চায় না। আমাদের জাপানী সহযাত্রীটির জাপানের শীতের উপযুক্ত কোট বোধ হয় সঙ্গে ছিল না। জাহাজ ঘাটে পৌঁছতেই তাঁর এক বন্ধু দেখলাম ডাঙা থেকে একটা বিরাট কোট ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। জাহাজে পাসপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষার পর আমাদের দশটার সময় ডাঙায় নামতে দিল।

ডাঙায় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছোট মাপের রিক্‌শ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দেখেই চালকেরা ছেঁকে ধরল। আমরা যখন কোন প্রকারে দর ঠিক ক'রে চড়তে যাচ্ছি, তখন দেখি জাপান-প্রবাসী সিন্ধী ভদ্রলোকেরা আমাদের দিকে অতি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। এক জন বললেন, "ট্যাক্সি এখানে খুব সস্তা।" বুঝলাম আমরা এখানে নূতন কিছু করছি, এখানে লোকে রিক্‌শ বিশেষ চড়ে না। যাই হোক, তাদের কথা

দেওয়া হয়ে গিয়েছে ব'লে আমরা আর বদল করলাম না।

এদেশের টাকা পয়সা যথেষ্ট যোগাড় করা ছিল না, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আবার যথারীতি যেতে হ'ল টমাস কুকের কাছে। তারা টাকা-পয়সা বদলে দিল এবং কত টাকায় কত দূর বেড়ানো যায় তারও একটা হিসাব বুঝিয়ে দিল। সে-হিসাবটা গরীব বাঙালীদের পকেটের পক্ষে খুব সস্তা নয়। সুতরাং আপাতত ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে চল্‌লাম স্বদেশী খাদ্য কোথাও পাওয়া যায় কি না তারই সন্ধানে। জাহাজে অখাদ্য খেয়ে খেয়ে প্রাণ প্রায় জিহ্বার কাছে এসে হাজির হয়েছিল, কাজেই আজ তাকে একটু আরাম দেওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। দেশে থাকৃতে শুনেছিলাম কোবে শহরে ইণ্ডিয়া লজ বলে একটা বাড়ীতে ভারতীয় ছাত্রেরা থাকে এবং ভারতীয় খাদ্য খেতে পায়। সেইখানেই যাব মনে ক'রে আমরা পথে বেরলাম।

হাঁটা পথে মানুষের ভীড় নেই, কেবলই ট্যাক্সি, বস্‌ ট্রাম চলেছে, মাঝে মাঝে সাইকেলের পিছনে জিনিষ নিয়ে পিওন ছুটেছে, মোটর সাইকেল ও সাধারণ সাইকেলের পিছনে গাড়ী লাগিয়ে বোধ হয় ফিরিওয়ালা কিংবা দোকানের যোগানদারেরা চলেছে। সকলেই চুপচাপ, কোনও গোলমাল নেই। পথে কেউ ঝগড়া করছে না, জটলা করছে না, মারামারি গল্পগাছা কিছুই করছে না; সবাই চলেছে নিজের নিজের কাজে। এরা যেন কথা বলতে জানে না, অথবা সবাই সবাইকার অপরিচিত।

রাস্তাঘাট পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, পথের ধারে ধারে কোথাও টবে কোথাও মাটিতে গাছ বসান। পাইনজাতীয় গাছগুলি সবুজ, চেরিফুলের গাছে প্রাণের কোনই লক্ষণ নেই। তাতে না-আছে পাতা না-আছে ফুল, না-আছে কুঁড়ি। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মনে করেছিলাম শীত তেমন বেশী বোধ হয় নয়, কিন্তু পথে বেরিয়ে দেখলাম এত পোষাক-আসাকের উপর কম্বল মুড়ি দিয়েও একটু অসোয়াস্তি লাগছে। ওভারকোটের গলার লোমের কলারটা মাথার উপর ঘোমটার মত চাপা দিয়ে তবে বসা যায়।

কোবের বড় রাস্তা গুলি কয়েকটা সমতল, কতকগুলি পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে; সরু রাস্তাগুলি আরও উঁচু নীচু, যেমন পার্ব্বত্য দেশে হওয়ার কথা। এই রকম একটা সরু রাস্তায় কাঠের সরু সরু তক্তার দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ীতে ইণ্ডিয়া লজ মনে করে আমরা এসে হাজির হ'লাম। দেখলাম সেটা "ইণ্ডিয়া" নয় "ইষ্টার্ণ-লজ" নামক একটি ভারতীয় হোটেল। তার কর্ত্তা এক জন পার্শী ভদ্রলোক, ইনি এক সময় কলকাতাতেও ছিলেন। তিনি আমাদের খুব যত্ন-আদর ক'রে বসিয়ে এক ধারে আগুন আর এক ধারে বৈদ্যুতিক হিটার জ্বালিয়ে দিলেন, আমাদের তৎক্ষণাৎ চা এবং আমার কন্যাকে দুধ আনিয়ে দিলেন এবং ভারতীয় বন্ধুদের টেলিফোনে আমাদের আগমন-সংবাদ দিলেন। তাঁর হোটেলের পরিচারিকারা আমাদের জন্য জাপানী টিকিট কিনে চিঠিপত্র সব ডাকে দিয়ে দিল। হোটেলে যারা কাজ করছে তারা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক, এক জন মাত্র পুরুষকে একবার দেখলাম। এই মেয়েগুলি সব ভারতীয় মেয়েদের মত রুটি লুচি বেলে ভেজে ডাল তরকারি বেঁধে আচার চাটনী ক'রে ভারতীয়-দের খাওয়ায়। আমরা প্রায় এক মাস জাহাজের খাবার খেয়ে এসেছি, কাজেই দিশী খাবার অর্ডার দিলাম। কিন্তু আপিস-ঘর ছেড়ে খাবার-ঘরে গিয়ে বসা যায় না, ঠিক ষ্টোভের পাশেই যদি বসা যায় তবেই আরাম, না হ'লে হাত পা যেন জমে আসে। শীতের চোটে মনে হচ্ছে এদেশে না এলেই হ'ত, একটা মাস এই রকম করে কাটানো বড়ই শক্ত হবে।

যাই হোক, উপায় যখন নেই সহ্য করতে হবে। দেখতে দেখতে সেখানে অনেকগুলি সিন্ধী, গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী যুবক এসে হাজির হলেন। এঁরা সকলেই এখানে খাওয়া-দাওয়া করেন, অনেকে এই বাড়ীতেই থাকেন। এঁদের এদেশে বাস ব্যবসায় উপলক্ষ্যে, আমদানি আর রপ্তানির কাজেই এঁরা ব্যস্ত। দুঃখের বিষয়, এখানে এক জনও বাঙালী দেখলাম না। যাঁরা এদেশে সপরিবারে থাকেন এমন অনেক সিন্ধী, গুজরাটী, পার্শী ও মুসলমান ভদ্রলোককে পরে দেখলাম, কিন্তু বাড়ী নিয়ে আছেন

সেকালের জাপানী খোঁপা
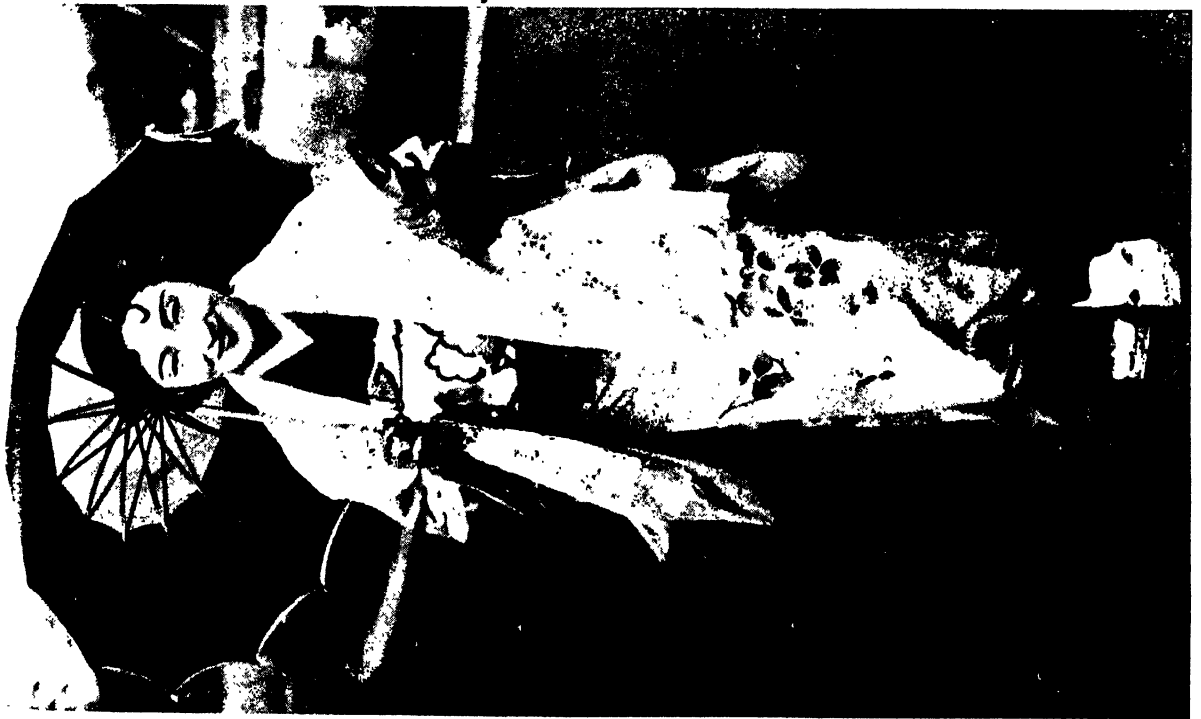
শোভন কিমোনো পরিহিতা জাপানী তরুণী

জাপানে পশুচারণ

বেপ্পো পাহাড়

এমন বাঙালী কোবে শহরে মাত্র এক জনকেই দেখা গেল। ছাত্র ধরণের আরও দু-এক জন বোধ হয় আছেন শুনেছি, কিন্তু তাঁদের আমি দেখি নি।

দাস মহাশয় এখানকার বহুকালের বাসিন্দা, ২০।২২ বৎসর জাপানেই আছেন। তাঁর কথা আগেই জানতাম। টেলিফোনে আমাদের খবর পেয়ে তিনিও অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন। তাঁর সাহায্য না পেলে জাপানে কিছু দেখাশুনা করা আমাদের শক্ত হত, কারণ আমরা ভাষাও জানি না, পথঘাটও জানি না। অবশ্য, পথঘাটের চেয়ে ভাষাটাই বেশী প্রয়োজনীয়, কারণ ভাষা না জানলে খাদ্য, পানীয়, পথঘাট কোন কিছুরই খোঁজ করা যায় না। খাওয়া দাওয়ার পর হোটেলের বরফের মত ঠাণ্ডা শয়ন-কক্ষে গিয়ে খানিক বিশ্রাম ক'রে আমরা বেড়াতে বেরোব ঠিক হ'ল। কিন্তু একটা এতটুকু বৈদ্যুতিক হিটারে ঘর মোটেই গরম হয় না দেখে শোবার চেষ্টা ছেড়েই দিলাম। যেখানে জানালা দিয়ে এক টুকরা রোদ এসে ঘরের ভিতর পড়েছে সেইখানে একটা চেয়ার টেনে পায়ের কাছে হিটারটা রেখে নূতন দেশের পথঘাট বাড়ীঘর দেখতে লাগলাম। খুব কাছাকাছি সব ছোট ছোট বাড়ী, উপরে কালো টালি দিয়ে ঢাকা, দেয়াল কাঠের, বাঁশের কঞ্চির কিংবা গাছের বাকলের। ভিতরের দেয়ালগুলি কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। কোথাও সুচিত্রিত মোটা কাগজ চার পাশে সরু কালো ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো, কোথাও বা ছয়-সাত ইঞ্চি দূরে দূরে চৌখুপির মত সরু সরু কাঠের খোপ কেটে ট্রেসিং পেপারের মত পাতলা কাগজ দিয়ে খোপগুলি ঢাকা। মানুষ হাঁটু গেড়ে বসলে তার চোখ যতখানি উপরে আসে এই পাতলা কাগজের দেয়ালের ঠিক সেইখানে দুটি করে কাচ বসানো থাকে, বাহিরটা দেখবার জন্য। কোন কোন দেয়ালে ঐখানটার সবটাই কাচের হয়। জাপানীরা মেজের উপর হাঁটু গেড়েই বসে, কাজেই কাচগুলির উচ্চতা এই মাপের। ঘরের যেদিকে বেশী আব্রু দরকার কিংবা কথাবার্তা শোনা যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সেই দিকেই মনে হল মোটা কাগজের দেয়ালগুলি থাকে, আর বাকী সব

দিকে চৌখুপি কাটা সরু কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাগজের দেয়াল। এই দেয়ালগুলির আরও একটি বিশেষত্ব আছে যে এরা সবাই দরকার মত সরে যেতে পারে। এদেশে ঘরের আলাদা দরজা প্রায় নেই। সব দেয়ালই দরজা মনে হয়, যখন যেটাকে প্রয়োজন পাশের দিকে ঠেলে আর এক দেয়ালের গায়ে রেখে দেওয়া যায়। দরজা সামনে পিছনে খোলে না ব'লে দরজা খোলার জন্য এদেশে বাড়ীর খানিকটা ক'রে স্থান অপব্যয় বেঁচে যায়। ঘরের দরজা দেয়াল, আলমারির দরজা, সবই পাশের দিকে সরে আর একটা দেয়ালের অথবা দরজার গায়ে মিলিয়ে যায়। ঘরের মেজেগুলি খাটের গদির মত পুরু পুরু মাদুরের গদি দিয়ে ঢাকা। মাদুরের গদি বসাবার জন্য ঘরের মেঝেতে সেই মাপের গর্ত্ত করা থাকে, বছরে একবার গদিগুলি তুলে গর্ত্তটা পরিষ্কার করা হয় শুনলাম। এদেশে ঘরের মাপ বলার নিয়ম কয় হাত বা কয় গজ লম্বা চওড়া বলে নয়, কয় মাদুরের ঘর তাই উল্লেখ করে। চার মাদুরের ঘর, ছয় মাদুরের ঘর—এই সব সাধারণ ঘরের মাপ। এক-একটা মাদুর লম্বায় সাত-আট ফুট ও চওড়ায় দু-আড়াই ফুট। সুতরাং এ-দেশে ঘর অধিকাংশই এক-শত স্কোয়ার-ফুটের চেয়ে ছোট হয়। বাহিরে তাকিয়ে দেখলাম সব বাড়ীই এই রকম দাহ্য পদার্থে তৈরি নয়। অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী পথে দেখেছি, এখনও দেখলাম, তারা কেউ আট-তলা, কেউ দশ-তলা—সব আগাগোড়া কংক্রিটে তৈরি। ছোট পাকা বাড়ীও আছে। এই সব বাড়ী আজকাল খুব তৈরি হচ্ছে। তের বৎসর আগে ভীষণ ভূমিকম্পের সময় জাপানে যে প্রলয় অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, তার পর থেকে এ-দেশের অনেক শহরেই নিয়ম হয়েছে যে কাঠের বাড়ী ভেঙেচুরে গেলে তার জায়গায় সব পাকা বাড়ী করতে হবে। আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি অনেকটা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু এতে জাপানের আসল চেহারাই বদলে যাবে। জাপান দেখতে দেখতে আমেরিকা হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই জাপানের ওসাকা শহর দেখে অনেক আমেরিকা-ফেরৎ লোক বলেন, এ একেবারে আমেরিকান শহর হয়ে গিয়েছে।

হোটেলের ঘর থেকে দেখলাম পথে জাপানী ঝিরা রঙীন কিমোনোর উপর সাদা এপ্রন প'রে কাঠের জুতা পায়ে দিয়ে খট্‌খট্ ক'রে বেড়াচ্ছে। একটি পার্শী মহিলা লাল শাড়ী প'রে বাগান-ঘেরা ছোট একটি বাড়ীতে ঢুক্‌ছেন, নাকছাবি-পরা একটি সিন্ধী মেয়ে ফ্রক প'রে একলাই কোথায় যেন চলেছে, দেখে নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হ'ল না। পথে মানুষ বেশী নেই, কোলাহল একেবারেই নেই।

কোবের থেকে তিন-হাজার ফুট উপরে রোক্কোসান নামক একটা পাহাড় এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে। গরম কালে এখানে লোকের ভীড় হয় দারুণ। আমরা শীতের দিনে এসেছি, কাজেই শীতেই পাহাড় দেখতে যাব ঠিক হ'ল। পথে দু-বার বস্ বদ্‌লে যেতে হবে। আগে এখানে মোটরে ক'রে যেতে হ'ত, যেতে লাগত সাড়ে-তিন ঘণ্টা সময়। কিন্তু জাপানীরা সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং সৌখীন জাত, কাজেই তাদের দেশের যত beauty spot (সুন্দর জায়গা) আছে সবগুলিকে তারা যথাসাধ্য সুগম্য ও সুরক্ষিত ক'রে তুল্‌ছে। এখন এই দীর্ঘ পথ শূন্যে ঝোলান বৈদ্যুতিক খাঁচায় ক'রে এগার-মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়।

পথে বেরিয়ে আমরা বস্ ধরলাম। প্রাচীন চিত্রের চূড়া খোঁপা ও রঙীন পাখা ফেলে জাপানী মেয়েরা যে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছে তা বাইরে পা দিয়েই বোঝা গেল। যাত্রীদের মধ্যে অর্দ্ধেক মেয়ে এবং বসের কনডাক্টার বিলাতী ইউনিফরম্-পরা কাঁধে ব্যাগ হাস্যমুখী একটি জাপানী মেয়ে। যত বার গাড়ী থামছে সে তড়াক ক'রে নেমে দাঁড়াচ্ছে, সব যাত্রীর ওঠা-নামা, সকলের টিকিট নেওয়া দেওয়া হ'য়ে গেলে তবে সে উঠে গাড়ী ছাড়তে দিচ্ছে। বিদেশী কি অথর্ব্ব মানুষ দেখলে ওই ছোট্ট মানুষটি আবার তাকে ধরে তুল্‌ছে। বস্ চল্‌তে চল্‌তে কাউকে উঠতে কি নাম্‌তে দেখলাম না। এই বস্ বদ্‌লে আর একটায় চড়ে দেখলাম সেখানেও একটি মেয়েই এই কাজে রয়েছে। ঝোলান গাড়ীর টিকিট কিনলাম, তাও মেয়েদের কাছে। ক্রমে বুঝলাম এ-সব কাজ মেয়েদেরই একচেটিয়া। পুরুষেরা গাড়ী চালিয়েই খালাস, যাত্রীদের

মায়া পাহাড়

সুবিধা-অসুবিধা, টিকিট কাটা পয়সাকড়ির হিসাব সব মেয়েদের হাতে।

'বসে' এ-দেশে দারুণ ভীড়। যদি এক দলের মানুষ পাশাপাশি না-বসে, তবে নামবার সময় পরস্পরকে খুঁজে এবং টেনে বার করাও শক্ত। গায়ে গায়ে মানুষ ত ব'সে থাকেই, তার পর দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝোলে দু-সারি। ভাগ্যিস্ দারুন শীত, না হ'লে ভারী ভারী ওভারকোট প'রে অতগুলো মানুষ একটা বন্ধ গাড়ীতে হয়ত সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে মরে যেত। আমরা নূতন মানুষ ব'লে কিনা জানি না, নামবার সময় সর্ব্বদাই 'বসে'র মেয়েটি আমরা সবাই নেমেছি কি না দেখে তবে গাড়ী ছাড়তে দিত। তদুপরি 'বস' থেকে নামবার সময় তাদের দেশীয় প্রথায় সৌজন্য জানাতে কখনও ভুলত না। এ-দেশে এই একটা কারণে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকতে হয়। উঠতে বসতে সামনে পিছনে ট্রামে 'বসে', ট্যাক্সিতে ট্রেনে, দোকানে বাজারে সর্ব্বত্রই লোকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমাদের মত অভ্যাস নেই ব'লে অনেক সময় ফিরে তাকাতে ভুলে যেতাম।

শূন্যে দোলানো ট্রেন তারের উপর ঝুলতে ঝুলতে ছুটল। নীচে পড়ে রইল পাহাড়-পর্ব্বত, ছোট ছোট ঝরণা, পায়ে-হাঁটা পাকদণ্ডীর মত পথ, চওড়া মোটরের রাস্তা, দার্জ্জিলিঙের মত গভীর খাদ ও পাইন বন, আর মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী ও সমাধিক্ষেত্রে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। অনেক গাছ পত্রহীন কঙ্কালসার, কিন্তু পাইন ও ফার-জাতীয় বড় বড় গাছে কাঁটা কাঁটা সবুজ পাতায় ভর্ত্তি। মোটের উপর তাই পাহাড়গুলো অনেকটা সবুজ দেখায়। সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে পাথরের তোরণ, পাথরের আলো, পাথরের ঘট—এই জাতীয় জিনিষ খুব ভারী ক'রে কেটে বসানোই বেশী চোখে পড়ে।

শীতের দিন ব'লে খাঁচাগাড়ীতে বেশী ভীড় ছিল না। বেড়াতে যাবার লোক কম, স্কুলের ছেলে আর কাজের লোকরাই খালি যাওয়া-আসা করছে। মাঝে মাঝে খাঁচা এসে শূন্যে বাড়ানো প্লাটফর্ম্মে থামছিল, লোক ওঠা-নামার পর দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে তবে চলছিল। রোক্কো পাহাড়ের মাথায় সবাই নেমে

পড়ল। এখানে দারুণ শীত, গায়ে তিনটা গরম জামার উপর একটা ওভারকোট ছিল; কিন্তু বোঝা গেল তাতেও কাজ চলবে না। ভাগ্যে সঙ্গে একটা ছোট কোট ছিল তাই রক্ষা। জাপানে যে কোন দ্রষ্টব্য জায়গাতেই বাথরুম, চা খাবার ঘর, হোটেল, আগুন পোয়াবার জায়গা ইত্যাদি যথাযথস্থানে থাকে। এইখানে একটা চা খাবার ঘরে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা কোট প'রে ফেললাম। কিন্তু পা নিয়ে মুস্কিল। পায়ে মাত্র এক জোড়া মোজা আর এক জোড়া স্যাণ্ডাল জাতীয় জুতা। এদিকে সমস্ত রাস্তা বরফে সাদা হয়ে আছে। যেখানে বা বরফ নেই, সেখানে বরফ গলে এক গাদা জল। রাস্তাগুলো খুব ভাল, তাই কাদা হয় নি। কোন রকমে পা বাঁচিয়ে ওই জলের উপরই আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটতে হল, বরফে পা দিলেই ত পা যাবে ডুবে। খাঁচাগাড়ীতে ছয়-সাত-আট বছরের কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে এসেছিল, বোধ হয় কোবে স্কুল থেকে রোক্কোতে বাড়ী আস্‌ছে। তাদের পায়ে সব হাঁটু পর্য্যন্ত টপবুট, কাঁধে একটা ক'রে ব্যাগ। আমরা যেমন পা বাঁচাতে ব্যস্ত, তারা তেমনি পা ভেজাতে ব্যস্ত। ভাল রাস্তায় বরফ দেড় ইঞ্চির দুই ইঞ্চির বেশী জমেনি মনে হ'ল; কিন্তু দুই পাশের নর্দ্দমায় বেশ এক হাত ক'রে বরফ জমে আছে। ছেলেগুলি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পরমানন্দে নর্দ্দমায় নেমে পড়ল এবং এক হাঁটু বরফ ভাঙতে ভাঙতে মহা কোলাহল করে ছুটতে লাগল। তাদের গালগুলো গোলাপ ফুলের মত টক্‌টকে লাল, অসুখ-বিসুখের কোন চিহ্ন নেই। সঙ্গে অভিভাবক কেউ নেই ব'লে এমন তাণ্ডব নৃত্যে বাধাও কেউ দেয় না। দাস মহাশয় দেখে বললেন, "বাপের পয়সার জুতো ছেঁড়ে ত ওদের কি? ফুর্ত্তি ত ক'রে নিচ্ছে।"

তাদের দেখাদেখি আমার কন্যাও রাস্তায় বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল, অবশ্য নর্দ্দমায় নামবার মত উৎসাহ তার হয় নি।

ছেলেগুলির বরফে লাফানো ছাড়াও একটা দেখবার জিনিষ ছিল, তাদের নিঃসঙ্গতা। জাপানে সর্ব্বত্রই দেখেছি এই রকম ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়েরা একলাই স্কুলে যায়। সে স্কুলে যাওয়া দুই-দশ পা নয়। তিন হাজার ফুট নীচেও তারা একলাই যায়, দুই-তিনটা বস্‌ কি বৈদ্যুতিক ট্রেন বদল করেও তারা একলা যায়। এরা নাকি কখনও হারায় না কিংবা গাড়ী চাপা পড়ে না। সর্ব্বত্রই গাড়ীর চালকেরা সাবধান এবং ছেলেমেয়েরা নির্ভীক। শুনেছি তাদের গলায় নাকি নাম-ঠিকানা লিখে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যদিই দৈবাৎ কেউ হারায় বা বিপদে পড়ে ত তৎক্ষণাৎ তার আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমি ৮০০।৯০০ মাইল রেলপথেও একটি আট-নয় বছরের ছোট্ট বেঁটে ছেলেকে ব্যাগ নিয়ে একলা যেতে দেখেছি। বোধ হয় ছুটির দিনে টোকিও থেকে সে কোবে যাচ্ছিল। বেশ খোস মেজাজে চলেছে।

রোক্কো পাহাড়ের মাথায় অনেক জায়গাতেই খুব ঘন জমাট বরফ পড়েছে। পথ-সাজানো কেয়ারি-করা বেঁটে ঝাউগাছগুলি লোকের দরজার সামনে কিংবা বড় রাস্তার পাশে সাদা ধপ্‌ধপে বরফের মধ্যে সবুজ তোড়ার মত ফুটে রয়েছে, গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো চূণের মত বরফ পড়ছে, দূরে একটা পুকুর জমে কঠিন হয়ে গিয়েছে, অনেক দূরে কোবের সমুদ্র-বন্দরের পাথরে বাঁধান সীমানা দেখা যাচ্ছে, নিস্তরঙ্গ সমুদ্র উপর থেকে কাঁচের মত চক্‌ চক্‌ করছে, তার চেয়েও দূরে 'মায়া' সান পর্ব্বতের চূড়া, সব জড়িয়ে মনে হচ্ছিল কি একটা অবাস্তব লোকে এসে পড়েছি। এরকম দেখা ত আমাদের অভ্যাস নেই, এরকম দেখবার কথাও নয়। অনেক জায়গায় সিঁড়ি ক'রে ক'রে উপরে বসবার ও চা খাবার সব জায়গা আছে, কার একটা বিরাট স্মৃতিস্তম্ভও রয়েছে দেখলাম। দেখে শুনে আমরা আবার ঝোলানো ট্রেনেই ফিরলাম। কিন্তু ততক্ষণে ঠাণ্ডায় আমার হাতগুলো জ্বালা করতে সুরু করেছে।

সন্ধ্যায় মিঃ দাসের বাড়ী পাপড়-ভাজা, ডালমুট ইত্যাদি নানা স্বদেশী জিনিষ খেয়ে পথে পথে মন্দিরের মত তোরণ-দেওয়া গাছের বাকলের বাড়ী, কাঠের বাড়ী ইত্যাদি দেখতে দেখতে আবার সেই ঈষ্টার্ণ লজে গিয়ে লুচি-তরকারি খাওয়া গেল। আমাদের জাহাজ কোবে বন্দরে দিন পাঁচেক থাকবে, কাজেই আমাদের আর রাত্রে হোটেল ভাড়া ক'রে থাকতে হ'ল না। একটা ট্যাক্সি

ক'রে জাহাজঘাটে গিয়ে হাজির হ'লাম। ট্যাক্সির ভাড়া এত কম হয় জানতাম না। পঁচিশ পয়সা ভাড়ায় অতখানি পথ নিয়ে গেল, আবার পুলিসের কাছে পথঘাট জেনে নিয়ে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিল।

শুনেছি এদেশে পুলিসরা সর্ব্বদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে না, রাস্তার কোণে কোণে এক একটা ঘরে তারা বেশ চেয়ার-টেবিল পেতে আরামে ব'সে থাকে। যার দরকার সে পুলিসকে এসে পথঘাট বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা ক'রে যায়। পথে মারামারি ঝগড়াঝাঁটি হয় না ব'লেই বোধ হয় এরা এত সুখে আছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সর্ব্বদাই গাড়ী থেকে নেমে এদের কাছ থেকে আমাদের পথঘাট জেনে দিত। অবশ্য, এদের ইংরেজী উচ্চারণ ও আমাদের ইংরেজী উচ্চারণে এত আকাশপাতাল প্রভেদ, যে প্রায়ই এই নিয়ে উভয় পক্ষকে মহা গোলমালে পড়তে হ'ত। আমরা যদি বলতাম 'আনিও মারু' ওরা আকাশ থেকে পড়ত। শেষে বোর্ডে নাম দেখালে বলত, 'আইয়ো মারু।' দুই-একটা ষ্টেশনের নাম অনেক সাধ্য সাধনা ক'রেও পুলিসদের বোঝাতে পারি নি। পথেও পুলিসের সাক্ষাৎ আমরা বার দুই পেয়েছিলাম, জানি না তারা পথেই ছিল কিংবা তাদের ঘর ছেড়ে তখনকার মত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

একবার আমরা টোকিও রাজপ্রাসাদের সীমানার উল্টাদিকে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে কি দেখতে যাচ্ছিলাম। গাড়ীতে উঠেছি, অকস্মাৎ এক পিতলের বোতাম-পরা পুলিস-সাহেব হাস্যবিকশিত মুখে এসে হাজির। তার ভাষা কিছুই বুঝলাম না, হাসি দেখে মনে হচ্ছিল সন্দেশ খেতেও দিতে পারে। সে কেবলই খাতা বের ক'রে ড্রাইভারের লাইসেন্স নম্বর নামধাম জাতিগোত্র সব লিখছিল এবং হেসে হেসে আমার মেয়ের টুপিটা ধরে তাকে আদর করছিল। তার হাস্য ও রৌদ্ররসের একত্র আবির্ভাব দেখে আমি ঠিক করতে পারছিলাম না তার মতলবটা কি। ড্রাইভারের কাতর মুখ দেখে বুঝলাম তার সমূহ বিপদ উপস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে পুলিস-পুঙ্গবের মুখের হাসি একবারও নিবল না। সে তারই মধ্যে আমার মেয়ের নাম, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ক'রে চলল।

জাপানী মেয়েদের পোষাক

আমার সঙ্গে এক বাঙালী-দম্পতি ছিলেন তাঁরা জাপানে বহুকাল বাস করেছেন, জাপানী ভাষা খুব ভালই জানেন। তাঁদের কাছে পরে শুনলাম যে ঐ জায়গাটাতে গাড়ী দাঁড় করানো এবং যাত্রী নেওয়া বারণ। ড্রাইভার সেই অপরাধ করাতে তাকে নিয়ে এই হ্যাঙ্গাম। আমরা বিদেশী মানুষ দেখে কিন্তু সে ওকে ছেড়ে দিল, অতঃপর এই রকম কাজ যেন আর না করে এই অঙ্গীকার করিয়ে। যাবার সময় সে আমাদের বিশেষ ক'রে আমার মেয়েটিকে গুডবাই ব'লে গেল।

রোক্কো পাহাড়ের বরফ দেখে এসে রাত্রে জাহাজে বেশ আরামেই ঘুমনো গেল, কারণ জাহাজের কেবিনে তখন গরম হাওয়ার পাইপ দিয়ে অনেক ডিগ্রী তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে এমন শীতের রাজ্যে যে আছি তা বোঝাই যায় না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও সশস্ত্র না হয়ে বরফের রাজ্যে যাওয়া আমার যে ঠিক হয় নি, পরদিন ভোরের দারুণ সর্দ্দিতে তা বোঝা গেল। কিন্তু তার জন্যে ত জাহাজে ব'সে থাকা যায় না। দাস মহাশয় বলেছেন ১০॥ টার সময় হ্যাম্বিউ ষ্টেশনে হাজির থাকতে হবে, কাজেই একটু বেশী চাপাচুপি দিয়ে আমরা তিন জন বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যে হ্যাম্বিউ ষ্টেশন তা ত কিছুই জানি না। জাহাজঘাট থেকে বেরিয়ে দুপাশের গুদাম ঘর পার হয়ে চলতে চলতে এক পুলিস-পুঙ্গবকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। সে আমাদের উচ্চারণ কিছুই বুঝল না, তার কথাও আমরা কেউ বুঝলাম না। অগত্যা দাস মহাশয়ের কথামত এবং কতকটা আন্দাজে একটা ট্রামে উঠে পড়া গেল। কোবের ট্রামগাড়ীগুলি ভারি সুন্দর, খুব চওড়া চওড়া গদি, মাঝে প্রশস্ত জায়গা। বসে যে রকম মারাত্মক ভীড়ে চাপা প'ড়ে গিয়েছিলাম এখানে তার কোন চিহ্ন দেখলাম না। আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি সামান্য ইংরেজী জানেন বোঝা গেল। তিনিই দয়া ক'রে আমাদের ষ্টেশন দেখিয়ে নামতে বললেন।

আলোচনা

"আকাশযান-চালক হইতে দিব না"

শ্রীকৌশিককুমার মিত্র

পৌষের প্রবাসীর ৪৪৪ পৃষ্ঠায় "আকাশযান-চালক হইতে দিব না" প্রসঙ্গে সম্পাদক-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। আমি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির জর্ণালিজমের ডিপ্লোমার জন্য কিংস কলেজে পড়িতেছি। গত টার্মে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এয়ার স্কোয়াড্রনের সভ্য হইবার আমন্ত্রণের উত্তরে আমি উক্ত স্কোয়াড্রনের সভ্য হইবার ইচ্ছা করি। অধ্যক্ষ-মহাশয় আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমার পত্র যথাস্থানে পাঠান। সাক্ষাৎকারের জন্য আমি দুই দিন আহূত হই। তথায় বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধিতা সম্বন্ধে কতকগুলি অনাবশ্যক প্রশ্ন ছিল। আমাকে 'খুব সম্ভবতঃ সভ্য করিয়া লওয়া হইবে' বলিয়া বিদায় দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে আমাকে জানান হয় যে স্কোয়াড্রনে স্থানাভাব-বশতঃ সম্প্রতি আমাকে লওয়া হইল না ভবিষ্যতে যদি স্থান হয় আমাকে জানান হইবে। যেদিন আমি ঐরূপ পত্র পাই তাহার পরের সপ্তাহে স্কোয়াড্রন আপিস হইতে অধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিত একটি পত্র তিনি নোটিস-বোর্ডে লটকাইয়া দেন। কিংস কলেজ হইতে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র সভ্যপদপ্রার্থী হওয়াতে ঐ পত্রে দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—"এখনও স্কোয়াড্রনে যথেষ্ট স্থান আছে—কিংস কলেজের ছাত্রেরা দলে দলে আবেদন করুন।" আমাকে লওয়া হইবে না—এই কথাটি ভদ্রভাবে বলিলেই চলিত। স্থানাভাবের মিথ্যা অজুহাত দেখান বোধ হয় এদেশী সভ্যতার প্রতীক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এয়ার স্কোয়াড্রনে ছাত্রদের বিমান-চালনা শিখান হয় ও 'A' লাইসেন্স পর্য্যন্তই এইখানে শিখান হয়।
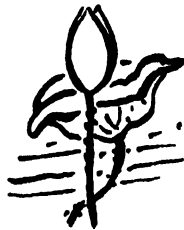
ভীমরুলের রাহাজানি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে এক দিন বেলগাছিয়া রোড দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, রাস্তার এক পার্শ্বে এক দল কালো রঙের ক্ষুদে পিপীলিকা সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। নিকটেই রাস্তার উপর রেল-লাইনের পুল। পিপীলিকারা এই রেল-পুলের বাঁধের নীচেই একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতেছিল। একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইলাম—মাঝারিগোছের একটা কুণো ব্যাং পিঁপড়ের লাইনের প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি তফাতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। ব্যাংটাকে এই ভাবে নিরিবিলি চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বড়ই কৌতূহল হইল—দেখা যাক কি করে। অনেক ক্ষণ কিছুই করিল না—কেবল মাঝে মাঝে অদ্ভুত উপায়ে গলার নীচের পর্দ্দাটাকে কাঁপাইতে লাগিল। চলিয়া যাইব ভাবিতেছি—এমন সময় একটা পিপীলিকা দল ছাড়িয়া ব্যাংটার একটু ধার ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইবা মাত্রই চক্ষের নিমেষে সে তাহাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। কেবল টক্ করিয়া একটু শব্দ হইল মাত্র। কোন্ ফাঁকে যে জিবে ঠেকাইয়া পিঁপড়েটাকে মুখে পুরিল তাহা লক্ষ্যই হইল না। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম—পিঁপড়ে খাইবার জন্যই ব্যাংটা ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আরও দুইটি পিঁপড়েকে টক্ টক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিল। পিঁপড়ের সারির মধ্যে মাথা-মোটা খুব বড় বড় সৈন্যজাতীয় পিঁপড়েরা মাঝে মাঝে আনাগোনা করেতেছিল। হঠাৎ ঐরূপ একটা সৈনিক-পিঁপড়ে লাইন ছাড়িয়া ব্যাংটার সম্মুখীন হইবামাত্রই সে টক্ করিয়া তাহাকে মুখে পুরিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্ কল্ শব্দে একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। ব্যাংটা ছটফট করিয়া এদিক ওদিক লাফাইতেছে আর এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিতেছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম—পিঁপড়েটা তাহার মুখে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় জিব ঠেকাইয়া তাহাকে গিলিবার সময় সে ব্যাঙের জিব কামড়াইয়া ধরিয়াছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ব্যাংটা ইতস্ততঃ লাফালাফি করিতেছিল। পকেটে একটুখানি 'কঙ্গো-রেড' ছিল। হাতের কাছে কিছু না পাইয়া তাহাই খানিকটা ব্যাংটার গায়ের উপর ছড়াইয়া দিলাম। চিহ্ন রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই ভাবে জব্দ হইয়াও সে আবার পিঁপড়ে-শিকারের জন্য কালও এই স্থানে আসে কি না। ব্যাংটা কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া মুখ ঘষিয়া পিঁপড়েটাকে ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল; অবশেষে বাঁধের পাশেই একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তার পর দিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় সেখানে গিয়া দেখি—পিঁপড়ের সার পূর্ব্বমতই রহিয়াছে; কিন্তু ব্যাঙের দেখা নাই। (পর্য্যবেক্ষণের ফলে পরে জানিতে পারিয়াছি যে, ব্যাঙেরা সাধারণতঃ দিনের আলোতে আহারান্বেষণে বাহির হয় না। পড়ন্ত বেলায় এবং অন্ধকারেই ইহারা শিকার অনুসন্ধান করিয়া থাকে।) যাহা হউক, ব্যাঙের আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। প্রায় দশ-বার হাত দূরে ঘাসের উপর এক খণ্ড শুষ্ক প্যাকাটি পড়িয়া ছিল—একটা ভীমরুল সেই প্যাকাটি হইতে মুখ দিয়া কুরিয়া কুরিয়া কি যেন সংগ্রহ করিতেছিল। মনে হইল যেন বাসা নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। একমনে তাহাই দেখিতেছি। ইতিমধ্যে দেখি—সওয়া ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা সাদা রঙের শুঁয়োপোকা, কখনও বা ঘাসের উপর দিয়া কখনও বা নীচে দিয়া দিশাহারা ভাবে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা হলদে রঙের বোলতা তাহাকে তাড়া করিয়াছে। শুঁয়োপোকাটা বোল্‌তার কাছ হইতে প্রায় সতর-আঠার ইঞ্চি দূরে ঘাসের নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোল্‌তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে এক বার ঘাসের নীচে ঢুকিয়া, এক বার উপরে উঠিয়া মরিয়া হইয়া যেন শুঁয়োপোকার সন্ধান করিতেছিল। শুঁয়োপোকাটা যদি এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, তবে বোধ হয় বোল্‌তা সহজে তাহার সন্ধান পাইত না; কিন্তু প্রাণভয়ে ছুটিবার ফলেই এবার বোল্‌তা তাহাকে দেখিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তখন একটা ভীষণ ওলটপালট কাণ্ড। শুঁয়োপোকাটা প্রাণপণে ছুটিতেছে, আর বোল্‌তা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহার ফলে একবার বোল্‌তা নীচে পড়িতেছে, শুঁয়োপোকাটা উপরে উঠিতেছে, আবার শুঁয়োপোকা নীচে পড়িতেছে, বোল্‌তা পিঠের উপর চাপিয়া বসিতেছে। এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে তাহারা প্যাকাটিটার খুব কাছে আসিয়া পড়িল। শুঁয়োপোকার আর চলিবার সামর্থ্য নাই—বোল্‌তার পুনঃ পুনঃ দংশনে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া আসিতেছিল। তখন বোল্‌তা তাহার পেটের দিকের খানিকটা অংশ চিরিয়া ফেলিল। সবুজ রঙের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া সে তাহা কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। খানিক ক্ষণ পরেই আবার উপরে উঠিয়া শুঁয়োপোকার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া লেজের দিকের বড় অংশ হইতে কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। ভীমরুলটার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল সে যেন ইতিপূর্ব্বেই কিছু একটা ঘটনার আঁচ পাইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কারণ ইতিমধ্যেই সে কাজ বন্ধ রাখিয়া মাথা উঁচাইয়া চুপ করিয়া যেন কিছু একটা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইবার ঘুরিয়া বসিতেই বোল্‌তাটার উপর তাহার নজর পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গিয়া বোল্‌তাকে আক্রমণ করিল। বোল্‌তা এইরূপ একটা প্রবল শত্রুর আচমকা আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া শিকার ছাড়িয়া উড়িয়া গেল; কিন্তু বেশী দূর না গিয়া আবার ঘুরিয়া আসিল। ভীমরুলটা ততক্ষণ শিকারটা খাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। বোল্‌তাটাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া শিকার ছাড়িয়া সে আবার

ভীমরুলেরা বাসার বোল্‌তাদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, বাসায় মাত্র দুই-একটি বোল্‌তা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লড়াইয়ের সপ্তম দিনের পরে লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র

বিপুল পরাক্রমে পাঁচ-সাতটা একত্র হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ভীমরুল এক দিকে একটা বোল্‌তাকে কামড়াইয়া ধরিতেছে তন্মুহূর্ত্তেই অপর দিক্‌ হইতে চার-পাঁচটা বোল্‌তা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। একটামাত্র ভীমরুলই যেন সমস্ত চাকটাকে চষিয়া ফেলিতেছিল। দেখিলাম, চার-পাঁচটা ছিন্নশির বোল্‌তা ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

প্রায় মিনিট-দশেক পর্য্যন্ত ভীমরুলটা প্রাণপণে লড়াই করিয়া অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ভীমরুল উড়িয়া যাইবার পর বোল্‌তারা ডানা খাড়া করিয়া শুঁড় উঁচাইয়া চাকটার উপর অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার প্রত্যেকটি গর্ত্তে মুখ ঢুকাইয়া কি যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। প্রায় পনর-বিশ মিনিটের মধ্যেই দেখিলাম কতকগুলি বোল্‌তা ডানা উঁচু করিয়া শুঁড় খাড়া করিয়া বাসাটার চতুর্দ্দিকে সারবন্দী ভাবে জমায়েৎ হইয়াছে। বাকী অধিকাংশ বোল্‌তাই বাসার মধ্যস্থলে জটলা করিতেছে। মনে হইল যেন ভীমরুলের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়াই ইহারা এই ভাবে সজ্জিত হইতেছিল, কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও

তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল। বোল্‌তা লড়াই না করিয়া ঘাসের নীচে দিয়া আসিয়া শুঁয়োপোকার কর্ত্তিত দেহখণ্ড মুখে লইয়া উড়িয়া গেল। ভীমরুল কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে; সেও বোল্‌তার পিছু পিছু ধাওয়া করিল। চাহিয়া দেখিলাম, কিছু দূর গিয়া বোল্‌তা ও ভীমরুল উভয়েই পুলের অপর পার্শ্বে সহসা যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এত শীঘ্র উহারা কোথায় অদৃশ্য হইল? নিকটে তেমন কোন গাছপালাও ছিল না; তবে কোথায় যাইবে? দেখিবার জন্য খানিকটা অগ্রসর হইয়া পুলের অপর পার্শ্বে আসিলাম। কোথাও কিছু নাই। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইলাম, বাঁধের ঠিক উপরেই পুলের তলায় বেশ একটু পরিষ্কার স্থানেই প্রকাণ্ড একটা বোল্‌তার বাসা। বাসাটার ব্যাস প্রায় দশ ইঞ্চি হইবে। অজস্র বোল্‌তা বাসাটা ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহারই এক পাশে সেই ভীমরুলটার সঙ্গে বোল্‌তাদের তুমুল লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে লাগিলাম। ভীমরুলটা যেন বোল্‌তার চাকের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই হুল ফুটাইয়া, কামড়াইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বোল্‌তারাও

ভীমরুলের আগমনের কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তখন বাধ্য হইয়াই ফিরিয়া আসিলাম। বেলা তিনটার সময় ফিরিয়া গিয়া দেখি বাসাটাতে কোন গোলমাল নাই। বোল্‌তারা দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করিতেছে। মাঝে মাঝে কেহ কেহ বাসা হইতে উড়িয়া যাইতেছে; আবার কেহ কেহ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বাসাটার খুব নিকটে যাইতেই বোল্‌তাগুলি আমাকে দেখিবামাত্রই যেন আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা ডানা উঁচু করিয়া সকলেই চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বিপদ আশঙ্কা করিয়া আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরেই তাহাদের সতর্কতার ভাব কাটিয়া গেল ও পুনর্ব্বার বাসার গর্ত্ত তৈয়ারী ও বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়ার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর কোন গোলমালের লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না।

তার পরদিন সকালবেলায় আবার গিয়া দেখি—ইতিপূর্ব্বের বাসাটার উপর একটা ভীমরুলের সঙ্গে বোল্‌তাদের তুমুল লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। ভীমরুলটা যেন মরিয়া হইয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই কামড়াইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইতিমধ্যে

দেখি—আর একটা ভীমরুল আসিয়া বাসাটার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে উড়িতে লাগিল। দুই-চারি বার এরূপ ঘুরিয়া বাসাটার উপর বসিয়াই একটা গর্ত্তে মুখ প্রবেশ করাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই চার-পাঁচটা বোল্‌তা আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। ভীমরুলটা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না-করিয়া আর একটা গর্ত্তে মুখ ঢুকাইয়া একটা অপরিপুষ্ট বোল্‌তার কীড়াকে টানিয়া বাহির করিল এবং ঘাড়ের দিকে কামড়াইয়া ধরিয়া উড়িয়া পলায়ন করিল। বোল্‌তাগুলি যেন অসহায় ভাবে কতক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া সকলে মিলিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ডানা কাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কেহই ভীমরুলের পশ্চাদ্ধাবন করিল না। অপর ভীমরুলটার সঙ্গে মারামারি তখনও থামে নাই। প্রায় পাঁচ-ছয়টা বোল্‌তা ভীমরুলের দংশনে বিকলাঙ্গ হইয়া নীচে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এতক্ষণ লড়াইয়ের ফলে ভীমরুলটাও বিশেষ ভাবে জব্দ হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার এক দিকের পা বোধ হয় বোল্‌তার দংশনে অসাড় হইয়া যাওয়ায় সে কাৎরাইতে কাৎরাইতে এক দিক হইতে আর এক দিকে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বোল্‌তারা সুযোগ পাইয়া তাহাকে যেখানে সেখানে অবিশ্রাম দংশন করিতে লাগিল। ভীমরুলটা অবশেষে একটা বোল্‌তার সহিত জড়াজড়ি করিয়া একেবারে চাকটার কিনারায় আসিয়া পড়িতেই আরও দুইটা বোল্‌তা আসিয়া আক্রমণ করিল এবং সকলে জড়াজড়ি করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাহাতেও কি লড়াই থামে! ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া কামড়াকামড়ি করিতে লাগিল। এদিকে চাকের বোল্‌তাগুলি পুনরায় ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। চাকটার চতুর্দ্দিকে ডানা উঁচু করিয়া অসংখ্য সান্ত্রী প্রায় নিশ্চলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সান্ত্রীদের পরেই এক দল কর্ম্মী বোল্‌তা কেবল গর্ত্তের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গুঁজিয়া বাচ্চাদের তদারক করিতেছে। বাসার মধ্যস্থলে সাদা টুপি দিয়া মুখ বন্ধ করা কতকগুলি গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে চাকের বাকী বোল্‌তাগুলি সমবেত হইয়া মাঝে মাঝে ডানা কাঁপাইতেছে। তাহাদের ডানা কাঁপানোর ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। রোদ প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে—এমন সময় দেখি আর একটা ভীমরুল বাসার কাছে আসিয়া উড়িতে লাগিল। বোলতাগুলি ভীমরুলের আগমন বুঝিতে পারিয়াই একসঙ্গে সকলে ডানা কাঁপাইতে কাঁপাইতে মুখ বাড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। ভীমরুলটা একবার বাসার খুব কাছে উড়িয়া আসিয়া আবার দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু মিনিট-পাঁচেক পরেই হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাসার উপর পড়িল এবং বোল্‌তাদের সমবেত বাধাদান সত্ত্বেও প্রায় দুই-এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা বাচ্চা মুখে করিয়া উড়িয়া গেল। আলো পড়িয়া আসাতে বোল্‌তারা তখন কি করিতেছিল দূর হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিলাম না। কেবল কতকগুলি বোল্‌তাকে বাসার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিলাম। কাছে গেলে যদি উড়িয়া আসিয়া দংশন করে এই ভয়ে তার পর দিন টেলি-মাইক্রোস্কোপের সরঞ্জাম সঙ্গে লইলাম। ভীমরুলেরা যখন বোল্‌তার বাচ্চাদের সন্ধান পাইয়াছে তখন নিশ্চয়ই আজ তাহারা আরও বেশী সংখ্যায় আসিয়া বাচ্চা চুরি করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা হইয়া গিয়াছিল। বেলা প্রায় দশটার সময় আসিয়া দেখি—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহারা বাচ্চা ছিনাইয়া লইবার অভিযান সুরু করিয়া দিয়াছে। সকাল হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত হয়ত তাহারা বোল্‌তার অনেক বাচ্চা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, রাস্তার অপর পার্শ্বে বাসা হইতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে টেলি-মাইক্রোস্কোপ খাটাইয়া বাসার অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। বাসার সান্ত্রীদের ব্যূহ পূর্ব্বমতই রহিয়াছে, কিন্তু বোল্‌তার সংখ্যা অনেক কম বোধ হইল। তাহারা অনেকেই কেবল ঘন ঘন গর্ত্তের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া বাচ্চাদের তদারক করিতেছিল। আর কতকগুলি কেবল ডানা উঁচু করিয়া নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। ইতিমধ্যেই একসঙ্গে দুইটা ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া বাসার উপর পড়িল। বোল্‌তাদের সঙ্গে দুই স্থানে ভীমরুলের জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি সুরু হইয়া গেল। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই প্রায় তিন-চারটা বোল্‌তা সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া বাসা হইতে নীচে পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্‌ ফাঁকে যেন ভীমরুল দুইটা বাচ্চা মুখে করিয়া উড়িয়া গেল। রাস্তার উপর আসিয়া দেখিলাম নীচে কয়েকটা বোল্‌তা পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। একটা বিকলাঙ্গ ভীমরুলও দেখিতে পাইলাম। পিঁপড়েদের মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকে মিলিয়া বোল্‌তার মৃতদেহ বহন করিয়া গর্ত্তের দিকে লইয়া চলিয়াছে। একটা অর্দ্ধমৃত ভীমরুলকেও তাহারা আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পিঁপড়েরা তাহার ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে তাহাদিগকে লইয়াই কাৎরাইতে কাৎরাইতে লাইন ছাড়াইয়া বহুদূর চলিয়া যাইতেছে। এদিকে বোল্‌তাদের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহারা খুবই ভয় পাইয়া গিয়াছে। কারণ এ-দৃশ্য দেখিতে রাস্তায় অনেক লোক জড় হইয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ একটু আগাইয়া যাইতেই বোল্‌তাদের অনেকেই পিছু হটিতে হটিতে একেবারে বাসার পিছন দিকে গিয়া লুকাইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যতই বেলা বাড়িতেছিল ভীমরুলের সংখ্যা যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একটার পর একটা ত আসিতেছিলই, আবার মাঝে মাঝে একসঙ্গে দুই-তিনটা আসিয়াও বোল্‌তার বাচ্চাগুলি মুখে করিয়া পলাইতে-ছিল। এখন মারামারি বড়-একটা দেখিতে পাইলাম না। খণ্ড-যুদ্ধে দুই-একটা বোল্‌তা প্রাণ হারাইতেছিল। কয়েকটা ছোট ছেলেকে ভীমরুলগুলিকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় তাহারা আসিয়া বলিল—প্রায় মাইলখানেক দূরে রাস্তা হইতে কিছু তফাতে একটা নাটা-ঝোপের ভিতর ভীমরুলেরা প্রকাণ্ড বাসা বাঁধিয়াছে। সেখান হইতেই উড়িয়া আসিয়া ভীমরুল বোল্‌তার চাকের উপরে এইরূপ রাহাজানি করিতেছে।

চতুর্থ দিনে সকালে গিয়া দেখিতে পাইলাম—বোল্‌তার সংখ্যা খুবই কম। তাহারা সকলে মিলিয়া চাকটার মধ্যস্থলে জমায়েৎ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধ্যস্থলে সাদা টুপি ঢাকা কতকগুলি গর্ত্ত ছিল। তাহার আশপাশের গর্ত্তগুলির মুখ খোলা এবং টেলি-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তাহার ভিতরের বাচ্চাগুলিকে পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। কিন্তু বাসার কিনারার চতুর্দ্দিকস্থ গর্ত্তগুলিকে

সম্পূর্ণ খালি দেখিতে পাইলাম। বোধ হয় ভীমরুলেরা ঐ সমস্ত গর্ত্তের বাচ্চাগুলি সবই লইয়া গিয়াছিল। আজও দেখিলাম, ভীমরুলেরা পূর্ব্বের মতই আনাগোনা করিতেছে। কেহ কেহ বাচ্চাগুলিকে লইয়া যাইতেছে, আবার কেহ কেহ রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইতেছে। লড়াই তখন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ভীমরুল আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানের বোল্‌তাগুলি পিছু হটিয়া গিয়া বাসার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় লয়, আবার চলিয়া গেলেই তাহারা স্বস্থানে আসিয়া জমায়েৎ হয়। এই সময়েও ভীমরুলের সম্মুখে পড়িয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা বোল্‌তা মারা যাইতেছিল। এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—অনাবৃত গর্ত্তের বাচ্চাগুলি অনবরত কেবল মাথা ঘুরাইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া দূরদর্শন-যন্ত্রটাকে আরও নিকটে আনিয়া বসাইলাম। অনেক ক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর বুঝিতে পারিলাম বাচ্চাগুলিও বিপদের সন্ধান পাইয়া মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সুতা বাহির করিয়া গর্ত্তের মুখে ঢাক্‌না প্রস্তুত করিতেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কয়েকটা গর্ত্তের ঢাক্‌না গড়িয়া উঠিতে দেখিলাম। বাচ্চারা নিজেই মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া গর্ত্তের ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া থাকে। পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা ঢাক্‌না বুনিতে সুরু করে। এই ঢাক্‌না এত শক্ত যে হাতে টানিয়া ছেঁড়া যায় না। ভীমরুলেরা এতক্ষণ ঢাক্‌না কাটিয়া পুত্তলি বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করে নাই। খোলামুখ গর্ত্তের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকেই লইয়াছে। এবার অন্য কিছু না পাইয়া তাহারা ঢাক্‌না ছিঁড়িয়া পুত্তলি বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই কাজে অনেক সময় লাগিতেছিল। এই সুযোগে বোল্‌তারা আসিয়া আবার দলবদ্ধভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীমরুল একে বাচ্চার স্বাদ পাইয়াছে তাহাতে অতি দুর্দ্ধর্ষ কোপনস্বভাব, কিছুতেই হটিবার পাত্র নহে। মারামারিতে দুই-একটা স্থানচ্যুত হইলেও অন্যেরা আসিয়া সেই স্থান দখল করিয়া টুপি কাটিয়া পুত্তলি বাহির করিয়া লইতে লাগিল। বোল্‌তারা দলে দলে প্রাণ দিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ভীমরুলেরা বোল্‌তাদের প্রায় সমস্তগুলি বাচ্চা ও পুত্তলি ছিনাইয়া লইয়া গেল। অবশিষ্ট বোল্‌তারা ভীমরুল দেখিলেই আর ভয়ে কাছে আসিত না—বাসার পিছনে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিত। বাসায় যে দুই-চারিটি বাচ্চা তখনও অবশিষ্ট ছিল, কর্ম্মী ও খাদ্যের অভাবে তাহাদের মধ্যে আর এক নূতন উপদ্রব আরম্ভ হইল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শরীরের রস চুষিয়া খাইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় আট-নয় দিনের মধ্যেই অতবড় বোল্‌তার বাসাটি প্রবল অত্যাচারীর কবলে পড়িয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল।

অভাবনীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সানাইয়ের করুণ রাগিণীর মধ্যে বিদায়ের ব্যথা ছাপিয়ে মিলনের আনন্দ-উজ্জ্বল সুর কেঁপে কেঁপে জানিয়ে দেয় যে, বিচ্ছেদের ভিতর শুধু ব্যথাই নেই; একটা মহা-মিলনের পূর্ব্বাভাস রয়েছে এই সুরের প্রতি মূর্চ্ছনায়। এ-কথা সবাই জানে, সকলেই উপলব্ধি করে—আমিও করেছি, কিন্তু আজ আর আমার সে-মন নেই। এক জনার মিলনকে কেন্দ্র ক'রে আর একটি অভাগা মেয়ের বিয়োগান্ত অনুষ্ঠানটি আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। তার পর জীবনের অনেকগুলি বছরই ত শেষ হয়ে গিয়েছে। ছোটবড় নানা কাজের ফাঁকে মনকে শুধু অন্যমনস্ক ক'রে রাখাই চলে, তার স্বভাবকে বদলান যায় না।

ছোট বোন রাণুর বিয়েতে বাড়ীময় একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। ছাদে মেরাপ বাঁধা হচ্ছে, বাড়ীর সম্মুখভাগটা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যতটা সম্ভব রুচিসম্মত ক'রে তুলতে নিপু উঠে প'ড়ে লেগেছে। সর্ব্বত্রই একটা নূতন উন্মাদনা, শুধু আমি সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে এসে নীরবে ব'সে আছি। আজ আবার টুনুর বিশীর্ণ বিবর্ণ মুখখানা নূতন ক'রে মনে প'ড়ে আমাকে রীতিমত চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

ঘটনাটা অনেক বছর পূর্ব্বেকার—

কাকার মেয়ে টুনু। জন্মগ্রহণের বছর দুই পরে টাইফয়েডে তার সহজ বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক দ্রুত ব'লেই মনে হয়—টুনুর বয়েস বছর-চোদ্দ, অথচ বড় বোন লক্ষ্মী তার কাছে ছেলেমানুষ।

কাকা কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে থাকেন। সম্পর্কটা অতি-নিকট হ'লেও পথের ব্যবধানটা বড় হয়ে চোখে ঠেকে, কাজেই যাওয়া-আসার মাত্রাটা আঙুলে গুণে শেষ করা যায় অর্থাৎ কখন-সখন। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্মীকে গান শেখাবার ভার পড়েছে আমার উপর। তা ছাড়া যাওয়া-আসারও একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা কাকা ক'রে দিয়েছেন।

লক্ষ্মীকে ভৈরবীর উপর একটা ভজন শেখাচ্ছিলাম। ওর তীক্ষ্ণ মেধা আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ভুল সংশোধন ক'রে ওকে উৎসাহিত ক'রে তুলছি। লক্ষ্মী পূর্ণ উদ্যমে গান অভ্যাস করছে এমন সময় টুনু এসে উপস্থিত হ'ল। আমার গায়ের উপর হেলে পড়ে এক গাল হেসে ঢিলে ছন্দে কথা ক'য়ে উঠল—দিদি কিচ্ছু পারে না···টুনু পরম বিজ্ঞের ন্যায় খানিক টেনে টেনে হেসে পুনরায় তার স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললে—আমি দিদির চেয়ে ঢের ভাল পারি—টুনু হঠাৎ সঙ্গীত-মুখর হয়ে উঠল। আমার দৃষ্টি এবং বোধ করি বা মনটাও জোর ক'রে তার দিকে আকৃষ্ট ক'রে উচ্চকণ্ঠে সা থেকে সা পর্য্যন্ত আবৃত্তি ক'রে গেল। টুনু সম্বন্ধে অনেক কথাই ইতিপূর্ব্বে শুনেছি, আজ তার সত্য রূপ খানিক দর্শন করলাম। করুণা হ'ল—আহা—আমি টুনুর দিকেই চেয়ে-ছিলাম। টুনু উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং সম্ভবতঃ আর একবার তার মেধার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মীর ধমকে সে থতমত খেয়ে গেল এবং হয়ত বা একটু সহানুভূতির আশায় বড় করুণ চোখে আমার দিকে চাইলে। সে-চোখে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু যে কাঙাল ভাব তার দুই সরল চোখে ফুটে উঠল তা আমাকে নাড়া দিলে।

আমি লক্ষ্মীকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—অবুঝ···ওর কোন কাজে দোষ হয় না। লক্ষ্মী লজ্জা পেলেও একটু হেসে বললে—সব সময় ভালও লাগে না।

হয়ত লক্ষ্মীর কথাই ঠিক। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে সে-কথাও অস্বীকার করা চলে না, তাই ব'লে জেনে-শুনে এই নিয়ে কথা বাড়ান কিংবা তাকে ধমক দেওয়ার সপক্ষে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। ভালমন্দর জ্ঞান যার নেই তাকে নিয়ে মিথ্যা সময়ের অপচয় কেন? ভাবলাম, যদি মিষ্টি কথায় ওকে নিরস্ত করা যায়। হেসে টুনুকে উদ্দেশ ক'রে বললাম—গানের সময় গোলমাল করতে নেই টুনু। চুপ ক'রে ব'সো, এর পরে তোমাকে বেশ ভাল দেখে একটা গান শেখাব।

কথার ওজন বুঝবার ক্ষমতা ওর আছে, তার ধারা সম্বন্ধেও সচেতন দেখলাম, কিন্তু কোন বিষয়ই ওর মাথায় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমার নরম সুরে ফল হ'ল উল্টো। টুনু আমার আরও কাছ ঘেঁষে আধআধ কণ্ঠে বললে—এখুনি শেখাও বড়দাদা—

টুনুকে নিয়ে মিথ্যা সময়ের অপচয় করব না ভেবেও নিজে থেকেই সেই ফাঁদে পা দিয়েছি। লক্ষ্মী পুনরায় টুনুকে ধমক দিতে গিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে—অতটা সহজ হ'লে ভাবনা ছিল না বড়দা।

আমিও একটু হেসেই জবাব দিলাম—তাই ব'লে দিন রাত রক্ত-চক্ষু দেখানরও কোন মানে হয় না। তুমি গান শিখছ, ওরও ইচ্ছে হয়েছে।

লক্ষ্মী বললে—ওর হবে না যে—

উত্তরে বললাম—তাই ব'লে ওর চেষ্টাকে তুমি দোষ দিতে পার না।

লক্ষ্মী নীরব হ'ল, কিন্তু টুনু কিছুতেই নিষ্কৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। তার গান শিখবার ইচ্ছেটা শেষ পর্য্যন্ত একটা জেদে পরিণত হয়েছে। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। লক্ষ্মী বেশ উপভোগ করছিল, তার চোখ-মুখের ভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু পাছে আমার জ্যেষ্ঠত্বকে অপমান করা হয়, সম্ভবত এই আশঙ্কায় তা প্রকাশ-পথে বার বার বাধা পাচ্ছিল।

টুনু বলছিল—জান বড়দাদা, দিদি একটুও ভাল না···আমাকে ভালবাসে না। যুঁই না, নীলা না, হাসি না···কেউ না···

আমি একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম। ভয় হ'ল, কি জানি টুনু হয়ত কেঁদে ফেলবে। কিন্তু আমাকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে টুনু হাসতে লাগল। এ হাসিতে চোখের জল ছিল না, কিন্তু বেদনা ছিল, অথচ এ-খবর ঐ মেয়েটা হয়ত জানে না। জানে না যে, ওর এই হাসির ভিতর দিয়ে সাধারণ জীবনের দৈন্য কেমন ক'রে মানুষের চোখে ধরা দেয়। ওর এই অর্দ্ধচেতন মনের বিকাশগুলি আমাকে যুগপৎ ব্যথিত এবং আগ্রহান্বিত ক'রে তুলছিল। ওকে জানবার এবং বুঝবার জন্য মনের মধ্যে একটা তাগিদ এল। যে অবহেলা ঐ অবোধ মেয়েটা দিনের পর দিন পেয়ে আসছে লক্ষ্মীর কাছ থেকে, যুঁইয়ের কাছ থেকে, নীলার কাছ থেকে, এমন কি সর্ব্বকনিষ্ঠ হাসির কাছ থেকেও, সে কথাটা ও জানে, উপলব্ধি করে অথচ প্রতিবাদ করতে পারে না।

প্রতিবাদ করবার মত গুছিয়ে বলবার ভাষা ওর নেই··· শক্তি ওর নেই, শুধু একটা নির্জ্জীব অভিমান টুনুকে ব্যথিত ক'রে তোলে। নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি দিয়ে নিজের বিষয় ভাবতে গিয়ে ওর বুঝবার শক্তিকে আরও সাংসারিক জটিলতার পাকে ফেলে শক্তিহীন ক'রে তোলে। দেহে ওর যৌবনের পূর্ণশ্রী ফুটে উঠেছে, সে দিক দিয়ে কারুর চেয়েই টুনু হীন নয়, কিন্তু মানসিক দৈন্য দেহের শ্রীকে মূল্যহীন ক'রে তুলেছে—সেখানে ও হাসির চেয়েও ছোট। সংসারের চোখে টুনু বাতিল, কারণ সে সকলের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না, কারণ চোখের পলকে সব কথা বুঝবার বুদ্ধি তার নেই। মনে যে-কথা জাগে মুখে তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায়। বুঝে বলবার কিংবা ভেবে দেখবার বুদ্ধি ওর কাঁচা। ওর বাইরের প্রকাশের সঙ্গে ভিতরের বিকাশ ঘটে নি, সেইটেই হ'ল ওর গুরু অপরাধ।

লক্ষ্মী বললে—আপনিও কি টুনুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেলেন?

—তোমার কি তাই মনে হয়? হেসে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

লক্ষ্মী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। লক্ষ্য আমার স্থানভ্রষ্ট হয় নি। পুনরায় সহজ হেসেই লক্ষ্মীকে বললাম—আজকের সকালটা তোমার মাটি হয়ে গেল, কিন্তু সকালের ঘাটতি বিকেলে তোমায় পুষিয়ে দেব। লক্ষ্মী একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল কিন্তু এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। গানের দিকে আমার মন নেই। মন যেখানে বিমুখ সেখানে মিথ্যা পণ্ডশ্রম করতে আমি প্রস্তুত নই। সুরের আলাপ হয়ত জমতো কিন্তু গানের কসরৎ আজ সব দিক দিয়েই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। এ-কথা লক্ষ্মী না বুঝলেও আমিত বুঝি।

টুনু তেমনি ক'রে হেসে হেসে বললে—ওরা রোজ রোজ সেজেগুজে বেড়াতে যায়। পুকুরে নৌকো ক'রে হাওয়া খায়, আমাকে এক দিনও নিয়ে যায় না। দিদি বকে··· দাদা মারে। হাসি আবার মুখ ভ্যাংচায়। জান বড়দাদা, দিদির অনেক শাড়ী। সিল্কের শাড়ী। আবার তিন জোড়া জুতো। আমার কিচ্ছু নেই।

লক্ষ্মী কুঞ্চিত মুখে উঠে গেল। টুনুর কথা কয়টির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। কথা হিসাবে এর তুল্যমূল্য হিসেব করতে বসব না কিন্তু মনে মনে আমি ক্ষুব্ধ হলাম। টুনুর ইচ্ছা অনিচ্ছা ত এমনি ক'রেই প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিন্তু এ-কথা কেউ একবার ভেবেও দেখে না যেহেতু ওর প্রতিবাদ করবার সাহস নেই।

নিতান্তই অবহেলার মধ্যে টুনু ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। প্রকৃতির সহজ ধর্ম্ম ঐ অবোধ মেয়েটাকে কিন্তু বাদ দিয়ে যায় নি। তার সহজ স্পর্শ ওর দেহের প্রতিটি অঙ্গে বিকাশ পেয়েছে। দেহের উপর ওর মায়া আছে, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিদির মত মনোহর ক'রে তুলতে ওর আগ্রহের অন্ত নেই, অথচ টুনু সকলের চেয়ে আলাদা—সকলের মধ্যে একলা।

টুনু পুনরায় কথা ক'য়ে উঠল—জান বড়দাদা, দিদির বিয়ে হবে। একটু হেসে একটু থেমে পুনরায় সে বললে—মা বলেছে আমারও হবে।

হাসি এসে এতক্ষণ যে আমার পিছনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল তা টের পেলাম ওর হাসির শব্দে—কি বোকা মাগো···হাসি বললে, জান বড়দা, টুনু মাকে জিজ্ঞেস করেছেল, মা আমার বিয়ে হবে কবে—ছি ছি লজ্জা নেই —হাসি অনর্গল হেসে চলল।

কিন্তু বোকা মেয়েটা এত ছি-ছিতেও লজ্জা পেল না, বরং সেও হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে হাসতে লাগল যেন মস্তবড় একটা রসিকতার কথা হয়েছে। টুনুর বুদ্ধিহীনতার কথা একরত্তি মেয়ে হাসি পর্য্যন্ত জানে। বিয়ে শব্দটার মধ্যে যে বাঙালী মেয়ের একটা লজ্জা লুকানো আছে এ-কথাটা হাসি বুঝলেও টুনু বোঝে না, অথচ বিয়ে সব মেয়ের হয় এ-কথাটা সে জানে। তারও দিদির মত বিয়ে হবে এ-কথাটা প্রকাশ করতেও সে আনন্দ পায় এবং সেই আনন্দকে টুনু অপরাপর দশ জন মেয়ের মত সঙ্গোপনে উপভোগ করতে শেখে নি। তাই তার মনের ইঙ্গিত স্পষ্ট রূপে ধরা দেয়, কোথাও তার গতিরোধ হয় না।

টুনু পুনরায় কথা ক'য়ে উঠল—আমাকে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে বড়দাদা? আমি ওর মুখের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতেই টুনু আমার কানের কাছে মুখ এনে অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বললে—আমি ভাল কাপড় প'রে আর চুপি চুপি দিদির পাউডার-এসেন্স মেখে তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যেন দিদিকে ব'লে দিও না, ও বাবাকে বলে দেবে। কিন্তু কথাটা সে অত্যন্ত গোপনে বলবার চেষ্টা করলেও যে আর গোপন নেই এ-কথাটা হাসি তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

টুনু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আমার আরও নিকটে এগিয়ে

এসে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বললে—আমি ত আর নিই নি। আমি কি নিয়েছি—ঠাট্টা করেছি। ও বাবাকে নালিশ করবে। টুনুর চোখে মুখে স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠল। একটা পরিচিত উৎপীড়ন-ভয়ে সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি তাকে আশ্বাস দিলেও মনে মনে ভারি ব্যথা পেলাম। টুনুকে মোলায়েম কণ্ঠে বললাম—তোমাকে আমি পাউডার-এসেন্স কিনে দেব। টুনু উজ্জ্বল বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল, সম্ভবতঃ তার বঞ্চিত মন এতখানি আশা করতে পারে নি।

খুড়ীমা এসে দেখা দিলেন—তোদের গান বাজনা হয়ে গেল। টুনু এসে জুটেছে বুঝি। খুড়ীমার আরম্ভটা কতকটা ভূমিকার মত মনে হ'ল। আমি কোন কথা বললাম না। খুড়ীমা পুনরায় বললেন—মেয়ে কি আর কেউ পেটে ধরে না কিন্তু সবই কর্ম্মফল। পাগল ক'রে তুলেছে আমায়। ওর জ্বালায় ঘরে বাইরে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। যোগ্যতা নেই এক ছটাক, সৌখীনতা আছে ষোল ছাপিয়ে আঠার আনা। কোন কিছু লুকিয়ে রাখবার পর্য্যন্ত উপায় নেই—পাউডার বল আর স্নো বল।

একটু থেমে খুড়ীমা পুনরায় বললেন—এদিকে বুদ্ধি নেই কিন্তু ওর বাবুয়ানার জ্বালায় আমাকে দিন রাত দুর্ভোগ পোয়াতে হয়। খিটিমিটি ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। যেমন হয়েছে ওরা তেমনি হয়েছে এই হতভাগী। মা হয়ে আমার বলা উচিত নয়—খুড়ীমা একটু ইতস্ততঃ ক'রে পুনশ্চ বললেন—ওর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি!

খুড়ীমার যে ব্যথা কোথায় তা হয়ত আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তাই ব'লে তাকে নিরপেক্ষ বলতে পারি না।

আমি বললাম—যদি একটু সৌখীনতা কিংবা—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে খুড়ীমা পুনরায় কথা ক'য়ে উঠলেন—সংসারের ধারণা নেই—নইলে একথা বলতে পারতিস না—খুড়ীমা জোর ক'রেই আমাকে থামিয়ে দিলেন।

আমি ভাই—তাও সহোদর নয় কিন্তু খুড়ীমা টুনুর মা একথা আমি ভুলি নি। কাজেই খামকা কথা না বাড়িয়ে আমি নীরব রইলাম। আমার বেশী কথা বলতে যাওয়া নিছক ধৃষ্টতা মাত্র। তাছাড়া খুড়ীমা সাংসারিক অভিজ্ঞতার যে অকাট্য প্রমাণ চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন তার পরে আর মাথা তোলবার ভরসা রইল না। কিন্তু সংসারের পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকলে যে আমি কি করতাম তা ঠিক ঠাহর হ'ল না।

খুড়ীমা পুনরায় বললেন—ওকে নিয়ে আমার লোক-সমাজে যাবার উপায় নেই। সেদিন দীনেশ-ঠাকুরপোকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠল। সবাই হেসে উঠেছে হাসির কথাও বটে। আমাকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল। ওকে নিয়ে যে আমি কোথায় যাব বুঝি না। এটা বোঝে ত ওটা নয়, ওটা বোঝে ত সেটা নয়।

আমি চুপ ক'রে ব'সে শুনছিলাম কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথা সেই টুনু পরম নির্ব্বিকার চিত্তে তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল, এবং আমাদের বিস্মিত ক'রে দিয়ে কথা ক'য়ে উঠল—বড়দাদা, আমাকে পাউডার কিনে দেবে···আর এসেন্স্। দিদিকে কিন্তু আমি দেব না। টুনু আপন মনে মাথা নাড়তে লাগল।

খুড়ীমা সেই দিকে খানিক চেয়ে দেখে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন—কোন দিকে হুঁস নেই—নিজের খেয়াল নিয়েই আছে।

টুনু পুনরায় অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, দিদিকে রবি-দাদার বৌ গান শেখায়—সে ভাল না—তুমি আমাকে গান শেখাবে—? আমার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই টুনু হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হার-মোনিয়ামের গোটাকয়েক রীড একসঙ্গে টিপে ধরল। কিন্তু খুড়ীমা ধমক দিতেই সে হাত-পা গুটিয়ে ব'সল। মুখের হাসি তখন যদিও তার মুখে লেগেছিল কিন্তু তা ভয় এবং সঙ্কোচে কুঞ্চিত।

খুড়ীমা বললেন—কাউকে সুস্থির হয়ে একটা কথা বলতে পর্য্যন্ত দেবে না। খুড়ীমা একটু থেমে পুনরায় অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন—ওকে অযত্ন করতেও দুঃখ হয়, আদর করতেও বাধে। তোরা দোষ দিবি সে আমি বুঝি, নিজেকেই নিজে দোষারোপ করি তবু ঠিক সহজ হয়ে উঠতে পারি না। ভবিষ্যতের দিকে চোখ পড়তেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। আমার সঙ্কল্প ভেসে যায় অথচ টুনু কোন রকমেই অপরাধী নয়।

খুড়ীমার এই স্বীকারোক্তির মধ্যে তাঁর অন্তরের কত বড় বেদনা যে লুকান আছে তা আমি উপলব্ধি করেছি। তাঁর মনের এই অসহায় অবস্থা সত্যই ভেবে দেখবার।

টুনু অন্যত্র প্রস্থান করলে। হয়ত আবার নূতন কোন খেয়াল তার মাথায় ঢুকেছে।

খুড়ীমা পুনরায়, বললেন—লক্ষ্মীর বিয়েতে টুনুর আনন্দই সব চেয়ে বেশী। ওকে বলেছি কিনা—এর

পরে তোর বিয়ে। মা হয়ে মেয়ের সঙ্গে এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা করতে কি কম ব্যথা পেয়েছি মনে করিস, নইলে বিয়ে যে ওর হবে না তা না বোঝে কে? নিজের মেয়ে হলেও সমাজে ওর দাম যে কতটুকু তা ত বুঝি। তাছাড়া কাণা খোঁড়া একটা যার তার হাতেও যখন দিতে পারব না।

খুড়ীমা থামলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। খুড়ীমা পুনরায় কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সহসা টুনুর উচ্চকণ্ঠে তাঁর বক্তব্য চাপা পড়ে গেল। টুনু প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলেছে—কাকে চাই···বাবাকে? আপিসে। দাদা? কলেজে। বড়দাদা? আমি ডেকে দেব না।

খুড়ীমার মুখের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতেই তিনি মুখে একটু হাসির ভাব দেখিয়ে বললেন—একবার দেখে আয় ত বাপু, আবার কার সঙ্গে বিভ্রাট বাধিয়ে তুলেছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে টুনুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, এরই মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। খুড়ীমাকে সংবাদটা জানালাম।

খাওয়া-দাওয়ার পরে দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলাম, হঠাৎ টুনুর আবির্ভাব হ'ল, মুখে তার অনর্গল কথা—নেবু-পাতা করমচা যা বিষ্টি দূরে যা—দূরে যা আ আ···বিষ্টি নেমেছে বড়দাদা। চেয়ে দেখি টুনু ব্যথিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আমার সাড়া পেতেই টুনু একটু যেন ব্যথিত কণ্ঠে বললে—বিকেলবেলা বেড়াতে নিয়ে যাবে কি ক'রে? বৃষ্টিকে দূর ক'রে দেবার আয়োজন ওর এই জন্য, কথাটা এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, লক্ষ্মীর মৃদু আহ্বানে উঠে বসলাম —বেলা গড়িয়ে গিয়েছে, বড়দা বেড়াতে যাবেন চলুন। সর্ব্বপ্রথমে আমার টুনুর কথা মনে হ'ল অথচ এদের কাছে তার বিষয় উত্থাপন করতে আমার মন সরছিল না। এরা কেউই টুনুকে চায় না। তার সম্বন্ধে এদের এই অনুদার ভাব পীড়াদায়ক। বিকেল বেলার এই নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশ আমাকে বারে বারে টুনুর ব্যথিত মুখখানা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তাকে বঞ্চিত ক'রে এদের নিয়ে আমার এই অভিযানকে মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইছিল না। আজকের এই ঝরঝরে ভাবটি হয়ত ঐ অবহেলিতা মেয়েটারই ঐকান্তিক প্রার্থনার ফল। অথচ শেষ পর্য্যন্ত ওকেই পড়তে হবে ফাঁকিতে।

লক্ষ্মী পুনরায় বললে—উঠে পড়ুন বড়দা, এর পরে টুনু এসে গোল বাধাবে।" রবিদার বাড়ী লুডো নিয়ে মেতে রয়েছে, এই বেলা চলুন।

টুনুর হয়ে খানিক ওকালতি করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কথাটা যখন লক্ষ্মীই তুলেছে। একটু হেসেই বললাম—এসেই যদি পড়ে না-হয় সঙ্গে নেওয়া যাবে।

লক্ষ্মী একটু উষ্ণ হয়ে উঠল, ওকে নিয়ে কোথাও যেতে আমাদের লজ্জা করে। না-আছে কথার ছিরি, না-আছে চলবার ছিরি, একেবারে অজবোকা। মিথ্যে ওকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়াবেন না।

ভাবছিলাম, এ কি লক্ষ্মীর হিংসা না অন্য কিছু। ছোট বোন ত, সে হোক না বুদ্ধিহীনা, হোক না ওদের চেয়ে আলাদা, তাই ব'লে প্রতি পদে পদে ওর অধিকার এমন নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছিত হবে কেন? আমার মনোভাব তিক্ত হয়ে উঠল কিন্তু মুখে যথাসম্ভব কোমলতা এনে প্রশান্ত সংযত কণ্ঠে বললাম—টুনুকে আমি কথা দিয়েছি, তাকে আজ কোনমতেই বাদ দেওয়া চলবে না।

লক্ষ্মী হয়ত প্রতিবাদ করবার জন্যই মুখ তুলেছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম—তুমি রাগ ক'রো না অথবা না ভেবে প্রতিবাদও ক'রো না। আমি জিজ্ঞেস করি টুনু সব দিক দিয়েই তোমাদের দয়ার পাত্রী নয় কি? সব চেয়ে বেশী দাবি যে ওর আমাদের কাছে এ-কথাটা ভুলে যাও কেন?

লক্ষ্মীর মুখের ভাব আষাঢ়ের মেঘের মত ভারী হয়ে উঠল। লক্ষ্য করলাম কিন্তু কথা বললাম না। বলবার হয়ত অনেক ছিল, কিন্তু নিজের বক্তব্য নিজেরই কানে হিতোপদেশের লম্বা বক্তৃতার মত শোনাচ্ছিল, তা ছাড়া ওরা যখন আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না তখন মিথ্যা ওদের অসন্তুষ্টির কারণ হই কেন?

লক্ষ্মী গুম হয়ে ব'সে রইল এবং খানিক পরে মন্থর পদে সারা দেহে ও মনে এক অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে স'রে পড়ল। আমি কিন্তু আমার কথার খেলাপ করি নি। সেদিনের সন্ধ্যাটা আমার টুনুর সঙ্গেই মুখর হয়ে উঠেছিল। একটা সরল সহজ সজীবতায় প্রাণ পেয়েছিল। যে আনন্দ টুনুর সঙ্গে হাল্কা হাসি গল্পে পেয়েছিলাম তা হয়ত লক্ষ্মী কিংবা অপরাপর ভাইবোনদের কাছ থেকে পেতাম না। টুনু মৌলিক, ওরা সব অনুকরণ।

দিন কেটে যাচ্ছে। বর্ত্তমানের স্থায়ী আস্তানা আমার

কাকার বাড়ীতেই। লক্ষ্মীর বিয়ে পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই পাকা। লক্ষ্মীর আজকাল রীতিমত পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পোষাকে-পরিচ্ছদে চলায়-বলায়। যখন-তখন কণ্ঠে ওর সুর খেলে যায়। ওর সব কাজেই একটা নবীন উৎসাহের মত্ততা। সম্মুখে ওর নূতন জগৎ, জীবনে ওর পরিবর্ত্তনের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। মন ওর বেগবান উদার। টুনুর প্রতিও ঔদার্য্যে কৃপণতা নেই। তাই আজকাল প্রায়ই টুনুকে দিদির শাড়ী প'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে টুনু একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। যুঁই এবং নীলাকে সে জানিয়ে দিয়েছে তার বিয়ের সময় সে তার সবচেয়ে মূল্যবান শাড়ীগুলো ওদের দিয়ে দেবে, আর ফেরত নেবে না।

যুঁই এবং নীলা মুখ টিপে টিপে হেসেছিল। টুনু অতটা তলিয়ে কোন দিনই বোঝে না। সে তীব্র বেগে মাথা নেড়ে বলে—মিথ্যে নয়, সত্যি তোদের আমি দিয়ে দেব। পরে পুনরায় অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বললে—কাউকে বলব না—চুপি চুপি দিয়ে দেব। টুনু হি হি ক'রে হাসতে লাগল। এ তার আত্মপ্রসাদের হাসি।

আমি নিঃশব্দে ওদের কথোপকথন শুনছিলাম। টুনু আমাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু সহসা আমার দিকে চোখ পড়তেই হেসে গড়িয়ে পড়ল এবং পরমুহূর্ত্তেই মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলে। যুঁই এবং নীলা এতক্ষণ যদিই বা চুপ ক'রে ছিল কিন্তু টুনু চলে যেতে একযোগে হাসতে লাগল। নীলা বলে, টুনুটা কি বোকা··· মাগো—

টুনুর পক্ষে বেশীক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না। বিশেষ ক'রে দিদির শাড়ী প'রে তাকে কি চমৎকার মানিয়েছে তা ওর বড়দাদাকে না দেখালে কখনও চলে! তার ওপর খোঁপায় আজ আবার গাঁদাফুল গুঁজেছে—পায়ে একটা স্যাণ্ডালও উঠেছে। টুনু খানিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল—হাসিটা ওর কারণ-অকারণের ধার ধারে না, তবুও মুখ তুলে চেয়ে দেখি—সম্মুখের বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। টুনু আঙুল দিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিয়ে বললে—সুন্দর! পুনরায় এক পশলা নিঃসঙ্কোচ হাসি। টুনুকে সত্যই আজ সুন্দর দেখাচ্ছে।

টুনু বললে—দিদি আমাকে ভালবাসে জান বড়দাদা? টুনু যেন কথাটা ব'লে অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছে এমনি ভাবে ঘাড় কাৎ ক'রে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—কত সামান্যে এই মেয়েটাকে খুশী ক'রে তোলা যায় অথচ কি কৃপণ, কি অনুদার আমাদের সংসারের রীতিনীতি।

টুনু পুনরায় কথা ক'য়ে উঠল—তুমি এমনি একটি কাপড় আমায় কিনে দেবে বড়দাদা?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। এমন কত কথায় সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছি, কিন্তু আমার হাত দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন কিছুই টুনুর কাছে পৌঁছয় নি অথচ সে-কথা ওর মনেও নেই, নইলে এমনি ক'রে ওর বহু প্রার্থনা আমার দরবারে এসে মিথ্যা মাথা কুটত না। নিত্য নূতন ওর আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু না-পাওয়ার জন্য ক্ষোভ নেই—কোন দুঃখ নেই। মুখ ফুটে 'দেব' বলাতেই ও চরিতার্থ হয়ে যায়। টুনুকে সামান্য কয়টা মাসেই আমি আয়ত্তে এনেছি। ওকে বুঝতে আমার কষ্ট হয় না।

লক্ষ্মীর বিবাহ-দিন আগতপ্রায়। আত্মীয়-পরিজনে বাড়ী ভ'রে গিয়েছে। রকমারি মনোবৃত্তির এক-একটি জীবন্ত প্রতীক। নানাবিধ আলোচনায় বাড়ীময় একটা আবেগময় প্রতিধ্বনি, শব্দের পর শব্দের তরঙ্গ, রং-বেরঙের শাড়ীর ঝলকানি। বড় বড় আয়োজনে প্রয়োজনের মাত্রাও বহু রূপে দেখা দেয় এ-অভিজ্ঞতা টুনুর নেই। যে অবস্থার ভিতর ওর জীবনের এতগুলি বছর কেটে গিয়েছে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন যোগ নেই। টুনুর বোবা মন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে—এরই নাম বিবাহ। টুনু যেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠেছে। তার মুখ দেখে এবং প্রশ্ন শুনে আমার তাই মনে হ'ল। তার দিদিকে ঘিরে মেয়েরা কত রকমের হাসিঠাট্টা করছে—তাকে নিয়েই যে সকলের বর্ত্তমান উৎসব তা বোধ করি টুনু কতকটা আন্দাজ করেছে। তার বিয়েতেও এমনি আলো জ্বলবে কিনা··· এমনি বাজনা···এমনি জনসমাগম হবে কিনা এ-প্রশ্ন টুনু আমায় বহুবার ক'রে গিয়েছে। এর পরে যে টুনুর বিয়ে এ-কথাটা সে ভোলে নি বরং একটা অনাগত আনন্দ ও পুলকে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্কের মত কি ভাবে, ডেকে জিজ্ঞেস করলে টুনু তার স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না। টুনুর ভাষা নেই। ওর ভাবভঙ্গী ভাষার চেয়ে স্পষ্ট; চোখ মেলে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়।

লক্ষ্মীর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। কাজের ভিড়ে টুনুকে আজ একবারও চোখে দেখি নি। নিজের মনে হয়ত কোথাও চুপ ক'রে ব'সে আছে কিংবা বিয়ের স্বপ্নে তন্ময়

হয়ে আছে। কিন্তু পরদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও টুনুকে লক্ষ্মীর কাছছাড়া হ'তে দেখি নি, লক্ষ্মীর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বার-কয়েক কাছে ডেকেছি, কিন্তু টুনু সাড়া দেওয়া আবশ্যক মনে করে নি। অথচ লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর ও নিজে থেকেই আমার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বললে—দিদি চলে গেছে বড়-দাদা। টুনুর মুখে হাসি থাকলেও চোখে জলের অভাব ছিল না। ও পুনরায় বললে—বিয়ে ভাল না—কিন্তু মুখে সে বিয়ের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ রায় দিলেও নিজের বিষয়ে সে অস্বাভাবিক সচেতন। টুনু আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের চেহারা আয়নায় দেখে। শাড়ীটা রকমারি ক'রে ঘুরিয়ে পরবার চেষ্টা করতেও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি। বাপের কাছে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এক জোড়া হিল-তোলা জুতার জন্য আবেদন জানায়। সোজাসুজি প্রত্যাখ্যাত হয়। টুনু হাসে কিন্তু পুনরায় তার আবেদন পেশ করে না; হয়ত মনেও থাকে না।

আমি টুনুর হয়ে সুপারিশ করতে গিয়ে বিফল হয়েছি। কাকা বলেন—মিথ্যে খরচ করবার মত পয়সা তাঁর নেই। যার গতিবিধি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার প্রয়োজনও সেই ভাবের হওয়া উচিত। প্রয়োজনের জন্যই ব্যয় করা, ব্যয় করার জন্য প্রয়োজন নয়।

হয়ত তাই—আমি নীরব রইলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, টুনুর সম্বন্ধে আমি আর ভবিষ্যতে কোন কথাই বলব না। নিজে আমি অক্ষম। আমার কথাও তাই মূল্যহীন। কিন্তু আমার বক্তব্য আর বেশী দূর টেনে চলব না। আমার নিজের মধ্যেও একটা অবসাদ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া এখানকার মেয়াদ আমার শেষ হয়ে গেছে। কাকা ঠিকই বলেছেন, প্রয়োজনের জন্যই আয়োজন, আমার প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেছে। আমি বিদায় নিলাম।

এখান থেকে একেবারে বিদায় নিতে পারলে বোধ করি ভাল ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। সম্ভব হয় নি বলেই আমার এই কাহিনীর অবতারণা।

যাওয়া-আসাটা ক্রমশই ক'মে এসেছিল। মাঝে মাঝে যাই, লক্ষ্য করি। টুনুর যেন একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে, ঠিক তেমনি ক'রে আর কাছে আসে না। কারণে-অকারণে হাসির মাত্রাটাও যেন হ্রাস পেয়েছে। ওর হাসিটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে থামতে হয়, পিছন ফিরে ভাবতে হয়।

কথাটা খুড়ীমাকে জানিয়েছিলাম। তিনি হেসে বলেন—তোরও দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে। ওর আবার পরিবর্ত্তন! ওকি মানুষ! ওর চেয়ে একটা জন্তুজানোয়ারের পর্য্যন্ত বুদ্ধি আছে। তা হয়ত আছে তবুও খুড়ীমার কথায় বাধা দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোর ভুল হয়েছে। তুই আর ওকে কদ্দিন দেখছিস—আমি দেখছি টুনুকে নিত্য ত্রিশ দিন।

ইচ্ছে হ'ল বলি, সেই জন্যই আপনার চোখে কিছু পড়ে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমি নীরবই থেকে গেলাম। অথচ টুনুকে বাদ দিয়ে যুঁইয়ের বিয়ের আয়োজনকে আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করতে পারি নি, যদিও সংসারের পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক। টুনুর অশিক্ষিত অপরিণত যৌবনের কোন মূল্যই সে পাবে না। কোন সুরুচিসম্পন্ন যুবকই তাকে গ্রহণ করতে চাইবে না। মানুষের অবজ্ঞার বহ্নিতে টুনু শুকিয়ে যাবে—ওর কোন স্থূল অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকবে না।

বাড়ীময় আবার একটা চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেছে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে দেখা দিয়েছে। লোকের প্রয়োজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই হয়ে থাকে।

টুনু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চোখে মুখে ওর বিষাদের ঘন ছায়া, কথার ভাণ্ডার যেন ওর শেষ হয়ে গেছে। আমাকেও টুনু এড়িয়ে চলে। কাছে ডাকি—পাশে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু তেমনি ক'রে হাসির অনর্গলতায় সহজ হয়ে উঠতে পারে না। যুঁইয়ের বিবাহকে কেন্দ্র ক'রেই টুনুর এই পরিবর্ত্তন, হয়ত নিজের সম্বন্ধে টুনু আজকাল ভাবতে চেষ্টা করছে, কিংবা ওর কাঁচা অপরিণত মনের এ আর একটা দিক্।

আলো, বাদ্য ও সমারোহ সেবারের মত হ'ল না—বাহুল্যবর্জ্জিত কিন্তু প্রয়োজন মত। টুনুর জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয়েছিল; মেয়েটার জন্য সত্যই মায়া হয়। কিন্তু টুনুর বর্ত্তমান চালচলন দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। সকলের সঙ্গে সেও রীতিমত মেতে উঠেছে। ওকে যে সকলেই এড়িয়ে চলে একথাটাও টুনু আজ আর বুঝতে চায় না। ও যেন সাবেক দিনকেও হার মানিয়েছে। কারণে-অকারণে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়··· ও যেন আরও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে টুনুর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছি। ও আজ আগাগোড়াই নূতন। ওর অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন সামঞ্জস্য নেই। তবুও কেউই

ওর সঙ্গে স্বেচ্ছায় কথোপকথনে সময় নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। টুনুর অপরাপর বোনদের সঙ্গে তার যে একটা মস্তবড় ব্যবধান আছে, এ-কথাটা দু-দিনের অতিথিরাও টের পেয়েছে। মানুষের অবহেলা করবার প্রবৃত্তি এমনি ক'রেই পথের সন্ধান ক'রে নেয়, এমনি অন্ধ গতিতেই তা এগিয়ে চলে।

বিয়ের পর্ব্ব প্রথম রাত্রেই শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী স্তব্ধ। শুধু বৈদ্যুতিক আলোগুলি সমানে জ্বলছে। কাকা খুড়ীমা এবং আমি পর দিনের বিদায়পর্ব্বের একটা খসড়া করছিলাম। টুনু এসে উপস্থিত; অপ্রত্যাশিত তার আগমন। কোন কথা না ব'লে হঠাৎ সে তার মা-বাবার পায়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল এবং কি ভেবে আমার পায়ের উপরও একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা চলে গেল। কাকা একটু হেসে বললেন—পাগলীর কত রকমের খেয়ালই আছে। খুড়ীমার মুখেও হাসির ব্যতিক্রম ঘটল না। টুনুর আজকের ব্যবহারের মধ্যে কাকা অথবা খুড়ীমা সাধারণ পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু দেখেন নি, কিন্তু আমি বরাবরই একটু সন্দিগ্ধ—সব ব্যাপারই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তলিয়ে দেখি। এর জন্যে মিথ্যা অনেক দুঃখ পেতে হয়, কিন্তু আবাল্যের স্বভাবকে আমি বদলাতে পারি নি। একটা কথা সব সময়ই আমি ভাবি এবং বিশ্বাস করি যে, মানুষের যতটুকু আমাদের চোখে পড়ে, ঠিক তাই তারা নয়, তা ছাড়াও জানবার এবং বুঝবার অনেক কিছু থেকে যায়।

রাত এখন দুটো, ঘুমের প্রয়োজন উপলব্ধি করছি কিন্তু ঘুম আসে না। কেমন একটা তীব্র অস্বস্তির ভিতর দিয়ে ঘণ্টাখানেক শেষ হয়ে গেল। নিঃশব্দে ছাদে গেলাম। আকাশে অজস্র তারা জ্বলছে, দৈবাৎ একটা তারা খসে পড়ল নিয়তির নিষ্ঠুর টানে।

ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিন্তু এত বড় বাড়ীটা নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এই-বাড়ীতে এত বড় একটা উৎসব হয়ে গেছে তার সাক্ষীস্বরূপ শুধু আলোগুলোই জ্বলছে। জীবন নেই, রয়েছে স্মৃতি।

টুনুর কথাই ভাবছিলাম। ওর আজকের ব্যবহার সত্যই ভেবে দেখবার মত। আমি অভ্যস্ত নই, তাই হয়ত বিস্মিত হই, ওকে নিয়ে নানা রকমের উদ্ভট কল্পনা করি, খুড়ীমা ও কাকার খুঁটিনাটি কাজের সমালোচনা ক'রে নিজে নিজেই দুঃখ পাই। আমার এই অনাবশ্যক মাথা-ঘামানোর কথা কেউ জানে না; জানাই না, কারণ সহানুভূতি পাই না। দু-দিনের জন্য আসি, দু-দিনেই চলে যাই, সেই জন্যেই নাকি টুনু আমার কাছে তিক্ত হয়ে ওঠে নি—নইলে এ ভালমানুষী আমার কোথায় থাকত? এখানকার সকলেরই এই মত; তাই নীরব থাকি। কি জানি হয়ত কথাগুলির মধ্যে কিছু সত্য আছে। ওরা অভিজ্ঞ। ওদের অভিজ্ঞতার মূল্য আমার চেয়ে ঢের বেশী।

নীচে থেকে একটা দাপাদাপির শব্দ কানে এল। উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। শব্দ লক্ষ্য ক'রে খানিক এগিয়ে গেলাম। চমকে উঠলাম—আগুন! বিবাহমণ্ডপের ওপাশ থেকে একটা আগুনের শিখা মুহূর্ত্তের জন্য এপাশে ছুটে এসে স্থির হ'ল। ভাল ক'রে চেয়ে দেখার অবকাশ হ'ল না, ছুটে নেমে গেলাম। যাবার পথে বার-কয়েক হাঁক দিয়েছিলাম মনে পড়ে। সুপ্ত বাড়ীটা এক মুহূর্ত্তে জেগে উঠল।

টুনু আগুনে পুড়ে গেছে। তাকে আর চিনবার পর্য্যন্ত উপায় নেই, শুধু তার কণ্ঠস্বরের কাতরোক্তি তাকে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করেছে।

টুনু মরেছে— তার ষোল বছরের লাঞ্ছিত জীবন এমনি ক'রেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু টুনুর এই মৃত্যু আজও আমার কাছে কতকটা দুর্ব্বোধ্য। শুধু একটা প্রশ্ন হয়ে বেঁচে আছে। জানি না টুনু তার পূর্ব্বজ্ঞান ফিরে পেয়েছিল কি না—হয়ত পেয়েছিল, তার বিগত জীবনের ইতিহাস তার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, তাই সে প্রতিশোধ নিয়েছে। নিজের জীবন দিয়ে জীবনের মূল্য জানিয়ে দিয়ে গেছে।

* * *

নিপুর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এল,—এখানে চুপচাপ ব'সে আছ আর আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি। একা আমি কত দিক সামলাব?

উঠে দাঁড়ালাম—কথাটা সত্য, বেচারা সারাদিন খাটছে।

চয়নিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৪৪ সালে পুনর্মুদ্রিত। মূল্য—কাগজে মলাট, ২৸৹; কাপড়ে বাঁধান, ৩।৹ ও ৪৲। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তক এ পর্য্যন্ত ১২ বার মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রণে ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬+৪৮৮+৮। মুদ্রণ পরিপাটি, কাগজ উৎকৃষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন্ কবিতাগুলি উঁহার পাঠকদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলে চয়নিকা প্রকাশিত হয়। ইহার কোন কবিতা কবি স্বয়ং বাছিয়া দেন নাই। কিন্তু ইহা যে লোকপ্রিয় সংগ্রহ, তাহা ইহার দ্বাদশ বার মুদ্রণেই প্রমাণিত হইতেছে। কবি নিজে তাঁহার যে সকল কবিতা বাছিয়া দিয়াছিলেন তাহা "সঞ্চয়িতা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মুদ্রণে "চয়নিকা"তে ১২৯০ সালে প্রকাশিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী," "প্রভাতসঙ্গীত," এবং "ছবি ও গান" হইতে গৃহীত কয়েকটি কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত "প্রান্তিক" পুস্তকের দুইটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৩৪১ সালে মুদ্রিত পুস্তকে যাহা ছিল, তাহার উপর ইহাতে "শেষ সপ্তক", "বীথিকা", "পত্রপুট", "শ্যামলী" "খাপছাড়া," "ছড়ার ছবি" এবং "প্রান্তিক" হইতে কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

এমন অনেক কবিতা আছে, যাহা "চয়নিকা" ও "সঞ্চয়িতা" উভয়েই আছে; আবার এরূপ কবিতাও আছে, যাহা একটিতে আছে অন্যটিতে নাই।

ড.

কুরল—প্রাচীন তামিল নীতিগ্রন্থ। তিরুবল্লুবর-রচিত প্রাচীন তামিল কাব্যের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডী-লিট্, এফ-আর-এ-এস-বী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সংবলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির, কলিকাতা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৸৹; সাধারণের পক্ষে ২।৹। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ব্যতীত রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকা এবং A. Sattanathan, M. A. প্রণীত ইংরেজী Forewordও ইহাতে আছে।

খ্রীষ্টীয়ানরেরা বাইবেলকে যেরূপ সম্মান দিয়া থাকেন তামিলভাষী হিন্দুরা "কুরল" গ্রন্থকে সেইরূপ সম্মান দেন। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। নীতিগ্রন্থ হইলেও ইহা নীরস নহে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"লোকপ্রিয়তায় ইহা তামিল ভাষায় অদ্বিতীয় পুস্তক। প্রস্তুত গ্রন্থ এই প্রাচীন, উপাদেয় এবং জনপ্রিয় তামিল পুস্তকের অনুবাদ। মূল তামিল ভাষা হইতে অনূদিত না হইলেও ইহার দ্বারা বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের একটি গরিষ্ঠ ভাষার অমূল্য রত্নস্বরূপ এই পুস্তকের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থের শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক সংস্কৃতির প্রসারকল্পে বিশেষ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, বাঙালী পাঠকবর্গের সমক্ষে ইহা উপস্থাপিত করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণে এই অভিনব সুরভি ও বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া বঙ্গভাষা সরস্বতীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রসার-বিষয়ে যত্নবান্ প্রত্যেক বাঙালী এই জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন।"

"শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু প্রাচীন তামিল সভ্যতার যে পরিচয় তাঁহার অনুবাদের পরিশিষ্টে দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও মোটামুটি ভাবে বাঙালী পাঠকের পক্ষে উপকার হইবে। নলিনীবাবুর অনুবাদটি প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য; এবং স্বজাতির প্রতি ও তিরুবল্লুবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তামিল-ভাষী অনুবাদকের ইংরেজী অনুসরণ করায়, মূলের অনেকটাই তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যাইবে।"

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

"দুই হাজার বৎসর যাবৎ এই গ্রন্থখানি তামিলভাষাভাষী জাতির নিকট বেদের সম্মান পাইয়া আসিয়াছে। ইহাতে ভগবদ্-ভক্তির কথা আছে, কিন্তু স্তবস্তুতি এবং বাহিরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি কথাও নাই। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চরিত্রনীতি, দাম্পত্য প্রেমের পূর্ব্বাবস্থা ও পরিণতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে কুরলের রচয়িতা বল্লুবর উপদেশ ও বিবৃতি দিয়াছেন; ইহা কোন কোন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায়, কোথাও বা স্মৃতি বা নীতি গ্রন্থের ন্যায়, কিন্তু পুস্তকখানির সর্ব্বত্র এমন একটি সরলতা ও ভাবপ্রবণতা আছে, যাহাতে ইহা কোন স্থানেই নীরস হয় নাই। বইখানি একটি কবিত্ব ও জ্ঞানের খনির ন্যায় বোধ হইতেছে।"

"যাহা হউক, যে কাজটা তরুণ লেখকদের মধ্যে কেহ করিলেই আমরা বেশী সুখী হইতাম, সেই শ্রমসাধ্য কার্য্যটি প্রায় অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয় করিয়া আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই ভাবে বৌদ্ধ জাতকগুলিও কিছু দিন পূর্ব্বে অপর এক জন পরিণতবয়স্ক প্রবীণ বিরাট সাহিত্যিক অনুবাদ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। এই সকল প্রচেষ্টা কি বিগত যুগের পাণ্ডিত্যের বিদায়ধ্বনি? আমাদের সবুজেরা কি শুধুই হাত পা গুটাইয়া গল্প রচন ও পঠনে ব্যাপৃত থাকিবেন? যদিও এখন বেকারসমস্যা ও অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহারা কতকটা হৃতশক্তি ও উৎসাহশূন্য হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা কোন উচ্চ লক্ষ্য ও বিরাট কার্য্য হাতে লইলে তাঁহাদের লুপ্ত উদ্যম ও আশা ফিরিয়া পাইবেন।"

"এই গ্রন্থ ১৩৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ৪টি গ্রন্থের উপক্রমণিকা, তৎপর ৩৪টি পরিচ্ছেদে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবনের কথা এবং ৭০টি রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ক এবং অবশিষ্ট ২৫টি পরিচ্ছেদে দাম্পত্য প্রেম আলোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে,১১টিতে প্রিয়-বিরহের কথা আছে।"

ড.

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম ও রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য এক টাকা।

নাম হইতেই এই দুইখানি পুস্তকের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং তদুপরি ইহাদের লেখক যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞাপন-মূলক পুস্তক-পরিচয় নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যকতা নাই। আমি এই সুযোগে, কাব্য-সমালোচনা হিসাবেই কিছু লিখিব, কান্তিবাবুর কবিতার সে দাবী আছে। বই দুইখানি সাতিশয় ক্ষুদ্রাকার, ৫½"×৪½", পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। দুইখানিরই শ্লোক-সংখ্যা পঁচাত্তর। অতএব ইহাদিগকে কাব্য-চটিকা বলাই ঠিক। কিন্তু চর্ম্মচটিকা নয়, কারণ কাপড়ে বাঁধাই। মূল্য সে হিসাবে একটু বেশীই বলিতে হইবে, কিন্তু সাকী, পেয়ালা ও গুলবাগিচার ভক্ত যাহারা তাহারা সাধারণতঃ একটু দিলদরিয়া প্রকৃতির লোক, অতএব এইরূপ শিরাজী-শরাবের মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও তাহাদের নেশা ছুটিবে না, বরং ইহার স্বাদ বৃদ্ধি পাইবে। তথাপি পেয়ালার চেহারা আর একটু ভাল হইলে ক্ষতি ছিল না; কারণ লেখক যে-যুগের রস পরিবেশন করিয়াছেন সে-যুগের লক্ষণই হইল—"সুদীর্ঘ অবসর, সুলভ পরিচ্ছদ ও সুপ্রচুর শিষ্টাচার।" অতএব কাব্যের পরিচ্ছদ একটু সুলভ হওয়াই উচিত ছিল। বই দুইখানিতে প্রকাশের তারিখ কুত্রাপি নাই, ইহা যে কোন্ সংস্করণ তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। প্রথম কাব্যখানি বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এত দিনে অনেকগুলি সংস্করণ হইবারই কথা, অতএব সে-বিষয়েরও কোন উল্লেখ না-থাকায় সন্দেহ হইতেছে, লেখক বোধ হয় তাঁহার রচনাকে কালাতীত দেখিতে চান। কিন্তু আমাদের যে কালের হিসাব না-রাখিলে চলে না, তারিখ ও সংস্করণগুলির হিসাব থাকিলে, বাংলা দেশে রস-পিপাসু পাঠকের সংখ্যা অনুমান করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারা যাইত। পুস্তকের তারিখ যে আরও অনেক কারণে কত প্রয়োজন, শিক্ষিত বাঙালীকে কি আজও তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে? ইহাও কি প্রেস-আইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না? ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, বাংলা পুস্তকে তারিখ পাওয়া কত দুর্ঘট। ফিট্‌জিরাল্ডের কাব্যখানিকে তিনি যে চপল চটুল ভঙ্গীতে বাংলা ছড়ায় ঢালিয়া সাজিয়াছেন, তাহা বাঙালীর পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা জমাট বা কঠিন হইলে, ঈসপের গল্পের সেই পক্ষীর মত, বাঙালী তেমন রত্নকণিকা স্পর্শ করিত না। পেয়ালা ঠুনকো না হইলে ঠুনঠুন আওয়াজ হয় না। ফিট্‌জিরাল্ডের কবিতার ভাষা, ছন্দ ও ভাবের গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও জনৈক ইংরেজ সমালোচক তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে ভক্তগণ নিশ্চয়ই চটিবেন, আমিও চটিয়াছি—কিন্তু আমাদের ফিট্‌জিরাল্ড সম্বন্ধে কথাগুলি সত্য বলিয়াই মনে হয়—

> "Its easy pessimism and cult of pleasure, its delightful freedom from demand for continuous thought from its readers, its appeal to the indolence and moral flaccidity which is implicit in all men, all contributed to its immense vogue; and among people, who did not perhaps fully understand it but were merely lulled by its sonorousness, a knowledge of it has passed for the insignia of a love of literature and the possession of literary taste."

ইহার শেষ কথাটি আমাদের দেশের খৈয়াম-ভক্ত কবি অনুবাদক ও পাঠকদের সম্বন্ধে সত্য বলিয়াই মনে হয়। তাই আমাদের দেশে অনুবাদেরও অন্ত নাই; ওদেশে ফিট্‌জিরাল্ড এক জন মাত্র, আমাদের দেশে সকলেই, কারণ শুধু পাঠক নয়, খৈয়াম হইবার জন্য সকলেই লালায়িত। কিন্তু কান্তিবাবুই এ পর্য্যন্ত জিতিয়াছেন, তরল ভাষা ও চপল ছন্দে আর কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারে নাই। ভাষা অর্থ ও ছন্দ—সকল বিষয়েই তিনি যেরূপ নিরঙ্কুশ হইতে পারিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি ফিট্‌জিরাল্ডের কবিতায় যেটুকু জল মিশাইয়া তাহাকে শরবৎলিপ্স্ বাঙালীর রসনাতৃপ্তিকর করিয়াছেন তাহাতেই উহা একটি নূতন পেটেন্ট বস্তু হইতে পারিয়াছে; এই জন্য কান্তিবাবুর অনুবাদ এক হিসাবে সফল হইয়াছে। কিন্তু এই সাফল্য লাভের জন্য তাঁহাকে খাঁটি সাহিত্যিক উৎকর্ষ হারাইতে হইয়াছে। ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি ভাষাকে বহু স্থানে পীড়িত করিয়াছেন, এবং মূলের অর্থগৌরবও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। রুবাই-জাতীয় কবিতার মিলবিন্যাসরীতির জন্য যে একটি ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হয় যাহা উহার মর্ম্মটিকেই যেন মর্ম্মরিত করিয়া তোলে, লেখক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার চতুষ্পদীর প্রত্যেক চরণে ঘুঙুর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভাবের সুর ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভাষার সম্বন্ধে তিনি শুধুই অসতর্ক নহেন, অনাবশ্যক অবহেলা দেখাইয়াছেন, যথা—'বীজ রোপণ', 'পেয়ালাটুক', 'মদিরটুক' 'রসান-স্তূপ', 'সমাধ-ভূমি', 'রসজ্ঞানে নই গভীর' ইত্যাদি। 'বঁধু' সর্ব্বত্র 'বঁধূ' (উ-কার) হইয়াছে। 'অনুবাদের মৌলিকতায়' আপত্তি নাই যদি তাহা স্বতন্ত্র ভাবে সুন্দর হয়। কিন্তু যেখানে তাহা অনুবাদ মাত্র, এবং সে অনুবাদে ভাব অথবা অর্থের হানি হয়, সেখানে তাহা নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য নয়। দৃষ্টান্ত দিব। প্রথম রুবাইটি মূলে আছে এইরূপ—

> Awake! for Morning in the Bowl of Night
> Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:
> And Lo! the Hunter of the East has Caught
> The Sultan's Turret in a Noose of Light.

ইহার অনুবাদ—

> রাত পোহালো শুনছ সখি, দীপ্ত ঊষার মাঙ্গলিক?
> লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক।
> পুব গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
> পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।

মূল শ্লোকে যে-দুইটি উপমামূলক চিত্র আছে কান্তিবাবু তাহার অনুবাদে অতিশয় সস্তা কাব্যির শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইংরেজ কবি এ-বিষয়ে যেমন সমঝদার তেমনই সতর্ক—যে অনুপম লিপিকৌশলে তিনি এই খাঁটি ফার্সী কাব্যমুক্তা দুইটিকে তাঁহার ইংরেজীতে গাঁথিয়া লইয়াছেন তাহাতে তিনি রসিকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। কান্তিবাবু 'মাঙ্গলিক' ও 'কিরণ তীর'এর সাহায্যে মুস্কিল আসান করিয়াছেন। আর একটি স্থান উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে, লেখক বাঙালী পাঠকের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মতে যথেষ্ট—তাহার অধিক যত্ন বা শ্রম-স্বীকার তিনি অনাবশ্যক মনে করেন। ফিট্‌জিরাল্ডে আছে—

> At once the silken Tassel of my Purse
> Tear, and its Treasure on the Garden throw.

ইহার অনুবাদ হইয়াছে এইরূপ—

> পৃথ্বী 'পরে উঠছি ফুটে গর্ব্বে পরি রঙীন সাজ
> পাপড়ি টুটে ছড়িয়ে মোদের জীবন রেণু-পরের মাঝ।

অতএব বাঙালী কবির হস্তাবলেপে ফিট্‌জিরাল্ডের গোলাপগুলির দুর্দ্দশাই হইয়াছে বলিতে হইবে। বাংলায় যখন Purseএর উপমাটি নাই তখন অবশ্য Treasureএর টীকা স্বরূপ

'জীবন-রেণু' ছাড়া আর কি লেখা যায়? কিন্তু, ওই "silken tassel of my purse"এর মত এমন মনোহর উপমাটি অনুবাদে ত্যাগ করা হইল কেন?—silken tassel ত পাপড়ি নয়, রেণুর সঙ্গেও পাপড়ির সম্পর্ক নাই! কেবল 'দিল পিয়ারা'ও 'গুলবাগিচা'র জোরেই ফিট্‌জিরাল্ড এই ফার্সী কবিকে আধুনিক যুরোপীয় কাব্য সাহিত্যে নব জন্ম ও অমরতা দান করিতে পারেন নাই। কান্তিবাবু বইখানির নামটিকেও ফার্সী করিতে গিয়া (ফিট্‌জিরাল্ড তাহা করেন নাই) ফার্সীয়ানাই করিয়াছেন—বানান ঠিক হয় নাই। কান্তিবাবুর অনুবাদ ইংরেজীতে যাহাকে বলে pretty pretty— তাহাই হইয়াছে; স্থানে স্থানে দুই-একটি শ্লোক বা এক আধ পংক্তি যে চমক লাগায় না এমন নহে; তথাপি আর একটু সাধনা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠা থাকিলে কান্তিবাবুর হাতেই এগুলি যেমন হইতে পারিত তাহা হয় নাই, ইহাই বলিতে গিয়া প্রসঙ্গ দীর্ঘ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় কাব্যখানির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই হাফিজের কবিতা সম্মুখে না থাকায় বলিবার উপায়ও নাই। তথাপি পরিচয় স্বরূপ আমার ভাল লাগিয়াছে, এমন কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কোনও রূপে কর্ত্তব্য শেষ করিলাম।

শতেক নরক ভুগতে রাজি ধূম্র অন্ধকারে,
বিশ্বজগৎ চুর হ'য়ে যাক ভাগ্য-জাঁতার ভারে,
আর্জ্জিতে মোর পেশ করেছি অনিচ্ছাটি পুরা—
ভণ্ড সাথে টানতে না হয় সুরাই হ'তে সুরা। (১৬)

গালের পাশের তিলটি কালো আছেই না হয় আঁকা,
তারির তরে গর্ব্ব এত—মুখ ফিরিয়ে থাকা?
তিলটি তোমার শুনলে পরে করবে নাকি মাফ?—
আমারি এক গোপন চিঠির একটি ক্ষুদ্র ছাপ। (২২)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

হাস্য-কৌতুক—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দেব দ্বিবেদী প্রণীত এবং কলিকাতা, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরু লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ আনা ও ছয় আনা।

বই দুখানিতে বর্ণমালা হইতে যুক্তাক্ষর বানান পর্য্যন্ত সমস্তই আছে। ছেলেদের প্রথমপাঠ্য পুস্তক যত সরস হয় ততই ভাল। চিত্র ও পদ্য দিয়া গ্রন্থকার সেই সরসতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রচ্ছদপটের ছবি দুইটি কৌতুকপ্রদ, ভিতরের গুলিও সুচিত্রিত। দ্বিতীয় ভাগে গল্পচ্ছলে কয়েকটি কৌতুক কবিতাও আছে। 'করল', 'চলল', বানানকে জটিল করিয়া 'ক'র্‌ল', 'চ'ল্‌ল' করিবার কোন কারণ নাই, বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য পুস্তকে। বই দুখানির ছবি, ছাপা ও কৌতুক কবিতা ছেলেদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, আশা করা যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য। প্রকাশক—শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, বহরপুর, জিলা ফরিদপুর। মূল্য দশ আনা। কাপড়ে বাঁধাই, চৌদ্দ আনা।

ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে মানুষ যে অমানুষ হয়, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ লেখক ত্রুটিসংশোধনের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। লেখক ছাত্রসমাজের দুর্দ্দশাবিষয়ে সচেতন, এবং দুর্দ্দশা দূরীকরণে সচেষ্ট। পুস্তকপাঠে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা, মর্ম্মজ্ঞতা এবং প্রাণবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্টও তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেখকের রচনাশৈলী গম্ভীর, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের আশুপ্রকাশন বাঞ্ছনীয়।

উপদেশ ভাল, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আপত্তি আছে, ধর্ম্মশিক্ষায় উৎসাহী মহাজনেরা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে ভাল হয়। প্রথমতঃ, লেখক মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম সভারে শিখান'। তিনি ইহা বিলক্ষণ জানেন যে যাঁহারা নিজেরা ধর্ম্মজীবন যাপন করেন না তাঁহাদের উপর ধর্ম্মশিক্ষার ভার দিলে সকলই ব্যর্থ হইবে; অন্য শিক্ষায় যেমন তেমন, ধর্ম্মশিক্ষক শুদ্ধ সংযত মর্ম্মজ্ঞ না হইলে শিক্ষা যে নিতান্ত প্রহসন হইয়া দাঁড়াইবে, সে কথা কি আমাদের শিক্ষাসংস্কারকেরা ভাবিয়া দেখেন নাই? রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়গুলির কয়টি আজ বর্ত্তমান, কয়টি বা পূর্ণতেজে বর্ত্তমান। তত্ত্ববিদ্যামন্দির শুধু তত্ত্বজ্ঞানী বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সাহায্যেই গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। তবে বক্তৃতা নয়, কার্য্যতঃ চাই।

দ্বিতীয়তঃ, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যসাধনার কথা বিদ্যালয়ের মধ্যে বলিয়া, বিদ্যালয়ের সীমানার বাহিরেই যদি ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রচুর উপকরণ রাখিয়া দিই তবে তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার কতটুকু অনুকূলতা করিবে? আমাদের শিক্ষালয়ের পরিকল্পনা শুধু নয়, তাহার সংস্থিতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রকৃতিও যে বদলাইতে হইবে, না হইলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিতেছি বই ত নয়!

তৃতীয়তঃ, প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষার ভার শুধু বিদ্যালয়ের উপর দিলে চলিবে কেন? পরিবারেরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, পিতা-মাতা পাড়াপ্রতিবেশী এ সকলের প্রভাব আছে, সে প্রভাব যদি বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষা তেমন কাজ করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মচর্যকে ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার অন্তর্গত পরম বিষয়ে পরানুরক্তির উপর জোর না দিলে দেখা যায়, উহা ধোপে টেকে না। লেখক মহাশয় যেমন খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছেন, তেমনই ভাবে বিষয়ের আলোচনা চাই, ইন্দ্রিয়গত জীবনের পরিবর্জ্জনে নহে, উহার সংযমেই ভোগের পরিপূর্ত্তি—একথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার দিন আসিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা'কে কেহ যেন 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা' বলিয়া ভুল না করেন। অনেকে করেন দেখিতেছি বলিয়াই একথা লিখিলাম।

আজকাল ধর্ম্মশিক্ষার ধুয়া খুবই শুনিতে পাই, কিন্তু শিক্ষক দুষ্প্রাপ্য। শিক্ষাপুস্তক লিখিলে চলিবে না, গীতা বাইবেল ধম্মপদ পড়াইলে ছাত্রদের উপর অবথা অত্যাচারই হইবে, 'অবশ্যপাঠ্য' বা 'অবশ্যশিক্ষণীয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও ফল হইবে না, ধর্ম্ম ভাল জিনিষ, কিন্তু তাহার শিক্ষা অত সহজ নয় যত আমাদের সংস্কারকেরা মনে করেন; তাই এত কথা বলিতে হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রাণের দান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তার পর হতে, তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চলো চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায় ফেলায়।
প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি'
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি,
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।
আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে ; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায় ; পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

পসারিণী

পাঠিকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক খোদিত লিনোকাট হইতে

তরাইয়ের তরুণী

[শ্রীযুক্তা ডক্টর সেলমা লাগেরলভের মূল সুইডিশ উপন্যাস হইতে
তাঁহার অনুমতি অনুসারে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্তৃক অনূদিত]

শ্রীসেলমা লাগেরলভ ও শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

অনেকেই তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া আজ ঈর্ষান্বিত হইতে পারিত, আজ সকলেরই স্নেহপ্রীতি সে ভোগ করিতে পারিত, নৃত্যগীতের মধ্যে অতি আনন্দে আজ সে দিন কাটাইতে পারিত; তাহার এই বড় সুখের দিন যে চলিয়া গেল।

এরল্যাণ্ড এক-এক বার গুডমুণ্ডের দিকে তাকাইতেছিলেন। সকাল বেলা তাহার চোখ দুইটি যেমন উজ্জ্বল ছিল এবং তাহাকে যেরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল, সে সমস্তই যেন এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন সে বিতৃষ্ণার সঙ্গে শক্তিহীনের ন্যায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে বসিয়া ছিল। তাহার পিতা মনে মনে ভাবিলেন, তাহার পুত্র কি তবে নিজের স্বীকারোক্তির জন্য অনুতাপ করিতেছে? প্রথমে তিনি তাহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়াছিলেন —কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁহার মনে হইল যে নীরব থাকাই ভাল।

কিছুক্ষণ পর গুডমুণ্ড জিজ্ঞাসা করিল—"এখন তবে কোথায় যাওয়া যায়? থানায় গিয়া পুলিসের কাছে সব কথা বলা ভাল না কি?"

তাহার পিতা উত্তর দিলেন—"আমি মনে করি আগে বাড়ী যাওয়া ভাল। তোমার বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন। গত রাত্রিতেও তুমি ঘুমাইতে পার নাই।"

"মা আমাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবেন।"

উত্তরে এরল্যাণ্ড বলিলেন—"তিনি খুব বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। আমি যতটা জানি তিনিও ততটা জানেন। তুমি যে স্বীকারোক্তি করিয়াছ সেজন্য তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।"

গুডমুণ্ড বিতৃষ্ণভাবে উত্তর করিল—"আমার মনে হয় মা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলেরই ইচ্ছা যে, আমি জেলে যাই।"

তাহার বাবা ইহার উত্তরে বলিলেন—"আমি জানি সত্য পথে চলার জন্য তোমাকে অনেক কিছু হারাইতে হইতেছে, কিন্তু তুমি যে মিথ্যা প্রলোভনকে জয় করিয়াছ, সেজন্য আমরা আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

গুডমুণ্ডের মনে হইল, এখন বাড়ী ফিরিয়া সকলের মুখে তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট করার জন্য প্রশংসা-বাক্য শোনা অসম্ভব। নিজে আরও শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে তাহার মন চাহিতেছিল না। সেজন্য সে অজুহাত খুঁজিতেছিল। ঠিক এই সময়ে গাড়ী চোরাবালি যাইবার পথের মুখে আসিয়া পৌছিয়াছে।

"বাবা, এখানে কি থামিতে পারা যায়? আমি হেলগার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে চাই।"

তাহার বাবা গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—"যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী ফিরিবার কথা ভুলিও না; তোমার বিশ্রাম লওয়া উচিত।"

গুডমুণ্ড বনের মধ্যে ঢুকিল; অল্পক্ষণ পরেই সে তাহার পিতার দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। হেল্‌গার সঙ্গে দেখা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে শুধু কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে না গিয়া কিছুকাল একাকী কাটাইতে চাহিয়াছিল। প্রত্যেকটি বিষয় তাহার মনে শুধু অর্থহীন ক্রোধের সঞ্চার করিতেছিল। পথে চলিবার সময় পায়ের তলায় একটা বড় পাথরের টুক্‌রা পড়িয়া ছিল; সে রাগ করিয়া জোরে পাথরটাকে লাথি মারিল। একবার সে থামিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া ফেলিল—উঁহার অপরাধ এই যে—ঐ ডালের পাতা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সে প্রথমে চোরাবালির পথ দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পরে সে সেখানকার ফার্ম্ ছাড়াইয়া উঁচু পাহাড়ের উপর

উঠিতে লাগিল। সে ভুল করিয়া এমন জায়গায় আসিয়াছে যে সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপর যাইতে হইলে বড় বড় বন্ধুর পাথরের গা বাহিয়া যাইতে হয়। তাহা অত্যন্ত বিপদজনক; পা পিছলাইলে হাত-পা ভাঙিবার সম্ভাবনা। সে বিপদের কথা ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু তবু সে সম্মুখের দিকেই চলিল, বিপদের সম্মুখীন হওয়া যেন তাহার পক্ষে আনন্দের বিষয়। সে ভাবিল—"যদি আমি হঠাৎ পড়িয়া শেষ হইয়া যাই তবে কেহই আমাকে এখানে খুঁজিতে আসিবে না—খুঁজিলেও পাইবে না; আমার পক্ষে সবই সমান। বৎসরের পর বৎসর জেলখানায় বসিয়া কাটানোর চেয়ে এখানে মরিয়া থাকাই ভাল।"

তবুও কোন বিপদই তাহাকে টানিল না। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে নির্ব্বিবাদে সর্ব্বোচ্চ শিখরে গিয়া পৌছিল। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই বন একবার আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য পর্ব্বতের শিখরভাগ এখনও তরুগুল্মহীন। গুডমুণ্ড শিখরের উপর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ, হ্রদ, নিবিড়ান্ধকার বনানী, আলবাঁধা কৃষিক্ষেত্র, ছোটবড় গ্রামগুলি দেখিতে লাগিল। অনেক দূরে সাদা মেঘে-ঢাকা শহরের কতক অংশও দেখা যাইতেছিল। শহরের বড় বড় চূড়াগুলি যেন শুভ্র মেঘকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। রাস্তাগুলি সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া মিলাইয়া গিয়াছে, রেল-লাইন মাঝে মাঝে বনের মধ্য দিয়া খালের মত চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকের সমস্ত দৃশ্য ছবির ন্যায় তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল।

সে একবার নিজের পায়ের দিকে চাহিল। চারি দিকের বিপুল দৃশ্য তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল, এই বিরাট দৃশ্যের শান্তিময় গভীরতা তাহার মনের গ্লানিকে ক্রমেই দূর করিয়া দিতেছিল।

শৈশবের একটা কথা তাহার মনে পড়িল, যীশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীর বিশাল দৃশ্য দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবার জন্য পরীক্ষাকারী তাঁহাকে পর্ব্বতের উচ্চশিখরে লইয়া গিয়াছিল। ছোটবেলা ইহা পড়িবার সময় গুডমুণ্ড ভাবিত, পরীক্ষাকারী নিশ্চয় এই পাহাড়ের উপর হইতেই খ্রীষ্টকে পৃথিবীর দৃশ্যাবলী দেখাইয়াছিল। গুডমুণ্ড আবার বাইবেলের সেই কথাগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিল—"তুমি যদি হাঁটু গাড়িয়া আমার পূজা কর, তাহা হইলে এ সমস্তই তোমাকে দান করিব।"

হঠাৎ তাহার মনে হইল, গত কয় দিন এই একই প্রকার প্রলোভন তাহাকেও বশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। যীশুকে পাহাড়ের উপর লইয়া গিয়া পরীক্ষাকারী দেখাইয়াছিল যে তাহার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য কত! সে বলিয়াছিল—"তুমি যদি নীরব থাক তাহা হইলে চারি দিকে যাহা দেখিতেছ তাহার সমস্তই তোমাকে দান করিব।"

গুডমুণ্ড এই কথা স্মরণ করিয়া এবার শান্তি বোধ করিতে লাগিল। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—"আমি ত বলিয়াছি, আমি ইহা চাই না।" তখন গুডমুণ্ড ভাবিল যে তাহার নিজের দোষ লুকাইয়া রাখিলে ফল কি হইত! খ্রীষ্ট যদি নীরব থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শয়তানের পূজা করিতে হইত; শুধু ধনসম্পদের দাস হইয়া তাঁহাকে থাকিতে হইত। কখনও তিনি নিজেকে মুক্ত পুরুষ মনে করিতে পারিতেন না।

গুডমুণ্ডের মনে গভীর শান্তি আসিল, নিজের স্বীকারোক্তির জন্য সে আনন্দিত হইল। গত কয় দিনের ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইল, যেন এতদিন সে চোখ বুজিয়া গভীর অন্ধকারের দিকে যাইতেছিল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল, কেন সে সেই পথ ছাড়িয়াছে। সে ভাবিয়া দেখিল, পরিবারভুক্ত সকলের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও হেল্‌গার শুভেচ্ছাই তাহাকে এই পথ ছাড়িতে সহায়তা করিয়াছে।

সে শরীরকে হেলাইয়া দিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাটাইল। তার পর এক সময় তাহার মনে হইল, এইবার বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিতে হইবে, আমার মন এখন সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে। যাইবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় দেখিল, হেল্‌গা শিখরের নীচে সমভূমির উপর বসিয়া আছে।

হেল্‌গা যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে চারি দিকের সমস্ত দৃশ্য চোখে পড়ে না, শুধু পাদদেশের কতক অংশ দেখা যায়। নেরলুন্দাও ঐদিকে, হয়ত সে নেরলুন্দার কৃষিক্ষেত্রের কতক অংশ দেখিতে পাইতেছিল। সারাটা সকাল গুডমুণ্ড অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে নানা অশান্তিতে কাটাইয়াছে, কিন্তু এখন হেল্‌গাকে দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে দৌড়িয়া নামিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ বিস্ময়বিষ্টের মত থামিয়া গেল।

সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আমার কি হইয়াছে! আমার কি হইয়াছে!" তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মনের বিপুল আনন্দ আকস্মিকতা ও আতিশয্যে প্রায় বেদনার পর্য্যায়ে

গিয়া পৌছিয়াছে। অবশেষে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে মনে বলিল—"কিন্তু 'আমি যে তাকে ভালবাসি—আজ পর্য্যন্ত এ সত্য আমার নিজেরই জানা ছিল না!"

এই অপূর্ব্ব অনুভূতি আজ তাহার হৃদয়ে নদীর জোয়ারের মত আসিয়াছে, সমস্ত বাধাই বুঝি আজ ভাঙিয়া গিয়াছে। হেল্‌গাকে যখন হইতে সে জানিয়াছে, তখন হইতে যেন কোন্ শক্তি তাহাকে হেল্‌গার দিকে সর্ব্বদাই টানিয়াছে, কিন্তু সেই আকর্ষণ হইতে সে সর্ব্বদাই নিজেকে সংযত রাখিয়াছে। এখন তাহার হেল্‌গাকে ভালবাসিবার অধিকার হইয়াছে—অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করিবার কথা এখন সে বিস্মৃত হইলে কোন ক্ষতি নাই।

"হেল্‌গা", "হেল্‌গা" চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রস্তরময় পথ বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। হেল্‌গা হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া চাহিল, "ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে আমি"—

—"কিন্তু তোমার না এখন গীর্জ্জায় থাকিবার কথা?"

"না, না, আজ কোন বিবাহ হইবে না। হিলডুর আমাকে বিবাহ করিতে চায় না।"

হেল্‌গা উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া সে চোখ বুজিল। সে একবার মনে করিল যে, গুডমুণ্ড এখানে আসে নাই; অরণ্যের কোন অদৃশ্য শক্তির মায়ামন্ত্রে তাহার শ্রবণ ও দৃষ্টি বশীভূত হইয়াছে। হউক ইহা স্বপ্ন, তবু তাহার আগমন সত্য, মধুর।

চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—আরও কিছুক্ষণ যেন সে এই স্বপ্ন উপভোগ করিতে পারে।

ভালবাসার আবেগে গুডমুণ্ড প্রায় মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিতেছে। হেল্‌গার নিকটে পৌছিয়াই সে দু-হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। বিস্ময়ের আতিশয্যে হেল্‌গা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, তাই সে তাহাকে চুম্বন করিতে বাধা দেয় নাই। এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই সময়ে যাহার গীর্জ্জায় পুরোহিতের সম্মুখে সহগামিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবার কথা সে সত্যই এখানে এই বনের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু সে যদি তাহার ছায়াও হয় তবু তাহার হেল্‌গাকে চুম্বন দিবার অধিকার আছে।

হঠাৎ হেল্‌গা যেন জাগিয়া উঠিয়া গুডমুণ্ডকে দুই হাত দিয়া সরাইয়া দিল। হেল্‌গার মুখে অনবরত প্রশ্নের ধারা বহিয়া চলিয়াছে—"এ কি তুমি? এখানে বনের মধ্যে কেন আসিয়াছ? কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই ত? হিলডুর কি তবে অসুস্থ? পুরোহিত কি রোগাক্রান্ত?"

গুডমুণ্ড নিজের বিবাহের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিতে চায়, কিন্তু হেল্‌গা তাহার নিকট হইতে সমস্ত ইতিহাস জানিয়া লইল। গুডমুণ্ড বলিয়া যাইতেছিল, আর হেল্‌গা নিশ্চল হইয়া বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল।

গুডমুণ্ড ছুরির ইতিহাসে না-পৌছানো পর্য্যন্ত হেল্‌গা তাহার কথায় কোন বাধা দেয় নাই। ছুরির কথা শুনিয়াই সে লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল যে, সে তাহাদের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় তাহার যে ছুরি ছিল, এ সেই ছুরি কি না?

গুডমুণ্ড উত্তর করিল—"হাঁ। ঠিক ঐটাই।"

সে আবার প্রশ্ন করিল—"কয়টা ফলা ভাঙিয়াছে?"

"শুধু একটা ফলার অভাব।"

হেল্‌গার মাথায় নানা চিন্তা খেলিতে লাগিল। কপাল কুঞ্চিত করিয়া সে বসিয়া পড়িল, যেন বিশেষ কিছু মনে করিতে চেষ্টা করিতেছে। হাঁ, এইবার তাহার স্পষ্ট মনে পড়িয়াছে, সে নেরলুন্দা হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্ব দিন গুডমুণ্ডের নিকট হইতে কাঠ কাটিবার জন্য তাহার ছুরিটা চাহিয়া লইয়াছিল। তখন ইহার একটা ফলা ভাঙিয়া যায় কিন্তু তাহা জানাইবার সুযোগ তাহার হয় নাই। গুডমুণ্ড সে-সময় সর্ব্বক্ষণই তাহাকে এড়াইয়া চলিত, তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পর্য্যন্ত চাহিত না। গুডমুণ্ড ছুরিটাকে তার পর আর কখনও ব্যবহার করে নাই। কাজেই সে জানিতেও পারে নাই যে ছুরিটাতে একটা ফলা নাই। সে মাথা তুলিয়া গুডমুণ্ডকে এই কথা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু গুডমুণ্ড তখন বিবাহ-বাড়ীতে যাওয়ার কথা বর্ণনা করিতেছে বলিয়া হেল্‌গা কিছু বলিবার অবসর পাইল না—গুডমুণ্ড আগে তাহার কথা শেষ করুক। কি ভাবে সে হিলডুরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহা শুনিয়া রাগে হেলগার গা জ্বালা করিতে লাগিল। হেল্‌গা বলিয়া উঠিল—"তোমারই দোষ। তুমি ও তোমার বাবা বিবাহ-আসরে গিয়া এমন সাংঘাতিক সংবাদ দিলে যে তাহারা ভয়ে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হিলডুর আত্মস্থ থাকিলে হয়ত তোমার কথার উত্তরই দিত না। আমার মনে হয় হিলডুর এখন অনুশোচনা করিয়া দুঃখ পাইতেছে।"

গুডমুণ্ড বলিল—"তাহার সুখদুঃখ সব আমার কাছে

সমান। আমি যে তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছি সেজন্য আনন্দিত।”

হেল্‌গা নিজের ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল—গভীর রহস্যটি যেন তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া না পড়ে। গুডমুণ্ড যে নরহত্যা করে নাই, শুধু সে-কথা সে ভাবিতেছিল না। কিন্তু ঐ ঘটনা যে গুডমুণ্ড ও তাহার বাগ্‌দত্তার মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দিয়াছে। হেল্‌গা যে-রহস্য জানে, তাহার সাহায্যে সে কি তাহাদের পুনর্মিলন সাধনের জন্য করিতে চেষ্টা করিতে পারে না?

হেলগা পুনরায় নীরবে ভাবিতে লাগিল। এদিকে গুডমুণ্ড নিজের কথা বলিয়াই চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই সে হেল্‌গাকে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া ফেলিয়াছে। এমন দিনে এ-কথা শুনিয়া হেল্‌গা পরম দুঃখ বোধ করিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, গুডমুণ্ড এমন চমৎকার বিবাহ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুঃখের কারণ—যদি এখন হইতে সে তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “না, না, আমাকে ও-কথা বলিও না।”

গুডমুণ্ড উত্তর করিল—“তোমাকে আমি বলিব না কেন? তুমিও কি হিলডুরের মত আমাকে ভয় কর?”

“না, না, সেজন্য নয়”—হেল্‌গা তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছিল যে, এরূপ কথা তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। কিন্তু গুডমুণ্ড সে-কথা মোটেই শুনিতে চাহে না—“আমি শুনিয়াছিলাম যে অনেক কাল পূর্ব্বে মেয়েরা এমন ছিল যে অতি দুঃখের দিনেও তাহারা স্বামীদের সঙ্গ ছাড়িত না; কিন্তু আজকাল তেমন মেয়ে বোধ হয় দেখা যায় না।” হেল্‌গার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে স্বেচ্ছায় এই মুহূর্ত্তে গুডমুণ্ডের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিত কিন্তু তাহা না করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। গুডমুণ্ড বলিয়া চলিল—“আজ এখন আমার কারাগারে যাইবার সময় উপস্থিত, এ-সময় তোমার প্রেমভিক্ষা করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। কিন্তু যদি আমি জানি যে, কারাগার হইতে আমি না-ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহা হইলে আমি সানন্দে সমস্ত দুঃখ বহন করিব।”

“গুডমুণ্ড, তোমার জন্য যে অপেক্ষা করিবে, সে ত আমি নই।”

“সকলেই এখন আমাকে মাতাল, খুনী, পাপী মনে করিয়া ঘৃণা করিবে—এমন কেহ যদি থাকিত, যে আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখে তবে সেকথা আমাকে এই দুঃসময়ে সর্ব্বাধিক সাহায্য করিতে।”

“তুমি নিশ্চয়ই জান, গুডমুণ্ড, আমি তোমার সম্বন্ধে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল চিন্তা করি না।”

হেল্‌গা শক্তিহীনের ন্যায় অসাড় হইয়া বসিয়াছিল। গুডমুণ্ডের প্রেম যেন তাহাকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে—কি ভাবে সে নিজকে মুক্ত করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু গুডমুণ্ড তাহার মনের ভাব মোটেই বুঝে নাই—সে ভাবিল সে ভুল করিয়াছে, সে হেল্‌গাকে যত ভালবাসিয়াছে, হেল্‌গা নিশ্চয়ই তাহাকে তত ভালবাসে নাই। সে হেল্‌গার দিকে অগ্রসর হইতেছিল—যেন সে তাহার সমস্ত অন্তরটা তলাইয়া দেখিতে চায়।

“তুমি কি নেরলুন্দা দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়া বসিয়া থাক না?”

“তা সত্য।”

“তুমি কি সেখানে ফিরিয়া যাইবার কথা দিনরাত চিন্তা কর না?”

“হ্যাঁ, তা সত্য, কিন্তু কাহারও জন্য আমার মন টানে না।”

“এবং তুমি আমাকে মোটেই গ্রাহ্য কর না?”

“হ্যাঁ করি, কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই না।”

“তাহা হইলে তুমি আর কাহাকেও ভালবাস?”

হেল্‌গা এবার চুপ করিয়া রহিল।

“হয়ত বা পের মোর টেনসনকে—”

হেল্‌গা সম্পূর্ণ নিঃসহায় হইয়া উত্তর দিল—“এক সময় ত আমি বলিয়াছিই যে আমি তাহাকে ভালবাসি।”

গুডমুণ্ডের মুখমণ্ডলে রাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে হেল্‌গার দিকে একদৃষ্টে কতকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তার পর বলিল—“বিদায়, এখন হইতে আমাদের পথও স্বতন্ত্র।” এই কথা বলিয়া নীচে পাথরের উপর লাফ দিয়া নামিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৬

গুডমুণ্ড অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেল্‌গাও অন্য পথে সত্বর নীচে নামিতে লাগিল। সে কোথাও না থামিয়া চোরাবালির কাছ দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বড় রাস্তার

দিকে দৌড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। পথে এক কৃষকের বাড়ীতে পৌছিয়া এলবোক্রায় যাইবার জন্য সে তাহাদের ঘোড়ার গাড়ীটা চাহিল। সে বলিল যে, একজনের জীবন লইয়া টানাটানি এবং এখন এই সাহায্য পাইলে পরে সে ইহার জন্য যথোচিত মূল্য পরিশোধ করিবে। ইতিপূর্ব্বে গীর্জ্জার যাত্রীরা বাড়ী ফিরিয়া বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে। সকলেই এই ব্যাপারে দুঃখ ও অনুকম্পা বোধ করিতেছিল। তাই এই কৃষক-পরিবার হেল্‌গাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল হেল্‌গা কোন বিশেষ সংবাদ লইয়া বিবাহ-বাড়ীতে যাইতেছে।

হিলডুর এলবোক্রায় উপরতলায় বিবাহের সাজ-পোষাকের ছোট ঘরেই বসিয়া আছে। তাহার চারি দিকে তাহার মা ও কয়েক জন প্রতিবেশিনী বসিয়াছিলেন। হিলডুর কাঁদে নাই কিন্তু একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ সম্পূর্ণ বিবর্ণ, যেন শীঘ্রই সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে। সকলেই গুডমুণ্ডের নিন্দা করিতেছিল এবং কেহ কেহ বলিতেছিল, হিলডুর যে গুডমুণ্ডের নিকট হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কেহ কেহ বলাবলি করিতেছিল যে, গুডমুণ্ড তাহার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি মোটেই বিবেচনা দেখায় নাই; শনিবার দিনই কেন সে ব্যাপারটা জানায় নাই। কেহ আবার বলিতেছিলেন, এত সুখের মালিক যে হইতে চায়, তাহার আরও সৎ ভাবে চলা উচিত ছিল। কেহ কেহ হিলডুরকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতেছিলেন, যে-লোকের মদ খাইয়া এত নেশা হয় যে সে কি করে না-করে নিজেই জানে না, সেরকম লোককে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছে।

মাঝখানে হঠাৎ হিলডুরকে অশান্ত হইয়া উঠিতে দেখা গেল, সে বাহির হইয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইল। ঘরের বাহির হইয়া সে দরজা বন্ধ করিয়াছে এমন সময় তাহার এক গ্রামের বান্ধবী আসিয়া কানে কানে বলিল—"নীচে একটি লোক তোমার সঙ্গে কথা বলিতে চায়।" হিলডুরের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কে, গুডমুণ্ড?"

"না, কিন্তু আমার মনে হয় সে তাহারই প্রেরিত লোক। তাহার যা বলিবার তাহা সে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিবে না।"

হিলডুর সারাদিন ঘরে বসিয়া আশা করিয়াছে, এমন কিছু ঘটুক যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়। এরূপ কঠিন দুঃখ যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এমন একটা কিছু কি ঘটিতে পারে না যাহাতে সে পুনরায় বিবাহের মুকুট ও ওড়না পরিতে পারে। গুডমুণ্ড-প্রেরিত লোকের কথা শুনিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ আসিল, সত্বর সে হেল্‌গার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

গুডমুণ্ড হেল্‌গাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছে দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিল যে এই উৎসবের গোলমালে আর কাহাকে পাঠানো হয়ত সম্ভব হয় নাই। সে হেল্‌গাকে সাদরেই গ্রহণ করিল।

হিলডুর হেল্‌গাকে তাহার সহিত দুধ রাখিবার ঘরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। উঠান পার হইয়া সেখানে যাইতে হয়। সে বলিল—"আমরা নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলিতে পারি, এমন কোথাও স্থান পাওয়া কঠিন—বাড়ীময় এখন অনেক লোক।"

ঘরে ঢুকিয়াই হেল্‌গা হিলডুরের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই যে, তুমি সত্যই গুডমুণ্ডকে ভালবাস কিনা?"

হিলডুর অপমান-বোধে কাঁপিয়া উঠিল। হেল্‌গার মত মেয়ের সঙ্গে সামান্য বাক্য-বিনিময় করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করার ইচ্ছা ত দূরে থাকুক। কিন্তু এখন কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক, বাধ্য হইয়া সে উত্তর দিল—"তা না হইলে তুমি কি মনে কর যে, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম?"

"আমি জানিতে চাই, তুমি এখনও তাহাকে ভালবাস কি না?"

হিলডুর যেন পাথর হইয়া গেল। কিন্তু হেল্‌গা তাহার দিকে এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে সে মিথ্যা বলিতে পারিল না।

"আজ তাহাকে যত ভালবাসিয়াছি পূর্ব্বে কখনও তেমন বাসি নাই।" সে এত ধীরে উত্তর করিল যে কথাগুলি উচ্চারণ করিতেও যেন সে কষ্ট পাইতেছে।

হেল্‌গা বলিল—"তবে তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল। আমার গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। তুমি ঘর হইতে গাত্রবস্ত্র লইয়া এস, এখনই আমরা নেরলুন্দায় যাইব।"

হিল্‌ডুর জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে গিয়া কি লাভ ?"

"তোমাকে সেখানে গিয়া বলিতে হইবে যে, গুডমুণ্ড যে কাজ করিয়াছে তাহা সত্ত্বেও তুমি তাহারই এবং যে পর্য্যন্ত সে জেলখানায় থাকিবে, তত দিন তুমি বিশ্বাসের সহিত তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে।"

"কিন্তু সে ত সম্ভব নয়। যে-লোক জেলখানায় যাইবে তাহাকে আমি বিবাহ করিতে চাই না।"

হেল্‌গা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু একটু পরেই সে বুঝিতে পারিল, হিল্‌ডুরের মত সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী পরিবারের মেয়ে এই ভাবেই চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। সে পরে বলিল—"গুডমুণ্ড নির্দ্দোষ না জানিলে আমি তোমাকে নেরলুন্দায় লইয়া যাইবার জন্য কখনই আসিতাম না।"

এইবার হিল্‌ডুর হেল্‌গার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—"তুমি কি সত্যই তাহা জান,—না, এ শুধু তোমার মনের ধারণা ?"

"এখন গাড়ীতে উঠিয়া যত শীঘ্র সম্ভব গেলেই ভাল হয়। তাহা হইলে পথে সমস্ত বলিতে পারিব।"

"না, আগে আমার জানা আবশ্যক, তুমি কি করিতে চাও ? আমি কি করিতেছি না-করিতেছি, তাহা আমার জানা নিতান্ত প্রয়োজন।"

ঔৎসুক্যের আধিক্যে হেল্‌গা একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না ; তবুও হিল্‌ডুরের কাছে সমস্ত বলা প্রয়োজন। গুডমুণ্ডের নির্দ্দোষিতার কথা তাই সে বলিতে আরম্ভ করিল।

"তুমি কি গুডমুণ্ডকে তখনই তাহা বল নাই ?"

"না, হিল্‌ডুর, আমি তোমাকেই শুধু একথা বলিতেছি। এ-সম্বন্ধে আর কেহ কিছুই জানে না।"

"কি জন্য তুমি এই খবর লইয়া আমার কাছে আসিয়াছ ?"

"তোমাদের মধ্যে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাক্ এই, উদ্দেশ্য লইয়া আমি আসিয়াছি। শীঘ্র গুডমুণ্ড শুনিবে যে সে দোষী নয়, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে তুমি স্বেচ্ছায় তাহার নিকট গিয়া সমস্ত মিটাইয়া লও।"

"সে যে নির্দ্দোষ, সে খবর কি তাহাকে দিব না ?"

"না, তুমি যেন স্বেচ্ছায় তাহার নিকট যাইতেছে এইরূপ ভাবে ব্যবহার করিও। আমি যে তোমার সঙ্গে এই আলাপ করিয়াছি, ইহা তাহাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে দিও না। নহিলে, তুমি আজ সকালে তাহাকে যাহা বলিয়াছ, সেজন্য কোনদিনই তোমাকে সে ক্ষমা করিবে না।"

হিল্‌ডুর নীরবে হেল্‌গার কথা শুনিতেছিল। এই ব্যাপারে এমন কিছু ছিল, যাহা সে জীবনে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই। নিজের অনুভূতিকে সে পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। "তুমি কি জান যে আমি তোমাকে নেরলুন্দা হইতে সরাইয়াছি ?"

"আমি জানি যে, নেরলুন্দার কর্ত্তা-কর্ত্রী দুজনেই আমাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন।"

"আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আজ কেন তুমি আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছ ?"

"এখন ত আমার সঙ্গে চল, ব্যাপারটা ভাল ভাবে মিটিয়া যাক্।"

কিন্তু হিলডুর চিন্তান্বিত হইয়া হেল্‌গাকে দেখিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল—"গুডমুণ্ড হয়ত তোমাকে ভালবাসে ?"

হেলগার ধৈর্য্য শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। সে তিক্ত স্বরে উত্তর করিল—"আমাকে বিবাহ করিয়া তাহার কি লাভ হইবে ? তুমি ত ভাল করিয়াই জান যে, আমি গরীব-ঘরের এক জন মেয়ে বই কিছুই নই এবং শুধু সে-কথা বলিলে আমার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না।"

দুই তরুণী গোপনে অপরের অলক্ষ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। হেল্‌গা এত দ্রুত গাড়ী চালাইল যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা অনেকটা পথ আসিয়া পড়িল। কাহারও মুখে কথা নাই। হিলডুর নীরবে হেল্‌গাকে দেখিতেছিল—পরম বিস্ময়ে হেল্‌গার কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছিল।

নেরলুন্দার কাছে আসিয়া হেল্‌গা ঘোড়ার লাগাম হিলডুরের হাতে দিল।

"এখন গুডমুণ্ডের সঙ্গে দেখা করিতে তুমি একাই যাও। আমি চুরি সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা বলিবার জন্য পরে আসিব। কিন্তু তোমার কথায় গুডমুণ্ড যেন বুঝিতে না পারে যে, আমিই তোমাকে লইয়া আসিয়াছি।"

নেরলুন্দায় বড় ঘরে গুডমুণ্ড তাহার মায়ের কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। তাহার বাবা কিছু দূরে একা চেয়ারে বসিয়া আপন মনে তামাক খাইতেছিলেন। যদিও তিনি কোন কথায় যোগ দেন নাই, তবু তাঁহাকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাইতেছিল—অর্থাৎ সবই ঠিকঠাক চলিতেছে, কোন কথাবার্ত্তায় যোগ দিবার প্রয়োজন নাই।

গুডমুণ্ড বলিতেছিল—"মা, তুমি কি বলিবে আমার জানিতে ইচ্ছা করে, যদি হেলগাকে বৌ করিয়া ঘরে

জানি ?" শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—"যে কোন মেয়েকেই আমি সানন্দে ঘরে তুলিব, স্ত্রী স্বামীকে যেরূপ ভালবাসে ততটুকু যদি সে তোমাকে ভালবাসে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না-হইতেই দেখা গেল ঈরিকের মেয়ে হিল্‌ডুর গাড়ী করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি হিল্‌ডুর বড় ঘরে ঢুকিল। নানাভাবেই সে যেন এখন সম্পূর্ণ আলাদা লোক, ইতিমধ্যে সে যেন অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। তাই সে স্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, মনে হইল সে যেন দরিদ্র ভিখারিণীর ন্যায় ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে চায়। তবুও শেষ পর্য্যন্ত ঘরে ঢুকিয়া সে শ্রীযুক্তা ঈঙ্গেবর্গ ও এরল্যাণ্ডের করমর্দ্দন করিল। পরে গুডমুণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গেই একটা কথা বলিবার ছিল।"

গুডমুণ্ড উঠিয়া দাঁড়াইল, হিল্‌ডুরকে সঙ্গে লইয়া ছোট ঘরে গেল। সে হিল্‌ডুরের দিকে একটা চেয়ার আগাইয়া দিল কিন্তু হিল্‌ডুর বসিল না। সে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সভয়ে অতি ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিল—"আমি ভাল করিয়াই জানি…আমি আজ সকাল বেলা নিশ্চয়ই বড় কঠোর কথা বলিয়াছি…"

গুডমুণ্ড বলিল—"হ্যাঁ, হিল্‌ডুর, আমাদের কথায় তুমি খুবই আশ্চর্য্য হইয়াছিলে।"

হিল্‌ডুর লজ্জায় সংকোচে আরও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

"আমার পক্ষে আরও সংযত হইয়া কথা বলা উচিত ছিল। আমরা হয়ত…পারিতাম…।"

"যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে মঙ্গলই হইয়াছে মনে করি; এখন সে-সব কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু তুমি এখানে আসিয়াছ বলিয়া আমি খুবই আনন্দিত।"

হিল্‌ডুর দীর্ঘশ্বাস লইয়া দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিল। পরে সে মাথা তুলিয়া বলিল—"না না, আমি চাই না যে আমি সত্যই যা আছি, তার চেয়ে তুমি আমাকে বেশী ভাল মনে কর। আমার নিকট এক জন আসিয়া বলিয়াছে যে, তুমি নির্দ্দোষ এবং সে আমাকে এখানে শীঘ্র আসিয়া সমস্ত গোলমাল মিটাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে। তুমি যে নির্দ্দোষ তাহা যে আমি জানি সে কথা বলা আমার উচিত নয়; কারণ তাহা হইলে আর তুমি আমার এখানে আসা বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে করিবে না। এখন তোমাকে এই বলিতে চাই যে, আমার ইচ্ছা…আমি চাই…কিন্তু পূর্ব্বে আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে আজ সমস্ত দিনই আমি শুধু তোমার কথাই ভাবিয়াছি এবং বারবার এই কামনা করিয়াছি, কোনও উপায়ে পূর্ব্বের অবস্থা আবার ফিরিয়া আসুক। এখন আমাদের সম্বন্ধ যেরূপই নির্দ্ধারিত হউক না কেন, আমি তোমাকে এইটুকু জানাইতে চাই, তুমি নির্দ্দোষ বলিয়া আমি বড়ই আনন্দিত।"

গুডমুণ্ড প্রশ্ন করিল—"কে তোমাকে এই পরামর্শ দিয়াছে?"

"সে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই।"

"আর কেহ যে ইহা জানে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। বাবা এইমাত্র সরকারী অফিসারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি শহরে তার করিয়াছিলেন, এই মাত্র উত্তর আসিয়াছে যে হত্যাকারীকে আপাতত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

গুডমুণ্ডের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া হিল্‌ডুরের পা কাঁপিতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। গুডমুণ্ডের শান্ত ও দয়াপরবশ ভাব দেখিয়া সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে—সে বুঝিয়াছে যে গুডমুণ্ড এখন তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

"আমি বুঝি যে, আমার সকাল বেলার ব্যবহারের জন্য তুমি কোনদিনই আমাকে ক্ষমা করিবে না।"

গুডমুণ্ড পূর্ব্ববৎ শান্ত স্বরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই তাহা ক্ষমা করিতে পারি। এখন আর সে-সম্বন্ধে কোন কথা না-বলাই ভাল।"

হিল্‌ডুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, চোখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল—যেন সে কাহারও আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। গুডমুণ্ড তাহার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—"এ অতি সুখের বিষয় হিল্‌ডুর, যে আমাদের বিবাহ বন্ধ হইয়াছে। কারণ আজ আমি নিজের মনকে জানিতে পারিয়াছি—আমি অন্য এক জনকে ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, অনেক দিন হইতেই আমি তাহাকে ভালবাসিতাম কিন্তু আজ আমি সে-কথা বুঝিতে পারিয়াছি।"

উদাস নিরাশার সুরে হিল্‌ডুর প্রশ্ন করিল—"কাহাকে ভালবাসিতে, গুডমুণ্ড?"

"তাহার নাম করিয়া কোন লাভ নাই। আমি ত তাহাকে আর বিবাহ করিব না। কারণ সে আমাকে ভালবাসে না। কিন্তু আমার পক্ষে আর কাহাকেও বিবাহ করা সম্ভব নয়।"

হিল্‌দুর মাথা তুলিল। তাহার মনের ভাব বোঝা কঠিন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে বুঝিয়াছে, তাহার রূপ, যৌবন, ধনসম্পত্তি গুডমুণ্ডের নিকট অতি তুচ্ছ। তাহার বাহিরের ব্যবহারের কঠিন আবরণের মধ্যে মহৎ কিছু আছে ইহা গুডমুণ্ডকে না দেখাইয়া আজ সে যাইবে না স্থির করিয়াছে।

"তুমি যদি বল তবে আমার জানিতে ইচ্ছা করে, গুডমুণ্ড, তুমি কি সত্যই চোরাবালির তরুণীকে ভালবাস?"

গুডমুণ্ড অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, হিল্‌দুর বলিয়া চলিল—"তুমি যদি হেল্‌গাকে ভালবাসিয়া থাক, তবে এ-কথাও আমি জানি, সেও তোমাকে ভালবাসে। সেই আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে আসিয়াছিল যেন আমাদের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হয়। সে জানিত যে তুমি নির্দ্দোষ কিন্তু সে তোমাকে ইহা বলে নাই; আমাকেই প্রথম বলিয়াছে।"

গুডমুণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে হিল্‌দুরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"তুমি কি মনে কর, ইহা আমার প্রতি ভালবাসার লক্ষণ?"

"সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার গুডমুণ্ড। সে-কথা আমি প্রমাণ করিতে পারি। এই সংসারে তাহার মত কেহই তোমাকে ভালবাসিতে পারিবে না।"

গুডমুণ্ড ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে হঠাৎ হিল্‌দুরের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি, —তুমি সে-কথা আমার নিকট বলিতেছ কেন?"

"আমিও মহত্ত্বে হেল্‌গা হইতে হীন হইয়া থাকিতে চাই না।"

"হিলদুর, হিলদুর, তুমি জান না—কি ভাবে এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার মনকে জয় করিয়াছ। তুমি বুঝিতেছ না, তুমি আমাকে কত সুখী করিয়াছ।"

হেল্‌গা পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। মাটির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া সে বসিয়া আছে। তাহার চোখের সামনে—সে যেন গুডমুণ্ড ও হিলদুরকে দেখিতেছে। তাহাদের মিলন-সুখের কথা সে কল্পনা করিতেছিল। আজ এই মুহূর্ত্তে তাহাদের মত সুখী কে আছে?

এমন সময় সে দেখিল, নেরলুন্দার এক জন ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে। হেল্‌গাকে দেখিয়া সে থামিল— "গুডমুণ্ড সম্বন্ধে কি খবর আসিয়াছে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।"

—"হ্যাঁ, তাহা শুনিয়াছি।"

—"সুখের সংবাদ। আসল হত্যাকারীকে জেলে পোরা হইয়াছে।"

হেল্‌গা বলিল—"আমি জানিতাম যে, গুডমুণ্ড কখনও হত্যাকারী হইতে পারে না।"

তার পর লোকটি নিজের পথে চলিয়া গেল, হেল্‌গা পূর্ব্বের ন্যায় পথের পাশেই বসিয়া রহিল।

"এখন তাহা হইলে তাহারা সবই জানে। আমার আর নেরলুন্দায় গিয়া দেখা করার প্রয়োজন নাই।"

নিজেকে তাহার আজ একান্ত পরিত্যক্তা বলিয়া বোধ হইতেছিল। সারাদিন সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যাপন করিয়াছে। এতক্ষণ সে নিজের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই, শুধু কামনা করিয়াছে যেন গুডমুণ্ড-হিলদুরের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এখন তাহার মনে হইতে লাগিল, এই সংসারে সে সম্পূর্ণ একা। প্রিয় ব্যক্তির জন্য কিছু না-করিতে পারা পরম দুঃখের বিষয়। কিন্তু এখন ত তাহাকে আর গুডমুণ্ডের প্রয়োজন নাই! তাহার শিশুকেও তাহার মা আপনার করিয়া লইয়াছেন, তিনি তাহাকে শিশুর বিন্দুমাত্র যত্ন লইতেও দেন না।

তাহার মনে হইল এইবার উঠিয়া ঘরের দিকে যাওয়া উচিত। কিন্তু উঁচু পথ বাহিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কষ্টকর মনে হইতেছিল। কি করিয়া যে বাড়ী পৌঁছান যায়, তাহার দেহে যেন সামান্য শক্তিও নাই।

হঠাৎ দেখা গেল যে নেরলুন্দা হইতে গাড়ী আসিতেছে। হিলদুর ও গুডমুণ্ড পাশাপাশি গাড়ীতে বসিয়া আছে—নিশ্চয়ই এখন তাহারা এলবোক্রায় বলিতে যাইতেছে যে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং আগামী কল্য তাহাদের বিবাহ হইবে।

হেল্‌গাকে দেখিয়াই তাহারা গাড়ী থামাইল। গুডমুণ্ড ঘোড়ার লাগাম হিলদুরের হাতে দিল এবং নিজে লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। হিলদুর মাথা নত করিয়া হেল্‌গাকে নমস্কার করিয়া গাড়ী হাঁকাইল।

গুডমুণ্ড হেল্‌গার নিকট রহিয়া গেল। সে বলিল— "হেলগা, তুমি যে এখানে, এজন্য আমি বড়ই সুখী। আমার ধারণা ছিল, তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হয়ত বা আমাকে চোরাবালিতে যাইতে হইবে।"

গুডমুণ্ড জোরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিয়াই শক্ত করিয়া হেল্‌গার হাত ধরিল। হেল্‌গা তাহার চোখের মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, সে তাহার সম্বন্ধে সমস্তই জানে, এখন আর তাহার পালাইবার পথ নাই।

সমাপ্ত

বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

হরিপুরায় এবার কংগ্রেস একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে—তাহাতে ভাবী যুদ্ধ ও এই দেশের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে কংগ্রেস নিজের মতামতের আভাস দিয়াছে। গত দুই-তিন বৎসর যাবৎ ভারতীয় জাতীয় মহাসভার চিন্তাধারায় এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছিল—তাহার দৃষ্টি ভারতের সীমারেখার মধ্যে আর সর্ব্বাংশে আবদ্ধ নাই। এবার জাপানের চীন-অভিযানে ভারতীয় কংগ্রেস চীনাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে, আর জানাইয়াছে ভাবী যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাপন্থীরা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-প্রসারে ভারতবাসী কোনরূপ সহায়তা করিবে না,—মোটের উপর ইহাই তাহার বক্তব্য। কংগ্রেসের দৃষ্টি পূর্ব্বে এইরূপে আপনার ভৌগোলিক গণ্ডী পার হইতে চাহিত না। কিন্তু দেশের কথা ভাবিতে হইলেই আজ বিদেশের কথাও ভাবিতে হয়—বর্ত্তমান কংগ্রেসের এই নীতি-বিশ্লেষণে সেই সত্যটিই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

এত দিন পরে কংগ্রেস যে নিজের পররাষ্ট্রনীতি স্থির করিবার প্রয়োজন বোধ করিল ইহার কারণ কি? এই প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। সংক্ষেপে ইহার উত্তর: ভারতীয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী চিন্তার আত্মপ্রকাশে স্বভাবতই ভারতবাসী শোষিত জাতিদের ভাগ্যের সহিত আপনার ভাগ্যের মুখ্য বা গৌণ সম্পর্ক এখন দেখিতে পাইতেছে। তাই ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যাকে সে এক বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার পটভূমিকায় দেখিতে শিখিতেছে। তাহা ছাড়া, যে-জাতি সত্যসত্যই পূর্ণ-স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে তাহার পক্ষে স্বাধীনতা লাভের সহায়ক হিসাবে এবং স্বাধীনতা আয়ত্ত হইলে তাহা সংরক্ষণের উপায় হিসাবে আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশকে সর্ব্বক্ষণই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। যেদিন হইতে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন হইতেই তাহার পররাষ্ট্রনীতি স্থির করিবার প্রয়োজনও উদ্ভূত হইয়াছে। কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতি কি হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু বহির্জগৎকে আজ ভারতবর্ষের বুঝিতেই হইবে। কংগ্রেসের দৃষ্টি আন্তর্জ্জাতিক মহাসমস্যার দিকে যে আজ নিপতিত হইয়াছে, ইহা কংগ্রেসের নিজ দায়িত্ববোধের ও ব্যাপকতর দৃষ্টির পরিচায়ক। স্বাধীনতার সঙ্কল্পকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য কংগ্রেসের চিন্তা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, ইহা হইতে ঐরূপ আশা করা ভুল হইবে কি?

২

জগতের অনেকটা জুড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র গ্রেট ব্রিটেন। তাই বহির্জগতের কথা অনেক সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতির কথা। আজ কিন্তু ব্রিটেনের সে গৌরব নাই; তথাপি ভারতবর্ষের পক্ষে এই পররাষ্ট্রনীতিই বিশেষ করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার মত। এ-দেশের সরকারী বৈদেশিক নীতি সর্ব্বাংশে সেই বিলাতী নীতির ছায়া—আর বে-সরকারী পররাষ্ট্র-চিন্তা সেই প্রভাবে বা প্রতিক্রিয়ার দ্বারা গঠিত ও নির্দ্ধারিত। তাই ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতিই আমাদের বহির্জগৎ পর্য্যবেক্ষণের একটি প্রধান দর্শনীয়।

সম্প্রতি ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতিতে একটি ছোটখাট ঝড় উঠিয়াছে—মনে হয় উহার আভ্যন্তরীণ অস্পষ্টতা তাহাতে কতকটা দূর হইল। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মিঃ এ্যাণ্টনি ইডেন্ মন্ত্রিমণ্ডলের পররাষ্ট্রনীতির সহিত একমত হইতে না-পারিয়া ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের পদ ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স অর্থাৎ ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরুইন। ইডেনের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলের, বিশেষতঃ প্রধান

মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে ইঙ্গ-ইতালীয় সম্পর্ক লইয়া। কিছুকাল পূর্ব্বে ইতালীয় রাজদূত সিনর গ্র্যাণ্ডি জানান যে, যদি ইতালীর সঙ্গে ব্রিটেন একটা বুঝাপড়ার জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতে চায় তবে এই তাহার সময়। অবশ্য, ইতালীর আবিসিনিয়া-বিজয় ব্রিটেন স্বীকার করিয়া লইবে, এবং ইতালীকে নিজ বজেট সুস্থির ও আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্রিটেন একটা বড় রকমের ধার দিবে, আর তদ্‌বিনিময়ে ইতালীও স্পেন হইতে তাহার 'স্বেচ্ছা-সৈনিক' ও অপরাপর সাহায্য তুলিয়া লইবার কথা বিবেচনা করিবে, এইরূপ একটা আভাস এই প্রস্তাবের পিছনে আছে। ইডেন মনে করেন, ব্রিটেনের পক্ষে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, জাতিসঙ্ঘের সমর্থক হিসাবে তাহার বাহিরে বিচ্ছিন্নভাবে এই সব চুক্তির কথাবার্ত্তা ব্রিটেন চালাইতে পারে না; বিশেষ করিয়া আবিসিনিয়া-বিজয় মানিয়া লওয়া ত সেই জাতিসঙ্ঘের ও ব্রিটেনের সমস্ত নীতির একেবারে প্রতিকূলাচরণ, আর মুসোলিনির কথায় বিশ্বাস কি? তাঁহার ইঙ্গিতে নিকট-প্রাচ্যের আরব জাতিদের মধ্যে আরবী ভাষায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইতালী বেতার প্রচার চালাইতেছে, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে নিরপেক্ষ থাকার কথা মুখে স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ তাহা পদদলিত করিয়া ইতালীয় বাহিনী আগুন জ্বালাইতেছে, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের বাণিজ্যপথ বিপন্ন ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিড়ম্বিত করিতে মুসোলিনি ও তাঁহার বেনামদার ফ্রাঙ্কো প্রভৃতি কেহই কসুর করিতেছেন না। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন মিঃ ইডেনের মত গ্রহণ করিলেন না—তিনি শান্তি চান, যুদ্ধকে তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে চাহেন, তাই ইতালীর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের যে-কোন সুযোগ পাইলে তাহা গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত। জাতিসঙ্ঘ? তাহার কি আছে যে শুধু এই শবদেহকে জড়াইয়া থাকিয়া তিনি পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন করিবেন? আর নীতি? সবে একটা আলাপ-আলোচনার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে—নীতি-বিসর্জ্জনের কথা ইহাতে কোথায়? সেই নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিবেন না, শান্তি-প্রতিষ্ঠার সুযোগটুকুকেও উপেক্ষা করিবেন—এ কি কথা। অতএব, ইডেন বিদায় লইলেন, লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌স্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। এই ইডেন-বিদায়ে জগতের ফাসিস্তপন্থীরা উৎফুল্ল হইয়াছেন—ইংলণ্ড এত দিনে জাতিসঙ্ঘ ও তাহার চুক্তি, প্রভৃতি নানাবিধ অসার জিনিষের মোহ কাটাইয়া ফাসিস্ত শক্তিদের বাস্তব শক্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে;—ইতালী উল্লসিত হইয়াছে, জার্ম্মেনী হ্যালিফ্যাক্‌স্-প্রতিষ্ঠায় আশান্বিত হইয়াছে, এমন কি সুদূর জাপান পর্য্যন্ত ইডেনের বিদায়ে আনন্দিত।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি একটা মোড় ঘুরিতেছে। ইডেন ও তৎমতাবলম্বী বহু ইংরেজ রাজনীতিক এত দিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতিকে যে-আদর্শে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন জাতিসঙ্ঘ, ঐকত্রিক নির্ব্বিঘ্নতা (কলেক্‌টিভ সিকুরিটি) ও সাধারণ ভাবে পররাজ্যগ্রাসী জাতিদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রয়াসী ও গণতান্ত্রিক জাতিদের সৌহার্দ্দ্য ছিল তাহার মূলসূত্র। বলা বাহুল্য, নিজেদের স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া কোন রাজনীতিকই এই সব নীতিকে প্রাধান্য দেন নাই। তথাপি প্রকাশ্যতঃ এত দিন পর্য্যন্ত সেই পররাষ্ট্র নীতির মুখ ছিল গণতান্ত্রিক জাতিদের দিকে—ফ্রান্সের দিকে, রুশিয়ার দিকে, চেকোস্লোভাকিয়ার দিকে, এমন কি, আমেরিকারও দিকে; প্রকাশ্যতঃ ফাসিস্ত শক্তির প্রতি ছিল তাহা বিরূপ। আজ কিন্তু তাহা বলা চলে না। আজ গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ফাসিস্ত শক্তিদের সহিত হাত মিলাইতে চলিয়াছে—তাহার পূর্ব্বতন বন্ধুগণ ইহাতে কি মনে করে? ফ্রান্স বরাবর ইঙ্গ-ইতালীয় মিত্রতার পক্ষপাতী—তাহাতে দুই জনকেই সে বন্ধুরূপে পাইবে, জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে তাহার ভরসা তাহা হইলে আরও বাড়ে। এই কারণেই আবিসিনিয়ার যুদ্ধে সে মুসোলিনিকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহে নাই; হোর-ল্যেবাল সর্ত্ত খাড়া করিয়া একটা সহজ রফাও করিতে চাহিয়াছিল। অতএব ফ্রান্স ব্রিটেনের এই কাজে আনন্দিত—যদি জার্ম্মেনীর সঙ্গে ব্রিটেনের মিত্রতা না হয়। আমেরিকা ব্রিটিশ মতে এত দিন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতেছিল না, এখন বুঝিতেছে তাহার এই সংশয়

অমূলক ছিল না। আর অন্যান্য বন্ধুরা? তাহারা হতবাক্—হয়ত বলিতেছেন, ব্রিটেনের পিরীতি এমনিতর 'বালির বাঁধ'!

আসলে কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন ওলট-পালটও হয় নাই; যাহা চাপা ছিল তাহাই প্রকাশ্যে এবার স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটেন তাহার জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্য শান্তিতে ভোগ-দখল করিতে চায়, সত্যই সে শান্তির পক্ষপাতী,—দুনিয়ার বিত্তবান্ লোকেরা কেহই অশান্তি পছন্দ করে না। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যাহারা বিত্তহীন তাহারা ইহা বুঝে না, বিশেষতঃ যদি তাহাদের আবার গায়ে শক্তি থাকে। ইতালী, জার্ম্মেনী ও জাপান এই শেষ শ্রেণীর—তাহারা সাম্রাজ্য চায়, এবং সাম্রাজ্য না-পাইলে শান্ত হইবে না। এই বলদৃপ্ত জাতিরা পররাজ্য যখন অপহরণ করিতেছিল তখন ইংরেজ কার্য্যতঃ বাধা দেয় নাই,—নিজের স্বার্থে হাত না-পড়িলে এই সব শক্তিমানদের সঙ্গে কেন সে কলহ করিবে? ইহার জন্যই জাতিসঙ্ঘ অক্ষম হইয়া গেল, পৃথিবীতে দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক মতামতে আস্থা খোয়াইল, সবল রাষ্ট্রগুলি দিনে দিনে সমস্ত নীতি, চুক্তি ও সন্ধিপত্রকে উড়াইয়া দিল, আর অর্দ্ধেক পৃথিবীর প্রভুত্ব করিয়াও আন্তর্জ্জাতিক আসরে ব্রিটেনের কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপ হইল হাস্যকর। ব্রিটেনের এমন সম্মান-লাঘব হইবে তাহা তাহার নিজেরও কল্পনাতীত ছিল। এই দুরবস্থা হইতে তাহার একমাত্র উদ্ধারের উপায় হইল নিজ শক্তি বৃদ্ধি। চেম্বারলেন-গবর্ণমেণ্ট বিপুল সমরায়োজন সুরু করিয়া ব্রিটেনের সেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠারই আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে এখন মুসোলিনির বহু পদাঘাত পৃষ্ঠে লইয়া কেন সেই চেম্বারলেন-মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহারই সৌহার্দ্দ্য যাজ্ঞা করিতে গেলেন? ইহার উত্তর চেম্বারলেন দিয়াছেন—শান্তি। দ্বিতীয় উত্তর—সাময়িক প্রয়োজন,—অর্থাৎ সুবিধাবাদিতা। ইউরোপে অন্ততঃ ব্রিটেন নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তাহা হইলে ইউরোপের বাহিরে জাপানের কথা সে স্থিরভাবে ভাবিতে পারিবে। কিন্তু তৃতীয় একটি উত্তর আছে—কোন কোন ইংরেজ সাংবাদিক রুষ্ট হইয়া ইতিমধ্যেই তাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন—চেম্বারলেন ব্রিটিশ ক্যাপি-টেলের স্বার্থ দেখিয়াছেন, ইতালীর সহিত বন্ধুতা ইংরেজ পুঁজিদারদের কাম্য। তাই যে-ইতালী এমন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে হাস্যাস্পদ করিল, আবিসিনিয়া কাড়িয়া লইল, প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইল, তাহারই বন্ধুত্ব হইল ব্রিটেনের যাজ্ঞা, এমন কি তাহাকে অর্থ ধার দিয়া সাহায্য করাও হইল তাহার দায়। পুঁজিদারের এই দাবিই সমস্ত ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির পশ্চাতে এত দিন গোপনে কাজ করিতেছিল। তাই ১৯৩২-৩৩ সনে তৎকালীন পররাষ্ট্র-সচিব সর্ জন সাইমনকে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ষ্টিমসন যখন মাঞ্চুকুয়ো-ব্যাপারে জাপানকে নিরস্ত করিবার জন্য আমেরিকার সহিত একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করেন, তখন সে আহ্বানে সাইমন সাহেব কর্ণপাত করেন নাই, তাই স্যামুয়েল হোর ইতালীকে আবিসিনিয়া উপহার দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাই প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন নিজ হাতে মুসোলিনিকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন; তাই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জার্ম্মেনীর সঙ্গে মিত্রতার বাণী বহন করিয়া গিয়াছিলেন ও জার্ম্মান উপনিবেশ প্রত্যর্পণের প্রস্তাব বহিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি যতই জাতিসঙ্ঘের পক্ষ-পাতী হউক, এমন কি সাম্যবাদী রুশিয়াকেও এখন স্বপক্ষীয় বলিয়া জ্ঞান করুক, ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় বরাবর যেন বুঝিয়াছিলেন যে, ঘটনা-পরম্পরার অনিবার্য্য বিবর্ত্তনে তাঁহাদের ভাগ্য ও সৌভাগ্য দুনিয়াব্যাপী ফাসিস্ত-শক্তিনিচয়ের উত্থান-পতনের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া পড়িবে। তাই যথাসম্ভব ব্রিটিশ গণতন্ত্রের যবনিকা অটুট রাখিয়া সেই সমাগত দিনের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতেছিলেন। যে-কারণে কোনও সমস্যাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত দিন সম্মিলিত কণ্ঠে আপনার অবিসংবাদিত মত দিতে পারে নাই—জার্ম্মেনী, ইতালী, স্পেন, চীন সব বিষয়েই ব্রিটেনের মন যেই হেতু বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল—তাহার মূল এইখানে। এক দিকে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিকতা অন্য দিকে শ্রেণী-স্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রচিন্তার এই দ্বন্দ্ব এখনও

জাপানের প্রতিনিধি-সভার অধিবেশনে প্রিন্স কোনোই, পররাষ্ট্র-সচিব হিরোটা, ও সমর-মন্ত্রী সম্মুখের সারিতে, বাম দিক হইতে ; একই বৈঠকে অল্পক্ষণ পর পর ছবিগুলি লওয়া হয়
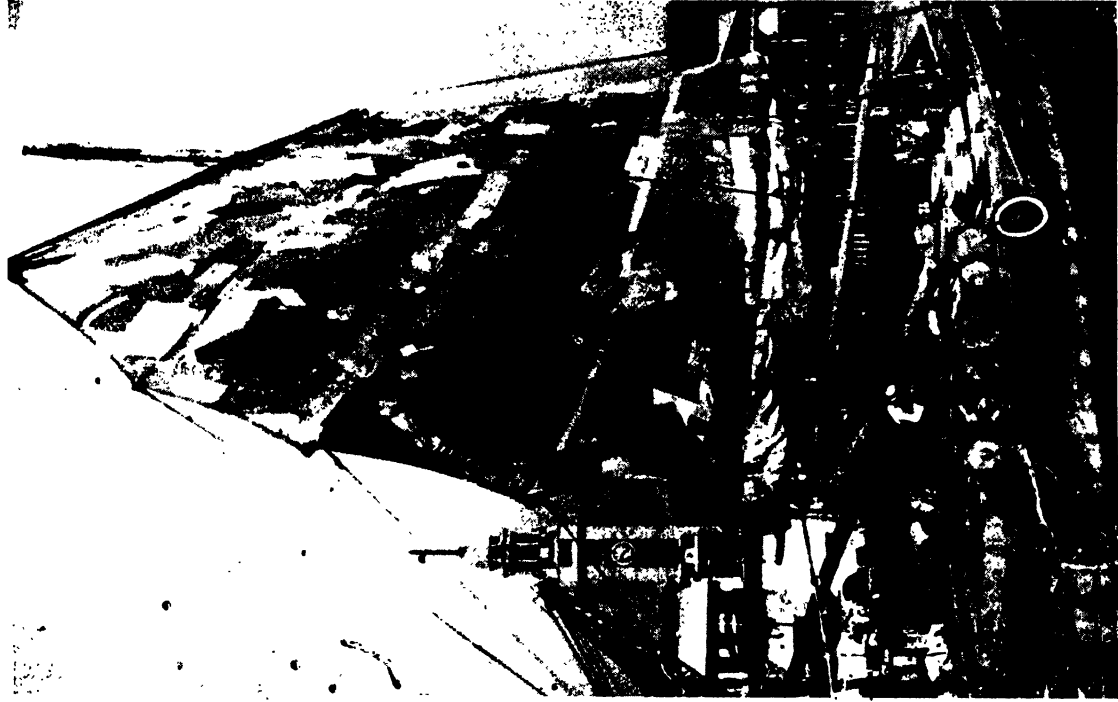
চীনের ক্যাণ্টন-হংকং রেলওয়ের টার্মিনাস কৌলুনে মাল-বোঝাই শাম্পান

ব্যাঙ্ককের একটি খেয়াঘাটে নৌকার সমাবেশ

.গব হয় নাই—তবে ইডেনের পদত্যাগে ব্রিটিশ বৈদেশিক-নীতির যবনিকায় একটি কোণ এবার সরিয়া গেল, ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের মুখপাত্র চেম্বারলেন-মন্ত্রিমণ্ডলের ঢাকা দেওয়া রূপের খানিকটা এবার চোখে পড়িল।

৩

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির এই আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বক্ষণেই ইউরোপে আর একটি বড় ঘটনা ঘটে। সমস্ত ইউরোপের রাজনীতি আজ হয় হিটলার না-হয় মুসোলিনীকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত। কিন্তু নাৎসী ঔদ্ধত্যে জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতেছে জার্ম্মেনীর সৈনিক-নায়কগণ তাহা স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেন না। এই সৈনিক-নায়কেরাই চিরদিন জার্ম্মেনীর ভাগ্যবিধাতা—কৈশারও ইঁহাদের মতামত অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইঁহারা নাৎসী নন। প্রথম দিকে হিটলারের সঙ্গে ইঁহাদের একটা বুঝাপড়া হয়—কিন্তু নাৎসী জার্ম্মেনীতে ভিন্ন দল, ভিন্ন মতের ঠাঁই নাই—নীমোলেরের মত ধর্ম্ম-যাজকের মতবিরোধও সহ্য করা হয় না। তাই হঠাৎ এক দিন জার্ম্মান সৈনিক-নায়ক জেনারেল ফন্ ফ্রিট্‌জ্ ও মার্শাল ফন্ ব্ল্যমবের্গ পদচ্যুত হইলেন, সৈনিক-নেতৃত্ব নাৎসী গোয়েরিঙের হাতে দেওয়া হইল, হিট্‌লার হইলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। পরিবর্ত্তনটা কত বড় তাহা জার্ম্মান ছাড়া অন্য জাতি বুঝিবে না, এই দুঃসাহস হোয়েনৎজোলার্ণ সম্রাট-দেরও হয় নাই, অথচ এক নিমেষে ইহা সম্পন্ন করিলেন হের্ হিটলার। তথাপি ভিতরে একটা অসন্তোষ বোধ হয় ধোঁয়াইতেছিল, হিটলার তাহা চাপা দিলেন একটা সুপরিচিত কৌশলে—বাহিরে একটি চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটাইয়া। ১২ই ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর শুশ্‌নিগ্ বের্কটেস্‌গাদেন প্রাসাদে হিটলারের নিমন্ত্রণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন আলোচনার জন্য। এগার ঘণ্টা সেই তন্ময় আলোচনা চলে, অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে নাৎসী-বাহিনী পায়তারা কষিতেছে। অতএব, শুশনিগ সুবোধ ছেলের মত মানিয়া লইলেন যে, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলে এক জন পাকা নাৎসীকে তিনি অষ্ট্রিয়ার পুলিস-বিভাগের ও আভ্যন্তরীণ সচিবত্বের ভার অর্পণ করিবেন, এবং অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যাপারের সমস্ত বাধা বিদূরিত হইবে। শুশনিগ অবশ্য এখন ঘরে ফিরিয়া বলিতেছেন যে, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না, কিন্তু সকলেই বুঝিয়াছে যে অষ্ট্রিয়া এবার অনেকাংশেই হিটলারের হাতের পুতুল। এই ভাবে নাৎসীদের অন্যতম উদ্দেশ্য,—জার্ম্মান জাতির একীকরণ—অনেকটা সার্থক হওয়াতে জার্ম্মেনীতে উল্লাসের অন্ত নাই। কিন্তু অন্যান্য শক্তিরা করিতেছেন কি? অষ্ট্রিয়াকে স্বাধীন ও জার্ম্মেনী হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত সেই ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালী এখন কি করিতেছেন? হিটলারের পূর্ব্বে এই দুই রাজ্যের একবার বাণিজ্যগত সম্মেলনের কথা উঠিলেও ইঁহারা তাহা ঘটিতে দেন নাই, আর আজ? ব্রিটেন বলিতেছেন—ব্যাপারটা বুঝিয়া দেখিতে হইবে; ফ্রান্স স্পষ্টই বলিয়াছেন—অষ্ট্রিয়াকে স্বাধীন থাকিতে হইবে; আর রোম? পূর্ব্বে এইরূপ সম্ভাবনায়ও তাহার সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন রোমের তুষ্ণীভাব। রোম-বার্লিন বন্ধুত্বে কি ছেদ পড়িয়াছে, না রোমও অন্যত্র এইরূপ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিশ্রুতি বার্লিনের নিকট হইতে পাইয়াছে? ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ব্রিটেন-ইতালীর আলোচনার কথার সূত্রপাত হইল—কেন এই মুহূর্ত্তেই হইল, তাহা বুঝা এখন দুঃসাধ্য নয়। তবে জার্ম্মেনী স্পষ্টই বলিয়াছে, রোম ও বার্লিনের বন্ধুত্ব ইহাতে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। এদিকে ইহার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে জয়-উৎফুল্ল মহানায়ক হিটলার রাইষ্টাগের বক্তৃতায় নাৎসীদের কৃতিত্ব ঘোষণা করিলেন, জানাইলেন—আর্থিক বনিয়াদ জার্ম্মেনীর আজ কত দৃঢ়; নাৎসী ক্ষমতা আজ শাসন-বিভাগে সর্ব্বত্র কত অব্যাহত; জার্ম্মেনীর সমরায়োজন কত বিপুল, কত মারাত্মক; সাম্যবাদী রুশিয়ার ধ্বংস কত নিকট ও কত অবশ্যম্ভাবী; জার্ম্মেনীর উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া পাওয়া তাঁহার কত কত দরকার, আর ইউরোপীয় শান্তির জন্য জার্ম্মেনীর সমালোচক ব্রিটিশ কাগজগুলিকে অচিরে শায়েস্তা করা ও মিঃ ইডেনের মত রাজনীতিকদের বিদায়

দেওয়া কত প্রয়োজন। অবশ্য দুই ঘটনায় সম্পর্ক নাই, কিন্তু ইহার পরেই মিঃ ইডেন বিদায় লইলেন।

৪

মানিতেই হইবে আজ ইউরোপ জুড়িয়া ফাসিস্ত এক-নায়কত্বের জয়যাত্রা চলিয়াছে। ফ্রান্স, চেকো-স্লোভাকিয়া আধা-এশিয়াটিক শক্তি সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া ফাসিজমের ঢেউ রোধ করিবার মত ইউরোপে আজ আর কেহ নাই। এই কারণেই, বিশেষতঃ হিটলারের অভ্যুদয়ের ফলে, ইহারা পরস্পর নিকটতর হইয়াছে, ব্রিটেনকেও তাহারা গণতান্ত্রিকতার নায়ক হিসাবে নিজেদের দলে পাইতে প্রত্যাশা করে—তাহা পাইলে তাহারা একটু নিশ্চিন্ত হয়; না হইলে বর্ত্তমান ইউরোপের ফাসিজমের সম্মুখে ইহারা দাঁড়াইতে পারিবে কি? ফ্রান্সে অবশ্য "ফ্রঁং পপুলের" বা গণ-তান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীদের সম্মিলিত দলই এখনও ক্ষমতাশালী। কিন্তু ফ্রান্সের আর্থিক বনিয়াদ কিছুতেই পাকা হইতেছে না। সেই চাপেই আবার মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু তাহারও সমরায়োজন চলিয়াছে বিপুল বেগে। আর পররাষ্ট্রনীতিতে সে জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে ইতালীকে স্বপক্ষে পাইতে চায়, ব্রিটেনের সহিত একযোগে চলিতেই সে সচেষ্ট। বর্ত্তমানে তাই ফ্রান্স অবশ্য ইঙ্গ-ইতালীয় আলাপের নামে খুশী হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডল জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জাতিসঙ্ঘের চুক্তি "ঐকত্রিক নির্ব্বিঘ্নতা" প্রভৃতি স্বীকৃত নীতিকে পরিত্যাগ করিবেন না; তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়া বা চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না।

এদিকে গণতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়ার দুর্বিপাকের দিনও হয়ত নিকটেই। বহুসংখ্যক (প্রায় ৩০ লক্ষ) জার্ম্মানের দ্বারা তাহার একাংশ অধ্যুষিত। হিটলারের মূলনীতি হইল তাহাদিগকে জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা। অতএব, চেকোস্লোভাকিয়া সতর্ক ও সন্ত্রস্ত—অষ্ট্রিয়ার পরেই তাহার পালা। তাহার ভরসা ফ্রান্স ও রুশিয়া।

এক দিক হইতে সাম্যবাদী সোভিয়েট রুশিয়ার বন্ধু কেহ নাই। কিন্তু বিশ বৎসরের সংগঠনে তাহার শক্তি বিপুল, সাম্যবাদ নাকি এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে আজ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও কতকাংশে প্রচলিত হইয়াছে; অন্য দিকে তাহার আর্থিক অবস্থার কথা শুনিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তাই অনেকেই তাহার বন্ধুত্ব কামনা করে। অথচ, উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব পৃথিবী তথাপি দেখিয়া চমকিত হয়, একে একে এই বিপুল রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধারগণ ইহার নিকট বলি যাইতেছেন। ঠিক এই মুহূর্ত্তে এমনি আবার একটি আয়োজন হইতেছে। হয়ত ইহাদের ছাঁটিয়া ফেলিয়া, সাম্যবাদীরা না হউন, ষ্টালিনের রুশিয়া রাষ্ট্র-হিসাবে আরও দৃঢ়মূল হইতেছে। অন্ততঃ সাইবেরিয়ার সোভিয়েট-বাহিনী সম্পর্কে ইহাই বলা হয়। কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিরও আজ সেই প্রথম যুগের দুঃসাহসিক মুক্তিবাণী নাই। স্পেনকে সে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু ইতালী বা জার্ম্মেনীর তুলনায় সে সাহায্য বেশী নয়; চীনকে সে কতটুকু সাহায্য করিবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। তথাপি এই কথা মানিতে হইবে, পূর্ব্ব-পশ্চিমের ফাসিজমের বিরুদ্ধে এই সোভিয়েট রুশিয়াই আজ প্রবলতম বাধা—উক্রেইন ও মঙ্গোলিয়া বা সাইবেরিয়ায়ই হয়ত ভাবী দিনের 'ইজমের' যুদ্ধের প্রথম ফুলকি জ্বলিবে। ষ্টালিনও সম্প্রতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সোভিয়েটের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তিদের মিত্রতা এবং রোম-বার্লিনের ফাসিজম্ ও টোকিওর সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য্য।

৫

এই ভাবেই সুদূর প্রাচ্যও সুদূর পশ্চিমের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই কোমিণ্টার্ণের বিরোধিতা-সূত্রটি অবলম্বন করিয়া জাপান জার্ম্মেনী ও ইতালীর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে; নাৎসী বা ফাসিস্তদের অপেক্ষা জাপানী ক্ষাত্রশক্তিও 'রেয়াল পলেটিকে'র কম ভক্ত নয়। চীনের গৃহসংস্কার আরম্ভ হইতেই তাই জাপানীরা তাহার ধ্বংসের ওজর খুঁজিয়া লইয়াছে। একে একে চীনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরগুলি জাপানের হস্তগত হইয়াছে। নয়-শক্তির চুক্তি ও ওয়াশিংটন চুক্তি, অবাধ বাণিজ্য

প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি মাঞ্চুকুয়োর সময়েই বাতিল করিয়া দিয়া জাপান এখন নিষ্কণ্টক। শুধু তাহাই নয়, চীনে জাপানী সৈনিকদের ঔদ্ধত্য ও অবহেলা হইতে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেনী, মার্কিণ—কোন জাতিই রেহাই পায় না। অবশ্য অনেক সময়েই এই সব শক্তি জাপানের এই আচরণে তাহাদের আপত্তি জানায়, জাপানও নিয়ম মাফিক নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করে। এই খেলা জমিয়াছে বেশ, স্পেনের নিরপেক্ষতা-কমিটির মতই ইহা আন্তর্জ্জাতিকতার ইতিহাসে এক হাস্যকর অধ্যায়। ব্রিটিশ-ফরাসী প্রভৃতি শক্তিদের অবশ্য ইহাতে মান বাঁচিতেছে না, কিন্তু আপাততঃ প্রাণ বাঁচিতেছে, তাহাই যথেষ্ট। চীন যাইতে বসিয়াছে, যাইবে। কিন্তু তাহা পরিপাক করিতে জাপানের অনেক দিন লাগিবে। তত দিন সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ, ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত ইন্দোচীন, নেদারল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত যবদ্বীপ ও মার্কিণের সংরক্ষিত ফিলিপাইন অন্ততঃ নিরাপদ থাকুক। ইতিমধ্যে এই সব শক্তি নিজেরা ভাবী দিনের জন্য প্রস্তুত হইবে এইরূপ একটা চিন্তা এই সব জাতির মনে জাগিতেছে। তাই সিঙ্গাপুরে নৌ-ঘাঁটি সম্পূর্ণ হইল, প্রাচ্য-মণ্ডলে এমন কি ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত, ব্রিটেনের সমর-শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে; ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা নৌ-নির্ম্মাণে পরস্পর একযোগে মন্ত্রণা করিতেছে, জাপানের নিকটেও তাহার নৌ-নির্ম্মাণের ভাবী প্রোগ্রাম চাহিতেছে। রূঢ় ভাবেই জাপান অবশ্য এই প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। বরং শোনা যায়, ৩৫ হাজার টনেরও বড় যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিতে সে এখন কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু এই ত্রি-শক্তির ঐক্য, আর্থিক শক্তি ও সমরনৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান একেবারে একচ্ছত্র হইতে পারিবে না—বরং আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। অথচ জাপান সবে আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে, মাঞ্চুকুয়ো, চীন, বহির্ম্মঙ্গোলিয়া সাইবেরিয়া শেষ হইতে না-হইতে তাহার প্রবর্দ্ধমান জনসংখ্যার নামে দাবি পড়িবে অষ্ট্রেলিয়ার উপর, প্রসারিত শিল্পবাণিজ্যের তাগিদে চীনে ও ভারতবর্ষে প্রধান ও একান্ত অধিকার তাহার প্রয়োজন হইবে, আর সমস্ত প্রাচ্য ভূমণ্ডলে সে চাহিবে আপনার প্রভুত্ব। সুদূর প্রাচ্যে জাপানী মহাসাম্রাজ্যের উদয় হয়ত সুদূর নয়।

৬

তনাকার এই স্বপ্ন সুপরিচিত, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও জানেন, আমরাও জানি। কিন্তু সত্যসত্যই কি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পক্ষে এক নূতন বিভীষিকা? চীনের অদৃষ্ট দেখিয়া কি ইহাই মনে হয় না যে এই দানবীয় শক্তির সম্মুখে আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার স্বপ্ন না-দেখাই ভাল, আপনার আত্মকর্ত্তৃত্ব—যেটুকু আত্মাধিকার এখনও পাইতেছি—তাহাও অটুট রাখিতে হইলে আর পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা না-করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ্যের আদর্শই গ্রহণ করা উচিত? সত্যসত্যই এইরূপ একটা ভাবনা অনেক ধীরপন্থী ভারতবাসীর মনে যে না-জাগিতেছে তাহা নয়।

কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতাই যাহারা জাতির চরম ও একমাত্র সম্মানকর দাবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে জাপান অনুরূপ আশা ও আশঙ্কার কারণ। আশা এই—প্রাচ্য-মণ্ডলে এই অতি-প্রবল শক্তির ক্রম-প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হয়ত নির্ব্বাপিত হইবে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম হইতে যদি আবার মুসোলিনীর ফাসিস্তরা ব্রিটিশ-পূর্ব্ব-পৃথিবীকে চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে ব্রিটিশ-নিগড় হইতে ভারতবর্ষের মুক্তি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। এখন তবে কংগ্রেসের পক্ষে চীনের সহিত এই অকেজো ও অর্থহীন সহমর্ম্মিতা না-জানাইয়া জাপানের সহিত ও ইতালীর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করাই কি ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র হওয়া উচিত নয়? অন্য দিকে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর মনে এই প্রশ্নও আছে—এই নূতন সাম্রাজ্যবাদী জাপান বা ইতালীর নিকট স্বাধীন ভারতের সত্যই ভয়ের কারণ আছে কি? পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে বলিয়াছেন, যে, মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই বুঝিব ইহাদের আস্তানা ও ভারতবর্ষের মধ্যে কত শত মাইলের তফাৎ। তাহা ছাড়া যে-ভারত ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করিবার মত শক্তি

সংগ্রহ করিতে পারিবে সে অত সহজে জাপান বা ইতালীর হাতেও আত্মবিক্রয় করিবে না—তাহা সহজেই বুঝা যায়। পণ্ডিত জবাহরলাল তাই এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া বাতিল করিতে চাহেন। তাহাই যদি হয় তবে আবার সেই প্রশ্ন উঠে, জাপানী বন্ধুত্ব, ইতালীয় বন্ধুত্ব ও জার্ম্মান বন্ধুত্বই কি ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? অথচ তাহা জবাহরলালজীর বা ভারতবাসীরও মনঃপূত নয়। সুভাষচন্দ্র সোভিয়েটের নজির উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে সুবিধাবাদ অবলম্বন করিতেই যেন বলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নেতারা বলেন, যে, এইরূপ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চিন্তা শুধু ব্যাপক দৃষ্টির ও বাস্তব দৃষ্টির অভাবেই আমাদের মনে দেখা দেয়। আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের যে স্বার্থ এক, ইহা ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনাতেই প্রমাণিত। দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের এই প্রচণ্ড পরাক্রমের মতই অন্য বড় সত্য কথা এই যে, দুনিয়াব্যাপী বঞ্চিত ও শোষিত জাতিরাও আপনাদের পরস্পর মিলনের পথ ও পরম প্রয়াসের সূত্রটি খুঁজিয়া পাইতেছে; অপর পক্ষে প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই এক স্ববিনাশী-দ্বন্দ্বও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই নূতন পুরাতন সকল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এখন হইতেই নিজেদের মত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলে নিপীড়িতদের পরস্পর মিলনের পথ সুগম হইবে।

যাহাই হউক, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হইলেও এই পথই ন্যায়ের পথ—ইহাই এখন আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।

গগনেন্দ্রনাথ

নিশিকান্ত

লাল নীল সাদা ও কালোরে,
আঁধার আলোরে
চির-মিলনের ছন্দে বাঁধিয়াছে তোমার তুলিকা;
হে মায়াবী, তোমার মায়ায়
ধরিলে ধরায়
অরূপের মর্ম্মবহ্নি প্রস্ফুটিত রূপের বর্ত্তিকা।

সকল রঙের সীমানায়
যেথা নিদ্রা যায়
নিরঞ্জন মহাশিল্পী; সকল স্বপ্নের পরপারে
স্বপন-বিহ্বল যে-স্বপনী,
আকাশ-অবনী
যার স্বপ্ন ফুলসম ফোটে, সূর্য্য-চন্দ্র তারকারে

স্বপ্নমেঘ সম যে ভাসায়;
সন্ধ্যায় উষায়
যে-বর্ণহীনের বাণী বিচ্ছুরিত বর্ণের প্লাবনে;
রবির স্বর্বণ-ধারে আর
শশীর রূপার
ঝরণায়, দিনে রাত্রে, বসন্তে শ্রাবণে,

যার স্বপ্ন ওঠে বিকশিয়া;
যাহারে ঘিরিয়া
জীবনের সুখ-দুঃখ স্বপ্নসম তরঙ্গিত হয়;
যে-গভীরে হাসি ও ক্রন্দন
মুক্তি ও বন্ধন
আনন্দে সুষমায়িত; চিত্ত তব ছিল যে তন্ময়।

সেই গভীরের সাথে, তুমি
সে-চেতন চুমি
আছিলে স্বপনমগ্ন, তাই তব জীবনের বেলা
অতলমন্থিত ঢেউ তুলে
ছিল আত্ম ভুলে,
বর্ণে বর্ণে খেলেছিল বর্ণহীন অন্তরের খেলা।

শিল্পী, তাই তোমার প্রকাশ
আনিল উল্লাস
কালহীন-বিলাসের; তোমার জন্মের মাঝে আসি
জন্মমৃত্যুহারা কোন প্রাণ
করি গেল দান
মর্ত্ত্যের ধূলার পরে চিরন্তন-বৈভবের রাশি।

প্রাণিতত্ত্বমন্দির, ভিয়েনা
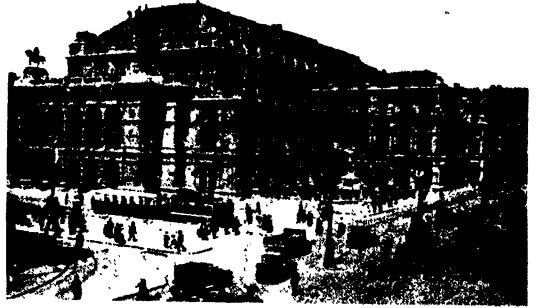
অপেরা-সৌধ, ভিয়েনা

অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনী

গত ফেব্রুয়ারি মাসে হিটলারের বাসভবনে অ[illegible]
রাষ্ট্রনায়ক শুশনিগ ও হিটলারের মধ্যে আলোচনার ফলে
অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীদের যে-সব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে
তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে

হেড্‌ন (১৭৩২-১৮০৯)। অষ্ট্রিয়া সুর- ও গীত-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র—হেড্‌ন অষ্ট্রিয়ার এই সুর-লোকের একজন প্রধান প্রতিনিধি।

মোজার্ট (১৭৫৬-১৭৯১)। সলৎসবুর্গে তাঁহার জন্ম-ভবনে এখনও প্রতিবর্ষে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। বাল্যেই তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হয় ও আট বৎসর বয়সে ইউরোপের বহু প্রধান নগরীতে তিনি সমাদৃত হন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনায় রাজসভায় নিয়োগ লাভ করেন ও অপেরা আরম্ভ করেন। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াও, স্বদেশপ্রেমে আঘাত লাগিবে মনে করিয়া প্রুশিয়ার ফ্রেডারিক উইলিয়মের রাজসভায় প্রধান গীত-নিয়ন্ত্রকের পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। ১৭৯১ সালে ভিয়েনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বীঠোফেন (১৭৭০-১৮২৭)। অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ না করিলেও তিনি সুর-পুরী ভিয়েনার আকর্ষণে ঐ স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। জার্ম্মেনীর অন্তর্গত বন্‌এ তাঁহার জন্ম, ভিয়েনায় তাঁহার মৃত্যু।

ব্রাম্‌স্‌ (১৮৩৩-১৮৯৭)। হাম্‌বুর্গে ইঁহার জন্ম, কিন্তু বীঠোফেনের ন্যায় এই সুরসাধকও ভিয়েনায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

ও হইতেছে—নূতন ব্যবস্থার ফলে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা হইবে, ও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ বক্তৃতায় এই কথা বার বার বলিলেও একথা সকলেই জানেন যে, অষ্ট্রিয়ায় মন্ত্রীসভায় বর্ত্তমানে হিটলারের মনোনীত একজন মন্ত্রীর নিয়োগ, অদূর-ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার উপরে নাৎসী জার্ম্মেনীর সম্পূর্ণতম প্রভাব বিস্তারের কথাই সূচনা করে। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে, বিশেষতঃ হিটলারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের সময় হইতে, যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিয়া আসিতেছে বর্ত্তমান ঘটনাবলী তাহারই একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে গত কয়েক বৎসরের সম্বন্ধ যে-সকল ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এই সময়ে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে বর্ত্তমান ঘটনা-পরম্পরা পাঠকের নিকট বিশদ হইতে পারে মনে করিয়া সেই পূর্ব্বকাহিনী এখানে অংশতঃ সংকলিত হইল।

অষ্ট্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি হিটলারের এই প্রথম নয়;

হিউগো উলফ (১৮৬০-১৯০৩)। আধুনিক কালে অষ্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠ সুরসাধক। গেটে, হাইনে প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবির রচনায় তিনি সুর-সংযোজন করিয়া গিয়াছেন।

অষ্ট্রিয়ার ও জার্ম্মেনীর সংহতি-বিধানের কথা হিটলারের আত্মকাহিনীতেই উল্লিখিত আছে। অষ্ট্রিয়ার অবস্থান ইউরোপের অন্যান্য দেশের পক্ষে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অষ্ট্রিয়ার উপরে কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারিলে আড্রিয়াটিক সাগর পর্য্যন্ত জার্ম্মেনীর পথমোচন হয় এবং এইরূপে দ্বিধাবিভক্ত ইউরোপের পূর্ব্বখণ্ডের উপর জার্ম্মেনী প্রভুত্ব খাটাইতে পারে। এই জন্যই অষ্ট্রিয়ার প্রতি জার্ম্মেনীর অশুভ দৃষ্টি এবং এই জন্যই ইউরোপের অন্যান্য জাতির মুখে অষ্ট্রিয়ার স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বাধীনতার কথা। রণনীতির দিক দিয়াও অষ্ট্রিয়ার মূল্য এই যে, অষ্ট্রিয়া আয়ত্তাধীন থাকিলে প্রভু-রাষ্ট্রের পক্ষে জার্ম্মেনী হইতে ইটালী ও ইটালী হইতে জার্ম্মেনী ও হাঙ্গেরীতে প্রবেশ-পথ সুগম হয়, চেকোস্লোভাকিয়াকেও বেড়িয়া ধরা সহজ হয়।

অষ্ট্রিয়াকে প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টার সপক্ষে জার্ম্মেনীর একটি যুক্তি, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর ভাষা- ও সংস্কৃতি-গত ঐক্য ও যোগাযোগ। ইউরোপের বিভিন্ন

"জননী"—প্রস্তরমূর্ত্তি, আনুমানিক ১৪০০ খ্রীঃ, ভিয়েনার মিউজিয়ম হইতে

নিম্ন অষ্ট্রিয়ার একটি নগর-তোরণ

হাবসবুর্গ পরিবারের রাজ-মুকুট
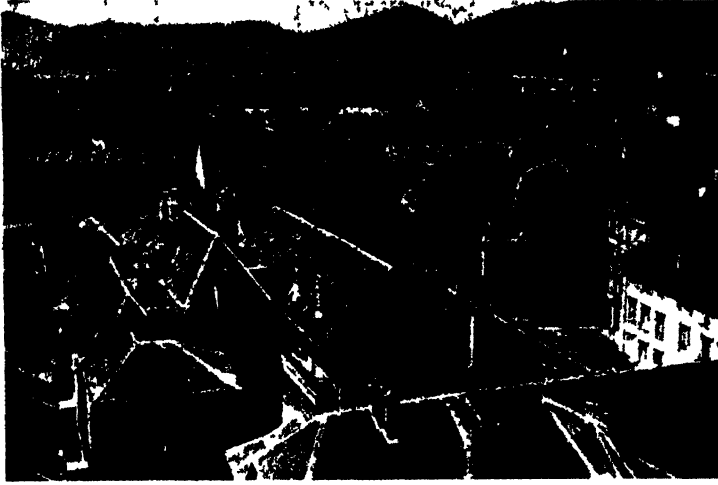
অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশের প্রধান শহর গ্রাজ—
সম্প্রতি এখানে নাৎসীদের উপদ্রব-সম্ভাবনা চলিতেছে।

যোগের কথা ত আছেই। এ-ছাড়া, মহাযুদ্ধের পরে বিখণ্ডিত হইয়া অষ্ট্রিয়া ক্ষীণায়তন, লোকবল ও ধনবল হীন দেশে পরিণত হইলে, এই দুর্ব্বল দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, অন্য কোন দেশের সহিত সম্মিলিত না হইলে একক বাঁচিয়া থাকা ইহার পক্ষে কঠিন, এই ভাব প্রবল হয়; অথচ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র কখনও অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মেনীর সহিত যুক্ত হইতে দিবে না। ১৯২১ সালে, অষ্ট্রিয়ার নয়টি প্রদেশের মধ্যে তিনটি জার্ম্মেনীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার যোগের প্রস্তাব করে, কিন্তু মিত্রশক্তি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। এই সময় বিদেশীর সহায়তায়ই অষ্ট্রিয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকে—অষ্ট্রিয়া তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে এইরূপ সর্ত্তে ১৯২২ সালে মিত্রশক্তি অষ্ট্রিয়াকে ২৬ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ দেয়—এই সময় জার্ম্মেনী-অষ্ট্রিয়া সম্মিলনের প্রস্তাব আর অগ্রসর হয় নাই। ১৯৩১ সালে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে এক কাষ্টম্‌স্‌ ইউনিয়নের প্রস্তাব হয়। কিন্তু ভার্সাই চুক্তি

অংশের জার্ম্মান-ভাষী ও জার্ম্মান-জাতিদের অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর একটি মূলনীতি। মহাযুদ্ধের পরে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী যখন বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত হয় তখন স্ব-নিয়ন্ত্রণনীতি (Self-determination) মুখে অনেকেই স্বীকার করিলেও অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মানদিগকেও জার্ম্মেনীর সঙ্গে যুক্ত দেওয়া হয় নাই। (দক্ষিণ টাইরলে বহু জার্ম্মান-ভাষী অষ্ট্রিয়ানের বাস, যুদ্ধের পর ঐ অঞ্চল ইটালীর অধীনে আসে, ৩,০০০,০০০ জার্ম্মান-ভাষী অষ্ট্রিয়ান যুদ্ধের পরে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগে পড়ে। ইহাদের উপরেও জার্ম্মেনীর খরদৃষ্টি আছে।) প্রতিবেশী জার্ম্মান-ভাষীরা নাৎসীবাদ গ্রহণ না-করিলে নাৎসীদের নিখিল-জার্ম্মান সংহতির প্রস্তাব শুধু কথার কথায় পরিণত হয়। হিটলার স্বয়ং অষ্ট্রিয়ান, একথাও স্মরণযোগ্য। অষ্ট্রিয়ার লৌহসম্পদেও জার্ম্মেনীর প্রয়োজন কম নহে।

মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় হইতে জার্ম্মেনীর সহিত উহার সংযোগ-বিধানের কথাটা অল্পবিস্তর চলিয়া আসিতেছে। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে সংস্কৃতিগত

অষ্ট্রিয়ার পুরাতন লোক-পরিচ্ছদ

অষ্ট্রিয়ার ক্যাথিড্রালে আনুমানিক ১২২০ সালের ফ্রেস্কো-চিত্র

অষ্ট্রিয়ার অল্টেনবুর্গের মঠ

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ভিয়েনা
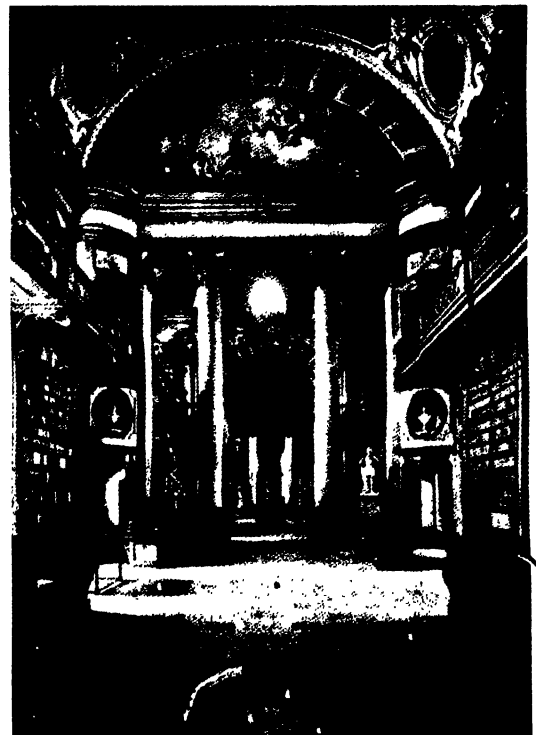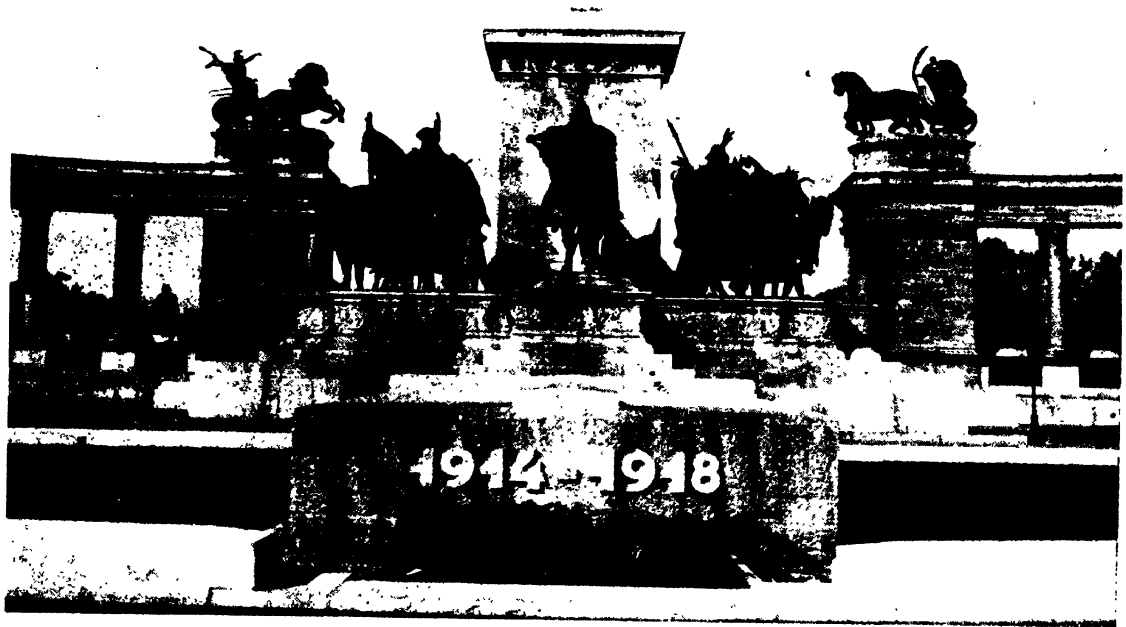
বিগত মহাযুদ্ধে নিহত অখ্যাতপরিচয় সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ, বুডাপেষ্ট
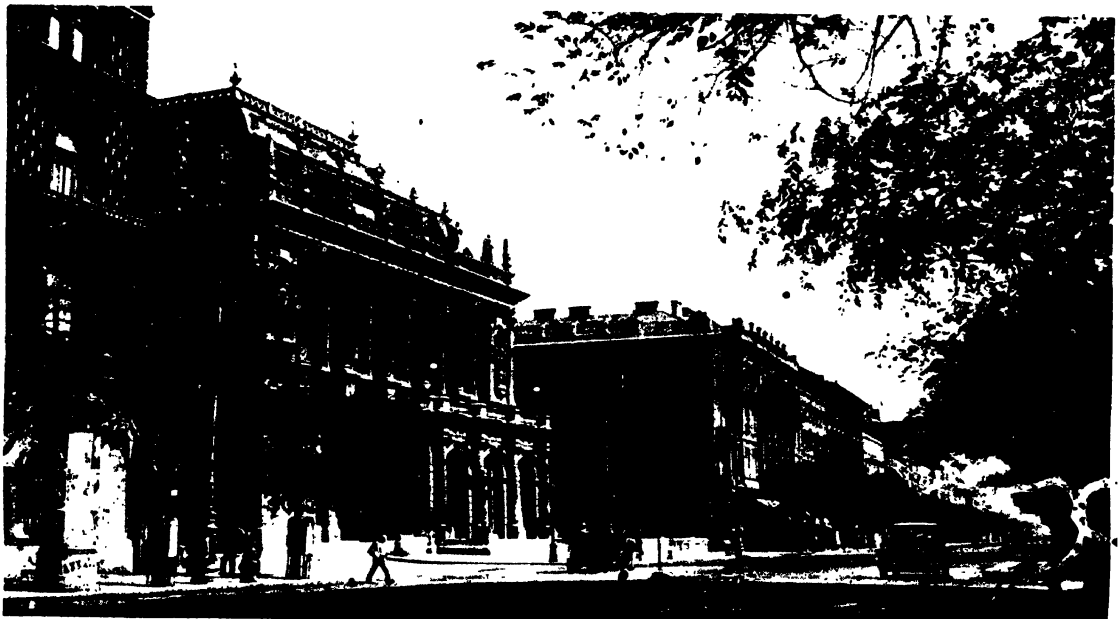
বুডাপেষ্টের অপেরা-হাউস

অনুসারে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে কোনরূপ যোগস্থাপন চলিতে পারে না, এই বলিয়া ফ্রান্স ইহাতে বাধা দেয় ও ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

অষ্ট্রিয়ায় জার্ম্মেনীর সহিত যোগের অনুকূল ভাব থাকিলেও, হিটলারের পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীদের প্রভাব বিশেষ ছিল না। ১৯৩৩ সানে হিটলার জার্ম্মেনীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়ার পর হইতে তাঁহার প্ররোচনায় অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীদের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্ট্রিয়াকে নাৎসীবাদ গ্রহণ করাইবার জন্য নাৎসীগণ নানারূপ প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকে ও ভয়প্রদর্শন বলপ্রয়োগ ইত্যাদি করিতে থাকে। ইহাতে সাধারণ লোকের মনে বিপরীত ভাবই উপস্থিত হইল—পূর্ব্বে যাহারা জার্ম্মেনীর সহিত মিলনের পক্ষপাতী ছিল এরূপ লোকও অনেকে অষ্ট্রিয়াকে নাৎসী জার্ম্মেনী হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার পক্ষপাতী হইল। হিটলারের জার্ম্মেনীতে সোশ্যালিষ্টদের প্রতি দুর্ব্যবহার দেখিয়া অষ্ট্রিয়ান সোশ্যালিষ্টগণ অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মিলনের বিরোধী ত হইবেই। এই সময় ডলফাস অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বময় অধিনেতা। তিনি মুসোলিনীর পৃষ্ঠপোষিত, অষ্ট্রিয়ার সোশ্যালিষ্ট ও নাৎসী দুই দলেরই তিনি বিরোধী।

ইটালী ও জার্ম্মেনীকে বর্ত্তমানে একান্ত ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্র বলিয়া দেখিতে পাইতেছি। এই দুই দেশের রাষ্ট্রকল্পনাও অনুরূপ; তৎসত্ত্বেও মুসোলিনীর পৃষ্ঠপোষিত ডলফাস নাৎসী জার্ম্মেনীর পরিপন্থী হইবার অন্যতম কারণ,

"দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে ব্যবধান"

ইটালী ও জার্ম্মেনীর মধ্যে অষ্ট্রিয়া ও এই ব্যবধানের (buffer state) কাজ করিয়াছে। অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সীমান্তদেশ জার্ম্মেনীর আয়ত্তাধীন হইবে, ইহা ইটালীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রীতিকর নহে। তাহা ছাড়া ইটালীর অধীন দক্ষিণ টাইরলে বহু জার্ম্মান-ভাষীর বাস—জার্ম্মান প্রভাব হইতে ঐ অঞ্চল যতদূরে থাকে ইটালীর পক্ষে ততই মঙ্গল। এইজন্যই ইটালী অষ্ট্রিয়াকে আশ্রয় দিয়াছিল।

ডলফাসের আমলে অষ্ট্রিয়ায় হিটলারের প্ররোচনায় ও অর্থসাহায্যে নাৎসীদের প্রকোপ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিলে নাৎসীদের অত্যাচার-অশান্তি দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া ওঠে, ডলফাসও সাধ্যমত তাহার সমুচিত উত্তর দেন ও অষ্ট্রিয়ার নাৎসী দলকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। নাৎসীরা এরোপ্লেন হইতে তাহাদের প্রচার-পত্রী অষ্ট্রিয়ায় ছড়াইতে থাকে, মিউনিক হইতে হিটলারের নিযুক্ত লোক অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রেডিয়ো-যোগে প্রচার চালাইতে থাকে—অষ্ট্রিয়া হইতে পলাতক অষ্ট্রিয়ান নাৎসীরা হিটলারের আনুকূল্যে জার্ম্মেনীতে এক 'অষ্ট্রিয়ান লিজিয়ন' বা সেনাদল সংগঠন করে, তাহাদের উদ্দেশ্য অষ্ট্রিয়াকে সুযোগমত আক্রমণ ও অধিকার করা।

অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর সম্বন্ধ এই সময় এরূপ কণ্টকসঙ্কুল হইয়া উঠে যে অবশেষে ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি একান্ত আপত্তি করিলে তবে জার্ম্মেনী কিছুকালের জন্য শান্ত হয়।

অষ্ট্রিয়ার নাৎসী ও সোশ্যালিষ্ট দুই দলের আক্রমণই ডলফাসকে প্রতিরোধ করিয়া চলিতে হইতেছিল। নাৎসী প্রতিপক্ষের গতিরোধ করিতে হইলে অষ্ট্রিয়া-গবর্ণ্মেণ্টের প্রয়োজন ছিল নাৎসী-বিরোধী সোশ্যালিষ্টদের কোনও রূপে সন্তুষ্ট রাখা; তাহার পরিবর্ত্তে মুসোলিনীর প্ররোচনায় ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোশ্যালিষ্টদের প্রতি কঠিন দমন-নীতি প্রযুক্ত হইল। এই সোশ্যালিষ্ট-দমনের ফলে, ডলফাস শক্তিশালী হওয়া দূরে থাকুক, নাৎসী-বিরোধী দলের শক্তি হ্রাস পাইয়া অষ্ট্রিয়ার নাৎসী দল নূতন করিয়া উদ্দীপনা লাভ করিল। রূঢ়ভাবে প্রচার না-চালাইয়া, অত্যাচার ও ভীতি-প্রদর্শনের পথে না-গিয়া, অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীবাদ ও জার্ম্মেনীর সহিত ঐক্যের কথা প্রচারের ভার চতুর ও বিচক্ষণ লোকের হাতে থাকিলে এই সময়েই অষ্ট্রিয়া হয়ত হিটলারের সম্পূর্ণ করতলগত হইতে পারিত।

কিন্তু, অষ্ট্রিয়ার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহা হয় নাই। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে নাৎসী ষড়যন্ত্রের ফলে ডলফাস নিহত হন। কিন্তু নাৎসী ষড়যন্ত্র সার্থক হইল না। সমস্ত অষ্ট্রিয়াময় নাৎসীদলের

ষড়যন্ত্র বিস্তৃত হইল না। এতদিন অষ্ট্রিয়ান নাৎসীদের প্ররোচিত করিয়া শেষ মুহূর্ত্তে জার্ম্মেনী পিছাইয়া গেল, পূর্ব্বোল্লিখিত 'অষ্ট্রিয়ান লিজিয়ন' অষ্ট্রিয়ার নাৎসীদের সহায়তা করিবে বলিয়া যে-কথা ছিল তাহাও কার্য্যে পরিণত হইল না। জার্ম্মেনীর এইরূপ পিছাইয়া যাইবার অন্যতম কারণ, দেখা গেল, সীমান্তে ইটালীয়ান সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে, নাৎসী ষড়যন্ত্র সফলকাম হইলে ইটালীয়ান সৈন্যও অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিবে। শুশনিগ অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর হইলেন।

১৯৩৪ সালের পরে অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মেনী-সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মেনীর মধ্যে ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই তারিখের চুক্তি। অষ্ট্রিয়াকে আয়ত্তাধীন করার কথা হিটলার যে ইতিমধ্যে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন এমন নহে; তবে তিনি জানিতেন, অপেক্ষা করিলে অষ্ট্রিয়া একদিন তাঁহার মুষ্টির মধ্যে আসিবেই। এই সময়ে ইটালী ও জার্ম্মেনীর মধ্যে সম্পর্ক যখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধে তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে মাত্র। ১৯৩৪ সালের শেষেও অষ্ট্রিয়া লইয়া ইটালী ও জার্ম্মেনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ইটালী ও জার্ম্মেনীর সম্পর্ক নিকটতর হইয়া অষ্ট্রিয়া-সম্পর্কে হিটলারের কার্য্য-কলাপে ইটালীর বাধা-প্রদান শিথিল হয়। ১৯৩৬ সালের অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মান চুক্তিতে, জার্ম্মেনী অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যের কথা মানিয়া লয়, কিন্তু অষ্ট্রিয়া যে একটি জার্ম্মান রাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া নিজের কার্য্যকলাপে একথা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। এই চুক্তির সর্ত্ত মুসোলিনী পূর্ব্বেই দেখিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান চুক্তিও ইটালীর অননুমোদিত নহে, এইরূপ প্রকাশ। [সংকলিত]

স.

স্বপ্ন ও জাগরণ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বপ্ন-সে নেচে নেচে মানবের চিত্তকে
সুখে আর দুঃখেতে ক'রে দিল রংদার,
ঘুম ভাঙি স্বপনেরে মনে হ'ল মিথ্যা সে,
মনে হ'ল সত্যি এ জেগে-ওঠা সংসার।
জেগে-ওঠা জড়দেহে ঘুমভাঙা নয়নের
চলমান বিশ্বেতে ওঠে কত ছন্দ,
জাগ্রত সংসার সরে যায় ক্ষণে ক্ষণে
ঝরে যায় তিলে তিলে রূপগীতগন্ধ।
পলে পলে ঝরে-পড়া অসহায় রূপরাগ
চঞ্চল—তবু তারে মনে হ'ল সত্যি,
স্বপ্নেরি মত সে যে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়
হ'ল নাকো সন্দেহ তবু একরত্তি?
নিত্য যা স'রে যায় সেই জাগা সত্যেরে
ভোগ করি জীবনের আসে পুনঃ নিদ্রা,
চিন্তার যমুনায় চিত্তের গাগরীটি সত্য ও মিথ্যায়
হ'ল শতছিদ্রা।
নিদ্রার মাঝে হায় পুনঃ শত সংসার
রংদার হয়ে ওঠে মোছে কত দুঃখ,
তবু এই জেগে-ওঠা চিত্তের দোলনাতে
তর্কেতে তর্কেতে দোল খায় বিশ্ব
সত্য ও মিথ্যার বিচারের কুন্তটি কাঁদে হায় চিরদিন
জীবনের কক্ষে
বুদ্ধির ছিদ্রে গো সব জল ঝরে যায়
হেসে ওঠে মহাকাল বিদ্রূপ-চক্ষে।
নিদ্রা ও জাগরণে সত্যের মত ওরে
চিরদিন আসে যায় সুখ আর দুঃখ,
তবু হায় চিত্তের রঙীন এই শ্লোক
বুদ্ধির ধারে কভু হ'ল নাকো সূক্ষ্ম।
জ্ঞানিগণ বলে হেসে—স্বপ্নে ও জেগে দেখা
মিথ্যা যে সন্দেহ নেই একরত্তি,
বিশ্বাসী ভক্ত সে হেসে বলে—বন্ধু গো,
জীবনের দু'টি ভোগ দুইটাই সত্যি।
মিথ্যা ও সত্যের এই দুই সন্দেহে তর্কেতে তর্কেতে
ছেয়ে ফেলে নিত্যে,
স্বপ্ন কি জাগরণ মিছে হোক ক্ষতি নাই,
মায়াময় তৃপ্তি যেন হ'য়ো নাকো মিথ্যে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখভোগ কাহাদের জন্য ?

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক অপরাধে বা সন্দেহে অনেক পুরুষ ও নারীর বৈয়ক্তিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। বাংলা দেশেই ইহাদের সংখ্যা বেশী। ইহাদের অনেকে খালাস পাইয়াছেন—কেহ বা বিনা সর্ত্তে, কেহ বা কোন কোন সর্ত্তে; কিন্তু এখনও অনেকে মুক্তি পান নাই। তাঁহাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন হইতেছে।

এই সমুদয় পুরুষ ও নারীকে বন্দী করিবার সত্য কোন কারণ ছিল কি না—প্রকাশ্য বিচারান্তে যাঁহাদের শাস্তি হইয়াছিল, তাঁহারা বাস্তবিক কোন অপরাধ বা নৈতিক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন কি না, এবং যাঁহারা বিনা বিচারে ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশ্যন অনুসারে বা অন্য কোন আইন-কানুন অনুসারে স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহারের কোন যথার্থ ও যথেষ্ট কারণ ছিল কি না, এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে দণ্ডভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সাধারণ অনেক বন্দীর মতই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে, সাধারণ বন্দীরা ব্যক্তিগত লাভালাভের চিন্তা বা হিংসাদ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক দৌরাত্ম্যকারীরা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে, মতিভ্রমবশতঃ, ঐরূপ কাজ করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগকে বিনা বিচারে, সন্দেহবশতঃ, স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহারা রাজনৈতিক কোন কাজ (হইতে পারে, যে, দুর্নীতিমূলক কাজ) করিতে চান বা করিয়াছেন, এই সন্দেহ তাঁহাদের দুঃখভোগের কারণ।

এই রাজনৈতিক বন্দীরা যাহাই করিয়া থাকুন বা যাহা করিয়াছেন বা করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহা দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার সহিত জড়িত।

যে-দেশকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার সহিত ইহাদের কাজ জড়িত, সেটি কোন্ দেশ? পঞ্জাবী রাজনৈতিক বন্দীরা কি শুধু পঞ্জাবকে, হিন্দুস্থানী ঐ প্রকার বন্দীরা কি শুধু আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে, বিহারী ঐরূপ বন্দীরা শুধু কি বিহারকে, বাঙালী ঐ শ্রেণীর বন্দীরা কি শুধু বঙ্গদেশকে, মহারাষ্ট্রীয় ঐ রকম বন্দীরা কি কেবল মহারাষ্ট্রকে,......স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন? তাহা নহে। সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার সহিত তাঁহাদের কাজের, প্রচেষ্টার, অভিপ্রায়ের সংস্রব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যসত্যই অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধও, মতিভ্রমপ্রযুক্ত, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য করা হইয়াছিল, প্রদেশ-বিশেষের জন্য নহে।

অতএব, এই রাজনৈতিক বন্দীরা যে-প্রদেশেরই হউন, তাঁহাদের বন্দীদশা বা মুক্তি নিখিলভারতীয় প্রশ্ন—প্রাদেশিক প্রশ্ন নহে। পঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখভোগ পঞ্জাবের জন্য, গুজরাটের বন্দীদের গুজরাটের জন্য, অন্ধ্রের বন্দীদের অন্ধ্রের জন্য, মহাকোশলের বন্দীদের মহাকোশলের জন্য, বিদর্ভের বন্দীদের বিদর্ভের জন্য, আসামের বন্দীদের আসামের জন্য, কেরলের বন্দীদের কেরলের জন্য,......এরূপ নহে; সকলের দুঃখভোগ সকল প্রদেশের ও সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য।

এই হেতু, সমগ্রভারতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির চেষ্টা প্রাদেশিক খণ্ড খণ্ড চেষ্টা না-হইয়া সমগ্রভারতীয় অখণ্ড চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের বলা উচিত ছিল, সকল প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি না-দিলে সমুদয় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কাজে ইস্তফা দিবেন। কিন্তু তাহা বলা হয় নাই। তাহা বলা হইলে এবং তদনুযায়ী কাজ হইলেও হয়ত বন্দীদের মুক্তি হইত না—যদিও হইতেও পারিত। কিন্তু অন্য একটা মহৎ সুফল

ফলিত—সমগ্র ভারতের একপ্রাণতা বাড়িত ও প্রমাণিত হইত।

আমরা বহুবার লিখিয়াছি, নূতন ভারতশাসন-আইন যে জয়েন্ট-পার্লেমেণ্টারি কমীটির রিপোর্ট অনুসারে মুসাবিদা করা হয়, সেই কমীটি রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রাদেশিক স্বাধীন কর্ম্মিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য ভারতবর্ষের একত্ব নষ্ট করিতেছেন। নূতন আইন অনুসারে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব কিছুই বাড়ে নাই বলিলে ভুল হইবে—কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরাই বলিয়াছেন তাঁহাদের ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। সুতরাং যথার্থ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ("প্রভিন্স্যাল অটনমি") হয় নাই। কিন্তু তাহা যতটুকু হইয়াছে, ভারতবর্ষের একত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী নষ্ট হইয়াছে।

কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, যখন এই প্রশ্নের আলোচনা হইতেছিল, তখন আমরা বলিয়াছিলাম, যদি মন্ত্রিত্বগ্রহণে সুবিধা হয়, তাহা হইলে সে সুবিধা হইবে কয়েকটি প্রদেশের, সকল প্রদেশের হইবে না; অতএব কতকগুলি প্রদেশকে অসুবিধায় ফেলিয়া রাখিয়া অন্য প্রদেশগুলির সুবিধা ভোগ করা একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক হইবে না। তদ্ভিন্ন, দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের নীতি এক হওয়া উচিত; কতকগুলি প্রদেশে কংগ্রেস হইবেন গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী এবং অন্য কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসই গবর্ন্মেণ্ট হইবেন এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সহিত মিতালি করিবেন, এরূপ নীতিতে সঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

কংগ্রেস এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছেন বটে, এবং এই চীৎকার যে অকপট নহে তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি নিছক শয়তানী হয়, তাহা হইলে তাহার হাতের তৈরি আইনের সাহায্যে দেশের কিছু উপকার হইতেছে কি প্রকারে? যদি বলেন, উপকার হইতেছে না, তাহা হইলে প্রশ্ন করিতে হয়, মন্ত্রিত্ব লইলেন কেন?

যাহা হউক, কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের হিতার্থে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হইলেও কেবল কয়েকটি প্রদেশের প্রত্যক্ষ হিত করিতেছেন এবং অন্যগুলিতে আন্দোলন ও চীৎকার করিতেছেন—যদিও এই আন্দোলন ও চীৎকারের উদ্দেশ্য হিতসাধন। এই জন্য মন্ত্রিত্বগ্রহণ প্রশ্নের যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে, "Every man for himself, and the devil take the hindmost" এই ইংরেজী প্রবাদটির উল্লেখ করিয়াছিলাম।

কংগ্রেস যে কয়েকটি প্রদেশের হিত করিতেছেন, আমরা তাহাদের হিংসা করিতেছি না, নিন্দাও করিতেছি না। কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের একপ্রাণতা কংগ্রেসে মূর্ত্তিমতী হয় নাই—এখনও কোন প্রদেশ বলিতে পারে নাই, "ভারতশাসন-আইন হইতে যে-সুখসুবিধা সব প্রদেশ পাইবে না, আমরা তাহা লইব না।" হইতে পারে, যে, কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী হওয়ায় কালক্রমে সব প্রদেশেরই উপকার হইবে। হইলে সুখের বিষয় হইবে।

কথিত আছে, বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, সকলের মোক্ষলাভ না হইলে আমি মোক্ষ চাই না। অবশ্য, কংগ্রেসওয়ালারা বোধিসত্ত্ব নহেন।

এখন আমরা রাজনৈতিক বন্দীদের কথা বলিতেছি। এই বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলগুলি কাজে বা কথায় ইহা দেখাইতে পারেন নাই, যে, তাঁহারা সব প্রদেশের বন্দীদের মুক্তি চান। দুটি প্রদেশের মন্ত্রীরা ইস্তফা দিয়াছিলেন নিজের নিজের প্রদেশের বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে। তাঁহারা অনুভব করেন নাই, মুখে বলেনও নাই, যে, সমগ্র ভারতের সকল প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের বন্ধন মোচনের জন্য, প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত—যদিও সকল প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীরা সকল প্রদেশেরই, সমগ্র ভারতেরই, দাসত্ববন্ধন মোচনের জন্য সন্দেহভাজন হইয়াছিল বা, কেহ কেহ, [illegible] অপরাধ করিয়াছিল।

কথিত হইতে পারে, মহাত্মা গান্ধী ত বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য বঙ্গে আসিতেছেন। তবে কেন বল, কংগ্রেস বঙ্গের বন্দীদের জন্য কিছু করিতেছেন না? প্রথমেই বলি, মহাত্মা গান্ধী এ সম্পর্কে

যাহা করিয়াছেন ও করিতে আসিতেছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কংগ্রেস ত তাঁহাকে পাঠান নাই, তিনি নিজে আসিতেছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজের নিজের প্রদেশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, বঙ্গের জন্য কিছু করেন নাই, করিবার সাধ্যও হয়ত তাঁহাদের নাই। এই জন্যই ত বলি, ভারতীয় মহাজাতির যে একতা ও একপ্রাণতা বাড়িতেছিল, ভারতশাসন-আইন বহু পরিমাণে তাহা নষ্ট করিয়াছে।

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রদেশে যাহা করিয়াছেন, তাহা আইনপ্রদত্ত নিজেদের ও নিজেদের দলের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করিয়াছেন। গবর্মেণ্ট কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কথা না শুনিলে তাঁহারা গবর্মেণ্টকে নানা অসুবিধায় ফেলিতে পারিতেন। মহাত্মা গান্ধী যাহা করিতে আসিতেছেন, তাহা অন্য প্রকারের চেষ্টা। তিনি বঙ্গের গবর্ণর ও মন্ত্রীদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দয়ার উদ্রেক করিয়া যাহা করিতে পারেন করিবেন। তাঁহার কথা না শুনিলে তাঁহারা কোন অসুবিধায় পড়িবেন না, বঙ্গের বা অন্য কোন প্রদেশের কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন না, অসহযোগ আন্দোলনের পুনরারম্ভ হইবে না। অতএব, কংগ্রেস বঙ্গের দুঃখে সমদুঃখভাগী নহেন। মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি সমদুঃখভাগী।

—

বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি কেন আবশ্যক

ফাল্গুনের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে ৭৪৭-৭৪৮ পৃষ্ঠায় আমরা অন্তরিত ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে আমরা তাহাদের মুক্তি কেন চাই, তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। অন্য কারণও আছে। তাহা বলিবার আগে আরও দু-একটা কথা বলা আবশ্যক।

রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে যাহারা বলপ্রয়োগে হিংসাতে বিশ্বাস করিত, তাহারাও এখন সে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সন্ত্রাসন-বাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা নাই। ইংরেজীতে কয়েদী-দের অনুতাপের বিশ্বাসযোগ্যতার বিরুদ্ধে একটা কথা চলিত আছে বটে; কিন্তু এক্ষেত্রে, যে-সব রাজনৈতিক বন্দী খালাস পাইবে, তাহারা চিহ্নিত হইয়া থাকিবে, কিছু ঘটিলে পুলিস আগেই তাহাদিগকে ধরিবে; এবং তাহারা সর্ব্বসাধারণের কোন সহানুভূতি পাইবে না। ইহা বিবেচনা করিলে, তাহাদের মুক্তি বিপৎসঙ্কুল মনে হয় না।

গত সংখ্যার ৭৪৭-৭৪৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি ও উপরে যাহা লিখিলাম, মন্ত্রীরা তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের বিবেচনার জন্য আরও দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

বঙ্গের কোন উপকারই বঙ্গের কোন মন্ত্রী করিতে চান না, আমরা এরূপ মনে করি না। তাঁহারা বহু অন্তরিত ও বন্দীকে যে খালাস দিয়াছেন, ইহার প্রশংসা তাঁহারা পান নাই এই জন্য, যে, অনেককে খালাস দিতে এখনও বাকী আছে। তাঁহারা যে এক-এক জনের বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেককে খালাস দিয়াছেন ও পরে দিবেন বলিয়াছেন, ইহার জন্যও তাঁহাদের নিন্দা অনেক কাগজে হইয়াছে—যদিও কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও প্রত্যেক বন্দীর বিষয় ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলকে খালাস দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন। অবশ্য, ইহা সত্য, যে, কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা কম, বঙ্গে বেশী। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রীরা একটু শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যেক বন্দীর বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে খালাস দিলেই বঙ্গে ও কংগ্রেসী প্রদেশ-গুলিতে এ-বিষয়ে কোন প্রভেদ থাকিবে না এবং বঙ্গের মন্ত্রীদিগকে এই সম্পর্কে আর নিন্দাও সহ্য করিতে হইবে না। নিন্দিত হওয়া কাহারও পক্ষে সুখকর নহে। নিন্দিত হওয়াতে কোন বাহাদুরিও নাই। অন্তরিত ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে—দু-দিন আগে বা দু-দিন পরে। এবং আগে দিলে কোন বিপদ নাই, বরং মন্ত্রীরা সুস্থচিত্তে দেশহিতকর নানা কাজে মন দিতে পারিবেন ও সেরূপ কাজ করিলে প্রশংসাও পাইবেন। অতএব, রাজনৈতিক দুঃখভোগীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই মন্ত্রীদের পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হইবে। মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনিয়া পরে ছাড়িবার পরিবর্ত্তে তাহা শুনিবার আগে ছাড়িয়া দিলে মন্ত্রীরা অধিক যশস্বী হইবেন। দেশের এতগুলি সমর্থ

শিক্ষিত মানুষ স্বাধীনতায় বঞ্চিত থাকিতে মন্ত্রীদের কোন কাজই লোকে সুনজরে দেখিতে পারিবে না।

অন্তরিত ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মন্ত্রীদের নিজেদের স্বার্থেই ও নিজেদের শান্তির জন্য কেন খালাস দেওয়া উচিত, তাহা বলিলাম। সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে কিছু গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম। এখন আর দু-একটা কথা বলিয়া শেষ করি।

দেশের কল্যাণকর কাজে মন দিতে হইলে উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক, শান্তি আবশ্যক। ইহা ঠিক বটে যে, অন্য বহু দেশের মত বাংলা দেশের দুঃখ বহুবিধ, অভাব অনেক, অনিষ্টকর নানা প্রথা, রীতিনীতি এখানে বিদ্যমান, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। সুতরাং আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে হইবে। কিন্তু অনেক আন্দোলন আছে যাহাতে উত্তেজনার উদ্রেক হয় না। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নিমিত্ত যে আন্দোলন হইতেছে তাহা উত্তেজনাবিহীন আন্দোলন নহে। ইহার অবসান আবশ্যক। বাংলা দেশে এই সম্পর্কে যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ আন্দোলন না-হওয়ায় অন্য কোন কোন প্রদেশ তাহাদের শক্তি ও সময় নিজ নিজ উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে পারিতেছে।

গত ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল বাংলা দেশে উত্তেজনাপূর্ণ কোন-না-কোন আন্দোলন লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে বাংলা দেশ যে-শক্তি ও সময় "গঠনমূলক" কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিত, তাহা করিতে পারে নাই; অন্য অনেক প্রদেশ পারিয়াছে এবং তাহার ফলে অগ্রসর হইয়াছে, এবং বাংলা দেশ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে।

এই জন্য সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের অবসান আবশ্যক।

কিন্তু যে অবাঞ্ছনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য এই আন্দোলন হইতেছে, সেই অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে আন্দোলন থামিতে পারে না, এবং আন্দোলন থামান উচিত হইবে না, বরং তাহা উত্তরোত্তর প্রবলতর ভাবে চালাইতে হইবে।

বাংলা দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন চলিতেছে এবং গত ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল যে-সব উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহার অনভিপ্রেত অন্যতম কুফল এই হইয়াছিল ও হইতেছে যে, বাঙালীর হাজার হাজার ছাত্র যুবজনোচিত উৎসাহে তাহাতে যোগ দিয়াছিল ও দিতেছে, এবং তাহাতে তাহাদের পঠদ্দশার যে প্রধান কাজ শান্ত ও ধীর ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন ও চরিত্রগঠন তাহাতে বাধা পড়িয়াছিল ও পড়িতেছে। উত্তেজনাবশে অনেকে বিপথগামীও হইয়াছিল।

অন্য অনেক প্রদেশে এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন বঙ্গের মত প্রবল আকারে ও দীর্ঘ কাল ধরিয়া না-থাকায় তথাকার ছাত্রেরা জ্ঞান অর্জ্জন ও চরিত্রগঠনে অধিক শক্তি ও সময় দিতে পারিয়াছে। অতএব বঙ্গের অবস্থাবৈগুণ্য দূরীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহী কয়েদীর মুক্তি

ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ চলিয়াছিল; তাহাতে বিদ্রোহীদের সৈনিকই বেশী হতাহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সৈনিকদের মধ্যেও হতাহত অনেক হইয়াছিল। বিদ্রোহান্তে অনেক ব্রহ্মদেশীয় বিদ্রোহী কারারুদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাদের সকলকে খালাস দিতে তথাকার মন্ত্রিমণ্ডল সঙ্কল্প করেন। সম্ভবতঃ এত দিনে সবাই খালাস পাইয়াছে।

বাঙালী অন্তরিত ও রাজনৈতিক বন্দীরা কি ব্রহ্মদেশীয় ঐ মানুষগুলির চেয়েও ভীষণ?

আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারে রাজনৈতিক বন্দী খালাস

প্রবাসীর এই সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারের সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি হইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল বিচারান্তে যাহাদের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

বঙ্গের অন্তরিত ও রাজনৈতিক বন্দীরা কি আগ্রা-

অযোধ্যা ও বিহারের এই লোকগুলির চেয়ে ভয়ানক মানুষ ?

—

মহীশূর রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দী খালাস

মহীশূরে রাজনৈতিক অভিযোগে কারারুদ্ধ সমুদয় বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ঐরূপ অভিযোগে আদালতে যাহাদের বিচার হইতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহীশূর গবর্মেণ্ট প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বঙ্গের যে-সকল অন্তরিত ও রাজনৈতিক অভিযোগে কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই, তাহারা বোধ করি অপার্থিব রকমের কোন কিছু করিয়া থাকিবে।

—

রাজদ্রোহ অপরাধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের একত্ব লোপ

ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের অর্থাৎ পীন্যাল কোডের ১২৪-ক ধারা রাজদ্রোহ অর্থাৎ সিডীশুন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। কংগ্রেসের বহু নেতা ও সাধারণ সভ্য এই ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি দণ্ডিত না হইতেন তাহা হইলেও ঐ ধারাটি ও অন্য কোন কোন দমনাত্মক আইন স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে বলিয়া কংগ্রেস দমনাত্মক আইন মাত্রেরই বিরোধী, এবং কংগ্রেসীদের নির্ব্বাচনবিষয়ক ইস্তাহারে (ইলেকশুন ম্যানিফেষ্টোতে) ঐরূপ সব আইন প্রত্যাহারের আশাও দেওয়া হইয়াছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি বোম্বাই অধিবেশনে এই নির্দ্দেশ দেন, যে, যে-সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, সেখানে কেবল হিংসাত্মক উত্তেজনা বা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধজনক লেখা বক্তৃতা বা কাজের বিরুদ্ধে ১২৪-ক ধারা প্রযুক্ত হইবে। ওয়ার্কিং কমীটি এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়ায় সাতটি প্রদেশে ঐ ধারার কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা তথাকার গবর্ণর সহি করিয়া মঞ্জুর করিলে, ঐ প্রদেশে পীন্যাল কোডের ১২৪-ক ধারা, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা, সীমান্ত-অপরাধ-দমন আইন ও জরুরি প্রেস আইন প্রত্যাহৃত হইবে, এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা এ প্রকারে সংশোধিত হইবে, যে, উহা আর রাজনৈতিক আন্দোলন ও কার্য্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে না।

সুতরাং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি যাহা করিয়াছেন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে, যে, যাহা চারিটি প্রদেশে রাজদ্রোহ, সাতটি প্রদেশে তাহা রাজদ্রোহ বিবেচিত হইবে না। দেখাও যাইতেছে, যে, সম্প্রতি বঙ্গে দুইটি দৈনিকের সম্পাদক ও মুদ্রক রাজদ্রোহ অপরাধে ১২৪-ক ধারা অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অতএব, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারি কমীটি যে ভারতবর্ষের একত্ব নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। রাজদ্রোহ সম্বন্ধে আইন বা তাহার প্রয়োগ যে সর্ব্বত্র এক থাকিতেছে না, ইহা অবশ্য তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না !

—

বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দলের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের গুজব

বঙ্গে কংগ্রেস ও অন্য কোন কোন দলের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের যে গুজব রটিয়াছে, তাহার প্রতিবাদও হইয়াছে। মৌলানা আবুল কলাম আজাদ বলিয়াছেন, এরূপ মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সহায়তা করা গান্ধীজীর কলিকাতা আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহা সত্য নহে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও বলিয়াছেন, যে, তিনি ও-রকম কোন প্রস্তাবঘটিত কোন কথাবার্ত্তার বিষয় অবগত নহেন।

কিন্তু গুজবটা রটিয়াছে, যে, বঙ্গের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে—কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী থাকিবেন না, কোন কোন অ-মন্ত্রী তাঁহাদের জায়গায় বাহাল হইবেন, এবং নূতন ব্যক্তিরা কংগ্রেসী হইতেও পারেন। তাহা হইলে শরৎবাবু বা মৌলানা আবুল কলাম আজাদ কি কিছু জানিতেন না ? অথবা হয়ত তাঁহারা

কংগ্রেসী-সরকারী ভাবে অর্থাৎ 'অফিশ্যালি' অবগত নহেন; সুতরাং গুজবটা 'অন্-অথরাইজ্‌ড্' !

আমি গত ফেব্রুয়ারির শেষে ও বর্ত্তমান মার্চ্চের গোড়ায় শান্তিপুরে ছিলাম। সেখানে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গে কংগ্রেসীদের সহযোগে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল ("কোয়ালিশ্যন মিনিষ্ট্রি") গঠনে কোন সাহায্য করিতেছেন কি না। আমি বলিলাম, আমি এ-বিষয়ে কিছু জানি না, রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার এ-বিষয়ে কোন কথা হয় নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে একসঙ্গে ধর্দায় মহাত্মা গান্ধীর নিকট গিয়াছিলেন, বোধ হয় গুজবটি রটিবার তাহা একটি কারণ; রবীন্দ্রনাথের নাম উহার সহিত জড়িত হইবারও উহা একটি কারণ হইতে পারে।

কংগ্রেসের কোন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া যদি বঙ্গের কংগ্রেসী দল অন্য কোন বা কোন-কোন দলের সহিত সহযোগিতা করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা বাংলা দেশের পক্ষে ভাল হয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই কন্‌ভোকেশ্যনে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক এবং অপর পাঁচ জন মুসলমান মন্ত্রীর মধ্যে এক জনও উপস্থিত হন নাই। ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 'স্পীকর' মৌলবী আজিজুল হকও অনুপস্থিত ছিলেন। হিন্দু মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। অপর দুই জন হিন্দু মন্ত্রীর অনুপস্থিতি আকস্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মুসলমান মন্ত্রী ছয় জন ও মুসলমান স্পীকর, সকলেই যে অনুপস্থিত হইলেন, ইহা কি আকস্মিক? আকস্মিক হওয়াটা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আকস্মিক না হইলে তাঁহারা কি কারণে এই প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলেন? মানুষ কাহারও উপর বিরক্ত হইলে তাহার ক্ষতি করিতে, তাহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে। সাত জন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী কনভোকেশ্যনে উপস্থিত না-হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না। তাহাকে জব্দ করিবার ও তাহার ক্ষতি করিবার অস্ত্র মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে আছে। কিন্তু সেই অস্ত্র প্রয়োগে বোধ হয় তাঁহারা হিন্দু মন্ত্রীদের সম্মতি পান নাই। হয়ত তাহাই এই নিষ্ফল বিরক্তিপ্রকাশের কারণ।

মুসলমান মন্ত্রীরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অসন্তুষ্ট, তাহা নানা কারণে অনুমিত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ বিলের খসড়া লইয়া তর্কবিতর্ক এবং "শ্রী" ও "পদ্ম" সম্বন্ধে আলোচনা এই রূপ অনুমানের কারণ।

—

এণ্ডরুজ সাহেবের বক্তৃতা

এবার কনভোকেশ্যনে এণ্ডরুজ সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা একটু নূতন ধরণের। সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে রাজনীতির আলোচনা পরিহার করিবার ইচ্ছা এই প্রকার বক্তৃতার অন্যতম কারণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

তিনি প্রধানতঃ শিক্ষাদাতা ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে এবং বিদ্যার্থীদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিষয়টি মনোজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ সখ্য কেবল যে জ্ঞানার্জ্জনের বন্ধুর পথে আনন্দ দেয় তাহা নহে, নানা প্রকারে জ্ঞানান্বেষণের ও জ্ঞানার্জ্জনের সহায়কও ইহা বটে। এণ্ডরুজ সাহেব তাহা বলিয়াছেনও।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলি ছোট ছোট হইলে, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সাশ্রম হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপক ও ছাত্রেরা উহার অঙ্গীভূত গৃহে বাস করিলে, অধ্যাপক ও ছাত্রদের এবং ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে সখ্যের সম্ভাবনা অধিক হয়। কিন্তু সাশ্রম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কিছু অধিক ব্যয়সাধ্য, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের উপযোগী নহে। তাহা হইলেও এই প্রকার বিদ্যাপীঠ বড় শহরের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে। যেমন শান্তিনিকেতনের

বিঠলভাই পটেল
হরিপুরায় কংগ্রেস-সভাপতি কর্তৃক উন্মোচিত মূর্ত্তি
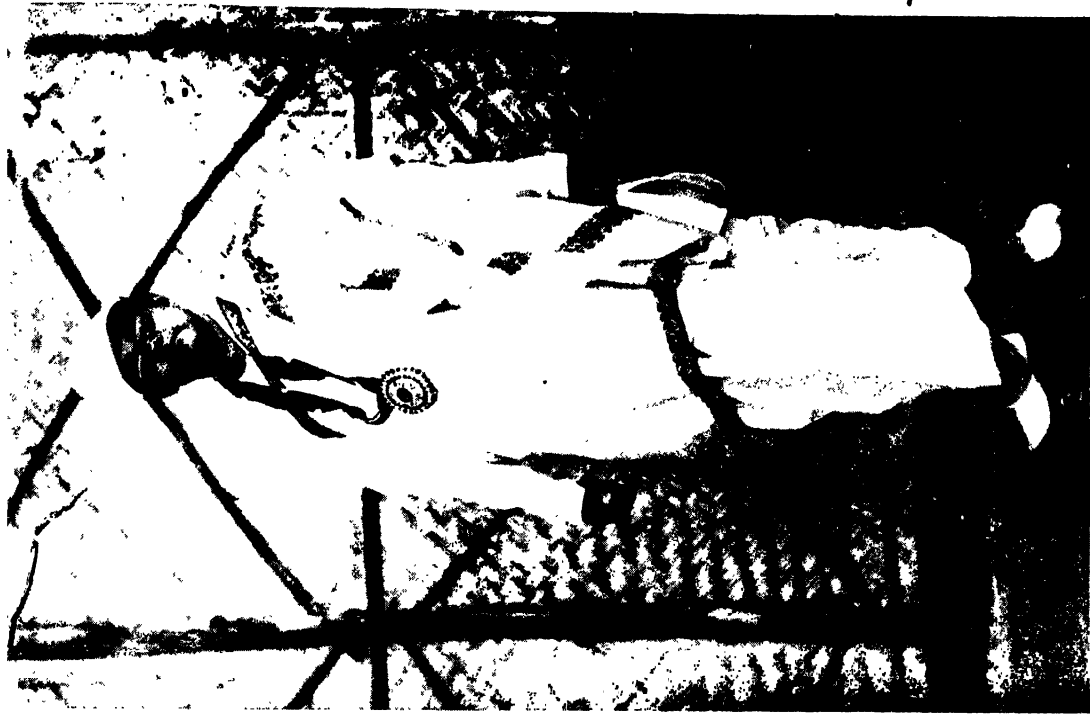
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
হরিপুরা কংগ্রেসে, সভাপতির অভিজ্ঞান-পদক পরিহিত

হরিপুরায় কংগ্রেস-প্রদর্শনীর প্রধান তোরণ

হরিপুরা কংগ্রেস অন্তে বোম্বাই গমন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনা

বিশ্বভারতী। এখানে ছাত্রছাত্রীদের ব্যয় কলিকাতা অপেক্ষা কম। কিন্তু ইহা কম রাখিতে গিয়া প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে অর্থ-চিন্তায় বিব্রত থাকিতে হয় এবং অধ্যাপকবর্গকে বেতন কম লইতে হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন ধরণের টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে সমাজ যে-ভাবে সাহায্য করিতেন এবং এখনও কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে করেন, তাহা প্রচলিত থাকিলে অধ্যাপক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও ছোট ছোট ক্লাস সম্ভবপর হয়।

কলিকাতার মত বড় শহরে বড় বড় কলেজের বড় বড় ক্লাসে পড়িয়াও অনেক ছাত্র মিত্রতার বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে মিত্রতাও এ-অবস্থায় একান্ত বিরল নহে। আমি নিজের পঠদ্দশার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলিতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষে গুরুজন ও বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে যে-একটু 'দূরত্ব' থাকে, যাহা হয়ত পাশ্চাত্য দেশে থাকে না। সেই জন্য সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের অর্থ যাহা, ভারতবর্ষে ঠিক্ তাহা নহে।

—

কন্‌ভোকেশ্যনে চ্যান্সেলরের বক্তৃতা

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বঙ্গের গবর্ণর মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন নাই, মৌখিক কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি এণ্ডরুজ সাহেবের বন্ধুত্ব-বিষয়ক বক্তৃতাটি অনুপ্রাণনাপূর্ণ বলিয়া তাহার প্রশংসা করিয়া, তৎসম্পর্কে বলেন, "পৃথিবীর চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দিকে তাকাইলে, দেশে দেশে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ লক্ষিত হয়; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটু অধিক বন্ধুত্ব আবির্ভূত হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়।" ইহা সত্য কথা। কিন্তু জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব প্রবল জাতিদের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তাহারা অন্য কতকগুলি জাতির কাঁধে চড়িয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলে বন্ধুত্ব হইতে পারে না। গবর্ণর ইহাও বলেন, যে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা এরূপ অনেক সুবিধা পাইয়াছেন যাহা তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী পান নাই। ইহা যেন তাঁহাদের মনে থাকে। গবর্ণর সাহেব গ্র্যাডুয়েটদিগকে এই অনুরোধ করেন, যে, তাঁহারা যেন সেবাকে জীবনের মূলমন্ত্র মনে করেন। এই অনুরোধ সর্ব্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য।

—

ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতা

ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁহার কন্‌ভোকেশ্যন-বক্তৃতায় ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন, প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সকল রকম শিক্ষার পরস্পর যোগ থাকা এবং সবগুলিরই বিস্তার প্রার্থনীয়; শিক্ষা-সংস্কার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সংস্কারের নামে সংহার বা সঙ্কোচ কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না। শিক্ষার বিনাশে বা সঙ্কোচে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

—

যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ এবং মন্ত্রিত্ব পুনর্গ্রহণ

কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষবাবুর অভিভাষণে কংগ্রেসী-মন্ত্রীদের কাজের আলোচনা যেখানে আছে, সেই জায়গাটি পড়িলেই বুঝা যায়, যে, যে-যে প্রদেশে কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা রাজনৈতিক সকল বন্দীকে খালাস দিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইত, সমাজতন্ত্রবাদী কংগ্রেসওয়ালারা তাঁহাদিগকে তীব্র আক্রমণ করিতেন—যদি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীরা ইতিমধ্যে ইস্তফা না-দিতেন। ইস্তফা দেওয়াতে তাঁহাদের উপর সমালোচনার ঝড় বহে নাই।

তাঁহারা ৬।৭ মাস ধরিয়া ২।১ জন করিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিতেছিলেন, বাকী সকলকে ছাড়িয়া দিবার জন্য গবর্ণরদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চালাইতেছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে সবাইকে ছাড়িয়া না-দিলে কংগ্রেসের তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে, এই ভয়েই তাঁহারা জেদ ধরেন, যে, সকলকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিতে হইবে। গবর্ণররা তাহাতে রাজী না-হওয়ায় তাঁহারা ইস্তফা দেন। কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া যাইবার পর, কিন্তু সেই আগেকারই মত ক্রমে ক্রমে ২।৪ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—একসঙ্গে

সবাইকে নয়! মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব পুনর্গ্রহণ তাহা হইলে এইরূপ রফা অনুসারে হইল, যে, মন্ত্রীরাই প্রত্যেক কয়েদীর বিষয় আলাদা আলাদা বিবেচনা করিবেন, গবর্ণর করিবেন না, এবং মন্ত্রীরা যাহাকে যাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিবেন গবর্ণর তাহাদের মুক্তিতে সায় দিবেন; এবং মন্ত্রীরা সবাইকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিবার জেদ না করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে মুক্তি দিবেন।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বড়লাট

ঠিক্ কি কি ভিতরের কারণে বড়লাট বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণরদিগকে ঐ দুই প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের যুগপৎ মুক্তিতে রাজী হইতে দেন নাই, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এই একটা কথা তাঁহার ষ্টেটমেণ্ট হইতে জানা যায়, যে, ঐ দুই প্রদেশের বন্দীদিগকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে বঙ্গে ও পঞ্জাবে সব বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিবার দাবী হওয়ায় বঙ্গের ও পঞ্জাবের গবর্মেণ্টের —বিশেষতঃ বঙ্গের গবর্মেণ্টের, বিশেষ অসুবিধা হইবে। অথচ, এই উভয় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশ্য ভাবে বলা হইয়াছে, যে, তাঁহাদের সহিত বড়লাট এ-বিষয়ে কোন পরামর্শ করেন নাই, এবং তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ-বিষয়ে বড়লাটকে কিছু বলেন নাই। পঞ্জাব গবর্মেণ্ট অধিকন্তু বলিয়াছেন, যে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের কোনই অসুবিধা হইবে না।

তাহা হইলে বড়লাট যাহা করিয়াছিলেন, কেন তাহা করিয়াছিলেন?

—

হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন

হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে লোক-সমাগম খুব হইয়াছিল। কংগ্রেসের কাজও সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সকল বন্দোবস্তেরই উচ্চ প্রশংসা প্রথম প্রথম কাগজে বাহির হইয়াছিল। এখন শুনা যাইতেছে, নেতারা ছিলেন ভাল কিন্তু সাধারণ প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহা হইবারই কথা।

অতঃপর কোথাও কংগ্রেসের অধিবেশন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। হরিপুরায় সব বন্দোবস্ত করিতে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। গুজরাট ধনী প্রদেশ বলিয়া এত টাকা আগাম বাহির করিবার লোক ছিল। সর্ব্বত্র সেরূপ লোক নাই।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম্য লোকদের সহিত সংস্পর্শ আগেকার চেয়ে বাড়িতেছে বটে। তবে কংগ্রেসের অধিবেশনের আর্থিক লাভটা অধিক পরিমাণে নাগরিক লোকদেরই এখনও হইতেছে বোধ হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতায় প্রকাশিত সমুদয় মতে যাঁহারা সায় দিতে পারিবেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, অভিভাষণটিতে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় আছে। ইহাতে বঙ্গের সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক, তিনি তাঁহার কার্য্যকাল এক বৎসরে কি করিতে পারেন।

—

ছাত্রদের বৃহৎ সভাসমিতি

কিছু দিন হইতে ছাত্রেরা সমগ্রপ্রদেশব্যাপী ও সমগ্র-ভারতব্যাপী সমিতি গঠন করিতেছেন ও সেগুলির অধি-বেশনও হইতেছে। এই সব সমিতির ঠিক উদ্দেশ্য আমরা অবগত নহি। সুতরাং সে-বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না।

ছাত্রেরা যদি তাঁহাদের শিক্ষা ব্যায়াম খেলা প্রভৃতির সুবিধা আরও বাড়াইবার জন্য সমিতি গঠন করেন ও আন্দোলন করেন, তাহা বাঞ্ছনীয়; তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

কারখানার শ্রমিকদের আর্থিক অভাব অভিযোগ ও স্বার্থ আছে, কারখানার মালিকদের সহিত তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ আছে; এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহের সহিত রাজনীতির যোগ আছে। সেই জন্য কারখানার শ্রমিকদের আলাদা সমিতির প্রয়োজন আছে। তাহা হইলেও এই আলাদা সমিতিগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের সহিত আপনাদিগকে যুক্ত করিলে ভাল হয়।

কৃষক ও ক্ষেতের শ্রমিকদের আর্থিক অভাব অভিযোগ ও স্বার্থ আছে, তাহার সহিত জমিদার জোতদার প্রভৃতির স্বার্থের সংঘর্ষ আছে; এবং এই সকল বিষয়ের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে। সুতরাং কৃষক প্রভৃতিরও আলাদা সমিতির প্রয়োজন আছে। তথাপি কৃষকসমিতি-গুলি আপনাদের কাজের বিশেষত্বগুলি রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইলে ভাল হয়।

ছাত্রেরা কারখানায় বা কৃষিক্ষেত্রে বা দোকানে পরিশ্রম করিয়া রোজগার করেন না। তাঁহাদের অভিভাবকেরা নানা শ্রেণীর লোক—জমিদার, কারখানার মালিক, আইন-জীবী, ডাক্তার, মহাজন, চাষী গৃহস্থ, সরকারী চাকর্যে, সরকারী পেন্স্যনভোগী, দোকানদার, জোতদার, সওদাগরী আপিসের চাকর্যে, এঞ্জিনীয়ার, ঠিকাদার, শিক্ষক ইত্যাদি। অল্পসংখ্যক ছাত্র গৃহশিক্ষকতা দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহারা একটা আলাদা শ্রেণী নহেন।

ছাত্রদের অভিভাবকদের মধ্যে যিনি যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোকদের অর্থনৈতিক সমস্যা যাহা, তাঁহার অর্থনৈতিক সমস্যাও তাহাই, এবং সেই সমস্যার রাজনৈতিক দিক্ থাকিতে পারে। যে-সকল ছাত্রের অভিভাবক দরিদ্র, তাহাদের আর্থিক কষ্ট আছে। দরিদ্র অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার রাজনৈতিক দিক্ আছে। কিন্তু ছাত্র হিসাবে ছাত্রদের বিশেষ কোন অর্থ-নৈতিক সমস্যা নাই, এবং তাহার রাজনৈতিক দিক্‌ও নাই—যদিও তাহাদের অভিভাবকদের আছে বটে। সুতরাং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক (Politico-economic) প্রয়োজনে ছাত্রদের স্বতন্ত্র বৃহৎ দেশব্যাপী সমিতি আবশ্যক, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

ছাত্রেরা যে-যে পরিবারের লোক, সেই সেই পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এবং কোন কোন স্থলে মহিলাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মত আছে এবং তদনুসারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন। সরকারী চাকর্যেরা ও পেন্স্যনভোগীরা তাহা করেন না। অন্যদের মধ্যে কেহ কংগ্রেসের, কেহ উদারনৈতিক সংঘের, কেহ প্রজাদলের, কেহ মোস্লেম লীগের, কেহ সমাজতান্ত্রিক দলের, কেহ সাম্যবাদী দলের, কেহ কৃষক দলের, কেহ বা শ্রমিক দলের সভ্য। কিন্তু অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা কোন রাজনৈতিক দলেই যোগ দেন না।

ছাত্রেরা রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, রাজ-নীতির আলোচনা করেন, সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল রাজ-নৈতিক সভায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞানী রাজনৈতিক বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন, ইহা আমরা চাই। রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স ও কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহারা স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ করিলেও তাহাদের উপকার হয়। কিন্তু ছাত্র-রাজনীতি (student-politics) নামক বিশেষ কোন রকম রাজনীতি আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাবালক, তাঁহারা নিজ নিজ মত অনুসারে কংগ্রেস, সমাজতান্ত্রিক দল, উদারনৈতিক সংঘ প্রভৃতির সভ্য হইয়া সেইগুলিতে যোগ দিতে পারেন। যাঁহারা নাবালক, তাঁহারা ত সমাজতান্ত্রিক-গবর্মেণ্ট-শাসিত দেশেও ভোটাধিকারী নহেন। আমাদের দেশে তাঁহারাও সাবালক ছাত্রদের সহিত তাঁহাদের বিতর্ক-সভায় (debating club-এ) রাজনীতির আলোচনা করিতে পারেন, সুব্যবস্থিত রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা শুনিতে পারেন, এবং নিতান্ত শিশু বা বালক না হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ স্বেচ্ছাসেবকও হইতে পারেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত ছাত্রদের পৃথক্ সমিতির কোন প্রয়োজন নাই, সার্থকতাও নাই। ইহাতে কেবল সমিতিবাহুল্য ও শক্তিক্ষয় হয়, এবং ছাত্রদের ছাত্রজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য যাহা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মে।

অন্য কোন কোন দুর্গত দেশের ছাত্রেরা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক ছাত্র তাহা করেন, যেমন কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের কতকগুলি ছাত্র; কিন্তু অনেকেই করেন না।

রাজনীতি মন্দ জিনিষ নয়। ইহা খুব আবশ্যক। কিন্তু ইহার উন্মাদনা আছে। সেই উন্মাদনা সত্ত্বেও শান্ত ও ধীর থাকা কঠিন। অথচ শান্ত ও ধীর না-থাকিলে

জ্ঞান অর্জ্জন ও চরিত্র গঠন দুঃসাধ্য—অসাধ্য বলিলেও চলে। মানুষের যেটি বাড়িবার বয়স, দেহমনে বাড়িবার আত্মায় বিকশিত হইবার বয়স, সেই বয়সে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের (active political life-এর) ঝড়-বৃষ্টি শীতাতপের মধ্যে পড়া অবাঞ্ছনীয়। এমন অনেক ছাত্রের কথা অনেকে জানেন, যাঁহারা রাজনীতির উন্মাদনায় সর্ব্বদা মাতিয়া থাকেন, বড় বড় রাজনৈতিক "রণরব" উচ্চারণ করেন, কিন্তু ভাল ও দরকারী বহি—রাজনৈতিক বহিও, পড়েন না। জীবনের সকল বিভাগেরই জন্য প্রস্তুতির আবশ্যক। রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে হইলেও তাহার প্রস্তুতি আবশ্যক। তাহার জন্যও শান্ত-সমাহিত ভাব এবং অধ্যয়নাদি চাই।

অকালে নেতৃত্বের নেশার প্রলোভনে পড়িলে ছাত্রদের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনাই বেশী। "সবুরে মেওয়া ফলে"। ধৈর্য্যধারণ করিয়া অপেক্ষা করিলে এবং জ্ঞান-অর্জ্জনাদি দ্বারা প্রস্তুত হইলে ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় নেতা হইতে পারিবেন।

ছাত্রেরা সার্ব্বজনিক রাজনৈতিক বিষয়ে এত মন দেন, তাহা আমরা মন্দ মনে করি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে নেতা হইতে চান, তাহাও ভাল। তাঁহারা যাহাতে ভবিষ্যতে সুযোগ্য নেতা হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এত কথা লিখিতেছি।

সকল দলের মানুষের, সকল মানুষের জীবনের ও চরিত্রের ভাল দিকটা দেখিতে শিখা অত্যন্ত আবশ্যক। অল্প বয়স হইতে রাজনৈতিক দলাদলিতে মাতিলে, (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ) দলবিশেষের ব্যক্তিবিশেষের জন্য ভোট সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া অপর দলের নির্ব্বাচনপ্রার্থীর দোষ উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করিলে মানসিক নিরপেক্ষতা শিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মে, স্থিরবুদ্ধিতা জন্মে না।

তর্কস্থলে অনেকে বলেন, অন্য দেশের ছাত্রেরা ত সঙ্কট সময়ে যুদ্ধেও যায়। সত্য। যুদ্ধ আসিলে—তাহা যে-রকম যুদ্ধই হউক—আমাদের ছাত্রদিগকেও কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কোন রকম যুদ্ধই নাই, তখন নামে-মাত্র ছাত্রত্ব রাখিয়া কার্য্যতঃ ছাত্রত্ব ত্যাগে উৎসাহ দেওয়া অনুচিত।

—

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রবাদ

অন্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজন আছে, সমাজতন্ত্রবাদের জ্ঞান বিস্তার আবশ্যক, এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণ বুঝিতে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল নয়, কৃষকদেরও অবস্থা ভাল নয়। তাহার উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোক নামে মধ্যবিত্ত হইলেও বাস্তবিক বিত্তহীন। তাহাদের বেকার অবস্থা শোচনীয়। তাহাদেরও দুর্দ্দশা মোচন আবশ্যক। অনেক জমিদারও নামে মাত্র জমিদার।

আমাদের দেশে খুব ধনী কতকগুলি লোক আছে, সাধারণ রকমের ধনীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক, সচ্ছল অবস্থার লোক তাহা অপেক্ষাও সংখ্যায় বেশী; কিন্তু অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। এ-অবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রচার হওয়া বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং তাহার প্রচার না-হইলে মানুষের ঘুম ভাঙিত না।

—

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ আন্দোলনের প্রণালী

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র যে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন হইতেছে, এবং সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যে-আন্দোলন করিতেছেন, তাহা মূলতঃ একজাতীয়। সব প্রচেষ্টাগুলিরই উদ্দেশ্য ধন উৎপাদন ও বণ্টনের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ন্যায়সঙ্গত পরিবর্ত্তন ও তাহার দ্বারা স্থায়ী ভাবে দরিদ্রদের দারিদ্র্যমোচন। এই জন্য সবগুলির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ প্রধানতঃ রাশিয়াতেই রাষ্ট্রের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং রাষ্ট্র তদনুসারে গঠিত হইয়াছে। ইহার বিরোধী মত অনুসারে ইটালী ও জার্ম্মেনীর রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, স্পেনেও চেষ্টা

হইতেছে। ইটালী ও জার্মেনীর সাম্যবাদবিরোধী ফাসিষ্টেরা রাশিয়াকে হীনবল করিয়া সেখানেও ফাসিষ্ট মতকে জয়ী করিতে চেষ্টা করিতেছে। অষ্ট্রিয়াতে যে-চেষ্টা হইতেছে, তাহাও উল্লেখ্য। ইউরোপের সব দেশের কথা এখানে বলা অনাবশ্যক। মোটের উপর ইহাই মনে রাখিতে হইবে, যে, যেমন এক দিকে সাম্যবাদ আছে, তেমনই অন্য দিকে ফাসিষ্ট মত আছে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহা এখন আমাদের বিচার্য্য নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, ইউরোপে যেমন উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম ও রক্তপাত হইয়াছে ও হইতেছে, ভারতবর্ষে তাহা যে হইতে পারে না, এমন নয়। ইতিমধ্যেই ত বিহারে, এবং যুক্ত-প্রদেশের কানপুরে বলপ্রয়োগের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট-ফাসিষ্ট বিরোধ যাহাতে না-হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহার প্রধান কারণ, আমরা রক্তপাত চাই না, আপোষে আলোচনা ও পরামর্শ দ্বারা মীমাংসা চাই। তা ছাড়া, অহিংসার কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্য কারণও আছে। অনেকগুলা যুদ্ধ একসঙ্গে চালান কঠিন। আমাদের প্রধান ও একমাত্র সংগ্রাম হওয়া উচিত কেবল স্বরাজলাভের জন্য। স্বরাজ লব্ধ হইবার পর তখন, রাষ্ট্র কি নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা বিচার্য্য। ইতিমধ্যে অবশ্য আইন পরিবর্ত্তন ও অন্য নানা উপায়ে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি যথাসাধ্য করিতে হইবে।

বলপ্রয়োগ ও রক্তারক্তির মূলে দ্বেষ। শ্রেণীগত দ্বেষের উদ্রেক যাহাতে না-হয়, যে দ্বেষ আছে তাহা যাহাতে না-বাড়ে সকল আন্দোলন এই ভাবে চালান উচিত। তাহা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, সামাজিক অসাম্য এবং ধনের অসমান ও অন্যায্য বণ্টন বর্ত্তমান সময়ের অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও ধনীদের সৃষ্টি নহে।

বর্ত্তমান জমিদারেরা জমিদারী-প্রথার সৃষ্টি করেন নাই; অনেক জমিদার পুরুষানুক্রমে জমিদারও নহেন, হয়ত নিজে তালুক কিনিয়াছেন বা পিতা বা পিতামহ কিনিয়াছেন। অন্যেরা উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী পাইয়াছেন। অতএব, জমিদারী-প্রথা যত খারাপই হউক না কেন, সংগ্রামটা হওয়া উচিত প্রথাটার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগতভাবে জমিদার মানুষগুলার বিরুদ্ধে নহে। তাঁহাদের মধ্যে খারাপ লোক আছে, কৃষকদের মধ্যেও আছে। তাহাদের সপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু শ্রেণীগতভাবে জমিদার বা কৃষক কাহারও বিরুদ্ধে অভিযান অবাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহা অন্যায়, তাহাতে দ্বেষ বাড়ে, ও তাহার চরম ফল রক্তারক্তি। মনে রাখিতে হইবে, জমিদারদের ও কৃষক-দের মধ্যে ভাল লোকেরা অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

কারখানার মালিক ও অন্য ধনী, যাঁহারা আছেন, এদেশে ও বিদেশে অসমান ও অন্যায় ধন বণ্টনের রীতি তাঁহারা প্রবর্ত্তন করেন নাই। শ্রমিকদিগকে কয়েক আনা করিয়া দৈনিক মজুরী দিয়া নিজেরা লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইবার রীতি বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই রীতিটা খারাপ, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু রীতিটা যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এখনও আছে, তাহার জন্য বর্ত্তমান ধনিকেরা দায়ী নহে, এবং তজ্জন্য তাহাদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ ন্যায়সঙ্গত নহে। শ্রেণীগতভাবেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, শত্রুতা উৎপাদন পরিহার্য্য। অনেক দেশে, ভারতবর্ষেও, অনেক ধনিক শ্রমিকদের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং অন্য নানা রকম সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাহা করিয়া থাকিলেও ধন উৎপাদন ও ধন বণ্টন সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যবস্থারই আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

এ-বিষয়ে দু-একটা সোজা গোড়ার কথা বলা যাইতে পারে। তাহা পাণ্ডিত্যসাপেক্ষ নহে।

ধন উৎপাদন ও বণ্টন

ইহা অনেক সময় ধরিয়া লওয়া হয়, যে, বর্ত্তমানে যাহারা ধনী তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, বর্ত্তমানে যাহারা দরিদ্র তাহাদিগকে বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বঞ্চিত করিয়া ধনী হইয়াছে। ইহা কোন ক্ষেত্রেই সত্য নহে বা হইতে পারে না বলিতেছি না; অনেক ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে। তাহার বিচার করিতেছি না

এখানে আমাদের বক্তব্য এই, যে, আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি লোককে যদি করাত দিয়া গাছের গুঁড়ি চিরিতে, ধান কাটিতে, ইঁট বা পাথর ভাঙিতে, মাটি কোপাইতে, কালিকলম কাগজ লইয়া কিছু লেখা নকল করিতে দেওয়া হয়, (কোনটিই প্রতিভার কাজ নয়), তাহা হইলে দেখা যায়, একই সময়ের মধ্যে কেহ বেশী কাজ করিয়াছে কেহ কম করিয়াছে, কেহ ভাল করিয়া কাজ করিয়াছে, কেহ তাহা করিতে পারে নাই। যাহারা বেশী ও ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদের পারিশ্রমিক বেশী হওয়া ন্যায়সঙ্গত। তাহারা যদি সদাশয়তা পূর্ব্বক বলে, আমরা অপেক্ষাকৃত অক্ষমদের কম শক্তিমানদের চেয়ে বেশী লইব না, আমাদের ভরণপোষণের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আমাদিগকে দিয়া বাকী অপেক্ষাকৃত অক্ষমদের মধ্যে বাঁটিয়া দাও, তাহা হইলে তাহা এই উৎকৃষ্ট কর্ম্মীদের মহত্ব। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত অক্ষম বা কম শক্তিমান্ তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিমানদের ন্যায্য উপার্জ্জনে ভাগ বসাইবার দাবী করিলে তাহা কি ন্যায়সঙ্গত হয়? মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির তারতম্য অনুসারে ধন-উৎপাদন-ক্ষমতার তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক, উপার্জ্জনের তারতম্য হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমানে এক জন মানুষ যে-পারিশ্রমিক বা বেতন পায়, আর এক জনের তাহার হাজার দু-হাজার গুণ পাওয়া সাধারণতঃ স্বাভাবিক নহে—অবশ্য প্রতিভা, বিশেষ-জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতার কথা স্বতন্ত্র।

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ধন-উৎপাদন ক্ষমতার যেমন তারতম্য আছে, মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়িতা প্রভৃতিরও তেমনি তারতম্য আছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, কতক লোকের ধনশালিতা ও অন্য কতক লোকের দারিদ্র্যের কারণ যে কেবলমাত্র প্রথমোক্ত লোকদের শোষকতা ও প্রবঞ্চকতা এবং শেষোক্ত লোকদের শোষিতত্ব ও বঞ্চিতত্ব, তাহা নহে; ধন-উৎপাদন ও ধন রক্ষা করিবার ক্ষমতার তারতম্যও একটা কারণ।

অতএব, সাম্যবাদের প্রচারকেরা যদি বিত্তহীন শ্রোতাদের মনে জানিয়া শুনিয়া বা অনভিপ্রেত ভাবেও এই ধারণা জন্মান, যে, অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সবাই শোষণ ও বঞ্চনা দ্বারাই সচ্ছলতা পাইয়াছেন, এবং বিত্তহীনেরা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সবাই শোষিত ও প্রবঞ্চিত বলিয়াই দরিদ্র, তাহা হইলে সে-ধারণা সত্য হইবে না। যদি এরূপ ধারণা জন্মান, যে, পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যবস্থা দ্বারা সব মানুষের আয় সমান করিতে ও রাখিতে পারা যায় ও যাইবে, তাহা হইলে সে ধারণাও ভ্রান্ত। যদি কোন রাষ্ট্র এক দিন আইনের জোরে ও গায়ের জোরে সকলের ধন ও আয় সমান করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা পরে আবার পূর্ব্ববর্ণিত কারণে অসমান হইয়া যাইবে। রাশিয়ার রাষ্ট্র অনেক চেষ্টা এবং উপদ্রব করিয়াও সকলের আয় ও ধন সমান করিতে ও রাখিতে পারে নাই।

—

ব্যক্তিগত সম্পত্তি

সাম্যবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী। কিন্তু সাম্যবাদকেও কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিতে হয় ও হইবে। প্রত্যেক মানুষ যে কাপড়চোপড় পরে, রাশিয়াতে তাহা তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি না? যে-জুতা পরে, তাহা তাহার সম্পত্তি কি না? যে-কলম দিয়া লেখে, তাহা তাহার সম্পত্তি কি না? না, রাষ্ট্র বা অন্য কেহ তাহা লইয়া ব্যবহার করিতে পারে? বোধ হয়, পারে না। সুতরাং কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিতেই হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি জিনিষটাই অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে চলিবে না। খুব কম করিয়াও কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিতে হইবে, নতুবা মানুষের ভব্যতা রক্ষা করা ও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। বিচার্য্য ও বিবেচ্য, ন্যূনতম ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি? ন্যায্য, অধিকতম ব্যক্তিগত সম্পত্তিই বা কি

"লাঙ্গল যার, জমী তার"

শুনিতেছি, "লাঙ্গল যার, জমী তার", এইরূপ একটি

কথা প্রচলিত হইতেছে। ইহা, "জিস্‌কা লাঠী উস্‌কা ভঁয়েস" ("লাঠি যার মহিষ তার") হিন্দী প্রবাদের ভাষান্তর হইয়া না দাঁড়ায়!

যিনি লাঙ্গল দিয়া জমী চষেন, তাঁহারই মত, যদিও অন্য রকমের, পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার করিয়া ও জমাইয়া কেহ জমী কিনিয়াছেন বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ তাহা কিনিয়াছেন, বা কোন প্রকার কাজের বিনিময়ে রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমী পাইয়াছেন। যিনি লাঙ্গল দিয়া জমী চষেন, তাঁহার পরিশ্রমের ন্যায্য পারিশ্রমিক তাঁহার অবশ্যই পাওয়া উচিত। কিন্তু জমীটা তাঁহার হইতে পারে না। যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জমী যে বা যাহার পূর্ব্বপুরুষ কিনিয়াছে, উহা তাহার। যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার না-করা যায়, তাহা হইলে জমী রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র উহার চাষের ব্যবস্থা করাইয়া লাঙ্গল-চালককে বা ট্র্যাক্টর-চালককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দিবে।

কোন রাষ্ট্র যদি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব লোপ করে, তাহা হইলে লোপের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহারা মালিক ছিল, তাহাদিগকে সমতুল্য (compensation) কিছু দিতে হইবে। নতুবা ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিলোপ ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

"লাঙ্গল যার জমী তার", এইরূপ বাক্যের ঠিক্ সমতুল্য না হইলেও কতকটা সদৃশ অন্য দু-চারটা কথা নীচে লিখিত হইতেছে। তাহা হাস্যকর হইলেও নিষ্ফল হইবে না; কারণ, লোকে হাসিতে ত পাইল?

"করাত যার তক্তা তার"; "ছুঁচসূতা যার (অর্থাৎ যে দরজির) পোষাকটা তার"; "হাতুড়ী যার ভাঙা ইট ও পাথরের গাদা তার"; "কর্ণিক ওলন যার (যে রাজমিস্ত্রীর) বাড়ীটা তার"; "যে মজুর কোন গাভীর দুগ্ধ দোহন করে, গাভীটা তাহার"; ইত্যাদি।

ঈর্ষাদ্বেষবিহীন আন্দোলন আবশ্যক

আমাকে একবার হাবড়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক শ্রমিক সভার সভাপতিত্ব করিতে হয়। একটি গান সেই সভার প্রারম্ভে গীত হয়। তাহার কথাগুলি ঠিক্ মনে নাই। শ্রমিকরা বলিতেছেন, ধনীদের ঘরবাড়ী, অট্টালিকা প্রাসাদ হাতুড়ী দিয়া "ঠক ঠক ঠক ভাঙব মোরা", এইরূপ উল্লাসের গান। ঈর্ষাদ্বেষপ্রসূত, ধ্বংসে প্রবর্ত্তক এরূপ কোন গান অবাঞ্ছনীয়। রাশিয়াতে যে এত রক্তারক্তি করিয়া বিপ্লব হইয়াছে এবং যে হিংস্রতা এখনও চলিতেছে, তাহা নিন্দনীয়। কিন্তু রাশিয়ার বিপ্লবীরাও সেখানকার প্রাসাদগুলা ভাঙে নাই; কোনটা ম্যুজিয়ম, কোনটা লাইব্রেরি, কোনটা বা শ্রমিকদের হোটেল, বিশ্রামভবন প্রভৃতিতে পরিণত করিয়াছে।

ভারতের বহু নেতা ও উপনেতা কার্ল মার্ক্সের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া যে-পথে চলিতেছেন, সেই পথ ভিন্ন লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার অন্য পথ কি নাই? ভারতীয় প্রতিভা কি অন্য কোন পথ আবিষ্কার করে নাই বা করিতে পারে না? যাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে 'স্বদেশী' ভালবাসেন, তাঁহারা এই বিষয়েও স্বদেশী শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করিয়া বাহির করুন।

ধনীরা ও মধ্যবিত্তেরা ধনের অপব্যবহার করায় এবং দরিদ্রদিগকে অবজ্ঞা ও উৎপীড়ন করায় তাহাদের মনে স্বভাবতঃ ঈর্ষাদ্বেষের আবির্ভাব হয়। সেই জন্য ধনী ও মধ্যবিত্তদের চিন্তাধারার, হৃদয়ের ও ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

—

ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জাতিগত ও রাষ্ট্রগত সম্পত্তি

সকল বা বহু সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানেন না, কিন্তু তাঁহারা জাতিগত ও রাষ্ট্রগত সম্পত্তি মানেন। অর্থাৎ কোন ইংরেজের, কোন জার্ম্যানের, কোন ফরাসীর, কোন জাপানীর, কোন চৈনিকের,.........তাহার তথাকথিত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার নাই, কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রের, ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রের, জাপানী রাষ্ট্রের......জাতিগত ও রাষ্ট্রগত সম্পত্তি আছে। ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, জাপানের,......অধিবাসী এক-একটি মানুষের অধিকার নাই, কিন্তু তথাকার মনুষ্যসমষ্টির

অধিকার আছে। তাও আবার সমগ্র মানবজাতির নহে, এক-একটা দেশের, এক-একটা জাতির, এক-একটা রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা সম্পত্তি আছে।

আফগানিস্থানের ঠিক্ পাশেই ইরান। যেখানে আফগানিস্থান শেষ হইল, আফগানমনুষ্যসমষ্টির সমষ্টি-গত সম্পত্তি সেই পর্য্যন্ত, তাহার এক চুল পর পর্য্যন্ত নহে। আবার ইরানীমনুষ্যসমষ্টির সমষ্টিগত সম্পত্তিও আফগানিস্থানের এক চুল জমী পর্য্যন্ত নহে। এই প্রকার যে সমষ্টিগত সম্পত্তির সীমারেখা টানা, তাহার যদি ন্যায্য ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায্য ভিত্তি নাই কেন?

কোন জাতি এখন যে রাষ্ট্রে থাকে, তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর সেখানে ছিল না। (যেমন বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির পূর্ব্বপুরুষ ব্রিটন, এঙ্গ্‌ল, স্যাক্সন, ডেন, নর্ম্যান প্রভৃতিরা অন্যান্য দেশে থাকিত।) সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে কোন রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অধিবাসীরা সেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি দাবী করিতে পারে কি? ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কেহ উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্ব দাবী করিলে যদি তাহা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রগত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী টিকিতে পারে কি?

ধনিক ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিত্তের প্রভেদ দেখিয়া সাম্যবাদী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়, সম্পত্তি হওয়া উচিত জাতির ও রাষ্ট্রের, এবং তাহা জাতির ও রাষ্ট্রের সকল সভ্য সমান ভাবে ভোগ করিবে।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, কোন কোন জাতি ও রাষ্ট্র খুব ধনী, আবার কোন কোন জাতি ও রাষ্ট্র খুব দরিদ্র। এক-একটা দেশের মানুষদের ধনের অসাম্য দূর করিবার জন্য যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করিয়া সাম্যবাদ এক-একটা দেশের সব ধনকে রাষ্ট্রীয় বিত্ত ঘোষণা করিয়া তথাকার সব মানুষের স্বত্বসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, সেইরূপ পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পত্তির অসাম্য দেখিয়া সকল রাষ্ট্রের সম্পত্তিকে সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি ঘোষণা করিয়া সকল রাষ্ট্রের ও সব মানুষের স্বত্বসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা কি সাম্যবাদ ও সাম্যবাদীর কর্ত্তব্য নহে?

তাঁহারা হয়ত বলিবেন, এক-একটা জাতি ও রাষ্ট্র নিজের সুচেষ্টায় ও অপচেষ্টায় যাহার মালিক হইয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে গেলে যুদ্ধ বাধিবে; তাহারা প্রবল। তাহা হইলে কি যুক্তিটা এই, যে, প্রবলের সাত খুন মাপ? এক-একটা রাষ্ট্রের প্রবলতম মানুষও রাষ্ট্রের তুলনায় দুর্ব্বল; অতএব তাহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে?

জাতিগত ও রাষ্ট্রগত সম্পত্তির সপক্ষে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে, যে, কোন কোন জাতিতে সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোক ও সুনিপুণ শিল্পী অনেক আছে, জাতিদের তাহা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত জাতিদের ধনশালিতা স্বাভাবিক ও ন্যায্য, অন্যদের আপেক্ষিক দরিদ্রতা অস্বাভাবিক বা অন্যায্য নহে। তাহা হইলে, এক-একটা দেশের মানুষদের মধ্যেও ত বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মিষ্ঠতা, শ্রমশীলতা, শিল্পনৈপুণ্য, সঞ্চয়শীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তারতম্য আছে; তাহাদের মধ্যে স্বত্বের অসাম্যও স্বাভাবিক ও ন্যায্য।

—

ডিক্টেটরি ও গুরুগিরি

গুরুগিরি যে-যে দেশের লোকেরা মানেন বা মানিয়া আসিয়াছেন, ডিক্টেটরি মানা তাঁহাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। "গুরুগিরি" এখানে যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

গুরুগিরিতে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা মনে করেন, নিজেদের কোন আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রয়োজন নাই, জীবনযাপনের পথ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কিছু ভাবিবার প্রয়োজন নাই; গুরু যাহা বলিবেন তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেই এবং তাঁহার আজ্ঞা অনুসারে চলিলেই ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে—এমন কি গুরু শিষ্যদের সমুদয় পাপের বোঝা নিজের স্কন্ধে লইতে ও শিষ্যদিগকে উদ্ধার করিতেও পারেন।

ডিক্টেটরের অধীন দেশের লোকদেরও নিজেদের বুদ্ধি খরচ করিবার দরকার নাই, স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন কাজ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুশীয় শিল্পী স্পার্লিং কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র

আনন্দ কুমারস্বামী
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রতিকৃতি

প্রৌঢ়
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রতিকৃতি

অনাবশ্যক। দেশের কল্যাণের জন্য তাহাদের কিছু চিন্তা করা অনাবশ্যক। বুদ্ধি খাটান, ভাবনা চিন্তা—যা কিছু দরকার, সব ডিক্টেটর করিবেন। দেশের লোকেরা কেবল যন্ত্রের মত তাঁহার হুকুম তামিল করিলেই হইল।

গুরুগিরিতে বিশ্বাস ও ডিক্টেটরিতে বিশ্বাস মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আপনাদিগকে চালাইতে অসমর্থ তাঁহারা গুরুগিরি মানেন, যাঁহারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আপনাদিগকে চালাইতে অসমর্থ তাঁহারা ডিক্টেটরের অধীন হন।

ধর্ম্মবিষয়ে অগ্রসর ও জ্ঞানী সাধকের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং গুরুগিরিতে বিশ্বাস এক জিনিষ নহে। তদ্রূপ, সহকর্মী ও অনুচরদিগের সহিত আলোচনার পর রাষ্ট্রীয় নেতারা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তদনুসারে কাজ করা ডিক্টেটরি মানা নহে।

—

কারখানার মালিক ও শ্রমিক

কারখানার মালিকদিগকে শ্রমিকদের দুশমন মনে করা অবশ্যম্ভাবী নহে। কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের অন্ন জোগাইবার জন্য দয়া করিয়া কারখানা খুলেন, ইহা সত্য নহে, তাঁহারা প্রধানতঃ বা কেবলমাত্র নিজেদের লাভের জন্যই কারখানা খুলেন, ইহা সত্য হইতে পারে—যদিও ইহাও সত্য যে আজকাল কোন কোন স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি নিজেদের ও দেশের ধন বৃদ্ধি এবং বেকার লোকদের অন্নসংস্থান উভয় উদ্দেশ্যেই কারখানা খুলেন। কিন্তু যে-সব কারখানা মালিকরা শুধু নিজেদের লাভের জন্যই খুলিয়াছেন, তাহার শ্রমিকেরাও ত সেখানে খাটিয়া উপার্জ্জন করে। সুতরাং সেই সব কারখানার মালিকরাও শ্রমিকদের শত্রু নয়। যে-সব মালিক খাটাইয়া পয়সা দেয় না বা কম পয়সা দেয়, তাহাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত।

আমাদের দেশে শিল্পজাত দ্রব্য যত বিক্রী হয়, তাহা যত বেশী পরিমাণে কুটিরে বা কারখানায় প্রস্তুত হইবে, সেই পরিমাণে শ্রমিকদেরও আয় বাড়িতে থাকিবে। কুটীরশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা এখন না করিয়া কারখানার কথা বলি। কারখানার সংখ্যা বাড়িতে পারে দুই উপায়ে। প্রথম, ধনী লোকেরা একা একা বা সম্মিলিত হইয়া কারখানা স্থাপন করিলে; দ্বিতীয়, সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থাৎ ঐরূপ রাষ্ট্রের ষ্টেট সোশ্যালিজম্ দ্বারা। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন না হইলে এখানে ষ্টেট সোশ্যালিজম্ হইতে পারে না—এখন এখানে গবর্মেণ্ট কোন কারখানা খুলিলে তাহার লাভেরও একটা বড় অংশ কোন-না-কোন উপায়ে ব্রিটিশ লোকদের হস্তগত হইবে।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে ভারতীয়দের কারখানা বৃদ্ধির একমাত্র উপায় ধনিকদিগকে কারখানা স্থাপনে প্রবৃত্ত করা ও উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে শ্রমিকদের শত্রু মনে করা হয় এবং তদনুরূপ আচরণ করা হয়, তাহা হইলে ধনিকদের উৎসাহ বাড়িবার কথা নয়।

—

বঙ্গে জলকষ্টের আসন্ন আর্ত্তনাদ

শীঘ্রই বঙ্গের অগণিত গ্রাম হইতে জলকষ্টের আর্ত্তনাদ উঠিবে। জলকষ্টে দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারীদের। তাঁহাদিগকেই দূর হইতে পানীয় জল, রান্নার জল আনিতে হয়।

জলকষ্ট নিবারণ গবর্মেণ্টের, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও জমিদারদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। গ্রামবাসীদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। যেখানকার মাটি নরম সেখানে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া গ্রামের লোকেরা নলকূপ বসাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। নিজেদের দৈহিক পরিশ্রমে পাতকূয়া খননও অনেক গ্রামে কঠিন নহে। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার দ্বারাও অনেক গ্রামের জলাভাব দূর হইতে পারে।

বহু ছাত্র এখন নিজ নিজ গ্রামে যাইতেছেন। তাঁহারা নিজে কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন, এবং অন্য অনেককে কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারেন।

—

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাত্তর বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে এক জন বড় চিত্রশিল্পী এবং মহানুভব ভদ্র ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তিনি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গে ও ভারতবর্ষে যে চিত্রাঙ্কন-রীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার অগ্রজ ঠিক্ সেই রীতির অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছবির অঙ্কনরীতি কতকটা পৃথক পৃথক ছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছবি অঙ্কনে তিনি প্রতিভাশালী বড় ওস্তাদ ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে যাহা কিউবিষ্ট চিত্রাঙ্কন-রীতি বলিয়া পরিচিত, তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সেইরূপ একটি রীতি উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে তিনি এ-বিষয়ে এক ও অদ্বিতীয়।

"প্রাচ্য আর্টের ভারতীয় সমিতি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘকাল তাহার পরিচালক ছিলেন। এই সমিতি বহু ছাত্রকে আর্ট শিক্ষা দিয়া এবং চিত্র-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গে আর্ট শিক্ষা দিবার সহায়তা করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণকে আর্ট বুঝিতে ও তাহার রসাস্বাদন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানা-গৃহে "বিচিত্রা" নাম দিয়া সাহিত্য ও আর্টের আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য যে-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, গগনেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন ভিন্ন অভিনয়েও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের বদান্য উৎসাহদাতা ছিলেন। দু-এক জনের পাকা ঘরবাড়ী কলিকাতায় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন জানি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও থাকিতে পারে।

দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদি কাজেও তিনি সাহায্য করিতেন। ইহা কম লোকেই জানে।

তাঁহাদের বাড়ীতে যে-সকল পুরাতন চিত্র ও অন্য বহুবিধ শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ আছে, তাহা খুব মূল্যবান।

গগনেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষিতা ও সৌজন্যের দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন।

—

"গৌরী মা"

সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী সন্ন্যাসিনী চিরকুমারী "গৌরী মা" ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন তিনি অল্প বয়সে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে নারীজাতির কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গ করেন। সারদেশ্বরী আশ্রম নামক বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার নারীকল্যাণচেষ্টার একটি প্রধান অঙ্গ।

শ্রীগৌরীপুরী দেবী

তিনি বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং ভবানীপুরের একটি মিশনারি বালিকা-বিদ্যালয়ে কিছু ইংরেজীও শিখিয়াছিলেন। হিমালয়ের নানা স্থানে তপস্যা ও সাধনা এবং ভারতবর্ষে সমুদয় প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনকে পুষ্ট করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবীর তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা উচ্চ ছিল।

স্পেনের যুদ্ধ

স্পেনের দুই দলের যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। এখনও বলা যায় না, কোন্ পক্ষের জয় হইবে, কোনও পক্ষের নিশ্চিত জয় হইবে কি না, এবং কখন যুদ্ধের অবসান হইবে।

—

আবিসীনিয়ায় "বিদ্রোহী"

যাহাদের দেশ কোন দস্যু জাতি ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে, তাহারা যদি সে অধিকার মানিয়া লইতে না-চায় ও মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিতে থাকে, তাহা হইলে বিজেতারা কখন কখন তাহাদিগকে বলে "ডাকাত," কখন কখন বা অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাষায় বলে "বিদ্রোহী"। যে-সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্ত হাবসী এখনও আবিসীনিয়ায় ইটালীর অধিকার মানিতেছে না, যুদ্ধ করিতেছে, ইটালীয়ানরা তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিতেছে।

ইটালীয়ানরা ও অন্যান্য দস্যু জাতিরা এখনও সাম্যবাদী মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অস্বীকারের অনুকরণে একথা বলে নাই, যে, কোন জাতিরই কোন দেশে মালিকানা স্বত্ব নাই, সমগ্র মানবজাতির তাহাতে অধিকার আছে, এবং তন্মধ্যে যে-জাতি সেই দেশ দখল করিয়া তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহারই স্বত্ব!

—

ব্রিটেন ও ইটালী

ব্রিটেন ইটালীর সহিত মিতালি করিবেন। বটলার সাহেব খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই মিতালি আবশ্যক; যে পথ দিয়া ব্রিটেন নিজের জমিদারি অর্থাৎ সাম্রাজ্যে যান, সেই পথে ইটালী প্রবল হইয়াছে। মিতালির জন্য ব্রিটেন ইটালীর আবিসীনিয়া-দখল মানিয়া লইবেন এবং ইটালী যাহাতে ব্রিটিশ মহাজনদের কাছে টাকা ধার পায় তাহারও সুবিধা করিয়া দিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জমিদার আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ডাকাত ছিলেন, কালক্রমে তাঁহারা সম্ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। ইটালীও ক্রমশঃ সম্ভ্রান্ত হইতেছে।

—

রাশিয়ায় আবার ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা

রাশিয়ায় আবার কতকগুলি "মান্যগণ্য" লোকের, স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিদেশীদের সহিত ষড়যন্ত্র করার অপরাধে, বিচার হইতেছে। তাহারা অনেকে অনেক অপরাধ স্বীকারও করিতেছে! ইহাদের বিষপ্রয়োগে হত্যা ও হত্যার চেষ্টা এবং অন্য প্রকারের ঐরূপ অপরাধ স্বীকারের কথা পড়িলে মানবপ্রকৃতির উপর ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহারা সত্য কথা বলিয়া থাকিলে কিরূপ অধম লোক তাহারা! এরূপ লোক সব নেতা ছিল! যদি ভয়ে বা পুলিসের উৎপীড়নে তাহারা মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিতেছে, তাহা হইলে রাশিয়ার পুলিসে কিরূপ পৈশাচিক লোক আছে, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কোন কোন আসামী ব্রিটেনকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ পক্ষ বলিতেছে, ওসব মিথ্যা কথা।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখা গিয়াছিল, প্রচণ্ড কোন নেতা অনেকের গলা কাটাইল, প্রচণ্ডতর নেতা প্রচণ্ড নেতার গলা কাটাইল, প্রচণ্ডতম নেতা প্রচণ্ডতরের গলা কাটাইল। রাশিয়াতে এখন ষ্টালিন প্রচণ্ডতম। তাহা অপেক্ষাও প্রচণ্ড কাহারও আবির্ভাব হইলে ষ্টালিনের বিপদ।

বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক এলডাস্ হাক্সলি তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তক "Ends and Means"এ ("উদ্দেশ্য ও উপায়"এ) ভাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মন্দ উপায় অবলম্বন সম্পর্কে লিখিয়াছেন, যে, যাহারা হিংস্র উপায় অবলম্বন করে তাহা তাহাদের এরূপ প্রকৃতিগত হইয়া যায়, যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার সমর্থনার্থ ও তাহা স্থায়ী করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ হিংস্র উপায়ই অবলম্বন করিতে থাকে। রাশিয়ার ইতিহাসে এই উক্তির প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে।

চীন ও জাপান

চীন এখনও মোটের উপর হারিতেছে—যদিও মধ্যে মধ্যে জিতিতেছে, এবং জাপান মোটের উপর চীনে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া

ক্রমাগত হারিবার আর্থিক সামর্থ্য চীনের থাকে (যেমন লোকবল নিশ্চিত আছে দেখা যাইতেছে), তাহা হইলে অর্থের অনটনেই জাপানকে হয়ত পরাস্ত হইতে হইবে। এ-পর্য্যন্ত কোন শক্তিশালী দেশ চীনের সাহায্য নিশ্চয় করিবে এরূপ বুঝা যাইতেছে না।

—

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন কৃষ্ণনগরে সুনির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে একটি সাহিত্যিক প্রদর্শনীও ছিল।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্যকে যতগুলি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও বেশী শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু শাখা বেশী হইলে শ্রোতা কমিয়া আসে এবং মূল বৃক্ষটির অস্তিত্ব শাখায় ঢাকা পড়িয়া যায়। পরবর্ত্তী অধিবেশন কুমিল্লায় হইবে। সেখানকার উদ্যোক্তাগণ ইহা বিবেচনা করিবেন। কৃষ্ণনগরে যতগুলি শাখা হইয়াছিল, তাহা তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন, না বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ করিয়া দিয়াছিলেন, জানি না।

সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণগুলির উৎকর্ষ সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা কম হয় নাই। কোন কোনটিতে ইংরেজী বাক্য ও শব্দ যাহা ছিল তাহার বাংলা সব জায়গায় দেওয়া হয় নাই। সবগুলিতেই যে ইংরেজী ছিল, তাহা নহে। যেমন, শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণটিতে ছিল না, এবং শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর "পদাবলী-সাহিত্য" সম্বন্ধীয় অভিভাষণটিতে ত থাকিবার কথাই নয়। ডক্টর কুদ্‌রৎ-এ-খোদার বৈজ্ঞানিক অভিভাষণটিতেও ইংরেজীর বুকনি ছিল না। অনেক শ্রোতাই ইংরেজী জানেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক বাংলানবীশ ও ইংরেজীতে কম অগ্রসর মহিলা ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক নহে।

সভাস্থ সকলের শুনিবার সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর অভিভাষণটি। তাঁহার কণ্ঠ যেমন মধুর সেইরূপ উচ্চ। সংস্কৃতের উচ্চারণে তিনি মনোযোগী হইলে তাঁহার পাঠ নিখুঁত হইবে।

কৃষ্ণনগরের অভ্যর্থনা-সমিতির সমুদয় বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। একটি আলোচনা কতকটা আদালতের বিচারের আকার ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষকে ডাকা ও তাহার বক্তব্য শুনা হয় নাই—যদিও তাহার উপর গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছিল। ইহাতে অবশ্য অভ্যর্থনা-সমিতির কোন হাত ছিল না।

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন পরিচালন-সমিতি"র নিয়মাবলী সুবিবেচিত। ইহার পঞ্চদশ নিয়মে বলা হইয়াছে, "এই সম্মিলনে বর্ত্তমান কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে না।" আমরা যত দূর জানি, এই নিয়ম কৃষ্ণনগরে পালিত হইয়াছিল। কেবল দুইটি অভিভাষণে বর্ত্তমান সমাজের ও বর্ত্তমান একটি ধর্ম্মের "আলোচনা" হইয়াছিল বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইয়াছে।

—

মুর্শিদাবাদে হিন্দু-মুসলমানের মিলনচেষ্টা

বঙ্গের মুসলমান সমাজে আভিজাত্যে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের স্থান সকলের উপরে। সমগ্র ভারত-বর্ষের মুসলমান সমাজেও এ-বিষয়ে তাঁহার স্থান উচ্চতমের মধ্যে। তিনি কোন রকমের চাকরিপ্রার্থীও নহেন। এই জন্য, তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার অকপটতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় না। এই মিলনসভায় যে কোন চুক্তি বা সর্ত্তের কথা উঠে নাই, ইহাও এই চেষ্টার অভিসন্ধিশূন্যতার একটি প্রমাণ। এইরূপ চেষ্টা ফলবতী হইলে সুখের বিষয় হইবে।

—

বিহারে বাঙালী

বিহারে বাঙালীকে আতঙ্ক করিবার চেষ্টা অনেক বৎসর হইতেই হইতেছে। নূতন ভারতশাসন-আইন অনুসারে কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর এই চেষ্টা প্রবলতর হইতেছে। কারণ, এই মন্ত্রীরা ভোটের জোরে মন্ত্রিত্ব পাইয়াছেন, এবং অধিকাংশ ভোটদাতা বিহারী; তাহাদিগকে খুশি করিতে হইবে। বিহারীরা শিক্ষা ও অন্যবিধ যোগ্যতায় বিহারের বাঙালীদিগকে অতিক্রম করিতে না-পারিয়া, তাহারা যে বাঙালী কেবল এই

কারণেই তাহাদিগকে চাকরি না-দেওয়া, প্রোমোশ্যন না-দেওয়া, কণ্ট্রাক্টরি না-দেওয়া, ইস্কুল কলেজে, খুব ভাল হইলেও, অবাধে ভর্ত্তি হইতে না-দেওয়া, এইরূপ নানা প্রকার জেদ করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর এবং শোচনীয় ব্যাপার এই, যে, যে-মানভূম বরাবর বাঙালীর বাসভূমি এবং যাহার অধিকাংশ অধিবাসী বাংলা বলে ও বুঝে, সেই মানভূম বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হওয়ায় মানভূমের লোকদেরও চাকরি প্রভৃতির দাবী বিহারীর দাবীর নিম্নস্থানীয় বলিয়া গণিত হয়। বাংলাভাষী সমুদয় অঞ্চলগুলিকেই বিহার হইতে বাহির করিয়া লইয়া বঙ্গের সহিত জুড়িয়া দেওয়া উচিত—যেমন আগে ছিল। কিন্তু তাহা হইলে বিহারের আয় ও প্রভুত্ব কমিয়া যায়! টাকাটি লইব, কিন্তু ন্যায্য অধিকার দিব না, এ বড় অদ্ভুত ব্যবহার।

গবর্ন্মেণ্ট বলেন, কংগ্রেসও বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষিত হওয়া উচিত। বিহারের বাঙালীরা সংখ্যালঘু। তাহারা বিহারের মুসলমানদের চেয়েও সংখ্যায় বেশী, শতকরা ১২ জন। কিন্তু মুসলমানকে খুশি রাখিতে গবর্ন্মেণ্ট ও বিহারী-কংগ্রেস উভয়েই ব্যস্ত। কিন্তু বিহারের বাঙালীকে উভয়েই দেখিতে পারে না। গবর্ন্মেণ্ট পারে না, যেহেতু তাহারা বাঙালী ও হিন্দু; বিহারী-কংগ্রেস পারে না, যেহেতু তাহারা বাঙালী এবং শিক্ষার প্রতিযোগিতায় বিহারীকর্ত্তৃক অপরাজিত।

ইহা একটি শোচনীয় ও কৌতুকজনক ব্যাপার, যে, বিহারে পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকলেই যোগ্য হইলে তাহাদের চাকরি কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদি পাওয়ায় আপত্তি হয় না; আপত্তি কেবল বাঙালীর বেলায়।

বিহারে ও অন্য অনেক প্রদেশে বাঙালীদের বিরুদ্ধে অনেক বাজে কথা বলা হয়। তাহার দু-একটা নমুনা দিতেছি।

"বাঙালীরা বিহারের অর্থ শোষণ করে।" খাস্ বিহারে যত বাঙালী থাকে তাহাদের মোট আয়ের চেয়ে বঙ্গে যত বিহারী থাকে, তাহাদের মোট আয় অনেক বেশী। শুধু শারন জেলার বিহারীরাই বাংলা দেশ হইতে দুই কোটি টাকা বৎসরে বাড়ীতে মনি অর্ডার করে। শারনের সব বাঙালীর মোট বার্ষিক আয় দুই লক্ষের বেশী হইবে না। বাংলা দেশ হইতে খাস্ বিহার ও খাস্ উড়িষ্যায় বৎসরে আট কোটি টাকার মনি অর্ডার হয়। খাস্ বিহার ও খাস্ উড়িষ্যার বাসিন্দা বাঙালীরা প্রায় সকলেই সেখানে ঘরবাড়ী করিয়া রোজগারের টাকা সেখানেই খরচ ও সঞ্চয় করে, বঙ্গে সামান্যই পাঠায়।

"বাঙালীরা বিহারের ভাষা গ্রহণ করে নাই।" খাস্ বিহারের বাসিন্দা বাঙালীরা হিন্দী বলিতে পারে, হিন্দী পড়েও অনেকে। কিন্তু তাহারা নিজেদের উৎকৃষ্ট ভাষা ও সাহিত্য পরিত্যাগ করে নাই, করিবেও না। বঙ্গে অন্য প্রদেশের যত লোক আছে, তাহাদের মধ্যে বাংলা সবাই বলে না, পড়ে না, বুঝে না; কেহ কেহ বলিতে পারে। নিজেদের ভাষা কেহই পরিত্যাগ করে নাই।

বিহারে বাঙালীরাও অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়াছে, জরিমানা দিয়াছে, লাঠি খাইয়াছে। বিহারের ভূমিকম্পে বাঙালীদেরও ক্ষতি হইয়াছে। এবং ভূমিকম্পে বিপন্ন বিহারীদের সাহায্যার্থ বাংলা দেশ হইতে অনেক টাকা গিয়াছে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনাদিতে বাঙালী বিহারে পথ দেখাইয়াছে। অনেক ব্যবসাতেও তাহাই।

বিহারে বাংলা ভাষা

এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছে, যে, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বাংলা-ভাষী জেলা ও অঞ্চলেও শিক্ষার ভাষা বাংলা না-হইয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইবে, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু হইলে তাহা অসহ্য অত্যাচার হইবে। শিক্ষিত বিহারীদের জানা থাকিতে পারে, পোল্যাণ্ড যখন পরাধীন ছিল, তখন রাশিয়া প্রভৃতি দেশ পোলিশ ভাষা আপিস আদালত ও শিক্ষাক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও পোলিশ ভাষা ও সাহিত্য লুপ্ত হয় নাই, পোলরা তাহা পরিত্যাগ করে নাই। বিহারীরা এখনও বাঙালীর প্রভু হন নাই, স্বাধীনও নহেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের সব প্রধান ভাষাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্য্যাদা দিতে অনেক অবাঙালী কুণ্ঠিত। এরূপ ব্যবহারে কেমন করিয়া মহাজাতি গঠিত হইবে?

বিহারে বাঙালী সমিতি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশকে সভাপতি করিয়া বিহারের বাঙালীরা একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। বিহারের সব প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালীর ইহার সভ্য হওয়া উচিত। এই সমিতি বাঙালীর অধিকার রক্ষার্থ ও কল্যাণসাধনের জন্য একটি খবরের কাগজ চালাইতে চান। উত্তম সংকল্প। এই কাগজটি দৈনিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা বিহারী দৈনিকগুলির সহিত যুক্তিতর্কে সমকক্ষতা করিবার সুবিধা হইবে না। বিহারে শিক্ষিত বাঙালী যত আছেন, সকলে এই সমিতির ও সংবাদপত্রের সমর্থক হইলে দৈনিক কাগজ চালান মোটেই কঠিন হইবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

চীন-জাপান বিরোধ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মতিগতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পাশ্চাত্য লেখকগণ চীন-জাপান সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক-পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিমের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে এবিষয় অহরহ লেখা হইয়া থাকে। বাংলা ভাষায় বিদেশী রাষ্ট্রের কথা আলোচনা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। সম্ববদ্ধভাবে এবং যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি আলোচনার আয়োজন পাশ্চাত্যদেশসমূহে প্রচুর। আমাদের দেশেও এইরূপ আয়োজন একান্ত আবশ্যক। বৎসর দুই পূর্ব্বে সরকারী ভাবে এদেশে একটা ইণ্টার[illegible] ইন্‌সৃটিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা হয়। এই জন্য বিলা[illegible] একজন বিশেষজ্ঞও আমদানী করা হইয়াছিল। ইহার ফলাফল [illegible]ও সাধারণে জানিতে পারে নাই। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্ব-কালে জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিদেশ-বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে সাময়িক আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এদিকে শিক্ষিত-সাধারণের তেমন দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গত আবিসিনিয়া-সমরে ও এখনও অসমাপ্ত স্পেন-বিপ্লবে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান চীন-জাপান বিরোধে উক্তরূপ আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। চীনে জাপানের নির্ম্মম অভিযানে সমগ্র প্রাচ্যবাসী আজ সন্ত্রস্ত।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাকিলেও ইহাদের মধ্যে এমন একটা যোগসূত্র রহিয়াছে এবং এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, অন্য হইতে তাহা অনায়াসে পৃথক করিয়া দেখা যায়। সমগ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও এইরূপ একটা সংস্কৃতিগত মিল রহিয়া গিয়াছে। এ-কারণ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা-পরাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও পরস্পরের ভিতর একটা গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান। আবিসিনিয়া বা স্পেনের দুর্দ্দশায় আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছি, অনেকটা বিচলিতও হইয়াছি, কিন্তু ইহা মানবতার দিক হইতে। চীন জাপান বিরোধে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে ইহার কারণ পরস্পরের একাত্মবোধের মধ্যে নিহিত এবং এই একাত্মবোধের জন্যই আমরা এক দিন জাপানকে 'প্রাচ্যের নবারুণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলাম। আজ এই চীন-জাপান বিরোধের মধ্যে আত্মহত্যারই সূচনা দেখা যাইতেছে।

চীন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদীদের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ছলেবলে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লইয়াছে। চীন সাধারণতন্ত্রের জন্মদাতা ডক্টর সান্ ইয়াৎ-সেন এইজন্য "Asia for Asiatics"—এশিয়া 'এশিয়াবাসীদের জন্য' এই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি মাঞ্চু সম্রাটকে তাড়াইয়া দিয়া চীন হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎস-মূলে আঘাত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উপাসকগণ ইতিমধ্যেই সেখানে আড্ডা গাড়িয়া ফেলিয়াছিল। পরে মহাসমর আসিল। চীন এই সময় নিরপেক্ষ ছিল। এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, চীন এই সময় নিরপেক্ষ থাকিয়া ভাল কাজ করে নাই—আত্মরক্ষার জন্যও তাহাকে মিত্রশক্তির পক্ষে দাঁড়ান উচিত ছিল। জাপান পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া ইতিমধ্যেই কূটনীতি বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। সে একাই প্রাচ্য রক্ষা করিতে পারিবে মিত্রশক্তিকে এই ভরসা দিয়াছিল। মহাসমরের সময়ে জাপান চীনকে কতকগুলি দাবি পূরণ করিবার জন্য চাপ দেয়। এই দাবিগুলি এখন ইতিহাসে 'একবিংশতি দাবি' (Twenty-one demands) নামে পরিচিত। মিত্রশক্তিবর্গ সম্মত না হওয়ায় তখন এ দাবি পূরণ হয় নাই। তথাপি লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, জাপান শক্তিমান্ হইলে দুর্ব্বল চীনের পক্ষে তাহা কিরূপ মারাত্মক হইবে। মহাসমর অন্তে ভের্সাই সন্ধির ফলে জাপান বাস্তবিকই প্রাচ্যে শক্তিমান হইয়া উঠে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯২১-২২ সনে ওয়াশিংটনে প্রাচ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির একটি বৈঠক আহ্বান করিয়া নয়শক্তি চুক্তি, চতুঃশক্তি চুক্তি ও নৌ-চুক্তি নামক কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল প্রাচ্যে জাপানের শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। আর একটি উদ্দেশ্য—চীনের অখণ্ডত্ব স্বীকার এবং চীনে মুক্ত-দ্বার বা 'Open door' নীতি প্রচলন। শেষোক্ত উদ্দেশ্য হইতে বুঝা যায়—চীনের অখণ্ডত্ব স্বীকার করিতে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে সকলের সমান অধিকার মানিয়া লইতে জাপান ভবিষ্যতে গররাজি হইতে পারে এমন আশঙ্কাও করা হইয়াছিল।

ওয়াশিংটন বৈঠকের পর পনর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জগতে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। মহাসমরের ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আবার পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। গত সাত বৎসরের ইউরোপীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে জাপান ঐ সব চুক্তি সত্ত্বেও প্রাচ্যে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অসম্ভব রকম বাড়াইয়া লইয়াছে। এক দিন বিরাট রুশ শক্তিকে হারাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র জাপান শুধু সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে নাই, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ হইতে সমগ্র এশিয়া
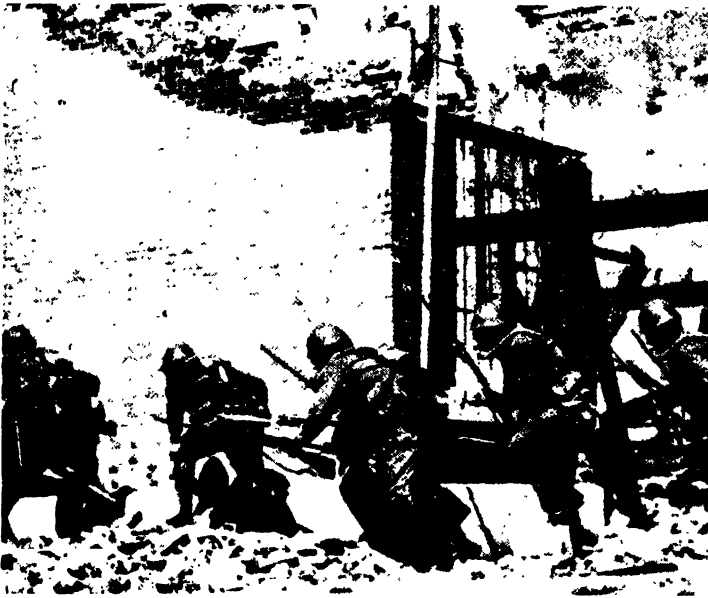
চীন-আক্রমণকারী জাপানী সৈন্য

জাপানী বোমা-নিক্ষেপের ফলে শাংহাইর রাজপথের দুর্দ্দশা

অভিহিত হইতেছে। ইটালী আবিসিনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের যে নগ্ন রূপ দেখাইয়াছে জাপান চীনে তাহাই প্রদর্শন করিতেছে।

গত পনর বৎসরের মধ্যে চীন আত্ম-সংগঠনে জন্য কি করিয়াছে? ওয়াশিংটন বৈঠকের পর প্রথম কয়েক বৎসরে জাপান আত্মপ্রসারে তেমন প্রবৃত্ত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেন পরলোক গমন করেন। গত ১৯২৭ সনে চীনের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ইহারা জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। যে সময়ে আত্মসংগঠন-কার্য্যে চীনের সমস্ত শক্তি সমবেত ভাবে নিয়োজিত করিবার প্রয়োজন ছিল সেই সময় আত্মঘাতী বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহা হইয়া উঠে নাই। গত বৎসর নিজ সৈন্যদের হস্তে চিয়াং কাই শেকের আটক হওয়ায় জগদ্বাসী সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারে চীনের জনসাধারণ—সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী এখন আর আত্মকলহে ব্যাপৃত হইতে চাহে না, একটি প্রবল শত্রুর সম্মুখে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইবার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছে। তবে চীন-সরকার এত দিন জাতিগঠন-কার্য্যে যে একেবারে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে, মাঝে মাঝে তাঁহাদের কর্ম্মের ফিরিস্তিতে ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাদিতে তাহা জানাও গিয়াছে। তথাপি বিরাট জাতির একীকরণের পক্ষে যে-সব বিভিন্নমুখী কার্য্যকরী প্রচেষ্টা আবশ্যক তাহা তত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই। এই জন্যই এ-বৎসরের প্রথম দিকে কোন বিশেষজ্ঞ এই বলিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, যদিও চীন সংহতির পথে অগ্রসর হইতেছে তথাপি সে এতটা শক্তিমান হয় নাই যাহাতে জাপানকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যাহাতে হয় জাপানকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতে হইবে

মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে একদা সমর্থ হইবে ভাবিয়া এশিয়া-বাসীরাও আশান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপান যে-ভাবে তাহার শক্তির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সকলের মনেই আতঙ্কের উদ্রেক হইয়াছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নকল বলিয়া ইহা

নতুবা জাপানের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। চীন প্রথম পন্থাই বাছিয়া লইয়াছে। কি কারণে সে এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

গত সাত বৎসর যাবৎ চীনের উপর জাপানের অবিরত অভিযান চলিয়াছে। সে মাঞ্চুরিয়া ও জিহোল অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উত্তর-চীনের ধাতুসমৃদ্ধ পাঁচটি প্রদেশের উপরও নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া লইয়াছে। অবশেষে গত ১৯৩৫ সনের শেষের দিকে যখন চীনের শুল্কনীতি এড়াইয়া জাপানীরা তাহাদের মালে চীন ছাইয়া ফেলিতে চাহিল তখন চীন-সরকার আর বাধা না দিয়া পারেন নাই। জাপান তখন কতকগুলি দাবির ফিরিস্তি চীন-সরকারে পেশ করিয়া এই হুমকি দিল যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহা মানিয়া না লইলে তাহাকে যথোচিত 'শিক্ষা' দেওয়া হইবে। চীন-সরকার এতকাল পরে এই প্রথম হুমকি অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার প্রতিবাদে জাপান তখন অস্ত্রধারণ করে নাই। জাপান-বিরোধী কার্য্যে চীনের দৃঢ়তা ও ঐকমত্য জানিয়া ইহা কতকটা থ' হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জাপান দেখিল এতকাল চীনে যে জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদীদের সংঘর্ষ চলিতেছিল তাহার অবসান হইয়া সে এক হইতে চলিয়াছে। সে ভবিষ্যতে সোভিয়েটের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশেষ অনর্থের কারণ হইতে পারে। গত ১৯৩৬ সনের শেষের দিকে জার্ম্মেনীর সঙ্গে জাপান যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ইহাও তাহার একটি কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

চীন জাপানের প্রতিরোধকল্পে ঐক্যবদ্ধ হইতে বস্তুতপক্ষে স[illegible] হয় রাষ্ট্রপতি চিয়াংকাই-শেকের গত বৎসর নিজ সেনানী দ্বারা আটক হইবার পর হইতে। তখন তিনি বাস্তবিকই বুঝিয়াছিলেন চীন মতবৈষম্য ভুলিয়া গিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। চীনা মাত্রেই জাপানের অসদুদ্দেশ্য জানিয়া তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল বলিয়াছি। চীনের অংশবিশেষ অধিকার করিয়াই জাপান নিরস্ত ছিল না, তাহার আত্মসংগঠনমূলক কার্য্যের প্রতিও পদে পদে বাধা দিতেছিল। চীনের বিখ্যাত মনীষী ডক্টর হু শি এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"The reconstruction work in all its phases has largely been carried out by Chinese personnel and financed by Chinese money. But of course there are international implications which may be summed up in these words: From the United States we get the training of the Chinese personnel; from the League of Nations, the technical advice of experts; from Great Britain an important portion of the money; and from Japan all obstruction."

প্রতি পদে জাপানের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া চীন কিন্তু স্বভাবতই ভাবিয়াছিল সে আত্মসংগঠন-কার্য্যে অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য পাইয়াছে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার সময়ও ইহাদের নিকট হইতে সেরূপ সাহায্য পাইবে। কিন্তু গত দুই-তিন বৎসরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায় এই সম্ভাবনা নিরাকৃত হইয়াছে। প্রাচ্যে প্রবল হওয়ার পক্ষে জাপান এতকাল সোভিয়েট রুশিয়াকেই বাধা স্বরূপ গণ্য করিয়া আসিতেছিল। গত এক বৎসরে রুশিয়ার আভ্যন্তরিক গোলযোগে এবং স্পেন-বিপ্লবে তাহার অকর্ম্মণ্যতায় তাহাকে ততটা ভয় করিবার আর কারণ রহিল না। আর যদি-বা ব্রিটেনের

বাধা দিবার সম্ভাবনা থাকিত তাহাও ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির জটিলতাহেতু সে সহসা অগ্রসর হইবে না বুঝিতে পারিল। জাপান কূটনীতিবিশারদের ন্যায় সময় বুঝিয়া চীনের উপর নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই অভিযান চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। চীন গত কয়েক বৎসরে কতকটা শক্তিমান হইয়াছে সত্য, সাম্যবাদীরা সরকারপক্ষীয়দের সঙ্গে একযোগে দেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছে সত্য কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তাহাকে সাহায্য না করিলে জাপানের উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে তাহার পারিয়া উঠা দায় হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্ত্তমান চীন-জাপান বিরোধ আরম্ভ হওয়ার পরে একটা চীন-সোভিয়েট চুক্তির কথা প্রকাশ হইয়াছে বটে কিন্তু বর্ত্তমানে সোভিয়েট কিছু অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা ছাড়া তাহাকে আর যে বিশেষ সাহায্য করিতে আসিবে তেমন মনে হয় না। চীন-জাপান বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া ওয়াশিংটনের নয়-শক্তি চুক্তিসম্পর্কে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পুনরায় আলোচনা চালাইবার জন্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহাতিশয্যে ব্রুসেল্‌সে একটি বৈঠক বসিয়াছিল। জাপান তাহাতে যোগদান করে নাই। বৈঠক কোন কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়া সাধারণভাবে রিপোর্ট পেশ করিয়াই কর্ত্তব্য ইতি করিয়াছেন। চীনের মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে এই বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল রাষ্ট্রবর্গ, অন্ততঃ যাহাদের স্বার্থ চীনে রহিয়াছে তাহারা তাহার পক্ষে লড়িতে আসিবে অথবা কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করিবে। তাহার এই ধারণা গত কয়েক মাসের ব্রিটেনের শ্রমিক, উদারনীতিক ও রক্ষণশীল দলের পত্রিকাগুলির আলোচনায় আরও দৃঢ় হইয়া থাকিবে। কারণ ইহারা প্রস্তাব করিয়াছিল যে, যে-সব দেশের সঙ্গে জাপানের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সেই সব দেশ (যথা—ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও

চীনা কুলীর শ্রান্ত মুখচ্ছবি

পিইপিঙে জাপানী সৈন্য

যুক্তরাষ্ট্র) জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক বয়কট পন্থা অবলম্বন করিলে ইহা অভিযান বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কোনই সম্ভাবনা নাই বলিয়া রাষ্ট্রনেতারা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও কি দেখিতে পাই? জাপানের হস্তে শত অপমান-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ব্রিটেন, মার্কিন কেহই উচ্চবাচ্য করিতেছে না। জাপানের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করা দূরে থাকুক, ব্রিটেন ইহার বন্ধু জার্ম্মেনীর সঙ্গে কিছুকাল যাবৎ আলাপ-আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছে। ইহার ফলাফল শেষ পর্য্যন্ত যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমানে ব্রিটেন যে জাপানের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করিবে না তাহাই বুঝা যাইতেছে। জাপান উত্তর-চীনের কতকাংশ ছাড়াও সাংহাই হইতে নানকিন পর্য্যন্ত দখল করিয়াছে। জাপান-সেনাপতির আদেশে শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক অঞ্চলের ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী কর্ত্তারা সর্ব্বপ্রকার জাপান-বিরোধী চীনা আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। চীনা পত্রিকাগুলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ জাহাজগুলিকে জাপানীদের সঙ্কেত মানিয়া চলা-ফেরা করিতে মালিকরা নির্দ্দেশ দিয়াছে। এত ভাল ছেলের মত জাপানী হুমকি মানিয়া চলিয়াও ব্রিটিশের রেহাই নাই। জাপানে ঘোর ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইংরেজরা যাহাতে হংকং হইতে চীন-সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ না করে সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইতেছে।

সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভর করিয়া দেড় বৎসর পূর্ব্বে আবিসিনিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। আবিসিনিয়া-সম্রাট রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, নহিলে ইটালীর সঙ্গে হয়ত স্বাধীনভাবে একটা বোঝাপড়ায় আসিতে পারিতেন। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে, সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্ব্বার ক্ষুধার সম্মুখে আবিসিনিয়া তাহার স্বাধীনতা কত দিন রক্ষা করিতে পারিত বলা যায় না। আবিসিনিয়ার ন্যায় চীনেও বহু যুগ ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযান চলিয়াছিল, কিন্তু এযাবৎ তাহার স্বাধীনতা নির্ম্মূল করিতে জাপানের ন্যায় কেহই এমন করিয়া অগ্রসর হয় নাই। চীনও তাহার পূর্ব্বে চুক্তিগুলির উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য চাহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ সাহায্যের ত আশা নাই-ই, পরোক্ষ সাহায্যও হয়ত পাওয়া যাইবে না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রবর্গের চক্রান্তের এবারে অল্পেতেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এখন চীন রাষ্ট্র নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ পাইবে। জাপানী সেনানায়কগণ বিপথগামী চীনাদের জন্য ভীষণ দরদ প্রকাশ করিতেছে! অথচ ইহারা আকাশ হইতে বোমা ছুঁড়িয়া সহস্র সহস্র নিরীহ নর-নারী-শিশু নিধন করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির হস্ত হইতে চীনকে রক্ষা করিতে নাকি জাপানীরা বদ্ধ-পরিকর! তবে কি চীনকে শ্মশানে পরিণত করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইবে? চীনের কোটি কোটি নরনারী আজ স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রণী হইয়াছে। তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা নিহিত। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যাহারা এতকাল কার্য্যতঃ তাহাকে শোষণ করিয়াছিল অথচ মুখে আশ্বাস দিতে ক্ষান্ত থাকে নাই, বিপৎকালে তাহাদের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া, তাহাদের সাহায্যের আশা করিয়া সংগ্রাম চালনায় বিপদও যথেষ্ট আছে। ওদিকে জাপান যেরূপ করাল মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে তাহার সঙ্গে হয়ত বোঝাপড়া করিবার কথাই উঠিতে পারে না। চীনের মহাজাতি তখনই জাপানের সঙ্গে একটা সম্মান- ও সন্তোষ-জনক মীমাংসায় আসিতে পারিবে যখন তাহারা একতাবদ্ধ হইয়া শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে।

দেশভ্রমণের সুয়োগ

পূজার ছুটি, বড়দিন, ঈস্টার প্রভৃতি ছুটির সময় ই. বি. রেলওয়ে যে সুলভ যাতায়াতের ও অবাধ ভ্রমণের টিকেট বিক্রয় করিয়া থাকেন তাহাতে ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা হয়। এবারে ঈস্টারের ছুটি উপলক্ষ্যেও ই. বি. আর. সুলভ মূল্যে ঐরূপ টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমতী দীপ্তি রায়
আলিগড় সঙ্গীত-সম্মিলনে নৃত্যকুশলতার জন্য পুরস্কৃত

শ্রীমতী গীতি রায়
আলিগড় সঙ্গীত-সম্মিলনে নৃত্যকুশলতার জন্য পুরস্কৃত

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনা শোভাযাত্রা, হরিপুরা